প্রবাসী, ৪৮শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৫

সূচীপত্র

কার্ত্তিক—চৈত্র

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয় সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

শারদোৎসব

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা-বলহীনেন-লভ্যঃ"

Uttarpara Jaikrishna Public Library
Acc. No. ১৪৪৬৫ Date ১৮.৫.৭৯

৪৮শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৫৫

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

গান্ধী জয়ন্তী

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে বেতার-বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু লেন :—

"যাঁহাকে আমরা জাতির পিতা বলিয়া অভিহিত করি াহার জন্ত বিশেষভাবে উৎসর্গীকৃত দিনে আমি আর আপনা- ের কি বলিব ? ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ যাত্রাপথে কলের স্থায় একজন তীর্থযাত্রী, যে গুরুর পদতলে বসিয়া ারতের সেবা এবং সত্যধর্ম্ম শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়া- ল সেই জবাহরলালরূপেই আজ আপনাদের নিকট কিছু লিব, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়।

"কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবন নয় সাধারণ ক্ষেত্রে এবং ন্যান্ত দেশের সহিত ব্যবহারে তিনি আমাদের সত্যের প্রতি দ্ধা রাখিতে এবং স্পষ্টবাদী হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ানুষের আত্মসম্মান ও প্রেমের মর্য্যাদা সম্বন্ধেও তিনি আমাদের শক্ষা দিয়াছেন। ঘৃণা এবং হিংসা হইতে ঘৃণা, হিংসা এবং ংসই আসে—এই পুরাতন শিক্ষারই তিনি পুনরাবৃত্তি রিয়াছেন। সুতরাং তিনি আমাদের নির্ভীকতা, ঐক্য, হিষ্ণুতা ও শান্তির পথ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন।

"গত বৎসরাধিককালে ভারতে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত; কারণ ঐগুলি অন্যায়। কিন্তু কাশ্মীর ও হায়দরাবাদে যাহা করিয়াছি ও করিতেছি তাহার জন্ত আমাদের কোনও দুঃখ নাই ; আমরা যদি হায়দরাবাদ ও কাশ্মীরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিতাম বে আরও বেশী দুঃখ কষ্ট ও হাঙ্গামা দেখা দিত। কাশ্মীরকে ক্ষা করিবার জন্ত অথবা জঘন্য ষড়যন্ত্র হইতে হায়দরাবাদের অধিবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্ত যদি ভারতবর্ষ অগ্রসর না ইত তবে লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিত না।

অন্যান্ত দেশে যাহাই ঘটুক না কেন, আমরা যেন শান্ত এবং গান্ধীজীর শিক্ষার প্রতি অবিচল থাকিতে চেষ্টা করি। তাঁহার প্রতি যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে নিজেদের প্রতিও আমরা বিশ্বাস রাখিতে পারিব এবং তাহাতে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির মঙ্গলই হইবে।"

ঐদিনই দিল্লীর জনসভায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে রাষ্ট্রনৈতিক গগনে গান্ধীজীর আবির্ভাবের উল্লেখ করিয়া তিনি আরও বলেন :—

"তাঁহার প্রথম মন্ত্র ছিল "ভয় পাইও না।" এই মন্ত্রে লোকের মনে নূতন আশা দেখা দিল; দেশের অবস্থাও অনেক পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার আদর্শ আমি এবং গবর্ন্মেণ্ট অনুসরণ করিতেছি। অবশ্য সর্ব্বদা আমরা তাঁহার উচ্চ আদর্শের সম্মান রক্ষা করিতে পারি নাই।"

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু বলেন :—

"জীবনের শেষ কয়মাস আমরা গান্ধীজীকে খুবই দুঃখ দিয়াছি। সেজন্ত আমরা যথোচিত অনুতপ্ত হইয়াছি কি-না জানি না। তিনি বলিতেন, আমার আর বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা নাই। চতুর্দ্দিকে ঘৃণা বিদ্বেষ লইয়া বাঁচিয়া থাকা গান্ধীজীর পক্ষে অসহনীয় ছিল। সুতরাং গান্ধীজীর জন্ত দুঃখ করিবার সময়ে আমাদের মনে রাখিতে হইবে তাঁহার দেহও নশ্বর ছিল। কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য রহিয়া গিয়াছে। তিনি জীবিত থাকিতে যে আলো বিচ্ছুরিত হইত, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার উপদেশ হইতে যে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহা আমাদের পথ প্রদর্শন করিবে। গান্ধীজীর মৃত্যুতে সে আলো ম্লান হয় নাই।"

"তাঁহার মহত্ত্বের কথা, তাঁহার গৌরবময় সাফল্যের কথা অধিক বলিয়া লাভ নাই। আমরা যখন বলি, তিনি আমাদের বাপু, জাতির জনক, আমরা যাহা কিছু পাইয়াছি, তাঁহারই জন্য পাইয়াছি ইহাই যথেষ্ট।"

মহাত্মাজীর পূর্ণাঙ্গ জীবন জাতির পক্ষে কত দূর কল্যাণময় ছিল সে কথা আজ আমাদের অভাব-অভিযোগপূর্ণ দুঃখ-জর- ক্লিষ্ট দেশের জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিরোধানের মধ্যেও তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিষ নিজে ধারণ করিয়া জাতির অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আজ হায়দরাবাদের সমস্যা যে এইরূপে, বিনা রাষ্ট্রবিক্ষোভে, পূরণ করা সম্ভব হইল তাহার কারণ মহাত্মাজীর আত্মাহুতি।

মহাত্মাজীর আত্মা ও চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল ও হিংসাবর্জ্জিত ছিল বলিয়াই তিনি অন্যের দোষ ক্ষমা করিয়া তাহার গুণের সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেন; নিজের মধ্যে অহঙ্কারের

লেশমাত্র ছিল না বলিয়া অপরকে হেয়জ্ঞান করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। নিজের বিশ্বাস পূর্ণরূপে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই অপরের বিচারের সময় তিনি তাহার মধ্যে যাহা অসত্য তাহাকে বর্জ্জন করিয়াও যেটুকু সত্য তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাঁহার শিষ্যবর্গ যদি তাঁহার পথ সত্য সত্যই অবলম্বন করিয়া চলিতেন তবে দেশে আজ আশার আলো উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত।

তিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে অহিংসাব্রতী ছিলেন। কিন্তু আমরা নিজের অভিজ্ঞতায় সাক্ষ্য দিতে পারি যে তিনি বীরত্বের সম্মানদানে হিংসা-অহিংসার মধ্যে কঠোর প্রভেদ করিতেন না। ১৯৪৫ সালে মগনলাল বাগরী নামক বিপ্লববাদী যখন ধৃত হইয়া নাগপুরের বিচারালয়ে চরম দণ্ডের সম্মুখীন হয় তখন মহাত্মাজী তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য সেখানকার এক প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান ব্যবহারাজীবকে বিশেষ অনুরোধ করেন এবং সকল ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দেন। ব্যবহারাজীব বলেন: "বাপুজী, ইস্‌নে তো অহিংসা ছোড় কর দুসরা রাস্তা লিয়া, তো ফির ইনকো আপ মদত দেনা কেঁও চাহ্‌তে হঁয় ?" আমরা আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার উত্তর শুনিলাম "ভাই, হিম্মত তো দেখলায়া ? হিম্মত কি কদর দেনা তো চাহিয়ে ?" বস্তুতঃ পক্ষে বীরত্বের সম্মান তিনি সর্ব্বদাই সকল ক্ষেত্রে করিতেন। মেদিনীপুরের ১৯৪২-৪৫ সালের অসহযোগ সংগ্রাম কালে জনৈক ক্ষমতালোভী নেতার চক্রান্তে দলবিচ্ছেদ ও বিশেষ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, যাহার ফল অত্যন্ত বিষময় হইয়া উঠে। মহাত্মাজীর মেদিনীপুর যাত্রার পূর্ব্বে ঐ নেতার দল মহাত্মাজীর নিকট বিপক্ষদলের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্য্যের অভিযোগ করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন। সেই দলের কয়েকজন আমাদের নিকট আসিলে আমরা তাঁহাদের বলি মহাত্মাজীকে অকপটে সমস্ত সত্য ঘটনা বলিতে। তাঁহারা ঐ পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, অসহযোগ সংগ্রামের সমস্ত বিবরণ মহাত্মাজীকে নিবেদন করেন। বলা বাহুল্য, মহর্ষিজীর বিচারে বীরত্বের সম্যক্ উপলব্ধি দেখা যায়। আজ এমন কে আছেন যিনি ঐরূপ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে সমর্থ ?

বাঙালী যুবশক্তির সমাদর

মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরে সুহরাবর্দ্দি মন্ত্রিসভার কলিকাতা দখলের জন্য সশস্ত্র অভিযানের সময় প্রায় দুই হাজার বাঙালী যুবক ও কিশোর জীবনমরণ পণ করিয়া যুদ্ধদানে তৎপর হয়। কলিকাতার হিন্দু সাধারণের ধন, প্রাণ এবং স্ত্রীলোকের মান-ইজ্জত রক্ষার অন্যতম কারণ উহাদের প্রবল প্রতিরোধ-সংগ্রাম। বঙ্গবিভাগের পর প্রধানমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে অনুরোধ করা হয় যেন ঐ সকল যুবককে সশস্ত্র পুলিস ও সামরিক বিভাগে গ্রহণ করিয়া দেশের শাসন রক্ষণে নিযুক্ত করা হয় কেননা অন্যথায় উহারা বিপথে যাইতে পারে। প্রফুল্লবাবু তাঁহার একান্ত নিজস্ব দিব্যজ্ঞানের আলোকে বিপরীত ব্যবস্থা করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের হাতে পুলিস রহিয়াছে ছয় মাসের অধিক। নিম্নলিখিত সংবাদ কিরণবাবু নিশ্চয়ই জানেন। আমরা দেখিতে চাহি এ বিষয়ে তিনি কি করেন কেননা তাহাতেই তাঁহার ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে।—

"২৭শে সেপ্টেম্বর ভোর তিনটার সময় একজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টর দলবল সহ ২৭।৩ বৈঠকখানা রোডের শ্রীফণীন্দ্রভূষণ সেন বরাটের গৃহে হানা দেন। খানাতল্লাসীর জন্য দমকলের মই দিয়া পুলিস তেতলা বাড়ীর ছাদে উঠে। বিবরণে প্রকাশ, ছাদে লোকের পায়ের শব্দ পাইয়া চোর মনে করিয়া বাড়ীর মালিকের পুত্র শ্রীসুধীর সেন শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসে এবং পুলিসের গুলি খাইয়া পড়িয়া যায়। গুলির শব্দ শুনিয়া সুধীরের বড়ভাই পুলিসকে প্রশ্ন করিলে তাহার প্রতিও গুলি ছোঁড়া হয় বলিয়া প্রকাশ। সৌভাগ্যক্রমে সে আহত হয় নাই। আহত সুধীর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। বড়ভাইটি আছেন পুলিসের হেপাজতে।"

পূর্ব্ববঙ্গের "পাকিস্থানী" মতিগতি

মুর্শিদাবাদ জেলার কংগ্রেসী পত্রিকা "গণরাজ"-এ নিম্নলিখিত বিবরণ ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে,—

মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে পাকিস্থানী জুলুম যে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একথা আমরা বহু পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি। স্বাধীনতা লাভের পর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল ; কিন্তু অবস্থার ত কোন পরিবর্ত্তন হইলই না, উপরন্তু 'র‍্যাডক্লিফ' রোয়েদাদ অনুসারে সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলের যে সকল চর মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত, তাহা পাকিস্থানী সরকারের দখলে থাকা অবস্থায় উভয় ডোমিনিয়নের প্রধান সচিবদ্বয় একত্রে মিলিত হইয়া 'status quo' রক্ষা করিবার যে চুক্তি সম্পাদন করিলেন, তাহার ফলে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য কতিপয় চর হইতে জেলার অধিবাসিগণ বিতাড়িত হইবার ফলে সুতি, সমসেরগঞ্জ, রাণীনগর, জলঙ্গী প্রভৃতি থানার অধিবাসিগণের একাংশ তাহাদের পৈতৃক বাসভূমি হইতে যে বিতাড়িত হইলেন এবং অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত হইলেন, তাহা অস্বীকার করিবে কে ? পূর্ব্ব পাকিস্থানের সরকার সীমানির্দ্ধারণ ব্যাপারে ভারত-রাষ্ট্রের নিকট সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিবার যে আকুল আহ্বান জানাইয়াছিলেন, তাহাতে সাড়া দিয়া ভারত-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার তাঁহাদের উদারতারই পরিচয় দিয়াছিলেন ; কিন্তু পাকিস্থানী সরকার তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রচলিত রীতি অনুসারে কোন চুক্তিই প্রতিপালন করেন নাই। তাই বার বার আমরা চুক্তি-ভঙ্গের দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি তাঁহাদের মেসিনগানধারী ষ্টীমারকে মুর্শিদাবাদ জেলার বুকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে। আমরা দেখিয়াছি যে তাঁহাদের সশস্ত্র রক্ষী আমাদের রাণীনগর থানার রামনগর, দোয়েম-কানুন, বাঁশগাড়া ও বেগমপুর মৌজার অনধিকার প্রবেশ

করিয়া গরীব নিরীহ প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছে—এমন কি আমাদের পাহারারত রক্ষীবাহিনীর উপর গুলি ছুড়িতেও সাহসী হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি পাকিস্থানী সরকার অন্যায়ভাবে অকারণে নুরপুর সীমান্ত হইতে আমাদের সশস্ত্র রক্ষীবাহিনীকে গ্রেপ্তার করিয়া ন্যায়-নীতির সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে।

ইহা পাঠ করিয়া ইহাই মনে হয় যে পাকিস্থানের নূতন রাষ্ট্রপাল জনাব খাজা নাজিমউদ্দিন ও পূর্ব্ববঙ্গের নূতন প্রধান মন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন যে সব ভরসার কথা আমাদের শুনাইতেছেন, তাহার উপর অনেক দিন নির্ভর করিয়া থাকা যাইবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব্বেও সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থানী বর্ব্বরতার যে বহিঃ-প্রকাশ হইয়াছে পশ্চিম পাকিস্থানে ও কাশ্মীর রাজ্যে তাহার ফল উভয় রাষ্ট্রের নাগরিকবর্গকে ভোগ করিতে হইবে। পূর্ব্ববঙ্গে অন্তরটিপুনী দিয়া হিন্দুর সম্মানের ও স্বার্থের উপর নিয়ত আঘাত করা হইতেছে। এই অবস্থায় যদি 'গণরাজ' পত্রিকায় বর্ণিত কার্য্য-কলাপ চলিতে থাকে তবে ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্তে যে-কোন দিন আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে। ইহা আমরা চাই না। কারণ ভারতবাসীর নিজেদের মধ্যে হানাহানি করিয়া যে স্বাধীনতা আসিয়াছে আমাদের দুয়ারে তাহা বিমুখ হইয়া চলিয়া যাইবে যদি এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার ভাব না থাকে। জনাব নুরুল আমিনকে এই কথাটাই মনে রাখিতে বলি। ভারতরাষ্ট্র পাকিস্থানের শত্রু এই কথা শুনাইতে শুনাইতে একদিন সত্যই "বাঘ" আসিয়া পড়িতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী বেশী দিন লাগাম কষিয়া রাখিতে পারিবেন না। লোকের সহ্যেরও একটা সীমা আছে।

বাঙালীর সামরিক বৃত্তি

হায়দরাবাদ রাজ্যের রাজাকার গুণ্ডামি দমন করিবার জন্য যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল তাহা প্রায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হয়। ইহার মধ্যে দুই দিকের নেতৃত্ব করেন দুই জন বাঙালী সৈন্যাধ্যক্ষ—ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চৌধুরী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রুদ্র; আকাশ-পথের আক্রমণে বিমানাধ্যক্ষ মুখার্জ্জি নেতৃত্ব করেন। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই তিন জন বাঙালী প্রধানকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, এবং তাঁহাদের কৃতিত্বের গৌরব বাঙালী জাতির প্রাপ্য বলিয়া দাবি করেন। তাঁহার বিবৃতিটি উত্তর-ভারতের কোন কোন সাংবাদিকের মনঃপূত হয় নাই; এই বিবৃতির মধ্যে তাঁহারা প্রাদেশিকতার ইঙ্গিত পাইয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। এই বিবৃতি পাঠ করিয়া আমাদের মনে কিন্তু অন্যভাবে দুঃখের উদয় হইয়াছিল। সৈন্যাধ্যক্ষ চৌধুরী, সৈন্যাধ্যক্ষ রুদ্র ও বিমানাধ্যক্ষ সুব্রত মুখার্জ্জির কৃতিত্বে আমরা গৌরব অনুভব করি। কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ, নৌ-সেনাধ্যক্ষ ও বিমানাধ্যক্ষের আজ্ঞায় বাঙালী সৈনিক, বাঙালী নৌ-সেনা ও বাঙালী বৈমানিক চলিলে সেনাধ্যক্ষ ও বিমানাধ্যক্ষের কৃতিত্বে একটা জাতির ক্ষত্রিয় বৃত্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। এইরূপ অসমান উন্নতিতে জাতির পক্ষে উৎফুল্ল হইবার কোন কারণ নাই।

ইংরেজের আমলে বাঙালীর কপালে "অ-সামরিক জাতি" বলিয়া একটা কলঙ্কের ছাপ লেপিয়া দেওয়া হইয়াছিল। চৌধুরী, রুদ্র, মুখার্জ্জি, সেন প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর দু-চার জন সামরিক জীবনে সাফল্য অর্জ্জন করিলে, বাঙালী জাতির মধ্যে সামরিক বৃত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে না। যখন লক্ষ লক্ষ বাঙালী সামরিক বৃত্তির নানা বিভাগে যোগদান করিবে তখনই বাঙালী সমরাধ্যক্ষবর্গের গৌরব বংশানুক্রমে সংক্রামিত হইবে। এইভাবে বিষয়টা বিচার করিলে ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায়ের সম্মুখে বিরাট কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে। স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের রক্ষা-কল্পে কেবল বাঙালী সমরাধ্যক্ষের আবির্ভাব হইলে চলিবে না। প্রত্যেক বাঙালীকে অস্ত্রধারণক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে.; প্রত্যেক বাঙালীকে ভারতরাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বর্ত্তমান যুগোপযোগী সামরিক শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শী করিয়া তুলিতে হইবে। এই বিষয়ে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রি-মণ্ডলীর অপদার্থতার কথা আমরা জানি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রি-মণ্ডলী ১০০ শত জাতীয় রক্ষী বাহিনীর সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে পারিবেন না; ১৭০০, ১৮০০ শত লোককে বাঙালী পল্টনে ভর্ত্তি করিবার সংবাদ প্রচার করিয়া কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে এই ধারণার সৃষ্টি করিলে চলিবে না। কথা ছিল যে ৬,০০০ হাজার পল্লীবাসীকে এক বৎসরের মধ্যে সামরিক অ, আ, ক, খ শিক্ষাদান করিয়া তাহাদের গৃহে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। তাহাদের গ্রাম পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব্ব-সীমান্তে অবস্থিত। এই সীমান্তরক্ষার প্রথম চোটটা তাহাদের উপরই পড়িবে।

মুর্শিদাবাদের "গণরাজ" পত্রিকা হইতে সংবাদ ও মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে আমাদের পূর্ব্ব-সীমান্তের প্রতিবাসী "পাকিস্থানীরা" খুব শান্তিপ্রিয় লোক নহে। বিগত এক বৎসরের মধ্যে তাহারা নানাভাবে আমাদের পূর্ব্ব-সীমান্তের গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার করিয়াছে। তাহা বন্ধ করিতে পশ্চিম বাংলার গ্রাম্য-অঞ্চলের লোককে সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাদের পৃষ্ঠ-রক্ষা করিবে রীতিমত সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী সৈনিক, নৌ-বাহিনী ও বৈমানিক। এই ত্রিবিধ শিক্ষার কি আয়োজন করা হইতেছে তাহা জানিবার অধিকার আমাদের আছে। এই বিষয়ে দায়িত্বটা কাহার—কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের না পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্টের? চূড়ান্ত দায়িত্ব ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্টের দায়িত্বটা কোন্‌খানে আরম্ভ ও কোন্‌খানে তাহার শেষ হইয়াছে, তাহা আমাদের জানিতে হইবে। পশ্চিম-বঙ্গ গবর্মেণ্ট একটি বিরাট প্রচার বিভাগ পোষণ করিতে-

আমরা পাইয়া থাকি। কিন্তু আমাদের মনে পড়ে না যে বাঙালীর মধ্যে সামরিক বৃত্তি উজ্জীবিত করিবার কোন চেষ্টার সংবাদ এই প্রচার বিভাগের নিকট হইতে পাইয়াছি। প্রধান মন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনে ছিটেফোঁটা সংবাদ যাহা পাই তাহা অকিঞ্চিৎকর। আর পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের সভ্যবৃন্দের গুণের কথা বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। সামরিক জীবন সম্বন্ধে যে একটা কলঙ্ক বাঙালীর কপালে দাগিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য কোন উদ্যোগ তাঁহাদের মধ্যে ত দেখিতে পাই না। এই কলঙ্ক মোচনের চেষ্টা করিবে কে তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়।

পশ্চিম বাংলা ও বিহারের সীমান্ত অঞ্চল

পশ্চিম বাংলা ও বিহারের মধ্যে সীমান্ত-অঞ্চল লইয়া একটা বিতর্ক চলিতেছে। এই বিষয়ে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী, পশ্চিম বাংলার পরিষদের সভ্যবৃন্দের বিরুদ্ধে আমাদের একটা অভিযোগ আছে। সেই অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গ হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রেরিত সভ্যবৃন্দের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য। আমাদের অভিযোগ তাঁহাদের সকলের নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধে, এই বিষয়ে তাঁহাদের অসহায়তার বিরুদ্ধে। বিহার-পরিষদে বিহারী মন্ত্রিমণ্ডলী ও সভ্যবৃন্দ এই সম্বন্ধে অধিক সজাগ বলিয়া মনে হয়। এই সেদিন মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় ত আমাদের সকলকে শাসাইয়া দিয়াছেন এবং একজন সভ্য বাংলাদেশের মালদহ জেলার উপর একটা দাবী পেশ করিয়া রাখিয়াছেন। আর পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রি মহাশয়গণ এই বিষয়ে নীরব; পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের সভ্যবৃন্দের বক্তৃতা-শক্তি নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা ও গণ-পরিষদের বাঙালী সভ্যবৃন্দ গত আট মাস পর্য্যন্ত ঘুমের ঘোরে ছিলেন। উৎকলের প্রতিনিধি শ্রীবিশ্বনাথ দাশের প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন সম্বন্ধে তাঁহার অনিচ্ছার কথা একটু রুক্ষ-ভাবে, বোধ হয়, প্রকাশ করেন। বাঙালী সভ্যবৃন্দের টনক তাহার পূর্ব্বেই নড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গণ-পরিষদের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভাষার ভিত্তিতে দাক্ষিণাত্যের প্রদেশসমূহ পুনর্গঠন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন; সেই কমিশনের কার্য্যাবলী হইতে উত্তর-ভারতে কোন সীমান্তের অদল-বদল করার প্রশ্নটাকে সাবধানতার সহিত এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে। বাঙালী সভ্যবৃন্দ একটু ব্যাপকতর মীমাংসার জন্য গণ-পরিষদের সভাপতির নিকট একখানি পত্র লিখেন; তাহার উত্তরে এমন একটা সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে যে বাঙালী সভ্যগণ ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর নিকট একটা অভিযোগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকেও এই বিষয়ে পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য আর একখানি পত্র দিয়াছেন। তাহার কোন সদুত্তর পাওয়া গিয়াছে কিনা তাহা আমরা জানি না। পণ্ডিত জবাহরলালের নিকট লিখিত পত্রে ব্যাপারটার মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"প্রিয় মহাশয়,

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ বিভাগ সম্পর্কে ১৯৪৮ সালের ৩০শে আগষ্ট তারিখে শ্রীবিশ্বনাথ দাশের প্রশ্নের উত্তরে আপনি লিখিতভাবে পরিষদে যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি।

এই বিশেষ সমস্যাটি সমাধানের জন্য বর্ত্তমানে কোন কাজ করা সম্পর্কে গবর্ণেমণ্টের অনিচ্ছার বিষয় আমরা অবগত আছি। কিন্তু কয়েকটি অঞ্চল সম্বন্ধে এই বিষয়ে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরল ও মহারাষ্ট্র এই চারিটি নূতন প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ও তৎসম্বন্ধে একটা রিপোর্ট দিবার জন্য গণ-পরিষদের সভাপতি যে কমিশন গঠন করিয়াছেন, গবর্ণেমণ্ট তাহা সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত কমিশন কাজ আরম্ভ করিয়াছে। আমরা বলিতে চাহি যে, বিহারের বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল সম্পর্কিত সমস্যাটিও বর্ত্তমানে স্থগিত রাখা উচিত নয়। বাংলা-বিহার সমস্যা ভাষাগত প্রদেশ গঠন সমস্যার অংশবিশেষ। বিহারের বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল বাংলার (বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলার) অন্তর্ভুক্ত করার দাবী ভাষার ভিত্তিতে কয়েকটি নূতন প্রদেশ গঠনের দাবীর ন্যায়ই পুরাতন।

গণ-পরিষদের কোন প্রস্তাব বা নির্দ্দেশ অনুসারে সভাপতি মহাশয় এই কমিশন নিযুক্ত করেন নাই; যদিও খসড়া প্রণয়ন কমিটির একটা নির্দ্দেশ অনুসারে এই কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছে, এরূপ একটা ইঙ্গিত আছে। খসড়া প্রণয়ন কমিটি নূতন শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী করার পূর্ব্বে নূতন প্রদেশসমূহ গঠন করার কথা বলিয়াছেন। ১৯৩৫ সালের ভারত আইনের ২৯০ ধারা অনুযায়ী একমাত্র গবর্ণেমণ্টই তাহা করিতে পারেন। আমরা এই শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নটি তুলিতাম না। কিন্তু বিহার ও পশ্চিম বাংলার সীমানা নির্দ্ধারণের সমস্যাটি কমিশনের কার্য্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য গণপরিষদের সভাপতিকে যে অনুরোধ করিয়াছিলাম সেই অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় আমাদের এই শাসন-তান্ত্রিক সমস্যাটির উল্লেখ করিতে হইয়াছে। আমরা বলিতে চাই যে গণ-পরিষদের সভাপতি কমিশন নিযুক্ত করিলেও প্রয়োজন বোধে তাহার কর্ম্মসূচী বাড়াইবার বা সঙ্কোচ করিবার অধিকার গবর্ণেমণ্টের আছে। ১৯৪৮ সালের ২৫শে আগষ্ট তারিখে গণ-পরিষদের সভাপতির নিকট যে পত্র আমরা লিখিয়াছিলাম তাহার প্রতিলিপি আপনার নিকটেও প্রেরিত হইয়াছিল। গণ-পরিষদের সভাপতি মহাশয় আমাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া যে উত্তর দিয়াছেন, কমিশনের কার্য্য-সূচী বাড়াইয়া বাংলা-বিহারের সমস্যাটা তাহার

অন্তর্ভুক্ত করিবার যে দাবী আমরা করিয়াছিলাম তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা আমরা পাইয়াছি। কমিশন কেবল নূতন প্রদেশ কয়টি গঠন সম্পর্কে তদন্ত করিবেন, এই কথাটা আমাদের জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই অবস্থায় ১৯৩৫ সালের ভারত আইনের ২৯০ ধারা অনুসারে গবর্ণমেণ্টই কেবল পশ্চিম বাংলা ও বিহারের সীমানা পুনঃ নির্দ্ধারণের জন্য কাজ করিতে পারেন। যখন গণ-পরিষদ এই বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই, তখন এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এবং অবস্থা উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি।

বর্ত্তমান সঙ্কটজনক সময়ে গবর্ণমেণ্টকে বিপদে পড়িতে হয় এইরূপ কোন কিছু করিতে আমরা চাহি না বা এরূপ কোন প্রস্তাবও করিতে চাহি না। বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলার প্রতি বর্গ মাইলে লোক সংখ্যা প্রায় ৮০০ শত হওয়ায় এবং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ক্রমাগত আশ্রয়-প্রার্থী আসায়, পশ্চিম বাংলার সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণের সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সমগ্র ভারতে ভাষাগত ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্বিভাগের প্রশ্নটি যদি বর্ত্তমানে স্থগিত রাখা হইত তাহা হইলে আমরা অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধানের জন্য চাপ দিতাম না। এইরূপ ক্ষেত্রে আমরা দুইটি প্রতিশ্রুতি চাহিতাম। প্রথমতঃ, বিহারের বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চলের ভাষাগত বর্ত্তমান অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য কোন কিছু করা হইবে না, এবং ভবিষ্যতে বিহারের বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিম বাংলার সহিত যুক্ত করা সম্পর্কে বাধা সৃষ্টি হইতে পারে, নূতন শাসনতন্ত্রে সেইরূপ কোন বিধান বা নির্দ্দেশ থাকিবে না।

শীঘ্রই এই পত্রের উত্তর পাইলে বাধিত হইব।"

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর নিকট হইতে এই পত্রের কোন সদুত্তর পাওয়া গিয়াছে কিনা জানি না; গণ-পরিষদের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কোন্ যুক্তি দেখাইয়া বাঙালী সভ্যগণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহাও আমরা জানি না। কোন সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হইলে, তাহা আমরা দেখি নাই। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর (৩রা আশ্বিন) তারিখের "হরিজন" পত্রিকায় পুরুলিয়ার কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে; তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহারা কোন প্রকাশ্য আন্দোলনের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা কংগ্রেসের সর্ব্বোচ্চ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের হাতে এই সমস্যার মীমাংসার ভার দিয়াছেন, ন্যায় ও কংগ্রেসের বহু বিঘোষিত নীতির উপর নির্ভর করিয়া কংগ্রেস নেতৃবর্গ তাহা মীমাংসা করিয়া দিবেন; এই ভরসা অতুলবাবু করেন। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী, পশ্চিম বাংলার পরিষদের সভ্যবৃন্দ, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিবর্গ—সকলেই মনে হয় এরূপ একটা ভরসায় বুক বাঁধিয়া আছেন। তাঁহাদের ভরসা সার্থক হউক। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে এরূপ ভাবে সদ্ভাবের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া চলা যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। কামড়াইতে নিষেধ করা হইয়াছিল বলিয়া ফোঁস করিতে ত কোন নিষেধ ছিল না—এরূপ একটা গল্প "রামকৃষ্ণ কথামৃতে" পড়িয়াছি। এই গল্পের শিক্ষা ছিল যে, নির্দিষ্ট লোককে হিংসা হইতে দূরে রাখিতে হইলে একটু ভয় দেখাইতে হয়। সেইরূপ রাষ্ট্রকেও অন্যায়ের পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে হইলে জনমতের রুদ্র-মূর্ত্তির প্রয়োজন হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের ও কর্ণাট প্রদেশের নেতৃবর্গ ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারবৃন্দের কানে এরূপ একটা সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের বাঙালী সভ্যবৃন্দের কি এই কথা অজানা?

গৌহাটির ঘটনার স্বীকৃতি

গৌহাটিতে গত মে মাসে অসমিয়ারা বাঙালীদের উপর চড়াও হইয়া যে গুণ্ডামি করে তাহার ফলে একজন বাঙালী নিহত এবং ৪০ জন আহত হয় এবং লুণ্ঠিত ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮১,৯৪৫।৶০ আনা। সম্প্রতি আসাম ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে রাজস্বসচিব শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী এই তথ্য স্বীকার করিয়াছেন। যাহারা দাঙ্গা বাধাইয়াছিল এবং লোকজন আহত ও সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মামলা চালানো হইতেছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে মেধী মহাশয় বলিয়াছেন যে তদন্তে সমস্ত অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হইয়াছে কিন্তু কোন লোকের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ নাই বলিয়া মামলা চালানো যাইবে না। গৌহাটির দুইটি ডাক্তারখানা এই দাঙ্গায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যাহারা ডাক্তার-খানাটি ভাঙিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৬ ধারানুসারে ৬৪ (৫) নং মামলা দায়ের করা হয়; তদন্তে অভিযোগ সত্য বলিয়া জানা যায়—এতগুলি কথা স্বীকার করিয়াও মেধী মহাশয় তাঁহার জবাবে সার কথা এই বলিলেন যে "প্রমাণ নাই" (No evidence)।

আসাম গবর্ণমেণ্ট দাঙ্গাকারী আসামীদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন—লোকের মনে অতঃপর এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়াই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। গৌহাটির ঘটনা এবং উহাতে সংশ্লিষ্ট দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে সত্য প্রতিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও সরকারের দয়ায় তাহাদের "প্রমাণাভাবে" মুক্তিলাভ হইতে আসামবাসী বাঙালীদের অসহায় অবস্থা যে কতদূর গভীর তাহা বুঝা যায়।

পূর্ব্বাচল প্রদেশ

আসামের প্রাদেশিক বিদ্বেষে জর্জ্জরিত হইয়া সেখানকার বাঙালীরা যে স্বতন্ত্র কংগ্রেস প্রদেশের দাবী তুলিয়াছিলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিগত অধিবেশনে তাহা অনুমোদন করা হয়। স্থানীয় লোকদের দাবী অনুসারে কাছাড়, ত্রিপুরা, মণিপুর ও লুসাই পাহাড় লইয়া একটি আলাদা কংগ্রেস প্রদেশ পূর্ব্বাচল প্রদেশ নামে গঠিত হয়। ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্তের কয়েক দিন পরে অকস্মাৎ কংগ্রেস-সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজে এক আলাদা হুকুমনামা জারী করিয়া ঐ অনুমোদন বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

পূর্ব্বাচল প্রদেশ লইয়া যাঁহারা আন্দোলন করিতেছেন দেখা যাইতেছে তাঁহারা স্বতন্ত্র কংগ্রেস প্রদেশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিতেছেন। হয়ত তাঁহারা ভাবিতেছেন যে একবার উহা কংগ্রেস-প্রদেশে পরিণত হইলে উহাকে শাসন-তান্ত্রিক প্রদেশ রূপে পৃথক করিয়া লইতে বিলম্ব বা অসুবিধা হইবে না। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দীর্ঘকাল যাবৎ কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে ভাষার ভিত্তিতে অন্ধ্র, তামিলনাদ, কর্ণাটক প্রভৃতি প্রদেশের অস্তিত্ব রহিয়াছে কিন্তু ঐগুলি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার চেষ্টা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ করেন নাই। ভারত-শাসন আইনের যে ধারা অনুসারে এখন অন্ধ্রকে আলাদা করা হইয়াছে সেই ধারায় অন্যান্য প্রদেশকেও তাঁহারা পৃথক করিতে পারিতেন সে ক্ষমতাও তাঁহাদের হাতে অনেক দিন যাবৎ আসিয়াছে। নূতন রাষ্ট্রবিধিতে প্রদেশ পুনর্গঠন সম্বন্ধে যে কঠোর ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে আসামের বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া নূতন প্রদেশ গঠন, বাংলা-বিহারের পূর্ব্বাঞ্চল পুনঃ-প্রাপ্তির ন্যায় অসম্ভব হইয়া উঠিবে। নূতন প্রদেশ গঠন করিতে হইলে তীব্র আন্দোলনের দ্বারা নূতন রাষ্ট্রবিধি প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব্বে তাহা করিতে হইবে, নতুবা আর উহা হইবে না। গোয়ালপাড়া, গারো পাহাড় এবং খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়কেও পূর্ব্বাচল প্রদেশ হইতে বাদ দেওয়া উচিত নহে।

পূর্ব্বাচল প্রদেশের উদ্যোক্তারা উহাকে কংগ্রেস প্রদেশে পরিণত করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিবার আরও দুইটি কারণ থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, তাঁহারা হয়ত ভাবিতেছেন যে পূর্ব্বাচল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হইতে পৃথক হইলে তাঁহারা নিজ এলাকায় সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনয়ন দেওয়ার স্বাধীনতা লাভ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে যেখানে একটি শাসন-তান্ত্রিক প্রদেশে দুইটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সেখানে নির্ব্বাচনে মনোনয়ন দানের জন্য ইলেকশন-ট্রিবিউনাল গঠিত হইবেই এবং আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভোটের জোর তাঁহাদের চেয়ে বেশী থাকিবেই। মুসলমান ভোটারের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে নিজের দলের হিন্দু আমদানী করিয়া কংগ্রেস কমিটি কবলিত করার যে দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ মহাশয় দেখাইয়া গিয়াছেন, পার্ব্বত্য জাতির নাম করিয়া অসমিয়া আমদানী করিয়া ঠিক সেই ব্যাপার আসাম কংগ্রেসের নেতারা করিবেন না এটা মনে করা মারাত্মক ভুল হইবে। তিন জন সদস্য লইয়া গঠিত ইলেকশন-ট্রিবিউনালে পূর্ব্বাচল একটার বেশী আসন কিছুতেই পাইবে না এবং ফলে মনোনয়ন কোন্ দিক দিয়া প্রবাহিত হইবে তাহাও অনুমান করিয়া লওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা হয়ত ভাবিতে পারেন যে পূর্ব্বাচল কংগ্রেস আলাদা হইলে তাঁহারা আসাম ব্যবস্থা-পরিষদের ঐ এলাকার সদস্যদের আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে পৃথক নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। এটাও মারাত্মক ভুল ধারণা। একই ব্যবস্থা-পরিষদের দুই দল সদস্যকে দুই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দুই প্রকার নির্দ্দেশ দিলে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সভায় তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে, এবং সেখানে ভোটে জিতিবে পূর্ব্বাচল প্রদেশ নয়, আসাম।

গৌহাটির ঘটনার পরও যদি আসামবাসী বাঙালীদের চৈতন্য সম্পাদিত না হয়, এখনও যদি তাঁহারা নিজ নিজ স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দেন এবং দল ও দলীয় 'নমিনেশনের' কথাই বেশী করিয়া ভাবিতে থাকেন তবে তাঁহাদের আরও অনেক লাঞ্ছনা সহিতে হইবে। আন্দোলনটা সবেমাত্র জমিয়া উঠিয়াছে, এখন একটু জোর দিলে সাফল্যলাভ এবং স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চল প্রত্যর্পণের আন্দোলন এবং পূর্ব্বাচল প্রদেশ গঠনের আন্দোলন একই সঙ্গে তীব্র ভাবে চলা উচিত ছিল; বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে এখনও তাহা হইল না।

ভারতরাষ্ট্রের ব্যয়-বাহুল্য

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার বিগত অধিবেশনে শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথের প্রশ্নের উত্তরে ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু আমাদের রাষ্ট্রপালের (গবর্ণর-জেনা-রেলের) বেতন ও তাঁহার উচ্চপদের আনুষঙ্গিক ব্যয়ের বহর সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দান করেন। সেই বিবৃতি পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, রাষ্ট্রপালের বেতন ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ মাসিক ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকার অধিক ব্যয় হয়। গান্ধী-জীর আদর্শ-পূত রাষ্ট্রের পক্ষে এই ব্যয় অপব্যয়, ইহা কতটা যুক্তিসহ তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। তাহা ছাড়া একটা প্রশ্ন তুলিলে চলিবে না। ইংরেজের আমলে আমরা এই বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছি যে আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে ইংরেজের দরাজ-হাতে ব্যয়ের বহর সহ্য করা অসম্ভব; বিদেশী বলিয়াই ইংরেজ এইরূপভাবে আমাদের

শোষণ করিতেছে। এই প্রতিবাদ মনে করিয়া রাখিবার লোকের অভাব এখনও আমাদের দেশে হয় নাই। সেইজন্ত পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে আমতা-আমতা করিয়া রাষ্ট্রপালের ব্যয়ের সপক্ষে অনেক কথাই বলিতে হইয়াছে—রাষ্ট্রপালের পদের একটা মর্য্যাদা আছে; সেই মর্য্যাদা ভারত-রাষ্ট্রের মর্য্যাদা হইতে পৃথক করা যায় না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই যুক্তিতে দেশের লোকের মনে কোন সান্ত্বনা আসে নাই; পণ্ডিত নেহরু সান্ত্বনা পাইয়াছেন, এরূপ মনে করিয়া তাঁহার উপর অবিচার করিতে চাই না।

কিন্তু এইরূপ প্রশ্নোত্তরে এই বিষয়ের মীমাংসা হইবে না। গত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হয় নাই; কেহই এরূপ কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন না, এবং দেশের লোক ভাবিয়া কোন উত্তর পাইতেছে না কেন আমাদের অবস্থার মত দেশে রাষ্ট্রের ব্যয় সম্বন্ধে এরূপভাবে পুরাতন রীতি (ইংরেজের আমলের রীতি) চলিতে দেওয়া হইবে। দিল্লী আমাদের পক্ষে বহুদূর; সেখানে ব্যয়ের বহর কি তৎ-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা করিতে হয় লোকের কথা শুনিয়া। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে কলিকাতা নগরীর লালদীঘির পাড়ে ও আলীপুর এণ্ডারসন হাউসে যে ব্যয়বাহুল্য দেখিতে পাই তাহা আমাদের চিন্তার পক্ষে পীড়াদায়ক। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন বাঙালী সভ্যের বিবৃতি হইতে ও নানা জনের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপ করিয়া নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া যায়। ইংরেজ আমলে সেক্রেটারীয়েটে (বেঙ্গল) ২৭৫০৲ টাকা বেতনের সেক্রেটারীর পদ ছিল মাত্র ছয়টি। অবিভক্ত বাংলার জন্ত ভারত-সচিব এই বেতনের ছয়টির বেশী পদ রাখিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। মুসলিম লীগ গবর্মেণ্ট এই নির্দ্দেশ অমান্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে বিভক্ত পশ্চিম বাংলার ব্যবস্থা এ বিষয়ে কি প্রকার হইয়াছে? বর্ত্তমানে এক-তৃতীয়াংশ বাংলায় ২৭৫০৲ টাকার সেক্রেটারীর পদও দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়া হওয়া উচিত ছিল দুইটি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা দ্বিগুণ বাড়িয়া হইয়াছে বারটি। এতদিন একজন সেক্রেটারী জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং শিক্ষা বিভাগের কাজ করিয়াছেন, এখন কাজ কমিয়াছে, কিন্তু আলাদা তিন জন সেক্রেটারী করা হইয়াছে এবং শেষোক্ত দুই বিভাগের সেক্রেটারীদ্বয় প্রত্যেকে পাইতেছেন ২৭৫০৲ টাকা। এতদিন সমবায় ও পুনর্ব্বসতি বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন একজন, বেতন ২৭৫০৲ টাকা। এবার হইয়াছেন দুই জন—প্রত্যেকের বেতন ২৭৫০৲ টাকা। ফাইনান্স বিভাগে এতদিন সেক্রেটারী ছিলেন একজন, বেতন ২৭৫০৲ টাকা; এবার একজন সেক্রেটারী এবং একজন স্পেশাল অফিসার বসানো হইয়াছে—প্রত্যেকের বেতন ২৭৫০৲ টাকা। সেক্রেটারীর বেতন এক ধাপে ৮০০৲ টাকা হইতে বাড়িয়া ২৭৫০৲ টাকা হইয়াছে। বর্ত্তমান ফাইন্সান্স সেক্রেটারীকে বসানো হইয়াছে আর একজনের দাবি অতিক্রম করিয়া। 'গোলমাল' বন্ধ করিবার জন্ত 'দাবি-অতিক্রান্ত' কর্ম্মচারীর বেতনও ২৭৫০৲ টাকা করা হইয়াছে।

আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের বাঙালী কংগ্রেসী কর্ণধারবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—'এইজন্তই কি ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই ও "নেতাজী" দেশের স্বাধীনতার জন্ত আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন? যদিও এইরূপ প্রশ্ন করিতে আমাদের লজ্জা হয়।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন

ইংরেজ এবং মুসলিম লীগ আমলে সাম্রাজ্যবাদী এবং সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। কমিশনের সুপারিশ নাকচ করিয়া উচ্চপদে লোক নিয়োগ তখনকার গবর্মেণ্টের রেওয়াজ ছিল, কারণ উচ্চতম পদগুলিতে নিজস্ব লোক বসাইতে না পারিলে জাতীয় স্বার্থের স্থলে সাম্রাজ্যবাদী বা দলগত স্বার্থ বজায় রাখা যায় না। কমিশনের সিদ্ধান্ত পদে পদে নাকচ করিলে খারাপ দেখায় বা উহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে সমালোচনার সৃষ্টি হয় বলিয়া কমিশনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্তও একটি পন্থা আবিষ্কৃত হয়। ছয় মাসের কম সময়ের জন্ত লোক নিয়োগ করিলে কমিশনের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না বলিয়া বড় বড় পদে ছয় মাসের নামে লোক নিয়োগ করা হইত; তারপর ক্রমাগত তাহাদের কার্য্যকাল চার মাস ছয় মাস করিয়া বাড়াইতে বাড়াইতে বছর দুয়েক তাহাদিগকে দিয়া কাজ করাইয়া শেষে এমন অবস্থায় উহা কমিশনের নিকট পাঠানো হইত যে ঐ নিয়োগ অনুমোদন ভিন্ন কমিশনের পক্ষে গত্যন্তর থাকিত না। এই চালাকিটা মুসলিম লীগ আমলে খুব বেশী পরিমাণে হইয়াছে। লীগের যে নেতারা এখানে ইহা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা পাকিস্থান গবর্মেণ্টে সমাসীন হওয়ার পর কিন্তু আর এই কাজ করেন না। পাকিস্থান গবর্মেণ্ট উচ্চতম পদে লোক নিয়োগ সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়াকড়ি করিতেছেন। সতর বৎসরের অভিজ্ঞতা না থাকিলে কাহাকেও ডেপুটি সেক্রেটারী করা হয় না এবং ২০ বৎসরের কম অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন লোককে সেক্রেটারী করা হয় না। কোন মন্ত্রী নিজের ইচ্ছামত সেক্রেটারী লইতে পারেন না। সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী প্রভৃতি বাছিয়া দিবার জন্ত একটি বোর্ড আছে। ঐ বোর্ডের সিদ্ধান্ত পাল্টাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। অন্তান্ত উচ্চপদে লোক নিয়োগ সম্পর্কে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

নিজের দেশে পাকিস্থান যাহা করিতেছে, নিজের দেশে আমরা কিন্তু তাহা করিতেছি না; বরং হিন্দুরাজ্যে আত্ম-

প্রতিষ্ঠার জন্য লীগ এখানে যে সব কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছে, সেইগুলিই এখানে এখনও অনুসৃত হইতেছে। বহুসংখ্যক নিয়োগে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে ফাঁকি দেওয়া হইতেছে। এখানে দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সরকারী বাস পরিচালনার জন্য একটি নূতন পদ সৃষ্টি হইল এবং উহার বেতন নির্দ্ধারিত হইল ১২৫০৲ টাকা; ছয় মাস বাদে উহা বাড়িয়া ১৫০০৲ টাকা হইবে। অথচ এই পদ পূরণের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে সুযোগ দেওয়া হইল না, কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল না, লোক নিযুক্ত হইয়া কাজে লাগিয়া গেল। ক্রয়শুল্ক আপিসের একজন এসিষ্টাণ্ট কমিশনার দুর্নীতিদমন বিভাগের তদন্তে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শেষে চাণক্যনীতি অনুসরণ করিয়া আট মাসের ছুটি লইয়া বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থলে আট মাসের জন্য লোক নিযুক্ত হওয়ার কথা এবং নিয়মানুসারে উহার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুমোদন আবশ্যক। কিন্তু কমিশনকে না জানাইয়া সেখানে লোক নিয়োগ করা হইয়া গিয়াছে। ক্রয়শুল্ক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কেন এরূপ করিলেন তাহার কারণ আছে। ঐস্থানে মাসখানেক পূর্ব্বে আর একটি এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের পদ খালি হয়। ইঁহারা যাঁহাকে সুপারিশ করিয়াছিলেন কমিশন তাঁহাকে অযোগ্য বিচার করিয়া তাঁহার চেয়ে জুনিয়র এক জনকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। মাত্র এক মাস পূর্ব্বে কমিশন যাঁহাকে বাতিল করিয়াছেন তাঁহার নাম আবার ঐ এসিষ্টাণ্ট কমিশনার পদেরই জন্য পাঠানো নিরাপদ নহে মনে করিয়াই হয়ত এবার তাঁহাকে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা হইয়াছে। আমাদের মতে ক্রয়শুল্ক বিভাগীয় কর্ত্তাদের এই কাজ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মর্য্যাদার হানিকর হইয়াছে এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত। কমিশনের সদস্যেরা এখনও যদি কমিশনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অপারগ হন, এবং তাঁহাদের যদি এখনও এইভাবে অবজ্ঞাত হইতে হয় তবে আমরা বলিব যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন তুলিয়া দিয়া জনসাধারণকে একটা বড় খরচ হইতে অব্যাহতি দেওয়াই ভাল।

দুষ্প্রাপ্য বস্ত্র

বস্ত্র এখনও জনসাধারণের নিকট যথাপূর্ব্ব দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য রহিয়া গেল। এদিকে পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। বস্ত্রপ্রাপ্তির আশ্বাস লোকে অসংখ্য বিবৃতি মারফত পাইয়াছে এবং পাইতেছে, কিন্তু আসল বস্তুর দেখা এখনও মিলে নাই।

কাপড় লইয়া ভারত-সরকার কিছুতেই যেন মনস্থির করিতে পারিতেছেন না। ভারতীয় পার্লামেণ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সরকার কর্ত্তৃক আটক বস্ত্র ও বস্ত্রের ভবিষ্যৎ মূল্য সম্পর্কে সরকারী কার্য্যক্রম বিবৃত করেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে গত ৩০শে জুলাই সমস্ত মিলের গুদামজাত কাপড় সরকার আটক করিয়াছেন এবং মিল কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহাদের গুদামজাত বস্ত্র সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সরকারকে সরবরাহ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মিল কর্ত্তৃপক্ষ যে তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যাইতেছে প্রায় ৪,১৭,৩০০ গাঁইট কাপড় আটক করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার কেবল মিলের কাপড় আটকাইয়াছেন, ব্যবসায়ীদের কাপড়ে তাঁহারা হাত দেন নাই, উহা আটক করিবার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারসমূহের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই কাপড়ের পরিমাণ কত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ তাহা বলিতে পারেন নাই, কারণ প্রাদেশিক সরকারেরা উহা ভারত-সরকারকে এখনও জানান নাই। ভারত-সরকার কর্ত্তৃক আটক গাঁইটগুলির মধ্যে ১,৫৭,০০০ গাঁইট বিলি করিবার জন্য ইতিমধ্যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়া গিয়াছে।

কাপড়ের দাম সম্বন্ধে ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে টেরিফ বোর্ডের সুপারিশের যথোপযুক্ত মর্য্যাদা রাখিয়া সাময়িক ভাবে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। আমাদের মতে মূল্য নির্দ্ধারণের ভার টেরিফ বোর্ডের উপরেই সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিলে ভাল হইত। তাহাতে ব্যবসায়ী বা জনসাধারণ কাহারও বলিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু এই দায়িত্ব শেষ পর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মচারী এবং মিল মালিকদের উপর অর্পিত হওয়ায় দাম চড়া করিয়া ধরা হইয়াছে এবং জনসাধারণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। চিনি, কয়লা প্রভৃতির মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে গবর্ন্মেণ্ট যে ভাবে ব্যবসায়ীদের অন্যায় আবদার এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত সমর্থনকে প্রাধান্য দিয়া চলিয়াছেন, কাপড়ের বেলাতেও তাহাই ঘটিতেছে বলিয়া লোকে সন্দেহ করিতেছে।

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের মতে কাপড় চালান সম্পর্কে আন্তঃপ্রাদেশিক বাধানিষেধই বস্ত্রসঙ্কটের জন্য দায়ী নহে। এরূপ নিষেধ না থাকিলে সীমান্ত পার হইয়া কাপড়ের চোরাকারবার বাড়িয়া উঠিবে। শিল্পসচিব যাহাই বলুন, এই বাধানিষেধ বিশেষ নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ দেখাই গিয়াছে যে কাপড় চালান সম্বন্ধে প্রচুর কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও পূর্ব্বপঞ্জাব, বোম্বাই এবং পশ্চিমবঙ্গ হইয়া বহু কাপড় পাকিস্থানে গিয়াছে; শুধু তাহাই নয়, পাকিস্থান হইয়া চীন হইতে আরব পর্য্যন্ত সমগ্র এশিয়ায় ভারতীয় কাপড় চোরাই চালান গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্ত্তী কয়েকটি জেলায় কাপড় চালান সম্বন্ধে কঠোরতা অবলম্বনের পর পাকিস্থানী চালান কতক কমিয়াছে, কিন্তু বন্ধ হইয়াছে ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। কাপড় চালান কাহারা দেয় গবর্ন্মেণ্ট তাহা জানেন না, বা গোয়েন্দা লাগাইয়া এক সপ্তাহের মধ্যে জানিতে পারেন না ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। আসামে কাপড় পাঠাইবার নাম করিয়া মস্তবড় ব্যবসায়ী পাকিস্থানে চোর

কারবার চালাইয়াছে, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও এখানকার ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট পুলিস উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা মাত্র করেন নাই। পাকিস্থানে কাপড়ের ব্যাপক চোরাকারবার চালাইতে গেলে যে অর্থ, বস্ত্র-ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা এবং সংগঠন থাকা আবশ্যক, কলিকাতায় বেশী লোকের তাহা নাই। ইহাদের খাতাপত্র এবং কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করিলে কাপড়ের চোরাকারবারের মূলশুদ্ধ ধরিয়া টান পড়িবে এবং এরূপ লোকের সংখ্যা মোটেই বেশী নহে।

ভারত-সরকারের নূতন বস্ত্রনীতি কার্য্যকরী করিবার জন্য ডাঃ মুখোপাধ্যায় একটি নূতন বিল পার্লামেন্টে পাস করাইয়া লইয়াছেন। উহাতে অপরাধীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিলটির একটি ধারায় বলা হইয়াছিল যে কোন ব্যক্তি চোরাকারবারী প্রমাণিত হইলে আদালত তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন। দক্ষিণ-ভারতের দুই জন সদস্যের প্রস্তাব ক্রমে এই ধারা বদলাইয়া এরূপ করা হইয়াছে যে, অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী আদালত সমগ্র সম্পত্তি অথবা উহার অংশ বিশেষ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষের দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী এবং সরকারী কর্ম্মচারী উভয়েই বুঝিয়া লইয়াছে যে তাহাদের প্রতি অনুকম্পাশীল লোকের অভাব নাই। আজকাল নিম্ন আদালতে দণ্ডিত হইলেও হাইকোর্টে উহারা খালাস পাইয়া যাইতেছে। চোরাকারবারীর মামলার বিচার সমগ্র ভাবে না হইয়া উহাদের সপক্ষে আইনের ফাঁক বাহির করিয়া সেই রন্ধ্রপথে উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে দুর্নীতি কখনও বন্ধ হইতে পারে না। সন্দেহের সুযোগে ইহাদিগকে মুক্তিদান তো আরও মারাত্মক। ইহাদের টাকার জোর, সমাজে প্রতিষ্ঠা অসাধারণ; মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে ইহাদের হৃদ্যতা যথেষ্ট। পার্লামেন্টে এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহে ইহাদের প্রভাবশালী প্রতিনিধিবৃন্দ রহিয়াছেন। অপরাধ অনুষ্ঠানের সময় ইহারা উচ্চতম ডিগ্রীপ্রাপ্ত অডিটার এবং একাউন্টান্ট, পুলিস প্রভৃতির সাহায্য পায়। ধরা পড়িবার পর আদালতের সর্ব্বোচ্চ উকীল-ব্যারিষ্টারেরা ইহাদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং অনেক জজ সাহেব ইহাদের প্রতি যে অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতেও অনেক সমাজদ্রোহী অকারণে নিস্তার পাইয়াছে মনে হয়। ইহাতে চোরের সাহস বাড়িয়াছে এবং জনসাধারণ হতাশ হইয়া পড়িতেছে।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে সর্দার প্যাটেল দুর্নীতিদমন আইন পাস করিয়া দিয়াছিলেন। সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি নিবারণের জন্য উহা পাস করা হয়। অসৎ সরকারী কর্ম্মচারীরাই দেশের সর্ব্ববিধ দুর্নীতি এবং চোরাকারবারের স্তম্ভ; ইহারা সায়েস্তা হইলে চোরাকারবার বন্ধ হইতে কিছুমাত্র দেরী লাগিবে না। কিন্তু দুর্নীতি দমন আইন বস্তাবন্দী হইয়াই রহিল। বাংলাদেশে বহু আন্দোলনের ফলে চোরাকারবার বিল যদি বা ব্যবস্থা-পরিষদে পাস হইল তো ভারত-সরকার উহা আটকাইয়া রাখিলেন। আন্দোলন বন্ধ না হওয়ায় উহা অর্ডিনান্সরূপে জারী হইল কিন্তু ঐ অর্ডিনান্স অনুসারে একটি মামলাও দায়ের হইল না; চোরাকারবার দমন তো বহু দূরের কথা। রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় যে সকল সেক্রেটারী কঠোর হস্তে দমননীতি প্রয়োগ করিয়া এবং নির্ব্বিচারে গ্রেপ্তার চালাইয়া অসংখ্য নিরপরাধ পরিবারকে পথের ভিখারী করিয়াছিল, আজ সেই সিভিলিয়ানেরাই চোরাকারবার এবং দুর্নীতিদমন আইন কঠোর হস্তে প্রয়োগের বিরোধী এই কারণে যে তাহাতে বুঝি বা কাহারও প্রতি অবিচার ঘটে। উপযুক্ত সন্দেহে দণ্ডদান চোরাকারবার এবং দুর্নীতি দমনের মূল সূত্র হইলে তবেই এই পাপ বন্ধ হইতে পারে। সন্দেহের সুযোগ, আইনের ফাঁকফোকর প্রভৃতি ইহাদের সপক্ষে গেলে কোন দিনই দুর্নীতি দূর হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগ

এই বৎসরের পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে শিক্ষা বিভাগের প্রতি খুব সুবিচার করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মোট ৩১'৮ কোটি টাকা রাজস্বের মধ্যে শিক্ষা-খাতে মাত্র ২'১ কোটি টাকা —অর্থাৎ মোট ব্যয়ের শতকরা ৬'৭ অংশ মাত্র বরাদ্দ করা হইয়াছে। এমন কি উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যে ৮৪ লক্ষ টাকা সাহায্য করা হয় তাহা পর্য্যন্ত এই ২'১ কোটি টাকার মধ্যে ধরা হইয়াছে। ফলে এই প্রদেশের শিক্ষা-বিষয়ক খরচের পরিমাণ একেবারে নিম্নতম স্তরে নামিয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে এ কথা স্মরণ করা উচিত যে দশ বৎসর আগে মুসলিম লীগের আমলেও মোট রাজস্বের শতকরা দশ ভাগেরও অধিক শিক্ষা বিভাগের জন্য ব্যয়িত হইত, অবশ্য দুর্ভিক্ষের সময় ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল। শিক্ষার জন্য বোম্বাই প্রদেশ তাহার রাজস্বের প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ, মধ্যপ্রদেশ শতকরা ১৫ ভাগের অধিক, মাদ্রাজ শত করা ১৪ ভাগের অধিক, এবং যুক্তপ্রদেশ শতকরা ১০ ভাগে অধিক খরচ করে। এই সকল প্রদেশের রাজস্বভাণ্ডারে যুদ্ধের বৎসরগুলিতে প্রচুর বাড়তি টাকা জমা হইয়াছে যাহা এখন জাতিগঠনমূলক কার্য্যে ব্যয়িত হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু এই দুর্ভাগা প্রদেশের নিজস্ব তেমন কোন বাড়তি টাকা নাই। উপরন্তু আয়কর রাজস্বের দিক দিয়াও ইহার খুব সুবিধা হয় নাই। আশা করা যায় যে প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে ইহার রাজস্বের অন্ততঃ শতকরা দশ ভাগ শিক্ষা সম্প্রসারণকল্পে ব্যয় করিবার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করিবেন।

আমরা জানিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম, কেন্দ্রীয় সরকার ইহাই স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান বৎসরে পশ্চিমবঙ্গকে স্বীয় রাজস্ব

হইতেই উন্নয়ন পরিকল্পনার ৮৪ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা আশা করি যে বর্ত্তমান রাজস্ব মন্ত্রী যিনি এক সময় কেন্দ্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কৃষি মন্ত্রী ছিলেন—বিষয়টি সম্বন্ধে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিবেন এবং বর্ত্তমান বৎসরে শিক্ষা উন্নয়নকল্পে যে ৮৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে তাহা আর ছাঁটাই করিবেন না। পশ্চিম বঙ্গকে স্বীয় রাজস্বাদি হইতে উপরোক্ত অর্থের ব্যবস্থা করিবার জন্ত চাপ দিয়া যদি কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে তাহা অর্থনৈতিক বিষয়ে দূরদৃষ্টির পরিচায়ক হইবে না। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজন দীর্ঘকাল যাবৎ অনুভূত হইতেছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে শিক্ষা এবং রাজস্ব মন্ত্রীরা এ বিষয়ে প্রগতিশীল মনোভাব অবলম্বন করিবেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির উন্নয়নকল্পে মাধ্যমিক শিক্ষাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্ত যে চেষ্টা সুরু হইয়াছে আমরা উহাকে অভিনন্দিত করি এবং বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি যে মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিবার জন্ত যে সাহায্যমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহার প্রতিও আমাদের আন্তরিক সমর্থন জানাই। ইহা বলাই বরং অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইবে যে, বর্ত্তমান পদ্ধতি আদৌ কোন মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং এ পর্য্যন্ত অনেকটা খামখেয়ালী ভাবে অর্থ-সাহায্যাদিও বিতরণ করা হইয়াছে। প্রায় ৭৫০টি স্কুলের মধ্যে মাত্র ৩১৫টি স্কুল এখন সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে। মনে হয় যে এই ব্যবস্থায় কয়েকটি সচ্ছল অবস্থার বিদ্যালয়েরই উপকার হইতেছে এবং পল্লী অঞ্চলের যে সকল বিদ্যালয়ের সাহায্য পাইবার দাবী অধিক সেগুলি উপেক্ষিত হইতেছে। নূতন স্কীম অনুসারে গবর্ণ্মেণ্ট প্রাথমিক অবস্থায় অতিরিক্ত তের লক্ষ টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত আছেন, গবর্ণ্মেণ্টের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেকটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে (aided school) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপযুক্ত ব্যবস্থার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে :

১। যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের যথোচিত তত্ত্বাবধান ;

২। বেতনের ন্যূনতম হার নির্দ্ধারণ এবং শিক্ষকদের জন্ত Provident Fund বা সঞ্চয়-ভাণ্ডারের ব্যবস্থা করা।

৩। ছাত্র এবং শিক্ষকদের সংখ্যানুযায়ী একটা যুক্তিসঙ্গত অনুপাত নির্দ্ধারণ। মোট সংখ্যার অনুপাত হইবে ১ : ২০।

৪। বর্ত্তমান বেতনের হার কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করিতে হইবে কিন্তু দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের উপযুক্ত কনসেশনের ব্যবস্থা থাকিবে।

৫। স্কুলের মর্য্যাদা অনুযায়ী অবস্থান স্থল, বাড়ী, খেলার মাঠ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদির মান নির্দ্ধারণ।

৬। যোগ্য পরিচালন-ব্যবস্থা।

এই প্রদেশের ইতিহাসে এই প্রথম প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকদের গ্রেডযুক্ত বেতনের হার বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আশার কথা যে, বিলম্বে হইলেও ক্লাসগুলির আয়তন এবং শিক্ষকদের গুণপনা ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়বাহুল্যের কথা বিচার করিয়া দেখিলে অবশ্য নির্দ্ধারিত বেতনের হার যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা উচিত যে যদি কোন বিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গ অধিকতর উচ্চহারে বেতন দিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে সরকার তাঁহাদের আংশিক ব্যয়ভার বহন করিবেন। এই স্কীম কতকগুলি সুদৃঢ় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা সমর্থনযোগ্য।

পশ্চিম বাংলার লোক-সংগঠন

ভারত বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সমস্তাসমূহের মীমাংসার পথ প্রায় দুরতিক্রম্য হইয়া উঠিয়াছে। সংযুক্ত বাংলার খাওয়া-পরার জন্ত অন্ত প্রদেশ বা দেশের উপর নির্ভর করিতে হইত। বঙ্গ বিভাগের ফলে সেই পর-নির্ভরতা বাড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে এই কথা বলা যায়, যে শক্তির বলে মানুষ, সমষ্টিবদ্ধ মানুষ, বাঁচিয়া থাকে, সেই শক্তির অভাব আমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে। কলিকাতা নগরীর ঐশ্বর্য্য আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি দিতেছে না। এবং আমাদের রাষ্ট্র-নেতা ও সমাজ-নেতৃগণের এই সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা আছে কিনা সেই বিষয়ে আমাদের মনে নানা সন্দেহের উদয় হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার পরিষদে একটি আইন পাস হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের ভূমির উন্নতির জন্ত। প্রদেশ-পালের নামে আদেশ গিয়াছে প্রতি জেলার কর্তৃপক্ষের নিকট খালি জমির খোঁজ করিবার জন্ত। এই জমির উপর নূতন শহর গড়িয়া তোলা হইবে যাহা হইবে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ এই পরিকল্পিত শহরের অধিবাসীরা এই নগরমণ্ডলীর উৎপাদিত সম্পদ হইতে নিজেদের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। এতদর্থে নদীয়া কৃষ্ণনগর শহরের নিকট, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ঢাকুরিয়া অঞ্চল ও যাদবপুরের পথে যোধপুর ক্লাবের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ও মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরের রেল-লাইন ও সেনা-নিবাসের নিকটবর্ত্তী ৬০০ বিঘা খাস মহল জমির উপর শহর গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা তৈয়ার হইতেছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকেও এই কার্য্যে সহযোগিতা করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

এই বিষয়ে গোড়াতেই একটা প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রয়োজন কি—কৃষির বিস্তার না শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা? কোন্‌টা অনতিবিলম্বে প্রয়োজন তাহা স্থির না হইলে এই প্রদেশে লোক-সংগঠনের চেষ্টা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা আছে। খাদ্য ও সম্পদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের নদী-নালা সংস্কৃত করিয়া দেশে কৃষির বিস্তারের উপর সমস্ত উন্নতির চেষ্টা নির্ভর করিতেছে, এই বিষয়ে কি কোন তর্কের অবসর আছে? পশ্চিম বাংলায় শিল্পপ্রতিষ্ঠার অবসর কতটা আছে; এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়াও প্রয়োজন। শিল্পের জন্য প্রয়োজন মূলধনের, কাঁচা মালের, শ্রমিকের। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর মূলধন কি পরিমাণ খাটিতেছে, বিশেষজ্ঞগণ তাহা বলিতে পারেন। এখানে বঙ্গের এমন বিশেষ কি কাঁচা মাল আছে, যাহা খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নহে। পশ্চিমবঙ্গে যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান চলিতেছে, তাহার অধিকাংশ শ্রমিক ত অ-বাঙালী। পরিকল্পিত শহরসমূহ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত লোকের আশ্রয়স্থল হইতে পারে। এই আগত ১৫।২০ লক্ষ লোকের মধ্যে বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহারা কি শারীরিক পরিশ্রম করিয়া শিল্পের সেবা করিতে পারিবেন? এবং এই জন-সমষ্টিকে গ্রামের আবহাওয়ার মধ্যে না বসাইতে পারিলে সমাজ-জীবনে এমন একটা বিপর্য্যয় দেখা দিবে যে রাষ্ট্রের পক্ষে তার তাল সামলাইবার চেষ্টা কঠিন হইবে। বর্ত্তমান যুগে রাষ্ট্রকে সর্ব্বকার্য্যে অগ্রণী হইতে হইবে, সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার নিয়ামক হইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ অবস্থায় এই দায় বিশেষভাবে অপরিহার্য্য। সুতরাং বড় বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পশ্চিম বাংলার শাসক সম্প্রদায়কে স্থির করিতে হইবে কোন্ কাজে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে হাত দিবেন—কৃষি-বিস্তারে না শিল্প-প্রতিষ্ঠায়? এই দুইটার মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ স্থির করিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

কৃষি-বিভাগের প্রচার পত্রিকা

কৃষিবিদ্ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র "খাদ্য-উৎপাদন"—এই নামে একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন। কৃষক-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে নানা সমস্যার আলোচনা এই কাগজে হয় বলিয়া ইহার একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। গত ১৬ই ভাদ্র তারিখের "খাদ্য-উৎপাদনে" সরকারী কৃষি-বিভাগের যে কৃতিত্বের নমুনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হাসির খোরাক যোগাইবে বলিয়া আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

> সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-বিভাগের একখানি সচিত্র প্রচার পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পত্রিকাখানির নাম "অধিক খাদ্য উৎপাদন আন্দোলন—১৯৪৮-১৯৪৯।" আমরা আর্ট জানি না, বুঝি না; সুতরাং চিত্রগুলি সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। ভাষা সম্বন্ধেও নীরব রহিলাম। কিন্তু দুই-একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। 'কাওপীর' বাংলা করা হইয়াছে—এক প্রকার কড়াই শুঁটি; কৃষকগণ "এক প্রকার কড়াই শুঁটি" কথার দ্বারা কি বুঝিবেন জানি না; "কাওপীর"-এর বাংলা প্রতিশব্দ আমরা জানি বলিয়াই ইহা বুঝিতে পারিলাম। খুবই দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয় যে কৃষি বিভাগের পরিচালকগণ জানেন না, "কাওপীর"-এর বাংলা হইতেছে বরবটি। দ্বিতীয় ইংরেজী কথাটি দেওয়া হইয়াছে "সান হেম্প"; ইহার কোন বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া হয় নাই; খুব সম্ভব ইহা যে কি রকম বস্তু তাহা প্রবন্ধের রচয়িতা মহাশয় জানেন না; জানিলে হয় ত লিখিতেন "এক রকম—"। তাঁহাকে জানাইতেছি যে সান হেম্পের বাংলা হচ্ছে—শণ পাট। তৃতীয় কথাটি হচ্ছে হাড়ের গুঁড়া একটি কৃত্রিম সার। এইরূপ পত্রিকা মুদ্রিত ও বিতরিত করিয়া কোন ফলই হয় না; কেবল অর্থ নষ্ট হয়।

জাহাজ নির্ম্মাণ ও নৌ-বাহিনী

শুনিতেছি পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট কলিকাতা নগরীর নিকটে জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানা ও ডক নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা কি উত্তর পাইয়াছেন জানি না। গত ৯ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট) তারিখে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে যে প্রশ্নোত্তরের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া মনে হয় যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট জাহাজ নির্ম্মাণ কার্য্যটা নিজের হাতে রাখিতে চান। ঐ তারিখে বাণিজ্য-মন্ত্রী শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী জাহাজ নির্ম্মাণ ও জাহাজী ব্যবসায় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নীতির বর্ণনা করেন। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং, ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং ও ভারত লাইনস্ লিমিটেড এই তিনটি কোম্পানীর হাতে ভারতরাষ্ট্রের জাহাজী ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এই সকল কোম্পানী রাষ্ট্রের সাহায্য পাইবে; রাষ্ট্র হইতে মূল ধন জোগান হইবে কিনা, তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট অভিমত পাওয়া যায় নাই। বে-সরকারী এই সব কোম্পানীর কর্ম্ম-কর্ত্তারা জাহাজ নির্ম্মাণ করিবেন না। ভারতের উপকূলে ও অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের জাহাজের স্থান প্রসার করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

এই সম্পর্কে একটা প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জাহাজ-নির্ম্মাণ ও জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতির উপর নৌ-বাহিনীর উন্নতি নির্ভর করে। জাহাজী ব্যবসায়ে নিযুক্ত খালাসীরাই নৌ-বাহিনীর গোড়া-পত্তন করে। এই নৌ-বাহিনীর নির্ম্মাণ সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। এখন পর্য্যন্ত আমরা ইংরেজের অভিজ্ঞতার হাত ধরা হইয়া আছি। ইংরেজ আমলে জাহাজী ব্যবসায়ে ও নৌ-বাহিনীতে যে খালাসী নিযুক্ত হইত

শ্রেণীর ভাগই সেই অঞ্চলের মুসলমান যাহা বর্তমানে 'পাকিস্থান' রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। এক ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও শ্রীহট্ট হইতেই প্রায় ৬০।৭০ হাজার খালাসী রংরুট করা হইত। কলিকাতার বন্দর হইতে যে সব জাহাজ সমুদ্র-পথে দেশ-বিদেশে গমন করে তাহাদের খালাসী এখন পর্য্যন্ত এই চারিটি জেলা হইতে আসে। এই অবস্থায় কলিকাতায় জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা ও ডক নির্ম্মাণ করিলেই বাঙালীর বুদ্ধি ও শ্রমের সার্থকতা হইবে না। এই জাহাজ চালাইবার জন্য খালাসী চাই। এই খালাসী আসিবে কোথা হইতে?

সমুদ্রগমন সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের একটা সংস্কার বা কুসংস্কার খালাসী রংরুট বিষয়ে হিন্দুর পক্ষে একটা বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ব্ববঙ্গের যে শ্রেণীর মুসলমান খালাসী হইবার জন্য কলিকাতা নগরীর খিদিরপুর অঞ্চলে ভীড় জমাইয়া থাকে, তাহাদের সম-শ্রেণীর হিন্দুরা এই বৃত্তির দিকে ছুটিয়া আসিবে, এরূপ ধারণা আমাদের নাই। তাহার কারণ হিন্দু সমাজের সামাজিক রীতি একরূপ; ঘর-মুখো প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অন্যরূপ। কারণ যাহাই হউক, যে অভাবের তাড়নায় পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান জাহাজী ব্যবসায়ের কল্যাণে 'মানুষ' হইয়া উঠিতেছে, সেরূপ অভাবের মধ্যে না পড়িলে বাঙালী হিন্দু "চাঁদ সদাগরে"র অনুকরণে সপ্তডিঙ্গার স্মৃতি ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্রনায়কগণ এই বিষয়ে একটু চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। বাঙালী, কাওরা, জেলে, দুলে, নমশূদ্র ইত্যাদি নানা শ্রেণীর মধ্যে জলের ভয় কম। তাহাদের মধ্যে ঠিক মত প্রচার করিলে তাহারাও লস্কর খালাসী হইয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করার পথ পায় এবং ভারত-সরকারের নৌসেনার রংরুটের একটা নূতন ক্ষেত্র খুলিয়া যায়।

ভাষা ও লিপির যুদ্ধ

শ্রাবণ মাসের "বাংলার শিক্ষক" মাসিক পত্রিকার প্রথম প্রবন্ধে কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন: "যদি বাঙালী-বিদ্বেষ বশতঃ কোন ভারতীয় ছাত্র বাংলা পড়িবে না মনস্থ করে অথবা কোন প্রদেশ যদি বাংলা ভাষাকে বিদূরিত করে তবে বাংলা ভাষার কোন ক্ষতি হইবে না; স্বদেশের সাহিত্য-শিক্ষার্থীরই ক্ষতি হইবে।" এই সম্পর্কে তিনি অহম্ ভাষাভাষী লোকসমষ্টির একাংশের উৎকট মনোভাবের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন: "আসামে অসংখ্য বাঙালী বাস করেন...কিন্তু স্বাধীনভাবে নিজেদের মাতৃভাষা অনুশীলন করিতে পারিবেন না, নিজের ভাষা প্রকাশ্য স্থলে ব্যবহার করিতে পারিবেন না অথবা মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন না—এ ব্যবস্থা হইলে ভারতে মানুষের চরম পরাধীনতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।" কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে আমাদের দেশের চিন্তানায়কগণও এইরূপ উৎকট মনোভাব পোষণ করিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে মহা-পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয়ের একটি বিবৃতির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। এলাহাবাদের দৈনিক "লিডার" পত্রিকায় ২৯শে আগষ্ট তারিখে চার কলমব্যাপী এই বিবৃতিটি প্রকাশিত হইয়াছে।

গত জুলাই মাসে গান্ধীজীর কথা প্রতিধ্বনিত করিয়া ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু মান্দ্রাজে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। রাষ্ট্রের ভাষা ও লিপি সম্বন্ধে তিনি "হিন্দুস্থানী" ভাষার সমর্থন করেন; তাহা লিখিত হইবে দুই লিপিতে—দেবনাগরী ও উর্দ্দুতে। মহা-পণ্ডিতের বিবৃতি তারই প্রতিবাদ। যে ভাষায় তিনি তাহা করিয়াছেন, তাহা যুদ্ধ-ঘোষণার সমান। পণ্ডিত জবাহরলালের কলরব (uproar) হিন্দীকে তার আসন হইতে টলাইতে পারিবে না; এমন পরাক্রমশালী কেহ কি আছেন যিনি সব প্রদেশে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—হিমাচল প্রদেশ, যুক্ত-প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মালব্য-রাজস্থান ও মৎস্যপ্রদেশ—সেই উচ্চপদ হইতে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিবেন?" এইরূপ চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। "মহান ব্যক্তিগণ" এই চেষ্টা যে করেন নাই তাহা নয়। কিন্তু সংখ্যা-গরিষ্ঠের দুর্ব্বার মত গোবিন্দ-বল্লভ পন্থের মন্ত্রীসভাকে বাধ্য করিয়াছে হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে অবলম্বন করিতে।

রাহুলজী পণ্ডিত জবাহরলালকে বিদ্রূপ করিয়াছেন যে তিনি গ্রন্থকার হইয়াও "জনতার ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই" এবং উর্দ্দু লিপিতে ও দেবনাগরীতে লিখিত হিন্দুস্থানী ভাষার সমর্থনের পশ্চাতে একটা কূটবুদ্ধি লুক্কায়িত আছে। ইংরেজী ভাষার প্রাধান্যকে বজায় রাখিবার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে। আর একটা প্রভাব কাজ করিতেছে। যুক্তপ্রদেশের কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের (noble class families) হিন্দী সম্বন্ধে যে অবহেলার ভাব ছিল তাহা আজও বিদ্যমান আছে; সেই পবিত্র আবহাওয়ার (holy atmosphere) মধ্যে যাঁহারা বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন তাঁহারাই আজ হিন্দীর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না।

হিন্দী বনাম উর্দ্দুর মোকদ্দমায় যে মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে তার পরিণতি দেখিতেছি মনান্তরে গড়াইয়া যাইবে। রাহুল-জীর মত পণ্ডিত লোক যে ভাষায় হিন্দুস্থানীর সমর্থকদের আক্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার চেলা-চামুণ্ডারা কি করিতেছেন তাহার পরিচয় পাই বিহারের বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চলে। অসংখ্য সমস্যাসঙ্কুল ভারতরাষ্ট্রে ভাষা ও লিপি লইয়া একটা রীতিমত যুদ্ধ চলিবে দেখিতেছি। রাষ্ট্রের পরিচালক যাঁহারা তাঁহারা ইহা আটকাইতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদ

ভারতরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদের আদালতে দুইটি নালিশে ফরিয়াদিরূপে উপস্থিত হইয়াছে; একটিতে আসামীরূপে। দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নালিশ পুরাতন হইলেও নূতন করিয়া আবার ইহা আনা হইয়াছে, কারণ পুরাতন অত্যাচার এখনও চলিতেছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার গবর্ন্মেন্টের প্রতিনিধি দাবী করে যে এই নালিশ খারিজ করিয়া দেওয়া হউক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদ এই দাবী গ্রহণ করে নাই; নালিশটাকে নথিভুক্ত রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়াছে। যে বর্ণবিদ্বেষে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দোষী, সেই দোষে অভিযুক্ত হইয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ গবর্ন্মেন্টকে কেন কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইবে, এবং হইলে যুক্তরাষ্ট্র কেন তাহার পক্ষ হইয়া দুইটি কথা বলিবে না, এই বিষয়ে একটা রহস্য থাকিয়া যাইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত দক্ষিণ-আফ্রিকা মোকদ্দমায় হারিয়া যাইবে কিনা, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কোন কথা বলা কঠিন। তাহারা ত শাসাইয়া রাখিয়াছে যে তাহাদের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলাইলে তাহারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

ভারতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় নালিশ পাকিস্থানের বিরুদ্ধে। এই দুই রাষ্ট্র উভয়েই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদের সভ্য। এই প্রতিষ্ঠানের আইন অনুসারে কোন সভ্য অন্য সভ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে পারে না। এই আইনের আশ্রয়ে ভারতরাষ্ট্র পাকিস্থানের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করিয়াছে যে, ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীর রাজ্যের বিরুদ্ধে পাকিস্থান রাষ্ট্র তাহার সৈন্যবাহিনী ও গুণ্ডাবাহিনীকে লেলাইয়া দিয়াছে, তাহারা কাশ্মীর রাজ্যের প্রজার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে, ঘরবাড়ী পুড়াইয়া দিয়াছে এবং স্ত্রীলোকের উপর পশুসুলভ অত্যাচার করিয়াছে। গত জানুয়ারি মাসে এই নালিশ দায়ের করা হইয়াছিল; প্রায় পাঁচ মাস তাহার শুনানী চলে। এই সম্বন্ধে "পাকিস্থানের" পররাষ্ট্র-মন্ত্রী জনাব জাফর-উল্লা খাঁ অনেক কূটতর্ক করেন; অনেক মিথ্যা কথা বলেন; কাশ্মীরে "পাকিস্থান" সৈন্যের উপস্থিতি ত্রেফ্ অস্বীকার করেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদের এই কথাটা বুঝা উচিত ছিল যে "পাকিস্থান" রাষ্ট্রের এলাকা অতিক্রম না করিয়া পশ্চিম সীমান্তের গুণ্ডাবাহিনী কোন প্রকারে কাশ্মীর আক্রমণ করিতে পারে না; তাহাদের অগ্রসর হইতে দেওয়াই কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণে সাহায্য করার সামিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদ এই কথা জানিয়া এবং বুঝিয়াও বোকা সাজিয়াছে এবং জ্ঞান-পাপীর মত আচরণ করিয়াছে। এই বিষয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের দায়িত্ব ও দোষই বেশী। কেন তাহারা ন্যায়ের পথে চলিতে পারিল না; কোন্ স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় তাহারা "পাকিস্থানে"র অন্যায়কে প্রশ্রয় দিল এবং কাশ্মীর-রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের যন্ত্রণা বিলম্বিত করিল, তাহা আমরা জানি না।

সে যাহাই হউক, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সহায়তায় "পাকিস্থানের" মুখ রক্ষা হইল; সরেজমিনে তদন্ত করিয়া কে দোষী কে নির্দ্দোষী তাহা স্থির করিবার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। ভারতরাষ্ট্র মোকদ্দমায় হারিয়া গেল; "পাকিস্থানীরা" এইরূপে প্রশ্রয় পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে অন্যায় করিয়া চলিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদ কর্ত্তৃক প্রেরিত কমিশন করাচী দিল্লী শ্রীনগরে মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিল; তাঁহাদের বক্তব্য শুনিল; "পাকিস্থানী" সৈন্যবাহিনী ও গুণ্ডাবাহিনী কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত অঞ্চলে ঘোরাফেরা করিল; অত্যাচরিত লোকের মুখে তাহাদের দুঃখের কথা শুনিল। দেখিয়া-শুনিয়া, "পাকিস্থান" রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের মুখে তাহাদের সৈন্যবাহিনীর কাশ্মীর আক্রমণে সহায়তার স্বীকৃতি শুনিয়া এবং স্বচক্ষে তাহার প্রমাণ দেখিয়াও "পাকিস্থানের" বিরুদ্ধে কোন শাস্তির প্রস্তাব করিতে পারিল না। তৎপরিবর্ত্তে দুই পক্ষের আক্রমণকারী ও আক্রান্তের নিকট যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ জানাইল। ভারতরাষ্ট্র তাহা স্বীকার করিল; আক্রমণকারী "পাকিস্থান" নানা কূট-তর্ক তুলিয়া তাহা অস্বীকার করিয়া বসিয়া আছে। তাহাতে তাহার কোন লজ্জা নাই; শাস্তির ভয়ও নাই। কারণ তাহার পশ্চাতে আছে ব্রিটেনের গোপন উৎসাহ এবং এই উৎসাহে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধন প্রদান। কমিশন ফিরিয়া গিয়াছে পূর্ব্বতন রাষ্ট্রসঙ্ঘের শ্মশানে, জেনেভা নগরীতে বসিয়া রিপোর্ট লিখিতেছে। এবং আরও কিছু ক্ষমতালাভ করিয়া কাশ্মীরে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া শোনা যায়।

ভারত সংক্রান্ত তৃতীয় নালিশে ভারতরাষ্ট্রকে আসামীরূপে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। ফরিয়াদি নিজাম বাহাদুর। পাঁচ দিন ভারতরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করাইয়া তাঁহার যুদ্ধের স্বাদ মিটিয়াছে; তিনি পূর্ব্বতন লায়েক আলী মন্ত্রিমণ্ডলীর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিয়া নিজের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ করিতে চান, এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ তাহার নালিশ উঠাইয়া লইতে চান। কিন্তু তাঁহার পুরাতন পার্ষদবর্গ এত সহজে হাল ছাড়িতে চায় না; তাহারা নিজামবাহাদুরের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া মোকদ্দমা চালাইয়া যাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প। খুঁটির জোরে ভেড়া নড়ে; তাহাদের খুঁটি হইল সেই চক্রান্তকারিগণ যাহারা কাশ্মীরের ব্যাপারটাকে এরূপভাবে ঘোরাল করিয়াছে। নিজামবাহাদুরকে জোর করিয়া মোকদ্দমা তুলিয়া লইবার জন্য বাধ্য করা হইয়াছে, এই অজুহাতে হায়দরাবাদের ঘটনাকে নথি হইতে খারিজ করিয়া

দিবার একটা চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টার মূলে যে ব্রিটিশের হাত আছে, এই বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। সরকারী ভাবে ভারতরাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে জড়িত না হইয়া পড়ার একটা ভান চলিতেছে; এই ভানের মধ্যেও ব্রিটেনের স্বার্থ আছে। পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন এই কথাটাই স্পষ্টভাবে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর (১লা আশ্বিন) তারিখে আমাদের শুনাইয়াছেন। হায়দরাবাদ রাজ্য একটা রাষ্ট্র কিনা, এই বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসার পূর্ব্বে আমাদের একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অনেক দেশ সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন উঠিতে পারে এবং হায়দরাবাদকে রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে আমাদের পক্ষে সুবিধা হইবে না, একটা নজির থাকিয়া যাইবে যাহা আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হইতে পারে। "...On the question of it (Hyderabad) being a state or not a state, I have always to keep in mind that there are other cases even within the empire, for which it might create a precedent...." এত সাবধানতা সত্ত্বেও মিঃ বেভিন তাঁহার বা ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠির প্রকৃত মনোভাব চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। তিনি ভারতরাষ্ট্রের মধ্যে একটা যোদ্ধ-মনোভাবের আবিষ্কার করিয়া (I regret, as every one must, that in this new Dominion a war-like spirit has developed) হায়দরাবাদ সম্পর্কে আমাদের আক্রমণকারী রাজ্য বলিয়া একটা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

এই বিষয়ে দুঃখ করিয়া লাভ নাই। এইরূপ অভিযোগ, মিথ্যা অভিযোগ, আমাদের বিরুদ্ধে ইংরেজের পক্ষ হইতে আসিবে এবং ইংরেজের কেউ ধরার লোকের অভাব হইবে না। এমন কি ইংরেজের বিরুদ্ধপক্ষীয় সোভিয়েট রাষ্ট্র হইতে প্রচার করা হইতেছে যে ভারতরাষ্ট্র এখন হইতেই পূর্ব্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনা করিতেছে। সুতরাং মিঃ বেভিনের ব্যবহারে আমাদের উত্তেজিত হইলে চলিবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার হুমকি

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদের অধিবেশন চলিতেছে ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারিসে। ভারতরাষ্ট্র দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ লইয়া আবার উপস্থিত হইয়াছে। এই বিষয়ে আলোচনা স্থগিত রাখা হইয়াছে; দক্ষিণ আফ্রিকার এই আবদার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদের বর্ত্তমান অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে। এই আবদার সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার মনোভাব এইরূপ: এই রাষ্ট্রের লোক সংখ্যা ১ কোটির কিছু বেশী। তাহার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসী বাণ্টুজাতির সংখ্যা প্রায় ৭৫ লক্ষ; উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া-বসা শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। ভারতবাসীর সংখ্যা মাত্র ২ লক্ষ ৫০ হাজার। ২৫ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করিয়া আছে; অ-শ্বেত কেহ কোনরূপ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করিবে, এই কথায় তাহারা শিহরিয়া উঠে। কামান-বন্দুক, গোলাগুলির অধিকার তাহাদের হাতে বলিয়া তাহারা ন্যায় ও সুবিচারের উপর পদক্ষেপ করিয়া স্পর্দ্ধায় চলিয়া যাইতে পারিতেছে। "রাষ্ট্র ও সমাজে শ্বেত ও অ-শ্বেতের মধ্যে সাম্যের কোন স্থান নাই"—এই কথা বলিয়াও দক্ষিণ আফ্রিকার এই শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় দুনিয়ার বুকে সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে। এই অন্যায় সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে বর্ত্তমান জগতে শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহ গায়ের জোরে ও বিজ্ঞানের কল্যাণে দুনিয়ার উপর নবাবী চালাইয়া যাইতেছে। এই সাহসেই দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থ-সচিব মিঃ এরিক লোউ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদকে শাসাইয়াছেন যে যদি ভারতবর্ষের অভিযোগ স্বীকার করিয়া লওয়া হয় বা তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা চলিতে দেওয়া হয় তবে "দক্ষিণ আফ্রিকা জাতিপুঞ্জ সংসদ পরিত্যাগ করার কথা বিবেচনা করিতে বাধ্য হইবে।" এবং এই হুমকিতে উহার ভারতবর্ষের অভিযোগ সম্বন্ধে সব আলোচনা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। এই সংবাদে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। ইটালি ও জাপান এইরূপ হুমকি দেখাইয়াই আবিসিনিয়া ও মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়াছিল। দশ বৎসর যাইতে না যাইতে আমাদের সেইরূপ একটা অন্যায়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। পূর্ব্বতন রাষ্ট্রসঙ্ঘ (লীগ অব্ নেশনস্) যেরূপভাবে ব্যর্থতায় বিলীন হইয়া গিয়াছিল, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদ (ইউনাইটেড নেশনস্ অরগেনিজেশন) কি সেই পথেই চলিতেছে না? এই প্রশ্ন তুলিয়া কোন সান্ত্বনা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু বিশ্ব-বিধানে অন্যায়, অবিচার ও অহমিকা স্থায়ী হয় না। তাহার জন্য রক্ত-গঙ্গা বহিয়া যায়, ইহা জানি। মানব-প্রকৃতি এই রক্ত-ক্ষয়ে অগ্রসর হয়, তবুও অন্যায়কে সহ্য করে না। ইহাও ইতিহাসের সাক্ষ্য।

গৃহাবাসের সমস্যা

"সংগঠন" জাতিগঠন কর্ম্মের একমাত্র মাসিক মুখপত্র। খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্ম্মী শচীন্দ্রনাথ মিত্র ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং শ্রীমতী অংশুরাণী মিত্র ইহার সম্পাদিকা। গঠনমূলক কর্ম্ম সম্বন্ধে এই পত্রিকাটির মতের মূল্য আছে। ভাদ্র মাসের সংগঠনে গৃহাবাসের সমস্যা সম্বন্ধে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। উহাতে বলা হইয়াছে যে "যদিও মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের মত ভারতের কুটীর ও অট্টালিকা শত্রুবিমানের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি ভারতের জনসাধারণের জন্য বাসোপযোগী গৃহাবাসের সমস্যা আছে। ইহা দৈন্যগ্রস্ত ভারতের বহু

পুরাতন সমস্যা। স্বাধীন ভারতে জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা অনুসারে বহু নগর, উপনগর, কারখানা, উপনিবেশ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজনও দেখা দিয়াছে। সুতরাং গৃহ নির্ম্মাণের উপাদান কোথা হইতে আসিবে, ইহা এক সমস্যা। সিমেণ্ট, কংক্রীট, রড, ইস্পাতের সরঞ্জাম ইত্যাদি গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ স্বদেশে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় না, এবং বিদেশ হইতেও বিশেষ পরিমাণে পাইবার উপায় নাই কারণ সেখানেও এ বিষয়ে সমস্যা বর্ত্তমান। পাকিস্থান হইতে আগত শরণার্থী সমাজের জন্ত গৃহাবাস নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়া সমস্যা ও অভাব আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না, এ ক্ষেত্রে কেন গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ স্বয়ং-সম্পূর্ণতা ও আত্মনির্ভরতার সহজ আদর্শটি ভুলিয়া রহিয়াছেন। দেশে মাটির অভাব নাই, বাঁশ খড় কাঠও পাওয়া যায়। সুরুচি থাকিলে এবং দেশের ইঞ্জিনিয়ার সমাজ কতকটা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়া সাহায্য করিলে, ঐ উপাদান দিয়াই সুশ্রী ও স্বাস্থ্যসম্মত গৃহাবাস লক্ষ লক্ষ রচিত হইতে পারে। পণ্ডিত নেহরু একবার এ বিষয়ে জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার কোন ফল হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু সঙ্কটকালেও যদি আত্মনির্ভরতার এই সকল সহজ পন্থা গ্রহণ না করিয়া আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তবে চৈতন্ত হইবে কবে?"

বাংলা-সরকারের পুনর্ব্বসতি বিভাগের পক্ষে এই মন্তব্যটি অবশ্যপাঠ্য বলিয়া আমরা মনে করি।

ক্লাবের জমি ও বাড়ীর জমি

কলিকাতায় টালিগঞ্জে ইংরেজদের দুইটি বড় ক্লাব আছে—যোধপুর ক্লাব এবং গল্‌ফ ক্লাব। তদ্ব্যতীত একটি রেসকোর্স রহিয়াছে। যোধপুর ক্লাবের এলাকা প্রায় ৩০০ বিঘা এবং গল্‌ফ ক্লাবের প্রায় ১১০০ বিঘা। কলিকাতার বুকের উপর এই পরিমাণ জমি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরেজের খেলাধুলার জন্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা ছাড়া তাঁহাদের আরও অনেকগুলি বিস্তীর্ণ জমিসমেত ক্লাব আছে, গড়ের মাঠ তো আছেই। কয়েক বৎসর আগে বাংলা-সরকারের কর্ম্মচারীরা একটি সমবায় গৃহনির্ম্মাণ সমিতি গঠন করিয়া যোধপুর ক্লাবের জমিটা উহার মালিকের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ক্লাবের ইজারা ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত আছে বলিয়া দখল লইতে পারেন নাই। ইজারার সর্ত্তানুসারে যোধপুর ক্লাব আরও পনর বৎসর উহার মেয়াদ বাড়াইবার দাবি করিতে পারেন এবং সেই দাবি তাঁহারা তুলিয়াছেন। ইহাতে সমবায় সমিতি কলিকাতার বাসস্থান সমস্যা সমাধানের পথে যেটুকু অগ্রসর হইয়াছেন তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অনেক ইংরেজ দেশে চলিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহাদের খেলার অনেক স্থান রহিয়াছে। তাহার জন্ত শহরের উপরে বাসোপযোগী এতগুলি জমি আটকাইয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে।

এ বিষয়ে সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় গবর্ণমেণ্টের নিষ্ক্রিয়তা। ক্লাবের কর্ত্তাব্যক্তিদের আপত্তির ফলে জমি-গরীবদের ভিটামাটি এবং চাষের জমি হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্ত ল্যাণ্ড একুইজিশন আইনের প্রয়োগ হৃদয়হীনতার সহিত যে ইংরেজেরা করিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহারাই এই আইনের কবল হইতে নিজেদের ক্লাবের জমি বাঁচাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন এই দৃশ্য বিচিত্র হইতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে সঙ্কুচিত হইতেছেন ইহাই আশ্চর্য্য। অনাবশ্যক যোধপুর এবং গল্‌ফ ক্লাব তুলিয়া দিয়া ঐ জমি অবিলম্বে অত্যাবশ্যক বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্ত সরকারের দখল লওয়া কর্ত্তব্য; দুইটা রেসকোর্সের একটাতে সাহেবদের গল্‌ফ খেলার স্থান করিয়া দিলেই যথেষ্ট।

সরকারী কর্ম্মচারীদের গৃহনির্ম্মাণ সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা বে-সরকারী লোকদেরও ঐ স্কীমের সুযোগ লইতে দিবেন। তাহার জন্ত তাঁহারা যোধপুর ক্লাব-সংলগ্ন আরও কিছু জমি দখল লইতে চাহেন। ঐগুলি কলিকাতার পেশাদার কয়েকজন অবাঙালী ফাটকাবাজের জমি এবং ইহারাও ঐ সব জমি অতিরিক্ত চড়াদরে বিক্রয় করিবার লোভে সমবায় সমিতিকে ছাড়িতে রাজি হইতেছেন না। ল্যাণ্ড একুইজিশন আইন অনুসারে এই জমিগুলিও উহাদের কেনাদামে দখল লইয়া সমবায় সমিতির হাতে অর্পণ করা সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য। সরকারী কর্ম্মচারীদের এই সমবায় সমিতির কার্য্য অবিলম্বে সফল হওয়া উচিত এইজন্ত যে উহার সাফল্য দর্শন করিলে অনুরূপ সমবায় সমিতি গঠনের দ্বারা গৃহসমস্যা নিবারণে লোকের উৎসাহ জন্মিবে এবং দেশের মঙ্গলের জন্ত ইহা একান্ত প্রয়োজন।

শরণার্থী ছাত্রদের উপর চাপ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারকে সভাপতি করিয়া শরণার্থী ছাত্রদের সাহায্যের জন্ত একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। ছাত্রদের পড়াশুনার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় অর্থ-সাহায্য এবং থাকিবার স্থান সংগ্রহ করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সহিত দরবার করাই কমিটির প্রধান কাজ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। যে সভায় কমিটি গঠিত হয় সেখানে জনৈক বক্তা বলেন যে, প্রায় ৯০০ ছাত্র বস্তিতে অবর্ণনীয় দুর্দ্দশার মধ্যে বাস করিয়া পড়াশুনা চালাইতে বাধ্য হইতেছে। কলিকাতা শহরের উপকণ্ঠে বহু জমি আছে। সেখানে বাঁশ খড় কাঠ দিয়া মাটির ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিলে অনেকের থাকার সুবিধা হইতে পারে। পাকা বাড়ী ছাড়া থাকা চলিবে না এমন কোন কথা নাই, শরণার্থীরা মাটির ঘরে থাকিতে আপত্তি করিবে ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাহারা কলিকাতায় পড়ে তাহাদিগকে শহরের কলেজে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত এবং যথাসম্ভব অপর সকলকে বিভিন্ন মফস্বল কলেজে ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। সিমেণ্ট লোহার আশায় বসিয়া না থাকিয়া সেখানেও অনায়াসে মাটির ঘর তৈরি করিয়া লওয়া যায়।

উপরোক্ত সভায় অধ্যাপক প্রমদারঞ্জন মজুমদার শরণার্থী

যাহা বিশ্ববিদ্যালয় অনায়াসে দূর করিতে পারেন। তিনি বলিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় এই সব ছাত্রের নিকট হইতে ২০৲ টাকা 'মাইগ্রেশন ফী' এবং ৫৲ টাকা 'লেট ফী' আদায় করিতেছেন। সর্ব্বাস্বান্ত পরিবারগুলির উপর এটা একটা বড় বোঝা। আসলে ইহারা সকলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র; রাষ্ট্রবিপ্লবে ইহারা পাকিস্থানে পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইয়াছে এবং বোর্ডের পরীক্ষার ফল দেরীতে বাহির হইয়াছে বলিয়া ইহাদের নিকট হইতে 'লেট ফী' আদায় করা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ছাত্রদের নিকট হইতে এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কারণ আমরা বুঝিতে অক্ষম। বদান্ততাটা অপরের উপর দিয়া যাক, আমার স্বার্থ ষোল আনা বজায় থাকুক এই মনোভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শোভন হয় না।

ছোয়েবুল্লা খাঁ

নিজাম রাজ্যের রাজাকার-বর্ব্বরতার শেষ হইয়াছে। কিন্তু তাহারা রাজ্যের জীবনে যে বিপর্য্যয় আনিয়াছে, মানুষের মনকে যেরূপভাবে বিষাক্ত করিয়াছে, সেই বিষ-ক্রিয়া দূর হইতে এখনও অনেক দিন লাগিবে। সেই বিষের উৎসমুখ মুসলমান সমাজের সংকীর্ণতার মধ্যে নিহিত, যে সংকীর্ণতার দরুন তাহারা ভারতবর্ষকে সাত-আট শত বৎসরের মধ্যে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে পারিল না। সকল মুসলমানই এই দোষে দুষ্ট ছিলেন না বা এখনও নাই। কিন্তু এই ব্যতিক্রম সংখ্যায় এত কম যে তাঁহারা মুসলমান সমাজের চিন্তার ও কর্ম্মের উপর কোন প্রভাব স্থাপন করিতে পারেন নাই বা পারিতেছেন না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বাদশাহ আকবরের ন্যায় প্রবল প্রতাপ তীক্ষ্ণধী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একছত্র সম্রাটেরও ব্যর্থতার কথা বলা যায়। হায়দরাবাদ রাজ্যের সাংবাদিক ছোয়েবুল্লা খাঁও এই পর্য্যায়ভুক্ত। সাম্প্রদায়িক সমন্বয়প্রয়াসী এই যুবক রাজাকারের হাতে বিনষ্ট হইয়াছেন। কাসিম রেজভি নাকি হুকুমজারী করিয়াছিল যে, যে মুসলমান হায়দরাবাদ রাজ্যে মুসলমান প্রভুত্বের বিরুদ্ধে কথা কহিবে, তাহার হাত পা কাটিয়া পরে হত্যা করা হইবে। ছোয়েবুল্লা খাঁকে এই ভাবে হত্যা করা হয়।

হায়দরাবাদ রাজ্যে যে অত্যাচার ও গণতন্ত্রবিরোধী কার্য্যকলাপ চলিতেছিল তাঁহার নিজের "ইমরোজ" পত্রিকায় দিনের পর দিন তাহার বিরুদ্ধে ভর্ৎসনা করা হইতেছিল। সেইজন্য তিনি শাসকশ্রেণী ও তাহাদের পৃষ্ঠপোষিত রাজাকার গুণ্ডাদের চক্ষুশূল হইয়া পড়েন। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া যৌবনের প্রারম্ভ হইতে তিনি নিজামশাহী রাজ্যের অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে তাঁহার জন্ম; ২৯ বৎসর বয়সে তিনি গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারাইলেন। "তাজ" নামক উর্দু সাপ্তাহিকে তাঁহার সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হয়। সরকারের আদেশে যখন তাহা বন্ধ হইয়া যায় তখন তিনি শ্রীনরসিংহ রাও পরিচালিত করেন। সরকারী ও রাজাকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকাখানিকেও গলা টিপিয়া মারা হয়। তারপর "ইমরোজের" আবির্ভাব।

ছোয়েবুল্লা খাঁ বীরের মত বাঁচিয়াছিলেন; মৃত্যুও হইল তাঁহার বীরের মত। স্বাদেশিকতার সেবায় কতটা আত্মভোলা হইলে নিজের সমাজের বিরুদ্ধে লোকে যাইতে পারে, তাহার মাহাত্ম্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ছোয়েবুল্লা খাঁর স্বেচ্ছামৃত্যু ভারতরাষ্ট্রের মুসলমানের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া গেল; ভারতরাষ্ট্রের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া গেল। এই ত্যাগ তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জীবনে সান্ত্বনা আনিবে। তাঁহার দুইটি সন্তান এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের মনকে বিশুদ্ধ করিবে। তাহারাই হইবে ভারতরাষ্ট্রের স্রষ্টা; ভারতপন্থার প্রচারক।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-মৃত্যুবার্ষিকী

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পঞ্চম মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৩ই আশ্বিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে এক স্মৃতিসভা হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন বলেন—"প্রবাসী পত্রিকার সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত রামানন্দ বাবু নিজে আড়ালে থাকিয়া অন্যের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেন। চিন্তাশীল পাঠকদের কাছে প্রবাসী ছিল অপরিহার্য্য।"

শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন বলেন—রামানন্দবাবু ছিলেন অপূর্ব্ব মনীষাসম্পন্ন কর্ম্মযোগী। অন্ধদের শিক্ষার জন্য অক্ষর এবং বালকবালিকার শিক্ষার জন্য সচিত্র বর্ণপরিচয় তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিয়া তিনি শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় ছিল আকাশের মত উদার এবং মনীষা ছিল সাগরের মত গভীর।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সভাপতির বক্তৃতায় বলেন—"দাসী" পত্রিকার সম্পাদকরূপে রামানন্দবাবু মেয়েদিগকে সেবাপরায়ণতায় উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি প্রদীপ, প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সাংবাদিক সাধুতা সকলের অনুকরণীয়। তাঁহার সম্পাদকীয় মন্তব্যে গভীর জ্ঞান শুধু নয়, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং দেশ ও জাতির প্রতি গভীর ভালবাসার পরিচয় থাকিত। সেই আদর্শ আজ একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার সাংবাদিকতার আদর্শ আমাদের কাছে ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। কোন দিন তিনি স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া সাংবাদিকের কাজ করেন নাই। সাংবাদিক হিসাবে তিনি শিক্ষকের কাজ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় ২২শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর) হইতে ৪ঠা কার্ত্তিক (২১শে অক্টোবর) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র-টাকাকড়ি

অবস্থা ও ব্যবস্থা

শ্রীবিমলাচরণ দেব

"অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা" আমাদের দেশের একটা প্রাচীন প্রবাদবাক্য। এই অল্পাক্ষরের মধ্যে কতকালের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা অন্তর্নিহিত এবং এই "অভিজ্ঞতা" সবটাই মিষ্ট নহে। কারণ অভিজ্ঞতা বলে যে, অবস্থা বুঝিয়া যদি ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলেই কল্যাণ হয়। আর, অবস্থা না বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলে বা অবস্থা বুঝিয়াও একটা কাল্পনিক লোকের ভাবে আবিষ্ট হইয়া ব্যবস্থা করিলে অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। কল্পলোকের দোহাই পাড়িলে সে অকল্যাণ রোধ করা যায় না।

তাই যখন মহাভারতে পাইলাম "ধর্মো হ্যাবস্থিকঃ স্মৃতঃ" বড় আনন্দ হইল।

এখন "ধর্ম" কি? সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি সম্প্রদায়-বিশেষের এক প্রকার বিশ্বাস। যথা—হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম ইত্যাদি। বস্তুতঃ "ধর্ম" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত মূল অর্থ হইতেছে "যাহা ধারণ করিয়া রাখে, যাহা মানুষ তথা সমাজকে অবসন্ন হইতে দেয় না।" প্রকৃতই, যখন মানুষ সংসারের ও নিজ মনের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতে "কান্দিশীকো ভয়দ্রুতঃ" হইয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে তখন সে অবসন্ন হয় ও নাশের দিকে যায়। সে সময়ে যদি সে এমন কোনও অবলম্বন পায় যাহাকে ধরিয়া সে দাঁড়াইতে পারে, সে বাঁচিয়া যায়। এই অবলম্বনই আদিম "ধর্ম"।

আমার মনে হয় প্রাকৃতিক শক্তির উদ্দাম অভিব্যক্তিই আদিম "ধর্মে"র মূল। যখন প্রবল ঝড় বহে, যখন প্রবল ঝড়ে দুইটা বৃক্ষশাখা ঘৃষ্ট হইয়া অগ্ন্যুৎপাদন করে এবং সেই অগ্নিতে সমগ্র বন দগ্ধ হইয়া যায়; যখন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত হয় এবং জীবজন্তু অসহায় ভাবে ভাসিয়া চলিতে থাকে, তখন এই সমস্ত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের শক্তি যে অবারণীয় তাহা অনুভব করিয়া মানুষ বিহ্বল ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। তখন সে স্বভাবতঃই মনে করে যে, যদি সে এই বায়ুর নিয়ামক শক্তি, এই বৃষ্টির নিয়ামক শক্তি, এই অগ্নির নিয়ামক শক্তির শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই অ-প্রাকৃত (supernatural) শক্তি প্রসন্ন হইবে ও তাহাকে রক্ষা করিবে। এইরূপে সে যখন যে শক্তির শরণাপন্ন হয়, স্বভাবতঃই সে সেই-শক্তিকে সর্বময় সর্বপ্রধান বলিয়া স্তুতি করে। পরে কালক্রমে সে অনুভব করে যে, সে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির যে উপাসনা করিতেছে, সে এই এক মহাশক্তির অস্তিত্ব ও সর্বব্যাপিত্ব অনুভব করিয়া তাহাকেই অবলম্বন করে। এইরূপে মানুষ "বহুদেব" হইতে "একদেব"-ধারণায় উপস্থিত হয়। ক্রমে একান্ত প্রণিধান দ্বারা বুঝে যে, যাহাদের "বহু" মনে করিতেছে তাঁহারা তত্ত্বতঃ "এক" এবং এই "এক"ই বিভিন্ন অভিব্যক্তি দ্বারা "বহু" রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। যাহাই হউক, মানুষ এই "বহুদেব" ও এই "একদেব" অবলম্বনেই বিভ্রান্ত অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্থৈর্য্য লাভ করে।

এই অবস্থাতেই স্তব, স্তুতি, পূজাদির উৎপত্তি। এদেশে এই স্তব-স্তুতি পূজা ক্রমে যাগযজ্ঞ, শ্রৌত, স্মার্ত্ত, গুহ্যাদি ক্রিয়ারূপে পরিণত হয়। ইহাই হইল "অ-প্রাকৃত ধর্ম"।

ধর্মের অপর এক রূপ আছে—"সমাজধর্ম।" যখন মনুষ্য-মিথুন একেলা থাকে, তখন অপর কোনও জন্তু-মিথুন হইতে তাহার বিশেষ প্রভেদ থাকে না। এমন কি, প্রথম প্রথম যখন একাধিক মনুষ্য-মিথুন একত্র অবস্থানাদি করে তখনও স্থায়ী বন্ধন কিছুমাত্র থাকে না। স্বল্পমাত্র কারণে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখনও "সমজ" মাত্র। কিন্তু ক্রমে মনুষ্য-মিথুনেরা সংঘবদ্ধ হয়। তখন নিয়মাদির আবির্ভাব হয়। ঐ নিয়মাদির দ্বারা নব-গঠিত সংঘ চালিত হওয়ায় ঐ নিয়মগুলিই সংঘকে স্থায়ী বন্ধনের দ্বারা ধারণ করে এবং বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে রক্ষা করে। এই স্থায়ী বন্ধনই "সমজ"কে "সমাজ"-এ পরিণত করে। এই নিয়মগুলিই "সমাজধর্ম"।

কালক্রমে পূর্বোক্ত প্রাকৃত ধর্ম সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করিয়া ব্যাপকতর "সমাজধর্মে"র অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ঐ যুক্তধর্ম সমাজের সর্বাঙ্গীণ বন্ধনের সৃষ্টি করে। এই যুক্তধর্মই শুধু "ধর্ম" বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য, কারণ এই যুক্ত ধর্মই সমাজকে সর্বতোভাবে সর্বপ্রকারে ধারণ করিয়া রাখে।

হিন্দুগণের নীতির বিশেষত্ব এই যে উহাতে "ধর্ম" অর্থে পূর্বোক্ত দুই ধর্মের যুক্তরূপ বুঝায়। প্রতীচ্যের religion শব্দ আমাদের "ধর্মে"র ঠিক প্রতিশব্দ নহে। প্রতীচ্যের religion পূর্বোক্ত "অ-প্রাকৃত ধর্ম" মাত্র বুঝাইয়া জাতির জীবনের অংশমাত্রে আবদ্ধ। হিন্দুর "ধর্ম" জাতিকে সর্বাঙ্গীণ ব্যাপিয়া আছে।

"অ-প্রাকৃত ধর্ম", "সমাজ ধর্ম" ও তাহাদের যুক্তরূপের

মূলসূত্র এক হইলেও সকল সমাজে উহাদের কেহই একই আকারে আবির্ভূত হয় না। সংসারের সকল জিনিষের মত "ধর্ম"ও একাধিক কারণ দ্বারা সঙ্ঘটিত। উৎপত্তির সময় যে সমস্ত কারণ যে ভাবে সক্রিয় থাকে, তদ্দ্বারাই "ধর্মে"র আকার নিয়মিত ও নির্দ্ধারিত হয়। কারণ-সমূহ একই ভাবে বা পরিমাণে বা শক্তিতে সকল সমাজে কোনও সময়েই থাকে না ও থাকিতে পারে না: এইজন্য "ধর্মে"র আকার কোনও দুই সমাজে ঠিক এক হইতে পারে না। কিছু না কিছু পার্থক্য থাকিবে। এই পার্থক্যের প্রধান কারণ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু ও জাতি (Ethnology or race); বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায় যে, তৎকালীন সমগ্র অবস্থা অর্থাৎ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, জাতি, অপরাপর জাতির সহিত নৈকট্য বা দূরত্ব প্রভৃতি নানাপ্রকার অনুকূল ও প্রতিকূল কারণের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া যে নিয়মসমষ্টি হয়, তাহাই "ধর্ম"। সমগ্র "অবস্থা" দ্বারা নিয়মিত ও নির্দ্ধারিত হয় বলিয়া "ধর্ম" সত্যই "আবস্থিক"।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে অবস্থার পরিবর্তন হইলে "ধর্ম"ও তদনুরূপ পরিবর্তিত হয়। এক অবস্থায় যাহা "ধর্ম" অপর অবস্থায় অর্থাৎ পূর্বাবস্থা পরিবর্তিত হইলে তাহা আর "ধর্ম" থাকে না, তাহা "অ-ধর্ম" হইয়া পড়ে। "অ-ধর্ম" অকল্যাণের আকর। যেমন, ব্যক্তিগত ভাবে বলি, আজ আমার শরীর বেশ সুস্থ, এক প্রকারের আহারাদি আমার শরীরের পক্ষে অনুকূল, অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিধান করে। অবস্থানুযায়ী বলিয়া ইহা "ধর্ম"। আগামী কাল যদি আমার শরীর সুস্থ না থাকে, তাহা হইলে পূর্বদিনের আহারাদি আমার শরীরের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে না, বিশেষ প্রতিকূল হইবে। পরিবর্তিত অবস্থাতে পূর্ববৎ আহারাদি করিলে স্বাস্থ্যের হানি, এমন কি প্রাণনাশ পর্য্যন্ত, হইতে পারে। অবস্থানুযায়ী নহে বলিয়া ইহা "অ-ধর্ম" এবং সেই-জন্যই অকল্যাণের কারণ। যদি বাঁচিতে হয়, নিজ সত্তার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হয় তাহা হইলে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থার সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হইবে। তাহা না করিলে বিনষ্ট হইতে হইবে। ইংরেজীতে বলে "Adapt or perish"। হনুমান নিজ চিরজীবিত্বের কারণ ভীমকে বলিয়াছিলেন—"যুগং সমনুবর্তামি কালো হি দুরতিক্রমঃ"।

"ধর্ম" ও "অ-ধর্ম" সম্বন্ধে এই মূল ভিত্তিগত সত্য মনে রাখিয়া আমাদের দেশের "অ-প্রাকৃত ধর্ম" সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলি। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের আদিম "অ-প্রাকৃত ধর্ম" ক্রমে যাগযজ্ঞাদি রূপে পরিণত হয়। ক্রমে অনুষ্ঠানের প্রাবল্য ঘটায় ক্রিয়ার উদ্দেশ্য চাপা পড়িয়া গেল। এই পরিণতিতে সাহায্য করিল নানাপ্রকার খুঁটিনাটি বিধি-নিষেধের আবির্ভাব। এই ভাবে ও ক্রমবর্দ্ধমান বিধি-নিষেধের আবরণে ও চাপে অ-প্রাকৃতিক ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য (অর্থাৎ সর্বনিয়ন্ত্রী শক্তির অনুভূতি ও মনন) অন্তর্হিত হইয়া সমস্ত ব্যাপারটা একটা প্রাণহীন ক্রিয়া-কাণ্ডে পরিণত হইল। এইরূপ বিধিনিষেধের দুই একটা উদাহরণ দিই—অমুক দ্রব্য সম্মুখে রাখিতে হইবে, বামে বা দক্ষিণে রাখিলে সমস্ত মাটি; জল মাটিতে ফেলিবে, কোনও পাত্রে ফেলিলে সবনাশ; খবরদার, "মালা" বলিবে না, "স্রজ্" বলিবে, যদি ভুল করিয়া "মালা" বলিয়া ফেল, থুড়ি থুড়ি বলিয়া "স্রজ্" বলিবে, ইত্যাদি। এই সব খুঁটিনাটি সম্বন্ধে সাবধান হইতে সমস্ত মন ব্যস্ত রহিল। আসল কাজের জন্য কিছুই রহিল না।

এইরূপে ধর্মে গ্লানি আসিল। ধর্মে গ্লানি আসিলেই ভগবানের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এখানে আবির্ভাব হইল বুদ্ধদেবের। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান ইহা নহে। মোটামুটি বলা যায় যে, বুদ্ধদেব তদানীন্তন বেদের অক্ষরমাত্র ও বিধিনিষেধ দ্বারা জটিলীকৃত ক্রিয়া-কাণ্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ধর্মের সারতত্ত্ব, অর্থাৎ শীল ও আচার, প্রচার করিয়া-ছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি মৈত্রীভাবনা, করুণাভাবনা, অহিংসা প্রভৃতির মূলসূত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ কথা কোথাও পাই না যে, তিনি মৈত্রীভাবনা, অহিংসাদি প্রয়োগ অবস্থানিবিচারে করিতে বলিয়াছিলেন। বরং পাই যে, যখন মগধসেনাপতি সিংহ তাঁহার নিকট অহিংসা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তখন তিনি উত্তরে বলিয়া-ছিলেন যে, যেখানে হিংসা করিলে অনেক লোকের উপকার হইবে, সেখানে হিংসা অবশ্যকর্তব্য। বলা বাহুল্য, ইহাই "অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা", ইহাই "ধর্ম"।

কিন্তু কালক্রমে তাঁহার পরবর্তী লোকেরা "অবস্থা"র সহিত "ধর্মে"র সম্পর্ক ভুলিয়া গেল। অবস্থা বিচার নাই, স্থান অস্থান বিচার নাই; সর্বত্র সর্বকালে মৈত্রীভাবনা, করুণাভাবনা, অহিংসাদি "ধর্ম", ইহাই প্রচার হইতে লাগিল। অবস্থাবিশেষে যে মৈত্রীভাবনা, অহিংসাদি পরম অধর্ম, তাহা কেহ ভাবিল না।

এইরূপ প্রচার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার হয় ত প্রথমে করিতে পারে নাই। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ইহার প্রভাব খুব বিস্তৃত হইয়াছিল। জনসাধারণের মধ্যে চিন্তাশক্তি বিশেষ থাকে না। চিন্তা-শক্তির অভাবে মানসিক জড়তা ও তৎপ্রসূত "গড্ডলিকা-

বৃত্তি" অবশ্যম্ভাবী। জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ বিকৃত বৌদ্ধভাবগুলির প্রচার ও প্রসারই বৌদ্ধগণের সম্প্রদায়রূপে অস্তিত্ব নাশের অন্যতম ও প্রধান কারণ। সহাবস্থান জন্য বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ও প্রাচীনপন্থী হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ভাবের অবশ্যম্ভাবী আদান-প্রদান হইয়া দুই সম্প্রদায়ে ক্রমে এরূপ ভাবসমীকরণ হইয়া গেল যে, বৌদ্ধসম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকার আবশ্যকতা রহিল না এবং ক্ষুদ্রতর বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বৃহত্তর হিন্দুসম্প্রদায়ে অনায়াসে মিলিয়া গেল। যে বুদ্ধ প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিরোধী ছিলেন, যাঁহাকে মহাভারতে এক স্থলে "চৌর" পর্যন্ত বলা হইয়াছে, হিন্দু বৌদ্ধ মিশিয়া গেলে সেই বুদ্ধই হিন্দুর দশাবতার মধ্যে কৃষ্ণকে সরাইয়া তাঁহার স্থানে বসিলেন।

শুনিতে পাই অনেকে বলেন যে, এই বৌদ্ধ প্রভাবের যুগ নাকি আমাদের ইতিহাসে সর্বোজ্জ্বল যুগ। এই যুগের সাহিত্য, দর্শন, কলা, স্থাপত্য, নাগার্জুনাদির রসবিদ্যাচর্চা প্রভৃতি আমাদের জাতির পক্ষে নাকি চিরস্মরণীয়। সাহিত্যাদি সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি (কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রৌঢ়ীবাদ হইলেও) প্রতিবাদ করিতেছি না। কিন্তু ঐ যুগ আমাদের দেশের "সর্বোজ্জ্বল যুগ", ইহা ঠিক নহে।

"লাভ" এর কথা বলিলেই "লোকসান"-এর কথা আসে। সাহিত্যাদি সম্বন্ধে বৌদ্ধযুগে লাভের কথা শুনিলাম। লোকসান কিছু হইয়াছিল কি? দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা বেশী?

দুই-একটা কথা বলি—Transfusion of blood নাকি আধুনিক পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটা বড় অবদান। কিন্তু বোধ হয় অনেকে খবর রাখেন না যে, চরক সংহিতায় Transfusion of blood-এর ব্যবস্থা আছে, সদ্যোহত ছাগের রক্তদ্বারা। অনেকেই জানেন যে, সুশ্রুতসংহিতা প্রধানতঃ শল্যতন্ত্রের গ্রন্থ, এদেশের Surgeon's Handbook বলিলেই হয়। সুশ্রুত মতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের আট তন্ত্রের প্রথম তন্ত্র "শল্য"। ইহাতে এত প্রকার শল্য তন্ত্রের যন্ত্রাদির (surgical instruments and appliances) বর্ণনা আছে যে, আশ্চর্য্য হইতে হয়। কিন্তু এই সমস্তই ও এই প্রকারের আরও কত কিছু লোপ পাইয়াছে, যত দূর মনে হয়, "অহিংসা"র বিকৃত বৌদ্ধ প্রচারে।

কিন্তু এই বিকৃত বৌদ্ধ প্রচার সর্বাপেক্ষা অনিষ্ট করিয়াছে আর এক ভাবে—"অহিংসা, মৈত্রীভাবাদি অবস্থা নির্বিচারে কর, ইহাই পরম ধর্ম", এই নীতি নিরন্তর প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে সম্মোহিত করিয়া, ভূতাবিষ্টের মত করিয়া, সমগ্র জাতিকে যুদ্ধবিমুখ ও নির্বীর্য্য করিয়াছে। এই

ক্রূর ও গভীর আঘাত হানিয়াছে, তাহা স্থির ভাবে ভাবিয়া দেখিলে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইহার ফলে সমগ্র জাতি একান্ত যুদ্ধবিমুখ ও সর্বাবস্থায় অবস্থা-নির্বিচারে শান্তিকামী (peace at any price) হইয়া পড়ায় আমাদের জাতীয় দুর্দশা, যাহা আজও কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। বৌদ্ধ প্রভাবের যুগ আমাদের ইতিহাসে জাতীয় সর্বনাশের যুগ।

ভারতের বাহিরেও দেখি, মোঙ্গল জাতির যে অংশ মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিল, তাহারা কি ভাবে বিশ্ব বিজয় করিয়াছিল। আর—বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চীনের অবস্থা!

যদি মানুষের মত অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চাও, শান্তি-বাদী হইলে চলিবে না, ইতিহাস একবাক্যে ইহা বলে।

বৌদ্ধ প্রভাব বঙ্গে খুবই বেশী হওয়ায় এখানে বৈদিক ধর্ম একেবারে লোপ পাইয়াছিল। পরে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের চেষ্টা হয় পশ্চিম অঞ্চল হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু ইহারই পরে আর এক আবির্ভাব হইল—রঘুনন্দন। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য রঘুনন্দন প্রচার করিলেন—দেশে ব্রাহ্মণ অটুট আছে, কাল-বিপর্যয়ে অনেক কিছু গিয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের কোনও ক্ষতি হয় নাই, ব্রাহ্মণকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। কিন্তু সেই কাল-বিপর্যয়েই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সমস্ত শূদ্র হইয়া গিয়া শূদ্রের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পরিচারকের) সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার এই মতের "প্রমাণ" কি, এ কথা তুলিলেই "সদ্যোজাত সংহিতা"র গল্প মনে পড়ে।

তখন দেশের পণ্ডিত সমাজের এরূপ হীন অবস্থা যে রঘুনন্দনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার লোক নাই। এক মাত্র রঘুনাথ শিরোমণির কথা শুনা যায়, যিনি কথঞ্চিৎ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন নিজ প্রণীত "তত্ত্ব" অনুসারে পুত্রের উপনয়ন দিয়া রঘুনাথের নিকট লইয়া গেলে তাঁহার ঐ পুত্র রঘুনাথকে অভিবাদন করিলেন। কিন্তু রঘুনাথ প্রত্যভিবাদন না করায় রঘুনন্দন ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—"ব্রাহ্মণ আপনাকে অভিবাদন করিলেন, আপনি প্রত্যভিবাদন করিলেন না।" রঘুনাথ তখন বলিলেন—"তোমার 'তত্ত্ব' অনুসারে তোমার পুত্রের উপনয়ন হইয়াছে কিন্তু আমার উপনয়ন তোমার 'তত্ত্ব' অনুসারে হয় নাই। তাহা হইলে তোমার পুত্র যদি ব্রাহ্মণ হয়, আমি ব্রাহ্মণ নহি। আবার আমার যে প্রথায় উপনয়ন হইয়াছে, তোমার পুত্রের সে প্রথায় উপনয়ন হয় নাই। তাহা হইলে আমি যদি ব্রাহ্মণ হই, তোমার পুত্র ব্রাহ্মণ নহে। এ অবস্থায়, হয় আমি উহার অভিবাদনের যোগ্য নহি বা তোমার পুত্র

অভিবাদন করিবার অধিকার তাহার নাই।" ইহার ফলে রঘুনন্দনের উপনয়ন সম্বন্ধে "তত্ত্ব" চলিত হয় নাই।

কিন্তু প্রতিবাদের অভাবে রঘুনন্দনের এই ব্রাহ্মণ-শূদ্র মত চলিয়া গেল। প্রতিবাদের অভাবের কারণ অনুমান-সাপেক্ষ।

অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্তর হইতে নিরন্তর প্রচারের ফলে সম্মোহন হইল। জনসাধারণ সম্মোহিত হইয়া সত্যই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইল। ব্রাহ্মণ বলিল—"শাস্ত্র সব আমার, আমি যখন যাহা বলিব, তাহাই শাস্ত্র তোমরা বেদাদি শাস্ত্র পড়িলে অনন্ত নরকে যাইবে; ওঁকার উচ্চারণ করার অধিকার কেবল আমাদের এবং তোমরা উহা উচ্চারণ করিলে তোমাদের জিহ্বা খসিয়া পড়িবে"—(এই শেষ কথাটি বাল্যকালে আমি এক নিরক্ষর রুটিওয়ালা "ব্রাহ্মণ"কে বলিতে শুনিয়াছি) ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্যে শাস্ত্রাদিতে প্রক্ষেপের কথাও অবিদিত নহে। Herrenvolk পন্থ প্রতীচ্যের অবদান নহে।

এইরূপে দেশের জনসাধারণের মনে পরাভূত মনোবৃত্তি (inferiority complex) জন্মাইয়া দেশের কি পরিমাণ অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা সহজে অনুমেয়।

বাংলা শক্তিপূজার দেশ। সহজে কাবু হইতে চাহে না। রঘুনন্দনের "তত্ত্ব" মানিয়া লইয়া বাঙালী ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় মনোবৃত্তি লুপ্ত হইল না। তাই সীতারাম, মেনাহাতি, প্রতাপাদিত্য প্রমুখ ব্যক্তিগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিপুল-বিক্রমে লড়িয়া দেশের জাতির অস্তিত্ব সগৌরবে রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিধাতা বিরূপ। চৈতন্যের উদয় হইল। চৈতন্যের সমর্থকেরা বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার আবির্ভাব না হইলে সারা বাংলা মুসলমান হইয়া যাইত। হয় ত। কিন্তু পঞ্জাবেও ত ঐ অবস্থা, মুসলমানদিগের প্রচণ্ড চাপ। সেখানে ঠিক চৈতন্যের সময়ই নানকের আবির্ভাব। দুই জনে সমসাময়িক। কিন্তু এক দিকে নানক ও তাঁহার শিখ এবং অপর দিকে চৈতন্য ও তাঁহার বৈষ্ণব! Look on this picture and on this! এই পার্থক্যের কথা ভাবিলে মনে পড়ে "মাটির গুণে"র গল্প!

চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল মন্ত্র "অহেতুকী প্রেম"—"সর্বাবস্থায় নির্বিচারে প্রেম বিলাও," "মেরেছ কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দিব না?" আর, আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম বলে, "অবস্থা-বিশেষে প্রেম পরম ধর্ম"—কিন্তু ইহাও বলে, "যদি অত্যন্ত পূজ্য বেদান্তপারগ ব্যক্তি তোমার বিরুদ্ধে আততায়ীরূপে আসেন সে অবস্থায়

কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম যে অবস্থা-বিশেষের উপর নির্ভর করে, ইহা ভুলিয়া যাওয়ার মত মারাত্মক ভুল আর হইতে পারে না। এইখানে কাশ্মীরের অন্তর্গত দরদিস্থানের একটি প্রবাদ বাক্য মনে পড়িতেছে—"রাজার সম্মুখ দিয়া বা ঘোড়ার পিছন দিয়া চলিবে না, লাথি খাইবে।"

চৈতন্যপ্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম নির্বীর্য নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছিল। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য এরূপ যে, এই নির্বিচার প্রেমের ভাব ও ভাবালুতা সারা সমাজকে ক্রমে আবিষ্ট করিয়াছে। এই প্রেমপন্থ দেশের উদগ্র জাগ্রত ভাবকে বিদায় দিয়া তৎস্থলে আনিয়া দিয়াছে "ভাব লাগা"—মানসিক অবসাদ ও অবনতি। প্রমাণের আবশ্যকতা নাই, শুধু একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখ।

আরও কি করিয়াছে? যে দেবতা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, যাঁহার এক হস্তে যুদ্ধবাদ্য শঙ্খ, অপর দুই হস্তে প্রচণ্ড আয়ুধ, চক্র ও গদা এবং শেষ হস্তে ক্ষত্রিয়বীর্যার্জিত পদ্ম-উপলক্ষিত শ্রী; যিনি প্রতোদমাত্র অবলম্বনে ভীষ্মের মত যোদ্ধার সহিত যুদ্ধের জন্য উদ্দাম বেগে ধাবমান হইয়াছিলেন, তাঁহার হাতে দিল বেণু ও মাথায় দিল প্রেমের পসরা! কি মর্মান্তিক রূপান্তর!

প্রেমে গদগদ করিয়া দেশকে নির্বীর্য করার জন্য চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম এদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

আশ্চর্য এই যে, এখনও এদেশে আর এক আকারে এই অহেতুকী সর্বাবস্থায়, অবস্থা যাহাই হউক, প্রেমের পর্ব জোর চলিতেছে। কেহ তোমাকে কাপুরুষের মত ছুরি মারিলে তাহাকে প্রেম করিবে। তোমার বাড়ী লুঠ করিয়া আগুন দিলেও ঐ ব্যবস্থা। এক পয়সাও পাইবার অধিকার না থাকিলেও তাহাকে "কোরা চেক" লিখিয়া দিয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইবে। অবস্থা বিবেচনার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল প্রেম করিবে।

চৈতন্যের প্রেমপন্থে শ্রীকৃষ্ণের দারুণ রূপান্তর হইয়াছিল বলিয়াছি। বর্তমান প্রেমপন্থে আর এক ক্ষত্রিয় বীরের শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। যে দিন প্রথম "রামধুন" শুনি তখনই মনে হইল যে, এ সুর খুবই চেনা, কোথায় শুনিয়াছি? ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল। মনশ্চক্ষে একখানি ছবি ভাসিয়া উঠিল। রাস্তার ধারে ছিন্নবস্ত্র পরিহিত হিন্দীভাষী ভিক্ষুক প্রসারিত পাণি দক্ষিণ হইতে বামে ও বাম হইতে দক্ষিণে সঞ্চালিত করিয়া করুণ সুরে কম্পিত কণ্ঠে গাহিতেছে—"একঠো আধেলা দেলা দে

[illegible] যে রামকে স্মরণ করিলেই

মনে পড়ে, "রাঘবং রাবণারিম্" ; দুর্ধর্ষ, ত্রৈলোক্যবিজয়ী, দেবদানবগন্ধর্বাদির যমস্বরূপ, লোকরাবণ রাবণকে যে রাম যুদ্ধে সবংশে নিধন করিয়াছিলেন ; যিনি কটাক্ষমাত্রেই মদ-দৃপ্ত পরশুরামের দর্প ও তেজ হরণ করিয়াছিলেন, সে রামের সম্বন্ধে গানের সুর হইল "একঠো আধেলা দেলা দে রা—া—া—ম" ! যদি রামের নামে গান বাঁধ, ত এমন গান বাঁধ যাহার শব্দে ভূত প্রেত পালাইবে ও ভক্তজনের মনে অতুল সাহস আসিবে। আমাদের 'বন্দেমাতরম্' গর্জনের কথা মনে পড়ে। ঐ গর্জন শুনিলে আমাদের শত্রুদের মানসিক অবস্থা কি হইত এবং এখনও হয়, জানিতে বাকি নাই।

আর এই নব প্রেমপন্থ ও কাঁদুনী সুরে রামের গান কখন? যখন দেশের ও জাতির অবস্থা-সঙ্কট ; সূতিকাগারে নবজাত রাষ্ট্রকে বালগ্রহে ঘেরিয়াছে। যখন ইংরেজ অখণ্ড ভারতকে ৬০২ টুকরায় ভাগ করিয়া দিয়া মজা দেখিতেছে (অর্থাৎ ৬০০ "ষ্টেট", ইণ্ডিয়া ও ইংরেজের শেষ দাটি পাকিস্থান) ; যখন সবপ্রাণেন আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে ; যখন আমাদের সামান্য মাত্র দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শত্রু অতিরিক্ত সাহসে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে ; যখন নিজেকে শান্তিবাদী প্রচার করার একমাত্র ফল শত্রুর আক্রমণ আকর্ষণ করা, সেই সময়ে এই প্রেমপন্থ ও এই গান ? মনে পড়ে আমাদের "স্বাধীনতা" লাভের সময় বরাবর একখানা ইংরেজী কাগজ ঈষৎ চাপা উল্লাসের সহিত লিখিয়াছিল, "Henceforth it will not be our hands which will be dyed with Indian blood."

দেশের এই অবস্থার মত ব্যবস্থা হইতেছে কি ? বরং দেখিতেছি যে দেশে কিছুকাল ধরিয়া একটা অলক্ষণ দেখা দিয়াছে—"অর্থকরী রাজনীতি" অর্থাৎ যে রাজনীতির শরণ লইলে রাতারাতি ভিক্ষুক ক্রোরপতি ও অজ্ঞাতকুলশীল অভিজাত বনিয়া যায়। এই "অর্থকরী রাজনীতি" আর কিছুই নহে—প্রেমপন্থের দোহাই দিয়া বৈশ্য ও শূদ্রবৃত্তি। নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য দেশ ও জাতিকে বলি দেওয়া।

আজিকার অবস্থা দেখিয়া মনে পড়িতেছে যখন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় মনোবৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙালীর ছেলে প্রবল পরাক্রান্ত স চাকর-খিদ্‌মদ্‌গারে ইংরেজের সহিত অসমান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেশের মাটিতে প্রথম যে রক্ত পড়িল তাহা এই বিশুদ্ধ মনোবৃত্তিসম্পন্ন বাঙালীর ছেলের। তাহারা এই "অর্থকরী রাজনীতি"র ধার ধারিত না। তাহাদের রক্তে পঙ্কিল দেশের মাটি হইতে আওয়াজ উঠিতেছে—দেশের সঙ্কট-অবস্থা দেখ। এখন একমাত্র ব্যবস্থা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় মনোবৃত্তির আবাহন সমগ্র জাতিতে! এই ক্ষত্রিয় মনোবৃত্তিতে "আমি দীন, আমি হীন" বা "প্রেমের" স্থান নাই। দেশের পরিপন্থী যে ই হইবে তাহাকে নির্মমভাবে ধ্বংস করিতে হইবে। "অর্থকরী রাজনীতি" দূর করিয়া এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্যবস্থা কর।

তোমার সাধনা বজ্র-কঠোর হোক

শ্রীকমলরাণী মিত্র

তবু ঘোচে নাকো শঙ্কা ও সংশয়,
তিমির-রাত্রি বুঝি বা হ'ল না শেষ।
—তবু দিকে দিকে ধ্বনি উঠে জয় জয়
ভবিষ্যতের নিশ্চিত নির্দেশ ॥
চরম-লক্ষ্যে বাকী আছে আরো পথ,
আরো পথ-চলা আরো দৃঢ়তর পায়ে—
তবুও চলিছে ঘর্ঘর জয়রথ,
বিজয়-পতাকা গর্বে উড়িছে বায়ে!
মহা-ভারতের অমোঘ অভয় বাণী
নিখিল-বিশ্বে আলোকের বর্তিকা—
মুক্তি-তীর্থে পথিক অগ্রগামী
জ্বালো সে-আলোক লক্ষ দীপ্ত শিখা!
সাধনা তোমার বজ্র-কঠোর হোক
ত্যাগ-সত্যের স্বার্থবিহীন ব্রতে,
তোমার পুণ্যে পুণ্য পিতৃলোক
তৃপ্তি লভিবে সপ্ত-স্বর্গ হ'তে ॥
করজোড়ে করি আলোকের বন্দনা,
উদয়-শিখরে রাখিনু নমস্কার ;—
তবু সংশয় করিছে অন্যমনা—
এখনো বুঝি বা ঘোচে নি অন্ধকার!

প্রবাহ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

৪

পরদিন প্রত্যূষে।...

মৃন্ময় প্রাত্যহিক উষাভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া এই মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছে। দেশে ফিরিলে এটা তার নিত্যকর্ম্ম। অল্পক্ষণেই মুখ হাত পা ধুইয়া একখানা বই খুলিয়া বসিল। গত রাতটা তার একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। কালো বিড়ালটার জলজলে দুটো চোখ, রোগা বৌটার দাঁত-বাহির-করা হাসি বহুক্ষণ তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর কখন এক সময় যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তার নিজেরই হুঁস নাই। কিন্তু প্রত্যূষে ঘুম ভাঙিতে অতি সহজেই সে আবিষ্কার করিল যে, গত রাত্রের মনের উপরকার সে পাষাণভার আজ আর নাই।

যেমন হীরু নাপিত তেমন রাধু বোষ্টম। ভয় দেখাইতে কেহই কম যায় না। আর তেমনি তার মনের জোর। মৃন্ময় একলা একলাই খানিকটা হাসিল।

মা আসিয়া শুধাইলেন, তোর চা এখানে পাঠিয়ে দেব মিনু?

মৃন্ময় বলিল, দাও মা।

মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, চায়ের সঙ্গে কি খাবি? গোটা কয়েক মুড়ির মোয়া দেব? কাল করেছি।

মৃন্ময় কহিল, আপত্তি নেই মা, কিন্তু নারকেল কোরা দিতে ভুলো না যেন।

মা চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আহার্য্য ও চা টেবিলের উপর রাখিয়া গেলেন।

মৃন্ময় রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি"র পাতা উল্টাইতেছিল এবং মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেছিল। মঞ্জুষার আকস্মিক আগমনে বইখানা মুড়িয়া রাখিয়া স্মিতহাস্যে কহিল, এত সকালে তুমি?

মঞ্জুষা কহিল, চা খেতে এলাম। কিন্তু কাল তুমি গেলে না কেন মিনুদা?

মৃন্ময় বলিল, নানা কারণে হয়ে ওঠে নি। আজ যাব। একটু থামিয়া অকস্মাৎ প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হইল। কহিল, তোমাকেই যে এতক্ষণ মনে মনে চাইছিলাম এ কথাটা তুমি কাছে আসতেই আরও পরিষ্কার হয়ে গেল মঞ্জু।

বিস্মিত চোখে মৃন্ময়ের মুখের পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া মঞ্জুষা কহিল, তার মানে?

মৃন্ময় কহিল, রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠিখানা পড়ছিলাম।

মঞ্জুষা বলিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু তার সঙ্গে আমার আসার সম্পর্ক কি?

মৃন্ময় কহিল, এ সব বই একলা পড়ে আনন্দ পাওয়া যায় না মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, কিন্তু আমার এখনও চা খাওয়া হয় নি। তা ছাড়া ঐ সব জটিল তত্ত্ব আমি বুঝিনে, ভালও লাগে না। মঞ্জুষা আর অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। মৃন্ময় চেয়ারটা ঘুরাইয়া দুয়ারের দিকে মুখ করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল এবং খানিকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া অত্যন্ত বিরক্ত ভাবেই সে উঠিয়া পড়িল। মঞ্জুষার সাক্ষাৎ মিলিল ভাঁড়ার-ঘরে। মৃন্ময়ের মায়ের নিকট বসিয়া সে নির্ব্বিকার ভাবে কুটনা কুটিতেছে ও মাঝে মাঝে নিতান্ত অভিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছে।

মৃন্ময় দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইতেই মা কহিলেন, তোর আবার কি চাই মিনু?

অকস্মাৎ মৃন্ময়ের মুখ দিয়া বাহির হইল, আর দুটো মুড়ির মোয়া। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অন্য কথা পাড়িল, কিন্তু কাকে দিয়ে কি করাচ্ছ মা!

মা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের পানে চাহিলেন।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, অভ্যাসের গুণে হাতের আবখানা ও যদি নামিয়েই দেয় তখন কিন্তু দোষের বোঝা তোমার মাথায়ই পড়বে।

এ এক আচ্ছা পরিহাস বটে! মা হাসিয়া কহিলেন, তোর অন্য কোন কথা না থাকলে এখন যেতে পারিস। মোয়া আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মৃন্ময় আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না।

খানিক পরে মঞ্জুষা আসিয়া যখন মৃন্ময়ের ঘরে প্রবেশ করিল তখন সে চোখ বুজিয়া কি চিন্তা করিতেছে। মঞ্জুষার আগমন টের পায় নাই।

মঞ্জুষা কহিল, অতগুলো মোয়া পড়ে আছে আর মোয়ার নাম করে মিছিমিছি যা নয় তাই বলে এলে।

মৃন্ময় চোখ চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, মিথ্যা সকলের কাছেই পীড়াদায়ক মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, এ তোমার অন্যায় রাগ মিনুদা। যা সত্যিই আমি বুঝি না, তা কেমন করে তুমি আমায় জোর করে ভাল লাগাবে। তোমার নান্টুদার কবিতা শোনাতে চাইলে ত কখনো ভাল না লাগার দোহাই দিয়ে আমি পালিয়ে যাই না।

যে যেমন লোক তার ভাল লাগাটাও ঠিক তেমনি হয়ে থাকে। এ সোজা কথাটা যদি না বোঝ তবে আমি কি করি।

মৃন্ময় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, তোমায় বলতে ভুলেছি, কাল নান্তুর চিঠি পেয়েছি।

মঞ্জুষা কহিল, এই প্রায় চার বছর সে নিরুদ্দেশ হয়েছে আর এত দিন পরে তার মনে পড়ল! কোথায় আছে সে? লিখেছে কি?

মৃন্ময় কহিল, জানি না। ঠিকানা দেয় নি। লিখেছে, প্রয়োজনমত জানাবে, কিন্তু কভারে ছাপ দেখলুম এক পাহাড়িয়া অঞ্চলের। ওখানে নাকি সে বেশ আছে। স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন ওর গতি। তার অবারিত চিন্তার পথে কেউ বাধার সৃষ্টি করে না। ওখানে কোন এক ধনী পাহাড়িয়া মেয়েকে নান্তু বাংলা শেখায়। ওর প্রয়োজনের অতিরিক্ত তারাই দিয়ে থাকে।

মঞ্জুষা কহিল, নান্তুদার বাড়ীতে এ খবর দিয়েছ?

মৃন্ময় কহিল, না। নান্তুর খবর গোপন রাখতে সে বিশেষ করে আমায় অনুরোধ করেছে। ওর খোঁজ করতে গেলে লাভ কিছু হবে না। মাঝে থেকে তাকে আবার নূতন পথের সন্ধানে বেরুতে হবে। ঘরকে সে নাকি ছাড়বার জন্যেই ছেড়েছে, ফেরবার জন্যে নয়। ওখানে সে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। জায়গাটাও চমৎকার।

মঞ্জুষা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের কথা কিছু লেখে নি?

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, লিখেছে বৈ কি। তোমার কথা নিয়ে প্রায় পাতাখানেক ভরিয়ে ফেলেছে। লিখেছে—মঞ্জু এখন কত বড়টি হয়েছে। আগের মত এখনও ময়ূর, খরগোস আর ডল নিয়ে মেতে থাকে কিনা? তেমনি করে কথায় কথায় তোর ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে কিনা। দুষ্টুমি করলে কান মলে দিই কিনা…

মঞ্জু হাসিয়া ফেলিল, কহিল, সব কথা মনে আছে ত বেশ!

মৃন্ময় পুনশ্চ কহিল, লিখেছে, এখানে সকলে আমায় মাথায় করে রেখেছে। এতটা আমার ভাল লাগে না। এর চেয়ে মঞ্জুর মত একটি মেয়ের প্রয়োজন আমার বেশী, যে কথায় কথায় অভিমান করে কথা বন্ধ করতে পারে…রাগ করে কিল চড় দিতেও যার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। এমনি একটি সহজ সঙ্কোচহীন মেয়েকে যদি পেতাম তা হলে দিনগুলি আমার আরও মধুর হয়ে উঠত।

মৃন্ময় থামিল। একটু হাসিয়া কহিল, পাগল আর কাকে বলে। ওর ধারণা তুমি এখনও ঠিক তেমনিই আছ। তেমনি সহজ আর তেমনি সরল। বয়োধর্ম্মকে পর্য্যন্ত নান্তু ভুলতে বসেছে। ও সব দিক দিয়েই কবি হয়ে উঠেছে। সে যাই হোক নান্তু কিন্তু মঞ্জুকে খুব ভালবাসে। মঞ্জু তার প্রবাস-বাসের একটা সচেতন চিহ্ন।

মঞ্জুষা রাগ করিয়া কহিল, এ সব তোমার গায়ের জোরের কথা। অন্যায় কথা অসঙ্গত কথা।

মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখে কহিল, মঞ্জু রাগ করেছ। কিন্তু সত্যিই এতে বিরক্ত হবার কিছু নেই। একটু ভেবে দেখলে তুমিও একথা বুঝতে পারবে। নান্তু-বর্ণিত মঞ্জুষা মৃন্ময়ের ঘাড়ে চড়ে। প্রয়োজনমত কিল-চড় দেয়—দিনের মধ্যে পাঁচ বার আড়ি করে, সাত বার ভাব করে। তাকে ভালবাসা মানে নিতান্তই স্নেহ করা। বয়সের তফাতেই ওর রূপ আলাদা হয়—এ সাধারণ কথাটাও তুমি বুঝবে না এ আমি কেমন করে জানব।

মঞ্জুষা তথাপি নীরব।

মৃন্ময় পুনরায় একটু ঠাট্টার ভঙ্গিতে কহিল, তোমাকে দোষ দেব না, কারণ তোমার আসল ব্যাধি কোথায় সে আমি জানি।

মঞ্জুষা কহিল, ডাক্তারী বিদ্যেটাও আয়ত্ত করেছ দেখছি, কিন্তু আমার যতদূর বিশ্বাস এখনো শিক্ষানবিশী চলছে। তাই বলছিলাম যে, রোগনির্ণয়ের আগে দু'এক জন অভিজ্ঞের সাহায্য নিয়ো, তাতে হয়তো অনেকের যন্ত্রণার লাঘব হবে।

মৃন্ময় হাসিমুখে উত্তর দিল, কিন্তু যে ইচ্ছে করে কেউটে সাপের মুখে হাত ঠেকিয়ে যন্ত্রণাকে ডেকে আনে তার জন্যে কোন বিধি-ব্যবস্থাই চলে না। না হাতুড়ের না অভিজ্ঞের।

মঞ্জুষা হাসিয়া ফেলিল। মৃন্ময়ের কানের কাছে মুখ আনিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, ইচ্ছে করে কেউ কেউটে সাপের মুখে হাত দিতে যায় না মিনুদা, যদি না এর পেছনে বড় কোন আকাঙ্ক্ষা লুকানো থাকে। মঞ্জুষা ক্ষণিকের জন্য থামিয়া পুনরায় কহিল, সেপ্‌টিক হবার কোন আশঙ্কা নেই জেনেও যারা কাটা-ঘায়ে টিংচার আইডিন লাগায়, তারা অত্যধিক হুঁসিয়ার হলেও যার প্রয়োগ করা হয় তার কাছে তা যন্ত্রণাদায়ক হয় যে মিনুদা।

মৃন্ময় কহিল, সামান্য একটু কাঁটার আঁচড়ে যারা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় তাদের সম্বন্ধে তুমি কি বিধান দেবে মঞ্জু?

মঞ্জুষা রাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আমি জানি না।…সে প্রস্থানোদ্যত হইতেই মৃন্ময় তাহাকে বাধা দিল, কহিল, যেয়ো না মঞ্জু, দরকার আছে।

মঞ্জুষা থামিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মৃন্ময়ের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। মৃন্ময় নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া আছে। মঞ্জুষা দুখানি হাত আলগোছে তার দুই কাঁধের উপর রাখিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, কি—ডাকলে কেন?

মৃন্ময় তথাপি নীরব।

মঞ্জুষা আরও একটু ঘন হইয়া দাঁড়াইল। মৃদু কণ্ঠে কহিল, কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? চলে যাব নাকি? চোখ দুটি ওর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কপালে ফুটিয়া

মৃন্ময় তার কাঁধের উপরে ন্যস্ত মঞ্জুর দুখানি হাতে ঈষৎ চাপ দিয়া কহিল, দুটো মোয়া খেয়ে যাও মঞ্জু।

মঞ্জুষা সহসা তার হাত টানিয়া লইয়া কহিল, না…আমি যাই। সে দ্রুত প্রস্থান করিল।

মৃন্ময় কতকটা বিস্মিত এবং বিহ্বল দৃষ্টিতে মঞ্জুষার দ্রুত অপস্রিয়মাণ মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিল।

৫

এই ঘটনার দিন কয়েক পরে মঞ্জুষার সাক্ষাৎ মিলিল মৃন্ময়ের শয়নকক্ষে। মৃন্ময় তখন ঘরে ছিল না। শয্যার উপর খানকয়েক বই ইতস্ততঃ ছড়ান ছিল। মূর্ত্তিমান বিশৃঙ্খলা। মঞ্জুষা আপন মনে গজ গজ করিতেছিল, মিনু-দা যেন কি! এর মধ্যে আবার মানুষ থাকতে পারে। যত বাবুয়ানা জামা-কাপড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জুষার হাত দুখানিও সক্রিয় হইয়া উঠিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বইগুলি টেবিলের উপর তুলিয়া রাখিতে গিয়া সে আবিষ্কার করিল নান্টুর একখানি সুদীর্ঘ পত্র। মঞ্জুষার মন কুতূহলী হইয়া উঠিল। এই চিঠি লইয়াই মৃন্ময় সেদিন কত না আজেবাজে বকিয়াছিল! তা ছাড়া নান্টুর খাপছাড়া জীবনযাত্রাকে মঞ্জুষা খানিকটা যেন করুণার চোখে দেখে।

নান্টু লিখিয়াছে—অনেক দিনের একটা পুরনো কথা আজ বার বার মনে পড়ছে। খুব ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছি। বাল্যকালটা হয়তো সেইজন্যই খুব আদরে কেটেছে। লোকে বলত—অভাগা। যাদের মা আছে সেই সব ছেলের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে গিয়ে মনে মনে হেসেছি, আর যারা আমায় কৃপার চক্ষে দেখেছে তাদের বলেছি নির্ব্বোধ। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে তারা মিথ্যে বলত না। মার স্নেহের কোল যদি আজ আমার অপেক্ষায় খালি থাকত কি সাধ্য ছিল আমার এমনি করে ভেসে বেড়াবার। তুমি হয়তো এক্ষুনি প্রতিবাদ করে বসবে, বলবে আমার দাদার কথা, আমার বৌদির কথা যাঁরা আজও আমায় স্নেহ করেন। করেন না এমন কথা আমি বলছিনে; কিন্তু সাংসারিক অভাব-অনটনের চাপে তাদের স্নেহের রূপ বদলে গেছে। তাদের প্রীতি আজ আমার উপার্জ্জিত অর্থের প্রয়োজনে স্বভাববর্দ্ধকে ভুলেছে। আমি খামখেয়ালী—উপার্জ্জনের প্রতি কোন দিনই আমার তেমন আগ্রহ নেই, কিন্তু অভাবের সংসার সে কথা শুনবে কেন। সে তার অসংখ্য দাবি নিয়ে আমার পিছনে তাড়া করছিল। কিন্তু আমাকে যে নিজের মত করে বাঁচতে হবে তাই গৃহত্যাগ করেছি। তার পর সুরু হ'ল নিজেকে নিয়ে ভেসে বেড়ান। দীর্ঘ চার বৎসরের ঘোরাফেরার পর স্থির হয়ে দাঁড়াবার একটা আশ্রয় পেতেই সর্ব্বপ্রথম তোমার কথা মনে পড়ল। ভেবে-ছিলাম আর হয়তো উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে হবে না, কিন্তু জীবনের সূচনায় যে দুর্ভাগা জীবনসংগ্রামে হেরে গেছে তার ভবিষ্যৎ সাধারণতঃ একটু অন্ধকারই হয়ে থাকে। আমিও তার থেকে বাদ পড়ি নি।

তুমি হেসো না মিনু। এ আমার ভাবপ্রবণতা নয়। জীবনের একটি অতি সত্য অনুভূতির কথা তোমাকে জানাচ্ছি। আমি বড় আঘাত পেয়েছি, যার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তাই এর আকস্মিকতা আমায় পাগল ক'রে তুলেছে। আমি কবিতা লিখি। মেয়েপুরুষের মনের বহু অলি-গলির সন্ধান আমার জানা এমনি একটা অকারণ দম্ভ আমার মধ্যে ছিল। আমার নির্ব্বোধ অহঙ্কারই আমার সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছে। আমি হেরে গেছি এক সহজ সরল পাহাড়ী মেয়ের কাছে।

চন্দনাকে আমি বাংলা পড়াতাম। মেয়েটির চালচলন, কথাবার্ত্তা সব কিছুর মধ্যেই একটা সুষ্ঠু ভাব ছিল। আঁটসাঁট বলিষ্ঠ গড়ন। তার পরিপূর্ণ যৌবন কোথাও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়, আপন মহিমায় তা সুপ্রকাশ। চোখে বিলোল কটাক্ষ নেই, রুদ্রমধুর ভাবে তা উজ্জ্বল। জ্বালা নেই, আছে দ্যুতি। চন্দনাকে আমার বড় ভাল লেগেছিল।

ওকে দূর থেকে দেখতে ভাল লাগে, কাছে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা করতে বুক কাঁপে। অথচ অনাবশ্যক রূঢ়তা না আছে তার কোন কাজে, না কথায়।

এই বিচার-বুদ্ধি যদি প্রথম থেকেই আমার থাকত, হয়ত আজ আবার আমাকে নতুন করে অজানার পথে পা বাড়াতে হ'ত না। কিন্তু আমার লোভী মন আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। চন্দনার অকপটতা আমার ভাবপ্রবণ মনকে উদ্বেলিত করেছে।

দুর্ব্বল মন যখন এমনি এক সন্ধিক্ষণে দোলায়মান, চন্দনার সাগ্রহ আহ্বান এল। তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। পাহাড়িয়া নদী মূর্ত্তিমতীর তীরে এসে দু'জনে উপস্থিত হলাম। এমন ত আরও কত দিন এসেছি, কিন্তু আজকের দিনের বিভ্রান্তি আমার জীবনকে তিক্ত করে দিয়েছে। একখানা বড় পাথরের উপরে দু'জনে পাশাপাশি বসেছি। পাড়াগাঁর গল্পে ওকে মাতিয়ে তুলেছি। কখনও বিস্ময়ে বড় বড় চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে, কখনও হেসে গড়িয়ে পরে। আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই।

চন্দনা প্রশ্ন করে, মাষ্টার বাবু তুমি দেশে যাও না কেন?

কি উত্তর দেব। বলি, দেশে আমার কেউ নেই। আমি একেবারে একা।

অনুকম্পায় চন্দনার চোখ দুটি ছল ছল করে ওঠে। জিজ্ঞেস করলে, তুমি বিয়ে করবে না মাষ্টারবাবু?

হেসে জবাব দিলাম, না। আমার প্রয়োজন নেই।

চন্দনা কথা বললে না, মুখ নত করলে।

দু'হাতে তার মুখ তুলে ধরলাম, চোখে তার জল।

অবাক হয়ে গেলাম, এবং সেই মুহূর্তে নিজেকে বড় বেশী দুর্ব্বল বলে মনে হ'ল। বুকের মধ্যে উষ্ণ রক্তস্রোত উদ্দাম হয়ে উঠেছে। আমি ভুল করলাম।

চন্দনার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল, কিন্তু কথায় তার প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ পেল না। শান্ত মৃদুকণ্ঠে সে বললে, 'মাষ্টারবাবু, তুমি দেশে চলে যাও। আমি তোমায়…' তাকে বাধা দিলাম, আমি ভুল করেছি চন্দনা।

চন্দনা যে কত কঠিন তা এবারে বোঝা গেল। সে বিকৃত কণ্ঠে বললে, ভুল তুমি কর নি—আর সেইজন্যেই তোমাকে যেতে হবে। আমার কথার অবাধ্য হয়ো না। তা হলে নিজের আরও ঢের বেশী অনিষ্ট তুমি করবে।

আমি পুনরায় একটা কৈফিয়ৎ দেবার জন্য প্রস্তুত হতেই চন্দনা আমায় থামিয়ে দিয়ে, তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বললে, তোমার দোষ কি মাষ্টারবাবু—বোনের স্নেহ ত কোন দিন পাও নি…

আমারই শেখান কথা আজ আমার উপর প্রয়োগ করেছে।

চন্দনার বাবার কাছে আমি চির বিদায় প্রার্থনা করেছি, কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করতে চান নি। চন্দনা বলে, বাংলা ভাষার উপর সে শ্রদ্ধা হারিয়েছে। যেটুকু আয়ত্ত করেছে তাও সে ভুলে যেতে চেষ্টা করবে।

নিজেকে পুনরায় ধিক্কার দিলাম। এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে। এখানে আর এক মুহূর্ত্ত থাকবার ইচ্ছা নেই। আগামী কাল কোথায় থাকব তা জানি না।

ইতি— নান্টু

মঞ্জুষা বার বার চিঠিখানা আগাগোড়া পড়িল। মনে মনে নান্টুকে অনুযোগ দিল। ছি ছি নান্টুদা এমন চঞ্চলমতি। আর চন্দনা…কি জানি কেমন মেয়ে সে !…

মৃন্ময় ইতিমধ্যে বারকয়েক ঘরের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া গিয়াছে। মঞ্জুষা তাহা টের পায় নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়া কথাটা সে মঞ্জুকে জানাইয়া দিল।

মঞ্জুষা হাসিয়া কহিল, সত্যিই বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। নান্টুদার চিঠিটা পড়ছিলাম। নান্টুদা যেন কি! একটা উচিত অনুচিত জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই।

মৃন্ময় কহিল, উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন এখানে না তোলাই ভাল। মানুষের মনের বিচিত্র গতি কখন যে কোন্ পথ অনুসরণ করতে চায় তা বোঝা বড় শক্ত ব্যাপার। তোমার দাদার বিষয় নিয়েও এতক্ষণ এই সব কথাই হচ্ছিল।

মঞ্জুষা কহিল, আমাদের বাড়ী থেকেই আসছ বুঝি?

মঞ্জুষা কহিল, দাদার সম্বন্ধে মার সঙ্গে বুঝি আলোচনা হচ্ছিল?

মৃন্ময় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হুঁ…তিনি কি বলেন জান? ছেলের অন্যায়কে তিনি অস্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁর মতে তাকে ত্যাগ করা কিছুতেই উচিত হয় নি।

মঞ্জুষা কহিল, কিন্তু তাকে পুরোপুরি ত্যাগ বাবা ত করেন নি। মাসে মাসে পাঁচ শ' করে তা হলে দিয়ে যাচ্ছেন কিসের জন্য। অথচ মা কিছুতেই বুঝবেন না। অনেক চেষ্টা করেও বোঝাতে পারি নি।

মৃন্ময় কহিল, আমিও পারি নি। ঠিক এই কারণেই তোমার বার বার বলা সত্ত্বেও এতদিন যাই নি। তিনি বলেন তোমার দাদার পাওনা মাত্র পাঁচ শ' টাকায় শেষ হয়ে যায় না। উপরন্তু তিনি যেন বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে আমায় উদ্দেশ করে বললেন যে, সবাই মিলে আমরা তোমার দাদার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছি। এই ভয়ই আমার সবচেয়ে বেশী ছিল মঞ্জু।

মঞ্জুষা মৃদুকণ্ঠে কহিল, মার কথায় তুমি দুঃখিত হয়ো না মিনুদা। নইলে বাবাকেও মা বুঝবার চেষ্টা করেন না। আমার মুখে হয়ত এসব কথা ঠিক শোভন হচ্ছে না। তবুও না ব'লে পারছি না যে, বাবা, আমার বাবা বলেই আজও দাদার কথা তিনি ভাবছেন। সকলেই বাবার নির্লিপ্ত ভাবটা লক্ষ্য করে, কেউ তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে না। আমার মা পর্য্যন্ত না। আর এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক। মা বলেন, মায়াদয়া বাবার শরীরে নেই। আচ্ছা মিনুদা, দুঃখ প্রকাশের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কি খালি চোখের জল ফেলা? যে আঘাত দিনে দিনে একটা লোকের স্বভাব পর্য্যন্ত বদলে দিয়েছে তা লোকের চোখে পড়ে না কেন?

মঞ্জুষা থামিল। তার দুই চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল।

মৃন্ময় নিঃশব্দে বসিয়া আছে।

মঞ্জুষা পুনরায় কহিল, বাবার মুখের পানে তাকাতে আমার ভয় করে মিনুদা। মার কাছে গেলে উঠি হাঁপিয়ে। তাই যখন তখন তোমার কাছে ছুটে আসি। বাড়ীর আবহাওয়া আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।

মৃন্ময় এতক্ষণে পুনরায় কথা কহিল, তোমার মাকে দোষ দেওয়া বৃথা। সব মা-ই ঠিক এই কথা বলতেন। তর্কবিচার নেই, কোন বিধান নেই, এমনি যুক্তিহীন তাদের দুর্ব্বলতা—মেয়েদের মাতৃত্ব। অথচ এই নিয়েই তাদের গর্ব্বের অন্ত নেই।

মঞ্জুষা স্থির দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার চোখে মুখে কেমন এক প্রকারের বিস্ময়। তার এই

কোন ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ্য করে একথা আমি বলি নি। নইলে কে না জানে যে, পৃথিবীতে মানুষ বলে পরিচয় দিতে গেলে মেয়েদের আঁচল ধরেই সকলকে উঠে দাঁড়াতে হয়। ওদের বুকের কোমল, বৃত্তিগুলিই আমাদের বেঁচে থাকবার শ্রেষ্ঠ উপকরণ।

মঞ্জুষা একটু হাসিয়া কহিল, যদি তোমার কথাই সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় তা হলেও কি মেয়েদের গর্ব্ব করবার মত কিছু নেই মিনুদা। যে দুর্ব্বলতা মানুষ সৃষ্টি করে তা কি এতই উপেক্ষার বস্তু? কিন্তু তর্ক থাক। অনেকক্ষণ এসেছি এখন যাই।

মৃন্ময় কহিল, আর একটু বসবে না?

মঞ্জুষা কহিল, না। আর একদিন তোমার কথা রাখব।

মৃন্ময় কহিল, যে কাজে হাত দিয়েছিলে তাও কি শেষ না করেই যাবে? না সেটাও আর এক দিনের জন্যে মুলতুবী থাকবে।

মঞ্জুষার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, কহিল, আজকের জন্যে না হয় একটু স্বাবলম্বী হলে। সময়ের খেয়াল ছিল না। তুমি রাগ করো না মিনু-দা—একটু থামিয়া মঞ্জু পুনরায় কহিল।

মৃন্ময় হাসিমুখে কহিল, রাগ করব কেন। তা ছাড়া সব অবস্থার সঙ্গেই আমি মানিয়ে চলতে পারি। কিছু অসুবিধে হয় না।

মঞ্জুষা কহিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। মঞ্জুষা ক্ষণকাল পরে পুনরায় কহিল, তোমার কলকাতা যাবার দিন ত প্রায় ঘনিয়ে এল। বিকেলে একবার যেয়ো। সত্যি নিজেকে বড় একলা মনে হয়।

মৃন্ময় প্রতিশ্রুতি দেয়। মঞ্জুষা প্রস্থান করে।

ইহারই দিন কয়েক পরে মৃন্ময় গ্রাম ত্যাগ করিল।

৬

প্রায় দেড় বছর পরে।

এই দীর্ঘ সময়টা মৃন্ময়ের এক প্রকার ভালই কাটিয়াছে। ইতিমধ্যে বারতিনেক সে গ্রামে গিয়াছে। গ্রামের সে দিন আর নাই। ও তরফের বড়বাবুর বিরাট কারখানা এ তরফের বহু ক্ষয়ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাড়ি, বাগ্‌দী ও নমঃশূদ্রপাড়ার জোয়ান পুরুষরা বড়বাবুর জয়গানে গ্রামকে সরগরম করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু তাদের গৃহলক্ষ্মীরা দিবারাত্র অভিশাপ দিয়া চলিয়াছে। বড়বাবুর কারখানা পয়সা দেয় ভাল। তিনি সজ্জন ব্যক্তি। জনমজুরদের সুখ-সুবিধার প্রতি তাঁর প্রখর দৃষ্টি। কারখানার সঙ্গে তিনি শরাবখানা খুলিয়াছেন। মজুরদের সপ্তাহান্তে বেতনের বার আনা কারখানায়ই দিয়া আসিতে হয়। গৃহলক্ষ্মীদের অভিশাপ বোধ করি সেইজন্যই। শান্তি গিয়াছে, অভাব বাড়িয়াছে খবরগুলি মঞ্জুষার চিঠিতে মৃন্ময় জানিয়াছে এবং গত বা দেশে গিয়াও নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। গ্রামকে মৃন্ম ভালবাসে। বিশেষ করিয়া এই শ্রেণীর জীবন্ত মানুষ-গুলিকে, যারা গ্রামের হৃৎস্পন্দনস্বরূপ, প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য শত অভাব, শত অনটনের মধ্যেও যারা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া লড়াই করিতে পারিত আজ তাহারা কারখানার শ্রমিক—শরাবখানার দাস। ভাবিতেও মৃন্ময় ব্যথিত হয় ইচ্ছা হয় উহাদের মধ্যে ছুটিয়া যায়। ওদের বর্ত্তমান জীবনের কদর্য্য দিকটা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, কিন্তু সময় কোথায়। আর কয়েকটা মাসের ব্যবধানে তার হাতে পর্য্যাপ্ত সময় দেখা দিবে। তখন—

রুদ্ধ জানালাটা সশব্দে খুলিয়া যাইতে মৃন্ময়ের চিন্তাধারায় বাধা পড়িল। বাহিরে বেগে বাতাস বহিতেছে। দুর্য্যোগ-দিন। আকাশে স্তবকে স্তবকে সাদা মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে —কোথাও কালো মেঘের জমাট স্তূপ। হোষ্টেলের ছেলেরা অনেকক্ষণ হইল দল বাঁধিয়া সহরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে বাহির হইয়াছে। এত জল নাকি দশ বৎসরের মধ্যে হয় নাই। মৃন্ময় কতকটা দলছাড়া। কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খল মাতা-মাতির মধ্যে সে নাই। নিজের পড়াশুনা লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু আজিকার এই বর্ষণক্লান্ত আকাশ উন্মত্ত প্রকৃতি তাহাকে আনমনা করিয়া তুলিয়াছে। মনে পড়িতেছে মঞ্জুষাকে, গ্রামকে আর তার অসহায় সন্তানদের। সেই সঙ্গে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে তার বহু সহপাঠী। বি-এ পরীক্ষার পর তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। বিমান ফেল করিয়াছে। অশোক কোন রকমে তরাইয়া গিয়াছে। নিতান্ত সাদাসিধা ছেলে সুশীল গিয়াছে বিলাত। অঙ্কশাস্ত্রে ক্লাসের মধ্যে যে ছিল সকলের চেয়ে কাঁচা, সে গিয়াছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে। আর সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, দুলাল গিয়াছে ডাক্তারি পড়িতে। অথচ দিনে দুপুরে ভূতের ভয়ে সে কাঁপিত। ডিসেকসন ক্লাসে জ্ঞান না হারাইলে রক্ষা!

মৃন্ময়ের চিন্তার সূত্র পুনরায় ছিঁড়িয়া গেল। শ্রীমান দেবল আসিয়াছে। দেবল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, আপনি গেলেন না মৃন্ময়বাবু—আজকের বেড়ানটা সত্যই উপভোগ্য হয়েছে।

মৃন্ময় একটু হাসিল। জবাব দিল না।

দেবল কহিল, আপনি হাসছেন! কিন্তু জীবনে এও এক চমৎকার রোমান্স। আমাদের বাঙালী জীবন এমন একঘেয়ে এবং বেসুরো যে···

মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখে কহিল, আপনার বক্তৃতা সেদিন ইউনিভারসিটি ইনষ্টিট্যুটে শুনেছি, চমৎকার বলেন আপনি।

দেবল বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, এই এক আপনার মত

দোষ। নিজে পছন্দ করেন না বলে আর কাউকে তা আলোচনা করতেও দেবেন না। সে চলিয়া গেল।

এদের এই হৈ চৈ মৃন্ময়ের আজ ভাল লাগিতেছিল না। নির্জ্জনে চিন্তায় সময় কাটাইতে পারিলেই ভাল হয়। কিছু দিন যাবৎ প্রতিনিয়তই সে ভাবিতেছে। মঞ্জুষার মার অবস্থা নাকি মোটেই ভাল নয়। যে-কোন মুহূর্ত্তে একটা কিছু ঘটিয়া যাইতে পারে। ফলে মঞ্জুষার সহিত বিবাহ ব্যাপারটা অনতিবিলম্বে চুকাইয়া ফেলিতে উভয় পক্ষ হইতে তাগিদ আসিয়াছে। মঞ্জুষাকে বিবাহ—কথাটা যে আজ নূতন করিয়া সে ভাবিতেছে তা নয়। মৃন্ময়ের অন্তরের অনেকখানি জুড়িয়া সে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এম্-এ পাস না করিয়া সে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। এ কথাটা সে পরিষ্কার করিয়াই তার বাপমাকে জানাইয়া দিয়াছে।

মঞ্জুষার নিকট মৃন্ময়কে নিয়মিত চিঠি দিতে হয়। মঞ্জু বেপরোয়া। সঙ্কোচের ধার ধারে না। চিঠির উত্তর দিতে বিলম্ব হইলে নানা অনুযোগ এবং লম্বা লম্বা উপদেশ বর্ষিত হয়। মৃন্ময়ের হাসি পায়। আমোদ লাগে। মঞ্জুষা তার গোপন চিন্তায় দেখা দেয়—দেখা দেয় মৃন্ময়ের মনের নিভৃতে। মুখে তার নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ করে না। তার আশেপাশের সকলকেই সে জানে। মঞ্জুষার চিত্তবৃত্তিকে টানিয়া ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া সকলে বিচার করিতে বসিবে একথা ভাবিতেও নিদারুণ বিতৃষ্ণায় মৃন্ময়ের মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। কথায় কথায় মঞ্জুষাকে লইয়া উহারা বিদ্রূপ করিবে, তার সারল্যকে ছলনা অথবা বাড়াবাড়ি বলিয়া উপহাস করিবে, কিংবা মুখে মুখে তার কথা আলোচিত হইবে এ যেন নিতান্তই একটা সস্তা নাটকীয় ব্যাপার। স্নেহের পাত্রীকে সাধারণের চোখের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া যাহারা বাহাদুরি নেয় মৃন্ময় সে শ্রেণীর নয়।

দেবল আসিয়া পুনরায় দেখা দিল, কহিল, বলতে ভুলে-ছিলাম—মাপ করবেন।

মৃন্ময় বিস্মিত চোখে দেবলের মুখের প্রতি চাহিল।

দেবল কহিল, আপনার বড়লোক বন্ধু সুনির্ম্মল বাবু এসে ফিরে গেছেন।

মৃন্ময় কহিল, কিন্তু আমি ত সারাদিন কোথাও বেরুই নি।

দেবল কহিল, সে খবর আমার রাখবার কথা নয়। মোটের উপর তিনি এসেছিলেন এবং এই চিঠিখানা আপনাকে দেবার জন্য রেখে গেছেন। দেবল হাত বাড়াইয়া চিঠিখানি মৃন্ময়কে দিল।

মৃন্ময় আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল। দেবল বিনা বাক্যব্যয়ে মৃন্ময়ের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার চিঠিখানার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল, আছেন বেশ। আমাদের দুর্ভাগ্য তাই কোন বড়লোক বন্ধু নেই। দেবল প্রস্থান করিল।

সুনির্ম্মলের বাড়ীতে হঠাৎ এমন কি উৎসব দেখা দিল যার জন্য এই সাদর আহ্বান! কিঞ্চিদধিক দেড় বৎসরের কলিকাতা বাসকালে তাহাকে বহু বার সুনির্ম্মলের বাড়ী যাইতে হইয়াছে যদিও সে তার গতিবিধি বহির্বাটী পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল। স্বেচ্ছায় কোন দিন সে কারুর বাড়ী যায় নাই। সুনির্ম্মলের বাড়ীতেও নয়। অতীতেও সে ডাকিয়াছে, আজও আমন্ত্রণ জানাইয়াছে। কিন্তু দুইয়ে তফাৎ অনেক। এ আহ্বান যুক্তি-বিচার দ্বারা এড়ান যাইবে না। দেখা না করিয়া চিঠি রাখিয়া যাওয়ার ইহা ছাড়া আর কি কারণ থাকিতে পারে। বড় লোকের একমাত্র ছেলে। সবই ওর কেমন খাপ-ছাড়া। মৃন্ময়ের সহিত কোথাও ওর এতটুকু মিল নাই। তথাপি সে তাহাকে এড়াইতে পারে না। পরীক্ষার ওজুহাতে এবারে পূজায় বাড়ী যাওয়া পর্য্যন্ত বাতিল করিয়া দিয়াছে। মাতার সকরুণ আহ্বান, মঞ্জুষার স্পষ্ট মিনতি সে খণ্ডন করিয়াছে। মঞ্জুষা ত সেই হইতে চিঠি লেখাও বন্ধ করিয়াছে। অথচ সুনির্ম্মল আসিয়া সেই মহামূল্য সময়ের উপর যখন তখন ভাগ বসাইতেছে। তাড়াইলেও যাইবে না। কটূক্তি করিলে মুখ টিপিয়া হাসে। ইহাকে লইয়া সে কি করিতে পারে।

খাবার তাগিদ আসিয়াছে। মৃন্ময়কে উঠিতে হইল।

ক্রমশঃ

চৈতন্য-লীলা [শ্রীঅমূল্যগোপাল সেন
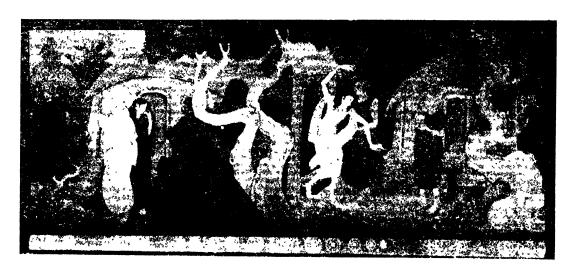
বাংলার চিত্রশিল্প ও কয়েকজন শিল্পী

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রশিল্প নিয়ে আলোচনা যতটা দরকার, বাংলাদেশে ততটা হয় না। অথচ প্রতিভার ছাপ যাদের ছবিতে রয়েছে তাঁদের ছবি নিয়ে আলোচনা হলে তাঁরা যে উৎসাহিত হন তাতে সন্দেহ নেই। সমঝদার ব্যক্তির উৎসাহে শিল্পীর মনে ভাল ছবি আঁকার স্পৃহা বাড়ে, অনুপ্রেরণা আসে—নইলে অবসন্ন মনে কর্ম্মের প্রেরণা জাগে না—মনের সৃষ্টিপ্রেরণার উৎস ক্রমশঃ শুকিয়ে আসে। সাধারণতঃ খ্যাতিমান শিল্পীদের বা তাঁদের চিত্রকলার আলোচনা অপ্রচুর হয়, কিন্তু যাঁদের খ্যাতি কম তাঁদের ভাল চিত্রেরও আলোচনা আমাদের দেশে বড় একটা হয় না। বর্ত্তমান যুগকে অতিপ্রচারের যুগ বলা যেতে পারে। মুদ্রাযন্ত্রের সুলভ-প্রচার, দৈনিক ও মাসিক কাগজে বিজ্ঞাপনের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও বাংলার চিত্র-শিল্পীর প্রতিভার উপযুক্ত সমাদর হচ্ছে না। দোষ হয়ত দেশের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির যাতে শিল্পকলার উপযুক্ত মর্য্যাদা নেই। তাই কলা-শিল্পের প্রতি অনুরাগ দেশের লোকের মনে ব্যাপকভাবে আজও জাগে নি। ওদিকে, ভাল ছবি এঁকে সচ্ছলভাবে জীবিকার সংস্থান করা অধিকাংশ চিত্রকরের পক্ষে সুকঠিন। অর্থনৈতিক দুরবস্থার চাপে আর উৎসাহের অভাবে অনেক শিল্পীরই ছবি আঁকার স্বাভাবিক প্রবণতা ও শক্তি ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ কলিকাতার বড় বড় চিত্রপ্রদর্শনীতে ভাল ছবির সংখ্যা কম দেখা যাচ্ছে, ভাল ছবি বিক্রীর পরিমাণও কমে যাচ্ছে, ছবির যথাযোগ্য বিচারও হচ্ছে না। বহু পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি সৃষ্টি হিসাবে সার্থক কিনা, সে বিষয়েও রসজ্ঞ ব্যক্তিদের সন্দেহ রয়েছে।

বাংলার চিত্রকলার খ্যাতি শুধুমাত্র ভারতে নয় পাশ্চাত্যের বহু দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। ভারত-শিল্পে

রবীন্দ্রনাথ [শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাউল [শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এই প্রচার ও প্রসারের মূলে রয়েছে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা। অবনীন্দ্রনাথ তো শুধুমাত্র স্রষ্টা নন, শিল্পীর মনে রূপসাধনার উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে কি করে তাকে সার্থক সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত করতে হয় সে দিক দিয়েও তিনি অদ্বিতীয়। ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর মানসিক স্বাতন্ত্র্যের গতি অনুধাবন করে, তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে তিনি তাদের হাতে-কলমে শিক্ষাদান করেছেন। তাঁরই নির্দ্ধারিত পথ অনুসরণ করে বাংলার চিত্রকলা বিশ্বে বিশিষ্ট আসন পেয়েছে। বাংলার এই প্রতিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে শিল্পীর প্রাণে উৎসাহ অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তার রূপসৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে। বিদেশীর শাসন-শৃঙ্খল আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির নানা পথ এত কাল রুদ্ধ করে রেখে দিয়েছিল। পরাধীনতার এই নাগপাশ থেকে আজ আমরা মুক্তিলাভ করেছি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশকে উন্নত করে গড়ে তুলবার নানাবিধ উদ্যোগ-আয়োজন চলছে। শিল্পকলার ক্ষেত্রেও এ উদ্যম প্রসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নিজস্বতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ যাদের চিত্রসৃষ্টিতে বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে এমনি কয়েক জন শিল্পীর শিল্পকলার আলোচনা প্রসঙ্গে দেশবাসীর মধ্যে যে বস্তুর অভাব মনকে পীড়িত করেছে সে সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বললাম। ১৯৩২ সালে চিত্রকর্ম্ম শেখার মানসে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগে যোগদান করি। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বৎসরই ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি শান্তিনিকেতনে কলাভবনে নন্দবাবুর কাছে শিক্ষালাভ করেন; তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মুকুল দে-ই বোধ হয় তাঁকে বেছে নিয়েছিলেন। এর পূর্ব্বে ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী ঈশ্বরীপ্রসাদ। সত্যেন্দ্রবাবু গুরুর সাধক শিষ্য। চিত্র-রচনার আঙ্গিক হিসেবে ইনি প্রচলিত ভারতীয় পদ্ধতিরই অনুসরণ করে চলেছেন—রসোপলব্ধির সুষ্ঠু প্রকাশেই এর ছবির সার্থকতা। এঁর আঁকা ছবিগুলিতে স্নিগ্ধ রং এবং লীলায়িত রেখার সমাবেশে যে কমনীয় রসঘন পরিবেশ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, অতি সহজেই তা রসজ্ঞ মনের তন্ত্রীতে সাড়া জাগিয়ে তোলে। সত্যেন্দ্রবাবুর আঁকা - "যশোদা ও কৃষ্ণ", "মা ও ছেলে", "বাউল", "ভোজ", "কাবুলিওয়ালা ও মিনি" ইত্যাদি ছবি রসিক-সমাজে সমাদৃত হয়েছে। শিক্ষক

[illegible] [শ্রী[illegible] গাঙ্গুলি

মূষিক-বাহন [শ্রীপ্রিয়প্রসাদ গুপ্ত

হিসাবেও তাঁর কার্য্য সার্থক। প্রাচীনকালের গুরু-শিষ্যের আদর্শকে তিনি নিজের জীবনে মেনে নিয়েছেন। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁর কয়েকজন ছাত্র বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করতে পেরেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ একদা অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের অনুরোধে কলিকাতা আর্ট স্কুলে ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগকে গড়ে তুলেছিলেন। এখানেই তাঁর ছাত্র ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, নন্দলাল, শৈলেন দে, সমরেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি— এখানেই সুরু হয়েছিল বাংলার চিত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবনের সাধনা।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় আর্ট স্কুলে পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে ছবি আঁকার রেওয়াজ কমে যেতে দেখেছি— তার বদলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিষয়বস্তু করে খুব ছবি আঁকা চলত। আমরা তখন নেচার থেকে খুব স্কেচ করতাম— যেমনটি দেখতাম, ঠিক তেমনি করতে চেষ্টা করতাম। নানা রকম ভঙ্গীতে মানুষের, জীবজন্তুর স্কেচ করতাম—আবার গাছপালা, কুঁড়েঘর এবং নানা প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির ছবিও আঁকতাম। তখনকার অধ্যক্ষ মুকুল দে এবং প্রধান শিক্ষক রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এ বিষয়ে খুব উৎসাহ দিতেন। এর ফলে বাংলার সমাজ-জীবনের বিষয়বস্তু নিয়ে প্রচুর ছবি আঁকা হ'ত। প্রচলিত ভারতীয় পদ্ধতিতেই সেগুলো অঙ্কিত হ'ত, তবে আলো-ছায়ার সমাবেশ এবং পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার থাকত। পৌরাণিক কাহিনী নিয়েও যে ছবি আঁকা হ'ত না তা নয়। মানুষের মডেল সামনে রেখেও আঁকতাম—সাপুড়ে, বাউল এমনি ধারা বেছে বেছে মডেল নিতাম। পুরোপুরি ভারতীয় পদ্ধতিতেই আঁকতাম। এ রকম করে আঁকাতে ড্রয়িং বেশ জোরালো হ'ল, আর প্রচলিত পদ্ধতির গতানুগতিকতার প্রভাব থেকেও খানিকটা মুক্ত হওয়া গেল। সেই সময়কার আব্দুল মৈনের আঁকা "অশ্ব পৃষ্ঠে জাহাঙ্গীর" ছবিটি এত ভাল হয়েছিল যে তার ছাপ এখনো মনে আছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর বর্শাহস্তে অশ্ব-পৃষ্ঠে বনমধ্যে শিকারের অন্বেষণে বহির্গত হয়েছেন, এই হচ্ছে ছবির বিষয়বস্তু। মুঘল-পদ্ধতির অনুকরণে ছবিটি আঁকা, নিখুঁত ড্রয়িং—খুব ভাবব্যঞ্জক। ইন্দু রক্ষিতের "কলিকাতা শহরের রাস্তা" স্কেচ থেকে আঁকা ছবি ; এ ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে ভারতীয় পদ্ধতিতে যে এত ভাল ছবি আঁকা যেতে পারে, এক সময় তা ভাবতেই পারা যায় নি। উক্ত ছবিতে কিন্তু, বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং বাস্তবধর্ম্মী অঙ্কনশৈলীর সমন্বয় মোটেই দৃষ্টিকটু হয় নি। সত্য মজুমদারের "তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর টিকিট কাটার দৃশ্য", "জাহাজের যাত্রী," "বাজার ঘাটের নৌকা" প্রভৃতি মানুষের সহজ সরল দৈনন্দিন জীবনের বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা ছবিগুলিতে অভিনব শিল্পদৃষ্টি এবং আঙ্গিকের কি অনায়াস অভিব্যক্তি! শুধুমাত্র গতানুগতিক আঙ্গিকের অনুকরণ না করাতে শিল্পীর অন্তরের রসানুভূতির পরিচয় ছবিগুলিতে কোথাও ব্যাহত হয় নি। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এদের আঁকা ছবিগুলি মনোরম। এঁরা

মিনি ও কাবুলিওয়ালা [শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনকে স্বীকার করে নিয়েছেন—তাই এঁদের ছবিতে চিরন্তন প্রাণধর্ম্ম রূপায়িত হয়ে উঠেছে। সত্যেন্দ্র বাবুর তদানীন্তন ছাত্রদের মধ্যে সত্য মজুমদার, ত্রিপুরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কমলারঞ্জন ঠাকুর, অমূল্য সেন, হেরম্ব গাঙ্গুলী, প্রিয়প্রসাদ গুপ্ত, ধীরেন্দ্র ব্রহ্ম প্রভৃতির ছবি বিশেষ করেই উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান লেখকও এই গুণী শিল্পীর কাছে শিল্পচর্চ্চা করে হাত

ফকিরের আস্তানা [শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

পাকাবার চেষ্টা করেছিলেন। অমূল্য সেনের আঁকা চৈতন্যের চিত্রাবলী এবং রাধাকৃষ্ণের ছবিগুলি রচনা-নৈপুণ্যে সুধীসমাজে খুবই আদৃত হয়েছে। এটা আশা করা অসঙ্গত নয় যে, উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষাদানের ফলে একদা এদের শিল্পসৃষ্টি সার্থক হয়ে উঠবে—এদের প্রতিভার অবদানে বাংলার শিল্পকলার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে।

আর্ট স্কুলে তখন ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন যাঁরা শিখতেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রাচ্য চিত্রকলা পদ্ধতিতে ছবি এঁকে কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে সুশীল সেন, সমর ঘোষ, রাধাচরণ বাগচী, বাসুদেব রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অধ্যক্ষ মুকুল দে এবং রমেন্দ্রবাবু তখন ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগের উপর বিশেষ ভাবে নজর রাখতেন এবং ছাত্রদের মধ্যে কর্ম্মোৎসাহ ও তাঁদের মনে নূতনের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করতেও তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন। রমেন্দ্রবাবু নিজের অঙ্কন-রীতিকে বিশেষ আঙ্গিকের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি, ছাত্রেরাও যাতে পুরাতনের মোহ ত্যাগ করে নিজ নিজ শিল্পসৃষ্টিতে নূতন রূপ দিতে পারে সে বিষয়ে তাদের নির্দ্দেশ দিতেন ও সহায়তা করতেন। আর্ট স্কুলে বাস্তবজীবনের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে ছবি আঁকার রেওয়াজ সম্ভবতঃ ঐ সময় থেকেই বেশী করে আরম্ভ হয়।

হাতে কলমে চিত্রকর্ম্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের শিল্পকলার ইতিহাস এবং ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকলার অঙ্কন-পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য এবং রূপ ও রস ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আর্টস্কুলগুলিতে থাকা দরকার। বিশেষ করে আমাদের প্রাচীন ভারতের চিত্রকলা চর্চ্চার রূপ, রীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে, প্রাচীনকালের গুণী শিল্পীদের আঁকা ছবি—বিশেষতঃ "অজন্তা", "রাজপুত" ও "মুঘল" পদ্ধতির আঙ্গিক ও আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের যথোচিত শিক্ষার প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেই বলেই চিত্রচর্চ্চায় আমাদের দৃষ্টির প্রসারতা বৃদ্ধির সুযোগ হয় না। চিত্রশিল্পীদের মধ্যেও অনেকেরই যখন বিভিন্ন পদ্ধতির সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান নেই, তখন অন্যে পরে কা কথা। এই শোচনীয় উদাসীনতা দেশের শিল্পকলার অগ্রগতি অনেকটা ব্যাহত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।
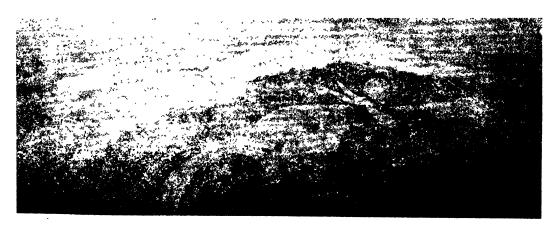
শ্রীচৈতন্যের সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান [শ্রীঅমূল্যগোপাল সেন

বাংলা লিপি

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

প্রতিবেশীকে গিয়ে বললাম, "মশায়, আপনার কুকুরটার চীৎকারে পাড়ার লোকে সারারাত ঘুমোতে পারে না, এর একটা বিহিত কিছু করুন।" তিনি বললেন, "আরে, এ ত খুব সোজা কথা। এর জন্যে সাত সকালে আমার কাছে ছুটে আসবার দরকার কি ছিল? তোমরা সব কানে তুলো গোঁজো।" তুলো গুঁজে রেখে দেবার জন্যেই যে ভগবান্ কান-দুটো আমাদের দেন নি, সেকথা কিছুতেই তাঁকে বোঝাতে পারলাম না।

তেমনি, বাংলা লিপির সংস্কারের কথা তুললেই যাঁরা সর্ব্বাগ্রে বানান বদলাবার পরামর্শ দেন, তাঁরাও আমাদের সৎপরামর্শ দেন না।

এঁরা বলেন, "৫০০টি টাইপ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছ ব'লে অভিযোগ করতে এসেছ, তা ত খাবেই; তোমাদের যেমন বুদ্ধি! ই ঈ দুটো, উ ঊ দুটো, ন ণ দুটো, য জ দুটো, শ ষ স তিনটের দরকার কি শুনি, এক-একটাতেই যখন কাজ চলতে পারে? রি, অই, অউ, ক্‌খ, গ্‌গঁ লিখলেই যখন চলে তখন ঋ, ঐ, ঔ, ক্ষ, জ্ঞ, এই অক্ষর ক'টাকে রেখেছ কেন অকারণ? আবার রেফ লাগিয়েছ কি দ্বিত্ব। তোমাদের দুর্ভোগ হবে না ত কার হবে?"

কথাটা এত লোকের কাছ থেকে এত বেশী শুনতে হয় যে, যা হোক একটা নিষ্পত্তি হয়ে এ আলোচনা এবারে শেষ হয়ে যাওয়া দরকার। একই ধরণের কথা ক্রমাগত কত আর শোনা যায়?

বাস্তবিক, একটা কুকুরের মুখে একটা muzzle না পরিয়ে পাড়ার ছেলেবুড়ো সকলের দুটো ক'রে কানে তুলো গুঁজবার পরামর্শ যতখানি মূল্যবান্, লিপিসমস্যা-সমাধানের উদ্দেশ্যে বানানগুলো বদলে দেবার পরামর্শের মূল্য ততখানিও নয়।

প্রথমতঃ, বাংলা লিপির যে ধরণের যতটা সংস্কার আমাদের প্রয়োজন এবং কাম্য, বানানের কিছুমাত্র অদলবদল না ক'রেও তা যে করা সম্ভব, বর্ত্তমান প্রবন্ধেই তা আমি প্রমাণ করতে পারব আশা করছি।

দ্বিতীয়তঃ, বানানের যত সরলীকরণই আমরা করি, তাতে আমাদের লিপিসমস্যার মীমাংসা কিছুই হবে না। ৫০০ থেকে কমিয়ে টাইপের সংখ্যা ৪৯০ করবার জন্যে বাংলা বানানে বিপ্লব বাধিয়ে দেবার প্রস্তাবটাকে অত্যন্ত হাস্যকর বেহিসাব ব'লে মনে করি। এতে ভাষার একেবারে ভিত্তিমূলে ভাঙন ধ'রে যাবে; তা ছাড়া, এই উপায়ে টাইপের সংখ্যা কমিয়ে যদি ২৫০, ১৫০ এমন কি ১০০-তেও নামিয়ে আনা যায়, যে-সমস্ত প্রয়োজনে লিপি-সংস্কার চাচ্ছি তার বেশীর ভাগ তাতে মিটবে না।

তৃতীয়তঃ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অত্যন্ত সুদূরপ্রসা গভীর এবং ব্যাপক ক্ষতি না ঘটিয়ে বানানের এই জাত সরলীকরণ সম্ভব নয়।

এবারে আমার এই তিন দফা বক্তব্যের ভিতর শেষ দফ নিয়ে আলোচনা সুরু ক'রে প্রথম দফাটিতে গিয়ে শেষ ক যাক।

বানানের সরলীকরণ থেকে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে কি জাতীয় ক্ষতি কতখানি হতে পারে তার কিছু আভ দেবার চেষ্টা করছি।

(১) বাংলায় তৎসম শব্দ ব'লে কিছু প্রায় আর বা থাকবে না; ফলে, তাদের আত্মীয়তার সূত্র ধ'রে নূতন নূ তৎসম শব্দ আজ যেমন ভাষার ভিতর-মহলে অ প্রবেশাধিকার পাচ্ছে, অতঃপর তা আর পাবে না। 'জ্ঞ রয়েছে ব'লে 'জিজ্ঞাসা'কে নিতে দ্বিধা করবার কিছু থাকে ন কিন্তু গ্যানের হাত ধ'রে জিগ্‌গাঁশা এলে তাকে প্রশ্ন করতে হবে, তুমি কে হে বাপু?

(২) সংস্কৃত যে শব্দসম্ভারকে আমাদের পরিবারভু ক'রে নিয়ে আমরা ভাষার আসর জমিয়েছি, তারা নিজেদে কৌলিক আচারের অনেকখানিকেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে ফলে, বাংলা ব্যাকরণের অনেকখানিই আসলে সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণ আমাদের খুব অল্পই আর কা লাগবে ব'লে আমাদের দুর্ভোগের শেষ থাকবে না। নূ সন্ধিসূত্র রচনা করতে হবে শ-দুএক, নয়ত দুরান্ত হয়ে যা দুরন্ত, একেশ্বরবাদ হয়ে যাবে একিশ্‌শরবাদ, পিত্রালয় হ যাবে পিত্র্যালয়। প্রত্যয়াদির নূতন সূত্র রচনা করতে হ হাজারখানেক, তা না হলে গ্যানের সঙ্গে জিগ্‌গাঁশার, কো সঙ্গে বিয়োগের, ন্যায়ের সঙ্গে নেয্যের, শ্‌শঁরণের সঙ্গে শ্রিতি বাণের সঙ্গে বস্ত্রের, ব্যেক্তির সঙ্গে অবাক্তের কোনোও সং খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ ছাড়া অন্য বিপদ্‌ও আ আছে।*

(৩) সন্ধি ক'রে ও প্রত্যয়-উপসর্গাদি জুড়ে তৎসমমূ নূতন শব্দ গঠন প্রায় বন্ধ হবে।

(৪) চেহারাটা আলাদা ব'লে, সংস্কৃত থেকে এমন অ শব্দ আমরা নিয়েছি, নিতে পেরেছি, যার উচ্চারণটা ভিন্না

* "বাংলা বানানের ভূমিকা", দিগন্ত, ১৩৫৫।

অন্ত বাংলা অথবা সংস্কৃত শব্দেরই মত। চেহারাটাও এক হয়ে গেলে এই শব্দগুলির ব্যবহার স্বাভাবিক নিয়মে ভাষায় ক্রমশঃ কমে আসবে, যে কারণে ঘোড়া অর্থে 'হয়' কথাটা বাংলায় এখন আর চলে না। শুর ও সুর এ দুটোকেই যদি শুর লিখতে হয়, তা হলে সুরের জন্যে শুর রেখে শুর বোঝাতে বীর বলতেই চেষ্টা করব। দীনকে দিন, বীণাতারকে বিনাতার, পীঠকে পিঠ, বলীকে বলি, বিকৃত এবং বিক্রীত দুটোকেই বিক্রিত, যমককে জমক, সুচীকে শুচি, নিঃসঙ্গ ও নিঃসংজ্ঞকে নিঃশঙ্গ, যদি আমাদের লিখতে হয়, তবে যে কথাটা কম চলে অন্ততঃ সেটার জন্যে সমার্থক অন্য কথাই খুঁজব। এক উচ্চারণের এই জাতীয় দ্ব্যর্থক আলাদা চেহারার শব্দ ভাষায় অনেক আছে ব'লে ভাষার শব্দসম্পদ্ এতে কমবে। অন্যদিকে, দ্ব্যর্থক শব্দ ভাষায় বেশী হ'লে শিক্ষার্থীর পরিশ্রম বাড়ে। আমরা বাংলা-ভাষাটাকে শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ করতে চাই, দুরূহতর করতে চাই না।

(৫) ধাতুপ্রত্যয়বিচারে শব্দার্থগ্রহ অনেক ক্ষেত্রেই আর হবে না। যাওয়া যদি জাওয়া হয়ে যায়, যা ধাতু হবে জা, যাত হবে জাত এবং জন্ম-জাত-র সঙ্গে তার তফাৎ কিছু থাকবে না ব'লে, অগ্রজ যে আগে জন্মেছে, না যে আগে চ'লে গিয়েছে তা বোঝা যাবে না।

(৬) হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের বিচারে বাংলায় কবিতা রচনা কমবে। যা-ও বা লেখা হবে, তাতে ঈ, ঊ থাকবে না ব'লে ধ্বনি-বৈচিত্র্যের বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না।

"সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সে হো পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥"

"মণিময় মঞ্জির পায়।
দূরহি তেজি চলি যায়॥"

"নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
সারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥"

"ঝুটি কি কহব কানাই।
ঝুরত তুয়া বিনু রাই॥"

"দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর।
শীত ভীত রহ শীখর-কোর॥"

"ঝুমরি দাদুরি বোল।
ঝুলত মদন-হিলোল॥"

"ডাকে ডাহুক ঝমক ঝমকল
বারি ঝলকত ঝারিয়া।
ডিণ্ডিমায়িত মণ্ডুকীবর
ময়ূর নাচত সাজিয়া॥"

"কত শত সুন্দর নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ চুম্বি' ও।
পড়ি' জলনীলে ধবল সৌধ ছবি
অনুকারিছে নভ-অঙ্গন ও॥"

"নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল হিমাচল
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী।"

"পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।"

"ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে
পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে,
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল
নত নয়নে অনিমেষে।"

"সকল যোগী সকল ত্যাগী,
এস দুঃসহ দুঃখ ভাগী,
এস দুর্জ্জয় শক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।
এস জ্ঞানী, এস কর্ম্মী, নাশ ভারত লাজ হে।"

এ সব জিনিষ আর চলবে না। নূতন আর লেখাই যে চলবে না কেবল তা নয়, পুরাণো জিনিষগুলিকেও আর নূতন ক'রে ছাপতে পারা যাবে না।

(৭) ভাষার ধ্বনি-বৈচিত্র্য ক্রমে কমবে।

অর্থাৎ, সব মিলিয়ে বাংলা ভাষাটার যা চেহারা হবে তা একেবারে চমৎকার।

এর পরে দেখা যাক, এ সমস্ত ক্ষতি স্বীকার ক'রে নিয়েও বানানের সরলীকরণ যদি আমরা করবই স্থির করি, তাতে আমাদের আজকের দিনের লিপি-সমস্যার মীমাংসা কিছুমাত্র হবে কি না, এবং যদি হয় ত কতটা হবে।

বাংলা লিপির সবচেয়ে বড় সমস্যা, এর অক্ষর বা ধ্বনি-চিহ্নের অকারণ বাহুল্য। কয়েক শ টাইপের মধ্যে থেকে, আঙুলে ক'রে গোনা যায় এমন কয়েকটিকে বাছাই ক'রে বাদ দিয়ে আমাদের লাভ ঠিক ততটাই হবে, ঘর-ভরতি মশার ঝাঁকের দু'তিনটাকে মেরে বাকীগুলোর কামড় খাওয়াতে যতটা লাভ।

বাংলা লিপির আর-এক সমস্যা, এর ঠাটটা ধ্বনি-অনুসারী, কিন্তু কার্য্যতঃ এ লিপি সর্ব্বত্র ধ্বনি-অনুসারী নয়। বানানের সরলীকরণ হলে প্রাজ্ঞকে প্রাগ্‌গঁ, রক্ষাকে রক্‌খা, ইন্দ্রকে ইন্‌দ্র, পদ্মকে পদ্দ, মাতৃকে মাত্রি, খাদ্যকে খাদ্দ লিখে, লিপির ধ্বনি-অনুসারিত্ব কিছু বাড়ালাম মনে ক'রে আত্মপ্রসাদ হয়ত আমরা অনুভব করতে পারি। কিন্তু দীর্ঘস্বর লুপ্ত হবে ব'লে যে-সব ক্ষেত্রে এখন আমরা স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণটাই ক'রে থাকি, সে-সব ক্ষেত্রে লিপির ধ্বনি-অনুসারিত্ব কমবে। চিহ্ন-হীন ব্যঞ্জন সংস্কৃতে সর্ব্বত্র অকারান্ত, কিন্তু বাংলায় কোথাও অকারান্ত, কোথাও হসন্তবৎ, কোথাও তার অন্নবিস্তর ওকার-

ঘেঁষা উচ্চারণ। বাংলা লিপি ধ্বনি-অনুসারী হবার পথে এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা, কারণ বাংলা শব্দের মোট সংখ্যা যদি ৬০,০০০ হয় ত তার মধ্যে অন্ততঃ ৮০,০০০ চিহ্ন-হীন ব্যঞ্জনের ব্যবহার রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বানানের সরলীকরণ ক'রে এদিক্ দিয়েও লাভ আমাদের প্রায় কিছুই হবে না। অকারান্ত উচ্চারণ বোঝাতে ওকার দেওয়া চলবে না, কারণ সেটা মিথ্যাচার হবে। ওকার-ঘেঁষা অকার উচ্চারণ ওকার দিয়ে বোঝাতে গেলে ব্যাধির চেয়ে চিকিৎসাটা বেশী মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। প্রথিত-প্রোথিত একাকার হয়ে যাবে; মহানুভব, মহার্ণব, মহারণ্য হয়ে যাবে মোহানুভব, মোহার্ণব, মোহারণ্য। মোহের অনুভব, মোহের অর্ণব, মোহরূপ অরণ্যের সঙ্গে তাদের আর কোনোও পার্থক্য থাকবে না। চিহ্নহীন ব্যঞ্জন বাংলায় যেসব ক্ষেত্রে হসন্তবৎ উচ্চারিত হয় তার সর্ব্বত্র উচ্চারণটা পুরোপুরি হসন্ত নয় ব'লে হস্ চিহ্নের ব্যবহারও মিথ্যাচারের সামিল হবে; হসন্তবৎ উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে সর্ব্বত্র হস্ চিহ্ন ব্যবহারের অন্য অনেক বিপদ্‌ও আছে।*

বাংলা লিপির আরও এক সমস্যা, এ লিপি তিন থাকে লেখা হয়ে বড্ড বেশী জায়গা জোড়ে। ই, ঈ, উ, ঊ, ঐ, ঔ, ইকার, ঈকার, ঐকার এবং ঔকারের আঁকড়িগুলো, ট-ঠ-এর ল্যাজ দুটো, রেফ ও চন্দ্রবিন্দু, এইগুলির স্থান উপরতলায়; উকার, ঊকার, ঋকার, ৠকার, ৯কার ও হস্‌চিহ্ন থাকে নীচতলায়; বাকী সব অক্ষর মাঝের তলায়। ট-ঠ-এর ল্যাজ ছেঁটে দেওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন উপরতলাটাকে রাখতেই হবে; মাঝের তলাটার ত কথাই নেই; একমাত্র নীচতলাটাকে বাদ দিয়ে চলে কিনা দেখা দরকার। বানানের সরলীকরণ হলে ঊকার, ঋকার, ৠকার, ৯কার অবশ্য বাদ পড়বে, কিন্তু উকার এবং হস্ চিহ্নের ব্যবহার থাকবে ব'লে নীচতলাটাকে আমরা ছাড়তে পারব না। অতএব সরলীকরণ থেকে এদিক্‌কার লাভও কিছুই আমাদের হবে না।

বাংলা লিপির বিরুদ্ধে এও আর-এক অভিযোগ, যে এর কোনোও কোনোও ধ্বনিচিহ্ন, যেমন ইকার-ঈকার, অন্য ধ্বনি-চিহ্নের ঘাড়ের উপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ছাপাখানায় এ জন্যে যে শিং বাগানো টাইপ ব্যবহার করা হয় সে টাইপ ভাঙে বড় বেশী, আর টাইপরাইটারে ক্রমাগত back-shift চেপে চেপে ছাপতে হয় ব'লে কাজ একটুও এগোয় না। বানানের সরলীকরণ থেকে এ সমস্যার কোনোও মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়।

এর পর নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছতে পারি, যে, লিপিসমস্যা সমাধানের জন্যে বানানের সরলীকরণ করবার পরামর্শটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক, বাজে পরামর্শ।

এবারে আমি দেখাব, যে, বানানের কিছুমাত্র অদলবদল না ক'রে, বাংলা ভাষার ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ বজায় রেখে, এবং বাংলা লিপির যেটা character বা স্বধর্ম, সেটাকে একটুও নষ্ট হতে না দিয়ে আমাদের এই লিপি-সমস্যার সমাধান কেবল যে সম্ভব তা নয়, অত্যন্তই সহজসাধ্য।*

এজন্যে সকলের আগে এবং সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, একটি অকার চিহ্ন গ্রহণ করা। সংস্কৃত লিপিতে অকারের প্রয়োজন নেই, কারণ সে লিপিতে চিহ্নহীন ব্যঞ্জন মাত্রেই সর্ব্বত্র সমভাবে অকারান্ত উচ্চারিত হয়। বাংলায় চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সর্ব্বত্র অকারান্ত নয় ব'লে, একটি অকার-চিহ্নের অভাব উপস্থিত হয়েছে। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার মত ক'রে অনেকে তাই আজ চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের অকার উচ্চারণ নির্দ্দেশ করবার জন্যে কোথাও কোথাও ওকার প্রয়োগ করছেন, কেউ বা তার হসন্তবৎ উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে স্থানে অস্থানে হস্‌চিহ্ন ব্যবহার করছেন। এ কাজ যদি সর্ব্বত্র করা চলত তা হলেও না-হয় বুঝতাম, কিন্তু কেন যে সেটা করা যায় না তা অন্যত্র বিশদভাবে বলেছি।

বাংলায় যে-সমস্ত ধ্বনির উচ্চারণ নেই তাদের জন্যেও একাধিক স্বতন্ত্র অক্ষর বা ধ্বনিচিহ্ন রয়েছে, আর যে অকারান্ত ধ্বনি আমাদের প্রায় প্রত্যেকটি কথায়, তার জন্যেই কোনোও চিহ্ন নেই, এটা যে ভিন্ন দেশীয় লোকের কাছে কতখানি অদ্ভুত ঠেকতে পারে একটু চিন্তা করলেই সেটা বোঝা যায়। কিন্তু বিদেশীয়েরা কি ভাবছে ব'লে নয়, আমাদের নিজের গরজেই অকার চিহ্ন একটি আমাদের নেওয়া উচিত।

অক্ষর থেকে মাত্রা টেনে যেখানে আমরা অক্ষরান্তরে চ'লে যাই সেইখানে ছোট একটি v চিহ্নকে অকাররূপে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা চলে। আকারের সঙ্গে অকারের আকৃতিগত যে একটু সাদৃশ্য থাকা বাঞ্ছনীয়, এর মধ্যে সেই সাদৃশ্য অল্প একটু পাওয়া যাবে; চিহ্নটি দেখতেও কিছু মন্দ নয়। সূক্ষ্ম-কোণ সম্বলিত দ্বিভুজ, কি বাংলা-লিপির অনেক অক্ষরের উপাদান; সেদিক্ থেকে দেখলেও স্বীকার করতেই হবে যে, আমার প্রস্তাবিত ধ্বনিচিহ্নটি, যা একটি সূক্ষ্মকোণ সম্বলিত ছোট দ্বিভুজ ছাড়া আর কিছুই নয়, খুব বেশী পরিমাণে বাংলা লিপির ধাতেরই জিনিষ। যে ঋকারটা কাত হয়ে বসে, সেইটেই যেন উপরে উঠে চিত হয়ে বসবে। নাগরী

* "বাংলা বানানে অ এবং অকার," বিশ্বভারতী পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা।

* "বাংলা লিপির সংস্কার," বিশ্বভারতী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। "নূতন বাংলার বর্ণমালা", বিশ্বভারতী পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

লিপিতে এ চিহ্নটি হয়ত তত মানানসই হবে না, কেননা, নাগরী লিপিতে সূক্ষ্মকোণ জিনিষটার একান্তই অভাব। এই চিহ্নটি লেখাও সহজ, টানালেখায় লাইনটাকে অল্প একটু কাঁপিয়ে দিলেই অকার হয়ে যাবে, বাংলা লিপির একটানা মাত্রাসমাবেশের একঘেয়েমিও এতে কাটবে। নূতন একটি ধ্বনিচিহ্ন যে ব্যবহার করতে হচ্ছে, কিছুদিন পরে কারও আর তা বিশেষ মনেই থাকবে না; আর বাস্তবিক, বাংলায় অকারান্ত ধ্বনি এত বেশী, যে, খুব সহজে লেখা যায় এমন চিহ্নই অকাররূপে আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

সংস্কৃত সন্ধিসূত্র ইত্যাদির ব্যবহার যাতে অব্যাহত থাকে, সেজন্যে সূত্র রচনা করতে হবে, যে, তৎসম শব্দগুলির অকার বাংলায় কোথাও অকারান্ত, কোথাও হসন্তবৎ উচ্চারিত হয় ব'লে বাংলা লিপিতে সেই উচ্চারণ অনুযায়ী অকারান্ত ব্যঞ্জন ও চিহ্নহীন ব্যঞ্জন ব্যবহার ক'রে লেখাও হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সর্ব্বত্রই হবে হসন্তবৎ। যুক্তাক্ষরের প্রথম অক্ষর বিযুক্ত অবস্থায় হস্‌চিহ্নিত হওয়া উচিত, কিন্তু তার দরকার কিছু নেই। কেবল ব্যাকরণ-বিভ্রাটের সৃষ্টি যাতে না হয়, সেজন্যে আরও একটি নিয়ম রচনা করতে হবে এই ব'লে যে, একযোগে লেখা হলে পূর্ব্বপদের হসন্তবর্ণ হস্‌চিহ্ন ত্যাগ করে।

ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে আমাদের প্রায় একমাত্র এবং খুব বেশী অসুবিধার কারণ যুক্তব্যঞ্জনগুলি। একটি অকার চিহ্ন গ্রহণ করলে দুটি বা তিনটি ব্যঞ্জনকে একত্র জুড়ে স্বতন্ত্র অক্ষর তৈরি করবার প্রয়োজন আর থাকবে না। যে বর্ণ স্বরান্ত নয় তাকেই হসন্তবৎ ব'লে চিনতে পারছি, সুতরাং স্বরান্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বেকার একটি বা দুটি চিহ্নহীন ব্যঞ্জনের হসন্তবৎ উচ্চারণ তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজে থেকেই যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি হচ্ছে।

যে যুক্তাক্ষর কয়টিকে ছেড়ে দেওয়া যাচ্ছে না, তারা হচ্ছে ক্ষ, জ্ঞ আর ত্র। কারণ মিলিত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি এদের প্রচলিত বাংলা উচ্চারণের মত নয়। আমার ছেলেবেলায় বর্ণ-পরিচয়ের বইয়ে অন্য ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সঙ্গে ক্ষ-কেও জায়গা দেওয়া হ'ত, অন্য যুক্তব্যঞ্জনগুলির থেকে তার স্বাতন্ত্র্যের এই যে স্বীকৃতি, এটা খুবই সমীচীন ছিল। এই স্বাতন্ত্র্য জ্ঞ পুরামাত্রায় এবং ত্র কিছু পরিমাণে দাবি করতে পারে। ঞ-র অন্য ব্যঞ্জননিরপেক্ষ ব্যবহার বাংলায় এখন আর নেই, তা ছাড়া জ ভিন্ন অন্য সমস্ত যুক্তবর্ণে তার উচ্চারণ ন, তাই ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ ইত্যাদিকে এই স্বাতন্ত্র্য দেওয়া যেতে পারে না। ঙ-র উচ্চারণ বাংলায় সর্ব্বত্রই অনুস্বারের মত ব'লে যে যুক্তব্যঞ্জনগুলিতে ঙ রয়েছে, সেগুলিরও এই স্বাতন্ত্র্যের উপরে কোনোও দাবি নেই।

ব'লে ম ফলা য ফলাকে রেখে দিতে হবে। এতে আর-একটা সুবিধা এই হবে যে স্মাট্‌স লিখতে ম, সুস্মিতা লিখতে ম ফলা, হ্যাঁ লিখতে য়, সহ্য লিখতে য ফলা ব্যবহার করতে পারব। মনে রাখতে হবে, ম ফলা যফলা মূল অক্ষরের সঙ্গে লেপটে বসবে না, বেশ ভদ্রলোকের মত পাশ ঘেঁষে আলাদা হয়ে বসবে।

বাংলায় অন্তস্থ ব এবং বর্গীয় বকে আমরা মিশিয়ে ফেলেছি। এ অবস্থার প্রতিকার সহজ নয় কিন্তু যুক্তবর্ণে অন্তস্থ ব-এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ রয়েছে, যেমন স্ব, আশ্বাস, বিশ্ব, কচিৎ, অশ্বয়, দ্বিত্ব, ইত্যাদি। অন্তস্থ ব-এর উচ্চারণ নির্দ্দেশ করবার জন্যে, 'ব়' এই অক্ষরটিকে যদি আমরা অন্তস্থ ব-এর বৈকল্পিক রূপ হিসাবে গ্রহণ করি তাহলে ব ফলা রাখতে হয় না। অনেক সময় প্রতিবর্ণীকরণের কাজে ব় অক্ষরটির আমাদের প্রয়োজন হয়, অনেক ছাপাখানায় সে কারণে এই অক্ষরটি আজকাল থাকেও দেখতে পাই। ব ফলা ছেড়ে ব় রাখবার এই সুবিধার জন্যে আমি ব়-এরই পক্ষপাতী। ব-ফলার উচ্চারণ যদিও বাংলায় দ্বিত্বের মত অনেকটা, কিন্তু অন্য ব্যঞ্জন-নিরপেক্ষ অন্তস্থ ব উচ্চারণ বাংলায় নেই ব'লে যুক্তবর্ণে তার উচ্চারণ-বৈকল্য ঘটে একথা বলা চলে না। তা ছাড়া, বিশ্ব, বিল্ব, এই কথাগুলিতে অন্তস্থ ব-এর ঠিক উচ্চারণটা কেউ যদি ভুল ক'রে ক'রেই ফেলেন, তাতে খুব বেশী ভয় পাবার কিছু কি আছে?

চিহ্নহীন সমস্ত ব্যঞ্জনেরই উচ্চারণ হসন্তবৎ হবে বলে হসন্ত রাখবার দরকার কিছু থাকবে না। শৃগাল, স্নান ইত্যাদি কথায় শ-স এর দন্ত্য উচ্চারণ একটি ফুটকি যোগ ক'রে নির্দ্দেশ করা চলবে। চ বর্গের দন্ত্য উচ্চারণ এবং প বর্গের দন্তৌষ্ঠ্য উচ্চারণ এই উপায়েই এখন নির্দ্দেশ করা হয়ে থাকে।

ছাপার কাজে ড়, ঢ়, য় চলবে। টাইপ-রাইটারের অক্ষর-সংখ্যা কমাতে হলে ড, ঢ, এবং য-কেই বিন্দুযুক্ত ক'রে এদের কাজ চালানো যেতে পারে।

চন্দ্রবিন্দু যদি মাথার উপর থেকে নেমে মূল বর্ণের ডান পাশ ঘেঁষে মাঝতলাতে এসে বসেন, তা হলে সব দিক্ দিয়েই ভাল হয়।

সমস্ত রকমের ব্যঞ্জনধ্বনির জন্যে এই কয়টি অক্ষরকে রাখলেই তা হলে আমাদের চলে:

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ
ব ভ ম য র ল ব় হ শ ষ স ড় ঢ় য় ং ঃ ँ ক্ষ জ্ঞ ত্র ।।

অর্থাৎ, মোট ৪৫টি।

উ-কারের ছোঁওয়া লাগলে গ, শ এবং হ-এর চেহারাই এখন বদলে যায়। সেটা কিছু সমস্যাই নয়। ছোঁওয়া এর পর আর লাগবে না।

এইজন্যে, যে, ব্যঞ্জননিরপেক্ষ ব্যবহারের জন্য অ আ প্রভৃতি একপ্রস্থ পূর্ণাবয়ব স্বরবর্ণ, আকার ইকার প্রভৃতি দ্বিতীয় একপ্রস্থ সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনিচিহ্ন এবং সংক্ষিপ্ত চিহ্নগুলির ভিতরে আবার দু-তিন রকমের উকার, ঊকার, ঋকার মিলিয়ে অকারণ অনেকগুলি ধ্বনিচিহ্ন আমাদের ব্যবহার করতে হয়। তার উপরে সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনিচিহ্নগুলির মধ্যে আকার ও ঈকার ছাড়া অন্য সব কয়টিই ধ্বনিক্রম অনুসারে তাদের যেখানে বসা উচিত, অর্থাৎ মূলবর্ণের ডাইনে, না ব'সে কেউ বা বসে উপরে, কেউ বা নীচে, কেউ বাঁদিকে, কেউ দু'দিক্ জুড়ে, কেউ আবার তিন দিক্ জুড়েও বসে।

দু'প্রস্থ স্বরধ্বনিচিহ্ন রাখব না স্থির ক'রে আমাদের ভাবতে হবে, মূলবর্ণ ও সংক্ষিপ্ত ধ্বনিচিহ্নের মধ্যে কোন্‌গুলিকে রেখে কোন্‌গুলিকে ছাড়ব। স্বতন্ত্রভাবে স্বরবর্ণের যত ব্যবহার, ব্যঞ্জন-সহযোগে অর্থাৎ আকার ইকার প্রভৃতি রূপে তাদের ব্যবহার বহুগুণ বেশী; তদুপরি আকার ইকার লেখা সহজ, তারা জায়গা জোড়ে কম: তাদের কিছুতেই ছাড়া চলতে পারে না। লিপিকারের কাজকে সহজ করাই লিপিসংস্কারকের কর্তব্য, কঠিনতর ক'রে তোলা নয়। অন্যদিকে, জায়গা এত কম জোড়ে ব'লেই, স্বতন্ত্র, অর্থাৎ ব্যঞ্জন-নিরপেক্ষ, স্বরবর্ণের কাজে আকার ইকার ব্যবহার করতে গেলে অত্যন্ত সেটা বিশ্রী দেখতেও হয়, এবং বাংলা লিপির বৈশিষ্ট্যও তাতে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

সবদিক্ কিসে রক্ষা হয় তার ইঙ্গিত বাংলা লিপিতেই একটি এবং নাগরী লিপিতে কয়েকটি রয়েছে। বাংলায় যেমন অ-তে আকার দিয়ে আ হয়, নাগরীতেও তাই হয়, তদুপরি অ-তে ওকার ঔকার যোগ ক'রে ও-ঔয়ের কাজও নাগরীতে দিব্যি চ'লে যাচ্ছে, বাংলাতেও চলতে পারে, এবং কয়েকটির কাজ যদি চলে ত বাকীগুলিরই বা কেন চলবে না? স্বরধ্বনির বাহন হবে অ; বাংলা অক্ষরগুলির মধ্যে রেখা-চিত্রের যা উপাদান, সরলরেখা, সূক্ষ্ম-কোণ, বৃত্তাংশ এবং ফুটকি, তার সবই এর মধ্যে রয়েছে; ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরান্ত হলে অ লোপ পাবে। সেবাগ্রামে basic হিন্দীর পাঠ্যপুস্তক এই রীতি অনুসরণ ক'রে ছাপা হচ্ছে, তাতে কারও কোনোও অসুবিধা হচ্ছে ব'লে এখন পর্যন্ত ত শুনিনি। আজ থেকে ঠিক চার বৎসর আগে বিশ্বভারতী পত্রিকার মারফৎ এই প্রস্তাব এবং একটি অকার চিহ্ন গ্রহণের প্রস্তাব আমি করে-ছিলাম; কিন্তু বাংলাদেশের সুধীজনের দৃষ্টিতে আমার সে লেখাটা পড়েছে ব'লে মনে হয় না।

ঌকারের ব্যবহার বাংলায় নেই, কিন্তু সংস্কৃতের উদ্ধৃতি ইত্যাদির জন্যে একে রাখতে হবে। ৯, এই সংখ্যাচিহ্নটি দিয়ে ঌকারের কাজ, আর ঋকারের দ্বিত্ব ক'রে ৠকারের কাজ যদি চালানো যায়, তা হলে অকার চিহ্নটিকে এবং স্বরধ্বনির বাহনরূপী অ-কে হিসাবে ধরে বাংলা স্বরবর্ণমালার সংখ্যা দাঁড়ায় ১২। মোট অক্ষরের সংখ্যা হয় ৫৭। যদি ফুটকি যোগ ক'রে ড়, ঢ়, য় নিষ্পন্ন করতে আপত্তি না থাকে ত টাইপ-রাইটারের কাজ ৫৪টি অক্ষর হলেই স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। বড় হাতের ও ছোট হাতের অক্ষর মিলিয়ে এবং diphthong দুটিকে নিয়ে রোমকলিপির বর্ণমালার সংখ্যা ৫৬।

এর পর ধ্বনিক্রমের কথা।

আকার আর ঈকারকে নিয়ে ধ্বনিক্রমের গোলযোগ কিছু নেই, কেবল ঈকারের আঁকড়িটা অন্য অক্ষরের এলাকায় ঝুঁকে না পড়ে সেটা দেখলেই হ'ল। ইকারের আঁকড়ির সম্বন্ধেও বক্তব্য সেই একই, তবে ইকারটাকে আগে বাঁদিক্ থেকে ডাইনে নিয়ে এসে তার আঁকড়ির ঝোঁকটাকে বাঁদিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

উকার, ঊকার ও ঋকারকে নীচতলা থেকে মাঝতলায় তুলে এনে মূলবর্ণের পায়ের কাছে ডানদিক্ ঘেঁষে বসিয়ে দিলেই কাজ চ'লে যাবে। রু-রূ লিখতে আমরা যে উকার ঊকার ব্যবহার ক'রে থাকি, সে দুটিকে নিলে টানা লেখার সুবিধা অনেক বাড়ে এবং অক্ষর-সমাবেশের দিক্ থেকেও সেটা ভাল হয়। তবে অনভ্যাসের জন্যে অক্ষরজ্ঞ লোকদের প্রথম প্রথম খুব অসুবিধা হবে তাতে। পরিবর্তন যত কম ক'রে লিপি-সংস্কার করা সম্ভব, তাই আমাদের করতে চেষ্টা করা উচিত।

একারটাকে ও ঐকারটাকে ডানদিকে সরিয়ে এনে তাদেরও ঝোঁক বাঁদিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু বাংলা বাঁদিক্ থেকে ডাইনে লেখা হয় ব'লে, উল্টোদিকে ঝোঁক, এমন অক্ষর লিখতে লিপিকারের অসুবিধা। ইকার-ঈকারের এই অসুবিধা নেই, কারণ টানা লেখায় প্রস্তাবিত ইকারের আঁকড়ির টানকে স্বচ্ছন্দেই ডানদিকে ঘুরিয়ে আনা যাবে, আর ঈকার সাধারণতঃ বাঁদিক্ থেকে ডাইনেই লেখা হয়ে থাকে।

নাগরী একার ঐকার নেওয়া চলতে পারে। কিন্তু এখনকার মত অন্য অক্ষরের মাথার উপরে তারা বসতে পাবে না ব'লে মাঝতলাটার সবটাই একেবারে ফাঁকা পড়ে থাকবে, ফলে, বাংলা এখন যেমন ঠাসাঠাসি হয়ে লেখা হয় তা আর হবে না। এ অসুবিধাটা নাগরী ওকার-ঔকারের নেই। কিন্তু নাগরী ও-কার যদি আমরা নিই তা হলে তার সঙ্গে যাতে গোল না বাধে এই জন্যে ই-কারের আঁকড়িটাকে বদলে ই-র আঁকড়ির ধরণের ক'রে নেওয়া প্রয়োজন হবে।

এ-ঐ-ও-ঔ লিখতে এখনকার এ-কার ঐ-কার ও-কার ঔ-কারের চেয়ে বেশী সময় লাগে না; সেইজন্যে মনে হয়, এইগুলিকেই একটু বদলে অথবা বেশ খানিকটা ছোট ক'রে লিখে এ-কার ঐ-কার ও-কার ঔ-কারের কাজ যদি আমরা

চালাই, কোনও দিক্‌ দিয়েই অসুবিধা কিছু হয় না। ছোট ক'রে লিখবার কথায় মনে পড়ল, আমার প্রস্তাবিত লিপিতে মূল বর্ণগুলি এবং অ যদি প্রস্থে পাঁচ মাত্রা স্থান জোড়ে, অ-কার আ-কার ই-কার ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনিচিহ্নগুলি এবং অনুস্বার-বিসর্গ-চন্দ্রবিন্দু, য-ফলা, র-ফলা ও হস্‌চিহ্ন ন্যূনাধিক ½ মাত্রা স্থান জুড়বে। টাইপরাইটারের key-board-এ এদের কথা ভেবে এক সার চাবির জন্যে আলাদা level-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পরিচয়ের সীমানা খুব বেশী ছাড়িয়ে না গিয়ে সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনিচিহ্নগুলির চেহারা মোটামুটি যত রকমের হতে পারে ব'লে আমার মনে হয়েছে তার একটা ছক এবারে দিচ্ছি:

অ৴

অ।

অী অী

অী

অ্‌ অ্ঁ

অ্‌ অ্‌

অ্‌ অ্‌

অ্‌

অএ অ্‌ অ্‌ অ্‌

অঐ অ্‌ অ্‌ অ্‌

অও অী অ্‌

অঔ অী অ্‌

এর মধ্যে একেবারে প্রথম সারের অক্ষরগুলোর আমি পক্ষপাতী।

এই অক্ষরগুলিকে আমাদের স্বরবর্ণমালা ব'লে গ্রহণ করলে বাংলা লিপি সম্পূর্ণ বাংলা লিপিরই জাতের থেকে যাবে এবং অন্যের দাসত্ব তাকে হতে হবে না। ·č, এই চিহ্নটি কেবল আমাদের লিপির থেকে বাদ পড়বে; v, এই একটি মাত্র নূতন চিহ্ন আমরা নেব। উ, ঊ থাকবে না, কিন্তু ড থাকবে, আঁকড়িও থাকবে। ঈ যাবে, কিন্তু হ থাকবে; ঈ-র হাড়গোড় ভাঙা চেহারাটার আদল দ-এর মধ্যে রয়ে যাবে খানিকটা। যুক্তাক্ষর থাকবে না ব'লে ত্র, ক্র, ত্ত, ক্ত বাদ পড়বে, কাজেই এ এবং ও যদি যায় ত একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েই যাবে, কিন্তু অক্ষর দুটি সুদৃশ্য; আমার প্রস্তাবিত স্বরবর্ণমালা গৃহীত হলে এদেরকেও ছাড়তে হবে না। ব্যাবৃত এ বোঝাবার জন্যে এ-র দাঁড়িটাকে টেনে নীচ অবধি নামিয়ে দিতে পারা যাবে; যেন এ-কার এবং আকার মিলিয়ে তৈরি হবে অক্ষরটা; ব্যাবৃত এ-র উচ্চারণও সেই জাতীয়ই ত বটে। সূত্র হবে: তৎসম শব্দের একার এবং এ বাংলায় দু'রকমে উচ্চারিত এবং দুরকম লেখা হয়ে থাকে। হাতের লেখায় এ-ঐ-ও-ঔকে ছোট ক'রে লিখতে কেউ না চান, লিখবেন না; ই-কার ঈ-কারের, ঐ-কার ঔ-কারের আঁকড়ি হাতের লেখায় অন্য অক্ষরের উপরে চ'লে এলেও কিছুই এসে যাবে না; উ-কার, ঊ-কার, ঋ-কার ও হস্‌ চিহ্ন এখনকার মত ক'রেই লেখা চলবে।

যাঁরা বাংলা লেখাপড়া জানেন, তাঁরা অ-কার চিহ্নটিকে একবার দে'খে নিলেই প্রস্তাবিত নূতন লিপির লেখা অনর্গল পড়তে পারবেন, অনায়াসে লিখতেও পারবেন। নাগরী লিপি একটানে লেখা যায় না, বাংলা সে তুলনায় অনেক বেশী একটানা লেখা যায়, প্রস্তাবিত লিপিও ততটাই বা তার চেয়েও বেশী একটানা লেখা চলবে।

নূতন শিক্ষার্থীদের আর দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে হাবুডুবু খেতে হবে না। পুরুষানুক্রমিক অশিক্ষায় দুর্বলবুদ্ধি, এদেশের লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর লোক এর পর দেশের ভাষার বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় সাধন করতে দলে দলে এগিয়ে আসবে। মাত্র ৫৭টি অক্ষর, ১০টি সংখ্যাচিহ্ন এবং বিরামচিহ্ন কয়েকটি আয়ত্ত করতে পারলেই তাদের বাংলা পাঠ-পরিচয় সমাপ্ত হবে। যে-সমস্ত বই নূতন লিপিতে ছাপা হয়ে উঠবে না বা ছাপা হতে দেরি হবে, পূর্ণাবয়ব গোটাপাঁচেক স্বরবর্ণ, একার চিহ্নটি যার সঙ্গে আকার এবং আঁকড়ি জুড়ে ঐকার ওকার এবং ঔকার তৈরি হয়, রফলা, রেফ এবং চার-পাঁচটি যুক্তাক্ষর চিনে নিলেই সে সমস্ত বইও তারা পড়তে পারবে; বাকী যুক্তাক্ষরগুলিতে যুক্ত অক্ষরগুলির চেহারা বেশ স্পষ্ট, যেজন্যে যুক্তাক্ষর আর থাকবে না বলে দুঃখ করবার আমাদের কিছু নেই। অক্ষরগুলি জড়াজড়ি করে তালগোল না পাকিয়ে পাশাপাশি বসলে যদি আমাদের কাজ চলে ত চলুক না? সচ্ছল, আহ্বান লিখতে চ-ছ এবং হ-বকে পাশাপাশি বসিয়েই এখনও অনেকে লিখে থাকেন।

যুক্তাক্ষর থাকবে না এবং অকার, উকার, ঊকার ঋকার,

চন্দ্রবিন্দু, হস্‌চিহ্ন পাশে বসবে বলে প্রেস্তের দিকে জায়গা জুড়বে খানিকটা বেশী ; কিন্তু প্রস্তাবিত লিপি তিন থাকের বদলে দুই থাকে লেখা হবে ব'লে হরেদরে আমাদের পুষিয়ে যাবে।

পুর্ব্বেও বলেছি, আবার বলছি, আমার প্রস্তাব গৃহীত হলে ছাপাখানার মালিকদের এক পয়সা খরচ হবে না। গোটাদশেক নূতন টাইপ ঢালাই করিয়ে নিতে যা খরচ পড়বে, বর্জ্জিত অক্ষরগুলির টাইপ ওজনদরে বিক্রয় ক'রে তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁরা লাভ করবেন।

প্রস্তাবিত লিপিতে টাইপরাইটার, লিনোটাইপ, টেলিগ্রাফ, টেলিপ্রিন্টার প্রভৃতির কাজ অনায়াসে চলবে। এক কথায়, যে-লিপি আজ তার অসংখ্য অযোগ্যতা, অসম্পূর্ণতা, জটিলতা, বিশৃঙ্খলতা প্রভৃতি নিয়ে মধ্যযুগীয় লিপির পর্য্যায়ে পড়ে রয়েছে, কোথাও কোনোও বিপ্লব না বাধিয়ে, কারও কোনোও অসুবিধা না ঘটিয়ে এক দিনে তাকে সমস্ত দিক্ দিয়ে সুসম্পূর্ণ ও বর্ত্তমানকালোপযোগী ক'রে নেওয়া যেতে পারে। এ লিপি যে সর্ব্বতোভাবে আমাদের পক্ষে রোমক লিপি অপেক্ষাও ঢের বেশী কাজের হবে, সংস্কৃত এবং সংস্কৃতমূলীয় ভাষাগোষ্ঠীর বর্ণমালার শ্রেষ্ঠতা যে কি নিয়ে এবং কোথায় তা যাঁরা জানেন, তাঁদের সেটা আর ব'লে বুঝিয়ে দিতে হবে না।

রাজস্থানী সাহিত্যে বীররস

অধ্যাপক শ্রীঅযোধ্যানাথ শাস্ত্রী

ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যে রাজস্থানী সাহিত্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। রাজস্থানী সাহিত্যে যে উদ্দীপনাপূর্ণ ভাবধারার সন্ধান পাওয়া যায় তাহা কেবল রাজস্থানেরই নয়, সমস্ত ভারতের পক্ষেই অতি গৌরবের বিষয়। রাজস্থানী কবিদের বীররসাত্মক কবিতা এত সুন্দর ও এত উন্নত যে তাহার সমকক্ষ কবিতা ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় বিরল। ইহার কারণ এই যে, রাজস্থানী কবিরা কেবল নিজেদের কল্পনা-বলেই ঐরূপ কবিতা রচনা করেন নাই, প্রত্যুত সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াই তাঁহারা লিখিয়াছেন। রাজস্থান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর-প্রসূ ভূমি। যুদ্ধবিগ্রহ তত্রত্য ক্ষত্রিয়দের একটি দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে নৃপতিদের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য কবিগণ উপস্থিত থাকিতেন। কেবল উৎসাহ-দানেই তাঁহাদের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না ; অবসর পাইলে, তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া তাঁহারা শত্রুর শিরচ্ছেদ করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না।

সেইজন্যই রাজস্থানী ভাষায় এত সুন্দর বীররসপ্রধান কাব্য রচিত হইতে পারিয়াছে। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় যে কাব্যের অভাব তাহা নহে ; তবে সেগুলিতে মুখত: রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়কে অবলম্বন করিয়া কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ভক্তি-কাব্যের সৃষ্টিও রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছে। বাংলা ভাষায়ও চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ স্ব স্ব কাব্যে ভক্তি-ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। আমাদের ভক্ত কবিগণ যে স্থলে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতরভাবাপন্না গোপিনীদের অশ্রুবারিধারায় কাব্যাঙ্গন সিক্ত করিয়াছেন, সেস্থলে রাজস্থানী কবিগণ, শত্রুগণের শতধাখণ্ডিত শরীর ও ছিন্ন-মস্তক হইতে নিঃসৃত শোণিতে যুদ্ধক্ষেত্র রঞ্জিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। রাজস্থানী কবিদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও এক সময় বলিয়াছিলেন—"ভারতের প্রত্যেক প্রান্তেই ভক্তিরসের কাব্য পাওয়া যায়, রাধা-কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক প্রান্তই উচ্চ কিম্বা নিম্নস্তরের সাহিত্য উৎপন্ন করিয়াছে ; কিন্তু রাজস্থান নিজের রক্ত প্রবাহ করিয়া যেরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার তুল্য সাহিত্য অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।"

ভাষা :—রাজস্থানী কবিগণ দুই প্রকার ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন- (১) পিঙ্গল ও (২) ডিঙ্গল ভাষায়। মীরাবাঈ, বৃন্দ ও বিহারী প্রভৃতি কবিগণ পিঙ্গল ভাষায় লিখিয়াছেন এবং চন্দরবরদাঈ, দুরশাজী, পৃথ্বীরাজ প্রমুখ কবিগণ ডিঙ্গল ভাষায় লিখিয়াছেন। ভক্ত কবিদের মধ্যে মীরা এবং শৃঙ্গারী কবিদের মধ্যে বিহারীর স্থান অতি উচ্চ। মীরার কৃষ্ণ-ভক্তির গীত কোন্ হিন্দু নরনারীর হৃদয়ে না ঝঙ্কৃত হইয়া থাকে ? তবে আমরা প্রস্তাবিত প্রবন্ধে বীর-রস-প্রধান কাব্য সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। বীর-রস-প্রধান কাব্য প্রায় ডিঙ্গল ভাষাতেই লিখিত।

ডিঙ্গল-ভাষা ও তাহার উৎপত্তি :—ডিঙ্গল ভাষা রাজস্থানের কথিত ভাষারই সাহিত্যিক রূপ। পিঙ্গল ভাষার অপেক্ষা ইহা অধিক প্রাচীন, সাহিত্যগুণ সম্পন্ন ও ওজঃগুণবিশিষ্ট। ইহার উৎপত্তি অপভ্রংশ হইতে হইয়াছে। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ও প্রাকৃত হইতে অপভ্রংশ ভাষার উৎপত্তি। ষষ্ঠ কিম্বা সপ্তম বিক্রম-শতকে অপভ্রংশই লোক-ভাষার রূপ ধারণ করিয়াছিল। ভাষাতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, বিক্রমের সপ্তম শতক হইতে দশম শতক পর্য্যন্ত কেবল রাজস্থানেই নয়, সমস্ত উত্তর-ভারতে

এই অপভ্রংশই লোক-ভাষার রূপ ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু পরবর্তী কালে ইহাও প্রাকৃতের ন্যায় সাহিত্যিকতার গণ্ডীতে আবদ্ধ হইলে, এই অপভ্রংশ হইতে আবার তিনটি উপভাষার সৃষ্টি হইল—(১) নাগর; (২) উপনাগর ও (৩) ব্রাচড়। নাগর অপভ্রংশ হইতেই রাজস্থানী ভাষার জন্ম। আর রাজস্থানী ভাষার যে সাহিত্যিক রূপ তাহাই হইল ডিঙ্গল-ভাষা।

ব্যুৎপত্তি:—ডিঙ্গলের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক বিদ্বানের অনেক মত।

(১) ডক্টর এল. পি. ট্যাসিটরী বলিয়াছেন,—"ডিঙ্গলের আসল অর্থ অনিয়মিত কিম্বা চাষার ভাষা। ব্রজভাষা পরিমার্জ্জিত ও সাহিত্য-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল; কিন্তু ইহা তাহার বিপরীত—অপরিমার্জ্জিত ও অনিয়ন্ত্রিত ছিল বলিয়া ইহাকে ডিঙ্গল বলা হইত।"১

(২) ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন,—"প্রারম্ভে এই ভাষার নাম 'ডগল' ছিল, পরে "পিঙ্গল" শব্দের সহিত অক্ষর-মিলন করিবার জন্য ইহার নামকরণ "ডিঙ্গল" করা হইয়াছে।"২

দুইটি মতই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সাহিত্যিক রূপ পাইবার পরেই যখন ইহা "ডিঙ্গল" নামে প্রসিদ্ধ হইল, তখন ইহাকে অশিক্ষিত চাষীর ভাষা বলা চলে না। আর "ডগল" বলারই বা কি অর্থ? ডগল শব্দের অর্থে মাটির ঢেলা বুঝায়। মাটির ঢেলার মত রুক্ষ ও অনিয়ন্ত্রিত বলাও সঙ্গত মনে হয় না। কারণ চতুর্দ্দশ শতকের ব্রজ ভাষাকে অনিয়ন্ত্রিত বলা চলে না। রাজস্থানীর কথিত ভাষা অপেক্ষা ইহা অবশ্যই পরিমার্জ্জিত ছিল নচেৎ সাহিত্যিক রূপেই বা পরিণত হইল কেন?

(৩) স্বামী পুরুষোত্তম দাস বলিয়াছেন,—"ডিম্+গল হইতে ডিঙ্গল শব্দ হইয়াছে। ডিম্ শব্দের অর্থ ডমরুর ধ্বনি। ডমরু বাজিলে ডিম্ ডিম্ শব্দ হয়, এবং ইহা রণচণ্ডীর আবাহন করিয়া থাকে। ডমরুর ধ্বনি শুনিলে বীর-হৃদয়ে অপূর্ব্ব উৎসাহ জাগ্রত হয়। মহাদেব বীর-রসের দেবতা, আর মহাদেবের বাদ্য ডমরু। কণ্ঠ হইতে যে কবিতময়ী ভাষা বহির্গত হইয়া ডিম্ ডিম্ ধ্বনির মত বীর-হৃদয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি করে, সেই ভাষাকে ডিঙ্গল-ভাষা বলা হয়। ডিঙ্গল-ভাষায় এইরূপ কবিতারই প্রাধান্য।৩

কেহ কেহ বলেন যে, ডিঙ্গল প্রথমে চারণ ও ভাটদের ভাষা ছিল। উহারা নিজ নিজ আশ্রয়দাতাদের কার্য্যকলাপের, শৌর্য্য-পরাক্রমের বর্ণনা অতিশয়োক্তিপূর্ণ ভাষায় করিত। অর্থের লোভে কাপুরুষকে শূর, কুরূপকে সুরূপ, মূর্খকে পণ্ডিত, কৃপণকে অতি দাতারূপে বর্ণনা করা তাহাদের স্বভাব ছিল। আসলে কবিতা রচনা করা ছিল তাহাদের জীবিকা। যেরূপ বর্ণনা করিবার নিমিত্ত যে আশ্রয়দাতা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিত, তাহার ঠিক সেইরূপ বর্ণনা করা হইত। সেইজন্য অতি ভাষণ করা অর্থে বর্ত্তমান ডীঙ্গ শব্দ হইতে ডীঙ্গল ব্যুৎপন্ন হইল। যাহার দ্বারা অতিশয়োক্তিপূর্ব্বক বর্ণনা করা হয়, সেইরূপ ভাব-ব্যঞ্জনায় ডীঙ্গল শব্দ প্রযুক্ত হইতে লাগিল। যেমন শীতল, শ্যামল শব্দের অর্থে শীতযুক্ত ও শ্যামযুক্ত বুঝায় সেইরূপ ডীঙ্গযুক্ত অর্থে প্রযুক্ত ডীঙ্গল শব্দ পরে ডিঙ্গল হইল। আজ পর্য্যন্ত রাজপুতানার বৃদ্ধ চারণ-ভাটগণ "ডীঙ্গল" এইরূপ দীর্ঘ ঈকারযুক্ত রূপই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ডিঙ্গল শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ অনেক মত দেখা যায়।

ডিঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিকতা:—একাদশ ও দ্বাদশ শতকের মধ্যে ডিঙ্গল কাব্য অতি অল্প মাত্রায় রচিত হইয়া ছিল। উপরন্তু যাহা রচিত হইয়াছিল, তাহা সাধারণ কোটির। মুসলমানের আক্রমণ হওয়ার পর হইতেই ডিঙ্গল কাব্যের ইতিহাস আরম্ভ হয়। সঙ্কট হইতে দেশরক্ষা করিবার নিমিত্ত, সে সময়ে রাজা-মহারাজাদের অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় করিতে হইত। স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই সৈন্য-বল ও শস্ত্রবল মজুত রাখিতে হইত। ইহার সঙ্গে কবিদেরও প্রয়োজন হইত। তাহাদের কাজ ছিল বীর-রসপূর্ণ কবিতার দ্বারা যোদ্ধাদের প্রোৎসাহিত করা। যোদ্ধাদের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করিবার জন্যই ডিঙ্গল কাব্যের সৃষ্টি। ঐ সময়ে ঐরূপ কাজ প্রায় চারণ-ভাটরাই করিত। তাহারা উচ্চশ্রেণীর কবি তো ছিলই, যোদ্ধা হিসাবেও কম যাইত না। প্রয়োজন হইলে শত্রুদের সম্মুখীন হইয়া সংগ্রাম-নৈপুণ্য দেখাইত। চন্দর বরদাঈ, দুরশাজী প্রভৃতি কবিগণ এই শ্রেণীর ছিলেন। ইঁহারা ধনসম্পদ লাভ ও প্রতিষ্ঠা লিপ্সায় কাব্য-কলা-কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য অনেক সময় ব্যয় করিতেন, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্যলাভ করিতেন। প্রারম্ভে ডিঙ্গল ভাষায় কাব্য-রচনা চারণ-ভাটদেরই একচেটিয়া ছিল বটে, কিন্তু যখন ইহার সম্মান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরাও ঐ ভাষায় কাব্য-রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—জ্যোতিষ, বেদান্ত, ধর্ম্ম, নীতি ও শালিহোত্র আদি বিষয়েও অনেক গ্রন্থ এই ভাষায় লেখা হইল।

মহাকবি চন্দরবরদাঈ—ডিঙ্গল ভাষার সুপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন কবি চন্দরবরদাঈ জাতিতে ভাট ছিলেন। লাহোরে ইঁহার জন্ম। চন্দের জন্মকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কথিত আছে যে, ইঁহার আশ্রয়দাতা পৃথ্বীরাজ ও ইনি একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথ্বীরাজের জন্মকাল বৈক্রম সম্বৎ ১২০৫। তাহা

(১) *Journal of the Asiatic Society of Bengal* Vol X, No 10, p, 376.

(২) Preliminary report on the operation in search of MSS. of Bardic chronicles, p. 15.

(৩) নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা, ভাগ ১৪, পৃ. ১২২।

হইলে চন্দের জন্মকাল ইহার কাছাকাছি সময়েই বুঝিতে হইবে।

অজমেরের চৌহান বংশীয় ক্ষত্রিয়দের সহিত ইঁহার পূর্ব্ব-পুরুষের সম্বন্ধ ছিল। ঐরূপ পরম্পরাগত সম্বন্ধ থাকায় শৈশবকাল হইতেই পৃথ্বীরাজ চৌহানের সহিত চন্দের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। পৃথ্বীরাজের মতই ইনিও অশ্বারোহণে, অসি-সঞ্চালনে ও তীর নিক্ষেপে অতিশয় দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজও ইঁহাকে রাজ-কবিরূপে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ইনি যুদ্ধক্ষেত্রে ওজস্বিনী কবিতা রচনার দ্বারা আশ্রয়দাতা পৃথ্বীরাজ ও তাঁহার সৈনিকগণকে প্রোৎসাহিত করিতেন এবং অবসর পাইলে স্বীয় রণনৈপুণ্যের পরিচয়ও দিতেন। চন্দরবরদাঈ ব্যাকরণ, সাহিত্য, ষড়ভাষা, ছন্দঃশাস্ত্র, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ ও সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ইনি "পৃথ্বীরাজ রাসো" নামক পৃথ্বীরাজের সুবৃহৎ জীবনকাহিনী রচনা করেন। "পৃথ্বীরাজ রাসো" গ্রন্থের বিশদ আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; তবে সংক্ষেপে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে "পৃথ্বীরাজ রাসো" উৎকৃষ্ট মহাকাব্যসমূহের সগোত্র। ইহাতে প্রায় এক লক্ষ কবিতা দৃষ্ট হয়। ইহার ভাষায় সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের সংমিশ্রণ দেখা যায়, কোন কোন স্থানে আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষার শব্দও দেখা যায়। বীর-রস-প্রধান এরূপ সুন্দর মহাকাব্য দুর্লভ।

পৃথ্বীরাজের সঙ্গে গজনীদেশের শাহবুদ্দীন ঘোরীর যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধের জীবন্ত বর্ণনা এই মহাকাব্যে পাওয়া যায়। উদাহরণের জন্য চন্দরবরদাঈয়ের একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, পাঠকগণ ইহা হইতে তাঁহার রচনা-নৈপুণ্যের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন—

কবিতাটি এইরূপ—

মচে কূহকূহং বহে সার সারং
চমক্কৈঁ চমক্কৈঁ করারং সুধারং।
ভভক্কৈ ভভক্কৈ বহে রত্তধারং
সনক্কৈঁ সনক্কৈঁ বহৈঁ বাণ-ভারং॥

হুবক্কৈঁ হুবক্কৈঁ বহৈঁ বেল-ভেলং
হলক্কৈঁ হলক্কৈঁ মচী ঠেল ঠেলং।
কুকৈঁ কূক কুটি সুরতান ঠানং
বকী জোগ-মায়া সুরং অপ্পথানং॥

বহে চট্টপট্টং উলট্টং উলট্টং
কুলট্টা ধরৈ অক্ক অপ্পং উহট্টং।
দডক্কং বক্কৈ সদ মধ্যং সুটট্টং
কডক্কং বজৈ সেন-সেনা সুঘট্টং॥

বহে হথ্য পরমার সিরদার সারং
পরে সেন গোরী বহে বণ্ড ধারং।
পয়ুধ্যৌ খাঁ নিস্থুরত্তি সেনা সহিত্তং
হুঔ সুর মধ্যান দিল্লেস জিত্তং॥

মচে কূহ কূহং—(যুদ্ধে) হটগোল মাচিয়া গেল।

বহে সার সারং—সর্ সর্ শব্দ করিতে করিতে তরবারি চলিতে লাগিল। করারং সুধারং তীক্ষ্ণধার (অসি) চমকাইতে লাগিল। ভভক্কৈ ভভক্কৈ বহেবণ্ড ধারং—খল্ খল শব্দ করিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সনক্কৈঁ সনক্কৈ বহে বাণ ভারং—সন্ সন্ শব্দ করিতে করিতে বাণ সমুদায় চলিতে লাগিল হুবক্কৈঁ হুবক্কৈঁ বহে শেল ভেলং—ভল্ল (অস্ত্রবিশেষ) হবক হবক করিয়া শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট ও তথা হইতে নির্গত হইতে লাগিল। হলক্কৈঁ হলক্কৈঁ মচী ঠেল ঠেলং—হায় হায় ও ধাক্কাধাক্কি হইতে লাগিল। কুকৈঁকূক কুটি সুরতান ঠানং—সুলতানের সৈন্য মধ্যে হাহারব আরম্ভ হইল।

বহে চট্টপট্টং উলট্টং উলট্টং—(বীরগণ) অত্যন্ত ত্বরা সহকারে উল্‌টে পাল্‌টে (সামনে ও পশ্চাতে) বাণ চালাইতে লাগিল। ডক্কং বক্কৈসদ—ধনুক হইতে টঙ্কার শব্দ উত্থিত হইল। মধ্য সুটট্টং—(ধড় হইতে পৃথক হইয়া) গাদা গাদা ছিন্ন-মস্তক একত্রিত হইয়া গেল। কডক্কং বজৈ সেন-সেনা—সেনাদলের মধ্যে কড়াকা বাজিয়া উঠিল, অর্থাৎ আতঙ্ক বিস্তীর্ণ হইয়া গেল। সেনা সুঘট্টং—সৈন্যসমূহে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল।

বহে হথ্যপরমার সরদার সারং—পরমারবংশীয় ক্ষত্রিয়দের যাঁহারা সর্দার, তাঁহাদের হাত তীব্র বেগে চলিতে লাগিল। পরে সেন গোরী—শাহবুদ্দীন গোরীর সৈন্য পতিত হইল। বহেবণ্ড ধারং—রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। পয়ুধ্যো খাঁ নিস্থুরত্তি সেনা সহিত্তং—(সেনাপতি) নিস্থুরত্তি খাঁ সৈন্য সহিত (ভূ-পৃষ্ঠে) পতিত হইল। হুঔসুর মধ্যান দিল্লেসজিত্তং—মধ্যাহ্নকাল হইতে না হইতেই দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজের বিজয় লাভ হইয়া গেল।

এইরূপ বহু কবিতা আছে যাহা পাঠ করিবামাত্র পাঠকের হৃদয়ে বীররসের উদ্রেক হয় এবং প্রাচীন ভারতীয় শূরগণের অক্ষয়-কীর্ত্তির স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

(১৮১৩-১৮৮৫)

হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের প্রখ্যাত ছাত্রগণের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি নিজ কর্ম্ম ও আচরণ দ্বারা বাঙালী সমাজের অসাড় দেহে চেতনা সঞ্চারে সহায়তা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহন যৌবনে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা হইয়া যান। তিনি বরাবর হিন্দুর প্রচলিত ধর্ম্ম এবং রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, হিন্দু সমাজও তাঁহাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমা করিতে পারে নাই। তথাপি এতদুভয়ের সংঘাতে যে অমৃতের উদ্ভব হয় তাহা দ্বারা বঙ্গসমাজ নবজীবন লাভ করে এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করিয়া তোলে। এ দিক দিয়া কৃষ্ণমোহনের কার্য্যাবলী বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কৃষ্ণমোহন ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে কলিকাতার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জীবনকৃষ্ণের তিন পুত্রের মধ্যে কৃষ্ণমোহন মধ্যম, জ্যেষ্ঠের নাম ভুবনমোহন এবং কনিষ্ঠ কালীচরণ। কৃষ্ণমোহনের শৈশব ও কৈশোর নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে। কিন্তু এই দারিদ্র্যদোষ তাঁহার অন্তর্নিহিত গুণরাশিকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই।

পাঁচ বৎসর বয়সে কৃষ্ণমোহনের হাতে খড়ি হয়। ইহার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি ডেভিড হেয়ারের ঠনঠনিয়ার পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। ১৮২৯, ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষ্ণমোহন হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি ইংরেজীর সঙ্গে সংস্কৃতও রীতিমত অধ্যয়ন করেন। ১৮২৮ সনের প্রথমে তিনি কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং এই বৎসরের মাঝামাঝি মাসিক ষোল টাকার একটি বৃত্তি লাভ করেন। কলেজের অধ্যয়ন শেষ করিবার পরও যাহারা উচ্চতর বিদ্যা আয়ত্ত করিতে রত থাকিতেন তাঁহাদের জন্যও এইরূপ বৃত্তির ব্যবস্থা হইল। রাধানাথ শিকদার এইরূপ বৃত্তিভোগী ছিলেন।

এই সময়, দিল্লী কলেজে মাসিক আশী টাকা বেতনে একটি শিক্ষকতা কর্ম্মের প্রস্তাব আসিলে কৃষ্ণমোহন ইহা গ্রহণে সম্মত হন। কিন্তু কলিকাতার 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' দিল্লীর স্থানীয় কমিটির প্রস্তাবে মত না দেওয়ায় ইহা বাতিল হইয়া যায়। ইতিমধ্যে কৃষ্ণমোহনের বিবাহ হয়। ১৮২৯ সনের ১লা নবেম্বর কলেজীয় শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেন। ইহার পর তিনি স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। লোকে এই স্কুলটিকে হেয়ার সাহেবের স্কুল বলিত। কৃষ্ণমোহন ছাত্রাবস্থায় ডেভিড হেয়ারের নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করেন—এখানে এ কথার উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি ১৮৪৯, ১লা জুন হেয়ার স্মৃতিসভায় স্বয়ং বলিয়াছেন—

"... I may perhaps venture to say that I was indebted to him for a longer period than any in this assembly. At the age of six I became his boy an honor which I continued to enjoy as long as any other friend now present in this hall."*

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (যৌবনে)
[কোলসওয়ার্দি গ্রাণ্ট কর্ত্তৃক অঙ্কিত

হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর শিক্ষায় ছাত্রগণ এক নূতন প্রেরণা লাভ করিলেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে ছাত্রেরা প্রত্যেক বিষয়ই যুক্তি দ্বারা পরখ করিয়া লইতে আরম্ভ করেন। ১৮২৯ সনে তাঁহারা ডিরোজিওর সভাপতিত্বে একাডেমিক এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখানে ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, দেশপ্রেম প্রভৃতি নানা বিষয়েরই আলোচনা হইত। কৃষ্ণমোহন ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন না,

* *A Discourse delivered at the Hindu College on the Hare Anniversary, June 1, 1849*. By K. M. Banerjee,

এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। কিন্তু ডিরোজিওর শিক্ষা এবং এসোসিয়েশনের প্রভাব তাঁহার উপরও পড়িয়াছিল। কৃষ্ণমোহনের একটি জীবন-কাহিনী † ১৮৪২ সনের অক্টোবর সংখ্যা 'ইণ্ডিয়া রিভিয়ু'তে প্রকাশিত হয়। অনেকের বিশ্বাস, এই কাহিনীটি কৃষ্ণমোহনের স্ব-রচিত। ইহা হইতে উক্ত বিষয় আমরা সবিশেষ জানিতে পারি। তৎকালীন ছাত্রসমাজ তথা কৃষ্ণমোহনের উপর ডিরোজিওর

ডেভিড হেয়ার

শিক্ষা এবং আলোচনার প্রভাব সম্বন্ধে ইহাতে এই মর্ম্মে লিখিত হইয়াছে,—

"এই সময় হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দর্শন (Meta-physics) আলোচনার ধুম পড়িয়া যায়। কলেজের সহকারী শিক্ষক মিঃ এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি ছাত্রদের মনেও এই বিষয়ে প্রেরণা দিতেন। কৃষ্ণমোহন কলেজে ডিরোজিওর নিকট কখনও পড়েন নাই, তিনি এই সময় কলেজের বাহিরেই ছিলেন। তথাপি তাঁহাকেও ডিরোজিও প্রবর্ত্তিত আলোচনার ছোঁয়াচ লাগে; এবং তিনি নব্য হিন্দু সংস্কারক দলে যোগ দিয়া তাঁহাদের আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। এই সকল যুবক আপনাদের সত্যের বন্ধু এবং মিথ্যার শত্রু বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহারা দর্শন আলোচনায় নিবিষ্ট হইলেন এবং ঘোষণা করিলেন তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য হিন্দু পৌত্তলিকতার বিলোপ সাধন। তাঁহারা নৈতিক আদর্শের উপরেই জোর দিতেন। যদিও খেয়াল ব্যতীত অন্য কোন উচ্চতর ভাবধারায় তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হন নাই, তথাপি তাঁহারা সকল রকম পাপকর্ম্ম ত্যাগ করিতে এবং মনুষ্য-প্রকৃতির কলুষিত বাসনাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিতে লাগিয়া গেলেন। দেশবাসীরা তাঁহাদের নিকট দুইটি কারণে অবজ্ঞার বিষয় ছিল—(১) পৌত্তলিকতা এবং (২) পাপকর্ম্ম ও দূষিত চরিত্র। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সোৎসাহে ও সাহসের সঙ্গে অভিযান চালাইবার জন্য তাঁহারা পরস্পরের সহিত পাল্লা দিয়া চলিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন, প্রচলিত ধর্ম্মের রীতি-নীতি মানিয়া চলিলে তাঁহাদের মর্য্যাদাহানি ঘটিবে। যে-সব বিষয় কতকটা মানিয়া চলা আবশ্যক (যেমন, পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে শ্রদ্ধাভক্তি বা সম্মান-প্রদর্শন), তাহা নিতান্ত কাপুরুষের কর্ম্ম বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করিতে লাগিলেন।"

"হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিও নব্যদলের বিরোধিতা খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠে। বন্ধুদের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনও কয়েক রাত্রি কলিকাতার বড় বড় রাস্তায় ঘুরিয়া খ্রীষ্টান পাদ্রীদের নানা ভাবে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইলেন। তাঁহারা কখনও গস্‌পেল প্রচার করিবার ভান করিতেন, কখনও পাদ্রীদের বাংলা শব্দের ভুল উচ্চারণ অনুকরণ করিতেন, কখনও বা ভাষার বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যাংশ-গুলির ভুল প্রয়োগ দর্শাইয়া দিতেন।"

শীঘ্রই নব্যদলের একখানি মুখপত্রের প্রয়োজন অনুভূত হইল। এ সম্বন্ধে উক্ত কাহিনীতে আছে,—

"প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরিচালনায় ১৮৩১ সনে 'রিফর্ম্মার' সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইনি সংস্কারপন্থী ছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের সবকিছুরই বিরোধিতা করিতে হইবে (যাহা নব্যদল করিত), ইহা তিনি চাহিতেন না। নব্যদলের কোন মুখপত্র ছিল না। এ অভাব মিটাইবার জন্য ঐ বৎসর মে মাসে [১৭ই মে] কৃষ্ণমোহন 'এন্‌কোয়ারার' নামে একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। হিন্দুধর্ম্মের সমুদয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান হইত বলিয়া রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ইহার উপর ভীষণ খাপ্পা হইয়া উঠিল। সম্পাদক ও সাহায্য-কারীদের উপর গালিগালাজ বর্ষিত হইতে লাগিল।"

কৃষ্ণমোহনের গৃহেও নব্যদল সমবেত হইতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিতেন। তাঁহারা খাদ্যখাদক সম্বন্ধে কোনরূপ বাছ-বিচার করিতেন না। একদা তাঁহাদের মধ্যে এক জন প্রতিবেশীর গৃহে এক খণ্ড গো-হাড় নিক্ষেপ করেন। ইহার ফলে ঐ অঞ্চলে ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। হিন্দুর গৃহে গো-মাংস ভক্ষণ এবং তথা হইতে প্রতিবেশী হিন্দুর গৃহে গো-হাড় নিক্ষেপ—এ সব কথা পল্লবিত

† ৪৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় বর্ত্তমান লেখকের "কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়" প্রবন্ধে (পৃ. ১৪-৩৫) ইহার বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।

হইয়া শহরময় ছড়াইয়া পড়িল। ঠিক ঐ সময়টিতে কৃষ্ণমোহন গৃহে না থাকিলেও বন্ধুদের অপরাধ তাঁহার উপর বর্তিল। সমাজ-নেতাদের চাপে পড়িয়া তাঁহার অভিভাবকেরা তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্ত ধরিয়া বসিলেন। কৃষ্ণমোহন এই অন্যায় আদেশ মানিতে রাজী হইলেন না। অগত্যা তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে হইল। ইহার পর তিনি এক বন্ধুর গৃহে আশ্রয় পান। কিন্তু সেখানেও বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না, হিন্দু মহলায় কেহ তাঁহাকে ঘরভাড়াও দিল না। কৃষ্ণমোহন শেষে এক ইউরোপীয়ের বাড়ীতে বাসা ভাড়া করিয়া সেখানে চলিয়া যান, পত্রিকাও সেখান হইতে বাহির করিতে থাকেন। তিনি উক্ত ব্যাপারের জন্ত শুধু হিন্দু ধর্ম নহে, আত্মীয়-স্বজন হইতেও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন।

গৃহত্যাগের অব্যবহিত পরেই, ১৮৩১ সনের নবেম্বর মাসে কৃষ্ণমোহন *The Persecuted* নামে একখানা পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখিয়া প্রকাশ করিলেন। হিন্দু যুবকদের নামে ইহা উৎসর্গীকৃত হয়। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ গুরু-পুরোহিত এবং তথাকথিত পণ্ডিতদের দৌরাত্ম্য ও ভণ্ডামি এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দুর্নীতি, ব্যভিচার প্রভৃতিতে আসক্তির বিষয় এই নাটকে বর্ণিত হয়। পুস্তকখানি ঐ সময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে আলোচিত হয়। বলা বাহুল্য, খ্রীষ্টানগণ ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে কৃষ্ণমোহন পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফের সঙ্গে পরিচিত হইলেন। ডাফ উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া খ্রীষ্টতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। বৎসরখানেক এইরূপ উপদেশ ও শিক্ষালাভের দরুন কৃষ্ণমোহন ধীরে ধীরে খ্রীষ্টধর্মে অনুরাগী হইয়া উঠেন। শেষে নিজ 'এনকোয়ারার' পত্রে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সঙ্কল্পের কথাও তিনি ব্যক্ত করিলেন। ১৮৩২ সনের ১৬ই অক্টোবর ডাফের গৃহে তৎকর্তৃক কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। বন্ধুবর গোবিন্দচন্দ্র বসাককে এই উপলক্ষ্যে তিনি নিম্নের পত্রখানি লিখিয়াছিলেন,—

Wednesday, 16th October, 1832.

My dear friend,

Through the mercy of a Gracious Providence, I intend being baptized this evening at the house of the Rev. A. Duff, and as you were one of those with whom last year about this time, I began first to examine the claims of Christianity, it will give me great pleasure to see you witness my declaration before God and man, of what is now my faith, and my admission into the visible Church of Christ.

Your most affectionate friend,
Krishna Mohana Banerjea.*

পাদ্রী ডাফ স্কচ চার্চ ভুক্ত ছিলেন। দীক্ষা গ্রহণান্তর যুক্তিবাদী কৃষ্ণমোহন স্কচ চার্চের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিলেন না। ডাফ কর্তৃক দীক্ষিত হইলেও স্কচ চার্চের অনুবর্তী না হইয়া তিনি চার্চ অব ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। ইহার জন্ত তাঁহাকে ডাফ এবং তাঁহার অনুচরবর্গের নিকট কম নিন্দিত হইতে হয় নাই।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

কৃষ্ণমোহন এত দিন হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষকতা-কর্মে লিপ্ত ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাঁহাকে এই পদ ত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর তিনি চার্চ মিশনরী সোসাইটির কলিকাতা কমিটি কর্তৃক মির্জাপুর ইংরেজী স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে নিয়োজিত হইলেন। হেয়ার সাহেবের স্কুলে খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এই স্কুলে খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা পাঠ্য বিষয়ভুক্ত। কাজেই কৃষ্ণমোহন স্বীয় অভিরুচি অনুযায়ী এখানে ছাত্রদের শিক্ষাদানের সুযোগ পাইলেন। তিনি এ সময় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে এতই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন যে, ১৮৩৩ সালে ব্রজনাথ ঘোষ নামে এক অপরিণতবয়স্ক ছাত্রকে খ্রীষ্টান করিবার জন্ত

* *Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India, etc.* By Ramgopal Sanyal. Part I. 1894. Pp. 8, 9.

পিতৃগৃহ হইতে লইয়া আসেন। ইহা লইয়া কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা হয় এবং কৃষ্ণমোহন বিচারপতি সার এডওয়ার্ড র‍্যায়ানের বিচারে ব্রজনাথকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। কৃষ্ণমোহন ইহার পর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণে বাহির হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া ১৮৩৫ সনে নিজ স্ত্রীকে তদীয় পিতৃগৃহ হইতে আনিয়া খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিলেন।

চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে ১৮৩৬ সন নাগাদ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় কৃষ্ণমোহন স্কুল হইতে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আর্কডিকন ডিয়াল্ট্রি তাঁহার এক জন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারই সহায়তায় বিশপ কলেজে একটি বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি সেখানে কয়েক মাস অধ্যয়নে রত থাকেন। শেষে ১৮৩৭ সনে বিশপ কলেজের সংলগ্ন বেগম সমরুর গির্জ্জায় পাদ্রী হইলেন। ১৮৩৮ সালের শেষ দিকে কলেজে প্রাচ্য বিদ্যার আলোচনাতেও তিনি রত হন। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। অন্যান্যের সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীচরণকে তিনি এখানে বসিয়াই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন।

ডাফ, ডিয়াল্ট্রি প্রমুখ সে যুগের খ্যাতনামা পাদ্রীগণ হিন্দু সমাজে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে সতত ব্যাপৃত ছিলেন এবং তাঁহাদের কার্য্যে কৃষ্ণমোহন দক্ষিণহস্ত স্বরূপ বিবেচিত হইলেন। হিন্দু কলেজের যুব-ছাত্রদের মধ্যে খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারের জন্য ইহার সম্মুখভাগেই—বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের সীমানার মধ্যে একটি গির্জ্জা স্থাপনের আয়োজন হইল। আরও স্থির হইল যে, এখানে কৃষ্ণমোহন পাদ্রীর কার্য্য করিবেন। বিষয়টি প্রথম দিকে খুবই গোপন রাখা হয়। পরে যে দিন ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের কথা সেই দিন প্রাতঃকালে এ বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখনই হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট গমন করিয়া এ বিষয়ের প্রতিবাদ জানাইলেন। তিনিও কালবিলম্ব না করিয়া লর্ড বিশপকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে দিয়া ইহা বন্ধ করিয়া দিলেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষ ঐ স্থানের পরিবর্তে হেদুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পাদ্রীদের এক খণ্ড ভূমি ক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিলেন। প্রস্তাবিত গির্জ্জা এইখানেই প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিল। ১৮৩৯, ২৭শে সেপ্টেম্বর গির্জ্জার দ্বার উন্মোচন হয়, ইহার নামকরণ হইল ক্রাইষ্ট চার্চ্চ। কৃষ্ণমোহন ইহার ভারপ্রাপ্ত হইয়া ঐ বৎসরই আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হইলেন। নিজ অভিরুচি মত খ্রীষ্টধর্ম্মালোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র এতদিনে তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

কৃষ্ণমোহন ১৮৫২ সন পর্য্যন্ত প্রায় তের বৎসর ক্রাইষ্ট চার্চ্চের আচার্য্য-পদে বৃত থাকেন। এখানে তিনি বরাবর বাংলায় প্রার্থনা করিতেন। কিছুকাল যাবৎ প্রতি রবিবারে তিনি যে প্রার্থনা করিলেন তাহা একত্র করিয়া তিনি ১৮৪০ সনে 'উপদেশ কথা' নামে প্রকাশ করেন। এই বৎসর স্ত্রী-শিক্ষার উপরেও ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দুই শত টাকা পুরস্কার পান। কিন্তু কি বক্তৃতা কি রচনা প্রত্যেকটিতেই তিনি খ্রীষ্ট-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি ১৮৩৯ সনে পাদ্রী ডিয়াল্ট্রির সঙ্গে কৃষ্ণনগরে গিয়া বহু শত হিন্দুকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিলেন। ডাফ, ডিয়াল্ট্রি প্রমুখ শ্বেতাঙ্গ পাদ্রীদের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনও গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে হিন্দু সমাজে খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচার এবং হিন্দু সন্তানগণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাদান ব্যাপারে অত্যধিক তৎপর হইয়া উঠেন। রামমোহন রায়কে কৃষ্ণমোহন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেও তৎপ্রবর্তিত ব্রাহ্ম বা বৈদান্তিক ধর্মের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী-সভার কার্য্যকলাপ তাঁহার তীব্র সমালোচনার হাত হইতে নিস্তার পায় নাই। তত্ত্ববোধিনী-সভার সভ্যগণ বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনাকালে প্রতীচ্য যুক্তিবাদের আশ্রয় লইতেন, এইজন্য ইহাকে বিলাতী বেদান্তবাদ বলিয়া কৃষ্ণমোহন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেন না। পাদ্রী ডাফ *India and India Missions* শীর্ষক এক পুস্তক লিখিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কশাঘাত করিতে কসুর করেন নাই। এইরূপে যখন শ্বেতাঙ্গ পাদ্রীগণ এবং কৃষ্ণমোহন প্রমুখ ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানেরা হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে নানা ভাবে আক্রমণ করিতে থাকেন তখন হিন্দু সমাজেও ইহার প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল। পাদ্রীগণ তাঁহাদের অবৈতনিক স্কুলগুলিকে খ্রীষ্টানীর কেন্দ্র করিয়া তুলেন। হিন্দুনেতৃবর্গও অনুরূপ অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া খ্রীষ্টানীর স্রোত রোধ করিতে প্রয়াসী হন। পূর্ব্বে সরকার খ্রীষ্টান পাদ্রীদের বড় একটা আমল দিতেন না। এ সময় কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিশেষ করিয়া শিক্ষা ব্যাপারে তাহাদের পরামর্শ গৃহীত হইতে লাগিল। কৃষ্ণমোহনের সহায়তায় হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৪৩ সনে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে কৃষ্ণমোহন স্বয়ং ১৮৫১ সনের ১০ই জুলাই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। চতুর্থ দশকে হিন্দু কলেজের কোন কোন শিক্ষক ও ছাত্রদের মাঝে মাঝে খ্রীষ্টান হওয়ার দরুন কলেজের অধ্যক্ষ-সভা এবং কাউন্সিল অব এডুকেশনের মধ্যে খিটিমিটি উপস্থিত হইত। অধ্যক্ষ-সভা চাহিতেন যাহাতে হিন্দু ব্যতীত অন্য কেহ কলেজের সংস্পর্শে না আসে। কাউন্সিল অব এডুকেশন ইহাকে সকল শ্রেণীর বিদ্যাগার করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। খ্রীষ্টান আন্দোলনের শেষ পরিণতি হইল ১৮৫০ সনে দেশীয় খ্রীষ্টানদের সপক্ষে 'লেকস লোসি' বা ধর্মান্তরিতদের পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার-দানমূলক আইনের মধ্যে। খ্রীষ্টান প্রচারক এবং হিন্দু সমাজের মধ্যে সংঘর্ষ হেতু কতকগুলি সুফলও ফলিয়াছিল। হিন্দু সমাজের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন গলদের দিকে

সমাজপতিগণের দৃষ্টি পড়ে এবং তাঁহারা সময়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া ইহাকে দোষমুক্ত করিয়া তুলিতে উদ্যোগী হন। কৃষ্ণমোহন প্রমুখ খ্রীষ্টান প্রচারকগণের আক্রমণাত্মক কার্য্যের ফলেই ইহা দ্রুত সম্ভব হইয়াছিল বলিতে হইবে।

কৃষ্ণমোহন কায়মনে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে রত হইলেও এই সময়ে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনায়ও মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের সতীর্থগণের সঙ্গে একযোগে তিনি এ সকল কর্ম্মে লিপ্ত হন। ১৮৩০ সনে ডেভিড হেয়ারকে কলিকাতার ছাত্রসমাজ একখানি মানপত্র দেন। কৃষ্ণমোহন এ বিষয়ে বিশেষ তৎপর ছিলেন। এইজন্য অনুষ্ঠিত একটি সভায় তিনি সভাপতিত্বও করেন। ১৮৩৪-৩৫ সালে শিক্ষার বাহন লইয়া যে বিতর্ক উপস্থিত হয় তাহাতে নব্যবঙ্গ, বিশেষ ভাবে কৃষ্ণমোহন যোগদান করেন। তাঁহার এবং ডক্টর টাইটলারের মধ্যে এই সম্পর্কে ঘোরতর বাদ-প্রতিবাদ হয়। ইহা হইতে জানা যায়, তখন ইংরেজীর সমর্থন করিলেও কৃষ্ণমোহনের ধারণা ছিল—বাংলা একদা শিক্ষার বাহন হইবে। শত বর্ষ পরে কৃষ্ণমোহনের এই ধারণা কতকটা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার প্রথম অধিবেশনে ১৮৩৮ সনের ২৩শে মে কৃষ্ণমোহন ইতিহাস পাঠের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। যুবকগণের মধ্যে পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়সমূহে জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে এই সভা গঠিত হইয়াছিল। কৃষ্ণমোহন সংঘবদ্ধ ভাবে কার্য্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির সহযোগে রামগোপাল ঘোষ প্রধানতঃ রাজনৈতিক আলোচনার জন্য ১৮৪২ সালে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামে একখানি দ্বিভাষী পত্রিকা বাহির করেন। কৃষ্ণমোহন ইহার একজন নিয়মিত লেখক নির্ব্বাচিত হন। ইহার পর বৎসর ১৮৪৩ সনের ২০শে এপ্রিল তারিখে জর্জ্জ টমসনের সহায়তায় বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা একটি পুরাপুরি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইহার উদ্যোক্তা এবং পরিচালকদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন ছিলেন এক জন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পরে কৃষ্ণমোহন স্বয়ং একাধিক সংবাদপত্র সম্পাদনা করেন। 'সংবাদ-সুধাংশু' ১৮৫০, ৭ই সেপ্টেম্বর তাঁহারই সম্পাদনায় বাহির হয়। জন ক্লার্ক মার্শম্যান বিলাত গেলে তাঁহার স্থলে কৃষ্ণমোহন ১৮৫২ সনে 'গবর্ণমেণ্ট গেজেটে'র (বাংলা) সম্পাদক হইলেন। ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষা কল্পে আদায়ী চাঁদার দ্বারা হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড গঠিত হয়। উৎকৃষ্ট বাংলা প্রবন্ধ-লেখকদের ইহা হইতে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করা হইত। কৃষ্ণমোহন ইহারও এক জন পরিচালক ছিলেন। প্রতি বৎসর ১লা জুন তারিখে হেয়ার স্মৃতি-সভা হইত। কৃষ্ণমোহন ইহার একাধিক সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন, সভাপতিত্বও করিয়াছিলেন। সাহিত্য; ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দিবার জন্য সে যুগে উৎকৃষ্ট পুস্তকের অভাব ছিল। কৃষ্ণমোহন 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (ইংরেজী নাম—*Encyclopaedia Bengalensis*) নামে খণ্ডে খণ্ডে কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ইহার ইংরেজী-বাংলা এবং বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' ১৮৪৪ সনে প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণমোহন ইহারও লেখক শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

আলেকজাণ্ডার ডাফ

কৃষ্ণমোহন ক্রাইষ্ট চার্চ্চ হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নিকট একটি সরকারী কর্ম্মের প্রস্তাব আসে, তিনি ইহা গ্রহণ করেন নাই। এই বৎসরেই তিনি শিবপুরে বিশপ কলেজের দ্বিতীয় অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন। এই পদে তিনি একাদিক্রমে ষোল বৎসর অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৮৬৮ সনে উহা ত্যাগ করেন। বিশপ কলেজে অধ্যাপনা কালে যে প্রচুর অবসর পান তাহা তিনি সাহিত্য-চর্চ্চায় সম্যক্ রূপে নিয়োজিত করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কৃষ্ণমোহন বিশপ কলেজে আট হাজার টাকা দান করেন। বঙ্গ-ভাষায় খ্রীষ্ট-গ্রন্থ প্রকাশ এবং দরিদ্র ছাত্রদের পঠনপাঠনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে এই অর্থ প্রদত্ত হয়।

বীটন সাহেবের মৃত্যুর (১৮৫১, ১৩ই আগষ্ট) পর ডাঃ

মৌএটের চেষ্টায় পরবর্তী ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতায় তাঁহার নামের সঙ্গে জড়িত হইয়া 'বীটন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। সমসাময়িক রাজনীতির আলোচনা এখানে নিষিদ্ধ ছিল। শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা এখানে হইত। কলিকাতার পদস্থ ইংরেজ এবং বাঙালীগণ ইহার সঙ্গে যুক্ত হন। ইংরেজ ও বাঙালীর ইহা একটি প্রকৃষ্ট মিলন-কেন্দ্র হইল। কৃষ্ণমোহনও ইহার এক জন বিশিষ্ট সভ্য হইলেন। ১৮৬৭ সনে তিনি ইহার সহকারী সভাপতি হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংস্কৃত কাব্য, হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন, উচ্চশিক্ষায় প্রাচ্য বিদ্যার স্থান* প্রভৃতি নানা বিষয়ে কৃষ্ণমোহন এই সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'কেমিলি লিটারারি ক্লাব' নামে আর একটি সাহিত্য-সংঘ ১৮৫৭ সনের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণমোহন ইহার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হইলেন। ১৮৬৫ সনে অষ্টম বার্ষিকীতে তিনি ইহার সভাপতির কার্য্য করেন। এই সঙ্ঘও ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের একটি মিলনস্থল হইয়াছিল এবং এখানে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হইত। কৃষ্ণমোহন এই ক্লাবেও বহু বার প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত জেনারেল এসেম্ব্লি ইন্‌ষ্টিটিউশন, সেণ্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানেও ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে তিনি বক্তৃতা দিতেন।

প্রায় প্রতিষ্ঠা অবধিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের যোগাযোগ ঘটে। তিনি ১৮৫৮ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের মেম্বর নিযুক্ত হন। একবার তিনি "Faculty of Arts"-এর ডীন বা সভাপতি হইয়াছিলেন (১৮৬৭)। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটেরও তিনি সদস্য হন। শিক্ষণীয় বিষয়াদি নির্দ্ধারণে এবং পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনে কৃষ্ণমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে প্রথমাবধি বিশেষ রূপে সাহায্য করিতেন। প্রবেশিকা হইতে বি-এ পর্য্যন্ত বাংলা ও সংস্কৃতে তিনি বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষক ছিলেন। উড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি দেশভাষার পরীক্ষাও তিনি মাঝে মাঝে গ্রহণ করিতেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ উঠিয়া গেলে, সিবিলিয়ানদের দেশীয় ভাষাদি শিক্ষা দানের জন্য "বোর্ড অফ একজামিনার্স" গঠিত হয়। কৃষ্ণমোহন মাসিক দুই শত টাকা বেতনে এক জন 'একজামিনার' নিযুক্ত হন। তিনি সিবিলিয়ানদের বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী পরীক্ষা লইতেন।

কৃষ্ণমোহন হিন্দুকলেজে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য বিদ্যার যেমন, প্রাচ্য বিদ্যারও তেমনি পক্ষপাতী ছিলেন এবং বরাবর প্রাচ্য বিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছেন। বিশপ কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি সবটুকু অবসর ইহার চর্চ্চায় অতিবাহিত করেন বলা চলে। বিশপ কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণের পূর্ব্ব বৎসর ১৮৫১ সনে ইংরেজী অনুবাদসহ সংস্কৃতে 'পুরাণ সংগ্রহ' প্রকাশ করেন। ইহার পর হইতে তিনি সংস্কৃত তথা প্রাচ্য বিদ্যার চর্চ্চায় যে পুরাপুরি মনোনিবেশ করেন বীটন সোসাইটি এবং কেমিলি লিটারারি ক্লাবে পঠিত প্রবন্ধগুলি হইতে আমরা তাহার আভাস পাইয়াছি। কৃষ্ণমোহন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত এবং বেদের প্রামাণ্যতা সম্পর্কে ইংরেজীতে আলোচনামূলক *Dialogues on the Hindu Philosophy* প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকখানি তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 'ষড়দর্শন সংবাদ' নামে ইহার বঙ্গানুবাদ ১৮৬৭ সনে প্রকাশিত হয়। প্রাঞ্জল বাংলায় জটিল বিষয়ের আলোচনায় এখানি একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কৃষ্ণমোহন পরেও শাস্ত্রচর্চ্চা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ১৮৭৫ সনে 'ঋগ্বেদ সংহিতা'র কতকাংশ স্বকীয় টীকা এবং বেদপাঠ সম্পৃক্ত একটি ভূমিকাসহ প্রকাশিত করেন। এই বৎসরই তাঁহার বিখ্যাত *Arian Witness* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বেদে যাহার ইঙ্গিত, বাইবেলে তাহার অভিব্যক্তি—পুস্তকখানিতে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে। পুস্তকখানি খ্রীষ্টান দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লিখিত হইলেও ঐ সময় সুধীজনের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করে। এখানি তাঁহার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ইহার যে-সব সমালোচনা হয় তাহার নিরিখে ১৮৮০ সনে ইহার পরিপূরক স্বরূপ তাঁহার আর একখানি পুস্তক বাহির হয়। ছাত্রদের সংস্কৃতচর্চ্চার সুবিধার জন্য কৃষ্ণমোহন রঘুবংশের কতকাংশ কুমারসম্ভব এবং ভট্টিকাব্য সংস্কৃত টীকা ও ইংরেজী অনুবাদসহ প্রকাশিত করেন। তাঁহার টীকা যে বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ তাহা বলাই

---

*এই বিষয়ে কৃষ্ণমোহনের অভিমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,—

"Academic education for natives must, for years to come, comprise *both* English and Oriental literature; the one for introducing, the other for naturalising the enlightenment of Europe in Asia.

"It should not be *exclusively* English, it must have Sanscrit or Arabic by its side—for even the subtleties of which the late Ram Mohun Roy spoke are worth our study with a view to arrive at an accurate knowledge of the *mind* of our ancestors. The Sanscrit language and grammar have also an intrinsic value in a philological point of view, and throw much light on the origin of the human species and human language. The purity of the vernacular again depends in a great measure on the proper cultivation of Sanscrit. No scheme of education would be of much value that excludes the Oriental element from its higher offices."

—*The Proceedings and Transactions of the Bethune Society from November 10th 1859 to April 20th 1869*: "The proper place of Oriental Literature in Indian Collegiate Education." (A Lecture read before the Bethune Society, in February, 1868).

বাহুল্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৬ সনে মার্চ মাসে রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং মনিয়র উইলিয়ামসের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনকেও 'অনারারি ডক্টর অফ ল' উপাধিতে ভূষিত করেন। উপাধিদান কালে ভাইস-চ্যান্সেলর আর্থার হব্‌হাউস কৃষ্ণমোহনের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেন এখানে তাহা উল্লেখ করিতেছি,—

"He, too, has laboured long, honourably and successfully at the literature of his country. Of his *Dialogues on Hindu Philosophy*, it has been said by Dr. Hull that they are a 'mine of new and authentic indications.' His Bengal Encyclopaedia and other works have greatly advanced our knowledge of Indian literature, politics and religion. I may add that one who has left a revered name in this country, the late Bishop Cotton, when advocating the institution of Honorary Degrees, since 15 years ago, mentioned even then the name of Mr. Banerjea as a conspicuous example of those who might fitly receive such a Degree."*

কৃষ্ণমোহন ১৮৬৮ সনে বিশপ কলেজের অধ্যাপক-পদ ত্যাগ করেন। পেন্সন প্রাপ্ত হওয়ায় আর্থিক দুশ্চিন্তা হইতে তিনি অনেকটা মুক্তি পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহনের পাণ্ডিত্যের কথা বিদেশী পণ্ডিত মহলেও জানাজানি হইল। এই সময় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বোডেন প্রোফেসর' পদে তাঁহাকে নিয়োগের প্রস্তাব হয়, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। এই পদে ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসন দীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন। দেশ-বিদেশের বুধমণ্ডলীতেও কৃষ্ণমোহন যোগ্য আসন পাইলেন। ১৮৬৪ সনের ৪ঠা জুলাই তারিখে কৃষ্ণমোহন ও বিদ্যাসাগর মহাশয় বিলাতের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। কৃষ্ণমোহন বঙ্গের এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হইয়া পড়েন। তিনি নিজে দশটি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন—বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, উড়িয়া, ফারসী, উর্দ্দু, ইংরেজী, লাটিন, গ্রীক ও হিব্রু। সুতরাং সোসাইটির ভাষাতত্ত্ব বিভাগে কৃষ্ণমোহন বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ই. টমাস প্রভৃতিও তাঁহার সহিত কার্য্য করেন। কৃষ্ণমোহন কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিরও এক জন সদস্য ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে বঙ্গভাষার উন্নতি বিধানার্থ যে 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' হয় তাহাতেও তিনি যোগ দিতেন। বাংলা ভাষার উন্নতিমূলক যে-কোন প্রচেষ্টাই তাঁহার আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিত।

কৃষ্ণমোহন পূর্ব্বোক্ত বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির এক জন উৎসাহী সভ্য ছিলেন বটে, কিন্তু পৌরসংকার, কি রাজনৈতিক কার্য্যে সাক্ষাৎ ভাবে এতদিন যোগদান করেন নাই। বিশপ কলেজ হইতে অবসর গ্রহণের পর কিছুকালের মধ্যেই তিনি এই দুই বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হন। কৃষ্ণমোহন বিদেশীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও, আচারে আচরণে সম্পূর্ণ স্বদেশী ভাবাপন্ন ছিলেন। ভারতবর্ষের যাবতীয় উন্নতির

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (বার্দ্ধক্যে)
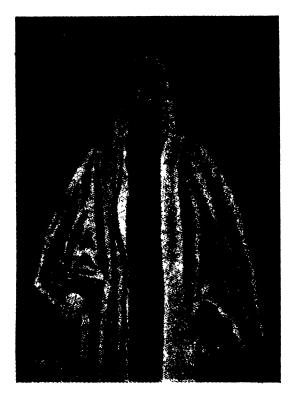
পক্ষে যে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ প্রয়োজন ইহা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন, এবং এই বিশ্বাস বলেই গত শতাব্দীর সপ্তম দশকের প্রত্যেক রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিয়া লন। শিশিরকুমার ঘোষের ইণ্ডিয়ান লীগের (১৮৭৫, সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত) তিনি সভাপতি হইলেন। তাঁহার সভাপতিত্ব কালে লীগের আনুকূল্যে এবং সরকারী ও বেসরকারী অর্থে কলিকাতায় একটি কারিগরি-বিদ্যা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়। আনন্দমোহন-সুরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত (১৮৭৬, জুলাই) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত-সভারও তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থা-দর্পণ প্রণেতা শ্যামাচরণ শর্ম্মসরকার ইহার প্রথম সভাপতি হন। সিবিল সার্বিসে ভারতীয় নিয়োগ, দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন, অস্ত্র আইন প্রভৃতির বিরুদ্ধে উক্ত সভা যে সব আন্দোলন চালায় বৃদ্ধ কৃষ্ণমোহন সে সকলেরই পুরোভাগে ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

* *Convocation Address*, Vol. I, pp. 342-3. Calcutta University.

তথা জমিদার সম্প্রদায়ের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও মুদ্রাযন্ত্র আইনের প্রতিবাদে ১৮৭৭ সনে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভা হয়, তাহাতে কৃষ্ণমোহন সভাপতিত্ব করেন। আবার এই আইন তুলিয়া লওয়া হইলে ১৮৮২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে টাউন হলে যে সভা হইল তাহাতেও তিনি সভাপতি হইলেন। ভারত-সভা সিবিল সার্বিস, মুদ্রাযন্ত্র আইন, অস্ত্র আইন প্রভৃতি সম্পর্কে বিলাতের জনসাধারণকে ভারতীয় মতামত অবগত করাইবার জন্য লালমোহন ঘোষকে প্রেরণ করেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে ১৮৮০ সনে ৪ঠা মার্চ তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এক বিরাট জনসভা হয়। ইহাতেও কৃষ্ণমোহন পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ সনে প্রধানতঃ ইণ্ডিয়ান লীগের আন্দোলনের ফলে কলিকাতা করপোরেশনে নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কৃষ্ণমোহন এই নবগঠিত করপোরেশনে একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। এখানেও তিনি সোৎসাহে কার্য্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস পালের সঙ্গে পৌরসভায় প্রায়ই তাঁহার মতদ্বৈধ হইত। কৃষ্ণদাস তাঁহাকে "hoary-headed Padre" বা 'পক্বকেশ পাদ্রী' বলিয়া নিজ 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেন। ১৮৮৩ সনে স্বদেশে ও বিদেশে রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনার জন্য বঙ্গে একটি ন্যাশনাল ফণ্ড বা জাতীয় ভাণ্ডার গঠিত হয়। এই ফণ্ডের টাকা তৎকালীন সরকারী ব্যাঙ্ক (ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল) গচ্ছিত রাখিতে অস্বীকৃত হইলে কৃষ্ণমোহন সভাপতি রূপে স্বয়ং গিয়া আমানত রাখিয়া আসেন। তাঁহার নিকট অসম্মতি প্রকাশ করিতে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ভরসা পান নাই। সুরেন্দ্রনাথ *A Nation in Making* পুস্তকে (পৃ. ৬১) কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে যথার্থই লিখিয়াছেন,—

"The Rev. Krishna Mohan Banerjea (better known as K. M. Banerjea) was among the earliest recruits to Christianity. A scholar and a man of letters, it was not till late in life that he began to take an active part in politics. He was associated with the Indian League and became president of the Indian Association . . . He was then past sixty; and though growing years had deprived him of the alertness of youth, yet in the keenness of his interest, and in the vigour and outspokenness of his utterances, he exhibited the ardour of the youngest recruit to our ranks. Never was then a man more uncompromising in what he believed to be the truth, and hardly was there such amiability combined with such strength and firmness."

সুরেন্দ্রনাথের এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে কৃষ্ণমোহনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাপকর্ম্ম, কুসংস্কার, দুর্নীতি প্রভৃতির প্রতি ঘৃণা এবং সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা—ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহারই শিক্ষাগুণে নব্যদল এই কয়েকটি গুণের অধিকারী হন। কৃষ্ণমোহনের জীবনে এ সমস্তই পরিষ্কার রূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণান্তর তাঁহার মধ্যে আস্তিক্যবুদ্ধিও জাগ্রত হয়। স্বদেশ-প্রেম তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। স্ব-সমাজের আবর্জ্জনা দূর করিয়া এবং বিদেশের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট সকলই গ্রহণ করিয়া আমরা স্বদেশকে বিশ্বসভায় উন্নত মস্তকে দাঁড় করাইব—কৃষ্ণমোহনের অভিপ্রায় এইরূপ ছিল। জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ সকলই আমাদের নিজস্ব। আমাদের এই নিজস্ব সম্পদ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি বরাবর সচেষ্ট ছিলেন। সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা দ্বারা তিনি দেশবাসীর অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। স্বদেশপ্রেমিক হইলেও কৃষ্ণমোহন যখনই সমাজকে আঘাত দেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করিয়াছেন, কোনরূপ দৌর্ব্বল্যবশতঃ তাহা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি প্রখর আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। খ্রীষ্টান পাদ্রীমহলেও যখন বর্ণগত বিভেদের সন্ধান পাইয়াছেন তখনও তিনি ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। ১৮৪৭ সনে কলিকাতার বিশপ তাঁহাকে সহকারীদের মধ্যে প্রথম স্থান দিলেও তাঁহার অধস্তন শ্বেতাঙ্গ সহকারীর সঙ্গে বেতনের তারতম্য করিলে তিনি ঐ পদ গ্রহণে অসম্মত হইলেন। শেষ জীবনে রাজনৈতিক কার্য্য পরিচালনেও তিনি অনুরূপ তেজ ও আত্মমর্য্যাদা দেখাইয়া গিয়াছেন। ১৮৮৫ সনের ১১ই মে কৃষ্ণমোহনের কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটে। তাঁহার মৃত্যুতে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই আত্মীয়বিয়োগের বেদনা অনুভব করিয়াছিল।
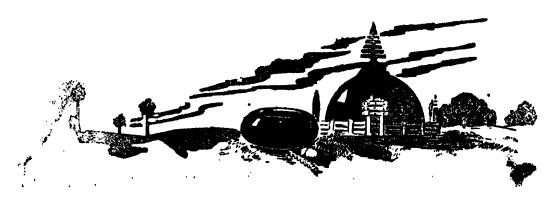
কয়েক বছর আগে কোনো একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে বই-টোকা অপরাধে সমস্ত পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়। কিন্তু কেন হয় তা হয় তো অনেকেই জানেন না। আমি বহু চেষ্টা করে সেটি আবিষ্কার করেছি। ঘটনাটি যে রকম ঘটেছিল আমি যথাসাধ্য বর্ণনা করছি।

পরীক্ষার প্রস্তুত হল। প্রায় ছশো পরীক্ষার্থী নিজ নিজ আসনে বসে গেছে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব থেকেই। তাদের খাতা বিতরণ পর্ব শেষ হয়ে গেছে, এবারে প্রশ্নপত্র আসছে।—প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র।

কিন্তু কালের কি রকম দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে, আশ্চর্য! যে কোনো লোকই এটা বুঝতে পারবে, কারণ আজকের দিনের পরীক্ষার্থীরা যে রকম চিন্তাশূন্য, ভয়ভাবনাশূন্য, আসন্ন প্রশ্নপত্রের অব্যবহিত পূর্বেও যেমন উদ্বেগশূন্য এবং যে রকম বেপরোয়াভাবে স্ফূর্তিযুক্ত তা অন্তত: প্রবীণ দর্শকের দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়।

পূর্বে তো এ রকম ছিল না। তখন পরীক্ষার্থীরা ইষ্টদেবতাকে বা গুরুজনকে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়ে জীবনের এই প্রথম ক্রান্তিমুহূর্তের জন্যে শান্ত গম্ভীর শুভচিত্তে এসে অপেক্ষা করত। তখন পরীক্ষার্থীদের অনেকেরই হাতে বাঁধা থাকত সর্বসিদ্ধি মাদুলী, অথবা কানে গোঁজা থাকত আশীর্বাদী বিল্বপত্র। কিন্তু আজকের দিনে ওসব আর দরকার হয় না। এখন পরীক্ষার্থীদের পকেটে থাকে টোকার জন্যে বই আর জামার নিচে থাকে ছোরা। এখন পরীক্ষায় পাস করার জন্যে রাত জেগে পড়তে হয় না; ব্রাহ্মী ঘৃত, কলকো-লেসিথিন, মৃতসঞ্জীবনী, এগল্লিপ অথবা অবাদ খেতে হয় না। এখন পরীক্ষার পূর্বদিন পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে সিনেমা দেখা চলে।

নিরপেক্ষ দর্শক বলবেন দুই-ই অভিশাপ। পরীক্ষার্থীরা একটিকে ত্যাগ করে আর একটিকে গ্রহণ করেছে। বস্তুত: একটির অনিবার্য পরিণতি অন্যটি, 'সুবর্ণ মধ্যমের' স্থান এর মধ্যে স্বভাবতই থাকতে পারে না, কেননা সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে নৌবিদ্রোহ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। কে জানে হয় তো পরীক্ষার্থীদের এই বেপরোয়া ঔদাসীন্য অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে একটি বড় রকমের ছাত্র-বিদ্রোহেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে!

এই কথাগুলো লেখকের নয়, পরীক্ষার হলের যাবতীয় হৈহল্লার মধ্যে সমীরণ একা গম্ভীরভাবে এই সব ভাবছিল। সে সম্মুখে খাতা নিয়ে প্রশ্নপত্রের জন্যে অপেক্ষা করছিল আর সবারই সঙ্গে। প্রবেশিকা পরীক্ষার এই কেন্দ্রে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক যে সব প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ছিল সমীরণ তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু শুধু যে সেই কারণেই সে চিন্তাশীল তা নয়, চিন্তার অন্য কারণ ছিল।

যথাসময়ে প্রশ্নপত্র বিলি হয়ে গেল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পরীক্ষাগৃহ যেন বাজারে পরিণত হ'ল। প্রথম ফিস-ফিস, তার পর একটু জোর, তার পর খোলাখুলি আলোচনা। নজরদারের চক্রাকার দৃষ্টি-পথকে অনুসরণ করছে করতে শব্দতরঙ্গ যেন সাইক্লোনের মত সমস্ত হল-ঘরে চক্রাকারে ঘুরছে। নজরদারের দৃষ্টি বাহ্যত: অতি সতর্ক, কিন্তু কেন যেন ঠিক দর্শনীয় মুহূর্তটি তার দৃষ্টি বার বার এড়িয়ে যেতে লাগল। নকল করা এবং নকল ধরার ব্যবস্থা, এ দুইয়ের মধ্যে এই রকম লুকোচুরির সম্পর্কটাই শোভনীয়, এবং এটাই প্রচলিত রীতি। কিন্তু তবু যারা ধরা পড়ে তারা যেন ধরা পড়তেই এসেছে। নইলে সর্বক্ষণ কেউ বই খুলে রাখে সম্মুখে? কখন খুলতে হবে, কখন লুকোতে হবে তার একটা প্রচলিত রীতি আছে—এই রীতি মেনে চললে পরীক্ষার্থী নিরাপদ এবং

এই বিশুদ্ধ বিদ্রূপের একমাত্র জবাব—সমীরণকে অবিলম্বে বের করে দেওয়া, কিন্তু তা পারা গেল না। কথাটার মধ্যে এমন একটি ব্যক্তিত্ব ছিল যা অগ্রাহ্য করা সম্ভব হল না। তার উচ্চারণের গাম্ভীর্যপূর্ণ ভঙ্গিতে তাকে দায়িত্বহীন বালক মনে করা গেল না। তাই অত্যন্ত অবাঞ্ছিত এবং অশোভন হলেও আমুক্ত আধিকারিক তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিলেন। বললেন, "তোমার কি বক্তব্য আছে বল।"

সমীরণের মুখচোখের ভাব দীপ্ত হয়ে উঠল, নাকের নিচের ক্ষুদ্র গোঁক জোড়া উৎসাহে কাঁপতে লাগল, মনে হ'ল সে যেন কিছু বলার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছে। সে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ফলক আমুক্ত আধিকারিকের চোখে বিঁধিয়ে প্রশ্ন করল, "আমার যা বলবার আছে শুনবেন সত্যিই?"

আমুক্ত আধিকারিক গম্ভীর সুরে উত্তর দিলেন, "তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।"

"কিন্তু আমাকে এখনও একটু বসতে অনুমতি দেওয়া হয় নি।"

"তুমি বসতে পার।"

ইতিমধ্যে দারোগা এসে পৌঁছলেন কনষ্টেবল সঙ্গে নিয়ে। তিনিও বসে শুনতে লাগলেন ব্যাপার কি।

সমীরণ পাশের খালি চেয়ারটাতে বসে বলল, "বেশ, তা হলে শুনুন। কিন্তু আমি প্রথমেই বলি, পরীক্ষার হল-এ নজরদারের ব্যবস্থাটা মন্দ নয়, কিন্তু তাকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে অতি উৎসাহী হতে নিষেধ করা উচিত ছিল আপনাদের। কারণ এখানে পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য পরীক্ষা পাস করা, সে জন্যে তারা যথারীতি টাকা জমা দিয়েছে।"

"অতএব তারা কিছু না শিখে নকল করে পাস করবে?"—আমুক্ত আধিকারিক প্রশ্ন করলেন।

সমীরণ বলতে লাগল, "এ ভাবে পাস করে কেউ যে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক লোক হয়েছে তার প্রমাণ নেই, পক্ষান্তরে যারা দেশের শত্রু তাদের মধ্যে অনেকেই হয় তো নকল না করে পাস করেছে। সুতরাং দুয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু শেখার কথা যে বলছেন, তাই যদি এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ত তা হলে নোট মুখস্থ করে পাস করা সম্ভব হয় কি করে? বলতে পারেন সে কথা? পারেন না। কিছু শেখানোই যদি আপনাদের উদ্দেশ্য হ'ত তা [illegible] শিক্ষাপদ্ধতি

নজরদারও নিশ্চিন্ত। এই রীতি লঙ্ঘন করলে নজরদার তাকে ধরবেই, এবং তাতে তার অপরাধও হবে না।

আর সবচেয়ে বিস্ময়, ধরা পড়ল সমীরণ। সে নজরদারকে আদৌ গ্রাহ্য করে নি। তাই ধরা পড়া সত্ত্বেও অন্য পরীক্ষার্থীরা তার প্রতি সহানুভূতি দেখাল না, কারণ তারা বহু আগে থেকেই তাকে অতটা দুঃসাহসী হতে নিষেধ করেছিল। কারণ এতে তাদেরও বিপদ ছিল। একজনের ধরা পড়া মানে তাদের কিছুক্ষণ টোকা বন্ধ। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে ঘটনাটা ঘটল প্রথমার্ধের শেষ ঘণ্টা বাজার কয়েক মুহূর্ত আগে। হয় তো নজরদার ইচ্ছে করেই দেরিতে ধরেছে। মাঝখানে ধরলে গোলমালে অন্যদের কিছু অসুবিধা হ'ত।

সমীরণের ধরা পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টা বেজে গেল। পরীক্ষার্থীরা বেরিয়ে গেল একঘণ্টার বিরাম ভোগ করতে। অন্যদিকে খাতা বই এবং পরীক্ষার্থী-সমীরণ গেল আমুক্ত আধিকারিকের ঘরে (পাঠক, মাপ করবেন, কথাটি সরকারী পরিভাষা থেকে গৃহীত)। সেখানে সমীরণের পরীক্ষা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হবে না কেন তার কৈফিয়ৎ চাওয়া হ'ল তার কাছে এবং একজনকে ধরায় সমস্ত ছাত্রের বিদ্রোহ আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে থানার দারোগাকে ডেকে পাঠানো হ'ল।

সমীরণ গম্ভীর ভাবে এবং অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে বলল, "আমি তো কিছু অন্যায় করি নি।"

কথাটি এমন একটি অপ্রত্যাশিত দৃঢ়তা, আত্মপ্রত্যয় এবং আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চারিত হ'ল যে আমুক্ত আধিকারিক হঠাৎ তার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারলেন না।

সমীরণ বলল, "আপনাদেরই অপরাধের জন্যে আমাকে শাস্তি দিতে চান?"

এবং পরীক্ষার পদ্ধতি এ রকম থাকত না। না শিখে পাস করার যদি আপনারা বাধা দিতেন তা হলে বিশ্ববিদ্যালয় টাকার অভাবে কবে উঠে যেত। কিন্তু সে কথা যাক। ধরা যাক, কিছু শেখাই উদ্দেশ্য। কিন্তু তবু আজ যে ষাট হাজার পরীক্ষার্থী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের মধ্যে পাস করবে অনুমান চল্লিশ হাজার, এবং তাদের মধ্যেও বেকার হয়ে বসে থাকবে অন্তত বিশ হাজার। তারা নানা জায়গায় চাকরির চেষ্টা করে বেড়াবে এবং সেই চেষ্টার ফলে ঐ বিশ হাজার ছেলের মধ্যে দু চার শ ছেলে হয় তো চাকরি পাবে। কিন্তু সে চাকরির সঙ্গে শিক্ষার কোনো সম্পর্ক থাকবে না তাদের। সুতরাং এই যদি অবস্থা তবে কিছু শেখার উপর অতিরিক্ত জোর কেন দিচ্ছেন আপনারা? আর এখন যদি কিছু শেখেও, তবে ক'দিন তা মনে থাকবে? এবং এ বিষয়ে শুধু প্রবেশিকা পরীক্ষা কেন, যে-কোনো পূর্বে পাস করা এম এ-কে হঠাৎ আবার এম-এ পরীক্ষায় বসিয়ে দিন দেখবেন পাস করতে পারবে না। অবশ্য হাজার হাজার ছেলের মধ্যে দু' একজন ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু আমি তাদের কথা বলছি না। আজকের কিছু শেখা, চর্চার অভাবে কালই ভুল হয়ে যাবে। আর হাজার হাজার ছেলে বেকার বসে থেকে শিক্ষার চর্চা রাখবে কিসের গরজে?"

সমীরণ বলে যেতে লাগল, "যারা সমস্ত জীবন সাহিত্য-ব্যাকরণ নিয়ে থাকবে, তারা সাহিত্য-ব্যাকরণ শিখুক, কিংবা যারা ইতিহাস ভূগোল চর্চা করবে একমাত্র তারাই ইতিহাস-ভূগোলে জ্ঞান লাভ করুক। তারা এদের মধ্যে শতকরা একজন কিংবা তারও কম। কিন্তু সেই অনিশ্চিত একজনের জন্যে এত ছেলের পাস করার আনন্দ নষ্ট করা কি উচিত? কারণ যারা নকল করে পরীক্ষা দিচ্ছে তারা যদি বুঝে থাকে প্রবেশিকা পাস করলেই তারা দশ-বিশ টাকার চাকরি পেলে খুশী থাকবে এবং না পেলেও আর পড়বে না, তবে তারা যে শেখা দু'দিনে নিশ্চিত ভুলে যাবে সেই-শেখার জন্যে পরিশ্রম করবে কেন? তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কি বলেন নি যে পরীক্ষার খাতার প্রশ্ন লেখার জন্যে বিদ্যাকে কণ্ঠে বহন করাও যা, উদরের নিচে বহন করাও তা? তবে এই আত্মপ্রবঞ্চনা কেন? তবে এই ভণ্ডামি কেন? আপনি কি Stephen Leacock-এর মূল্যবান কথাটি জানেন না যে 'Every man has somewhere in the back of his head the wreck of something which he calls education?'

"আপনি জানেন না বলুন ভারতবর্ষে শিক্ষার ধারা আগা-গোড়া না বদলালে দেশ উৎসন্নে যাবে? দেশে কর্মঠ স্বাস্থ্য-বান লোকের দরকার এখন। দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলের সম্মুখে শত রকমের কর্মক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিতে হবে, দেশের বেকার সমস্যা মেটাতে হবে, এমনি অবস্থায় এই মিথ্যা শিক্ষার নামে আপনারা ঠিক উল্টোটাই করছেন—অকর্মণ্য ছেলে, স্বাস্থ্যহীন ছেলে এবং বেকার ছেলের সংখ্যা বাড়াচ্ছেন। এমনি অবস্থায় এই শিক্ষার যে কোনো দামই এখন নেই সে কথা অবশ্যই বোঝেন, সুতরাং এ শিক্ষার যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ সার্টিফিকেট পাওয়া তা যত সহজে পাওয়া যায় ততই ভাল নয় কি?"

সমীরণ এমন আবেগের সঙ্গে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল যে আয়ুক্ত আধিকারিক এর মাঝখানে কোনো কথা বলার সুযোগ পান নি, কথাও খুঁজে পান নি। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল তাঁর কর্তব্য আরক্ষের (আমার কথা নয়, সরকারী পরিভাষা) হাতে সমীরণকে সমর্পণ করা। কারণ তাঁর মনে একটা ঘোর সন্দেহের উদয় হয়েছিল প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর মুখে এই সব কথা শুনে।

সমীরণের তা না বোঝবার কথা নয়। তাই সে তাঁর সন্দেহকে তার নিজের যুক্তির সমর্থক হিসাবে ব্যবহার করার সুবিধা পেয়ে গেল। সে বলল, "আমার কথা যে কত সত্য তা আপনার মুখের ভাব দেখে আরও বেশি বোঝা যাচ্ছে। আপনি আমাকে সন্দেহ করেছেন। অর্থাৎ গৌণভাবে আপনি এই কথাই বলতে চাচ্ছেন যে প্রবেশিকা পরীক্ষা যে দেবে সে তো মূর্খ, সে আবার এত কথা বলবে কোথেকে। অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী যে কিছুই জানে না, এ কথা এক রকম ধরেই নিয়েছেন। ভালই করেছেন। শুধু আত্মপ্রবঞ্চনাটি ঠিক রেখে তাদের নকল করার বাধা দিচ্ছেন। এটা কিন্তু ভাল করছেন না।"

যাইতেছে। সেখানকার নীলা গ্র্যানাইট প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে অবস্থান করে। নীলার সহিত কিছু কিছু মিশ্রিত চুনী এবং উপরত্নও পাওয়া যায়। কাশ্মীরী নীলার বর্ণসম্পদ অতি উচ্চ শ্রেণীর। কাশ্মীরী নীলাতে যেন আকাশের নীলিমা মূর্ত্ত হইয়া আছে।

সৌগন্ধিক :—ম্যাগনিসিয়ম্-এলিউমিনিয়াম্ অক্সাইড সৌগন্ধিকের উপাদান। চুনীর সহিত ইহার বর্ণ-সৌসাদৃশ্য এত ঘনিষ্ঠ যে সৌগন্ধিককে অনেক সময় চুনী বলিয়া ভুল করা হয়। একটু পরীক্ষা করিলেই এই ভুল ধরা পড়িয়া যায়। সৌগন্ধিক চুনীর ন্যায় শক্ত নহে এবং ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব চুনী হইতে কম। স্ফটিক-স্তরের মধ্যে সৌগন্ধিক খুবই উজ্জ্বল এবং খাঁটি রত্নের ভিতরে বর্ণৈশ্বর্য্যও দেখা যায়। কৃত্রিম উপায়ে সৌগন্ধিক নির্ম্মাণকার্য্য খুবই চলিতেছে, কিন্তু কৃত্রিমতা সহজেই ধরা পড়িয়া যায়।

সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশে সৌগন্ধিক পাওয়া যায়—ভারতেও অল্পবিস্তর উৎপন্ন হয়। চুনীর ন্যায় উজ্জ্বল সৌগন্ধিক অনেক বেশী মূল্যে বিক্রীত হয়। মাদাগাস্কার, অষ্ট্রেলিয়া, আফগানিস্থান এবং ব্রেজিলে সৌগন্ধিকের আকর আছে।

বৈদূর্য্য :—এলিউমিনিয়ম অক্সাইড ইহার উপাদান। ঈষৎ মলিন পীত আভা, পিঙ্গল ও সবুজের বিচিত্র বর্ণসমাবেশে বৈদূর্য্যের জন্ম। বৈদূর্য্য-রত্নকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(ক) পীত ও সবুজ বর্ণের বৈদূর্য্যকে অনেকাংশে অলিভিনের সহিত ভুল করা হয়। অলিভিন এক প্রকারের পীত ও সবুজ বর্ণের রত্নবিশেষ।

(খ) 'বিড়ালাক্ষ'—অন্ধকারে বিড়ালের চক্ষু যেমন জ্বলে বিড়ালাক্ষ-বৈদূর্য্যের আভা অনেকটা সেই প্রকারের। ঈষৎ হরিতাভ, পিঙ্গল ও সবুজ এক প্রকার মসৃণ রেশমের অভ্যন্তরে ইহার স্বভাবজাত সৌন্দর্য্য সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশোন্মুখ। গোল পৃষ্ঠ করিয়া কাটিলে মধ্যে একটি উজ্জ্বল রেখা দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন দিক হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে হইবে যে রেখাটি একই কক্ষে বিচরণ করিতেছে। বিড়ালাক্ষের জনপ্রিয়তা খুব বেশী।

(গ) আলেকজাণ্ড্রাইট নামে বৈদূর্য-রত্নের আর একটি শ্রেণী আছে। দিনের আলোতে ইহাকে গভীর সবুজ বর্ণের দেখায়, কিন্তু কৃত্রিম আলোতে ইহা ঘন রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষে কইম্বাটুর ও কাজারম জিলায় বৈদূর্য্য-রত্ন কিছু কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু খাঁটি বৈদূর্য্যের পর্য্যায়ে ইহারা পড়ে না। উড়িষ্যার কটক জেলায় বৈদূর্য্য পাওয়া যায়। সিংহল, উরাল পর্ব্বত ও ট্যাসম্যানিয়াতে আলেকজাণ্ড্রাইট শ্রেণীর বৈদূর্য্য পাওয়া যায়।

বেরিল :—বেরিলিয়ম্ এলিউমিনিয়ম্ ইহার উপাদান। দুইটি অমূল্য রত্ন বক্ষে ধারণ করিয়া বেরিলরত্ন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী—একটি পান্না, আর একটি একোয়ামেরিন, মরকত, হরিন্মণি, গারুত্মত প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পান্না অভিহিত। কৃত্রিম আলোকে পান্না এবং একোয়ামেরিন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। দুষ্প্রাপ্য রত্ন হিসাবে ইহাদের যথেষ্ট আভিজাত্য আছে।

বেরিলজাতীয় স্ফটিকস্তর বহু মণ ওজনের পাওয়া যায়; কিন্তু রত্ন পর্য্যায়ে ইহারা স্থানলাভ করে না। এই জাতীয় বেরিল এলিউমিনিয়মের সহিত যুক্ত হইয়া এক প্রকার কঠিন ধাতু সৃষ্টি করে। এই বর্ণসঙ্কর ধাতু অর্ণবযান ও ব্যোমযান নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে নেল্লোর জেলায়, বিহার প্রদেশে এবং কাশ্মীরে বেরিলের আকর আছে। অভ্রস্তরের মধ্যেও বেরিল পাওয়া যায়। মাদ্রাজ প্রদেশে কইম্বাটুর জেলায় এবং মহীশূরেও এই রত্ন পাওয়া যায়। রাজপুতানায় নিকৃষ্ট স্তরের বেরিল পাওয়া যায়। সিংহল-দ্বীপও এই রত্নের জন্মদান করে।

পোখরাজ :—এলিউমিনিয়ম্-ফ্লুওসিলিকেট্ পোখরাজের উপাদান। অন্য রত্নের তুলনায় ইহা কতকটা সহজলভ্য। বর্ণ হরিতাভ। বর্ণবৈচিত্রের জন্য ইহা অনেক সময় দুষ্প্রাপ্য রত্নশ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত। অস্বচ্ছ পোখরাজ রত্ন পর্য্যায়ে পড়ে না। নিকৃষ্ট পোখরাজ জাত ধাতুকে পালিশ ও চূর্ণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মদেশের তাভয় জেলাতে টিনের সহিত পোখরাজ পাওয়া যায়। সিংহল দ্বীপেও পোখরাজ উৎপন্ন হয়।

তামড়ি :—রত্নের মধ্যে সহজলভ্য, বাজারে আমদানীও বেশী এবং মূল্যও অন্য রত্নের তুলনায় কম। ইহা এলামাণ্ডাইট্ জাতীয়। উজ্জ্বল গাঢ় লাল রং, একটু বেগুনী আভাবিশিষ্ট। নিকৃষ্ট তামড়ি চূর্ণ করিয়া উৎকৃষ্ট রত্নরাজিকে মসৃণ করা হয়। ঘড়ির চক্রধরযন্ত্রটিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

রত্নগুণসমন্বিত তামড়ি বেশী পাওয়া যায় না—উহার নিকৃষ্ট শ্রেণীই সহজলভ্য। বিহার প্রদেশে, উড়িষ্যা প্রদেশের মহানদীর বালুকারাশিতে তামড়ি পাওয়া যায়। হাজারিবাগে তামড়ির বড় বড় খণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহাদিগকে রত্নপর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না। মাদ্রাজে কৃষ্ণানদীর তীরে বালুপ্রবাহে ইহারা সংগুপ্ত থাকে। সালেম, নীলগিরি ও নেল্লোর জেলায় রক্তবর্ণ তামড়ি এবং ত্রিবাঙ্কুর জেলায় বর্ণসম্পদশালী তামড়ির সন্ধান পাওয়া যায়। রাজপুতানাতে উদয়পুর ও জয়পুর রাজ্যে, আরাবল্লীর গিরিশ্রেণীতে তামড়ির আকর দৃষ্ট হয়। আজমীর, জয়পুর, কিষণগড় ও শাহপুরে এক প্রকার তামড়ি পাওয়া যায়। কিষণগড়ে প্রাপ্ত তামড়ি ভারতবর্ষের যাবতীয় তামড়ির মধ্যে রত্নসম্পদে শ্রেষ্ঠ। দক্ষিণ-ভারতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা অলঙ্কার প্রভৃতির জন্য মাদ্রাজে প্রেরিত হয়।

অলিভিন :—এই রত্ন জহরীদের নিকট পেরিডট্ নামে পরিচিত। পেরিডটাইট্ আগ্নেয় শিলায় ইহার জন্ম। সবুজ, পীত, পিঙ্গল ও রক্তবর্ণের বিচিত্র পরিবেশ ইহার মধ্যে দৃষ্ট হয়। চুনা-পাথরের মধ্যেও এই রত্ন দেখা যায়। ব্রহ্মদেশে চূর্ণীর আকরে, চুণীর সঙ্গে একত্রে অলিভিন দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে এই রত্ন পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। রত্নগুণসমন্বিত অলিভিন মিশরের উপকূল হইতে দূরে সেন্টজন দ্বীপে এবং সিংহল, কুইন্সল্যাণ্ড, ব্রেজিল ও নিউ মেক্সিকোতে পাওয়া যায়।

জেড বা পীলু :—নানাপ্রকারের বিচিত্র কারুকার্য্য এই রত্নের উপর করা যায়। জেড্ রত্ন নানাবর্ণের হয়, সাধারণতঃ ফিকে সবুজ। জেডাইট্ এবং নেফ্রাইট এই দুই শ্রেণীতে এই রত্নকে বিভক্ত করা যায়। জেডাইট্ ফিকে সবুজ—নেফ্রাইটের বর্ণ পত্র-সবুজ। জেডাইট বিভিন্ন অলঙ্করণে খচিত হইয়া সেগুলিকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করে।

জেডরত্নের উপর চীনাদের অগাধ বিশ্বাস। তাহাদের মতে এই রত্ন বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন, ধারণ করিলে সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়। রত্নধারণ সম্পর্কে ভারতীয়দের সংস্কারও কম নহে—উপযুক্ত রত্ন ধারণ করিতে পারিলে দুর্দ্দিন দূর হইয়া সুদিনের উদয় হইবে এদেশের অনেকেই ইহা বিশ্বাস করেন।

উত্তর-ব্রহ্ম হইতে জেড সরবরাহ করা হয়। রেঙ্গুন হইতে জাহাজে চীনদেশের নানা বাজারে জেড চালান হয়। এই রত্নের কারুশিল্পে চীনারা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। চীনদেশের বাজার ওঠা-নামার উপর জেডের ব্যবসা বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

গোমেদ :—গোমেদের খ্যাতি অন্যান্য রত্নের তুল্য নহে। ঔজ্জ্বল্যে ইহা প্রায় হীরকের কাছাকাছি। সবুজ, হলুদ, পিঙ্গল, কমলালেবুর রঙ্ প্রভৃতির ন্যায় নানা বর্ণের গোমেদ পাওয়া যায়। কমলালেবু বর্ণের গোমেদের আদর বেশী। জারকোনিয়ম্-সিলিকেট্ উপাদানে ইহাদের জন্ম। তাপে ইহা বর্ণহীন হয়। বর্ণশোভার দিক হইতে সিংহলে উৎপন্ন একপ্রকার গোমেদকে 'মাতারা হীরক' বলা হয়।

পাথরের নুড়ির সঙ্গে বারিবাহিত স্ফটিকস্তরে এবং পললস্তূপে গোমেদ অবস্থান করে। সিংহল, শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে গোমেদের জন্ম। কেলাসিত শিলাতে নেফিলিনের সঙ্গেও গোমেদ অবস্থান করে। এই প্রকারের গোমেদ কাডাপ্পা, কইম্বাটুর জেলা এবং ত্রিবাঙ্কুরে দেখা যায়। মাদ্রাজ প্রদেশের ত্রিচিনোপল্লীতে এবং বিহারে হাজারীবাগ জেলার দোনচাচ নামক স্থানে গোমেদ পাওয়া যায়। ত্রিবাঙ্কুর মিনারাল কোম্পানী ত্রিবাঙ্কুরের সমুদ্রোপকূলে বালুকারাশির মধ্যে প্রচুর গোমেদ আবিষ্কার করিয়াছে। উপরোক্ত কোম্পানী গ্রেট ব্রিটেন, জার্ম্মানী, যুক্তরাষ্ট্র এবং আফ্রিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে গোমেদ রপ্তানী করিতেছে। গোমেদ-ধারণে গ্রহশান্তি হয়, ভারতীয়দের মধ্যে এ বিশ্বাস খুব আছে।

স্ফটিক বা কো-য়ার্টস্ :—উপরত্ন পর্য্যায়ভুক্ত। ইহা অলঙ্করণের শোভা বৃদ্ধি করে। আগ্নেয় শিলাগর্ভে সাধারণতঃ ইহার জন্ম—সিলিকন্-অক্সাইড ইহার উপাদান।

কেলাসিত স্ফটিককে নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—গোলাপী স্ফটিক, ধোঁয়াটে স্ফটিক, ব্যাঘ্রচক্ষু ও বিড়ালাক্ষ স্ফটিক। কেলাস প্রচ্ছন্ন স্ফটিককে নিম্নলিখিত নাম দেওয়া হয় :—ক্যাল্‌সিডনী, কারনেলিয়াম্ বা রুধিরাখ্য, অ্যাগেট, ওনিকস ও ফ্লিন্ট। কারনেলিয়ান বা রুধিরাখ্য রক্তবর্ণের। অ্যাগেট সাদা, ধূসর, পিঙ্গল প্রভৃতি বর্ণের হয়। ওনিকস বিভিন্ন বর্ণের স্তর বা রেখাযুক্ত। ফ্লিন্ট অবচ্ছ—প্রাচীনকালে অস্ত্র নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত। ইহার ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে স্ফটিক পাওয়া যায়। গোলাপী-স্ফটিক উড়িষ্যার সম্বলপুরে মেলে। বোম্বাই প্রদেশের তাপ্তারাতে যে স্ফটিক পাওয়া যায়, কাম্বে উপসাগর দিয়া তাহা বিদেশে রপ্তানী করা হয়। মধ্যপ্রদেশের চিন্দওয়ারাতে, হায়দরাবাদের বরঙ্গল জেলায়, মাদ্রাজের গোদাবরী জেলার রাজমহেন্দ্রীতে এবং তাঞ্জোরে 'ভেল্লাম হীরক' নামে একপ্রকারের স্ফটিক পাওয়া যায়। দিল্লীতে 'দিল্লী স্ফটিক' নামে এক প্রকারের স্ফটিক আছে। ইহা দ্বারা সুন্দর নেকলেস প্রস্তুত করা হয়। অ্যামীথ্র নামক স্ফটিক বিহারের সাঁওতাল পরগণায় এবং মধ্যপ্রদেশে পাওয়া যায়। কাম্বের বাজারে অ্যাগেট ও কারনেলিয়াম্ কাটা হয়। মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে, যুক্তপ্রদেশের বান্দায় এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে অ্যাগেট কাটিয়া অলঙ্কারে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়। ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে কাম্বে হইতে অ্যাগেটের খুচরা চালান যায়। সুলভ রত্ন হিসাবে স্ফটিকের ব্যবসায় কাশ্মীরের বাজারে খুব চালু।

ওপাল :—রত্ন হিসাবে ওপাল খুব জনপ্রিয় না হইলেও ব্যবহারে ইহার জনপ্রিয়তা দিন দিনই বাড়িতেছে। অকেলাসিত সিলিকা এবং তাহার সহিত কিছু জলের সংমিশ্রণে ইহার জন্ম। ওপালে বিভিন্ন রং দৃষ্ট হয়। ইহার কঠোরতা কম, প্রায় কাচের তুল্য। বোম্বাই, মধ্য-প্রদেশ, হায়দরাবাদ এবং মাদ্রাজে ওপাল পাওয়া যায়।

তারকুস্ :—উজ্জ্বল নীলবর্ণের। কাচাসোনার পরিবেশে সংস্থাপিত হইলে ইহার মনোহারিত্ব বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। ভারতবর্ষে আজমীঢ় পাহাড়ে এবং রামগড়ে তারকুস্ রত্ন পাওয়া যায়। পারস্ত ও মিশরেও তারকুসের বহুল প্রচলন আছে।

এই সকল পত্রে চিত্রের নামগন্ধ ছিল না, থাকিবার কথাও নয়। এদেশের শিল্পীরা তখন সবেমাত্র অপেক্ষাকৃত সহজ ধাতু ও কাঠ খোদাই শিল্পের আশ্রয় লইয়াছেন। আমরা এই ধাতু ও কাঠ খোদাই চিত্রের প্রথম নিদর্শন পাই—১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গলে'। ক্রমশঃ পুস্তকের গণ্ডী ছাড়াইয়া পত্র-পত্রিকায় চিত্র দেখা দিতে আরম্ভ করিল।

মাসিক-পত্রে সর্ব্বপ্রথম চিত্রের দর্শন পাই—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ (৩য় ভাগ) হইতে ইহাতে মাঝে মাঝে চিত্র প্রকাশিত হইত। ইহার পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, পাদরি লং-সম্পাদিত 'সত্যার্ণব' পত্রের জন্ম। এই মাসিক-পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় একখানি করিয়া কাঠ-খোদাই চিত্র এবং দ্বিতীয় বর্ষ হইতে সকল সংখ্যায় এক বা একাধিক চিত্র সন্নিবিষ্ট হইত।

ক্যাম্বেলের মডেল ডেপুটি —'অমৃত বাজার পত্রিকা,' ২ মে ১৮৭২

তৈলের ঘানি —'সত্যপ্রদীপ,' ৪ জানুয়ারি ১৮৫১
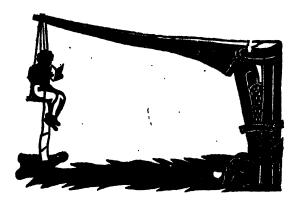
কিন্তু বাংলা "সচিত্র মাসিক পত্রিকা" বলিতে সচরাচর আমরা যাহা বুঝি, তাহা প্রকাশিত হয় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। ইহার নাম—'বিবিধার্থ-সংগ্রহ,' সম্পাদক—স্বনামধন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রকাশক—ভার্নাকিউলার লিটারেচার কমিটি বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ। ইহার আদর্শ ছিল বিলাতের 'পেনি ম্যাগাজিন'; "আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের পাঠযোগ্য করণার্থে উক্ত পত্র অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক, এবং তত্রস্থ প্রস্তাবিত বস্তু সকলের বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাকিবেক।" শৈশবে রবীন্দ্রনাথকে ইহা মুগ্ধ করিয়াছিল; তিনি 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন: "রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক-পত্র বাহির করিতেন।...বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুসি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড় চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের উপর চীৎ হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে। এই ধরণের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন?"

অনিয়মিত ভাবে প্রচারিত হইয়া ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' লুপ্ত হয়। ইহার অভাব পূরণার্থ দুই বৎসর পরে (ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩) রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় 'রহস্য-সন্দর্ভ' প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহাও একখানি পুরাতত্ত্ব সচিত্র মাসিক পত্রিকা। "চিত্রপট যে মনের সংস্কারক তাহা সভ্য তত্ত্বানুসন্ধায়িরা স্থির করিয়াছেন; অতএব সময়ে সময়ে উত্তম চিত্রদ্বারা চিত্তানুরঞ্জন করাও ইহার উদ্দেশ্য; তদর্থে এই পত্রের প্ররোচক বঙ্গানুবাদক সমাজের আদেশে বহু শত ছবি বিলাত হইতে আনীত হইয়াছে, তাহার প্রকাশে বোধ হয় অনেকেই পরিতৃপ্ত হইবেন।"

সাপ্তাহিক-পত্রে আমরা প্রথম চিত্রের দর্শন পাই—'সত্যপ্রদীপে'। ইহা শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র; ১ম সংখ্যায় প্রকাশকাল—৪ মে ১৮৫০। সম্পাদক প্রথম সংখ্যায় প্রতিজ্ঞা করেন যে, "পদার্থ ও শিল্প প্রভৃতি বিদ্যা সম্পর্কীয় নানারূপ প্রস্তাব বিভার্থি মহাশয়েরদের সন্তোষার্থে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব তন্মধ্যে যেং কথা সহজে বোধগম্য নহে ব্যাখ্যার্থে তাহার প্রতিবিম্ব কখন কখন প্রকাশ হইবেক।"

ইহার ছয় বৎসর পরে, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকার আবির্ভাব। উহা—'অরুণোদয়'; সম্পাদক—রেঃ লালবিহারী দে। 'অরুণোদয়ে'র প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় একখানা করিয়া ছবি থাকিত।

ভাগীরথী-তটে ['রহস্য-সন্দর্ভ,' শ্রাবণ ১৯২০ সংবৎ

টেম্‌স নদী-তলের সুড়ঙ্গ ['বিবিধার্থ-সংগ্রহ,' মাঘ ১৭৭৩ শক

বৃক্ষ ['অরুণোদয়,' ১ অক্টোবর ১৮৫৭

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে 'সচিত্র ভারত সংবাদ' নামে আরও একখানি পাক্ষিক পত্রের উদয় হয়। "এই পত্রের প্রতি খণ্ডে দুইখানি করিয়া প্রতিমূর্ত্তি থাকিবেক, ঐ প্রতিমূর্ত্তি সকল বিখ্যাত ইংরাজ ও বাঙ্গালি লিথোগ্রাফার এবং এনগ্রেভারদিগের দ্বারা প্রস্তুত করান হইতেছে।"

অতঃপর আমরা সাময়িক-পত্রে চিত্রের দর্শন পাই—শিশিরকুমার ঘোষ-সম্পাদিত 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য়। ইহা প্রথমে সাপ্তাহিক পত্ররূপে বাংলা ভাষায় প্রচারিত হয়; ১ম

মনমানুষ ['তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১ পৌষ ১৭৬৭ শক

সংখ্যার প্রকাশকাল—২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র মাঝে মাঝে ব্যঙ্গচিত্র স্থান পাইত। ১৮৭২ সনের ২৮এ ফেব্রুয়ারি পত্রিকা-সম্পাদক লেখেন:—"এবারে আমরা নূতন এক প্রকার বিবিধ পাঠকগণকে উপহার দিলাম। ছবিটি তত ভাল হয় নাই, কিন্তু এটি প্রথম। এতদ্দেশে যত ভাল হইতে পারে তাহার চেষ্টার ত্রুটি করিব না। তবে প্রতি সপ্তাহে কি প্রতি মাসে কি আদবে আর ছবি দিতে পারি না পারি তাহা সাধারণের উৎসাহের উপর নির্ভর করে। একটি ছবি খুঁদিতে অনেক ব্যয়।"

১৮৭২ সনের ২রা মে তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র যে কার্টুনটি প্রকাশিত হয়, তাহার বিষয়—ছোট লাট ক্যাম্বেলের মডেল ডেপুটি। এ সম্বন্ধে রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:—"লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সার জন ক্যাম্বেলের মাথায় ঢুকলো যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর জন্ত এমন একটা সার্ভিস তৈরি করতে হবে, যাতে এক-একজন এক-একটা বিদ্যাকল্পদ্রুম হ'তে পারে। সাধারণ কেতাবি বিদ্যে ত থাকবেই, তার ওপর একটু কেমিষ্ট্রি, একটু বোট্যানি, সারভেয়িং, জিমন্যাষ্টিক, সাঁতার ইত্যাদি ইত্যাদি। সুরসিক শিশিরবাবু ক্যাম্বেলি সভ্যকে রহস্য কোরে তাঁর 'অমৃত বাজারে' একটি কার্টুন ছাপান, জিমন্যাষ্টিকের পোষাক-পরা, কোমরে একটি পিছন-দিকে-ঝোলান শিকলি আর কানে একটি চিমটে (চিমটেটা হচ্ছে কম্পাস)।"

সচিত্র বাংলা পত্র-পত্রিকার কথা আপাততঃ এইখানেই শেষ করিলাম। প্রবন্ধে যে-সকল পত্র-পত্রিকার উল্লেখ করিয়াছি তাহার প্রায় সবগুলিই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হইয়াছে।

চম্পক

শ্রীরমেশ দাশ

দোলে চম্পক মণিকাঞ্চন সম
বিথারি গভীর নিবিড় ছবির তম—
শাওন গগনে মেঘের নয়নে কনক বিজলী লিখা
অমা রজনীর মন্দির-ঘরে হিরণ প্রদীপশিখা।
দোলে চম্পক দোলে
অমাবস্যার কোলে
তারাকান্ত বক্ষের মাঝে মুক্তির নিঃশ্বাস
ব্যর্থনাথন মনের গহনে সঞ্চিত বিশ্বাস।

চম্পক দোলে যে
তমসার কোলে যে—
ক্ষ্যাপাগল বৈজ্ঞানিকের মহান্ আবিষ্কার
বৃদ্ধ যীশুর নয়নের পাতে মুক্ত স্বর্গদ্বার।
দোলে চম্পক দল
গন্ধে বিচঞ্চল
স্বর্ণ জ্যোতিতে হইয়া জ্যোতির্ম্ময়
কঠিন গহন অমানিশা করি জয়।

বিদ্রোহী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

একমাত্র ছেলে সুরপতি বাপের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারলে না। হাড়কৃপণ মহীপতির লক্ষীর উপর অচলা ভক্তি। তাঁকে কায়েমি ভাবে বেঁধে রাখবার যত কিছু আয়োজন তার লেশমাত্র ত্রুটি সে করেনি। লক্ষী যদি বা স্থাণুত্বের লক্ষণ প্রকাশ করলেন—ছেলে বেঁকে বসল। বললে, যে গাঁয়ে বাস করছি তার ভাল-মন্দ দেখতে হবে না।

যুক্তি দিলে মহীপতি, গাঁ তো মানুষ নয়—তার আবার ভালমন্দ কি।

তর্ক তুললে সুরপতি, মানুষ নিয়েই গাঁ, সেই মানুষ না বাঁচলে গাঁয়ের রইল কি। একটা হাসপাতাল দিন।

ইঃ—আমার গায়ের রক্ত-জল-করা টাকা—

টাকা আপনার নয়—প্রজাদের কাছে খাজনার দরুন—সুদের দরুন আদায় করেন নি?

বেশ করেছি। চড়ে উঠল মহীপতি। এ হ'ল উপার্জ্জন। কে উপার্জ্জন করে না শুনি?

আমি এ রকম উপার্জ্জন করব না।

তা করবে কেন। সব ক'টা পাস দিইয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করলাম কিনা—পরের গোলামি না করলে চলবে কেন। আইন শিখেছ বিষয়-সম্পত্তি বজায় রাখবে বলে—কোর্টে মক্কেল খোঁজবার জন্য নয়।

সুরপতি বললে, এ অধর্ম্মের উপার্জ্জন।

মহীপতি চীৎকার করে উঠল, বটে। দূর-হ আমার সামনে থেকে।

সুরপতি চলে গেল সামনে থেকে। কিছুক্ষণ পরে জানা গেল সে গৃহত্যাগ করেছে।

২

ছেলে গৃহত্যাগ করলে—ছেলেকে ত্যাগ করতে পারলে না মহীপতি। ভাবলে—জোয়ান বয়সের ছেলেরা ও রকম একগুঁয়ে হয়েই থাকে। সে-ও একদা বাপের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিল। বাপ ছিলেন উদার। দীয়তাং ভুজ্যতাং পালপার্ব্বণ উপলক্ষে চলতই বাড়ীতে। লক্ষী চঞ্চলা হতেই মহীপতি করেছিল প্রতিবাদ। বৃদ্ধ ওর একগুঁয়েমি দেখে দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন, আর কেন—আমায় কাশী পাঠিয়ে দে। এ বিষ গলায় জমিয়ে নীলকণ্ঠ হবার সাধ্যি আমার নেই—আমায় রেহাই দে।

বাপকে মুক্তি দিয়েছিল মহীপতি। লক্ষীর প্রতিষ্ঠায় অতঃপর কায়মন প্রাণে-ও [illegible] হয়েছে। সেই লক্ষীকে বিসর্জ্জন দেওয়ার বেদনা সুরপতি বুঝবে কেন। যাক না চলে—ফিরে আসতেই হবে। সংসার বড় কঠিন স্থান। এর আকাশে ভাবের ফানুস উড়িয়ে চিরটা কাল নিরুদ্বিগ্নে কাটে না কারও। সুরপতি অবশ্যই ফিরে আসবে।

আপন মনে হাসলে মহীপতি।

৩

সত্যই সুরপতি ফিরে এল। ফিরে এল গ্রামে, বাপের প্রাসাদে উঠল না সে। সে প্রজাদের ডেকে বললে, কেন সহ্য কর তোমরা এই পীড়ন? তোমাদের সর্ব্বস্বান্ত করে যে ফুলে উঠেছে—সে তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল দেখতে বাধ্য। ইচ্ছের না দেয় জোর করে আদায় কর তোমাদের পাওনা।

মহীপতি দেখলে, এ তো মন্দ নয়। তার পয়সায় আইন শিখে বিষয়সম্পত্তি বজায় রাখা দূরে থাক—লক্ষীকে উৎখাত করবার চেষ্টা করছে সুরপতি। অকৃতজ্ঞ সন্তান।

মহীপতি ফন্দী আঁটতে লাগল কি করে রেহাই পাবে এই সঙ্কট থেকে। চক্ষুলজ্জা বশতঃ সোজা পথটি বেছে নিতে পারল না। বাহ্যিক আচরণটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম ও সংযত করল সে—আর সেই সঙ্গে অন্তরের অন্তস্তলে পীড়ন অনুভব করল—শোণিতগত মোহের প্রচ্ছন্ন রূপেই হোক কিংবা পিতৃগত দাবিই তার পিছনে থাকুক। আদেশটা অনুরোধের রূপ নিল।

সুরপতি বললে, আপোষ নেই—লক্ষীকে লুটে নেবার কাজে বাধা দেব আমরা—জীবনপণ।

মহীপতিও কঠিন হয়ে উঠল—চক্ষুলজ্জা অতঃপর কেটে গেল।

এক দিন সুরপতি গ্রামের রঙ্গমঞ্চ থেকে সহসা অপসৃত হ'ল।

৪

বছরখানেক বাদে মহীপতি দেখলে, জমিদারির শাসনদণ্ড তার হাত থেকে খসে পড়ছে—মনের সাহস বাহুর শক্তির সঙ্গে অন্তর্হিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক নিয়মে যৌবনের পর জরা আসে—সম্পদের উদয় বিলয় এই নিয়মেরই অঙ্গ। লক্ষী হয়ত চঞ্চলা হয়েছেন নতুবা একমাত্র ছেলের মতিগতি এমন হবে কেন?

মৃত্যুশয্যায় ছেলেকে অজ্ঞাতবাস থেকে আনিয়ে বললে, তোমারই জন্য আমার এতকালের সঞ্চয়। ইচ্ছে হয় রাখ, ইচ্ছে হয় নষ্ট কর। আমি থাকব না—তুমিও থাকবে না—কিন্তু চৌধুরীবংশ থাকবে।

সুরপতি মৃদুস্বরে বললে, কিছুই থাকে না বাবা, মানুষের মত বংশের আয়ুও সীমাবদ্ধ।

মহীপতি বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল সুরপতির দিকে। চোখের কোণটা তার চক্ চক্ করে উঠল। বুক ঠেলে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘনিশ্বাস। মৃদুস্বরে বললে, তারা—তারা।

তারপর চোখ বুজল—আর চাইল না।

৫

সুরপতি সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। যে আদর্শকে ধ্রুবতারা করে সে বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল—সেই আদর্শ স্পষ্টতর হ'ল তার আচরণে। দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন—পাঠাগার প্রতিষ্ঠা—বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন—জলকষ্ট নিবারণ—যা সাধ্যে ও কল্পনায় ছিল—সুরপতি ত্রুটি করলে না কিছুই। প্রজারা ধন্য ধন্য করলে। সবাই বলে, রাম-রাজত্বের নমুনা আমরা গাঁয়ে বসেই পাচ্ছি—আমরা সুখী।

সুরপতি আত্মপ্রসাদ লাভ করল। ভাবলে, যা আমার সাধ্যায়ত্ত সবই করলাম—এতে মানুষ সন্তুষ্ট হবে না কেন।

কিন্তু এক দিন তার ভুল ভাঙ্‌ল।

বেলা মধ্যাহ্ন। আহার সেরে অন্দরের গলিপথ দিয়ে আসছিল সদরে। তার প্রসঙ্গ কানে যেতেই থমকে দাঁড়াল একটু। উমাপতি ও অরুন্ধতী—তারই ছেলেমেয়ে—তর্ক করছে পাশের ঘরে। তর্কটা চলছে গতকাল আর বর্তমান নিয়ে।

অরুন্ধতী বলছে, যাই বল দাদা—বাবা এসব বিষয়ে উদার।

উমাপতি উত্তর দিলে, না, উনি রক্ষণশীল। দু'কালের সঙ্গে মিলিয়ে পথ চলতে চান।

তাতে ক্ষতিটা কি? অরুন্ধতীর কণ্ঠ।

ক্ষতি এই—আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে পিছুতে পারি না—সামনে আমাদের এগুতেই হবে। পাহাড় থেকে নেমে জল কখনও পাহাড়ে ফিরে যায়?

মানুষ জল নয়।

মানুষ সজীব—তাই কালের গতিতে সে এগিয়ে চলবে। বাবা রক্ষণশীল না হলে এই প্রাসাদ এতদিন গরীবদের ছেড়ে দিতেন।

চমকে উঠল সুরপতি। এরা বলে কি! প্রাসাদই যদি ছাড়ব তো দেশের মঙ্গল করব কি দিয়ে। অর্থ হচ্ছে ক্ষমতা—যার সুষ্ঠু প্রয়োগ সমাজকে সুস্থ রাখে—অপপ্রয়োগ সমাজকে বিষাক্ত করে।

সেই উত্তরই দিলে অরুন্ধতী, বাবা তো টাকাকে আটকে রেখে সমাজকে বিষিয়ে তুলছেন না?

কিন্তু ক্ষমতা ওঁকে পেয়ে বসেছে। ক্ষমতার ওপর ওঁর মোহ জন্মেছে—একে বিশ্বাস করা কঠিন।

কি যে বল—সব ছেড়ে ছুড়ে ফকিরী নিলেই বুঝি সমাজের মঙ্গল করা যায়?

না রে—ক্ষমতা যখন পেয়ে বসে—তখনই তাকে ভয় করি। বাবা হয়ত কারো অনিষ্ট করেন নি—কিন্তু উপরে বসে আদেশ করবার ইচ্ছা ওঁর বেড়েই চলেছে।

সুরপতি সরু পথটুকু অতিক্রম করে বৈঠকখানায় এল। চিন্তাযুক্ত—সন্দেহমলিন। এরাও তার আচরণকে সন্দেহের চোখে দেখছে—তাকে মনে করছে ক্ষমতাপ্রিয়! এরা কি জানে না—তার বিদ্রোহের ইতিহাস?

৬

উমাপতি ও অরুন্ধতীকে ডেকে সুরপতি বললে, স্পষ্ট আর সত্য কথা আমি ভালবাসি। সত্য করে বল ত—আমার আচার-আচরণ সম্বন্ধে তোমাদের মনে কোনও সন্দেহ হয়েছে? আর কেনই বা হ'ল সন্দেহ।

ওরা ভাইবোনে দৃষ্টি বিনিময় করলে।

অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি বললে, না বাবা, আপনার কাজের ভুল ধরব—এমন স্পর্দ্ধা—

না—না—স্পর্দ্ধার কথা নয়। ভুল সকলেরই হয়। এক কালের কর্তব্য—আর এক কালে কর্তব্য থাকে না। ছেলের পানে চেয়ে বললে, তুমি কি বল উমা, থাকে?

উমাপতি মৃদুস্বরে বললে, সবাই যদি তা বুঝত!

আমায় বুঝিয়ে দাও তোমরা—

অরুন্ধতী ইঙ্গিতে নিষেধ করলে উমাপতিকে।

উমাপতি বললে, সে বোঝানো শক্ত। আপনারা যা জন্মগত তায় ও সত্য বলে জেনে এসেছেন—

শোন উমা। সুরপতির স্বর দৃঢ় হ'ল—আত্মপ্রত্যয়ে। বললে, যা সত্য—তা চিরকালের সত্য। আর সেই অনুযায়ী যে কাজ করা যায় তা ন্যায়।

উমাপতি বললে, এক যুগের বিধান অন্য যুগে—অচল।

বিধান কালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরি—কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করবে না কোন যুগ। সুরপতির কণ্ঠস্বরে ঘরখানা গম গম করে উঠল।

উমাপতি বলল, একটা কথা বলব—রাগ করবেন না?

এ কথায় দুঃখ পেলাম উমা—তোমাদের সে শিক্ষা দিয়েছি কি কোন দিন?

উমাপতি লজ্জিত হয়ে মাথা নামালে। বললে, তাই আমাদের যথেষ্ট সাহস বেড়েছে।

সুরপতি তার লজ্জা দেখে মনে মনে প্রসন্ন হ'ল। বললে, বল কি বলবে।

একদম [illegible] কথা [illegible] বাবা। না ভুলেই সে এক নিঃশ্বাসে বলে চলল, আর আমি বলি—জমি চাষের মেয়েকে দিয়ে

কন্যে—কিংবা বিয়ে না করেও কাউকে বেছে নিই সঙ্গিনী হিসাবে—সইতে পারবেন আপনি ?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন—স্তম্ভিত করে দিল সুরপতিকে। সমাজগত এই প্রশ্নটি যে এমন জটিল হবে—এ কল্পনা সে করেনি স্বপ্নেও। কিন্তু মুহূর্তে তার সে ভাব কেটে গেল। বললে, ভিন্ন জাতের কথা বলছ কেন? তার মনে হ'ল, তার গলা দিয়ে আর কারও ধ্বনি বার হচ্ছে।

উমাপতি বললে, স্বজাতির সঙ্গে বিয়ে এক কালের বিধান সত্য আর ন্যায়ের উপর গড়া বিধান—কিন্তু বাবা, আজ যদি কেউ বলে, মানুষের আবার জাতি কি—সে তো একই জাতি—

বাধা দিলে সুরপতি। এক জাতি বললেই সমস্যাটা মিটল না উমা। কর্ম্মভেদে—জাতিভেদে—এ বিধান বহু কালের আর সব কালের। কর্ম্মের ব্যাখ্যা নানান রকম হতে পারে কিন্তু বিভাগটা যে গুণগত। তোমাদের সাম্যবাদী সোভিয়েটও সেই বিধান মেনে নিয়েছে।

সোভিয়েটের কথা থাক, কিন্তু মানুষ জাতিভেদ মানবে কেন স্বইচ্ছায়? বিভাগ এলেই আসবে প্রভুত্বের ইচ্ছা। ও নীচু—আমি উঁচু—এই অহঙ্কার থেকেই—অকল্যাণের সৃষ্টি হবে।

সুরপতি বললে, ভেবে দেখি—দিনকতক পরে তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দেব।

উমা বললে, এটা আমাদের প্রশ্ন নয়—জীবন-মরণের সমস্যা। এই সত্যকে যতক্ষণ স্বীকার করতে না পারব আমরা—ততক্ষণ আমাদের কল্যাণ নাই।

আচ্ছা, ভেবে দেখি। অসহিষ্ণু কণ্ঠে সুরপতি বললে, বিভাগটা মানুষের ইচ্ছার সৃষ্টি হয় নি—ওটা আসতে বাধ্য।

৭

ভাবতে লাগল সুরপতি। গভীর অভিনিবেশ সহকারে প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা দিক দিয়ে বিচার করলে কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারলে না—এক দিন স্বইচ্ছায় যে গোষ্ঠী-আনুগত্য স্বীকার করেছিল অরণ্যচারী মানুষ, তা ভাঙতে এবার, ইচ্ছা কেন জাগছে তার মনে! বহু দুঃখ কষ্ট বিপদ অসুবিধা সয়েই মানুষ বেছে নিয়েছিল এই প্রথা। তার পর সভ্যতা সংস্কৃতির আলো জেলে সে বহু দূর অগ্রসর হয়েছে। সুন্দর পৃথিবী আজ পূর্ণত্বের পথে। এরা ভাঙতে চায় এই সভ্যতাকে—নষ্ট করতে চায় সংস্কৃতিকে। মানুষের আদি কামনায় যা প্রতিষ্ঠিত—তারই পূজারী হ'ল এরা। এই যদি স্বাধীনতার অর্থ হয়, যদি কল্যাণের ভিত্তি হয় তা হলে অন্ধকার যুগের মানুষরা কি দোষ করেছিল!

সামাজিক এই বিপ্লবকে কিছুতেই স্বীকার করতে পারলে না সুরপতি। বললে, সাম্যবাদ আনতে হলে—পুরাতন সমাজ-ভিত্তিতে আঘাত করতেই হবে—এ যুক্তি দুর্ব্বল বলে মনে হচ্ছে। বিভাগের বিধানটা আপনি পড়ে নি আকাশ থেকে—অমনি গজায় নি মাটি থেকে—ওটি বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল—স্বতঃস্ফূর্ত। নানা দিক প্রসারী প্রজ্ঞাকে অস্বীকার করা চলে না। শ্রেণীভেদ হবেই। উদ্ভিদ-জগতে এর দৃষ্টান্ত আছে—প্রাণী বা পক্ষী জগতেও দৃষ্টান্ত আছে। এই পরীক্ষায় প্রথম পর্য্যায়ে রাশিয়াও উত্তীর্ণ হতে পারে নি। তার মজুরের আর বাস্তকারের আয়ের তফাৎ আকাশ-পাতাল। সম-অধিকারবাদ মেনে নিয়েও—সেখানে কেউ চড়ছে মোটরে—কেউ হাঁটছে পায়ে। আসল কথা, ওটা হ'ল বাহ্যিক অংশ। কল্যাণ যা গড়ে—তা অন্তরের প্রসারে—দরদে। সেবার ব্যাকুলতা না জাগলে জন-কল্যাণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

উমারা ভুল বুঝেছে—ওদের বিদ্রোহের পিছনে নাই কোন সুচিন্তিত প্রণালী—কিংবা লক্ষ্যে পৌঁছবার নাই কোন সুনির্দ্দিষ্ট বিন্দু।

৮

কয়েক দিন চিন্তার পর উমাপতিকে ডেকে পাঠালে বৈঠকখানায়। চাকর খবর নিয়ে এল—তিনি দেশে গেছেন। দেশ মানে পাড়াগাঁয়ে? কেন? কেন'র উত্তর একখানি সংক্ষিপ্ত পত্রে জানিয়েছে উমাপতি। লিখেছে:

বাবা, পরীক্ষা দিতে চললাম। আপনার উত্তর যাই হোক—আমাকেও নিজের কাজের দ্বারা উত্তর পেতে হবে। সর্ব্বপ্রথমে ভাঙব সামাজিক প্রথাকে। আপনারা যাকে হরিজন বলেন, তেমন বংশের কোন মেয়েকে সঙ্গিনী করে কাজে নামব। যাদের কল্যাণ করব—তাদের দূরে রেখে খানিকটা ভক্তি সম্ভ্রম আর মর্য্যাদা আদায় করব না—এই স্থির করেছি। ওরা যে ওরা—আমরা যে আমরা এটা মুছে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। পারি কিংবা হারি—সে জবাব ভবিষ্যতের থাকুক।

স্তম্ভিত সুরপতির বাঙ্‌নিষ্পত্তি হ'ল না—এমন আঘাত সে প্রত্যাশা করে নি।

অরুন্ধতীকে ডেকে চিঠিখানি তার হাতে দিয়ে বললে, পড়।

অরুন্ধতী চিঠি পড়তে লাগল, সুরপতি একদৃষ্টে তার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করতে লাগল।

চিঠি পড়ে সেখানা ভাঁজ করে অরুন্ধতী নিরুত্তরে বাপের হাতে ফিরিয়ে দিলে, কোন মন্তব্য করলে না।

সুরপতির বিস্ময় বাড়ল। বললে, তুই যে কিছু বললি না অরু?

আমি! চমকে উঠল সে। বুঝি সঙ্কোচ লজ্জায় মুখখানি ওর ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল। ঠিক মাথা নামিয়ে নয়—মুখ

ফিরিয়ে ধীরে ধীরে উত্তর দিলে, বেশ ত, দাদা পরীক্ষা করুক না।

এ পরীক্ষার কোন মানে হয়!

পরীক্ষার মানে আর কি—তা ফলের উপরই নির্ভর করে।

ওকে সমর্থন করছ তুমি! ক্রোধে বিস্ময়ে সুরপতির কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হ'ল।

আপনি তো আমাদের ভালমন্দ বেছে নেবার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন বাবা। একটু থেমে বললে, দাদা প্রায়ই বলত—যে পৃথিবী সম্পূর্ণ হ'ল সে পৃথিবী আমাদের নয়। কিছু করবার না থাকলে বেঁচে থাকবার অর্থ কি!

ভিতরের অবরুদ্ধ বাষ্প প্রবল প্রতিবাদে ফেটে পড়তে চাইল—অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করল সুরপতি। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল অরুন্ধতীর দিক থেকে। সে দৃষ্টিতে আগুনের উত্তাপ কখন বাষ্পে রূপান্তরিত হয়েছে—বুঝতে পারে নি সে।

সুরপতি ভাবলে, এই ধরণের পরীক্ষার অর্থ যাই হোক—এটা মানুষের স্বভাব। বিদ্রোহটা মানুষের প্রবৃত্তিগত একটা জিনিষ—যা যুক্তি কিংবা যুক্তিগ্রাহ্য নয়—যার হেতু খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র!

হয়ত ঠিক কথাই বলেছে উমা। জগৎ সম্পূর্ণ ও সুন্দর হলে মানুষের করণীয় কিছু থাকবে না বলেই—এই প্রবল বৃত্তি মানুষের অন্তরে রয়েছে। তবু একে মেনে নেওয়া...

দৃঢ় সঙ্কল্পে সে ঘাড় নাড়লে, না, উমাপতিরা ভুলই বুঝেছে—।

পরম ক্ষণ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

এ-পার ও-পার, দু-জনে যে আজ দু-পারের অধিবাসী;
মধ্যে উথলে অশ্রু-সাগরে লবণ-অম্বুরাশি।
দিগন্তহীন অসীমে কোথায় অবলম্বন পাই,
স্মৃতির সেতু যে রচনা করিয়া চলি চিরদিন তাই।
একবার শুধু আসে মানুষের জীবনে পরম ক্ষণ,
তার পর সারা-জীবন ভরিয়া তাহারি অন্বেষণ।
হৃদয় কেবলি হৃদয়ে জানায় সকরুণ আহ্বান,
বৃথা এ মিনতি, নিয়তি সেথায় নিয়ত বর্ত্তমান।
নিষ্ঠুর পরিহাস,
এ জীবন চির-পরিচিতে খুঁজে না-পাওয়ার ইতিহাস।

একদা সে কবে আসিয়াছিলাম তুমি আমি কাছাকাছি,
মনে হ'ল কোন্ স্বপ্নের মাঝে যেন আজ জাগিয়াছি।
নবীন স্বর্গ্যে সোনার দীপ্তি, চন্দ্র কিরণে মায়া,
চরণ-ছন্দ-মন্দ্রিত পথে ছবি এঁকে যায় ছায়া।
যে গান শুনি নি অন্তর-তারে বাজে তার ঝঙ্কার
পুষ্পে পুষ্পে বর্ণ-সুষমা, বাতাসে গন্ধভার।
কিছু নাই আজ অসম্পূর্ণ, সবি হ'ল সুন্দর,
প্রতিদিবসের প্রকৃতিতে এ কি ঘটিল রূপান্তর!
আসে দিন একবার,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে মিলে গিয়ে সব হয়ে যায় একাকার।

সে সুর মিলায়, সে আলো মিলায়, ঝরে না জ্যোৎস্নারাশি,
নিপীড়িত বীণা কেঁদে থেমে যায়, বাজে না ব্যাকুল বাঁশী।
বন্দী হৃদয় গুমরিয়া মরে, কোথা আনন্দময়
অকস্মাতের রহস্য-ভরা সে পরম বিস্ময়।
সহসা দেখি যে তুমি কাছে নাই, দূরে—বহুদূরে আমি,
ধরণীর বুকে কুজ্ঝটিকার আবরণ আসে নামি।
ভুবন-ভরা সে মাধুরীর আর মেলে না কো সন্ধান,
দু-জনের মাঝে অপার সাগর, অলঙ্ঘ্য ব্যবধান।
দিন যদি ফিরে আসে!
মথিত চিত্ত নিশ্বসি উঠে, অদৃষ্ট শুধু হাসে।

তুমিও একাকী, আমিও একাকী, জানি জানি, তবু জানি,
অন্ধকারের বুকে ফুটে উঠে নব-আলোকের বাণী।
হয়ত জীবনে অপূর্ণ থাকে মর্ত্ত্যভূমির আশা,
মিলন ক্ষণিক, মনে রেখো তবু ভুল নয় ভালবাসা।
বৃথা প্রতীক্ষা, হয়ত জীবনে ফেরে না পরম ক্ষণ,
একেলা মানব কেঁদে কেঁদে ফেরে, বিরহ চিরন্তন।
সেই নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে হয়ত অদৃষ্ট জয়ী হয়,
ভালবাসা তবু ভাগ্যের কাছে মানে না কো পরাজয়।
হোক্ এই বিধিলিপি!
চির-বিরহের বহ্নি-দহনে প্রেম হয় চিরজীবী।

মধ্যভারতের গৌড়রাজসভায় বাঙালী পণ্ডিত

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গলার বাহিরে সুদূর আগ্রানগরীর নিকটে এক "গৌড়-রাজ্যে"র অস্তিত্ব যেমন আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তেমনই অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় সেই গৌড়-রাজগণের প্রশস্তিকার "গৌড়ীয়" অর্থাৎ বাঙালী মহাকবি এবং মহাপণ্ডিত দুই জনের কথাও বাঙ্গলাদেশে আজ সমুচিত গৌরব ও প্রচারলাভে বঞ্চিত হইয়া আছে। এ বিষয়ে প্রবন্ধান্তরে আমরা যে সূচনা করিয়াছি (প্রবাসী, পৌষ ১৩৫৪, পৃ. ২৪৪-৫) তাহারই বিস্তৃতি বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল।

গৌড়ক্ষত্রিয়: রাজপুতানার ইতিহাস পাঠে জানা যায় "৩৬ রাজকুলে"র মধ্যে একটি হইল 'গৌড়' (টডের রাজস্থান, ১ম খণ্ড, ৭ম অধ্যায়)। এই ক্ষত্রিয়বংশের আদিস্থান ছিল আজমীর এবং ইহা পাঁচ শাখায় বিভক্ত ছিল। চিতোর-রাজ খোমানের রাজত্বকালে (৮১২-৩৬ খ্রীঃ) খোরাসান-পতি (আলমামুন) চিতোর আক্রমণ করিলে যাঁহারা চিতোর-রাজের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে "আজমীরের গৌড়"দের উল্লেখ আছে (ঐ, মেবারকাহিনী, ৪র্থ অধ্যায়)। টড সাহেব লিখিয়াছেন, পৃথ্বীরাজের সময় একজন গৌড়নরপতি মধ্যভারতে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে শেষ গৌড়নরপতি "রাধিকা-দাস" সিন্ধিয়ার হস্তে পরাজিত হন এবং গৌড়রাজ্যের রাজধানী "শিওপুর" (অধুনা গোয়ালিয়রের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত) তাঁহার অধিকারে চলিয়া যায়—তৎকালে ঐ গৌড়রাজ্যের রাজস্ব ছিল প্রায় ১২ লক্ষ মুদ্রা। পরাজিত গৌড়রাজ ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরম বৈষ্ণব হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। টড সাহেবের মতে বাংলার আদিরাজগণও এই গৌড়বংশীয় ছিলেন এবং তদনুসারেই বাঙ্গলার রাজধানী গৌড় আখ্যা লাভ করিয়াছিল।

কৃপারামের গৌড়রাজ্য: এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব রাজা ও রাজ্যের নাম "রামপ্রকাশ" নামক স্মৃতিগ্রন্থের প্রারম্ভে সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল (Eggeling : *Ind. Off. Cat.* p. 50')। রামপ্রকাশের দুইটি মাত্র প্রতিলিপি লণ্ডনে রক্ষিত আছে, (*ib*, pp. 502 & 531) একটি বঙ্গাক্ষর ও একটি নাগরাক্ষর। গত ১৯৩৯ সনে নবদ্বীপের সাধারণ পাঠাগারে আমরা এই শ্রেষ্ঠ এবং মূল্যবান্ গ্রন্থের একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আবিষ্কার করি—নাগরাক্ষর পত্রসংখ্যা ৪৪৯। প্রারম্ভের তৃতীয় শ্লোকে গ্রন্থসম্পাদক শিবভক্ত রাজা কৃপারামের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া লিখিত হইয়াছে:

> যদ্বুদ্ধিঃ সকলবিবেকনিপুণা প্রাগেব জাগ্রদ্যশো-
> জাহাঁগীর-মহীমহেন্দ্রগণিতা শ্রৈষ্ঠ্যেন সংবুদ্ধিষু।

অর্থাৎ—তাঁহার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিকৌশল সম্রাট্ জাহাঙ্গীরও প্রশংসা করিতেন। পঞ্চম শ্লোকে তাঁহার পুত্র গোবর্দ্ধনের বীরত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। ষষ্ঠ শ্লোকটি এই:—

> শ্রীমদ্ভূপসমূহবন্দিতপদ-শ্রীসাহজাহাঁ-কৃপা-
> পাত্রং যাদবরায়-বর্দ্ধিতনয়ো মাণিক্যচন্দ্রান্বয়ঃ।
> গৌড়ক্ষত্রকুলোদ্ভবো ভুবি কৃপারামাভিধো ভূমিপো
> গ্রন্থং ধর্ম্মকৃতাং কৃতে রচয়িতুং তস্মিন্ মনো যো দধৌ॥

অর্থাৎ—গৌড়ক্ষত্রিয় মাণিক্যচন্দ্রের বংশধর যাদবরায়ের পুত্র রাজা কৃপারাম সম্রাট সাহজাহানের কৃপাপাত্র ছিলেন এবং ধর্ম্মনিষ্ঠদের জন্য এই গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেন।

গৌড়রাজ্যের অবস্থান: কৃপারামের গৌড়রাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা লণ্ডনস্থ পুথির বিবরণ হইতে জানা যায় না। নবদ্বীপের পুথির শেষে যে পুষ্পিকা আছে তাহাতে ৬ শ্লোকে যুবরাজ গৌড়-গোবর্দ্ধন, রাজা কৃপারাম ও গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা "ভট্টাচার্য্য শতাবধানে"র স্তুতির পর গ্রন্থসমর্পণ বর্ণিত হইয়াছে এবং তৎপর নিম্নলিখিত সমাপ্তি বাক্যে গ্রন্থ, গ্রন্থকার, রচনাকাল ও লিপিকারের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে:—

ইতি গৌড়-ক্ষত্রকুলাবতংস-যাদবরায়াত্মজ-মাণিক্যচন্দ্রান্বয়-মহামণ্ডিক-পরমজ্ঞানি-বিরাজমানমানোন্নত- কীর্ত্তিপ্রতাপোর্জ্জিত-নৃপতি-শ্রীকৃপারামা (+ সুনীত-শ্রীশতাবধানভট্টাচার্য + এই অংশ পরে পার্শ্বে সংযোজিত হইয়াছে) বিরচিতঃ কালতত্ত্বার্ণব-সন্তরণোপায়সেতুভূততিথ্যাদিকালনির্ণায়কো রামপ্রকাশনামা গ্রন্থঃ সমাপ্ত ইতি সংবৎ ১৭০৪ বর্ষে কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ রবিবারান্বিতায়াং বৃশ্চিকলগ্নে শুভস্থানে "ইঁদুরখী"-নামনগরে॥

শ্রীকৃপারামনামগৌড়রাজ্যে তস্যাত্মজ-শ্রীগোবর্দ্ধন-গৌড়রাজ্যে তস্যাত্মজ-শ্রীপহারসিংহগৌড়রাজ্যে শুভং॥

মাধ্যন্দিনীয়শাখায়াং যজুর্বেদাধ্যায়ি-শ্রীমহাযাজ্ঞিক-বাধাগ্নি-হোত্রিণাং স্বীয়াত্মজশ্রীদুর্বাসোগ্নিহোত্রিণঃ পাঠার্থং শুভং পুস্তক-মিদং লিখিতং। "অন্তর্বেদি"স্থ-বিগহলী গ্রামীয়ভক্তান্তিবাসিনা।

> যাদৃশং পুস্তকং দৃষ্টং তাদৃশং লিখিতং ময়া।
> যদি শুদ্ধমশুদ্ধং বা মম দোষো ন বিদ্যতে॥ শুভং॥

সর্ব্বশেষে বাঙ্গলা অক্ষরে শেষ স্বত্বাধিকারীর নাম লিখিত আছে:—শ্রীআনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্যস্য পুস্তকমিদং শাং গুপ্তপাড়া মিরভাঙ্গা।

যে সকল তথ্য এস্থলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা সাবধানে নির্ণয় করা আবশ্যক। এই বিরাট গ্রন্থ রাজা কৃপারামের নামেই প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রতিলিপিকার এ স্থলে এবং গ্রন্থমধ্যেও প্রত্যেক প্রকরণের শেষে (৫৮।১, ৯৪।২,

৩৭৪।২, ৩৯৫।২ প্রভৃতি পত্রে) "কৃপারাম-বিরচিতঃ" স্থলে "কৃপারামাজ্ঞনীত-শ্রীশতাবধান-ভট্টাচার্যবিরচিতঃ" পাঠ যোজনা করিয়া প্রকৃত রচয়িতার সম্বন্ধে সকল সন্দেহের নিরসন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, সময়নির্দেশটি (১৭০৪ সম্বৎ কার্তিক শুক্লাষ্টমী রবিবার অর্থাৎ ২৪ অক্টোবর ১৬৪৭ খৃঃ *) গ্রন্থ-রচনারই বটে, প্রতিলিপির নহে। কারণ প্রতিলিপির অক্ষর ও কাগজ খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। তৃতীয়তঃ, "ইন্দুরখী"-নগরে বসিয়া গ্রন্থকার শতাবধান ভট্টাচার্য্য রচনা সমাপ্ত করেন। "গৌড়রাজ্যে"র অন্তর্গত এই নগর গোয়ালিয়র রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে এখনও বিদ্যমান থাকিয়া ঐ চিরবিলুপ্ত রাজ্যের অবস্থান সূচিত করিতেছে। চতুর্থতঃ, ১৬৪৭ সনে রাজা কৃপারাম প্রাচীন হইয়াছিলেন, তাঁহার পৌত্র "পহার-সিংহ"ই বোধ হয় তখন প্রাপ্তবয়স্ক। অন্তর্বেদির লেখক-লিখিত অগ্নিহোত্রির এই গ্রন্থ কি করিয়া গুপ্তিপাড়ায় আসিল তাহার রহস্য দুর্জ্ঞেয় হইলেও অনুমেয়। গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে ভাদ্র মাসে অগস্ত্যোদয়ের গণনা বিবৃত হইয়াছে। অগস্ত্যোদয় বর্ষাকালের অবসান সূচনা করে। গ্রন্থকার এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মূল্যবান্ মন্তব্য করিয়াছেন :—

এবঞ্চ "অর্গলায়াং" মহারাজ-চক্রবর্ত্তিনগরে ষড়ঙ্গুলপরিমিতা তত্র মধ্যাহ্নে শঙ্কুছায়া ৬ ভবতি। ...সিংহস্থসূর্য্যস্য ২০-তমাংশান্তরে নিশান্তে অর্গলাপুরে অগস্ত্যোদয়ঃ। "লাহাম্বির"-মধ্যেপি ভূপতি-কৃপারামরাজধানাং প্রায়স্তথৈবেতি। (৪৩১-২ পত্রে) অর্গলা সম্রাট সাহজাহানের রাজধানী আগ্রানগরীর দেবভাষায় রূপান্তর। বুঝা যায় গ্রন্থকার রাজা কৃপারামের সহিত আগ্রায় গমন করিয়া স্বয়ং মধ্যাহ্নসূর্য্যের শঙ্কুছায়া নিরূপণ করিয়াছিলেন। কৃপারামের রাজধানী লাহাম্বিরও আগ্রার দক্ষিণে গোয়ালিয়র রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে উল্লিখিত ইন্দুরখীর দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। সুতরাং রাজা কৃপারামের "গৌড়রাজ্যে"র অবস্থান সম্বন্ধে অতঃপর সকল সন্দেহ নিরস্ত হয়। টড লিখিত শিবপুরের গৌড়রাজ্যের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

শতাবধানের পূর্ব্বপুরুষ :—রামপ্রকাশ গ্রন্থে শতাবধান ভট্টাচার্য্য স্বয়ং নিজের কিছুমাত্র পরিচয় দেন নাই। তৎপুত্র চিরঞ্জীব "বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী" গ্রন্থে শতাবধানের অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিলেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ পরিত্যাগ করিয়াছেন—কেবল রাঢ়ীয় কাশ্যপগোত্র দক্ষের বংশে শতাবধানের পিতা "কাশীনাথ সামুদ্রিকাচার্য্যে"র নামোল্লেখ করিয়াই শেষ করিয়াছেন। এই সামান্য কুলপরিচয়ও অত্যন্ত দুর্লভ (cf. M. Chakravarti : J. A. S. B, 1915, p. 291) এবং চিরঞ্জীব তজ্জন্য ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার প্রদত্ত ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া আমরা একাধিক রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে কাশীনাথ পর্য্যন্ত সমস্ত পূর্ব্বপুরুষের নাম ও প্রচুর পারিবারিক পরিচয়াদি বিবরণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি—তাহার সারসঙ্কলন লিখিত হইল। চট্টোপাধ্যায়-বংশের আদিকুলীন বহুরূপ (ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী, পৃ. ১), তৎপুত্র গাঙ্গী (ঐ, পৃ. ৫), তৎপুত্র সর্ব্বেশ্বর "ধবসথী" (পৃ. ৯), তৎপুত্র অচ্যুত (পৃ. ১৬), তৎপুত্র নীলাম্বর, তৎপুত্র হরি, তৎপুত্র চণ্ডীদাস (ভৈরবী মেল) তৎপুত্র শ্রীকর, তৎপুত্র বৈষ্ণব মল্লিক, তৎপুত্র গোপীনাথ, তৎপুত্র অনন্তাচার্য্য ('অকৃতী' অর্থাৎ কুলহানি), তৎপুত্র কাশীনাথ "সামুদ্রাচার্য্য", তৎপুত্র শতাবধান ভট্টাচার্য্য (আদিকুলীন হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ—সাকাডাঙ্গার কুলপঞ্জী ২১৪ পত্র ও জয়ন্তীপুর ২১৬।১ পত্র)। শতাবধানের মাতুলবংশ নবদ্বীপের একটি প্রসিদ্ধ বিদ্বদ্গোষ্ঠী—গয়ঘড়ী দিবাকর মিশ্রের সন্তান কাশীনাথ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন (প্রায় ১৫৫০ খ্রীঃ)। তাঁহার তিন জামাতা, প্রথম কাশীনাথ সামুদ্রিকাচার্য্য, দ্বিতীয় ভবানন্দ মজুমদারের পুরোহিত গাঙ্গুলী রাঘব চক্রবর্ত্তী ও তৃতীয় চট্ট গোপীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার—শেষোক্ত ব্যক্তি শতাবধানের পরমগুরু কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমের দৌহিত্র ছিলেন।

শতাবধানের প্রতিষ্ঠা :—চিরঞ্জীবের বর্ণনানুসারে শতাবধান বাল্যকালেই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়াছিলেন :—

বাল্যেঽধীত্য সমস্তশাস্ত্রমতিতঃ সিদ্ধান্তবাগীশতঃ
বাগীশপ্রতিমো বভূব বিজয়ী বাদেষু বিখ্যাতধীম্।

(বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী ১।১০) তাঁহার উপাধির ব্যাখ্যা অন্যত্র দ্রষ্টব্য (ঐ, ১।১১-৩, প্রবাসী, পৌষ ১৩৫৪ পৃ. ২৪৪)। এই "অনন্যসাধারণ শক্তিশালী" পণ্ডিত প্রথমতঃ নবদ্বীপেই অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কারণ চিরঞ্জীবের "বাল্যে" রচিত মাধবচম্পূ গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে, চিরঞ্জীব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং তৎপর বহুকাল কাশীতে যাপন করেন :—

বাগ্দেবীবদনাদনাদিরচনাবিন্যাসদীব্যন্নব-
দ্বীপপ্রাপ্তজনেরনেকদিবসং বারাণসীবাসিনঃ।

(শ্লোকটিতে একটিমাত্র পদে নবদ্বীপের অপূর্ব্ব স্তুতিবাদ আছে—যে নবদ্বীপ সাক্ষাৎ সরস্বতীর মুখনির্গত নিত্য বাঙ্ময়ের রচনাবিন্যাসে শোভমান ছিল)। আমাদের অনুমান হয় শতাবধানের অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ বার্দ্ধক্যে কাশীগমন কালে দিগ্বিজয়ী শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন—ইহা প্রায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। কাশী হইতে ধর্ম্মপরায়ণ রাজা কৃপারামের আহ্বানে শতাবধান পরে সুদূর গৌড়রাজ্যে যাইয়া প্রতিষ্ঠা

* ২৪ অক্টোবর ১৬৪৭ রবিবারই বটে কিন্তু শুক্লাষ্টমী নহে শুক্লাসপ্তমী। সম্ভবতঃ লিপিকার সপ্তম্যাং স্থলে ভুল করিয়া অষ্টম্যাং লিখিয়াছেন। লক্ষ্য করিতে হইবে, এই তারিখ সম্রাট সাহজাহানের রাজত্বকাল মধ্যেই পড়ে।

লাভ করেন। চিরঞ্জীব তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থের শেষে পরিচয় প্রদানকালে পিতার প্রতিষ্ঠার কথা লিখিয়াছেন :—

দ্বৈতাদ্বৈতমতাদিনির্ণয়বিধিপ্রোদ্বুদ্ধবুদ্ধিঃ শ্রুতো
ভট্টাচার্য্যশতাবধান ইতি যো গৌড়োদ্ভবোঽভূৎ কবিঃ।

(অর্থাৎ যিনি কবি হইয়াও শাস্ত্রীয় মতে ভেদ ও ঐক্যমত্যাদি মীমাংসায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখাইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন)। রামপ্রকাশের শেষে স্বয়ং গ্রন্থকারও তাঁহার কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন :—

ভট্টাচার্য্য-শতাবধানকৃতিনি ন্যায়াদিশাস্ত্রার্থবিদ্-
বর্য্যে দ্বৈতমতে তদেকতরতো নির্ণায়কে ভূরিশঃ।

(৫ম শ্লোক)

(অর্থাৎ কৃতী গ্রন্থকার ন্যায়াদিশাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং মতভেদস্থলে একতরপক্ষে মীমাংসা বহুবার করিয়াছেন।)

রামপ্রকাশ রচনা :—এই বিরাট্ গ্রন্থরচনায় বহুকাল অতীত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তিনি রাজার নিকট প্রচুর সম্পত্তিও লাভ করিয়াছিলেন। প্রারম্ভের ৭ম শ্লোকে

ন্যায়াদিশাস্ত্রেষু কৃতশ্রমস্য স্মৃতার্থদৃষ্টেরিতগৌড়ভূতেঃ।
গ্রন্থেঽত্র নানামতনির্ণয়াগ্র্যা শতাবধানস্য কৃতির্মুদে স্যাৎ॥

"ইতগৌড়ভূতেঃ" পদে (অর্থাৎ যিনি গৌড়রাজের নিকট সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন) তাহার স্পষ্ট সূচনা আছে। সম্পত্তির লোভই তাঁহার দূরদেশে আগমনের অন্যতর কারণ ছিল সন্দেহ নাই। আকবর হইতে সাহজাহানের সময় পর্য্যন্ত মোগল সম্রাটদের হিন্দুর শাস্ত্র ও ধর্ম্মের প্রতি প্রকট সহানুভূতি দেশীয় রাজগণকে এবং তাঁহাদের আশ্রিত পণ্ডিতগণকে রাজধানীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। শতাবধানের এই গ্রন্থ বঙ্গের বাহিরে রচিত হইলেও তিনি জন্মভূমির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নাই—বাঙ্গলার গ্রন্থসমূহ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বিচার করিয়াছেন। প্রারম্ভের ১০ম শ্লোকে তাঁহার উপজীব্য প্রমাণ-গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :—

হেমাদ্রি-মাধবাদীনাং গৌড়ানাং তত্ত্বদর্শিনাং।
সম্মতং সমভিজ্ঞায় গ্রন্থোঽয়ং পরিনির্ম্মিতঃ॥

"তত্ত্বদর্শী" গৌড়ীয় গ্রন্থকারদের মধ্যে আচার্য্যচূড়ামণি (৪১৫।১ পত্র), সময়প্রকাশকার (৪১১।২) ও পরিশিষ্ট-প্রকাশকার নারায়ণোপাধ্যায় (৩৬১।২), গৌড়ীয়কাল-কৌমুদীকার (৩২৭।১) ও স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের (৪৩৫।১) নাম উল্লেখযোগ্য। অন্য গ্রন্থের মধ্যে স্মৃতিদর্পণ (৪৪৩।২) ও মেধাতিথির জ্যোতির্নিবন্ধ (৪০৪।১) অতিদুর্লভ। রামপ্রকাশ গ্রন্থ বাঙ্গলাদেশেও প্রচারিত হইয়াছিল—গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের স্মৃতির টীকায় এবং কাশীনাথ তর্কালঙ্কার রচিত প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থাসংগ্রহে (২য় সং পৃ. ২৫) আমরা রামপ্রকাশের উল্লেখ দেখিয়াছি। এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়া উচিত।

গৌড়রাজ্যে বাঙ্গালী উপনিবেশ ?

শতাবধান একাকী সুদূর গৌড়রাজ্যে গিয়াছিলেন মনে হয় না। তাঁহার সঙ্গে কিম্বা পূর্ব্বে বহু বাঙালী সেখানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে। বোধ হয় রাজধানীর সান্নিধ্যে বাস করিয়া ব্যবসায় চালাইবার উদ্দেশ্যে কোন কোন বাঙালী বণিকশ্রেণী সেখানে গিয়াছিলেন।

প্রত্নতত্ত্ববিভাগের J. D. Beglar সাহেব ১৮৭১-২ খ্রীষ্টাব্দে লাহারির (Lahar) এবং ইঁদুরখী (Indurakhi) উভয় স্থানই প্রত্নকীর্ত্তির অনুসন্ধানে পরিদর্শন করিয়াছিলেন। লাহারিরে মারহাট্টা আমলের কতিপয় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া তিনি প্রাচীনতর কিছু দেখেন নাই। কিন্তু ইঁদুরখীতে প্রাচীন বহু কীর্ত্তির মধ্যে তিনি কতিপয় ইষ্টক-গৃহের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

"At Indurakhi there are some *Chhatris* with curved eaves and ridges to the roofs, like the thatched houses and curve-ridged temples of Lower Bengal." (*Arch. Survey, of India*, vol. vii—Bundelkhand and Malwa—p. 38)

অর্থাৎ, বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ "জোড় বাঙ্গলা" ধরণের মন্দিরের আদর্শে এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। লক্ষ্য করিতে হইবে শতাবধান ইঁদুরখীতে বসিয়াই রামপ্রকাশ রচনা শেষ করিয়াছিলেন। তিনি রাজা কৃপারামের চরিত্র যেরূপ উজ্জ্বল ভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় ঐ রাজার আচরণে আকৃষ্ট হইয়াই বহু লোক তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিল এবং তন্মধ্যে বাঙালীও অনেক ছিল। আত্মবিস্মৃত অবস্থায় কোন বাঙালীর বংশধর এখনও ঐ অঞ্চলে থাকা অসম্ভব নহে—এ বিষয়ে যাঁহাদের সুযোগ আছে তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া তথ্য প্রকাশ করিলে বাঙ্গলার বাহিরে বাঙালীর কীর্ত্তি রক্ষার উপায় হয়।

রাজা কৃপারামের তিরোধান :—১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রকাশ রচনার সমাপ্তিকালে রাজা কৃপারাম, তৎপুত্র গোবর্দ্ধন ও তৎপুত্র পহারসিংহ তিন জনই জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই গৌড়রাজ্যে একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল অনুমান হয়, কৃপারামের মৃত্যুতেই হউক অথবা শত্রুর আক্রমণেই হউক। রামপ্রকাশের উপলভ্যমান তিনটি প্রতিলিপিই কালবিষয়ক, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে স্পষ্ট লিখিত আছে রামপ্রকাশের অন্যান্য খণ্ডও রচিত হওয়ার কথা ছিল :—

অথ শ্রাদ্ধস্বরূপং শ্রাদ্ধপ্রভেদঃ শ্রাদ্ধস্য নিত্যনৈমিত্তিককাম্যভেদাদিকং চ "শ্রাদ্ধকাণ্ডে রামপ্রকাশে" বক্ষ্যতে (৩৫৯।২ পত্র)।

জলতর্পণে বিশেষান্তরং চ "শ্রাদ্ধাদিকাণ্ডে রামপ্রকাশে" অবধাতব্যম্ (৪৩০।২)। কিন্তু রামপ্রকাশের শ্রাদ্ধাদিকাণ্ড এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এবং খুব সম্ভবতঃ রচিতই হয় নাই।

না হওয়ার কারণ কৃপারামের মৃত্যু এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খলা হওয়াই সম্ভব। চিরঞ্জীবের একটি শ্লোক হইতে জানা যায় শতাবধান কাশীতেই স্বর্গী হইয়াছিলেন :—

সোঽহং পুরা সমধিগত্য পিতুঃ প্রসাদং
ব্রহ্মৈকতাং গতবতঃ শিবরাজধান্যাং।
যস্মাদধীতমনধীতমথাপি শাস্ত্রম্
অধ্যাপয়ামি নিভৃতং নিপুণং বিচার্য্য॥
(বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী ১।২১)

তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তির সময় ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে নহে, চিরঞ্জীবের গ্রন্থাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্যদ্বারা এইরূপ অনুমান হয়।

চিরঞ্জীবের গ্রন্থাবলী : (১) শৃঙ্গারতটিনী : যৌবনসুলভ শৃঙ্গাররসে পরিপূর্ণ মনোহর ও কবিত্বপূর্ণ নানা ছন্দে ১২০ শ্লোকে এই খণ্ডকাব্য রচিত। ইহাই সম্ভবতঃ তাঁহার প্রথম রচনা। ইহাতে কোন পৃষ্ঠপোষক রাজার নাম নাই। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

২। বৃত্তরত্নাবলী—ছন্দের ক্ষুদ্র গ্রন্থ, রাজা যশবন্ত সিংহের জন্য লিখিত। ১৭৫৫ শকে (১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত (১৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)।

৩। মাধবচম্পূ : ৫ উচ্ছ্বাসে বিভক্ত এই চম্পূকাব্য একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে—ইহা কবির "বাল্যে" রচিত হইয়াছিল। ইহাতেও কোন পৃষ্ঠপোষক রাজার নাম নাই।

৪। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী : ৮ তরঙ্গে বিভক্ত এই সুপ্রসিদ্ধ চম্পূকাব্য বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা কবির পরিণত বয়সের রচনা, কারণ তিনি একটি শ্লোকে লিখিয়াছেন নানা শাস্ত্রে বহুতর গ্রন্থ রচনার পর ইহা রচিত হইয়াছিল।

ন্যায়াদিশাস্ত্রেষু ময়া কৃতা যে কাব্যেষু যে বা রুচিরাঃ প্রবন্ধাঃ।
ভবন্তি বিদ্বান্ চ যাসু যাসু যে যে বুধাস্তৎপরিপোষকাস্তে॥১।২২

চিরঞ্জীবকৃত ন্যায়াদিশাস্ত্রের কোন গ্রন্থই এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই গ্রন্থেও কোন পৃষ্ঠপোষকের নাম নাই।

৫। তাজিকরত্ন : জ্যোতিঃশাস্ত্রের গ্রন্থ, কিন্তু ইহা আমরা এখনও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি নাই।

৬। দুর্গোৎসবপদ্ধতি : গুপ্তিপাড়ানিবাসী এক ভদ্রলোকের নিকট ইহার প্রতিলিপি ছিল, কিন্তু তাহা হারাইয়া গিয়াছে।

৭। কাব্যবিলাস : অলঙ্কার শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, সম্প্রতি কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার সর্ব্বশেষ রচনা; কারণ ইহাতে শৃঙ্গারতটিনী, মাধবচম্পূ ও বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাঁহার রচিত অপর দুইটি অনাবিষ্কৃত রচনার উল্লেখ আছে—হৃদয়কল্পলতা ও শিবস্তোত্র। ইহা কোন রাজার পোষকতায় রচিত না হইলেও ইহাতে উদ্ধৃত কবির স্বরচিত শ্লোকাবলীর মধ্যে বহু রাজার প্রশস্তি পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের একটি প্রতিলিপির তারিখ ১৭৩২ সম্বৎ (অর্থাৎ ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ—L. 4125)। সুতরাং ১৬৭০ সনে চিরঞ্জীব বার্দ্ধক্যে গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়াছিলেন ধরা যায়। তৎপূর্ব্বে বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী ও তাহারও পূর্ব্বে বহুতর গ্রন্থ রচনা হইয়া গিয়াছে ও তাঁহার পিতারও মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের পরীক্ষিত চিরঞ্জীবের সমস্ত গ্রন্থেরই মঙ্গলাচরণ সুপ্রসিদ্ধ "তমোগণবিনাশিনী" শ্লোক এবং শেষে "দ্বৈতাদ্বৈত" শ্লোকের তত্তদ্‌গ্রন্থানুযায়ী পাঠ পরিবর্ত্তন মাত্র।

রাজা যশবন্ত সিংহ :—বৃত্তরত্নাবলী গ্রন্থের বহুতর উদাহরণ শ্লোকে এই রাজার সম্বোধন আছে—তাঁহার পরিচয় অতি স্পষ্টাক্ষরেই গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। শ্রীগোবর্দ্ধনভূপনন্দন (২য় শ্লোক), কৃপারামৈকবংশধ্বজ (৪র্থ শ্লোক) এবং (প্রতি পৃষ্ঠায়) পুনঃ পুনঃ "গৌড়" শব্দের প্রয়োগ হইতে তাঁহাকে এক্ষণে অনায়াসে জানা যায়। তিনি পহার সিংহের কনিষ্ঠ ভাই কিম্বা নামান্তর। চিরঞ্জীব কাশীতেই অধ্যাপনা করিতেন, কিন্তু সম্ভবতঃ কিছুকাল গৌড়রাজ্যে পিতার স্থলে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং সেই সময়েই বৃত্তরত্নাবলী রচিত হইয়াছিল—রচনাকাল প্রায় ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইবে। কাব্যবিলাসেও যশবন্তের স্তুতি আছে (পৃ. ৪০, ৫০) এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য রাজাদেরও স্তুতি আছে। তিনি ধারাবাহিক গৌড়রাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন না নিশ্চিত। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই যশবন্তকে নবাব সুজাউদ্দীনের (১৭২৭-৩৯ খ্রীঃ) ঢাকাস্থিত নায়েব দেওয়ানের সহিত অভিন্ন ধরিয়া (Notices, III, No. 280) বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন—চিরঞ্জীব ১৭০০ সনের বহু পূর্ব্বেই স্বর্গী হইয়াছিলেন। কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের পুত্র যশোমন্ত সিংহও (১৭১১-৪৮ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি সন্দেহ নাই (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৭, পৃ ১৩৫ দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ চিরঞ্জীব কাশী এবং উল্লিখিত গৌড় রাজ্য ছাড়িয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

রাজস্তুতি :—কাব্যবিলাসে নিম্নলিখিত রাজাদের স্তুতি পাওয়া যায় :—মৃত রাজা মানসিংহ (পৃ. ৪৯), মৃত রাজা বিক্রমসিংহ (পৃ ৩৯), মৃত রাজা কৃপারাম (পৃ ১৮), রাজা জয়সিংহ (পৃ. ৪৫), কীর্ত্তিসিংহ (পৃ. ৫০) এবং রাজা হৃদয় (পৃ. ১৬, ১৯, ৩৫, ৪৬)। ইঁহাদের কাঁহারও সভায় তিনি গৌড় রাজ্যের বিপর্য্যয়কালে আশ্রয় লইয়াছিলেন অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ তদ্রচিত (হৃদয়-) কল্পলতা গ্রন্থ হৃদয় রাজার সভায় লিখিত বলিয়া অনুমান হয়। এই হৃদয় (একস্থলে 'হৃদয়েশ' আছে পৃ. ১৯) গড়মণ্ডলের রাজা হৃদয়েশ্বর কি না বিবেচ্য। জয়সিংহকে ৺শাস্ত্রী মহাশয় দ্বিতীয় জয়সিংহ ধরিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রমাণাবলী দৃষ্টে তাঁহাকে সুপ্রসিদ্ধ মির্জা রাজা জয়সিংহ হইতে অভিন্ন ধরাই যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে কাব্যবিলাস গ্রন্থ ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মির্জা রাজার মৃত্যুর

পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। শতাবধান ও তৎপুত্র চিরঞ্জীব যেরূপ অসামান্য প্রতিভাশালী ছিলেন তাহাতে আমাদের ইহাও অনুমান হয়, কাশীতে উক্ত মির্জা রাজা জয়সিংহ দ্বারা রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন চিরঞ্জীব এবং সেখানেই তিনি বিভিন্ন রাজপুত্রদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। Tavernier সাহেব ১৬৬৫ সনের ডিসেম্বর মাসে পরিদর্শন করিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ দিয়াছেন। বেণীমাধবের মন্দিরের পশ্চিম ভাগে ইহা অবস্থিত ছিল বলিয়া জানা যায়। এই সময়ে চিরঞ্জীব যে কাশীর একজন সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক ছিলেন তাহা বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক হইতে বুঝা যায়।

শতাবধানের বংশধরে :—শতাবধানের মূল বাড়ী হুগলী জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ গুপ্তপল্লী অর্থাৎ গুপ্তিপাড়া গ্রামে ছিল। ১৬৬৯ সনের আগষ্ট মাসে ধর্ম্মান্ধ সম্রাট্ আওরঙ্গজেব কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করিয়া হিন্দুমাত্রেরই মনে যে ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল তাহার ফলে বহু লোক কাশী ত্যাগ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। এই সময়ে বহু বাঙ্গালীও পশ্চিমাঞ্চল হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া থাকিবে—সহর অপেক্ষা গ্রামই তখন কতকটা নিরাপদ ছিল। চিরঞ্জীব কিম্বা তাঁহার পুত্রগণ এই সময়েই প্রায় ৭০ বৎসর কাশী ও গৌড়রাজ্যে বাস করার পর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ সাধক ও কবি মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার ১৫৯৪ শকাব্দে (১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে) "শ্যামাকল্পলতিকা" রচনা করেন। গুপ্তিপাড়ায় প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে চিরঞ্জীব মথুরেশের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ. ৯৪৮)। চিরঞ্জীবের অধস্তন বংশে দীর্ঘকাল পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল ; আমরা কতিপয় নাম সংগ্রহ করিয়াছি। ব্রজদেব তর্কবাগীশ শূদ্রমণি জমীদার মনোহর দত্ত ও গদাধর দত্তের নিকট ১১২৭ সনের ৫ ভাদ্র (১৭২০ খ্রীঃ) প্রভূত নিষ্কর ভূমি দান পাইয়াছিলেন (বর্দ্ধমানের ২৫৩৩ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)। ব্রজদেব এবং তাঁহার জামাতা বিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী বর্দ্ধমানরাজ চিত্রসেনেরও দানভাজন ছিলেন। ব্রজদেবের পৌত্র রাজারাম সিদ্ধান্ত রাজা তিলকচাঁদের নিকট ভূমি দান পাইয়াছিলেন। ১২০৯ সনে এই বংশে উক্ত রাজারাম, রঘুনন্দন ন্যায়পঞ্চানন ও রঘুবীর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি জীবিত ছিলেন। ১৮৯৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে অশীতিপরবৃদ্ধ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নিঃসন্তান পরলোকগত হইলে এই ভারতবিখ্যাত মহাপণ্ডিতের বংশ বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইংরেজ রাজত্বে ভারতে ধনতন্ত্র-প্রতিষ্ঠায় এ জাতীয় সদ্যঃ ফল ঘরে ঘরেই ফলিয়াছে। কেবল চিরঞ্জীব কেন, যাঁহাদের গ্রন্থরত্ন এক সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র সমুচিত সমাদরের সহিত অধীত হইত এইরূপ শত শত মহাপণ্ডিতের নাম ও বংশ মহাপ্রলয়ের আবর্ত্তনে পড়িয়া যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই বংশের সংযোগ কাশী ও গৌড় রাজ্যের সহিত সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নাই। তজ্জন্যই রামপ্রকাশের পূর্ব্বোল্লিখিত পুথিটি গুপ্তিপাড়ায় আসিতে পারিয়াছিল। কালক্রমে এই পুথি কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে স্থানপ্রাপ্ত হয়। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ইহা ও অপরাপর বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ রাজবাটী হইতে গঙ্গাপ্রাপ্তি হওয়ার উপক্রম হইলে নবদ্বীপের একজন গ্রন্থরসিক পণ্ডিতের চেষ্টায় পাঠাগারে লোকলোচনের গোচর হইয়া অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্যাবিষ্কারের সহায়ক হইয়াছে।

এবার অবগুণ্ঠন খোলো

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভুলে যাওয়া মোর কথাগুলি এলো স্মরণের উপকূলে
শুভ শরতের প্রথম স্বরের হিন্দোলে দুলে দুলে।
শ্যামাবনানীর বসনপ্রান্তে জোনাকির পাখা জ্বলে,
নীল আকাশের অঙ্গন ভরি আলোকের খেলা চলে।
ক্ষণমিলনের আবেশে আবেগে শিহরিছে কলেবর,
বাসর-রাত্রি এসেছে রচিতে বিনম্র অবসর।
কত ঘর ছেড়ে কত ঘর পেতে জানা হোতে অজানায়
মনোহরণের লুকোচুরি খেলা মদবিহ্বল বায়।

তুমি যেন ছবি কবিতায় ঢাকা, ভাবের তুলিতে আঁকা,
আপনার মাঝে করেছ রচনা আনন্দ রূপরাকা।
মাধুর্য্য দিয়ে তনু-লাবণ্য করেছ যে প্রসাধন,
তোমারে ঘেরিয়া বন-লতিকার নির্জ্জনে নীরাজন।
তোমারে হেরিয়া মনে হয় মোর সবি সুন্দরতম,
ভরাভাদ্রের তটিনীর সম এসেছ সমুখে মম।

জীবন-পথের আবেগ-আকুল স্বপনের সঙ্গীতে
ফুটিতেছে আশা কুসুমের সম হৃদয়ের নিভৃতে।
বিনা পরিচয়ে মম অন্তরে চঞ্চল ঢেউ তুলি
তোমার কণ্ঠ হবে কি মুখর চমকিয়া ক্ষণগুলি ?
ফুল-উৎসব মন্থর হ'ল মর্ম্মর ধ্বনিয়াছে,
এবার অবগুণ্ঠন খোলো : এসো তুমি মোর কাছে।

মালয়ে টিনের খনি

ক্যাপ্টেন লুই যথাসময়ে আমাদের দলে এসে জুটলেন। প্রাতরাশ সেরে আমরা পাঁচ জনে জিপে ক'রে রওনা হলাম। বাঁদিকে ব্রিটিশ রেসিডেন্সী। ডান দিকে বড় বড় বাড়ী—সবই মিলিটারী আস্তানা। প্রবাসী ভারতীয়দের দু'চারটি বাড়ীও নজরে পড়ল। রাস্তার অনতিদূরেই দাঁড়িয়ে আছে একটা মসজিদ। আমরা রেললাইন পার হয়ে এগিয়ে চললাম। বাঁদিকে খুব বড় একটা চালের কল। মাইল দু-এক যাবার পর আমরা ডান দিকে এরোড্রোম দেখতে পেলাম। উড়ো-জাহাজের সারি যেন অতিকায় পাখীর মত ডানা গুটিয়ে পাহাড়ের কোলে বিশ্রাম করছে। এদিকের রাস্তাটা বাঁদিকে বেঁকে বরাবর চলে গেছে সেঙ্গাবার দিকে।

রাস্তার দৃশ্য সর্ব্বত্রই এক—উভয় পার্শ্বে সেই সবুজ ধান্যক্ষেত্রের অনন্ত প্রসার। এই ধান-ক্ষেতের প্রাচুর্য্য দেখে দেশটিকে তো অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার বলেই মনে হয়। কিন্তু মালয়ীরা শুধু চাষের মালিক, প্রাণের মালিক তারা নয়। মাঝে মাঝে অবশ্য রবার-ক্ষেতও আছে। মাইল দশেক যাবার পর আমরা সিত্রা-ভেস্‌টিটিউট ক্যাম্পে এসে পৌঁছলাম। এখানে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির ক্যাম্প ছিল। এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের জাতীয় বাহিনীর কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করে গর্ব্বে আমার বুক ভরে উঠল। এদিকটায় খুব ম্যালেরিয়া। শ্যামদেশ থেকে যে সব কুলী আসে তাদের এখন এখানে থাকতে দেওয়া হয়। ভারতীয় কুলীদের সংখ্যাও এখানে নেহাত কম নয়। এখান থেকে ধানের-ক্ষেত বড় একটা নজরে পড়ে না—দুধারে শুধুই ছেদহীন নিবিড় রবার-বন। এবার আমরা 'সিত্রা' শহরে এসে পৌঁছলাম।

কতকগুলো মালয়ী পল্লী পার হয়ে আমরা চাংলুন শহরের দিকে এগিয়ে চললাম। এ দিকটায় শুধু রবার-বন—দূরে এখানে সেখানে আরণ্য বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন পাহাড়ের সারি দাঁড়িয়ে। এখানে কেবল রবার প্ল্যানটেশন্ এেষ্টট আছে। এখানকার অধিকাংশ ষ্টেট হয় চীনাদের না হয় ব্রিটিশদের দখলে। এ দিককার রাস্তাটা বেশ উঁচুনীচু একটু দূরে চীনাদের কবর। এখান থেকে চাংলুন শহর আরম্ভ হ'ল। শ্যামের সীমানা এখান থেকে এখনও আট মাইল হবে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি দু'ধারে বাঁশবন আর রবার-বন যেন সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে। আমরা কিছু পরে 'বুকিট কায়ু হিটাম' নামক গ্রামে এলাম। দু'পাশে পাহাড়ের গায়ে রবার-ক্ষেত। আমরা এসব ছাড়িয়ে চললাম। মাইল দুই যাবার পর আমরা শ্যামের সীমানায় এসে পড়লাম। এখানে একটা সাইনবোর্ড রয়েছে, তাতে লেখা আছে 'সাদাও বাউণ্ড্রি-পোষ্ট', মিলিটারী অফিসার দেখে গেট্ বিনা আপত্তিতে খুলে দিলে। সামনেই রাস্তার মাঝখানে শ্যাম ও মালয়ের সীমানা-নির্দ্দেশক একটি স্তম্ভ। এদিকে ভীষণ যুদ্ধ হয়ে গেছে। ডানদিকে কারা যে যুদ্ধ করবার জন্যে 'পিলবক্স' তৈরি করেছিল তা বুঝতে পারলাম না। আলোরষ্টার থেকে শ্যামের সীমানা পর্য্যন্ত দূরত্ব ত্রিশ মাইল। এদিকে বেজায় ধুলো। প্রায় সবগুলো সাঁকো বোমা-বর্ষণের ফলে ভেঙে গিয়েছিল। জাপানীরা সবই পুনর্নির্ম্মাণ করেছে দেখলাম, তবে স্থায়ী হবে ব'লে মনে হয় না—কারণ সবই কাঠের তৈরি। খানিকদূর এগিয়ে আসবার পর আমরা খ্লাউং-কুয়ান নামে একটা ছোট্ট গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রাম-প্রান্তস্থ একটা ভাঙা পুল পেরিয়ে আমরা 'গ্রামছাড়া রাঙা-মাটির পথ' ধরে জীপ চালিয়ে চললাম। এখান থেকে বেশ একটুখানি বৈচিত্র্যময় দৃশ্য সুরু হ'ল। রক্তের মত রাঙা লাল মাটির পথ সুদূরের পানে উধাও হয়ে চলে গেছে—নিম্নে প্রবহমাণ ছোট ছোট নদীসমূহের শুভ্র জলধারা রজতরেখার মত দৃশ্যমান। মাঝে মাঝে ধানক্ষেত, নারিকেল গাছ, সুপারি গাছ, আম গাছ ও ট্যাপিওকা গাছ ইত্যাদির নিবিড় বন। রাস্তার দু'পাশে কোথাও বা রাস্তার লাল আর বনের সবুজের এক অপূর্ব্ব সুসঙ্গতি। এখানে সবচেয়ে বেশী নজরে পড়ল রবার-বন। রবার গাছের সারি যেন দু'পাশে পদাতিক সৈন্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। আমরা কিছুক্ষণ বাদে 'সাদাও' শহরে এসে পড়লাম। সাদাও শহরে একটা গেট রয়েছে। এখানেও খানাতল্লাসীর পরে বহিরাগতদের শহরে ঢুকতে দেয়। আমাদের এ সবের বালাই নেই। পুলিসরা শহরে টহল দিচ্ছে, সবাই শ্যামদেশীয়। শহরে নানা বেশধারী বিভিন্ন জাতের লোক দেখলাম। থাইবাসীরা দেখতে ঠিক মালয়ীদের মতই, নাকের ডগাটা বা একটু মোটা, তা ছাড়া আর সব দিক দিয়ে বেশ সাদৃশ্য আছে। সুন্দর চেহারাওয়ালা দু'চার জন লোকও নজরে পড়ল।

এদিক থেকে একটা রাস্তা গেছে পেডাং-বেসারের দিকে। এটি একটি রেল ষ্টেশন, 'পার্লিস' রাজ্যের মধ্যে পড়ে। কতক-গুলো ছোট গ্রাম পেছনে রেখে আমরা খ্লাউংগাঈ শহরে এসে পৌঁছলাম। এটি একটি বড় শহর। এখানে আমরা দুটো রেল-লাইন পার হলাম। ডানদিকে রেল-লাইন, বাঁদিকে পাহাড়। এই লাইনটা হাজাই শহরের দিকে চলেছে—এটা

হ্রদ, কোয়ালা লাম্পুর

সেরেম্বানের পথে শ্যাম উপসাগরের দৃশ্য

বাদশাহ আলমগীর [শ্রীপ্রিয়প্রসাদ গুপ্ত

চতুরাশ্রম [শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

সেঙ্গোরার পথে শ্যাম-উপসাগরের ধারে রেষ্ট হাউস

শ্যাম ষ্টেটের রেলওয়ে। আরম্ভ হয়েছে পাডাং বেসার থেকে। এটি মিটারগজ লাইন। আমরা 'ব্যাট্' নদী পার হয়ে সাংলা-খুংলুং শহরে এসে পড়লাম। এখান থেকে সেঙ্গোরা ৪৬ মাইল।

'ওরাট্' নামক একটি নদী অতিক্রম করে আমরা একটা রেল-লাইনের নিকট এসে পড়লাম। রেল লাইনটি 'কোটাবারু'র দিকে চলে গেছে। কোটাবারু ও সেঙ্গোরাতে জাপানী সৈন্যেরা প্রথম অবতরণ করে মালয়দেশ অধিকার করে। ডানদিককার রাস্তাটা ধরে সোজা এগিয়ে চললাম। খানিকটা আসবার পর আমরা একটা জংশনে এসে পেলাম। এখান থেকে বাঁদিকের রাস্তা ধরে বরাবর গিয়ে হাজির হলাম 'হাজাই' শহরে। এখানে একটি সিকিউরিটি আপিস আছে। সেখানকার এক সার্জেন্টের কাছ থেকে মজুমদার মশায় ১০ ডলারের টিকল (শ্যামদেশীয় মুদ্রা) ভাঙিয়ে নিলেন। সাত টিকল এক ডলারে পাওয়া গেল, বাজারে এক ডলারে ছয় টিকল হিসাবে নেয়। আমি ক্যাপ্টেন দত্তের কাছ থেকে ত্রিশ টিকল নিয়ে এসেছিলাম।

রাস্তাটি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। বড়জোর ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে জিপ চালান যেতে পারে। রাস্তায় আমরা দু-একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম। একজন ছোট একটি ছেলের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন—নেতাজীর ফটো ছেলেটির বুকে আঁটা রয়েছে। প্রথমেই 'জয় হিন্দ' বলে সম্ভাষণ করা হ'ল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পাঞ্জাবী ছাড়া ভারতের আর কোনও জাতের লোক এখানে আছেন কিনা? আমার প্রশ্নের যে জবাব পেলাম তাতে শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠল। ইনি বললেন, "এখানে পাঞ্জাবী কি গুজরাটি বলে কোন জাত নেই, আমরা সকলেই ভারতবাসী।" বুঝলাম নেতাজীর আদর্শ এখানকার আকাশে-বাতাসে মিশে রয়েছে। তাই তো এখানকার ভারতীয়েরা সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে উদার দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করতে পেরেছেন। ভারতীয় বলতে গর্বে এঁদের বুক ফুলে উঠে। আর খাস ভারতবর্ষে আমরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করে চলছি, সাম্প্রদায়িকতা আর প্রাদেশিকতা দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দে মেতে উঠেছি। আমরা বাজার ঘুরে হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সারতে গেলাম। খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকলে দাম দিতে গিয়ে দেখি খুব সস্তা—চার জনের খাওয়া-খরচ পড়ল মাত্র ছয় ডলার। শ্যামে এখনও খাবার খুব সস্তা, ভাল মুরগী দুই থেকে আড়াই ডলারে পাওয়া যায়। আর মালয়ে ছয় থেকে সাত ডলার—সেখানে খাওয়া থাকা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। কাকেও বকশিশ দিতে গেলে পাঁচ ডলারের কমে কিছুতেই পারা যায় না। টাকা হ'লে পাঁচ টাকা দিলেই ব্যস্। হাজাই শহরের পাশে রেল-ষ্টেশন—এখান থেকে রেলে 'কোটাবারু' ও 'ব্যাঙ্কক' যাওয়া যায়। এটি বহুদিনকার পুরানো শহর, ধুলো উড়ছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মোটেই নয়, চীনা অধিবাসী এখানে খুব বেশী। বড় বড় দোকানগুলো সবই চীনাদের। মালয়ীরা সংখ্যায় এখানে খুব কম। এখানে আর একটি জাত আছে তারা চীনা ও শ্যামজাতির মিশ্রণে সমুৎপন্ন বর্ণসঙ্করজাত। দেখতে এরা বেশ। আমরা সাড়ে তিনটায় সেঙ্গোরার পথে পাড়ি দিলাম।

লেকের ধারে 'না-খোলা' বাজার ও কাঠের বাড়ী। এখানে আমেরিকানরা বোমাবর্ষণ করে অনেক বাড়ীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে

মোড়ের মাথায় এসে বাঁদিককার রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে চললাম। আকাশে মেঘ করেছে। ক্রমে একটু একটু বৃষ্টিপাত সুরু হ'ল। এখান থেকে আবার রাস্তার দুধারের সবুজ-শোভা চোখ জুড়িয়ে দিতে লাগল। মাইলের পর মাইল জুড়ে বরাবর চলেছে ধানক্ষেত। একটু ঘুরে গিয়ে আমরা রেল-লাইন পার হলাম। এবার আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। প্রবল বারিবর্ষণে দূরের আকাশের নীলিমা আর দু'ধারের ধানক্ষেতের শ্যামল শোভা ঝাপসা হয়ে এল। বারিধারাসিক্ত পথের উপর দিয়ে জিপ চলল দ্রুতবেগে। হাজাইয়ের মোড় থেকে সেঙ্গোরা আঠার মাইল। পথে অনেকগুলো নদী পার হতে হ'ল, এবার নৈসর্গিক দৃশ্যপটের পরিবর্তন হয়েছে—মাঝে

লেকে জেলেদের মাছ ধরবার পাগার

মাঝে জঙ্গল, দূরে পাহাড়ের শ্রেণী সমুন্নত শিরে দাঁড়িয়ে। প্রবল বারিপাতের ভেতর দিয়ে জিপ চালিয়ে আমরা বেশ খানিকটা রাস্তা এগিয়ে এলাম। বৃষ্টি এখন থেমে গেছে। বাঁদিকে দূরে পাহাড়ের মাথায় শ্যামদেশের বৌদ্ধ প্যাগোডার চূড়া দেখতে পাওয়া গেল। কান্তবর্ষণ আকাশের পটে অভ্রভেদী মন্দিরচূড়ার স্তব্ধ গাম্ভীর্য হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করলে। রাস্তার পাশে শ্যামবাসীদের দু-একখানা বাড়ী। ডানদিকে উন্নত পাহাড়শ্রেণী সুদূর দিগন্তের পানে উধাও হয়ে চলে গেছে। আমরা একটা বড় নদী পার হয়ে সেঙ্গোরায় ঢুকে পড়লাম।

শহরের সর্বত্র ছোট ছোট বাংলো ও আতপ-পাতায় ছাওয়া বাড়ী। রাস্তার বাঁদিকে বৌদ্ধ মন্দির। মন্দির-চত্বরে পীতবসনপরিহিত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বসে আছেন। আশেপাশে দণ্ডায়মান মন্দিরের মত আকৃতিবিশিষ্ট কতক-গুলো স্তম্ভ বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কোন বৌদ্ধ পুরোহিতের মৃত্যু হ'লে পর তাঁর মৃতদেহ দাহ করে ভস্মাবশেষ মাটিতে পুঁতে এ ধরণের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। আমরা এসব দেখে ডান দিককার একটা রাস্তা দিয়ে শ্যাম উপসাগরের অভিমুখে এগোতে লাগলাম। বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে সোজা সেঙ্গোরার লেকে যাওয়া যায়। যাবার পথে একটি বড় রেষ্ট হাউস নজরে পড়ল। এখানে যাত্রীদল এসে থাকতে পারে, অবশ্য খরচ তাদের নিজেদেরই দিতে হয়। রাস্তার দু'ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, এখানে সেখানে ছোট ছোট বাংলো। আমরা এসব ছাড়িয়ে একেবারে শ্যাম উপসাগরের ধারে এসে পৌঁছলাম। এখানে অনেক লোকের ভিড়। শ্যামদেশীয় ভদ্র-পরিবারের মেয়েরা অনেকে এখানে বেড়াতে এসেছেন। সাঁতার কাটার মতলবে আমরা চারজনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম শ্যামসাগরের সুনীল জলে। স্নানান্তে তীরে উঠে আমরা একটি শ্যামদেশীয় ছেলেকে গাইড করে এগিয়ে চললাম। এখানে একটি ছোট পাহাড়ের উপর একটি সুন্দর বাগান নজরে পড়ল—তিন জনেই উপরে উঠে গেলাম। সামনে একটা কামান রয়েছে, বিশেষ কিছুই দেখবার নেই। ওপরে একটা চাপরাশীর সুন্দর বাংলো আছে। একজন শ্যামদেশীয় ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী বাংলোর বহিঃপ্রাঙ্গণে বেড়াচ্ছিলেন। স্থানীয় কয়েকটি তথ্য জানবার জন্যে তাঁদের প্রশ্ন করলাম। কিন্তু তাঁরা কেউ ইংরেজী জানেন না—উত্তর দিতে পারলেন না। সেখান থেকে নেমে এসে গাইড ছোকরাটিকে নিয়ে জিপে চেপে বসে আমি নিজে জিপ চালাতে আরম্ভ করলাম। ছেলেটির নাম নিশীথ রতন কোট্। তার বাড়ী লেকের ধারে—বাপ মা দুজনেই বেঁচে আছে। ছেলেটি ব্যাঙ্ককে পড়তে গিয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ বাধতেই সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়। আমরা দূর থেকে প্যাগোডা দেখলাম, পাশেই লাইট হাউস ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এখানে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা ভীষণ বোমাবর্ষণ করেছে। আমরা 'কেপে'র পাশ দিয়ে জিপ চালিয়ে বরাবর লেকের ধারে গিয়ে হাজির হলাম। লেকটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০ মাইল, এখানে অনেক জেলের বাস। লেক থেকে মাছ ধরে এরা জীবিকা উপার্জন করে। এই বিরাট হ্রদটিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন বললে অত্যুক্তি হয় না। হ্রদতটে দাঁড়িয়ে আমরা তার শোভা অবলোকন করতে লাগলাম। ওপারে ধূসর পাহাড় উন্নতশিরে দণ্ডায়মান, সম্মুখে নীল বারিরাশির অনন্ত প্রসার, দৃষ্টি যেন সেই নীলিমায় অবগাহন ক'রে ধন্য হয়। পাহাড়ের কোলে জেলেদের ছোট ছোট ঘরগুলো যেন ছবির মত দৃশ্যমান। প্রকৃতি এদিকটায় সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে রেখেছেন বটে, কিন্তু মানুষ এখানকার লোকালয়ের শ্রীসম্পাদনে বড়ই উদাসীন। লেকের ধারেই নোংরা পল্লী। এত সুন্দর লেক—প্রকৃতির রূপ এখানে এত নয়নানন্দকর, কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন। মনে হয় এরা প্রায় সকলেই অত্যন্ত দরিদ্র। শ্যাম-গবর্ণমেন্ট এ অঞ্চলের উন্নতি বিধানে কেন যে মনোযোগী নন তা বুঝা দুষ্কর। এর পাশে 'নাখোনা' বাজার। এর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললাম; মাঝে মাঝে লেকের দিকে ঘরবাড়ী বোমার আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সেগুলোকে এরা আবার মেরামত করতে আরম্ভ করেছে। শ্যামবাসীদের সংখ্যা এখানে খুব বেশী, ভারতীয়দের সংখ্যা এদের অনুপাতে খুব কম। লেকের ধার দিয়ে চলেছি, থৈ থৈ করছে লেকের জল, দূরে কালো পাহাড়ের কোলে সাদা মেঘের লুকোচুরি খেলার আর অন্ত নেই। লেকের জলে জেলে ডিঙিতে করে জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরছে। এরাও 'পাগার' করে মৎস্য শিকারে ওস্তাদ। লেকের মধ্যে বড় বড় জঙ্ক (বড় নৌকা) ভাসছে। আসবার সময় শ্যাম উপসাগরের ধারে একটা জলমগ্ন জাহাজ দেখলাম। গাইড ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, ওটা জাপানী জাহাজ—নিজেদেরই মাইনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ডুবে গেছে। এক বড়

ডোরিসান ফল হাতে একটি মালয়ী মেয়ে

হ্রদ এদেশে আর আছে কিনা সন্দেহ। এই হ্রদ সাগরের মত বিরাট, সুদূরপ্রসারিত। এর বারিরাশি অন্তরীপের কাছে গিয়ে মিশেছে। জাহাজ অনায়াসে এর মধ্যে ঢুকতে পারে। রাস্তার ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছে একটি বৌদ্ধ মন্দির। শ্যামদেশবাসীরা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। মালয়ীদের মত এদের পরণেও সারং ও কুবায়া। কেনাকাটা করবার জন্যে বাজারে নামলাম। বাড়ীতে কবে ফিরব মেয়ে দুটি হয়ত তারি প্রতীক্ষা করে অধীর আগ্রহে দিন গুনছে। তাদের জন্যে একটি শ্যামদেশীয় ছাতা, বেতের তৈরি ছোট্ট বাহারে ব্যাগ ইত্যাদি কিনলাম। দোকান থেকে ফিরছি, দেখি চক্রবর্ত্তী-মশায় একটা দোকানে বসে বসে গল্পগুজবে মেতে উঠেছেন। আমি ভেতরে ঢুকলাম। দোকানদার ভদ্রলোক পঞ্জাবী মুসলমান। 'জয় হিন্দ' উচ্চারণ ক'রে আমায় অভ্যর্থনা করলেন। আমিও জয় হিন্দ বলে তাঁকে প্রত্যভিবাদন জানালাম। নেতাজীর হরেক রকমের কটো ছোট বড়টার প্রায় সব জায়গায়। নেতাজী সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল তাঁর সঙ্গে। নেতাজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তির অন্ত নেই। এঁর গ্রুব বিশ্বাস নেতাজী মারা যান নি। যত দিন না ভারত স্বাধীন হয় তত দিন তিনি মরতে কখনও পারেন না, তিনি বললেন যে নেতাজী এখানে কোনদিন পদার্পণ করেন নি; কিন্তু তাঁকে দেখবার জন্যে স্থানীয় সকল ভারতীয়ই ব্যাঙ্ককেই অনুষ্ঠিত এক সভায় গিয়েছিলেন। ক্ষুদ্র দোকানের সামান্য দোকানদার, কিন্তু নেতাজীর আদর্শে তাঁর হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ঘুচে গেছে। বাস্তবিকই তিনি বড় মনের অধিকারী হয়েছেন। এঁর সান্নিধ্যে গিয়ে নেতাজীর মাহাত্ম্যকে যেন নূতন করে উপলব্ধি করলাম—কিছুক্ষণ পরে চলে আসবার সময় মনে হ'ল যেন নিতান্ত আপনার জনকে ছেড়ে যাচ্ছি।

ফেরবার পথে দেখি একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। পথি-পার্শ্বে লোকের পর লোক ভক্তিভরে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই একটা বৌদ্ধ মন্দির নজরে পড়ল—ভেতরেও বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। সেটা তৈরি হয়েছে—থাই সাল ২৪৮৬ অব্দে (বৌদ্ধ যুগের সাল)। আমরা যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই আবার পাড়ি জমালাম। বাঁদিক দিয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একটা পথ চলে গেছে—সেই পথে মাইল তিনেক যাবার পর 'কাউসেং চেজার' পাহাড় দেখা যায়—এখানকার দৃশ্য বড়ই মনোরম।

মৃত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্দেশে নির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। জনমানবশূন্য রাস্তার ওপর দিয়ে জিপ চালিয়ে আমরা চলেছি। বেশ ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়েছে। নির্জ্জন বনপথে রাতচরা পাখীর কর্কশ কণ্ঠ শুনে গা-টা ছম্ ছম্ করে ওঠে। আমাদের জিপের আলো পড়ে লক্ষ্মীছাড়া পাখীদের চোখগুলো জ্বলছে। পল্লীর পথে বনবিড়াল আর শেয়ালের আনাগোনার অন্ত নেই। আমাদের ভয় চীনা ডাকাতের কথা ভেবে। তাদের পাল্লায় পড়লে প্রাণ বাঁচানই হবে দায়। চীনা দস্যুরা টাইপিং-এর

বর্ষাকালে দিনের বেলায়ই টাকার লোভে লোককে গুলি করছে এমন কথা হামেশাই শোনা যায়। এদের কাছে অনেক অস্ত্রশস্ত্র আছে। ব্রিটিশরা প্রথমে পরাজিত হয়ে এ-দেশ ত্যাগ করবার সময় এদের হাতে অনেক অস্ত্র দিয়ে যায় —জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলে। আবার জাপানীরা যখন আত্মসমর্পণ করলে তখন এদের প্রচুর অস্ত্র দিয়ে যায়—ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই চালাবে বলে।

ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল বেগে জিপ চালিয়ে চলেছি। ভয়ের কারণ থাকা সত্ত্বেও আমরা মোটেই ভীত হই নি। কেননা আমরা পাঁচ জন ছিলাম—আর তার ওপর 'স্টেনগান' বত্রিশটা, তাতে গুলি পোরা আছে। যদি আশঙ্কার কোন কারণ ঘটে তা হলে স্থির করলাম—বেমালুম গুলি চালাব। খানিকটা দূর গিয়ে এক পুলের কাছে গাড়ী থামালাম। চীনাদের মালবাহী দু-একখানা গাড়ী দেখতে পাওয়া গেল। জিপে তেল-জল দিয়ে আবার ষ্টার্ট দিলাম। রবার-ক্ষেতে পুঞ্জীভূত নিবিড় অন্ধকার—আকাশ মেঘে ঢাকা। এবার সুরু হ'ল বন্ধুর পথ। সামনে নানা জায়গায় গর্ত রয়েছে। পথ খারাপ বলে এখন আস্তে আস্তে চালাতে হচ্ছে। জিপের গর্জন ছাপিয়ে নীচেকার প্রবহমাণ নদীর কল-ধ্বনি কানে এসে প্রবেশ করছে। মাঝে মাঝে উড়ন্ত চামচিকাগুলো গাড়ীর গায়ে এসে ধাক্কা খাচ্ছে। আকাশে চন্দ্র-তারা মেঘে আচ্ছন্ন অথচ মজুমদার মশায়ের—"যে লগনে জনম আমার আকাশে চাঁদ ছিল" আরম্ভ হ'ল। আমরা রাত সাড়ে নটায় 'আলোরষ্টারে' এসে পৌঁছলাম। পরের দিন কুলিম হ'য়ে আমরা টাইপিং-এ ফিরব মনস্থ করলাম।*

---

* লেখকের "মহাযুদ্ধের পর মালয়" নামক পুস্তকের একটি অধ্যায়।

প্রবাসীর শরৎ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

কত, কত দিন
হেরেছি তোমার স্বপ্ন বিরামবিহীন—
আজ তুমি যবে
বাংলার জলে স্থলে আকাশে গৌরবে
শোভিবে—রব' না আমি যোগ দিতে তোমার উৎসবে।

আজিকে যখন
শেফালী কমলদলে পরম লগন
বিকশি' উঠিবে সুখে, স্মৃতিপটে আঁকি'
লব' তব রূপ খানি—তবু কিছু বাকী
রয়ে যাবে, আকস্মিক বেদনার সাথি'।

পরাণ অসহ হবে, তারি মাঝে করিব সন্ধান
সুরভি নিঃশ্বাস তব বাণীহীন গান,
আনন্দের উন্মাদনা লাগে,
সুগোপনে জাগে
সে আশ্বাস যারে তুমি ছড়াতেছ দূরে অনুরাগে।

আমি তাই হেথা
একাকী উদাস মনে মৌনে চাপি ব্যথা,
ভাবিব যেথায় আছি এক খণ্ড মোর দূর দেশ,
অনন্ত অশেষ,
রয়েছে আমারে ঘিরে—চিন্ময়ের প্রিয় পরিবেশ।

চকিত নিমেষে
প্রবাসের বিরহীর ব্যথা যাবে ভেসে।
দূর হ'তে কাছে আসা পূর্ণ পূর্ণ হবে—
গভীর নীরবে।
তোমার শারদ শোভা মোর চিত্তে রাজিবে গৌরবে।

সঙ্কটত্রাণ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

রাস্তার উপর থেকে ঘেয়ো কুকুরটাকে কোলে তুলে নিলে ছবিলাল। কাপড়ের খুঁট দিয়ে সেটার ক্ষতের পুঁজ মুছাতে মুছাতে বললে—এ্যাঃ শালা, একদম পইচ্যা গেছছ। চল বাড়ীত চল, অখন দেখি তোর বরাত আর ওস্তাদের কিরপা।"

পাটক্ষেতের পাশ দিয়ে সঙ্কীর্ণ কর্দমাক্ত পিচ্ছিল রাস্তা। মানুষ-প্রমাণ উঁচু পাটগাছের সারি সমস্ত পৃথিবীটাকে দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছে। অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে পথ চলতে লাগল ছবিলাল। খানিক দূর যাবার পর বাঁ-দিকে পড়ল একটা পচা খাল, সেটির পাড়ে ঘন গাছপালা আর লতাগুল্মের গভীর জঙ্গল। খালে জল এক-হাঁটুর বেশী নয়। বদ্ধ জলে লতাপাতা পচে এমনি একটা উৎকট দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে যে সেখানে খানিকক্ষণ থাকলেই সুস্থ মানুষের দম বন্ধ হয়ে আসে। লতাগুল্মের আড়াল থেকে সাপ-খোপ মাঝে মাঝে খালের জলে লাফিয়ে পড়ে।

খালের ঘোলা জলে গুটিকতক ডুব দিয়ে নিলে ছবিলাল, সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেহমন তার চাঙ্গা হয়ে উঠল। লোকটা অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া বটে! বাইরের মুক্ত বাতাসে তার হাঁফ ধরে গিয়েছিল, কিন্তু এখানকার দূষিত আবহাওয়া তার দেহ-মনে যেন সঞ্জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করলে। সকল রকম বীভৎসতার মধ্যেই ওর উৎকট উল্লাস।

খালের একধার দিয়ে একটা সুঁড়ি রাস্তা বরাবর একটি টিলার ওপরে উঠে গেছে। সেখানে চামারদের বস্তি। বাড়ীগুলো একেবারে গায়ে গায়ে লাগাও। পায়রার খোপের মত ঘরগুলোতে জানালাদির বালাই নেই—আলো-বাতাসের প্রবেশপথ রুদ্ধ। কোন কোন বাড়ীর উঠানে পড়ে রয়েছে মরা গরু। পচা চামড়ার দুর্গন্ধে বস্তিটা ভরপুর। পৃথিবীর সমস্ত নোংরামি যেন চর্মকারদের এই ক্ষুদ্র পল্লীটিতে পুঞ্জীভূত।

নিজের বাড়ীর উঠানে গিয়ে বাজখাঁই গলায় হাঁক দিলে ছবিলাল—"মঙ্গলী, ঘর নি আছছ?" সঙ্গে সঙ্গে যে বিকটাকৃতি স্ত্রীলোকটি আঙিনায় এসে দাঁড়াল প্রথম দৃষ্টিতে তাকে প্রেত-লোকের অধিবাসিনী বলেই মনে হয়। বলা-বাহুল্য, মঙ্গলী নাম্নী এই স্ত্রী-জাতীয়া জীবটি ছবিলালের স্ত্রী। একেবারে রাজযোটক তাতে সন্দেহ নেই। মঙ্গলী মাঢ়ীশুদ্ধ দাঁতগুলো বের করে হেসে বললে—"এইতারে আবার কই থেইক্যা লইয়া আইলে?", দাওয়ায় বসে ছবিলাল বললে—"হেডা রাস্তাত পইড্যা পইড্যা কুকাদি ছুইরা দিছিল। লইয়া আইলাম। দেখি অখন গুরুর কিরপা।"

ছবিলাল জাতিতে চামার হ'লেও জাত-ব্যবসা করে না। লোকটা গুণী। গাছগাছড়া আর লতাপাতা দিয়ে ক্ষত-চিকিৎসা করে সে জীবিকা অর্জ্জন করে। এ বিষয়ে সারা মুলুকে তার জুড়ি নেই। রোজগারও হয় বেশ, স্বামী-স্ত্রী দু'জনের সংসার স্বচ্ছন্দেই চলে যায়। পথ থেকে কুড়িয়ে ঘা-ওয়ালা জন্তুগুলোকে বাড়ীতে এনে নিরাময় করা ওর এক বাতিক—ক্ষত সারানো ওর পেশাও বটে, আবার নেশাও বটে।

ছবিলালের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দৈত্যের মত বিরাট তার দেহ। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুলে জট পাকানো। লোকটা আবার গন্নাকাটা, কাটা ঠোঁটের ফাঁকে বের হওয়া লম্বা ধারালো দাঁতগুলো দেখলে মুখখানাকে তার হিংস্র জন্তুর মুখ বলেই মনে হয়। সব চেয়ে ভীষণ তার ভাঁটার মত গোল, লাল লাল দুটো চোখ। লোকটা যখন রেগে যায় তখন সেগুলো যেন হিংস্র শ্বাপদের চোখের মত জ্বলতে থাকে।

ছবিলালের জীবনও বৈচিত্র্যময়। সংসারে একমাত্র বন্ধন ছিল তার মা। সেই মা মারা যাওয়ার পর হঠাৎ এক দিন বাড়ী থেকে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। নানা জায়গায় ভবঘুরের মত কাটিয়ে অবশেষে কামরূপ কামাখ্যায় গিয়ে বহুদিন এক সন্ন্যাসীর চেলাগিরি করে। গুরু শিষ্যের উপর (সম্ভবতঃ গঞ্জিকা প্রস্তুত এবং সেবনে দক্ষতা দেখে) খুব তুষ্ট হন এবং নানা গাছগাছড়ার গুণাগুণ এবং ক্ষত আরোগ্য করবার বিদ্যাটি তাকে খুব ভাল করে শিখিয়ে দেন। হঠাৎ এক দিন গুরুকে না জানিয়ে সে দেশে রওনা হয়। গ্রামে এসে প্রথমে সে উদাসীনের মতই থাকত। সারাদিন সে শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াত, রাতটা কাটিয়ে দিত এক ভাঙা শিব-মন্দিরের প্রাঙ্গণে শুয়ে। ক্রমে ক্ষত-চিকিৎসায় তার কৃতিত্বের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং সব জায়গায়ই তার বেশ খাতির হ'তে লাগল।

অবশেষে এই ছন্নছাড়া জীবনের ওপর তার বিরক্তি ধরে গেল—সে সংসারী হ'ল। মেয়েরা সবাই তাকে ভয় করত, তার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলত। কিন্তু মঙ্গলী মেয়েটি কি সুনজরেই যে তাকে দেখলে! সে স্বেচ্ছায় তার ঘর করতে রাজী হ'ল। তার পর এক দিন তাদের বিয়ে হয়ে গেল। মঙ্গলীকে নিয়ে ছবিলাল প্রৌঢ় বয়সে ঘর বাঁধলে।

ছবিলালের বাড়ী যে খালটির পাড়ে তার অনতিদূরে মাতলা নদীর তীরে স্যামচন্দ্রপুরের জমিদারের কাছারি। কাছারির বাংলোর বারান্দা থেকে দেখা যায় নদীর ওপারে দিগন্ত-প্রসারিত ধানক্ষেতে সবুজের বিপুল সমারোহ—নদীমাতৃক

দেশের সন্তানদের হৃদয়কে আশায় আনন্দে আন্দোলিত করে ধানগাছগুলো দিন দিন হতে থাকে পরিপুষ্ট, প্রবর্দ্ধমান।

পল্লীর স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রাকে বিপর্য্যস্ত করে হঠাৎ এল পঞ্চাশের মন্বন্তর—অন্নপ্রাচুর্য্যের দেশে সুরু হ'ল নিদারুণ অন্নাভাব। অনাহারে থেকে থেকে লোকেরা ধীরে ধীরে হয়ে উঠল নির্ম্মম, দয়ামায়াহীন। মানুষের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির কাছে তার হৃদয়ের সুকুমারবৃত্তি তুচ্ছ হয়ে গেল।

আশপাশের গ্রামগুলোর কেউ কেউ উপায়ান্তরবিহীন হয়ে ভিটে ছাড়তে বাধ্য হয়। নৌকা করে কাছারিতে এসে নিজ নিজ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সেখানে রেখে তারা অজানার পথে পাড়ি জমায়।

কাছারির বেশীর ভাগ কর্ম্মচারীই বিদেশাগত। সবাই মোটা টাকা রোজগার করেন, ফলে দুর্ভিক্ষের মধ্যেও তাঁদের সচ্ছল স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় না। প্রত্যেকেই সাধ্যমত একটি দুটি পিতৃমাতৃপরিত্যক্ত ছেলেমেয়েকে আশ্রয় দেন।

লোকমুখে কথাটা মেহেদীর হাওরের ওপারের রাধাপুর গ্রামে গিয়েও পৌছল।

একটি কায়স্থ-পরিবারের স্বামী-স্ত্রী নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রী করে কোনমতে নৌকা-ভাড়াটা যোগাড় করে এক দিন শ্যামচন্দ্রপুর কাছারিতে এসে উপস্থিত হ'ল। সঙ্গে তাদের পনর ষোল বৎসরের একটি মেয়ে—মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সারা গায়ে তার দগদগে ঘা—মুখখানি বীভৎস বিকৃত। দেহে তার যৌবন-সঙ্কেতের লেশমাত্র নাই—দেখলে মনে হয় বয়স সাত আট বৎসরের বেশী নয়।

যতদিন অন্নাভাব ছিল না, ততদিন এই গলিত ক্ষতযুক্ত বিকটদর্শন মেয়েটাই ছিল বাপ-মায়ের নয়নের মণি—কিন্তু আজ এই অনাবশ্যক বোঝার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে দু'জনেই তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। কেউ আশ্রয় দেয় ভাল, নইলে মাতলা নদীতীরে মেয়েটিকে পরিত্যাগ করে অকূলে তরী ভাসাতেই তারা বদ্ধপরিকর।

মেয়েটির চেহারা দেখেই কাছারির কর্ম্মচারীরা সবাই নাক সিঁটকালেন—আশ্রয় তার কোথাও মিলল না।

বিফলমনোরথ হয়ে স্বামী-স্ত্রী মেয়েটিকে নিয়ে নদীতীরে একটা গাছতলায় এসে বসল। তখন দ্বিপ্রহর—রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, বায়ুর গতি রুদ্ধ, নদীতে তরঙ্গ নেই। আকাশ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে একটা তীব্র জ্বালা—খর রৌদ্রদাহে সমস্ত প্রকৃতি যেন মূর্চ্ছাতুরা।

খানিক জিরিয়ে নিয়ে মেয়েটিকে সম্বোধন করে বাপ বললে—"লক্ষ্মী, তুই এখানে খানিকক্ষণ থাক, আমরা বাজার থেকে একটু ঘুরে আসছি।"

মেয়েটি চিঁ চিঁ করে বললে—"বেশী দেরি করো না, বাবা। একলা আমার ভয় করবে।"

বাপ তার রুখু মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—"আরে পাগলী, ভয় কিসের—এই আমরা এলাম বলে।"

মেয়েটিকে ফেলে তারা চলে গেল। ঘুরপথে নদীর ঘাটে গিয়ে তারা নৌকায় উঠল। মাঝি নৌকা ছেড়ে দিলে।

এদিকে বহুক্ষণ কেটে গেলেও বাপ মা যখন ফিরে এল না, মেয়েটির তখন কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। শেষে সে একেবারে ককিয়ে কান্না জুড়ে দিলে। শেষে অবসন্ন হয়ে নির্জীব জড় পদার্থের মত গাছতলায় শুয়ে পড়ে কোঁপাতে লাগল।

ছবিলাল এদিক দিয়ে আসছিল ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে করতে—সম্ভবত: রাস্তায় কোথাও ঘাওয়ালা কুকুর বা অন্য জানোয়ার পড়ে আছে কিনা তার চক্ষু দুটি তারই সন্ধান করছিল। হঠাৎ একটু দূরের থেকে গাছতলায় শায়িত মেয়েটির পানে নজর পড়তে তার মনে হ'ল, একটা মৃতদেহকে শকুনির পাল যেন ঠুকরে খেয়ে গেছে। কুতূহলী হয়ে সে কাছে এগিয়ে এল। মেয়েটির পানে তাকিয়ে বুঝতে পারলে সে মৃত নয়, বিকৃত বিশীর্ণ দেহের মধ্যে ক্ষীণ প্রাণটুকু তার ধুকপুক করছে।

যেয়ো জানোয়ারের সন্ধানে বেরিয়ে যে ঘা-ওয়ালা বালিকাটির সামনে এসে পড়ল ছবিলাল সে পথকুকুরদেরই সগোত্র—তেমনি গৃহ থেকে বিতাড়িত এবং অসহায়। রাস্তায় পড়ে মরাই তারও অদৃষ্টলিপি—আর ছবিলালের কাছে কুকুরে আর মানুষে কোনও প্রভেদ নেই, উভয়ের সম্বন্ধে তার একই মনোভাব। লোকটা একেবারে গীতায় বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের মত সর্ব্বত্র সমদর্শী।

ছবিলাল যুক্তিবিচার করে কোনও কাজ করে না, চলে ঝোঁকের মাথায়। হঠাৎ তার মাথায় চাপল এক খেয়াল। মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে সে হন্ হন্ করে নিজ বাড়ীর পানে রওনা হ'ল।

দিন-রাত ক্ষতের যন্ত্রণায় মেয়েটার কাতরানির আর অন্ত নেই। তার উপর অপরিচিত অভিনব পরিবেশের মধ্যে এসে সে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। ছবিলাল শিয়রে এসে বসলেই সে কেমন যেন অসহায়ের মত ক্যাল ক্যাল করে তার পানে তাকিয়ে থাকে। ছবিলালের হৃদয়ে সুকুমারবৃত্তির কোনও বালাই আছে এ অপবাদ তার অতিবড় শত্রুতেও দিতে পারবে না। সুতরাং মেয়েটির শোচনীয় অবস্থা তার হৃদয়ে দয়া মায়া বা করুণার উদ্রেক ঘোটেই করে না। কিন্তু তার মাথায় কেমন যেন একটা নেশা চেপে যায় যে, মেয়েটিকে তার নিরাময় করে তুলতেই হবে। গুরুর কৃপায় যে বিদ্যাটি সে আয়ত্ত করেছে তারই সাহায্যে মেয়েটিকে আরোগ্য করে নিজের ক্ষমতাটা সে একবার পরখ করে নিতে চায়।

সে বুঝতে পারলে মেয়েটির ক্ষত দুরারোগ্য, জটিল—কিন্তু জটিল বলেই তার জেদ আরও বেড়ে গেল। গুরুর নাম স্মরণ করে সে তার চিকিৎসায় রত হ'ল। নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়ে গাঁয়ের বন-বাদাড় ঘুরে কত রকম লতা-পাতা আর গাছ-গাছড়া যে বাড়ীতে এনে জড়ো করতে লাগল তার আর অন্ত নেই।

মাস দুই চিকিৎসার পরে দেখা গেল অপ্রত্যাশিত ফল—ক্ষত ধীরে ধীরে শুকিয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে ক্রমে মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। হবিলালের ওষুধের গুণে ক্ষতের দাগগুলোও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল।

হবিলালের চিকিৎসায় পিতামাতা কর্তৃক পথ-প্রান্তে ফেলে যাওয়া এই মেয়েটির যেন পুনর্জন্ম হ'ল।

তারপর বাঁধভাঙা বন্যার জল যেমন হঠাৎ এক দিন অতর্কিতে বিপুল প্লাবনে এসে খাল বিল নদীনালা পুষ্করিণীকে পরিপূর্ণ করে তোলে তেমনি যৌবন আর স্বাস্থ্যের জোয়ার এসে এই কিশোরীর রোগজীর্ণ দেহকে অপরূপ লাবণ্যশ্রীতে মণ্ডিত করে তুলল। তার যেন নব কলেবর প্রাপ্তি হ'ল। এই জীর্ণ আবরণের অন্তরালে কোথায় লুকিয়ে ছিল এতদিন এই নিরুপম রূপরাশি যা দেখলে চমক লাগে, মনে জাগে প্রবল মোহ।

ধ্বংসের হাত থেকে বিধাতার একটি নিপুণ সৃষ্টিকে রক্ষা করেছে হবিলাল—তার আত্মপ্রসাদের আর পরিসীমা রইল না। ছবিতে তুলিকার শেষ পরশ বুলিয়ে শিল্পী যেমন আত্মহারা হয়ে আপন সৃষ্টি নিরীক্ষণ করে তেমনি ভাবে মুগ্ধ বিস্ময়ে বারবার সে মেয়েটির স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল পরিপুষ্ট নিটোল দেহের পানে তাকায়—তার সকল ইন্দ্রিয় যেন চক্ষুময় হয়ে মেয়েটিকে গিলতে থাকে।

চোখে ওর নেশা লাগল কি?

নেশাই বটে! হবিলালের চোখে পৃথিবীর রং বদলে গেল, তার হৃদয়ে জাগল রূপের ক্ষুধা। কিন্তু হবিলালের ক্ষুধা—সে তো মানুষের ক্ষুধা নয়—সে যে দানবের ক্ষুধা! যে-বস্তুর উপর তার প্রলুব্ধ দৃষ্টি পড়েছে তাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রাস না করা পর্য্যন্ত তো সে বুভুক্ষার উপশম হবে না।

হবিলাল ভাবে, মেয়েটিকে যে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। তার স্বাস্থ্য রূপ যৌবন সব কিছুই ফিরে এসেছে তার অক্লান্ত চেষ্টায়—সুতরাং মেয়েটির উপর সম্পূর্ণ অধিকার তারই।

হবিলাল স্থির করলে মেয়েটিকে সে বিয়ে করবে। মনের কথাটি সে একদিন খুলে বললে।

শুনে হবিলালের স্ত্রী হয় ঈর্ষান্বিত আর মেয়েটি আতঙ্কে শিউরে উঠে। নিজের অদৃষ্টের কথা সে ভাবে।

বয়স তার ষোল বৎসর মাত্র, কিন্তু এরই মধ্যে তার জীবনটাকে নিয়ে বিধাতার যে নিষ্ঠুর লীলা শুরু হয়েছে তার অবসান হবে কবে? ছোটবেলা থেকে বিনাদোষে সকলের ঘৃণা কুড়িয়ে কাটছিল তার দিন। হঠাৎ একদিন নৌকা করে বাপ মা তাকে শ্যামচন্দ্রপুর কাছারির নিকটে মাতলা নদীতীরে পরিত্যাগ করে কোথায় চলে গেল। কি তার অপরাধ তাও রইল তার অজানা। দৈবচক্রে আশ্রয় জুটল এক চর্মকারগৃহে যেখানকার ভয়ারজনক আবেষ্টনে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। এই নরকেই কি তাকে থাকতে হবে চিরকাল। বিধাতার অভিশাপ-স্বরূপ যেন তার দেহে হঠাৎ এসেছে স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্য। এই দেহভরা রূপলাবণ্য নিয়ে কোথায় গিয়ে আত্মগোপন করবে সে।

পূর্ব্বজীবনের সঙ্গে পড়েছে তার পূর্ণচ্ছেদ। এখন সে আর বাপমায়ের আদরের লক্ষ্মী নয়, হবিলালের দেওয়া নিদানী নামে, তারই আশ্রিতারূপে শ্যামচন্দ্রপুরের চর্মকার-পল্লীতে আর আশেপাশে তার পরিচয়।

যে বয়সে মেয়েরা স্বপ্ন দেখে সেই যৌবনোন্মেষ কালে তাকে ঘিরে রইল রূঢ় নিষ্ঠুর কুৎসিত বাস্তব পরিবেশ। যে লোকটার আশ্রয়ে সে আছে তাকে দেখলেই তার গা ঘিন ঘিন করে, তার চোখে লুব্ধ ক্ষুধাতুর দৃষ্টি দেখে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। ওর হাত থেকে কি আত্মরক্ষা করতে পারবে সে! হবিলালের ভেতরকার যে পশুটা আজ জেগে উঠেছে তার কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কি?...

ওদিকে হবিলালের কাজকর্ম সব গেছে চুলোয়। দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়ার সন্ধানে আর সে বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় না, চব্বিশ ঘণ্টা নিদানীকেই আগলে বসে থাকে। যেখানেই নিদানী যায় সেখানেই ছায়ার মত সে তাকে অনুসরণ করে। লোকটার চোখে সব সময় কেমন একটা ক্ষুধিত, জ্বালাভরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ওই চোখ দুটার পানে তাকালেই নিদানীর বুকের ভেতরটা পর্য্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠে।...

মাতলার তীরে একটা নিরালা জায়গায় এসে চুপ করে বসে ছিল নিদানী, হঠাৎ একটা উচ্চ হাস্যের শব্দে সে চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখে সামনেই দাঁড়িয়ে মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মত হবিলাল। আশ্চর্য্য! লোকটা কি তাকে দু'দণ্ডের জন্যেও সোয়াস্তি দেবে না।

বাজখাঁই গলাকে সাধ্যমত মোলায়েম করবার চেষ্টা করে হবিলাল ঈষৎ অনুনয়ের সুরে বললে—"নিদানী, তুই আমারে এমুন কইর‍্যা এড়াইয়া চলিস ক্যেরে? তুই এহানে আইয়া বইয়া রইছ আর তরে আমি সারাডা গা তুকাইয়া বেড়াইতাছি। ক নিদানী, আমারে তর ডরডা কিয়ের? আমি কি বাঘ না ভাল্লুক যে তরে গপ কইর‍্যা গিল্যা ফালাইমু। কথা হুন, তুই আমারে বিয়া কর, হেবে মজলী-ডাঙ্গে লইয়া যাইয়া দিয়া দুইজনে সুখে থাকুম। শিব ঠাউরের

ফিরপার রুজিরোজগার আমার ভালই হয়। আরো খাটতে পারলে ছবিলালের পয়সা মারে কেডা।"

সিদামী নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগল, মনে মনে বললে—"তুমি বাঘ ভালুকের চেয়েও ভীষণ। তাদের হাত থেকে বাঁচোয়া আছে। কিন্তু তোমার কবল থেকে নিস্তার নেই।" প্রকাশ্যে শুধু বললে—"তুমি আমার বাপের সমান।"

আকাশ-ফাটা অট্টহাস্য করে উঠল ছবিলাল। একটা বক নিকটেই মৎস্যশিকারের আশায় ধ্যানস্থ হয়ে অপেক্ষা করছিল, সেটা পর্য্যন্ত চমকে উঠে একটু দূরে সরে গেল। একটু চুপ করে থেকে ছবিলাল বললে—"ও, বুঝছি ভাইল থারাকথায় গলব না। বা-প, আচ্ছা কেমন বাপ তা টের পাবি।"

বলে সিদামীর পানে একটা জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে গেল।

ইতিমধ্যে ছবিলালের সংসারে দেখা দিয়েছে দারুণ বিপর্য্যয়। সিদামীর প্রতি ছবিলালের ক্রমবর্দ্ধমান আসক্তি দেখে নিদারুণ ঈর্ষায় মঙ্গলীর মনটা বিষিয়ে উঠল। সময় সময় ছবিলালের মারধোর সত্ত্বেও তার জীবনটা তো কাটছিল বেশ—সে মনের সুখেই ছিল, কিন্তু কোথা থেকে এই হতভাগা মেয়েটা উড়ে এসে জুড়ে বসে সবকিছু পণ্ড করতে বসেছে। সিদামীর কাছে ছবিলালকে দেখলেই তার সমস্ত শরীরে যেন আগুন ধরে যায়—কোনো না কোনো অছিলায় সে তাদের সামনে এসে হাজির হয়। তার এ অবাঞ্ছিত উপস্থিতিতে ছবিলালের শরীর রাগে রি রি করতে থাকে। যখন ছবিলাল বাড়ীতে থাকে না তখন সে যেন বাঘিনীর মত সিদামীর উপরে লাফিয়ে পড়ে। টেনে হিঁচড়ে আঁচড়ে কামড়ে সে তাকে একেবারে নাজেহাল করে তোলে, গলা সপ্তমে চড়িয়ে চেঁচাতে থাকে—"আবাগী, আমার সব্বনাশ করতে আইছস—যা আমার বাড়ী থনে অখনই বাইরইয়া যা।"

সিদামীও তো এই মুহূর্ত্তেই বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কোথায় যাবে সে! এ সংসারে তার আশ্রয় কোথায়!

মঙ্গলীর নিরন্তর সতর্ক প্রহরায় ছবিলাল অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মেজাজটা তার এমনিতেই চটে ছিল হঠাৎ মঙ্গলী তার কাছে এসে খেঁকিয়ে উঠল—"অই আপদডারে, সিদামীডারে বিদায় কইরা দে। না অইলে ও আমার সংসার জ্বালাইয়া খাইব।"

কথাগুলো শুনে ছবিলাল রাগে একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে উঠল। সজোরে ধাক্কা মেরে মঙ্গলীকে সে মাটিতে ফেলে দিলে। তারপর সে কি বেদম প্রহার! মঙ্গলীর হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যায় বুঝি। খুব একচোট মার দিয়ে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে ধরে তাকে খালের পাড়ে টেনে নিয়ে এসে প্রচণ্ড এক লাথি মেরে বললে, "যা বাইরইয়া যা, আমার বাড়ীতে আর আইছ না।"

মঙ্গলী ধীরে ধীরে উঠে বসল, বিড় বিড় করে বললে, "চললাম কিন্তু এর সাজা ভগমান তরে দিব।"

খাল পেরিয়ে, মেঠো রাস্তা ধরে সে চলতে লাগল। পাটক্ষেতের আড়ালে মঙ্গলীর অপ্রস্রিয়মাণ মূর্ত্তিখানির পানে তাকিয়ে সিদামী ভাবছিল, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে ছবিলালের আশ্রয় ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়!—হঠাৎ চোখ তুলে দেখে এক জোড়া জলন্ত চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টি তার ওপরে নিবদ্ধ।

মঙ্গলী চলে যাওয়ার পর সিদামীর নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হতে লাগল। এতদিন তবু তার এবং ছবিলালের মধ্যে এমন একটা আড়াল ছিল যেখানে নিজেকে সে কতকটা নিরাপদ মনে করত। কিন্তু এখন সে আড়াল টুটে গেছে। সিদামীর মনে হ'ল, সে যেন এক অতলস্পর্শ গহ্বরের একেবারে প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে—অচিরেই সেই অন্ধকার গহ্বরে পতন তার অনিবার্য্য। এমন কোন অবলম্বন নেই যা আঁকড়ে ধরে সে আত্মরক্ষা করতে পারে।...

ক্রমে ক্রমে ছবিলালের ভোগবাসনা হয়ে উঠল দুর্দ্দমনীয়। এক মুহূর্ত্তও সে সিদামীর কাছছাড়া হয় না। খালের ধারে, নদীর তীরে, ভাঙা দেউলে পাশে যেখানেই গিয়ে বসে সিদামী, সেখানেই যাওয়া করে ছবিলাল। কোথায় যাবে সিদামী, পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্য্যন্তও বুঝি ছবিলালের সন্ধানী চক্ষু দুটি তাকে অনুসরণ করে ফিরবে—তার বিকৃত কামনার হাত থেকে সিদামীর নিস্তার নেই।

ভোগাকাঙ্ক্ষায় ছবিলালের দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু উন্মুখ, কিন্তু সেজন্যে তার তাড়াহুড়া নেই। করায়ত্ত শিকার সম্বন্ধে শিকারী যেমন নিশ্চিন্ত থাকে, সিদামী সম্বন্ধে তার মনোভাবও অনেকটা তেমনি ধরণের।

তা ছাড়া দীর্ঘকাল সন্ন্যাসীর চেলাগিরি করে কাটানোর ফলে এটুকু ধর্ম্মজ্ঞান তার আছে যে অবৈধ ভাবে সে নিজের ভোগবাসনা চরিতার্থ করবে না, বিবাহদ্বারা সম্পর্কটাকে বৈধ করে নেবে।

জোর-জবরদস্তি করলে পাছে সব ভেস্তে যায় সেজন্যে সে তার প্রতি অত্যন্ত মোলায়েম ব্যবহার সুরু করলে। সিদামীর মনোরঞ্জন করবার জন্যে তার চেষ্টার আর অন্ত রইল না। সাধ্যাতিরিক্ত খরচ করে আয়না, চিরুণী, গন্ধতৈল ইত্যাদি কত জিনিষই না সে নিয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে ছবিলালের দেরী হ'ল না। সে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করতে পারলে সিদামী তার 'পরে কখনো প্রসন্ন হবে না।

তার ভাবান্তর দেখা দিল। মুখখানা আষাঢ়ের আকাশের

যত গভীর থমথমে। গত এক বৎসরের মধ্যে ছবিলালের এমন মূর্ত্তি নিদানী দেখে নাই। সে যেন সাংঘাতিক একটা কিছু করতে বদ্ধপরিকর। তবে কি তার সর্ব্বনাশের চরম মুহূর্ত্ত সমাগত।

সে দিনরাত একান্ত মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করতে লাগল—"হে ভগবান, এ পিশাচের হাত থেকে আমায় বাঁচাও, এ নরকপুরী থেকে আমায় উদ্ধার কর।"

ভগবান বোধ করি অসহায় মেয়েটির কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করলেন। মুশকিল আসানের একটা উপায় অচিরেই হ'ল। কাছারির ডাক্তারের ছেলে সুনীল নিয়েছিল যুদ্ধের কণ্ট্রাক্ট। দেখতে দেখতে বরাত তার ফিরে যায়। সৈন্য-বিভাগের জন্যে নারী সরবরাহ করে সুনীল কর্ত্তাদের নেক-নজরে পড়ে এবং এইটেই নাকি তার ভাগ্যপরিবর্ত্তনের মূল কারণ। নারী-সংগ্রহে সুনীলের যোগ্যতা অপরিসীম। কোথায় কোন্ সরবরাহযোগ্য এবং উপভোগ্য নারী আছে তাদের নামধাম সবকিছু তার নখদর্পণে।

নিদানীর উপর পড়ল তার নজর এবং দুকূল থেকে এই স্ত্রীরত্নটিকে উদ্ধার করে সৈন্যবিভাগের কর্ত্তাদের উপঢৌকন দেবার জন্যে সে তৎপর হয়ে উঠল। মেয়েটাকে পেলে ওরা যে কি রকম লুফে নেবে এবং ফলে সে কি মোটা দাঁও মারবে তাই সে ভাবতে লাগল।...

ছবিলাল বাড়ী নেই, একথা জেনে একদিন সন্ধ্যার পরে সুনীল তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল। ছবিলাল গিয়েছিল রঘুনন্দন পাহাড়ের জঙ্গলে দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়ার সন্ধানে।

নিদানী ছিল ঘরের ভিতরে, সুনীলের ডাকে বেরিয়ে এল। সুনীল শোনালে তাকে আশার বাণী—এই নরক থেকে তাকে সে উদ্ধার করতে চায়। তাকে নিয়ে সে চলে যাবে শহরে। সেখানে মোটা মাইনেতে হবে তার যুদ্ধের চাকরি। ভদ্র-সমাজে সুখে স্বচ্ছন্দে খেয়ে-পরে মানুষের মত সে বাঁচতে পারবে।

সুনীলের কথায় নিদানী স্বপ্ন দেখতে লাগল...এই নরকাগার থেকে সত্যি কি হবে তার মুক্তি, অন্ধকারের ওপারে বাস্তবিকই কি তার জন্যে অপেক্ষা করছে আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! এতকাল পরে এল কি তার মুক্তিদাতা—ছবিলালের বিকৃত কামনার হাত থেকে তাকে উদ্ধার করতে। এক মুহূর্ত্তে সে মনস্থির করে ফেললে, আজই সে সুনীলের সঙ্গে এখান থেকে চলে যাবে। একবার মনে হ'ল এ জায়গা থেকে অন্যত্র গিয়ে সে তো আরো দুর্গতির মধ্যে পড়তে পারে। কিন্তু আর ভাববার সময় নাই। একথা সে বুঝতে পেরেছে যে, ছবিলালের কামনার লেলিহান শিখা থেকে আর সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। আজ ছবিলাল বাড়ীতে নেই, বহু-দূরে গেছে—ফিরতে রাত হবে অনেক। এমন সুযোগ আর আসবে না। কাজেই তাকে এ স্থান পরিত্যাগ করতে হবে এই মুহূর্ত্তেই। সুনীলের পায়ের তলায় পড়ে সে ফুকরে কেঁদে বলে উঠল,—"আপনি আমায় এক্ষুনি এ নরক থেকে নিয়ে যান, আমায় বাঁচান।"

সুনীল নিদানীকে সান্ত্বনা দিলে। তারপর তাকে নিয়ে ছবিলালের বাড়ীর পেছন দিককার জনহীন শুঁড়ি পথ ধরে টিলার নীচে নেমে এল। খাল পেরিয়ে, পাট-ক্ষেতের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে চলতে চলতে নদীর ঘাটে পৌঁছে নৌকায় চড়ে বসল।' নিদানীর হ'ল মুক্তিস্নান—পেছনে পড়ে রইল পচা খাল, এক বৎসরের দুঃখদুর্গতির স্মৃতিবিজড়িত ছবিলালের কুঁড়েঘর, চামারহাটির নোংরা ঘরবাড়ী, আর খালপাড়ের বন-ঝোপ। নৌকা চলল শহরের পানে।...

ওদিকে রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হলে পর ছবিলাল ফিরে এল ঘরে। অভ্যাসমত ডাকলে—'নিদানী!' কেউ সাড়া দিলে না। ঘরে ঢুকে তাকে না দেখে সে আশ্চর্য্য হ'ল। সারাটা বাড়ী পাতি পাতি করে খুঁজল, কিন্তু কোথাও তার পাত্তা নেই। ছবিলালের মনটা দমে গেল, তবে কি পাখী শিকলি কেটেছে! ঘরের ভিতরটা ভালো করে পর্য্যবেক্ষণ করে বুঝল তার সন্দেহ অমূলক নয়। নিদানীর সব কাপড়চোপড়, মায় আয়না চিরুণী পর্য্যন্ত কিছুই নেই।

হঠাৎ যেন ছবিলালের নিজেকে নিতান্ত অসহায়, অত্যন্ত একা মনে হতে লাগল—সংসারটা যেন এক অপরিমেয় শূন্য-তায় ভরে উঠেছে। এতদিন পরে আজ মঙ্গলীর কথা মনে পড়ে তার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। বৌটা বাস্ত-বিকই তাকে ভালবাসত, কিন্তু একটা অসম্ভবের নেশায় সে নির্ম্মমভাবে প্রহার করে তাকে তাড়িয়ে দিলে।

সে বুঝল, মঙ্গলীর অভিশাপ এতদিনে ফলতে সুরু হয়েছে। তার সংসারের খেলাঘর এবার ভাঙল—এ ভাঙা ঘর আর জোড়া লাগবে না।

হঠাৎ তার চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। এই তার জীবনে প্রথম দুঃখানুভূতির উত্তপ্ত অশ্রুবিন্দু।

* * *

এদিকে সুনীলের নৌকা এতক্ষণে মাতলা ছাড়িয়ে তিস্তাস নদীর বুকের ওপর দিয়ে চলেছে। রাত হয়েছে গভীর, আকাশে প্রকাণ্ড একখানি কাঞ্চন-থালার মত চাঁদ উঠেছে। দিগন্তপ্রসারিত তিতাসের রুপালি জলধারার উপর দিয়ে যেন জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। নৌকার গায়ে ঢেউয়ের আঘাতে বড় মধুর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে।

নৌকার ছইয়ের বাইরে গিয়ে বসল সুনীল, বড় মিষ্টি করে ডাকলে—"নিদানী, ঘুমিয়েছ না জেগে আছ?"

"ঘুম আসছে না আমার...কিন্তু নাম তো আমার নিদানী নয়, ওটা ছবিলালের দেওয়া নাম।"

"তবে কি নাম তোমার—তোমার জীবনের কথা একটু-আধটু জানি, কিন্তু সব তোমার নিজের মুখে শুনতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।"

"বাপ মায়ের দেওয়া নাম আমার লক্ষ্মী। আমার জীবনের কথা শুনে কি-ই বা লাভ! একটানা দুঃখের জীবন আমার। কিন্তু কত বড় সর্বনাশের হাত থেকেই না আপনি আমায় বাঁচিয়েছেন।"—কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর।

"লক্ষ্মী, একটু কাছে সরে এসো"—সুনীলের গলাটা যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল! ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সে লক্ষ্মীর হাত ধরে মৃদুভাবে আকর্ষণ করলে।

একটু অবাক হয়ে সুনীলের মুখের পানে তাকালে লক্ষ্মী। চোখ দুটোতে তার কেমন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি! লক্ষ্মীর বুক দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল, তার মনে হ'ল এই চাউনির সঙ্গে ছবিলালের লালসাতুর দু'টি চক্ষুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। ছবিলালের সঙ্গে সুনীলের শান্ত ভদ্র চেহারা, তার পোশাক-পরিচ্ছদ চলন-বলন সবকিছুরই কতই না পার্থক্য, অথচ মনের চেহারা যে দু'জনেরই এক, তারই প্রতিফলন সে দেখলে সুনীলের কামনাপ্রদীপ্ত দুই চক্ষে।

সে তীব্র দৃষ্টির সম্মুখ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে লক্ষ্মী। জ্যোৎস্নার প্লাবন তার মুখখানিকে অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। কিন্তু জ্যোৎস্নাধৌত আকাশের এককোণে পুঞ্জীভূত কালো মেঘের মত, তারও শুভ্র সুন্দর আননে ঘনিয়ে এসেছে সুগভীর দুশ্চিন্তা আর অজানা আশঙ্কার কালো ছায়া।...

সুনীল আরো একটু ঘন হয়ে বসল। নিরীহ শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে হিংস্র পশুর মত অবস্থা তার।

লক্ষ্মী একবার একান্ত অসহায়ভাবে সুনীলের মুখের পানে তাকালে, পরক্ষণেই ঊর্দ্ধমুখী হয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। সত্তোদ্ভিন্ন যৌবনে তার কত জ্যোৎস্নারজনী অশ্রুজলে ব্যর্থ হয়ে গেছে, আজ প্রথম সুরু হয়েছিল চন্দ্রিকাস্নাত নিশীথে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার পালা—বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সে-স্বপ্ন ভেঙে গেল।

কিন্তু লক্ষ্মীর দৃঢ় সঙ্কল্প। প্রাণ থাকতে সুনীলের পশুসত্তার কাছে আত্মসমর্পণ সে করবে না। অদৃষ্ট তার জীবনটাকে নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলেছে, কিন্তু প্রতিকূল ভাগ্যের কাছে পরাজয় স্বীকার সে করবে না। যদি উপায়ান্তর না থাকে তা হলে খরস্রোতা তিতাসের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে চরম সঙ্কটের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে।...

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার প্রয়োজন হ'ল না।...প্রবৃত্তির তাড়নায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে নিজের আখেরের লাভের আশা মাটি করবে, সুনীল তেমন ছেলেই নয়। যখন সে নিজের ভুল বুঝতে পারলে তখন ছইয়ের ভেতরে গিয়ে নিদ্রার আয়োজন করলে। নৌকার বাইরে জেগে বসে রইল লক্ষ্মী। সকালবেলা তিতাস নদীর বারিরাশিকে রাঙিয়ে সূর্য্য উঠল পূর্ব্বাকাশে।

নদীতীরস্থ বনঝোপের কাছে একটা নিরালা জায়গায় মাঝি শেষরাত্রে নৌকা বেঁধে নিদ্রা দিয়েছিল—এখনো আরামে ঘুমোচ্ছে। ওদিকে ছইয়ের ভেতর সুনীল গভীর নিদ্রায় অচেতন।

লক্ষ্মী তখনো বাইরে ঠায় বসে আছে—চোখে তার অতন্দ্র রজনী যাপনের সুগভীর ক্লান্তি, এক রাত্রিতে বয়স যেন তার দশ বৎসর বেড়ে গেছে।...

ভোরের আলো নৌকার ছইয়ের ভেতরে এসে পড়েছে। সুনীলের সুষুপ্ত মুখের পানে তাকিয়ে লক্ষ্মী শিউরে উঠল—তার নিঃশ্বাসে যেন বিষ-বাষ্পের স্পর্শ। লক্ষ্মীর সমস্ত শরীর জ্বালা করতে লাগল—একেই সে ভেবেছিল তার মুক্তিদাতা। লোকটা ভদ্রবেশী বর্ব্বর, ছবিলালের চেয়েও নীচ প্রকৃতির। ওকে বিশ্বাস করেই লক্ষ্মী সর্ব্বনাশের সম্মুখীন। এই মুহূর্ত্তে ওর বিষাক্ত সংস্পর্শ পরিহার করতে না পারলে তার যেন আর বাঁচোয়া নাই।

তড়িদ্বেগে নৌকা থেকে তীরে নেমে এল লক্ষ্মী, তারপর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বেত-কাঁটার জঙ্গল ভেঙে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। কাঁটায় তার গায়ের চামড়া ছড়ে যেতে লাগল। কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, সে যেন নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাইছে।

জঙ্গল পার হয়ে সে এক সুদূরপ্রসারী প্রান্তরের বুকে এসে পড়ল। অনন্তবিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ—দিগন্তের শেষসীমা পর্য্যন্ত দৃষ্টি কোথাও প্রতিহত হয় না। চতুষ্পার্শে আকাশ নত হয়ে প্রান্তরের বুকে নেমে এসেছে—পৃথিবীর উপরে যেন আকাশের নীলাকাশের ঘেরাটোপ দেওয়া।...

লক্ষ্মীর নিশি-জাগরণক্লান্ত দেহে আর তিলমাত্র শক্তি নেই। গভীর শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে সে একটা গাছতলায় বসে পড়ল।

সুমুখে প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে পায়ে চলার পথ। মাঠ পেরিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে, খাল, বিল, জলা-ডোবা ডিঙিয়ে সে পথ যেন কোন্ সুদূরের পানে উধাও হয়ে চলে গেছে।

গাছতলায় বসে লক্ষ্মী সেই দূরবিসর্পিত পথ-রেখার পানে উদাসনয়নে তাকিয়ে রইল...

সেকালে বাঙালীর শক্তিচর্চ্চা

শ্রীশান্তি পাল

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের বহু স্থানে বাঙালী জাতির বীরত্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামায়ণ ও মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের বাঙালী রাজাদের কীর্ত্তিকলাপ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের অনেক কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে। 'বৃহৎ বঙ্গের' ভূমিকার এক স্থানে বলা হইয়াছে—"বঙ্গীয় নৃপতিগণ রণতরীতে আরোহণ পূর্ব্বক রঘুর দিগ্বিজয়ে বাধা দিয়াছিলেন এবং সেই যুদ্ধ এরূপ ঘোরতর হইয়াছিল যে, যুদ্ধ জয় করিয়া রঘু গঙ্গামধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্জে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন। ……যে সমুদ্রগুপ্ত আসমুদ্র হিমাচল জয় করিয়াছিলেন তাঁহাকেও বঙ্গদেশ জয় করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিনিও এই দুরূহ কার্য্য সমাধা করিয়া সাগর-সঙ্গমে একটি স্মারক জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন।"

খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে রচিত বিভিন্ন কাব্যে গৌড়ের পাল ও সেন রাজগণের শৌর্য্য বীর্য্য ও শক্তিমত্তার নানা কাহিনী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের ভূমিকায় এক স্থানে বলা হইয়াছে—"বঙ্গদেশ যখন স্বাধীন ছিল, পালবংশীয় রাজগণ যখন গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, যখন বাঙালী বীরের পদভরে বঙ্গভূমি কাঁপিত—বঙ্গের সেই শুভ সময়ে ধর্ম্মমঙ্গলের উৎপত্তি হয়। ধর্ম্মমঙ্গলে মল্লদিগের লড়াই ও অশ্বাদির চালনার সজীব বর্ণনা দেখা যায়। অশ্বে আরোহণ করিয়া কোমল অঙ্গে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া বাঙালী বীর রমণীর ধনুর্ব্বাণ হস্তে যুদ্ধে গমন—কোন্ কাব্যে এ নয়ন মনোহর দৃশ্য আছে?"

অতি প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া এবার পরবর্ত্তী কালের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। চতুর্দ্দশ শতকে বাঙালীর ছেলেরা যে আখড়ায় গিয়া দেহানুশীলন, শস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি নানা প্রকার শক্তিচর্চ্চা করিত, এ তথ্য আমরা অনাদিমঙ্গলেও পাইতেছি। তখনকার যুগে বাংলাদেশে রাজকুমারদের বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত শক্তিচর্চ্চা করিতে হইত। আমরা রাজা কর্ণসেনের উক্তিটি এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম:

> "বিদ্যা বিনে গতি নাই জানে সর্ব্বজনে,
> রাজপুত্র হইলে চাই শিখাইতে রণে।
> ডাকরে আনিল রাজা জয়পতি মণ্ডলে,
> কোথা আছে মল্লবীর কহিবে তৎকালে।
> এমন বিভর মল্ল আছে এইখানে,
> জগতে কহিলে তার নাম নাহি জানে।
> রমতী শহরে আছে মল্ল সারেঙ-ধল,
> যার বক্ষের হস্তে ধরে বাহিণ হাতীর বল।"

এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, তৎকালে রাজারা যেমন রাজপুত্রদের যথোচিত বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন, তেমনই শারীরিক শক্তিচর্চ্চা ও রণ-কৌশলাদি শিখাইতেও যত্নবান হইতেন; মল্লবীরগণ রাজ্যের সাধারণ প্রজা হইলেও বঙ্গাধিপগণ তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করিতেন; রাজা তাঁহার মণ্ডলকে উৎকৃষ্ট মল্লের সন্ধান করিতে বলিতেছেন। মণ্ডল রাজাকে সারেঙ ধলের কথা বলিলেন।

> "আজ্ঞা কহি কোটালিয়া করিল গমন,
> মালের নিকটে গিয়া দিল দরশন।
> আখড়াশালেতে খেলে মাল সারেঙ-ধল,
> চারিদিকে পড়েছে পাষাণ জগদ্দল।
> নিরবধি আখ্‌ড়া সদাই ঠাট বাট,
> চারিদিকে প'ড়ে আছে পাষাণ মাল কাঠ।"

এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, রাজার আজ্ঞায় কোটাল অর্থাৎ পুলিশ কর্ম্মচারী মল্লের সন্ধানে বাহির হইল। এখানে আমরা তৎকালীন আখড়ার একটি উত্তম বর্ণনা পাইতেছি। তাহাতে দেখা যায় সেই আখড়া কোন অংশেই আধুনিক 'জিমন্যাসিয়াম' অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। পাষাণ, গদা, মাল কাঠ, ঠাট-বাট ইত্যাদি বিবিধ সরঞ্জাম এবং মল্লক্রীড়ার অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যগুলিও তথায় রহিয়াছে। তারপরে:

> "বার দিয়া বসেছে ভূপতি কর্ণসেন,
> মল্লগুরু আগিয়ে সম্মুখে দেখা দেন।
> মাল সব আড়ালে দাঁড়াল সারি সারি,
> তাল কিম্বা শাল গাছ তুলনা দিতে নারি।"

রাজসভায় মল্লগুরু সারেঙ-ধলের আবির্ভাবের কথা এ-স্থলে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গুরু সারেঙ-ধল রাজ-সমীপে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার শিষ্যেরা সারি সারি অন্তরালে দাঁড়াইলেন। শেষের দুই পঙ্‌ক্তিতে তাঁহাদের উন্নত বলিষ্ঠ দেহের একটি নিপুণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানে তাঁহাদিগকে তাল ও শাল গাছের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সুঠাম বাঙালী মল্লের দেহের তুলনা আর কিসের সহিত হইতে পারে?

অনাদিমঙ্গলে 'আখড়াপালা' ও 'মালবধ' পালার মধ্যে আমরা বাঙালী বীরজননীর একটি সুন্দর চিত্র পাই। তাহার কয়েকটি ছত্র এ স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না;

"হেনকালে রঞ্জাবতী করে নিবেদন,
লাউসেন কর্পূরে শিখাইবে রণ।
সঁপিলাম বাছা দুটি তোমার ওই পায়,
সর্ব্বকালে শুনিয়াছি গুরুর আছে দায়।
রঞ্জা বলে বাছাধন খেলা কর দূর,
মিলায়েছে মল্লগুরু অনাথ ঠাকুর।
এক মনে সেবা কর গুরুর চরণ,
গুরুভক্তি বিতালাভ কহে সর্ব্বজন।
কড়ি খেলা পাশা খেলা অতি অলক্ষণ,
পাশা খেলে দুঃখ পাইল পাণ্ডব পঞ্চজন।"

* * * *

হনুমান সরণ শিখান হাতে হাতে,
চলন বুলন গতি উল্লম্ফন পাতে।
এগোয় পেছোয় দোঁহে উরুতে চাপড়,
দুটি হাত বুকেতে গুরুর পায়ে গড়।
চাকার ভাঙরি প্রায় ঘুরে পায় পায়,
আশি হাত লাফ দিয়ে গড়াগড়ি যায়।
বিক্রমে বিবিধ প্যাঁচ শিখে দুটি ভাই।
দন্তে চিবাইয়া ভাঙে লোহার কলাই।
নিঙাড়িয়া সরিষা মাথায় মাখে তেল,
চাপড়ে ভাঙিল লোহার পাঁচ বেল।
ধনুকবিতা অসিবিতা ফলক লাঠারি,
শিখাল অনেক বিতা কহিতে না পারি।
গজবাজিবিতা আর রথের চালনা,
লাউসেন কর্পূর দোঁহার পুরিল বাসনা।"

এই উদ্ধৃতাংশে আমরা তখনকার দিনের গুরুভক্তি, কড়ি-পাশা প্রভৃতি খেলার অপকারিতা, নানা প্রকার দৈহিক কসরৎ ও সেগুলির পরীক্ষা ইত্যাদির নিখুঁত বর্ণনা পাইতেছি। প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে দেখি জননী পুত্রকে গুরুর হস্তে সঁপিয়া দিবার কালে তাহাকে গুরুভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। রামায়ণ মহাভারতে আমরা জ্ঞান-গুরু ও অস্ত্র-গুরুর বহু বৃত্তান্ত পাইয়াছি; এখানেও মল্লবিতা ও রণবিতা শিক্ষাদাতা গুরুর কথা পাওয়া গেল। আমরা দেখিলাম, গুরুর নিকট লাউসেন ও কর্পূর মল্লযুদ্ধ, ধনুর্বিদ্যা, অশ্ব ও হস্তী চালনা, রথচালনা, অসি-ভল্ল চালনা প্রভৃতি বিচিত্র শস্ত্রবিতা শিক্ষা করিতেছেন।

লাউসেন ও কর্পূরসেনের শক্তিমত্তার কথা সেকালে দেশের সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই দুই ভাইয়ের বীরত্ব-কাহিনীতে মঙ্গলকাব্য পরিপূর্ণ। সেকালে ভাটেরা নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে মঙ্গলকাব্যের পদগুলি সুর-লয়ে গান করিয়া বাঙালী যুবকদের শক্তিচর্চ্চায় উৎসাহিত করিত। মুকুন্দরাম বিরচিত চণ্ডীমঙ্গলেও আমরা কালকেতুর শক্তিমত্তার একটি চমৎকার বর্ণনা পাইতেছি।

"লহিয়া শতেক ঠেলা যায় সঙ্গে করে খেলা
তার হয় জীবন সংশয়,
যে জন আঁকড়ি ধরে আছাড়ে ধরণী পরে
ডরে কেহ নিকটে না রয়।

* * *

ইচ্ছা হয় যেই দিনে বনে যায় বাপ সনে
আগে ধায় জিনিয়া পবনে,
তাড়িয়া হরিণ ধরে কি কাজ ধনুক শরে
বিতা হেতু ব্যাধ চিন্তে মনে।"

উপরোক্ত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, চণ্ডীকাব্যের সময়েও নিয়মিত শক্তি-চর্চ্চা হইত। পিতৃপিতামহেরা বংশধরদের বীরত্বসূচক কার্য্যে কিরূপ উৎসাহিত করিতেন কালকেতুর জীবনকথাই তাহার প্রমাণ। রাঢ়-বঙ্গে বরেন্দ্রভূমিতে যখন বাঙালীর বাহুবলে নূতন নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হইতে বঙ্গসন্তানেরা ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে আখড়ায় গিয়া শরীর-চর্চ্চা করিতেন, শস্ত্রবিতা শিক্ষা করিতেন। বাঙালীর বাহু তখন দুর্ব্বল হয় নাই, তাহার হাতে অসি তখন ঝন ঝন করিয়া বাজিয়া উঠিত। তখনকার দিনে বাংলার ঘরে ঘরে বীর-সন্তানদের আবির্ভাব হইত।

মনসামঙ্গলের একস্থলে যুদ্ধে লক্ষীন্দর কি ভাবে প্রচণ্ডকে বন্দী করিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত আছে। বাংলার বণিক-সন্তানেরা যে রণবিদ্যায় পারদর্শী হইতেন, লক্ষীন্দরের কাহিনী হইতে আমরা তাহা জানিতে পারিতেছি। মনসা-ভাসানের কবি বলিতেছেন:

"লক্ষীন্দর যুদ্ধ তবে দিল পাছে থাকি
ধাইয়া চলিল যুদ্ধে যতেক ধানুকী।
ভূপতিকে রুষিলেক বন্দুক ভরিয়া,
প্রচণ্ডের সৈন্ত মধ্যে চলিল ধাইয়া।
হাতে অস্ত্র করি সৈন্ত ধাইল সত্বর,
ঘোড়ার উপরে চড়ি হাতে ধনুঃশর।
নানা অস্ত্রে প্রহারিল মুষল মুদগর,
বিঁধিয়া প্রচণ্ড সৈন্ত করিল জর্জ্জর।"

বাংলাদেশের বারভূঁইয়াদের মধ্যে বহু বীরের নাম আমরা ইতিহাসে পাই। মাহেন্দ্রদেব, লক্ষণমাণিক্য, চাঁদ রায়, প্রতাপ রায়, মুকুন্দ রায়, রামচন্দ্র রায়, সীতারাম রায় প্রমুখ ভূঁইয়াদের শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা সুবিদিত। পর্ত্তুগীজ ও আরাকানবাসীরা যখন বাংলাদেশে ভয়ানক উৎপাত করিত তখন তাহাদিগকে দমন করিবার জন্ত বাংলার ভূঁইয়াদের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। সেসময় বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবার জন্ত হিন্দু ও পাঠানেরা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া বহু লড়াই করিয়াছিল। বাঙালী

সুতরাং সংগ্রামনৈপুণ্যে যে-কোনও স্বাধীন জাতির সৈন্যদের চেয়ে ন্যূন ছিল না। তাম্রমীরার রাজা অনুরূপনারায়ণ ও রংপুরে মুকুন্দনারায়ণ শের শাহের পক্ষ লইয়া বহুবার যুদ্ধ করেন। তাঁহাদের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া শের শাহ্ রাজাকে প্রচুর জায়গীর দান করেন। মুকুন্দনারায়ণের সৈন্যবাহিনীর বাঙালী সড়কিওয়ালা লাঠিয়াল ও তীরন্দাজরা ছিল ওস্তাদ যোদ্ধা। ঐ সকল লাঠিয়াল, সড়কিওয়ালা ও তীরন্দাজেরা অনেক সময়েই বন্দুকধারীদিগকে পরাস্ত করিত।

ভুঁইয়াদের রাজত্বকালে লাঠি বা তলোয়ারের জোরে বাঙালীরা দুর্দান্ত, দস্যুদিগকে শায়েস্তা করিত। মেনারাম ও ধনারামের অনেক বীরত্বের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। মেনারাম তৎকালীন বাঙালীদের মধ্যে অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। রাজা সীতারাম রায় তাঁহাদের আদর করিয়া 'মেনাহাতী' ও 'ছামলাবাঘ' বলিয়া ডাকিতেন। দুর্গাদাস সেন মহাশয় তদ্‌রচিত 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থের এক স্থানে মেনারামের বীরত্বপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"ভুমরাই পরগণার মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। মৈত্রপত্নীর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা শুনিয়া দুর্বৃত্তেরা তাঁহাকে হরণ করিতে যায়। মৃত্যুঞ্জয় তাহার সন্ধান পাইয়া সীতারামের এলাকায় পলায়ন করিলেন। দুর্বৃত্তেরা ভূষণায় প্রবেশ করিয়া মৈত্রপত্নীকে হরণ করিল। মৈত্র গিয়া সীতারামের নিকট ধরনা দিলেন। সীতারাম আহার করিতে যাইতেছিলেন, তিনি অমনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মৈত্রপত্নী উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। মেনা ধনা অতি ত্রস্ত সৈন্য লইয়া গিয়া পথিমধ্যেই অপহারকগণকে বিনাশ করিল। নিহত পামরদিগের মুণ্ডদ্বারা মুণ্ডমালা গাঁথিয়া মেনারাম ও ধনারাম গলায় পরিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় মৈত্রপত্নীকে লইয়া মেনা-ধনা মহম্মদনগরে প্রত্যাগমন করিল। মেনা-ধনা মুণ্ডমালা পরিয়া সসৈন্যে 'জয় সীতারাম' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।"

মেনা-ধনার অধীনে সে সময় পঁচিশ হাজার হিন্দু ও আট হাজার মুসলমান সৈন্য ছিল। ঐ সকল সৈন্যের মধ্যে বাঙালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, চণ্ডাল, জেলে, জোলা, মাহিষ্য ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পাঠান প্রভৃতি প্রায় সকল জাতির লোক ছিল। তাহাদের মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ছিল না। সকলেই রাজা সীতারামের জন্য প্রাণপণ করিয়া লড়াই করিত। সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিম, যে-সকল বাঙালী সৈন্য লইয়া ইংরেজদিগের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন, তাহাদের বীরত্ব-কাহিনী আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হইয়া আছে। তাম্রমুন্দর, মোনাহাতী, মধুরায়, মোহনলাল প্রভৃতি বাঙালী সেনাপতিদিগের শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা বাঙালী জাতি কখনো বিস্মৃত হইবে না। ইংরেজদিগের সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও প্রথম প্রথম অনেক বাঙালী যোদ্ধা ছিল।

বাঙালী সৈন্যেরা যুদ্ধক্ষেত্রে কিরূপ অপরাজেয় ছিল তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা আমরা 'বৃহৎ বঙ্গে'র ভূমিকা হইতে এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—"ইণ্ডিয়ান আরডালের চতুর্থ অধ্যায়ে বিশপ হিবার লিখিয়াছেন—যে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া লর্ড ক্লাইভ এরূপ আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই বাঙালী ছিল—That little army with which Clive did such wonders was raised chiefly from Bengal......" ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ঐতিহাসিক বর্টন লিখিয়াছিলেন—"বাঙালীরা বহু রণক্ষেত্রে প্রমাণ করিয়াছে যে তাহারা সাহসিকতায় য়ুরোপীয় সৈন্যদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।" ওয়াল্টার হ্যামিল্টন লিখিয়াছেন—"আমাদের ভারতীয় যুদ্ধসমূহের ইতিহাসের আদিপর্ব্বে আমাদের বহু সেনাবাহিনী প্রধানতঃ বাঙালী সৈন্যদের লইয়াই গঠিত হইয়াছিল এবং যুদ্ধে তাহারা যথেষ্ট সাহস ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।"

তখনকার দিনে অর্থের দ্বারা সকল সময়ে জমিদারী ক্রয় করা যাইত না। নবাব-সরকার বা স্বাধীন ভুঁইয়াদের দরবারে চাকুরী কিম্বা ডাকাতি এই দুইটি উপায়ে সহজে জমিদারীর মালিক হওয়া যাইত। বাংলার জমিদারদিগের মধ্যে অনেকেই শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ডাকাত-সর্দার বেণীমাধব রায়ের অনেক বীরত্ব ও দুঃসাহসের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় দখল থাকায় সকলে বেণীমাধবকে 'পণ্ডিত ডাকাত' বলিয়া ডাকিতেন। কথিত আছে তাঁহার স্ত্রীকে দুর্বৃত্তেরা চুরি করায় তিনি সংসারের উপর বিরূপ হইয়া উঠেন এবং শেষে ডাকাতি আরম্ভ করেন। তিনি উত্তরবঙ্গে 'চলন বিল' নামক একটি বিলের মধ্যে এক দ্বীপে আশ্রয় লইয়া একটি ডাকাতের দল গঠন করেন। সেখানে তিনি একটি কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে দুর্বৃত্তদের ধরিয়া আনিয়া সেই কালীর সম্মুখে বলি দিয়া মৃতদেহগুলিকে তিনি চলনবিলের মধ্যে ফেলিয়া দিতেন। হিন্দুরা আজিও ঐ স্থানটিকে পণ্ডিত ডাকাতের ভিটে এবং মুসলমানেরা শয়তানের ভিটে বলে। বেণীমাধবের ভয়ে হিন্দু-মুসলমান সকলেই সন্ত্রস্ত থাকিত। তাঁহার ডাকাতদলকে দমন করিতে গিয়া বাদশাহী ফৌজ হয়রান হইয়া পড়িয়াছিল।

বেণী রায়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি পতিত হিন্দুদের আশ্রয় দিয়া স্বধর্ম্মে টানিয়া আনিতেন। যাহারা বিপদে পড়িয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিত, তাঁহাদের তিনি সাদরে গ্রহণ করিতেন। তাঁহার দলে বহু পতিত হিন্দু ও মুসলমান আশ্রয় পাইয়াছিল। সকল ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। কথিত আছে যে, তখনকার দিনে আসাম প্রদেশে ধর্ম্মান্তরিত-

দের এক অভিনব উপায়ে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইত। দুর্গাদাস লিখিতেছেন—"আসামে ব্রাহ্মণ ও রাজবংশী ভিন্ন হিন্দুর অন্ত বিভাগ নাই। এজন্ত তথায় ভিন্নধর্ম্মীদিগকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রথা বরাবর প্রচলিত আছে। এখানে ভিন্নধর্ম্মীয় লোকদিগকে হিন্দু করিবার রীতি এই যে, ব্রাহ্মণ কিম্বা অধিকারীর উপদেশমত ভক্ত কয়েকবার 'হরি-বোল' 'হরিবোল' বলিয়া গোবর-জলে স্নান করে। তারপর মাটিতে পড়িয়া দেববিগ্রহ প্রণাম করিয়া নির্ম্মাল্য মাথায় লইয়া দেবতার প্রসাদ ও চরণামৃত সেবন করিলেই বিশুদ্ধ হিন্দু অর্থাৎ রাজবংশী হয়।" বলা বাহুল্য, বেণী রায়ও এই পন্থা অবলম্বন করিয়া অনেক স্বধর্ম্মচ্যুত হিন্দুকে উদ্ধার করিয়া-ছিলেন।

বাঙালীর শারীরিক বল ও অস্ত্রচালনায় নৈপুণ্যের কথা বলিয়াছি। এবার বাঙালীরা কামান দাগিতে ও জাহাজ চালাইতে কিরূপ দক্ষ ছিল সেই সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। সেকালে প্রত্যেক বড় বড় ভূঁইয়ারই দুর্গমধ্যে প্রচুর দেশী কামান রাখা হইত। শ্রীপুর, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে কামান নির্ম্মাণের বিরাট কারখানা ছিল। সাগরদ্বীপ, জাহাজঘাটা, ধুমঘাট, চক্রশ্রী, দুবলা, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানে জাহাজ তৈয়ারী ও মেরামত হইত। সন্দীপে নৌশক্তির একটি বড় আড্ডা ছিল। মোগলেরা নৌয়ারা পোষণের জন্ত কতকগুলি স্বতন্ত্র জায়গীর রাখিতেন। ঢাকা সমস্ত বাংলার নৌয়ারার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ঢাকা ছাড়া হুগলী, যশোহর প্রভৃতি স্থানেও নৌনির্ম্মাণ চলিত; গৌড়, সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বড় বড় বন্দরও ছিল। সেই সকল বন্দরে বহু বাঙালী নৌয়ারার নানা সেরেস্তায় দক্ষতার সহিত কাজ করিতেন।

ভূঁইয়ারা আবার নানা আকারের নৌয়ারা রাখিতেন। কার্ভুস, কোশা, জঙ্গা, গ্রাব, পরিন্দা, বালাম, খাওর প্রভৃতি বড় বড় নৌকা ও জাহাজ সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতেন। লক্ষণ-মাণিক্যের রাজত্বকালে আরাকানের মগেরা প্রায়ই বঙ্গোপ-সাগরের ধারে ধারে লুঠতরাজ করিতে আসিত। লক্ষণ-মাণিক্যকে তাহাদের সহিত বহুবার জলপথে লড়াই করিতে হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের সুযোগ্য সেনাপতি শঙ্কর চক্রবর্তী এবং সূর্য্যকান্তের বীরত্বের কাহিনীও সুবিদিত।

সেকালে বাংলাদেশে বিভাচর্চ্চা অপেক্ষা দৈহিক শক্তিচর্চ্চার মূল্য কম ছিল না। কথিত আছে যে, সাঁতোড়ের নাবালক রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণকে সকল রকম শক্তিচর্চ্চায় পারদর্শী করিবার জন্ত দেওয়ান গোকুলচন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তিনি রাজপুত্রকে শস্ত্রচর্চ্চায় সুদক্ষ করিবার ভার সেনাপতি কামতার খাঁর উপর অর্পণ করেন। কামতার রাজপুত্রকে অতি-মাত্র যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে থাকেন। ফলে তিনি অল্পকাল-মধ্যেই কুস্তি, অস্ত্রচালনা ইত্যাদিতে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। ভূঁইয়াদের রাজত্বের একশত দেড়শত বৎসর পরেও বাঙালীদের মধ্যে কুস্তিচর্চ্চা কিরূপ হইত তাহার একটু নমুনা আমরা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' হইতে এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩, শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। বিহিত বিনয় পুরঃসর নিবেদনমিদং। সংপ্রতি শহর কলিকাতার সন্নিহিত ৺ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী বালি নামক গ্রামে অভিনব জনৈক কুস্তিগীর মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক যাঁহার ভোজনের বৃত্তান্ত ইহার পূর্ব্বে শ্রাবণ মাসীয় চন্দ্রিকা ও পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্র প্রভৃতিতে উত্তমরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি যেরূপ ঐ কুস্তিগীর বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছেন তদ্বিস্তর বর্ণন বাহুল্য যে ঠিক কিন্তু এতদ্রূপ বলবান গুণজ্ঞ ব্যক্তিকে সর্ব্বসাধারণকে বিশেষ এ সকল বিদ্যাতে সুপণ্ডিত জনগণকে জ্ঞাত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অস্মদাদির বোধ হয় যে এতৎ প্রদেশস্থ অতি বিখ্যাত রাধাগোয়ালা ও তাহার পুত্রদ্বয় এবং আর আর বিলক্ষণ বলবান ও যাঁহারা এমত কুস্তিগীর কার্য্যে প্রকৃত দক্ষ এমত ব্যক্তিদিগকেও তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিয়া দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে পারেন এবং যেকল কর্ম্ম বিষয়ে তাহা তিনি প্রকৃষ্টরূপে অবগত আছেন। এইক্ষণে যে কেহ উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিতে অথবা এতদ্বিষয়ে কোন বিশেষ উপদেশ লইতে প্রার্থনা রাখেন তবে তিনি ঐ নবীন কুস্তিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গমন করিলে অথবা লিপি প্রেরণ করিলে অবশ্য তাবদ্ব্ত্তান্তাব-গত হইতে পারিবেন। এবং এতমহানুগরস্থ ভাবদৈশ্বর্য্যশালী মহাশয়দিগের অস্মাদির বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন এই যে কোন মহাশয় স্বীয়২ বহির্দ্বারের সমূহবলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর ব্যক্তিদিগকে দ্বারপালের কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন যত্তপি তাহারদিগের দ্বারা ঐ পূর্ব্বোক্ত নবীন কুস্তিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরীক্ষা লইতে মনস্থ করেন তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বালি গ্রামের দক্ষিণ পল্লীস্থ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট লিপি প্রেরণ করিলে আমরা অত্যন্ত বাধিত হইয়া ঐ কুস্তিগীর মহাবল পরাক্রমকে তৎক্ষণাৎ তন্মহাশয়ের সমীপস্থ করিব। অতএব হে সম্পাদক মহাশয় আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বার্ত্তা দর্পণে অর্পণ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি—কস্যচিৎ বালি নিবাসী দ্বিজাদিসমূহ সজ্জন গণনাং।"

সেকালে বাংলাদেশে বীরাঙ্গনার অভাব ছিল না। এক সময় রাণী ভবশঙ্করীর ন্যায় মহীয়সী মহিলা এই বাংলাদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভবশঙ্করী পুরুষদিগের ন্যায় রীতিমত শক্তিচর্চ্চা ও যুদ্ধবিদ্যার অনুশীলন করিতেন। তিনি অসি-ক্রীড়া করিতেন, তীর ও তীর ছুঁড়িতেন এবং অশ্বারোহণে সুদক্ষ ছিলেন। বাংলার এই বীরাঙ্গনা পাঠান সেনাপতি ওসমানের

সহিত সম্মুখযুদ্ধে যে বীরত্ব প্রকাশ করেন তাহাতে রাজা মানসিংহ খুশী হইয়া তাঁহাকে নানা উপঢৌকনাদি প্রদান করেন।

তখনকার দিনে বাংলাদেশে সাধারণ গৃহস্থের মেয়েরাও শক্তিচর্চ্চা করিতেন। তাঁহারা যে আখড়ায় গিয়া লাঠি-খেলা অসিক্রীড়া ভল্ল ও তীর নিক্ষেপ প্রভৃতি শিখিতেন তাহার যথেষ্ট নজির আছে। আমরা পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল নিবারণার্থে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' হইতে কয়েক পংক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—২৬ চৈত্র, ১২৩৩। কুস্তি লড়াই। সংপ্রতি মোং পাতরিয়াঘাটা নিবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাটীর সম্মুখে প্রত্যহ বৈকালে বালিকা প্রভৃতির মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে তত্রস্থ বাঙ্গালির বালক প্রভৃতি দুই ২ জন এক ২ বার মল্লযুদ্ধ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ বালিকাদিগের যুদ্ধ সন্দর্শনে কে না আহ্লাদিত হন? কিন্তু যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহারা পরাজয় হইলে গণ্ডগোল করিবার উদ্যোগ করে; কিন্তু দেওয়ানজি মহাশয়ের শাসনেতে কেহ কোন বিবাদ করিতে পারে না।"

সেকালের বাংলার মেয়েরা যে কিরূপ সাহসী ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বসম্পন্ন ছিলেন তাহার নিদর্শনস্বরূপ 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা' হইতে একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি—স্ত্রীলোকের সাহস। কলিকাতা পূর্ব্ব-দক্ষিণ বাদাবনের অন্তঃপাতী জয়নগরের নিকট চৌরমহল নামে এক গ্রাম আছে সেখানে অধিক লোকের বসতি নাই, কেবল অতিশয় বন এবং ব্যাঘ্র-ভীতিও অতিশয়। এক গৃহস্থের স্ত্রী নব প্রসূতা, তাঁহার স্বামী প্রাতকালে কর্ম্মান্তরে গেলে ঐ স্ত্রী আপন গৃহের পিড়াতে অগ্নি করিয়া দ্বার শক্তরূপে দিয়া বালক লইয়া থাকিল। এক প্রহরের সময় এক ব্যাঘ্র আসিয়া ঐ গৃহ প্রবেশের উদ্যোগে গৃহের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ স্ত্রীলোক ব্যাঘ্রের ঐ সকল উদ্যোগ দেখিয়া নানারূপ ভাবিতে বিশেষতঃ এ সময় যদি আপন স্বামী আসে তবে তাহাকে এই ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিবে এই রূপ নানা চিন্তা করিতেছে ইত্যবসরে ব্যাঘ্র কোন দিগে দ্বার না পাইয়া লম্ফ দিয়া পিড়ার চালে উঠিয়া চালের খড় উঠাইয়া যৎকিঞ্চিৎ দ্বার করিয়া মুখ দিল। কিন্তু মুখ প্রবেশ হইল না। পরে পশ্চাতের দুই পা ও লাঙ্গুল অগ্রে দিল এই সময় ঐ স্ত্রী জীবন আশা ত্যাগ করিয়া আপন নিকটস্থ শীত নিবারক কাঁথার এক ভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অল্পে অল্পে ব্যাঘ্রের মার্গেতে ধরিল। তখন ব্যাঘ্র ব্যস্ত হইয়া পুনরুত্থানের চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু দশ আনা শরীর নিরালম্বে দোদুল্যমান হওয়াতে উত্থানে সমর্থ হইল না। পরে প্রলয়-কালীন গর্জ্জনতুল্য বার বার বৃহৎ শব্দ করিতে লাগিল ইহাতে গ্রামস্থ লোকেরা ভীত হইয়া স্ব স্ব গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া গৃহ

মধ্যে থাকিল। ঐ স্ত্রী ক্রমে ক্রমে গৃহ দাহ না হয় কেবল ব্যাঘ্র দগ্ধ হয় এইরূপ অগ্নি জ্বালাইতে লাগিল। কিছুকাল পরে ব্যাঘ্র নিঃশব্দ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল দুই দণ্ডা পরে গ্রামস্থলোক গৃহ হইতে বাহির হইয়া চতুর্দিকে অবলোকন করিয়া পাঁচ সাত দশ জন একত্র হইয়া ক্রমে ক্রমে ঐ স্থানে আসিয়া বিশেষ দেখিল। সে সময় ঐ স্ত্রীর স্বামীও আইল পরে ব্যাঘ্রকে চাল হইতে নামাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।" সমাচার দর্পণ, ২রা মার্চ্চ, ১৮২২।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সঙ্কলিত "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" শীর্ষক পুস্তকে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙালীদের সাহস ও বীরত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ পাইতেছি—

"পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙালীরা এত দুর্ব্বল ছিল না, রক্তপাত দেখিলে তাহাদের মূর্চ্ছা হইত না, শত্রুর নাম শুনিলে আতঙ্ক উপস্থিত হইত না, গ্রামে গ্রামে ব্যায়াম-চর্চ্চার স্থান ছিল, গ্রামে গ্রামে একজন বিখ্যাত সর্দ্দার ছিল, ভদ্রলোকেরা পালোয়ান আখ্যা গ্রহণ করিতে লজ্জিত হইত না। কথায় কথায় লাঠালাঠি হইত ও মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গি এবং হস্তপদ অস্ত্রাঘাত দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হওয়া লোকের নিকট তত গুরুতর বিষয় বলিয়া বোধ হইত না। প্রতি রাত্রে ভদ্র অভদ্র সকলে একত্রিত হইয়া লাঠি, তরবার, বল্লম প্রভৃতি খেলা শিখিত। দশ জন একত্রিত হইলে কেবল ঐ গল্প ঐ কথা হইত। সকলের গৃহে দুই চারখানি তরবার, দশ-বার-গাছা বল্লম থাকিত, বাড়ীর একজন না একজন লাঠি তলোয়ার বা বল্লম খেলিতে জানিতেন। ইংরেজদিগের কঠোর শাসনে এ দেশের সে ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে কিন্তু তখন সমাজে যে জীবনী-শক্তি ছিল সেটা সেই সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে"— অমৃত বাজার পত্রিকা, ৫ ডিসেম্বর ১৮৭২।

ইদানীং আমরা রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছি। এ অধিকার রক্ষা করিতে হইলে যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন শক্তিচর্চ্চা তাহাদের অন্যতম। দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তিতে শক্তিমান না হইলে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য পরাক্রমশালী জাতিসমূহের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছু হটিয়া যাইব। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, স্বাধীনতা পাওয়া যত কঠিন, তাহা রক্ষা করা ততোধিক দুরূহ।

চৈতন্যপূর্ব যুগের বৈষ্ণব কাব্য-কথা

শ্রীরবীন চৌধুরী

(১)
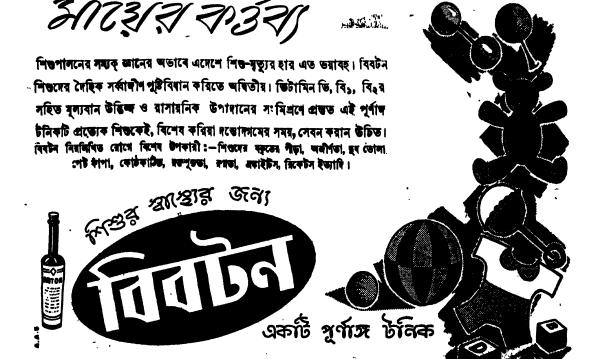
সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা পড়েন, এটা তাঁদের চোখে পড়বেই যে, প্রাচীন আমলে পৃথিবীর প্রায় সবকয়টি দেশেই ধর্ম ও সাহিত্য যমজ ভাই-বোনের মত একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। পেরিক্লীস যুগের গ্রীক কাব্য-নাটক, প্রাচীন ভারতের বৈদিক সাহিত্য, প্রাক্-চতুর্দশ শতকের ইংরেজী কাব্য-কথা—কোথাও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। জাপানী সাহিত্যও গড়ে উঠেছিল একদিন সিণ্টো ধর্মকে কেন্দ্র করে। পাল, সেন ও চৈতন্যপূর্ব যুগের আমাদের প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ভিত্তিও তৈরী হ'ল সহজযান বৌদ্ধ, হিন্দু আর আর্য্য, অনার্য্য মিশ্রণে উদ্ভূত যত লৌকিক দেবদেবীদের ইট-কাঠ-পাথর দিয়ে। চর্য্যা ও বৌদ্ধ-দোহাবলীতে সহজযান মতের ছাপ, অনার্য্য চরিত্রের মঙ্গল কাব্যগুলিতে সেই চণ্ডী-মনসা ঠাকরুণদের বিবাদ বিসংবাদ, ধর্ম্ম-ঠাকুরের মাহাত্ম্য—লৌকিক দেবতাদের কত কীর্ত্তি, কত কাহিনী লিপিবদ্ধ। আর সমুদ্রবৎ হিন্দুধর্ম্মকে নিয়ে যেসব ছড়া, গাথা, কাব্য, পুরাণ লেখা হয়েছে, তাদের সংখ্যা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত বললেও অত্যুক্তি হবে না।

বিশাল জট-মাথা বটগাছকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে যেমন পাখীদের নীড়ের রচনা চলে, পুরাকালে ধর্ম্মকে অবলম্বন করে তেমনি গড়ে উঠেছিল সাহিত্য। ধর্ম্মের আলবাল থেকে রস আকর্ষণ করে আম্রম-সহকারের মত সে লাভ করেছিল শ্যামশ্রী। এর কারণটাও সোজা। সে যুগটা ছিল ধর্ম্মের যুগ, সমাজের মুখ্য চেতনা ছিল ধর্ম্ম-চেতনা। সুতরাং সে আমলের কাব্য-কলা হ'ল ধর্ম্মমুখী।

একথা সকলেই মানেন যে, যা আমি ভাবি, অনুভব করি, তারই রূপায়ণ আমার কাব্যে আমার সাহিত্যে। আবার আমার কথা হচ্ছে, আমার সময়ের কথা, আমার দেশের কথা—স্থান ও কাল হতে আমি বিচ্ছিন্ন নই। সুতরাং সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের যোগ মায়ের সঙ্গে ছেলের যোগের মত, একেবারে নাড়ীতে নাড়ীতে। আর সেকালের সাহিত্য-বাসর তাই জাঁকিয়ে বসেছে—ধর্ম্ম।

ঠিক এই কারণে জয়দেবের গীত-গোবিন্দের সময় জেনেও যদি কেউ মনে করেন যে, পঞ্চদশ শতক-পূর্ব্ব প্রাচীন বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ছিল না, তবে আমরা তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা করতে

পারব না। সাহিত্য যদি সমাজ-বৃক্ষের অমৃত-ফল হয়, তবে চৈতন্যের আগে বৈষ্ণব সাহিত্যের রচনা হয়ে থাকলে, মানতেই হবে বাংলার সমাজ-নদীতে তখন বৈষ্ণবতার প্রবাহ ছিলই। আজকের মত লাখ লাখ মন্দির না উঠলেও, সেকালের সমাজ-চত্বরে শানবাঁধানো দু-চারটে কৃষ্ণ-মন্দির দেখা যেতই।

আর আসলে হয়েও ছিল তাই। সেদিনের ধর্ম্মাশ্রয়ী সাহিত্যের বেশ মোটা একটা অংশ রাধাকৃষ্ণের লীলা-কীর্ত্তনে মুখরিত হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণলীলা বাংলার মাটিতে এল কি ভাবে, ছড়াল দেশের নগরে পল্লীতে—দিগন্তচুম্বিত প্রান্তরে, উঠল একে একে তার দেবায়তন, এসব কথা না জানলে ঐ শ্রেণীর সাহিত্য-রচনার হেতু বোঝা যাবে না। আগে আমরা তাই কৃষ্ণলীলার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তার পর বৈষ্ণব-লেখার ছোট এক ফিরিস্তি দেব।

(২)

সকলেই জানেন উত্তর-ভারতেই বৈষ্ণবদের তীর্থ মথুরা, বৃন্দাবন। রাধাকৃষ্ণের যত লীলা ওখানকারই যমুনাতটে, যমুনা-জলে, পর্ব্বতের পাদদেশে, অরণ্যে। একথা জানেন বলেই তাঁরা মনে করেন, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উদ্ভবও বুঝি ঐ ভূখণ্ডে। কিন্তু উক্ত ধর্ম্মের উৎস বোধ হয়,ওখানে নয়। পদ্মপুরাণে নারদ-ঋষির কাছে যুবতী ভক্তি বলছেন যে, দ্রাবিড়েই তাঁর জন্ম। মহারাষ্ট্র, গুর্জ্জর প্রভৃতি দেশ ঘুরে তিনি ক্ষীণা ও খণ্ডিতাঙ্গী হয়েছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনের ভূমি স্পর্শমাত্র ফিরে পেলেন আবার নবযৌবন। ভাগবত লেখারও আগে দাক্ষিণাত্যে আলওয়ার সম্প্রদায় বৈষ্ণবদের মতই জ্ঞানমার্গ ছেড়ে প্রপত্তিমার্গ আশ্রয় করেছিলেন। তাঁরা নামগান করতেন, নায়িকাভাবে মধুর ভাবের উপাসনা করতেন আর উপাসনাকালে দেহে তাঁদের সাত্ত্বিক ভাবের উন্মেষ হ'ত। তামিল ভাষায় যে সব কবিতা এঁদের রয়েছে, বৈষ্ণব-কাব্যের তারা নিকট-আত্মীয়। ভাগবতও বোধ হয় ওখানেই লেখা হয়ে থাকবে। দক্ষিণা-পথের নদী-গিরি-বনের যে স্পষ্ট ছবি ওতে রয়েছে, তাতে একথাই মনে হয়। ভাগবত সম্পর্কে ফারকুহার সাহেবেরও এই মত। (অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের ভূমিকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন)। মোট কথা, যেখানেই ঐ ভক্তিধর্ম্মের উদ্ভব হোক, বিন্ধ্যের দক্ষিণ-পারের পূর্ব্ব-পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার দেশেই হোক বা উত্তরের গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সমতলখণ্ডেই হোক, বাংলায় তা এসেছে আর্য্যাবর্ত্ত থেকে। পঞ্চোপাসক আর্য্যেরা যেদিন পা দিলেন এদেশে—শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ধর্ম্মমতের মত বৈষ্ণবতাও এল বাংলায়।

আর্য্যেরা কবে প্রথম আমাদের বাংলার পলিমাটিতে এলেন ঘর বাঁধতে, তা ঠিক বলা যায় না। অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখেছেন, "কোন্ সময় থেকে বাংলাদেশে আর্য্যদের বসতি আরম্ভ হয়, তা ঠিক করে বলা শক্ত। তবে মৌর্য্য সম্রাটদের শাসনকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে যে অন্ততঃ উত্তরবঙ্গে আর্য্যদের উপনিবেশ ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে।" (প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী)। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বঙ্গসমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা বোঝা যায় ঐ শতাব্দীর শিলালিপি থেকে। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের লিপিতে দেখি, পুষ্করণ-অধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা নিজেকে চক্রস্বামীর (বিষ্ণুর) দাসানুদাস বলছেন। তার পর গুপ্ত আমলেও বৈষ্ণবতার জয়ডঙ্কা বেজেছে। পরম-ভাগবত গুপ্ত সম্রাটরা বাংলার দেবায়তনে অনেকগুলি বিষ্ণু-মন্দির যোগ করেছেন। কিন্তু এ আমল পর্য্যন্ত চলেছে যেন শিবহীন যজ্ঞ। যে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিস্তার হ'ল আকাশের মত—আর যে আকাশের নীল চন্দ্রা-তপ ঘিরে অসংখ্য নক্ষত্রের মত ফুটল অসংখ্য কবিতা, খ্রীষ্টীয় পঞ্চ শতক পর্য্যন্ত সে কৃষ্ণের পূজা হয় নি বৈষ্ণব দেউলে, চাঁদোয়ার নীচে কথকতা চলে নি তাঁর লীলা-কাহিনীর।

অনেকের হয়ত সংশয় জাগতে পারে এই ভেবে যে কৃষ্ণ ত বিষ্ণুরই নামান্তর। কিন্তু কৃষ্ণ আর বিষ্ণুর মধ্যে বৈষ্ণবেরা বিভিন্নতা দেখেন। তাঁদের মতে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন কৃষ্ণের অংশমাত্র বিষ্ণু, তাঁর বহু অবতারের অন্যতম অবতার। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত *History of Bengal*-এর ১ম খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) গুপ্ত আমলের বিষ্ণু—বৈদিক বিষ্ণু ও পাঞ্চ-রাত্রদের নারায়ণের সমন্বয়, ভাগবতোক্ত কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিরাট পার্থক্য।

কৃষ্ণপূজার সূত্রপাত হয়ত হয়েছিল ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে, কারণ পাহাড়পুরে রাধাকৃষ্ণের যে যুগলমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তার সময় সপ্তম শতক। অধ্যাপক বাগচীরও এই মত। (History of Bengal-এ ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তবে *Vaisnava Faith and Movement* গ্রন্থে অধ্যাপক সুশীলকুমার যে অনুমান করেছেন যে, পালরাজাদের সময়েই অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে

ভাগবতের ভক্তিধর্ম্ম পুষ্টিলাভ করে বাংলায়, গুপ্ত-আমলে কৃষ্ণ-পূজার প্রচলন ছিল না। কৃষ্ণ-পূজার আরম্ভ-কালটা পিছিয়ে গেলেও সুশীলবাবুর অনুমানটা নিছক "প্রত্নতাত্ত্বিক" মনে হয় না, কিন্তু যাঁরা বলেন এদেশে, কর্ণদেব ও কর্ণাটগণ ভক্তি-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন তাঁদের একথা বলবার কারণ কি, ঠিক বুঝা যায় না।

সে যাই হোক, এই কৃষ্ণলীলার গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে-পৌরাণিক ঐরাবতের মত আর দাঁড়াতে পারল না কোন রাজ-বংশ, কোন রাজধর্ম্ম। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাং যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে প্রবলতর দেখেছিলেন, বৌদ্ধ, পাল আমলেও তারা ধারা ব্যাহত হ'ল না দুটো কারণে। প্রথমতঃ পাল সম্রাট্‌রা বৌদ্ধ হ'লেও হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। গৌড়-বঙ্গের শেষ পাল সম্রাট্ রামপালদেবও জাহ্নবীনীরে বিষ্ণুপদ ধ্যান করতে করতেই দেহত্যাগ করেছিলেন। আর দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে—ধর্ম্মকলহে বঙ্গদেশের চিরকালীন অনাসক্তি। এই বাংলায় কোনকালে ধর্ম্ম নিয়ে Crusade বা জেহাদ চলে নি। ভিন্সেট স্মিথ বলেছেন বটে যে, সপ্তম শতাব্দীতে শৈব শশাঙ্ক বোধিদ্রুম ধ্বংস করেছিলেন এক দিন, কিন্তু এরকম দৃষ্টান্ত বড় বেশী চোখে পড়ে না। নইলে যে বৌদ্ধধর্ম্ম অষ্টম শতকেই উত্তর-ভারত হতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, হিন্দু সেনরাজাদের যুগ পার হয়ে বাংলার সমাজ আঁকড়ে তা চৌদ্দ শতক পর্য্যন্ত টিকে থাকতে পারত না।

সাত শ পঞ্চাশ হতে বার শ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস ত হিন্দুধর্ম্মের ক্রমোন্নতির ইতিহাস, আর হিন্দু-দেবগণের মধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্যলাভের ইতিকথা। এই সাড়ে চার শ বৎসরের যে মূর্ত্তিগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলি একথার পোষকতাই করবে।

পাল আমলের পর যে সেন-বংশ সুরু হ'ল, সে বংশের সম্রাট্‌গণের অনেকেই ছিলেন বৈষ্ণবমতাশ্রয়ী। আর বর্ম্মণ রাজারা ত প্রায় সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন। অবশ্য সেন-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন এবং প্রসিদ্ধ লক্ষ্মণ সেন ছিলেন শৈব। কিন্তু বিজয় সেনের কথা বাদ দিলে বলা যায় যে লক্ষ্মণ সেনের শৈবত্ব বাংলার সমাজে বৈষ্ণবতার অগ্রগতির পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষতিকর হয় নি। বরং কুলদেবতা সদাশিবের পূজা করলেও তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল কৃষ্ণেরই প্রতি। রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী নিয়ে নিজে তিনি একাধিক বৈষ্ণব পদ রচনা করে-ছিলেন শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে, আর রাজকবি জয়দেব মিশ্রকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন বাংলার অমর কাব্য গীত-গোবিন্দ।

দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে যে তুর্কী অভিযান সুরু হ'ল, তারই আঘাতে অপস্রিয়মাণ বৌদ্ধধর্ম্মকে আরও তাড়াতাড়ি ছাড়তে হ'ল বাংলার দেবস্থান। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এত দিন পর্য্যন্ত বঙ্গসমাজে আর্য্য অভিজাত সম্প্রদায় ও অনার্য্য জনসাধারণের যে ধারা পাশাপাশি চলেছিল উদাসীন ও অজ্ঞানের মত, এই প্রচণ্ড সংঘাতে তার পরিণতি হ'ল জলে, দুর্ব্বার বিদ্যুৎ স্রোতধারা মিলন একবেণী নদীতে। আর সেই মিলিত মহাজাতি আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য মাথায় নিতে দাঁড়াল যে মন্দির-প্রাঙ্গণে, তার পাষাণ-চত্বর হতে এক শ' আট দেউলই উঠেছে এক শ' আট হিন্দুবিগ্রহ নিয়ে।

এই কারণে এতদিন 'চৈত্রের শীর্ণ নদীর মত বাউবুল সিক্ত করে ঝিরিঝিরি বয়ে চলেছিল যে বৈষ্ণব-ধারা, দ্বাদশ শতকের পর তারই খাতে এল কৈশোরের প্রাণ-চাঞ্চল্য।' তারপর ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে একদিন চৈতন্যের জন্ম হ'ল। যে কৃষ্ণলীলা-কাহিনীতে আগে এসেছিল জোয়ার, এবার তাতে দেখা দিল বন্যা। শুধু নদে নয়, শান্তিপুর নয়, সমগ্র বঙ্গদেশ তারপর ভেসে গেল নাম-কীর্ত্তনে, লীলা-কাহিনীর কথকতায়, রচনায়।

বৈষ্ণবতার এই জোয়ার ছিল বলেই চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে উত্তর-ভারতে সুরদাস লিখলেন পদাবলী, নানক লিখলেন, 'গোবিন্দ ভজন বিনে বৃথা সভ কাম।' প্রাচীন বাংলার রাজভাষা সংস্কৃতে লেখা হ'ল লক্ষ্মণ সেনের একাধিক কবিতা শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে, কেশব সেনের পদ, জয়দেবের অমর কাব্য গীত-গোবিন্দ আর যে মাগধী অপভ্রংশ হতে ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে সৃষ্টি হ'ল বাংলা ভাষার (অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে), সেই অপভ্রংশ সাহিত্যও মুখর হল লীলাগানে। প্রাকৃত-পৈঙ্গলে রয়েছে রাধাকৃষ্ণের নৌকা-লীলার পদ :

আমে যে বাহহি কাহ্ন নাব ছোট্ট ডগমগ কুগতি ন দেহি।
তই ইথি নইহি সন্তার দেই জো চাহহি সো লেহি ॥

বাংলা-ভাষায় এই লীলা-কাহিনীর প্রথম কথক কে, বলা শক্ত। ১১২৯-১১৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় চালুক্য-বংশের রাজা সোমেশ্বর ভুলোকমল্লের নির্দ্দেশে রচিত মানসোল্লাস গ্রন্থে যে পদটি রয়েছে, 'ছাড়্ ছাড়্ মই জাইবো গোবিন্দ সহ খেলন নারায়ণ জগহকের গোঁসাই'—এইটিই প্রাচীনতম নিদর্শন বলে আমার মনে হয়। *Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে দীনেশচন্দ্র সেন কিন্তু সংস্কৃত চন্দ্রচূড়চরিতের লেখক বাঙালী উমাপতি ধরকেই রাধাকৃষ্ণ লীলার প্রথম কথক বলে অনুমান করেছেন।

উমাপতি নামে এক মৈথিল কবি ছিলেন, বঙ্গ ও মিথিলায় যাঁর অনেক বৈষ্ণব পদ চলিত রয়েছে। অধ্যাপক Aufrecht সাহেব এঁর কাল নির্দ্ধারণ করেছেন একাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে। দীনেশ বাবুর মতে এই উমাপতিই বাঙালী উমাপতি ধর। তাঁর বিশ্বাস বাঙালী উমাপতি ধর যখন বিজয় সেনের সভাকবি এবং সেজন্য তাঁর সময় যখন এগার শতক, তখন উভয় কবি অভিন্ন এবং মৈথিল উমাপতি আসলে মিথিলার কবি নন, তিনি বাংলারই ঐ উমাপতি ধর, চন্দ্রচূড়-চরিতের লেখক।

দুই কবির আবির্ভাবকাল একই সময়ে হ'লে, তাঁদের অভিন্ন মনে করবার কারণ আছে, কিন্তু তা নয়। উমাপতি ধর বিজয় সেনের সভাকবি হ'লেও, তাঁর সময় দ্বাদশ শতাব্দী হয়। *History of Muslim Rule in India* নামে ঈশ্বরীপ্রসাদের যে ইতিহাস রয়েছে তার দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে মনে হয় বিজয় সেনের আমল দ্বাদশ শতক। তা ছাড়া উমাপতি ধর আসলে ছিলেন লক্ষ্মণসেনের সভাকবি এবং ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে তাঁর সময় ১১৭০ থেকে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থে অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছেন, "উমাপতি ধর দীর্ঘজীবী ছিলেন। ইনি লক্ষ্মণসেন দেবের পিতা বল্লালসেন দেবেরও মন্ত্রিত্ব করেছিলেন।" তা হ'লেও চন্দ্রচূড়চরিতের কবিকে দ্বাদশ শতকেই ফেলতে হবে কারণ বল্লালসেনেরও রাজ্যকালের আরম্ভ ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে।

চৈতন্যপূর্ব্ব বৈষ্ণব কাব্য-ভাণ্ডার যাঁদের মণিমাণিক্যে পূর্ণ হয়েছে, সে সব প্রাতঃস্মরণীয় কবির মধ্যে এবার প্রথমেই নাম করা যাচ্ছে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের। সত্য বটে, বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, কিন্তু তাঁকে বুঝেছে ত বাঙালী। আর চণ্ডীদাসের গান ত আজ মাঝিমাল্লাদেরও মুখে। কিন্তু পদাবলীর এই চণ্ডীদাস কি প্রাচীন বাংলার ? চৈতন্য কি এঁরই পদাবলীর রসাস্বাদন করেছিলেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তবে আমাদের মনে হয়, চৈতন্যদেব এঁর পদাবলী শোনেন নি। 'সই, কেবা শুনাইল তার নাম' প্রভৃতি পদের কথক এই চণ্ডীদাস তাঁর পরবর্তী সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। (তাঁর 'দীন-চণ্ডীদাস' পুস্তকের ১ম খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য) চৈতন্য যে চণ্ডীদাসের পদ শুনে মুগ্ধ হতেন, তিনি বড়ু-চণ্ডীদাস এবং তাঁর রচনা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই মহাপ্রভু স্বরূপ ও রামানন্দসনে রাত্রিদিন শুনতেন—অধ্যাপক মণীন্দ্র-মোহন বসুর এই মত এবং আমাদেরও মনে হয় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রস আস্বাদন করা শুধু মহাপ্রভুর পক্ষে নয়, যে কোন বিদগ্ধ জনেরও পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন নিকৃষ্ট কাব্য ত নয়ই, বরং তার বংশী ও বিরহখণ্ডে আছে বড়ু-চণ্ডীদাসের কবি-প্রতিভার হীরক-দীপ্তি। সাহিত্য-পরিষদ থেকে টীকা-টিপ্পনী সহ বসন্তবাবুর সম্পাদনায় এর যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তা পড়লে সকলেরই একথা মনে হবে।

চণ্ডীদাসের পর নাম করা যায় মালাধর বসুর। এঁর উপাধি ছিল গুণরাজ খাঁন এবং ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ইনি লিখেছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়'। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় এই গ্রন্থের যে সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে রয়েছে মালাধর ও তাঁর কাব্যের বিস্তৃত পরিচয়।

রামানন্দ কিংবা রূপ-গোস্বামীর মত চৈতন্যের সমসাময়িকদের নাম আমরা আর করব না। তবে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আবির্ভাব সত্ত্বেও রাধাকৃষ্ণলীলা নিয়ে সেদিনের বাংলায় আর কেউ কাব্য লেখেন নি, এরূপ বিশ্বাস হয় না। সেদিন রাধাকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যে অজস্র লেখা চলেছিল তার প্রমাণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

পুস্তক-পরিচয়

আজিকার ভারত—রজনী পাম দত্ত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; ২৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য—তিন টাকা মাত্র।

এই পুস্তকখানি গ্রন্থকারের লিখিত বৃহত্তর *India Today* নামক বইয়ের বাংলা সংস্করণ। গ্রন্থকার ব্রিটেনের বামপন্থী চিন্তা-নায়কবর্গের অন্যতম বলিয়া পরিচিত। তাঁহার পিতা ছিলেন বাঙালী; কলিকাতার দত্ত পরিবারের বংশধর; তিনি ইংলণ্ডে জীবনের শেষাংশ কাটাইয়াছিলেন। গ্রন্থকারের মা ছিলেন সুইডেনবাসিনী। এই গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রে লেখক তাঁহার পিতার নিকট রাজনীতিক প্রথম পাঠের জন্য ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। চিরাচরিত চিন্তাধারা ও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম রামমোহন রায় আরম্ভ করিয়াছিলেন তার পরিণতির সাক্ষীরূপে বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একজন বংশধর উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন তাহা ভারতব্যাপী ঐতিহাসিক বিপ্লবের অন্য একটা প্রমাণ মাত্র। উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত যাহা করিয়াছিলেন স্বদেশে বাস করিলে তাহার অধিক কিছু করিতেন কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ চিন্তাশীল ভারতবাসী এই বিপ্লবের ধারকরূপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধিকার শিথিল করিয়া দিয়াছে। উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত সেই যুগের লোক।

ব্রিটিশ-শাসনের আমলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবনতির ইতিহাস ও তার প্রমাণ এই বইখানিতে পরিবেশিত হইয়াছে—এই ইতিহাস আমাদের অজানা ছিল না; ব্রিটিশ ও ভারতবর্ষীয় ঐতিহাসিকবৃন্দ এক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক সমাজ-তন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যাখ্যাতা কার্ল মার্কস ও নরম্যান এন্‌গেল্‌স-এর দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন; ব্রিটিশ-শাসন ও শোষণের ফলে যে অর্থনৈতিক অবনতির সূচনা হয় তার বিশদ বর্ণনা এই বইয়ে আছে। এই প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এবং একখানি বইয়ের মধ্যে তাহা সন্নিবেশিত করিয়া আমাদের—সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদের—উপকার সাধন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে দাদাভাই নৌরজী, মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে, রমেশ-চন্দ্র দত্ত এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে অসন্তোষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ রূপে ফুটিয়া উঠে, তার অর্থনীতিক কারণ এই ইতিহাসের মধ্যে আছে। অর্থনীতিক অবনতির ফলে সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে বিপ্লব ও বিপর্য্যয় দেখা দেয়, এই বইয়ে তাহাই মাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভাবের রাজ্যে, চিন্তা জগতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে রজনী পাম দত্ত বিশেষ কিছু বলেন নাই। তার পরিচয় না জানিলে "আজিকার ভারত"কে সম্যক্ জানিতে পারা যায় না।

আর একটা কথা। ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এমন কোন আচার-আচরণ ছিল যাহা দেশের জীবনকে দুর্ব্বল করিয়া পরদেশীর পদানত করিবার সুযোগ করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-শক্তি কেন এই ছত্রভঙ্গের নিবারণ করিতে পারিল না, তার কারণ না বলিতে পারিলে ভারত-ইতিহাসে একটা রহস্য থাকিয়া যায়। শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভেদ ও বিরোধ ভারতবর্ষের একচেটিয়া নয়। অন্যান্য দেশেও তাহা ছিল। কিন্তু তাহা পরদেশীর শাসন ও শোষণ ডাকিয়া আনিতে সক্ষম হয় নাই। ভারতবর্ষের বেলায় এই ব্যতিক্রম দেখা দিল কেন? রজনী পাম দত্তের বইয়ে এই প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। সুতরাং "আজিকার ভারত" আমাদের জ্ঞান-রাজ্যের পরিধি বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

চিরন্তনী—শ্রীসুষমা সেনগুপ্ত। এনাক্ষী গ্রন্থ-মন্দির, ১৫৩ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। মূল্য—১।৹

গল্প-সংগ্রহ সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া লেখিকা পাঁচটি কাহিনী পরিবেশন করিয়াছেন। দেশ ও আচার-ব্যবহারের পার্থক্য-সত্ত্বেও ধৈর্য্য ও ক্ষমাময়ী নারীর অন্তরে যে চিরন্তনী বৃত্তি অন্তঃশীলা ফল্গুর মত প্রবাহিত তারই ব্যথা-বেদনা প্রতিটি গল্পে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীর মধ্যেই আছেন চিরকালের সীতা, সাবিত্রী, শবরী, অরুন্ধতীরা। ক্ষমা, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও অনুরাগের আলোকে তাঁরা বার বার উজ্জ্বল হইয়া উঠেন।

রচনা ভাবানুযায়ী প্রাঞ্জল এবং মিষ্ট। সবচেয়ে প্রশংসার কথা অকপট দরদ দিয়া কাহিনীগুলি রচিত এবং সেই কারণে প্রত্যক্ষ-দর্শনের অনুভূতি-রসে মন ভরিয়া উঠে—চক্ষুতে অশ্রুবাষ্প ঘনায়।

পাকিস্থানের পত্র—শ্রীনীহাররঞ্জন ঘোষাল। দি ফিনিক্স প্রেস লিমিটেড। ৫৩, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২।৹

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল। বাংলার যে বিস্তীর্ণ আবাদী জমির উপরে দু'ফুট চওড়া একটি কাটা-নালার সীমারেখায় বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা রূপরূপে প্রকাশিত হইল, একদিকে তার সুরাজপুর পূর্ব্ব-পাকিস্থানী (পাকিস্থান নহে) গ্রাম, অন্য দিকে রাজপুর—ভারতবর্ষের সুরু।

যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন—দু'ভাগে বিভক্ত ভারতবর্ষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘুমাইয়া বাঁচিবেন—তাঁহাদের আশা যে নিত্য-দেখা দুঃস্বপ্নে নিদ্রাহীন রাত্রিকে সুদীর্ঘতর করিতেছে—তাহারই আভাস পাকিস্থানের পত্রে পাওয়া যায়। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ভিত্তিপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রাজনীতি, সমাজনীতি ও মনুষ্য-চরিত্রের ফাঁকে ফাঁকে বহু জিনিষ—অনুসন্ধানী দৃষ্টির দ্বারা লেখক আবিষ্কার করিয়াছেন এবং শ্লেষ মিশাইয়া ইঙ্গিতে ও স্পষ্ট ভাষণে সেগুলি বিশ্লেষণ ও ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সব দোষত্রুটি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লেখকের ভাষার ধার আছে, ব্যঙ্গোক্তির তীক্ষ্ণতা সোজা মর্ম্মস্থানে আঘাত করে—এবং বাস্তব অনুভূতিও লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবের মধ্যে কল্পনার যথেচ্ছ প্রসার ঘটাইয়াছেন লেখক—যেগুলি উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাহুল্য বলিয়া বোধ হয় না। পত্রের বর্ণনাংশে যে ত্রুটি বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে সেটি এই যে, যে সমস্ত ঘটনা দ্রষ্টার অগোচরে ঘটিতেছে—প্রত্যক্ষদর্শনের হুবহু বর্ণনাতে তাহা ভারাক্রান্ত। ইহা রসাভাসের লক্ষণ।

লেখক লালা মিঞা ও মালতীকে লইয়া স্বপ্নজাল বুনিয়াছেন। সুরাজপুর ও রাজপুরের সীমারেখা-চিহ্নিত দু'ফুট চওড়া খাদটি এদের দেশ-কাল-ধর্ম্ম অতিক্রান্ত প্রেমের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে কিনা সে ভবিষ্যদ্বাণী আজিকার দিনে সম্ভব নয়। কিন্তু কল্পনার জগতে লালা মিঞার মত নায়কেরা আশা-আশ্বাসহীন বর্ত্তমানকে যে খানিকটা উদ্ভাসিত করে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। না-পত্র না-উপন্যাস জাতীয় এই রচনায় মধ্যে বলিষ্ঠ একটি ভঙ্গী আছে—ব্যক্তিনিরপেক্ষ হইলে যাহার প্রকাশ অসাধারণ বলিয়া স্বীকৃত হইত। ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিচারের প্রধান বাধা অবশ্য স্ব-সম্পর্কিত (ব্যক্তি, জাতি বা ধর্ম্মগত) ক্ষয়ক্ষতির উত্তেজনা। আকস্মিক আঘাতে সুকুমার বৃত্তিগুলি আহত হইলে—চিন্তার কেন্দ্রস্থানটি বিচলিত হইবেই এবং রঙের পোঁচ এ সব ক্ষেত্রে গাঢ় হইয়াও থাকে। রচনায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থাকিলেও—বাস্তব-নিষ্ঠা সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই। লালা মিঞারা শরৎচন্দ্রের ভাষায় কথা বলিলে, কিংবা মালতীরা রবীন্দ্রনাথের নায়িকাদের মত বিতর্ক তুলিলে পত্রের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বেমানান বোধ হয়। সঙ্কীর্ণ উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সেই কথা। অবশ্য আশাবাদের

যাহা হউক, পাকিস্থানের পত্র নাটকের রস-উপভোগকে বঞ্চিত করিবে না। স্পষ্ট কথা—বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে প্রকাশ করার কৃতিত্ব লেখকের আছে, এবং বাংলা সাহিত্য ভবিষ্যতে তাঁহার কাছে অনেক কিছু আশা করিতেছে।

প্রচ্ছদপট প্রশংসার্হ।

কালের যাত্রা—শ্রীযতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—দেড় টাকা।

স্বর্গধামে একরাত্রি, মাটির মায়া, ভবিতব্য, অসতী, কেবলের প্রেম, কালের যাত্রা, হরুলুলু কিংস্ লিমিটেড প্রভৃতি দশটি গল্প এই সংগ্রহে আছে। কয়েকটি গল্পে বাস্তবের ব্যথা ও কল্পনার মায়াজাল বোনা হইয়াছে এবং কয়েকটিতে লঘু পরিহাসের চেষ্টা আছে। বর্ত্তমান কালের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে না পারিলে জীবন যে দুর্ব্বহ হইয়া উঠে—কালের যাত্রা গল্পে এই তথ্যটি পরিস্ফুট হইয়াছে। বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে লেখকের কৃতিত্ব দেখা যায়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। নালন্দা প্রেস, ১৫৯-৬০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা।

বইখানির উপযুক্ত নামকরণই হইয়াছে, কেননা দেশে যাঁহারা সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী হইবার এবং তাঁহাকে অতি নিকটে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগলাভ করিয়াছিলেন তাঁহারাও দেশ হইতে দূরান্তরে পূর্ব্ব-এশিয়ার অপূর্ব্বকর্মী নেতাজীর বিরাটত্বে অভিভূত হইয়া পড়েন। নিকটের এবং দূরের সুভাষচন্দ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য যে নাই গ্রন্থকার ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। দেশবন্ধুর অনুগামীরূপে যে সুভাষচন্দ্রের উন্মেষ হইয়াছিল পূর্ণবিকশিত নেতাজীরূপে পূর্ব্ব-এশিয়ায় এবং পূর্ব্ব-ভারতের আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তে তাঁহাকেই আমরা দেখিতে পাই। গ্রন্থকার কলিকাতা বিদ্যাপীঠের কর্ম্মী হিসাবে এবং অন্যান্য নানা সূত্রে সুভাষচন্দ্রের সাহচর্য্যলাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সুকবি এবং সুলেখক। তাঁহার তুলিকায় দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র এবং কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের প্রথম ভাগ অভিজ্ঞতাপ্রসূত রচনা বলিয়া শেষার্দ্ধ অপেক্ষা আমাদের অধিক আকৃষ্ট করে। শেষার্দ্ধে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এবং নেতাজী সম্বন্ধে উদ্ঘাটিত তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুভাষচন্দ্রের দুইখানি পত্রের অনুলিপি, তাঁহার লেখা 'তরুণের আহ্বান', 'দলাদলির হোক অবসান' এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ' পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। নেতাজীর কথা যতই শুনি ততই শুনিতে আগ্রহ হয়। এই সুলিখিত সুবৃহৎ গ্রন্থখানি পাঠকের আকর্ষণের বস্তু হইবে।

চৌধুরীদের বৌ—শ্রীনীহারকুমার পালচৌধুরী। প্রকাশক—শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৩, জোড়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বইখানি নাটিকা। চৌধুরী-পরিবারে জমীদারী লইয়া দুই ভাইয়ে মামলা বাধিয়াছে। মুখ দেখাদেখি নাই। বড় ভাইয়ের শ্বশুর এটর্ণি। তিনিই এ মামলার মূল। ছোটর পক্ষ বড়-বৌকে সাক্ষী মানিয়াছে। বড় বৌ মৃণাল মিথ্যা বলিবে না। সাক্ষ্য না দিলেও বিপদ, কেন না তাহাতে মামলার রায় ছোটর পক্ষেই যাইবে। ছোট-বৌ মিনতি শিক্ষিতা মেয়ে। দেশের মন্দিরে ছেলের চুল দিতে গিয়া সে দেখিল মামলার ফলে চৌধুরীদের কীর্ত্তি লুপ্ত এবং জমীদারী ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। মিনতি ফিরিয়া আসিয়া স্বামী-সহ বাড়ী গিয়া স্নেহময়ী বড়-জা মৃণালের কাছে বলিল, "তুমি নাকি সাক্ষ্য দিতে রাজী হয়েছ দিদি?" মৃণাল বলিল, "ভুলে গেছি ছোট-বৌ, চৌধুরীদের বড়-বৌ সাক্ষ্য দেয় না।" মিনতি বলিল, "মামলা আমরা তুলে নিয়েছি দিদি। আমরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।" তার পর দুই ভাইয়ে মিলন হইয়া গেল। এইটুকু গল্পাংশ। এই বিষয়বস্তু লইয়া লেখক চৌধুরীদের দুই বৌয়ের চরিত্র নাটিকায় চিত্তাকর্ষকভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

বাংলার আধুনিক গল্প—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত। ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী, ২১৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

পুস্তকখানি সঙ্কলনগ্রন্থ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রমেশচন্দ্র সেন, রামপদ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর রায়, জগদীশ গুপ্ত, সুশীল জানা, সবুজ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ আটাশ জন লেখকের আটাশটি ছোট গল্প ইহাতে আছে। লেখকদের মধ্যে অনেকেই খ্যাতনামা এবং অনেকগুলি গল্পই সুপাঠ্য। আজকাল কয়েকখানি গল্পসঙ্কলন বাহির হইয়াছে। কোনটির অপেক্ষা ইহা অল্প মনোরম নহে। বইখানি হইতে

[illegible] হইয়া যায়। চন্দ্রবাবুর বয়স যখন চোদ্দ বৎসর তখন তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হন, কিন্তু দারুণ দুর্দৈবের মধ্যেও তিনি হতাশ না হইয়া কুড়ি বৎসর বয়সে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও ভগবানে অটুট নির্ভরতা সম্বল করিয়া একটি সামান্য চাকুরী লইয়া রেঙ্গুন বন্দরে উপনীত হন এবং সেখানে ভাগ্যান্বেষণে সদাজাগ্রত থাকিয়া প্রথমে আধুলি মাত্র সম্বল অবস্থা হইতে ক্রমে বর্মার নানা লাভজনক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত হইয়া শেষে আড়াই লক্ষাধিক টাকার মালিক হন এবং তখনও তাঁহার কর্মক্ষমতা অটুট থাকে। যাঁহারা ঘটনাবহুল উপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন বইখানি তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

চলচ্চিত্র—শ্রীবীরেন দাশ। ভারত বুক এজেন্সী। ২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

চলচ্চিত্রের টেকনিক অথবা কলা-কৌশল সম্বন্ধে সাধারণের বিশেষ কিছুই জানা নাই। এ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় খুব বেশী আলোচনাও হয় নাই। পর্দায় যে ছবি দেখিয়া দর্শকেরা আনন্দলাভ করে তাহার ভিতরকার খবর জানিবার জন্য তাহাদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বীরেনবাবুর চলচ্চিত্র হইতে সেই কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে এবং সিনেমার ছবি কি করিয়া তৈরি হয় সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মিবে। পুস্তকখানিতে লেখকের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও জটিল বিষয়কে গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা—এ দুয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ-প্রণালী, ডকুমেন্টারি বা শিক্ষামূলক চিত্র, ছোটদের উপযোগী চলচ্চিত্র ও প্রদর্শনী, চলচ্চিত্রের ইতিহাস, সোভিয়েট চলচ্চিত্র, মস্কো চিত্র নাট্য ষ্টুডিয়ো ইত্যাদি, চলচ্চিত্রের বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বাংলাভাষায় সিনেমা সম্বন্ধে দুই একখানা বই আছে বটে, কিন্তু উহার ব্যবহারিক দিক লইয়া এমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক আলোচনা অন্য কোন পুস্তকে নাই। যে সকল নূতন গল্প-লেখক সিনেমার গল্প লিখিয়া অর্থ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিতে চান তাঁহারা এই পুস্তকে অনেক উপদেশ পাইবেন।

কয়েকটি বিদেশী গল্প—শ্রীগোপাল ভৌমিক। সরস্বতী লাইব্রেরী। সি ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিঃ। মূল্য ২৸০ আনা।

শ্রীযুক্ত গোপাল ভৌমিক বর্ত্তমান পুস্তকে ষোলটি বিদেশী গল্পের অনুবাদ করিয়া বাঙালী পাঠকপাঠিকাদের রসপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে ইউরোপ আফ্রিকা এবং আমেরিকা এই তিনটি মহাদেশেরই কতকগুলি ভাল গল্প একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ছাড়া ইহাতে প্যালেষ্টাইনের একটি ইহুদী গল্প, দক্ষিণ আফ্রিকার একটি গল্প এবং আমেরিকার একাধিক গল্প আছে। লেখক অনুবাদকে মূলানুগত করিবার জন্য সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি গল্পগুলিকে "ভাবান্তরিত করিয়াছেন, রূপান্তরিত করেন নাই।" পুস্তকটিতে আলেকজাণ্ডার কুপ্রিন, শেখভ, ষ্টেইনব্যাক প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের মাত্র চারিটি গল্প স্থান পাইয়াছে, বাকী লেখকেরা এদেশে তত পরিচিত নহেন—কিন্তু তাঁহাদের রচনায় প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রহিয়াছে। যোসে শিল্যানপ্পির লেখা লতিকা নামক গল্পটি শুধু এই গল্পসংগ্রহের নহে, বিশ্ব-সাহিত্যের একটি সেরা গল্প বলিয়া গণ্য হইবে। স্বল্প দু'একটি কথায় ইহাতে যে বেদনা-করুণ চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা পাঠকের মনের পটে চিরন্তরে আঁকা হইয়া যায়। নিপুণ জহুরীর মত গোপালবাবু বিশ্ব-সাহিত্যের কতকগুলি উজ্জ্বল মণিরত্ন খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়া বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। এজন্য তিনি গল্প রসিকমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

ডক্টর মতিলাল দাশ

শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্র। ডাঃ দাশ এম. এ পাস করিয়া তিন বৎসর অধ্যাপকতা করেন, পরে ১৯২৯ সালে মুন্সেফ হন। ১৯৩৬ সালে তিনি ইউরোপের বিচার-পদ্ধতি অনুশীলন ও পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি-কেন্দ্রে ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্মধারা সম্বন্ধে নানাবিধ বক্তৃতা করেন। ডাঃ দাশ একজন সাহিত্যিকও বটেন। বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি পাঠকমহলে সুপরিচিত হইয়াছেন।

হেমন্তকুমারী দেবী

যশোহর মাগুরার অন্ধ ঔপন্যাসিক ও স্বদেশসেবক পরলোকগত যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের পত্নী এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্যের মাতা হেমন্তকুমারী দেবী গত ১লা আশ্বিন হুগলী চাপদানীতে ৮০ বৎসর বয়সে লোকান্তরিতা হইয়াছেন। স্বদেশপ্রীতি, দানশীলতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা প্রভৃতি সদ্গুণাবলীর জন্য তিনি বহু লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলনে তিনি স্বামীর পাশে দাঁড়াইয়া কাজ করিয়াছিলেন। মহম্মদপুরে অনুষ্ঠিত সীতারাম উৎসবেও তিনি যদুনাথের কর্ম্মসঙ্গিনী ছিলেন। এমনি ভাবে তিনি সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা সম্পাদন

হেমন্তকুমারী দেবী

করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশপ্রেম বাংলার নারীদের অন্তরে প্রেরণার সঞ্চার করিবে।

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু

অশোক ও কুণাল

শ্রীরণবীর সকসেনা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

৪৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনেতা

গত মাসে দুই জন রাষ্ট্রনেতার জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে, প্রথমে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ৭৪তম জন্মোৎসব, পরে পণ্ডিত নেহরুর ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষে। এই দুই জন এখন ভারত-রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ পদাধিকারী এবং আমাদের রাষ্ট্রনায়ক। বর্ত্তমানে ইঁহাদেরই বুদ্ধিমত্তা ও পরিচালনার উপর ভারত-রাষ্ট্রের প্রগতি ও পুষ্টি নির্ভর করে। উভয় উৎসবে সমস্ত দেশবাসী ইঁহাদের দীর্ঘজীবন, অটুট স্বাস্থ্য ও শক্তি কামনা করিয়াছে এবং আমরাও তাহাতে যোগদান করিতেছি।

এই দুই জনই বাংলার বাহিরের লোক এবং দুই জনই বাংলার সহিত বিশেষ পরিচয় রাখেন নাই। পণ্ডিত জবাহরলাল তো তাঁহার এক পুস্তকে বাংলা সম্পর্কে অজ্ঞতা স্বীকারই করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি এক বক্তৃতায় সর্দ্দার বল্লভভাইও বাংলার সম্পর্কে জ্ঞানের বিশেষ অভাব দেখাইয়াছেন। রাষ্ট্রচালকের পক্ষে কোনও প্রদেশ সম্পর্কে অজ্ঞতা বা ঔদাসীন্য বিচক্ষণতার পরিচায়ক নহে। আমরা আশা করি, তাঁহারা দুই জনেই অদূরভবিষ্যতে তাঁহাদের এই জ্ঞানের অভাব দূর করিতে সমর্থ হইবেন। বাংলাদেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলদায়ক এ কথা তাঁহারা না বুঝিলে বাংলা তথা ভারত-রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ বিপৎসঙ্কুল হইবে।

বাংলার দিক হইতে আমাদের বুঝা প্রয়োজন যে, আমরা কাহারও নিকট সাহায্য বা সহানুভূতিপ্রার্থী হইয়া যত দিন থাকিব তত দিন আমাদের আশা-ভরসা কিছুমাত্র থাকিবে না। যদি আমরা নিজ শক্তিবলে আমাদের দাবি আদায় করিতে পারি তবেই আমাদের মঙ্গল, নতুবা নহে। বাংলার যুবকদের ভবিষ্যৎ ক্রমেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, তাঁহাদের যদি চেতনা এখনও না হয়, যদি এখনও তাঁহাদের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার গতি রুদ্ধ না হয়, তবে তাঁহারা দাঁড়াইবেন কোথায়? পরের উপর দোষ দিয়া মনকে হয়ত তুষ্ট করা যায়, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন চলে না। একথা তাঁহাদের বুঝিবার সময় হইয়াছে। তাঁহারা একথা না বুঝিলে বাংলা চিরদিন অন্য প্রদেশের নিকট তাচ্ছিল্যের বস্তু হইয়া থাকিবে।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন

ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গের, বিশেষ করিয়া পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অবিবেচনার ফলে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্নটাকে আজ একটা সমস্যায় পরিণত করা হইয়াছে। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ভাবপ্রবণ বলিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তায় মাঝে মাঝে যে অসংযমের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা আমাদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে। সর্দ্দার বল্লভভাইয়ের এই দুর্ব্বলতা আছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। কিন্তু তিনিও মুখের লাগাম খুলিয়া দিয়াছেন। নাগপুরের একটি বক্তৃতায় তিনি প্রাদেশিকতার নিন্দা করিতে গিয়া বাংলাদেশকে টানিয়া আনিয়াছেন—"বাংলাদেশে যাও, তথায় দেখিবে বিহার-বাংলা, আসাম-বাংলার ঝগড়া।" সর্দ্দারজী কেন তাঁহার ঘরের কাছের দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টি দিতে পারিলেন না, তাহার কারণ আমরা জানি না। সংযুক্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশ গঠন লইয়া যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, বোম্বাই নগরী সংযুক্ত মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে কিনা এই বিষয়ে গুজরাটি-মারাঠীর মধ্যে যে বিতণ্ডার উদয় হইয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে নাগপুরের শ্রোতৃবর্গ ব্যাপারটা অধিক বুঝিতে পারিতেন। সে যাহাই হউক, এই বিষয়ে শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালা "হরিজন" পত্রিকার ৩১শে অক্টোবর (১৪ই কার্ত্তিক) সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে প্রশ্নটাকে অকারণ জটিল করা হইতেছে এই কথাটাই স্পষ্ট হইয়া উঠে। নিম্নে তাহা তুলিয়া দিলাম:

"মহারাষ্ট্রপ্রদেশ গঠনের বিষয়ে ও তাহার সঙ্গে বোম্বাই শহরের কি সম্পর্ক হইবে সে বিষয়ে ত মনে এবং ধ্বনিতে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা যাইতেছে। ইহা লইয়া এত উত্তেজনা ও বাদানুবাদ হইতেছে কেন তাহা আমি বুঝিতে পারি না। শেষ পর্য্যন্ত যাহাই হোক না কেন প্রদেশ ত আর পাকিস্থান বা লঙ্কার মত স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়াইতেছে না, অথবা কোন বিশেষ প্রদেশের অধিবাসী

না হইলেও যে কোন ভারতীয় সেই প্রদেশে বসবাস করার অধিকার হইতে বিচ্যুত হইতেছে না। কোন প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট এইমাত্র বলিতে পারে যে, যে সকল লোক সেখানে বসবাস করিতে চায় বা তাহার পৌর কার্য্যকলাপে অংশ লইতে চায় তাহাদের অফিস-সংক্রান্ত চিঠিপত্র বা কথাবার্ত্তায় ঐ প্রদেশের ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বোম্বাই শহর যদি প্রস্তাবিত মহারাষ্ট্র প্রদেশের অন্তর্ভুক্তই হয় তাহা হইলেও বোম্বাই-এ এখন যে সকল ভারতীয় বাস করিতেছে তাহাদের সেখান হইতে তাড়ানও যাইবে না কিংবা তাহাদের বিদেশী বলিয়া গণ্যও করা হইবে না। কেবল এই পর্যন্ত দাবী হইতে পারে যে কালক্রমে তাহাদের মারাঠী ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন গায়কোয়াড় ও বরোদা, সুরাট এবং আহমদাবাদের মহারাষ্ট্রীয়েরা গুজরাটি গ্রহণ করিয়াছে। তাহা কথা খুব কঠিন নয়।"

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই ভাবে এই কথাটাকে বুঝিতেছেন না কেন, তাহা দেশের লোকের জানা প্রয়োজন। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা চীৎকার তুলিয়াছেন "সর্ব্বনাশ হইল; সাম্প্রদায়িকতার কল্যাণে যেমন ভারত-বিভাগ হইয়াছে, সেইরূপ ভাষাগত পার্থক্যে (প্রাদেশিকতায়) ভারত-রাষ্ট্র ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িবে।" এই চীৎকারের পিছনে কোন যুক্তি আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বিহার-বাংলার বিতণ্ডাটার উল্লেখ করিতে চাই। ১৯১২ সালে যখন বিহার প্রদেশ সংগঠনের প্রয়োজনে কয়েকটি বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্চল বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হয়, তখন বিহার প্রদেশের নেতৃবর্গ জানিতেন যে এই ব্যবস্থা বেশী দিন টিকিতে পারে না। বিহারের প্রয়োজন ফুরাইলে, রাজস্বের প্রয়োজন ফুরাইলে, এই অঞ্চলগুলি বাংলার কোলে ফিরিয়া আসিবে। ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে বিহারের নেতৃবৃন্দ এই প্রত্যর্পণের দাবীটা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৯৩১ সালে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ মানভূম জেলা সম্মেলন উপলক্ষে সভাপতিরূপে একটি প্রস্তাব পেশ করেন; তাহার মধ্যে এই স্বীকৃতি ছিল যে মানভূম জেলার বঙ্গভাষা-ভাষী লোক-সমষ্টির সংখ্যা শতকরা ৮৯ জন। আজ বিহারের নেতৃবর্গ এই সব কথার উপর ধামা-চাপা দিবার উদ্দেশ্যে এমন একটা চীৎকার তুলিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় শাসকবৃন্দ পর্য্যন্ত ভড়কাইয়া গিয়াছেন; বাংলার ন্যায্য দাবি স্বীকার করিয়া লইতে সাহস পাইতেছেন না। কারণ তাঁহারা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বিরক্ত করিতে পারেন না।

গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় কংগ্রেসের বিধানে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ সংগঠনের ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছিল; সেইজন্যই এতগুলি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসের মানচিত্রে দেখা দিয়াছে। ইংরেজের আমলে যে প্রদেশ বিভাগ হইয়াছিল, কংগ্রেস প্রদেশের সংখ্যা তাহার দ্বিগুণ হইতে বেশী। এই কংগ্রেসী বিধানকে অবলম্বন করিয়া ভারত-রাষ্ট্রের প্রদেশ বিভাগ অতি সহজেই হইতে পারে। সেই কার্য্য আরম্ভ করিবার পথে কোন বাধা নাই, এবং আজ যে বাধা দেখা দিয়াছে তাহার সৃষ্টি-কর্ত্তা পণ্ডিত জবাহরলাল ও সর্দার বল্লভভাই। কিশোরলালজী দেখাইয়াছেন এই কাজ কত সহজ, এবং আমরা এখনও আশা করি যে ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারবৃন্দ এই সহজ কথাটা বুঝিবেন। না হইলে তাঁহাদের ভাগ্যে অনেক দুর্গতি আছে; অথাদ সলিলে তাঁহাদের ডুবিয়া মরিতে হইবে। দেশের লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগের বিরুদ্ধে নেহরু-প্যাটেলও বেশী দিন টিঁকিয়া থাকিতে পারিবেন না।

বাঙালী-অবাঙালী

খণ্ডিত বাংলায় বাঙালীর আত্মরক্ষার চেষ্টাকে বাংলার বাহিরে এক শ্রেণীর লোক অবাঙালী বিতাড়ন বলিয়া প্রচার করিতেছেন এবং বাংলাদেশেই কেহ কেহ ইহাকে প্রাদেশিকতা মনে করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইতেছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থ যাহাদের সর্ব্বস্ব তাঁহাদের পক্ষে ইহা সাজে, তাঁহাদের পক্ষে এই মনোভাব সম্ভবও বটে। ভারতবর্ষের বিশেষ একটি প্রদেশ সকল প্রদেশের ভাগ্যান্বেষীর শিকার-ক্ষেত্র হইয়া থাকিবে, তাহাতে আপত্তি করিলেই উহা হইবে ঘোরতর জাতীয়তা-বিরোধী কাজ—এইটাই যেন বাংলার নিয়তি হইয়া দাঁড়াইতেছে। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালীকে স্বাবলম্বী হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। আজও বাঙালী কাপড়ের জন্য মাড়োয়ারীর, তেলের জন্য যুক্তপ্রদেশের, দুধের জন্য বিহারীর, ঘিয়ের জন্য বোম্বাইয়ের, এবং জীবনযাত্রার অনুরূপ বহু অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য ভিন্ন প্রদেশের মুখাপেক্ষী। যানবাহনের জন্য বাঙালী পাঞ্জাবীদের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার প্রথম ফলস্বরূপ বাঙালীকে প্রত্যেকটি ভেজাল খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে হইতেছে। ঘিয়ের নামে দালদা, সরিষার তেলের নামে বিষাক্ত তারামিরা বীজের তেল, দুধের নামে মিল্ক পাউডার, এরারুট এবং ময়লাজলের মিকশ্চার ইত্যাদি সেবন করিতে হইতেছে। এই উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া অবাঙালীরা বাংলাদেশ হইতে কি পরিমাণ অর্থ দেশে পাঠাইতেছে পোষ্টাপিসে কিছুক্ষণ দাঁড়াইলেই তাহা বুঝা যাইবে। আগে যাহারা দশ বিশ টাকা মনি অর্ডারে পাঠাইত এখন তাহারাই তিন চার পাঁচ শত টাকা ইন্সিওর করিয়া পাঠায়। বাঙালী স্বাবলম্বন এবং

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য এই টাকাটা দেশে রাখিবার চেষ্টা করিলে প্রাদেশিকতা কিরূপে হয় তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

সর্দার প্যাটেল নাগপুরের বক্তৃতায় বাঙালীর উপর কটাক্ষ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে বাঙালীরা শিখ ট্যাক্সিওয়ালাদের তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ট্যাক্সিওয়ালাদের এক সভায় বক্তৃতা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যেন পাঞ্জাবী-বাঙালীতে একটা শত্রুতা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার জন্য বাঙালীই প্রধানতঃ দায়ী। শ্রীসন্তোষ মুখার্জি মোটর ভেহিকেল আপিস হইতে অপসারিত হওয়ার পর কলিকাতার রাজপথে ট্যাক্সি ও বাসচালকদের ব্যবহার কিরূপ দাঁড়াইয়াছে সে সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা এই বিরোধের মূল কারণ বুঝিতে পারিবেন। ইহাদের সংখ্যা বেশী নয়, কিন্তু প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোকের সংস্পর্শে ইহাদিগকে আসিতে হয়। কাজেই এক জন পাঞ্জাবীর দুর্ব্যবহারে বহুসংখ্যক বাঙালী ক্ষুব্ধ হয় এবং ইহা হইতেই একটা বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। মিটারের উপর অতিরিক্ত দাবী, অল্প দূর যাইতে না চাওয়া প্রভৃতি ট্যাক্সিচালকের দোষ। কিন্তু বাস-চালকদের দোষ অতি মারাত্মক। ট্রামের সহিত ইহাদের যেন একটা মজ্জাগত বিরোধ, কোন-না-কোন প্রকারে ট্রামের গতিরোধ করিতে পারিলেই ইহাদের আনন্দ। ট্রাম আটকাইয়া বাস চালানো রীতিমত রেওয়াজ হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি একটি শোচনীয় ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সার্কুলার রোডে মির্জাপুরের মোড়ের একটু আগে উত্তরগামী একটি ট্রামকে থামিতে বাধ্য করিবার জন্য উত্তরগামী একটি বাস ট্রামের ডান দিক হইতে রাস্তার বাম দিকে যাওয়ার জন্য তীব্রগতির উপর অকস্মাৎ বাম দিকে মোড় ফিরে। বাসের দরজায় একটি লোক বাহিরে ঝুলিয়াছিল। সংঘর্ষ এড়াইবার এবং লোকটিকে বাঁচাইবার জন্য ট্রাম তৎক্ষণাৎ থামে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও লোকটি ট্রামের সহিত ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া যায় এবং গুরুতররূপে আহত হয়। ট্রাম না থামাইতে পারিলে লোকটি চূর্ণ হইয়া যাইত। রাস্তার ডানদিক এবং সম্মুখ সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল; নিছক চলতি ট্রাম থামিতে বাধ্য করা ছাড়া বাসটির এই দ্রুত মোড় ফিরানোর কোন কারণ ছিল না। বাসের নম্বর এক জন কনেষ্টবল টুকিয়া লয় এবং ট্রামের দুই জন যাত্রী সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য নাম-ঠিকানা দেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এক জন বাস-চালকের দোষে এরূপ একটি ঘটনা ঘটিল, কিন্তু ট্রামের যাত্রী এবং স্থানীয় বহু লোকের মন ইহাতে পাঞ্জাবীদের উপর বিষাইয়া রহিল। ট্রাম আটকাইবার জন্য রাস্তার মাঝখানে বাস থামাইয়া যাত্রী লওয়া ও নামানো মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক; কিন্তু সমানে ইহাই চলিতেছে। মোড়ে মোড়ে আকণ্ঠবোঝাই বাস পর্যন্ত অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড় করাইয়া আরও যাত্রী আহ্বান এবং তার পর বেপরোয়া ছুটিতে গিয়া দুর্ঘটনা ঘটানো আজকাল খুব বেশী আরম্ভ হইয়াছে। গরমের দিনে বিশেষভাবে এই একটি ব্যাপার লইয়া প্রায় প্রত্যেক বাসে ঝগড়া হয় এবং বাঙালী যাত্রীরা ইহার জন্য চালক পাঞ্জাবী সমাজকে আশীর্ব্বাদ করে না ইহা নিশ্চিত। পুলিসের তরফ হইতে মোটর ভেহিকেল এবং হেডকোয়ার্টাসের ট্রাফিক বিভাগ এই অত্যাচার বন্ধ করিতে পারে, কিন্তু দুইটিতেই এত অযোগ্য লোক বসানো হইয়াছে যে নালিশ করিয়াও কোন ফল হয় না এবং ট্যাক্সি ও বাসওয়ালারা ইহা বুঝিয়া লইয়াছে বলিয়াই এত উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার পাঞ্জাবী সমাজপতিরা অগ্রসর হইয়া এটা বন্ধ করিলে পাঞ্জাবী-বাঙালী বিরোধ অল্প দিনে দূর হইয়া যাইবে। বাঙালী এই ক্ষেত্রেও স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করিতেছে সত্য, কিন্তু ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে এখানে উভয়েরই স্থান হওয়া কঠিন নয়। তবে তাহার জন্য সদ্ভাব আবশ্যক। পঞ্জাবকে বাঙালী চিরদিন বন্ধু মনে করিয়াছে, কিন্তু প্রতিদানে অনেক সময় যাহা পাইয়াছে তাহাকে ঠিক মিত্রতা বলা যায় না।

কলিকাতায় দুর্গোৎসব

দুর্গাপূজার ভাব ও ব্যঞ্জনার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা চূড়ান্ত। কলিকাতা মহানগরীতে বারোয়ারী দুর্গাপূজার যে ব্যবস্থা জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে সেই ভাবের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সেইজন্য "নব-সঙ্ঘ" পত্রিকায় ১৫ই কার্ত্তিকের সংখ্যায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় বড় দুঃখে লিখিয়াছেন: "এত বড় সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবে কে কত প্রকারে প্রতিমার সাজসজ্জা করিল, কতখানি আমোদ-প্রমোদ-কৌতুকের ব্যবস্থা করিল, প্রদর্শনী কাহার কত বড় হইল, তরুণেরা ইহা ব্যতীত দেশের ও দশের কল্যাণ করিলেন কতটুকু?" আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতার বাগবাজার, সিমলা প্রভৃতি দুর্গাপূজার আয়োজনে প্রত্যেকটিতে প্রায় বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমরা কিন্তু টাকার হিসাবের দিক দিয়া ব্যাপারটার বিচার করিতে চাই না। যে উন্মাদনা প্রকাশ আমরা এই পূজা উপলক্ষে লক্ষ্য করিয়াছি তাহা আমাদের ভাবাইয়া তুলিয়াছে। জাতির জীবনে উৎসবের প্রয়োজন আছে; জাতির মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য, গতানুগতিক জীবনে পরিবর্ত্তন আনিবার জন্য দুর্গাপূজার মত উৎসবের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ দেখাইয়া গিয়াছেন যে তাঁহারা মানব-মনের স্বাভাবিক বুভুক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। সেইজন্যই তাঁহারা উৎসবের উপর আধ্যাত্মিকতার ছাপ দিয়া জাতিকে বাহ্যিক উন্মাদনার হাত হইতে মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আজ আমরা সে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছি; সামাজিক উৎসবের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য তাচ্ছিল্য করিয়া কলিকাতার হিন্দুসমাজ বাহ্যিক আড়ম্বরে মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাতে কিছুমাত্র সংযম নাই। দুর্গাপূজার ভাব ও ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকিলে এরূপটি হইতে পারিত না। এর পরিণতি কোথায় তৎসম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য আমরা সমাজপতিগণের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি। ভারত-রাষ্ট্রের শাসক সম্প্রদায়েরও এই বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে। স্বাধীন ভারতে নূতন যুগের মানুষ তৈয়ার করিবার দায়িত্ব তাঁহাদের। তাহার জন্য প্রয়োজন নূতন শিক্ষার ও নূতন ব্যবস্থার। অনেক পুরাতন প্রথা বাতিল হইয়া গিয়াছে; অনেক পুরাতন ব্যবস্থা নব কলেবর ধারণ করিয়াছে; অনেক পুরাতন তন্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা স্বীকৃত হইয়াছে; পুরাতনের মধ্যে বহু চিরন্তন সত্য খুঁজিয়া বাহির করা হইয়াছে। চিন্তাজগতে ও কর্ম্মজগতের মধ্যে যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মধ্যে পড়িয়া সমাজ-মন বিভ্রান্ত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব কাহার, এই প্রশ্নই আমরা দেশের লোককে করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গে সামরিক শিক্ষা

বাঙালীর কপালে ইংরেজ-রাজ যে কলঙ্কের ছাপ—"অসামরিক জাতি"—লাগিয়া দিয়াছিল তাহা মুছিয়া ফেলিবার কোন চেষ্টা আমরা দেখিতেছি না বলিয়া প্রতি মাসে জনমতকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেছি। কেন্দ্রীয় নেহরু-সচিবমণ্ডলী যেমন দিনগত পাপক্ষয় করিয়া যাইতেছেন পশ্চিমবঙ্গের রায়-মন্ত্রিমণ্ডলীও তাহার অনুসরণ করিতেছেন। ইংরেজের হাত হইতে যে কাঠামোটা নেহরু-মন্ত্রিমণ্ডলী পাইয়াছিলেন, তাহা নাড়াচাড়া করিয়াই তাঁহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন; কাশ্মীরের রক্ষার প্রয়োজনে, "পাকিস্থান" বর্ব্বরতার হাত হইতে কাশ্মীরকে রক্ষা করিবার জন্য, ভারতের জনশক্তির সংগঠনে তাঁহারা কোন উৎসাহের সৃষ্টি করিতে পারিতেছেন না; হায়দরাবাদ রাজ্যের "রাজাকর"-বিভীষিকা দূর করিবার পর তাঁহারা যেন আরও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা গতানুগতিক জীবনের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে বাংলার ভবিষ্যতের বিষয়ে বিশেষ নৈরাশ্যের কারণ জন্মাইবেন।

সত্যই চিন্তিত হইবার কারণ আছে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল নাগপুরে গর্জ্জন করিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্থানের প্রতি যেরূপভাবে উদ্যতদণ্ড হইয়াছেন, তার প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করিতেছি। পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নুরুল আমিন ত "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী" এই প্রতি-উত্তর করিয়াছেন, এবং আমরা ভাবিতেছি যুদ্ধের এই কল্পনার মধ্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভার বিশেষ কর্ত্তব্য আছে কি? নিশ্চেষ্ট হইয়া শিখ, গাড়োয়ালী, গুর্খা, মারাঠা সৈন্যের ভরসায় নিরুদ্বেগে নিদ্রার কথা তাঁহারা কখনই ভাবিতে পারেন না। ঐ সকল প্রদেশের মধ্যে নিজস্ব শিক্ষিত সৈন্য আছে, যাঁহারা সামরিক শিক্ষালাভের পর ছুটি বা পেন্সন পাইয়াছে। উপরন্তু অনেক প্রদেশে "প্রান্তিক রক্ষীদল" হিসাবেই হাজার হাজার যুবক সামরিক শিক্ষালাভ করিতেছে। আমাদের এই প্রদেশ সীমান্তের উপর, অথচ এখানে না আছে সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত "রিজার্ভ", না আছে সুগঠিত রক্ষীদল।

সামরিক শিক্ষার উদ্যোগ-আয়োজনের জন্য যে উৎসাহ বা সাহসের প্রয়োজন তাহার অভাব বাঙালীর মধ্যে আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি না। চৌধুরী, রুদ্র, আকাশ-যুদ্ধে কৌশলী মুখার্জ্জীর মত যুদ্ধপটু সেনাধ্যক্ষ থাকিতে এই অজুহাত উঠিতেই পারে না। মাদ্রাজী সাংবাদিক কাশ্মীর রণাঙ্গনে বাঙালী সৈন্যাধ্যক্ষের উপস্থিতি ও বাঙালী সৈন্য-বাহিনীর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যবোধ করিয়াছেন। এই অসম উন্নতির কারণ সুবিদিত। তাহা দূর করিতে হইলে বাঙালী সৈন্যাধ্যক্ষকে আনিয়া বাঙালী সৈন্যকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই পথে বাধা কোথায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে তাহা আমাদের জানাইতে হইবে। সাপ্তাহিক সাংবাদিক-বৈঠকে প্রশ্নোত্তর করিয়া এই বিষয়ে দেশের লোকের অস্পষ্ট ধারণা সব স্পষ্ট করিয়া লইতে হইবে। লোকশিক্ষার ইহাও একটা অঙ্গ।

এই ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব হইবে কেন তাহা আমরা জানি না, এবং বিলম্বের সম্ভাবনা থাকিলে ততদিন আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে দেওয়া হইবে কেন? সামরিক শিক্ষার পক্ষে লোক-সংগ্রহ প্রাথমিক কর্ত্তব্য। এই উদ্যোগ-পর্ব্বের জন্যও কি সংগঠকের অভাব? বাংলাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন ও সন্ত্রাসনবাদের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এই অপবাদ অস্বীকার করিবেন। যে সংগঠনশক্তি ইংরেজের দাপটে ভাঙিয়া পড়ে নাই, তাহার সদ্ব্যবহার হইতেছে না কেন তাহা আমরা জানিতে চাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বাল্যাবস্থায় তাহার সামরিক শক্তি সংগঠন করিয়াছিলেন এক বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী-লিয়ন্ ট্রট্‌স্কী; তাঁহার সামরিক শাস্ত্রে কোন জ্ঞান ছিল বলিয়া আমরা শুনি নাই। তবুও তিনি রাষ্ট্রের কর্ণধার লেনিনের আগ্রহে এই অনভ্যস্ত কর্ত্তব্যের ভার লইয়াছিলেন। জোসেফ ষ্টালিনও এই পর্য্যায়ভুক্ত সামরিক শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। কিন্তু এই দুই জনই সোভিয়েট রাষ্ট্রের সামরিক সংগঠনের স্রষ্টা।

সুযোগ ও সুবিধা পাইলে বাঙালী বুদ্ধিজীবী বিপ্লবীও অনুরূপ অসাধ্যসাধন করিতে পারেন। সেই সুযোগ ও সুবিধা তাঁহাকে কেন দেওয়া হইতেছে না ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে আমরা তাহার একটা সদুত্তরের অপেক্ষা করিতেছি। মাঝে একবার শুনিয়াছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গের

পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার এই সংগঠন-কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। মন্ত্রী মহাশয়ের যৌবনের উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা আমাদের জানা থাকায় আশা ছিল যে এবার কাজ সত্য সত্যই দ্রুত অগ্রসর হইবে। কিন্তু যেরূপে সমস্ত কাজ পিছাইয়া যাইতেছে তাহাতে আমাদের সমস্ত ভরসার বনিয়াদ শিথিল হইয়া গিয়াছে। অথচ এই বিষয়ে মুখ বুঁজিয়া থাকিতেও পারিতেছি না। বাঙালীর কলঙ্ক মোচনের জন্ত সামরিক বৃত্তির পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন; ভারত-রাষ্ট্রের পূর্ব্ব-সীমান্ত রক্ষার জন্ত বাংলাদেশে সামরিক বিদ্যা ব্যাপকভাবে প্রসারেরও আবশ্যক। কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় যে যুবশক্তি কর্ম্মাভাবে স্লোগানব্রতী হইয়া পড়িয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে যে ক্ষাত্র-বীর্য্য অনাদৃত শ্রেণীর মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত ধিকিধিকি জ্বলিতেছে, তাহার সংগঠনের জন্ত সুদূর দিল্লীর দিকে চাহিয়া থাকিলে বাঙালী কোন মন্ত্রিমণ্ডলীকে ক্ষমা করিবে না। আর একবার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে এই কথাটাও মনে রাখিয়া চলিতে অনুরোধ করিতে চাই যে, যে মন্ত্রীর উপর এই কাজের ভার তিনি দিয়াছেন তাঁহার অন্ত ভার লাঘব করিয়া হউক বা যে প্রকারে হউক এই সামরিক শিক্ষার দ্রুত প্রগতির দিকে তাঁহার একান্ত চেষ্টার পথ যেন মুক্ত রাখা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নতিবিষয়ক পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্ত নানাবিধ পরিকল্পনা সরকারী দপ্তরখানায় নানা বিভাগের আলমারীতে জমা রহিয়াছে; উন্নতিকামী অনেকের পরিকল্পনা সেই স্থানে আসিয়া জমা হইতেছে। এক দামোদর উপত্যকার উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাড়া আর কোনটি হাতে লওয়া হয় নাই, এখনও কাগজের খাঁচড়ের অবস্থায় তাহা আছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে একটি কথা মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলীর মাথায় বসিয়া আছেন এক জন বিচক্ষণ ডাক্তার; পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্ব-অঙ্গে ব্যথা দেখিয়া কোথায় ঔষধ দিবেন, তাহা ভাবিয়া তিনিও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন। আর অনেকগুলি মন্ত্রীপ্রবর "নোকরসাহীর" (hureaucracy) কেতাদুরস্ত ফাইলের উপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখিয়া, সংক্ষিপ্ত নাম দস্তখত করিয়া দিন কাটাইতেছেন। তাঁহারা "নোকরসাহীর" চোখে দেখেন, তাহাদের কানে শুনেন, নিজের কোন পরিকল্পনা আছে বা তাহার পক্ষে উৎসাহ আছে, কাজ দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দুই-একটা পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। ১৯৪৪ সাল হইতে হরিণঘাটার বাংলাদেশের দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটি "খাটাল" প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ হয়; এই চারি বৎসরে সেই স্থানে একটি গরুও যায় নাই। খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বাকি এই বিষয়ে একটা কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশপত্র সরকারী দপ্তরখানার পেশ করিয়াছিলেন; তাহা আলোচনার পর্য্যায়ের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। অথচ বোম্বাই প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলী অনুরূপ একটা পরিকল্পনার রূপ দিতেছেন বোম্বাই নগরী হইতে ২০ মাইল দূরে আরে গ্রামে। এই কাজে ২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে, এবং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহারা এই টাকা শোধ করিয়া দিবেন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-মন্ত্রী শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা বর্ত্তমান যুগের বিরাট্ বিরাট্ পরিকল্পনার উপর শ্রদ্ধাবান নহেন; কিন্তু এই সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কোন পরিকল্পনা আছে বলিয়া শুনি নাই, এবং সেই পরিকল্পনাকে রূপ দিবার উৎসাহ আছে, তাহার কোনও পরিচয় পাই নাই। ফলে তিনি নেতিবাচক নীতি অনুসরণ করিয়া যাইতেছেন।

এখন শিক্ষা-মন্ত্রীর কথা বলা যাউক। রায় শ্রীহরেন্দ্র চৌধুরীকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অনেক আশা করিয়া মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়াছেন অনেক কলকাঠি নাড়িয়া। কিন্তু এতদিন চলিয়া গেল তবুও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে বিশেষ ভাবে কোন বিষয়ে তাঁহার কোন উৎসাহ-আবেগ আছে, বা কোন বিশেষ পরিকল্পনার জন্ত তাঁহার বিশেষ চেষ্টা আছে। সুতরাং শিক্ষার উন্নতির জন্ত নানা পরিকল্পনা জট পাকাইয়া গিয়াছে। উচ্চশিক্ষার জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আছে; তাঁহারা চীৎকার করিয়া নিজের পাওনাগণ্ডা আদায় করিয়া লইবে। গণ-শিক্ষার ব্যবস্থার জন্ত মন্ত্রিমণ্ডলীকে বিব্রত করিবার লোক দেখিতেছি না। সুতরাং মন্ত্রীপ্রবর বুনিয়াদি শিক্ষা কমিটি ও "বয়স্ক শিক্ষা" পরিকল্পনা কমিটি এই দুইটি কমিটি নিয়োগ করিয়া দিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ স্নেহময় দত্ত সব্যসাচী বলিয়া কোন পরিচয় পাই নাই। ভাল লোক বলিয়া তিনি অজাতশত্রু হইতে পারেন; মিষ্ট কথায় সকলকে তুষ্ট করিয়া রাখিবার কৌশল তাঁহার বেশ জানা আছে। কিন্তু শিক্ষার নানা পরিকল্পনার চাপে তিনি তলাইয়া যাইতেছেন বলিয়া মনে হয়। অথচ তাঁহার বলিবার সাহস নাই যে নূতন লোকের উপর এই কর্ত্তব্য দেওয়া হউক। যে পরিকল্পনাই তাঁহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হউক, তাহা তিনি সুবোধ ও সুশীল বালকের মত মাথা পাতিয়া লইতেছেন।

মন্ত্রী মহাশয়েরও ভ্রূক্ষেপ নাই যে একজন লোক এত কাজ সুষ্ঠুভাবে করিতে পারে কিনা। "বয়স্ক শিক্ষার" কথাই ধরা যাউক। এই সম্বন্ধে কমিটি একটা রিপোর্ট দিয়াছেন শুনিয়াছি। এই রিপোর্ট প্রস্তুতিতে মুসলমান সভ্যগণের কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই, অথচ মিঃ রেজাউল করিমের মত জাতীয়তাবাদী মুসলমান এই কমিটির সভ্য আছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী "বয়স্ক শিক্ষা"র জন্ত শিক্ষকদের একটা বিশেষ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করিবার কথা; ১৫ই নবেম্বর হইতে

শিক্ষকদের শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইবার কথা ছিল। তাহার কোন হদিশ পাওয়া যাইতেছে না, অথচ মহিলা প্রতিষ্ঠান-সমূহের শিক্ষয়িত্রীগণ ছুটি লইয়া বসিয়া আছেন ১৫ই নবেম্বর নূতন পাঠ আরম্ভের জন্ম। এই গড়িমসির নানা কারণ সম্বন্ধে একটার কল্পনা করিতে পারি। "বয়স্ক শিক্ষা"র ব্যবস্থাটি কার্য্যকরী করার দায়িত্ব শিক্ষা বিভাগে ডিরেক্টরের উপর পড়িয়াছে ; তাঁর অবস্থা উপরে বর্ণনা করিয়াছি। কমিটি এই বিষয়ে অপর কোন প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করিতে পারেন নাই, যাহার সভ্যগণ "বয়স্ক শিক্ষাকে" একটা ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন বা করিতে প্রস্তুত আছেন। কমিটি প্রস্তাব করিয়াই খালাস, এবং অন্য কোন কাঁধের অভাবে ডাঃ স্নেহময় দত্তের কাঁধে গিয়া জোয়ালটা পড়িয়াছে। "নোকরসাহীর" গদাই-লস্করী চালের কথা জানিয়া শুনিয়াও কমিটি এতদপেক্ষা কোন কার্য্যকরী প্রস্তাব করিতে পারেন নাই। ফলে এই পরিকল্পনাটাও পিছাইয়া যাইতেছে।

ইহার জন্ম জনমতের নিকট দায়ী শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্র চৌধুরী। তিনি কিন্তু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পক্ষছায়ার নীচে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন। কৃষি-মন্ত্রী ও শিক্ষা-মন্ত্রীই কেবল "নোকরসাহীর" হাত ধরা নয়। তাঁহাদের সহযোগীদের অবস্থাও এইরূপ বা ততোধিক শোচনীয়। সকলেই দিন গুনিতেছেন। অতীতের নিশ্চেষ্টতার বেড়া ভাঙিবার শক্তি কাহারও নাই। যে বিপ্লবী ভাবের দাপটে ইংরেজ সরিয়া গিয়াছেন ; সেই ভাব-সম্পদ দু-এক জন ছাড়া কাহারও স্বোপার্জ্জিত নয়।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করিতে আমরা কোন আনন্দ পাই না। তবুও কর্ত্তব্যের দায়ে তাই করিতে হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার জন্ম সাহায্য, পুনর্বসতি ও সমবায়সচিব শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি সম্প্রতি একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। সম্মেলনে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি লইয়া দীর্ঘ আলোচনা হয়, কিন্তু কোন সুচিন্তিত ও সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার পরিচয় উহাতে পাওয়া গেল না। সাংবাদিক সম্মেলন বলিতে আজকাল সরকারী ঘোষণা বা মন্ত্রীমহাশয়দের পরিকল্পনা প্রচারের যে বৈঠক বুঝায়, উক্ত সম্মেলনও তাহাতেই পর্যবসিত হইয়াছে।

মাইতি মহাশয় যুক্তপ্রদেশের সমবায় ব্যবস্থার প্রশংসা করিয়া বলেন যে, তথায় বীজাগারকে কেন্দ্র করিয়া 'মাল্টি-পারপাস' সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে, বীজ সার এবং কৃষির যন্ত্রাদি সরবরাহ করা উহার কাজ। এই সমিতি গঠনে তথাকার কৃষি বিভাগ ও কংগ্রেস-কর্ম্মীরা সাহায্য করিয়াছেন একথাও তিনি বলেন। দুঃখের বিষয়, মাইতি মহাশয় তাঁহার নিজের প্রদেশের সমবায় বিভাগের কোন কৃতিত্বের বা প্রশংসাজনক কার্য্যের কথা বলিতে পারেন নাই। সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে বুঝা গিয়াছে যে, কৃষি সমবায় সম্বন্ধে সরকারের উল্লেখযোগ্য কোন কাজ নাই। মামুলী খয়রাতী সাহায্য, কৃষি-ঋণ দান এবং টেষ্ট রিলিফ ছাড়া আর কিছুই করা হয় নাই। অর্থাৎ সমবায় সমিতিগুলিতে বিপুল অর্থ ঢালা এবং সেটা সাধারণতঃ চোরের উদরপূর্ত্তি ও ভিক্ষুক-পোষণেই খরচ হইয়া গিয়াছে ; কৃষি সমবায় সমিতির প্রধান যে উদ্দেশ্য কৃষককে স্বাবলম্বী করা এবং তাহার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য দান, সে দিকে বিশেষ কোন নজর দেওয়া হয় নাই। খয়রাতী সাহায্য, কৃষি-ঋণ দান এবং টেষ্ট রিলিফ প্রভৃতি কার্য্যে সরকারী কর্ম্মচারীর উৎসাহিত হওয়ার কারণ আছে ; ইহাতে সুবিধা অনেক। প্রথমতঃ কাজ দেখাইবার ঝঞ্চাট নাই, খরচ দেখাইলেই হইল ; দ্বিতীয়তঃ, হিসাবের অঙ্ক এদিক ওদিক করিয়া দু' পয়সা হাতে আনিবার বিলক্ষণ সুযোগ আছে ; তৃতীয়তঃ, কাঁচা টাকা দাতব্য করিবার ক্ষমতা হাতে থাকায় দল পাকাইয়া মোড়লী করিবার সুবিধা, উপরওয়ালারা যেখানে নিদ্রামগ্ন সেখানে ইহাতে অসুবিধারও কোন কারণ নাই ; তার উপর যদি ইহাতে উপরিস্থ প্রভুদের আর্থিক বা রাজনৈতিক কোনরূপ স্বার্থ থাকে তবে তো কথাই নাই। সমবায় সমিতির নামে যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে তাহার গত কয়েক বৎসরের প্রকৃত হিসাব খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিলে অনেক তথ্য প্রকাশ পাইবে। ১৫ই আগষ্টের পর এটা বন্ধ হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই ; সে চেষ্টাও দেখা যায় না। যে টাকা ইহাতে অপচয় হইয়াছে তাহা দিয়া সার কিনিয়া গ্রামের মাঠে মাঠে ছড়াইয়া দিয়া আসিলে অন্ততঃ একটা বড় ফল পাওয়া যাইত, বাংলার খাদ্যাভাব ঘুচিত।

মাইতি মহাশয় ১৯৪৮ সালের ৬ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতা মহানগরীর সাংবাদিকবৃন্দকে আহ্বান করিয়া সমবায় সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বড় বড় পত্রিকা মারফত উহা প্রচারিত হইয়াছে। দুইটি স্থানের অধিবাসীদের উদ্যমের দুইটি উদাহরণও তিনি দিয়াছেন—আমাদের বিশ্বাস এরূপ উদাহরণ আরও পাওয়া যাইবে এবং সন্ধান লইলে দেখা যাইবে যে, ইঁহারা প্রায়ই সরকারী সাহায্য ছাড়া সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় সাফল্য অর্জন করিয়াছেন ; সাফল্য লাভের পর সরকারী কর্ত্তারা বাহাদুরী লইতে অগ্রসর হইয়াছেন এই মাত্র। হুগলীর কয়েকটি গ্রামে এরূপ উদ্যমের কথা আমরা জানি। সেখানে কয়েকটি গ্রামে সমবায় সমিতির চেষ্টায় ম্যালেরিয়া বিতাড়ন এবং গ্রাম পরিষ্কার আরম্ভ হইয়াছে। সরকারের নিকট ইঁহারা কোন

রূপ সাহায্য চাহিতে যাইবেন না, এই সঙ্কল্প লইয়াই ইঁহারা কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম ইঁহাদের দেখাদেখি উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে। গ্রামগুলিকে পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর এবং স্বাবলম্বী করা ইঁহাদের উদ্দেশ্য; তাহার জন্য ইঁহারা সরল এবং অনাড়ম্বর গ্রাম্য জীবনকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। সকলের আগে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং মনুষ্যত্ব; শহরের বিলাসিতা ও বৈভব জাতির পক্ষে মঙ্গলকর নহে, ক্ষতিকর—এই কথাটাই নিজেদের দৃষ্টান্ত দিয়া ইঁহারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সরকারের উচিত এই সব প্রচেষ্টার সন্ধান লওয়া এবং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ইঁহাদিগকে সাহায্য করিয়া এই সব শুভ প্রচেষ্টাকে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দেওয়া।

সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয়তার বক্তৃতা পঞ্চাশ বৎসর আগে হইয়া গিয়াছে; এখন আর তাহার প্রয়োজন নাই। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশ সমবায় সমিতিকে জাতীয় জীবনের, বিশেষতঃ আর্থিক জীবনের একটি অতি বড় অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রয়োজনানুসারে সমবায় সমিতির রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু কোন দেশই উহার মূল লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সমবায় সমিতি মানুষকে স্বাবলম্বী করিবে, পরস্পরের বিপদে পারস্পরিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিবে, সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের দ্বারা ধনী বণিক ও চোরাকারবারীর কবল হইতে সকলকে মুক্ত করিবে—খয়রাতী সাহায্যের নামে ভিক্ষুক পোষণ কেন্দ্রে পরিণত হইবে না। এ দিক দিয়া স্বাধীন বাংলার সমবায় সমিতি গত পনের মাসে এক পদও অগ্রসর হইয়াছে বা হইবার চেষ্টা করিয়াছে, মাইতি মহাশয় তাহার কোন পরিচয় দিতে পারেন নাই।

বাংলার সমবায় সমিতির উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উহার গোড়ার গলদগুলিকে দূর করিতে হইবে। প্রথমেই সমবায় বিভাগটিকে সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি হইতে পৃথক করিয়া একটি স্বতন্ত্র দপ্তরে পরিণত করিয়া আধুনিক সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এক জন কর্মঠ লোকের উপর উহার ভার দেওয়া দরকার। তারপর দরকার সমবায় সমিতির কোথায় কি ভাবে দুর্নীতি প্রবেশ করে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান এবং সর্ব্ববিধ দুর্নীতির মূল উৎপাটন। ইহা না করিয়া আমরা কেবল 'ইউনি-পারপাস' 'মালটি-পারপাসে'র জাবর কাটিতে থাকিব এবং বিশুদ্ধ সকলে এই পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।

কলিকাতা পুলিস

কলিকাতার পুলিস সম্বন্ধে আমরা অনেক অপ্রিয় মন্তব্য করিয়াছি; দেখা যাইতেছে কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতে বিচলিত হন নাই এবং আমাদের আশঙ্কাই ক্রমশঃ সত্যে পরিণত হইতেছে। কলিকাতা প্রায় অরক্ষিত শহরে পরিণত হইতে চলিয়াছে। স্বাধীনতালাভের পর আমরা আশা করিয়াছিলাম যে কলিকাতা পুলিস লণ্ডন মেট্রোপলিটান পুলিস এবং নিউইয়র্ক পুলিসের সহিত তুলনীয় হইবে; আমাদের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট বিলাতের স্কটলণ্ড ইয়ার্ড এবং আমেরিকার এফ-বি-আইয়ের সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবে। কিন্তু প্রথম হইতেই পুলিসের উচ্চতম পদগুলিতে অযোগ্য এবং দেশের বিরুদ্ধাচরণের কুখ্যাতিসম্পন্ন লোক নিয়োগ এবং শহরের ও গ্রামের পুলিস একাকার করিয়া এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহার ফলে পুলিসের যেটুকু দক্ষতা ইংরেজ আমলে ছিল তাহাও রসাতলে গিয়াছে। এখন একটা খুন বা ডাকাতির কিনারা হওয়া তো দূরের কথা, বাসার চাকরের চুরি প্রভৃতিও ধরা পড়ে না। পুলিসের এখন প্রধান কাজ হইয়াছে রাস্তায় হকার এবং গরু তাড়ানো, কলার খোসা সরানো এবং মাসে মাসে সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করিয়া নিজেদের গুণকীর্ত্তন। গত এক বৎসরে কলিকাতায় কয়টা খুন, ডাকাতি, চুরি এবং পকেটমার হইয়াছে এবং কয়টা অপরাধী ধরা পড়িয়া দণ্ডিত হইয়াছে তাহার একটা হিসাব প্রকাশ হওয়া দরকার, হইলে বর্ত্তমান পুলিসের কৃতিত্ব বুঝা যাইবে।

পুলিসের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষের যোগ্যতা নাই কিন্তু ক্ষমতালোভ আছে এবং তাহার জন্য দলাদলি অত্যন্ত বাড়িয়াছে। পুলিসে দলাদলি দেশের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। দল পাকাইবার স্বার্থে প্রিয়পাত্রদের উচ্চপদে নিয়োগ এবং উপযুক্ত লোকদের ন্যায্য দাবি অস্বীকার করা হইতেছে এবং ইহাতে পুলিস-বাহিনীর মনোবল কমিয়া গিয়াছে। প্রমোশন-প্রাপ্ত প্রিয়পাত্রেরা কাজ জানে না, শিখিয়া লইবার যোগ্যতাও ইহারা দেখাইতে পারে নাই; পুরানো দক্ষ লোকেরা ন্যায্য প্রাপ্য উন্নতিতে বঞ্চিত হইয়া কর্ম্মবিমুখ। ফলভোগ করিতেছে দেশের লোক। সর্ব্বরোগহর দাওয়াই কারফিউ প্রয়োগ করিয়া মানুষকে ঘরে আটকাইয়া শান্তিরক্ষা এক কথা, স্থানীয় তরুণ দলের সহযোগিতা অর্জ্জন করিয়া পুলিস ও স্থানীয় তরুণ দলের সহযোগিতায় অপরাধ বন্ধ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। মহরমের শোভাযাত্রা লইয়া যাহা ঘটিয়াছে গোয়েন্দা পুলিসের দক্ষতার লেশমাত্র থাকিলে অনেক আগে তাহার সন্ধান মিলিত। মহরমের মিছিলে গোলযোগ ঘটিলে তাহা রাজাবাজার হইতে মাণিকতলার মধ্যে ঘটে ইহা জানা কথা। এই এলাকার সঙ্ঘবদ্ধ তরুণ দলগুলির প্রতিনিধিদের ডাকিয়া পুলিস কমিশনার যদি তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন তাহা হইলে গোলযোগ কিছুতেই ঘটিতে পারিত না। পুলিস এখন আমাদের, সুতরাং তরুণ দলের ইহাতে আপত্তির কারণ থাকিত না।

কিন্তু তাঁহার জন্ত পুলিস কমিশনারের উপর যে শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকা আবশুক বর্ত্তমান কমিশনারের উপর নানা কারণে তাহা নাই এবং থাকিতে পারে না। তিনি নিজেও বোধ হয় ইহা জানেন এবং এইজন্তই তিনি লাঠিবাজী, গুলিচালনা এবং কারফিউ জারীর প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। স্থানীয় পুলিস অধ্যক্ষ সত্যেন মুখার্জ্জী বা অবনী গুপ্তের হাতে ক্ষমতা থাকিলে তাঁহারা ইহা পারিতেন এবং করিতেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু গত পুলিস কনফারেন্সে বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষের আশ্রিতবাৎসল্য, আত্মীয়প্রীতি এবং সাধারণ দুর্নীতিপরায়ণতার বিরুদ্ধে তীব্র ও প্রকাশ্ত প্রতিবাদ করায় পর হইতে পুলিস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সত্যেন মুখার্জি, ভাইস-প্রেসিডেন্ট অবনী গুপ্ত এবং সেক্রেটারী হিমাংশু গুপ্ত কর্ত্তাদের চক্ষুশূল হইয়া রহিয়াছেন। ফলে জনসাধারণ কলিকাতা পুলিসের সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ এই তিন জন অফিসারের আন্তরিক সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

বর্ত্তমান পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের অযোগ্যতার মূল কারণ তিনটি: (১) বেঙ্গল পুলিস হইতে প্রিয়পাত্রদের আনিয়া কলিকাতা পুলিসে ভর্ত্তি করা, তাহাদিগকে অন্তায় ভাবে প্রমোশন দেওয়া এবং তজ্জনিত বিরোধ, (২) এই দলাদলিতে এংলো-ইণ্ডিয়ানদের সাহায্য লাভের জন্ত তাহাদিগকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত সুবিধা দান এবং দুর্নীতিপরায়ণতা সত্ত্বেও উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ, এবং (৩) পানাসক্তি। তৃতীয় দোষটি ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় বৈদেশিক দূতাবাসের ভোজসভায় মন্ত একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ; ভারত-সরকার সুরাপান নিবারণী নীতি অনুসারে সমস্ত ভারতীয় দূতাবাসের ভোজসভা প্রভৃতিতে মন্তপান নিষিদ্ধ করিয়াছেন। অথচ কলিকাতার লালবাজার ঘাঁটিতে মন্তপান অবাধে চলিতেছে এবং জনসাধারণ তাহার জন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। লালবাজারে ডেপুটি কমিশনার এবং এংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জ্জেন্ট প্রভৃতির জন্ত একটি মন্ত-ভাণ্ডার আছে; তিন জন সার্জ্জেন্ট সেখানে প্রতিদিন মদ বিক্রয়ে নিযুক্ত থাকে এবং এই কাজ ইহাদের পুলিস-ডিউটির অন্তর্ভুক্ত। ঘটা করিয়া গ্রামের দুইটি ভাড়ির দোকান বন্ধ করার আগে লালবাজারের 'বার' বন্ধ হওয়া উচিত। পুলিস-মন্ত্রী কি ভাবে ইহা চলিতে দিতেছেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

হেড কোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনার এখনও বিশেষ যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই। ট্রাফিক কণ্ট্রোলের ভার তাঁহার উপর; তাঁহার আমলে রাস্তার দুর্ঘটনা কিছুমাত্র কমে নাই। আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে কলিকাতার কোন একটি ক্লাবের ম্যানেজারির ভার লইয়া সম্প্রতি তিনি দিল্লী গিয়াছিলেন। কলিকাতার দ্বিতীয় পুলিসম্যান ক্লাবের ম্যানেজারির ভার লইয়া মফঃস্বলে যান, এটা নূতন সংবাদ বটে। কনষ্টেবল সংগ্রহের ভার ইঁহার উপর। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ ইনি বাঙালী কনষ্টেবল নিয়োগ বন্ধ করিয়া হিন্দুস্থানী ভর্ত্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং চারি শতাধিক নিয়োগ ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। এটা কি কারণে ও কাহার পরামর্শে তিনি করিয়াছেন আমরা জানি না। বাঙালী কনষ্টেবলেরা যদি অযোগ্য হয় তবে যোগ্য লোক সংগ্রহ এবং কঠোর তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল। বিহারী নিয়োগের কৈফিয়ৎ স্বরূপ এই কথা বলা হইয়াছে যে বর্ত্তমান হিন্দুস্থানী কনষ্টেবলদের কিছু কিছু আত্মীয়-স্বজনকে কোর্সে লওয়া উচিত বলিয়া এই ব্যবস্থা করা হইল। পুলিস-মন্ত্রী ইহা জানেন কি না, জানিলে ইহা অনুমোদন করিয়াছেন কি না, না জানিলে কেন তাঁহাকে নিয়োগব্যাপারে এত বড় একটা পরিবর্ত্তনের কথা জানানো হয় নাই তাহা প্রকাশ হওয়া উচিত। পুলিস ট্রেনিং স্কুল, ডাকাতি দমন বিভাগ এবং পোর্ট পুলিস সম্বন্ধে যে সব সংবাদ আমাদের নিকট আসিতেছে তাহা বস্তুতঃই আপত্তিজনক। রেলে চোরাই চালান একটু কঠিন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া পোর্টে তৎপরতা বাড়িয়া গিয়াছে কি না সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া দরকার।

কলিকাতা পুলিসকে লণ্ডন বা নিউইয়র্ক পুলিসের তুল্য করিয়া গড়িবার লোক নাই, আমাদের যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহাই লইয়া কোনরূপ চলিতে হইবে এই ধারণা আমরা সমর্থন করি না। শ্রীসত্যেন মুখার্জি প্রমুখ যে সকল কর্ম্মচারী চরিত্রবল ও দক্ষতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের উপর পুলিস সংস্কার ও সংগঠনের দায়িত্ব অর্পিত হইলে কলিকাতা পুলিসের চেহারা ফিরিয়া যাইবে এ কথা শুধু আমরা নহি, শহরসুদ্ধ লোক বিশ্বাস করে। উপযুক্ত সহকর্ম্মী ও সহকারীর অভাব তাঁহাদের হইবে না; প্রয়োজনীয় লোক তাঁহারাই বাছিয়া লইতে পারিবেন।

কলিকাতায় মহরম

কলিকাতায় মহরম এবার শেষ পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে নাই। শেষদিনে বিলক্ষণ গোলযোগ হইয়াছে, পুলিস গুলি চালাইয়াছে এবং পাঁচ জন নিহত ও আশী জনের বেশী আহত হইয়াছে। অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে যায় নাই এবং ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে।

এবারকার এই গোলযোগ একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিছুদিন যাবৎ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নূতন করিয়া লোক আসা আরম্ভ হইয়াছে। ইহা লইয়া যে বাদানুবাদ চলিতেছে তাহাতে হিন্দুদের প্রতি পাকিস্থানীদের মনোভাব তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। পাকিস্থান হইতে সমস্ত হিন্দু বিতাড়িত হইবে অথচ ভারতবর্ষে যে শ্রেণীর মুসলমান গত সাধারণ নির্ব্বাচনে পাকিস্থানের পক্ষে ভোট দিয়াছে এবং

পাকিস্থান অর্জনের জন্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করিয়াছে তাহারা এখানে পঞ্চমবাহিনী-স্বরূপ বসবাস করিতে থাকিবে এটা কেহই পছন্দ করিতেছে না। সংবাদপত্রসমূহ অত্যন্ত গুরুতর জাতীয় সমস্তায় তায় এই বিষয়টিকেও এড়াইয়া চলিতে থাকিলেও ইহাই বর্তমানে কলিকাতা শহরের ঘরে ঘরে প্রধান আলোচনার বিষয়। হিন্দু-মুসলমান সমস্তার সমাধান-কল্পে ভারতবাসী ভারত-বিভাগে রাজী হইয়াছিল কিন্তু তাহা যখন হইল না, মুসলমান নিজের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল, কিন্তু ভারতের মাইনরিটি সমস্তা মিটিল না, বরং বাস্তত্যাগী রূপ আর এক প্রবল এবং নূতন সমস্তা দেখা দিয়া ভারতবাসীর স্বাভাবিক জীবনে বিপর্যায় সৃষ্টি করিল—এটা কেহই প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। পাকিস্থান যখন পাকিস্থান-খণ্ডের হিন্দুদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে না, হিন্দু বিতাড়নেই যদি সে বদ্ধপরিকর হয়, তখন পাকিস্থান গ্রহণের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ লোকবিনিময় পাকিস্থানকে মানিতেই হইবে। বর্তমানে যে একতরফা হিন্দু বিতাড়ন চলিতেছে তাহা কিছুতেই চলিতে পারে না—এইটাই এখন সাধারণ লোকের মনোভাব দাঁড়াইয়াছে এবং সর্দার প্যাটেলের সাম্প্রতিক বক্তৃতায় কতকটা এই মনোভাবই প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ 'সেকুলার' বা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইবে—এই মনোভাব তাহার বিরোধীও নহে। জাতীয়তাবাদী এবং জমিয়ৎ-উল-উলেমার মুসলমানেরা পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমরা সাদরে স্থান দিব ; পাকিস্থানে এই শ্রেণীর মুসলমানেরা চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন, তাঁহারাও ভারত-খণ্ডে চলিয়া আসিলে আমরা অভ্যর্থনা করিয়া লইব, কিন্তু পাকিস্থানের পক্ষে যে সব মুসলমান ভোট দিয়াছে এবং লড়িয়াছে তাহাদিগকে কিছুতেই স্থান দিব না—এইটাই ক্রমশঃ গণদাবীরূপে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই মনোভাব সংবাদপত্রে প্রকাশ হইতে দেওয়া হইতেছে না কিন্তু গবর্মেণ্টের ইহা অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য করা উচিত হয় নাই।

এই অবস্থায় এবার মহরম আসিয়াছে। গত বৎসর ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির করিয়াও বন্ধ করিতে হইয়াছে, এবার উহার নাম করাও সম্ভব হয় নাই—এটাও লোকে পথে ঘাটে বলিতেছে। গত বৎসর মহরমের অল্প আগে কলিকাতায় মহাত্মা গান্ধী অনশনে থাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিলের স্মৃতি টাটকা থাকা সত্ত্বেও কোন গোলযোগ হয় নাই। এবার মহাত্মা গান্ধী নাই। এই কারণে বিশেষ ভাবে গবর্মেণ্টের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। দুই বৎসর আগে লীগ আমলের শেষ মহরমে বিজ্ঞান কলেজের সম্মুখ হইতে সুকিয়া ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত লীগ-চমূর এবং লীগ-পুলিসের যে তাণ্ডব নৃত্য ঘটিয়াছিল তাহাতে অত্যন্ত নৃশংস ভাবে দুইটি বালক গুলি বিদ্ধ হইয়া নিহত হয় এবং অনেকে আহত হয়। সে স্মৃতিও একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। সে হিসাবে এই এলাকাটুকুতে খুব কড়া পাহারা রাখা উচিত ছিল। গোলযোগ ঠিক কেন বাধিয়াছিল এবং কাহারা বাধাইয়াছিল গবর্মেণ্ট তাহা বলিতে পারেন নাই, আমরাও তাহা জানি না। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই এটা উপলব্ধি করিয়াছেন যে সতর্কতার প্রয়োজন এবার খুব বেশী ছিল, তার অনেক সঙ্গত কারণও ছিল, কিন্তু কিছুই করা হয় নাই। পুলিস পূর্ব্বাহ্নে কোন সংবাদ লয় নাই এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে নাই—করিলে গোলযোগ ঘটিত না এবং ইহার জন্ত প্রধানতঃ দায়ী গোয়েন্দা-বিভাগ এবং পুলিস কমিশনার—এই অভিযোগ যাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদিগকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। অজ্ঞাত-পরিচয় দুষ্টলোকের ("unknown miscreants") ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সাফাই গাওয়া পুলিসের কাজ নয়, পুলিসের কর্তব্য সময় থাকিতে দুষ্ট লোকদের ষড়যন্ত্রের সংবাদ লওয়া এবং দুষ্ক্রিয়া নিবারণ করা। বর্তমান গোয়েন্দা বিভাগ এবং পুলিস কমিশনার পুলিসের এই প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের এবিষয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

কলিকাতা টেলিফোন-কেন্দ্রে অগ্নিকাণ্ড

অল্পদিন পূর্ব্বে টালায় জলকল অচল করিবার একটি বিশেষ চেষ্টা হয়। চেষ্টা প্রায় ফলবতী হইয়াছিল কেবলমাত্র ধ্বংসকারী দলের প্রধান চালকবর্গ তাঁহাদের অভ্যাসমত একটু আগেই সরিয়া পড়ায় তাঁহাদের চেলাচামুণ্ডেরা দ্রুত কাজ নিকাশ করিতে পারে নাই। কর্তৃপক্ষ টের পাইয়া পুলিসের দল আনিয়া ধ্বংসকারীদিগের উদ্যমে বাধা দেওয়ায় এবং ধ্বংসকারীদিগের মনে সাম্প্রদায়িক কলহের ভয় হওয়ায় ব্যাপারটা সময়মত আটক পড়ে এবং কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত চেষ্টায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মোটামুটি মেরামতি কাজ শেষ হইয়া যায়। টালায় যাহারা জল-সরবরাহ বন্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদের প্রধান চালক দুই জন বাঙালী হিন্দু এবং রাষ্ট্রবিধ্বংসে চেষ্টিত দলবিশেষের চাঁই। কর্মীরা ছিল শতকরা ৯০ জন পাকিস্থান অধিবাসী অহিন্দু। বলা বাহুল্য, গোয়েন্দা পুলিস আগে হইতে খবরও দেয় নাই এবং ঐ চালকদ্বয়কে এখনও ধরিতেও পারে নাই।

ঐ ঘটনার পূর্ব্বেই সমস্ত শহরেই পথে ঘাটে গুজব ছিল যে কম্যুনিষ্টরা প্রথমে কলিকাতার জলকল, বিদ্যুৎকল, টেলিফোন ও রেডিও বিকল করিবে, তারপর ৮ই-৯ই নবেম্বর বা তাহার কাছাকাছি কলিকাতায় প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করিবে। পুলিস বিভাগে সে খবর পৌঁছাইয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু তাহার অল্পদিন পরেই টেলিফোন বিভাগের কলিকাতা কেন্দ্রে বিষম অগ্নিকাণ্ড ঘটিল, যাহার ফলে শহরের কাজ-কারবার, শাসনরক্ষণ সকল কাজেই বিষম বাধা পড়িল এবং রাষ্ট্রের প্রায়

হয় কোটি টাকা লোকসান হইল। ঘটনা ঘটিলও অতি অদ্ভুত ভাবে। আগুন ধরিল একেবারে চারিতলায়। যে ঘরে আগুন লাগিল সেখানে ২৫ জনের একজনও রবার পোড়া গন্ধ পাইল না, হঠাৎ এক জন মাত্র দেখিল দুই হাত উঁচু আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। সে আগুন অগ্নিনির্ব্বাপক-যন্ত্রে নিবিল না ইহাও আশ্চর্য্য! অবশ্য পেট্রোল বোমা বা থারমিটভরা আধের বোমার আগুন উহাতে নিভে না। তাহার পর দমকল আসিতে অল্প দেরী হয় এবং তাহা চলিতে সামান্ত দেরী হয়। অথচ সব পুড়িয়া শেষ হইল। ইহা কি দৈবদুর্ব্বিপাকের লক্ষণ?

বাংলায় ধর্ম্মঘট

কলিকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন যাবৎ ধর্ম্মঘটের হিড়িক চলিতেছে এবং ধর্ম্মঘট এবার প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত বাঙালী কর্ম্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যাঙ্কে ধর্ম্মঘট ইহার মধ্যে ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে। রেশনের বরাদ্দ ক্রমেই কমিতেছে, ফলে বাহির হইতে খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইতেছে, খরচও বাড়িতেছে। গত পাঁচ বৎসরের দুর্ম্মূল্যতার বাজারে বাঁধা আয়ের মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারীদের দুর্দশা অতি শোচনীয় হইয়া রহিয়াছে, তদুপরি আবার এক দফা মূল্যবৃদ্ধিতে ইহারা প্রায় দিশাহারা হইবার উপক্রম হইয়াছে।

এই অবস্থার সুযোগ যাহারা লইবার তাহারা পূর্ণমাত্রায় লইতেছে এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানহীন বহু মধ্যবিত্ত পরিবার পতঙ্গের ন্যায় আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে। উস্কানিদাতাদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট এবং কম্যুনিষ্টদের সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রমিক-নেতারা রহিয়াছেন। ইঁহাদের উস্কানিতে ধর্ম্মঘট হইতেছে এবং ফলে কর্ম্মচারীদের আধপেটা খাওয়ার যে সংস্থানটুকু ছিল তাহাও নষ্ট হইতেছে। ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের আয় কম, দায়িত্ব বেশী, কাজের সময়ও বেশী, সুতরাং অসন্তোষ তাহাদের মধ্যে বেশী হইবে ইহা স্বাভাবিক। অনেকগুলি ব্যাঙ্ক অল্পদিনের মধ্যে বন্ধ হওয়ায় বেকার ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং ইহাতে ব্যাঙ্ক মালিক ও পরিচালকদের সুবিধা হইয়াছে। লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ক পাঁচ শ' কর্ম্মচারী বরখাস্ত করিয়া পাঁচ হাজার নূতন কর্ম্মপ্রার্থীর দরখাস্ত পাইয়াছেন। ধর্ম্মঘটের পিছনে গণ-সমর্থন বা রাষ্ট্রের সমর্থন কোনটাই নাই এবং ইহার ফলে ধর্ম্মঘটের সাফল্যজনক পরিণতির আশা সুদূরপরাহত। এই অবস্থায় বিনা ধর্ম্মঘটে ন্যায্য দাবি আদায়ের চেষ্টা করা উচিত ছিল, কিন্তু যাহারা বর্ত্তমানে জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করিয়া ভারতবর্ষকে চীন দেশে পরিণত করিবার চেষ্টায় আছে তাহারা উহা করিবে না, যেন-তেন-প্রকারে ধর্ম্মঘট বাধাইয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিই ইহাদের কাম্য।

ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীরা শিক্ষিত, কিন্তু নানা দুর্ব্বিপাকে এমনই বিভ্রান্ত হইয়াছেন যে এটা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘটের পরিণাম অতি শোচনীয় হইয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন উহাকেই "সাফল্যজনক" ধর্ম্মঘট বলিয়া অভিহিত করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। কম্যুনিষ্টদের বেনামদার বাঙালী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাটি নিজের চাকুরি বাঁচাইয়া মধ্যবিত্ত বাঙালী কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটে উত্তেজিত করিয়াছেন এবং তাহাদ্বারা বাঙালী সমাজের যে অনিষ্ট করিয়াছেন এতদিনে তাহা সকলের বুঝা উচিত ছিল। অবাঙালী প্রতিষ্ঠানের চাকুরিতে বাঙালী নিয়োগ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। তাহার জন্ত প্রধানতঃ এই ব্যক্তির অদূরদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা দায়ী। সম্প্রতি ইনি আর একটি নূতন সর্ব্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ব্রতী হইয়াছেন। এই চেষ্টা কম্যুনিষ্ট বেনামীতে আর একটা চাল কি না সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া উচিত। মাদ্রাজ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে কম্যুনিষ্টদল কর্তৃক সভাপতিত্বে ইঁহার নিয়োগ হইতে সুরু করিয়া আজ পর্য্যন্ত এই ব্যক্তির কার্য্যকলাপ দেশের পক্ষে অনিষ্টকর এবং কম্যুনিষ্টদের পক্ষে লাভজনক হইয়াছে। নূতন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন চেষ্টা যোগসাজসের ব্যাপার কি না সে সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

গবর্ণমেণ্ট ট্রাইবুনালের মারফত তদন্ত এবং এওয়ার্ড কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা শ্রমিক এবং কর্ম্মচারীদের প্রতি তাঁহাদের শুভেচ্ছার পরিচয় সন্দেহ নাই। ভারত-সরকারও এতদিনে আমদানী দ্রব্যের উপর কড়াকড়ি হ্রাস করিয়া জিনিষপত্রের ক্রত মূল্য হ্রাসে মনোযোগী হইয়াছেন। এমতাবস্থায় কর্ম্মচারীরা আর একটু ধৈর্য্য ধারণ করিলে ভাল করিতেন। লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী এবং ম্যানেজার উভয় পক্ষের বিবৃতি হইতে যে সব তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে কর্ম্মচারীদের অধৈর্য্য এবং অবিবেচনাই বেশী প্রকাশ পাইয়াছে। এই উপলক্ষে সমস্ত ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘট করাইবার যে চেষ্টা হইতেছে তাহা শুভ ফলদায়ক হইবে না। রাষ্ট্র এবং জনসাধারণ যেখানে ধর্ম্মঘটের বিরোধী সেখানে ধর্ম্মঘট ব্যর্থ হইতে বাধ্য এবং এরূপ করিতে থাকিলে বাঙালীর কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। রাষ্ট্র-বিপ্লবে বহুজন যেখানে সর্ব্বস্বান্ত ও পথের ভিখারী হইয়াছে সেখানে সচ্ছলতা দাবি করিতে গিয়া আধপেটার সংস্থান নষ্ট করিয়া বেকার হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, একথা মনে রাখিলে বর্ত্তমান কষ্ট সহনীয় হইতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা

"বরিশাল হিতৈষী" লিখিতেছেন :

"আফ্রিকায় বড়লাট তদানীন্তন পূর্ব্ব বাংলায় উদ্বিগ্নে

আজম খওয়াজা নাজিমদ্দীন টাউনহলে ঘোষণা করিয়া গেলেন চাউলের দাম ৩৫৲ হইতে ২২।০ টাকায় আনিবই—কিন্তু আজ তাহা ৪২৲—৪৫৲। আজিকার উজিরে আজম নুরুল আমিন বলিয়াছেন—পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ হইবে না। আর বচক্ষে তৈলসিক্ত মলিন ন্যাকড়া-জড়ান প্রেতমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে।

"আল্লার ওয়াস্তে দুইখানি পয়সা দাও না—দুই পয়সার মুড়িতে তো পেট ভরে না।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন কাহারও উপর দোষারোপ না করিয়া লেখে—৫টির ১টি গিয়াছে, চারিটি ভুঁয়ে গড়াগড়ি দেয়, আমার পথ আত্মহত্যা ব্যতীত আর কিছু নাই।

হাসপাতালে ও কজলল হক রাস্তার ফুটপাতে পড়িয়া বালকদ্বয় যখন আর্ত্তনাদ করিয়া "ও আল্লা—এক মুঠ ভাত দাও" বলে।

গৃহস্থ যখন তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত মুসুরি ডাইল ১৵০ আনার স্থলে ৸/০ আনায় বিক্রী করিতে আসিয়া বলে বাবু আজ পেটের দায় ঘর খালি করিতেছি।

রাজপথে ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত জনবহর যখন দৃষ্টি আহত করে—

তদুপরি পাকিস্থানের উজিরে আজম যখন বলেন ল্যাংটা থাক—আর ক্ষুধায় মর, যুদ্ধ-সম্ভার সংগ্রহ অব্যাহত চলিবে।

মর্ম্মে যখন মত্ত ক্ষোভ সর্পসম ফোঁসে—
'তখনও ভাল মানুষ সেজে
বাঁধান হুকা যতনে মেজে
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে'
মুখে ভদ্রতার বাণী বলিতে হইবে ?"

এই বর্ণনার মধ্য হইতে যে চিত্র আমাদের চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠে, তাহা ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষেও ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। কারণ প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগিলে আমাদেরও সাবধান হইতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দলে দলে হিন্দুরা চলিয়া আসিতেছেন এই কথাটাই আমরা কলিকাতা শহরে থাকিয়া শুনিতেছি। কিন্তু আমরা খবর রাখি না কত মুসলমান অভাবের তাড়নায় উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে পশ্চিম বাংলায় আসিয়া পড়িতেছে; এখানে ইহারা আগামী ফসলের অপেক্ষায় দুই-তিন মাসের জন্য আসিতেছে, এই সময়টা এখানে কাটাইয়া ইহারা ফিরিয়া যাইবে নিজ দেশে। যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে এখানে একটা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইহারা দেশে টাকা পাঠাইয়া দিবে যেমন পাঠায় ওড়িয়া, বিহারী, পশ্চিমা। সেইজন্য দেখিতে পাই কলিকাতার দমকল বিভাগে, কলিকাতায় জলের কলে নোয়াখালির মুসলমানকে। কারণ পশ্চিম বাংলার হিন্দু-মুসলমান এই সব বৃত্তির সেবা করিতে পারিতেছে না। আজ যখন পূর্ব্ববঙ্গ অন্য রাষ্ট্রের, বিরোধী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়িবে। এই কথাটা এই দুই রাষ্ট্রের শাসকবর্গের মনে করা উচিত।

মেদিনীপুর কলেজ

মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সর্ব্বপ্রধান সংখ্যাগুরু জেলা। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে মেদিনীপুরের স্ত্রী-পুরুষের আত্মত্যাগ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই জেলা অনগ্রসর—যদিও প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই বিষয়ে গোড়াপত্তন হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বসুর কর্ম্মস্থল মেদিনীপুরে, সেই শহরের স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে তিনি বহু বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। সেই স্কুলই কালে কলেজে পরিণত হয় এবং আজও তাহা টিঁকিয়া আছে ব্রিটিশ আমলের বিমাতার মত ব্যবহার সত্ত্বেও। এই ইতিহাসই মেদিনীপুর কলেজের প্রাক্তন ছাত্রসংঘের একটি বিবরণী পুস্তিকা হইতে জানিতে পারি। পূর্ব্বের আমলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুর কলেজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইত। ১৯২৩ সনে মেদিনীপুর মিউনিসিপালিটির হাত হইতে এই কলেজের ভার গবর্মেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করেন, এবং অনেক সময় তাঁহাদের পক্ষ হইতে স্বীকার করা হয় যে কলেজটি গবর্মেণ্ট পরিচালিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গবর্মেণ্ট তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। গবর্মেণ্ট-পরিচালিত স্কুলে বা কলেজে শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য যেরূপ ব্যয় করা হয় তাহা অন্যান্য স্কুল বা কলেজ হইতে বেশী, শিক্ষক বা অধ্যাপকবৃন্দ অধিক মাহিনা পান ও তাঁহাদের পেন্সনের ব্যবস্থা থাকে।

কিন্তু সরকারী কলেজ রূপে স্বীকৃত হইয়াও মেদিনীপুর কলেজ এই সব সুবিধায় বঞ্চিত ছিল। একটা দৃষ্টান্ত দিলে এই অসম আচরণ লোকচক্ষে স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। ১৯৪৩-৪৮ সনের মধ্যে মেদিনীপুর কলেজে ব্যয় হইয়াছে ৩ লক্ষ ২৪ হাজার ৯ শত টাকার কিঞ্চিদধিক। সেই সময়ের মধ্যে কৃষ্ণনগর কলেজে ব্যয় হইয়াছে ৬,৭৮,০০১ টাকা, হুগলী কলেজে ৭,১৩,৯৭৩ টাকা। এর মধ্যে গবর্মেণ্টের দান ছিল ক্রমান্বয়ে—৭৪,৮১৮ টাকা, ৫,০০,২৬৭ টাকা, ৫,৯৮,১২৪, টাকা।

আজ অতীতের কথা লইয়া তর্ক তুলিব না। মেদিনীপুর কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সঙ্ঘের দাবী যে পরিষ্কার ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকার করিয়া লউন—এই কলেজের পরিচালনা তাঁহাদের একটা দায়—এবং এই দায়িত্ব স্বীকার করিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। ১৯৪৭ সনের ১৫ই

আগষ্টের পর এই পনের মাসের মধ্যে এই দাব স্বীকৃত হইল না কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। পশ্চিমবঙ্গের আইন-পরিষদে মেদিনীপুরের সভ্যসংখ্যা প্রভাব-প্রতিপত্তিতেও নগণ্য নয়। মন্ত্রিসভার উপর তাঁহারা কেন চাপ এত দিন দিতে পারিলেন না, তাহা আমরা জানি না। ব্রিটিশ আমলের অনুরূপ অবহেলা তাঁহারা আজ সহ্য করেন কেন?

এই উপলক্ষে মেদিনীপুরের জাগ্রত জনমতের নিকট আমরা একটি নিবেদন জানাইতে চাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহারা যে দৃঢ়তা ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন তা শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত করিলে গবর্ন্মেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে পাঁচ বৎসরের মধ্যে মেদিনীপুর নবকলেবর ধারণ করিবে। সেই শক্তি মেদিনীপুরের আছে বলিয়াই আমরা এই নিবেদন জানাইতে সাহস করিতেছি।

লোক-সংখ্যা ও খাদ্য-উৎপাদন

কলিকাতার "নিউ রিভিউ" নামক মাসিক পত্রের নবেম্বর (১৯৪৮) সংখ্যায় লোক-সংখ্যার উপর খাদ্য-উৎপাদনের প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক মিঃ বর্ণ ভাদু বর্ত্তমান সংখ্যা-শাস্ত্রীগণের ও নৃতত্ত্ববিদ্‌বর্গের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে খাদ্য-উৎপাদনের তুলনায় লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে বিপ্লবের আবির্ভাব হয়; যুগে যুগে দেশে দেশে তার প্রমাণ আছে। লোকে নিজের পিতৃভূমি ও বাস্তু ত্যাগ করে অনেক সময় খাদ্যের অভাবে; ধর্ম্মের নির্যাতন এইরূপ স্থানত্যাগে একটা গৌণ স্থান অধিকার করে। ব্রিটেন হইতে আমেরিকায় গিয়া যে সব উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা উক্ত দুইটি অবস্থার ফল; অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ধ্বংস করিয়া শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপন আমেরিকার তাম্র-বর্ণ "ইণ্ডিয়ান"দের ধ্বংস-লীলার পুনরাবৃত্তি মাত্র। আজ চীন জাতির ও ভারতীয় জাতির ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা শ্বেতাঙ্গ অধিকৃত দেশের দিকে রওয়ানা হইয়াছে; শ্বেতাঙ্গেরা বাঁধ বাঁধিয়া তাহাদের আগমন আটকাইবার চেষ্টা করিতেছে যেমন করিতেছে আসামের লোকেরা বাঙালীর আগমন ঠেকাইয়া রাখিতে। এসব চেষ্টা সার্থক হইবে কিনা জানি না। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে ঘন-বসতি অঞ্চলের লোকেরা স্বল্প-বসতি অঞ্চলের উপর চাপ দিবেই। সংখ্যা-শাস্ত্রী ও নৃতত্ত্ববিদ্‌ কুকজিনস্কি (Kuczynski) ইতিহাসের এই অমোঘ বিধানের সপক্ষে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

মিঃ বর্ণ ভাদু এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটা তথ্যের উল্লেখ করিয়া ভাল করিয়াছেন। অনেক অর্থনীতিবিদ্‌ এই কথাটা প্রচার করিয়াছেন যে ভারত-বর্ষের জনসংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে। তিনি পঞ্চাশ বৎসরের (১৮৮১-১৯০১) লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির হিসাবের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে একথা বিচারসহ নহে। এই সময়ের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৬৬ জন; বিলাতের ৫০ জন; জাপানের ৭২ জন; নিউ জিল্যাণ্ডের ১১২ জন; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ১৮৬ জন; ও ভারত-বর্ষের (ব্রহ্মদেশ বাদে) মাত্র ৩৬ জন করিয়া।

আর একটা হিসাব তিনি দিয়াছেন যাহা জানিয়া রাখিলে ভাল হয়। ১৬০০ সনে ব্রিটেনের জনসংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ; ১৮০১ সালে তাহা বাড়িয়াছে দেখা যায় ৮৮ লক্ষে; ১৮৮১ সনে ইহা তিন গুণ বাড়িয়া ২ কোটি ৫৯ লক্ষে দাঁড়ায়; ৫০ বৎসর পরে, ১৯৩১ সনে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩ কোটি ৯৯ লক্ষে; ১৯৪১ সনে ৪ কোটি ১০ লক্ষে। প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরে বিলাতে আট গুণ লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের হিসাবে দেখা যায় চারি গুণ বৃদ্ধি—১৬০০ সনে ১০ কোটি; ১৮০১ সনে ১৮ কোটি ৫০লক্ষ; ১৮৮১ সালে ২৫ কোটি ৩৮ লক্ষ; ১৮৩১ সালে ৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ; ১৯৪১ সনে ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ।

আমাদের দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৪৩ সনে ৭৭ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়; ১৯৪৭ সনে তাহা বাড়িয়া যায় প্রায় ১০০ কোটি টাকায়। এই সংখ্যায় প্রমাণিত হয় গবর্ন্মেণ্টের খাদ্যবৃদ্ধি-আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে। এক সময়ে আমাদের দেশের লোকের ৭।৮ কোটি লোক আধ-পেটা খাইয়া থাকিত। লেখকের মতে তাঁহারা এখন ত দু-বেলা খাইতেছে। তাই দেশের খাদ্য-উৎপাদনে কুলায় না।

পূর্ব্বাচল প্রদেশ

গত সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি "পূর্ব্বাচল প্রদেশ" নামে একটি নূতন কংগ্রেস প্রদেশের সংগঠন ঘোষণা করেন। হঠাৎ তৎসম্বন্ধে সব কার্য্যকরী ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেওয়া হয় এক সপ্তাহের মধ্যে। গত দুই-তিন (২৬-২৮ কার্ত্তিক) দিনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্য একটি অধিবেশন অধিষ্ঠিত হয়, তাহাতে "পূর্ব্বাচল প্রদেশের" প্রস্তাব একেবারে বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব ও পরের এই দুইটি কার্য্যের সঙ্গতি সম্বন্ধে কোন কারণ দেখানো হয় নাই। সুতরাং কল্পনা করিয়া তর্ক করিতে হয়। সে চেষ্টা আমরা করিব না।

একটা কথা বলিতে চাই। অবস্থার দাস মানুষ। ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব সীমান্তে যে অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে তৎসম্বন্ধে সজাগ থাকিলে এই "পূর্ব্বাচল প্রদেশের" প্রস্তাব এমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে তৎপর হইতেন

া। এই অবস্থা সৃষ্টি হইতেছে পূর্ব্ববঙ্গে। এই "পাকিস্থান" প্রদেশের ২৫।৩০ লক্ষ হিন্দু তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষের বাসভূমি ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। যেদিন ভারত-বিভাগ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন সেদিন হইতে নেহরু-প্যাটেল প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবর্গ পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সম্বন্ধে একটা দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। মনে-প্রাণে এই স্বীকৃতি না থাকিলে নাগপুরে সর্দার প্যাটেল এমন করিয়া মিঃ নুরুল আমিনের গবর্ণমেন্টকে শাসাইতেন না।

এই দায় স্বীকার করিয়া ভারত-রাষ্ট্রের পরিধির মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুর জন্ম জায়গা করিয়া দিতে হইবে। আসামের মন্ত্রিমণ্ডলী এই দায়ের অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের অজুহাত এই যে, আসামে এত জমি নাই। অথচ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী সদস্য, আসাম পরিষদের কংগ্রেসী দলের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বলিতেছেন যে কেবল মাত্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ই আরও ১ কোটি লোকের বসতি স্থাপিত হইতে পারে।

আসামী নেতৃবর্গের বাঙালী হিন্দুদের আমল না দিবার কারণ থাকিতে পারে। সেই বিষয় লইয়া এখানে তর্ক তুলিব না। কিন্তু ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই তাঁহাদের স্থান করিবেন কোথায়? দুই এক লক্ষ হইলে কথা ছিল না। যে ২৫।৩০ লক্ষ হিন্দু নিজের উদ্যোগে আসিয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এই চাপ সহ্য করা কঠিন। এই স্থান সংকুলানের উদ্দেশ্যেই "পূর্ব্বাচল প্রদেশের" প্রস্তাব হইয়াছিল। কাছাড়, ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্যে কত লোকের স্থান সঙ্কুলান হইত তৎসম্বন্ধে সঠিক হিসাব দেখি নাই। ৫।১০।১৫ লক্ষ হইলেই মন্দ কি। এই সুযোগের সম্ভাবনা এমনভাবে নষ্ট করা হইল কেন তাহা আমাদের জানিতে হইবে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে প্রশ্ন করিয়া এই মনোভাবের পরিচয় পাইতে হইবে।

একটা কথা ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। এই সমস্যাকে ধামাচাপা দিলে চলিবে না। তাহাতে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়া ভারত-রাষ্ট্র বিপন্ন হইবে। ম্যাক্‌ডোনাল্ডী রোয়েদাদের সময়ের "না গ্রহণ না বর্জ্জন" নীতির পরিণতি কি হইয়াছে, তাহা আজ সর্ব্বজনবিদিত। 'পাকিস্থানীদের" ফুসলাইয়া কিছু আদায় করিতে গেলে, এমন মূল্য দিতে হইবে যাহা ভারত-বিভাগ হইতে কম হইবে না। ভারত-বিভাগের পূর্ব্বে নানা আশ্বাসের সম্যক্ ব্যর্থতার কথা মনে রাখিয়া সকলকে সাবধান হইতে হইবে।

জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর যে শান্তি ও প্রাচুর্য্যের আশা করিয়া পৃথিবীর লোকে উৎসাহী হইয়াছিল তাহা এই তিন বৎসরে বিলীন হইয়া যাইতেছে। পরাজিত জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিন নগরী লইয়া যে ঠেলাঠেলি চলিতেছে তাহাই তাহার নানা বহিঃপ্রকাশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই ঠেলাঠেলি গত মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে চলিতেছে, তাহা থামাইবার জন্য মস্কো নগরীতে পাশ্চাত্ত্য শক্তিত্রয়ের দূতগণ সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্ব্বাধিনায়ক ষ্টালিনের সঙ্গে দেখা করিয়া একটা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু ফল তাহাতে কিছুই হয় নাই। দুই পক্ষই এইজন্য পরস্পরকে দোষ দিতেছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের যে অধিবেশন চলিতেছে তাহার সম্মুখে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই ত্রি-শক্তির পক্ষ হইতে নালিশ রুজু করা হইয়াছে যে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ বার্লিন অবরোধ করিয়া পৃথিবীর শান্তি বিপন্ন করিতেছে। এই অভিযোগের শুনানী উপলক্ষে আর এক দফা গালাগাল দুই পক্ষ হইতে আমরা শুনিয়াছি; তাহার মধ্যে না পাইলাম কোন সংশোধনের উপায় সম্বন্ধে নূতন আলো, না পাইলাম কোন বিশিষ্ট নির্দ্দেশ।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টা এই বিরোধে অচল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কারণ সম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের পত্নী শ্রীমতী ইলেনর রুজভেল্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য।

> "জার্ম্মানীকে কেন্দ্র করিয়া আজ সুরু হইয়াছে একটি আদর্শগত সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মীমাংসা শান্তিপূর্ণ উপায়েও হওয়া সম্ভব যদি আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক আদর্শনিষ্ঠা বজায় রাখিতে সক্ষম হই।
>
> "নিজেদের দেশে রাশিয়া যত ইচ্ছা তাহার রাষ্ট্রিক আদর্শ প্রসার করিতে পারে এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত বন্ধুত্বও করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া সে যে এই সকল দেশের রাষ্ট্রিক আদর্শ এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবে ইহা কখনই হইতে পারে না। যদি সোভিয়েট-মতবাদ কাহারও ভাল লাগে তাহারা স্বেচ্ছায় তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে—কিন্তু এই মতবাদকে জোর করিয়া কাহারও ঘাড়ে চাপাইবার অধিকার নিশ্চয়ই কাহারও নাই।
>
> "গণতান্ত্রিক প্রথা অনুসারে প্রত্যেক লোকই স্বাধীন ভাবে নিজের মত ব্যক্ত করিতে পারে। অধিকাংশের মত অনুসারে রাষ্ট্রব্যবস্থা চালনা করাই গণতন্ত্রের মূল কথা এবং বলপ্রয়োগে কাহাকেও শাসন করা নীতিবিরুদ্ধ।

সেইজন্যই আজ জগতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন এত বেশী।

"আজ জাতিসঙ্ঘই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম।"

এই "মাধ্যমের" কথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু কাজে কেহই তাহার রূপ দিতে রাজী নন। সোভিয়েট সংবাদ-পত্র পড়িলে মনে হয় যে আমেরিকার ধনী সম্প্রদায় আজ পৃথিবী শোষণ করিবার অভিপ্রায়ে অভিযান শুরু করিয়াছে। সোভিয়েট প্রভাবের বহির্ভূত অঞ্চলগুলি এই বিশ্ব-শোষণের ক্রীড়নক; কেহ বুঝিয়া—কেহ অজ্ঞাতে। ভারতবর্ষ নাকি শেষোক্ত পর্য্যায়ে পড়িয়াছে। কিন্তু এই অভিযোগের মধ্যেও বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে উদ্ধারের পথের কোন সন্ধান পাইলাম না। পরস্পরের গায়ে কাদা ছিটাইলে বিবাদের মীমাংসা হয় না।

এই কথাটা বুঝিয়াও মানুষ কোন দিন সংযত ব্যবহার করিতে পারিল না। আজ যখন বিজ্ঞানের কল্যাণে বিশ্বের সকল দেশের মধ্যে দূরত্ব সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইতেছে, তখন পরস্পর ঠোকাঠুকির সুযোগ যেন আরও বাড়িয়া চলিতেছে। তবে কি বলিতে হইবে যে দূরকে নিকট করিবার যে উপায়গুলি আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা ভাঙিয়া চুড়িয়া ফেলা হউক। পৃথিবীর লোক সপ্তদশ শতাব্দীর অবস্থায় ফিরিয়া যাউক যখন সমুদ্র-পথ ছিল প্রায় অগম্য; আকাশ-পথ ছিল কল্পনার অতীত। সে অবস্থায় ফিরিয়া গেলে যদি পৃথিবীতে হানাহানির অবসর কমিয়া যায় তবে আমাদের দুর্বুদ্ধিকে তাহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমান যুগের মানুষ এই ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইবে না, তাহাও জানি। সুতরাং বিশ্ব-যুদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতে থাকুক; ভাবজগতে চিন্তাজগতে তর্কের স্রোত বহিতে থাকুক। ইতিহাস বলিতে থাকুক মানুষ ঠেকিয়াও শিখে না; শিক্ষা করিবার, সাবধান হইবার শক্তি তাহার নাই; তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা এই গুণটি তাহার প্রকৃতির মধ্যে দেন নাই।

জাপানী সামরিক নেতৃবৃন্দের বিচার

নুরেমবুর্গ নগরীতে জার্ম্মানীর সামরিক নেতৃবৃন্দের বিচার হইয়াছিল; তাহার মধ্যে প্রধানগণের হইয়াছিল ফাঁসি; বন্দুকের গুলীতে হত্যা করার সম্মানটা তাঁহাদের দেওয়া হয় নাই। সে কথা লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ জাপানী সামরিক নেতৃবৃন্দের বিচার আমাদের মনে করাইয়া দিয়াছে যে বিজয়ী শক্তিপুঞ্জ তাঁহাদের হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া যাইতে চান না; তাঁহাদের রাষ্ট্র-বিধানে তাহা মজ্জাগত করিয়া রাখিতে চান। ১১ জন বিচারক লইয়া এক মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল; তাহার মধ্যে ছিলেন একজন বাঙালী বিচারক, তাঁহার নাম শ্রীরাধাবিনোদ পাল। অধিকাংশ বিচারকেরা রায় দিয়াছেন যে অভিযুক্ত জাপানী সামরিক নেতৃবৃন্দ বিশ্ব-শান্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছিলেন; যুদ্ধ পরিচালনার মধ্যে যে হিংস্রতা অপরিহার্য্যরূপে বিদ্যমান, তাহার অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা শত্রুপক্ষের প্রজাবৃন্দের ও বন্দী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালনা করিবার জন্য প্ররোচনা দিয়াছিলেন ও নানাক্ষেত্রে সেই নিষ্ঠুরতার সমর্থন করিয়াছিলেন। এই অপরাধে ৬ জনের হইয়াছে ফাঁসির হুকুম; ১৪ জনের হইয়াছে দ্বীপান্তরের আদেশ।

বিচারক-মণ্ডলীর সভাপতি অষ্ট্রেলিয়ার সার উইলিয়ম ওয়েব রায়ে বলিয়াছেন যে প্রধান অপরাধী জাপ সম্রাট্ হিরো-হিতোকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা প্রয়োজন ছিল; ফরাসী জজ বেরনারও সেই অভিমত প্রকাশ করেন, কিন্তু স্বতন্ত্র রায়ে বলেন যে উপস্থিত অপরাধীরা জাপ রাষ্ট্রনীতির ক্রীড়নক মাত্র; সুতরাং তাঁহাদের অব্যাহতি দেওয়া উচিত। ডাচ বিচারপতি ডাঃ রোলিংও স্বতন্ত্র রায় দেন; তাঁহার অভিমতের বর্ণনা সংবাদপত্রে দেওয়া হয় নাই। তিনি ৬ জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ সমর্থন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ডাঃ রাধাবিনোদ পাল সকলকে নির্দ্দোষ বলিয়া রায় দিয়াছেন। এই অভিমতের সমর্থনে তিনি কি বলিয়াছেন তাহা ঠিক ঠিক বুঝা যাইতেছে না। যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা পাইয়াছি তাহা পড়িয়া মনে হয় বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক বিধানানুসারে এরূপ হিংসা-নীতি অপরিহার্য্য বলিয়া তিনি মনে করেন।

যে তিনটি স্বতন্ত্র রায় উপস্থিত করা হয় তাহা আদালতে পাঠ না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় আমরা জানিতে পারিব না কোন্ কোন্ কারণ দর্শাইয়া তিন জন বিচারপতি তাঁহাদের আট জন সহযোগীর মতের বিরুদ্ধে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিলেন। সে যাহাই হউক, এই কথা বুঝিবার পক্ষে কোন অস্পষ্টতার বাধা নাই যে বিজয়ী শক্তিপুঞ্জ যে নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন, জাপানী সামরিক নেতৃবৃন্দ তাহা হইতে এমন ভাবে বিচ্যুত হন নাই যে তাঁহাদের বিশ্বের জনমতের সম্মুখে দোষী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে। ডাঃ রাধাবিনোদ পালের রায় সাক্ষ্য দিতেছে যে, এশিয়ার ২৫।৩০ কোটি লোক টোকিয়ো নগরীর এই বিচারকে 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতির প্রয়োগ বলিয়া মনে করে। জার্ম্মানী ও জাপান বিজয়ী হইলে উইনষ্টন চার্চ্চিল, ষ্টালিন, জেনারেল মার্শাল, জেনারেল আইসেন-হাওয়ার, জেনারেল জুকভ প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতা ও সামরিক নেতৃবৃন্দের বিচার হইত এবং তাঁহাদের নিয়োজিত বিচারকমণ্ডলী পরাজিত নেতৃবৃন্দের প্রতি অনুরূপ দণ্ডাদেশ দিতেন। লাটিন ভাষায় একটা কথা আছে যাহার অর্থ এরূপ দাঁড়ায়—'যখন যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠে, তখন আইন হইয়া যায় নীরব।' বর্ত্তমান সভ্যতার কর্ণধারগণ যে রাষ্ট্রনীতির পূজক ও ধারক তাহার কথা মনে করিয়া যীশুর কথা স্মরণ করাইয়া দিতে

ইচ্ছা হয়—তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপী তাহারাই কেবল অপরাধীর উপর লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতে পার। গান্ধীজী ছাড়া এরূপ কোন লোক-নেতার নাম ত আমাদের মনে পড়ে না যিনি মনেপ্রাণে অহিংসাব্রতী বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে পারেন। ন্যুরেমবুর্গে ও টোকিয়োর বিচার ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিবে বিশ্ব-মানবের শুভ-বুদ্ধির দুয়ার হইতে। ডাঃ রাধাবিনোদ পালের স্বতন্ত্র রায়ের ফল শেষ পর্য্যন্ত হয়ত কিছুই হইবে না, কিন্তু তথাপি তাঁহার স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য এবং ন্যায় বিচারের মূল নীতির অকপট অভিব্যক্তির জন্য তাঁহাকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

খুরসেদ নরিম্যান

খুরসেদ নরিম্যানের মৃত্যুতে দেশ এক জন লোক-নেতা হারাইল। তিনি স্বাধীন ভারতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। দাদাভাই নৌরজী, ফিরোজ শাহ মেহতা, দিনশাহ ওয়াচা প্রভৃতি কংগ্রেস আন্দোলনের প্রবর্ত্তকবর্গের উত্তরসাধকরূপেই খুরসেদ নরিম্যান স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় রাজনীতিক জীবনে স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি গতানুগতিকভাবে শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণ করেন। আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়া কিন্তু তিনি এমন একটা অন্যায়ের প্রতিকারে হস্তক্ষেপ করিলেন যাহা যুবকের পক্ষে সহজ ছিল না। সমুদ্রবক্ষ হইতে জমি উদ্ধার করিবার জন্য বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া বোম্বাই নগরীর পরিধি বৃদ্ধি করা হইতেছিল। এই কার্য্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইতেছিল। হার্ভে নামক এক জন শ্বেতাঙ্গের উপর কার্য্যের ভার ছিল। খুরসেদ নরিম্যান সংবাদ পান যে এই বিরাট কার্য্যের মধ্যে ঘুষ প্রভৃতি নানাবিধ অনাচার চলিতেছে। নিজের দায়িত্বে লোকসমক্ষে তিনি এই সংবাদ প্রকাশ করেন। ফলে হার্ভেকে বাধ্য হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনিতে হয়। বোম্বাইয়ের গবর্মেণ্ট এই মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন, এবং যুবক নরিম্যান সততার পক্ষে যুদ্ধ করেন। বিচারে তাঁহার অভিযোগ প্রমাণিত হয়। এই বিজয়ে তিনি লোকনেতার আসনে উন্নীত হন। বিশেষ করিয়া বোম্বাইয়ের যুবক শ্রেণী তাঁহাকে নেতৃত্ব পদে বরণ করে। এই উপলক্ষে তিনি দেশের রাজনীতিক অগ্রগামী দলের পরিচয়লাভ করেন, এবং অতি সহজেই তাহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এই সময়েই সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে নরিম্যানের সহযোগিতার সূচনা হয়।

বর্ত্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রথমার্দ্ধে বোম্বাইয়ের রাজনীতিক জীবনে নরিম্যানের প্রভাব অনন্যসাধারণ ছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিঠলভাই যখন বোম্বাই ছাড়িয়া আসেন তখন সকলেই আশা করিতেছিল যে খুরসেদ নরিম্যান তাঁহার স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু নিয়তির বিধান অন্যরূপ। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে তিনি সহযোগিতা বজায় রাখিতে পারিলেন না। এই বিষয়ে দোষ-গুণের বিচার করিয়া ফল নাই। যে পদে শ্রীবলবন্ত খের (বোম্বাইয়ের প্রধানমন্ত্রী) আজ অধিষ্ঠিত, সেই পদ ছিল খুরসেদ নরিম্যানের প্রাপ্য। তিনি তাহা লাভ করিতে পারিলেন না, এবং রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িলেন। মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে তিনি বোম্বাই নগরীর মিউনিসিপালিটিতে কংগ্রেসী দলের নেতৃত্ব পদে বৃত হন। এই সংবাদে আমরা আশা করিয়াছিলাম যে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে খুরসেদ নরিম্যান তাঁহার যোগ্য পদ লাভ করিবার সুযোগ পাইবেন। মৃত্যু দেশের লোকের সেই আশায় বাদ সাধিল।

নরেন্দ্রনাথ শেঠ

৭১ বৎসর বয়সে এই বাঙালী বিপ্লবী-প্রধান দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইংরেজ রাজত্বের অত্যাচার অবিচার তাঁহার পরিবারবর্গের উপর নির্ব্বিচারে পড়িয়াছে, কিন্তু ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্রোহী মন কোন দিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর প্রায় চৌদ্দ মাস তিনি বাঁচিয়াছিলেন। যে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ও সংগঠনের সুযোগ আমরা লাভ করিয়াছি তৎসম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের মনে কোন মোহ ছিল না। সেই মনোভাবের কারণটি ধরিতে পারিলে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার একটি অর্থ পাওয়া যাইবে।

যে পরিবারে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা কলিকাতার আদি বাসিন্দা। শেঠ-বসাক-লাহা-আঢ্য পরিবার ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিয়া কলিকাতা সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। সেইজন্য তাঁহাদের শ্বেতাঙ্গ সওদাগর শ্রেণীর তাঁবেদারী করিতে হইয়াছিল; কারণ বলিতে গেলে কলিকাতার বন্দর তাঁহাদেরই সৃষ্টি। ইংরেজের সঙ্গে যে শিক্ষা ও সাধনা আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে এই সব হিন্দু শ্রেণীর বিশেষ কোন প্রাণের যোগ ছিল না যেমন হইয়া উঠিয়াছিল রামমোহন-মধুসূদন-ভূদেব-পরিবারের সঙ্গে। নরেন্দ্রনাথের পিতা রাজেন্দ্রনাথ ইংরেজী শিক্ষার দ্বিতীয় যুগের অন্তর্বর্ত্তী ছিলেন; চন্দ্রমাধব ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী ছিলেন; তাঁহার পুত্রেরা সকলেই বর্ত্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু এই শিক্ষা তাঁহাদের প্রাচীন সংস্কারকে দুর্ব্বল করিতে পারে নাই; কোন কোন দিক হইতে এই শিক্ষা তাহা দৃঢ় করিয়াছিল; রক্ষণশীলতার সঙ্গে স্বাদেশিকতার একটা নূতন যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কল্যাণে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের নিকট হইতে আমরা নূতন করিয়া ভাবিতে পাই যে আমাদের সংস্কৃতি ও

রীতিনীতি একেবারে বাজে জিনিস নয়; তাহাদের মধ্যে সত্য বস্তু ছিল ও আছে। পাশ্চাত্য জগতের এই আবিষ্কারে আমাদের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস ফিরিয়া আসে; ইংরেজ-নিরপেক্ষ হইয়া চলিবার সাহস দেখা দেয়। যে যুগে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, তাহা এই ভাব-বন্যার যুগ। সুতরাং তিনি কোন দিনই সমাজ-সংস্কারপন্থী হইতে পারিলেন না; "কেরঙ্গ" ভাব ও সংস্কৃতির বাহক, ধারক ও প্রচারক বিদেশী শাসন-ব্যবস্থার মূলচ্ছেদ না করিতে পারিলে ভারতে প্রকৃত "স্বরাজ" আসিতে পারে না এই বিশ্বাসের অনুপ্রেরণায় নরেন্দ্রনাথ হইয়াছিলেন রাজনীতিক বিপ্লবী। এই বিশ্বাসের মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন পশ্চিম ভারতে বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক, পূর্ব্ব-ভারতে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং বাংলাদেশে তাঁহার বাণী-মূর্ত্তি ছিল "সন্ধ্যা" পত্রিকা।

এই পত্রিকাকে অবলম্বন করিয়া যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তাহার মধ্যে নরেন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। সুতরাং "কালী মায়ীর বোমার" আহ্বানে সাড়া দিতে তাঁহার মনে কোন দ্বিধা দেখা দেয় নাই। তাঁহার উদাহরণে কলিকাতার আদি নাগরিকগণের মধ্যে অনেকেই অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া সন্ত্রাসবাদকে সাহায্য করিয়াছিলেন; তাঁহার অনুপ্রেরণায় কলিকাতার "গুণ্ডা" শ্রেণী পুলিশকে পিটাইতে সাহস পাইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার সমস্ত পরিবার বিপন্ন হইয়াছিল; বসন্ত চ্যাটার্জ্জিকে হত্যার চেষ্টায় তাহার পরিবারের ১৩ জনকে একদিনে গারদের পশ্চাতে নিরুদ্ধেশ হইতে হয়; তাঁহাকে সুন্দরবনের চরে সাপ-কুমীরের মধ্যে নির্ব্বাসিত হইতে হয়। বৃদ্ধ পিতা রহিলেন একা বাড়ীতে প্রায় ৫০।৬০টি মহিলা ও নাবালকের অভিভাবকরূপে, অন্নদাতারূপে। দুই-তিন বৎসর পরে নরেন্দ্রনাথ যখন কয়েকখানি হাড় লইয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন দেশে নূতন রাজনীতিক চিন্তা ও কর্ম্মপ্রবাহের বান ডাকিয়াছে; বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে এক বৃহদংশের মনে সংশয় জাগিয়াছে। এইরূপ সংশয়ী মন লইয়াই তাঁহারা গান্ধী-আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্তু তাঁহাদের "মেজ-দাকে" তাহার মধ্যে পাইলেন না। কারণ আত্মশুদ্ধি করিয়া, নিজের সমাজ-সংস্কার করিয়া শক্তি অর্জ্জন করিবার জন্য যে কর্ম্মক্ষেত্রে গান্ধীজী আমাদের আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা নরেন্দ্রনাথের সহজাত সংস্কারের বিরোধী ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের চিন্তা-নায়ক ও কর্ম্মবীরগণ যাঁহারা গান্ধী-যুগে বাঁচিয়া ছিলেন, তাঁহারা কেন গান্ধীতন্ত্র অবলম্বন করিতে পারিলেন না তাহার কারণ এই ভাব-সাঙ্কর্য্যের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে অন্যায় হইবে না। ব্যক্তিগত মতামত ইহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র; ব্যক্তিগত ত্যাগ-মাহাত্ম্য এই বিরোধে ম্লান হইয়া যায়; এক অশরীরী উন্মাদনার গণ-মন আপনার পথ খুঁজিয়া লইয়া সংস্কারকের সব চেষ্টা বিফল করিয়া দেয়। নরেন্দ্রনাথের জীবন তাহার আর একটি প্রমাণ। এই বিচারের মধ্যেও তাঁহার ত্যাগ আমরা ভুলিতে পারি না। সেই ত্যাগের স্মৃতির প্রতি দেশের ঋণ অপরিশোধনীয়। নরেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গের সহিত দেশের লোকের মন সমদুঃখী। আমরাও সমভাবে এই দুঃখের ভাগ লইতেছি।

বেঞ্জামিন হর্নিম্যান

ভারতবাসী এক জন ইংরেজ-বন্ধু হারাইল। মিসেস এনি বেসান্ত, চার্লস এণ্ড্রুজ ও উইলিয়ম পিয়ারসন ছাড়া এমন কোন ইংরেজের নাম আমরা জানি না যিনি হর্নিম্যানের মত মনে প্রাণে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কামনা করিয়াছেন এবং তাহার জন্য আত্মভোলা হইয়া আপনার সর্ব্বস্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। স্বদেশী যুগে হর্নিম্যান কলিকাতার "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন; সম্পাদক ছিলেন রাটক্লিফ, অল্প সময়ের জন্য এই ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকাখানি ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল। তারপর যথাপূর্ব্বং তথা পরম্। ছয়-সাত বৎসর পর স্যর ফিরোজ শাহ মেহতার আহ্বানে হর্নিম্যান তাঁহার দৈনিক পত্রিকা "বোম্বে ক্রনিকলে"র সম্পাদক হইয়া চলিয়া যান এবং এই সুযোগে তাঁহার সাংবাদিক ও রাজনীতিক জীবন নানাভাবে বিকশিত হয়। তিনি কয়েকজন যুবক ভারতবাসীকে এইরূপে গড়িয়া তুলেন যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজ ভারতবর্ষের সাংবাদিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রের কর্ণধার হইয়া আছেন।

মিসেস এনি বেসান্ত যখন "হোমরুল লীগ" (Home Rule League) নামক রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ১৯১৬-১৭ সালে ভারতব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি করেন তখন পশ্চিম-ভারতে হর্নিম্যান এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রাউলাট বিল ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্যুৎগর্ভ লেখনীর আঘাতে ভারতবর্ষের ইংরেজ আমলাতন্ত্র এরূপ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে যে, আমাদের দেশের বাহিরে তাঁহাকে নির্ব্বাসনে পাঠানো হয়। প্রায় সাত বৎসর বিলাতে কাটাইয়া হর্নিম্যান এই দেশে ফিরিয়া আসেন। এই কয় বৎসরে তিনি মনে প্রাণে আমাদের "স্বদেশী" বনিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া তিনি পূর্ব্বের সুযোগ লাভ করিতে পারেন নাই। অনেক পত্রিকা তাঁহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনী পূর্ব্বের ন্যায় শাণিত ছিল। মতামত সম্বন্ধে একটা কঠোর ভাব ছিল বলিয়া হর্নিম্যান লোকের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া চলিতে জানিতেন না। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁহার চরিত্রের গৌরব ও তাঁহার সাংসারিক অসাফল্যের কারণ। আজ তাঁহার জীবনের নানা-কথা স্মরণ করিয়া ভারত-বন্ধু এই ইংরেজের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

জয়দেবের লবঙ্গাদি বসন্ত-পুষ্প

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

জয়দেব গীত-গোবিন্দের আরম্ভে মঙ্গলাচরণ করিয়া রাধা-কৃষ্ণের বিহার বর্ণনা করিয়াছেন। কোথায় বিহার? বৃন্দাবন-বিপিনে। কখন বিহার? বসন্তে!

বৃন্দাবন-বিপিন-প্রত্যক্ষ-যোগ্য। কিন্তু বসন্ত প্রত্যক্ষ-যোগ্য নয়। জ্যোতিষীরা বসন্তকালের চন্দ্র দেখিয়া বলিয়াছেন, ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে বসন্ত ঋতুর আরম্ভ। ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে চৈত্রী পূর্ণিমা, এবং চৈত্রী পূর্ণিমা হইতে বৈশাখী পূর্ণিমা, এই দুই মাস বসন্ত। ফাল্গুনী পূর্ণিমা ও দোল পূর্ণিমা একই। কিন্তু কবি পাঁজি দেখেন না। প্রকৃতির অবস্থা দেখিয়া ঋতু গণনা করেন। এই কারণে জয়দেব বসন্তের প্রাকৃতিক লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। সে সময় বৃক্ষের নবপল্লব উদ্গত হয়, পুষ্প প্রসূত হয়, সুখস্পর্শ মলয় সমীর বহিতে থাকে, কোকিল কুহু কুহু রব করিতে থাকে, অলিকুল গুঞ্জন করিতে থাকে। আর প্রবাসী জনের চিত্ত চঞ্চল হয়। বসন্তে চারি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হয়, কেবল রসনার হয় না। যখন উক্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তখন বসন্ত। বসন্ত রাধাকৃষ্ণের বিহার-কাল। তখন যে বসন্ত, কবি তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

গীত-গোবিন্দে দ্বাদশ সর্গ। তিনি দ্বাদশ বসন্ত-পুষ্প বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমে

ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ কুটিরে॥

সতীশচন্দ্র রায় কৃত পদ্যানুবাদ—

ললিত-লবঙ্গ-লতা আলিঙ্গিয়া, কোমলতা
লয়ে বহে মলয় পবন;
ভ্রমর-ঝঙ্কার সনে পিককুল কল-স্বনে
নিনাদিত নিকুঞ্জ ভবন।*

লবঙ্গ-লতা কেমন গাছ? পূজারি গোস্বামী কিম্বা সতীশবাবু কিছুই লেখেন নাই। এক পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন, লতা-বিশেষ। প্রচলিত সংস্কৃত কোশে নামটি নাই। শব্দকল্পদ্রুমে আছে, লতা-বিশেষ। মধুকর ভ্রমর নয়, মধুমক্ষিকা; কুটিরকে ভবন বলিতে পারা যায় কি? কুঞ্জ লতাগৃহ, কুটির পর্ণশালা। ঠিকই হইয়াছে।

চৌদ্দ পনর বৎসর হইল, বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" পড়িতেছিলাম। কবি তিন চারি স্থানে লবঙ্গের অর্থাৎ লবঙ্গপুষ্পের নাম করিয়াছেন। এক স্থানে আছে—

ফুটিল গুলাল মাল্লী মালতী মাধবীলতা
লবঙ্গ দোলঙ্গ নেআলী।
শেবতী কনকযূথী যূথী কনক কেতকী
পারলি তুলালী॥

বসন্তকালের বর্ণনা। এইরূপ উল্লেখ দেখিয়া লবঙ্গ ফুলের গাছ চিনিতে যত্ন করিয়াছিলাম। দেখি, কেবল চণ্ডীদাসে নয়, পূর্ববঙ্গের "পদ্মাপুরাণে", ভবানন্দের "হরিবংশে", উত্তর বঙ্গের "চণ্ডিকা বিজয়ে" লবঙ্গ-পুষ্পের উল্লেখ আছে। দক্ষিণরাঢ়ের জয়ানন্দ লিখিয়াছেন,—"নারেঙ্গ দোলঙ্গ বিল্ব লবঙ্গান্তঃপুরে।" অতএব লবঙ্গলতা বহুজ্ঞাত সুলভ লতা, অন্তঃপুরেও রোপিত হইত। এমন গাছ বিলুপ্ত হইতে পারে না; এখনও আছে। কিন্তু অন্য নামে আছে।

সংস্কৃত কোশে ও বৈদ্যক কোশে লবঙ্গ সুপরিচিত সুগন্ধি দ্রব্য। ইহার অপর নাম শ্রীপুষ্প, ইহা লবঙ্গতরুর শুষ্ক মুকুল। পূর্বে মালয়-দ্বীপ হইতে আসিত, এক্ষণে আফ্রিকার পূর্বদিগ্‌বর্তী জাঞ্জিবার নামক দ্বীপ হইতে আসিতেছে। মাদ্রাজে ও সিংহলে লবঙ্গ-তরুর উদ্যান হইতেছে। লবঙ্গতরু জামগাছের তুল্য মাঝারি তরু। উক্ত কবিদের লবঙ্গলতা তরু হইতে পারে না। আমরা জানি একের সাদৃশ্যে অন্যের নাম হয়। লবঙ্গলতার কোন্ বিষয়ে হইতে পারে? লবঙ্গতরুর ফুলের আকারে ও গন্ধে লবঙ্গলতার ফুলের সাদৃশ্য থাকিবার কথা। বহুজ্ঞাত এমন ফুল কি হইতে পারে? যূথী (জুঁই ফুল) ভিন্ন আর কোন ফুল মনে হইতেছে না। শ্বেত যূথীর নাম লবঙ্গ হইয়াছিল। কারণ দেখিতেছি উভয়ের আকারে ও গন্ধে সাদৃশ্য আছে। আরও দেখিতেছি যেখানে লবঙ্গ নাম আছে সেখানে যূথী নাম নাই। যূথী দুই প্রকার। যূথী (শ্বেত যূথী) ও হেমযূথী। হেমযূথীর পুষ্প পীতবর্ণ। অমর কোশে নাম হেম পুষ্পিকা। চণ্ডীদাসে ইহার নাম কনক যূথী। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় চণ্ডীদাসের উল্লেখিত বৃক্ষ-নির্ণয়ে লবঙ্গ-পুষ্প চিন্তা করিয়াছি। সেখানে একটা ভুল করিয়াছি। লিখিয়াছি, রঘুনন্দনে যূথীর নাম লবঙ্গ আছে। পরে দেখিয়াছি রঘুনন্দনে নয়, কালিকাপুরাণে (১৪।৪২)

* গীত-গোবিন্দ সংস্কৃত মূল, পূজারি গোস্বামীর টীকা, পদ্যানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত। সতীশচন্দ্র রায় এম-এ সম্পাদিত। কলিকাতা ১৩১৯।

আছে,—"লবঙ্গ-বল্লী সুরভির্গন্ধেনোদ্বাস্যমারুতম্" (লবঙ্গলতা পুষ্প সুরভি গন্ধ দ্বারা পবনকে সুবাসিত করিয়া)। ইহা বসন্তকালের বর্ণনা। চণ্ডীদাসও বসন্তে লবঙ্গফুল ফুটিতে দেখিয়াছিলেন। জুঁইফুল বর্ষাগমে ফুটে, কিন্তু জল পাইলে চৈত্র-বৈশাখেও ফুটিতে দেখিয়াছি।

বিদ্যাপতি বসন্তপুষ্প বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সে সব জয়দেব হইতে লইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥"

জয়দেবের ললিত লবঙ্গলতা কি কুসুমিত হইয়াছিল? হইয়াছিল বলিতে শঙ্কা নাই। কারণ জয়দেব পরে পরে আরও তেরটা বৃক্ষের পুষ্প বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লবঙ্গলতা প্রথমে ধরিয়াছেন। বসন্তের এক নাম পুষ্প-সময়। তিনি পুষ্পশূন্য কোন বৃক্ষের নাম করেন নাই। জয়দেবের টীকায় পূজারি গোস্বামীও লবঙ্গলতাকে পুষ্পিত মনে করিয়াছেন।

লবঙ্গ, লতা-বিশেষ। যে গাছ সোজা দাঁড়াইতে পারে না, বাঁকিয়া নুইয়া পড়ে, অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে গাছ লতা (সং লা ধাতু গ্রহণে)। আর, যে লতা জড়াইয়া জড়াইয়া উঠে তাহা বল্লী। (সং বল্ ধাতু আবরণে)। লবঙ্গলতার তনু সুকুমার। বসন্তাগমে ইহার নবোদ্গত শাখা ও পল্লব চিক্কণ হরিৎকান্তি হয় এবং পরস্পর জড়াইতে জড়াইতে যূথে যূথে ক্ষুদ্র সুগন্ধ পুষ্প প্রসব করে। মলয় সমীর গন্ধবহ হইয়া থাকে।

কালিকা-পুরাণ কামরূপে প্রণীত হইয়াছিল। যে অংশে লবঙ্গবল্লীর উল্লেখ আছে, সে অংশ অষ্টম খ্রীষ্ট শতাব্দে রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত কোশে লবঙ্গের এই দ্বিতীয় অর্থ গৃহীত হয় নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। চণ্ডীদাসের মালতী দ্ব্যর্থ হইয়াছে, (পরে পশ্য)। তিন শত বৎসর পূর্বেও বঙ্গীয় কবিকুল যূথী না বলিয়া লবঙ্গ বলিতেন। কি কারণে লবঙ্গ নাম পরিত্যক্ত হইল, বঙ্গীয় কাব্যামোদী চিন্তা করিবেন।

এখানে বড়ু চণ্ডীদাসের প্রথমোক্ত কয়েকটি বসন্তপুষ্পের পরিচয় করি। "ফুটিল গুলাল মাহ্লী মালতী মাধবীলতা, লবঙ্গ দোলঙ্গ নেআলী"। গুলাল লাল গোলাপ মনে করি। 'গুল' ফার্সী শব্দ অর্থ ফুল। বিশেষার্থ গোলাপ ফুল। গুল+আব=গুলাব, ফুলের জল। গোলাপের সংস্কৃত নাম সেবন্তী (সেঁঅতি) চণ্ডীদাসে শেবতী। চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে" গুলাল ব্যতীত আরও কয়েকটা আরবী ফার্সী শব্দ আছে। মাহ্লী, উচ্চারণ মাল্হী। বাংলা ভাষায় ফলাযুক্ত হ থাকিলে প্রথমে ফলা, পরে হ উচ্চারিত হয়। আমরা লিখি আহ্লাদ পড়ি আল্হাদ। মাহ্লী, মালহী অর্থাৎ মল্লী (বা মল্লিকা)। মালতী বলিলে বর্তমানে বঙ্গীয় পাঠক বৃক্ষারোহী মালতী লতা বুঝিয়া থাকেন। সাধারণ পাঠকের কথা দূরে থাক, বিচক্ষণ ভূয়োদর্শী আয়ুর্বেদবেত্তা কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত তাঁহার "বনৌষধি দর্পণে" মালতীকে বৃক্ষারোহী মালতী লতা বুঝিয়াছেন। তিনি বিভ্রান্ত হইয়া আয়ুর্বেদোক্ত মালতীর লক্ষণের সহিত মিলাইতে পারেন নাই। মালতী লতা বর্ষার শেষে পুষ্পিত হয়, তাহার গন্ধে সন্ধ্যাকালে চারি দিক আমোদিত হয়। "ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল, পরিমল লোভে অলি, আসিয়া জুটিল।" ইহা এই লতা মালতী। সংস্কৃত কোশে কিম্বা বৈদ্যক কোশে এই মালতীর উল্লেখ নাই। অমর কোশে "মালতী সুমনাজাতিঃ" জাতির বাংলা নাম জাই ওড়িয়া নাম জাই, হিন্দী নাম চাম্বেলী, চামেলী। জাতি ও মালতী একই ফুল। একটা গানে আছে—"জাতি যূথী বেলফুল ফুটিল মল্লিকা ফুল।" এই গীতরচয়িতা ঠিকই লিখিয়াছেন। জাতিকেও লতা বলিতে পারা যায়, কিন্তু এই গাছ প্রথমে সোজা উঠে, পরে দীর্ঘ হইয়া নুইয়া পড়ে। জাতি পাথুরে কাঁকুরে মাটিতে সহজে জন্মে ও প্রচুর ফুল ধরে। সচরাচর বর্ষার শেষে ও শরতে ফুল ফুটে। কিন্তু জল পাইলে ফাল্গুন মাসেও ফুটিতে দেখিয়াছি। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে" বৃক্ষারোহী মালতী লতার নাম মধুমালতী। সেখানে আছে "মালতী মধুকর।" ওড়িয়াতেও মধুমালতী। কেহ কেহ না জানিয়া আর এক লতাকে মধুমালতী কেহ বা লবঙ্গলতা বলেন। সে লতা তরু আশ্রয় করিয়া ঝুলিতে থাকে। গ্রীষ্মকালে তাহার সুগন্ধ থোবা থোবা ফুল হয়। প্রথমে সাদা, পরে গোলাপী, পরে রক্তবর্ণ হয়। এই কারণে ইহার নাম রঙ্গিলা হইয়াছে। গাছটি বিদেশী, মালয়দ্বীপ হইতে আনীত। কিন্তু কোন মালতী ফুলের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই। গন্ধে ও আকারে বরং জুঁই ফুলের সহিত সাদৃশ্য আছে।

চণ্ডীদাসের অপর কয়েকটি ফুল চিনিতেছি। মাধবী লতা প্রসিদ্ধ বৃক্ষাশ্রয়ী লতা। দোলঙ্গ, সংস্কৃত নাম মাতুলুঙ্গ। কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত মাতুলুঙ্গের বাংলা নাম টাবা বলিয়াছেন। কিন্তু টাবা অন্য নেবু। মাতু-লুঙ্গের এক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাম বীজপূরক, হিন্দীতে বিজৌরা; উত্তর ভারতে আছে, আজিকালি বঙ্গদেশে এই নেবু প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকে পাতি নামে অতিশয় অম্ল নেবু চিনে। কিন্তু নামে ভুল করিতেছে। পাতি শব্দের অর্থ সামান্য। কলিকাতা অঞ্চলে গোল

নেবুকে পাতি বলে। ইহার ছাল কাগজের মত পাতলা। এই নেবুর নামই কাগজী হওয়া উচিত। ঢাকায় তাহাই আছে। কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে যে নেবুকে কাগজী বলে তাহার ছাল পুরু। ফল সুঘ্রাণ অণ্ডাকার। আয়ুর্বেদে এই সুঘ্রাণ অণ্ডাকার নেবুর নাম 'নিম্বু'। ঢাকায় ইহারই নাম 'লেবু'। পশ্চিমবঙ্গে কাগজী এই ভুল নামের পরিবর্তে 'নিম্বু' রাখা উচিত। কিন্তু পূর্বকালে দোলঙ্গ নেবু প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার সদৃশ এক জাতির নাম ছোলঙ্গ। ঢাকায় ছোলঙ্গ অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে, ছাল পুরু, ফুল সাদা, দলের বহিঃপৃষ্ঠে লাল ছিটা আছে। কবিরাজ মহাশয়েরা ঔষধে প্রয়োগ করেন [পরে জয়দেবের করুণ পশ্য]। ফল বড় ও লম্বা। রস নাতি অম্ল।

নেআলী সংস্কৃত নাম নেপালী; অন্য প্রসিদ্ধ নাম নবমালিকা। জয়দেবও নব মালিকার নাম করিয়াছেন, পরে দেখা যাইবে।

জয়দেব অপর যে সকল বসন্ত-পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি সে সকল উত্তমরূপে চিনিতেন। প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ দিয়াছেন। একে একে দেখিতেছি। ২। বকুল অলিকুলসঙ্কুল কুসুমসমূহে শোভা পাইতেছে। এককালে বকুলের বহু পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। বকুল ফুলের গন্ধ মধুর নহে। বকুলের এক সংস্কৃত নাম মদ্যগন্ধ। ৩। তমাল। কবি লিখিয়াছেন তমালের নবদলের সহিত মৃগমদসৌরভ পুষ্প উদ্ভূত হইয়াছে। বসন্তের আরম্ভে নূতন পত্র ও পুষ্প হয়। কিন্তু পুষ্পের গন্ধ মৃগমদ তুল্য কিনা বলা কঠিন। মৃগনাভির গন্ধ অতিশয় মৃদু, তমাল পুষ্পের গন্ধও অতিশয় মৃদু। ৪। কিংশুক। পলাশ ফুল নারঙ্গ বর্ণ ও নখতুল্য বক্র। কবি ইহাকে মদনের যুবজন-হৃদয়-বিদারণ নখ কল্পনা করিয়াছেন। ৫। নাগকেশরের কুসুম কবির নিকট মদন মহীপতির ছত্রের হেমদণ্ড। নাগ পীতবর্ণ কেশর আছে বলিয়া নাগকেশর, বাংলায় নাগেশ্বর। পুষ্প চতুর্দল, ছত্রের বস্ত্র, মধ্যস্থলে পীতবর্ণ কেশর, পুষ্প সুগন্ধ। বঙ্গদেশে নাগেশ্বরের গাছ সুলভ নয়। ৬। পাটলি। পাটলি বঙ্গদেশে দুর্লভ। বড়ু চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনে পারলি (পাটলি) বৃক্ষ ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, পাটলি নাই কিন্তু কন্যার পারুল নাম বহু প্রচলিত। উত্তরবঙ্গে পারুল আছে। পাটলি হইতে নগরের নাম পাটলিপুত্র। পাটলির ফুল সুগন্ধ গাঢ় নীল-রক্তবর্ণ, এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি দীর্ঘ নল। কবি পাটলি পুষ্পকে মদনের তূণ কল্পনা করিয়াছেন। পুষ্পের মুখে যে অলিকুল, তাহা কবির চক্ষে মদনের বাণ। পাটল শব্দের অর্থ শ্বেত-রক্ত। ইহা হইতে কোন কোন বঙ্গীয় ও মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত পাটলিকে গোলাপ ফুল মনে করিয়াছেন। জয়দেব তাহাদের ভ্রম দূর করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতি পাটলি বর্ণনা জয়দেব হইতে লইয়াছেন। বঙ্গদেশে পাটলি কেন অনাদৃত হইল? ৭। করুণ। করুণ বিগতলজ্জ হইয়া পুষ্পচ্ছলে হাসিতেছে। শব্দ কল্পদ্রুমে ইহার বাংলা নাম করুণা লেবু লিখিত আছে। এই নাম দৈবাৎ অন্য এক পুস্তকে পাইয়াছি। কিঞ্চিদধিক শত বর্ষ পূর্বে ডেনমার্ক দেশীয় ভয়েট্ (Voigt) নামে এক ডাক্তার হাওড়া শিবপুরে প্রসিদ্ধ উদ্যানে পালিত বৃক্ষনাম-মালা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাহাতে করুণ নেবুর বাংলা নাম কোর্ণ নেবু লিখিত আছে। ইহা মাতুলুঙ্গের এক জাতি। ইহাই ছোলঙ্গ। পুষ্প সুগন্ধ। সতীশবাবু বাতাবি নেবু মনে করিয়াছেন। কিন্তু জয়দেবের কালে এদেশে বাতাবি ছিল না। Batavia নগরের নাম হইতে বাতাবি। বাতাবি ফুলের সৌরভ অন্যফুলে দুর্লভ। মাতুলুঙ্গ অর্থাৎ দোলঙ্গ ও ছোলঙ্গ ফুলের সৌরভ মৃদু। ছোলঙ্গ নাম "চৈতন্যচরিতামৃতে" আছে। ৮। কেতকী। কবি দন্তুরিত বিশেষণ দিয়াছেন। কেতকীর মুখ কেমন? কুন্তাকৃতি। কুন্ত কোঁচ—সূক্ষ্মাগ্র ক্ষেপণাস্ত্র। কবির চক্ষে বিরহীজনের চিত্ত ভেদ করিতেছে। ৯। মাধবী। সৌরভ দ্বারা 'ললিত' হইয়াছে। ১০। নব মালিকা। বাংলা নাম নেআলী। "সপ্তলা নব মালিকা" অমর কোশে। কিন্তু এই নাম হইতে 'নব মালিকা' চিনিতে পারা যায় না। কেহ কেহ নব মালিকা ও নব মল্লিকা এক মনে করিয়াছেন। কালিদাসের শকুন্তলা স্বামিগৃহে যাইবার সময় লতাভগিনী সহকার বধূ নব-মালিকার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। আমি ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের প্রবাসীতে নবমালিকা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। নবমালিকা বৃহৎ লতা, আশ্রয়-তরুর শাখা মাল্যের আকারে বেষ্টন করে। মল্লিকাও করে। মল্লিকা একপুট, বেলী দ্বিপুট। অমর কোশের কোন কোন টীকাকার লিখিয়াছেন নব মালিকা সপ্তদলা, এই হেতু সপ্তলা। বৈদ্যক কোশে পাইতেছি নবমালিকা শিখরিণী ও সূচিমল্লিকা, অর্থাৎ দলের অগ্রভাগ সূচিতুল্য। নেপালী নাম হইতে পাইতেছি ইহা পাহাড়্যে, বনভূমিতে জন্মে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি এখানে (বাঁকুড়া নগরে) পশু চিকিৎসালয়ে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত এক লতা দেখিয়াছিলাম। এখন সে গাছটি নাই। উদ্যান-স্বামী এক পাহাড়্যে স্থান হইতে আনিয়াছিলেন। ১১। চূত, আম্র মুকুলিত। মাধবী লতা তাহার শাখা আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। ইহা কবিদিগের এক প্রিয় উপমা ছিল। (১২) দর-বিদলিত মল্লী-বল্লী ঈষৎ বিকশিত মল্লী-বল্লী। এই মল্লী বন মল্লিকা,

কারণ ইহাকে বল্লী বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বৃক্ষারোহী লতা। বেলীও লতার আকার ধরে, কিন্তু বনমল্লিকার তুল্য নয়। বনমল্লিকারই এক নাম নবমল্লিকা। ইহা স্বীকার করিলে জয়দেবের মতে নবমালিকা আর নবমল্লিকা পৃথক গাছ। কবি লিখিয়াছেন মল্লীর পরাগদ্বারা যেরূপ বস্ত্র সুবাসিত হয়, কাননও সেইরূপ সুবাসিত হইয়াছে। এখানে কবি একটু ভুল করিয়াছেন, মল্লীর পরাগ দ্বারা নহে, দল হইতে বিকীর্ণ সৌরভ দ্বারা সুবাসিত হয়। এ বিষয়ে জাতি পুষ্প শ্রেষ্ঠ। চম্পক পুষ্প দ্বারাও বস্ত্র বাসিত হইত।

কবি বসন্তের আর দুইটি পুষ্পবৃক্ষের নাম করিয়াছেন। (১) অশোক সকলের পরিচিত বৃক্ষ। বসন্তে ইহার তাম্রবর্ণ নবপল্লব এবং প্রথমে নারঙ্গ পরে রক্তবর্ণ পুষ্পগুচ্ছ গাঢ় হরিৎ পত্রের মধ্যে উদ্গত হইয়া সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাত্রিকালে পুষ্পের মৃদু গন্ধ পাওয়া যায়। (২) কদম্ব নামে দুই বৃক্ষ বুঝায়। বাংলায় বলে কেলি কদম্ব, কদম্ব। উভয়েরই পুষ্পমঞ্জরী বৃত্তাকার। কেলি কদম্বের ছোট, কদম্বের বড়; কেলি কদম্বের পুষ্প সুগন্ধ, বসন্তে ফুটে। ইহার সংস্কৃত নাম নীপ ও ধূলি কদম্ব। কদম্ব বর্ষাকালে ফুটে, ইহার সংস্কৃত নাম ধারা কদম্ব ও রাজকদম্ব।

কবি বর্ণিত এই চতুর্দশ পুষ্পের মধ্যে কিংশুক নির্গন্ধ। বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম—

"দেখিতে কিংশুক পুষ্প অতি মনোহর।
গন্ধ বিনা কেবা তার করে সমাদর?"

পলাশ জাঙ্গল বৃক্ষ। শুষ্ক ভূমিতে যত্র তত্র জন্মে। কেতকীও জাঙ্গল, অযত্নে বহুস্থান ব্যাপিয়া বাড়িতে থাকে। তমালও বিনা যত্নে জন্মে। অপর একাদশ বৃক্ষ উদ্যান-পালিত। জয়দেব কাহার উদ্যানে নাগকেশর ও পাটলি বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন?

ইদানীং পুষ্পোদ্যান দেখিতে পাই না। কদাচিৎ কোথাও কদম্ব, কনকচাঁপা জন্মিতেছে। কদাচিৎ কোথাও যত্নপূর্বকক চম্পক ও নাগকেশর পালিত হইতেছে। কিন্তু পুষ্পোদ্যান কোথায়, যেখানে নানাবিধ সুগন্ধ প্রসিদ্ধ পুষ্প পাওয়া যায়? গ্রামে গ্রামে দেউল আছে, বিগ্রহের পূজা হইতেছে, কিন্তু পুষ্পোদ্যান কই? কোথাও কোথাও করবী, জবা, কৃষ্ণচূড়া বিদেশাগত গোলঞ্চ ও কলিকা ফুল দেউলের সংলগ্ন ভূমিতে আছে। কিন্তু নানাবিধ ফুলগাছ রোপিত হইতে দেখি না। শাদা ফুল ব্যতীত সরস্বতী পূজা হয় না। কোথাও কোথাও শাদা বকফুলে পূজা হয়। অনেক স্থলে বিদেশী পীতবর্ণ গাঁদাফুলে পূজা হইতেছে। ঢাকায়, ফরিদপুরে, বরিশালে পলাশ ফুলে পূজা হইতেছে। শ্বেতপুষ্পের এমন অভাব। যেখানে নিকটে বন আছে সেখানে বন্য শ্বেত পুষ্পদ্বারা সরস্বতী পূজা হইয়া থাকে। কুন্দ শ্বেতবর্ণ, ইহা মাঘ মাসে ফুটে, এই কারণে ইহার নাম মাঘ্য। গাছ সুদৃশ্য, ফুলের গন্ধ মনোহর। বর্ষাকালেও কুন্দের ফুল ফুটে। এইরূপ সরস্বতী পূজার নিমিত্ত দ্রোণ পুষ্পও আছে। অতি শ্বেত গোলাপ, শীতকালে ফুটে। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, পরের উদ্যানের পুষ্পে দেবদেবীর পূজা নিষিদ্ধ। উত্তম ব্যবস্থা ছিল। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে সেকালে গ্রামে গ্রামে দেবালয়ের সন্নিকটে পুষ্পোদ্যান থাকিত। কলিকাতা মহানগরী। সেখানে চক্ষু, কর্ণ পরিতৃপ্তির বহুবিধ আয়োজন আছে। কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কিছুই নাই। 'পারক্' নামে আরাম আছে, কিন্তু সুগন্ধ পুষ্পবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশবন্ধু পারক্ বৃহৎ, কিন্তু ফুলের গন্ধ কখনও পাই নাই। 'কর্জন গার্ডেন' ছেলেখেলার উদ্যান, 'ইডেন্ গার্ডেনে' বসন্তে ও বর্ষাকালে গিয়াছি, কিন্তু ফুলের গন্ধ পাই নাই। কলেজ চত্বর (স্কয়ার) সুন্দর, ইহার সরোবর সুন্দর, কিন্তু নিরাভরণ, কমল-কুমুদ নাই। চত্বরে বড় বড় গাছ আছে, কিন্তু সুগন্ধ পুষ্প কই? বসন্তে বিবিধ বর্ণের পুষ্পের সুষমা, বিবিধ সৌরভ ও পক্ষীর কাকলি, কলিকাতার তুল্য কৃত্রিম নগরীতে দুর্লভ।

ভবানী তাঁহার খেলাঘর বহুবিধ আকারের, বর্ণের ও গন্ধের পুষ্পদ্বারা সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহারা হতভাগ্য যাহারা দেখিতে পায় না, বলিয়া না দিলে গন্ধ পায় না।

লিপি

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

সূর্য্যদেব, রশ্মিদীপ্ত তীক্ষ্ণ তরবার,
মেঘলোকে ঝলসিত হোক এইবার।
অবরোধ অন্ধকারে তীক্ষ্ণধার হানো,
উজ্জ্বল আলোর বন্যা আনো তুমি আনো।
সূর্য্যদেব, দীপ্তরশ্মি বিকীর্ণ অনল।
কালো মেঘ গলে হোক নব-ধারা-জল।

ফোটে যেন মাঠে ধান, প্রাণে ঝরে গান,
মৃত্যু, মারী কৃষ্ণছায়া হোক অবসান।
পথ হোক লক্ষ পদপাতে মুখরিত,
অগণন জীবনের তরে অবারিত।
দেখা দিক আদিগন্ত আলোর আকাশ,
রৌদ্রদীপ্ত বাঁচিবার উজ্জ্বল উল্লাস।

স্বরাজ···রেলে

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

কুমুদবন্ধু বি. এ. রেলওয়ের পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে কাজ করিতেছিলেন। চেষ্টা-চরিত্র করিয়া বদলির হুকুমগুলা রদ করাইয়া সতের বৎসর এক জায়গায় কাটিল; দু-পয়সা পাইতেন, শহরে জায়গাজমি কিনিয়া বাড়ী-বাগান করিয়া বেশ গুছাইয়া লইয়াছিলেন, এমন সময় গোলমাল আরম্ভ হইল। কলিকাতা, ঢাকা, নোয়াখালি; তাহার পর পার্ব্বতীপুরেও দু-একটা মারামারি গোছের ধাক্কায় সাক্ষাৎ পরিচয় দিয়া গেল। তাহার পর আসিল স্বাধীনতার সঙ্গে দেশ-বিভাগ এবং সেই সঙ্গে লোক-বিভাগও; কর্ম্মচারীদের বলা হইল তোমরা কে কোন্‌দিকে থাকিতে চাও বাছিয়া লও। পরাধীনতার আমলেই পাকিস্থানী স্বাধীনতার নমুনা পাওয়া গিয়াছিল, কুমুদবন্ধু হিন্দুস্থানের সপক্ষে নাম লিখাইলেন। কিছুদিন পত্রাচারে কাটিল, তাহার পর যখন এদিকেও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, ওদিকেও আশার কোন লক্ষণ নাই, এমন সময় যুক্তপ্রদেশের একটি বড় রেল আপিস হইতে ডাক পড়িল, পার্ব্বতীপুরের সতের বৎসরের বাস উঠাইয়া কুমুদবন্ধু সপরিবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিতান্ত কম নয়—নিজে, স্ত্রী, দুইটি কন্যা, চারিটি পুত্র—বছর দশের মধ্যে; বিধবা এক দিদি, তাঁহার একটি ছোট দৌহিত্র।

আসিয়াই একেবারে অকূলে পড়িলেন।

প্রথম সপ্তাহটা প্ল্যাটফর্ম্মে কাটাইতে হইল। তাহার পর ওয়েটিং-রুমের সামনের বারান্দায়। দিদি মহামায়া খুব শক্ত মেয়েমানুষ, কিন্তু তিনিও এক সপ্তাহের অধিক অগ্রসর হইতে পারিলেন না; তবে লড়াইয়ের জন্য পা পুঁতিবার একটা জায়গা পাইলেন এবং দুই দিন পরেই ওয়েটিং রুমের একটি কোণ স্বীয় পরিবারের জন্য দখল করিলেন।

কোন ব্যবস্থা নাই, অসংখ্য লোক পূর্ব্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রতিদিনই আরও আসিতেছে। কাহারা ডাকিতেছে, কি উঠেছে, কিছুরই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সকালবেলায় উঠিয়া মহামায়া তোলা উনানে ওয়েটিং-রুমের মধ্যেই রান্নার ব্যবস্থাটা করিয়া ফেলেন, দুইটি কোনরকমে নাকে মুখে গুঁজিয়া কুমুদবন্ধু সেই যে বাহির হন, ফেরেন একেবারে সন্ধ্যার সময়। ইহার মধ্যে কত আপিস ঘোরেন, কত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—কোনো ফলই হয় না। রেলটার অব্যবস্থার কথা পূর্ব্বে শোনা ছিল, কিন্তু সেটা যে এ ধরণের কিছু হইতে পারে এমন জানা ছিল না। মাসখানেক ওয়েটিং-রুমে কাটিল, পশ্চিমের শীত বেশ ভাল করিয়া ঝাঁকিয়া আসিতেছে, দিদির মেজাজ অত্যন্ত বিগড়াইয়া যাইতেছে, প্রত্যহই ওয়েটিং-রুমটায় রান্নাঘরের ধোঁয়া জমিয়া উঠিলে ষ্টেশন মাষ্টার থেকে ষ্টেশনের যত কর্ম্মচারী আসিয়া দরজার বাহিরে জমা হয়, ওদিকে মহামায়াও আসিয়া দাঁড়ান, গাছকোমর বাঁধা, হাতে খুন্তি, মুখে তুবড়ি ছুটিতে থাকে—"ড্যাকরারা, অলপ্পেয়েরা, ডেকে এনে না দেবে চাকরি, না দেবে থাকবার জায়গা, ঐ ম্লেচ্ছ কাপড়-চোপড় নিয়ে আমার রান্নাঘরের চৌকাঠের এদিকে পা দিলে একধার থেকে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব! আয় না, হেম্মৎ থাকে আয়!"

এংলো-ইণ্ডিয়ান ষ্টেশন মাষ্টার একবার দায়ে খালাস হওয়া গোছের চেষ্টা করিয়া সরিয়া পড়ে, বেচারাদের দুর্দিন পড়িয়াছে, এখন সবই সম্ভব, দেশী কর্ম্মচারীরাও একে একে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়, মহামায়াই রোজ জেতেন, কিন্তু এ ভাবে আর চলে না। কুমুদবন্ধুর কতবার মনে হইয়াছে আবার পার্ব্বতীপুরে গিয়াই যেমন করিতেছিলাম সেইরূপ চাকরি করি, কিন্তু কয়েকবারই সন্ধান লইয়া জানিয়াছেন ও-পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এদিকে এরা মুসলমানদের জন্য দুয়ার খুলিয়া রাখিলেও, ওদিকে ওরা অর্গলিত করিবারও হাঙ্গাম রাখে নাই, দুয়ারের জায়গায় দেয়াল তুলিয়া দিয়াছে, আর কোন আশাই নাই।

শীত প্রচণ্ড হইয়া আসিল, হাতের পয়সাও ফুরাইয়া আসিয়াছে, অবশেষে তিক্তবিরক্ত হইয়া কুমুদবন্ধু চাকরির আশা ত্যাগ করিয়া নিতান্তই অদৃষ্টের ওপর নিজেদের ছাড়িয়া বাড়িতে ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছেন, এমন সময় পার্ব্বতীপুর আপিস ঘুরিয়া তাঁহার হাতে একখানি বড় খাম আসিয়া পড়িল। খুলিয়া দেখিলেন—তাঁহার চাকরি হইয়াছে এই ষ্টেশনেই হিসাবের সেরেস্তায়; বাসাও ঠিক হইয়াছে, একখানি চার চাকার, অর্থাৎ সবচেয়ে যা ছোট সেই রকম মালগাড়ি। কুমুদবন্ধু ওটাকে লেখা-পড়া করাইয়া আট চাকার করাইয়া লইলেন, এর পিছনে এংলো-ইণ্ডিয়ান ষ্টেশন মাষ্টার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের যে অক্লান্ত চেষ্টা ছিল এটুকু না বলিলে অধর্ম্ম হয়, অবশ্য তাহার পিছনে ছিল মহামায়ার ক্ষুরধার জিহ্বা।

ওয়েটিং-রুম ছাড়িয়া সকলে নূতন সচল বাসায় গিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।

২

একেবারেই অভিনব ধরণের পল্লী। বিরাট ষ্টেশন-প্রাঙ্গণের একধারে এমন প্রায় দেড়শ'খানা মালগাড়ী, চার

চাকার, ছয় চাকার, কয়েকখানা আট চাকারও, ঐ এক একখানা বাড়ি। অসহ্য কষ্ট, জায়গা নাই, দিনের বেলায় তাতিয়া উঠে, শীতের দিন বলিয়া আরামের না হইলেও খুব বেশী কষ্টও হয় না, কিন্তু রাত্রে অসহ্য ; প্রায় সবই পূর্ব্ববঙ্গের লোক, পশ্চিমের নিদারুণ শীতে যেন জমিয়া যাইবার মত হয়। কয়লাও প্রচুর নয়, সন্ধ্যার একটু আগে প্রত্যেক বাসার সামনে সারি সারি তোলা উনুনে আগুন জ্বলিতে থাকে, সমস্ত পাড়াটা ধূমে ধূম্রাকার হইয়া ওঠে ; উনুন ধরিলেই সেগুলা গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া যায়, তাহাতে রান্না, তাহাতেই যতটা সম্ভব তাপ সঞ্চয়। শেষ রাত্রে শীতে আর কাহারও ঘুম হয় না, সবাই গুটিসুটি মারিয়া বসিয়া থাকে।

তবুও মানুষ পরের দুরবস্থা দেখিয়া আশ্বাস পায়, শত শত লোক প্ল্যাটফর্মে পড়িয়া আছে, এ তবুও তো একটা আচ্ছাদন। দিনের বেলা এই দুঃখের জীবন থেকে যতটা পারে রস নিংড়াইয়া লয় লোকেরা, ছেলেরা ছুটোপুটি করে, গৃহিণীরা বৌ-ঝিয়েরা এ বাসা সে-বাসা ঘুরিয়া আলাপ করিয়া বেড়ায়, কোয়ার্টাসের জন্ত কোথায় কোথায় ইট পড়িতেছে সেই সব আলোচনা লইয়া আশায় বুক বাঁধে।...মানুষের সবই সয়, তা ভিন্ন এটা বিশেষ করিয়া সহিবারই যুগ, একটা কল্পনার ভবিষ্যৎ গড়িয়া লইয়া মানুষ কল্পনাতীত এই বাস্তব বর্তমানকে ভুলিতেছে। কুমুদবন্ধুর পরিবারও ধীরে ধীরে এই দলে মিশিয়া যাইতেছে। পঞ্জাবে যা কাণ্ড হইতেছে সে হিসাবে এ ত স্বর্গ, পার্ব্বতীপুরের কথা আর ভাবাও যায় না।

কিন্তু এ স্বর্গও কপালে বেশী দিন টিকিল না।

প্রথমটা বাদ সাধিল পয়েন্টস্‌ম্যান রামদিন, পাইলট ড্রাইভার করিম শেখের সহযোগিতায়। অবশ্ব ভুল করিয়াই, তবে সে-ভুলেও এই রেলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে।

বাসাগুলি ষ্টেশন-প্রাঙ্গণের নিতান্ত একদিকে পড়িয়া আছে বটে তবে একেবারে যে স্থাণু এমন নয়। লাইনের ওপর মাঝে মাঝে চলাফেরা করে। প্রত্যহ নূতন বাসা আসিতেছে, তাহাদের জায়গা দিতে হয়, রোজই দু'একখানা করিয়া পুরানো বাসা স্থানান্তরিত হইতেছে, হয়ত কেহ অন্ত ষ্টেশনে বদলি হইল, হয়ত কোন বাসার অধিকারী পাকা কোয়ার্টার্স পাইল, তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। ডিপার্টমেন্টে হুকুম দেয়, পয়েন্টস্‌ম্যানের নির্দেশে পাইলট ইঞ্জিনে কাজটা সম্পন্ন করে। ছেলেমেয়েরা, বধূ-গৃহিণীরা মাঝখান থেকে খানিকটা গাড়ি চড়ার আনন্দ উপভোগ করিয়া লয়। এমনও হয় কর্তা আপিস থেকে আসিয়া দেখেন বাসা নাই, হয়ত লাইনের ভেতরের দিকের একটা বাসা অন্ত ষ্টেশনে বদলি হইয়াছে, তাঁহার বাসাটিকে পথ ছাড়িয়া অন্ত লাইনে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। খানিকক্ষণ পরে পাইলট ইঞ্জিন আবার ল্যাজে করিয়া আনিয়া রাখিয়া গেল।

এই রকম কিছু একটা ব্যাপার কুমুদবন্ধুর বাসা লইয়াও হইতেছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলায়।—

পয়েন্টস্‌ম্যান রামদিনের ডিউটির শেষ দিক এটা, এটুকু শেষ করিয়া নিজের বাসায় যাইবে, এক লোটা ভাঙ তৈয়ার আছে সেবন করিয়া দড়ির খাটিয়ায় গা এলাইয়া দিবে ; একটু ব্যস্ত আর অন্তমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। পাইলট করিম শেখের ডিউটির এই আরম্ভ, একটু বাঁধা-মাত্রার নেশা করিয়া কাজে নামে, কাজ করিতে করিতে সেটা কাটিয়া যায় ; ঠিক কাটার অবস্থাটা এখনও দাঁড়ায় নাই।

কুমুদবন্ধু আপিস থেকে ফিরিয়া একটু জলযোগ করিয়া এই সময়টা ক্লাবে যান, সেখানেই গেছেন। শীত বেশ জমিয়া আসিয়াছে। লোহার উনুনটা ধরিয়া গেছে, সেটাকে গাড়ির মধ্যে তুলিয়া দু'দিককার ঝাঁপ বন্ধ করিয়া রান্নার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় রামদিনের গলার 'হুঁসিয়ার ! হুঁসিয়ার !' শব্দ হইল এবং পাইলট আসিয়া আস্তে আস্তে গাড়িটার সঙ্গে যুক্ত হইল। মহামায়া দরজার ফাঁক দিয়া মুখটা বাড়াইয়া বলিল,—"কে, রামদিন ? আমরা রান্না আরম্ভ করেছি, আস্তে নাড়াচাড়া করতে বলো ড্রাইভারকে।"

"আপনি মজেসে রসুই করুন মাইজি, কুছু ডর নেই"—বলিয়া রামদিন কাপলিংটা বসাইয়া দিল, ইঞ্জিন ধীরে ধীরে বাসা লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

খানিকটা দূরে অন্ত একটা লাইনে গাড়িটাকে দাঁড় করাইয়া ইঞ্জিনটা আবার এই লাইনে প্রবেশ করিল, কুমুদবন্ধুদের পাশের গাড়িটা জুড়িয়া আবার সেই ভাবে বাহির করিয়া লইয়া প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি একটা লাইনে রাখিয়া আসিল। অন্ত দুই-তিনটা লাইনে প্রবেশ করিয়া আরও গোটাকতক গাড়ি লইয়া ঐ রকম টানা-পোড়েন করিল, ততক্ষণে রাত্রি হইল, রামদিনের ডিউটি শেষ হইয়া আসিল, পরের পয়েন্টস্‌ম্যান্ রামচরিত্তরকে কোথায় কোন্ গাড়ি যাইবে, কোন্ গাড়ি বাহির হইবে সব বুঝাইয়া দিয়া নিজের কোয়ার্টাসে চলিয়া গেল।

৩

রাত্রি প্রায় নয়টায় সময় এই মাস দুয়েকের অভ্যাসমত ইয়ার্ডের বিদ্যুতের আলো আর টর্চের সাহায্যে লাইন ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া যথাস্থানে আসিয়া কুমুদবন্ধু সেজ ছেলের নাম ধরিয়া ডাকিলেন—"ওবিনেশ !"

অবিনাশ দোরের কাছে কিছু জিনিসপত্র থাকিলে সরাইয়া লইবে তাহার পর কুমুদবন্ধু গাড়িতে উঠিবেন, এই হইতেছে প্রাত্যহিক ব্যবস্থা, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। দারুণ শীত, আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া হি-হি করিতে করিতে কুমুদবন্ধু আবার হাঁকিলেন—"ওবিনেশ, শুনছিস না জিনিসগুলো সরিয়ে দে, উঠব..."

বন্ধ দরজা খুলিয়া উঠিতে যাইবেন, ভিতর থেকে একটি পশ্চিমা ছেলে বলিল—"ই গাড়ি নেহি।"

"তবে!"—বলিয়া কুমুদবন্ধু তিন হাত পিছাইয়া আসিলেন। ঠাহর করিয়া দেখিলেন এটা তাঁহার পাশের গাড়িটা, পাশাপাশি তিনটা আট চাকার লম্বা গাড়ি ছিল, তাই ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন দারুণ শীতের এই জবড়জঙ্গ অবস্থায়। সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু শীত ছাড়িয়া গিয়া কালঘাম ছুটিল—তাহা হইলে তাঁহারটা কোথায়?

সেই ছেলেটিকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আমারটা কোথায় তা হলে?"

"শান্টিংসে লে গিয়া।"

"কখন?"

"সামকো।"—অর্থাৎ সন্ধ্যার সময়

"কোথায়? কোন্ দিকে? এখনও ফেরেনি কেন?"

ছেলেটি তিনটি প্রশ্নের কোনটিরই উত্তর দিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কুমুদবন্ধুর মুখ দিয়া কোন প্রশ্ন সরিল না। এরকম ব্যাপার এখানে কয়েকবার হইয়াছে, একবার তিনিও ভুক্তভোগী, কিন্তু সে কয়েক মিনিটের জন্য, বড় আধঘণ্টা; আপিস হইতে আসিয়া দেখেন বাসা নাই, তাহার পর তখনই আবার পাইলট ইঞ্জিন রাখিয়া গেল। এ যে সন্ধ্যা থেকে উধাও, রাত ন'টাতেও দেখা নাই!

তৃতীয় গাড়িটা এক জন বাঙালীর, এক আপিসেই কাজ করেন, কুমুদবন্ধু বাবু সামনে গিয়া ডাকিলেন—"গোপেশবাবু!"

গাড়ির দরজা খুলিয়া গোপেশবাবু মুখ বাহির করিলেন।

"আমার গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না মশাই!"

"তার মানে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনলাম সন্ধ্যের সময় শান্টিঙে নিয়ে গিয়েছিল—নিশ্চয় মিশিরজীর গাড়িটা বের করবার জন্যে, তাঁর ত বদলি হয়ে গেল?—সেই থেকে এখন পর্য্যন্ত ফিরে আসে নি—সব নেশাখোরদের কাণ্ড, কারুর ত নজর নেই এদিকে…"

"কাছাকাছি ইয়ার্ডটা দেখেছেন?"

"না, দেখি নি এখনও, এই শুনলাম সুরজপ্রসাদবাবুর ছেলের কাছে?"

"দাঁড়ান, আসছি।"

ওভারকোট, র‍্যাপার, কম্ফর্টারে আপাদমস্তক ঢাকিয়া গোপেশবাবু নামিয়া আসিলেন। দুই জনে কাছাকাছি সমস্ত ইয়ার্ড খুঁজিলেন, তাহার পর দূরেও; পয়েন্টসম্যান, পাইলট ড্রাইভার দুই জনকে প্রশ্ন করিলেন, গাড়ির কিন্তু কোন হদিস পাওয়া গেল না। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হয়রাণ হইয়া অবশেষে ইয়ার্ডের এক প্রান্তে দেখা গেল একটি আট চাকার গাড়ি একক দাঁড়াইয়া আছে। আশায় বুকটা ধড়াস ধড়াস করিয়া উঠিল, তাহার পর দুই জনে আগাইয়া নম্বরের উপর টর্চ ফেলিয়া দেখেন মিশিরজীর গাড়িটা। ডাকাডাকি করিয়া মিশিরজীকে তুলিলেন, খবর পাইলেন পার্শেল এক্সপ্রেসের পেছনে তাঁহার গাড়ীটা আজ জুড়িয়া তাঁহার নূতন কর্ম্মস্থানে পৌঁছাইবার কথা ছিল, কিন্তু জোড়ে নাই। কারণটা জিজ্ঞাসা করায় এই রেলওয়েটাকে একটা কুৎসিত গালাগাল দিয়া বলিলেন—কারণ তিনি জানেন না, শুধু এইটুকুই জানেন এ রেলে সবই সম্ভব, যবে খুশী লইয়া যাইবে, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছেন।

কি সর্ব্বনাশ যে হইয়াছে বুঝা গেল দুই জনে ষ্টেশনে ছুটিলেন। ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিয়া জানাইলেন—তাঁহার গাড়ীটা ভুলক্রমে সাতটা বাইশের পার্শেল এক্সপ্রেসে যুক্ত হইয়া ষ্টেশন ছাড়িয়া গিয়াছে, সন্ধান লইয়া সেটাকে আটকানো দরকার। সমস্ত ব্যাপারটা আত্যোপান্ত বলিয়া গেলেন।

এ ধরণের বা এর চেয়েও গুরুতর এত ব্যাপার নিত্য হইতেছে এ রেলে যে, ষ্টেশন মাষ্টারের মুখে বিশেষ কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। অলসভাবে টেলিফোনটা তুলিয়া লইয়া ডাকিলেন—"হ্যালো, কনট্রোল!…"

সাড়া পাওয়া গেলে প্রশ্ন করিলেন—

"সেভেন্টি-সিক্স ডাউন পার্শেল এখন কোথায়?"

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা, গাড়ীটা সব জায়গায় ধরে না, চার ঘণ্টায় অনেকগুলি ষ্টেশনই পার হইয়া গিয়াছে, কনট্রোল একটু অনুসন্ধান করিয়া সঠিক অবস্থানটা জানাইল, রাস্তায় আছে আর মিনিট পাঁচেক পরেই একটা বড় ষ্টেশনে পৌঁছিবে।

ষ্টেশন মাষ্টার ব্যাপারটা জানাইলেন—অমুক নম্বরের গাড়ী অমুক ষ্টেশনে যাইবার কথা, তাহার স্থানে ভুলক্রমে অমুক নম্বরের গাড়ী চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে খুলিয়া লইয়া পরবর্ত্তী এক্সপ্রেস বা কোন প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে জুড়িয়া পাঠাইয়া দিতে হইবে। নির্দ্দেশটুকু দিয়া ফোন ছাড়িয়া তিন জনে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া রহিলেন। একটু যে গল্প হইল তাহাতে ষ্টেশন মাষ্টার জানাইলেন—"ও গাড়ী এখন বিশ-বাঁও জলে।"

"কেন?"

একটু হাসিয়া নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলিলেন—"এই দেখুনই না, এটা কি রেল ভুলে যাচ্ছেন যে, এর নামই পড়েছে ওল্ড টায়ার্ড…"

এমন সময় টেলিফোনটা বাজিয়া উঠিল, ষ্টেশন মাষ্টার তুলিয়া লইয়া সাড়া দিলেন—"হ্যালো…ইয়েস…তাই নাকি? …তা হ'লে?…বেশ, পার্টি বসে আছেন ততক্ষণ…খোঁজ নিয়ে বলুন।"

টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া কতকটা বিজয়ের হাসি হাসিয়াই বলিলেন—"ঐ নিন, সে গাড়ী পৌঁছোয়ই নি ও ষ্টেশনে। আপনাকে বললাম না?"

"পৌঁছোয় নি! তা হলে?"—কুমুদবন্ধু একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

"থামুন খোঁজ নিচ্ছে। এ ষ্টেশনে আবার গার্ডের বদলি হ'ল, আগেকার গার্ড রানিং-রুমে চলে গিয়েছে, তার কাছে লোক পাঠানো হয়েছে।"

"কিন্তু সে তো সমস্ত চার্জ্জ বুঝিয়ে যাবে…"

"বোধ হয় এটা ছেড়ে গিয়েছে…রেলটা যে কি ভুলে যাচ্ছেন যে আপনি—এর আগেকার নাম রেখেছিল—বদমাইস, নালায়েক…"

এমন সময় টেলিফোনে শব্দ হইল—ষ্টেশনমাষ্টার আবার তুলিয়া লইলেন—

"হ্যালো ?…আচ্ছা…বেশ…আচ্ছা…আচ্ছা…"

টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া সেই রকম নিরুদ্বেগ কণ্ঠে জানাইলেন টেলিফোনে বলিতেছে—এ ষ্টেশন ছাড়িয়া পরের ষ্টেশনে পৌঁছাইতে গাড়ীর শেষের দিকের মালগাড়ী থেকে একটা কান্নাকাটি হট্টগোল ওঠে। ষ্টেশনের সবাই জড়ো হইয়া টের পায়—এক গাড়ীর বদলে অন্য গাড়ী জুড়িয়া লইয়া চলিয়াছে পার্শেলটা। গাড়ীটাকে কাটিয়া ষ্টেশনের সাইডিঙে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এদিকে ওমুখো আর গাড়ী নেই, একেবারে শেষ রাত্রির দিকে এক্সপ্রেস, তাহাতেই জুড়িয়া ফেরত দেওয়া হইবে।

আর কিছুই তাহা হইলে করিবার নাই। বেশী দূর নয়, এদিক থেকে ধরিলে ছয়টা ষ্টেশন পরেই, কিন্তু ডাউনেরও কোন গাড়ী নাই যে, কুমুদবন্ধু গিয়া পরিবারের সঙ্গে মিলিত হন। মালগাড়ী থাকিলেও চলিত, কিন্তু খবর পাইলেন যে তাহাও আর নাই; একটা ছিল, মিনিট দশ হইল ছাড়িয়া গিয়াছে।

ষ্টেশনমাষ্টার আর একটা খবর দিলেন। এই ধরণের দুর্ঘটনার সম্প্রতি বাড়াবাড়ি হওয়ায় এর জন্য আপিসে একটা বিভাগই খোলা হইয়াছে, সকাল ছয়টা হইতে বসে। এক্সপ্রেসে যদি মালগাড়ীটি আসিয়া না পড়ে, কুমুদবন্ধু যেন আপিসেই খবর নেন, কেননা সকাল থেকে ষ্টেশন কর্ম্মচারী-দের হাতে কাজের চাপ, ইচ্ছা থাকিলেও এই রকম টেলিফোন ধরিয়া সাহায্য করিতে পারিবে না। আপিসটার সন্ধানও দিয়া দিলেন।

কুমুদবন্ধু একটু ভীত ভাবেই বলিলেন—"সকালের এক্স-প্রেসে নিশ্চয় এসে পড়বে…"

ষ্টেশন মাষ্টার শুধু একটু মুচকি হাসিলেন, বলিলেন—"এসে পড়ে ভালই, আপনাকে আর আপিসে দৌড়াতে হবে না।"

৪

এক্সপ্রেসটা পৌঁছবার সময় পাঁচটা, সাড়ে সাতটায় আসিল। মালগাড়ীটা নাই। কুমুদবন্ধু চারিটা থেকে আসিয়া বসিয়া আছেন, অবসন্ন শরীরে নূতন আপিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

একটি ছোট ঘর, মাঝখানে টেবিলের সামনে এক জন অত্যন্ত স্থূল, আধ-বুড়ো-গোছের ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, বাঙালীই। অন্য একটি টেবিলে মুখোমুখি হইয়া দুই জন পশ্চিমা ছোকরা কেরাণী, এক জন টাইপিং লইয়া আর এক জন কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত রহিয়াছে। শীতের সকাল, তায় নূতন আপিস, এখনও অনেকে সন্ধানই জানে না, তবুও কাউণ্টারে পাঁচ-সাত জন লোক ভিড় করিয়া রহিয়াছে।

কুমুদবন্ধু দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমি রেলেরই লোক, এই ষ্টেশনেই থাকি, ভিতরে আসতে পারি কি ?"

"আসু-ন"—ভদ্রলোক টানিয়া কথাটা বলিয়াই কাশিতে আরম্ভ করিলেন, সেই অবস্থাতেই ডান হাতটা সামনের চেয়ারের দিকে বাড়াইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। গলায় একটা কম্ফর্টারের ওপর র‍্যাপার জড়ানো, কাশিটা থামিলে দুটাকেই আরও টানিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি ব্যাপার ?"

"একটা বড় বিপদে পড়া গেছে—ইয়ে, পাকিস্থান থেকে এসেছি, আছি মালগাড়ীতে, কাল সন্ধ্যেয় সেটা পার্শেল এক্সপ্রেসে…"

"টেনে নিয়ে গেছে ?…প্রাতর্বাক্যে বলা ঠিক নয়, কিন্তু আর আশা নেই…

"আশা নেই কি মশাই !"

ভদ্রলোক টানিয়া টানিয়া কথা বলেন, এদিকে একটা তন্দ্রাচ্ছন্নভাব লাগিয়া আছে, তুড়ি দিতে দিতে হাই তুলিলেন, তাহার মাঝখানেই কাশি আসিয়া পড়িল, সব শেষ হইলে বলিলেন—"আৎমারাম, লষ্ট্ ওয়াগন্‌স্‌কা ফাইল সব উতারো তো।"

কুমুদবন্ধু লক্ষ্য করিলেন আপিস নূতন হইলেও ফাইলের গাদা লাগিয়া গেছে এরই মধ্যে, এক জন কেরাণী উঠিয়া কাঠের র‍্যাক্ থেকে এক থাক্ নামাইয়া আনিল। ভদ্রলোক সেই রকম অলস কণ্ঠে বলিলেন—"ঐ দেখুন, বিশ্বাস না হয়—পঁয়ত্রিশখানা মালগাড়ী সমস্ত লাইনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মা-বাপ নেই…ক্লাসিফিকেশন্, আৎমারাম…?"

"টেন্ উইথ্ ফ্যামিলি হুজুর, অলেভুন উইথ্ ফ্রেট্, ফোরটিন এম্‌প টি…"

"ঐ দিন—দশখানা আপনার মতন পরিবার নিয়ে, এগার-খানার মাল, বাকি খালি। …প্যাঁকাল মাছের মতন পিছলে পিছলে বেড়াচ্ছে সমস্ত লাইনে, ধরবার উপায় নেই, আজ খোঁজ পেলেন এই পাশের ষ্টেশনে, ধরবেন ক্যাঁক করে, কাল খবর এল এক শ' মাইল দূরে একটা সাইডিঙে পড়ে আছে…"

হাই তুলিয়া কাশিয়া কম্ফর্টার, র‍্যাপার টানিয়া দিয়া বলিলেন—"খেলে কচুপোড়া; বুড়ো বয়সে বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে এসে এক হেঁড়া ভাতা হাতে দিয়ে…তার পর আর কিছু পেয়েছেন খবর, না ঐ পর্য্যন্ত ?"

কুমুদবন্ধুর মুখ একেবারে শুকাইয়া গেছে, বলিলেন—"কাল রাত্তিরে খবর পাওয়া গেল এখান থেকে পাঁচটা ষ্টেশন আগে একটা সাইডিংএ পড়ে আছে—এদিককার নামগুলোও মনে থাকে না—পার্শেলের কার্ট্ ইপেক্ আর কি—ঠিক ছিল সকালের এক্স্প্রেসে জুড়ে নিয়ে আসবে, তা আসে নি।"

ভদ্রলোক অলস ভাবে টেলিফোনটা তুলিয়া লইলেন, ডাকিলেন—"হালো কণ্ট্রোল!…" সাড়া পাওয়া যাইতে আগাগোড়া সমস্ত খবরটা দিয়া গেলেন। তাহার পর টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া বলিলেন—"খোঁজ নিচ্ছে।"

একটু যে সময় পাওয়া গেল তাহাতে নিজের দুঃখের কথা তুলিলেন—নাম অনুকূল ভাদুড়ী—রিটায়ার করিয়া বসিয়াছিলেন—ছোট মেয়েটির বিবাহ দিয়া এইবার দু'জনে কাশীবাসী হইবেন, আবার ডাকিয়া : এই ফ্যাসাদ—হাতে আছে পাত্র-টাত্র একটা?—এই পেটে একটু খিদে থাকে—কিছু জমি-জমা—নেহাত চাকরির ওপরই না ভরসা…"

এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। তুলিয়া বলিলেন—"হালো!·আচ্ছা…ঠিক…"

রাখিয়া দিয়া একটু বিজয়ের হাসি হাসিয়াই বলিলেন—"ঐ নিন্, যা বলেছিলাম—সে গাড়ী ও ষ্টেশনে আর নেই…"

"বলেন কি!—নেই?…আমি ভেবেছিলাম বুঝি ভুলে…"

"নেই।…তার কারণ হয়েছে, হাণ্ড্রেড্ টোয়েন্টি সিক্স ডাউন্ গুডস্ রাত আড়াইটের সময় শান্টিং করতে করতে ভুল করে তুলে নিয়ে গেছে।"

"তার পর!"

"কোন্ ষ্টেশনে ড্রপ করলে খবর পেতে দেরি হবে, এক এক করে জিগ্যেস করবে তো?"

বহু দূরে দুইটা ষ্টেশনের নাম করিয়া বলিলেন, মালগাড়ীটা এখন সেই দুইটার মাঝখানে ঘণ্টা দুয়েক তার কোন খবর নাই, হয়তো ইঞ্জিন ফেল করিয়া মাঝ পথে দাঁড়াইয়া আছে।"

তাহার পর একটু নিম্ন কণ্ঠে বলিলেন—"ফেলই কি করে সব সময় মশাই? মাঝপথে দাঁড় করিয়ে এটা ঠুকছে ওটা ঠুকছে, ওদিকে ওয়াগনকে ওয়াগন্ খালি করে মাল সরিয়ে নিচ্ছে—ট্রিক্স্!…আমরাই কিছু করতে পারলাম না।"

উপায় নাই, একবার আপিসে বাহির হইবার সময় এদিক হইয়া যাইতে বলিলেন—যত দূর সম্ভব খোঁজখবর লইয়া রাখিবেন। মেয়ের বিবাহের কথাটা মনে রাখিতে বলিলেন—"আমরা হলাম ভাদুড়ী—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—বাগচি, সান্যাল—মানে ভাদুড়ী ছাড়া আর যা হয়—ছেলেটির যেন খাওয়ার-পরবার একটু সংস্থান থাকে ..."

৫

এগার দিন হইয়া গেছে গাড়ীর কোন সন্ধান নাই; ঠিক যে সন্ধান নাই এমন নয়, পাওয়া যাইতেছে খবর, সব ব্যবস্থা ঠিক, আবার কি করিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, আজ এক জায়গায়, কাল হয় তো দেড়শ' মাইল দূরে। খামতিনেক চিঠিও পাইলেন, হতাশায় ভরা, আর গালাগালি—রেলওয়েকে আর এমন রেলওয়েতে কাজ করার জন্য অনুকূলকেও।

অনুকূলও একেবারে আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বারদুয়েক সব ঠিকঠাক করিয়া নিজে পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আগেই গাড়ী উধাও হইয়াছে, একেবার সামনের দিকেই, একবার এদিকে আসিয়া পাশের একটা জংশন ষ্টেশন হইয়া ব্রাঞ্চ লাইনে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

হতাশায় হতাশায় এমন অবস্থা হইয়াছে যে একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গেছে আর ইহজন্মে পাওয়া যাইবে না। দিনে তিন-চারবার করিয়া আপিসে যান, খোঁজ পান অমুক ষ্টেশনে রহিয়াছে, তাহার পর আবার নিরুদ্দেশ; অনুকূলবাবু নির্ব্বিকার কণ্ঠে মেয়ের জন্য পাত্রের কথা তোলেন। সর্ব্বোচ্চ অফিসার পর্য্যন্ত চিঠি লিখিয়া লিখিয়া হয়রাণ হইয়া গেছেন, সবগুলা অনুকূলবাবুর আপিসে আসিয়া জমা হয়। একটা ফাইল খোল' হইয়াছে, সেটা দিন দিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। এদিকে ফাইলের সংখ্যাও পঁয়ত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাউণ্টারে লোকদের ভিড়, গুলতন গেছে বাড়িয়া।

মরিয়া হইয়া এক ঝোঁক গাড়ীর সন্ধান লইতে লইতে এক নাগাড়ে পাঁচ দিন সমস্ত লাইনটা এমুড়ো ওমুড়ো চষিয়া ফেলিলেন, ধরা গেল না। পশ্চিমের শীতে, অনিয়মে শরীর ভাঙিয়া গিয়াছে, আবার হেড কোয়ার্টারে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর ব্যাপারটা চরমে আসিয়া ঠেকিল।

একদিন নিজের আপিসে চেয়ারে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, পাশের সঙ্গী কেরাণীরা যখন যাহার অবসর হইতেছে সান্ত্বনা দিতেছে—গাড়ী যখন লাইনের ওপরই আছে, ভয় কি?—একদিন না একদিন পাওয়া যাবেই·এ তো সমুদ্র নয়, কোথায় ঝড়ে ডুবিল, কোথায় পাহাড়ে ঠোকর লাগিল…এ যতই কিছু হোক, বাঁধা লাইন ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না… ঐ তো পঞ্জাবে পরিবারকে পরিবার নষ্ট হইয়া গেল, এ তো তাহার চেয়ে ঢের ভাল…ধরা'যাক, যদি নাই আর দেখা হয়, বাঁচিয়া তো থাকিবেই সবাই…

এমন সময় অনুকূলবাবুর পিয়ন আসিয়া খবর দিল বাবু সেলাম দিয়াছেন।

কাশিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই দক্ষিণ হাতটা বাড়াইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বেগটা থামিলে র‍্যাপার আর কম্ফর্টার ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া বলিলেন—"নিন মশাই, টেনে তুলেছি, এ সব ব্যাপারে অত হেলে চলে? এইবার গিন্নী এসে পৌঁছুলে একটা ভোজ দিয়ে দিন…"

নিজের রসিকতায় হাসিতে গিয়া আমার একচোট কাশি আসিয়া পড়িল।

কুমুদবন্ধু বাবু ব্যাকুল আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন—"এসে গেছে ?"

"এসে গেছেই বলতে পারেন ; টু ডাউন এক্সপ্রেস নেক্সট্ স্টপেজ থেকে তুলে নিয়ে ষ্টার্ট করেছে...মাঝে পাঁচটা ষ্টেশন।"...

ঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন—"আর আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বে..."

"তা হলে উঠি আমি..."

"আরে বসুন, আধ ঘণ্টা বললাম বলে কি আধ ঘণ্টাই ভেবেছেন নাকি ?" হয় তো শুনবেন কোথাও ইঞ্জিন ফেল করে বসে আছে, কিম্বা কোন ষ্টেশনে লাইন ক্লিয়ারই পায় নি, ছিলেম বি. এ. আর.-এ, এসব কাণ্ড তো জানা নেই।...পেলেন পাত্রের খোঁজ ? মেয়েটিকে তো আর রাখা যায় না ; এই দেখুন না, গিন্নি যা চিঠি লিখেছেন তাতে পতি-গুরুর গুরুত্ব আর কিছু রাখেন নি। আমরা হলাম ভাদুড়ী—এটুকু মনে রাখতে হবে, বাগচি, সাণ্ডাল..."

কোন রকমে মুক্ত হইয়া যখন ষ্টেশনে আসিয়া গেছেন দেখেন গার্ডের গাড়ীর দিকে একটা তুমুল জটলা, এক রকম ছুটিতে ছুটিতে গিয়াই উপস্থিত হইলেন।

ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া দেখেন একটা রেলের সাঁওতালী কুলীর পরিবার, মেয়ে, মাগী, আণ্ডাবাচ্ছা মিলাইয়া আট দশ-জন ; বলা নাই, কওয়া নাই, তাহাদের নিজের ষ্টেশন থেকে টানিয়া আনিবার জন্ত একবার থেকে সবাই মিলিয়া অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতেছে, একটা লোক কপিলিংটা খুলিয়া গাড়ীটাকে ছাড়াইয়া লইতেছে।

আপিসে আসিয়া খবর পাইলেন, সেই ষ্টেশনেই আপ পার্শেল এক্সপ্রেসটা দাঁড়াইয়া ছিল, টু ডাউন পৌঁছিবামাত্র কুমুদবন্ধুর গাড়ীটা জুড়িয়া লইয়া উল্টা দিকে চলিয়া গিয়াছে।

৬

শরীর গেছে, মন দিন দিনই ভাঙিয়া পড়িতেছে ; ওদিকে কুড়ি বৎসরের তিল তিল করিয়া সঞ্চয় করা সম্পত্তি নষ্ট হইল, তাহার পর এই—একেবারে মূলে হাভাত। বৈরাগ্য অনেক দিন থেকেই প্রবেশ করিয়াছিল মনে, ক্রমে ক্রমে উগ্র হইয়া উঠিল।

আর অনুকূল বাবুর আপিসেও যান না, নিজের আপিসে গিয়া টেবিলের সামনে বসিয়া সান্ত্বনা খোঁজেন, ছুটি হইলে উঠিয়া আসেন। ওয়েটিং-রুমের একটা কোণে পড়িয়া থাকেন, হোটেলে নেহাত প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত এক মুঠা খান।

দিন আষ্টেক পরের কথা। এক জন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন কুমুদবন্ধু, তিনি তত্ত্বজ্ঞান দিয়াছেন সমস্ত জীবনটাই এই রকম বৃথা অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ানো ; ঠিক হইয়াছে সব ত্যাগ করিয়া এই দিক দিয়াই গিয়া হিমালয়ে উঠিবেন। কাজে ইস্তফা দিয়া সকাল সকালই আপিস হইতে বাহির হইয়া গেটের কাছে আসিয়াছেন, ডাক পিয়ন প্রবেশ করিতেছিল, হাতে একটা চিঠি দিল, খামের ওপর অনেকগুলি মোহরের ছাপ। কুমুদবন্ধু তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলিয়া পড়িলেন—

পার্ব্বতীপুর
সোমবার

আশীর্ব্বাদ জানিবা,

আমরা অনেক কষ্টে তিন দিন হইল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বাড়ীর চারখানা দরজা আর দুইটা জানালা খুলিয়া লইয়া গিয়াছে ; তাহার পরই পাড়ায় পুলিস মোতায়েন হয়, আর কিছু করিতে পারে নাই। এখানে আর হাঙ্গামাও কিছু নাই ; শোনা যাইতেছে এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে পশ্চিমা মোছলাদের বনিতেছে না। কাল কলিমুদ্দি আসিয়া অনেক দুঃখ করিল—বলিল—মা ঠাকরুণ, যখন এয়েছেন আর যাবেন না, ওরা আপনাদের তাড়িয়ে—আমাদেরও তাড়াবে। কলিমুদ্দির ছেলে তো কালেজে লেখাপড়া করিতেছে, সেই নাকি ভেতরের কথা টের পাইয়া এই সব বলিয়াছে।

আমার চিঠি লিখিয়া দিল অম্বিকার ছেলে ললিত। উহারাও আসাম থেকে ফিরিয়া আসিয়াছে। বলে তাদের চেয়ে ঘরের মুসলমান ঢের ভাল। তারা বাঙালীকে এক-বারে পছন্দ করে না।

যাই হোক, তুমি পত্রপাঠই ইস্তফা দিয়া চলিয়া আসিবে, আর ও সুখের চাকরীতে কাজ নাই—যা আছে তাহাতেই চলিয়া যাইবে। আমরা কি করিয়া পরিত্রাণ পাইয়া পলাইয়া আসিয়াছি এক ভগবানই জানেন, চিরদিনই বোধ হয় রেলে রেলে ঘুরিতে হইত।

আমরা শরীর গতিকে ভাল। ফসল ভাল হইয়াছে, কলিমুদ্দি, পাঁচু সেখ, জয়মাল, সাতকড়ি মণ্ডল সবাই বলিতেছে আমাদের অংশ আমরা পাইব।

তুমি চলিয়া আসিতে বিলম্ব করিবা না। পুনরায় আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা
দিদি

শিক্ষায় হস্তশিল্পের স্থান

শ্রীঊষা বিশ্বাস, এম-এ, বি-টি

সাধারণতঃ আমরা আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করি—কথায়, চিত্রে অথবা অন্য কোনও কারুশিল্পে। লেখক তাঁর ভাবসমূহ ফুটিয়ে তুলতে চান তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে, চিত্রকরের ভাব রূপ পায় তাঁর আঁকা ছবির মধ্যে—ভাস্করের ভাব-কল্পনার বিচিত্র অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় তাঁর গড়া মূর্তিতে। এমনি ভাবে কত বিচিত্র উপায়ে আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে প্রয়াস পাই। আমাদের মনে কত চিন্তা, কত ভাবেরই উদয় হয়। তার খবর বাইরের জগতের কেউ জানতেই পারে না, যতক্ষণ না সেগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে—ভাষায়, চিত্রকলায় অথবা কোনও কারুশিল্পে। মানুষের এই ভাবপ্রকাশের শক্তিটি বিধি-দত্ত। এ ক্ষমতা সকলের সমান থাকে না। প্রকাশ-শক্তির অভাবে আমাদের কত ভাবই অব্যক্ত থেকে যায়—পরে মন থেকেও সেগুলি আস্তে আস্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে বিলীন হয়ে যায়। এক জন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেছেন—"No impression without expression"—অর্থাৎ আমাদের মনের কোন ভাবধারণাই স্পষ্ট ও স্থায়ী হতে পারে না যদি না আমরা সেটিকে একটি বাহ্যিক রূপ দিতে সক্ষম হই। বাস্তবিকই কথাটি খুব ঠিক। "কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে"—শিশুর ফুটনোন্মুখ মনেও তেমনি কত ভাবেরই উন্মেষ হয়। তার প্রকাশ করবার শক্তি বয়স্কদের চেয়ে ঢের বেশী সীমাবদ্ধ। সেইজন্যে তার আত্ম-প্রকাশের শক্তির উৎকর্ষ সাধন করবার দিকে প্রথম থেকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। নইলে তার ক্ষুদ্র মনটি পঙ্গু ও অক্ষম হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কোনও পেন্সিল, কলম বা খড়ি পেলেই শিশু তাই দিয়ে "হিজিবিজি" কাটে—কিছু লিখতে বা আঁকতে চেষ্টা করে। জননীরা অনেক সময়েই ছোট শিশুর আত্ম-প্রকাশের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের গুরুত্ব ঠিক বুঝতে পারেন না—তাঁরা তাকে ভর্ৎসনা করেন, ঘর নোংরা করছে বা কাগজ নষ্ট করছে বলে। সুতরাং অনেক সময়েই শিশুর আত্মপ্রকাশের প্রথম প্রয়াস অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়—সমুচিত উৎসাহের অভাবে। এইজন্যেই শিশুর শিক্ষায় হস্তশিল্পের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। হস্তশিল্প শিক্ষা দ্বারা শিশুকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ ও সুবিধা দিতে হবে—শুধু ভাষাশিক্ষার দ্বারাই নয়। হস্তশিল্পের সাহায্যে শিশুর কতকগুলি সহজাত বৃত্তিকেও ফুটিয়ে তোলা অনায়াসসাধ্য হয়। এমনি করে সে শৈশব থেকেই হস্তশিল্পে নৈপুণ্য লাভ করবার সুযোগ পাবে—পরে ভবিষ্যৎ জীবনেও কর্মকুশল হয়ে উঠতে শিখবে।

ভাষার সাহায্যেই আমরা প্রধানতঃ আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করে থাকি। কথা-শিল্পী তাঁর বিচিত্র কথা-নৈপুণ্যের মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তোলেন কাহিনীর অপরূপ ছবিগুলি। কিন্তু আমাদের মনের ভাবগুলি স্পষ্টতর ও অধিকতর স্থায়ী হয়, যখনই আমরা সেগুলিকে একটি বাহ্যিক, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপ দিতে সক্ষম হই। ভাষার সাহায্যে যে ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা যায় তা অনেক বেশী স্পষ্ট, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও চিত্তাকর্ষক হয় যদি সেইটিই চিত্রে, ভাস্কর্যে অথবা কোনও কারুশিল্পে রূপ পরিগ্রহ করে। এইজন্যই আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে হস্তশিল্পকে শিক্ষাদানের একটি সুষ্ঠু উপায় বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। পুঁথিগত জ্ঞান আহরণ করাই বর্তমান শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বর্তমানে শিক্ষা শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষার দ্বারা শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে—তার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন শক্তি ও সম্ভাবনা অস্ফুট, সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান আছে তাকেই সম্যক্‌রূপে বিকশিত করে তোলাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এইজন্যেই আধুনিক শিক্ষায় ইন্দ্রিয়গুলির সম্যক্ অনুশীলনের (Sense-training) উপর শিশুর ভবিষ্যৎ শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করা হয়। বিদ্যালয়ে শিশু শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই শিক্ষালাভ করবে না—তাকে শুধু শ্রোতা হলেই চলবে না। তাকে একাধিক ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন করে "হাতেকলমে" শিখতে হবে। সে যা শুনবে সেগুলি যদি সে চোখে দেখবার ও হাত দিয়ে স্পর্শ করবারও সুযোগ পায়, তা হলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করা ও মনে রাখা তার পক্ষে কত বেশী সহজ হবে। তার ধারণাগুলিও তা হলে কত দৃঢ়তর, এবং স্পষ্টতর হবে। এই রকম করে বিদ্যালয়ে হস্তশিল্পের সাহায্যে শিশুকে একাধিক ইন্দ্রিয়ের চর্চ্চা করে শিখবার সুযোগ দেওয়া যায়। বিদ্যালয়ের পাঠসমূহ শিশুর কাছে নিতান্ত নীরস ও অর্থহীন বলে মনে হবে যদি না বিষয়বস্তুর প্রতি তার মনে ঔৎসুক্য এবং আগ্রহ জাগানো যায়। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া দরকার শিশুর মনে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মানো—তার কৌতূহল উদ্দীপিত করা। এই জন্য বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন পাঠগুলি যথাসম্ভব মনোজ্ঞ ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করতে চেষ্টা করতে হবে। তা হলে শিশুর মন স্বতঃই পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং শিক্ষকের কাজও অনেক সহজ হয়ে যাবে।

আমরা জানি শিশুরা ছবি, বিশেষ করে রঙীন ছবি খুব ভালবাসে। তাই তাদের মনকে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে—সুরঞ্জিত চিত্রের সাহায্যে। শিক্ষাদান কালে শিশুদের মনে অনেক নূতন জিনিষ সম্বন্ধে এমন ধারণা জন্মাতে হবে যা তারা কখনও চোখে দেখে

শি। তাদের কল্পনা-শক্তিও পরিণতবয়স্কদের চেয়ে অনেক বেশী সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে প্রকৃত জিনিষ দেখিয়ে শিশুদের শিক্ষা দিতে পারলেই ভাল হয়। কিন্তু অনেক সময়ে তা আদৌ সম্ভবপর হয় না। এই রকম হলে সেই জিনিষগুলির 'আদর্শ' (model) যদি আমরা মাটি অথবা অন্ত কোনও পদার্থ দিয়ে গড়ে দেখাতে পারি তা হলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি কতকটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও সরস করে তুলতে পারা যাবে। 'আদর্শ' গড়ে বিষয়গুলি বোঝানো সম্ভব না হলে সেগুলি ছবিতে এঁকে দেখাতে পারলেও পাঠগুলি ছেলেমেয়েদের কাছে অনেক সহজ ও বোধগম্য হয়। এহেতু আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ববিদেরা যথাসম্ভব ছবি, চার্ট, আদর্শ ইত্যাদি প্রদীপনের (illustration) সাহায্যে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া সমীচীন মনে করেন। শিশুরা চঞ্চল, ক্রীড়াশীল ও কর্মপ্রিয়। কিছু না করে শুধু স্থিরভাবে বসে শিক্ষকের নীরস উপদেশ শুনে যাওয়া তাদের পক্ষে কষ্টকর। শিক্ষক যদি ছবি, চার্ট, আদর্শ ইত্যাদির সাহায্যে পাঠ্য বিষয়ের নীরস তথ্যগুলি সরস, ও প্রত্যক্ষগোচর করে তুলতে প্রয়াস পান তা হলে তাঁর পক্ষে শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করাও অনেক সহজ হয়। পাঠদান কালে শিশুদের যথাসম্ভব কাজে ব্যাপৃত রাখতে এবং তাদের কৌতূহল সজাগ রাখতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা অমনোযোগী হবার সুযোগ না পায়। ছবি, চার্ট, আদর্শ ইত্যাদি শিশুদের শুধু দেখালেই হবে না—প্রশ্ন দ্বারা শিক্ষক এইগুলি সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করবেন—তাদের যুক্তি ও কল্পনা প্রয়োগ করে উত্তর দেবার সুযোগ দিবেন—তাদের চিন্তা করে উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন।

শিশুরা বৈচিত্র্যপ্রিয়। একই রকম কাজ তারা বেশীক্ষণ করতে মোটেই ভালবাসে না, বিরক্ত বোধ করে। একরকম কাজ তাদের বেশীক্ষণ করতে দেওয়া সমীচীন নয়। বিদ্যালয়ে নিম্নতম শ্রেণীগুলিতে প্রত্যেক পাঠের পরে শিশুদের কিছু হাতের কাজ, খেলা, অভিনয়, অথবা ব্যায়াম করতে দিলে ভাল হয়। পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের মত শিশুরাও চায় আত্মপ্রকাশ করতে—তাদের মনের ভাবগুলিকে একটা বাহ্যিক রূপ দিতে—কোনও কিছু লিখতে, আঁকতে বা গড়তে। তাদের সে চেষ্টা কার্য্যতঃ যতই ব্যর্থ হোক না কেন, সেদিকে তাদের মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই। তাদের হাতে খড়ি, পেন্সিল বা কলম দিলে তারা তাই দিয়ে খুশীমত কত কি আঁকতে বা লিখতে চায়। মাটি পেলে তা দিয়ে তারা কত কি গড়তে চায়। এতে করে তাদের স্বাভাবিক আত্ম-প্রকাশের চেষ্টাই সূচিত হয়। এই সৃজন-স্পৃহা তাদের একটা সহজ বৃত্তি। তারা তাদের অনভ্যস্ত, অপটু হাত দিয়ে হয় তো কিছুই ঠিকমত আঁকতে বা গড়তে পারে না। তবু এতেই তাদের কত আনন্দ। এমনি করেই তাদের সৃজন-স্পৃহা, কর্ম্ম-স্পৃহা চরিতার্থ হয়। বিদ্যালয়ে এমনিভাবে শিশুদের নানা রকম হাতের কাজ করতে দিয়ে তাদের সৃজন-স্পৃহাকে জাগিয়ে তুলতে হবে—তাদের আত্ম-প্রকাশের সুযোগ ও সুবিধা দিতে হবে। তাদের উদ্ভাবনী শক্তিটি বিকশিত করে তুলতে হবে। এই হস্তশিল্পের মধ্য দিয়েই তাদের অন্যান্য শক্তিগুলিকেও ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে হবে। হস্তশিল্প শিক্ষাদান দ্বারাই তাদের সৌন্দর্য্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে—তাদের বিবিধ রঙের জ্ঞান, বর্ণসমন্বয়, অনুপাত, গঠন-সৌষ্ঠব ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হবে। তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করতে শিখবে—বুঝবে পরিচ্ছন্নতা সৌন্দর্য্যেরই একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। হস্তশিল্প শিক্ষাদ্বারা শিশুদের পর্য্যবেক্ষণ, স্মৃতি ও কল্পনাশক্তিরও উৎকর্ষ সাধিত হবে। তাদের আঙুলের জড়তা দূর হবে—তারা হস্তশিল্পে নৈপুণ্যলাভ করবে। তারা মনোনিবেশ সহকারে কাজ করতেও অভ্যস্ত হবে। বিদ্যালয়ে শিশুরা হস্তশিল্পের সাহায্যে অনেক বিষয় 'হাতেকলমে' শিখবারও সুযোগ পাবে। অনেক শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের ধারণা স্পষ্টতর হয়, যদি সেগুলি তাদের পুনরায় চিত্রে অথবা আদর্শে প্রকাশ করতে দেওয়া যায়। এতে তারা স্মৃতি ও কল্পনা উভয় শক্তিই নিয়োগ করতে পারবে। এই রকম করে হস্তশিল্পকে একটা প্রকৃষ্ট শিক্ষাদান-প্রণালীতে পরিণত করা যায়। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণতঃ হস্তশিল্প একটা বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় মাত্র বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয়ই হস্তশিল্পের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যায়।

বর্ত্তমানে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে সচরাচর যে রকম হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে আসল উদ্দেশ্য ঠিকমত সাধিত হয় বলে মনে হয় না। এখনও এমন অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে হাতের কাজ প্রায় শিখানোই হয় না বললে চলে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা হস্তশিল্প শিক্ষা দেবার কোনও প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেন না। মনোবিজ্ঞানসম্মত কোনও ধারাবাহিক পদ্ধতি অবলম্বনে হস্তশিল্প শিক্ষা দেবার প্রয়াস কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। কোন্ বয়সের শিশুর পক্ষে কিরূপ হাতের কাজ উপযোগী সে সম্বন্ধেও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নেই। এঁরা গতানুগতিকভাবে হাতের কাজ শিখিয়ে যান—শিশুদের দৈহিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী হস্তশিল্প শিক্ষা দেবার কোন চেষ্টাই করেন না। হস্তশিল্প শিক্ষা দেবার একটা সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হওয়া বিশেষ দরকার। হস্তশিল্পকে একটা বিশেষ শিক্ষাদান-প্রণালীতে পরিণত করতে হলে অবশ্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকেই কিছু কিছু হস্তশিল্প শিখতে হবে। তা সত্ত্বেও প্রত্যেক বিদ্যালয়েই অন্ততঃ এক জন বিশেষজ্ঞ থাকা দরকার।

বিদ্যালয়ে শিশুদের চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেবার আগে তাদের নানা রকম জিনিষ গড়তে বা তৈরি করতে শেখাতে হবে। তারা মাটি দিয়ে বল, কমলালেবু, কলা, আম, বিলিতী-বেগুন ইত্যাদি প্রথমে গড়তে শিখবে। এই সময়ে তাদের কাগজ কেটে অথবা কাগজ ভাঁজ করে নানা রকম জিনিষ তৈরি করতেও শিখানো যায়। সুন্দর সুন্দর রঙীন ছবি কাটতে দিলেও শিশুরা খুব আমোদ পায়। এই ছবিগুলি পরে এক একটি খাতায় সেঁটে এলবাম প্রস্তুত করলে বেশ ভাল হয়। রঙীন কাগজের উপর শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা দাগ দিয়ে দেবেন—শিশুরা সেগুলি নানা রকম ফল, ফুল, পাতা ও জীবজন্তুর আকারে কাটবে। পরে এই গুলি দিয়ে প্রকৃতি-পত্রিকা, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের চার্ট, গল্পের চার্ট ইত্যাদি তৈরি করা যেতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা ছবি এঁকেও শিশুদের সেগুলি বেশ সুন্দর পরিষ্কার করে কাটবার নির্দেশ দিতে পারেন। সেই ছবিগুলিই খাতায় সেঁটে এলবাম তৈরি করা যায় অথবা সেগুলি বড় কাগজে সেঁটে নানা রকম চার্টও প্রস্তুত করা যায়। ছবি আঁকতে শেখাবার আগে এই রকম করে ছবির প্রতি শিশুদের অনুরাগ বৃদ্ধির চেষ্টা করলে ভাল হয়। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা রেখাচিত্রের উপর শিশুদের রঙ দিতে বলবেন। এই রেখাচিত্রগুলি তাঁরা নিজেরা এঁকে দিতে পারেন। শিশুরা যেখানে যে রকম রঙ দেওয়া দরকার সেখানে সেই রকম রঙ দেবে। এই রকম করে তাদের রঙের জ্ঞান দেওয়া হবে। তারা রঙ চিনতে শিখবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ-সমন্বয় করতেও শিখবে। এই সঙ্গে তাদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিরও অনুশীলন করা হবে। তারা প্রকৃত জিনিষের রঙ দেখে ছবিতে রঙ দিতে চেষ্টা করবে। রঙীন কাগজ কেটে কেটে শিশুদের কখনও কখনও তাই দিয়ে থাম, শিকল, পাখা ইত্যাদি জিনিষ তৈরি করতে দেওয়া যায়। কাগজ খুব সরু সরু করে কেটে সেগুলি পাটির মত করে বুনতে দিলেও শিশুরা খুব আমোদ অনুভব করে। কাগজ ভাঁজ করে তাদের নৌকা, দোয়াত, এবং কামরাঙা ইত্যাদি নানা রকম ফল তৈরি করতে দেওয়া যেতে পারে। খালি দেশলাইয়ের বাক্স, সিগারেটের বাক্স, পুরানো কাপড় ইত্যাদি অনাবশ্যক জিনিষ দিয়ে শিশুদের নানা রকম খেলনা তৈরি করতে শেখানো চলে। খেজুরপাতা কেটে তাই দিয়ে পাখা, ব্যাগ ইত্যাদি বোনাও শেখানো যেতে পারে। হস্তশিল্প শিক্ষা দেবার সময়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা এই রকম করে বৈচিত্র্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন—শিশুদের সব সময়ে একই রকম হাতের কাজ করতে দেবেন না। শিশুরা যেন সর্ব্বদা বুঝতে পারে তারা যে কাজ করছে তার দ্বারা বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে। তাদের তৈরি জিনিষগুলি যথাসম্ভব কাজে লাগানো দরকার। তাদের কাটা অথবা তাদের রঙ-দেওয়া ছবি ইত্যাদি দিয়ে প্রকৃতি-পত্রিকা, এলবাম, চার্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করলে হাতের কাজ করতে তাদের আরও উৎসাহ হবে। মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে হস্তশিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। তাতে শিশুদের তৈরি জিনিষগুলি দেখানো হলে তাদের উৎসাহ আরও বাড়বে।

সাধারণতঃ ছয় বা সাত বছরের আগে শিশুদের হাতের ও চোখের ক্ষুদ্রতর পেশীগুলির সামঞ্জস্য সাধিত হয় না। এই সময়ে তাদের কোনও উপকরণাদির (apparatus) সাহায্য না নিয়ে ইচ্ছামত বাহু সঞ্চালন করে আঁকতে দিতে হয়—ইংরেজীতে যাকে free arm drawing বলে। এই রকম করে শিশুরা যাতে তাদের হাতের মাংসপেশীগুলিকে স্ববশে আনতে পারে সে বিষয়ে সাহায্য করতে হবে, এতে তাদের চোখের দৃষ্টিও ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসবে। এই সময়ে তাদের 'মাস ড্রয়িং' শিক্ষা দিতে হয়। তারা কোনও একটি বিশেষ আদর্শ দেখে কাগজে রঙ ঘষে ঘষে সেই আকারের জিনিষ তৈরি করবে। একেই 'মাস ড্রয়িং' বলে। এই রকম অঙ্কনে কোনও সীমা-রেখা (outline) থাকে না। ছবির মাঝখান থেকে আরম্ভ করে বাইরের দিকে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিনিষটির আকার গঠন করতে হয়। রঙীন খড়ি বা পেন্সিলটি মাঝখানে ধরতে হবে এবং যে পর্য্যন্ত না জিনিষটির আকৃতি ঠিক হয় সেই পর্য্যন্ত রঙ ঘষতে হবে—ডান দিক থেকে বাঁ দিকে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রঙ ঘষে যেতে হবে। এই রকম করে শিশুদের রঙীন খড়ি বা পেন্সিল দিয়ে রঙ ঘষে ঘষে আম, কলা, শশা, পেঁপে, বিলিতী বেগুন, কমলালেবু ইত্যাদি ফল, নানা আকারের পাতা প্রভৃতি জিনিষ আঁকতে দেওয়া যায়। পেন্সিল বা তুলি ব্যবহার করতে দেবার আগে তাদের রঙীন খড়ি দিয়ে আঁকতে দিলেই ভাল হয়।

কোনও একটি জিনিষের সমগ্র রূপটিই প্রথমে আমাদের মনে মুদ্রিত হয়—পরে তার পৃথক পৃথক অংশের সূক্ষ্মতর বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের লক্ষ্যীভূত হয়। তেমনি ছোট শিশুর মনও কোনও একটি জিনিষের মোটামুটি আকার ও গঠনই আগে ধরতে পারে। চিত্রাঙ্কন ও আদর্শগঠন (modelling) শিক্ষা দেবার সময় এই কথাটি আমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে। এই বয়সের শিশুদের কাছ থেকে আমরা কোনও সূক্ষ্ম কাজ আশা করতে পারি না। তারা যা আঁকবে বা গড়বে তার মোটামুটি গঠন ও আকারটি ঠিক হয়েছে কিনা তাই আমরা দেখব। "মাস ড্রইং" শিক্ষা দেবার পরে তাই শিশুদের রেখাচিত্র আঁকতে শেখাতে হবে। রেখাচিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেবার সময় তাদের প্রথমে যে সাধারণ জিনিষ আঁকতে শেখাতে হবে সে কথা বলাই বাহুল্য। এই সময়ে তাদের কতকগুলি ইংরেজী ও বাংলা অক্ষর দিয়ে নানা রকম নক্সা আঁকতে শেখানো যায়। এতে করে শিশুদের

চিত্রাঙ্কন ও হস্তলিপি দুইটি বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হবে। এই নক্সাগুলিই পরে সূচীকর্মে, বই, খাতা, এলবাম ইত্যাদির মলাটে এবং অন্যান্য জিনিষে ব্যবহার করা যায়।

শিশুদের সর্ব্বদাই আসল জিনিষটি দেখে আঁকতে ও গড়তে দেওয়া উচিত। তা হলে তাদের পর্য্যবেক্ষণশক্তির উৎকর্ষ সাধিত হবে। এই রকম করে জিনিষ দেখে আঁকবার বা গড়বার কিছু অভ্যাস হ'লে তাদের স্মৃতি থেকেও কিছু কিছু আঁকতে বা গড়তে বলতে হবে। এই উপায়ে তাদের স্মৃতিশক্তিরও কিঞ্চিৎ অনুশীলন হবে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা মাঝে মাঝে শিশুদের কল্পনা থেকেও কিছু কিছু আঁকতে নির্দ্দেশ দেবেন। তাঁরা কোনও একটি গল্প বলে কল্পনা থেকে শিশুদের একটি ছবি আঁকতে বলতে পারেন। এই রকম করে শিশুরা কল্পনা-শক্তিও প্রয়োগ করতে শিখবে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা চিত্রাঙ্কনে শিশুদের কোনও মৌলিকতা দেখলেই উৎসাহ দিতে ত্রুটি করবেন না। প্রথম থেকেই তাঁরা আর একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন, ছেলেমেয়েরা যেন অতিরিক্ত 'রবার' ব্যবহার না করে—এটি বড়ই খারাপ অভ্যাস। পুনঃ পুনঃ অঙ্কনের দ্বারাই শিশুদের হাত ও চোখ ঠিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তখন তাদের 'রবার' ব্যবহার করা দরকারই হবে না। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা যেন হাতের কাজ শিক্ষা দেবার সময়ে সর্ব্বদাই কোনও একটি বাঁধাধরা বিষয়-তালিকা (Syllabus) অনুসরণ না করেন। শিশুরা স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে নূতন কিছু আঁকলে বা গড়লেই তাদের উৎসাহ দিতে চেষ্টা করা উচিত। ছেলেমেয়েরা পেন্সিল দিয়ে রেখা-চিত্রাঙ্কনে কিছু অভ্যস্ত হলে তাদের ক্রমেই কঠিনতর বিষয় আঁকতে শেখাতে হবে। ক্রমে তাদের অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর কাজও করতে দিতে হবে। সেই রকম আদর্শগঠনেও তাদের বস্তু-বিশেষের সূক্ষ্মতর আকৃতি ও গঠন-বৈশিষ্ট্য শেখাতে হবে। শিশুদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাংসপেশীগুলি ক্রমশঃ বশে আনীত হয়; তাই তাদের পক্ষে তখন সূক্ষ্মতর কাজ করাও সহজ হয়। তারা অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয় অঙ্কনে কিছু অভ্যস্ত হলে ক্রমশঃ তাদের আলো-ছায়ার (light and shade) জ্ঞান, দূরত্ব অনুযায়ী জিনিষের আয়তনের তারতম্য ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা জন্মাতে হবে। পরে তাদের রঙ ও তুলি ব্যবহার করে ছবি আঁকতে শেখাতে হবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক হস্তশিল্প ছাড়াও ছেলেমেয়েদের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি প্রয়োজনীয় কারুশিল্প শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। সংসারের অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষও তাদের তৈরি করতে শেখানো যায়—যেমন তাল বা খেজুর পাতার পাখা, ঝাঁকা বোনা, বেত বা বাঁশ দিয়ে নানা রকম জিনিষ বোনা, তাঁতে গামছা তোয়ালে কাপড় গালিচা ইত্যাদি বোনা, চামড়ার কাজ, মাটির কাজ, খাম তৈরী করা, বই বাঁধানো, নারকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি, পাপোষ তৈরি করা ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে কোনও একটি বিশেষ কারু-শিল্প শিখে ছেলেমেয়েরা পরে ভবিষ্যৎ জীবনেও এর সাহায্যে কতকাংশে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারে। অনেক ছাত্রছাত্রী হয় তো পড়াশুনায় আদৌ মনোযোগী নয়, অথবা তাদের মেধা বা স্মৃতিশক্তি এতই কম যে, তারা জ্ঞানার্জ্জনে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারবে না। এই সব ছেলেমেয়েকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা দেবার বৃথা চেষ্টা না করে কোনও হাতের কাজ শেখালে অভিভাবকদের অযথা অর্থ নষ্ট হয় না। অনেক সময়েই দেখা যায় এই সব ছেলেমেয়েরা হাতের কাজে বেশ পটু হয়। এক্ষেত্রে এদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা দেবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, পিতা মাতা বা অন্য অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখা উচিত ছেলে মেয়েদের মনের স্বাভাবিক গতি বা প্রবৃত্তি কোন্ দিকে। তাদের স্বাভাবিক রুচি ও প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করা বিশেষ দরকার।

আজকের দিনে একান্ত পুঁথিগত বিদ্যার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। শিশুদের শুধু কতকগুলি "পুস্তকের কীট" করে গড়ে তোলাতে যে বিশেষ কোনও সার্থকতা নেই একথা অনেকেই অনুভব করছেন। পুস্তকের মধ্যে যে অশেষ জ্ঞানরাশি যুগযুগান্তর ধরে সঞ্চিত হয়ে আসছে তা থেকে বিদ্যা আহরণ করবার স্পৃহা যেমন শিশু-মনে জাগিয়ে তুলতে হবে তেমনি তাদের প্রস্তুত করতে হবে প্রাত্যহিক জীবনের কঠিন সমস্যাগুলির সম্মুখীন হবার জন্যেও। শিশুর সামনে রয়েছে তার অনাগত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—সেই ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে কি জটিল সমস্যা প্রচ্ছন্ন আছে তা কে জানে! তাই জীবনের প্রভাত থেকেই তাকে গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যৎ জীবনের দায়িত্ব বহনোপযোগী করে—তাকে শৈশব থেকেই শিক্ষা দিতে হবে কর্ত্তব্যপরতা। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার প্রাত্যহিক জীবনের কার্য্য-কলাপের সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষার যথাসম্ভব সামঞ্জস্য থাকে। শিশুর কার্য্যকরী শক্তিগুলি সম্যক্‌রূপে বিকশিত করে তোলাও বিদ্যালয়ের শিক্ষার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। নতুবা তার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। হস্তশিল্প শিক্ষার দ্বারা শিশুরা শ্রমের মর্য্যাদা বুঝতে শিখবে—তারা বুঝবে নিজের হাতের কাজে কোনও অপমান বা গ্লানি নেই। তারা কায়িক শ্রমকে হেয় জ্ঞান করবে না। তারা বুঝবে তাদের নিত্যব্যবহার্য্য অত্যাবশ্যক জিনিষগুলি অপরের কায়িক পরিশ্রমেরই ফল। আধুনিক বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনায় হস্তশিল্পকে যে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে তা খুবই সুখের বিষয়। অদূর ভবিষ্যতে এই অভিনব পরিকল্পনা অনুযায়ী বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেশে গড়ে উঠবে এবং বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষার ধারাও বদলে যাবে। তাতে করে অন্ততঃ ছেলেমেয়ে-দের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটবার সম্ভাবনা কমে যাবে। জীবনের সুরু থেকেই শিশুরা শিখবে শ্রমের মর্য্যাদা, আত্মনির্ভরশীলতা ও কর্ত্তব্যপরতা।

'মেঘনাদবধ' কাব্যের রস

শ্রীগোপাললাল দে

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারম্ভে কবি মধুসূদন সরস্বতী দেবীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, 'গাইব মা বীররসে ভাসি, মহাগীত।' সুতরাং পাঠকের মনে করা স্বাভাবিক যে কবি বীররসকেই কাব্যের প্রধান রসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 'সাহিত্যদর্পণ'-প্রণেতা কবিরাজ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'শৃঙ্গারবীরশান্তানামে-কোঽঙ্গী রস ইষ্যতে।' 'অঙ্গী প্রধানঃ', অতএব কবিরাজের মতে মহাকাব্যের প্রধান রস হইবে শৃঙ্গার, বীর এবং শান্তাদির মধ্যে একটি। অপর আটটি রস এবং অপরাপর সঞ্চারীরস সেই অঙ্গীরসের পোষকতা করিবে। টীকাকার ভট্টাচার্য্য বলিতেছেন, 'শান্তানামিতি বহুবচনাৎ করুণোঽপি গৃহ্যতে। তেন করুণ প্রধানস্য রামায়ণস্য মহাকাব্যত্ব সিদ্ধিঃ।" অতএব করুণরসও কাব্যের অঙ্গীরস হইতে পারে।

'মেঘনাদবধে'র প্রারম্ভে প্রথম চার পংক্তির মধ্যে কবি 'বীর' শব্দটি তিন বার ব্যবহার করিয়াছেন, এমন ক্ষেত্রে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কবি স্বীয় কাব্যখানিকে বীররসের কাব্যরূপে রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহাই করিয়াছেন। এখন কাব্যটি আদ্যোপান্ত বিচার করিয়া দেখা যাক কবির পোষিত আশা পূর্ণ হইয়াছে কি না।

প্রথম সর্গে দেখি বীরচূড়ামণি বীরবাহু সম্মুখ সমরে পড়িয়া হত হইয়াছেন, লঙ্কার রাজসভায় শত শত পাত্র-মিত্র নত-মস্তকে বসিয়া আছেন এবং রাবণ পুত্রশোকে বাক্যহীন, তাঁহার 'ঝর ঝর ঝরে অবিরল অশ্রুধারা।' দূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে তিনি 'হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর চূড়ামণি!' বলিয়া বিলাপ করিয়া বলিতেছেন,

> 'নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
> রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
> কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
> বধিল সম্মুখরণে? ফুলদল দিয়া
> কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?'

সুতরাং পুত্রশোককাতর পিতার করুণ শোকদৃশ্যে কাব্যের অবতারণা। তখনই তিনি বুঝিয়াছেন, 'একে একে শুকাইছে ফুল, এবে নিবিছে দেউটি।' প্রাসাদশিখর হইতে রাবণ রণক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তখনও তাঁহার বাক্য ও চেষ্টা করুণরসেরই সৃষ্টি করিয়াছে। করুণরসের অন্তর্নিহিত ভাব 'শোক' এবং বীররসের ভাব 'উৎসাহ'। সেতুবদ্ধ সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি পড়ায় রাবণ প্রথমতঃ সমুদ্রকে যথেষ্ট বিদ্রূপ করিলেন এবং পরে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন,

> 'উঠ বলি, বীরবলে এ জাঙ্গাল ভাঙ্গি,
> দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা।'
> 'এই কি সাজে তোমারে অলঙ্ঘ্য, অজেয় তুমি?'
> 'কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে বীতংসে;'

কবি এইখানে কিছু বীররসের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও যেন অসহায় রাবণের করুণ অনুনয়ের সুরে ভরা।

তাহার পরেই দেখিতে পাই এক বিচিত্র দৃশ্য, 'প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।' সখী-সনাথা চিত্রাঙ্গদার বেশ-বাস, চেষ্টা এবং বাক্যাবলী একটি চরম করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সর্গের মাঝের দিকে দেখি লঙ্কার রাজলক্ষ্মী 'ফিরায়ে বদন ইন্দুবদনা ইন্দিরা বসেন বিষাদে দেবী।' তিনি বলিতেছেন, লঙ্কায় 'প্রতি গৃহে কাঁদে পুত্রহীনা মাতা, দূতি পতিহীনা সতী।' প্রমোদ উদ্যানে, শেষের দিকে দেখি, ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলাকে। কবি এই অংশে একটি উপভোগ্য বীররসের সৃষ্টি করিয়াছেন,

> 'বামাবৃন্দ নবীন যৌবন
> মদে মত্ত ফেরে সবে, মাতঙ্গিনী যথা মধুকালে।'

'ছিঁড়িয়া কুসুমদাম রোষে মহাবলী মেঘনাদ' লঙ্কায় চলিয়া গেলেন। রাবণ সেখানে যুদ্ধযাত্রায় সাজিতেছেন 'বীরমদে মাতি'—এই বীররসের দৃশ্যে পিতাপুত্রের মিলনের ফলে ক্ষণিকের করুণ দৃশ্যের পরেই বন্দীদের বন্দনায় পাই, 'ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে রঘুপতি।' সুতরাং করুণরসে আরম্ভ হইয়া প্রথম সর্গ বীররসে শেষ হইল।

দ্বিতীয় সর্গের আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, সমগ্র সর্গটি জুড়িয়া লঙ্কা হইতে ইন্দ্রালয়, তথা হইতে কৈলাস, সর্ব্বত্র মেঘনাদকে বধ করিবার জন্য দেবগণের ষড়যন্ত্র, তাহার মধ্যে বীররসের কিছুমাত্র অবকাশ নাই। ষড়যন্ত্রের হীনতার মধ্যে বীরসের অবসরই বা কোথায়? সমগ্র সর্গে নিয়তির হস্তে ক্রীড়নকস্বরূপ একটি অসহায় বীরপুরুষের ঘনায়মান বিপদ সহানুভূতিশীল পাঠকের মনকে বিষাদব্যথায় ক্লিষ্ট করিয়া তুলে।

তৃতীয় সর্গের প্রারম্ভে প্রমীলার বিরহব্যথা মধুর ভাবজনিত শৃঙ্গাররসকেই রূপ দিয়াছে। অতঃপর কাতরতা ত্যাগ করিয়া প্রমীলা সখীগণের সঙ্গে সবলে লঙ্কা-প্রবেশের সংকল্প করিলেন।

> 'দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃকুল বধূ;
> রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী;
> আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?

পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?'

বীররসের একটি উজ্জ্বল চিত্র আমরা এইখানে পাইলাম।

'অগ্নিশিখা তেজে, চলিলা প্রমীলা দেবী বামা দলবলে !'

মেঘনাদবধ কাব্যে রাম-চরিত্রের মহত্ব বোধ হয় এই একটি স্থানেই একবার প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ একবারই। উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াই তাহা যেন চিরতরে ম্লান হইয়া গিয়াছে; আর সে মহত্বের সন্ধান মিলে না। রাম প্রমীলাকে সসম্মানে বিনা বাধায় লঙ্কা-প্রবেশের অনুমতি দিলেন। প্রমীলা চলিলেন,

'তার পাছে শূলপাণি, বীরাঙ্গনা মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশীকলা যথা !'

বীররসের এমন অপূর্ব্ব চিত্র মেঘনাদবধ কাব্যে আর দ্বিতীয়টি নাই।

ইন্দ্রজিতের সহিত প্রমীলার মিলনে কবি আবার আদি রসের চিত্র আঁকিয়াছেন। এই মাত্র যে নারী 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া রামচন্দ্রের সৈন্যদের সম্মুখসমরে আহ্বান করিতেছিল সে-ই এখন প্রিয়তমসমাগমে বিগলিতচিত্ত হইয়া বলিতেছে, 'ভববিজয়িনী দাসী; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে'। পরিবর্ত্তনটি দ্রুত হইলেও অসঙ্গত হয় নাই। মনোহারী মিলনদৃশ্যে পাঠকের চিত্ত একটু রসসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে যে পরম শোচনীয় ঘটনা অনতিবিলম্বেই ঘটিবে পার্ব্বতীর মুখে তাহার পূর্ব্বাভাস পাইয়া পাঠকের মন বিষাদে পূর্ণ হইয়া যায়। করুণ রসে সর্গটি শেষ হয়।

চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে যুদ্ধোন্মদে ব্যস্ত লঙ্কায় একটা উৎসবের মত ভাব দেখা যায়। এই অংশে কিয়ৎপরিমাণ তরল ভাবের বীররসের সঞ্চার দেখা যায়, তাহা ঘনীভূত হইয়া বৈশিষ্ট্য লাভ করে নাই। আবার এদিকে উক্ত সর্গ-মধ্যে অপহৃতা, অশোক বনে লাঞ্ছিতা, বিরহিণী সীতার দুঃখের অন্ত নাই—'কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে'। তাঁহার করুণ ক্রন্দন উপোদ্ঘাতের বীররসকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। সীতা ও সরমার কথোপকথন করুণ রসের নির্ঝরিণী। মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্য-সৃষ্টিতে, তথা বাংলা কাব্যসাহিত্যে ইহা করুণ রসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বরূপ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, এই কারণেই কাব্যবর্ণিত ঘটনার পক্ষে দৃশ্যতঃ সম্পর্কশূন্য হইলেও এই অংশ মেঘনাদবধের অমূল্য সম্পদ।

পঞ্চম সর্গে দেবকুলপ্রিয় লক্ষ্মণ দেবতাদের আদেশে এবং তাঁহাদের দ্বারা রক্ষিত হইয়া শিবপূজায় বসিলেন। রাম তাঁহাকে বিদায় দিলেন অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরে। তাঁহার বাক্যে বা কার্য্যকলাপে সময়োচিত উৎসাহ-উদ্দীপনার কিছুমাত্র ভাবও দেখা যায় না। রাম বার বার চিন্তা করেন, বিবেচনা করেন, দেবতাদের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, আত্মশক্তিতে বা লক্ষ্মণের পৌরুষের উপর নির্ভর করিবার মত মানসিক দৃঢ়তা তাঁর নাই।

লক্ষ্মণ লঙ্কার উত্তর দ্বারে চণ্ডীর দেউলে একাকী গেলেন, বহু প্রলোভন এবং ভয়ও জয় করিলেন, কিন্তু তিনি জানেন যে তিনি দেবকুলপ্রিয় ও দেবাশ্রিত এবং তাহাই তাঁহার সাহসের ভিত্তি; তাই লেখনীমুখে কবি লক্ষ্মণের বহু বীরত্ব ও সাহসিকতার বর্ণনা দিলেও এই সর্গের বীররসের চিত্র আসলে অবাস্তব অভিনয়ের মত হইয়া গিয়াছে। পাঠকের চিত্ত তদ্দ্বারা অভিভূত হয় না। বরং উক্ত সর্গের স্থানে স্থানে রৌদ্ররসের যে চিত্র আছে তাহা পাঠকচিত্তকে প্রভাবিত করে।

ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণ বিভীষণের সহায়তায় দেব-মায়াবলে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়া গুপ্তঘাতকের মত ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করিলেন। লক্ষ্মণ ও বিভীষণের চরিত্র যতদূর মসীলিপ্ত হওয়া সম্ভব, তাহা এইখানে হইয়াছে। গুপ্ত ঘাতকের কর্ম্মে বীররসের কোন অবসরই নাই। এই অংশে অতি অল্প পরিসরের মধ্যে ইন্দ্রজিতের বাক্য ও কার্য্যকলাপ আশ্চর্য্য মহিমময়। এই স্বল্পকালস্থায়ী অসম যুদ্ধের ফলে ইন্দ্রজিৎ শাশ্বত কালের মহাবীরগণের তালিকায় স্থান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সকল বীরত্বকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে অবস্থাঘটিত একটি সুগভীর কারুণ্য। দরদী কবির হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে তাহা স্বতঃ উৎসারিত। গুপ্তঘাতকের হস্তে ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলেন বটে, কিন্তু রসবিচারের দিক দিয়া কাব্যটিকে একেবারে অশ্রুধারায় সিঞ্চিত করিয়া দিয়া গেলেন।

সপ্তম সর্গে পুত্রশোকার্ত্ত রাবণের যুদ্ধসজ্জায় এবং দেবগণের সহিত রণে বীররস সত্যই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

'স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি,
সরোষে গর্জ্জিয়া রাজা কহিলা গভীরে;
চালাও। হে সূত, রথ যেথা বজ্রপাণি
বাসব।"

রাবণের রথ চলিল, কার্ত্তিকেয় বিনাযুদ্ধে পথ ছাড়িলেন, ইন্দ্র আহত ও শক্তিহীন হইয়া পলাইলেন; রামকে তখনকার মত পাশ কাটাইয়া রাবণ লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে ছুটিলেন এবং তাঁহাকে অব্যর্থ শক্তিশেলে আহত করিলেন। কবি এই স্থানে সার্থক যুদ্ধবর্ণনার দ্বারা একটি অপূর্ব্ব বীররসপূর্ণ কাব্যাংশের সৃষ্টি করিয়াছেন। রাবণের বীরত্বের চরম বিকাশ সপ্তম সর্গে।

অষ্টম সর্গে শক্তিশেলাহত-লক্ষ্মণকে লইয়া রাম ও বানরগণের বিলাপে অবিমিশ্র করুণ রসই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রামের নরকদর্শনদৃশ্যে বীভৎসরসের অবতারণা হইয়াছে, দশরথের সহিত রামচন্দ্রের মিলনে সঞ্চারীরসে বাৎসল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

নবম সর্গে মৃত ইন্দ্রজিতের শোকযাত্রার যে একটি সুমহান্ শোকগাম্ভীর্য্যপূর্ণ বর্ণনা আছে তাহা পাঠকের চিত্তকে যুগপৎ গাম্ভীর্য্যে এবং কারুণ্যে পূর্ণ করিয়া দেয় এবং মনে যেন চির দিনের জন্য একটা ছাপ রাখিয়া যায়। দরদী পাঠক-চিত্তে অনবরত ধ্বনিত হইতে থাকে কাব্যের সর্ব্বশেষ দুইটি ছত্র,

'বিসর্জ্জি' প্রতিমা যেন বিজয়া-দিবসে, সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।'

এখন সতর্ক বিচার করিয়া বলিলে বলিতে হয়, সমগ্র কাব্যে প্রধানতঃ বীর ও করুণরস স্থান পাইয়াছে এবং তাহা-

বের গভীরতা, ব্যাপকতা এবং চিত্তদ্রবকারী শক্তির বিচারে কাব্যটিকে অবশ্যই বীররসাত্মক না বলিয়া করুণ-রসাত্মক বলিতে হয়। যদিও কবি আদিতে বীররসের কাব্য লিখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন তথাপি কার্য্যতঃ তিনি কাব্যটিকে করুণ রসোত্তীর্ণই করিয়াছেন।

হয়ত বা তাঁহার মনে এই ইচ্ছাই ছিল; কারণ কাব্যটির যখন আরম্ভ, তখন কবি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন, "Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with 'Vira ras'. Let me write a few epiclings and thus acquire a pucca fist."

বীররসাত্মকই হউক আর করুণরসাত্মকই হউক, কাব্যটি যে ট্র্যাজেডি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্ত্য আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন, 'সার্থক ট্র্যাজেডির জন্য চাই নায়কের সুমহান্ বিরাট্ ব্যক্তিত্ব। নায়ক যত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইবে—ট্র্যাজেডি হইবে তত গভীর।' হয়ত সেই কারণেই বীররসের অবতারণা দ্বারা কবি তাঁহার করুণরসাত্মক ট্র্যাজেডির নায়কের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা ট্র্যাজেডির গভীরতা ও বিরাটত্বকে রূপদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এদিকে, রামায়ণ-কথা চিরকরুণ; এমনও হইতে পারে যে সেই কাহিনীকে বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করার ফলেই গোড়ায় ইচ্ছা থাকিলেও এবং মূলতঃ 'পুটপাকো প্রতিকাশো রামস্য করুণোরসঃ'কে ত্যাগ করিলেও কবি সেই করুণরসের জারক প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারিলেন না।

ওদিকে স্বধর্মভ্রষ্ট, সমাজচ্যুত, আত্মীয়স্বজন-পরিত্যক্ত, ভাগ্যবিড়ম্বিত কবির পক্ষে করুণরসই তো স্বাভাবিক রস। মধুসূদনের বাহিরের সাহেবী পোষাক ও চালচলনের আড়ালে তো লুকানো ছিল খাঁটি একটি বাঙালী-চিত্ত। সে যুগে বিদ্যাসাগর ছিলেন বাঙালী পোষাকপরা সাহেব, আর মাইকেল ছিলেন সাহেবী পোষাকপরা বাঙালী। তাই ষষ্ঠ সর্গ শেষ করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন—'It cost me many a tear to kill him.'

আবার এমনও হইতে পারে যে লিখিতে আরম্ভ করিয়া কবির "মনে ছিল এক, হয়ে গেল আর'। কেননা কিছুদিন পরেই কবি আর একখানি পত্রে লিখিয়াছেন— 'I never thought I was such a fellow for the pathetic.' করুণরস-রচনার সার্থকতা বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল। তবে কি করুণ রসসৃষ্টিই প্রারম্ভে উদ্দিষ্ট ছিল? অথবা দৈবক্রমে তাহা আসিয়া পড়িল এবং অবশেষে অর্দ্ধ-অচেতন ভাবাভিভূত কবি নিজ অপ্রয়াসলব্ধ সার্থকতায় বিস্মিত হইয়া নিজেকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,'কিমিদং ব্যাহৃতম্ ময়া?'—এ আমি কি লিখিলাম? এমন করুণ রসাত্মক কাব্য লিখিতে পারি তাহা ত জানিতাম না!

কয়েকটি ক্ষুদ্র কাব্য লিখিয়া হাত পাকাইয়া একখানি মহাকাব্য লিখিবার আকাঙ্ক্ষা কবির ছিল। 'মেঘনাদবধ' কাব্য হয়ত তাহাদেরই একখানি। তিনি লিখিয়াছিলেন, সুযোগ-সুবিধা, উপযুক্ত অবসর এবং যোগ্য বিষয়বস্তু পাইলে 'I could have made a regular Iliad'। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে কবি-কল্পিত সেই মহাকাব্য অলিখিতই রহিয়া গেল। রোগ শোক, দারিদ্র্য, অনবসর কবির সংকল্পকে সত্যে পরিণত হইতে দিল না।

দুর্লভ

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

ভাললাগা পাছে ভালবাসা হয়ে পড়ে
ছিলাম সভয়ে প্রাণের কবাট এঁটে,
মনের অঙ্গনে দিই নি আসন পেতে
এলে যবে দূর দুর্গম পথ হেঁটে।
রক্ত অধরে সুধা প্রলেপের নিচে
জানি হলাহল সমুদ্র উথলিছে,
সারা সংসার মরুতে কোথাও
পানীয় পাই না খুঁজি—
প্রাণের অপার পিপাসা যাহাতে মেটে।
দুর্লভ প্রেম দুয়ারে যেদিন এলো
থরথর করে কাঁপিয়া উঠিল বুক,
ধরিতে গেলাম বাড়ায়ে ব্যাকুল পাণি—
মূল্য শুনিয়া ভয়ে শুকাইল মুখ।
সকল অতীত, সকল ভবিষ্যৎ
ফেলে দিতে হবে জীর্ণ বস্ত্রবৎ,
নিরুদ্দেশের পথে যেতে হবে
অজানায় হাত খুঁজি,
পাথেয়—তাহারি "বোহেমিয়া" হাসিটুক।

তিমির রাত্রে প্রলয় ঝঞ্ঝা এসে
বনস্পতিরে উড়ায়ে লইতে চায়,
শত-শাখা কোটিপত্রে আন্দোলিয়া
প্রাণপণে তরু প্রতিরোধ করে তায়।
সে জানে কেবল উন্মূল হওয়া সার,
গতির আশায় দুর্গতি হবে তার,
ধ্বংস-পাগল ঝটিকা শোনে কি
পাদপের প্রতিবাদ;—
তার আনন্দ পরের দুর্দশায়।
আমার প্রতিটি স্নায়ুতে জাগায়ে দিলে
প্রমত্ত বেগ প্রচণ্ড ঝটিকার,
জানি ক্ষণপরে তুমি উড়ে যাবে দূরে,
উড়ায়ে নেবে না এ পাষাণ দেহভার।
তবু যে একদা বুকে দিয়েছিলে দোলা,
জানি তার স্মৃতি জীবনে যাবে না ভোলা,
পথিক পবন কাছে এলে কভু
ধরাশায়ী বিটপীর
শুষ্কপর্ণে গুমরিবে হাহাকার।

শেয়ালের সভা

"বন্ধুগণ! সকলেই বলে ঐক্য এবং চীৎকার উন্নতির উপায়। বন্ধুগণ! আমরা সমস্বরে চীৎকার করিতে কখনই ত্রুটি করি নাই, মানুষ ত হইতে পারিলাম না!" ('পঞ্চা-নন্দ,' ২য় কাণ্ড, ৩য় সংখ্যা)

সেকালের সাময়িক-পত্রে ব্যঙ্গচিত্র

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৭২ সনে শিশিরকুমার ঘোষ 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে সর্ব্বপ্রথম ব্যঙ্গচিত্রের অবতারণা করেন। এরূপ একখানি চিত্র—"ক্যাম্বেলের মডেল ডেপুটি" আমরা গত বারে প্রকাশ করিয়াছি।

ইহার দুই বৎসর পরে বিলাতী *Punch*-এর অনুকরণে ব্যঙ্গচিত্র-সম্বলিত দুইখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথমখানি 'হরবোলা ভাঁড়'; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল —জানুয়ারি ১৮৭৪; পরিচালক—দুর্গাদাস দস। প্রতি সংখ্যার পূর্ণপৃষ্ঠা চার-পাঁচখানি লিথো-চিত্র মুদ্রিত হইত। 'গৌরচন্দ্রিমা'য় ভাঁড় বলিতেছেন:—

"কেন আমি আসরে নামলেম, উদ্দেশ্য আমার কি, কার্য্যই বা কি, সেই কথা এখন বলি। সমাজের ছবি চিত্র কোর্‌বো;—এক পৃষ্ঠে ছবি, এক পৃষ্ঠে দর্পণ।—ছবি দেখে যাঁহারা তুষ্ট হবেন, দর্পণে তাঁহারা পবিত্র মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব অবশ্যই দেখ্‌তে পাবেন। আর আমার ছবিতে যাঁহারা রুষ্ট হবেন, তাঁহারা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তি দর্পণেই দেখ্‌বেন।"

'হরবোলা ভাঁড়' ২য় সংখ্যা হইতে দ্বিভাষিক পত্রে—"A Monthly Anglo-Vernacular Illustrated Comic Journal"-এ পরিণত হয়; নামকরণ হয়—"The Indian Punch· হরবোলা ভাঁড়"।

"হরবোলা ভাঁড়ে"র কয়েক দিন পরেই—১৮৭৪ সনের ৩১এ জানুয়ারি 'বসন্তক' আবির্ভূত হয়। ইহা "প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে" প্রকাশিত হইত। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত:—

নবপরিণয়যোগাৎ স্রীযু হাস্যাভিযুক্তং,
মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং,
প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাক্তকণ্ঠং।

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পত্রিকার ১ম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—

"লোকের এই রকম স্বভাব, যে, কেহ এক জন নিকটে আসিলে অগ্রে ঐ আগন্তুক ব্যক্তির নাম ধাম কর্ম্মাদির বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং সভ্য-

Bridging the Chasm between the two Races
"ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে মিলন-সেতু" ('হরবোলা ভাঁড়')

সমাজেরও মনঃ আমার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হয়েছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করি, আমি যাত্রাওয়ালার সঙের দাদার মতন নই, যে, কড়্ কড়্ কোরে না জিজ্ঞাসা কোত্তেই আত্মপরিচয় দিতে থাক্‌বো। আর, যাঁরা ভদ্র, তাঁরা কি আপনি পরিচয় দেন? অপরের দ্বারা পরিচয় দেওয়াই তাঁহাদের নিয়ম। অতএব আমি ভাটের মত আপনার কুলজী না পোড়ে এই-মাত্র বলিতেছি, যে, সভ্যগণ আমার বসন্ত-পঞ্চমীর পর উদয়েই নাম বুঝিবেন এবং এই কীর্ত্তিতেই স্মৃতি জানিবেন।"

সুচারু যন্ত্রালয় (৩৩৬ নং চিৎপুর রোড) হইতে 'বসন্তক' প্রকাশিত হইত। 'হরবোলা ভাঁড়ে'র ন্যায় ইহারও প্রত্যেক সংখ্যায় চার-পাঁচখানি বড় লিথো-চিত্র থাকিত। চিত্রগুলি নিমতলা-নিবাসী গিরীন্দ্রকুমার দত্তের অঙ্কিত বলিয়া মনে হয়। 'বসন্তক' সম্পাদন করিতেন সুচারু যন্ত্রালয়ের অধিকারী প্রাণনাথ দত্ত; তিনি এই সময়ে নবপর্য্যায় 'রহস্য-সন্দর্ভ'ও পরিচালন করিতেন।

অতঃপর ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসে (ইং ১৮৭৮) সুরসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চুঁচুড়ার সাধারণী যন্ত্র হইতে 'পঞ্চা-নন্দ' নামে "রস-প্রধান পত্র ও সমালোচন" প্রকাশ করেন। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—

"এই ত ভবের হাটে রসের পসরা মাথায় উপস্থিত হওয়া গেল। এই ত ভবসাগরে রঙ্গিল পান্‌সী ভাসান গেল। এই ত ভবের বাদিতে আড্ড-বোড়ন করা গেল। এই ত ভবের আসরে নামা গেল। এই ত ভবলীলা আরম্ভ হইল। এখন দেখা যাউক—তোমারই এক দিন, কি আমারই এক দিন!

পঞ্চা-নন্দ বাহির হইল, লোক-সমাজে এই অলোক-সামাজিক—অলোকসামান্যই বলিতাম, কিন্তু তাহা হইলে অনুপ্রাস ভঙ্গ হয়—এই অলোক-সামাজিক বর্ত্তিকা এখন নয়নানন্দদায়িনী হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এ আলোক কত দিন অন্তরে ভারত-উজ্জ্বল করিবে? সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হন, কিন্তু সূর্য্যের আলোক অতি তীব্র—অসূর্য্যম্পশ্যরূপা! চন্দ্র ক্রমে ক্রমে কলা প্রদর্শনপূর্ব্বক মাসে এক-বার মাত্র পূর্ণমাত্রায় আত্মবিকাশ

করেন; তদ্ভিন্ন, পুরাতন কাহিনী অনুসারে চন্দ্রের কলঙ্ক আছে! নিত্য নৈমিত্তিক গৃহস্থের প্রদীপ—
"সুবর্ণ দেউটি যথা তুলসীর মূলে"—
মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলে, বাতাসে নিবিয়া যায়, এবং টিকা

ধরাইবার সময়ে দীপ হাতে উপস্থিত হয়। তবে এ আলোক কেমন ?

['বসন্তক'

এ আলোক কেমন ? গভীর ভাবে এই গুরু প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা বাধ্য। এ আলোক—বলিয়াই ফেলি—এ আলোক করাল কাদম্বিনীর অন্তরবিদারিণী সৌদামিনী সদৃশ ; ভৈরবী শ্যামার সমর-রঙ্গ-কালীন হাসির মত ! ইহাতে জগৎ চকিত হইবে, স্তম্ভিত হইবে, মন বিকম্পিত হইবে, মোহিত হইবে ! ভয়ে বিহ্বল হইবে, অথচ আনন্দে অধীর হইবে। তবে আমাদের মুখে এ কথা শোভা পায় না ! নাই পাইল, লেখা ত জমিয়া গেল ! যাহা হইবে তাহা হইবে। অদৃষ্টবাদ, কারণবাদ, বিবাদ, বিসম্বাদ কিছুতেই তাহার প্রতিবাদ হইবে না।

অসময়ে যে বন্ধু, সেই বন্ধু—"শ্মশানেচ যতিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।"—পঞ্চা-নন্দ সেই অসময়ের বন্ধু, পঞ্চা-নন্দ সেই শ্মশান বন্ধু। ষড়্‌দর্শনের লোপে ভারতে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল ; ঔরস পুত্রের অভাবে আরও একাদশ প্রকার পুত্রের ব্যবস্থা মনুসংহিতায় আছে ; সেই জন্য ষড়্‌দর্শনের অভাব দূরীকরণ জন্য বঙ্গ-দর্শন, আর্য্য-দর্শন জ্ঞান-বেশোদ্ভব যমজ ভ্রাতার ন্যায় কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। এখন তাঁহাদেরও অন্তিম দশা—মুখ ব্যাদান করেন বটে, কিন্তু সে খাবি খাওয়ার জন্য—আর কি নীরব থাকিবার সময় ? অতএব উঠ বন্ধুগণ উঠ ! জাগ ভারতের হিতব্রত, জাগো !—পঞ্চা-নন্দ স্বয়ং উপস্থিত। (এখানে বুঝিতে হইবে)—অতএব উপস্থিত।

পঞ্চা-নন্দ মুমূর্ষু দেহে জীবন সঞ্চার করিবে, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিবে, অর্থাৎ যাহারা পত্রিকার গ্রাহক হইয়া মূল্য না দেয়, তাহাদিগকে খুব—খুব শক্ত—আরও শক্ত—আশীর্ব্বাদ করিবে। দীর্ঘায়ুরস্তু !

'বঙ্গ-দর্শন' প্রভৃতি সাময়িক পত্র ; সেই জন্য মাসে মাসে দেখা দিবার আশ্বাস দিয়াছিল। পারে নাই, কারণ বাঙ্গালী—স্ত্রী-জাতি। স্ত্রী-জাতির এমন প্রতিজ্ঞা থাকে না ; প্রথম প্রথম দুদিন দশ দিন ; তাহার পরে—ভগবান্‌কি হাত !

পঞ্চা-নন্দ দুঃসময়ের বন্ধু, সেই জন্য অসাময়িক, যখন ফুরসৎ, তখনি সাক্ষাৎ। পঞ্চা-নন্দ স্ত্রীলোক নহে।

পঞ্চা-নন্দের দর্শনী—যে যার যেমন মর্জ্জি। আধুনিক "দর্শন" সমূহের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কেহ কেহ দিয়া থাকেন ; সে শ্রেণীর লোককে এইমাত্র বলা যাইতেছে যে তাঁহারা যখন চব্বিশ মাসে বৎসর গণনা করিয়া পরিতুষ্ট, তখন পঞ্চা-নন্দকেও যাহা ইচ্ছা দিয়া রাখিতে পারেন, অগ্রাহ্য হইবে না।

বাজে সাত্ লাক্ সাত্ লাক্ সাত্ লাক্
নেবো বাজার, কোর্‌বো ব্যাপার, হবে সবে তাক্
মোদের বেঙ্গিং বেঁচে থাক্। ('বসন্তক')

এখন আশীর্ব্বাদ করি এই ভক্তির মুক্তা, দেবতার ইন্দ্র, নন্দনের পারিজাত, স্নেহের পঞ্চা-নন্দ—দীর্ঘজীবী হইয়া নিজের আয়ুবৃদ্ধি এবং যশোবৃদ্ধি এবং অর্থবৃদ্ধি এবং সর্ব্বসমৃদ্ধির কামনা করিতে থাকুন।—এবমেব্।"

কিন্তু প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর 'পঞ্চা-নন্দ' ধূমকেতুর মত সাহিত্যাকাশ হইতে সহসা অদৃশ্য হন।

১৮৭৯ সনে ইন্দ্রনাথ ভবানীপুরে বাসা করেন। এই সময় স্থানীয় যুবকবৃন্দ—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি 'পঞ্চা-নন্দ' পুনঃপ্রকাশের জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন; তাঁহারাই কাগজ চালাইবেন, ছাপাইবার সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দেওয়ায় ইন্দ্রনাথ লিখিতে

চিত্র। সিংহ, নেকড়ে বাঘ ও মেষপাল
(বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশ হইতে উদ্ধৃত)

সিংহ। (একতম মেষের পেট চিরিতেছেন, এমন সময় নেকড়ে বাঘের প্রবেশ) তুমি কে?
নেকড়ে। হুজুর আমি ক্ষুদ্র জমিদার। (মেষপালের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) এগুলি কি মহারাজের খাশের প্রজা?"
সিংহ। হাঁ, ইহারাই আমার মেদিনীপুরের প্রজা। তোমার প্রয়োজন কি?
নেকড়ে। ধর্ম্মাবতার! আমি প্রজাপালন শিখিতে আসিয়াছি। ('পঞ্চা-নন্দ', ২য় কাণ্ড, ১ম সংখ্যা)

সম্মত হন। পুনর্জ্জীবিত 'পঞ্চা-নন্দ' এবার দেড় বৎসর এই ভাবে চলিয়াছিল:—

—১ম কাণ্ড:

১ম সংখ্যা (পাক্ষিক) ভবানীপুর সুধাকর প্রেস ১৬ মাঘ ১২৮৬ (২৯-১-৮০)
১১শ „ (মাসিক) বর্দ্ধমান, বর্দ্ধমান প্রেস ১২৮৭ সাল (১৯-১-৮১)
১২শ „ „ „ „ (৮-২-৮১)

—২য় কাণ্ড:

১ম সংখ্যা (মাসিক) বর্দ্ধমান, বর্দ্ধমান প্রেস ১২৮৭ সাল
৩য় „ „ „ ১২৮৮ সাল
৪র্থ „ „ „ „ (৩০-৮-৮১)
৫ম-৬ষ্ঠ „ „ „ „ (২০-৬-৮২)

'পঞ্চা-নন্দে' মাঝে মাঝে ব্যঙ্গচিত্র থাকিত, কিন্তু ইহা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয় নাই; ইহার শেষ যুগ্ম-সংখ্যাটির ললাটে আছে:—"দ্বিদল খণ্ড...পঞ্চা-নন্দ অর্থাৎ যাহা পড়িতে বুঝিতে নারে মূর্খে লাগে দ্বন্দ্ব। রস-প্রধান অসাময়িক পত্র ও সমালোচন।"

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের অনেক প্রাথমিক রচনা—যেমন, 'বঙ্গীয় সমালোচক' প্রথমে 'পঞ্চা-নন্দে' (৭ম সংখ্যা, ১৬ বৈশাখ ১২৮৭) স্থান পাইয়াছিল। 'স্বর্ণলতা'-রচয়িতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও ইহার লেখক ছিলেন। ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (১ বৈশাখ ১২৮৭) প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ:—"প্রকৃতি। বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা।" 'প্রকৃতি'র সম্পাদক ছিলেন—কাব্যবিশারদ।* 'পঞ্চা-নন্দে'র ৩য় সংখ্যায় (১৫ ফাল্গুন ১২৮৬) মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ: "কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমরা 'কল্পনা লতিকার' নাম 'কল্পলতা' রাখিলাম এবং 'স্বর্ণলতা' প্রণেতা ইহার সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিলেন। শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কার্য্যাধ্যক্ষ।" তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৭ম সংখ্যা হইতে 'কল্পলতা'র সম্পাদক হন জানা যাইতেছে; কারণ ২য় সংখ্যায় (১ ফাল্গুন ১২৮৬) মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে পাইতেছি: "কল্পলতার ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে।"

'পঞ্চা-নন্দ' সত্য সত্যই "জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, সরস ব্যঙ্গ, তীব্র বিদ্রূপ এবং পবিত্র আমোদের খনি" ছিল। ইহার বহু রচনা ইন্দ্রনাথের 'পাঁচু ঠাকুর' গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক এগুলির সরস রহস্য উপভোগ করিতে পারেন।

আমরা ব্যঙ্গচিত্র-সমন্বিত তিনটি মাত্র সাময়িক-পত্রিকার সামান্য পরিচয় দিলাম। এই জাতীয় আরও পত্র-পত্রিকা সেকালে বাহির হইয়া থাকিবে।

* পঞ্চম সংখ্যার (১২ চৈত্র ১২৮৬) 'প্রকৃতি'র বিজ্ঞাপনের সহিত ভবানীপুর সুধাকর প্রেসে মুদ্রিত, নেহালচাঁদ-রচিত 'জেনানা জওয়ান' নামক "অভিনব রহস্য কাব্যে"র বিজ্ঞাপন আছে; ইহা খুব সম্ভব ছদ্ম নামে কাব্যবিশারদের রচনা।

প্রবাহ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

৭

পর দিন বেলা চারিটা নাগাদ সুনির্ম্মলের মোটর আসিয়া হোটেলের সম্মুখে দাঁড়াইল। ড্রাইভারকে সরাসরি ফেরত পাঠাইতে পারিলেই সে খুশী হইত। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা সম্ভব হইল না। তাহাকে যাইতে হইল। ড্রাইভার মৃন্ময়কে সুনির্ম্মলদের বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল। তাহাকে রীতিমত ব্যস্ত মনে হইল।

সুনির্ম্মলকে সাক্ষাৎ বাহির মহলেই পাওয়া গেল। এক-মুখ হাসিয়া সে অগ্রসর হইয়া আসিল, কহিল, এসেছ তা হলে ?

মৃন্ময় জবাব দিল, কাল দেখা না করে ওভাবে একটা চিঠি রেখে এলে কেন ?

সুনির্ম্মল হাসিয়া কহিল, কারণ তোমার সঙ্গে বসে তর্ক করবার সময় কাল আমার হাতে ছিল না।

মৃন্ময় মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া কহিল, ও···কিন্তু এই জরুরী তলবের কারণ জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?

সুনির্ম্মল কহিল, জিজ্ঞেস তুমি যথাস্থানেই করো। আজকের নিমন্ত্রণ আমার নয়, আমার বোন রুবীর। তার আজ জন্মদিন।

মৃন্ময় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, এ ভাবে আমায় অপ্রস্তুত করা তোমার উচিত হয় নি সুনির্ম্মল। তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা হলেও—এই সব সামাজিক ব্যাপারে—ছি ছি সুনির্ম্মল, তোমার একটু কাণ্ডজ্ঞান পর্য্যন্ত নেই।

সুনির্ম্মল কথাটা মানিয়া লইয়া কহিল, ও জিনিষটা আমার চিরদিনই একটু কম। কিন্তু আপাততঃ তুমি ওপরে যাও, আমি কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যাচ্ছি।

মৃন্ময় বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, তুমি বেরিয়ে যাবে আর আমি···

সুনির্ম্মল কহিল, তাতে কিছু অসুবিধা তোমার হবে না। রুবী রয়েছে তার বন্ধু-বান্ধবীরা' রয়েছেন। দেখতে দেখতে আমি এসে পড়বো।

বাধা দিয়া মৃন্ময় কহিল, তার চেয়ে আমি এখানেই তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

সুনির্ম্মল কহিল, সেটা তোমার ইচ্ছে অবশ্য রুবীর যদি কোন আপত্তি না থাকে।

রুবী দেখা দিল। সুনির্ম্মল তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, ইনিই মৃন্ময় ভট্টাচার্য্য। তোমার অতিথি। আর এই আমার বোন রুবী। সুনির্ম্মল চোখের পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রুবী দুই করতল একত্র করিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, আপনার কথা দাদার মুখে আমি এত বেশী শুনেছি যে, আপনাকে আর অপরিচিত বলে ভাবতে পারছি না। বহু প্রশংসার সঙ্গে দাদা আপনার গানের প্রশংসা করতেও ভোলেন নি।

মৃন্ময় মৃদু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, সুনির্ম্মল একটা আস্ত পাগল।

রুবী মৃদু হাসিয়া কহিল, কিন্তু মিথ্যাবাদী নয় নিশ্চয়ই।

মৃন্ময় একথার জবাব দিল না।

রুবী কহিল, ভেতরে চলুন।

মৃন্ময় তাহাকে অনুসরণ করিল।···

···কে মৈত্রেয়ী···আয় ভাই। রুনু আসেনি বুঝি! কি হ'ল আবার তার। মৃন্ময়ের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া স্মিতহাস্যে কহিল, বসুন। মৃন্ময় বসিল।

রুবী মৈত্রেয়ীকে বসাইয়া নিজেও তার পাশে বসিয়া অনর্গল বকিয়া চলিল, কি মেয়ে এই রুনু—অসুখ ওর লেগেই আছে। আজ মাথাধরা, কাল টন্‌সিল অপারেশন, পরশু জ্বর জ্বর ভাব। অছিলার আর অভাব নেই। রেণু ত ফোন করে দিয়েই খালাস, বলে, মার শরীর খারাপ। মাদের আবার শরীর ভাল থাকে কবে। কার কথা বলছ লিলিদির—দাদা নিজেই গেছেন আনতে। এসে পড়বে এখুনি। কিন্তু রুনু এলো না, গাইবে কে ?

মৈত্রেয়ীর প্রশ্নে মৃদু কণ্ঠে রুবী কহিল, দাদার বন্ধু। এ ভেরি গুড্ সিঙ্গার। উহাদের কথা আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। রুবীর বান্ধবীর দল আসিতে সুরু করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল রুনু এবং রেণুও আসিয়াছে।

রুবি কহিল, কি ভাগ্যি, আজ বহালতবিয়তে আছ রুনু।

রুনু কহিল, ভাল আর কোথায় রুবী-দি, সর্দ্দি-কাশি লেগেই আছে। গলায় কিছু নেই।

মীরা হেমার চোখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। প্রকাশ্যে কিছু কহিল না। কিন্তু রেণু আবার স্পষ্টবাদিনী, সে থামিল না, কহিল, কি ভাগ্যি গান শিখিনি, নইলে সর্দ্দি-কাশি কি আমাদেরই ছেড়ে কথা কইত!

রুবি মুখে কিছু না বলিলেও প্রকারান্তরে রেণুর কথারই সায় দিল। মৃন্ময় বলিয়া যে একটি পুরুষ মানুষ এখানে উপস্থিত আছে তাহা যেন উহারা গ্রাহের মধ্যেই আনিল না। মৃন্ময় গবাক্ষপথে বাহিরে দৃষ্টি রাখিয়া এদের রকমারি কথাবার্তা

শুনিতেছিল, আর সুনির্ম্মলের বিলম্বের জন্ত মনে মনে অনুযোগ করিতেছিল।

এদের কথার ফাঁকে রুবী একবার মৃন্ময়ের নিকট হইতে ঘুরিয়া গেল। মৃদু কণ্ঠে কহিল, আপনি যেন কিছু মনে করবেন না মৃন্ময় বাবু। সামান্ত দোষত্রুটি ওরা ক্ষমা করবে না। তাই...থাক ঐ যে দাদাও এসে পড়েছে।

সুনির্ম্মল এতক্ষণে ফিরিল। সঙ্গে আছে লিলি। সকলের দৃষ্টি এক সঙ্গে তার প্রতি আকৃষ্ট হইল। সাধারণ বাঙালী মেয়ের মত স্বাস্থ্যহীন সে নয়। অটুট স্বাস্থ্য এবং যৌবন-লাবণ্য তাকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। মৃন্ময় বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল। ততক্ষণে সুনির্ম্মল মৃন্ময়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। মৃন্ময়ের এই বিমুগ্ধ ভাবটি সুনির্ম্মলের দৃষ্টি এড়াইল না। ঠোঁটের কোণে একটু বাঁকা হাসি মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। লিলিকে কহিল, ইনি মৃন্ময় ভট্টাচার্য্য। আমার বিশিষ্ট বন্ধু। লিলি স্নিগ্ধ হাসিয়া মৃন্ময়কে নমস্কার জানাইল।

লিলিকে দেখাইয়া পুনশ্চ সুনির্ম্মল কহিল, আর ইনি হচ্ছেন লিলি সান্যাল। এবারে বি-এ দেবেন।

লিলি মৃন্ময়ের পাশে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল এবং মৃদু হাসিয়া সুনির্ম্মলকে কহিল, আপনাকে ত অতিথি অভ্যাগতদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে, আমি বরং মৃন্ময় বাবুর সঙ্গেই ততক্ষণ গল্প করছি।

মেয়েদের মধ্যে বেশ একটা চাপা গুঞ্জন উঠিল। লিলি একবার চারি দিকে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়াই ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইল। কিন্তু সব সময় তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামান লিলি পছন্দ করে না। সে অসঙ্কোচে মৃন্ময়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে যত্নপরিকর হইল। মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনি চুপ করে আছেন যে?

মৃন্ময় হাসিমুখে কহিল, গল্প করার মত বিষয়বস্তু না থাকলে যা হয় আমার তার থেকে কিছু বেশী হয় নি। আপনি নিজেই বলুন না আমি মিথ্যে বলেছি কিনা?

লিলি সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

রুনু কহিল, লিলিদির সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি।

মীরা কহিল, নিছক অহঙ্কার—

রুনু আরও খানিকটা যোগ করিয়া দিল, তবু যদি না আমরা হাঁড়ির খবর জানতাম।

রেণু বাধা দিয়া কহিল, তা বলে লিলিদিকে শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না।

রুনু কহিল, রেণুর যে বেজায় টান দেখছি।

রেণু মৃদু রোষ সহকারে কহিল, কথাটা মিথ্যে বলো নি রুনু।

আলোচনাটা আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে না দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। রেণুকে ওরা ভয় করে। রেণুর মুখ বড় আলগা। সত্য কথা সোজা করিয়াই বলিতে সে ভালবাসে।

রেণু থামিতে পারিল না। বলিয়া চলিল, অভারটা লিলিদির নয়, এ হচ্ছে আমাদের অযথ ঈর্ষা। তাকে ছুঁতে পারি না বলেই নিন্দে করা। আর এই অন্তায় কাজে আমাদেরই আনন্দ হয় সবচেয়ে বেশী।

ইহাদের আলোচনার ধরণে রুবী একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। রেণুকে মিনতি করিয়া কহিল, তুই থাম ত রেণু। অমন বড় বড় কথা আমরাও দু-চারটে জানি। রুবী তাহাকে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিত করিল।

রেণু নির্ব্বিকার ভাবে বলিয়া চলিল, শুধু জানা থাকলেই হয় না রুবী। সময় মত তা প্রকাশ করবার সাহস থাকাও দরকার।...রেণু হয়তো আরও কিছু বলিত, কিন্তু সহসা সীতার আবির্ভাবে সে থামিল। রুবী কহিল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে সীতা?

সীতা কহিল, ওদিকে। লিলিদির ব্লাউসের ডিজাইনটা বড় চমৎকার। একটা নক্সা তুলে নিলাম।

সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

সীতা একটু অপ্রস্তুত হইল, কহিল, ঐ তো তোমাদের দোষ। যেটি তোমাদের মনোমত হবে না সেখানেই করবে ঠাট্টা। বিশ্বাস না হয় দেখে এস ডিজাইনটা।

কিন্তু ডিজাইন দেখিতে যাইতে কেহই আগ্রহ প্রকাশ করিল না। আবহাওয়াটা যেন অকস্মাৎ ঝিমাইয়া পড়িল। কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্ত। সুনির্ম্মল আসিয়া পুনরায় হৈ চৈ সুরু করিয়া দিল—হোপলেস! এতটা সময় তোমরা শুধু গাল গল্পেই কাটিয়ে দিলে। না দেখছি একটা হারমোনিয়াম, না সেতার, না এস্রাজ। খাসা! ওদিকেও দেখছি ওরা বেশ গল্প ফেঁদে বসেছে। দুটিই বুক-ওয়ার্ম। মিলেছে ভাল। যেমন মৃন্ময় তেমনি লিলি। এই যে রুনুও এসেছ! তা বলে রেণুকেও আজ ছেড়ে দেওয়া হবে না। কিন্তু তার আগে যন্ত্রপাতিগুলো আনাতে হয়। সুনির্ম্মল অকারণে বিস্তর হৈ চৈ করিল।

রুনুকেই সর্ব্বপ্রথম গাহিতে হইল। ওর গলা বেশ মিষ্টি। টানিয়া টানিয়া গানকে শ্রুতিমধুর করিতে সে পাকা। মেয়েরা ওর বিশেষ ভক্ত। কাজেই পর পর তাহাকেই বহুক্ষণ গাহিতে হইল। তার পর আসিল রেণুর পালা। স্বভাবত সে একটু গলা ছাড়িয়া গায়। অনাবশ্যক মাত্রাগুলিকে দীর্ঘতর করিয়া তোলে না। গায় ভাল। কিন্তু ভক্তের অভাব। কাজেই আরম্ভেই তাহাকে শেষ করিতে হইল, এবং রুনুকেই পুনরায় গাহিবার জন্ত অনুরোধ করা হইল। রুনু হয়ত গান করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্তু মাঝখানে

মৃন্ময় এক গোলযোগের সৃষ্টি করিল। কহিল, উনি ত' বেশ গাইছিলেন। ওঁকেই আবার গাইতে বলা হোক না।

রুদ্র অবজ্ঞার দৃষ্টিতে এক বার মৃন্ময়ের প্রতি চাহিয়া দেখিল। রেণু অতটা লক্ষ্য না করিয়াই পুনরায় সুরু করিল। কণ্ঠস্বর সুরের উপর নৃত্য করিয়া চলিল। মৃন্ময় একাগ্রভাবে শুনিতে লাগিল। অবশেষে রেণুকেও থামিতে হইল। রুদ্র পুনরায় অনুরুদ্ধ হইয়াও আর গাহিল না।

সুনির্ম্মল কহিল, রেণু এই অল্প কালের মধ্যে বেশ শিখেছ ত। আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম।

রেণু লজ্জিত ভাবে মাথা নত করিল। রুদ্রর চোখে জল আসিয়া পড়িল। তার কাছে সুনির্ম্মলের মতামতের একটা বিশেষ মূল্য আছে। সুনির্ম্মল পুনরায় বলিয়া চলিল, সেই বোবা রেণু, যে স্বরগ্রাম করতে পাঁচ বার ঢোক গিলেছে... জান মৃন্ময়, এরই নাম প্রতিভা। মানুষের মধ্যে যদি এ বস্তু থাকে সামান্য চর্চ্চা করলেই তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। রেণুর মধ্যে লুকান ছিল সেই প্রতিভা।

রেণু হাসিয়া ফেলিল। কহিল, এর পরে কিন্তু সত্যিই লজ্জা পাব নির্ম্মল-দা।

সুনির্ম্মলও হাসিল, কহিল, তা বলে তোমায় আর গাইতে বলা হবে না রেণু। এ বারে গাইবেন লিলি। সকলেই একসঙ্গে তাহাকে সমর্থন করিল।

লিলি একটু হাসিয়া কহিল, গান আমি ভাল জানি নে, কিন্তু তা বলে কৃপণ নই। লিলির গানের পরে সুনির্ম্মল আর এক কাণ্ড করিয়া বসিল। মৃন্ময়ের একখানা হাত ধরিয়া কতকটা নাটকীয় ভঙ্গীতে কহিল, মৃন্ময় ভট্টাচার্য্যকে তোমরা শুধু এক জন কৃতী ছাত্র হিসাবেই জান কিন্তু ভগবান যে ওকে দিতে কোন দিক থেকেই কার্পণ্য করেন নি, এবারে তা প্রমাণ হবে।

মৃন্ময় চাপা গলায় কহিল, পাগলামি করো না সুনির্ম্মল।

সুনির্ম্মল থামিতে পারিল না। বলিয়া চলিল, ইনি এক জন ভাল গায়কও। তোমরা অনুমতি দিলে তোমাদের হয়ে আমি ওকে অনুরোধ করতে পারি।

একটা মৃদু গুঞ্জন উঠিল, নিশ্চয় নিশ্চয়। রুদ্রর গলার আওয়াজ সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

মৃন্ময় স্মিত হাস্যে কহিল, সুনির্ম্মলের বাড়িয়ে বলা স্বভাব। নইলে আপনারাই বলুন ত কলেজ হোষ্টেলে কি আর সঙ্গীত-চর্চ্চা সম্ভব হয়। তা ছাড়া আপনাদের ঐ অরগ্যানে গাইবার তেমন অভ্যাস আমার নেই।

সুনির্ম্মল কি বলিতে যাইতেছিল। তাহাকে থামাইয়া দিয়া রুদ্র কহিল, আমরা কিন্তু কালোয়াতী শুনতে চাইছি না।

কথা কয়টির অন্তর্নিহিত খোঁচাটি মৃন্ময়কে বিঁধিল কিন্তু সে হাসিমুখেই জবাব দিল, আপনি আমার প্রতি অবিচার করছেন। এখানে যে বাঁয়া তবলা দিয়ে গানের কসরৎ চলছে না সে ত আমি দেখতেই পাচ্ছি। তা ছাড়া...মৃন্ময় মুহূর্তের জন্য থামিয়া যেন একটু রূঢ় কণ্ঠেই কহিল, কার কাছে আমি গানের কসরৎ করব। এ সাধারণ জ্ঞানটুকু আমার আছে।

যে খোঁচা রুদ্র মৃন্ময়কে দিয়াছিল তার চতুর্গুণ সে ফিরাইয়া দিয়াছে। কথাটা বুঝিয়াই রুদ্র নীরব রহিল।

মৃন্ময় তার এই কঠোর ব্যবহারে একটু লজ্জিত হইল। মুহূর্ত্তেই সে সুর পাল্টাইয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল, গান-বাজনায় সত্যিই আমি অজ্ঞ। আর সে কথা আমি আগেই আপনাদের জানিয়েছি। তবুও সুনির্ম্মলের কি ছেলেমানুষি দেখুন দেখি। মাঝে থেকে কত কি বাজে বকে আমি নিজেই হলাম অপ্রস্তুত। সত্যই এর কোন আবশ্যক ছিল না। কিন্তু সে যাই হোক, অসৌজন্য যদি কোথাও বা প্রকাশ পেয়ে থাকে তা আপনারা মনে রাখবেন না।

কোন কথায় কি প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল।

সুনির্ম্মল কহিল, তুমি অত্যন্ত প্রগল্‌ভ হয়ে পড়েছ।

মৃন্ময় হাসিয়া এক সঙ্গে অরগ্যানের গোটাকয়েক রিড চাপিয়া ধরিল। মৃন্ময় গাহিয়া চলিল—একের পর এক। কাহারও অনুরোধের অপেক্ষায় রহিল না।

রুদ্রর মুখে কে যেন এক ছোপ কালি মাখাইয়া দিল। রেণু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা করিল। আপনি যে কত চমৎকার গান করেন। লিলি কহিল, গানে আপনার সত্যিকারের প্রাণ আছে। রুবী কহিল, দাদা কিন্তু সত্যি সত্যিই মিথ্যা-বাদী নয়। রেণু যেন কিছুতেই থামিতে পারিতেছে না। চাপা কণ্ঠে লিলিকে কহিল, শুধুই কি প্রাণ লিলি-দি। প্রাণের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। কি সর্ব্বনেশে কণ্ঠস্বর।

লিলি রেণুর বাহুমূলে ঈষৎ চাপ দিয়া কহিল, সব কথা সকল সময় বলা চলে না। বলা উচিতও নয়। এ কথাটা বুঝবার মত বয়েস এবং বুদ্ধি তোমার নিশ্চয় হয়েছে রেণু।

রেণু একটু লজ্জিত কণ্ঠে কহিল, আমি কিন্তু কিছু ভেবে বলি নি লিলি-দি।

লিলি হাসিল, কহিল, ভেবে এ কথা কেউ প্রকাশ করে না তা আমি জানি। উভয়ে হাসিয়া ফেলিল।

রুবী জানাইল, আহার্য্য প্রস্তুত।

৮

মৃন্ময় অকস্মাৎ আবিষ্কার করিল যে, এই দুই ঘণ্টায় সে দুটি চক্ষুও পড়ে নাই। লিলি, রুদ্র, রুবি ও মীরার মাঝে যেন খানিকটা একাগ্রতা সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। ওদের শাড়ীর ঝলমলানি, ভাষার সুতীব্র ব্যঞ্জনা, চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণ—এর সবকিছুই চোখের সম্মুখে একটা মায়াজাল বিস্তার করে। সুনির্ম্মলের সুসজ্জিত হল-ঘরের সারি সারি

বৈদ্যুতিক আলোর চোখ ঝলসানো দ্যুতির পাশে ওরা যেন এক একটি বিদ্যুৎ-ঝলক। মঞ্জুষার সহিত কোথাও এদের একতিল মিল নাই। মঞ্জুষার শান্ত শ্যাম মুখশ্রী, তার লাজ-নম্র চোখের অকপট দৃষ্টিভঙ্গী মৃন্ময়ের বুকে কোন দিন ঝড় তোলে নাই, কিন্তু একথা সে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারে যে, মঞ্জুষা তার প্রশান্ত বুকের মাঝে নিঃশব্দে ভাসিয়া বেড়াই-তেছে। কোন আলোড়ন নাই, ঝঞ্ঝা নাই; নিঃসঙ্কোচ, নিরুপদ্রব এবং নিঃশব্দ।

মৃন্ময়ের আজ হঠাৎ নিজেকে এ ভাবে যাচাই করিবার বাসনা জাগিল কেন? নিজের অজ্ঞাতেই উহাদের প্রতি হয়তো তাহার খানিকটা দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়িয়াছে। মৃন্ময় সচেতন হইয়া উঠিল। কিসের জন্ত এসব অনাবশ্যক যুক্তি। এ কেমন তার মনের বিলাসিতা! মৃন্ময় নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করে, এদের নিজস্ব বলিতে আছে কি? এদের চালচলন, কথা বলার ভঙ্গী—সবকিছুর মধ্যেই একটা প্রাণহীন উগ্র বৈশিষ্ট্য আছে। চমকপ্রদ—কিন্তু অসার। ওদের মনের খবর সে রাখে না, কিন্তু বাইরের যা, তা মনকে মাতাল করিতে পারিলেও একান্ত ভাবে কাছে টানিতে পারে না। ওরা ক্ষণপ্রভা, মুহূর্ত্তের আনন্দ। ওদের সঙ্গে লইয়া মোটরে হাওয়া খাইতে যাওয়া চলে। পাশে বসাইয়া সিনেমা দেখা যাইতে পারে। টেনিসের পার্টনার করিলেও চমৎকার মানানসই হয়, কিন্তু পল্লীর নিভৃত কোণে একটি শান্ত সুন্দর সংসার রচনা করা সম্ভব নয়। ওরা সব ঝড়ের মত্ত হাওয়া, গ্রাম্য পর্ণকুটির ওদের জন্ত নয়।

সহসা মৃন্ময় আপন-মনেই হাসিয়া উঠিল। এ এক আচ্ছা পরিহাস বটে—যেন উহাদের কেহ তার সহিত সংসার রচনা করিতে উদ্যোগী হইয়াছে—যেন তার জীবনের সহিত জড়াইয়া পড়িতে চাহিতেছে। মৃন্ময় ইংরেজী বইয়ের খানকয়েক পাতা পর পর উল্টাইয়া গেল, কিন্তু তার চিন্তার ধারা অপরিবর্ত্তিত রহিল।

উহাদের মধ্যে লিলির গতিবিধি বেশ সংযত। কথাও কম বলে। ওর ধরণ-ধারণ আলাদা। এই উগ্র পরিবেশের ভিতর হইতেও সুনির্ম্মল নির্ব্বাচনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

অকস্মাৎ মৃন্ময় বই বন্ধ করিয়া রাখিল।

মঞ্জুষার বাবাও রীতিমত ধনী। কিন্তু অর্থের উৎকট তীব্র প্রকাশ কোথাও নাই। বিস্ময় সৃষ্টির অবকাশ তারা দেয় না। যেন সাধারণের এক জন। এক মুহূর্ত্তে মৃন্ময়ের মনটা পদ্মাপাড়ের একখানি শ্যামল পল্লীর পথে ধাবিত হইল। ওখানকার সবই যেন তার চেনা—তার বড় আপন জন। তার জীবনের প্রতিটি ধাপে জড়াইয়া আছে। ওখানে তাকে সঙ্কুচিত হইতে হয় না। দারিদ্র্যের জন্ত কুণ্ঠা দেখা দেয় না। ওখানকার পাখীর গান, নদীর কলতান, জেলেদের জাল ফেলা, নক্ষত্রখচিত আকাশ, পরপারের বৃক্ষশ্রেণীর সুনীল ছায়ারূপ, হিরু নাপিতের হুঁকোর, রাধু বোষ্টমের রামপ্রসাদী সুর, মঞ্জুষাদের তিন মহল বাড়ী—সব যেন গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। একের সঙ্গে অপরের যেন নাড়ীর সম্বন্ধ রহিয়াছে।

মৃন্ময় তন্ময় হইয়া গিয়াছে। গ্রামের অসংখ্য স্মৃতি তার মনকে ঘিরিয়া আছে। তাহার মনে হইল যেন সে নদীর তীরে শ্যাম দূর্ব্বাদলের উপর দেহ বিছাইয়া মঞ্জুষার কোলে মাথা রাখিয়া সাত সমুদ্র তের নদীর পারের গন্ধে মাতিয়া উঠিয়াছে। চতুর্দ্দিকের জগৎসংসার যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মঞ্জুষার একখানি কোমল হাত শিথিল ভাবে তার কপালে ন্যস্ত, আর তার কয়েক গুচ্ছ চূর্ণ কুন্তল বাতাসে উড়িয়া আসিয়া মৃন্ময়ের চোখে মুখে মৃদু পরশ বুলাইয়া দিতেছে। বুকে তার কত কথা—যা ভাষার অজস্রতায় গুঞ্জরিয়া উঠিয়াছে। কে আছে তার সাক্ষী। ঊর্দ্ধে উদার-গম্ভীর নীলাকাশ আর নিম্নে পদ্মার খরস্রোত, যাহা অনাদিকাল ধরিয়া কত সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়া চলিবে। কত দিনের এমনি কত মধুর স্মৃতি তার বুকের তলায় ঘুমাইয়া আছে। জীবনের ঐ দিনগুলি তার কাছে অমূল্য। তার মন-মঞ্জুষায় অক্ষয় সম্পদ।

সুনির্ম্মলের গলার সাড়া পাওয়া গেল, মৃন্ময় আছ? ঘরে পা দিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, আঃ! ডেডফুল। এই বিকেল বেলাও বই নিয়ে বসে আছ!

মৃন্ময় চোখ তুলিয়া চাহিল। কোন কথা কহিল না।

সুনির্ম্মল পুনরায় কহিল, মেয়েদের কল্পনাশক্তি দেখছি আমাদের চেয়ে ঢের বেশী!

বিস্মিত কণ্ঠে মৃন্ময় বলিল, অর্থাৎ...

সুনির্ম্মল সহাস্যে কহিল, লিলি তোমায় ঠিক চিনেছে। সে বলে, বাহিরমুখো প্রাণী নাকি দেখলেই চেনা যায়। অর্থাৎ তোমার গ্রহকীটত্ব সম্বন্ধে কি সে একটা ধারণা করে নিয়েছে। সুনির্ম্মল হো হো করিয়া খানিক হাসিল। কিন্তু তাহাতে মৃন্ময়ের বিস্ময় কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না। সে একটু বাঁকা উত্তর দিল, আমার সম্বন্ধে এই ধরণের আলোচনা ত স্বাভাবিক এবং সুস্থ নয় সুনির্ম্মল। তা ছাড়া আমার সম্বন্ধে তিনি কতটুকু জানেন। কতক্ষণের পরিচয় আমার সঙ্গে তাঁর!

মৃন্ময়ের উক্তির তীক্ষ্ণতায় সুনির্ম্মল সুর পাল্টাইল। কহিল, ভাবটা লিলির হলেও ভাষাটা আমার। কিন্তু তোমার কূট তর্ক থামাও। সত্যি কথা বলতে কি মৃন্ময়, তোমার আইন পড়া উচিত ছিল। সে যাই হোক, এখন এসব বাজে কথা রেখে চলো যাই খানিক বেড়িয়ে আসবে।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, সে রকম ত কোন কথা ছিল না সুনির্ম্মল।

সুনির্মল কহিল, লিলি অবশ্য বলেছিল—বেড়াবার সময় হয়তো তোমার হবে না। কিন্তু আমি যে ওদের কথা দিয়ে ফেলেছি মিনু।

মৃন্ময় ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, আমার সম্বন্ধে লিলি দেবীর এই ধরণের মতামত প্রকাশ করা যেমন নিরর্থক তোমারও তেমনি কথা দেওয়া অনাবশ্যক! আর তা ছাড়া ওরাই বা কারা যাদের কাছে তোমার কথা রাখতে না পারাটা একটা মস্তবড় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

সুনির্মল রাগত কণ্ঠে কহিল, খামোকা তর্ক করে একটা সীন ক্রিয়েট করো না মৃন্ময়। রুনু, রেণু, রুবি সব তোমার জন্যে মোটরে অপেক্ষা করছে। এর পরে তারা এসে উপস্থিত হলেই কি খুব ভাল হবে।

মৃন্ময় হাসিল। কহিল, তাঁরা যে এখানে আসবেন না বা আসতে পারেন না এ কথা তুমিও জান, কিন্তু আমি ভাবছি তুমি কি ভেবে ওদের এই হোষ্টেল পর্য্যন্ত নিয়ে এসেছ! আশ্চর্য্য···তোমার কি একটা সাধারণ মানসম্মান জ্ঞানও নেই!

সুনির্মল উষ্ণ কণ্ঠে কহিল, না নেই। কিন্তু তুমি কি করবে তাই জানতে চাই।

হাসিমুখে মৃন্ময় কহিল, সে কথা কি আমার বলে দিতে হবে: আমার হয়ে তুমিই বরং তাঁদের কাছে একবার ক্ষমা চেয়ো, কিন্তু তুমি আর দেরি করো না। তাঁরা সব অপেক্ষা করছেন।

সুনির্মল চলিয়া যাইতেই মৃন্ময়কে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করিতে দেখা গেল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে মঞ্জুষার একখানি ছোট ফটো পাইয়াছিল, উহা অপহৃত হইয়াছে। নিশ্চয় ইহা সুনির্মলের কাজ। টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়াই সে কথা কহিতেছিল। মৃন্ময় একটু চিন্তিত হইল। সুনির্মলের ঢাক পেটানো স্বভাব। অবশ্য মৃন্ময়ের ইহাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না। কিন্তু বেচারী মঞ্জুষা হয়তো ওর জানিত মহলে মুখে মুখে আলোচিত হইবে। উহাদের প্রগতিশীল সমাজের আবেষ্টনী হয়তো তাহাকে অকারণে রূঢ় আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। ওদের এই অতি আধুনিকতার সহিত তার খাপ খায় না। তার নিজস্ব একটা নীতি ও মত আছে—যার ব্যতিক্রম সে পছন্দ করে না।

মৃন্ময় উঠিয়া পড়িল। আজ এই মুহূর্ত্তে আর পুস্তকে মনোনিবেশ করা সম্ভব হইবে না, বরং কিছুক্ষণ বেড়াইয়া আসিবার প্রয়োজন সে বোধ করিল। হোষ্টেলের এই দেয়াল-ঘেরা অপরিসর ঘরখানি তার নিকট বিরক্তিকর ঠেকিতেছে।

মৃন্ময় রাস্তা বাহিয়া চলিয়াছে। অগণিত জনস্রোত। একটা প্রাণহীন জাতির নিঃশব্দ পথ-চলা। কারুর মুখে বলিষ্ঠ হাসি নাই। চলমান জনতার নিষ্প্রাণ মিছিল। মৃন্ময় চলিয়াছে। কোথায় কোন ভিখারী দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সকরুণ আবেদন জানাইতেছে, সিনেমা বুকিং আপিসে কি পরিমাণ ভিড় জমিয়াছে, হেদোর জলে কে আজ ক্রমাগত ছুই দিন ধরিয়া একাদিক্রমে সাঁতার কাটিতেছে—এসব খবর জানিতে তার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। তার চেয়ে পল্লীতে পল্লীতে এবার ধানের ছড়াছড়ি···পল্লী এবার শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, গ্রামের দুঃখদুর্দ্দশা নাই···তাদের মুখে চোখে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিয়াছে—এ খবর যদি কেহ তাহাকে দেয় মৃন্ময় তাকে খুশিমনে একপেট খাওয়াইয়া দিবে।

মৃন্ময় চমকাইয়া উঠিল, কে···অবিনাশ? বড্ড চমকে উঠেছিলাম। ডাকলে কেন? সাজেসশান চাইছ? হোষ্টেলে যেও। সব কি আর মনে ক'রে বসে আছি। কি বলছ? রেকর্ড ব্রেক করেছে···প্রফুল্ল ঘোষ? তাতে আমার কি। বলতে পার বেকার সমস্যার কোন সমাধানের পথ বেরিয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ অন্নচিন্তার সমাধান। কি বলছ? বাঙালী ছেলেরা শুধু স্বপ্ন দেখতে জানে, কাজ করতে জানে না! মিথ্যে কথা। আর এই হীন মিথ্যাই বাঙালীকে তাদের সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক জীবনে দিন দিন দুর্ব্বল করে ফেলছে। তাদের আত্ম-প্রত্যয়ের ভিত্তিকে শিথিল করে দিচ্ছে। না-না অবিনাশ তুমি হেসো না। সত্যিই আমি বাজে কথা বলছি না। কি বলছ কাল যাবে? যেও।

মৃন্ময় দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিল। কিন্তু পুনরায় তাহাকে থামিতে হইল কাঁধের উপর একখানা ভারী হাতের চাপে। সে কি! এবার বাড়ী যাবে না মিশা। পুজোর আর কতোই বা বাকী। পুজোর বাজার করতে বেরিয়েছ? কালই যাচ্ছ তা হলে। কিন্তু আমায় আবার টানছ কেন। বউয়ের জন্যে কাপড় কিনবে?···হা হা হা কে বলছে তোমায় খালি হাতে যেতে।···করছ কি আজকাল? চাকরীর চেষ্টা! বাবার পয়সায় জমিদারী···খামকরেক বেশী করে নিয়ে যেও বন্ধু!

মৃন্ময় দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিল। আঃ জোর বাঁচিয়া গিয়াছে। অন্যমনস্ক হইবার যো আছে কি। যান্ত্রিক যুগ এটা। যন্ত্রের নব নব আবিষ্কার মানুষের নিরুপদ্রব জীবনে এক বিষম আতঙ্ক। কখন কার ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। মোটর, বাস, লরি, স্থলপথে চলমান দুর্গ, জলে ভাসমান দুর্গ, উভচর দুর্গ, আরও কত কি। মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়াছে। আর খানিক পরেই গড়ের মাঠ। ওখানে গিয়া খানিক বিশ্রাম করিয়া লইলে মন্দ হয় না। শহরের মিউনিসিপ্যালিটির এ অঞ্চলের উপর বিশেষ দৃষ্টি আছে। আবর্জ্জনা জমিতে দেয় না। মৃন্ময় মনুমেন্টের তলায় আসিয়া বসিল। কতকগুলি ছেলেমেয়ে আয়ার সঙ্গে বেড়াইতেছে। দিব্যি স্বাস্থ্য। দেখিতে ভাল লাগে। কত সাহেব মেম বেড়াইতেছে। প্রাণ ভরিয়া

হাসিতেছে। আনন্দের নির্ঝর যেন। মৃন্ময় ভাবে উহাদের কি কোন অভাব নাই, অথবা কোন দুঃখ! জীবনটাকে এরাই উপভোগ করিয়া লইতেছে। এরা পরদেশে আসিয়াও স্বাধীন, আমরা নিজের দেশেও পরাধীন। প্রাণ ভরিয়া একটু হাসিতে পারি না, মন খুলিয়া দুইটা কথা বলিতে পারি না। আমরা নিজেদের ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের দাবি তাই আজ আত্মকলহের ইন্ধন যোগায়। সত্য দাবি মিথ্যার কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন। আলো নাই...শুধু অন্ধকার...নীরন্ধ্র অন্ধকার।

মৃন্ময়কে আজ কি ভূতে পাইয়াছে? সে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে। আজ এই সব এলোমেলো ভাবনা তাহার মনকে নাড়া দিয়াছে কিসের জন্য! অকস্মাৎ সে সুনির্ম্মলকে এর জন্য সর্ব্বতোভাবে দায়ী করিয়া পুনরায় হোষ্টেলের পথে পা বাড়াইল।

পরদিন বৈকাল।

আজও সুনির্ম্মলের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। মৃন্ময়ের বাক্স-পেঁটরার প্রতি দৃষ্টি পড়িতে সে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। জিনিষপত্র সব বাঁধাছাঁদা হইয়া গিয়াছে। মৃন্ময় ঢাকা মেলে আজ রাত্রেই দেশে রওনা হইবে। অথচ গতকালও ঠিক ছিল পূজার অবকাশটা সে এখানেই থাকিবে। সুনির্ম্মল ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিল। বড় দেরি হইয়া যাইবে। তার এমন সাজান প্ল্যানটা শেষ পর্য্যন্ত না বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। তার জীবন-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনেক দুষ্কৃতির কাহিনী অঙ্কিত হইয়া আছে, অর্থ এবং মিথ্যার গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া লক্ষ্যহারা ভাবে ঘুরিয়া মরিতেছে। সুনির্ম্মল আজিও ভদ্র-সমাজে দিব্যি নিরুপদ্রবে মাথা উঁচু করিয়া আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সে নিজেই ধাঁধায় পড়িয়াছে লিলিকে লইয়া। তার জীবনে লিলি ফুরাইয়া গিয়াছে তাই সে আজ মুক্তি চায়। অথচ সহজ পথ নাই। লিলি চালাক মেয়ে। আইনের ধরে সে তাহাকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লইয়াছে। সহজ পথে মুক্তি নাই বলিয়াই মৃন্ময় তার অন্তরঙ্গ। বন্ধুত্বের বন্ধনের মধ্যে সে তার মুক্তির সন্ধান করিতেছে।

লিলিকে সে ভয় করে। ঐ নির্ব্বাক গম্ভীর মেয়েটি যে কখন কি ভাবে চলে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তাদের মধ্যের সম্বন্ধটা অতি কৌশলে সে কিছুদিনের জন্য চাপা দিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু এই গোপনতার গ্রন্থি যে-কোন মুহূর্ত্তেই সে খুলিয়া ফেলিতে পারে। তখন হয়তো নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে কোন পথই আর খোলা থাকিবে না। কিন্তু লিলির জীবন-পথে যদি মৃন্ময়কে আনিয়া দাঁড় করান যায় তাহা হইলে তার মুক্তির আশা নিতান্ত দুরাশা নয়। নিজের দুষ্কৃতির বোঝা অতি সহজে মৃন্ময়ের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া আইনকে ফাঁকি দেওয়া যায়।

মৃন্ময় কিছুক্ষণ সুনির্ম্মলের চিন্তিত মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া কহিল, অবাক হয়ে গেছ নাকি? হঠাৎ মনটা বেঁকে দাঁড়াল। এতদিনের অভ্যাস মা গিয়ে আর করি কি। খামোকা বুড়ো মা বাবাকে দুঃখ দিয়ে লাভ নেই।

সুনির্ম্মল ইতিমধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। সে হাসিয়া কহিল, সে ত নিশ্চয়। কিন্তু তোমার মত লোকের পড়াশুনোর ক্ষতি করে কতখানি যে পূজার আনন্দ ভোগে আসবে সেই কথাই ভাবছি।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, পড়াশুনো দেশেও বেশ চলতে পারে। কিন্তু বেশী দিন আমি গ্রামে থাকব না। তা ছাড়া লিলির ইংরেজী পড়ানোর ভার যখন দিয়েছ তখন বেশী দেরি করা চলতেই পারে না। এই কথাটাই জানতে চাইছ ত।

সুনির্ম্মলের চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মৃন্ময় কহিল, যদি শেষ পর্য্যন্ত কোন কারণে পিছিয়ে পড়ি তা হলেও তোমার ভাবনার কারণ নেই। লিলি তার পড়া-শুনার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন বলেই আমার বিশ্বাস।

সুনির্ম্মল পুনরায় গম্ভীর হইয়া উঠিল, তোমার ঐ দুমুখো কথাবার্ত্তা আমার ভাল মনে হয় না। যা বলবে তা পরিষ্কার করে বলাই তোমার উচিত।

মৃন্ময় শান্ত কণ্ঠে কহিল, যদি পরিষ্কার করে বলাটাই তুমি পছন্দ কর সুনির্ম্মল, তা হলে আমি বলি এ অধমকে রেহাই দাও। তুমি অর্থশালী, ইচ্ছে করলে অনায়াসেই তুমি এক জন অভিজ্ঞ প্রোফেসার তার জন্য নিযুক্ত করতে পার। আমিও সময়ের অপব্যবহার থেকে রেহাই পাই।

সুনির্ম্মল তীব্র কণ্ঠে কহিল, তুমি পয়সা চাও একথা খোলাখুলি বললেই হ'ত।

মৃন্ময় কতকটা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, তুমি আজ সুস্থ নও। আজ তুমি যাও। আমি ফিরে এলে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। বলিয়া, জোর করিয়া মৃন্ময় প্রসঙ্গটা চাপা দিল। সুনির্ম্মল কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ক্রমশঃ

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষার ভিত্তি

শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য

এক কথায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য "জ্ঞানলাভ"—জ্ঞানলাভের মুখ্য উদ্দেশ্য পরা শান্তি লাভ।

জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তি মচিরেণাধিগচ্ছতি—গীতা।

জ্ঞান দ্বিবিধ—পরা ও অপরা

পরা জ্ঞান—পরা বিদ্যা—ভূমা আত্মবোধ। যে জ্ঞানের উন্মেষণ হইলে সীমাবদ্ধ খণ্ডিত জীবন অতিক্রম করিয়া জীব অখণ্ড অনন্ত আনন্দঘন পরম তত্ত্বের বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে; ইহাই সত্যদর্শী পূজ্যপাদ ঋষিগণ কর্তৃক পরাজ্ঞান বা পরাবিদ্যা নামে কথিত হইয়াছে। এই জ্ঞানলাভই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য। মরণশীল মানব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন সে জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়া ধন্য হয়। মানব-জীবন সার্থক হয়।

অপরা জ্ঞান—অপরাবিদ্যা—অনাত্মবোধ

আত্মজ্ঞান বা পরাবিদ্যা ব্যতীত যাবতীয় জ্ঞান, যথা—আয়ুর্বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, অর্থকরী বিদ্যা ইত্যাদি সমস্ত জ্ঞানই অপরা নামে অভিহিত হয়। "পরাজ্ঞান" দ্বারা মানব মোক্ষলাভ করে এবং অপরা জ্ঞানলাভে মানব সর্ব্ববিধ ভোগ ও তজ্জনিত বন্ধনপ্রাপ্ত হয়। মানব-জীবনের সার্থকতা ভোগে নয়, ত্যাগে—প্রবৃত্তি মার্গে নয়, নিবৃত্তি মার্গে—এই শিক্ষাই মানব-জাতির প্রতি ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান।

মাত্র ভোগতৃপ্তিই মানব-জীবনের একমাত্র অভীষ্ট নয়। আহার নিদ্রা মৈথুনই কেবল মানব-জীবনের চরমকাম্য নহে। পশুপক্ষীরাও এই তিনটির আচরণ করে, মানব-দেহ ধারণ করিয়া যাহারা কেবলমাত্র ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিতেই রত তাহারা পশুরই সমান।

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ।
সামান্য মেতৎ পশুভির্নরাণাম্॥
ধর্ম্মোহি তেষাম্ অধিক বিশেষো।
ধর্ম্মহীনা পশুভিঃ সমানাঃ॥—মনু সংহিতা।

দেশকাল পাত্র অনুসারে কর্ম্মধারা নিরূপণ করিবার জন্য পূজ্যপাদ ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে, আজ দেশের সর্ব্বত্রই হাহাকার; ঘরে ঘরে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, অর্থাভাব, জ্ঞানাভাব এবং শিক্ষার অভাব; অভাব—অভাব—অভাব—অভাবের অগ্নিশিখা আজ প্রদীপ্ত হইয়া চতুর্দিকে ধূ, ধূ জ্বলিতেছে। এই অভাবের অভাব কবে হইবে তাহা কে জানে? মানবকুল আজ অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত। এ দুর্দশার মূল কারণ প্রকৃত শিক্ষার অভাব।

পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে আজ আমরা মুক্ত হইলেও আমাদের মধ্যে এত আবিলতা, এত গলদ যে আশু তাহার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন, নহিলে স্বাধীনতার প্রকৃত আস্বাদন লাভ হইবে না, হইতে পারে না। বাহ্যিক আবিলতা দূর করা সহজ, কিন্তু অন্তরের আবিলতা বিদূরিত করা সহজ নয়; অন্তরের আবিলতা তখনই বিদূরিত হইবে যখন দেশের প্রত্যেক শিক্ষক, প্রত্যেক শিক্ষার্থী, প্রত্যেক জননী ও প্রত্যেক সন্তান প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ভারতের আকাশ বাতাস গরিমায় পূর্ণ করিবে। তখন ভারতমাতা তাঁহার প্রদীপ্ত প্রভায় সমগ্র পৃথিবী আলোকিত করিয়া জগতে পুনরায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন; ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

শিক্ষার ভিত্তি

"খাঁটি মানুষ" তৈয়ারী না হইলে, দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না। আমাদের দেশ আধ্যাত্মিকতার দেশ; এ দেশের উন্নতিকল্পে যিনি যে দিক দিয়াই প্রচেষ্টা করুন যত রকমই দেশহিতকর পরিকল্পনা করুন—এদেশের মজ্জাগত যে ভাবধারা, যে কৃষ্টি, তাহা ভগবৎমূলক। আমরা আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবার দিকে যদি দৃষ্টি না রাখি—ভগবদভিমুখী সমাজ-বিজ্ঞানের দিককে যদি অবহেলা করি, তবে দেশের প্রকৃত কল্যাণের আশা সুদূরপরাহত হইবে।

ভাবী জাতি-গঠনের প্রধান দায়িত্ব মায়েদের। তাঁহাদের ঋতুকালীন আচরণ গর্ভাবস্থায় নিয়মপালন ও প্রসবের পর সন্তান পালন—এই তিনটির উপরেই সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

নারীকে এই সময়ে অবশ্যপালনীয় নিয়মাদি যদি শিক্ষা দেওয়া যায় তবে নারী সহজেই সন্তান-রত্নের 'মা' হওয়ার আশা করিতে পারেন।

ভবিষ্যতের মানুষ দেশকল্যাণকর কার্য্যের প্রথম ও প্রধান সোপান। ইহার মূল ভিত্তি হইবে নারীর শিক্ষা, ঐ শিক্ষা ভিত্তি যতই সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে তদুপরি নির্ম্মিত শিক্ষা সৌধও ততই দীর্ঘস্থায়ী ও সুরম্য হইবে।

নারীর শিক্ষা

যত দিন দেশের নারীগণ আদর্শ রমণীরূপে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিতা না হন তত দিন সুসন্তান জন্মিবে না। সুসন্তান

জন্মিলে—সুসন্তানে দেশ পরিপূর্ণ না হইলে দেশের কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না। বহু রক্তদান ও বহু কারাবরণ দ্বারা অর্জ্জিত এই স্বাধীনতা রক্ষা পাইবে না। তাই নারীদের শিক্ষার এত প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে স্কুল কলেজে আমাদের বালিকাদিগকে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ ও সঙ্কীর্ণ; নারীর মানসিক গড়ন ও চারিত্রিক বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রাপ্তবয়স্কা বালিকাগণকে সাধারণ জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই শারীর বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে পালনীয় নিয়মগুলিও যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল নিয়ম না জানায়, পালন না করায় বহু প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়।

চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল স্ত্রীরোগ চিকিৎসায় নিযুক্ত থাকিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, এদেশের মেয়েরা ঋতুকাল, গর্ভাবস্থা ও সন্তান প্রসবান্তে পালনীয় নিয়মগুলি না জানায় এবং বহু ক্ষেত্রে জানিয়াও পালন না করায় অনেকে দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হন ও বহু আকাঙ্ক্ষিত সুসন্তানলাভে বঞ্চিত হন। ঋতুকালে নারীদের যে সকল নিয়মপালন করা একান্ত কর্ত্তব্য তাহা না করায় বহু নারী সারাজীবন জীবন্মৃত অবস্থায় জীবন-যাপন করেন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে—

আর্ত্তবস্রাবদিবসাদ হিংসা ব্রহ্মচারিণী
শয়ীত দর্ভশয্যায়াং পশ্যেদপি পতিং ন চ
করে শরাবে পর্ণে বা হবিষ্যং ত্র্যহমাহরেৎ
অশ্রুপাতং নখচ্ছেদভ্যঙ্গমনু লেপনম্
নেত্রয়োরঞ্জনং স্নানং দিবা স্বাপং প্রধাবনম্।
অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণং হসনং বহুভাষণং
আধাতং ভূমিখননং প্রবাতঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥

অর্থাৎ রজঃস্বলা স্ত্রী রজঃ নিঃসরণ দিবস হইতে তিন দিন হিংসা করিবে না; ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, কুশাসনে শয়ন করিবে, পতিকে দর্শনও করিবে না, হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। অশ্রুপাত, নখচ্ছেদন, অভ্যঙ্গ অনুলেপন, নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন, স্নান, দিবানিদ্রা, প্রধাবন, হাস্য, বহুভাষণ, পরিশ্রম, অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণ, ভূমিখনন ও প্রবল বাত সেবন—এইগুলি বর্জ্জন করিবে।

প্রসবের পর, সন্তান পালন কিভাবে করিতে হয় তাহা আমাদের দেশের কয়জন জননী জানেন? গর্ভধারিণী হওয়া সহজ, কিন্তু মা হওয়া এত সহজ নয়।

শিশু পালন—শিশুর প্রয়োজনীয়তা

শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ বল ও ভরসা। কিন্তু সেই শিশু যদি সুস্থ ও বলিষ্ঠ না হইয়া রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয়, তাহার দ্বারা জাতির উন্নতি বা দেশরক্ষা—কোন কাজই হয় না। যদি শিশু চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ না হইয়া চরিত্রহীন ও অধার্ম্মিক হয়, সে বংশের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক, দেশের কলঙ্ক হইয়া দাঁড়ায়। সন্তান রুগ্ন ও দুর্ব্বল কিংবা চরিত্রহীন হওয়া যে কি নিদারুণ, সে দুঃখ যে কি মর্ম্মন্তুদ তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অপরে বুঝিবে না।

শিশু এরূপ হয় কেন? এ কথার উত্তর শিক্ষার দোষে।

যে সন্তান জীবনের প্রথম হইতে আহার-বিহার ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে সৎশিক্ষা না পায় সে কখনও সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ হইতে পারে না। সন্তানকে মাত্র আহার ও পোশাক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেই তাহার প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হয় না; সন্তানকে যথারীতি "পালন" করিতে হইলে তাহার স্বাস্থ্যগঠনের সঙ্গে সঙ্গেই চরিত্রগঠনের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। পিতামাতা নিজেরা সৎ হইয়া সদ্দৃষ্টান্ত না দেখাইলে সন্তান সৎ হয় না—হইতে পারে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি গর্ভধারিণী হওয়া সহজ, কিন্তু মা হওয়া সহজ নয়।

বাল্যে মাতৃক্রোড়ে শিশুর যে শিক্ষা আরম্ভ হয় সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাই তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে দেখা যায়। বর্ত্তমানে স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সন্তান অর্থকরী বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইতে পারে, কিন্তু যদি জীবনের প্রথম হইতেই সর্ব্ববিষয়ে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা পালন করিতে শিক্ষা না পায়, কালে সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। এই উচ্ছৃঙ্খলতার জীবন্ত ছবি আজ সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান।

তাই যদি আমরা সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ সন্তান লাভ করিতে চাই, যদি আমাদের সন্তানদের বংশের গৌরব, জাতির গৌরব, দেশের গৌরবস্বরূপ দেখিতে চাই, তো তাহার জীবনের প্রথম দিন হইতেই তাহার আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই সতর্ক হইতে হইবে। এই নির্দ্দেশ যথাযথভাবে পালন করিলে, দেশের প্রতিগৃহ সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ সুসন্তানে পরিপূর্ণ হইবে।

জন্মের প্রথম দিন হইতেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা চলে। বাল্যের শিক্ষা যত সহজে অভ্যাসে পরিণত হয় পরবর্ত্তী কালের শিক্ষা তত সহজে হয় না। বাল্যের শিক্ষা জীবনের সঙ্গে একেবারে একীভূত হইয়া যায়, সে শিক্ষা সহজে ভুলা যায় না, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। স্কুল কলেজে সাধারণ জ্ঞান ও অর্থকরী বিদ্যা লাভ হইতে পারে, কিন্তু অধুনা তথায় মনুষ্যত্ব লাভের শিক্ষা দেওয়া হয় না। ইহা অতীব ক্ষোভের বিষয়।

বাল্যকাল হইতে শিশুকে সংযম শিক্ষা দিতে হইবে এবং ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তিগুলি তাহার কোমল হৃদয়ে যাহাতে উদিত না হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে।

শিশুর শিক্ষা লাভের প্রকৃষ্ট স্থান ও কাল

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জীবনের প্রথম দিন হইতেই আমাদের শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা চলে। পিতৃমাতৃ সন্নিধান এবং পরিজনবেষ্টিত নিজ আলয়ই প্রকৃত শিক্ষালয়। শিশু যখন পাঠশালায় যাইতে আরম্ভ করে তখন তাহার চরিত্র গঠনের দায়িত্ব "গুরু মহাশয়ে"র উপর বহুলাংশে ন্যস্ত হয়। পাঠশালাতে শিশুর "গুরুকরণ" আরম্ভ হয়। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে উপযুক্ত গুরুগুণবিহীন হইয়াও অনেকে গুরুপদবাচ্য হইয়া দাঁড়ান। মনে রাখা উচিত যাঁহার নিজের চরিত্র গঠিত হয় নাই, সেই গুরুমহাশয় জ্ঞানবিহীন শিশুর চরিত্র গঠনের ভার লইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। যিনি নিজের কাম ক্রোধাদি রিপু দমনে অক্ষম তিনি অপরকে রিপু দমনের শিক্ষা দিবেন কিরূপে? কেবলমাত্র মৌখিক উপদেশ দানে অপরের চরিত্র গঠন করা যায় না। অপরের চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায় নিজের চরিত্র গঠিত করিয়া সেই দৃষ্টান্ত অপরের সমক্ষে স্থাপন করা। পিতা মাতা ও শিক্ষকগণের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের শিক্ষাই দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ শিশুতে প্রতিফলিত হয়।

শিশুর নৈতিক শিক্ষা

মনুষ্যত্বের পরিচয় ভোগে নয়, নিবৃত্তিমার্গে। মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যাহারা কেবল মাত্র ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিতে রত তাহারা পশুর সমান।

সন্তানকে চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ করিতে হইলে বয়ঃ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে হইবে :—

সৎসঙ্গ, সদাচার, সদ্ধবৎ, সত্যবাদিতা, সরলতা, অহিংসা—পরপীড়া বর্জ্জন, দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সংযম, দানশীলতা, শ্রদ্ধা-ভক্তি ও শৃঙ্খলতা—নিয়মানুবর্ত্তিতা।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার অবসান তখনই সম্ভব যখন সুশিক্ষিত সুসংযত সচ্চরিত্র শিক্ষা-নিপুণ সহৃদয় শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হইবে, যখন স্বাস্থ্যবতী সন্তান পালনে সুনিপুণা জননীগণ দ্বারা প্রতিগৃহ গৌরবান্বিতা হইবে। দেশের প্রকৃত উন্নতি তখনই সম্ভব যখন দেশের যুবকবৃন্দ সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান, ধর্ম্মপ্রাণ ও সুসংযত হইয়া জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

নারী

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

বিস্ময়-বিমূঢ় চিত্তে অকস্মাৎ তোরে হেরিলাম আজি।
হেরিয়াছি বার বার দিবস রজনী, নব সাজে সাজি'
আবির্ভূত হইয়াছ নয়ন-সম্মুখে, মুগ্ধ হই আমি—
যেন স্বপ্ন-লোক হ'তে হে স্বপ্ন-চারিণী আসিয়াছ নামি,
বিথারিয়া মায়া আর বিরচিয়া মোহ ভুলাইলে অয়ি,
মদির-অলস নেত্রে ছুটেছি পিছনে হে ছলনাময়ী!
তোমার ছলনা-মুগ্ধ নয়নে আমার তুমি ছিলে নারী;
মোহ-ভার মুক্ত হ'য়ে হেরিলাম—হাতে অমৃতের ঝারি।

শুভম প্রভাতে তাই আমি নমিলাম। আমার আকাশে
প্রথম উষার আলো যবে ফুটে ওঠে আভাসে আভাসে,
হেরিনু সে আলো আমি বিপুল বিস্ময়ে তোর বুকে শুয়ে;
অমৃতের যে আস্বাদ লভিয়াছি নামে তোর বুকে ছুঁয়ে,
যে গান গাহিয়া ওঠে আমার এ কণ্ঠ, আমি শুনিলাম
জীবনের উষালোকে তোর কণ্ঠে সেই গীতি অবিরাম।
ভুলে গেছি সে কাহিনী, ভুলে গেছি ওরে সে পীযূষ-বারি,
আমার প্রভাতে তুমি এনেছিলে সাথে অমৃতের ঝারি।

জীবনের বেলাভূমে একা নহি আমি। মোর খেলা সাথে
বুক-ভরা প্রীতি নিয়ে মুখে নিয়ে হাসি আছে আঙিনাতে
সাথী মোর দিবারাতি। বাদে বিসম্বাদে যদি ভুলে যাই,
ডাগর আঁখিতে ভার ফুটে ওঠে ভাষা, ডাকে—আয় ভাই।
দূরে যায় রেখে যায় তবু স্নেহপ্রীতি অকুণ্ঠিত প্রাণ
অযাচিত সেবা-ভরা স্মৃতি-ঘেরা তার অসীম কল্যাণ।
জীবনে সরস করি' স্নেহের পরশ সর্ব্বত্র বিথারি'
মঙ্গল-কামনা-পূত নিয়ে এলে সাথে অমৃতের ঝারি।

পিকবধূ নিয়ে আসে মধু-মাস, আসে দক্ষিণা পবন,
নামে সবুজের ঢেউ, নামে কুসুমিত বন-উপবন,
স্বর্গের মদিরা নামে মোর দুটি চোখে, বুকে ভালবাসা,
কামনার পাত্রখানি পূর্ণ করি' জাগে দুরন্ত দুরাশা:
হেনকালে ফুটে ওঠে নয়ন-সম্মুখে একখানি ছবি,
খুঁজেছিনু যারে আমি অন্তরে বাহিরে, সে প্রিয়-বান্ধবী
ব্রীড়ায় আনত আঁখি দাঁড়ায়ে একাকী মোর দ্বারে নারী
বসন্তের প্রস্ফুটিত মাল্য-সম, হাতে অমৃতের ঝারি।

একটি কলিকা ছোট বুকে আসে নেমে, মুখে হাসি-রাশি
স্বর্গের সুষমা-মাখা, সুধা-ঢালা প্রাণ স্নেহেতে উচ্ছাসি'
বাহু দিয়া কণ্ঠ ঘেরি' তোলে সে কল্লোল তটিনীর মত,
রৌদ্র-তপ্ত বক্ষ-মাঝে আনে সরসতা স্নিগ্ধতা সতত,
সেবায় ভরিয়া রাখে ক্ষুদ্র যে অঞ্জলি, করে কল-গীতি,
মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষা তার, বক্ষ-ভরি' আনে মাধুর্য্য ও প্রীতি,
পূজার নির্ম্মাল্য যেন, মাঙ্গলিক গান ভরি কণ্ঠে তারি,
রূঢ় রুক্ষ জীবনের বেলাভূমে আনে অমৃতের ঝারি।

রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের দায়িত্ব

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

অনেকে আজও ভাবিয়া থাকেন, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছেন। কিন্তু এ কথা আমার বার বার মনে হইয়াছে যে, নোবেল পুরস্কার রবীন্দ্রনাথের যথোপযুক্ত পুরস্কার নহে। কেননা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তুল্য সাহিত্য-স্রষ্টা এ যুগে কোন দেশেই নাই। আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ এবং স্বাদেশিকতায় হয়ত বিচারবুদ্ধি আমাদের অন্ধ, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশেও রবীন্দ্রনাথের যে সম্মান তাহাতে মনে হয়, গেটের পর রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের আবির্ভাব ইউরোপে আর হয় নাই। শরৎ চন্দ্র বলিতেন তিনি সাধারণের ঔপন্যাসিক আর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মত ঔপন্যাসিকদের ও লেখকদের ঔপন্যাসিক এবং লেখক। প্রতিভা যদি নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি হয়, তাহা হইলে এই বিচ্ছুরিত বিলসিত নিত্য নূতন প্রতিভা যাহা অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া সহস্রবিধ চরিতার্থতায় আপনাকে ও জগৎকে সার্থক করিয়াছে তাহার তুলনা কোথায়? শরৎ চন্দ্রের উক্তি মিথ্যা বিনয়ভাষণ নহে, রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু, সাহিত্যগুরু। সাহিত্যের সকল বিভাগে আপনার সার্থক প্রতিভার স্বাক্ষর চিহ্ন তিনি বারে বারে আঁকিয়া গিয়াছেন। ভাবে, ভঙ্গীতে, ভাষায়, ষ্টাইলে তাঁহার প্রাণপ্রাচুর্য্যের ক্ষয় ছিল না। নিত্য নূতনরূপে তাঁহার প্রতিভা বৈচিত্র্য আমরা তাঁহার শেষ জীবনেও দেখিয়াছি। সমালোচক শিরোমণি ড্রাইডেন কবি চসারের সৃষ্টি-প্রাচুর্য্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন—Here is God's plenty। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য।

আমেরিকার দার্শনিক উইল্ ডুরাণ্ট রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, শুধু রবীন্দ্রনাথের জন্যই ভারত স্বাধীন হইবার যোগ্য। জাতি স্বাধীন হইলে জাতির মনুষ্যত্ব ও সৃষ্টিশক্তি সার্থক ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পাবে। ইহাই স্বাধীনতা লাভের সর্ব্বাপেক্ষা সারবান যুক্তি। সৃষ্টিশক্তি মানুষের অমরতা লাভের উপায়স্বরূপ। পরাধীন ভারতে যখন সৃজনী প্রতিভার পরাকাষ্ঠা রবীন্দ্রনাথে দেখিতে পাই, শ্রেষ্ঠ মানবতা যখন গান্ধীজীর জীবনে প্রতিভাত হয় তখন ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ মনে স্থান পায় না। পরাধীনতার মধ্যেও যে জাতির প্রাণের ধারা এমনই অটুট ও সার্থক সে জাতি কখনও মরিবে না। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের বন্ধুর পন্থা দিয়া এক দিন তাহার আত্মা আপনাকে খুঁজিয়া পাইবেই।

রবীন্দ্রনাথ কবি, কিন্তু তাঁহার মহত্তর রূপ পরিস্ফুট তাঁহার ঋষিত্বে। নূতন সভ্যতার অগ্রদূত হিসাবে তিনি জগতের ইতিহাসের অলিখিত অধ্যায়ে একটা বিরাট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্ম্মমূলে গিয়া উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ও তাহাদের ভাল-মন্দের বিচার করিয়াছেন। স্বদেশী সমাজের যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে বিশ্লেষণ তিনি করিয়াছেন তাহা তাঁহার মত কবি-মনীষীর দৃষ্টিতেই সম্ভব। সেই বস্তুকে ভিত্তি করিয়াই হয়ত একদিন মানুষের আত্মিক মিলনের প্রয়োজনে নূতন সভ্যতা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবে। এমনি করিয়া গান্ধীজীর জীবনাদর্শও হয়ত একদিন জগতের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিবে।

কার্ল মার্কস সভ্যতার যে অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও যান্ত্রিক সভ্যতার পরিণতি কোন্ দিকে তাহার সার্থক ইঙ্গিত তাঁহার লেখার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন জগতের শ্রমিক আন্দোলনের মর্ম্মমূলে তাহা প্রেরণা জোগাইয়াছে। রাশিয়ার আদর্শ কম্যুনিজম; রাশিয়া ইহা প্রবল ভাবে প্রচার করার ভার লইয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্টরা তাহা জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছে। আমাদের দেশেও রুশীয় মতবাদ প্রচারকের অভাব নাই। প্রচারের ফলে যাহা অর্দ্ধ সত্য বা মেকি তাহাও সচল হইতেছে অথচ জগতের সভ্যতাকে নূতন করিয়া গড়িতে পারে যে মহান্ আদর্শ তাহাকে জগতে প্রচার করার দায়িত্ব কেহ মানিয়া লইতেছে না।

এইখানেই ভারতবাসী ও বঙ্গবাসী হিসাবে আমাদের একটা বিরাট দায়িত্ব আছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য অপূর্ব্বসুন্দর। তাহা অনুরাগের সহিত পড়িতে ও বুঝিতে হইবে; দেশের জনসাধারণকে পড়াইতে ও বুঝাইতে হইবে। এজন্য রবীন্দ্র-পাঠচক্রের প্রয়োজন। আবৃত্তিকারক, অভিনেতা, গায়ক ও অধ্যাপকদের মিলন ও সহযোগিতায় দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মবাণী দেশের জনসাধারণে বুঝিতে শিখিবে। আমাদের বহু সৌভাগ্য যে আমরা রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক, তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার কথা শুনিয়াছি, কেহ বা তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়াছি। সহস্র বৎসর পরে কত বিদেশী ও স্বদেশী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য অতি অনুরাগের সহিত আলোচনা করিবে কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যের কণামাত্রও তাহারা পাইবে না। এই কারণেই আমাদের দায়িত্বও প্রবল হওয়া চাই। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, —প্যারিসে যখন রবীন্দ্রনাথ বেড়াইতে গিয়াছেন এক ফরাসী

মোটরগাড়ী-চালক রবীন্দ্রনাথকে এক হোটেলে পৌঁছাইয়া দেয়। কবির সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জানিতে সে চায়। যখন সে জানিল হিন্দু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার গাড়ীতে চাপিয়াছিলেন সে ভাড়া লইতে অস্বীকার করিল ও জানাইল—রবীন্দ্রনাথের কাব্য সে পড়িয়াছে। জাতি কতখানি সভ্য হইলে তাহার গাড়োয়ানেও বিদেশী মনীষীর লেখা অনুরাগের সহিত পড়িতে শেখে। সকলেরই মনে আছে যে দিন পারি নগরী জার্ম্মানদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় সে দিন পারি রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' অভিনয় চলিয়াছিল। ফরাসী জাতির কৃষ্টি যে এক দিক দিয়া অতুলনীয় ইহা তাহারই পরিচয়। এতখানি শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা বাঙালী ও ভারতীয় পাঠকদের কবে হইবে? না হইলে আমাদের স্বাধীনতা পুরাপুরি সার্থক হইয়া উঠিবে না। রবীন্দ্রনাথের বিরাট সৌন্দর্য্যবোধ জাতির প্রাণে সঞ্চারিত করিতে পারিলে জাতির জীবন সার্থক হইবে। তাঁহার সাহিত্যে যে প্রাণদ মন্ত্র আছে জাতির জীবনীশক্তি স্ফুরণে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সেই মন্ত্র কি জাতির প্রাণে আমরা সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছি?

অনেকে অভিযোগ করেন রবীন্দ্রনাথ দুর্ব্বোধ্য। এ অভিযোগ কিয়ৎ পরিমাণে সত্য। যে বিরাট প্রতিভা ও মনস্বিতা অপূর্ব্ব প্রাণশক্তি লইয়া কবির পঞ্চদশ বর্ষ হইতে অশীতি বর্ষ পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে বিচিত্র ধারায় আপনাকে সার্থক করিয়াছে তাহার গভীরতা, তাহার বিস্তার, প্রকাশভঙ্গীর অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা আপনা হইতেই তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিকে অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে। এ সাহিত্য বুঝিতে, উপভোগ করিতে সাধনার আবশ্যক। মিল্টনের এক সমালোচক বলিয়াছিলেন টীকার সাহায্য ব্যতিরেকে মিল্টনের কাব্য-রস আস্বাদন করিবার অধিকার পাণ্ডিত্যের শেষ পুরস্কার—last reward of mature scholarship। এ কথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যাঁহারা রবীন্দ্রভক্ত তাঁহাদিগকে যথোচিত সাধনা, ও পরিশ্রম দ্বারা রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস আস্বাদন করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া পঠন-পাঠনের বন্দোবস্ত করা। সঙ্গীত বিদ্যালয়েও দরকার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষ চর্চ্চা ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করা। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরিয়া যাহা লিখিয়াছেন সারা জীবনের সাধনা দিয়াই তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। এই জন্যই মিলিতভাবে জাতীয় মহাকবির সৃষ্টি-প্রতিভার চর্চ্চা ও উপভোগের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কবি ইয়েটস্ বলিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান এক দিন কুলী মজুর চাষী মাঝি সকলেই গাহিবে। আজও সে দিন আসে নাই। দেশে কাগজপত্র, সভাসমিতি, রেডিও প্রভৃতি প্রচুর থাকিলেও প্রচারের পথ যথেষ্ট উন্মুক্ত নয়। বাংলার কবিওয়ালা, বৈষ্ণব কবি, রামপ্রসাদ প্রভৃতির গান অতি সহজেই বাঙালীর নিভৃত গ্রাম্য জীবনে গিয়াও স্থান করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু আজও জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সঙ্গীতস্রষ্টার সুর জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইতে পারে নাই। ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে মজুরও রবীন্দ্রনাথের অনূদিত কবিতার রস গ্রহণ করে অথচ তাঁহার দেশবাসীরা আজও সে রসে বঞ্চিত। শিক্ষার অভাবই দৈন্যের হেতু এ কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু শিক্ষার বন্দোবস্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কর্ত্তব্য হইবে রবীন্দ্র-সাহিত্য ব্যাপকভাবে প্রচারের বন্দোবস্ত করা। শান্তিনিকেতন হইতে যে প্রতিষ্ঠানের মারফৎ লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে সেই লোকশিক্ষা-পরিষৎ যদি রবীন্দ্র-সাহিত্যে আদ্য মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার বন্দোবস্ত করেন ও উপাধির পর যাঁহারা রবীন্দ্র-সাহিত্যে গবেষণা করিতে চান তাঁহাদের সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দেন তাহা হইলে বাঙালী জাতি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিবে। এই পরিষৎ ছাত্রদের জন্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিবেন; সঙ্গে সঙ্গে পাঠনের বন্দোবস্তও করিয়া দিবেন।

এই ধরণের কাজ হইলে জাতি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবে। বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে তাগিদ আসিবে নানা জাতিকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও বাণী বুঝাইবার। দেশের যাঁহারা জ্ঞানী ও গুণী তাঁহাদের উপর এই ভার অর্পিবে। অনুবাদ করিয়া, বক্তৃতা দিয়া, নূতন আলোচনা পুস্তক লিখিয়া, গান গাহিয়া, আলোকচিত্রাদির সাহায্য লইয়া রবীন্দ্রনাথের বাণীকে নানা জাতির মনের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

এই কার্য্য করিতে না পারিলে রবীন্দ্রনাথের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হইবে না; জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে তাঁহার যে অবদান, জগতের কল্যাণকামনায় তাঁহার যে সাধনা ও বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্নে সকল শক্তি নিয়োগ তাহা নিতান্তই নিরর্থক হইবে। শক্তি ও দ্বন্দ্বের হানাহানিতে জগৎ আজ ক্লান্ত। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'কে শান্তি দিতে পারে বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর মত মহামানবগণ। ইউরোপ শ্রান্ত ক্লান্ত; তাহার হিংসা লোভ ও সংশয়ের মধ্যে মানবাত্মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই জগতের সুধীমণ্ডলী তাকাইয়া আছেন ভারতের দিকে। রবীন্দ্রনাথ ভারতের সেই বাণীমূর্ত্তি।

কমনওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশন টাসম্যানিয়ার আবেদন শুনিতেছেন। বাম হইতে—উড, রিচার্ডসন, ফিট্‌জিরাল্‌ড, কেনেলি, অসবোর্ণ, টাসম্যানিয়ার প্রধান মন্ত্রী কসগ্রোভ, বিন্‌স্, লেখক।

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

অষ্ট্রেলিয়া

১৯৪৭-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার সকাল সাড়ে ছ'টার সিডনি বিমানঘাঁটিতে নামিলাম।

ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় দূতাবাস হইতে আমার আগমন-সংবাদ জানাইয়া অষ্ট্রেলিয়াস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারকে একটি তার করা হইয়াছিল। সেই তারের একটি নকল আমি ভ্যানকুবারে পাইয়াছিলাম। তারে লেখা ছিল যে, আমি একদিন সিডনিতে বিশ্রাম করিয়া পরদিন ক্যানবেরা যাইব। দূতাবাসের কর্তৃপক্ষ মনে করিয়াছিলেন যে, এত বড় লম্বা ভ্রমণের পর আমি একদিন বিশ্রাম করিতে চাহিব। তারে হাই কমিশনারের ঠিকানা দেওয়া ছিল সিডনি। কিন্তু তিনি থাকেন ক্যানবেরায়। মনে সন্দেহ হইল, ঠিকানায় যখন ভুল আছে তখন হাই কমিশনার মহাশয় সময়মত তারটি নাও পাইতে পারেন। বিমানঘাঁটিতে নামিয়া খোঁজ লইয়া জানিলাম, আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কেহ ঘাঁটিতে আসে নাই অথবা আমার জন্য কোন সংবাদও নাই। আমার অনুরোধে ঘাঁটির কর্মচারিগণ টেলিফোন যোগে তাঁহাদের নগরস্থিত কার্য্যালয়ে খবর দিলেন। খবর আসিল সেখানেও আমার জন্য কোন সংবাদ বা কোন ভদ্রলোক উপস্থিত নাই। ঘাঁটির কর্মচারিগণ বলিলেন, "শীঘ্রই ক্যানবেরাগামী একটি বিমান সিডনি ত্যাগ করিবে। সে বিমানে আপনি স্থান পাইতে পারেন।" তৎক্ষণাৎ টিকিট কিনিয়া হাই কমিশনারকে আমার আগমনবার্ত্তা জানাইয়া তার করিয়া দিলাম। এই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া মালের খোঁজ লইতে লাউঞ্জে গেলাম। ততক্ষণ মাল শুল্ক বিভাগের হেফাজতে আসিয়াছে। সেখানে কয়েকজন সাংবাদিকের পাল্লায় পড়িলাম। অন্যান্য দেশ হইতে এখানকার সাংবাদিকগণ অধিকতর উৎসাহী। 'আমার কিছু বলিবার নাই।'—একথা বলিলেই অন্যত্র সাংবাদিকগণ চলিয়া গিয়াছেন। করাচীতে যাইবার পূর্ব্বে এক জন সাংবাদিককে আমি কথা দিয়াছিলাম যে, আমি অন্য কোন সাংবাদিককেও কিছু বলিব না। কিন্তু এখানে সাংবাদিকগণ আমাকে রীতিমত জেরা করিতে সুরু করিলেন এবং আমার ছবি না তুলিয়া ছাড়িলেন না। পরদিন যথারীতি 'সিডনি সান' পত্রিকায় আমার ও আমার দুই জন সহযাত্রীর ছবি দেখিলাম। অপর দুই জনের মধ্যে এক জনের নাম "টেডপুল" এবং দ্বিতীয়ের নাম "জন জেলিন"। টেডপুল মোটর-দৌড়ে খ্যাতিমান। 'জন জেলিন' চৌদ্দ বৎসরের বালক, ইউরোপে পর্বতভ্রমণ কালে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ডাক্তার আলেকজাণ্ডার মিন্‌কাউফির জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

৮টার সিডনি বিমানঘাঁটি হইতে বিমান উড়িল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। মেঘ ও বৃষ্টি ভেদ করিয়া বিমান পরিষ্কার আকাশে উঠিল। ১২০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নয়টায় ক্যানবেরা বিমানঘাঁটিতে নামিলাম। নামিবার সময়

হকৃসবেরি নদীর পোল—সিডনি

পাহাড়ে ঘেরা বিমানঘাঁটিটির দৃশ্য বেশ ভাল লাগিতেছিল। অদূরে মেষপাল স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বিমানঘাঁটি হইতে সিধা হাই কমিশনারের আপিসে পৌঁছিলাম। যে বাড়ীতে বিমানের নাগরিক কার্য্যালয় তাহারই দোতলায় হাই কমিশনারের আপিস।

শহরের এই জায়গাটির নাম সিভিক সেণ্টার বা নগরকেন্দ্র। এখানে দুইটি সমান্তরাল বাড়ীর লাইন। প্রত্যেক লাইনে দুইটি করিয়া মোট চারিটি বাড়ী। বাড়ীগুলি দোতলা। প্রায় সব ঘরেই দোকান। কোন কোন ঘরে নানা প্রকারের আপিস—জায়গাটি ছোট। দোকানগুলিও খুব ছোট ছোট। মানুষও কম। ইহাই ক্যানবেরা সহরের কেন্দ্রস্থল।

হাই কমিশনারের আপিসে যাইতে তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দাম্‌লের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি মিনিট দশেক পূর্ব্বে আমার তার পাইয়া হোটেল ক্যানবেরায় আমার জন্য স্থান সংগ্রহ করিয়াছেন। দাম্‌লে মহাশয় বলিলেন যে, ওয়াশিংটনের তার পাইয়া তিনি আমার জন্য সিডনিতে এক দিনের মত হোটেল ঠিক করিবার জন্য তাঁহাদের সিডনিস্থ প্রতিনিধি শ্রীযুত সান্যালকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। বলিতে বলিতে টেলিফোন বাজিল। শ্রীযুত সান্যাল সিডনি হইতে ডাকিতেছেন। তিনি সিডনিতে বিমানের নগরস্থিত কার্য্যালয়ে গিয়া আমাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীযুত দাম্‌লের নিকট আমার সরাসরি ক্যানবেরা আগমনের সংবাদ পাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুত দাম্‌লে ট্যাক্সি ডাকিয়া আমাকে হোটেল ক্যানবেরায় পাঠাইয়া দিলেন।

ক্যানবেরা সুন্দর শহর। ইহাকে শহর না বলিয়া উদ্যান বলিলেই ঠিক হয়। এখানে মাত্র চৌদ্দ হাজার লোকের বাস। শহরে মানুষ অপেক্ষা বৃক্ষের সংখ্যা বেশী। বৃক্ষশ্রেণী সুসজ্জিত। নানা প্রকারের নয়নমনোহারী বৃক্ষ। তন্মধ্যে 'উইপিং উইলো' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার শাখাশ্রেণী হইতে কোমল পল্লবহুল দীর্ঘ প্রশাখাগুলি নীচে লুটাইয়া পড়িয়াছে। শহরের উত্তরে 'সিভিক্ সেণ্টার'। দক্ষিণে পার্লামেণ্ট ভবন ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী সরকারী আপিসসমূহ। সিভিক সেণ্টার ও পার্লামেণ্ট ভবনের মধ্যে প্রায় দেড় মাইল ব্যবধান। একটি জনবিরল সুন্দর রাস্তা সিভিক সেণ্টার ও পার্লামেণ্ট-ভবনকে সংযুক্ত করিয়াছে। প্রায় মধ্যপথে ক্ষীণ-কায়া মলোংলো নদী। ইহাই সহরের প্রধান অংশ। ইহার আশে পাশে মাঝে মাঝে সাজান বাড়ীঘর। 'হোটেল ক্যানবেরা' পার্লামেণ্ট ভবনের কাছে। হোটেলে গিয়া নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিলাম। একতলা বাড়ী। মধ্যস্থলে বড় চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ। হোটেলটি প্রাঙ্গণকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। ঘরগুলির সামনে ঘুরানো প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দার উপরে টালির ছাত। হোটেলের চারি দিকেও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। তাহাতে সুসজ্জিত তরুশ্রেণী। বহুদিন পরে এইরূপ একতলা বাড়ীতে থাকিলাম। এতদিন দেখিয়াছি পিঁপড়ার সারির মত মানুষ আর নদীর স্রোতের মত মোটরশ্রেণী। বাড়ী একটির ঘাড়ে আর একটি; পাল্লা দিয়া আকাশ ছুঁইতে উঠিয়াছে। এখানে কোন তাড়াহুড়া নাই। মানুষ, গাড়ী বা বাড়ী কেহই ভিড় করিয়া ছুটিতেছে না। অনেকক্ষণ পথ চলিলে একটি মানুষ বা একটি গাড়ী অথবা একটি বাড়ী দেখা যায়। বাড়ী মাটি ছাড়িয়া আকাশে উঠিতে চায় না। মাটির কোলেই শান্তিতে বিশ্রাম করিতেছে। কৃশা মলোংলো নদীর গতিতে কোন তাড়াহুড়া নাই। নির্ম্মল আকাশের নীচে এ যেন প্রকৃতির মায়াপুরী। প্রকৃতির কোলে বসিয়াও তাহার অপ্রমেয় রহস্যের কূলকিনারা না পাইয়া উইপিং উইলো আলুলায়িতকুন্তলা বিরহিণীর মত কাঁদিতেছে।

হোটেলে আসিয়া স্নানাদি সারিয়া পুনরায় হাই কমিশনার আপিসে আসিলাম। বাংলার ভূতপূর্ব লাট শ্রীযুত কেসি সাহেবের চিঠি আমার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি আমাকে তাঁহার মেলবোর্ণের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং এখানকার ট্রেজারী ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুত ম্যাক্‌ফার্লেন মহাশয়ের নিকট আমাকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যে চিঠি দিয়াছেন তাহার একটি নকল পাঠাইয়াছেন। প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে যখন কন-জার্ভেটিভ পার্টির হাতে এ দেশের মন্ত্রিত্ব ছিল তখন কেসি মহাশয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন। দাম্‌লে মহাশয় টেলিফোনে আমার আগমন-বার্ত্তা প্রয়োজনীয় আপিসগুলিতে জানাইয়া দিলেন। স্থির হইল ট্যাক্স বিভাগের পি. এস. ম্যাক্‌গভর্ণের সঙ্গে ঐ দিনই দেখা হইবে এবং পরদিন ম্যারেন্নিতার কমিশনের সি. জে. টেটাজ এবং ট্রেজারী সেক্রেটারী ম্যাক্‌-ফার্লেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।

পার্লামেণ্ট ভবনের দুইটি হাতার দুইটি বাড়ীর মধ্যে সরকারী খাস দপ্তরগুলি অবস্থিত। বাড়ী দুইটি উত্তর ব্লক ও

দক্ষিণ ব্লক নামে পরিচিত। পার্লামেন্ট ভবন একতলা। কিন্তু দপ্তর দুইটি দোতলা। পার্লামেন্ট ভবনের পিছনে একটি টিলা। এই টিলার উপর ভবিষ্যতে বড় করিয়া নূতন পার্লামেন্ট ভবন নির্ম্মিত হইবে। পি. এস. ম্যাকগভর্ণ ও এল. টমসন মহাশয়দ্বয়ের সহিত নানাবিধ আলাপ আলোচনা করিয়া এবং পড়িবার জন্য কয়েকখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

এখানে ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত নৈশ ভোজনের সময়। ৭টার পর কর্মচারিগণের ছুটি। খাদ্যের ও পরিবেশনের ব্যবস্থা ভালই। অভাবের কোন চিহ্ন নাই। একই টেবিলে পরস্পর অপরিচিত লোকেরা খাইতেছে।

এখানে দেখিতেছি সকলেই বেশ আলাপী। খাবার টেবিলে বা খাবার পর লাউঞ্জে অনেকেই আলাপ করিতে আসেন। হোটেলে কয়েকজন সাংবাদিক আছেন। তাঁহারা প্রায়ই নানা বিষয়ে আলাপ করেন। অনেকেই "শ্বেত অষ্ট্রেলিয়া" নীতি সম্বন্ধে আমার মতামত জানিতে চাহেন।

অষ্ট্রেলিয়া বিরাট দেশ। ইহার আয়তন ২৯, ৭৪, ৫১৪ বর্গ মাইল অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ। ইহার জনসংখ্যা মাত্র ৭৫ লক্ষ অর্থাৎ বর্তমানে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলের জনসংখ্যা অপেক্ষা কিছু বেশী। জনবসতি সমুদ্রোপকূলে সীমাবদ্ধ। দেশের অভ্যন্তরে জনবসতি নাই বলিলেই হয়। মাত্র চার-পাঁচটি শহরে দেশের প্রায় অর্দ্ধেক লোকের বাস। সিডনিতে ১১ লক্ষ, মেলবোর্ণে ১০ লক্ষ, ব্রিজবেনে ৫ লক্ষ, এডিলেডে ৩ লক্ষ, এবং পার্থে ২ লক্ষ লোকের বাস। বাংলাদেশে চাষাপ্রতি ৩/৪ একর জমি, আমেরিকায় চাষাপ্রতি ৩/৪ শত একর জমি ; আর এখানে চাষাপ্রতি ৩/৪ হাজার একর জমি। অষ্ট্রেলিয়ায় জলের বড় অভাব। জলাভাবে দেশের অভ্যন্তরে চাষের প্রসার সম্ভব হয় নাই। কোথাও জল এত অল্প যে পশুপালনও সম্ভব নয়। 'মেরিনো' জাতীয় মেষ আবিষ্কারের ফলে এদেশের বহু স্বল্পজল স্থানে মেষপালন সম্ভব হইয়াছে। এই জাতীয় মেষগুলি খায় কম ; দেখিতে কৃশ। কিন্তু ইহাদের লোম ঘন ও লম্বা। গম, ফল এবং পশম অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান পণ্য।

১৩ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ৯টায় মারে-রিভার কমিশনের আপিসে গেলাম। টেটাজ মহাশয় আমাকে সাদরে স্বাগত করিলেন। তাঁহার নিকট 'মারে' নদীর বিশদ বিবরণ শুনিলাম। মারে এ দেশের বৃহত্তম নদী। ১৬০০ মাইল লম্বা। ডার্লিং, মরুমবিজ ও গুলবার্ণ ইহার প্রধান উপনদী। ইহাদের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৭৬০ মাইল, ১০৫০ মাইল এবং ২৮০ মাইল। ভিক্টোরিয়া রাজ্যের অন্তর্গত 'গ্রেট ডিভাইড' পর্ব্বতমালা হইতে এই নদীগুলি উদ্ভূত। উৎপত্তিস্থল হইতে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার সীমানা পর্য্যন্ত মারে নদী নিউ সাউথ ওয়েলসের সীমানা

বাটলার্স গর্জের নিকট নিউল্লার্ক বাঁধ গাঁথা হইতেছে

নির্দ্দেশ করিতেছে। তারপর সাউথ অষ্ট্রেলিয়ার ভিতর দিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে। এই স্বল্পজল দেশে নদীর জল লইয়া রাষ্ট্রত্রয়ের মধ্যে প্রথম হইতেই বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন থাকায় বিবাদের মীমাংসা দুরূহ ছিল। ১৯০১ সালে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিবাদ-মীমাংসার পথ সুগম হইল। তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে জলের যথাযথ বণ্টন করিবার জন্যই রিভার মারে কমিশনের সৃষ্টি। জলের প্রধান ব্যবহার সেচের জন্য। নদীটিকে মোহানা হইতে এচুকা পর্য্যন্ত নাব্য রাখাও কমিশনের কর্ত্তব্য। যাহাতে ন্যূনতম জলের দ্বারা এই নাব্যতা সম্পাদনের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তজ্জন্য বাঁধ ও দরজা প্রভৃতি নির্মাণ করা হইয়াছে। নদী যেখানে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে সেখানে ভিক্টোরিয়া হ্রদ অবস্থিত। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার ব্যবহারের জন্য বৎসরে অন্ততঃ একবার এই হ্রদটিকে জলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া কমিশনের কর্ত্তব্য। ভিক্টোরিয়া রাষ্ট্রে অবস্থিত 'হিউম' বাঁধ মারে নদীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাঁধ। সেখানে সম্প্রতি জলশক্তিদ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা চলিতেছে। কমিশন নিজে কোন নির্মাণ-কার্য্যাদি করেন না। কমিশনের অনুমোদন লইয়া রাষ্ট্রগুলি স্ব-স্ব এলাকায় নির্মাণ-কার্য্য করিয়া থাকেন।

টেটাজ মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ শেষ করিয়া ১১টায় সেক্রেটারিয়েটে আসিয়া ট্রেজারী সেক্রেটারী ম্যাককার্লেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। ম্যাককার্লেন আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ঐদিন সমুদয় রাষ্ট্রের ট্রেজারী সেক্রেটারীগণ ক্যানবেরায় উপস্থিত ছিলেন। সাড়ে এগারটায় তাঁহাদের সম্মেলন হইবার কথা। ম্যাককার্লেন আমাকে ঐ সম্মেলনে লইয়া গিয়া সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। কুইন্সল্যাণ্ড, নিউ সাউথ ওয়েলস্, ভিক্টোরিয়া, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া ও টাসমানিয়ার ট্রেজারী সেক্রেটারীগণ প্রত্যেকেই আমার অভিজ্ঞতার কথা; বিশেষতঃ আমেরিকার কথা শুনিবার

জন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন এবং প্রত্যেকেই আমাকে স্ব-স্বরাষ্ট্রে নিমন্ত্রণ করিলেন। অতি সংক্ষেপে আমার মার্কিন মুলুকের অভিজ্ঞতার কথা ইঁহাদের নিকট বিবৃত করিলাম। আমি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান দেখিবার জন্ত এদেশে আসিয়াছি 'কমন্‌ওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশন' তাহাদের মধ্যে প্রধান। শুনিলাম 'কমন্‌ওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশন' আগামী সপ্তাহে টাসম্যানিয়ার রাজধানী হোবার্টে টাসম্যানিয়া সরকারের দরখাস্ত শুনিবেন। টাসম্যানিয়া সরকারের তিন জন প্রতিনিধি ক্যানবেরার এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ট্রেজারী সেক্রেটারী এইচ. ডি. রবিন্‌সন, ইকনমিষ্ট কে. জে. বিন্‌স্ এবং ব্যবহারজ্ঞ আর. জি. অস্‌বোর্ণ। কমন্‌ওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশনের কার্য্য দেখিবার আকর্ষণে ইঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

ঐ দিন সন্ধ্যার ডাম্‌লেদের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ হোটেল হইতে বাহির হইলাম। এখানে রাস্তায় বাহির হইলেই ট্যাক্সি মিলে না। এক জন ট্যাক্সিব্যবসায়ী আছে। তাহার দোকানে পূর্ব হইতে সংবাদ দিয়া রাখিলে সময়মত যথাস্থানে ট্যাক্সি পাওয়া যাইতে পারে। বাসের জন্ত অপেক্ষা করিতেছি। রাস্তা জনশূন্ত। বাস আসিতে দেরী হইতেছে। জনৈক ভদ্রলোক নিজের মোটরে যাইতেছিলেন। আমার পাশ দিয়া যাইবার সময় সহসা গাড়ী থামাইয়া আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনাকে কোথাও পৌঁছাইয়া দিতে পারি কি?" আমি গন্তব্যস্থানের ঠিকানা বলিলাম। তিনি আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন, "আমি আপনাকে দেখিয়াই বুঝিলাম যে, আপনি বাসের জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। সহর হইতে দশ মাইল দূরে আমার বাড়ী। সেখানে আমার চাষ-বাসের ব্যবস্থা আছে। আমি অনেক শূকর পুষি। একবার এক জন ভদ্রলোকের নিকট অনেক শূকরের মাংস বেচিয়াছিলাম। সে কারবারে আমার বেশ লাভ হইয়াছিল।" আমি ভাবিতেছিলাম ভদ্রলোকের ভদ্রতার কথা। ভদ্রলোক আমাদিগকে ডাম্‌লেদের গৃহের অদূরে নামাইয়া দিয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া চলিয়া গেলেন। জনশূন্ত রাস্তায় বাড়ীর নম্বর দেখিতে দেখিতে গৃহটি খুঁজিয়া বাহির করিলাম। বহুদিন পর লুচি-তরকারী ও ভাত খাইলাম। ডাম্‌লে-গৃহিণী এদেশে গৃহস্থালীর সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। এখানে ঝি-চাকর পাওয়া যায় না। তিনি ভারতবর্ষ হইতে একটি লোক সঙ্গে আনিয়াছেন। সে-ই রান্না করিয়াছে। খাদ্যদ্রব্য সব সামনে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। নিজেরাই বাঁটিয়া খাইলাম। রেডিওতে দিল্লী কেন্দ্রের হিন্দী গান শুনিলাম। ডাম্‌লে গৃহিণীর আতিথেয়তায় আপ্যায়িত হইয়া হোটেলে ফিরিলাম।

১৪ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার আপিসে বসিয়া ডাম্‌লের সাহায্যে আমার অষ্ট্রেলিয়ার প্রোগ্রাম স্থির করিলাম। এখানে দেখিতেছি হোটেলে স্থান পাওয়া কঠিন ব্যাপার। সোমবার হোবার্টে যাইতে হইবে। সেখানকার হোম-সেক্রেটারী আমার জন্ত হোটেলে স্থান সংগ্রহ করিতে না পারিয়া দুঃখ করিয়া তার করিয়াছেন। শেষে কি হোটেলের অভাবে আমার প্রোগ্রাম ব্যাহত হইবে? পরাঞ্জপে মহাশয়ের মাদ্রাজী সেক্রেটারী আয়েঙ্গারের এক বন্ধুর বাড়ী হোবার্টে। তাঁহার পরিবার হোবার্টে থাকে। সেই ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ীতে তার করিয়া আমার জন্ত হোটেল খুঁজিতে অনুরোধ জানাইলেন। স্থির হইল আমি হোবার্টে স্থান না পাইলে এডিলেড যাইব। এডিলেডে স্থানপ্রাপ্তির আশা পাওয়া গেল। সেখান হইতে মেলবোর্ণ হইয়া পুনরায় ক্যানবেরায় আসিব। তারপর সিডনি হইয়া কলিকাতা ফিরিব। ডাম্‌লে মহাশয় সাত দিনের ছুটি লইয়া সমুদ্র-তীরে বেড়াইতে যাইতেছেন। সিডনির হোটেলে ঐ দিনই সিট ঠিক করিয়া রাখা হইল। মেলবোর্ণে হোটেল মিলিল না। সেখানে হোটেলের জন্ত ক্যানবেরা ট্রেজারী সেক্রেটারীকে অনুরোধ করিতে হইল। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করিতে গিয়া টাকা বা অসুবিধার কথা তিনি যেন না ভাবেন। আমাকে কাজ করিতেই হইবে। দামী হোটেলে কিংবা অসুবিধাজনক হোটেলে আমার আপত্তি নাই। যাহা পান তাহাই যেন বিনা দ্বিধায় তিনি আমার জন্ত স্থির করেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার মদের দোকান বন্ধের সময় সম্বন্ধে সিডনিতে গণভোট গৃহীত হইবে। বর্ত্তমানে সন্ধ্যা ছ টায় দোকান বন্ধ হয়। এক দল রাত্রি পর্য্যন্ত দোকান খোলা রাখিতে চান। কাগজে ইহা লইয়া খুব বাদবিতণ্ডা ও প্রচার চলিতেছে। যাঁহারা রাত্রি পর্য্যন্ত দোকান খোলা রাখিতে চান তাঁহারা বলিতেছেন যে এখন ছ টায় দোকানে অসম্ভব ভিড় হয়। পরে আর মদ পাওয়া যাইবে না বলিয়া ঐ সময় লোকে মাত্রাতিরিক্ত রূপে মদ পান করে। কাগজ পড়িয়া মনে হইতেছিল যেন প্রায় সকলের মতেই রাত্রি পর্য্যন্ত দোকান খোলা রাখা উচিত। কিন্তু গণভোটের ফল যখন প্রকাশিত হইল তখন দেখা গেল ছ টায় দোকান বন্ধ করার দল বহু ভোটে জিতিয়াছে। এদেশে মদ্যপানের বহর যেন একটু বেশী দেখিতেছি।

শনিবার হোটেলের লাউঞ্জে বসিয়া পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার ট্রেজারী সেক্রেটারীর সহিত নানা বিষয়ে আলাপ হইল। পার্থে যাইবার জন্ত ইনি বার বার আমাকে অনুরোধ করিলেন। দুঃখের সহিত আমাকে এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে হইল। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার বহু বিষয়ে ইঁহার সহিত আলোচনা হইল। ইনি বলিলেন, "সিডনির চেয়ে ভারতবর্ষ আমাদের বেশী কাছে। যুদ্ধের সময় পার্থ হইতে কলম্বো পর্য্যন্ত একটি

বিমান চলিত। সিডনি পৌঁছিতে যত সময় লাগে তার চেয়ে কম সময়ে তখন কলম্বো যাওয়া যাইত।" ভদ্রলোক আরও বলিলেন, "এদেশে অল্প লোকের বাস। বহু দূরে দূরে ছড়ান। সিডনি বা মেলবোর্ণের স্বার্থ পার্থের স্বার্থ হইতে ভিন্ন। সেই জন্য ইঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীও বিভিন্ন। ফেডারেশন হইতে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়াকে পৃথক করিয়া দিবার জন্য সেখানকার বহু লোক যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতের হাউস অব লর্ডসের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন। হাউস অব লর্ডস্ এ বিষয়ে কিছু করিতে পারেন কিনা তাহা অবশ্য তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই।" কেসি সাহেবের কথা উঠিল। এক জন অষ্ট্রেলিয়ান ভারতবর্ষে কিরূপ লাটগিরি করিয়াছেন সেকথা এদেশে আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাঁহার শাসনকালে বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের কিরূপ তীব্রতা ছিল এবং সেজন্য তিনি কতদূর দায়ী, অনেকেই আমাকে এ প্রশ্ন করিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে 'কেসি' মহাশয়ের বিরোধী দলের লোকের সংখ্যাও কম নয়।

শনিবার আয়েঙ্গারের বন্ধুর বাড়ী হইতে তার আসিল যে, হোবার্টে কোন হোটেলেই স্থান নাই। তবে আমার আপত্তি না থাকিলে 'হলিডিন' নামক 'গেষ্ট-হাউসে' তিনি আমার জন্য স্থান সংগ্রহ করিতে পারেন। আমার অবশ্য আপত্তির কারণ ছিল না। গেষ্ট-হাউস শুনিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে, কাহারও বাড়ীতে গেষ্ট হিসাবে থাকিতে হইবে। পরে দেখিয়াছিলাম 'হলিডিন' হোটেলই। তবে এখানে মদ পরিবেশন করা হয় না। মদ বিক্রয়ের লাইসেন্স বিহীন হোটেল এখানে 'গেষ্ট-হাউস'রূপে পরিচিত।

১৭ই ফেব্রুয়ারী সোমবার সকালে ট্রেজারীতে ম্যাককার্লেন ও তদীয় ডেপুটি 'ওয়াটের' সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিলাম। বেলা ২টা ১৫ মিনিটে হোটেল ত্যাগ করিলাম। আমার বড় থলিটি হোটেলের দারোয়ানের হেফাজতে রাখিয়া গেলাম। ওভার-কোটটিও রাখিয়া যাইব স্থির করিয়াছিলাম। দারোয়ান বলিল, "টাসম্যানিয়া পাহাড়ে দেশ। সেখানে এ সময়েও বেশ ঠাণ্ডা পড়িতে পারে। ওভার-কোটটি সঙ্গে রাখাই ভাল।" তাহার উপদেশমত ওভার-কোটটি সঙ্গে লইয়া যে ভালই করিয়াছিলাম তাহা পরে বুঝিয়াছিলাম।

বেলা ৩টা ১০ মিনিটে বিমান উড়িল। বনাবৃত পর্বতশ্রেণীর উপর দিয়া উড়িতেছি। বন্ধুরগাত্র ভূমির রূপ কমনীয়, যেন সুকোমল ভেলভেটে মোড়া। ৫টা ২০ মিনিটে মেলবোর্ণ বিমানঘাঁটিতে বিমান নামিল। এখান হইতে দ্বিতীয় বিমানে হোবার্টে যাইতে হইবে। টাসম্যানিয়া অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত একটি দ্বীপ। দ্বীপের অভ্যন্তরভাগ পর্ব্বতসঙ্কুল। সেখানে জন-বসতি নাই বলিলেই হয়। উত্তর ও দক্ষিণ উপকূলে কিছু জন-বসতি আছে। হোবার্ট শহর দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে।

ওয়াডামানা বৈদ্যুতিক শক্তিগৃহের একটি দৃশ্য। খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়া বড় বড় জলের নল নামিয়া আসিয়াছে

মেলবোর্ণের বিমানঘাঁটিটি বেশ বড়। প্রায়ই বিমান নামিতেছে ও উড়িতেছে। হোবার্ট-গামী বিমানে ৭টায় বিমানঘাঁটি ত্যাগ করিলাম। সুসজ্জিত শহরের উপর দিয়া উড়িয়া ৭টা ২৫ মিনিটে অন্তরীপ ছাড়িয়া সমুদ্রে পড়িলাম। প্রথমে দু-একটা ছোট ছোট বালির চর। তারপর দিগন্তব্যাপী নীল জল। সন্ধ্যার পূর্বে দেখা গেল আকাশে অপরূপ মেঘের সজ্জা। আকাশের রূপ কোথাও মেদিনীপুরের পাহাড়-প্রস্তরসঙ্কুল প্রান্তরের মত, কোথাও যেন অযুত হস্তীর শোভাযাত্রা। দূরে ভারত মহাসাগরে সূর্য্যদেব অস্তগমন করিতেছেন। ভারতমাতা তখনও জ্যোতির্ম্ময়ী। তাঁহার শিরোভূষণের জ্যোতি যেন তখনও পশ্চিম-দিগন্ত ভেদ করিয়া ঈষৎ দেখা যাইতেছে। ভাবিতেছি কলিকাতায় এখন বেলা প্রায় ৩টা। গৃহিণীগণ নিজ নিজ গৃহে বিশ্রাম করিতেছেন। পুরুষেরা কর্ম্মস্থলে। এখানে কিন্তু ক্রমশ: "অন্ধকার নেমে আসে চোখে, চোখের পাতার মত।" অন্ধকারে সব একাকার হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইয়া পড়িয়াছে। চারদিক নিস্তব্ধ। কেবল বিমানের একটানা গর্জ্জন শুনা যাইতেছে। সহসা অনন্ত-অন্ধকার মহাসাগরে জ্যোতিষ্ক সমবায়ের মত হোবার্টের আলোকমালা নয়নপথে পতিত হইল। রাত্রি ৯টা ২৫ মিনিটে এরোড্রোমে নামিয়া ১০টায় হোটেলে পৌঁছিলাম। ডারওয়েণ্ট নদীর সেতুর উপর দিয়া নগরে প্রবেশকালে পর্ব্বত-বন্ধুর শহরের আলোকসজ্জা পরম রমণীয় দেখাইতেছিল।

১৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রবিন্‌সন, অসবোর্ণ ও বিন্‌সের সহিত ট্রেজারীতে মিলিত হইলাম। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে 'হোটেলে জায়গা পাওয়া যাইবে না' বলিয়া যে তার গিয়াছে তাহা পাইয়া আমি আর আসিব না। আমার জন্য হোটেলে স্থান সংগ্রহ করিতে না পারায় তাঁহারা লজ্জিত ছিলেন। আমি আসিব না ভাবিয়া দুঃখিতও হইয়াছিলেন।

সহসা আমাকে দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। আমি 'হলিডিনে' আছি শুনিয়া বিনুস বলিলেন, "হলিডিন মন্দ জায়গা নয়। তবে আমাদের আপিস হইতে আপনার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট হোটেলেই স্থান খোঁজা হইয়াছিল, এখন এখানে ভ্রমণকারীদের বড় ভিড়। সে হোটেলে স্থান পাওয়া অসম্ভব।" ঐ দিনই কমনওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশনের শুনানী আরম্ভ হইবে। প্রধান মন্ত্রী কমিশনের সভ্যগণকে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করিবেন। সেই ভোজে আমারও নিমন্ত্রণ হইল। পার্লামেণ্ট ভবনের হল ঘরে এই ভোজের ব্যবস্থা। সেখানে প্রধান মন্ত্রী রবার্ট কস্‌গ্রোভের সহিত আমার আলাপ হইল। তিনি যথারীতি কমিশনের সভ্যবৃন্দ ও উপস্থিত মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারিগণের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ভোজসভায় জন পনর ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী আমাকে বলিলেন, "শুনানী শেষ করিয়া কমিশন আমাদের হাইড্রো-ইলেকট্রিক সংক্রান্ত কাজগুলি দেখিবার জন্য টাসম্যানিয়ার অভ্যন্তরে সফর করিবেন। আমরা তাঁহাদের সফরের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনি যদি তাঁহাদের সহিত যোগ দেন তবে বিশেষ আনন্দিত হইব।" কমিশনের সহিত ভ্রমণের প্রস্তাবে আমি সানন্দে সম্মত হইলাম। ভোজসভায় শিক্ষামন্ত্রী আমার পাশে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে টাসম্যানিয়া সর্বাপেক্ষা অগ্রণী। 'এরিয়া স্কুল'গুলি আমাদের বিশেষত্বপূর্ণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এই স্কুলগুলির শিক্ষাপদ্ধতির বিশিষ্টতা সুধীগণের প্রশংসা পাইয়াছে। আপনার একটি এরিয়া স্কুল দেখিবার সময় হইবে কি?"

আমি বলিলাম, আগামী কাল ও পরশু (বুধ ও বৃহস্পতিবার) কমিশনের শুনানী চলিবে। শনিবার কমিশনের সহিত সফরে বাহির হইতে হইবে। শুক্রবারে আমি মুক্ত। যদি ঐ দিনে দেখা সম্ভব হয় তবে অবশ্যই আমি সাগ্রহে আপনাদের এরিয়া স্কুল দেখিতে যাইব।

ভোজনান্তে কমিশনের শুনানী আরম্ভ হইল। সর্বপ্রথম প্রধান মন্ত্রী কমিশনের নিকট তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিলেন। তার পর বিভাগীয় অধিকর্তাগণ স্ব স্ব বিভাগ সম্বন্ধে বলিলেন। কমিশনারগণ তাঁহাদিগকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী বুধবার স্থানীয় সংবাদপত্র 'মারকারী'তে এই শুনানীর বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইল। খুব বড় অক্ষরে এই বিবরণীর এইরূপ শিরোনামা ছাপা হইয়াছিল: "অষ্ট্রেলিয়ান অর্থ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের ঔৎসুক্য"। বিবরণীর প্রথমেই বড় হরফে এই শুনানীতে বর্তমান লেখকের উপস্থিতির কথা বলা হইয়াছিল। শুনানীর শেষ দিনে কস্‌গ্রোভ মহাশয় টাসম্যানিয়ার একখানি ভূচিত্রাবলী কমিশনের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন। এক একটি মানচিত্রে দেশের এক একটি সম্পদ বা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মানচিত্রসমূহ রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশেষ সহায়ক। কমিশন এগুলির খুব তারিফ করিলেন, বলিলেন, "অষ্ট্রেলিয়ার কোন রাষ্ট্রে তাঁহারা এইরূপ মানচিত্র দেখেন নাই।" কস্‌গ্রোভ মহাশয় আমাকে কয়েকখানি মানচিত্র উপহার দিলেন। আমি একখানি গ্রহণ করিয়া বলিলাম, "বেশী দিতে হইলে কলিকাতা পাঠাইবার ভার আপনাকেই লইতে হইবে।"

অষ্ট্রেলিয়ায় ছয়টি রাষ্ট্র। তন্মধ্যে কুইনস্‌ল্যাণ্ড, নিউ সাউথ ওয়েলস্ এবং ভিক্টোরিয়া সমৃদ্ধিশালী। টাসম্যানিয়া, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া জনবিরল এবং শিল্পসম্পদে পশ্চাৎপদ। শেষোক্ত রাষ্ট্রত্রয় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্য ব্যতীত অচল। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য-বিতরণ ব্যবস্থা ন্যায়-প্রতিষ্ঠ করিবার জন্যই কমনওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশনের সৃষ্টি।

কোন রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলে কেন্দ্রীয় সরকার দরখাস্তটি কমিশনের নিকট প্রেরণ করেন। কমিশন যথোচিত অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইয়া দেন। কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে প্রার্থী রাষ্ট্রকে সাহায্য প্রদান করেন। এ বিষয়ে কমিশন কতিপয় সুনির্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কমিশনের মতে যদি কোন রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের তুল্য করভার বহন করিবার দায়িত্ব লয় তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যেও অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায়ই তাহার সমানাধিকার। রাষ্ট্র কিরূপ করভার বহন করিবে বা কিরূপ জনহিতকর কার্য্য করিবে সে বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। সাহায্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণেই শুধু কমিশনের সূত্র প্রয়োগ করা হয়। প্রার্থী রাষ্ট্রের করভার কম থাকিলে সাহায্য কম হয় এবং করভার বেশী থাকিলে সাহায্য বেশী হয়। সেইরূপ জনহিতকর কার্য্যের ব্যয় অন্যান্য রাষ্ট্র অপেক্ষা বেশী থাকিলে সাহায্য তদনুপাতে কম হয় এবং কম থাকিলে সাহায্য তদনুপাতে বেশী হয়। রাষ্ট্রের কর্মকুশলতা অনুসারেও সাহায্য কম-বেশী করা হয়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই কমিশন এদেশে কাজ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ইঁহাদের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রার্থী রাষ্ট্র নির্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছে।

মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার কমিশনের শুনানী চলিল। দুই বেলা শুনানীতে উপস্থিত রহিতেছি আর বৈকালে শহরে বেড়াইতেছি।

হোবার্ট শহর ডারওয়েণ্ট নদীর তীরে; সমুদ্র হইতে ১৪ মাইল দূরে। অদূরে ৪১৬৬ ফুট উচ্চ ওয়েলিংটন পর্ব্বত।

পাহাড়ের গায়ে ও উপত্যকার সমভূমিতে শহরটি অবস্থিত। নদীর উত্তর পার্শ্বে এবং সমভূমিটুকুর তিন দিকেই পাহাড়। শহরটি নদীর পশ্চিম পারে। নদী বাঁকিয়া মাঝে মাঝে শহরের ভিতরে চলিয়া আসিয়াছে—স্থলভাগ যেন দুই বাহু বাড়াইয়া নদীর মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। উপকূলভাগ কয়েক স্থলেই এইরূপ ভগ্ন দ্বিতীয়ার চাঁদের মত বক্র। হোবার্ট বন্দর একটি শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়। পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ অনায়াসে এখানে আসিতে পারে। প্রকৃতির রমণীয় নিকেতনে এই শহরটি অবস্থিত। গাছপালা ঘনসবুজ। রকমারি ফুল। গ্লাডিয়োলা ফুল বড় সুন্দর। পাইন জাতীয় ছোট ছোট গাছ নানা রূপে ছাঁটিয়া কেহ বাড়ীর প্রাচীর তৈরি করিয়াছেন। কেহ নানারূপ তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আকাশ পরিষ্কার, বাতাস বিশুদ্ধ। আবহাওয়া সুখকর। পর্ব্বত-ক্রোড়ে প্রশস্ত নদীতীরে প্রকৃতির লীলা-কুঞ্জে ছবির মত সুন্দর শহর হোবার্ট, শহরের জনসংখ্যা ৭২০০০। বিকালে বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর উপরকার পুলে যাইতাম। ইহা একটি 'পণ্টুন' সেতু। সেতুটি বেশ সুন্দর। ইহার উপর হইতে শহরের দৃশ্য পরম রমণীয়। শহরের অনেকে আমাকে বলিত, "এত বড় 'পণ্টুন' সেতু পৃথিবীতে আর নাই। আমি কলিকাতার পুরাতন হাওড়ার পুলের কথা বলিয়া সবিনয়ে প্রতিবাদ জানাইয়াছি।

এখানে বড় রাস্তার উপর সরকারের টুরিষ্ট ডিপার্টমেণ্টের আপিস। ভ্রমণকারীদের সর্ব্বপ্রকার সংবাদ সরবরাহ করা এবং তাহাদের জন্য নানা দিকে যাতায়াতের বন্দোবস্ত করা এই আপিসের কার্য্য। গ্রীষ্মকালে মনোরম টাসম্যানিয়ার ভ্রমণকারীদের বড় ভিড়।

বুধবার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট হইতে চিঠি পাইয়া তাঁহার আপিসে গেলাম। তাঁহার সহকারী হিউসের সঙ্গে আলাপ হইল। ঠিক হইল হিউস শুক্রবার সকালে আমাকে একটি এরিয়া স্কুলে লইয়া যাইবেন। সকাল ৮টায় রওনা হইয়া সন্ধ্যায় ফিরিব। পরদিন গ্রাণ্টস্ কমিশনের সহকারী সেক্রেটারী করেষ্টার আমার সহযাত্রী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। করেষ্টার পককেশ হইলেও যৌবনোচিত সজীবতায় সর্ব্বদা প্রফুল্ল এবং সদালাপী।

২০শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অসবোর্ণ আমাকে নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। অসবোর্ণ-গৃহিণী সাদরে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহার রন্ধন তখনও শেষ হয় নাই। মাঝে মাঝে রান্নাঘরে যাইতেছিলেন। সস্ত্রীক এটর্ণী জেনারেল বা আইন মন্ত্রী এবং গ্রাণ্টস্ কমিশনের সভ্যদ্বয়ও এই ভোজে নিমন্ত্রিত ছিলেন। তাঁহারা আমার পরেই আসিলেন। অসবোর্ণের দশ-এগার বৎসরের এক পুত্র বাহিরে খেলিতেছিল। ছেলেটির ম্যাজিকে বড় ঝোঁক। আমি ভারতবর্ষের লোক শুনিয়াই সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "আপনি দড়ির খেলা জানেন?" তাহার মাতা হাসিলেন। বুঝাইয়া দিলেন যে, দড়ির খেলাটি গল্প-মাত্র। ছেলেটির কল্পনায় ভারতবর্ষ ম্যাজিকের দেশ। তাহার জানা দুই-একটি ম্যাজিক আমাকে দেখাইবার জন্য সে খুব ব্যস্ত হইল। একটি ম্যাজিক বেশ ভালই দেখাইল। একটি রবারের নলের মধ্য দিয়া একটি সূতা চালাইয়া দিল। সূতার দুই প্রান্ত নলের দুই দিক দিয়া ঝুলিতে লাগিল। ছেলেটি তখন কাঁচি দিয়া নলটি কাটিয়া দুই টুকরা করিয়া ফেলিল। কিন্তু সূতাটি অখণ্ডই রহিয়াছে। আমরা সকলেই তাহার প্রশংসা করিলাম। ছেলেটি উৎসাহী ও বুদ্ধিমান্। যথাসময় ভোজন সুরু হইল। অসবোর্ণ-গৃহিণী পরিবেশনও করিতেছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে আহার করিতেও বসিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মপটুতা ও রন্ধন-কুশলতার প্রশংসা করিলাম।

রাত্রি প্রায় ১১টায় অসবোর্ণদের নিকট বিদায় লইয়া আমরা সকলে একত্রে বাসে ফিরিলাম। এটর্ণী জেনারেল ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে হোটেলে পৌঁছাইয়া দিবার ভার লইলেন। এটর্ণী জেনারেল যুবক। গ্রাণ্টস্ কমিশনের সভ্য অধ্যাপক উড্ তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত। তিনি অধ্যাপকের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আইন ব্যবসা ছাড়িয়া নূতন রাজনীতিতে আসিয়াছি। আইন ব্যবসা ভালই চলিতেছিল। কিন্তু রাজনীতির বিচিত্র গতি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।" বাস হইতে নামিয়া ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী আমার সঙ্গে হোটেলের দরজা পর্য্যন্ত আসিলেন। দেখিলাম দরজা বন্ধ। ভদ্রমহিলা হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই। যেরূপেই হোক আপনাকে ঘরে ঢুকাইয়া যাইব। না হয় জানালা বাহিয়াই উঠিব।" অনুসন্ধানে দেখা গেল একটা দরজা খোলা আছে। আমাকে 'ভিতরে ঢুকাইয়া' তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার এরিয়া স্কুল দেখিতে যাইব। প্রাতরাশের পর পূর্ব্বনির্দিষ্ট স্থানে হিউস্ ও করেষ্টারের সঙ্গে মিলিত হইলাম। হিউস্-পত্নী আমাদের সঙ্গে যাইবেন। তাঁহাকে তাঁহার গৃহ হইতে গাড়ীতে তুলিয়া লওয়া হইল। হিউস্-পত্নী ভারতবর্ষের কথা তুলিলেন। সোৎসাহে বলিলেন, "আমার ঠাকুর্দা ভারতবর্ষে রেল-কর্ম্মচারী ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক শহরে তাহার কর্ম্মস্থল ছিল। আমার এক ভাই (সহোদর নহে) এখনও ভারতবর্ষে রেলের কাজে নিযুক্ত আছেন। (স্বামীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এই ব্যক্তিটির জন্যই আমার ভারতবর্ষে যাওয়া হয় নাই। পিতার সঙ্গে ভারতবর্ষে যাইবার জন্য আমি প্রস্তুত এমন সময়ে ইনি আমাকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন।"

করেষ্টার বলিলেন, "আমার এক ভগিনী গারো পাহাড়ে মিশনরী জীবন যাপন করিতেছেন।"

হিউস্‌-পত্নী আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্তার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তাহাদের ফটো দেখিতে চাহিয়া আমার নিকট তাহাদের ফটো নাই শুনিয়া নিরাশ হইলেন।

আমরা এরিয়া স্কুল দেখিতে জীবস্টোন গ্রামে যাইতেছি। জীবস্টোন হোবার্ট হইতে ৩৪ মাইল। ওয়েলিংটন পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠিতেছি। আঁকা-বাঁকা রাস্তা। দূরে ডারওয়েন্ট নদী দেখা যাইতেছে। আরও উপরে উঠিবার পর বহু দূরে সমুদ্র দেখা গেল। সমুদ্র পুনঃ পুনঃ চোখে পড়িতেছে ও আড়ালে যাইতেছে। চারদিকে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে অফুরন্ত ইউক্যালিপ্‌টাস বা গাম গাছের জঙ্গল। পাইন, ফার এবং ওক গাছও যথেষ্ট। মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ ঝোপ। তাহাতে ছোট ছোট লাল ফল পাকিয়া আছে। কোথাও মেয়েরা সেই ফল পাড়িয়া লইতেছে। সেগুলি দ্বারা নাকি জেলি প্রস্তুত করিবে। হুয়নভিল নামক একটি গ্রাম পথে পড়িল। এই গ্রামে একটি স্কুল আছে, স্কুলের বাড়ীটি সুন্দর তখনও স্কুল বসে নাই। হিউস্‌ সেখানে গাড়ী থামাইয়া চারিদিক ঘুরাইয়া দেখাইলেন। দূরে চারদিকেই পাহাড়। অদূরে হুয়ন নদী—বচ্ছতোয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী। নদীর উপরকার সুন্দর একটি সেতু অতিক্রম করিয়া ওপারে গেলাম। অনেক দূর পর্য্যন্ত নদীর ধারে ধারে চলিলাম। পথের পাশে মাঝে মাঝে আপেলের বাগান। বড় বড় আপেলের বাগিচাগুলি দেখিতে বড় মনোরম। আপেল পাকিবার সময় হইয়া আসিয়াছে। এক একটা গাছ যেন আপেলের ভারে ভাঙিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে লাল টুকটুকে ফলগুলি দেখিতে বড়ই লোভনীয়। বেলা সাড়ে বারটায় জীবস্টোনে পৌঁছিলাম।

প্রধান শিক্ষক স্কুলের পাশেই সপরিবারে বাস করেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন হইয়াছে। ভোজনে বসিলাম। স্কুলের মেয়েরা রান্না করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে দুই জন পরিবেশন করিল। সস্ত্রীক প্রধান শিক্ষক এবং কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী আমাদের সঙ্গে আহার করিলেন। ভোজনান্তে প্রধান শিক্ষক আমাদিগকে ক্লাসে লইয়া গেলেন। পর পর তিনটি ক্লাস দেখিলাম। চৌদ্দ-পনের বছরের ছেলে-মেয়েরা পড়া দিতেছিল। ছয়-সাত বছরের ছেলেমেয়েরা কাগজ কাটিয়া বাড়ী বানাইতেছিল। বাড়ীগুলি আমাদিগকে দেখাইবার জন্ত তাদের বিশেষ উৎসাহ। আট-নয় বছরের ছেলেমেয়েরা ভূমণ্ডলের ম্যাপ আঁকিতেছিল। প্রধান শিক্ষক আমাকে প্রত্যেক বেঞ্চের কাছে লইয়া গেলেন। আমি নিকটে যাইতেই শিশুগণ "এই ভারতবর্ষ" বা "এই কলিকাতা" বলিয়া নিজেদের অঙ্কিত মানচিত্রে সোৎসাহে আমাকে ভারতবর্ষ বা কলিকাতার অবস্থান দেখাইতেছিল। এতটুকু ছেলেমেয়েরা ভূমণ্ডলের মানচিত্র আঁকিয়াছে দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। অঙ্কন মোটামুটি ভালই হইয়াছে। আমার প্রশ্নের জবাবে তাহারা মানচিত্রের উপর অন্যান্য জায়গাও দেখাইল। প্রধান শিক্ষক বলিলেন, "আমি কাল ইহাদের বলিয়াছিলাম যে কলিকাতা হইতে এক জন ভদ্রলোক তোমাদের দেখিতে আসিতেছেন। তোমরা যদি তাঁহাকে তাঁহার দেশের কথা বলিতে না পার তবে তিনি তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন। বাইরে কয়েকটি ছেলে কোদাল দিয়া খেলার মাঠ পরিষ্কার করিতেছিল। কোথাও ছেলেরা ছুতার মিস্ত্রীর কাজ করিতেছে, কোথাও লোহারের কাজ চলিতেছে কোথাও বা চামড়ার কাজ চলিতেছে। মেয়েরা সেলাই শিখিতেছে। তাহাদের রান্না ও পরিবেশন তো পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কাঠের কাজের শিক্ষক সগর্ব্বে বলিলেন তাঁহার একটি ছাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বেই হোবার্টে একটি বড় দোকানে বেশ ভাল মাহিনায় কাঠের কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিলাম। ভদ্রলোকের নানা বিষয় বেশ জানাশুনা আছে। বলিলেন,"আমরা দেখিয়াছি যে অধিকাংশ ছেলেই স্কুল ছাড়িয়া চাষবাস বা অন্ত ব্যবসায়ে চলিয়া যায়। কলেজে খুব কম ছেলেই যায়। কাজেই স্থানীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়াই এই এরিয়া স্কুলের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। শহরের এরিয়া স্কুলে অন্যান্য বিষয় শেখান হয়। এখানে আমরা গৃহনির্ম্মাণ শিখাই, কংক্রিটের কাজ শিখাই, কাঠের কাজ শিখাই। মেয়েরা রান্না শেখে, সেলাই শেখে। ইহারা পরিণত বয়সে যেরূপ জীবন যাপন করিবে তাহার জন্ত সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত করিয়া তোলাই এরিয়া স্কুলের আদর্শ। স্থানীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়াই ইহাদিগকে আমরা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করি।"

হিউস্‌ প্রধান শিক্ষককে বলিলেন, "আপনাদের দেশে আসিয়া ইনি স্বহস্তে একটি পাকা আপেল তুলিতে পারিলেন না—ইহাই আমার আপশোষ।"

প্রধান শিক্ষক—"এবার দুর্বৎসর, ফসল দেরীতে হইয়াছে। অন্যান্য বার এতদিনে আপেল পাকিয়া যায়। কিন্তু এবার একটিও পাকে নাই।"

স্কুল-প্রাঙ্গণে অনেকটা সমতল ভূমি। দূরে চারদিকে পাহাড়, বড় বড় ইউক্যালিপটাস গাছ। নানারূপ ফুল গাছ। কতকগুলি বাবলা গাছের মত গাছ দেখিলাম। নাম ওয়াটাল। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যখন ভারতবর্ষের 'বাণিজ্য-যুদ্ধ' সুরু হইয়াছিল তখন শুনিয়াছিলাম যে চামড়া ট্যান করিতে ওয়াটাল গাছের ফলের প্রয়োজন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাই ভারতবর্ষকে এই ফল সরবরাহ করিত। এদেশের খেলা-ধূলা সম্বন্ধে আলোচনা হইল। এখানে নাকি এক পক্ষে ১৮ জন লইয়া ফুটবল খেলা হয়।

বৈকালে সকলে মিলিয়া চা-পান করিয়া ৩টার জীবস্টোন ত্যাগ করিয়া ৬টায় হোবার্টে পৌঁছিলাম।

পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারী শনিবার প্রাতরাশের পর হোটেলের পাওনা চুকাইয়া দিয়া বসিয়া আছি। সরকারী হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক কারখানাগুলি পরিদর্শনার্থ রওনা হইতে হইবে। রবিনসন গ্রাণ্টস্ কমিশনের সভ্যগণকে লইয়া আমাকে হোটেল হইতে তুলিয়া লইবেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। আমি গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। দুইটি মোটর গাড়ীতে আমরা আট জন। কমিশনের তিন জন সভ্য, সেক্রেটারী, সহকারী সেক্রেটারী, রবিনসন, হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক কমিশনের চেয়ারম্যান এবং আমি। এ. ডব্লু. নাইট হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিকের সভাপতি। ইনি আমাদের অভিযানের নেতা ও পথপ্রদর্শক। ট্রেজারী সেক্রেটারী রবিনসন সরকারের পক্ষে দলের তত্ত্বাবধায়ক। এ. এ. ফিট্‌জিরাল্ড্ গ্রাণ্টস্ কমিশনের সভাপতি। ইনি এদেশের একাউণ্ট্যাণ্ট সভারও সভাপতি। অধ্যাপক জি. এল. উড দ্বিতীয় সভ্য। ইনি মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। অপর সভ্যের নাম জে. জে. কেনেলি। ইনি পার্থের অধিবাসী। ইঁহারা সকলেই প্রৌঢ়-বয়স্ক। কমিশনের সেক্রেটারী এম্. রিচার্ডসন। ইনি পক্ক-কেশ বৃদ্ধ। সহকারী সেক্রেটারী কয়েকটার পূর্ব্বদিন আমার সঙ্গে জীবষ্টোন গিয়াছিলেন। এ দেশের অভ্যন্তর-ভাগ পার্ব্বত্য মালভূমি। ৩৩০ ফুট উচ্চে একটি বড় হ্রদ আছে। হ্রদটি ২০ মাইল লম্বা ও ১৪ মাইল চওড়া। ইহার নাম গ্রেট লেক। এত উচ্চে এত বড় হ্রদ বিদ্যুৎ-শক্তির একটি বিরাট্ আধার-বিশেষ। এখান হইতে জল নামাইয়া লইয়া পথে যেখানেই একটা খাড়া পাহাড় পাওয়া যায় সেখানেই পর্ব্বতশীর্ষ হইতে সবেগে নিপতিত জলস্রোতের সাহায্যে পর্ব্বতমূলে টারবাইন চালাইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হইয়া থাকে। টারবাইন ঘুরাইয়া দিয়া জলরাশিকে খাল দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়। পরে ঐ জলের অবতরণ-পথে আবার যখন একটি খাড়া পাহাড় পড়ে তখন সেখানে ঐ জলের দ্বারাই আবার একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র চালান হয়। এইরূপে এই হ্রদের জলের দ্বারা শানন্ ও ওয়াডামানা নামক দুইটি স্থানে দুইটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে।

গ্রেট লেক ভিন্ন লেক সেণ্ট ক্লেয়ার নামে আর একটি হ্রদও এই পাহাড়ের উপর অবস্থিত। তাহার জলের দ্বারা টেরেলিয়া কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। বাটলার্স গর্জ নামক স্থানে অপর একটি কারখানা স্থাপিত হইতেছে। এই কেন্দ্রটিও সেণ্ট ক্লেয়ারের জলে চলিবে।

এই সমস্ত জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ একটি কমিশনের হস্তে ন্যস্ত। নাইট এই কমিশনের সভাপতি। কমিশন প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতেছেন। ইঁহাদের বিদ্যুৎ-উৎপাদন-প্রচেষ্টা অফুরন্ত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। ভবিষ্যতে সমুদ্রের তলা দিয়া তার চালাইয়া এখান হইতে ভিক্টোরিয়া রাষ্ট্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার কথাও কেহ কেহ চিন্তা করিতেছেন। টাসম্যানিয়ায় উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি টাসম্যানিয়ার তথা অষ্ট্রেলিয়ার একটি বড় সম্পদ।

আমরা শনিবার সেণ্ট ক্লেয়ারের কেন্দ্রগুলি এবং রবিবার গ্রেট লেকের কেন্দ্রগুলি দেখিব। সোমবার হোবার্ট ফিরিব এবং ফিরিয়াই আমি মেলবোর্ণ অভিমুখে রওয়ানা হইব।

কামনা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এক সঙ্গে গিয়েছিনু দূর শৈলপুরী,
বন্যা যেথা বর্ণময় মেঘে কুয়াশায়,
দিনভোর রৌদ্র-ছায়া করে লুকোচুরি—
রাত্রির দীপালি যেথা নগরী সাজায়।
বর্ণে বর্ণে ছেয়ে গেছে নীরস পাষাণ,
ঢেকেছে রুক্ষতা তার শ্যাম আবরণে
শতেক নির্ঝর তারে করাইছে স্নান
মধু হাস্য জাগাইছে তাহার আননে।

নিশ্চল পাষাণ আজি এ বক্ষ পঞ্জর,
আসিবে না ছুটি' যেথা গিরিনির্ঝরিণী?
জাগাবে না শ্যাম শোভা আবরি' কঙ্কর,
বাজাবেনা মৌন ভাঙি শিঞ্জন-কিঙ্কিণী?
মৃত্যুর স্তব্ধতা ভাঙি জীবন উচ্ছ্বাস
উঠিবে না হর্ষ ভরে করি' অট্ট হাস?

খোং ফু জু ও চীনের প্রাক্-দার্শনিক যুগ

শ্রীঅজিতরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

চীন দেশের সভ্যতা অতিশয় প্রাচীন। তাহার দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের মধ্যে, প্রথমতঃ ভারতীয় ও শেষের দিকে খ্রীষ্টীয় ভাবধারার প্রভাব যদিও লক্ষিত হয়[১] তথাপি তাহার মধ্যে যে নিজস্ব মৌলিকতা নিহিত আছে সেকথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চীন দেশের প্রথম উল্লেখযোগ্য মনস্বী খোং ফু জু[২]। তাঁহার পূর্ব্বেও অনেক মনস্বী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন না থাকায় তাঁহারা বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। খোং ফু জুর মতবাদে কতটুকু মৌলিকতা আছে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান; এবং ইহা প্রায় নিশ্চিত যে তাঁহার সবটুকু একেবারে নিজস্ব নয়; তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনস্বিগণের নিকট অনেকাংশে ঋণী। খোং ফু জুর সমসাময়িক লাউজু[৩]। লাউজুর মতবাদও পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষিগণের ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে[৪]। অন্যতম দার্শনিক ম জু'র বেলায়ও এই কথাই প্রযোজ্য। অন্যান্য অপ্রধান দার্শনিকদের মতবাদ—যেমন কা ও মিং—ইঁহাদেরও সর্ব্বাংশে মৌলিকতা নাই বলিয়াই মনে হয়।

চীন দেশের দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হয় খোং ফু জুর সঙ্গে সঙ্গে। তাঁহার পূর্ব্বে কোন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের অথবা কোন সুবিন্যস্ত মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায় না; প্রকৃতপক্ষে সুবিন্যস্ত ভাবে কোন মতবাদ তখন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলও না। এই প্রাক্-দার্শনিক যুগ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্ধান পাইতে হইলে কতকগুলি ইতিহাস ও সাহিত্য-গ্রন্থের উপরই মুখ্যতঃ নির্ভর করিতে হয়। কারণ তদানীন্তন চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতে হইলে এই গ্রন্থসমূহই একমাত্র সহায়। তন্মধ্যে সি চিং নামক গ্রন্থখানিতে চাও বংশের রাজার রাজত্ব-কালের প্রথমাংশে কি কি ঘটিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ আছে। এই সি চিং গ্রন্থ ৩০৫ খানি গীতিকাব্যে পরিপূর্ণ। এই গীতিকাব্যগুলি পাঠ করিলে তৎকালীন চাও বংশের রাজত্বে প্রচলিত আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করা যায়। সু চিং আর একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ; ইহা ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা ও ভাবধারা অবলম্বনে লিখিত। সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত ধর্ম্মযাজকগণের প্রার্থনাসমূহ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চুন চি উ নামক আর একখানি গ্রন্থ আছে। তাহাও ঐতিহাসিক তথ্যবহুল। ইহাতে প্রতি বৎসরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী কালানুক্রমিকভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ছো চুয়ান নামক গ্রন্থখানি পূর্ব্বোক্ত চুন চি উ নামক গ্রন্থেরই টীকা-স্বরূপ। এই গ্রন্থখানিই চীন দেশের প্রামাণিক ও তথ্যপূর্ণ মূল্যবান্ গ্রন্থ। প্রাক্‌দার্শনিক যুগের সর্ব্বশেষ গ্রন্থ সম্ভবতঃ কো ইউ নামক গ্রন্থখানি। ইহাতে বিভিন্ন বিষয়ে কথোপকথনসমূহ সন্নিবেশিত আছে এবং ছো চুয়ানে যে যে বৎসরের ঘটনাসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সেই বৎসরের ঘটনাবলী সংক্রান্ত কথোপকথনই ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।[৫] আমাদের মনে হয় এই গ্রন্থ অথবা চুন চিউ নামক গ্রন্থখানি অনেকটা জৈন যুগপ্রধানাচার্য্য গুর্ব্বাবলী নামক গ্রন্থের মত। জৈন গুর্ব্বাবলীতেও এইরূপ কোন্ গুরু কোন্ বৎসরে কি করিলেন তাহা লিপিবদ্ধ আছে।[৬]

মনীষী খোং ফু জু কে এবং তিনি কি করিতেন সেই সম্বন্ধে চীন দেশের ঐতিহাসিক গ্রন্থ সি চিতে অল্পবিস্তর আলোচনা আছে।[৭] তিনি সাংটুং প্রদেশের চু ফু শহরের নিকট লু নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ তুং রাজার বংশধর। কিন্তু কালক্রমে তাঁহারা পিতৃভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং এই লু নামক স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। এই নূতন স্থানে আসিয়া পারিপার্শ্বিক কারণবশতঃ অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থায় তাঁহারা পতিত হন এবং খোং ফু জুকেও এই আর্থিক দুরবস্থার দরুন দুর্ভোগ ভুগিতে হয়; তিনি অবিচলিত ভাবে বহু ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া কোন প্রকারে রাজদরবারে প্রবেশ লাভ করেন। সেখানে স্বীয় অধ্যবসায় বলে রাজার প্রধান অমাত্যের পদ লাভ করেন ও অতিশয় দক্ষতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। কিন্তু রাজ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় তিনি সেই পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তখন তিনি কয়েকজন অনুচরসহ ত্রয়োদশ বৎসর কাল নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং বহু দুঃখ-দৈন্যের সম্মুখীন হন। পরিশেষে জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রাচীন মনীষিগণের গ্রন্থসমূহ অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে থাকেন[৮] ও সঙ্গে সঙ্গে অনুচরবর্গকে তদ্বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। এই অনুচরবর্গই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যের স্থান অধিকার করে; মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যসংখ্যা ছিল সহস্রাধিক। তিনি ৪৭৯ খ্রীঃ পূঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন। চু ফু নামক স্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়; এই স্থানে এখনও তাঁহার সমাধিমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

খোং ফু জু চাও বংশের রাজাদিগকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। কারণ এই চাও বংশের রাজত্বর্গের সময় হইতেই চীন দেশের

সভ্যতা একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। চাও বংশীয় রাজগণের পূর্ব্বে আরও দুই রাজবংশের পতন হয়। এই পতনের কারণ হইতে চাওবংশীয় রাজগণ অশেষ শিক্ষালাভ করেন৯ এবং পতনের কারণ সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হইয়া অতি সন্তর্পণে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। তজ্জন্য রাজ্য ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে ও শিক্ষা-দীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করে। খোং ফু জু-ও এই চাও বংশের রাজগণের গুণে মুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া বলিয়াছিলেন, "চাও বংশীয় রাজন্যবর্গের কি সাংস্কৃতিক গরিমা! এইজন্য আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা অনুকরণ করি।"১০ এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, খোং ফু জুই সর্ব্বপ্রথম সাধারণ ভাবে শিক্ষাদান-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর প্রাচীন গ্রন্থগুলি পাঠ করেন এবং তদ্বিষয়ে শিক্ষাদান করিবার জন্য একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন।১১ এইজন্য চীন দেশের দার্শনিকগণের নিকট তিনি নমস্য; কারণ খোং ফু জুই সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে দার্শনিক আলোচনার প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং তাঁহার সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত হয়।

খোং ফু জু নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। প্রাচীন ছয়খানি বিনয়গ্রন্থ (লিউ, ই—six disciplines) তিনি অতি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন এবং তাহা হইতে সার সঙ্কলন করিয়া বাণী প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার বাণীসমূহ সঙ্ঘের অনুচরবর্গ লিপিবদ্ধ করিতেন। এই লিপিবদ্ধ বাণীসমূহই পরবর্ত্তীকালে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়, এবং ইহা শেষ পর্য্যন্ত খোং ফু জুর দর্শনের মূল ও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হয়। চৈনিক বিনয় গ্রন্থসমূহের লেখক কাহারা সেই সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই। অবশ্য এই বিষয়ে মতভেদ আছে; নব্যসম্প্রদায় মনে করেন যে, এই ছয়টি বিনয়গ্রন্থ খোং ফু জু-র রচনা। কিন্তু ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা চিন্তা করিবার বিষয় বটে। পূর্ব্বোক্ত কো ইউ ও চু চোয়ান নামক গ্রন্থে কয়েকজন বিশিষ্ট ও খ্যাতিসম্পন্ন লোকের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাতে 'সি চিং', 'স্থ চিং', 'লি চি' ও 'ই চিং' শীর্ষক বিনয় গ্রন্থসমূহের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, খোং ফু জু এই বিনয় গ্রন্থসমূহের রচয়িতা নন।১২ অন্ততঃ যে আকারে এই গ্রন্থসমূহ আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাদের ত নহেনই।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বিনয়গ্রন্থসমূহের অধ্যয়নে জনসাধারণের অধিকার ছিল না। এই গ্রন্থসমূহ বিশেষ শ্রেণীরই অধিগম্য ছিল।১৩ জনসাধারণ তাহা অধ্যয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। খোং ফু জুও বিনয়গ্রন্থসমূহের দুরূহতার দরুন তাহা হইতে সার সঙ্কলন করিয়া সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করেন।১৪ পূর্ব্বে এই শিক্ষালাভ শ্রেণীবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল। খোং ফু জু সেই বাধা দূরীভূত করিয়া দেন এবং সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষাদান করিতে থাকেন।১৫ বিনয়গ্রন্থসমূহ প্রকৃতপক্ষে সহজবোধ্য ছিল না, এইজন্য সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণের পক্ষে সেগুলি অধিগত করা একেবারে অসম্ভব ছিল। জনসাধারণ যাহাতে এই গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ না থাকেন তাহার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। এইজন্য চীন দেশের জনসাধারণ আজ পর্য্যন্তও কৃতজ্ঞতাসহকারে "মহান্ শিক্ষাগুরু" বলিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকে। তিনি যে এই সম্মানলাভের যথার্থই যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

চীনবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে ভিন্নমুখী মতবাদের দরুন চীনদেশ ঘোরতর বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়, তখন 'লি সু'১৬ (খ্রীঃ পূঃ ২১৩ অব্দ) প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত। এইরূপ অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয়—তিনি ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি অতি কৌশল সহকারে এক বিচিত্র আদেশ প্রদান করেন—তাহাতে দার্শনিকবর্গের লিপিবদ্ধ মতবাদসহ মূল্যবান্ গ্রন্থাদি অগ্নিদগ্ধ করা হয়। এই আদেশের ফলে চীনদেশের সাংস্কৃতিক উন্নতির পথ বহুলাংশে ব্যাহত হয়। যদিও এই চীনবংশীয় রাজগণ খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মহান্ চীন ভূখণ্ডকে সঙ্ঘবদ্ধ ও একত্রিত করেন এবং চীনের অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্ত করেন তথাপি উক্ত প্রধান অমাত্যের ঘোরতর অনিষ্টকারী আদেশ প্রদানের পর হইতে সমগ্র চীনদেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রসারে বাধা উপস্থিত হয়। জনসাধারণের নিকট যে সমুদয় গ্রন্থ ছিল তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য চীন দেশে প্রাচীন শিক্ষাধারা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। রাজকীয় গ্রন্থাগারে যে কয়েকখানি পুস্তক রক্ষিত ছিল তাহাই কেবল আগুনের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং তাহা হইতেই চীনের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ধারার পুনরভ্যুত্থান সম্ভব হয়। ইহার পরই চীনবংশীয় রাজন্যবর্গের অবনতির সূত্রপাত হয় ও অতি অল্পকাল মধ্যেই এই বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে। ইহার পর হানবংশীয় রাজগণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহাদের উদার মতবাদের দরুন পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক মতবাদসমূহের চর্চ্চা পুনরায় আরম্ভ হইতে থাকে। হোইনান দেশের রাজকুমার বিশিষ্ট দার্শনিকগণকে আহ্বান করিয়া অর্থসাহায্য করিতে থাকেন।১৭ এই দার্শনিকগণ রাজকুমারের নামে বিভিন্ন মতসমূহ সঙ্কলিত করেন। এই রাজকুমার আমাদের দেশের ভোজরাজের মত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন; ভোজরাজ পণ্ডিতবর্গকে অর্থসাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।১৮ তাঁহারই অর্থানুকূল্যে যোগসূত্রের উপর

ভোজস্মৃতি নামক স্মৃতি রচিত হয়। এই স্মৃতির অপর নাম রাজ-মার্ত্তণ্ড।[১৯] হোইনাম দেশের রাজকুমারের অর্থসাহায্যেও তেমনি একখানি গ্রন্থ রচিত হয়; এই গ্রন্থখানি এখনও হোইনাম জু[২০] নামে পরিচিত।

এই হানবংশীয় রাজগণের সময় হইতেই খোং ফু জুর দার্শনিক মতবাদের অভ্যুত্থানের সূচনা হয়, এবং চাওবংশীয় রাজাদের সহায়তায় এই মতবাদ উৎকর্ষ লাভ করে। ইহার মূলে একটি কারণ ছিল। তৎকালীন দার্শনিক মতবাদ-সমূহের মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল না। এক দার্শনিক যাহা বলিতেন অন্য দার্শনিক তাহা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতেন। বহু দার্শনিক মতবাদ জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের পরিবর্দ্ধক ও পরিপোষক বটে, তবে তাহাদের মধ্যে যোগসূত্র থাকা আবশ্যক, নতুবা তাহা নিরর্থক বাগবিতণ্ডায়ই পর্য্যবসিত হয়। তাহাতে জ্ঞানের প্রসার ব্যাহত হইয়া থাকে। ভারতেও যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন এক যুগে অনুরূপ অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায় তাহা মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ আছে।[২১] চীনদেশে যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা তখন টুং চুং সু নামক জনৈক মহাপুরুষ এই অবাঞ্ছিত অবস্থার অবসান করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হন এবং যাহাতে মাত্র একটি মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাজার নিকট একখানি যুক্তিপূর্ণ লিপি প্রেরণ করেন। তখন হানবংশীয় রাজা উ টির রাজত্বকাল। তাঁহার ওয়ে হি ও উ আন নামে দুই জন বিচক্ষণ অমাত্য ছিলেন। তাঁহারা টুং চুং সুংর লিপির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া খোং ফু জুর দর্শন ব্যতীত অন্য সব দর্শনের পঠন-পাঠন একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। তাহাতে খোং ফু জুর দর্শনে পারদর্শী ও আস্থাবান জনগণই একমাত্র রাজপুরুষের পদলাভ করিবার অধিকারী হন। জনসাধারণও রাজসম্মান পাইবার আশায় অথবা অর্থাগমের লোভে "খোং ফু জুর" দার্শনিক মতবাদ আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। খোং ফু জুর দর্শনও এই রাজকীয় সাহায্যলাভ করিয়া বহুলভাবে প্রচারিত হইবার সুযোগ পায়।[২২]

খোং ফু জুর পূর্ব্বে চীনদেশের জনসাধারণ অলৌকিক ও যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন।[২৩] এই বিশ্বাসপ্রবণতা যে কেবল চীনদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে, পৃথিবীর বহু সভ্যজাতির পূর্ব্বাবস্থা অনুসন্ধান করিলে এইরূপ নিদর্শন অনেক পাওয়া যায়।[২৪] মনে হয়, ভারতবর্ষেও ইহার ব্যতি-ক্রম হয় নাই। বৈদিক গ্রন্থে তাহার অস্তিত্বের সন্ধান মিলে।[২৫] বৈদিক ঋষিদের ন্যায় চীনদেশের মহাপুরুষগণও বোধ হয় এক সময়ে প্রকৃতির পূজারী ছিলেন।[২৬]

বৈদিক দেবতাগণ যেমন মানুষের সুখদুঃখের নিয়ন্তা ছিলেন চীনদেশের দেবগণও অনেকাংশে সেইরূপই ছিলেন[২৭]। যাঁহারা সৎপথে চলিতেন তাঁহারা দেবতাদের কৃপালাভে সমর্থ হইতেন; যাঁহারা অসৎপথে চলিতেন বা দুষ্কর্ম করিতে চেষ্টা করিতেন তাঁহাদের উপর দুঃখ-দৈন্য ও বিপৎপাত হইত।[২৮] কিন্তু কালক্রমে এই মনুষ্যভাবসম্পন্ন দেবতাদের উপর মানুষের বিশ্বাস শিথিল হইতে থাকে; এবং তাহার স্থলে এক অলৌকিক দৈবশক্তির কল্পনার সূচনা হয়; তিনিই বিশ্ব-নিয়ন্তা, সুখ-দুঃখের বিধাতা—তিনিই ঈশ্বর (টি)। কিন্তু এই ঈশ্বর নিরালম্ব অবস্থায় কোথাও থাকিতে পারেন না; তাই তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থানেরও কল্পনা করা হইতে থাকে এবং এই কল্পনা হইতেই স্বর্গের (থিয়েন) রূপ প্রতিভাত হইয়া উঠে। ঈশ্বর যেমন অসীম শক্তিসম্পন্ন, স্বর্গও তদনুরূপ অসীম শক্তির ক্ষেত্র বলিয়া কল্পিত হইতে থাকে। ইহা অসম্ভব কিছু নয়। চীনদেশের জনসাধারণ থিয়েন এবং "টি" উভয়ের কাছেই কৃপাপ্রার্থী ছিলেন। এই উভয়কেই তাঁহারা সমভাবে শ্রদ্ধা ও ভয় করিতেন। কারণ এ দুইয়ের মধ্যে এক জনের কোপে নিপতিত হইলে, "এমন কি রাজ্যভ্রষ্ট হইবারও সমূহ সম্ভাবনা ছিল।. একবার এই ঈশ্বরের ভয়ে সিয়ারাজ্যের অধিপতিকে শাস্তি দিতে রাজপুরুষ টাংও সাহস করেন নাই। যদিও এই রাজা বহুবিধ অন্যায় আচরণে লিপ্ত ছিলেন… তথাপি ঈশ্বরের কোপবৃদ্ধি হইবার ভয়ে সেই রাজাকে শাস্তি দিতে পারা যায় নাই।"[২৯] মোট কথা, ঈশ্বরের কৃপাপ্রাপ্ত হইলেই মাত্র রাজগণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন। কখনও কখনও স্বর্গের কৃপাতেও তাহা সম্ভব হইতে পারিত।[৩০]

কিন্তু সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তাধারার সূচনায় একমাত্র এই জাতীয় স্থূল ভাবনার পরিবেশেই দার্শনিকের মন আবদ্ধ থাকিতে পারে না। দার্শনিক মন এই স্থূল ভাবনার সহজগতিকে অতিক্রম করিয়া চিন্তার জটিল আবর্ত্তে আপনা হইতেই নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। তখন সংশয়াকুল হইয়া মন বিভিন্ন-মুখী চিন্তাধারার সমন্বয়সাধন করিবার জন্য চেষ্টিত হয় এবং সমাধানের একটি মৌলিক সূত্র আবিষ্কার করে। চীনদেশের ভাবধারায় স্বর্গ ও ঈশ্বরের কল্পনায় যাহা স্থূলভাবে দার্শনিক চিন্তায় উন্মেষ হইতে থাকে। কিন্তু তাহাতেই মনের গতিকে সীমাবদ্ধ না করিয়া আরও সূক্ষ্ম কল্পনার সাহায্যে এই বিশ্বের বৈচিত্র্যের মূল অনুসন্ধান করিতে চৈনিক মনীষিগণ যত্নবান হন। "এই ধরিত্রী সহস্র সহস্র প্রাণীর জীবনদান করিয়াছে এবং তাহাদের জীবনধারণের ভার গ্রহণ করিয়াছে। সুন্দর ও অসুন্দর উভয়েই তাহার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই।…"

এইজন্য প্রত্যেককে এই চিরন্তন নীতির বিষয়ে সচেতন হইতে হইবে—"ইন" ও "ইয়াং" রূপ যে দ্বৈতনীতি বিশ্বের অন্তরালে নিহিত আছে তাহাদের সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ এই সম্বন্ধে সদাজাগ্রত। তাঁহারা এই দ্বৈতনীতিকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিয়া পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হন।"[৩১]

১। "During the period of Chin, Han, and Tang dynasties China came in contact with India and Chinese civilization and culture had been greatly influenced by Indian culture and civilization."—

অধ্যাপক টান, *Sino Indian Journal* vol. I, part I, পৃঃ ৪৫; পৃঃ ৫২ দেখুন, *Mythology of all races* (Chinese & Japanese). প্রথম দিকের কয়েকটি পৃষ্ঠা দেখুন।

২। লাটিন ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া বলা হয় Confucius.

৩। W.by কৃত *Three Ways of Thought in China*, পৃঃ ২৯।

৪। "As to practice, they accept the orderly sequence of nature from Yin and Yang School, gather the good points of Confucius and Mohists and combine with these the important points of the Schools of Names and Law."—Porter, *Aids to the Study of Chinese Philosophy*, Peiping, ১৯৩৪, পৃঃ ৫১।

৫। *Sacred Books of the East* খণ্ড ৩; *The Chinese Classics*, খণ্ড ৪ ও ৫ দেখুন।

৬। সিংঘী সিরিজ সংকলিত গ্রন্থখানি দেখুন।

৭। এই গ্রন্থের ৪৭তম অধ্যায় দেখুন। ইহাই চীনের প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহা এক শত ত্রিশ অধ্যায়ে পরিপূর্ণ। হানবংশীয় রাজা উ-টির (১৪০-৮৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দ) রাজত্বকাল অবধি ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সুমা টান নামক ঐতিহাসিক (১১০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ) এই গ্রন্থখানি লিখিতে আরম্ভ করেন ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সুমা চিয়েন সেখনি সমাপ্ত করেন চীনের ছয়টি দর্শন সম্বন্ধে এই গ্রন্থে (১৩০ অধ্যায়) বহু মূল্যবান্ তথ্য বিদ্যমান আছে। মনে হয় ইহা অনেকটা আমাদের আইন-ই-আকবরীর মত। আইন-ই-আকবরীতেও আমাদের দেশের ষড়্দর্শনের মূল তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

৮। "He read the *i* so assiduously that the thorgo which bound it wore out three times and said "give me a few more years like this and I will come to a perfect knowledge of the *i*."— "লুন ইউ, ৭, ১৬; দেখুন" *History of Chinese Philosophy* (ফুং কৃত) পৃঃ ৪৪।

৯। "Chow had the advantage of surveying the two preceding dynasties." লুন ইউ, ৩, ১৪।

১০। "How replete is its culture, I follow Chou" লুন ইউ, ৩, ১৪।

১১। "It was only when the times were out of joint that the teachers and scholars set up their teachings and it was in so doing that our master (Confucius) was superior to Yao and Shun."

১২। "Both *Kuo Yu* and *Tso Chuan* records numerous conversations between important personages in which the odes and History are frequently mentioned."—*History of Chinese Philosophy*, পৃঃ ৪৬।

১৩। "This indicates that an education of this sort was acquired by a portion, at least, of the nobility of that time. Confucius was the first man, however, to use the six Disciplines for teaching the common people."— *History of Chinese Philosophy*, পৃঃ ৪৬-৪৭।

১৪। লুন ইউ নামক গ্রন্থখানি দেখুন। এই গ্রন্থ খোং ফু জুর শিষ্যগণ কর্তৃক সংকলিত। ইহা খোং ফু জুর দর্শনের অন্যতম আকর-গ্রন্থ। স্যুট হিল সাহেব ও লেগি সাহেব ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। *The Chinese Classics* vol. I ও *The Analects of Confucius* (Yokohama সংস্করণ) দেখুন। উপরোক্ত Six Disciplines হইতে পরবর্তী অনেক দার্শনিক মতবাদ উদ্ভূত হইয়াছে The i Wen Chih Chapter of the Chien Hanshu says of the various Philosophic Schools that sprang from the heritage of the Six Disciplines. *History of Chinese Philosophy*, পৃঃ ৪৮।

১৫। ফুং কৃত গ্রন্থের পৃঃ ৪৬-৪৭ দেখুন।

১৬। এই গ্রন্থের পৃঃ ১৫ দেখুন।

১৭। "The book . . . was written . . . by the guests attached to the Court of Liu An, Prince of Huai-nan . . . This book like Lu-Shih Chun Ch'in is a miscellaneous compilation of all schools of thought." এই গ্রন্থের পৃঃ ৩৯৫ দেখুন এবং ইয়েন থিয়েন লুন নামক গ্রন্থের ৮ অধ্যায় পৃঃ ৫১ পশ্য।

১৮। মেরুতুঙ্গ কৃত প্রবন্ধ চিন্তামণিতে ভোজরাজ বিক্রমাদিত্য ও শিলাদিত্যের প্রশস্তি দ্রষ্টব্য।

১৮। ভোজবৃত্তির পুষ্পিকা।

২০। আমরা যেমন গ্রন্থের পরিবর্ত্তে গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করি, যেমন বলিয়া থাকি শঙ্কর দেখুন, রামানুজ দেখুন, চীনদেশেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রন্থের নামের পরিবর্ত্তে গ্রন্থকারের নামই উল্লেখিত হইয়া থাকে। চীনের জু শব্দ অনেকটা আমাদের জী শব্দের অনুরূপ। এই প্রসঙ্গে সু-উয়েন ছি জু নামক চীনদেশের প্রাচীনতম অভিধান পশ্য।

২১। ভারতীয় চিন্তাধারায় মুখ্যতঃ চারিটি যুগ বিদ্যমান। প্রথম বৈদিক যুগ, দ্বিতীয়, ব্রাহ্মণ্যযুগ (যদিও ব্রাহ্মণ্যযুগ আসলে বৈদিক যুগের মধ্যেই পড়ে তথাপি মন্ত্রযুগটিকেই এইস্থানে বৈদিক যুগ বলিয়া ধরা হইয়াছে, আর ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগকেই এইখানে ব্রাহ্মণ্য যুগ বলাই হইয়াছে) তৃতীয় বৌদ্ধ ও জৈন যুগ, চতুর্থ নবপরিবেশে ব্রাহ্মণ্যযুগ। পৃঃ ২৩।

২২। "The teachers of today have diverse standards (tao), men have diverse doctrines and each of the philosophic schools has its own particular position and differs in the ideas which it teaches. Hence it is that the rulers possess nothing whereby they may effect general unification, the Government Statues having often been charged, while the ruled know not what to cling to. I, your ignorant servitor, hold that all not within the field of Six Disciplines or the arts of Confucius, should be cut short; not allowed to progress further. Evil and licentious talk should be put a stop to. Only after this, can there be a general unification and can the laws be made distinct, so that people may know what they are to follow." ছিয়েন হান সু, অধ্যায় ৫৬, পৃঃ ২০-২১।

২৩। চু ইউ, ২, ১।

২৪। "Magic and religion belonging to some department of human experience. Together they belong to the supernatural world, the X-region of experience, the region of mental twilight." Magic includes "all bad ways and religion all good ways of dealing with the supernatural—bad and good, of course, not as we

may happen to judge them, but as the society concerned judge them." Marett, *Anthropology, Home University Library,* পৃঃ ২০৯-১১।

২৫। অথর্ব্ববেদ পঞ্চ

২৬। Mythology of all races.

২৭। "In ancient times peoples and divine beings did not intermingle. Among the people there were those who were refined and without evils. They were moreover, capable of being equable, respectful, sincere and upright. Their knowledge both in upper and lower ranges was capable of conforming to 'righteousness. Their wisdom could illumine what was distant with its all pervading brilliance. Their perspicacity could illumine everything. When there were people of this sort the illustrious spirit would descend on them . . . It was through such persons that the regulation of the dwelling places of the spirits, their positions (at the sacrifices) and their order of precedence were affected. It was through them that their sacrifices, sacrificial vessels and seasonal clothings were arranged." চু ইউ,২১১

২৮। "The spirits regardless who is the man, accept only virtue . . . Thus without virtue people will not be harmonious and the spirits will not accept the offerings." চু চুয়ান, (লেগি সাহেবকৃত) *Chinese Classics* দ্রষ্টব্য।"Heaven confers its decrees on the virtuous . . . Heaven punishes the guilty" সু চিং. পৃঃ ৫৫-৫৬

২৯। সু চিং; টাং-এর অভিভাষণ, পৃঃ ৮৫

৩০। সি, চিং; ৪-৩; গাথা ৩

৩১। ইউয়ে ইউ, ২, ১।

বিজয়সিংহের সমুদ্রযাত্রা*

শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ

১

ঊর্দ্ধে মেঘের গুরু গর্জ্জন,
 চারিদিকে ঝঞ্ঝার ঝঙ্কার।
পদতলে ফেনময় ঊর্ম্মির
 উচ্ছল উদ্বেগ শঙ্কার।

২

হুঁসিয়ার, যাত্রীরা হুঁসিয়ার,
 টলমল্ রণতরী টলমল্,
নাবিকেরা কসে টেনে ধর হাল
 ভগবান নেই, আছে বাহুবল্।

৩

মৃত্যু সে কিছু নয়,—বিশ্রাম,
 কে বলে সে জীবনের মহাভয় ?
তারি লাগি নবতর জন্ম,
 নব নব জগতের পরিচয়।

৪

আগুয়ান বীরদল, আগুয়ান,
 বাজুক না দুর্য্যোগ তূর্য্য।
পেশীময় বক্ষের শক্তি
 আনবেই প্রভাতের সূর্য্য।

৫

যৌবন চিরজয়ী চিরকাল,
 রক্তের স্ফূর্ত্তিতে উদ্‌গ্রীব।
বিশ্বের বক্ষে সে বিস্ময়
 ধ্বংসের পদে সে যে চির-শিব।

৬

হুঁসিয়ার বন্ধুরা, হুঁসিয়ার,
 ভেঙে গেছে হাল, যাক্ ধর কের,
মানুষের বড় নয় ভগবান,
 মৃত্যু সে বড় নয় জীবনের।

৭

পশ্চাতে শতশির ঊর্ম্মি,
 চারিদিকে ঝঞ্ঝার শঙ্কা।
বিতাড়িত বন্ধুরা তোল মুখ,
 সম্মুখে—সম্মান—লঙ্কা।

৮

আগুয়ান বীরদল, আগুয়ান,
 মুছে ফেল কপালের স্বেদজল,
ভয় নেই দেখা যায় দূরে ঐ,
 বন্ধুর সিন্ধুর শতদল।

৯

সেথা সব উদ্বেগ অবসান,
 অভিরাম অবসর—অবিরল,
আগুয়ান বীরদল, আগুয়ান,
 আগুয়ান রাত্রির সেনাদল।

* দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া বিজয়সিংহ সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। দুস্তর সমুদ্রের মধ্যে ঝড়ের রাত্রিতে তাঁহার বন্ধুগণ হতাশায় ভাঙিয়া পড়িলে তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইহা কল্পনা করিয়া এই কবিতাটি রচিত হইল।

আত্মঘাতী

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

শেষরাত্রির দিকে পাড়ার কয়েকজন ছোকরা আসিয়া ডাকাডাকি করিয়া ঘুম ভাঙিয়া দিল। ধমকাইয়া উঠিলাম—কি ব্যাপার হে তোমাদের? একটু স্বচ্ছন্দে ঘুমুতে দেবে না নাকি? এই তো অত রাত অবধি বকাবকি করে তবে উঠলে, এখনও কাক ডাকে নি—

হীরু আসিয়া বিছানায় বসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—কাল রাতে রাজেন কাকা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তাহার কথা আটকাইয়া যাইতেছিল।

শুনিয়া গুম হইয়া রহিলাম কিছুক্ষণ। এই রকমটা যে হইতে পারে, কাল সকালে একটু আশঙ্কা হইয়াছিল। উচিত ছিল তাঁহাকে কয়েক দিন চোখে চোখে রাখা। কিন্তু তাহাতে কি শেষরক্ষা করা যাইত? রাজেন কাকা যে সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলাম। ছেলেদের বলিলাম—চলো দেখি কোথায় যেতে হবে।

কোথায় গলায় দড়ি দিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলাম না। দেখি আমার অনুমান ঠিক হয় কিনা।

শ্রাবণের শেষ। রাস্তার জল-কাদা শুকাইবার সময় পায় না। মেঘলা থাকিলে দিনে তালপাকানো রৌদ্র, দুপুরে অসহ্য গুমোট। তবু দেখি আজ শেষরাত্রির দিকে একটু ঠাণ্ডার আমেজ দিয়াছে। অন্ধকার খানিকটা পাতলা হইয়া আসিয়াছে। দুই-একটা পাখী গাছের ডালে বাসায় বসিয়া পাখা ঝাপটাইয়া আলস্য ভাঙিতেছে, জড়ানো গলায় হঠাৎ এক-আধ বার ডাকিয়া উঠিতেছে।

ছেলেদের পিছনে পিছনে গ্রামের সরু হাঁটাপথ ধরিয়া চলিতেছিলাম। পথের দুই পাশে আম-জাম-কাঁঠালের গাছ, আসশেওড়ার ঝোপ; বাঁ দিকে গাছপালার উপর চোখ পড়িতে ফিকে অন্ধকারে দেখিলাম একটা গাছের ডাল হইতে দড়ি বাঁধা রাজেন কাকার দেহটা ঝুলিতেছে। আমাকে দেখিয়া দেহটা যেন ইচ্ছা করিয়াই বন্‌বন্‌ করিয়া পাক খাইতে লাগিল। মনে মনে হাসিলাম। কাকা মরিয়াও আমার সঙ্গে রসিকতা করিবার অভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই। চোখের ভুল। কিন্তু এরকম চোখের ভুলে বুঝা যায় কাকার আত্মহত্যার সংবাদ অজ্ঞাতসারে আমার মনের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

সকলে হাঁটিতে হাঁটিতে মহেশ-কর্ত্তার বাড়ী ছাড়াইয়া কমল-পুকুরের ঘাটে পৌঁছিলাম। হীরু পথ দেখাইয়া আনিতেছিল। কমল-পুকুরের ঘাট হইতে স্কুল-বাড়ীর মাঠ দেখা যায়। এতক্ষণে অন্ধকার কাটিয়া গিয়া আলো ফুটিয়াছে। ঠিক আলো নয়—আলোর আভাস। স্বদেশীতলার বকুল গাছ চারদিকে ছড়ানো ডালপালা লইয়া একটা অস্পষ্ট ছায়ার মত দেখাইতেছে কমল-পুকুরের এপার হইতে। এ পর্য্যন্ত আসিয়া আর বুঝিতে বাকী রহিল না রাজেন কাকা আত্মহত্যা করিবার উপযুক্ত বলিয়া কোন্ স্থানটি বাছিয়া লইয়াছেন। সংবাদ শুনিবার পর এই রকমটাই অনুমান করিয়াছিলাম।

ধীরে ধীরে কমল-পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের রাস্তা ধরিয়া স্বদেশীতলার দিকে চলিলাম। স্কুল-বাড়ীর দিক হইতে কুকুরের ডাকের শব্দ আসিতেছে। ঘেউ-উ-উ করিয়া একটানা বিলাপের মত ডাক। ভোরবেলার কুকুরের কান্নার শব্দ অদ্ভুত লাগিল। স্কুল-বাড়ীর বোর্ডিংয়ের জন কয়েক ছেলে বকুলগাছের তলার বেদীটার নীচে বসিয়া আছে। একটা লণ্ঠন তখনও মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। বুঝিলাম ইহারা পাহারা দিতেছে।

বকুলতলায় পৌঁছিলাম। একটা লম্বা উঁচু ডাল গাছের গুঁড়ির চারদিকের বাঁধানো বড় চাতাল ছাড়িয়া অনেকটা সম্মুখে প্রসারিত। সেই ডালের সঙ্গে বাঁধা দড়িতে রাজেন কাকার দেহটা ঝুলিতেছে। চাতালের প্রায় তিন ফুট উপরে পা, মাথাটা সম্মুখের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে।

দড়ি কাটিয়া দেহটা নামাইবার ব্যবস্থা হয় নাই। বোধ হয় ছেলেরা সাহস পায় নাই। নামাইবার বন্দোবস্ত করিতে কিছু সময় গেল। ইতিমধ্যে গ্রামের আরও লোক আসিয়া জড় হইয়াছে সেখানে।

মহেশ-কর্ত্তার ছোট ছেলে যোগেশ জ্যেঠা আসিয়াছেন। তিনি রাজেন কাকার কয়েক বৎসরের বড়, কিন্তু দুই জনে এক সঙ্গে খেলাধুলা করিতেন। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি রায় বাহাদুর চক্রবর্ত্তী আসিয়াছেন। টেকো দারোগা নিবারণ গাঙ্গুলী আসিয়াছে। হেডমাষ্টার হরেন ভৌমিক আসিয়াছেন। দূরে বাড়ী হলেও দেবেন ডাক্তার, নিতাই ঘটক প্রভৃতি গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা আসিয়াছেন।

কি করিয়া খবর পাইয়া কজলুর দফাদার নছের চৌকীদারকে সঙ্গে লইয়া এরই মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। কজলুর ভিড় হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছে—যেখানে পরশু দিনের সভার সময়ে পতাকা উত্তোলনের জন্য বাঁশ পোঁতা হইয়াছিল সেই বাঁশের কাছে। কঠোর দৃষ্টিতে গম্ভীর ভাবে সে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল, দেশের গবর্ণমেন্টের

একজন প্রতিনিধির উপযুক্ত কঠিন, অটুট গাম্ভীর্য্য তাহার সারা অঙ্গ, যার মেহেদী-রাঙানো দাড়ী বেষ্টন করিয়া আছে।

দড়ি কাটিয়া দেহ নামাইয়া চাতালের উপর শোয়ানো হইল। গলার দড়ি কাটিয়া ঘাড় সোজা করিয়া দেওয়া হইল। চক্রবর্ত্তী রায় বাহাদুর চাতালের উপর উঠিয়া আসিয়া গায়ের চাদরখানা দিয়া মুখ ও দেহ ঢাকিয়া দিলেন। ছেলেরা একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া দেখিল। পরশু সভায় রাজেন কাকা অনুপস্থিত থাকায় চক্রবর্ত্তী রায় বাহাদুর তাঁহার উদ্দেশ্যে বহু ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন ইহারাই পঞ্চম বাহিনীর সৃষ্টি করে। 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়া তিনি নূতন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

চাহিয়া দেখি যোগেশ জ্যেঠা চাতালের নীচে ঘাসের উপর বসিয়া। তাঁহার দৃষ্টি চাতালের গায়ে লেখার উপর আবদ্ধ। বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্—লাল সিমেন্টের উপর বড় বড় অক্ষরগুলি কাটা। চাতালের চারপাশে একই লেখা—বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্।

যোগেশ জ্যেঠার পিতাঠাকুর মহেশকর্ত্তার কীর্ত্তি।

মহেশকর্ত্তা কবে স্বর্গত হইয়াছেন। তাঁহার চেহারা একটু একটু মনে পড়ে। নাতিদীর্ঘ একহারা মানুষ, সাদা ধপধপে রং। হাতের তেলোয়, পায়ের চেটোয় গোলাপী আভা, গালে, কপালে গোলাপী ছোপ, রক্ত যেন কাটিয়া পড়িবে। পাকা চুলে বাঁ দিকে পরিপাটি করিয়া টেরী কাটা। সাদা, মোটা গোঁফের দুই প্রান্ত চুমরানো। কোঁচানো সরু কালোপাড় কাঁচি ধুতি, গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে বকলস লাগানো পেটেণ্ট লেদারের পাম্প-সু। চোখে পাঁসনে চশমা, চশমার সঙ্গে বাঁধা কালো সিল্কের ফিতা গলা বেড়িয়া পাঞ্জাবীর উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

বাষট্টি বছরের ফুল-বাবু মহেশকর্ত্তা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িলেন। সে কি প্রচণ্ড ঝড়! ঘুমন্ত দেশ সে ঝড়ের ধাক্কায় চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। মরা গাঙে বান ডাকিল।

বাঁ হাতে কোঁচার খুঁট ধরিয়া খালি পায়ে গান করিতে করিতে মহেশকর্ত্তা ভাবলী নদীতে চলিয়াছেন রাখীবন্ধনের দিন সকালে—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, (ওরে) দীনদুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই।' মহেশকর্ত্তার পিছনে চলিয়াছে গ্রামের ছেলেছোকরা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, এমন কি ছোট মেয়েরা পর্য্যন্ত হাততালি দিয়া সমস্বরে গাহিতে গাহিতে—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।'

বিলাতী কাপড় পোড়ানো হইল, স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করা হইল, দেশী কাপড়ের দোকান খোলা হইল, কুস্তি, লাঠিখেলা শিখিবার আখড়া তৈয়ারী হইল।

সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে, বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, লিয়াকৎ হোসেন, অশ্বিনী দত্তের নাম গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সকলের মুখস্থ হইয়া গেল। ফুলার সাহেবের নামে ও লাল পাগড়ী লইয়া ছড়া বাঁধা হইল। নৌকার মাঝি, গরুর রাখাল, গরু-মহিষের গাড়ীর গাড়োয়ান, মুদীর দোকানের ছোকরা, স্কুল, পাঠশালার ছেলেরা এই সব ছড়া গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তার পর আসিল বন্দেমাতরম্, সন্ধ্যা, যুগান্তরের দিন মজঃফরপুরে বোমা ফাটিবার সংবাদে দেশে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহিয়া গেল।

টেকো দারোগা নিবারণ গাঙ্গুলীর পিতা মহেন গাঙ্গুলী ছিল পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর। গাঙ্গুলী গ্রামে আসিয়া একবার ঘুরিয়া গেল। তার পর মহেশকর্ত্তার বড় ছেলে হরিশ এবং আরও কয়েকজন যুবককে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া সদরে চালান দেওয়া হইল। সকলে মিলিয়া বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে জেলে ঢুকিল। মহেন গাঙ্গুলী ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইয়া গেল।

এবার আসিল মহেশকর্ত্তার মেজ ছেলে সতীশের পালা। কোথায় কাহার মাথায় খুলি ফুটা করিয়া দিয়া গ্রামে আসিয়া জেলেপাড়ায় লুকাইয়াছিল। গোপনে খবর পাইয়া মহেন গাঙ্গুলী নিজে আসিল ধরিতে। জাল কাঁধে বিনোদ মাঝির সতীশের গাঙ্গুলীর হাতে ধরা পড়াটা পছন্দ হইল না। বৈঠার ঘায়ে গাঙ্গুলীর মাথা ফাটাইয়া দিয়া ভাবলী নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তার পর হইতে তাহার আর কোন খোঁজ নাই। কেহ বলে আসামে পলাইয়া গিয়া বর্ম্মায় পাড়ি দিয়াছে, আবার কেহ বলে কালাঘরে মরিয়াছে। সকলেরই শোনা কথা।

এবার জেলার সম্মানিত জমিদার, ছেষট্টি বছরের ফুলবাবু মহেশকর্ত্তা বাঁ হাতে কোঁচার খুঁট ধরিয়া 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই', গাহিতে গাহিতে জেলে ঢুকিলেন। চারদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

দুই মাস পরে মহেশকর্ত্তা ফিরিলেন। ফিরিয়া এলোমেলো টেরী ও ঝুলিয়া-পড়া গোঁফের প্রান্তে শ্রী ফিরাইয়া আনিতে মন দিলেন। জেলে বসিয়া কয়েকটা নূতন ছড়া বাঁধিয়াছিলেন, সেগুলি প্রচার করিতে লাগিলেন।

১৯০৫ হইতে ১৯১২। ভাঙা বাংলা জোড়া দিবার পণ করিয়া বাঙালী এই কয় বৎসরে নিজের ঘরে, সমস্ত দেশে আগুন জ্বালাইয়া দিল। কত ঘর, কত জীবন যে সে আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। ভাঙা বাংলা জোড়া দিবার লড়াইকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হইল স্বাধীনতা সংগ্রাম। মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাব বাংলার সঙ্গে কাঁধ মিলাইল।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ মাস আসিল। দিকের ধু ধু পিলি

জাতিপুঞ্জ পরিষদের সাধারণ সভার ১৪৬তম পূর্ণ অধিবেশনে বক্তৃতারত ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রী বি. নরসিংহ রাও

রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব মিঃ জর্জ সি. মার্শাল জাতিপুঞ্জ পরিষদের সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিতেছেন

মিঃ জর্জ সি. মার্শাল (বামে) ও শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষী পণ্ডিত

'সেটেল্ড ফ্যাক্টকে আন্‌সেটেল্ড' করিয়া ইংরেজ আবার ভাঙা বাংলা জোড়া দিল।

দিল্লীর দরবার হইতে যেদিন ভাঙা বাংলা জোড়া লাগিবার কথা ঘোষণা করা হইল সেদিন মহেশকর্তা স্কুলবাড়ীর মাঠে সভা করিলেন। সভার শেষে ঐ দিনটিকে স্মরণীয় করিবার জন্ত তিনি মাঠের এক পাশে উঁচু করিয়া বেদী গাঁথিয়া দিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন। প্রশস্ত চাতাল গাঁথা হইল। যোগেশ জ্যেঠা তখন ছোট। তিনি, রাজেন কাকা ও আরও অনেকে মিলিয়া চাতাল গাঁথিবার ইট সুরকী বহিয়াছিলেন, চাতালের মাঝখানে মহেশ-কর্তা নিজের হাতে একটা বকুলের চারা পুঁতিলেন। চাতালের পাশে লেখা হইল স্বদেশী আন্দোলনের বীজমন্ত্র বন্দেমাতরম্, গুণিয়া ১০৮ বার।

এই চাতালের নাম দেওয়া হইল স্বদেশীতলা।

স্বদেশীতলার চাতালের উপরে শোয়ানো চাদরে ঢাকা রাজেন কাকার মৃতদেহ, নীচে ঘাসের উপর বসিয়া মহেশ-কর্তার উত্তরাধিকারী যোগেশ জ্যেঠা এক মনে চাতালের গায়ের লেখা পড়িতেছিলেন।

১৯১২ হইতে ১৯২০। মহেশকর্তা স্বর্গে গেলেন ১৯১৪ সনে—বড় ছেলে হরিশ হইলেন বাড়ীর কর্তা। ভারলী নদীতীরের শ্মশান হইতে পিতার অস্থিখণ্ড সঞ্চয়ন করিয়া স্বদেশীতলার বকুল গাছের গোড়ায় তামার ঘটে পুঁতিলেন। শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া ছোট ভাই যোগেশকে বলিলেন—তুই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহের সেবা করতে লেগে যা। লম্বা চুল রেখে কণ্ঠি ধারণ করে বোষ্টম হয়ে যা, আর কিছুতে মন দিস না। কন্ঠিধারী গদগদ চালের বোষ্টম দেখলে শত্রুরা চোখ দেবে না। সত্তে গেছে, আমারও থাকবার উপায় দেখছি না। বাবার জন্ত একটা বছর আবদ্ধ হয়েছিলাম। এত বড় পরিবারটা তলিয়ে যাবে তুই বৈষ্ণব না হলে।

স্বদেশীতলায় একটি ঘর তুলিয়া হরিশকর্তা নাম দিলেন হরিমন্দির। কীর্তন, কথকতা চলিতে লাগিল। বাড়ী ছাড়িয়া সেইখানে আসিয়া আড্ডা গাড়িলেন। যোগেশ জ্যেঠাকে হরিমন্দিরের তত্ত্বাবধানে বসাইয়া দিয়া হরিশকর্তা একদিন ডুব মারিলেন। ভাঙা বাংলা কবেই জোড়া লাগিয়াছে, কিন্তু যে আগুন ভাঙা বাংলা জ্বালাইয়াছিল তাহা প্রজ্বলিত হইতে থাকিল সহস্র শিখায়। ১৯২০ সনে হরিশকর্তা পুড়িলেন সেই আগুনে।

হরিশকর্তার মৃত্যুর পরে সব দায়-দাবি লইয়া স্বদেশীতলার উত্তরাধিকার বর্তাইল রাজেন কাকার উপর। হরিশ-কর্তার শিষ্য তিনি। মহারাষ্ট্রের কোন অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্য অঞ্চল হইতে গুরুর মৃত্যুসংবাদ ও চিতাভস্ম বহন করিয়া গ্রামে ফিরিলেন। সেই চিতাভস্ম স্বদেশীতলায় মহেশ-কর্তার অস্থিখণ্ডের পাশে সমাহিত করা হইল।

আজ স্বদেশীতলায় রাজেন কাকার চিতাভস্ম সমাহিত করিবার দিন আসিয়াছে। কিন্তু সে সম্মান কি মহেশকর্তার উত্তরাধিকারী যোগেশ জ্যেঠা তাঁহাকে দিতে রাজী হইবেন? রাজেন কাকা গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। এ কি হরিশকর্তার শিষ্যের উপযুক্ত মৃত্যু!

গ্রামের লোক জানে সম্প্রতি রাজেন কাকার মাথা খারাপ হইয়াছিল। যে কষ্ট, যে উৎপীড়ন তিনি সারা জীবন সহ্য করিয়াছেন তাহার ফলে অনেক আগেই তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিলে কেহ আশ্চর্য্য হইত না। কিন্তু যখন সকল কষ্ট, সকল সাধনা সার্থক হইল, জাতির স্বপ্ন যখন বাস্তবে পরিণত হইল, দেশের আকাশে বহু ঈপ্সিত স্বাধীনতার তরুণ সূর্য্য দেখা দিল সেই মুহূর্তে তাঁহার মাথা গেল বিগড়াইয়া। আশ্চর্যের কথা।

মানসিক ও চারিত্রিক এই ক্লৈব্যের পরিচয় দিবার পর গ্রামের লোক তাঁহাকে সে উচ্চ সম্মান দিতে রাজী হইবে কেন?

হরিশকর্তার শিষ্য রাজেন কাকার দেহে ছিল অসুরের শক্তি। দুঃসাহসের, কষ্টসহিষ্ণুতার সীমা ছিল না। প্রশস্ত ললাট ও আবক্ষ দাড়ি র মধ্যে অবস্থিত নাকটি একটু ছোট মনে হইত। চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত রকমের শান্ত ও নিরীহ, মুখের হাসিটুকু ভারি অমায়িক। কে বলিবে এই শ্মশ্রুগুম্ফ লইয়া সৌম্যদর্শন, পরম অমায়িক লোকটি অত্যন্ত পরিহাসপটু, কে বুঝিবে এই শান্ত, নিরীহ খোলসটার ভিতরকার মানুষটি উক্কাপিণ্ডে গড়া? অনেকেই এই নিরীহ দৃষ্টি ও অমায়িক হাসিতে প্রতারিত হইত।

একবার ধরা পড়িয়া গেলেন জেলে। ভোজপুরী বুলিতে কথা বলিয়া, রামচরিত মানস হইতে দোঁহা আবৃত্তি করিয়া, সময়ে অসময়ে সীতারাম ভরসা করিয়া করিয়া রাজেন কাকা পণ্ডিতজী ও সাধুবাবা বনিয়া গেলেন। কয়েদী ও ওয়ার্ডার দলের মধ্যে তাঁহার বহু শিষ্য জুটিয়া গেল। পলায়ন জমিয়া গেলে হঠাৎ একদিন তিনি শিষ্যমণ্ডলীকে অকূলে ভাসাইয়া গরাদ ভাঙিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন।

রাজেন কাকা একবার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। সেও এক হাসির ব্যাপার। পুলিসের তাড়ায় পলাইয়া বেড়াইবার সময়ে ছত্রিশগড়ে মান্দালা জেলায় এক ঘাসে'রার গৃহে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। বুড়া ঘাসেরিরার ঘরে ছিল দুইটি স্ত্রী। কাকার নিরীহ দৃষ্টি ও অমায়িক হাসিতে ঘাসেরিয়ার অল্পবয়সী দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারটি গলিয়া গেল। দুইখানি বেশী বাজরার রুটি, একটু বেশী করিয়া অড়হরের ডাল ও আমের চাটনীর লোভে কাকাও একান্ত বিগলিত ভাব দেখাইতে লাগিলেন। দুই চারিদিনের মধ্যে ঘাসেরিয়া-পত্নীর আকর্ষণ এমন উগ্র হইয়া উঠিল যে কাকাকে পলায়নের চেষ্টা দেখিতে হইল। এদিকে বুড়া ঘাসেরিয়া প্রথম

পক্ষের রিপোর্ট পাইয়া দ্বিতীয় পক্ষকে ধমকাইতে গিয়া তাহার হাতে দুই-এক ঘা খাইল, বুড়ী চুরাইলের তাড়ানিতে বিশ্বাস করিবার জন্ত। স্বামীদেবতাকে এইভাবে সম্মান দিয়া দ্বিতীয় পক্ষ পা ছড়াইয়া কাঁদিতে ও বুড়ী চুরাইলের উদ্দেশে অশ্রাব্য গালিগালাজ বর্ষণ করিতে লাগিল। কি মনে হইতে হঠাৎ কান্না থামাইয়া রাজেন কাকার কাছে গিয়া তাঁহাকে ধমকাইতে লাগিল। বলিল যে বুড়াবুড়ীর কোন কথায় ঘাবড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলে তাঁহারও বুড়ার হাল হইবে। কাকা মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে ওরকম বেইমানী তিনি করিতেই পারেন না। সে দিনটা কাটিল। পরের দিন কাকা অত্যন্ত বিনীতভাবে দ্বিতীয় পক্ষকে জানাইলেন যে তিনি আমীর লোক ছিলেন এককালে যদিও রামজীর ইচ্ছায় এখন দেওয়ানা হইয়াছেন। তবে দেওয়ানা ফকির হইলেও মানুষের অভ্যাস বড় খারাপ জিনিস। ঘৃতশূন্ত বাজরার রুটি খাইয়া খাইয়া তাঁহার আমিরী পেটে দারুণ দর্দ হইয়াছে। ইহার পর লোটা লইয়া বার সাতেক ময়দানে গেলেন, খাটিয়ার উপর লেট হইয়া ঘণ্টা দুই ছটফট করিলেন। শেষতক দবাখানায় যাইবার অনুমতি আদায় করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইলেন।

১৯২১ হইতে ১৯৪১। হঠাৎ এক দিন গ্রামে ফিরিয়া রাজেন কাকা স্বদেশীতলায় ভাঙা হরিমন্দির মেরামত করাইয়া সেখানে কিছুদিন জাঁকিয়া বসিলেন। দাড়ীতে জটাজুটে চেহারা যাহা হইয়াছে ধুনি জ্বালিয়া বসিলে গ্রামেই হয়ত পসার হইয়া যাইত।

হয়ত বলিবার কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে নামিত হইত। গ্রামের ছেলেরা ইস্কুল কলেজ ছাড়িয়া অনেকে প্রায় সাধুবাবা হইয়া উঠিয়াছিল। সে কি দীন ভাব, মৃদু বচন, সদা উদ্ভ্রান্ত-প্রায় অশ্রুর ছায়াপাতে মেদুর দৃষ্টি! চরকা-যজ্ঞ, সূত্রযজ্ঞ, ডাণ্ডী অভিযানের মহড়া, গাঁজার দোকানে পিকেটিং, থানায় ও সদরে নোটিশ পাঠাইয়া বে-আইনী বক্তৃতা, শোভাযাত্রা—নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া নূতন খাতে জাতীয় আন্দোলনের স্রোত বহিতে লাগিল।

রাজেন কাকা কিছুদিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া এই সব দেখিতে লাগিলেন। এই সব কার্য্যকলাপের নিগূঢ় মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যাহাতে কাজে লাগিয়া যাইবার একটা সূত্র পান।

ভ্রাতার মৃত্যুর পরে যোগেশ জ্যেঠা বৈষ্ণব ধর্মের চর্চা করিতেছিলেন। নূতন আন্দোলনের কতকটা নিরাপদ রচনাত্মক কার্য্যপদ্ধতির ধারা লক্ষ্য করিয়া আসরে নামিয়া আসিলেন। কাকাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া যোগেশ জ্যেঠা তাঁহার হাতে একটা কিছু কাজ গছাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় মেয়ের বিবাহ দিবার জন্ত মহেশ গাঙ্গুলীর পুত্র টেকো নিবারণ দারোগা গ্রামে আসিল। নিবারণ গাঙ্গুলী মেদিনীপুরে বদলী হইয়া গিয়াছিল এবং ইতিমধ্যেই সেখানে লাঠি চার্জ্জে ধুরন্ধর বলিয়া সুখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। গাঙ্গুলীর মেয়ের বিবাহ আর যোগেশ জ্যেঠা গ্রামের প্রধান ও সমাজ-পতি। কাজেই দুই বিপরীতমুখী ধারাকে ক্ষণেকের জন্ত মিলিতে হইল।

উভয়ের সাক্ষাতের সময়ে কাকা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যথারীতি সেই সাক্ষাতের রিপোর্ট দিতে গিয়া বলিলেন—সে একটা অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য হে ছোকরা।

একদিকে মহাত্মাজীর আদেশ, অন্য দিকে পেটের দায়, এই দোটানার ফলে গাঙ্গুলী দারোগা দুস্তর সাগরে পড়িয়াছেন, নিবেদন করিলেন। সত্যাগ্রহীদের উপর কত যে নৃশংস অত্যাচার ইংরেজবেটারা করিতেছে দেখিয়া কতবার মনে হইয়াছে দিই ছাড়িয়া গোলামী, বেটাদের লাঠির তলায় মাথা পাতিয়া দিই, দেখি কত মারিতে পারে। চোখে দেখা কর্ত্তা, নিজের চোখে দেখা। মেয়েলোকের মাথায়, সাক্ষাৎ জগজ্জননী মায়েদের মাথায় লাঠি মারিতে গো-খোর, শোর-খোর ম্লেচ্ছ বেটাদের হাত কাঁপে না। সত্যাগ্রহের তেজ কত? শুইয়া বসিয়া লাঠি খাইতেছে, হাত পা মাথা ভাঙিয়া রক্তের নদী, তবু উঠিয়া দাঁড়াইবে না, দৌড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিবে না। স্বচক্ষে এ সব দেখিয়া জীবনে ধিক্কার জন্মিয়াছে আর মহাত্মাজীর উদ্দেশে শতকোটি প্রণাম জানাইয়াছি মনে মনে। গঙ্গুলী দারোগার চোখ হইতে জলের ধারা বহিল।

কাকা নিবারণ গাঙ্গুলীর অনুকরণ করিয়া সাক্ষাতের রিপোর্ট দিলেন, তারপর হাসিয়া আকুল। হাসি থামাইয়া বলিলেন—এই সব ভক্ত বিটকেলের দলে সারা দেশটা ছেয়ে ফেলবে দেখো।

আর কিছুদিন গেলে কাকা অসহযোগীদের কৃপার পাত্র হইয়া দাঁড়াইতেন, কিন্তু হঠাৎ একদিন গ্রাম হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। কোন খবর নাই। বহুদিন পরে ১৯৩১-এর মুখে তেমনি অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চেহারা দেখিয়া অবাক হইলাম। সেই জোয়ান শরীর শুকাইয়া, কালি মারিয়া পোড়া কাঠের মত হইয়াছে। বলিলেন—দেশ পর্য্যটন করে এলাম হে। আগের দিনে গৃহীরা হেঁটে তীর্থ করতেন, সাধুরা কেদারবদরী হতে কন্তাকুমারিকা, দ্বারকা হতে কামাখ্যা, পরশুরাম কুণ্ড পর্য্যন্ত পদব্রজে বেড়াতেন। মহাজনদের পন্থা ধরে আমিও দেশের সঙ্গে পরিচয় করছি। অকৃত্রিম দেশসেবার কাজ হে।

তারপর বলিলেন—গিয়েছিলেম আসামে বেড়াতে। ইচ্ছা ছিল পূর্ব্বসীমান্তের পাতকোই 'পাস' হয়ে উত্তর-বর্ম্মা পর্য্যন্ত ঘুরে আসব। এই পথে শান-খাই জাতগুলো ও আসাম-

বিজয়ী বর্ম্মী সৈন্যেরা এসেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমার যাওয়া হয়ে উঠল না।' আহোম রাজাদের সাবেক রাজধানী চরদেও, গড়গাঁও ঘুরতে ঘুরতে জ্বর আর আমাশয়ে ধরল। আর একটু বাড়াবাড়ি হলে ওখানেই হয়ে যেত, মীরজুমলার মত ধুঁকতে ধুঁকতে ফেরবার শক্তিও থাকত না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন, মীরজুমলাকে ধুঁকতে হ'ল কেন?

কাকা বলিলেন—সে এক মজার কাহিনী। মহারাষ্ট্রের অরণ্য ও পর্ব্বতে গর্ব্বিত মোগল বাহিনীর এমন লাঞ্ছনা ঘটে নি। শাহজাহান অসুস্থ, ছেলেদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে লড়াই বেধে গেল। সুযোগ বুঝে কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ কামরূপ ও হাজোর ফৌজদারকে তাড়া লাগালেন। ফৌজদার পালালেন গৌহাটিতে। গৌহাটি এর আগে মোগলরা নিয়েছিল। সেখানেও ঠাঁই হ'ল না। আহোম রাজা জয়ধ্বজ গৌহাটির দিকে আসছেন শুনে ফৌজদার গৌহাটি ছেড়ে বাংলায় পালিয়ে এলেন। আহোম সৈন্যদল ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে ঢাকা পর্য্যন্ত এসে লুঠপাট করে চলে গেল। তখন মীরজুমলা এগুলেন পঞ্চাশ হাজার সৈন্য আর চারশ' রণতরী নিয়ে। এক একখানা গ্রাব বা রণতরীতে সত্তর আশী জন নৌ-সৈন্য, তের-চৌদ্দটা করে কামান। তিন চার খানা কোশা নৌকা দাঁড় বেয়ে একখানা ভারী গ্রাবকে টেনে নিয়ে যায়। রণতরীগুলোর ভার সব ইউরোপীয় অফিসারদের উপর—পর্ত্তুগীজ আর ওলন্দাজ অফিসার। ইংরেজ তখনও ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারে নাই।

আহোম সৈন্য ও আহোম নৌ-বাহিনীর খ্যাতি ছিল। কিন্তু তারা পেরে উঠল না। সিমলাগড় ও সাল্কাবার যুদ্ধে হেরে আহোম রাজা পালালেন নামরূপে; মীরজুমলা ঢুকলেন রাজধানী গড়গাঁওয়ে। চার মাইল প্রশস্ত, ঘন বাঁশবনের প্রাকারে ঘেরা আহোম রাজধানী গড়গাঁওয়ে কাঠ ও খড়ের তৈয়ারী রাজপ্রাসাদে গিয়ে তিনি উঠলেন। তারপর আরম্ভ হ'ল আসল তামাশা। অবিরাম বৃষ্টি—আহোমদের পোড়ামাটি নীতির ফলে রসদের অভাব আর দিনরাত তাদের চোরা আক্রমণ। ঘাঁটি ছেড়ে এক পা বাইরে বেরুবার উপায় নেই চোরা গুলির দাপটে। একবার নৈশ আক্রমণে রাজধানীর অর্দ্ধেক তারা দখল করে বসল। খাদ্যাভাব, রক্ত আমাশয় আর চোরা আক্রমণের ফলে মীরজুমলার সৈন্যদের মধ্যে ঘোর অসন্তোষ দেখা দিলে। আহোম রাজধানীতে প্রায় বন্দী অবস্থা থেকে কোন রকমে পালাতে পারলে মীরজুমলা বাঁচেন, রাজ্যজয় তখন মাথায় উঠেছে।' মানরক্ষা গোছের একটা সন্ধি করে জ্বরে প্রায় বেহুঁস অবস্থায় তিনি ঢাকা রওনা হলেন, কিন্তু ঢাকায় আর পৌঁছুতে পারলেন না, পথেই মারা গেলেন। সৈন্যদলের অর্দ্ধেকের উপর সাফ হয়ে গিয়েছিল খাদ্যাভাবে আর ব্যারামে। এই শিক্ষালাভের পর দিল্লীর বাদশাহ আর কোন সেনাপতিকে আসাম আক্রমণ করতে পাঠান নাই।"

বাস্তবিক কাকার শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এত দেশ থাকতে ঐ জঙ্গলে কেন গিয়েছিলেন মরতে?

কাকা হাসিলেন। বলিলেন, জঙ্গল বলে কি নিজের দেশে বেড়াব না? তা ছাড়া একটা কৌতূহল ছিল বরাবর। উত্তর-পূর্ব্ব পথে যারা বাইরে থেকে এদেশে এসেছে তাদের আমরা হজম করে নিয়েছি, আর উত্তর-পশ্চিমের পথে যারা এসেছে তারা কিন্তু উল্টে আমাদের হজম করতে চাইছে। তাই এক বার পূব দিকটা দেখতে গিয়েছিলাম।

একটু হাসিয়া বলিলেন, একটা গল্প বলি শোন। রুদ্র সিং, যাঁর আহোম নাম সুক্রংফা, রাজা হলেন বাপ গদাধর সিংহের মৃত্যুর পরে। বৃদ্ধ বয়সে নদীয়া জেলার শান্তিপুরের কাছে মালিপোতার তান্ত্রিক পণ্ডিত কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যের নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন। রাজার খেয়াল হ'ল কাঠ আর খড়ের প্রাসাদ ভেঙে পাকা রাজপ্রাসাদ গড়েন। দেশে ইটের কাজ জানা মিস্ত্রী নেই; কোচবিহার থেকে ঘনশ্যাম নামে বাঙালী স্থপতি এলেন। কয়েক বৎসর আসামে থেকে ঘনশ্যাম অনেকগুলি পাকা মন্দির আর প্রাসাদ তৈয়ারী করে দিলেন। রাজার কাছে প্রচুর পুরস্কার পেয়ে ঘনশ্যাম দেশে ফেরবার জন্য তৈরী হলেন, হঠাৎ তাঁর কাছে পাওয়া গেল কতকগুলো লেখা কাগজ। তাতে রয়েছে আসাম ও আসামের লোকেদের সম্বন্ধে নানা বিবরণ। আহোম রাজা অনুমান করে নিলেন, মোগলদের হাতে দেবার জন্য এই বিবরণ সঙ্কলিত হয়েছে। ঘনশ্যামকে সরাসরি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ল। পলাশীর যুদ্ধের চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগেকার ঘটনা। এ থেকে বোঝ আহোমরা কি করে আফগান ও মোগলদের হাত থেকে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল।

আসাম অভিযানের ধকল সামলাইতে বেশ কিছুদিন সময় লাগিল। কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বর হয়। তারপর শরীর একটু ভাল করিয়া সারিতে না সারিতে আবার জেলে প্রবাসের পালা আরম্ভ হইল। শেষ বার যখন জেল হইতে ফিরিলেন শরীর আবার ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অসুস্থ শরীরেও বাহিরে রাখা নিরাপদ নয় মনে করিয়া কর্ত্তারা আবার তাঁহাকে খাঁচায় পুরিলেন। প্রায় মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হইয়া ডাক্তারী সুপারিশে ছাড়া পাইলেন। চিকিৎসা চলিল। যোগেশ জ্যেঠা উপদেশ দিলেন এবার ভাল হইয়া সংসারী হও, পুলিশ হয়ত আর ধরিবে না। কাকা হাসিয়া বলিলেন, গোঁফ ওঠবার আগে থেকে জেলে যাতায়াত সুরু করেছি। এখন গোঁফে সবে পাক ধরেছে। এখনই কি হয়েছে দাদা?

ঠিক কথা। কাকার প্রাণ যেন কচ্ছপের প্রাণ। শক্ত

খেলাটা পুতুলের বাক্সে ভাঙিয়া আলাদা করিয়া দিলেও কচ্ছপ কামড়াইবার জন্য গলা বাড়াইয়া দেয়। কাকার হাঁটুতে বল নাই, হাতে জোর নাই। ১৯৪২-এর জুলাই শেষ হইতেই আকাশ আবার মেঘে ছাইয়া ফেলিল। কাকা বিছানা ছাড়িয়া টুক টুক করিয়া হাঁটিতে সুরু করিলেন, চোখে মুখে উৎসাহের আলো দেখা দিল। ৯ই আগষ্টের পরে ঝড় উঠিল। কাকা আবার ডুব দিলেন মেদিনীপুর, বালুরঘাট, বিহার,—কোথায় কখন কোন্ কাজে হাত লাগাইলেন তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ অনাবশ্যক মনে করিয়া কাকা আমাদের কাছে সব খুলিয়া বলেন নাই। আন্দোলন চলিতে থাকা কালে আমরা খবর পাইলাম বিহারপ্রান্তে রেল-লাইন উপড়াইবার চেষ্টায় রত এই অজুহাতে তাঁহাকে ধরা হয়। বাস্তবিক তিনি গিয়াছিলেন পাহারারাধারী সৈন্যদের অস্ত্র সরাইবার চেষ্টায়। বাংলায় তো রাণাঘাটের কাছে রেল লাইনের কার্য্যে ব্যস্ত মজুরদের উপর হাওয়াই জাহাজ হইতে মেসিনগানের গুলি চালিয়াছিল এই অজুহাতে যে তারা লাইন উপড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। বিচারের অপেক্ষায় জেল হাসপাতালে থাকিবার সময়ে কাকা কি করিয়া অদৃশ্য হইয়া যান এ খবরটাও আমরা পাইয়াছিলাম।

আস্তে আস্তে সে ঝড় থামিয়া আসিল। কয়েক বৎসর পরে হঠাৎ এক দিন খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কাকা গ্রামে দেখা দিলেন। এবার আগষ্ট বিপ্লবের একজন নেতা বলিয়া লোকে তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিল।

এত দিন কোথায় ছিলেন, কি করিতেছিলেন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বলিলেন উড়িষ্যার পাহাড়ে ও জঙ্গলে সাধু সাজিয়া আত্মগোপন করিয়া ছিলেন। চক্রধরপুর হইতে চাইবাসার মধ্য দিয়া কেওঞ্জরগড়, সেখান হইতে পাল লাহারা। শবর, খোঁদ, মালের, জোয়া, জুয়াংদের মধ্যে গুণীন সাজিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। খেন-কানালের পূর্ব্বে কখনও অগ্রসর হন নাই। পশ্চিমে ছত্রিশগড় পর্য্যন্ত যাইতেন। চিমটে, ঝোলা, কপনী আর জটা সম্বল করিয়া বছর দুই স্বচ্ছন্দ মনে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। সম্বলের মধ্যে একখানা কম্বল আর একখানা বাঘ-ছাল। মধ্যে মধ্যে বহির্জগতের খবর লইবার জন্য বামরা পর্য্যন্ত যাইতেন।

হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—ব্যাটারা ঠ্যাংটা ভেঙে দেওয়াতে বড় অসুবিধে হচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে ভাবতাম, দূর ছাই, সারা জীবনটা ত গেল জেলে আর জঙ্গলে, এবার পছন্দমত একটা শবর, খোঁদ কি জুয়াং মেয়ে দেখে সংসার-ধর্ম্ম করতে লেগে যাই। এর মধ্যে জুয়াং মেয়েগুলোকে ভাল বলতে হবে, কোন দিন সাড়ী গহনার জন্য জ্বালাতন করত না তারা। কি করে জানলাম একথা ভেবে অবাক হচ্ছ তোমরা। জানাটা সহজ। সাড়ী-টাড়ী প'রে অঙ্গসৌষ্ঠব ঢাকবার তেমন রেওয়াজ নাই কিনা ওদের মধ্যে। আর গহনার মধ্যে দু'চারটে কড়ি, পুঁতি, ঝিনুক কোনমতে যোগাড় করে দিলেই হ'ল। আজকালকের দিনে সহধর্ম্মিণী করতে হলে এর চেয়ে সুপাত্রী কোথায় পাবে বল?

মনের এই সাধ ব্যক্ত করিয়া কাকা হা হা করিয়া হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—একবার বামরা গিয়ে বাংলার দুর্ভিক্ষের খবর পেলাম। কোনও সূত্রে আসাম-প্রান্তে যুদ্ধের যে খবর পেলাম তাতে উড়িষ্যার জঙ্গল থেকে আসামের জঙ্গলে পাড়ি দেবার জন্য মন অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু পাড়ি দিতে পারলাম না। ঝাড়সাগুদা ষ্টেশনে গাড়ী চড়ে বসেছি কি করে পুলিস সন্ধান পেয়ে রাজা খারসোয়ান ষ্টেশনে ধরল। তারপর অঙ্গুল, কটক, বালেশ্বর জেলে কাটল এত কাল।—

১৯৪৬ সনে দেশের উপর দারুণ দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিল। কলিকাতা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, বিহার, পঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ। ষদেশীতলায় ভাঙা হরি-মন্দিরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রাজেন কাকা আকাশপাতাল ভাবেন। কোন্ চক্রীর চক্রে এই উন্মত্ততা সাইমুম বাত্যার মত দেশের উপরে নামিয়া আসিল? এতদিনের সাধনা, জীবনভোর অকথ্য লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন, দুঃখকষ্ট কিসের আশায় হাসিমুখে সহিয়াছেন?

১৯৪৭ আসিল দেশ বিভাগের আলাপ আলোচনা লইয়া। রাজেন কাকা বিরস হাসি হাসিয়া বলিলেন,—ও এই ভেড়ো বড়ি গেলাবার জন্য এত কাণ্ড তোমাদের? এই জন্য ক্রুশেডার ও আনসার দলের মিলিত অভিযান?

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা উৎসব হইল দুই দেশে। ১৬ই আগষ্ট ভোর হইতে হইতে রাজেন কাকা আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। আমার ঘরে বসিয়া খুব হাসিতে আরম্ভ করিলেন। তারপর হুকুম করিলেন—এই ছোকরা, চা লাও, সন্দেশ লাও জলদী জলদীসে। হাসি বন্ধ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। একটু বাদে বলিলেন—এই ছোকরা, তোর বয়েস কত হ'ল? মহেশকর্ত্তার ভোজ খেয়েছিলি মনে আছে? আরে তখন যে তুই জন্মাস নি। তবে শোন। পাঁচটা খাসী কাটা হ'ল। এক মণ চালের পোলাও হ'ল। পাঁচ মণ সন্দেশ এল। ষদেশীতলার মাঠে ছেলেবুড়ো মিলে রান্না করলে। গাঁয়ের সব লোক খেল। ভাবলী নদীর ওপার থেকে মুসলমান চাষীরা দলে দলে এসে কলার পাত পেড়ে চিঁড়ে, দই, সন্দেশ পেটভরে খেল। ভাঙা বাংলা জোড়া লাগবার উৎসবে সেদিন এই বিরাট ভোজ দিলেন মহেশকর্ত্তা। কেউ কেউ হেসে বলল—কার্জ্জন সাহেবের শ্রাদ্ধ।

আবার বলিলেন—মহেশকর্ত্তার সে সম্পত্তি নেই।

যোগেশদার অবস্থা ভাল নয়। ধর্মকর্ম নিয়ে আছেন, বাইরে বেরুতে চান না। আজ ছোকরা তুই খাওয়াবি আর খাব আমি একা। কর্তারা গোটা দেশটাকে বঁটিতে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বড়, ছোট, মুড়ো টাই টাই করেছেন, আরামসে যে যার ভাগ খাবেন বলে। আনন্দের আজ আর সীমা নেই। বাবা, আজ খাওয়াবে না ত খাওয়াবে আর কবে? যাও যাও জলদী কর, যাও।

আগের মত আবার তিনি হাসিতে লাগিলেন। চা খাইতে খাইতে বলিলেন,—তুমি কোন ভাগ নেবে ছোকরা? একটা কথা বলে রাখি শোন। বঁটিতে কাটতে গিয়ে কর্তারা পিত্তটা গেলে ফেলেছেন, সব তেতো মেরে যাবে, কেউ ফুর্তি করে খেতে পারবেন না। কথাটা বলে রাখছি. মনে রেখো।

আমার পিঠে এক থাবড়া মারিয়া বলিলেন—আমার ভাগে কি পড়েছে জানিস? নাড়ীভুঁড়িগুলো। এই বলিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

হাসিতে হাসিতে যাইবার জন্ত উঠিলেন। হঠাৎ হাসি বন্ধ করিয়া স্বাভাবিক ভাবে, খুব নিম্নস্বরে বলিলেন—কাল সকালে একবার আমাদের ওদিকে যাস। কথা আছে।

তারপর চলিয়া গেলেন।

রাজেন কাকার অবস্থা দেখিয়া দুশ্চিন্তা হইল। নূতন অবস্থার সঙ্গে তিনি কি ভাবে আপনাকে খাপ খওয়াইবেন চিন্তা করিয়া কোনমতে স্থির করিতে পারিলাম না। কে তখন জানিত আমার চিন্তা করা বাহুল্য, তাঁহার ব্যবস্থা তিনি স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন?

ফজলুর দফাদার আগাইয়া আসিয়া বলিল—লাস সদরে চালান যাবে। গাড়ী আনতি চৌকীদার যাতিছে।

যোগেশ জ্যেঠা মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। আমি রায় বাহাদুর চক্রবর্তীর দিকে চাহিলাম। রায় বাহাদুর দারোগা নিবারণ গাঙ্গুলীর দিকে চাহিলেন। নিবারণ গাঙ্গুলী ফজলুর রহমানের দিকে চাহিল। ফজলুর রহমান ধর্মগুণে দেশের সরকারের প্রতিনিধি, পদোচিত গাম্ভীর্য লইয়া সে কাহারও দিকে চোখ ফিরাইল না, স্বদেশীতলার বকুলগাছের মাথার উপর দিয়া অসীম ব্যোমের দিকে চাহিয়া রহিল।

ব্যাপার বুঝিয়া ছেলেদের মধ্যে একটা উত্তেজনার ভাব দেখা দিল। সাদা চাদরে ঢাকা রাজেন কাকার মৃতদেহ কাঁধে তুলিয়া তারলী নদীর তীরে শ্মশানঘাটে যাইবার জন্ত তাহারা প্রস্তুত হইল। দফাদার চোখ লাল করিয়া উত্তেজিত ভাবে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের জমিদার যোগেশ জ্যেঠা, রায়বাহাদুর চক্রবর্তী, হেডমাষ্টার হরেন ভৌমিক, টেকো দারোগা নিবারণ গাঙ্গুলী সকলেই হতভম্ব। গাঙ্গুলী তাহাকে বুঝাইবার জন্ত কাছে যাইতে দফাদার ফজলুর রহমান এক ধাক্কা দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল। কর্কশ স্বরে বলিল—সরকারী কামে কতা কইলে গেরেপতার করমু কুথাই। মামাও লাস। কয়েকজন ছেলে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—চল তুই আমাদের সঙ্গে, তোর সামনে লাস পোড়াব। সদরে চিঠি দিব তুই দাঁড়িয়ে লাস পুড়িয়েছিস। তাহারা দফাদারকে টানিয়া লইয়া চলিল।

তারলী নদীর ধারে গ্রামের শ্মশানে রাজেন কাকার সংকার শেষ করিয়া সকলে মিলিয়া জল ঢালিয়া চিতা নিবাইয়া দিলাম। এক টুকরা অস্থি ও কিছু ভস্ম লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। মনের ইচ্ছা সকলে মত করিলে মহেশকর্তা ও হরিশকর্তার ভস্মের মত রাজেন কাকার ভস্মও স্বদেশীতলায় সমাহিত করিব।

তাহার আর প্রয়োজন হইল না। পরের দিন সকালে খবর পাইলাম স্বদেশীতলার বেদী নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, একখানি ইটও সেখানে পড়িয়া নাই। এক রাতের মধ্যে এই কাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

ভাবিলাম এ ভালই হইল। মাটি, নদী, আকাশ সবই ভাগ হইয়াছে, শুধু স্মৃতিটুকু আঁকড়াইয়া থাকিয়া কি ফল? সব নিশ্চিহ্ন, লুপ্ত হইয়া যাউক। ভাবিলাম তারলী নদীতেও আর বিদ্রোহী দেশকর্মীর চিতাভস্ম বিসর্জন করিব না। কিন্তু কোথায় লইয়া যাই এই পবিত্র চিহ্নটুকু?

কেশবচন্দ্রের জাতিগঠনের পরিকল্পনা

শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ভারতে ইংরেজ অধিকারের দৃঢ়-ভিত্তি স্থাপিত হইল। ইহার অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই আরম্ভ হইল বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের নব-জাগরণ। 'আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ' এবং 'ফরাসী বিপ্লব' সমস্ত ইউরোপে স্বাধীনতার যে নূতন আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া জনমনে যে নবীন আশা এবং আকাঙ্ক্ষা আনিয়া দিয়াছিল, তাহা ইংরেজ-জাতির সংস্পর্শের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষকেও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিল। বাংলাদেশ সর্ব্বপ্রথম সেই মন্ত্র গ্রহণ করে এবং এই প্রদেশেই সমগ্র ভারতের জাতীয়তাবোধের প্রথম বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। মোটামুটি হিসাবে ইহাকেই জাতীয়তার ক্রমবিকাশের প্রথম যুগ ধরা যাইতে পারে—১৮১০ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পঁচিশ বৎসর। এই যুগকে রাজা রামমোহনের যুগও বলা যায়। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আসিয়া দেশকে নবচেতনা দানের ব্রত গ্রহণ করেন; ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পর আসিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং বিদ্যাসাগরের যুগ—১৮৩৫ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি পঁচিশ বৎসর। এই যুগের প্রথম ভাগে ১৮৩৯ সনে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে নূতন জীবনের সাড়া পাওয়া যাইতেছিল, ইংরেজের শাসনব্যবস্থায় এদেশবাসীর মধ্যে একতাবোধ জন্মিতেছিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের মনে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল। ভারতের জাগরণের তৃতীয় যুগ ১৮৬০ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই যুগের ইতিহাসের সহিত কেশবচন্দ্রের জীবন অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত। এই সময়েই আমরা দেখিতে পাই কেশবচন্দ্রের জাতিগঠনের পরিকল্পনা এবং সেই অনুযায়ী বিবিধ কর্ম্মপ্রচেষ্টা। এই তৃতীয় যুগেই বাংলাদেশের নেতৃত্বে ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক নূতন পর্ব্ব আরম্ভ হয়। এই পঁচিশ বৎসরে ভারতের জাতীয়তবোধ ও ঐক্যবোধ কতদূর দানা বাঁধিয়াছিল, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) প্রথম অধিবেশনেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বিভিন্ন দিক্ হইতে বিশেষ ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই যুগের শেষ ভাগে ভারতের জাতীয়তাবোধ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে এবং অন্যান্য বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে দেশবাসী সচেতন হইতে থাকে।

কেশবচন্দ্রের কর্ম্মজীবনকে সাধারণ ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বিলাত-গমনের পূর্ব্বে প্রথম পর্ব্ব; ১৮৭০ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর দ্বিতীয় পর্ব্ব। প্রকৃতপক্ষে ১৮৬০ সনের পূর্ব্বেই তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইয়াছিল, তবে ঐ বৎসর হইতে তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রকাশ্য পরিচয় পাওয়া যায়। এই সনেই মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে তিনি "Young Bangal, This is for you" নামে *Tracts for the Times* সিরিজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন। এই সিরিজে প্রকাশিত তেরোখানি পুস্তিকা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার মতে চারিত্রিক উৎকর্ষসাধন এবং জীবন্ত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জাতিগঠনের প্রধান উপায়; কোনও দেশ বা জাতি তথা সমগ্র মানবজাতি ধর্ম্ম ও চরিত্রকে অবলম্বন না করিলে উন্নত হইতে পারে না। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই মূল বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন—কোনও বিষয়ে কোনও সময়ে এই আদর্শ হইতে একতিলও বিচ্যুত হন নাই। ১৮৬০ সনেই কেশবচন্দ্র তাঁহার অন্তরঙ্গ সহযোগীদের লইয়া "সঙ্গত সভা" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার আলোচনাদির ভিতর দিয়া তাঁহারা এই কথাই ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পান যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সত্যে, প্রেমে এবং পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, তাহা হইলেই সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র জাতির মধ্যে এই সকল গুণ অর্শিবে।

কেশবচন্দ্রের জাতিগঠনের প্রধান উপাদান ধর্ম্ম ও চরিত্র। জাতিগঠনের দ্বিতীয় সোপান জাতির ঐক্যবোধ। আমাদের একতাবোধের প্রধান অন্তরায় জাতিভেদ। ইহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম সর্ব্বপ্রথমে কেশবচন্দ্র আরম্ভ করেন। ১৮৬২ সনে প্রথম এবং ১৮৬৪ সনে দ্বিতীয় অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কেশবচন্দ্র এক-যোগে বালবিধবাদের প্রতি অবিচারের এবং জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। যদি ভারতবর্ষকে এক করিতে হয় তবে প্রথমেই ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদবৈষম্য দূর করিতে হইবে। এই বিষয়েই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার অনৈক্য উপস্থিত হয়। মহর্ষিদেব উপাসনালয়ে বেদীতে বসিবার অধিকার কেবলমাত্র উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে দিলেন, ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে দিলেন না। কেশবচন্দ্র ইহার প্রতিবাদ করিলেন এবং সকল বর্ণেরই উপাসনার বেদীতে বসিবার অধিকার আছে, এই দাবী গ্রাহ্য না হওয়াতে তাঁহাকে সদলে মহর্ষিদেবের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিতে হইল। উপাসনালয়ে শূদ্রের উপাসনা করিবার অধিকার লইয়া প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে যে সংগ্রাম কেশবচন্দ্র সুরু করিয়াছিলেন তাহাই ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতব্যাপী

অস্পৃশ্যদের মন্দিরপ্রবেশ ও পূজার অধিকার লাভ সম্পর্কিত আন্দোলনে।

ইদানীং অস্পৃশ্যতার উপর অতিরিক্ত জোর দিয়া হিন্দু-সমাজকে এক করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যুক্তি এই যে, বর্ণাশ্রমে দোষ নাই, কেবল অস্পৃশ্যতা দূর হইলেই হইল। এইরূপ জোড়াতালি দিয়া সমাজকে এক করিবার চেষ্টা পণ্ড হইতে বাধ্য। উচ্চনীচ ভেদ রহিল, সকল মানুষকে সমান হইতে দেওয়া হইল না—ইহাতে সাম্য আসিতে পারে না। কেশবচন্দ্র জোড়াতালির পথে যান নাই, কারণ তিনি জানিতেন যে ইহাতে জাতিগঠনকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। এই জাতিভেদরূপ পাপ সমাজ হইতে দূর করিবার জন্য তিনি অসবর্ণ বিবাহ তো সমর্থন করিয়াছিলেনই, উপরন্তু আন্তর্জাতিক (Inter-racial) বিবাহেও তাঁহার পূর্ণ সম্মতি ছিল। যাহাতে এই সকল বিবাহ আইনসঙ্গত হয়, তাহার জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টকে দিয়া ১৮৭২ সনে নূতন বিবাহবিধি প্রবর্ত্তন করাইয়া গিয়াছেন। এই বিবাহবিধিতে জাতিভেদের নামগন্ধ নাই, সকল দেশের সকল বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ এই বিবাহবিধির সাহায্যে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে। সকল জাতি বর্ণকে এক করিয়া এক মহাজাতি-গঠনের যে বিরাট্ একটি পরিকল্পনা কেশবচন্দ্রের মনে ছিল তাহা ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়। বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে যে সকল অসবর্ণ বিবাহ হইতেছে তাহার প্রায় সবগুলিই কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত এই বিবাহবিধি অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে।

অস্পৃশ্যদের স্পর্শদোষ দূর করিয়া হিন্দু সম্প্রদায়ে রাখিবার একটি উপায় বাহির করা হইয়াছে—তাহাদের 'হরিজন' আখ্যা দেওয়া। ইহাতে কি লাভ হইয়াছে তাহা বুঝা কঠিন। কারণ জাতিভেদ-বর্জ্জন মনোভাব পরিবর্ত্তনের উপরেই মূলতঃ নির্ভর করে, যদি সে পরিবর্ত্তন মনে না আসে তো কেবল নামে কিছু আসে যায় না। যত দিন জাতিভেদ সমূলে উৎপাটিত না হইবে তত দিন পর্য্যন্ত ভারতবাসী এক জাতি হইতে পারিবে না, তাহাদের সমাজে 'কাটল' সব সময়েই থাকিবে।

ভারতের মহাজাতি গঠনে সকল প্রদেশের যোগাযোগ, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া একতাবোধ আনিয়া দিবার সূচনা দেখিতে পাই কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রচারের উদ্যমে। ১৮৬৪ সনে, মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে গিয়া তিনি ধর্ম্ম, নীতি, দেশের কল্যাণ, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ে বক্তৃতা ও উপদেশাদি প্রদানপূর্ব্বক ঐ সকল অঞ্চলের অধি-বাসীদের হৃদয়ে নব প্রেরণার সঞ্চার করেন। মাদ্রাজবাসীরা তাঁহাকে "The Thunderbolt of Bengal' নামে আখ্যাত করিয়াছিল। জাতীয় জীবনকে ধর্ম্ম ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নূতন আদর্শের সূত্রে গ্রথিত করিয়া জাতিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বার বার এই প্রকার 'প্রচার-যাত্রায়' বাহির হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্য-প্রদেশ এবং বোম্বাই পরিভ্রমণ করেন। ইহাতে বাংলার সঙ্গে ঐ সকল প্রদেশের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ সংস্থাপিত হয় এবং আন্তঃপ্রাদেশিক সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়; সমস্ত ভারতে একতাবোধ জাগ্রত হইতে থাকে।

এই সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার আদর্শ কেশবচন্দ্রের মনে জাগরূক থাকিয়া ভিতরে ভিতরে কাজ করিতেছিল। ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ যে দেশকে খণ্ডিত এবং দুর্ব্বল করে তাহা তিনি জানিতেন। তাই তাঁহার কর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতেই ধর্ম্মসমন্বয়ের আদর্শ তাঁহার চরিত্রে দেখিতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের সারমর্ম ও ধর্ম্মানুভূতি গ্রহণ করিবার মনোবৃত্তি তখন হইতেই তাঁহার ছিল। ১৮৬৪ সনে নভেম্বর মাসে তিনি দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় ত্যাগ করেন। ১৮৬৫ সনে "ব্রাহ্মবন্ধু সভার" একটি বিশেষ অধিবেশনে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান এই তিন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করা হয় এবং উপস্থিত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলাগণ পোপের 'সার্ব্বজনীন প্রার্থনা' (Universal Prayer) পান করেন। ইহা একটি অভিনব অনুষ্ঠান, কারণ সকল ধর্ম্মকে সমান মর্য্যাদা দান করিয়া ধর্ম্মসমন্বয়ের ক্ষেত্র এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলনভূমি সর্ব্বপ্রথমে কেশবচন্দ্রই এই ভাবে প্রস্তুত করেন। মাত্র কিছুকাল আগে মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনাসভায় হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান এই তিন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে নির্ব্বাচিত অংশ পাঠ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—আচার্য্য কেশবচন্দ্র ইহা আরম্ভ করেন প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে। ১৮৬৬ সনে কেশবচন্দ্র বিভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে পাঠ সঙ্কলন করিয়া 'শ্লোকসংগ্রহ' প্রকাশিত করেন; ক্রমে বৌদ্ধ, শিখ, ইহুদী, জরথুস্ত্রীয় এবং চৈনিক ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নির্ব্বাচিত অংশসমূহ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার ভিতরে ছিল ভারতীয় জাতিসংগঠনের এবং সমগ্র মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির উচ্চস্তরে উন্নীত করিবার মহান্ আদর্শ। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মসমন্বয়ের বাণী এই সময় হইতে চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ অভিনব ও গভীরতর তাৎপর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে।

সকল প্রদেশের সঙ্গে আদর্শে এবং ভাবে যুক্ত হইয়া তিনি স্বতঃই দেশের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিলেন এবং বিভিন্ন ধর্ম্ম-মণ্ডলী ও শাস্ত্রকে গ্রহণ ও স্বীকার করায় হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষে কথা বলিবার নৈতিক অধিকার তাঁহার জন্মিল। এই অধিকারের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই তাঁহার ১৮৬৬ সনের "Jesus Christ: Europe & Asia" নামক বিখ্যাত বক্তৃতাতে। ২৮ বৎসরের যুবক কেশবচন্দ্র

এশিয়াবাসীর প্রতি ইউরোপের ঘৃণা, অবিচার এবং অত্যাচারের কথা আলাময়ী ভাষায় ব্যক্ত করিলেন এবং দৃপ্তকণ্ঠে প্রাচ্যের গৌরব ঘোষণা করিলেন। কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কেহ এমন ভাবে এশিয়া এবং ভারতকে আধুনিক জগতে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পান নাই।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে, বিলাত গমনের পূর্ব্বে কেশবচন্দ্রের জাতিগঠন-প্রচেষ্টার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি ১৮৭০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বিলাতযাত্রা করেন এবং অক্টোবর মাসে প্রত্যাগমন করেন। সমগ্র ভারতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের তথা সমগ্র এশিয়ার আধ্যাত্মিকতার সারবার্ত্তা বহন করিয়া তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন এবং বিলাতে যে বাণী তিনি প্রচার করেন তাহা সমগ্র প্রাচ্যের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মর্ম্মবাণী।

দেশে প্রত্যাগমনের পর কেশবচন্দ্রের জাতিগঠন-পরিকল্পনা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৮৭০ সনে, ২রা নভেম্বর, তাঁহার উদ্যোগে Indian Reform Association নামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, 'দেশের সামাজিক এবং নৈতিক উন্নয়ন।' এই কয়েকটি বিভাগে ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়:

১। নারীদের উন্নতি; ২। সাধারণ এবং কারিগরী শিক্ষা (Technical Education); ৩। দরিদ্রদিগের জন্য সুলভ সাহিত্য-প্রচার; ৪। মাদকতা নিবারণ; ৫। বিপন্নদের সাহায্য।

এই বিভাগগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় কেশবচন্দ্রের জাতিগঠনের পরিকল্পনা তখন কিরূপ বহুমুখী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ও দরিদ্রদিগের অবস্থার উন্নয়নের জন্য কেশবচন্দ্রের আন্তরিক ব্যাকুলতা। এই পরিকল্পনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফল এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক 'সুলভ-সমাচার'। ১৮৭০ সনে নভেম্বর মাসে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হয়। সহজ ভাষায়, সাধারণ লোকের উপযোগী, জাতি-গঠনের পরিকল্পনামূলক নানা প্রবন্ধে পরিপূর্ণ 'সুলভ সমাচারে'র প্রকাশ কেশবচন্দ্রের একটি স্মরণীয় কার্য্য। 'কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্রবাণী' পুস্তিকায় সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে ইহা স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দরিদ্র এবং সমাজের অবনত ও লাঞ্ছিতদের উদ্বুদ্ধ করিতে যে চেষ্টা 'সুলভ সমাচার' সে-যুগে করিয়াছিল তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। বর্ণে বর্ণে বিভেদ যেমন জাতিকে এক হইতে দেয় না, ধনী-দরিদ্রের ভেদবৈষম্যও তেমনই দেশবাসীকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। সেই বিভেদ দূর করিবার সুস্পষ্ট এবং কার্য্যকরী ইঙ্গিত আজ হইতে ৭৭ বৎসর পূর্ব্বে 'সুলভ সমাচারে'র, ১৮৭১ সনের ২৯শে আগষ্টের সংখ্যায়, "বড়লোক" নামক প্রবন্ধে আমরা দেখিতে পাই। গণ-মানসকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে এমন ভাবে আর হয় নাই। আবার "ভারতবাসীদের মধ্যে একতালাভের উপায় কি?" প্রবন্ধে কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, হিন্দী ভাষাকে ভারতের সর্ব্বজনগ্রাহ্য ভাষা করিতে—উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষের একতাসাধন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার কথা বলেন নাই। রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় ইহার পরে এই মত প্রকাশ করেন, কিন্তু কেশবচন্দ্রই জাতিগঠন পরিকল্পনায় ইহাকে সর্ব্বপ্রথমে স্থান দেন। যখন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কলিকাতায় আসেন তখন কেশবচন্দ্র তাঁহাকে এই পরামর্শ দেন, তিনি যেন ভারতবর্ষের সকলের বোধগম্য করিবার জন্য সংস্কৃতে ধর্ম্মপ্রচার না করিয়া হিন্দীতে করেন। স্বামী দয়ানন্দ এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তখন হইতে হিন্দীতে আর্য্যসমাজের আদর্শ ও বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কেশবচন্দ্র নিজেও বাংলার বাহিরে কখনও কখনও হিন্দীতে বক্তৃতা করিতেন।

এই গণচেতনার উদ্বোধনের মধ্যেও দরিদ্রদের পক্ষে উন্নত হইবার আকাঙ্ক্ষায় সংযত প্রচেষ্টা এবং চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যে একান্ত প্রয়োজন কেশবচন্দ্র সেকথা বলিতে ভুলেন নাই। অসংযত, হানিকর উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে গা ভাসাইতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন এবং যাহাতে সুরাপানে আসক্ত হইয়া দরিদ্র লোকেরা নিজেদের সর্ব্বনাশকে না ডাকিয়া আনে তাহার জন্য মাদকতা নিবারণ আন্দোলনে উৎসাহের সহিত যোগ দেন। পরে এই আন্দোলনের নেতা হইয়া সারাজীবন গবর্ণমেণ্টের সহিত মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের আয় লইয়া তুমুল বাদানুবাদ করেন। বিলাতে অবস্থান কালে এই বিষয়ে সেখানকার কর্তৃপক্ষের আচরণের যে কঠোর সমালোচনা তিনি করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ধর্ম্ম ও চরিত্র—এই দুইটিকে ভিত্তি করিয়া কেশবচন্দ্র জাতিগঠনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ ধর্ম্ম ও চরিত্রকে রাজনীতির বহির্ভূত এবং গঠনমূলক কর্ম্মের সহিত সম্পর্কশূন্য বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে চরিত্রগঠনের মূল্য কতখানি তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। এই যে আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা—অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু অগ্নিমূল্য—এ সকলের প্রধান কারণ 'চোরা কারবার', এবং 'ঘুষের কারবার'; কিন্তু এই চোরা কারবারী ও ঘুষখোর কাহারা? যাহারা অসাধু প্রকৃতি এবং স্বার্থপর। চোরাকারবারী এবং ঘুষখোরকে শাসন বা দমন করিবে কে? ইহার প্রতিকার কোথায়? যতই নূতন আইন করা হোক

না কেন, ইহারা আত্মরক্ষা করিবার জন্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিবে। সুতরাং দেশকে উন্নত করিবার প্রকৃত পন্থা দেশবাসীর চরিত্রগঠনে এবং লোককে সৎ ও নিঃস্বার্থ হইতে শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে। এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই কেশবচন্দ্র দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর যাবৎ জাতীয় চরিত্রের আমূল সংস্কারে প্রবৃত্ত ছিলেন।

ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ যে কেশবচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ক্রমে ক্রমে গভীরতর আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিয়া তিনি দেখিলেন যে সকল ধর্মই সত্য। ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৮১ সালে ২৩শে অক্টোবরের 'Sunday Mirror' পত্রিকায় তিনি লিখিলেন, "Not that there aro tiuths in every reli.iou but all religions are true," অর্থাৎ, "প্রত্যেক ধর্ম্মেই যে কিছু কিছু সত্য আছে, তাহা নহে; সকল ধর্ম্মই সত্য।" ধর্ম্মকে ভারতবাসীদের ও জগতের নানা জাতির প্রগতির মূল ভিত্তি করিবার সঙ্কল্প কেশবচন্দ্রের মনে ছিল? তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক আদর্শে পৃথিবীর সমস্যাগুলির সমাধান করিতে না পারিলে কখনও স্থায়ী মীমাংসা হইবে না। কেবল ভারতবর্ষকে কেন, সমগ্র মানবজাতিকে একতাবদ্ধ করিবার ইহাই একমাত্র মন্ত্র—"One World" বা অখণ্ডজগৎ এই ধারণার ইহাই এক মাত্র ভিত্তি। বর্ত্তমানের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই এখন এই কথাই স্বীকার করিতেছেন যে, বর্ত্তমান জগতের অশান্তি এবং দুর্গতির কারণ আধ্যাত্মিক বিকার। তাঁহারা দেখিতেছেন যে, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উৎকর্ষ ভিন্ন আণবিক বোমার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আর অন্য কোনো উপায় নাই। গান্ধীজীও বলিয়া গিয়াছেন, "All religions are equally true," অর্থাৎ "সকল ধর্ম্মই সমান ভাবে সত্য।"

প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র জাতিগঠনের যে পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও পরিপূর্ণভাবে কার্য্যকরী হয় নাই। তাঁহার পরিকল্পনা কিন্তু তখন যেমন ছিল আজও তেমনি সত্য। তাঁহার মধ্যে জাতি-বিদ্বেষ ছিল না। গতানুগতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে না গিয়া কেশবচন্দ্র একেবারে মূল ভিত্তি হইতে জাতিগঠনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়া যদি আমরা জাতীয় চরিত্র গঠনের দিকে মনোযোগ দিতাম, তাহা হইলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে দুর্নীতির প্রসার আজ দেখিতেছি, তাহা সম্ভব হইত না। অপিচ কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মসমন্বয়ের আদর্শ গ্রহণ করিয়া যদি হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইত, তাহা হইলে এই দুই সম্প্রদায় আজ রাজনীতির ক্ষেত্রে হিংস্র, রক্তক্ষয়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ না হইয়া পরস্পরের সহযোগী হইত, ভারতবর্ষ এই ভাবে বিখণ্ডিত হইত না, সহস্র সহস্র হিন্দু ও মুসলমান নিহত হইত না, লক্ষ লক্ষ নরনারী লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং বাস্তুত্যাগী সর্ব্বহারা হইয়া আজ পথে আসিয়া দাঁড়াইত না।

ভারত ও পাকিস্থান

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

যাহারা মনে করিয়াছিলেন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্থান ভারতের সাহায্য ব্যতিরেকে এক বৎসরও চলিতে পারে না, তাহাদের সহিত আমার মত মিলে নাই। পৃথিবীতে এমন অনেক স্বাধীন দেশ আছে যেগুলি পাকিস্থান অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র, জনসংখ্যায় লঘিষ্ঠ এবং প্রাকৃতিক সম্পদে হীন। জনাব জিন্না সাহেব বলিতেন, আকারে এবং জনসংখ্যায় পাকিস্থান পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পঞ্চম এবং মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী। প্রকৃতপক্ষে ২,৩৩,১০০ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এবং ৬ কোটি ৫৬ লক্ষ লোকের বাসভূমি যে একটি অচল রাষ্ট্রে পরিণত হইতে থাকিবে সে কথা জনাব জিন্না সাহেবের মত বিচক্ষণ লোক বুঝিতে পারেন নাই, তাহা সম্ভব নহে।

পাকিস্থানের নানারূপ সুবিধা রহিয়াছে, তাহার কথা ভাবিয়া দেখা দরকার। স্বাধীন রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়া সমুদ্রের সহিত যোগাযোগ রাখিবার জন্য উপযুক্ত বন্দরের প্রয়োজন। এই সমুদ্রের জাহাজাদি চলাচলের দিকে পথ পাইবার জন্য জার্ম্মানী কি চেষ্টা, কি অর্থব্যয় করিয়াছে, কত অনর্থ ঘটাইয়াছে তাহা সুবিদিত। পাকিস্থানের প্রধান বন্দর করাচী। ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল সিন্ধী অমুসলমান ব্যবসায়ীর দল। ভারত বিভাগের পূর্ব্বে বোম্বাই বন্দর থাকা সত্ত্বেও করাচী বন্দরে প্রায় চল্লিশ কোটি টাকার মাল ওঠা-নামা করিত। প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধায় করাচীকে জগতের একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পশ্চিম পাকিস্থানের সমস্ত রপ্তানীযোগ্য কাঁচা-

মাল—বিশেষতঃ তুলা, পশম, চামড়া, হয়ত বা কিছু খাদ্যশস্য, লবণ প্রভৃতি বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য রপ্তানীর বিশেষ সুযোগ এখানেই রহিয়াছে। পূর্ব্বপাকিস্থানের প্রধান সম্পদ পাট। ভারতবর্ষে যত পাট হইত তাহার শতকরা ৭৩ ভাগ পড়িয়াছে পাকিস্থানে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে। পাকিস্থানের পক্ষে তুলা ও পাট পাওয়ায় আয়ের একটি প্রধান পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাট আবার ভারতবর্ষের সামান্য অংশে হয়, সর্ব্বত্র হয় না। পাকিস্থানে উৎপাদিত পাটের অধিকাংশ রেল, ষ্টীমার বা নৌকাযোগে কলিকাতায় বিক্রয়ের জন্য পাঠাইতে হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৪১,৯৫,০০০ গাঁইট পাট এই ভাবে আসিয়াছে। বাকী পাট লইয়া তাহাদের বিব্রত হইবার কথা। কিন্তু পূর্ব্বপাকিস্থানে চট্টগ্রাম বন্দর রহিয়া গিয়াছে। চট্টগ্রাম বন্দর এখনও খুব উন্নত নয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যখন মনে করা যায় যে ৭,৬৪,০০০ গাঁইট পাট রপ্তানীর পক্ষে তাহা এখনই উপযোগী তখন তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করা চলে না। তাহার উপর চট্টগ্রামে একটি সুবৃহৎ বন্দর স্থাপনের জন্য এবং তাহার বিনিময়ে বিনা বাধায় পাট পাইবার আশায় ইংরেজ-আমেরিকান ধনিকেরা খুব উৎসাহ দেখাইতেছেন। কাঁচা পাট পাওয়ার সুবিধা ছাড়া তাঁহাদের নিয়োজিত মূলধনের উপর বন্দরের খাতে মোটা লভ্যাংশ পাইবার আশাও বর্ত্তমান।

পাটের পরই তুলার কথা। এখানেও পাকিস্থানের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বিদেশে তুলা রপ্তানী করিয়া ভারতের মোটা আয় ছিল, এখন পাকিস্থান তাহার শতকরা ৪০ ভাগ পাইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে আনুমানিক ৯,০০,০০০ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পশমের ক্ষেত্রেও পাকিস্থানের সুবিধা, কারণ পঞ্চনদ ও তাহার উত্তর পশ্চিমস্থ অঞ্চল পাওয়ায় তাহার বিশেষ সুবিধা হইয়া গিয়াছে। খাদ্যশস্য বিষয়ে ভারত অপেক্ষা পাকিস্থানের সুযোগ-সুবিধা বেশী, কারণ সিন্ধু ও পঞ্চনদের সেচব্যবস্থাযুক্ত সমস্ত জমি পাকিস্থানে পড়িয়াছে। পশু-চর্ম্ম ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। যুদ্ধ-পূর্ব্বে ১৯৩৯-৪০ সালে ইহার মূল্য ছিল ৬ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। ইহার অধিকাংশই আজ পাকিস্থানের সম্পত্তি। ভারতের সহিত পাকিস্থানের যে লেনদেন চুক্তি হইয়াছে তাহাতে পাকিস্থান হইতে অন্ততঃ ৪০ লক্ষ খণ্ড চামড়া না লইলে ভারতের বিশেষ অভাব থাকিয়া যায়। পাকিস্থান হইতে অন্ততঃ বিশ লক্ষ মণ লবণ না পাইলে ভারতের অভাব মিটিতে পারে না।

পাকিস্থানের অভাব আছে অনেক এবং কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে গুরুতর পরনির্ভরতা বর্ত্তমান। কাপড়, কয়লা, লোহা, সিমেণ্ট, চিনি প্রভৃতি দ্রব্যাদি পাকিস্থানকে হয় ভারত, না হয় অপর দেশের নিকট কিনিয়া লইতে হইবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পাকিস্থান অত্যন্ত পিছাইয়া আছে।

ভারতবর্ষের আজ যে অবস্থা তাহাতে মারাত্মক হইতেছে খাদ্যাভাব; তাহার পর পাট। অন্যান্য বিষয়ে পাকিস্থান অপেক্ষা ভারতের অবস্থা অনেক ভাল। পেট্রোল ও কেরোসিনের জন্য ভারত এবং পাকিস্থান উভয়েই পরমুখাপেক্ষী। ভারতবর্ষের এইখানে বিষম অসুবিধা। যাহাদের খাদ্য কিনিতে বৎসরে ১২০ কোটি টাকা, পেট্রোল কিনিতে ৪০ কোটি টাকা অপরকে দিতে হয়, তাহার পক্ষে নিজের প্রয়োজনীয় অপরাপর বহু দ্রব্য রপ্তানী করিতে না পারিলে চলে না। জাতির পক্ষে ইহা মহা অকল্যাণের অবস্থা।

নূতন শিল্প সংস্থানে ভারত ও পাকিস্থানের একই অবস্থা; কলকব্জা ও দক্ষ লোক বা বিশেষ জ্ঞানের জন্য সম্পূর্ণরূপে পরের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। তৃতীয় মহাসমরের যে আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে আমেরিকা, ইংলণ্ড সমস্ত লোহা, তামা প্রভৃতি দিয়া যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে ভারত পাকিস্থানকে যে সাহায্য করিতেছে বা করিবার আশ্বাস দিতেছে, তাহা ব্যর্থ বচন মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। তাহা হইলেও পাট এবং কতক পরিমাণে তুলা, পশম ও কাঁচা চামড়ার জন্য পাকিস্থানের উপর নির্ভর করিতে হইলেও, ভারত কাঁচা মালের ক্ষেত্রে পাকিস্থান অপেক্ষা অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছে। পাট ও তুলার ফলন বৃদ্ধি করা কতকাংশে সম্ভব, পাকিস্থানের যে অভাব তাহা পূরণ করা সহজসাধ্য নহে। সুতরাং যদি বাহির হইতে যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় অথবা যথাসম্ভব এখানে তৈয়ারী করিয়া লইবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে পাকিস্থান অপেক্ষা ভারতের সুযোগ অনেক বেশী হইবে।

এক ভৌগোলিক সীমার মধ্যে এতকাল থাকিয়া হঠাৎ ভারত বিভাগ হওয়ায়, মনের দিক দিয়া যাহাই হোক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে দুই পক্ষই বিশেষ বিব্রত ও চিন্তিত। বাংলা বিভাগ অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ দুই ডোমিনিয়নে এক 'সংসারে'র লোক বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং হয়ত রাষ্ট্রপতিদের আদেশে ভাইয়ের বিপক্ষে ভাইকে দাঁড়াইতে হইতে পারে।

পশ্চিম-পঞ্চনদে হিন্দু বা শিখ এবং পূর্ব্ব পঞ্চনদে মুসলমান নাই বলিয়া শোনা যাইতেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হিন্দুশূন্য হইলেও, সিন্ধুতে এখনও দুই লক্ষের উপর অমুসলমান রহিয়াছে। সে হিসাবে পূর্ব্বপাকিস্থানের অবস্থা

সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে অল্পপরিসর স্থানের মধ্যে সোয়া এক কোটি হিন্দু রহিয়াছে। আর সমগ্র ভারতে রহিয়াছে প্রায় সোয়া চার কোটি মুসলমান।

ধর্মের ভিত্তিতে জনাব জিন্না সাহেব ভারত বিভাগ করিয়া তাঁহার সধর্মীদের বেশী উপকার করিলেন কিনা এখনও বুঝিতে পারা যায় না। লোক বিনিময়ের কথা প্রথমে খুব জোর গলায় বলিবার পর শেষে স্ব-সম্প্রদায়ের লোকেদের দুর্দশা দেখিয়া সেই মত শেষে তাঁহাকে পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। বর্তমান অবস্থায় আমরা যদি দেড় কোটি অমুসলমানকে স্থান দিতে রাজী হই, তাহা হইলে পাকিস্থানকে সোয়া চার কোটি মুসলমানকে আশ্রয় দিতে হয়।

এ অবস্থা মুসলমানেরা মর্মে মর্মে বুঝিয়াছে, সুতরাং আর "লোক বিনিময়" বুলি আওড়ায় না। এখন চায় কি ভাবে হিন্দু বিতাড়ন করিয়া তাহাদের ধনসম্পত্তি, জমিজেরাৎ মনের সুখে ভোগ-দখল করিতে পারে। তাই আজ প্রকাণ্ড দাঙ্গা-হাঙ্গামার বহর অনেক কমিয়াছে, এখন হাতে না মারিয়া ভাতে মারিবার ব্যবস্থা হইতেছে। লোকেরা সদাসর্বদা অত্যাচারের ভয় দেখাইয়া রাখে, অত্যাচার করে না; স্ত্রীলোকদের অপহরণ করা অপেক্ষা বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইয়া আতঙ্কগ্রস্ত রাখে; পথে ঘাটে হিন্দু স্ত্রীলোক দেখিলে, গায়ে হাত দেয় না, মুখভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী করে, অশ্লীল গান করে, নানাপ্রকার অভদ্র ইঙ্গিত করে। জমি-পুকুর দখল করে না, গরু চুরি করে না, ফসল, মাছ ইত্যাদি প্রকাশ্য ভাবেই লয়; উঠান হইতে দুধ দোহন করিয়া লইয়া চলিয়া যায়। মানী লোকেদের ইচ্ছা করিয়া অসম্মান করে, ঘরে দালানে বসিয়া আত্মীয়স্বজনের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবার সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক হঠাৎ আসিয়া নিকটে বসিয়া আত্মীয়তা প্রকাশ করে, সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক ভয়ে উঠিয়া পালায়, পুরুষরা বিব্রত হইয়া স্থান ত্যাগ করে। ইহাতে কোনও দোষ নাই বলিয়া "কর্তা"কে বুঝাইতে চেষ্টা করে। এরূপ উদাহরণের অভাব নাই।

জিন্না সাহেবের হয়ত লক্ষ্য ছিল, ঘর সামলাইয়া উঠিতে পারিলে তিনি একবার মুসলমান সম্রাটদের রাজধানী দিল্লী-আগ্রার দিকে মুখ ফিরাইবেন। প্রত্যক্ষভাবে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সরাসরি পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া আফগানিস্থান, ইরাণ, ইরাক, আরব, সিরিয়া, তুর্কী, মিশর প্রভৃতি যাবতীয় মুসলমান রাষ্ট্রকে একসূত্রে আবদ্ধ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেন। পাকিস্থান পাইলে এই সুযোগ ঘটিবে বলিয়া তিনি ভারত বিভাগে উদ্যোগী হন এবং শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজের সহায়তায় সফলকাম হন।

ভারতবর্ষকে শান্তি দিবার কথা তাঁহার মনে হইলে তিনি বিশেষ অশান্তি ভোগ করিতেন। ভারতবর্ষকে বিব্রত রাখিতে পারিলে পাকিস্থানের কি সুবিধা হইবে, তাহা তিনিই জানিতেন। আর কিছু না হইলেও ভারত ঘর সামলাইতে ব্যস্ত থাকিলে তিনি বিভিন্ন জাতির সহিত সখ্য স্থাপনপূর্ব্বক পাকিস্থানের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও পাকিস্থানের কুক্ষিগত করিতে পারিবেন, ইহাই হয়ত ছিল তাঁহার মনোগত আশা। তিনি এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। আফ্রিদী, ওয়াজিরি, মাসুদ, মোহমন্দ লুঠেরা ছাড়িয়া দিয়া ভারতের সহিত যুক্ত কাশ্মীর রাজ্যকে আক্রমণ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে গোপনে, পরে প্রকাশ্যে পাকিস্থানী সৈন্য ও রণসম্ভার দিয়া আক্রমণকারীদের সাহায্য করা হয়।

তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবস্থা এইরূপ ছিল। পাকিস্থানীদের মতিগতি যেরূপই হউক, ভারতের পক্ষে এই বিভাগ অত্যন্ত বেদনাদায়ক হইলেও গৃহীত চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্থানকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করিয়া বন্ধু প্রতিবেশী হিসাবে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার ইচ্ছা ভারতের ছিল এবং এখনও রহিয়াছে।

পণ্ডিত জবাহরলাল সত্যই বলিয়াছেন, পাকিস্থান এখন মিলিতে চাহিলেও তিনি তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত নন। ভারতবাসী সকলেরই এই এক মত। যত দিন না পাকিস্থান নিজ উগ্র স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিয়া একত্রীভূত হইতে চায়, তত দিন তাহাকে গ্রহণ করিয়া লাভ নাই। কিন্তু বন্ধুভাবে থাকিবার প্রস্তাব যে অত্যন্ত সমীচীন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জিন্না সাহেবের মৃত্যুর পর এই কথা একবার ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিষয়ে ভারত ও পাকিস্থান পরস্পরের নির্ভরতার কথা প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশে উল্লেখ করা হইয়াছে। এক বৎসরের অধিক যখন চলিয়াছে, তখন ভবিষ্যতে খুব অসুবিধা হইলেও হয়ত কোনও রকমে চলিয়া যাইবে। কিন্তু যেখানে একই পরিবারের লোক ভিন্ন ভিন্ন অংশে পড়িয়াছে, যেখানে দৈনন্দিন ব্যাপারে পরস্পরের যোগাযোগ, যেখানে একই ভাষা, একই ভাব, জীবন ধারণের রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ এক, সেখানে ব্যবধান সৃষ্টি করিলে অনেক অসুবিধাই জনসাধারণকে ভোগ করিতে হয়। সেইজন্যই দুই রাষ্ট্রে সম্প্রীতি থাকা উচিত। তাহা হইলে রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া ভারত বিভাগের পূর্ব্বে যেমন ছিল সেইরূপ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা, যানবাহন ও মাল চলাচল, মুদ্রার মান এক রাখিয়া চলিলে সকল দিক বজায় থাকে।

এখন সকলের চেয়ে বড় প্রশ্ন হইতেছে, পাকিস্থান কালে ভারত দখল করিবার বাসনা মনে মনে পোষণ করে কি না। এই প্রশ্নের উত্তর কি হইতে পারে তাহা বিবেচনা করা যাক।

যদি ভারত আক্রমণের বাসনা থাকে, তাহা হইলে পাকিস্থানের অধিবাসীদের মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া রাখিতেই হইবে। সেই বিদ্বেষকে জীয়াইয়া রাখিতে হইলে মুসলমান ধর্মের উপর অত্যাচার হয়, মুসলমান স্বার্থের হানি করা হয়, ভারতের মুসলমানদের প্রতি অবিচার, অত্যাচার হয়, ভারত পাকিস্থান দখল করিতে চায়, এই সকল ভাব পাকিস্থানের মুসলমানদের মনে জাগরূক রাখিতে হইবে। ইহারই অনুরূপ কথা জগতের অপর মুসলমান জাতিদের মধ্যেও প্রচার করা প্রয়োজন। পাকিস্থানের ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হয় তাহারা ভারতের সহিত সংগ্রাম চায়। তাহা না হইলে এতদিন ভারত যে সৎ ব্যবহার পাকিস্থানের প্রতি করিতেছে, তাহাতে উহার মতি-গতির পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয় নাই।

এখনও বোধ হয় সময় আছে, বন্ধুভাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে থাকিয়া কাজ চালাইবার উপায় এখনও আবিষ্কার করার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যে সকল ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্থান সমান স্বার্থে জড়িত—যেমন আত্মরক্ষা, বিদেশে ভারতীয়ের স্বার্থরক্ষা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-নীতি প্রভৃতি ব্যাপারে একযোগে কাজ করিয়া পাকিস্থানের লাট, পাকিস্থানের নোট, পাকিস্থানের বেতার ও বিবৃতি প্রভৃতির বিশেষত্ব বজায় রাখা চলিতে পারে। মনে সদিচ্ছা থাকিলে এ সকল বিষয়ের মীমাংসাও অতি সত্বর হইতে পারে। অপর দিক দেখিতে গেলে ঘোরতর চিন্তার উদ্রেক হয়। ভারতের দুর্দশা আছে সত্য, কিন্তু পাকিস্তানও খুব সুখে আছে বলিয়া মনে করা যায় না। প্রথমে জুনাগড় রাজ্য লইয়া পাকিস্থান খেলা সুরু করিল। ভারতীয় কূটনীতির নিকট পাকিস্থানকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। কাশ্মীর সংগ্রামের ফলে পাকিস্থান বিব্রত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ওয়াজিরি, মামুদ প্রভৃতি এবং পাকিস্থানের পাহাড়িয়া সৈন্যদের বিতাড়িত করিতে ভারতকে বেগ পাইতে হইতেছে। কিন্তু শতকরা ৮৩ জন মুসলমানের দেশ বলিয়া যে কাশ্মীর পাকিস্থানে যোগ দিবে অথবা পাকিস্থান লড়াই সুরু করিলেই কাশ্মীরী মুসলমান কাশ্মীরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া, পাকিস্থানে যোগদান করিবে তাহার লেশমাত্র সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। স্যর ফিরোজ খাঁ নুন যে চেঙ্গিস খাঁ বা নাদির শাহের মত ভারতে বন্যার মত ঝাঁপাইয়া পড়িবার ভয় দেখাইয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

ভারত বিভাগের সময় জিন্না সাহেব ভাবিয়াছিলেন ভারতের তিন কোণে তিনটি খুঁটি পুঁতিয়া রাখিলেন, তন্মধ্যে দক্ষিণে যে হায়দরাবাদ রহিল তাহা একদিন সমস্ত দক্ষিণ ভারত জয় করিয়া উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আগত সৈন্যবাহিনীর সহিত মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার সীমানায় মিলিত হইবে। যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন কাশ্মীরের শতকরা ৮৩ জন অধিবাসী মুসলমান বলিয়া কাশ্মীর পাকিস্থানে যোগ দিবে তাঁহারা একথাটা ভাবেন নাই যে, হায়দরাবাদে শতকরা ৮৭ জন হিন্দু অধিবাসী ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগ দিতে পারে। যাহা হউক, হায়দরাবাদ সমস্যার সমাধান হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, অন্ততঃ পাকিস্থানের সুযোগ-সুবিধা যে থাকে নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

জনাব জিন্না সাহেবেরও এই সময় এন্তেকাল হইয়াছে; পাকিস্থান এখন ভারতের সহিত শত্রু বা মিত্র ভাবে ব্যবহার করিবার চরমক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে।

পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে আজও কেন শত্রুতা পোষণ করিতেছে, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। গোটা পাকিস্থান হইতে অমুসলমান অপসারণের যে চেষ্টা চলিতেছে তাহার দরুন এবং কাশ্মীর হইতে পাকিস্থানী সৈন্যের এখনও প্রত্যাবর্ত্তনের কোনও লক্ষণ না দেখা যাওয়াতে পাকিস্থান যে দিল্লী আগ্রা চায়, উত্তর-ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সহিত যুক্ত হইয়া বিহার উড়িষ্যা দখল করিতে চায়, সেকথা আর অবিশ্বাস করা যায় না।

এই দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া পাকিস্থান যদি আপনার অধিকারে সন্তুষ্ট থাকিয়া রাজ্যশাসন, প্রজার সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভের চেষ্টায় মন দেয়, তাহা হইলে ভারতের সাহায্য পাইয়া জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারে।

ভারতের সহিত যুদ্ধে পাকিস্থানের কতদূর সুবিধা হইবে তাহা সমর-বিশেষজ্ঞদের বিচার্য্য বস্তু। কিন্তু একথা বোধ হয় মনে করা ভুল নয়, প্রতিদিনই প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধের ব্যাপারে ভারতের শক্তিসঞ্চয় হইতেছে। আজ ক্ষুদ্র দুইটি ভূখণ্ড বাদ দিলে আসমুদ্র হিমাচল ভারত একটি বিরাট রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। দেশীয় রাজন্যবর্গ ইংরেজের সহায়তায় এতদিন ক্ষতির কারণ ছিল, বর্ত্তমানে তাহারা ভারতের বন্ধু, সহায়। হায়দরাবাদ-যুদ্ধে বরোদার পদাতিক, ত্রিবাঙ্কুরের অশ্বারোহী ভারতের সৈনিকের পাশে পাশে ছিল। প্রকৃত পক্ষে এ বিষয় লইয়া শ্লাঘা করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান।

ভারতের লোকসংখ্যা এবং আয়তন পাকিস্থানের অন্ততঃ দশ গুণ। তাহার প্রাকৃতিক ও শিল্প-সম্পদ পাকিস্থান অপেক্ষা বিশগুণ বেশী। তাহার উপর পাকিস্থান অমুসলমানদের বিতাড়িত করিয়া ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। বাস্তুত্যাগীরা যে তিক্ততা লইয়া বাস্তু ঘর, সহায় সম্পদ ছাড়িয়া আসিতেছে, যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে তাহারা সেই অনুপাতে তীব্রতা লইয়া পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধ করিবে। তাহার উপর পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধে অমুসলমান অধিবাসীদের কথা ভাবিয়া ভারতীয় ইউনিয়নের যে পথ অবলম্বন করিতে হইত, আজ সমস্ত অমুসলমান পাকিস্থান ত্যাগ করিলে, সে চিন্তার কারণ থাকে না।

অপর পক্ষে ভারতের সীমার মধ্যে সোয়া চার কোটি মুসলমানের বাস। জিন্না সাহেবের উপযুক্ত চেলা সার জাফরুল্লা খাঁ ভারবয়ে বলিলেন, মুসলমান-স্বার্থের কোনও ক্ষতি হইলে হায়দরাবাদ দখল ত তুচ্ছ কথা, ভারতের সোয়া চার কোটি মুসলমান একযোগে, (like one man) ভারতকে ছিন্ন-ভিন্ন, লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবে। হায়দরাবাদে অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সার জাফরুল্লা দেখিয়াছেন যে, মুসলিম লীগের উত্তেজনায় ক্ষিপ্তপ্রায় এবং ইংরেজের কূটবুদ্ধিতে মোহগ্রস্ত মুসলমান, আর ভারতে সর্বস্বার্থ-সংরক্ষিত নির্ভয়ে বাসকারী মুসলমান একই শ্রেণীর মানুষ নয়। হায়দরাবাদ দখল হওয়া পর্যন্ত সারা ভারতে সোয়া চার কোটি মুসলমানের একজনও বিদ্রোহ করে নাই। ইহাতেও কি পাকিস্থানের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে না?

শেষ কথা, পাকিস্থান কি একবার পূর্ববঙ্গের কথা ভাবে না? যদি উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে তাহা হইলে ভারতের সহিত পূর্ববঙ্গের যোগ অচিরকাল মধ্যেই স্থাপিত হইতে পারে। তখন সারা ভারত কেবল উত্তর-পশ্চিমে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলে তাহার যুদ্ধ করা চলিতে পারে। পাকিস্থান যে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের সহায়তা পাইবে তাহাও ত মনে হয় না।

ভারত-পাকিস্থানে সংঘর্ষ বাঁধিলে জয়-পরাজয় যাহারই হউক, উভয় রাষ্ট্রেরই নবলব্ধ স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে, যাহারা যুদ্ধ চাহে না সেই নিরীহ লোকেদের কষ্টের সীমা থাকিবে না। যখন সদ্ভাবে থাকিবার উপায় বর্তমান, তখন পাকিস্থানের পক্ষে সর্বদা রণডঙ্কা বাজাইয়া চলা যে কেবল ভারত ও পাকিস্থানের অমঙ্গলসূচক নয়, সারা বিশ্বের পক্ষেই অকল্যাণকর তাহা মনে রাখা উচিত। পাকিস্থান ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করিয়া সখ্যের পথ, মৈত্রীর পথ অবলম্বন করিতে পারে। এখন পাকিস্থান স্বাধীন, ইহার মধ্যে যে-কোনটি গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা তাহার আছে।

সাম্প্রতিক কবিতা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যকে সর্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। আমাদের ভাব, চিন্তা, আদর্শ সব কিছুর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বর্তমান। তিনি আমাদিগকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিতে ও নূতনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার অনুকরণ করিয়া শক্তিমান্ কবিরাও তাঁহারই প্রবর্তিত ধারার অনুবর্তন করিয়াছেন, স্বকীয়তার পরিচয় দিতে পারেন নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অন্ধ অনুকরণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এই অনুকরণ বেশ কিছু দিন চলিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল—এক দল তরুণ সাহিত্যিক এই গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দিতে ক্ষান্ত হইলেন। নূতন পথ খুঁজিবার জন্ত পথ-সন্ধানীরা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা দেখিলেন, নীলা-সঙ্গিনীর কঙ্কণ-ঝঙ্কার তাঁহাদের মনে তেমন আবেগ-সঞ্চার করিতে পারে না। আকাশ হইতে ধরণী পর্যন্ত যে সৌন্দর্যের ধারা প্রবাহিত তাহারও উৎসমুখ কে যেন আগলাইয়া বসিয়া আছে। মানুষের আর্তনাদ এখন ইলিয়টের সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে—Give us light—light—light। আজ অন্ন নাই, প্রাণ নাই, মুক্ত বায়ু নাই, আছে অতলগর্ভ অন্ধকার। তাই প্রকৃতি-সর্বস্ব বিশ্বচেতনা অথবা রূপাতীত সৌন্দর্যলক্ষ্মী, এ যুগের কাব্যের উপজীব্য হইতে পারে না। এখন সাহিত্যের শিলা-চত্বরে ফুটিতে চায় বিক্ষুব্ধ, বঞ্চিত জনগণের অন্তর্বেদনা। সাম্প্রতিক কবি সখেদে বলেন,

> 'মৃত্যু কেবল, মৃত্যুই ধ্রুব সখা
>
> বেদনা শুধুই, বেদনা সুচির সাথী।'

কালের দিক হইতে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী এবং ভাবের দিক হইতে রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তি-প্রয়াসী কাব্যসমূহকেই অতি-আধুনিক কাব্য বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। আধুনিক বাংলা কবিতা যে আধুনিক ইংরেজী কবিতা দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত তাহা কাব্য-রসিকেরা জানেন। অবশ্য মধুসূদনও বিদেশী ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং সাগরপার হইতে প্রচুর উপকরণও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তবুও তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে এবং বিশেষ ভাবে ব্রজাঙ্গনা কাব্যে বাঙালী জীবনের মর্মকথা ও বাংলার গীতিকাব্যের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যও পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত নহে কিন্তু সেখানেও উপনিষদ আধ্যাত্মিকতা এবং বৈষ্ণব কবিতার প্রেমভক্তি ও ভাবাত্মতার পটভূমিকায় স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তিই প্রকাশমান।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ রবীন্দ্র-সাহিত্যে নাই,

পাশ্চাত্যের ভাবধারাকে আত্মসাৎ করিয়াই তিনি তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টিকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন।

কিন্তু সাম্প্রতিক কবিদের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্নরূপ। ইউরোপীয় কাব্যের উৎকট ভাবধারা আমাদের সাম্প্রতিক কবিতার অনেকখানি জুড়িয়া বসিয়া আছে। সাম্প্রতিক কবিরা ইলিয়ট, এজরা পাউণ্ড, ষ্টিফেন স্পেণ্ডার প্রভৃতির নিকট অকুণ্ঠ ভাবে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। ইহার মূলে রহিয়াছে তাঁহাদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও নূতন রচনা-শৈলীর প্রতি অনুরাগ। প্রচলিত ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গী, ছন্দোবদ্ধ পদ, বিষয়বস্তু, চন্দ্র-জ্যোৎস্না-মলয়-মারুত—এক কথায় যাহা কিছু পুরাতন তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারা অভিনব ভাব ও ভাষায় কাব্য সৃষ্টি করিতে চান। এই নূতনত্বের মোহে তাঁহারা নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং জনগত ও সামাজিক পরিবেশের প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ হইয়া অপরিচিত অথবা স্বল্পপরিচিত সমাজ-জীবন হইতে উপজীব্য গ্রহণ করিতে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছেন। ফলে, তাঁহাদের রচনা অনেক স্থলেই সুস্পষ্ট বা স্বতঃস্ফূর্ত হয় নাই। সেগুলিতে অনাড়ম্বরত্বের ভড়ং আছে, কিন্তু আন্তরিকতা নাই, দুরূহ শব্দপ্রয়োগে বহু স্থলেই তাঁহাদের রচনা দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

যুগে যুগে রুচির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। পোপের যুগের এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুগের রুচি এক নয়। ভারতচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের যুগের রুচি বিভিন্ন। কিন্তু শুচিতা, সংযম, শালীনতা প্রভৃতি পরিহার করিয়া সাহিত্য-রচনায় উন্মার্গগামী হওয়া যে-কোন যুগের কবিদের পক্ষে অপবর্গ-স্বরূপ। সাম্প্রতিক কবিরা অনেকে রিয়ালিজমের নামে কামার্ত্তির বাস্তব রূপ ফুটাইয়া রসোল্লাস সৃষ্টি করিবার যে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাহা প্রশংসনীয় নহে। যৌন আকর্ষণ অস্বাভাবিক নহে; ইহা সাহিত্যের বিষয়বস্তুও হইতে পারে। তবে ইহার একটা সীমারেখা থাকা প্রয়োজন। মানুষ সময় সময় পশু হয়। তাই বলিয়া তাহার ঐ পশুত্বের জয়ঢাক বাজানোতেই সাহিত্যিকের শক্তির অপব্যবহার হওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শই সাহিত্যের পটভূমিকায় পরিপূর্ণ গৌরবে ফুটিয়া উঠা উচিত। মানুষের একটি বিশেষ বৃত্তির বিদ্যুৎস্ফুরণই কাব্যের একমাত্র উপজীব্য নয়। সত্য শিব ও সুন্দরের লীলাক্ষেত্র মানবজীবনের অখণ্ড মহিমাই রসস্রষ্টার নিপুণ তুলিকায় রূপায়িত হওয়া সমীচীন।

সাম্প্রতিক কাব্য হইতে রোমান্টিক ভাবধারা ক্রমেই লোপ পাইবার পথে চলিয়াছে। সুখের বিষয়, বুদ্ধদেব বসু মাঝে মাঝে প্রেমের কবিতা রচনা দ্বারা ঊনবিংশ শতকের রোমান্টিক ভাবধারাকে কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। বিষ্ণু দে এবং তাঁহার অনুগামী কোনো কোনো কবি কিন্তু পতন ছাড়া প্রেমে আর কিছু দেখিতেই পান না। প্রেমেন্দ্র মিত্র মুটে-মজুরের কবি। সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে ভাবুকতা আছে যথেষ্ট, কিন্তু তাঁহার কল্পনা আত্মকেন্দ্রিক এবং নেতিবাচক। 'জন্মাষ্টমী' কবিতা তাঁহার প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। কিন্তু এ ধরণের কবিতা তাঁহার কাব্যে বড় বেশী নাই। সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশভঙ্গী কেমন যেন উদ্ভট ও খাপছাড়া ধরণের। ফলে তাঁহাদের অধিকাংশ কবিতাই দুর্ব্বোধ্য, এবং ঐগুলি হইতে রস আহরণের চেষ্টা করিতে গিয়া পাঠককে নিরাশ হইতে হয়। সাম্প্রতিক কবিতা সম্বন্ধে চরম কথা বলিবার দিন এখনও সুদূরবর্ত্তী। মানব-সভ্যতা আজ অপ্রকৃতিস্থ। হয়ত এই অপ্রকৃতিস্থ সভ্যতার ধূলি-ধূসরিত পটভূমিকাতেই ভাবীকালে ফুটিয়া উঠিবে নূতন সমাজের অরুণ-রেখা। সে সমাজের সাহিত্য তখন কোন অভিনব রূপপরিগ্রহ করিবে, সাম্প্রতিক কবি তখন কোন্ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া কাব্যরচনা করিবেন তাহা বলিবার সময় এখনও আসে নাই।

সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ শক্তিমান্। অল্প পরিসরের মধ্যে তাঁহাদের বাচনভঙ্গীর সুষ্ঠু প্রকাশ বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। ভাব-ঘন, গাঢ়-সংবদ্ধ, অনাড়ম্বর, ইঙ্গিতময় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মননশীল তাঁহাদের রচনা। তাঁহাদের কেহ কেহ দেশ-বিদেশের কাব্য-সাহিত্যের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত। উন্মার্গগামী না হইলে এবং উপযুক্ত সাধনা থাকিলে ইঁহারা বাংলা কাব্যের মরা গাঙে বান ডাকাইতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের ভাস্বর প্রতিভার যুগেও যে সাম্প্রতিক কবিগোষ্ঠী রসিক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

বৌদ্ধ যুগে গান্ধার

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী

গান্ধার অতি প্রাচীন জনপদ। ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার যুগ হইতে এই দেশটি ভারতবর্ষের অখণ্ড অংশরূপে বিরাজিত। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে এই জনপদ ও তাহার অধিবাসীগণের বিবরণ লিখিত আছে। বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের মত বৌদ্ধ সাহিত্যেও বৌদ্ধ-ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ, অবস্থান, নদ-নদী, জনপদ ও তাহার অধিবাসীগণের বিবরণও তদ্রূপ লিখিত আছে। আজ আমরা এই প্রবন্ধে পালি ও বৌদ্ধ সংস্কৃত-সাহিত্যে গান্ধার জনপদের উল্লেখের কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।

পালি সাহিত্য : অঙ্গুত্তর নিকায়

বৌদ্ধ শাস্ত্র বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম্ম এই তিন পিটকে বিভক্ত। সমবায়ে ইহাদের নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথাক্রমে ইহাদের নাম—(১) দীর্ঘ নিকায় (২) মধ্যম নিকায় (৩) সংযুক্ত নিকায় (৪) অঙ্গুত্তর নিকায় (৫) ক্ষুদ্দক নিকায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মসাহিত্যের মধ্যে নিকায় গ্রন্থমালা সুপ্রাচীন এবং প্রামাণ্য। নিকায় গ্রন্থমালার চতুর্থ গ্রন্থ অঙ্গুত্তরে ষোলটি মহা-জনপদের নাম ও উহাদের ভৌগোলিক অবস্থানের উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধ যুগে ভারতবর্ষ মধ্য ও উত্তর দুই অংশে বিভক্ত ছিল। মধ্য চৌদ্দটি এবং উত্তর অংশ দুইটি জনপদে ভাগ করা ছিল।

অঙ্গুত্তরে উল্লিখিত ষোলটি মহা-জনপদের নাম ও সেগুলির ভৌগোলিক সংস্থান এইরূপ—(১) কাশী (২) কোশল (৩) অঙ্গ (৪) মগধ (৫) বৰ্জ্জি (৬) মল্ল (৭) চেদী (৮) বংস (৯) কুরু (১০) পাঞ্চাল (১১) মৎস (১২) শূরসেন (১৩) অশ্বক (১৪) অবন্তি (১৫) গান্ধার (১৬) কম্বোজ।১ এই ষোলটি মহা-জনপদের মধ্যে চৌদ্দটি মধ্যদেশে এবং অবশিষ্ট দুইটি গান্ধার ও কম্বোজ উত্তর-দেশে অবস্থিত।

মহাবস্তু

মহাবস্তু গ্রন্থেও ষোলটি মহা-জনপদের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু উহাদের নাম উল্লিখিত নাই।২ বুদ্ধদেব যে যে দেশে পর্য্যটন করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে সেই সেই দেশের নামের উল্লেখ আছে। এই সকল দেশের সহিত অঙ্গুত্তরে উল্লিখিত মহা-জনপদসমূহের সম্পূর্ণ না হইলেও কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ মহাবস্তু গ্রন্থে গান্ধার ও কম্বোজ জনপদের পরিবর্তে শিবি ও দশার্ণ জনপদের উল্লেখ আছে।৩

১। অঙ্গুত্তর নিকায় প্রথম খণ্ড ২১৩ পৃ; চতুর্থ খণ্ড ২৫২ পৃঃ

২। A Study of Mahavastu, p. 9. B. C. Law.

৩। Geograprical Essays, p. 26, B. C. Law.

দীপবংশ ও মহাবংশ

সিংহলদেশের প্রাচীন ইতিহাস দীপবংশ এবং মহাবংশ। উভয় গ্রন্থই বুদ্ধদেবের সময় প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।৪ মহাবংশ খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে রচিত হয়। মহানামন এই প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থখানি প্রাচীন সিংহলী গদ্যে এবং পদ্যে রচনা করেন।৫ এই উভয় গ্রন্থে বৌদ্ধ ভারতের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম, মধ্য এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ অংশ, দাক্ষিণাত্য ও সিংহলের বহু জনপদের উল্লেখ আছে। দীপবংশে লিখিত আছে যে, থেরা মহ্যন্তিক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য গান্ধার ও কাশ্মীরে প্রেরিত হইয়াছিলেন।৬ বৌদ্ধযুগে গান্ধার ও কাশ্মীর সংযুক্তরাজ্য ছিল। এই যুগে গান্ধার বলিলে গান্ধার ও কাশ্মীর যুক্তরাজ্য এবং তক্ষশীলা রাজ্যকেও বুঝাইত।৭ জাতক গ্রন্থেও ইহার সমর্থনসূচক প্রামাণ্য বিবরণ আছে। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা গান্ধার জাতকের নামোল্লেখ করিতে পারি। সে যাহা হউক, উভয় গ্রন্থ—দীপবংশ ও মহাবংশে গান্ধার জনপদের উল্লেখ আছে এবং উহা উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত।

শাসন বংশ

শাসন বংশ গ্রন্থেও মহা-জনপদ গান্ধারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দীপবংশ এবং মহাবংশের মত শাসনবংশেও লিখিত আছে—থেরা মহ্যন্তিক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য গান্ধার গমন করিয়াছিলেন।৮

দীব্যাবদান

দীব্যাবদান গ্রন্থে লিখিত আছে, যূপকাষ্ঠ মহাপদ্ম কর্ত্তৃক গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইলে চারিজন নৃপতি কর্ত্তৃক উহা ধৃত ও রক্ষিত হয়। গান্ধাররাজ ইলপত্র চারিজন নৃপতির অন্যতম।৯

মিলিন্দ পঞ্‌হো

মিলিন্দ পঞ্‌হো—প্রাচীন প্রামাণ্য বৌদ্ধ গ্রন্থ। ইহা ভিক্ষু-সূত্র নামেও পরিচিত। এই গ্রন্থখানি কোন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ১০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত।১০ গ্রন্থখানির রচনা-

৪। History of Pali Literature, p. 517, B. C. Law.

৫। History of Pali Literature, p. 522, B. C. Law.

৬। Dipvamsa, Oldenberg p. 53.

৭। Political History of Ancient India p. 93 H. C. Roy Chaudhury.

৮। P. T. S. edition p. 12.

৯। Cowee and Nail p. 60-61.

১০। History of Medieval School of Indian Logic p. 61. M. M. S. C. Vidyabhusan.

কাল সম্বন্ধে মতভেদের অভাব নাই। রিস ডেভিস এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বিশদভাবে ইহার আলোচনা করিয়াছেন।১১ এই গ্রন্থখানি উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃত কিংবা উত্তর-ভারতীয় প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়। মূল গ্রন্থের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। প্রথমে ইহা সিংহলদেশে (পালী ভাষায় অনূদিত হইয়া ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশে) প্রচারিত হয়।১২ চীনা ভাষাতেও অনুবাদিত হইয়া "নাগসেন ভিক্ষুসূত্র" নামে পরিচিত হয়।১৩

প্রথোক্ত মিলিন্দ ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজা নামে উল্লিখিত। তাঁহার রাজ্যের সীমা পঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি অলসন্দা (আলেকজেন্দ্রিয়া) নগরে কলসম নামক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভিক্ষু নাগসেন কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। এই গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার যে উত্তর পশ্চিম ভারতের অধিবাসী ছিলেন, ইহা তাঁহার গ্রন্থ হইতে অনুমিত হয়। কারণ এই গ্রন্থে পঞ্জাবের বহু নদনদী ও স্থানের নাম উপর্য্যুপরি উল্লিখিত আছে। শুধু তাহাই নহে, উহার নিকটবর্তী বহু দেশ, বন্দর, সুরাট, ভিরুকচ্ছ প্রভৃতি দেশের নামেরও উল্লেখ আছে।১৪

মিলিন্দ পঞ্‌হো গ্রন্থে সাতাশটি দেশ ও রাজ্যের নামের উল্লেখ আছে। যথা—(১) যবন (২) ভিরুকচ্ছ (৩) চীন (৪) গান্ধার (৫) কলিঙ্গ (৬) কলসা (৭) কুম্ভনগোলা (৮) কাশ্মীর (৯) কোশল (১০) কালা পত্তন (১১) মগধ (১২) মথুরা (১৩) নিকুম্বর (১৪) সগল (১৫) শকেত (১৬) শক দেশ (১৭) সৌভির (১৮) সুরোহ (১৯) বারাণসী (২০) সুবর্ণ দ্বীপ (২১) পাটলীপুত্র (২২) উদ্দিয় (২৩) বঙ্গ (২৪) তিলাত (২৫) একোলা (২৬) উজ্জয়িনী (২৭) গ্রীস। এই গ্রন্থেও গান্ধার প্রাচীন জনপদরূপে বর্ণিত।

জাতক সাহিত্য

জাতক গ্রন্থমালা অতি প্রাচীন। বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। জাতক সাহিত্য ভারতীয় ইতিহাসের এক অচ্ছেদ্য অংশ। ইহা হইতে প্রাচীন বৌদ্ধ ভারতের সমাজ-জীবন, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি জ্ঞাত হওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, ইহা হইতে ঐতিহাসিক ভৌগোলিক তথ্যেরও বহু সন্ধান পাওয়া যায়। এই কারণে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে জাতক গ্রন্থমালা মহামূল্যবান। জাতকের গল্পগুলি মহাভগ্‌গ, চুল্লভগ্‌গ, মহাভদলন, মহাদেব স্তূত ও অবদান-গ্রন্থে গল্পাকারে স্থান লাভ করিয়া পালি বৌদ্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

অশ্বঘোষ রচিত সূত্রালঙ্কার এবং ক্ষেমেন্দ্র রচিত অবদান-কল্পলতা গ্রন্থেও জাতকের গল্পগুলি স্থান লাভ করিয়াছে। জাতক-সাহিত্য মহাযান ও হীনযান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তি রূপেও তদ্রূপ প্রভাব আসন অধিকার করিয়াছে। জাতক কথাসমূহের জনপ্রিয়তা বৌদ্ধভাস্কর্য্য এবং চিত্রকলার মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

জাতক-সাহিত্যের বহু গল্পে গান্ধার জনপদের উল্লেখ আছে। বাহুল্য বোধে সেগুলি বর্ণনা না করিয়া কেবলমাত্র উদাহরণ-স্বরূপ আমরা কয়েকটির নামোল্লেখ করিলাম। যথা—গান্ধার জাতক, কুম্ভকার জাতক, ধমদ্ধজ জাতক, চুল্লিপালই জাতক, বিদেহ জাতক প্রভৃতি। এই জাতক গল্পগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধ ভারতে গান্ধার অতি প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল।

পালি ভাষায় রচিত উপরি-লিখিত গ্রন্থসমূহে এবং ভিক্ষুসূত্র গ্রন্থে গান্ধার জনপদ ও উহার অবস্থানের কথা যেরূপ লিপিবদ্ধ আছে তাহা বলা হইল। কোন কোন গ্রন্থের মতে গান্ধার জনপদ বৌদ্ধ ভারতবর্ষের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত।

সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য

এইবার আমরা সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ হইতে গান্ধার রাজ্যের কথা বলিতেছি। বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রাচীন যুগে বুদ্ধদেবের সময় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি পালি ভাষায় রচিত এবং প্রচারিত হয়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তিনটি ধর্মসভার অধিবেশন হয়। এই ধর্মসভার অনুমোদনক্রমে বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহ তৎকাল প্রচলিত, পালি ভাষায় রচিত হয়।১৫

গান্ধাররাজ কনিষ্কের রাজত্ব-সময়ে জলন্ধরে এক ধর্ম সভার অধিবেশন হয়। এই সভা তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় পার্শ্ব এবং বসুমিত্রের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার পার্শ্ব সভাপতি হন এবং বসুমিত্র ও অশ্বঘোষ সহসভাপতিত্ব করেন।১৬ পাঁচশত ভিক্ষু পালি ত্রিপিটকের টীকাগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া এই সভায় পাঠ করেন। এই সময় হইতে পালি ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম-

১১। Milindapanho S. B. E. series, Vol. XXXV.

১২। History of Pali Literature p. 353 B.C. Law.

১৩। Catalogue of Chinese Tripitak, No. 1358 Bunyen Nanjio.

১৪। Sylvain Levy., I. H. Q. 1936. Vol. XII, p. 121, 126, 133.

১৫। History of Medieval Indian Logic, p. 57-58 S. C. Vidyabhusan.

১৬। Encyco Religion and Ethics, Vol. VII p. 652.

গ্রন্থসমূহ প্রণালীবদ্ধ ভাবে রচনার সূত্রপাত হয়।১৭ কনিষ্ক-যুগের পূর্ব্বে কোন বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয় নাই তাহা নহে। কনিষ্ক যুগের ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা বৌদ্ধজগতের শিক্ষা ও মনোভাব প্রকাশের অনুকূল হইবে মনে করিয়া মহারাজ কনিষ্ক এই কার্য্য অনুমোদন করেন।

ইহার একমাত্র কারণ, সংস্কৃত ভাষা দেবভাষারূপে তৎকালীন জনসাধারণের মধ্যে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিল এবং এই যুগে গান্ধার ও উদয়নে সংস্কৃত ভাষাই শিক্ষার প্রধান বাহন হয়।১৮ আরও দেখা যায় যে, মহাযান ধর্ম্মগ্রন্থগুলিও সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং প্রচারিত হইয়া মধ্যএশিয়া, গান্ধার, উদয়ন, কাকাগড় এবং বাহ্লিক দেশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।১৯

১৭। History of Medieval Indian Logic, p. 63. S. C. Vidyabhusan.

১৮। Indian Pandits in the Land of Snow p. 18. S. C. Das.

১৯। *Ibid* p. 28.

অভিধর্ম্ম বিভাষশাস্ত্র

এই গ্রন্থে গান্ধার-রাজ্যের উল্লেখ আছে।২০ এই গ্রন্থখানি কনিষ্ক যুগে জলন্ধরে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় পঠিত হয়।২১ এই সময় হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিশেষ যত্নের সহিত অভিধর্ম্ম গ্রন্থ অধ্যয়ন ও আলোচনা আরম্ভ করেন। এই সময় হইতেই এই গ্রন্থের টিকারচনার সূত্রপাত হয়।২২

সূত্রসংগ্রহ

এই গ্রন্থে গান্ধার-রাজ্যের উল্লেখ আছে। ইহাতে লিখিত আছে, ভিক্ষু সংঘরক্ষক বৌদ্ধজগতের বহুদেশ ভ্রমণ ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে অবশেষে গান্ধার-রাজ্যে উপনীত হন এবং গান্ধার রাজগুরুর পদে অধিষ্ঠিত হন।২৩

উপরোক্ত গ্রন্থ দুটি আলোচনা করিলে দেখা যায়, বৌদ্ধ যুগেও গান্ধারের প্রাচীনত্ব সুস্পষ্ট।

২০ Nanjio, Chinese catalogue p. 277, No. 1263.

২১। Chinese bundle of Tripitaka, Vol. 7, p. 16.

২২। Encyco Religion and Ethics. Vol. 7.

২৩। Chinese Bundle p. 94, Nanjio p. 302, No. 1252.

মহাতীর্থঙ্কর মহাবীর

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

ভারতবর্ষে বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতে দেখা যায় যে গৌতম বুদ্ধের সময় প্রায় ৬৩টি সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য করেছিলেন এবং জৈন ধর্ম্ম-গ্রন্থাদিতেও দেখা যায় যে, তখন তদপেক্ষাও অধিকসংখ্যক ধর্ম্ম-সংস্থা বিদ্যমান ছিল। কয়েকটি ধর্ম্মসম্প্রদায় বৌদ্ধ-সম্প্রদায় থেকেও প্রাচীন ও বিশাল ছিল।

জৈনসম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থঙ্কর মহাবীর, বেদ যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা খণ্ডন করে নিজের প্রচারিত ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গৌতম বুদ্ধের ন্যায় তিনিও ভিক্ষুকদের জীবনাদর্শ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম থেকেই গ্রহণ করেছিলেন এবং স্মৃতি ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রোক্ত চারি আশ্রম—যথা, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত করেছিলেন, অবশ্য কিছু অদলবদল করে।

আগে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির ধারণা ছিল যে, জৈন ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি শাখা মাত্র। লেশন, ওয়েবার ও উইলসন প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই মত প্রতিষ্ঠিত করতে খুবই যত্নবান হয়েছিলেন, কিন্তু ডাক্তার বুহ্‌র ও ডাক্তার যোকাবী নামক দুই জন প্রখ্যাত জার্ম্মান পণ্ডিত, তাঁদের অপূর্ব্ব যুক্তি-দ্বারা এই মত খণ্ডন করতে সক্ষম হন।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম প্রায় সমসময়ে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল এবং কয়েক শতাব্দী ধরে উভয় ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রসার লাভ করতে থাকে। কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু জৈন ধর্ম্মের প্রভাব এখনও লোপ পায়নি। তার প্রমাণ ভারতে এখনও জৈন ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা নগণ্য নয়।

মহাবীরকেই জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলা হয়, কিন্তু জৈনগণ তাদের ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করবার জন্যে আরও ২৩ জন তীর্থঙ্করের উল্লেখ করে থাকেন, যাঁরা নির্ব্বাণ লাভের সদুপদেশ প্রচার করে দেশবাসীর অসীম কল্যাণ সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সব জৈনদের মতে প্রথম তীর্থঙ্করের নাম ঋষভদেব, কিন্তু তাঁর আবির্ভাবকাল এখনও অজ্ঞাত।

দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ এক শত বৎসর বেঁচেছিলেন এবং মহাবীরের অভ্যুদয়ের আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি নাকি পরলোকে প্রয়াণ করেছিলেন।

মহাবীরের বিচিত্র জীবন-কথা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। জৈন-কল্পতরু গ্রন্থে তাঁর জীবনকাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তাতে বহুস্থানে অতিশয়োক্তি আছে এবং এমন সব অলৌকিক ঘটনা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে যে নির্বিচারে সেগুলো বিশ্বাস করা কঠিন। এই গ্রন্থ রচনা করেছেন ভদ্রবাহু এবং তাতে অজস্র জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ঐতিহাসিক তথ্যেও এই গ্রন্থ অতি সমৃদ্ধ। এ ছাড়া অন্য অনেক জৈন ধর্মগ্রন্থ থেকে মহাবীরের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করা যেতে পারে।

অনেক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেও মহাবীরের জীবন-কথার আংশিক উল্লেখ রয়েছে, সেগুলিও খুব মূল্যবান।

প্রাচীন বিদেহ রাজ্যের রাজধানী ছিল বৈশালী নগরী। খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বৈশালী অতিবিখ্যাত মহাসমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। এই বৈশালী নগরীতে তখন এক প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যের কর্ণধার ছিল লিচ্ছবী বংশীয়েরা। এই রাজ্যের প্রধানকে রাজা নামেই অভিহিত করা হ'ত।

বৈশালীর নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে কুণ্ডগ্রাম নামে ছিল একটি গ্রাম, যার বর্ত্তমান নাম বসুকুণ্ড। মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত বষাঢ় ও বখীরা নামক গ্রামদ্বয় এখনও বৈশালীর স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে।

এই বসুকুণ্ড গ্রামে সিদ্ধার্থ নামে এক অভিজাতবংশীয় পরম ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় বাস করতেন। তিনি জ্ঞাত্রিক বংশীয় ক্ষত্রিয়-দের প্রধান ছিলেন। তাঁর সহধর্ম্মিণীর নাম ছিল রাণী ত্রিশলা। রাণী ত্রিশলা বৈশালীর রাজা চেটকের সহোদরা ভগ্নী ছিলেন। চেটকের কন্যার বিবাহ মগধের সম্রাট বিম্বিসারের সহিত সম্পন্ন হয়েছিল। এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সিদ্ধার্থ বহু মান্যাস্পদ ব্যক্তি ছিলেন।

সিদ্ধার্থের এক কন্যা ও দুই পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের নাম বর্দ্ধমান। এই বর্দ্ধমানই যথাকালে কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সাধারণ্যে মহাবীর নামে পরিচিত এবং অশেষ খ্যাতির অধিকারী হন।

জৈন-কল্প-সূত্রে উল্লিখিত আছে, মহাবীর স্বর্গস্থিত পুষ্পোত্তর নামক স্থান থেকে 'মর্ত্তধামে জন্মগ্রহণ করতে মনস্থ করে ঋষভদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী দেবানন্দার গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী উক্ত বসুকুণ্ড গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু দেবতারা দেখলেন যে, ইতিপূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণবংশে কোন মহাপুরুষ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ জন্মগ্রহণ করেন নি। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে দেবানন্দার গর্ভ থেকে অপসারিত করে রাণী ত্রিশলার গর্ভে রেখে দেন। ত্রিশলার কনিষ্ঠ পুত্র বর্দ্ধমান কালক্রমে মহাবীর নামে সুপরিচিত হন।

জৈনদের মধ্যে আবার শ্রেণী-বিভাগ রয়েছে। তার মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ই প্রধান—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। মহাবীরের উপরোক্ত জন্ম-বৃত্তান্ত শ্বেতাম্বর জৈনগণ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন, কিন্তু দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈনগণ তা পুরোপুরি অলীক কল্পনা বলে মনে করেন।

বলা বাহুল্য, দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব বিষয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে, এটি তার মধ্যে প্রধানতম।

আবার পূর্ব্বের কথায় ফিরে আসা যাক্—রাজা সিদ্ধার্থ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বর্দ্ধমানের জাতকর্ম্মোপলক্ষ্যে বিশেষ উৎসবের আয়োজন করেন। শৈশবেই রাজা তাঁর বিদ্যা-শিক্ষার যথোচিত আয়োজন করেন। অসাধারণ মেধা ও ধীশক্তি বলে কৈশোরেই তিনি নানা শাস্ত্রে ও কলাবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন।

বিদ্যাশিক্ষা সমাপন করবার পর বর্দ্ধমানকে যশোদা নাম্নী এক রাজকুমারীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করা হয়। ক্রমে তাঁদের এক কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেই মেয়েটি বয়ঃ-প্রাপ্ত হলে রাজা তাকে জামালি নামক এক বিদ্বান ও সুন্দর পাত্রের হাতে সমর্পণ করলেন।

মহাবীর যখন সাধন-পথে অগ্রসর হয়ে 'জিন্' বা 'অর্হৎ' অভিধা লাভ করেন, তখন জামালী তাঁর শ্বশুরের প্রধানতম শিষ্য বলে পরিগণিত হন। কিন্তু জামাতার এই শিষ্যত্বগ্রহণ মহাবীরের অনেক জৈন ভক্তের মনঃপূত হয় নি এবং তা নিয়ে বিশেষ মতান্তর ও মনান্তরের সূচনা হয়।

ত্রিশ বৎসর বয়সে পিতৃ-মাতৃবিয়োগের পরে বর্দ্ধমান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দীবর্দ্ধনের অনুমতি গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন এবং ভিক্ষুর জীবন যাপন করতে থাকেন।

তিনি এমন কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন যে প্রায় এক বৎসর তিনি গাত্রবাস পরিবর্ত্তন করেন নি। তাঁর দেহাবরণের ভাঁজে ভাঁজে বহু পোকা-মাকড় আশ্রয় নিয়ে স্থায়ী ভাবে বাসা বেঁধেছিল। এর কিছুকাল পরে তিনি পরনের যাবতীয় জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে সাধনায় ব্রতী হলেন। ক্রমে ক্রমে আহারেও তাঁর আগ্রহ লোপ পেল। এইরূপ কৃচ্ছ্র-সাধন করে তিনি সমুদয় ইন্দ্রিয়গ্রামকে সম্পূর্ণ বশে আনয়ন করেন। এমনি ভাবে জিতেন্দ্রিয় হবার পর তিনি নিবিড় বনে বিচরণ করতে থাকেন। এই সময় তিনি উন্মুক্ত আকাশ-তলে শয়ন করতেন। দিগম্বর অবস্থায় এই প্রব্রজ্যাকালে তাঁকে বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তাতে কিন্তু এই সর্ব্বত্যাগী জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ব্রতচ্যুত হন নি।

তিনি কাউকেও ঘৃণা বা দ্বেষ করতেন না, ভোগ, তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা বর্জনপূর্ব্বক সাধনপথে অগ্রসর হয়ে অবশেষে তিনি এমন এক উচ্চস্তরে উন্নীত হন যে পার্থিব বস্তুতে তাঁর আর কোন প্রয়োজন রইল না।

কথিত আছে যে, রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী নালন্দায় তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করেন। সেখানে গোশাল মংসলিপুত্র নামক এক ভিক্ষু তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই বন্ধুত্ব প্রায় সাত বৎসর স্থায়ী হয়েছিল এবং এই সময় উভয়ে কঠোর সাধনায় ব্রতী ছিলেন।

হঠাৎ কি কারণে গোশাল মংসলি-পুত্রের সহিত মহাবীরের মতান্তর ঘটে এবং পরে তা মনান্তরে পরিণত হয়। পরিণামে এই দুই সাধক-বন্ধুর মধ্যে চিরবিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়। ফলে গোশালি মংসলিপুত্র নিজেই একটি সম্প্রদায় গঠন করেন এবং প্রচার করেন যে, তিনিই 'অর্হৎ' বা 'তীর্থঙ্কর'। মহাবীরের 'অর্হৎ' বা 'তীর্থঙ্কর' হওয়ার দুই বৎসর পূর্ব্বেই গোশাল মংসলিপুত্র নিজকে তীর্থঙ্কর বলে ঘোষণা করেন এবং নূতন সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। এই সম্প্রদায়ের নাম 'আজীবিক' সম্প্রদায়।

গোশালের মতবাদের উল্লেখ জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কিন্তু গোশাল মংসলিপুত্র অথবা তাঁর শিষ্যগণ এই নূতন মতবাদ ও 'আজীবিক' সম্প্রদায়ের তথ্য-সম্বলিত কোন গ্রন্থ রচনা করে নি।

জৈন গ্রন্থাদিতে দেখা যায়, গোশাল মংসলিপুত্রকে দাম্ভিক, ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, শঠ, ভণ্ড ইত্যাদি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, জৈনদের ও আজীবিকদের মধ্যে গভীর বিদ্বেষ-ভাব ও কলহ বিদ্যমান ছিল। বলা বাহুল্য, এই দুই সম্প্রদায়ের কলহ ও বিসম্বাদ মহাবীরের প্রথম ধর্ম্মপ্রচার-প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট ব্যাহত করিতেছিল এবং এই বিপত্তি কাটিয়ে উঠতে তাঁকে অত্যন্ত বেগ পেতে হয়েছিল।

গোশালের প্রচার-কেন্দ্র ছিল শ্রাবস্তী নগরীর এক কুম্ভকারের দোকানগৃহে। এই দোকানটির মালিক ছিল হালহলা নামে এক কুম্ভকার-পত্নী। ক্রমে গোশাল শ্রাবস্তীতে নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

মহাবীর দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন এবং কৈবল্য অবস্থা প্রাপ্ত হন। এমনিভাবে সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী হন। এই সময় থেকেই তিনি 'জিন্' বা 'অর্হৎ' নামে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সময় মহাবীরের বয়ঃক্রম ৪২ বৎসর।

সিদ্ধিলাভ করার পর তিনি প্রথম 'নিগ্রন্থ' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। নির্গ্রন্থ কথার মানে হ'ল বন্ধন-রহিত। নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের স্থলে এখন জৈন সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। জিনের শিষ্য জৈন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মহাবীর নিজে 'নির্গ্রন্থ' ভিক্ষু এবং 'জ্ঞাতৃ'বংশ সম্ভূত ছিলেন তাঁর বিরোধী বৌদ্ধগণ তাঁকে নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র বলে উপহাস করতেন।

মহাবীর ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল স্বীয় ধর্ম্ম-মত, ভারত-বর্ষের প্রতি প্রদেশে ও জনপদে গিয়ে প্রচার করেন ও বহু ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মগধ ও অঙ্গ দেশে, অর্থাৎ বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে তিনি স্বীয় মতবাদ প্রচারে বিপুল সাফল্য লাভ করেন। তিনি সবচেয়ে বেশী সম্বর্দ্ধিত হয়েছিলেন ও সম্মান লাভ করেছিলেন চম্পা, মিথিলা, শ্রাবস্তী বৈশালী ও রাজ-স্থানে। এই সব স্থানে প্রায় সমুদয় গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করে।

কথিত আছে যে, সম্রাট বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুও তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং যথাযোগ্য ভাবে তাঁর সম্বর্দ্ধনা করেছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে দেখা যায় যে, উক্ত নৃপতিদ্বয় বৌদ্ধ ছিলেন। সম্ভবতঃ এই উভয় সম্রাটই জৈন ও বৌদ্ধ এই উভয় ধর্ম্মকে সমান শ্রদ্ধা করতেন।

মাত্র ৭২ বৎসর বয়সে মহাবীর দেহত্যাগ করে পরমাত্মায় বিলীন হন। তাঁর জীবনাবসান হয়েছিল পাটনা জেলার অন্তর্গত পাওয়া নামক জনপদে, রাজা হস্তিপালের জনৈক কর্ম্মচারীর গৃহে। পাওয়া গ্রাম এখনও জৈনদের মহাতীর্থরূপে পরিগণিত।

জৈন গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে যে ঈশার জন্মের ৫২৭ বৎসর পূর্ব্বে মহাবীর নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হন। মহাবীরের তিরোভাবের তিথি ও তারিখ নিয়ে অনেক মতভেদ দেখা যায়; এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত।

বৌদ্ধদের ন্যায় জৈনদের মধ্যেও এক ভিক্ষুসম্প্রদায় আছে—বৌদ্ধদের ন্যায় জৈনরাও জীবহিংসা করে না। অহিংসার দিক দিয়ে তারা বৌদ্ধদের চেয়েও এক ধাপ উঁচুতে। জৈনরা শুধু যে মানুষ পশু ও বৃক্ষে এক বিরাট প্রাণ-সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে তা নয়, তারা বলে যে অগ্নি, জল, বায়ু এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুতেও প্রাণস্পন্দন বিদ্যমান এবং এ সবের পক্ষে হানিকর কার্য্য করা মহাপাতক।

বৌদ্ধদের ন্যায় জৈনগণও বেদকে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকার করে না। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেও তাদের আস্থা নাই। তারা শুধু বেদোক্ত কর্ম্মবাদ ও নির্ব্বাণের সিদ্ধান্তগুলিকে মান্য করেন এবং জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন।

জৈনগণ চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের অস্তিত্ব স্বীকার করে। জৈনদের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ 'আগম' সাত ভাগে বিভক্ত। এই সাত খণ্ডের মধ্যে 'অঙ্গ' খণ্ড সর্ব্বপ্রধান ও বিরাট গ্রন্থ। আবার এই 'অঙ্গ' খণ্ড একাদশ ভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে 'আচারঙ্গ সূত্র' ও 'উপাসক দশা সূত্র' হ'ল সর্ব্বপ্রধান।

আচারঙ্গ সূত্রে জৈন ভিক্ষুদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে এবং উপাসক দশাসূত্রে উপাসক মণ্ডলীর কার্য্যক্রম নির্দ্দেশ করা হয়েছে।

জৈন ধর্ম্মগ্রন্থে পাওয়া যায় যে মহাবীরের মহাপ্রয়াণের দুই

শত বৎসর পরে মগধে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। সে সময় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য মগধের সম্রাট ছিলেন।

জৈন-কল্প সূত্রের রচয়িতা ভদ্রবাহু তখন মগধস্থ কোন এক বিরাট সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ছিলেন। তিনি এই সময় তাঁর স্বদলভুক্ত বহু জৈনকে সঙ্গে নিয়ে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটকে চলে যান। তখন মগধে আরও একটি বিরাট জৈনসম্প্রদায় ছিল। এই দলের নেতা ছিলেন স্থূলভদ্র।

মগধের মহামারীর কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। কিছু দিন পরে এই মহামারী ও দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হ'ল এবং যে সব জৈন কর্ণাটকে চলে গিয়েছিল, তারাও মগধে ফিরে এল। তখন দেখা গেল যে, যারা কর্ণাটকে গিয়েছিল তাদের চাল-চলনে ও বেশ-ভূষায় এক বিষম পরিবর্ত্তন ঘটেছে, ফলে তারা আর মগধের জৈনদের সঙ্গে কিছুতেই মিশতে পারলে না। মগধের জৈনগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করত, কিন্তু দেখা গেল কর্ণাটক ফেরত জৈনগণ নগ্ন অবস্থায় থাকায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমনি ভাবে দুটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হ'ল—শ্বেতাম্বরি ও দিগম্বরি।

আর এক ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবধান দুরতিক্রম্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কর্ণাটকগামী জৈনদের অনুপস্থিতিতে মগধের জৈনগণ এমন কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করে যার শাস্ত্র-তত্ত্ব ও ব্যাখ্যানাদি কর্ণাটকফেরত জৈনগণ কিছুতেই সমর্থন করলে না। তাদের সিদ্ধান্তসমূহ কর্ণাটক-ফেরত জৈনদের অনুমোদন লাভ করলে না। এই মতবিরোধ ক্রমেই বেড়ে চলল। পরে ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের বল্লভী সম্প্রদায়ের লোকেরা বর্ত্তমান জৈন ধর্ম্ম-সিদ্ধান্তসমূহ প্রণয়ন করে এবং সেগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ায় এই বিরোধের সুমীমাংসা হয়। মথুরার শিলালেখসমূহে এই স্বীকৃতি দৃষ্ট হয়। এই সব শিলালেখ সম্রাট কনিষ্কের সময় নির্ম্মিত হয়েছিল।

এর পর জৈন ধর্ম্মের স্রোত মৃদু গতিতে বয়ে চলেছিল। উল্লিখিত শিলালিপিগুলিতে অনেক জৈন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর নাম উৎকীর্ণ রয়েছে যাঁদের অবদানে এই ধর্ম্মের শাস্ত্র-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে আছে।

অনেকের ধারণা জৈনগণ রক্ষণশীল বলেই তাদের ধর্ম্ম আজও ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় তার বিলুপ্তি ঘটে নি।*

* এই প্রবন্ধ লিখতে *Cambridge History of India* ও *Ancient India* থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।—লেখক

জানপদ সেনা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, এম-এ

বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অবশেষে লব্ধ হইয়াছে ; এখন প্রশ্ন হইতেছে, উহা কি করিয়া রক্ষা করিতে পারা যায়। আমাদের নবজাত গণতন্ত্রের শত্রু অনেক, ভিতরে ও বাহিরে। প্রত্যেক গণতন্ত্রের রক্ষকই হইল তাহার তরুণের দল। এরিষ্টটলীয় গণতন্ত্রে তরুণেরাই রাজ্যের সীমানা পাহারা দিত। গণতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জানপদসেনা সংগঠনেরও প্রয়োজন। কারণ গণতন্ত্র, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও জানপদ সেনা ট্রেনিং এই তিনটিই একসঙ্গে চলে। এই দুইটি আনুষঙ্গিকের অভাবে গণতন্ত্র কার্য্যত: অচল হইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কিশোর ও যুবকদের সামরিক শিক্ষালাভের একান্ত প্রয়োজন। উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে কেন্দ্র করিয়া এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যেখানে ছাত্রের সংখ্যা কম, সেখানে দুই বা ততোধিক স্কুলকেও এক-একটি কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। মফস্বলে একাধিক গ্রামকে একই হাই স্কুলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা চলে। এ প্রসঙ্গে অনেকে হয়তো বলিবেন, বিভিন্ন স্থানের কংগ্রেস কমিটিগুলিও তো সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিবার ভার লইতে পারেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় সামরিক শিক্ষার পরিচালনা রাজনৈতিক দলগত না হওয়াই উচিত। পল্লী-ইউনিয়নগুলিকেও আমরা যে এক একটি কেন্দ্র ধরিব তাহারও সুবিধা নাই। কারণ প্রত্যেক ইউনিয়নে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় নাও থাকিতে পারে। অন্ততঃপক্ষে এক ব্রিগেড স্বেচ্ছাসৈনিক লইয়া একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইতে পারে। ইহাতে মনে হয় পাঁচটি হইতে আটটি পর্য্যন্ত ইউনিয়ন লইয়া একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। এখানে বলা ভাল যে, স্বেচ্ছাসৈনিক হইবার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক বয়স হইতেছে চৌদ্দ বৎসর। আর ট্রেনিঙের সময় হইল চারি বৎসর, অর্থাৎ চৌদ্দ হইতে আঠার বৎসর পর্য্যন্ত। এইরূপ ৪১ জন ছেলে লইয়া এক দল বা কোম্পানী স্বেচ্ছাসৈনিক গঠিত হইতে পারে, তিন কোম্পানীতে হয় এক ব্যাটালিয়ন, আর তিন ব্যাটালিয়নে (৩৬৯ জনে) এক ব্রিগেড এবং তিন ব্রিগেডে এক ডিষ্ট্রিক্ট। তিন ডিষ্ট্রিক্টে এক এরিয়া, তিন এরিয়াতে এক কম্যাণ্ড, আর তিন কম্যাণ্ডে এক আর্মি। এই ভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি এক আর্মি কম্যাণ্ডের অধীন হইবে।

শহরের মধ্যে প্রতি স্কুলে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ট্রেনিঙের প্রথম দুই বৎসরের কাজ চালান যাইতে পারে ; আর শেষের দুই বৎসর বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে মনোনীত ছাত্র লইয়া একটি সাধারণ কেন্দ্রে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। ১৫ ও ১৬ বৎসর বয়সে নকল বন্দুকদ্বারা শিক্ষা দেওয়া চলিবে, তবে এ সময়ে আসল বন্দুকের অংশগুলির সঙ্গেও পরিচয় করান চলে। এই সময়টাই শিক্ষার পক্ষে প্রশস্ত ; ১৭ ও ১৮ বৎসর বয়সে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত বন্দুক চালানো শিক্ষা দেওয়া যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রকোপ সহ্য করাইবার উদ্দেশ্যে জুন-জুলাইকে মাঝে ধরিয়া প্রায় তিন মাস কাল শিক্ষা-শিবিরের জন্য রাখা যাইতে পারে। তবে পরীক্ষা-শিবির শীতকালে চলিবার ব্যবস্থা করা উচিত। ১৪ হইতে ১৮ এই চারি বৎসরের প্রতি বৎসরে তিন মাস করিয়া ক্যাম্পিং ধরিলে মোটের উপর এক বৎসর কাল ট্রেনিঙের জন্য ব্যয়িত হয়। এই ট্রেনিঙের বিশেষ উদ্দেশ্যের মধ্যে রহিবে কষ্টসহিষ্ণুতা, পথ-ঘাট চেনা, সোজা-পথ বাহির করা, নূতন পথ বা বাঁধ তৈয়ারী করা, জঙ্গল-কাটা, গড়খাই খনন ও লক্ষ্যভেদ শিক্ষা ইত্যাদি। রুট-মার্চ্চ, প্যারেড, মোটর-বাইক অভিযান প্রভৃতিও শিবিরের কার্য্য-তালিকার মধ্যে থাকিবে ; খাল-বিল বা নদীতে সাঁতার ও নৌ-চালনার অভ্যাসও করান হইবে। দিক্-নির্ণয় শিখাইবার জন্য সূর্য্য তারা, ও দুপুরে ঘড়ির কাঁটার ছায়াপাত প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ সমীচীন। ক্যাম্পিঙের সময় ভাত খাওয়ার পরিমাণ কমাইতে হইবে ; রুটি, ডিম, মাছ, চা, পাঁউরুটি প্রভৃতিই বেশী চলিবে। জল-খাবার পরিমাণ-মত হইবে। ক্যাম্পিঙের খরচ অবশ্য রাষ্ট্রই বহন করিবে, তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণেরও দায়িত্ব বড় কম নহে ; কারণ দেশরক্ষার সমস্যাই আপাততঃ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রের দুর্ব্বলতম অংশ কোন কোন দেশীয় রাজ্য ও অরক্ষিত সীমান্ত—গ্রামাঞ্চলের উপর দৃষ্টি দিলেই এ বিষয় যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

দেশব্যাপী জানপদ সেনা গঠন রাষ্ট্রদেহে অভূতপূর্ব্ব বলসঞ্চার করিবে এবং রাষ্ট্র তাহার অদম্য অফুরন্ত শক্তি-উৎসের কতকটা সন্ধান এই পথেই পাইয়া বিষম বিপৎপাতকেও কাটাইয়া উঠিবে ; কোন রাষ্ট্রই হাজার বলশালী হইলেও শুধু বৈতনিক সৈন্যবাহিনীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে না।

পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা ও ভারতবর্ষ

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস, এম-এস্‌সি

বিগত মহাসমরের পর সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া এক দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন যাবতীয় খাদ্যশস্য যদি সাম্যের ভিত্তিতে সর্ব্বজাতির নরনারীর মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হইত তাহা হইলে হয়ত এই মারাত্মক অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইতে পারিত। অবশ্য আধুনিক খাদ্য-বিজ্ঞান অনুসারে যদি খাদ্যের পরিমাণ হিসাব করা যায় ত তাহাতেও প্রয়োজনীয় পুষ্টি সম্পাদন করা সম্ভব হইত না। উত্তর-আমেরিকা, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ প্রয়োজনাতিরিক্ত হওয়ায় উক্ত দেশসমূহের উদ্বৃত্ত খাদ্য অনেক সময় দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চলসমূহে রপ্তানি করা সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্য-আমেরিকা এবং দক্ষিণ-আমেরিকার কিয়দংশের লোকেরা আধপেটা খাইয়া আছে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় সার, কৃষিকার্য্যোপযোগী যন্ত্রপাতি প্রভৃতির অভাবে নিজস্ব খাদ্যসমস্যা মিটাইতে সক্ষম হয় নাই। বহির্জগৎ হইতে খাদ্যশস্য ক্রয় করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা না থাকায় ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ পৃথিবীর উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য আশানুরূপ সংগ্রহ করিতে অক্ষম। হিসাবে পাওয়া যায় যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন বাদে সমগ্র ইউরোপের লোক-সংখ্যা এশিয়া মহাদেশের লোকসংখ্যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ; অথচ ইউরোপবাসীরা এশিয়াবাসীদের তুলনায় অধিক পরিমাণ চাউল, গম এবং ছয় গুণ অধিক মাংস খাইতে পায়।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান খাদ্যপরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়। আজ সমগ্র দেশের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য। বিদেশ হইতে খাদ্যবস্তু আমদানী করিয়া মাঝে মাঝে খাদ্যাভাবের কিঞ্চিৎ উপশম করা হয় মাত্র—কিন্তু অনাহারের বিভীষিকা এদেশের কোটি কোটি নর-নারীর মন হইতে আদৌ দূরীভূত হয় না। বিগত ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষে প্রায় ত্রিশ লক্ষ নরনারীর প্রাণ-বিয়োগ হয়।

১৯৪৬ সালে আবার বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা গেল। তখন দক্ষিণ-ভারতেও নিদারুণ খাদ্যসঙ্কট ও অন্নাভাব পরিদৃষ্ট হইল। কেন্দ্রীয় সরকারের একাগ্র চেষ্টার ফলে বিদেশ হইতে চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য আমদানী করা সম্ভব হওয়াতে অতি কষ্টে দেশবাসীর প্রাণ রক্ষা হইল। বাংলাদেশের অদৃষ্ট নিতান্তই শোচনীয় এবং এখানে প্রায় প্রতি বৎসরই চাউলের অভাব দৃষ্ট হয়। সুজলা সুফলা বাংলাদেশের এই দুর্ভাগ্য যে কোন্ দিন কাটিবে তাহা বলা যায় না। তদুপরি বাংলা বিভাগ যে খাদ্য বিষয়ে আরও নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আজ লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী পশ্চিম বঙ্গের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার যথাসর্ব্বস্ব ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে, ভিক্ষার অন্ন কিংবা কষ্টার্জ্জিত স্বল্পাহার তাহাদিগকে নির্জ্জীব করিয়া ফেলিতেছে। সরকারও নিত্য নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের উর্ব্বরা ভূমি ফসলশুদ্ধ ফেলিয়া সেখানকার অধিবাসীদের দেশ-ত্যাগ করিতে হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের উৎপন্ন ফসলের পরি-মাণ নিতান্তই সীমাবদ্ধ। বাহির হইতে আমদানী ছাড়া স্বাভাবিক পুষ্টিমানের ভিত্তিতে খাদ্য-রেশন সরবরাহ করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব। আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিলে এই সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। অবশ্য পশ্চিম বাংলার পতিত জমি-সংস্কার ও অনুরূপ পরিকল্পনাসমূহ কার্য্যকরী করিতে পারিলে সমস্যার কিয়ৎ পরিমাণ মীমাংসা হইবে সন্দেহ নাই। উন্নত ধরণের জল-সেচন পদ্ধতি অবলম্বন ও সারপ্রয়োগদ্বারা কৃষির উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ এবং অনশন ও অর্দ্ধাশনপীড়িত গ্রামবাসী আশানুরূপ পরিশ্রমও ত করিতে পারিবে না। সুতরাং কৃষিজাত খাদ্যশস্যের উন্নতিসাধন সত্বর সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বাকী রহিল বিদেশ হইতে খাদ্য-শস্য আমদানী করিয়া সমস্যার সমাধান করা। সমগ্র ভারত-বর্ষে বিদেশ হইতে আমদানী চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের বার্ষিক মূল্য প্রায় ১২৫ কোটি টাকা। এই বিপুল অর্থ বিদেশে না গিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইলে দেশের কত কল্যাণ হইত? কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে বাংলা ও পঞ্জাবের জন্য খাদ্যবস্তু ক্রয়ের ব্যয়ভার ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইবে বলিয়া মনে হয়। আবার আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির ফলে যদি কোন দিন যুদ্ধ বাধিয়া উঠে ত ভারতবর্ষ বিদেশের খাদ্য সরবরাহ হইতে হঠাৎ বঞ্চিত হইতে পারে। তখনকার অবস্থাও চিন্তা করা দরকার।

খাদ্য-সমস্যার আশু সমাধানের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সমগ্র পৃথিবী আজ এইজন্য রেশনিং পরি-কল্পনা লইয়া ব্যস্ত। রেশনিঙের উদ্দেশ্য সঞ্চিত খাদ্যের সুষ্ঠু বণ্টন এবং তাহাও হওয়া উচিত খাদ্য-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে। যেখানে গমের পরিমাণ যথেষ্ট নয় সেখানে গমের তুল্য অন্যান্য শস্যাদি স্বল্প পরিমাণে মিশানো যায়। বোম্বাইয়ে বাদাম হইতে তেল নিষ্কাশন করিয়া ঐ বীজ চূর্ণ করিয়া ময়দা বা আটার সহিত মিশা

রান্না করে আনন্দ পাবেন!
রসুই
বনস্পতির সেরা!
RASOI
VANASPATI
হিন্দুস্থান ডিভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্ : চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা।
ম্যানেজিং এজেণ্ট : এম. আর. সরকার অ্যাণ্ড কোং লিঃ
২ পাউণ্ড, ৫ পাউণ্ড, ১০ পাউণ্ড
এবং ৩৭ পাউণ্ড টিনে পাওয়া যায়
HDX 31

সুফল পাওয়া গিয়াছে। এমন কি আমেরিকাতেও এইরূপ ময়দার সহিত বাদামের বীজ-চূর্ণ মিশ্রণ কার্য্য অনুমোদিত হইয়াছে। চাউল ও গমের পরিমাণ যখন বিদেশ হইতে আমদানী না করিয়া বাড়ানো সম্ভব নহে তখন খাদ্য-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পুষ্টিমানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি চাউল ও গমের সহিত বেশী পরিমাণ গোল আলু, লাল আলু, যব প্রভৃতি ব্যবহার করা যায় ত সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। দেশের আসল সমস্যা চাউল ও গমের ঘাটতি। সুতরাং দেশবাসীর উচিত অন্যান্য খাদ্য হইতে এই ঘাটতি পূরণ করা। প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও শ্বেতসারের কিয়ৎ পরিমাণ যদি চাউল ও গম ছাড়া অন্যান্য খাদ্য হইতে সংগ্রহ করা যায় এবং তাহাতে যদি লোক খাইয়া বাঁচে ত অবিলম্বে সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য। প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ভিটামিন প্রভৃতির অভাব পূরণ করিতে কচি শাকসব্জির মূল্য খুব বেশী। আধুনিক খাদ্য-বিজ্ঞানে ইহাকে এক নূতন আবিষ্কার বলা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে কচি-শাকপাতায় তাজা প্রোটিন, ভিটামিন, ফলিক এসিড প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

চাউল সম্বন্ধে একটি মূল্যবান তথ্যের কথা আলোচনা করা যাক্। ভারতবর্ষের বহু স্থানে আতপ চাউলের আদর বেশী। সেখানকার অধিবাসীদের নিকট সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ চাউল অধিকতর মুখরোচক। আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে সমপরিমাণ আতপ ও সিদ্ধ চাউলের মধ্যে শেষোক্তটির পুষ্টিমূল্য অনেক বেশী এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান হইতে আতপ অপেক্ষা সিদ্ধ চাউলের উৎপাদনও হয় বেশী। সুতরাং বেশী পরিমাণে সিদ্ধ চাউল আহারের রেওয়াজ হইলে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ স্বভাবতঃই বেশী হইত। অবশ্য কিয়ৎ পরিমাণ আতপ চাউল ধর্ম্মকার্য্যের জন্য (দেবতার পূজা প্রভৃতি) পৃথক করিয়া রাখিতেই হইবে। এইরূপে ব্যাপকভাবে সিদ্ধ চাউলের ব্যবহার আইন করিয়াই হউক, আর প্রচার-কার্য্যের দ্বারাই হউক প্রচলন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। হিসাবে দেখা যায় যে, আতপের বদলে কেবলমাত্র সিদ্ধ-চাউল আহারের অভ্যাস হইলে শুধু ইহা দ্বারাই ভারতবর্ষের উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ প্রতি বৎসর ৪০,০০০ টন বাড়িয়া যাইবে।

পুষ্টিকর খাদ্যসমূহের মধ্যে দুধ, মাংস, ডিম ও মাছ উল্লেখযোগ্য। জীব-দেহের পক্ষে এই সকল খাদ্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় এবং উহাদিগকে শরীর রক্ষাকারী খাদ্য (protective food) বলে। সাধারণের পক্ষে এই সকল খাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন। এই সকল খাদ্য রেশনিঙের আওতায় আসে নাই। কিন্তু দুধ যেমন প্রত্যেক শিশুর পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় সেরূপ মনুষ্যদেহের পুষ্টির জন্য মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতির সুব্যবস্থার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং ঐ সমস্ত খাদ্যদ্রব্যেরও সুষ্ঠু বণ্টন হওয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজন। দেশের ধনীগণ হয়ত ঐসব পুষ্টিকর খাদ্য বেশী খাইয়া নিজেদের ভাগের চাল, গম প্রভৃতির কিয়দংশ দরিদ্রদের ছাড়িয়া দিতে পারে। যাহারা মানসিক পরিশ্রম বেশী করে তাহারা প্রোটিনের (মাছ, মাংস) পরিমাণ বেশী খাইয়া যাহারা শারীরিক পরিশ্রম বেশী করে তাহাদিগকে নিজেদের ভাগের শ্বেতসার (চাউল, আটা) ছাড়িয়া দিতে পারে। ইহাতে সমস্যার আংশিক সমাধান হয়।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৪১ সালে জনসংখ্যা ৪০ কোটি ছিল। বাৎসরিক হিসাব ধরিলে অনুমান করা যায় যে ১০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বাড়িয়া ৫০ কোটিতে দাঁড়াইবে। সুতরাং এই অতিরিক্ত দশ কোটি লোকের খাদ্য-সরবরাহ এক নূতন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। দেখা যাইতেছে যে উৎপাদন ও সরবরাহ অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। কাজেই এখন খাদ্য শস্যাদির উৎপাদনবৃদ্ধিতে মনোযোগী হওয়া দেশবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য।

সমাজ-সংস্কারে বিধবা-বিবাহ

শ্রীরণজিৎ সান্যাল

হিন্দুসমাজের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টায় এদেশে যখনই কোনও সামাজিক আন্দোলন বা আইন প্রবর্ত্তন বা সংস্কারের চেষ্টা হয়েছে, তখনই দেশের রক্ষণশীল সম্প্রদায় সে অগ্রগতির প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'এদের অহৈতুক শত্রুতা বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সকল চেষ্টাকে কেবলি ধূলিসাৎ করেছে'। সমাজ-সংস্কারে অগ্রণী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন এর জলন্ত সাক্ষ্য দেয়।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ বেআইনী হ'ল বটে, কিন্তু তখনও সমাজের স্থিতিশীলতায় কোনও পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। সে সময় সমস্ত দেশের বা সমাজের স্বার্থকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে চিন্তা করবার চেষ্টাও হয় নি। এই আদর্শ দেখালেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। এক নিকৃষ্ট সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রচেষ্টা সেকালের সামাজিক জীবনের মধ্যে যে প্রাণসঞ্চার করেছিল আজকের দিনে তা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। হিন্দুসমাজ তখন নির্বীর্য্যতার চরম সীমায় পৌঁছেছিল বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্মৃতি ও পরাশর সংহিতার ব্যাখ্যার সাহায্যেই গণচিত্তের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। উত্তরকালে তাঁর প্রচেষ্টা ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইল বিধবা বিবাহ আইন (Hindu Widows' Re-marriage Act, 1856) বিধিবদ্ধ হয়ে। সে সময় এই অগ্রগতিমূলক আন্দোলনের বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনসাধারণ কি পরিমাণ বিপক্ষতা করেছিল তা এই আইনের প্রণেতা অনারেবল্ সার জে. পি. গ্রান্টের বিবৃতি থেকে জানা যায়। তিনি বলেন, এই আইনের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করে পঞ্চাশ হাজারের উপর দস্তখতযুক্ত প্রায় চল্লিশটি স্মারকলিপি কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হয়েছিল।

এই আইনে যে কয়েকটি ধারা আছে তার মধ্যে প্রধান হ'ল বিধবার বিবাহ এবং বিধবা-বিবাহের ফলে জাত সন্তান-সন্ততিদের বৈধতায় (legality) আইনের সমর্থন দেওয়া। ধারাটির কিয়দংশ উল্লেখ করা যেতে পারে—

"No marriage contracted between Hindus shall be invalid and the issue of no such marriage shall be illegitimate by reason of the woman having been previously married or betrothed to another person who was dead at the time of such marriage, any custom and any interpretation of Hindu Law to the contrary notwithstanding."

এই ধারা থেকে অনুমান হয়, ইতিপূর্ব্বে যে কয়েকটি বিধবা-বিবাহ দেবার চেষ্টা হয়েছিল তাতে এই জাতীয় বিবাহের ফলে জাত সন্তানদের বৈধতার প্রশ্ন বিধবা-বিবাহকে আইনের দিক দিয়ে পঙ্গু করে রেখেছিল। এই আইনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ধারায় বলা হয়েছে যে, পুনর্বিবাহের দরুন বিধবাদের পূর্ব্বেকার বিবাহে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। বিধবা-বিবাহ আইনবদ্ধ হয়ে থাকা সত্ত্বেও বহুকাল ধরে সমাজে অগ্রাহ্য হয়ে রয়েছে, একথা বলাই বাহুল্য। এখনও বহু ক্ষেত্রে বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজে দেখা যায় যে, বিধবাদের সামাজিক স্বচ্ছন্দ পরিবেশের বাইরে এক আলাদা শ্রেণীর মানুষ হিসাবে গণ্য করা হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে বিধবাদের সংসারের বোঝা বলে মনে করা হয়, এমন দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে বিরল নয়। আমাদের এই মনোবৃত্তি কায়েম হওয়ায় সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টা তেমন সফল হচ্ছে না।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনা অনুসারে কেবলমাত্র কুড়ি থেকে পঁচিশ বৎসর বয়সের বিধবাদের সংখ্যা ছিল ৮,৪৬,৯৫৯ এবং বিধবাদের মোট সংখ্যা ছিল ১৬,৮১,৬৭৯। এই তথ্য ভারতের সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে আমাদের কুসংস্কারের চূড়ান্ত নিদর্শন হয়ে থাকবে। মহাত্মা গান্ধী একাধিক বিবৃতি ও প্রবন্ধে বালবৈধব্যকে সমাজের দুষণের কলঙ্ক বলে স্বীকার করেছেন, যদিও তাঁর মতে নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত বিধবারা হিন্দু সমাজের সম্পদস্বরূপ। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বৈধব্য দুর্নীতিকে নানা ভাবে প্রশ্রয় দিয়েছে। গান্ধীজীর মতে—'Widowhood imposed by religion or custom is an unbearable yoke and defiles the home by secret vice and degrades religion (*Conquest of Self*. পৃ. ২৩)। অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, আমাদের দেশে আর্থিক অভাব বা প্রবৃত্তির প্রেরণায় পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে এমন মেয়েদের মধ্যে বাল-বিধবার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়।

এদেশে অসহায় বিধবাদের সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব কম। তন্মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের কথা এখানে উল্লেখ করব। সেটি হচ্ছে লাহোরের সার গঙ্গারাম ট্রাষ্ট পরিচালিত বিধবা-বিবাহ সহায়ক সভা। উক্ত প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা কার্য্যালয় ১৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীটে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিধবা-বিবাহের প্রসারের জন্য উল্লেখযোগ্য কাজ করে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিনা পারিশ্রমিকে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা ও উক্ত প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করা, এবং জনসাধারণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচারের জন্য যাবতীয় বৈধ উপায় অবলম্বন করা। স্বাধীন ভারতে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানগুলির উপযুক্ত পরিচালনার ব্যবস্থা করার বিশেষ দায়িত্ব জাতীয় গবর্ণমেন্টের আছে।

বিধবা-বিবাহকে সামাজিক ভাবে গ্রহণ ও সমর্থন করতে হলে প্রচার ও আন্দোলন ছাড়াও যে বিধবাদের অভিভাবকদের নৈতিক গুরু দায়িত্ব রয়েছে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

পুস্তক-পরিচয়

দেবী-যুদ্ধ—৺শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ; প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, মিউনিসিপাল মার্কেট, শ্রীহট্ট। ২৬৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ৫৲ টাকা।

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি বলিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দোষ সমগ্র হিন্দু সমাজের। তাহা না হইলে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত উপাখ্যানাদি মন্থন করিয়া বর্ত্তমান যুগে ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইত না। অনেক সময়ই দেখা যায়, হিন্দুর এই সব প্রাচীন কথার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া লৌকিক জীবনের সুখ-দুঃখ মান-অপমানকে অনিত্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইংরেজ শাসনের কল্যাণে আমাদের আধ্যাত্মিকতার মোহ একটু আধটু টুটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য দেখিতে পাই, আমাদের রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া হিন্দুর সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাসের লৌকিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র বর্ত্তমান জীবনের হীনতার আলোকে সুর ও অসুরের বিবাদের বর্ণনা করিয়া, অতীতকে আমাদের সামনে জীবন্ত করিয়া ধরিয়াছেন।

শরচ্চন্দ্রের "দেবী-যুদ্ধ" নামক কাব্য সেই পর্য্যায়ভুক্ত। এই সাধক ব্রাহ্মণ শ্রীহট্ট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন; পুঁটিয়ার রাণী ৺শরৎ-সুন্দরীর আনুকূল্যে শিক্ষালাভ করেন, এবং বারেন্দ্রভূমে, উত্তরবঙ্গে, শিক্ষাব্রতীরূপে জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেন। এই কার্য্যে তিনি লোকের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। উত্তরবঙ্গের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় অনেকেই তাঁর ছাত্র ছিলেন। যুগধর্ম্মের অনুপ্রেরণায় তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ এই "দেবী-যুদ্ধ" কাব্যে পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরে এই কাব্য প্রকাশিত হয়। সেই যুগের চিন্তানায়কগণ সেই কাব্যকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সমালোচনায় পরিস্ফুট দেখা যায়। 'প্রদীপ' পত্রিকার ১৩০৮ বঙ্গাব্দের মাঘ ফাল্গুন সংখ্যায় এই সমালোচনা প্রকাশিত হয়। "দেবী-যুদ্ধের" কবি সেই পৌরাণিক কাহিনীকে (মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী উপাখ্যানকে) লৌকিক পরিচ্ছদে সমাবৃত করিয়া কাব্য রচনা করায় মনে হইতেছে—এ বুঝি মানব-সমাজের কথা, এ বুঝি প্রতিদিনের প্রত্যক্ষী-কৃত ঘটনাবলীর অস্ফুট চিত্রপট। এই গুণে "দেবী-যুদ্ধ" পাঠকচিত্তকে বিমুগ্ধ করে।...মনে হয় বুঝি ইহার দেবাসুর সেকালের দেবাসুর নহে।"

স্বদেশীযুগে এই কাব্য ইংরেজ-শাসকের চক্ষে রাজদ্রোহসূচক বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রায় চল্লিশ বৎসর ইহা নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকায় স্থান-লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পরে যে নবযুগের আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময়ে ইহা প্রকাশ করিয়া শ্রীগিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য স্বদেশী যুগের স্মৃতি উদ্দীপ্ত করিতে সাহায্য করিয়াছেন। কাব্যখানি দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া তাঁহার চেষ্টা আরও প্রশংসার যোগ্য। বর্ত্তমান যুগের পাঠকবর্গ এই দেশের নানা জাতির ও নানা সংস্কৃতির মধ্যে সংঘর্ষের একটা পরিচয় এই কাব্যের মধ্যে পাইবেন, এই কাব্যের সাহায্যে নিজের দেশের ইতিহাস বুঝিতে পারিবেন। প্রকাশকের শ্রম ও অর্থব্যয় তখন সার্থক হইবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব
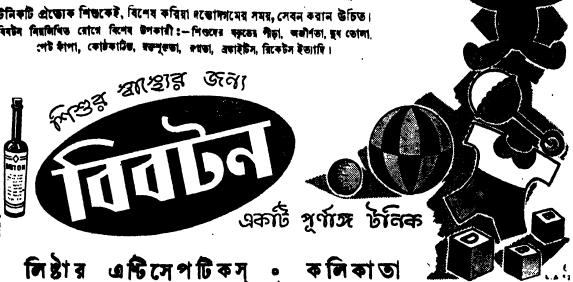
সীতার বনবাস—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

"সীতার বনবাস" বিদ্যাসাগরের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহার প্রথম দুইটি পরিচ্ছেদ ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত, অবশিষ্টাংশ রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে সঙ্কলিত। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের দান কতখানি জানিতে হইলে "শকুন্তলা" ও "সীতার বনবাস" পাঠ করিতে হয়। সম্পাদকদ্বয় ভূমিকায় লিখিতেছেন, "ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার দেশবাসীর জন্য এই দুইটি মহৎ কাব্যের গল্পাংশকে সুললিত বাংলা গদ্যে রূপান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' সমগ্র বাঙালী জাতিকে সাহিত্যরসে উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত করিয়াছে।... সীতার বনবাস আজ আর সহজলভ্য নয়।" "সীতার বনবাসে"র প্রথম প্রকাশ-কাল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চবিংশতি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তিনি রচনাকে সহজ ও সুললিত করিবার জন্য প্রত্যেক সংস্করণেই ভাষার কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন; বর্ত্তমান সংস্করণে সম্পাদকেরা তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের সুন্দর এবং সাবলীল বাংলা আধুনিক পাঠককে আনন্দ দান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

টাকার বাজার—শ্রীঅতুল সুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৭৩ মূল্য ।৹।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার এই পুস্তকে দশটি অধ্যায়ে টাকার বাজারের স্বরূপ ও সংগঠন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, বিনিময়ের বাজার, দেশী বিলের বাজার, 'তলবী' ও স্বল্পমেয়াদী ঋণের বাজার, বন্ধকী বাজার, ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং, শেয়ার বাজার, মূলধনের বাজার ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। নিছক টাকার বাজার সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় পুস্তক কেহ লেখেন নাই, সুতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখককে অভিনন্দিত করিতেছি। বিষয়টি জটিল হইলেও লেখক যতদূর সম্ভব সহজ সরল ভাষায় বাঙালী পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। সাধারণ লোকের নিকট, এমন কি যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত সম্পর্কিত তাহাদেরও অনেকের নিকট ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কাজ-কারবার রহস্যময়। লেখক এই রহস্যের কতকটা উদ্ঘাটিত করিয়া সাধারণের নিকট ধরিয়াছেন।— স্বাধীনতালাভের পর ব্যবসা সম্পর্কে এদেশবাসীর দায়িত্ব অনেক বাড়িয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে আমাদের নিজস্ব স্থান আজ গ্রহণ করিতে হইবে। আধুনিক জগতের আর্থিক কাঠামোর সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকিলে একালের ব্যবসা-ক্ষেত্রে অন্ধের মত হাতড়াইতে হয়। এই ধরণের পুস্তক যতই দেশে প্রচারিত হইবে ততই প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসাক্ষেত্রের আসল চিত্র বাঙালীর নিকট পরিস্ফুট হইবে ও তাহাকে এদিকে আকর্ষণ করিয়া আনিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রগণও এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র—শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী এবং শ্রীসুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়। মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০নং বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৫৫, মূল্য ৩৲।

প্রবন্ধের বই। ইহাতে মোট সাঁইত্রিশটি প্রবন্ধ আছে। পাঁচটি প্রবন্ধ রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কীয়; অন্যান্য প্রবন্ধে অর্থনীতি, সমাজনীতি, স্বাস্থ্য, ব্যাঙ্কিং, মুদ্রাস্ফীতি, যানবাহন, খাদ্যসমস্যা, পশুপালন, শিল্প, দামোদর
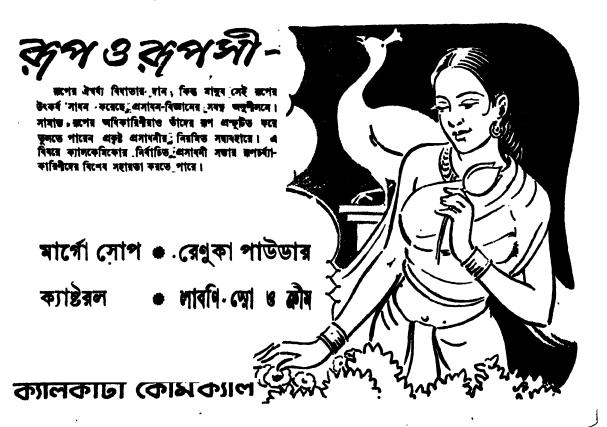
পরিকল্পনা প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। কমার্স ক্লাসের ছাত্র ব্যতীত সাধারণ পাঠকগণও এরূপ পুস্তক পাঠ করিয়া দেশের আধুনিক সমস্যা সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ ভারতীয় পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং জাতীয়তার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া লেখা বলিয়া মনোজ্ঞ হইয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ব্লু-ব্লাড—শ্রীমাধবেন্দ্র মিত্র। প্রকাশক—পর্য্যটক প্রকাশনা ভবন, ১৬৩, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। দাম—২।০

উপন্যাসের নামকরণ হইতে মনে হয় এখানি কোন বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ। মৌলিক বাংলা রচনায় এরূপ নামকরণ আদৌ সুষ্ঠু নহে।

বর্তমান সমাজের কয়েকটি সমস্যাকে লেখক যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা সমালোচনার অতীত নহে। উপন্যাসের নায়ক একদা সন্ন্যাসাশ্রমে ছিল, কিন্তু সে আশ্রম-প্রবেশের কোন ঘাতসহ যুক্তি তার ছিল না, যেমন আশ্রম-ত্যাগের পর তার বাস্তবমুখী চিত্তের দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যায়। অন্তর্মুখীন যে রস-পিপাসা মানুষকে সংসারবিমুখ করিয়া অমৃতলোকের পথে লইয়া যায়, সে সম্পদ সঞ্চয়ের তপস্যা তার ছিল না। তাই সন্ন্যাস গ্রহণ ও বর্জ্জন অনায়াসেই ঘটিয়াছে। ধর্ম্ম যে কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টিমাত্র নহে—এ সত্য প্রায় সর্ব্বজনস্বীকৃত। ধর্ম্মের ব্যাখ্যা যে ভাবেই দেওয়া যাক—বাস্তবভূমিতে দাঁড় করাইয়া লেখক নীতিবিমুখ জগতের একটি চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার নায়ক চিন্তাশীল, অধ্যয়নশীল, প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী—তবুও মনে হয় রক্তমাংসে গড়া সজীব পদার্থ নহে। ঔপন্যাসিক নন বলিয়াই লেখক গল্প-রচনার বহু মাল-মশলা স্বল্পপরিসরের মধ্যে অবহেলায় ছড়াইয়া দিয়াছেন। বহু নরনারীকে টানিয়া আনিয়াছেন, তাহাদের পরিচয়ও কিছু কিছু দিয়াছেন; কিন্তু জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, দ্বন্দ্ব-বেদনাকে রূপ দিবার প্রয়াস মাত্র করেন নাই। কতকগুলি সমস্যা ও প্রচলিত মতবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্য লইয়া কতকগুলি চরিত্র-পরিচিতির সার্থকতা উপন্যাসের ক্ষেত্রে নাই। সমস্যার সঙ্গে কাহিনীকে অঙ্গাঙ্গিভাবে গাঁথিয়া রসসৃষ্টি করিতে না পারিলে একই সঙ্গে দর্শন ও অনুভূতির রাজ্যে সাড়া জাগানো কঠিন।

প্রুফের ত্রুটি ছাড়াও বানানে অনবধানতা আছে। 'র' ও 'ড়' কারের অপপ্রয়োগ এবং চন্দ্রবিন্দু বর্জ্জন তাহার মধ্যে প্রধানতম।

অগ্নিমন্থন—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চৌধুরী। কারবারী হিন্দ লিমিটেড। ১১, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—তিন টাকা।

উপন্যাস লিখিবার প্রয়াস আজকাল বাড়িয়াই চলিয়াছে, কিন্তু ভাষালক্ষ্মীর প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার পরিচয় বহুক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। গল্প শুনিতে কে না ভালবাসে, এবং সেই কারণেই গল্প শোনাইবার আগ্রহ মানুষের স্বাভাবিক। কিন্তু বাহন খোঁড়া হইলে গল্পটি গতিহীন ও ভারগ্রস্ত হইতে বাধ্য। 'অগ্নিমন্থন' উপন্যাসটি এই কারণেই সার্থক সৃষ্টি হয় নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতার অঞ্জলি—সঙ্কলয়িতা ও প্রকাশক: আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ ১৬০; মূল্য—দুই টাকা।

বাংলা সাহিত্যে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করিয়া লেখা দেশের মুক্তি-সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের বিশেষ অভাব রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের ধারাবাহিক কাহিনী 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' এই অভাব বহুলাংশে পূরণ করিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্য্যায়, ধারা ও কাহিনী কিশোরদের উপযোগী করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। স্বাধীনতা-সংখ্যা 'শিশু-সাথী'তে ইহার অনেকগুলি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। এই পুস্তক পড়িয়া কিশোর পাঠক-পাঠিকা জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার কথা, বিপ্লবী বাংলার তরুণদের আত্মদানের কাহিনী, নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিবরণ প্রভৃতি অবগত হইয়া অনুপ্রাণিত হইবে সন্দেহ নাই।

বহু মূল্য দিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হয়; ইহা রক্ষার জন্যও দীপ্ত দেশপ্রেম, ক্ষাত্রবীর্য্য ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন। দেশের কিশোরদিগকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করিতে হইবে। ইহার ফলে দেশের জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ বীরবৃন্দের প্রতি তাহারা যেমন শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিবে, তেমনি নিজেদের জীবন গঠনের উপাদানও সংগ্রহ করিতে পারিবে।

'জাতীয় পতাকা' শীর্ষক প্রবন্ধে মাতঙ্গিনী হাজরা সম্বন্ধে একটু ভুল খবর আছে, মেদিনীপুরে থানা দখল করিতে গিয়া তিনি প্রাণ দেন নাই। ঘটনাটি ঘটে তমলুকে; ১৯৪২ সনের ২৯শে সেপ্টেম্বর স্থানীয় আদালত-প্রাঙ্গণ অভিমুখী দলের পুরোভাগে থাকিয়া পুলিসের গুলীতে তিনি নিহত হন।

কয়েকটি স্বদেশী গান ও কয়েক জন দেশ-নেতার ছবি পুস্তকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট উত্তম।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

তন্ত্রের আলো—শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—চার টাকা।

তান্ত্রিক উপাসনা সমগ্র ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ও বহুলপ্রচারিত। অবশ্য ইহার নামমাত্র শ্রবণে অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন—ইহার কোন কোন অনুষ্ঠান শিষ্ট সমাজে আপাতদৃষ্টিতে গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে; অথচ ইহার তাৎপর্য অনুসন্ধান অনেকেই করেন না—ইহার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিবার আগ্রহ ও চেষ্টারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলে তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্র সাহিত্যের দুর্জ্ঞেয় রহস্য অতি অল্পসংখ্যক লোকের নিকটই সুস্পষ্ট বা পরিচিত। অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য পূজাপদ্ধতি ও বিবিধ অনুষ্ঠানের বিধিনিষেধও যে অনেকেই জানেন এমন কথাও বলা যায় না। এরূপ অবস্থায় তন্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ববিশ্লেষণের যে প্রয়াস আলোচ্য গ্রন্থে দেখা যায় তাহা বিশেষ প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। সুপণ্ডিত গ্রন্থকার মহাশয় তন্ত্রোক্ত শিবতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, সদ্‌বিদ্যা, সম্ভূতি, জীব ও ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন—স্থানে স্থানে বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিবার জন্য আকর-গ্রন্থের উল্লেখ বা তাহা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হই-

রাছে। অবশ্য অজানান্ধকারে আচ্ছন্ন তত্ত্বের গূঢ় রহস্য ইহাতে কতটা আলোকিত হইবে বলা কঠিন। গ্রন্থের অনেক স্থলই যে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভাষাও সর্ব্বত্র নির্দোষ নহে। প্রধান প্রধান তন্ত্রগ্রন্থের—বিশেষ করিয়া যে সমস্ত মূলগ্রন্থ অবলম্বন কারয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহাদের এবং তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের পরিচয় বা বিবরণের অভাবে গ্রন্থখানির অঙ্গহানি ঘটিয়াছে। তন্ত্রনামে পরিচিত সকল গ্রন্থই প্রামাণিক নহে, তাই অবলম্বিত গ্রন্থের প্রামাণ্য নিরূপণও আবশ্যক। দার্শনিক তত্ত্বের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ব্যবস্থা তান্ত্রিক পূজা ও অনুষ্ঠানের মধ্যেই রহিয়াছে এ কথা তান্ত্রিক সমাজে সুবিদিত।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ক্রিব্রাহিম—শ্রীনিশিকান্ত বসু। নব্যবাঙ্গলা সাহিত্য সঙ্ঘ, আলমবাজার। মূল্য এক টাকা।

হালকা ধরণে লেখা বিদ্রূপাত্মক নক্‌শা—আমাদের অস্থির চিত্তের, নিষ্ঠাহীন মনের ছবি। চারি ধর্ম্মের সমন্বয়—সংক্ষেপে 'ক্রিব্রাহিম'। আমরা সবই মানি অথচ কিছুই মানি না, ইহাই লেখক দেখাইতে চাহিয়াছেন।

মায়াপুরী—শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী। ময়মনসিংহ প্রিণ্টার্স লিমিটেড। মূল্য ১।০।

ভরত, কংফুশিয়ো, কালিদাস, ট্রুম্যান, প্রগতি গাঙ্গুলী, কাঞ্চনমালা, রাক্ষসী এই কয়টি চরিত্র অবলম্বনে রচিত ভাবমূলক নাটিকা। কথায় ও গানে আধুনিক নরনারীর হালচাল বর্ণিত হইয়াছে।

সান্ত্বনা—১ম খণ্ড। শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাটুলি, বলাগড় (হুগলী)। মূল্য ১।০।

কয়েকটি গান। প্রাচীন ও নূতন ছন্দ ও ভাষা-ভঙ্গীর উপর লেখকের অনায়াস অধিকার আছে।

শিল্পকথা—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। দি কালচার পাবলিশার্স। ৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লেখক পাণ্ডিত্য এবং সমালোচন-নৈপুণ্যের জন্য বিখ্যাত। তাঁহার লেখায় একটি স্বাধীন চিন্তাশীল রসপিপাসু মনের সাক্ষাৎ পাই। কেবল বাংলা নহে, সংস্কৃত, ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যেও তাঁহার অনায়াস প্রবেশাধিকার। বিভিন্ন দেশের মনীষিগণের ভাবরসে তাঁহার চিত্ত পরিপুষ্ট। বর্ত্তমান গ্রন্থে 'শিল্পকথা', 'শিল্প ও জীবন', 'কবি ও যোগী', 'ধ্বনিরাজ্য কাব্যস্ত', 'মালার্মে', 'উপনিষদের সুন্দর', 'কবিত্বের স্বরূপ', 'আধুনিক কবিত্ব', 'কাব্যের মহত্ত্ব', 'কাব্য ও ছন্দ', 'ছন্দের অ-আ', 'কবিত্বের একটি সূত্র', 'লোকোত্তর চেতনার কবিতা', 'কাব্য ও মন্ত্র', 'নব্য কাব্য', 'ইংরাজী ও ফরাসী', 'বাংলা লিপি-সংস্কার'—এই সতেরটি প্রবন্ধ আছে। সবগুলিই সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রাচীন ও নবীন উভয় সাহিত্যেই লেখক জীবন-রহস্য-রসের সন্ধান করিয়াছেন। নব্য সাহিত্যের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন। 'লিপি-সংস্কার' বিষয়ে তিনি উৎসাহী নহেন, কারণ তিনি অনুভব করেন "লিপি ভাষার জড় কাঠামো বা সঙ্কেত মাত্র নয়। লিপিরও আছে একটা প্রাণ, প্রকাশ ক্ষমতা, সৌন্দর্য্য। ...আশঙ্কা হয়, সারল্যের দোহাই দিয়ে আমরা শ্রীহীনতার মধ্যে গিয়ে না পড়ি।"

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উদ্দাম যৌবনে—উপন্যাস। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—পোঃ গড়িয়া, ২৪ পরগণা, লেখকের নিকট। মূল্য ৩৲।

আলোচ্য পুস্তকখানি ভূপর্য্যটক ক্ষিতীশবাবুর প্রথম উপন্যাস। কিন্তু প্রথম উদ্যম হিসাবেও উৎসাহ দিতে পারিলাম না। কোন চরিত্রই ফুটিয়া উঠে নাই, অথচ অবাস্তব এবং অবাঞ্ছনীয় ঘটনার ভিড়ে উপন্যাসখানি ভারাক্রান্ত। লেখক ভূমিকায় তাঁর পুস্তক-সমালোচনা নিজেই করিয়া নূতনত্ব দেখাইয়াছেন।

সেরা মানুষ গান্ধীজী—শ্রীবিজয়রতন বসাক ও শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী। সি, সি, বসাক এণ্ড সন্স। ১২৭, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—উপহার সংস্করণ ৸৴০, সুলভ সংস্করণ ।৵০।

মহাত্মা গান্ধীর কর্ম্মময় জীবনের কাহিনীগুলি ছোটদের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। গান্ধীজীর সত্যনিষ্ঠার এবং মহৎ আদর্শের জীবন্ত দৃষ্টান্তগুলি ছোটদের জীবন গঠনে যথেষ্ট সহায়ক হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বাংলার দামাল ছেলে—শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী। অভিযান গ্রন্থমালার দ্বিতীয় বই। পরিবেশক: সেনগুপ্ত এণ্ড কোং, ২।১ নবীন কুণ্ড লেন ও এ, কে পালিত এণ্ড কোং, ৮নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় বাংলার তথা ভারতের গৌরব সুভাষচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের চমকপ্রদ কাহিনী ছোটদের বুঝিবার মত সহজ করিয়া লিখিত হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে স্বভাবতঃই মনের মধ্যে বিস্ময় উত্তেজনা এবং বেদনার সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্ব্বেই প্রভাতবাবু "বাঘ সিংহের লড়াই" লিখিয়া বিষয়-নির্ব্বাচনের জন্য ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকখানিরও আমরা প্রশংসা করিতেছি।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

অন্তরালে—শ্রীকানাইলাল ঘোষ। উষা পাবলিশিং হাউস। ৩৪নং মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

আমাদের সভ্য সমাজে লোকচক্ষুর অন্তরালে কত যে পাপ ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা চলিতেছে, মুহূর্ত্তের ভুলে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া কত স্ত্রী-পুরুষ যে নিজের জীবনে চরম দুর্ভাগ্যকে ডাকিয়া আনিতেছে তাহার আর অন্ত নাই। লেখক বর্ত্তমান উপন্যাসে সমাজের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকেরই ছবি ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু ক্ষমতার অভাবে তাহার পুস্তকখানি রসসৃষ্টি হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে। ইহাতে না আছে প্লটের বাঁধুনি, না আছে ভাষার গাঁথুনি কিংবা সার্থক চরিত্রসৃষ্টি। 'ফিমেল ডিজিজ স্পেশালিষ্ট' ডাক্তার চৌধুরীর 'চেম্বারে' গভীর রাত্রে একের পর এক ব্যভিচারী এবং ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীরা আসিয়া নিজেদের অতীত দুষ্কর্মের কথা স্বীকার করিতেছে। সেই দীর্ঘ ও ভয়াবহ বর্ণনা এতই বিরক্তিকর যে ধৈর্য্য ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া উঠা সম্ভবপর হয় না। লেখকের অপূর্ব্ব ভাষাজ্ঞানের কতকগুলি উৎকট দৃষ্টান্ত দিয়ে দিতেছি:

উচ্ছ্বাসিত, মুহূর্তের মোহাযে, লোকলজ্জার মোহাযে, স্বার্থের মোহাযে—(এই মোহাযের মানে কি মোহন করিয়া?, কোটরাগত চক্ষু, ঘূর্ণাক্ষরে। করণীয় কর্ত্তব্য (অকরণীয় কর্ত্তব্য কিছু আছে কি?)। উপহাসে হেসে উঠেছিলাম। পিতার পৌরুষত্ব (বীর্য্য) আছে। ইংরেজী জ্ঞানের একটু নমুনা: মিট টু ডেথ। সিন্থেটিক পরজন (চার-পাঁচবার আছে) এটা কি রকম 'পরজন'?

আর দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

ছবি ছড়ায় জহরলাল—শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী। রত্নাকর পাবলিশিং হাউস। ১৬৩-এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯। মূল্য ৳০।

এই পুস্তকে ছবি ও ছড়ায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর জীবন-কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার এক পৃষ্ঠায় ছবি এবং অন্য পৃষ্ঠায় দুইটি করিয়া ছড়া আছে। লেখক লেখায় জবাহরলালের জীবনের যে ঘটনাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, রেখায় তাহা যেন চোখের সামনে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

১। কলিকাতা ২। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ ৩। পুরী ৪। বারাণসী। ৫। দার্জ্জিলিং ৬। দিল্লী—সি এ পার্কহি প্রণীত ইংরেজী পুস্তক হইতে শ্রীললিত ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত। ম্যাকমিলান এণ্ড কোং লিমিটেড, ২৯৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে ৳০, ১০, ৶০, ৶০, ৶১০, ৩।০।

পুস্তিকাগুলি অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত হইয়াছে। সহজ ও স্বচ্ছ ভাষায় বর্ত্তমান ভারতবর্ষের বিখ্যাত নগরীগুলির প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া লেখক ছেলেমেয়েদের মনে ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কৌতূহল উদ্রেক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা, প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নয়নরঞ্জন সু-অঙ্কিত চিত্র-শোভিত বইগুলি ছেলেদের মনোরঞ্জন করিবে।

১। গীতাবীথি ২। ধারা—শ্রীবিজয়গোপাল। প্রাপ্তিস্থান, —উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা। প্রত্যেকের মূল্য ২৲।

প্রথম পুস্তকখানি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উদ্দেশে রচিত গীতাবলীর সঙ্কলন। গানগুলি ভাষা ও ছন্দ এমন সুমিষ্ট এবং মর্ম্মস্পর্শী যে, পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

দ্বিতীয় পুস্তকের ভাবধারা মূলতঃ এই যে, মানবের অনন্ত পিপাসা অনন্ত প্রেমময় ভগবানে আত্মসমর্পণেই চরিতার্থতা লাভ করে। মহাসিন্ধু হইতে জন্মলাভ করিয়া বারিবিন্দুসমূহ যেমন পাহাড়ের অন্ধকার গুহাতলে সঞ্চিত হইয়া পুনরায় সাগরের ডাকে পাষাণকারা ভেদ করিয়া কত বন-উপবন, প্রান্তর-লোকালয়, মরু-কান্তার পার হইয়া অবশেষে মহাসিন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া শান্তিলাভ করে, মানবের জীবনধারাও তেমনই অনন্ত প্রেমময়ের বাঁশীর ডাকে অধীর হইয়া শৈশব ও যৌবনের হাসি-কান্না ও সুখদুঃখের স্মৃতিবিজড়িত দিনের শেষে জীবনসায়াহ্নে ভগবানের ধ্যানে জ্ঞানে তন্ময় হইয়া আত্মস্থ হয়। দার্শনিক মহেন্দ্রনাথ সরকার ভূমিকায় ইহার একটি চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাহিত্যে নবাগত কবির ভাবের গভীরতা ও ভাষার লালিত্য প্রশংসনীয়।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

দেশ-বিদেশের কথা

বাঙালী বৈজ্ঞানিকের কৃতিত্ব

আমেরিকা, কানাডা এবং ইংলণ্ড হইতে উচ্চশিক্ষালাভ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সমাপ্ত করিয়া শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার আচার্য্য, পি-এইচডি (লণ্ডন) ডি-এসসি (কলিকাতা) সম্প্রতি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ডক্টর আচার্য্য ১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এসসি উপাধি লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি সার তারকনাথ পালিত বৈদেশিক ফেলোশিপ বৃত্তি লাভ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. ডব্লু. ম্যাকবেন, এফ-আর এস, কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরলোকগত ই. এফ. বার্টন এবং লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের অধ্যাপক জি. আই. ফিনচ, এফ-আর-এস প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সহিত তিনি গবেষণা-কার্য্যে রত ছিলেন।

প্রাকৃতিক রসায়ন (Physical Chemistry) ব্যতীত ডাঃ আচার্য্য ইলেকট্রন অপটিক্স নামে এক আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ও ইলেকট্রন ডাইফ্র্যাকশন এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। ডাঃ আচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসবিহারী ঘোষ বৃত্তি এবং নাগার্জ্জুন পুরস্কারও লাভ করিয়াছেন। ডাঃ আচার্য্য সংস্কৃত সাহিত্যেও বিশেষ পারদর্শী।

ছাত্রজীবনে কুমিল্লায় ঈশ্বর পাঠশালার টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া তিনি বিদ্যাবিনোদ ও ব্যাকরণতীর্থ উপাধি লাভ করেন। ত্রিপুরার রাজবৈদ্য মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের অর্থানুকূল্যে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ এবং সাংখ্য-বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ডক্টর আচার্য্য ত্রিপুরা জেলার বাখরাবাদ গ্রামের অধিবাসী। তাঁহার পিতা পরলোকগত কৃষ্ণকুমার আচার্য্য একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ শেঠ

জন্ম: ২৫শে আশ্বিন, ১২৮৫। মৃত্যু: ২৮শে আশ্বিন, ১৩৫৫।

(বিবিধ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)

বেলাশেষের তান

শ্রীপ্রিয়প্রসাদ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সাংহাইয়ের ইয়াংসি নদীতীরস্থ 'বুলেভার' বা প্রশস্ত রাজপথের দৃশ্য

চীনের বৃহৎ প্রাচীরের একাংশের দৃশ্য

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৫৫ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কংগ্রেস অধিবেশন

স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইতেছে। কংগ্রেসের চালক-পরিষদ তাহার পূর্ব্বে দিল্লীতে মিলিত হইয়া নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা করিয়াছেন। সাধারণের সম্মুখে তাহার কিছু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, কিছু অংশ বোধ হয় এখনও চাপা আছে, কংগ্রেসের অধিবেশনের মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেও পারে। দিল্লীর ওয়াকিবহাল মহলের কথায় বুঝা যায় যে, চালক-পরিষদ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর আদেশ-উপদেশ দানের অধিকার পাইতে ইচ্ছুক। মন্ত্রিমণ্ডলীর বাহিরে যে সকল কংগ্রেসের মোড়ল নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির পরিচালকরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের বক্তব্য এই যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীগুলি কংগ্রেসের—অর্থাৎ তাঁহাদের—আজ্ঞাবাহী হওয়া উচিত, নতুবা দেশশাসনে ও পরিচালনে কংগ্রেসের আদর্শ রক্ষা সম্ভব হইবে না। এরূপ দাবি সত্য সত্যই হইয়াছে কি না তাহা সঠিক না জানায় আমরা তাহার বিচার মুলতুবী রাখিলাম।

কংগ্রেস-চালক-পরিষদ অধিবেশনের পূর্ব্বাহ্নে খবরের কাগজে যে সকল প্রস্তাবাবলী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে মনে হয় যে ঐরূপ কোনও একটা গুপ্ত অভিযান সত্য সত্যই চলিতেছে। নহিলে স্বাধীন ভারতের প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে ঐরূপ অবাস্তব ফাঁকা আওয়াজ ও সাধু উদ্দেশ্যপূর্ণ ভুয়া কথার ছিনিমিনি খেলা হইত না। দেশের সাধারণের দুঃখকষ্ট বা অজ্ঞানতা মোচনে দেশের চালকদিগের প্রতি কোন নির্দ্দেশ ইহাতে নাই, কংগ্রেসের আদর্শ খর্ব্ব হইয়া দেশ কিরূপে অনাচারমগ্ন হইতেছে তাহারও কোন আলোচনা প্রসঙ্গ ইহাতে নাই।

সর্ব্বাগ্রে মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্কে যে প্রস্তাবনা করিয়া পরিষদ স্মৃতিতর্পণ ও কর্ত্তব্য পালনের পর্ব্ব শেষ করিয়াছেন তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল :

"দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেসকে কখনও ক্লেশ, কখনও সার্থকতা, কখনও বিজয়, কখনও পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু জাতির জনকের সুমহান্ নেতৃত্বে এই ক্লেশ জনসাধারণকে অভিভূত করিয়াছে, পরাজয় জাতীয় প্রচেষ্টায় দ্বিগুণ উৎসাহের সঞ্চার করিয়া বিজয়ের সূচনা করিয়াছে।

"দুই বৎসর পূর্ব্বে এক সঙ্কটকালে মীরাট শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, এই সঙ্কটের মধ্যেও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বই জাতিকে পরিচালিত করিয়াছে। এই দুই বৎসরের মধ্যে আমাদের কতক পরিমাণ সার্থকতা আসিয়াছে, দীর্ঘদিনব্যাপী স্বাধীনতা-সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু এজন্য আমাদের যে মূল্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা খুবই বেশী। জন্মভূমিকে বিখণ্ডিত করা হইয়াছে। এই অবাঞ্ছিত দেশ বিভাগে জনসাধারণের মধ্যে উন্মত্ততা দেখা দেয়। মনে হয় যে, কংগ্রেসের আদর্শ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। গান্ধীজীর উদাত্ত বাণী সেই অন্ধকারের মধ্যেও আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করে, শোকাভিভূত অসংখ্য নরনারী সেই বাণী হইতে শক্তি ও সান্ত্বনা সংগ্রহ করিয়াছিল।

"ইহার পর আমাদের প্রতি চরম আঘাত আসে। প্রেম এবং শান্তির প্রতীক যিনি, ভারতের অপরাজেয় অন্তরাত্মার প্রতীক যিনি, সেই মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হইল।

"ইহার ফলে কংগ্রেসের দীর্ঘ সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হইলেও ইহা মুক্তির আনন্দ না আনিয়া দুঃখ এবং বিভ্রান্তই আনিয়া দিল।

"স্বাধীনতা অর্জ্জনের ষোল মাস পরে এবং কংগ্রেসকে যিনি গঠন করিয়াছেন, ইহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এগার মাস পরে কংগ্রেস সেই মহান্ আত্মা এবং তাঁহার বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে এবং প্রতিজ্ঞা করিতেছে যে, সেই সঞ্জীবনী বাণী অনুসরণ করিয়াই কংগ্রেস ভারত ও বিশ্ব-মানবের সেবা করিয়া যাইবে।

"ভারত স্বাধীনতা পাইয়াছে, কিন্তু ইহার ফলভোগের জন্য আমাদের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। কংগ্রেস-সেবীদের মনে রাখিতে হইবে জনসেবার ভার গ্রহণ করিবার গুরুদায়িত্ব তাহাদের রহিয়াছে এবং যাহারা এই দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য ভুলিয়া চাকুরী এবং ক্ষমতার জন্য লালায়িত হয়, তাহারা দেশের অহিতসাধন করিতেছে।

"ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যের এবং মিলনের ভাব বৃদ্ধি করিতে হইবে, শ্রেণী-বিভেদ দূর করিতে হইবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রেণীহীন গণতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ছিল গান্ধীজীর উপদেশ। তিনি বলিয়াছেন, নৈতিক আদর্শের প্রতি অবিচলিত থাকিতে হইবে, ইহাই জীবনকে অর্থপূর্ণ করিবে।"

এই তর্পণমূলক প্রস্তাবটিতে বিশেষ দ্রষ্টব্য এইমাত্র যে, দেশপিতার আকস্মিক মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ও আদর্শ সম্পর্কে তাঁহার স্বলিখিত যে সকল নির্দ্দেশ "হরিজনে" ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল সে সম্পর্কে কংগ্রেস-চালক-পরিষদ একেবারে নীরবতা অবলম্ব করিয়াছেন।

সর্দ্দার প্যাটেল ও পুলিস

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতীয় কংগ্রেস-শাসনযন্ত্রের সবল দক্ষিণ বাহু স্বরূপ এবং তিনি বাস্তবেও বিশ্বাসী। তাঁহার জীবনের সন্ধ্যা উপস্থিত, এখন তাঁহার খোলা কথা বলিবার সময় হইয়াছে। দিল্লীর পুলিসবাহিনীকে তিনি বলিয়াছেন :—

"আপনারা জনসেবার মনোভাব লইয়া কাজ করিবেন এবং জনসাধারণের আস্থাভাজন হইবেন।" "জনসাধারণ গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করিবে তাহা প্রধানতঃ আপনাদের কাজের উপরই নির্ভর করে।"

"ভারত স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে পুলিসের কাজের ফলে জনসাধারণের সহিত তাহাদের প্রায়ই বিরোধ উপস্থিত হইত। পুলিস তখন জনসাধারণের নিকট অপ্রিয় ছিল। সমগ্র দেশব্যাপী পুলিসবাহিনীর এই কুখ্যাতি রহিয়াছে। এই কুখ্যাতি আজও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। এত দীর্ঘদিন ধরিয়া যাহার অস্তিত্ব ছিল তাহা দূর হইতে সময় লাগিবে।"

"কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। ভারত স্বাধীন হইয়াছে এবং জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুলিস এবং জনসাধারণের মনোভাবেরও পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন। দক্ষ এবং জনপ্রিয় পুলিসবাহিনী ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট পরিচালনা সম্ভবপর নহে। আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষা করা পুলিসের কার্য্য এবং সর্ব্বত্র শান্তি রক্ষিত না হইলে নাগরিক জীবন যাপন অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং পুলিসের কার্য্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সরকারের জনপ্রিয়তা তাহাদের কার্য্যের উপরই নির্ভর করে।"

"পুলিসবাহিনী এমন শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন যেন আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষার জন্য কখনও সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন না হয়। সৈন্যবাহিনী দেশের সীমান্ত রক্ষা করিবে, আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীর সহায়তা প্রয়োজন হইলে উহা গবর্ণমেণ্টের দক্ষতার পরিচায়ক নহে।"

"আপনারা জনসাধারণের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করিবেন এবং তাহাদের আস্থাভাজন হইবেন। ইহা খুব কঠিন কাজ নহে। পুলিস যদি আন্তরিকতার সহিত জনসাধারণের সেবা করে, জনসাধারণের সহযোগিতা না পাইবার কোন কারণ নাই। পুলিসবাহিনীর সকলেই শান্তিকামী জনসাধারণের সেবক। যাহারা আইনভঙ্গ করে তাহাদের প্রতিও কঠোর ব্যবহার করা উচিত নয়। ইহাদিগকে শান্তিপ্রিয় নাগরিক করিয়া তোলাই পুলিসের কাজ।"

ইহা খুব আশাপ্রদ খাঁটি ভাষণ। কংগ্রেস-নেতৃবর্গকে এই জাতীয় কিছু উপদেশ দিলে দেশের উপকার হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শাসনকার্য্যে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের হস্তক্ষেপ

শাসনকার্য্যে, বিশেষতঃ ফৌজদারী মামলার বিচারে, কংগ্রেস কমিটিসমূহের সভাপতি ও সম্পাদকদের হস্তক্ষেপ প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং ইহার ফলে বিচারবিভ্রাট প্রায়শঃই ঘটিতেছে। ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এই ধরণের কার্য্যে সাধারণ লোকের যেমন অসুবিধা ঘটিতেছে, তেমনই লোকে কংগ্রেসের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে। কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন লোকের এই কার্য্যের ফলে সাধারণ লোকে সমগ্র কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানের উপর দোষারোপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কংগ্রেসের সুনামের পক্ষে ইহা অত্যন্ত হানিকর।

সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি একটি মামলার বিচারকালে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের এই ধরণের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আদালতে মামলা চলিতে থাকাকালে কোন কংগ্রেস-কর্ম্মী পক্ষ বিশেষের হইয়া কোন রিপোর্ট দাখিল করিলে তাহা আদালত অবমাননার সামিল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কারণ উহা আদালতের বিচারকে প্রভাবান্বিত করে। পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁহার রায়ে তীব্র মন্তব্য করিয়া বলেন যে ফৌজদারী মামলার বিচারকালে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের হস্তক্ষেপ বড় বেশী ঘটিতেছে, ইহা বন্ধ হওয়া দরকার। এই ধরণের হস্তক্ষেপ হওয়ামাত্র তাঁহাদিগকে আদালত অবমাননায় অভিযুক্ত করিবার জন্য প্রধান বিচারপতি নিম্ন আদালতসমূহকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, হয় তাঁহারা নিজেরা উহা করিবেন নতুবা হাইকোর্টকে জানাইবেন; হাইকোর্ট তাঁহাদের নামে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনিবেন। বিহারের একটি মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এক জমি দখলের মামলায় হস্তক্ষেপ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন এবং উহাতে মামলার মোড় ঘুরিয়া যায়। ব্যাপার হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়াইলে প্রধান বিচারপতি উপরোক্তরূপ তীব্র মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশেও এই শ্রেণীর হস্তক্ষেপ খুব বেশী রকম আরম্ভ হইয়াছে। এখানে এই প্রথার আর বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই বন্ধ হওয়া দরকার।

ব্যক্তিস্বাধীনতা

ভারতবর্ষের নূতন রাষ্ট্রবিধিতে ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারাটি সামান্য সংশোধনের পর গৃহীত হইয়াছে। রাষ্ট্রবিধির ১৩ ধারায় ব্যক্তিস্বাধীনতার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এবং ৯ ধারায় বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কোচ করিয়া কোন আইন ভারতবর্ষের কোন আইনসভা পাশ করিতে পারিবে না। প্রচলিত আইনসমূহের মধ্যে যেগুলি ব্যক্তিস্বাধীনতা ধারার পরিপন্থী সেগুলিও বাতিল হইয়া যাইবে। মানুষে মানুষে বৈষম্যমূলক কোন ব্যবস্থা অবশ্য ব্যক্তিস্বাধীনতা-রূপে গণ্য হইবে না এবং তাহা দূর করিবার জন্য আইন প্রণয়নে কোন বাধা থাকিবে না।

রাষ্ট্রবিধির ১৩ ধারায় রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ দেওয়া হইয়াছে :

(১) বক্তৃতা ও রচনার স্বাধীনতা।

(২) নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা।

(৩) সঙ্ঘ ও ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা।

(৪) ভারতের সর্ব্বত্র অবাধে চলাফেরার স্বাধীনতা।

(৫) ভারতের যে কোন স্থানে স্থায়ী ও অস্থায়ী বসবাসের স্বাধীনতা।

(৬) সম্পত্তি অর্জ্জন, ভোগ ও বিক্রয়ের স্বাধীনতা।

(৭) ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা জীবিকার্জ্জনের স্বাধীনতা।

প্রত্যেকটি স্বাধীনতার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আবার ঐগুলি সঙ্কোচ করিবার অধিকার রাষ্ট্রকে দেওয়া হইয়াছে। ইহাই ভারতীয় রাষ্ট্রবিধির ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারাটির বিশেষত্ব। যথা, বক্তৃতা ও রচনার স্বাধীনতা ১৩ (১) (ক) ধারায় স্বীকার করিয়া ১৩ (২) ধারায় বলা হইয়াছে যে মানহানি, সিডিশন অথবা দুর্নীতিমূলক কার্য্যকলাপ অথবা রাষ্ট্রের ক্ষমতা বা বনিয়াদ ধ্বংসকারী কার্য্যকলাপ প্রভৃতি নিবারণের জন্য বক্তৃতা ও রচনার স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিয়া আইন প্রণয়ন করিলে তাহা ১৩ (১) (ক) ধারার পরিপন্থী হইবে না। অন্যান্য বিষয়গুলি সম্বন্ধেও এই ভাবে স্বাধীনতা দানের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সঙ্কোচের অধিকারও দেওয়া হইয়াছে। গণ-পরিষদে বিতর্কের সময় কথা উঠে যে আমেরিকান রাষ্ট্রবিধিতে ব্যক্তিস্বাধীনতার সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে এবং কোন সময়েই উহাতে হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা শাসন বিভাগ বা আইনপ্রণেতাদের দেওয়া হয় নাই। পৌনে দুই শত বৎসর যাবৎ এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। ভারতীয় রাষ্ট্রবিধিতেও ব্যক্তিস্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ এই ভাবেই হওয়া উচিত। এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। রাষ্ট্রবিধির খসড়ার ধারাগুলি যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে সেই ভাবে গৃহীত হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্কোচ যে কি ভাবে হইতে পারে, তাহা বর্ত্তমান প্রচলিত সিকিউরিটি আইনে দেখা গিয়াছে। আইনটি কম্যুনিষ্ট দমনের মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া প্রণীত হয় কিন্তু পরে উহা যেভাবে প্রযুক্ত হইতেছে তাহাতে সুপরিচিত কম্যুনিষ্ট বিরোধী কর্ম্মীও উহার কবল হইতে রেহাই পায় নাই। সম্প্রতি আইনটি সংশোধন করিয়া এমন করা হইয়াছে যে উহার প্রয়োগ ব্যাপারে হাইকোর্টেরও হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কোচমূলক ব্রহ্মাস্ত্রটির প্রয়োগ এখন শাসকদের হাতে নিরঙ্কুশ ভাবে বর্ত্তিয়াছে। ভবিষ্যতেও এই ভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও বনিয়াদ ধ্বংসকারী কার্য্যকলাপ নিবারণের নামে ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কোচমূলক আইন প্রণয়ন করিয়া উহা বিপক্ষ দলের বা ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত হইবে এই আশঙ্কা আদৌ অমূলক নহে। ১৩ ধারায় অন্ততঃ এইটুকু উল্লেখ থাকা উচিত ছিল যে ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কোচমূলক কোন আইন প্রণয়নের সময়ে আদালতের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করা চলিবে না। আদালত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ আলোচনা কালেও এই ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ব্যক্তিস্বাধীনতার সর্ব্বপ্রথম বিষয় বিনা বিচারে গ্রেপ্তার না হওয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারা আলোচনার দিন পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ভাইস-প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে গণ-পরিষদে কোরাম নাই। তখন কোরামের ঘণ্টা বাজানো হয় এবং কয়েকজন সদস্য উহা শুনিয়া পরিষদগৃহে প্রবেশ করেন। তাঁহারা পরিষদ-গৃহের আশেপাশেই ছিলেন কিন্তু আলোচনায় যোগদানের জন্য উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ইঁহারা আসিবার পরও উপস্থিত সদস্য-সংখ্যা নিতান্ত কম মনে করিয়া ভাইস-প্রেসিডেন্ট ১৫ মিনিটের জন্য পরিষদের কাজ মুলতুবী রাখেন। রাষ্ট্রবিধি প্রণয়ন, বিশেষভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক পরিচ্ছেদ আলোচনায় বর্ত্তমান কংগ্রেস সদস্যবৃন্দের উৎসাহ ও দায়িত্ববোধ কতখানি এই ঘটনা তাহার সামান্য পরিচয় মাত্র। ইঁহারা যে কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছেন তাহার জন্য দিল্লী যাওয়া-আসার প্রথম-শ্রেণীর গাড়ী-ভাড়া ব্যতীত সেখানে অবস্থানের জন্য বোধ হয় দৈনিক ৪৫৲ টাকা করিয়া ভাতাও পাইতেছেন।

ভারতরাষ্ট্রের ও পাকিস্থানের সীমানা

গত ২২শে অগ্রহায়ণ হইতে এই দুই রাষ্ট্রের প্রধানগণ নূতন দিল্লীতে মিলিত হইয়াছেন। সংবাদ পাইলাম যে এই সম্মেলনের প্রথম দিনে ৭টি কমিটি গঠিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে চতুর্থটি হইতেছে ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নানা "পাকিস্থানী" গণ্ডগোল লইয়া। সংবাদপত্রে এই বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে—পূর্ব্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ-আসাম এবং পূর্ব্ব-পঞ্জাব-পশ্চিম-পঞ্জাবের সীমানা-বিরোধ

কমিটি পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও ত্রিপুরার সীমানা বিরোধ ও ঘটনাবলীর এবং পূর্ব্ব-পশ্চিম পঞ্জাব সীমান্তের ঘটনাবলীর আলোচনা এবং (১) বিরোধসমূহের নিষ্পত্তি ও (২) এইরূপ ঘটনাবলী বন্ধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাব করা। আমরা পূর্ব্ব-পঞ্জাবের পশ্চিম সীমান্তে গোলাগুলি বর্ষণের কথা শুনিয়াছি; সম্মেলনের অধিবেশন সময়ে পর্য্যন্ত তাহা চলিতেছে; উভয় রাষ্ট্রের পুলিশ-বাহিনী পর্য্যন্ত ইহাতে লিপ্ত। সংবাদপত্রের বিবরণ পাঠ করিয়া এই ব্যাপারে দোষী-নির্দোষী নির্দ্দেশ করা সহজ নয়, এবং কলিকাতায় বসিয়া তাহা করিতেও চাহি না। ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্তের উত্তর হইতে দক্ষিণে যে বিভাগরেখা র‍্যাডক্লিফ সাহেব টানিয়া দিয়াছেন আসাম হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত, তৎসম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। তাহার ফলে আমরা বলিতে চাই—পূর্ব্ববঙ্গের "পাকিস্থানীদের" লোভ সংযত না হইলে, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিরক্ষা করা কঠিন হইবে। মুর্শিদাবাদ ও কাছাড় অঞ্চলে যে চোরাগুপ্তি আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ চলিতেছে, ইহার উল্লেখ না করিয়াও আশঙ্কার কারণ আছে।

দিল্লীর সম্মেলনে এই সব কথা উঠিবে। কিন্তু ৪নং কমিটির নির্দ্দেশনামার মধ্যে একটা বিষয়ের অনুল্লেখ দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা-নামার সংশোধনের কথার উল্লেখ কেন করা হয় নাই, তার কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। "আনন্দবাজার-পত্রিকার" সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য এই বিষয়ে বার-তেরটি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই বাঁটোয়ারা-নামার সংশোধন অপরিহার্য্য। এতৎসম্বন্ধে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ১৯৪৭ সালের ১৯শে আগষ্টের বিবৃতির একাংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনার দাবীর যুক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন: "বর্ত্তমান বাঁটোয়ারার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ভারত ও পাকিস্থানের নেতারা ভবিষ্যতে পরস্পর আপোষ বন্দোবস্ত করিবেন; ইহার প্রতিবন্ধক কিছু নাই।" উক্ত বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে দুই পক্ষেরই "আপত্তির হেতু আছে," এই স্বীকৃতির পর কেন এই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয় নাই, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়।

পাকিস্থান ও ত্রিপুরা রাজ্য

ত্রিপুরা রাজ্যের উপর প্রায় দুই মাস যাবৎ পাকিস্থানীদের আক্রমণ চলিতেছে। রাজ্যটির অর্থনৈতিক অবরোধ বসানো হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাজ্যের কর্ম্মচারীদের সীমান্তের নিকটে পাইলেই পাকিস্থানীরা তাহাদিগকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে; জনৈক কয়েষ্ট অফিসারকে অতিশয় নৃশংসভাবে হত্যা করাও হইয়াছে। রাজ্যের মধ্যে হানা দিয়া লুঠ করা, ঘরে আগুন দেওয়া প্রভৃতি ক্রমেই বাড়িতেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মুসলমান প্রজাদের উপর অত্যাচারের কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করিয়া পাকিস্থানীদের উত্তেজিত করা হইতেছে এবং এই কার্য্যে নোয়াখালীর জনৈক কুখ্যাত লীগনেতা সকলের অগ্রণী বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কাজই কলিকাতা আন্তঃডোমিনিয়ন চুক্তির পরিপন্থী, বহুবার পূর্ব্ববঙ্গ সরকারকে এই সমস্ত অন্যায় কার্য্যের বিবরণ জানাইয়াও কোন ফল হয় নাই।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা জেলায় এই মর্ম্মে এক ছাপানো ইস্তাহার বিলি করা হইয়াছে যে, ত্রিপুরারাজ্যের ভারত ডোমিনিয়নে যোগদান নিন্দনীয় কার্য্য হইয়াছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃত অধিকারী পাকিস্থানীরা; কোন পার্থিব শক্তি পাকিস্থানীদের এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

এই ব্যাপারে পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস প্রভৃতির নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। "আজাদ" পত্রে পূর্ব্ববঙ্গের জনৈক মন্ত্রীর যে সব উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ঐ গবর্ণমেণ্টের কর্ণধারগণের ত্রিপুরা সম্বন্ধে মনোভাব কি তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষাত্রবৃত্তি

পশ্চিমবঙ্গে সামরিক সংগঠন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ অন্যত্র প্রকাশিত হইল। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের পর হইতে প্রতি মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় যে সব সম্পাদকীয় মন্তব্য এই বিষয়ে প্রকাশিত হইয়াছে, প্রবন্ধ-লেখক তাহা প্রমাণ-প্রয়োগে সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীমনবাহাদুর সিং জাতিতে গোর্খা হইলেও আদর্শ ও মননশীলতায় তাঁহাকে বাঙালী হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার উপায় তিনি রাখেন নাই। এই প্রবন্ধই তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। একজন অবাঙালী এমন ঝরঝরে বাংলা লিখিতে ও বলিতে পারেন, তাহা সহজে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু সিং মহাশয় সে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যেই পরিচয় পাওয়া যায় যে, প্রায় চল্লিশ বৎসর হইতে তিনি বাঙালী জীবনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 'বাঙালী পল্টনে' যোগদান হইতে আজ পর্য্যন্ত তিনি বাঙালীর মধ্যে ক্ষাত্রবৃত্তি পুনরুত্থানের দুরূহ কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন বলিলে অন্যায় হইবে না। এই বিষয়ে তাঁহার বাস্তব জ্ঞান কত গভীর বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে সামরিক বৃত্তি প্রবর্ত্তন করা সহজ হইবে না। এই বিষয়ে আমরা প্রতি সংখ্যায় আমাদের নেতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রদেশের দুইটি মন্ত্রিমণ্ডল—ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের

নেতৃত্বে গঠিত। ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমরা মাসের পর মাস এই সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন জানাইতেছি। ডাঃ ঘোষের নিকট হইতে কোন উত্তর পাই নাই; গান্ধীবাদী বলিয়া বোধ হয় সামরিক বৃত্তির প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা ছিল। ডাঃ রায় এই বিষয়ে সজাগ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তিনিও নানা বাধানিষেধ ও অনভিজ্ঞতার জালে পদে পদে আটকাইয়া যাইতেছেন। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের সামরিক নিয়মকানুন এই সব বাধার সৃষ্টি করিয়াছে; ইংরেজের পরিত্যক্ত ঠাট বজায় রাখিয়াই তাঁহারা দিনগত পাপক্ষয় করিয়া যাইতেছেন। কাশ্মীর অভিযানও নূতন করিয়া কোন কিছু করিবার অবকাশ দিতেছে না। কিন্তু ডাঃ রায়ের আসল প্রতিবন্ধক তাঁহার প্রদেশের লোকের নিশ্চেষ্টতা; সামরিক বৃত্তি সম্বন্ধে অনুৎসাহ। শ্রীমন বাহাদুর সিং ১৯১৮-১৯ সালের বাঙালী নেতৃবর্গের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, আজও তাহা অনেকাংশে প্রযোজ্য। শিখ, গাড়োয়ালী, গোর্খা, রাজপুত, মারাঠি, মাদ্রাজী ইংরেজ আমলে বাংলাদেশের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে এবং আজও তাহা করিবে এই ভরসায় আমরা দিন কাটাইতেছি। এই মনোভাবের পরিবর্তন না হইলে 'বাবু' জা'ত বাঙালীর হাতে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া কোন ফল হইবে না। শ্রীমন বাহাদুর সিং বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অকাট্য সত্য, এবং তাহা আমাদের আত্মাভিমানে আঘাত দিতে পারে। এরূপ আঘাতের প্রয়োজন আছে বলিয়াই আমরা এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট ইহাই হইল বড় সমস্যা—বাঙালীর মনকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। অনুরূপ কাজ যুগে যুগে জাতির সংগঠক-প্রধানদের করিতে হয়। অপরিচিত, নূতন নূতন শ্রেণী হইতে 'ক্ষত্রিয়' সংগ্রহ করার বৃত্তান্ত এই দেশের ইতিহাসে আছে। 'অগ্নিকুল' ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি রাজপুতানার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ; মহারাষ্ট্রের 'চিৎ-পাবন' ব্রাহ্মণ শ্রেণী সম্বন্ধে এইরূপ একটা কিম্বদন্তী আছে। 'অগ্নি' সংস্কারের কল্যাণে অহিন্দু হিন্দু হইতে পারে, অনার্য্য আর্য্য হইতে পারে, লেখনী বৃত্তির লোকের অসিবৃত্তি অবলম্বনের পথ সুগম হইতে পারে, এই কথা আমাদের দেশের লোকের মনে জাগরূক থাকিলে আজ বাঙালী-প্রধানদের অন্ধকারে চারিদিকে হাতড়াইতে হইত না। 'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি'—এই কথা বলিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দুঃখ করিয়াছিলেন। আজও সে কলঙ্ক আমাদের মোচন হয় নাই। গুরুসদয় দত্ত 'রায়বেশে' নৃত্যের ইতিকথা আমাদের শুনাইয়াছেন; তাহা ছিল সামরিক 'জাতি' ও 'শ্রেণী'র উন্মাদনায় পূর্ণ। আমরা 'রায়বেশে'র নৃত্যের প্রদর্শনী দেখি, কিন্তু তাহার ইতিহাস জানি না বলিয়া তাহার পূর্ব্ব গৌরবের সঙ্গে বর্ত্তমান বাঙালী জীবনের কোন সম্পর্ক আছে বা থাকিতে পারে বলিয়া মনে করিতে পারি না। বাঙালী সৈন্যাধ্যক্ষ পাওয়া যাইলেও বাঙালী পদাতিক পাওয়া যায় না, তাহার রহস্যও এই আত্মবিস্মৃতির মধ্যে আছে। আজ বাঙালীকে 'সামরিক' জাতিতে পরিণত করিতে হইলে পূর্ব্ব ইতিহাসের জের টানিয়া নূতন সংস্কারের সৃষ্টি করিতে হইবে। এইরূপ সৃষ্টিকার্য্যের ক্ষেত্র—বাঙালী জীবনের জমিনের এক বৃহদংশ চাষের অভাবে পতিত রহিয়াছে। আবাদ করিলে সোনা ফলিবে। কে হইবেন এই আবাদকারী? ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সম্মুখে, তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীর সম্মুখে এই কর্ত্তব্যপথ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আছে।

কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের পুরাতন আইন-কানুনের বাধা আজ মনে হয় আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতেছে। প্রায় পনর দিন পূর্ব্বে কলিকাতার দৈনিক পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার মধ্যে এইরূপ ভরসার একটা ইঙ্গিত দেখিতেছি। ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া নামক সংবাদ-বিতরণী প্রতিষ্ঠান এই সংবাদ দিয়াছিলেন।

"The Government of West Bengal have promulgated the West Bengal National Volunteer Force Ordinance, 1948, which empowers the Government of West Bengal to raise and maintain a Volunteer Force to be called the West Bengal National Volunteer Force."

এই সংবাদের মর্ম্মার্থ আমরা এইভাবে বুঝিয়াছি। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট কর্তৃক নানা শ্রেণীর সৈন্যবাহিনী Regular Army, Territorial Force, Cadet Corps—রীতিমত সৈন্যবাহিনী, আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী যাহারা রীতিমত সৈন্যবাহিনীর পৃষ্ঠরক্ষা করিবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রবৃন্দ সামরিক বিদ্যার প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগে পণ্ডিত, এই শেষোক্ত দল গঠন করিবেন। পশ্চিমবঙ্গে এই শিক্ষাদানের, এরূপ সামরিক বাহিনী সংগঠনের ব্যবস্থা সর্ব্বভারতীয় ব্যবস্থার অঙ্গরূপে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনী West Bengal National Volunteer Force—এই ব্যবস্থার অতিরিক্ত। এই বিষয়ে আমাদের ব্যাখ্যা সঙ্গত কিনা তাহা মন্ত্রিমণ্ডলীর কোন মুখপাত্র বলিয়া দিলে ভাল হয়।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিমণ্ডলীকে বাঙালীর মধ্যে নূতন ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টিকার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। তাহার জন্য সমস্ত বাঙালী জাতিকে অগ্নিসংস্কারের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে হইবে। আমাদের জাতীয় চরিত্রে যে দুর্ব্বলতা, যে ক্ষুদ্রতা, যে পল্লবগ্রাহিতা, শরীর মনে যে আলস্য শিকড় বাঁধিয়াছে, তাহা এই আগুনে পুড়িয়া যাইবে। অগ্নিশুদ্ধ হইয়া নূতন বাঙালী ভাবের সঙ্গে ধর্ম্মের, চিন্তার সঙ্গে পরিশ্রমের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবতার সমন্বয়-সাধন করিবে। এই আশায়ই আমরা বাঁচিয়া আছি, এই বলিষ্ঠ জীবন রূপায়িত দেখিবার জন্য নিজের ক্ষুদ্র চেষ্টা ও শক্তি নিয়োজিত করিয়াছি।

পূর্ব্বাচল প্রদেশ

অব্যবস্থিতচিত্ত লোকের প্রসাদ, দান, ভয়ঙ্কর হইতে পারে, এই পুরাতন সাবধানবাণী নূতন করিয়া বুঝিতেছি আমরা কংগ্রেসের নূতন নেতৃত্বের কল্যাণে। গত সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের সর্ব্বোচ্চ পরিচালকমণ্ডলী একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে কংগ্রেসী বিধানে একটি নূতন প্রদেশের নাম যোগ করিলে মন্দ হয় না। এই সংবাদে নূতন কাছাড় জিলা, ত্রিপুরা রাজ্য ও মণিপুর রাজ্যের লোক উৎসাহিত হইয়া উঠে। এই প্রস্তাবকে রূপ দিতে পারিলে আসাম প্রদেশের বর্ত্তমান শাসক-সম্প্রদায়ের অনাচার ও অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তিলাভের একটা সম্ভাবনা দেখা দিবে এই ভরসায়। প্রায় ২৫ লক্ষ অসমীয়া-ভাষাভাষী যেরূপ করিয়া ৪৫ লক্ষ অ-অসমীয়া-ভাষাভাষীর উপর নবাবী চালাইতেছে, তাহা আর বেশী প্রশ্রয় পাইলে ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্ত অশান্ত হইয়া উঠিবে। আসামের পঁচিশ লক্ষ বাঙালীর, আট-নয় লক্ষ মণিপুরী, পাঁচ-ছয় লক্ষ মিজো-লুসাই, টিপ্‌রা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি বর্ত্তমান বড়দলৈ মন্ত্রিসভার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে, এবং কংগ্রেস পরিচালকমণ্ডলীর প্রস্তাবে আমরা বুঝিয়াছিলাম যে কেন্দ্রীয় গবর্ণেণ্ট এই সমস্তার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু নবেম্বর মাসে সেই মণ্ডলীই মত বদলাইয়াছেন। তাহার কোন কারণ প্রদর্শন করিবার দায়িত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। দেশের লোকের বুদ্ধিবৃত্তির উপর এই অবিশ্বাসের ফল কি দাঁড়াইতে পারে, সেই সম্ভাবনার কথা মনে করিয়া আমরা পণ্ডিত নেহরু, সর্দ্দার প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে সাবধান করিয়া দিতে চাই।

আন্দামানে বাঙালী উপনিবেশ

প্রথমাবধি আমরা এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছি। পূর্ব্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ হিন্দু আন্দামানে নূতন জীবন গড়িয়া তুলিতে পারিবে, এই ভরসা করিয়া নয়। আজ তাহাদের জীবনে যে হতাশার ও ব্যর্থতার ভাব দেখা দিয়াছে, তাহার জন্ত চাই একটা প্রতিষেধক। সেই প্রতিষেধক আসিবে গঠন-মূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টায়, তাহা যেখানেই হউক। "ঘরমুখো" বাঙালী জাতির কলঙ্ক মোচন হউক। আন্দামান দ্বীপ একটা নিমিত্তমাত্র।

সেইজন্ত পশ্চিমবঙ্গ হইতে শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতির নেতৃত্বে যে অনুসন্ধানমণ্ডলী বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত এই দ্বীপপুঞ্জে গমন করে তাহার সার্থকতা আমরা কামনা করিয়াছি। তাঁহাদের সঙ্গে একই জাহাজে পূর্ব্ব-পঞ্জাব হইতেও কয়েকজন সরকারী ও বেসরকারী অনুসন্ধানকারী গিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিচয় কলিকাতার কোন সংবাদপত্র দেন নাই। বাংলার মন্ত্রীর পক্ষেই প্রচারকার্য্য চলিয়াছে। মন্ত্রিমহাশয় দেশে ফিরিয়াছেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণেণ্টের নিকট তাঁহার বক্তব্য বলিবার জন্ত আমন্ত্রণ পাইয়া দিল্লী গিয়াছেন শুনিয়াছি। তৎপূর্ব্বে তিনি সংবাদপত্রের মারফতে জানাইয়াছেন যে আন্দামান দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের জমি আছে; নূতন ভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন গঠন করিয়া তুলিবার অবসর আছে। কত লোকের সংকুলান হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলেন নাই। ভাসাভাসা ভাবে অনেক আশার কথা শুনাইয়া তিনি গিয়াছেন। তাঁহার দলের ২।৪ জনকে রাখিয়া আসিয়াছেন আরও ব্যাপক অনুসন্ধান করিবার জন্ত। তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দুর নেতৃস্থানীয় বা প্রতিনিধি পর্য্যায়ের কে বা কাহারা ছিলেন, তাহা আমরা জানি না। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুকে বুঝাইয়া, "কালাপানির" ভয় তাড়াইতে পারে, এরূপ কেহ ছিলেন কিনা তাহাও আমাদের জিজ্ঞাস্য।

কারণ আমরা মনে করি যে বাঙালী সমাজের সুখদুঃখের মায়া কাটাইয়া যাইবার প্রচেষ্টায় যাঁহারা উৎসাহ দিতে যাইবেন, তাঁহাদের "আপনি আচরি ধর্ম্ম" তাহা শিখাইতে হইবে। নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া যাঁহারা এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিবেন, তাঁহারাই হইবেন বাংলার বাহিরে "বৃহৎ বঙ্গের" প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহাদের যাঁহারা অনুগামী হইবেন তাঁহাদের কোন শ্রমকে ভয় করিলে চলিবে না।

এত ব্যাপক প্রচারের মধ্যে যাহা আরম্ভ করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আর একটা কথা আমরা শুনাইয়া রাখিতে চাই। কেন্দ্রীয় গবর্ণেণ্টের নিকট হইতে কোনরূপ স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না পাইয়া থাকিলে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলীর এই বিষয়ে কোন ভরসার কথা উচ্চারণ করা সঙ্গত হইবে না। যদি পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু প্রধানদের কেহ নিজে উদ্যোগী হইয়া নিজের ব্যয়ে এইরূপ একটা অভিযান লইয়া যাইতে পারিতেন তবে তাঁহাদের দাবি অগ্রগণ্য হইত, তাঁহাদের সহকর্ম্মীদের শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতির নেতৃত্বে আজ যাহা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে বাঙালীর শক্তির কোন প্রমাণ নাই; উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্ত সংগঠন-শক্তির পরিচয় নাই। কেন্দ্রীয় গবর্ণেণ্টের খেয়াল অনুসারে তাঁহাদের চলিতে হইবে। সেই খেয়ালের প্রকৃতি আমরা "পূর্ব্বাচল" প্রদেশের প্রস্তাবে দেখিয়াছি।

রেল-দুর্ঘটনা

আমাদের দেশে অসতর্কতার জন্ত কত লোক প্রাণ হারাইতেছে অথবা জীবনের মত পঙ্গু হইয়া রহিতেছে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গল নাগপুর রেলের গত পাঁচ মাসের খতিয়ান হইতে তাহা বুঝা যায়। ১৯৪৮ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে ৮৪৭ জন লোক অসতর্কতার জন্ত নিহত

আহত হইয়াছে। ইহার মধ্যে গাড়ীতে স্থানাভাবে পাদানিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া পিছলাইয়া পড়িয়া ২৬৪ জন, সিগনাল-পোষ্টে ধাক্কা লাগিয়া ১৯ জন এবং চলতি গাড়ীতে উঠিবার জন্ত ঠেলাঠেলি করিতে গিয়া প্লাটফর্ম ও রেলের মাঝখানে পড়িয়া ১২ জন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হইয়াছে। এ তো গেল ভীড় ও স্থানাভাবজনিত দুর্ঘটনা। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার এই যে, নিছক অসতর্কতার জন্ত গাড়ীচাপা পড়িয়াছে ৩৮৮জন। শান্টিং-এর সময়ে দুইটি চলন্ত মালগাড়ীর মাঝখান দিয়া তাড়াতাড়ি লাইন পার হইতে গিয়া তিন ব্যক্তি উহার মাঝে পড়িয়া মরিয়াছে অথবা গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। চলতি গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ৪৩ জন হতাহত হইয়াছে। লাইনের উপর গাড়ী চাপা পড়িয়া ১৩০ জনকে মৃত বা অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে।

বেঙ্গল নাগপুর রেলের হিসাবে দেখা যায় যে ১৭২ জন তাড়াতাড়ি চলতি ট্রেনের সম্মুখ দিয়া লাইন পার হইতে গিয়া কাটা পড়িয়াছে; ইহার মধ্যে ১২৭ জনই মারা গিয়াছে। পাদানিতে দাঁড়ানো লোকদের মধ্যে ৩৫ জন আহত ও ৪ জন নিহত হইয়াছে। চলতি ট্রেনে উঠিতে বা নামিতে গিয়া ৪৮ জন হতাহত হইয়াছে।

শিক্ষার অভাবে একটা দেশের লোক নিজের হিতাহিত বিষয়ে পর্য্যন্ত কত দূর কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইতে পারে এই তথ্যগুলি তাহারই নিদর্শন মাত্র।

মাদ্রাজে 'স্পেশাল পে' বাতিল

মাদ্রাজ সরকার উচ্চ বেতনভোগী সরকারী কর্ম্মচারীদের 'স্পেশাল পে' তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কোন কোন শ্রেণীর অফিসারেরা ইংরেজ আমলে নিজ বেতনের উপরে একটা অতিরিক্ত 'স্পেশাল পে' পাইতেন; বর্ত্তমানে উহা বজায় রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই ইহাই মাদ্রাজ সরকারের অভিমত। সেক্রেটারী, বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি এবং বিভাগীয় কর্ম্মকর্ত্তারা এখন হইতে আর কোন 'স্পেশাল পে' পাইবেন না। তাঁহাদের যানবাহন ভাতা বজায় থাকিবে তবে উহা সাধারণতঃ বেতনের এক-দশমাংশ পর্য্যন্ত হইবে কিন্তু কখনও ১৫০ টাকার বেশী হইবে না। বাড়ী ভাড়া যাহা তাঁহারা এখন পাইতেছেন সেটা ঠিক থাকিবে। পশ্চিমবঙ্গ এখন দরিদ্র প্রদেশ। এখানেও এই ধরণের ব্যয়-সংকোচ আরম্ভ হওয়া উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিশন

স্বাধীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা-ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্ত ভারত-সরকার কর্ত্তৃক একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গঠনতন্ত্র ও কার্য্যাবলী উভয় সমস্যা সম্বন্ধেই কমিশন তদন্ত করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বর্ত্তমান গঠন প্রণালী, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে প্রচুর গলদ রহিয়াছে এবং উহার আমূল সংশোধন ও পরিবর্ত্তন আবশ্যক এ বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। ভারতীয়, ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের লইয়া এই কমিশন গঠিত হইয়াছে। কমিশন শীঘ্রই কলিকাতা আসিবেন। তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া শিক্ষাসমস্যার আলোচনার জন্ত এখন হইতেই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টের পর (১৯১৭) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যাবলী ভালভাবে এযাবৎ পর্য্যবেক্ষণ করা হয় নাই। তজ্জন্ত সরকার এ কমিশনের হাতে ব্যাপক ক্ষমতাদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যাহাতে কমিশন দেশের সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান গঠনতন্ত্র, কার্য্যাবলী ও ক্ষমতার কি কি পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত, কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের সহিত ইহাদের সম্পর্ক কিরূপ হইবে, কমিশন এই সকল ব্যাপারে তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করিবেন।

ভারতীয় যুবকদের গণতন্ত্রের সমস্যাবলীর সহিত পরিচিত করা শিক্ষা-ব্যবস্থার গুরু দায়িত্ব। মানবতা ও বিজ্ঞানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাও কমিশনের অন্ততম আলোচ্য বিষয়। অন্তান্ত বিষয়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংশ্লিষ্ট কলেজসমূহে উঁচুদরের শিক্ষা, পরীক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষকদের যোগ্যতা ও বেতন, ছাত্রদের বাসস্থান, বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের পথ, আঞ্চলিক ও অন্তান্ত ভিত্তিতে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড় মুস্লিম-বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি, শিক্ষার মাধ্যম, গবেষণা-কার্য্যে শিক্ষকদের উৎসাহ দান, ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও চারুকলা শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ও গবেষণা-কার্য্যের ব্যবস্থা এবং উন্নতি সম্পর্কে স্ব স্ব অভিমত জ্ঞাপন করিবার জন্ত কমিশনের সদস্যদের কাছে এক প্রশ্নাবলী দাখিল করা হইয়াছে। দিল্লী অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার পর কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনের এক কর্ম্মসূচী গ্রহণ করিবেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা উত্তর ভারত সফর করিবেন। কমিশন প্রত্যেক কেন্দ্রে ৪ হইতে ৬ দিন অবস্থান করিবেন। আশা করা যায় যে, কমিশন আগামী জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

কমিশন আগামী বৎসর জুন মাসে তাঁহাদের কার্য্যাবলী সমাপ্ত করিবেন বলিয়া মনে হয়।

আন্দামান

সম্প্রতি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাংলা হইতে একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে কয়েকজন সেখানকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। ইঁহারা নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :

আন্দামানে এখনই যাহাতে নূতন লোক গিয়া বসবাস করিতে পারে তাহার জন্ত জঙ্গল কাটা দরকার এবং এই টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া উচিত।

যাহারা সেখানে যাইবে তাহাদের গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং অন্তান্ত আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্ত টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পোর্টব্লেয়ার হইতে কলিকাতার মধ্যে একটি সাপ্তাহিক ষ্টীমার সার্ভিস এবং ডাক ও খবরের কাগজ এবং সম্ভব হইলে কিছু যাত্রীবহনের জন্ত একটি দৈনিক এরোপ্লেন সার্ভিস খোলা দরকার। এই কার্য্য কেন্দ্রীয় সরকারের করা উচিত।

আন্দামানের তিন ভাগে যাতায়াতের সুবিধার জন্ত রাস্তা তৈরি করা দরকার এবং এই কার্য্যও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে লওয়া উচিত।

সংবাদপত্রে প্রকাশ এই সব প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট উপস্থাপিত করা হইবে।

এই প্রস্তাবগুলির সঙ্গে প্রথমেই একথা বলিলে ভাল হইত যে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে অর্পণ করা হউক। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে অবশিষ্ট কাজ অনেক সহজ হইত। বর্ত্তমানে আন্দামানের জঙ্গল পরিষ্কার, জমি দখল, পোর্টব্লেয়ার ও কলিকাতার মধ্যে অন্ততঃ একটি সাপ্তাহিক ষ্টীমার সার্ভিস এবং আন্দামানে পথঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ হইলেই সেখানে লোকজন যাওয়া সুরু হইতে পারে।

আসামে বাঙালী বিতাড়ন আরম্ভ

আসামে তেজপুর উচ্চ বালিকাবিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, সেখানে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ১৯৩২ সালে এই বিত্তালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তদবধি সেখানে বাংলা এবং আসামী উভয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্য্য চলিতেছে। বিত্তালয়ের শতকরা ৪০টি ছাত্রী বাঙালী। আসামের বিত্তালয়সমূহে বাংলার প্রচলন বন্ধ করিবার এই প্রথম চেষ্টা।

দামোদর কর্পোরেশনের বাজেট

আগামী দুই বৎসরের জন্ত দামোদর কর্পোরেশনের বাজেট প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে ২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং ১৯৪৯-৫০ সালে ব্যয় হইবে ৭ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।

নিম্নলিখিত হারে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট, পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট এবং বিহার গবর্মেণ্ট এই টাকা দিবেন:

১৯৪৮-৪৯ সাল: কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট প্রায় ৭০ লক্ষ; পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট প্রায় ৯১ লক্ষ এবং বিহার গবর্মেণ্ট প্রায় ৬১ লক্ষ।

১৯৪৯-৫০ সাল: কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট ২ কোটি ৮১ লক্ষ; পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট ৩ কোটি ৪০ লক্ষ এবং বিহার গবর্মেণ্ট ১ কোটি ৯৫ লক্ষ।

দামোদর পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্ত যে টাকা খরচ হইবে পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে তাহার সবচেয়ে বড় অংশ আসিয়া পড়িতেছে এবং বিহারকে দিতে হইতেছে সবচেয়ে কম। অথচ এই পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশী লাভবান হইবে বিহার। দামোদর পরিকল্পনার ফলে মানভূম ভারতবর্ষের খনিজ-শিল্পের মধ্যমণি হইবে এবং দেশের মোট খনিজ-শিল্পের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ এখানে কেন্দ্রীভূত হইবে। মানভূম যদি বিহারেই থাকিয়া যায় তবে বিহার ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এবং ক্ষমতাশালী প্রদেশে পরিণত হইবে; কারণ দেশের লোহা তামা, কয়লা, অভ্র ও অন্তান্ত বহুবিধ অতি প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য ও খনিজ দ্রব্যজাত শিল্প থাকিবে বিহারের হাতে। কয়েকটি জেলার চাষের জল এবং কিছু বিদ্যুৎ ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গের আর কতটা লাভ হইবে সেটা একবার খতাইয়া দেখিলে ভাল হইত। মেষ্টন এওয়ার্ড, নিমেয়ার এওয়ার্ড প্রভৃতিতে আর্থিক ব্যাপারে বাংলার প্রতি যে ধরণের অবিচার করা হইয়াছিল, স্বাধীনতা লাভের পর নিমেয়ার এওয়ার্ড পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ইনকাম ট্যাক্স এওয়ার্ডেও সেই মনোভাবই দেখা গিয়াছে। দামোদর পরিকল্পনার ব্যয় বহন বিষয়েও বাংলার উপর দিয়া অপরের সুবিধা করিয়া লওয়া হয় এরূপ ব্যাপার ঘটিতে না দেওয়াই ভাল।

পশ্চিমবঙ্গের শাসন ও শোষণ

ভারতরাষ্ট্রের পরিধির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব-পঞ্জাব প্রদেশ দুইটি ভারতবর্ষের বিভাগের পর জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই জন্ম সহজ ভাবে হয় নাই। ইংরেজ ডাক্তারের নির্দেশ অনুসারে ছুরি চালাইয়া এই দুইটি প্রদেশকে বাহির করা হইয়াছে। রক্তক্ষয়ের জন্ত তাহারা দুর্ব্বল; বৈদ্যসঙ্কটের জন্ত, চিকিৎসামণ্ডলীর মধ্যে মতভেদের জন্ত, চিকিৎসা ঠিক ঠিক চলিতেছে না।

পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নানা বিবৃতিতে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, এই প্রদেশে তণ্ডুল-বস্ত্র-তৈল প্রভৃতি মানব-জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা শীঘ্র সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি যে বিভাগের মাথায় বসিয়া আছেন তাহার কর্ত্তব্য উৎপাদন করা নয়, ব্যয় করা। সুতরাং উৎপাদনের জন্ত অন্তান্ত মন্ত্রী ও অন্তান্ত বিভাগের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এই সব মন্ত্রিপ্রবরের বিভাগ কিভাবে কর্ত্তব্য পালন করিতেছে, তাহার পরিচয় আমরা প্রতি মাসে দিবার চেষ্টা করি। "নোকরসাহী" (bureaucracy)—লোকমান্ত তিলকের ব্যবহৃত এই কথা—পরামর্শদাতাদের অভিজ্ঞতা মন্ত্রীদিগের থাকিতে পারে না। সুতরাং

তাঁহারা মোকরসাহীর অত্যন্ত গড়িমসি চালের নিকট হার মানিয়া যান। গত মাসে আমরা দেখাইয়াছি কি করিয়া কৃষি ও শিক্ষার উন্নতি এই "লাল ফিতা"-ওয়ালাদের হাতে পড়িয়া কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে।

এবার অন্ত দুই বিভাগের কথা আলোচনা করিব। সেচ-বিভাগ, কৃষিবিভাগ ও মৎস্তবিভাগের মধ্যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। পশ্চিমবাংলার খাল-বিল মজিয়া গিয়া কৃষির অবনতি হইয়াছে, মৎস্যের উৎপাদন কমিয়াছে। দামোদর পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হইতে এখনও অন্ততঃ দশ বৎসর লাগিবে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল এই পরিকল্পনার কল্যাণে পূর্ব্বের ন্তায় ধনধান্তে ভরিয়া উঠিবে; এই আশায় অনেকেই দিন গুণিতেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলের অবস্থাও ত মন্ত্রী মহাশয়কে ভাবিতে হইবে। দামোদর পরিকল্পনার মত বিরাট কিছু করিবার সম্ভাবনার জন্ত এই অঞ্চলের লোকে ত চোখ বুজিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্ত গঙ্গার উপর বিরাট বাঁধ দিয়া জলের প্রবাহ ভাগীরথীর ভিতর চালাইবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে শুনিয়াছি। কিন্তু উহা বাস্তবে পরিণত হইতে সময় ও অর্থ দুই-ই বহু পরিমাণে লাগিবে সুতরাং উহার ফল সম্প্রতি পাইবার আশা নাই এবং আশু ফলপ্রদ পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার নিতান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। এই পূর্ব্বাঞ্চলের প্রতি জিলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা খালবিল উন্নত করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুদ্ধ জলস্রোত বহতা করিয়া দিলে এই অঞ্চল বিরাট পরিকল্পনা হইতে অধিক লাভবান হইবে। এই সব কাজের জন্ত দিল্লীর নিকট হইতে সাহায্য পাওয়ার কথা নয়। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের সেচ-মন্ত্রীকে নিজের তৈলে নিজের মাছ ভাজিতে হইবে। তাহা হইলে মৎস্ত-বিভাগের মন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্করেরও নিদ্রার ব্যাঘাত কমিবে এবং আমরাও সংস্কৃত খালবিলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির আশায় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক পরিবেশিত চালের মধ্যেও খাড়-প্রাণ পাইব।

পশ্চিমবঙ্গের সনাতন খাল-বিলের সন্ধান লইবার জন্ত বৃহৎ কোন ব্যয়ের প্রয়োজন হইবার কথা নয়। রাজস্ব-বিভাগে তাহার হিসাব আছে। তদতিরিক্ত প্রতি জিলায় যেসব সংবাদ-পত্র আছে তাহার মধ্যেও উহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। আমরা বারাসত-বসিরহাট-বনগাঁ মহকুমার মুখপত্র "সংগঠনী" পত্রিকায় ১৬ই অগ্রহায়ণের সংখ্যায় প্রদত্ত এইরূপ একটা হিসাবের প্রতি সেচ-মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন তিনি চব্বিশ পরগণার খাল-বিল পরিদর্শন করিয়া "বৎসর" কাটাইয়াছিলেন। এবং এই পরিদর্শনের ফলে তিনি কয়েকটি "বাঁওড়" ও বিলের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিবরণ দিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া দেখা যায় যে কত সামান্ত সংস্কার করিলে ধান ও মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র দুইটি "বাঁওড়ের" উল্লেখ করিতেছি।

"তেঁতুলবেড়িয়া—(ঝাউডাঙ্গা) বাঁওড়। এটিকে কচুরী-পানা তুলিয়া ইচ্ছামতীর সঙ্গে খালদ্বারা যুক্ত করিলে (½ মাঃ মাত্র) ইহাতে প্রচুর মাছ জন্মাইতে পারে।

যাদবপুরের (গাইঘাটা থানা) বিল। যমুনা হইতে নির্গত গোয়ালসুতীর খালের সঙ্গে বিলকে মাত্র ৭০০ হাত যোগ করিয়া দিলে প্রচুর মৎস্ত উৎপাদন এবং চাষ আবাদের সুবিধা করা হইতে পারে।"

"সংগঠনীর" এই সংখ্যায়ই যমুনা ও পদ্মা এই দুই শাখা-নদী সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এক শত বৎসরের মধ্যে ইহাদের অবনতি ও রুদ্ধ-স্রোতের কাহিনী বর্ণনা করিয়া লেখক বলিয়াছেন,—

"২৪ পরগণার চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৮৫০ বর্গ-মাইল। তাহার মধ্যে ২৫০ বর্গমাইল জমির অধিকাংশই নির্ভর করে যমুনা নদী সংস্কারের উপর। ইহার সঙ্গে পদ্মা সংস্কৃত হইলে ও সংলগ্ন বিল ও বাঁওড়গুলির সুষ্ঠু ব্যবস্থা হইলে প্রায় ৪৫০ বর্গমাইল জমির উৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি পাইবে এবং ২৪ পরগণা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া হয়ত উদ্বৃত্ত অঞ্চলে পরিণত হইবে।"

এই সব তথ্য নূতন না হইতে পারে। এরূপ অনেক তথ্য হয়ত সরকারী কবুতরখানায় ধুলাবালি চাপা পড়িয়া আছে। প্রবন্ধ-লেখক তাহা আবার লোকের দৃষ্টিপথে আনিয়া তাহাদের ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহার সব আশা হয়ত বিচারগ্রাহ্য হইবে না। "সংগঠনী" পত্রিকা এইরূপ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া মফঃস্বলের সংবাদপত্র সমূহের সম্পাদক-মণ্ডলীর সম্মুখে নূতন দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়াছেন। এইরূপ তথ্যের সাহায্যে সেচ-বিভাগ, কৃষি-বিভাগ, মৎস্ত-বিভাগ ও জনস্বাস্থ্য-বিভাগ একযোগে অনেক সংস্কারে হাত দিতে পারেন। এই সব সংস্কারকার্য্যের জন্ত পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর মন্ত্রিমণ্ডলীর খেয়ালের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। পশ্চিমবঙ্গের আয়ত্তের মধ্যে যে সঙ্গতি আছে তাহাই যথেষ্ট। সকল কাজের জন্ত ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দিল্লীর দ্বারস্থ হওয়া অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের নিজের সামান্ত ধন ও শ্রমশক্তির উপর নির্ভর করিবার চেষ্টা-উন্তমকে আমরা শ্লাঘনীয় বলিয়া মনে করি। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রি-মণ্ডলীকে দিল্লীতে দৌড়াদৌড়ি করিয়া যেরূপ ভাবে পরিশ্রান্ত হইতে হইতেছে, তাহা নানা দিক দিয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে আত্মশক্তির পরিচয় দিতে পারিলে ঘর ও বাহির উভয়েরই বিশ্বাস ও সম্মানলাভ করা যায়।

দিল্লীর উপর নির্ভরশীলতা যেরূপ অপমানজনক, সেইরূপ কলিকাতার লালদীঘির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবার অভ্যাসও

নিষ্প্রয়োজনীয়। উহা যে আমাদের মধ্যে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহার প্রমাণ সংগ্রহের জন্ত বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না। "সংগঠনী" পত্রিকার প্রবন্ধের মধ্যেও তাহা চোখে পড়ে। অনেক প্রবন্ধে কচুরীপানার উপদ্রবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এমন ভাবে ও তাহার যেন কেবলমাত্র কলিকাতাই এই উপদ্রবের হাত হইতে মুক্তি দিতে পারে। পঞ্চাশ বৎসর, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গদেশের পল্লীবাসী এরূপভাবে কলিকাতার মুখাপেক্ষী ছিল না। এইরূপ পরনির্ভরতার উপর ভরসা করিয়া চলিলে আমাদের "স্ব-রাজ" পর-রাজ হইতে বিলম্ব হইবে না।

ভারতবর্ষে অশিক্ষা

আমাদের রাষ্ট্রচালকেরা ও তাঁহাদের পরামর্শদাতাগণ স্বাধীন রাষ্ট্রের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার কথা আমাদের নানা ভাবে শুনাইতেছেন। কিন্তু কথা ও কার্য্যের মধ্যে যে দূরত্ব ইংরেজ আমলে চালু ছিল, আজও তাহা কমে নাই। উদাহরণ-রূপে বয়স্ক লোক শিক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, যাহা ভিয়েৎনামের মত ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, তাহা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল কেন? অনেক বিষয়ে ভিয়েৎনামের অবস্থা পশ্চিম-বঙ্গের অবস্থা অপেক্ষা সঙ্গীন। ভিয়েৎনাম আজি তিন বৎসর হইতে, ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে, ফরাসী সাম্রাজ্য-বাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়া আসিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের সেই সৌভাগ্য হইলে হয় ত শিক্ষা বিষয়ে বর্ত্তমান নিশ্চেষ্টতা ও ফাইল লইয়া দিনগত পাপক্ষয় করিবার প্রবৃত্তির প্রশ্রয় পাইত না।

সেই দুঃখ চাপা দিয়া এখন ভিয়েৎনামের কথা বলি। একখানি মার্কিন সংবাদপত্রে—*World-Over Press* এই বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। ফু-থো (Phu-tho) নামে কোন প্রদেশে ৪,১৫৮ জন শিক্ষক ৩৬৫৩টি ক্লাসে ৭০,০০০ লিখন-পঠনে অজ্ঞ লোকের শিক্ষায় ছয় মাস কাল ব্যয় করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে; হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই প্রদেশে মাত্র ১০,০০০ লোক অশিক্ষিত আছে।

ফরাসী আমলের ১৯৪০ সালের একটা হিসাবে দেখা যায় যে, ৩,২৪৫ জনের জন্ত মাত্র একটি স্কুল ছিল; ১,৩৮২ জনের জন্ত ছিল মাত্র একজন শিক্ষক।

ভিয়েৎনাম রাষ্ট্রে শিক্ষার যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা গণতান্ত্রিক নহে; নিষ্ঠুর (tough)। এই বিবরণীতে দুইটি উপায়ের উল্লেখ দেখিলাম, তাহার কথা আমরা ভাবিতেও পারিতেছি না। ভিয়েৎনাম রাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী।

কোন বাজারে প্রবেশ করিতে হইলে প্রত্যেকের নাম দস্তখত করিয়া দিতে হয়; তাহা না পারিলে ফিরিয়া যাইতে হয়; নাম দস্তখত করিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারিলে বাজারে প্রবেশ করিতে পারে।

বিবাহ করিবার জন্ত সরকারের অনুমতি লইতে হয়। লিখন-পঠনে মূর্খ লোককে বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয় না। লেখাপড়া শিখিবার জন্ত এরূপ অমোঘ বিধান সহজে আবিষ্কার করা যায় না।

মন্ত্রীরূপে বা কর্ম্মচারীরূপে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রব্যবস্থা যাঁহারা পরিচালনা করেন তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের অভাব আছে তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। বিপ্লবী উপায়ে ক্ষমতা হাতে আসিলে তাঁহাদেরই অন্ত মূর্ত্তি দেখিতাম। সে সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই; তাহার ফলে আমরা ইংরেজ আমলের 'নোকরসাহী'টা পাইয়াছি। তাহা আমা-দের গলায় পাথরের ঘণ্টার মত ঝুলিতেছে। আর কত দিন এই বোঝা বহিয়া আমাদের চলিতে হইবে তাহাই বিবেচ্য।

"সেনদীঘি" মৎস্যের চাষ

কলিকাতার দশ মাইল দক্ষিণে বোড়াল গ্রাম অবস্থিত। আমাদের নবজাতীয়তার একজন প্রবর্ত্তকের জন্মস্থান বলিয়া এই গ্রাম ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে। প্রাচীন কালেও দেখা যায় এই গ্রামের একটা প্রসিদ্ধি ছিল—সেনরাজ বংশের নামের সহিত তাহা জড়িত। "সেনদীঘি" নামে একটি জলাশয় তাহার সাক্ষ্য দিতেছে বলিয়া স্থানীয় লোকের ধারণা। এই দীঘির পাড়ে একটি মন্দির "ত্রিপুরা-সুন্দরী"র উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। মন্দির আজ জীর্ণ, ভগ্ন; দীঘিও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইংরেজ আমলে যে সামাজিক অরাজকতা লোক-চক্ষুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না, তাহার অবসরে "ত্রিপুরা-সুন্দরী"র দেবোত্তরে হাত দিবার লোকের অভাব হয় নাই। সুতরাং দেখিতে পাই ১৯৩১ সালের জরিপে এই দীঘির সংলগ্ন অনেক ডাঙা জমি স্থানীয় জমিদারদের মধ্যে অনেকের নামে সরকারী কাগজে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এর পরে বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণ বসুর আরব্ধ কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিবার জন্ত একটা নূতন জাগরণ আসিয়াছে। "ত্রিপুরা-সুন্দরী" সেবা সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান "ত্রিপুরা-সুন্দরী" মন্দিরের সংস্কার ও "সেনদীঘির" সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়া-ছেন। বিরাট দীঘির সংস্কারকার্য্য ব্যয়-বহুল ব্যাপার; প্রায় বিশ হাজার টাকা তাহাতে ব্যয় হইবে। "সেনদীঘি" সংস্কার করিতে পারিলে কেবল যে স্থানীয় জলাভাব দূর হইবার একটা উপায় বাহির হইবে, তাহা নয়। এই জলাশয়ে মৎস্যের "চাষ" করিতে পারিলে একটা আয়ের ব্যবস্থা হয়। সমিতির চেষ্টায় এই দীঘির গর্ভ হইতে উত্থিত জমির উপর "ত্রিপুরা-সুন্দরী"র

স্বত্ব-স্বামিত্ব ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে; যে জমিদারদের হাতে তাহা চলিয়া গিয়াছিল তাঁহারা তাহা হৃষ্টচিত্তে ফিরাইয়া দিয়াছেন।

মামলা-মোকদ্দমার আশঙ্কা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া "ত্রিপুরা-সুন্দরী" সেবা সমিতি পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মৎস্য বিভাগের নিকট একটি আবেদন লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মৎস্যবিভাগ হাঙ্গামার হাত হইতে মুক্তি লাভের জন্য ১০০৲ টাকা এককালীন দান করিবার প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। আজ পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলীর মুখে মুখে "মাল্‌টি-পারপাস্‌ কো-অপারেটিভ সোসাইটি" নাম প্রচার হইতেছে। নানা রকমের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটিমাত্র সমবায় সমিতি গঠন—ইহাই মনে হয় এই নূতন "শ্লোগানের" অর্থ। বোড়ালের "সেনদীঘির" মতন জলাশয়ের সংস্কার এরূপ সমিতির আওতায় আসে কিনা, মৎস্যবিভাগ তাহার জন্য কোন চিন্তা করিয়াছেন কি?

শিক্ষকের ধর্ম্মঘট

কিছুদিন পূর্ব্বে মাধ্যমিক বিত্তালয়সমূহের শিক্ষকেরা এক-দিনের জন্য ধর্ম্মঘট করেন। বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি কতকগুলি দাবির প্রতি দেশবাসী এবং গবর্ণমেণ্ট উভয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছিল এই ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য। দেশের লোকের সহানুভূতি শিক্ষকদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কোন সুফল হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। ধর্ম্মঘটের সমর্থক আমরা নহি; এই ধরণের প্রতিবাদমূলক ধর্ম্মঘটেও যে কোন ফল হয় না তাহাও এক্ষেত্রে দেখা গেল। কার্ত্তিক সংখ্যায় "শিক্ষক" পত্রে অধ্যাপক ডাঃ মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য লিখিত "শিক্ষকের ধর্ম্মঘট" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য। ডাঃ ভট্টাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক এবং "শিক্ষক" পত্রিকাটি "নিখিল বাংলার শিক্ষক সমাজের মুখপত্র" রূপে পরিচিত।

ডাঃ ভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন, "দাবি স্বীকার করিয়ে নেবার যে পন্থা অবলম্বিত হয়েছে তার সঙ্গে সহানুভূতি না থাকলেও শিক্ষকদের দুরবস্থায় এবং দুর্গতিতে তাদের প্রতি সহানুভূতি সম্ভব।... ধর্ম্মঘটের উপর কটাক্ষ করে শিক্ষকদের দাবি অস্বীকার করা চলে না। জীবনযাত্রার মান এবং দ্রব্যমূল্য যে পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে তাতে বর্ত্তমান আয়ে আর বেঁচে থাকাই অসম্ভব।" ইহার পর লেখক শিক্ষকদের মিশনরীর সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছেন, "অন্যেরা পার্থিব সম্পদের দিকে যতটা নজর দেন, শিক্ষকের পক্ষে কি ততটা সমীচীন? আত্ম-প্রতিষ্ঠা অন্যের যতটা লক্ষ্য, আত্মবিসর্জ্জন কি শিক্ষকের পক্ষে ততটাই শোভন ও যোগ্য নয়? অন্যে যেখানে মুখর, শিক্ষক কি সেখানে মৌন হবেন না?...মিশনরীরা পেন্‌সন বা প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের জন্য তাগিদ দেন না।" বর্ত্তমান আয়ে বাঁচিয়া থাকা যে শ্রেণীর শিক্ষকদের পক্ষে অসম্ভব, লেখক তাঁহাদিগকে মিশনরীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আত্মবিসর্জ্জনের উপদেশ দিয়াছেন কিরূপে তাহা আমরা বুঝিলাম না। শিক্ষকেরও পরিবার পালন করিতে হয়, ভদ্রতা রক্ষা করিতে হয়।

ডাঃ ভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন, "সামরিক বিভাগ এবং মিশনরীদের মধ্যে অভাববোধ ও অসন্তোষ নেই, কারণ যাই থাক না কেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষকেরা অভাবগ্রস্ত এবং অসন্তুষ্ট।...বেতন কিছু বৃদ্ধি হলেই যে এই অভাব অদৃশ্য হবে সে কথা মনে করারও কারণ নেই।...জীবনের মান বা বাসনা না কমলে সন্তোষ এক প্রকার অসম্ভব।... পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকই অর্থের সন্ধানে অনবরতই ঘুরছে এবং উপার্জ্জনের ফিকির খুঁজতেই তাদের মন ব্যস্ত থাকে। কিন্তু শিক্ষকেরাও যে অবিরাম এই ভাবে স্বর্ণ-মৃগের পিছনে পিছনে ছুটবেন এটা কেবল অশোভন নয়, সম্পূর্ণ অসমীচীন।" সামরিক বিভাগে এবং মিশনরী-দের মধ্যে অভাববোধ বা অসন্তোষ নাই লেখক কোন্‌ তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া একথা বলিয়াছেন আমরা তাহা জানি না, তবে সামরিক বিভাগের এক জন সৈনিক অথবা এক জন মিশনরী যে বেতন ও ভাতা পাইয়া থাকেন, মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন অপেক্ষা তাহা অনেক বেশী, এটা জানা কথা। আজকের দিনে চল্লিশ টাকা বেতনের শিক্ষক দ্বিগুণ বেতন দাবি করিলেও তাহাকে স্বর্ণ-মৃগের পিছনে ছোটা বলিয়া অভিহিত করিবার মত অকরুণ লোক দেশে বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রবন্ধের শেষে ডাঃ ভট্টাচার্য্য শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির উপায়স্বরূপ বিত্তালয়ের সংখ্যা অর্দ্ধেক কমাইয়া দেওয়ার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আমরা কোনরূপেই সন্তোষজনক মনে করিতে পারি না। ইংরেজ সরকার এদেশে শিক্ষাবিস্তারে প্রবলভাবে বাধা দিয়া আসিয়াছে। শিক্ষাবিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দে গবর্ণমেণ্ট বরাবরই যথাসম্ভব আপত্তি করিয়াছে। ডাঃ ভট্টাচার্য্য শিক্ষার বর্ত্তমান ত্রুটি কিছু কিছু আলোচনা করিয়া মন্তব্য করিতেছেন, "ত্রুটি সংশোধন না করে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা আর সমীচীন হবে না; যেখানে চারিটি বিত্তালয় আছে সেখানে যদি দুইটি থাকতো তা হলে শিক্ষকদের বেতন অন্ততঃ কিছুটা হ'ত। সরকার যে টাকা দিতে ইচ্ছুক তার বেশী ভাগাভাগি না হলে শিক্ষকদের অসন্তোষ কমে যেতে পারে।"

এখানে ইংলণ্ডের নিজের শিক্ষাবিস্তারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮৭০ সালে বিলাতের এডুকেশন অ্যাক্ট পাস হয়। ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের তখন মোট জনসংখ্যা ছিল আড়াই কোটি। শিক্ষার মান উন্নতির

পর শিক্ষাবিস্তার হইবে এই আশায় বসিয়া না থাকিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিস্তারে এমন ভাবে মন দেন যে ১২ বৎসরের মধ্যে নিম্নলিখিত অবস্থা দাঁড়ায় :

প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছাত্র-সংখ্যা
১৮৭০...	১৮,৭৮,০০০
১৮৮২...	৪৫,৩৮,০০০
বার বৎসরে বৃদ্ধি...	২৬,৬০,০০০
শিক্ষকদের সংখ্যা—	
১৮৭০...	১২,৪৬৭
১৮৮২...	৩৩,৫৬২
শিক্ষার ব্যয়—	
১৮৭০...	১,২৮,৬৪,০০০ টাকা
১৮৮২...	৪,৩১,৮৮,০০০ "

বাংলা-সরকার এই সময়ে শিক্ষার জন্ত ব্যয় করিতেন ৪,৮৭,০০০ টাকা।

দেশে এখন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। এই অবস্থায় শিক্ষার দ্রুত প্রসার একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার ব্যাপকতা এবং গভীরতা উভয়টির প্রতিই একসঙ্গে সমান দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে, কবে শিক্ষার মান উন্নত হইবে তার পর শিক্ষাবিস্তার করিব এই আশায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

আদালত ও পঞ্চায়েৎ-রাজ

পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর ডাঃ কাটজু এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-সমিতিতে সম্প্রতি একটি বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছেন। আইন পাস করিয়া ছাত্রদের আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অন্ত কাজে যাওয়া উচিত নয়, আদালতে যোগদান করাই কর্ত্তব্য, এই অভিমত প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে আইন ব্যবসায় একটি মহান্, স্বাধীন এবং উদার ব্যবসা। উকীলদের পক্ষে জালিয়াতি প্রভৃতি অসৎ কার্য্যে সহায়তা করা অতিশয় নিন্দনীয়, প্রত্যেক উকীলের সততা রক্ষা করিয়া চলা উচিত ডাঃ কাটজুর এই অভিমত সকলেই সমর্থন করিবেন। ডাঃ কাটজু ইহাও বলিয়াছেন যে, উকিলদের পক্ষে মক্কেলদের অনুরোধে কোনরূপ অসাধুতার আশ্রয় লওয়া অতিশয় নিন্দনীয়, ইহাতে সমগ্র আইন ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়। উকিল সমাজ এরূপ কার্য্যকলাপ সহ্য করিবেন না মক্কেলরা ইহা বুঝিতে পারিলে আর এই প্রকার অন্যায় সম্ভব হইবে না।

বর্ত্তমানে আইন ব্যবসায়ের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ডাঃ কাটজুর এই সতর্কবাণীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। গত যুদ্ধের কয় বৎসরে আর সব ব্যবসায়ের ন্যায় আইন ব্যবসায়ের অনেক অবনতি হইয়াছে। আগে লোকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যই উকিলের দ্বারস্থ হইত এবং এমন উকিল অনেক ছিলেন যাঁহার মক্কেল কোনরূপ নৈতিক বা দুর্নীতিপরায়ণতার অপরাধে প্রকৃতই অপরাধী ইহা বুঝিতে পারিলে তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রকারান্তরে অন্যায়ের প্রশ্রয় দানে সম্মত হইতেন না। গত যুদ্ধে বিশেষভাবে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যুদ্ধের কয়েক বৎসরে ব্যবসা বাণিজ্য, সম্পত্তি ভোগদখল প্রভৃতির সঙ্কোচমূলক এত বিভিন্ন প্রকারের আইন পাস হইয়াছে যে সাধারণ লোককে বিপন্ন হইয়া যেমন আদালতে উপস্থিত হইতে হইয়াছে, তেমনি অসাধু লোকদেরও অর্থাগমের অজস্র উপায় খুলিয়া গিয়াছে। আইনের ফাঁকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা শুধু যে আদালত হইতে মুক্তি লাভের জন্ত উকিলের শরণাপন্ন হইয়াছে তাহা নহে, অপরাধ অনুষ্ঠানের আগেও উকীলের পরামর্শ লাভ করিয়াছে এরূপ অভিযোগ অনেক হইয়াছে। ডাঃ কাটজুর উক্তি তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। যুদ্ধের সময় বহু গরীবের সম্পত্তি সরকার দখল করিয়াছেন। সরকারী ক্ষতিপূরণের টাকা তুলিবার জন্ত গরীব এবং নিরক্ষর লোককে উকীলের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে এবং তাহার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদিগকে প্রবঞ্চিতও হইতে হইয়াছে। দুর্নীতির বশীভূত হইয়া সরকারী উকীলের চেষ্টায় মামলার প্রধান আসামীদের মুক্ত করিয়া দেওয়ার দৃষ্টান্তও পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন উকীলের কার্য্যকলাপ আইন-ব্যবসায়ের মর্য্যাদার হানিকর হইতেছে ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা এই যে সমগ্রভাবে উকীল সমাজ তাহার কোন সক্রিয় প্রতিবাদ করেন না। এজন্ত সরকারী হস্তক্ষেপের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া উকীলেরা নিজেদের সংগঠনগুলির মারফত অনায়াসে এই সব পাপের প্রতিবিধান করিতে পারেন।

ডাঃ কাটজু বলিয়াছেন যে বিলাতী বিচার-পদ্ধতি এদেশের উপযুক্ত নহে। আমাদের দেশে পঞ্চায়েৎ-রাজ প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। পঞ্চায়েতের হাতে বিচার কার্য্যের দায়িত্ব অর্পিত হইলে বিচার লাভ সহজ এবং স্বল্পব্যয়সাধ্য হইবে। আমরা এই অভিমত সমর্থন করিতে পারিলাম না। আমাদের দেশে কোন কালেও পঞ্চায়েতের উপর সর্ব্ববিধ অপরাধের বিচারের ভার ছিল না; সম্পত্তিঘটিত বিরোধ গ্রামের স্মার্ত্ত পণ্ডিতের পাঁতি লইয়া পঞ্চায়েৎ মিটাইয়া দিতেন এবং ছোটখাট গ্রাম্য অপরাধের বিচারমাত্র তাঁহারা করিতেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বড় রকমের ব্যক্তিগত অপরাধ প্রভৃতির জন্ত আইনবেত্তাদের লইয়া গঠিত আদালত ছিল। আদালতের কাজ রীতিমত ভাবে যদি চলে, উকীল এবং সলিসিটরেরা যদি মক্কেলকে জীয়াইয়া রাখিয়া ফী আদায়ের জন্ত অনর্থক তারিখ আদায় না করেন, হাকিমেরা যদি দ্রুত বিচার শেষ করিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করেন তাহা হইলে সুবিচার লাভ অনেক সহজ ও স্বল্পব্যয়সাধ্য হইতে পারে। বর্ত্তমানে বিচার বিভাগ

সর্ব্বসাধারণের নিকট ভীতি ও ব্যয়বাহুল্যের বস্তু হইয়া থাকিবার প্রধান কারণ উহার পরিচালনায় ত্রুটি; আদালত বিলাতী ছাঁচে গঠিত ইহাই উহার প্রধান দোষ নহে। অশোক-চক্র এবং অশোক-স্তম্ভের মোহর আমরা জাতীয় পতাকায় এবং জাতীয় শীল মোহররূপে গ্রহণ করিয়াছি; বিচার-বিভাগ সংস্কারের দ্বারা উহার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অশোক যাহা করিয়াছিলেন আমরা সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে অন্ধকারে পথের সন্ধান মিলিবে। উকিল, ব্যারিষ্টার ও এটর্ণী এই তিনের অধিকার ও আয়ত্তে আসিয়া পশ্চিমবাংলার বিচারপ্রার্থীদের সর্ব্বনাশ হইতে হয়। অচিরে ইহার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

ভারতরাষ্ট্রের আন্তর্জ্জাতিক নীতির মধ্যে অসঙ্গতি

শ্রীকৃষ্ণলাল শ্রীধরণী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভারতবর্ষের বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সভ্যতা-সাধনার" মল্লিনাথ" বলিয়া তাঁহার একটি বিশেষ পরিচয় আছে। দেড় বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার মাতৃভূমিতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এবং যুক্তরাষ্ট্রের ও ভারতবর্ষের অনেক সংবাদপত্রে এই দেশের জীবন সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ ও সংবাদ পাঠাইতেছেন। সম্প্রতি তিনি সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের প্যারিস অধিবেশনের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করিতেছেন, এবং ভারতবর্ষের আন্তর্জ্জাতিক নীতির মধ্যে যে নানা অসঙ্গতি আছে তাহার প্রতি ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক নানা সমস্যার সম্বন্ধে ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধিমণ্ডলী এমন একটা নীতি অনুসরণ করিতেছেন যাহা বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়! ভাবুক জবাহরলাল নেহরুর ছোঁয়াচ তাঁহাদের অনেককেই অল্পবিস্তর প্রভাবিত করিতেছে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীধরণী ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ববিলাসী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের অভিযোগ এখনও সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দরবারে অমীমাংসিত আছে। এই গবর্ণমেণ্ট আবার দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার অছি। এই অঞ্চল জার্ম্মানীর উপনিবেশ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজয়ের পর ইহা জার্ম্মানীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) অধীনে আসে। এই সঙ্ঘ তাহাকে অছিরূপে পরিচালনা করিয়া স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করিয়া গঠন করিবার জন্য তাহার শাসনভার দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে ছাড়িয়া দেন। গত ২৭।২৮ বৎসর এইরূপ শাসনের ফলে দেশের অধিবাসী কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের কতটা উন্নতি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গত বৎসর দক্ষিণ-আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব পেশ করেন যে দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকাকে তাঁহাদের রাষ্ট্রের অংশরূপে একীভূত করার অনুমতি দেওয়া হউক। ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধি শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ইহার বিরোধিতা করেন, এবং সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ এই আপত্তি গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, এবং ঐ গবর্ণমেণ্টকে নূতন অছিনামা পেশ করিবার অনুরোধ জানান।

এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া ঐ গবর্ণমেণ্ট এই বৎসরও তাঁহাদের দাবি পেশ করিয়াছেন। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এ বৎসরও তাহার বিরোধিতার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এবার মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলি ও পাকিস্থান তাঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে। এই কথার উল্লেখ করিয়া শ্রীধরণী বলিয়াছেন যে ভারতরাষ্ট্র যদি বাস্তবতার অনুসরণ করিত তবে মুসলমান রাষ্ট্রগুলি এরূপভাবে একটা শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রের অন্যায়ের সপক্ষে যাইতে সাহস পাইত না। ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ যদি বুঝাইয়া দিতেন যে প্যালেষ্টাইন বিভাগের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য পাইতে হইলে আরবরাষ্ট্র-গুলিকে কোন কোন বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতে হইবে, দানপ্রতিদানের নীতি মানিয়া চলিতে হইবে তাহা হইলে আরব রাষ্ট্রগুলি এরূপ ভাবে শ্বেতাঙ্গ প্রাধান্যের সপক্ষে ভোট দিতে পারিত না। ভারতরাষ্ট্র প্যালেষ্টাইন বিভাগের বিরুদ্ধে মত দিয়া প্রস্তাব করিয়াছে যে তৎপরিবর্ত্তে একটা যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হউক, প্যালেষ্টাইনে দুইটি সমমর্য্যাদা-সম্পন্ন রাজ্য এই যুক্তরাষ্ট্র (Federation) প্রতিষ্ঠা করুক। ইহুদীরা ইহার বিরোধী, আরবরাও তাহাদের নিরঙ্কুশ অধিকার চায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে। ইহার ফলে ভারত ইহুদীদের সাহায্য হারাইয়াছে, আরবদের সাহায্যও লাভ করিতে পারে নাই। এইজন্য আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে ভারতরাষ্ট্র নানাভাবে বিপন্ন হইতেছে।

পূর্ব্ব এশিয়ায় যুগ-পরিবর্ত্তন

প্রায় তের বৎসর জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চীনের চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্ট মর্য্যাদার সহিত টিকিয়া ছিল। অবশ্য তাহার পিছন হইতে শক্তি যোগাইতেছিল আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র। মাঞ্চুরিয়ায় বিবাদ আরম্ভ হয় ১৯৩১ সালে; জাপানের দাপটে ঐ দেশ হইতে চীনকে হটিয়া আসিতে হয়। আবার শক্তি পরীক্ষা আরম্ভ হয় ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে। পিপিং নগরীর মার্কো পোলো পুলের ঘটনায় অজুহাতে জাপান চীন দেশের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। চারি বৎসর চীন প্রায় একাকী যুদ্ধ চালাইয়া গেল; পৃথিবীর সহানুভূতি তাহার মনের বল ও উৎসাহ অটুট রাখিতে সাহায্য করে। ভারতবর্ষ হইতেও এই প্রীতি অকুণ্ঠ ভাবে চীনের উপর বর্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই ভাবের গঙ্গোত্রী। কংগ্রেসের সভাপতি রূপে সুভাষচন্দ্র বসু চীনে একটি চিকিৎসক দল প্রেরণ করেন। ১৯৩৯ সালে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কংগ্রেসের প্রতিনিধি-

রূপে চীন দেশের তদানীন্তন রাজধানী চুংকিং গমন করেন। চিয়াং কাইশেক তখন চীনের কর্ণধার। তিনি এই প্রীতির প্রতিদানে সস্ত্রীক ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে আসেন; গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন; ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে প্রকাশ্যে অনুরোধ করেন তাঁহারা যেন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী মণ্ডলের সহিত সম্মানজনক আপোষ করিয়া ফেলেন।

এই সম্বন্ধে অদূর অতীতের কথা স্মরণ করিয়া আমরা চিয়াং কাইশেক পরিচালিত রাষ্ট্রের নূতন বিপর্যয়ে চিন্তান্বিত হইয়া পড়িতেছি। জাপানের পরাজয়ের তিন বৎসরের মধ্যে চীনা কম্যুনিষ্টদের আক্রমণে চিয়াংকাইশেক গবর্মেণ্ট মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীন হইতে হটিয়া আসিতেছে। চীনের রাজধানী নানকিনের উপর আক্রমণ আসন্ন। এই বিপর্য্যয়ের কারণ সম্বন্ধে যে তর্ক উঠিয়াছে তাহাতে যোগদান করিতে গেলে চীনের অবস্থা সম্বন্ধে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন। এই কারণ যথেষ্ট নয় যে সোভিয়েট ইউনিয়ন চীনা কম্যুনিষ্টদের পেছনে থাকিয়া সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করিতেছে; প্রতি-উত্তরে বলা হইতেছে যে চীনের পিছনেও ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সাহায্য আছে। এই ভাবে কাটাকাটি করিয়া অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে চিয়াং কাইশেক গবর্মেণ্ট চীন দেশের জনগণের একটা বিরাট অংশের প্রীতি হারাইয়াছেন বলিয়াই বিপন্ন হইয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন তর্কের অবকাশ নাই। যে সব শক্তি জগতের শক্তিভাণ্ডারের চাবিকাঠি হাতে লইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ-এশিয়ার সোভিয়েট ইউনিয়ন—একমত হইতে পারিলে পূর্ব্ব এশিয়ার যুগ পরিবর্ত্তনে আশার আলোক দেখা দিতে পারে। তাহা না হইলে এই অঞ্চলের গণজাগরণের নেতৃত্ব কম্যুনিষ্টদের হাতে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। একটা কথা শুনা যায় যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এই অগ্রগতিকে বাধা দিবে। উত্তরে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়—তবে এতদিন কেন কম্যুনিষ্টদের প্রসারে বাধা দেয় নাই? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর শুনা যায় নাই, এবং কল্পনা করিয়াও কিছু বলিতে চাই না।

পনর-ষোল বৎসর পূর্ব্বে একখানি বই পড়িয়াছিলাম। আপটন্ ক্লোজ তাহার লেখক। বইখানির নাম—এশিয়ার বিদ্রোহ—*Revolt of Asia*। লেখক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে ব্রিটেন পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্বপদ হারাইবে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সেই পদে বসিবে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারকরূপে নব-জাগ্রত এশিয়ার সম্মুখীন হইবে। তখন একটা ভীষণ সংঘর্ষ দেখা দিবে—সংস্কৃতির সংঘর্ষ; জাতি (race) ও বর্ণের (colour) সংঘর্ষ; অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক এক পক্ষে, পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের বৃহদংশ এক দিকে। এই লোক-বল ও সম্পদ নিয়ন্ত্রিত হইবে শক্তি-ত্রয়ের দ্বারা—সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীনারাষ্ট্র ও জাপান; এই ত্রি-শক্তির মধ্যে জাপানের স্থান হইবে তৃতীয় এবং সাম্রাজ্যবাদের দুইটি শেষ ধারকের বিরুদ্ধে এই ত্রিশক্তি আত্মস্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেও পরাঙ্মুখ হইবে না। এই বই পাঠ করিয়া মনে মনে প্রশ্ন করিয়াছিলাম—ভারত তবু কই?

আপটন্ ক্লোজের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে নাই। এক বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হইয়া জাপানের শক্তি খর্ব্ব হইয়াছে; তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে এবং দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শাসনে আছে। কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়া যাইতে এবং আর্থিক ক্ষতি পূরণ করিতে বেশী দিন লাগিবে না। জাপানের সৈন্যাধ্যক্ষদের বিচারে একজন ভারতবাসী বিচারক, ডাঃ রাধাবিনোদ পাল, নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের নির্দোষ বলিয়াছেন, এবং দেশে ফিরিয়া যাহা বলিতেছেন তাহার মধ্যে আমাদের উক্তির সমর্থন পাই। যে সংযমের সহিত জাপানী জাতি পরাজয়ের নিষ্ঠুর বিধান স্বীকার করিয়া লইয়াছে, যে নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত তাহারা পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে; যুদ্ধোত্তর যুগের নানা অভাব যেরূপভাবে নীরবে, বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ জাতির পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং পরাজিত জাপান ও বিধ্বস্ত চীন সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে সংগঠিত হইয়া উঠিবার অবসর পাইলে পৃথিবীর চেহারা ফিরিয়া যাইবে।

আপটন ক্লোজ বলিয়াছিলেন এই তিন দেশের যুক্ত প্রয়াসে সোভিয়েট হইবে ভাবের গুরু, চীন দেশ হইবে তাহার পরিচালক (manager), এবং জাপান যোগাইবে তাহার সৈন্য-শ্রেণী। এই পরিণতির মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে ইংরেজ, স্কচ ও আইরিশ জাতির সহযোগিতার অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইবে। ইংরেজ করিয়াছে সাম্রাজ্য শাসন, স্কচেরা করিয়াছে সাম্রাজ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্যে লাভ এবং আইরিশরা করিয়াছে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণপাত। সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন ও জাপানের মধ্যে কর্ত্তব্যের ভাগ-বাঁটোয়ারা এই ভাবেই হইতে পারে। এই সম্ভাবনার মধ্যে যে যুগ পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যায় সেই পটভূমিতে ভারত-রাষ্ট্রের স্থান কোথায় তৎসম্বন্ধে আমাদের সজাগ হওয়া উচিত। কারণ কোন প্রাচীর তুলিয়া এই পরিবর্ত্তনের উচ্ছ্বাসকে আমাদের দেশ হইতে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না, যেমন পারে নাই চীন দেশ। ভাবের গতিপথ কোন বস্তু নির্দ্ধারণ করে না। লোকের মনে সমাজ-জীবনের নানা ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সব জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, তাহাই বিপ্লবের বাহক। এই কথাটা স্মরণ করিয়া চলিতে পারিলে ভারতবর্ষ গণ-তন্ত্র ও

সাম্রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে সেতু নির্মাণ করিতে পারে। সেই সৌভাগ্যের যোগ্য হইবার গুণ আমাদের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আমাদের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে তার বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে।

ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা

ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ডাঃ সোকর্ণ ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণে আমাদের দেশে আসিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯৪৭ সালের শীতকালে দিল্লী নগরীতে যে "নিখিল-এশিয়া" কনফারেন্স বসিয়াছিল তদুপলক্ষে এই সাধারণতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শারিয়ার আমাদের দেশে পদার্পণ করেন। ডাঃ সোকর্ণের আগমন উপলক্ষে ইন্দোনেশিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

জাপানী আক্রমণের সময় ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা পলাইয়া গিয়াছিল প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এই সব দ্বীপপুঞ্জ হইতে যেমন ইংরেজরা গিয়াছিল বর্ম্মা ও মালয় হইতে; ইংরেজের প্রধান ঘাঁটি সিঙ্গাপুরের যেমন পতন হইয়াছিল, সেইরূপ মাদুরা, ব্যাটাভিয়া প্রভৃতি ডাচ সামরিক কেন্দ্রও জাপানীদের হাতে চলিয়া যায়। জাপানের পরাজয়ের পর ডাচরা পূর্ব্বের শাসন-ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিতে চায়। কিন্তু গণতন্ত্রী ইন্দোনেশিয়ানরা একটা স্বাধীন সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই প্রত্যাবর্ত্তনে সশস্ত্র বাধা দেয়। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে এই সাধারণ-তন্ত্র (Republic) ঘোষণা করা হয়, এবং তার অস্তিত্ব নানা ভাবে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

ডাচদের ইহা মনঃপূত হইবার কথা নয়, এবং গত তিন বৎসর হইতে ইন্দোনেশিয়ান সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে। একথা সর্ব্বজনবিদিত যে ডাচ পুঁজিপতিদের মুরুব্বি ব্রিটিশ ও মার্কিনী পুঁজিপতিরা, এবং শেষোক্তদের সাহায্য না পাইলে তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং অধীনস্থ দেশসমূহের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সফলকাম হইতে পারিবে না। আজ তিন বৎসর ধরিয়া সে চেষ্টাই তাহারা করিয়া আসিতেছে এবং পূর্ব্ব-এশিয়ার জাগৃতি ও সংহতির পথে বহু বাধা স্থাপন করিতেছে। এই চেষ্টায় তাহারা ইন্দোনেশিয়ার নানা দ্বীপের পুঁজিপতিদের নিকটে নানা ভাবে সাহায্য পাইতেছে। সেইজন্য লিন্‌গজাতি নগরীর সন্ধিসর্ত্ত (১৯৪৬) নানা ভাবে পদদলিত করিতেছে। তাহাদের তাঁবেদারীতে অনেকগুলি রাষ্ট্র গজাইয়া উঠিয়াছে; প্রায় প্রতি দ্বীপে একটি করিয়া রাষ্ট্র ডাচদের অনুগ্রহে গঠিত হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়া সাধারণতন্ত্রের পরিধি ও ক্ষমতা এই ভাবে সঙ্কুচিত হইতেছে যেমন করিয়া "পাকিস্থান" প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষের পরিধি ও ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইয়াছে। আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থার কারণ ও ফল বুঝিতে চেষ্টা করিলে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত নানা সংবাদে বিভ্রান্ত হইতে হইবে না।

গত এক মাসের মধ্যে ওলন্দাজদের দেশ হইতে একটি "মন্ত্রিমিশন" আসিয়াছিল ইন্দোনেশিয়ার—সাধারণতন্ত্রের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আপোষ করিবার জন্য। রাষ্ট্রপতি ডাঃ সোকর্ণ ও প্রধান মন্ত্রী ডাঃ হাত্তা ওলন্দাজ প্রধানগণের সর্ত্তে আপোষ করিতে স্বীকৃত হইতে পারেন নাই। সর্ত্তগুলি কি তাহা স্পষ্ট করিয়া জানা যায় নাই। কিন্তু নানা বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রকে ওলন্দাজ তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির সমপর্য্যায়ে ফেলিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। আর একটা সর্ত্ত ছিল ওলন্দাজ রাজবংশের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রের সম্বন্ধ স্থাপন। এই সম্বন্ধের মধ্যে ওলন্দাজ প্রাধান্যের ব্যবস্থা বা ইঙ্গিত ছিল বলিয়াই বর্ত্তমান আলোচনা ফাঁসিয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। মার্কিনী সাহায্য ব্যতিরেকে ওলন্দাজ-সাম্রাজ্যের ঠাট বজায় থাকিতে পারে না। মার্কিন দেশ গণতন্ত্রের আদর্শ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এই তন্ত্রের মহিমা প্রচারের জন্য বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কল্যাণে যত সব উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার ব্যবহারে চক্ষু খাটিয়া মরে, কর্ণ পীড়িত হয়। কিন্তু মার্কিন দেশের ব্যবহারে তাহার প্রমাণ পাওয়া কঠিন; মন ও মুখে যে ঐক্য থাকা প্রয়োজন তাহার অভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ মার্কিনী শাসক সম্প্রদায়ের আদরে লালিত-পালিত ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের স্পর্দ্ধা; এবং যত দিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের দেশ ডাচদের পিছনে থাকিয়া তাহাদের সাম্রাজ্যলিপ্সাকে প্রশ্রয় দিবে তত দিন ইন্দোনেশিয়ার শান্তি ফিরিয়া আসিবে না। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের "সদিচ্ছা মিশন" ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে; এখন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছে।

লোকসমষ্টি ও তাহার সংস্কৃতির ধ্বংস

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের আইনে একটি নূতন বিধান জুড়িয়া দেওয়া হইল। কোন রাষ্ট্র শান্তির সময়ে বা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাকালে যদি কোন লোকসমষ্টি নিঃশেষ করে বা তাহাদের সংস্কৃতি ধ্বংস করে তবে তাহা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে—যেমন হইয়াছিল পরাজিত জার্ম্মানীর নেতৃবৃন্দ এবং যেমন হইতে যাইতেছে জাপানের নেতৃবৃন্দ। লোকসমষ্টিকে নিঃশেষ করা যায় যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াও, তাহাদের সংস্কৃতির বিলোপ সাধন করা যায় শান্তির সময়েও। আমাদের দেশেও সম্প্রতি ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্টের পর কলিকাতা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, বিহার, উত্তর-পশ্চিম

সীমান্ত প্রদেশ, দিল্লী, পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশে যাহা ঘটিয়াছে তাহা এই নূতন আইনের আওতায় আসে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

অতীত যুগের ইতিহাসে আট্টিলা, চেঙ্গিস খাঁ, হালাকু প্রভৃতি লোকের নামের সঙ্গে এইরূপ অত্যাচার ইতিহাসে স্থান-লাভ করিয়াছে। সেই সময়ের মতি-গতি এইরূপ নিষ্ঠুরতাকে খুব নিন্দনীয় মনে করে নাই। ঐতিহাসিক যুগে—গত দুই হাজার বৎসরের মধ্যে—খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও ইসলামের মধ্যে ধর্ম্মান্তরিত করার কার্য্যকে সাধু-জনোচিত আখ্যায় অভিনন্দিত করা হইতেছে বলিয়া দেখিতে পাই। যদিও এই দুই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক দুই জনই ধর্ম্মপ্রচারে গায়ের জোরের স্থান নাই বলিয়া বিশেষ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, তবুও তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা এই অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াই ধর্ম্মের প্রতি আনুগত্যের বিশেষ বিশেষ প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব যুগের কোন ধর্ম্মই ইউরোপ-আমেরিকায় থাকিতে দেওয়া হয় নাই, হজরৎ মহম্মদ-পূর্ব্ব ইরাণের ধর্ম্ম আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মাত্র দেখা যায়; মধ্য-এশিয়ার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি ইসলামের দাপটে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর্য্য-অনার্য্যের ধর্ম্মের বিরোধ রক্ত-রঞ্জিত কিনা তৎসম্বন্ধে তর্ক চলিতেছে; হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরোধে তরবারির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল কিনা, তাহা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। গত দুই হাজার বৎসরের ইতিহাসে গায়ের জোরে ধর্ম্মপ্রচারের নিদর্শন ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। ইসলাম আসিয়া তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছিল। কোরান বা তরবারি—ইহার দুইটির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হইবে, এরূপ কিম্বদন্তী বিশ্বাস হয় ত করিতাম না। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টোবর নোয়াখালী-ত্রিপুরায় যে তাণ্ডবের সৃষ্টি করিয়া ৫০,০০০ হাজার হিন্দুকে দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে মুসলমান বানাইয়া ফেলা হইল, তাহা দেখিয়া কিম্বদন্তী ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করিতে দ্বিধা হয় না। সেই জন্য সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দরবারে পাকিস্থানের প্রতিনিধি মিসেস্ ইক্রাম-উল্লা খাঁয়ের ওকালতী শুনিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। ভদ্রমহিলাটি সংস্কৃতি ধ্বংসের চেষ্টাকে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে দণ্ডনীয় করিবার পক্ষে অনেক যুক্তি দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশের উপর নির্ভর করিয়া মতামত প্রকাশ করা হইতেছে।

লোকসমষ্টি ধ্বংস (Genocide) নূতন নয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠা এই নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ; অনেক সময়ই এরূপ ধ্বংসলীলাকে পুণ্য কার্য্য বলিয়া অভিনন্দিত করা হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর মানব-মন এই প্রশংসায় সায় দিতে পারিতেছে না বলিয়া, সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে ঘটা করিয়া বক্তৃতা দেওয়া হইতেছে। লোকসমষ্টির প্রাণ ও সংস্কৃতির ধ্বংস বন্দুক-তরবারির সাহায্যে এক দিনে বা দুই-দিনে করিলে বর্ত্তমান যুগের লোকের চোখে পড়ে। কিন্তু কোন রাষ্ট্র বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি ধীরবে বহু দিন ধরিয়া ধ্বংসলীলার নানা প্রক্রিয়া চালাইয়া যায়, তাহার বিচার কে করিবে? কোন লোকসমষ্টির পক্ষে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করা কি সহজ বা সম্ভব? মিত্রশক্তিরা জয়লাভ না করিলে হিটলার বা তোজোর নিষ্ঠুরতার কোন প্রমাণ কি পাওয়া যাইত? ইহুদী জাতির মত সুসংবদ্ধ জাতি হিটলারের নিষ্ঠুর নীতির কথা বহু পূর্ব্বেই আমাদের শুনাইয়াছিল। কেহ কি তাহাতে কর্ণপাত করিয়াছিল?

সেইরূপে মিসেস্ ইক্রাম-উল্লা খাঁয়ের "পাকিস্থানে" যাহা ঘটিতেছে তাহা Genocide—লোকসমষ্টির ধ্বংস ও তাহাদের সংস্কৃতির ধ্বংস—সে বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে নোয়াখালী জেলায় হিন্দুর পাকা ধান ক্ষেত হইতে যে ভাবে, নিয়মিত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, কাটিয়া লওয়া হইতেছে, তাহা Genocide-এর অঙ্গ বলিয়া নালিশ রুজু করিতে আমাদের মনে কোন দ্বিধা নাই। এইরূপ ধান কাটাকে চুরি বলে না। তাহা সুপরিকল্পিত কর্ম্মপন্থার অংশবিশেষ। হিন্দুকে হাতে মারিব না, ভাতে মারিয়া তাহার সংস্কৃতির ভিত্তি শিথিল করিয়া দিব; হয় তাহাকে ভিটামাটির মায়ায় প্রতিবেশীর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিতে হইবে, না হয় ভিটামাটির মায়া সংস্কৃতির পায়ে বলি দিয়া তাহাকে দেশ ত্যাগ করিতে হইবে যেমন করিতে হইয়াছে জার্ম্মানীর ইহুদীকে। এক হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে জার্ম্মানী এই ইহুদীদের জন্মভূমি ছিল; জার্ম্মানীর শাসক-সম্প্রদায়ের অনেকেই জার্ম্মানীর সঙ্গে এত প্রাচীন সম্বন্ধের দাবি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন না।

নোয়াখালী-ত্রিপুরায় "পাকিস্থানের" প্রকৃতির নূতন পরিচয় পাইয়াছিলাম বলিয়া আজ 'Genocide' সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশের অভিজ্ঞতার সাহায্যে পৃথিবীর নানা দেশে যাহা ঘটিতেছে তাহা অনুমান করা সম্ভব। পূর্ব্বে বিলাত-আমেরিকার ইতিহাস পড়িয়া আমাদের নিজের দেশের ঘটনাবলী বুঝিতে চেষ্টা করিতাম, সেইজন্য সে জ্ঞান ছিল কল্পনায় প্রসূত, বাস্তবতাশূন্য। আজ আমাদের জাতীয় জীবনের ঘটনাবলীর সাহায্যে আমাদের দেশের সম্বন্ধে সত্য জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইতেছে; বিদেশের সম্বন্ধেও জ্ঞান সত্য অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত হইতেছে। আমাদের এই জ্ঞান অর্জ্জন করিতে অনেক অশ্রুজলে তাহা পরিক্রত করিতে হইতেছে। তবুও বলিব এই অশ্রুজল সার্থক হইবে, যদি আমরা সত্যের সম্মুখীন হইবার সাহস তাহা হইতে সংগ্রহ করিতে পারি, যদি বিশ্বাস করি যে সত্যব্রতীর অশ্রুজল এই বিশ্ববিধানে ব্যর্থ হয় না।

আমার জীবনের তন্ত্র

শ্রীযদুনাথ সরকার

আজ যে কথা বলতে হবে তার বিষয় হচ্ছে আমার জীবনের দর্শন, অর্থাৎ কোন্ আদর্শ সামনে ধরে, কোন্ মন্ত্র ধ্যান করে আমি এত বছর কাজ করে এসেছি। আত্মজীবনী ব্যাখ্যান করতে গেলে নিজকেই সব কাজের কেন্দ্র বলে ধরে নিয়ে চলতে হয়। রামায়ণ লিখতে গেলে রামকে বাদ দেওয়া যায় না। আমার জীবনে মেনে নেওয়া আদর্শটি দেখাতে গেলে আমি কোন্ পথে চলেছি, এবং কেন সে পথে চলেছি, তা না ব'লে উপায় নেই। যদি কেউ একে আত্মম্ভরিতা বলেন তবে অবিচার করা হবে।

আমরা সকলেই নিজ জীবনের আদর্শ বেছে নিই চোখের সামনে যাঁদের দেখেছি তাঁদের কাজগুলির ভিতর-কার মূলমন্ত্র বুঝে, অথবা বই পড়ে অতীতের মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণী ভেবে ভেবে। কারণ তরুণ মানুষ যে বড় মানুষের মত হতে চাইবে এটা স্বভাবের নিয়ম।

যাঁকে দেখে আমি নিজ জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য স্থির করতে পেরেছি, তিনি আমার পিতা, স্বর্গীয় রাজকুমার সরকার; আজ ৩৪ বৎসর হ'ল তিনি পরলোকগমন করেছেন; মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বৎসর। ধনী জমিদার-সন্তান এবং ইংরেজী শিক্ষিত হলেও তিনি কখনও ভোগ-সুখ বা আড়ম্বর চান নাই; চিরদিন সরল সংযত জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁর জীবনের ব্রত ছিল, আমাদের রাজশাহী জেলার সব রকম লোকহিতকর কাজে নিজকে নিয়োজিত করা। বাংলার প্রথম যুগের ইংরেজী শিক্ষার সমস্ত সুফলই তিনি পেয়েছিলেন। অথচ তাঁর চিত্ত শান্তি পেত, বল পেত, বৈষ্ণব ধর্মের এক সরল উদার রূপ হৃদয়ে মেনে নিয়ে—এতে কোন বাইরের ভঙ্গী বা বদ্ধ কুসংস্কার ছিল না, এজন্য তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করতেন, কলিকাতায় এলেই তাঁকে দর্শন করতেন। মুর্শিদাবাদ জেলার মরিচা-দিয়াড়ে তাঁর এক কাঠা ভূসম্পত্তিও ছিল না, অথচ সেখানকার মুসলমান প্রজাদের নীলকুঠিওয়ালা সাহেবদের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি অনেক বৎসর ধরে নিজের খরচে লড়াই করেন, জেলা আদালত ও হাইকোর্টে মোকদ্দমা ক'রে গবর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত পাঠিয়ে, হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে আন্দোলন ক'রে, এমন কি ঐ বিষয় সংক্রান্ত দলিলপত্র ও সরকারী রিপোর্ট ছাপিয়ে তা পার্লামেণ্টের উদারনৈতিক সদস্যদের জন্য বিলাতে পাঠিয়ে।

ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্য। তিনি আমার বালক চিত্তে ইতিহাসের নেশা জাগিয়ে দেন। আমাকে প্রথমে প্লুটার্কের লেখা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মহাপুরুষদের জীবনী পড়ান। সেই থেকে এবং পরে ইউরোপীয় ইতিহাস পড়ে আমার যেন চোখ খুলে গেল; আমার তরুণ হৃদয়ে অঙ্কিত হ'ল কি করলে কোনো জাতি বড় হয়, কি করলে ব্যক্তিগত জীবনকে সত্য সত্যই সার্থক করা যায়। স্বদেশী বস্ত্র ও শিল্পদ্রব্য ব্যবহার করা যে আমাদের নৈতিক কর্তব্য তা তিনি পুরাতন পার্টিশন আন্দোলনের যুগে নিজ বৃদ্ধ বয়সে পর্যন্ত প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হয়ে নির্ভয়ে বলেছিলেন।

এইরূপে যে জীবনমন্ত্রটি আমি পেয়েছি, তা বলবার আগে সাবধান করে দিই কেউ যেন না ভাবেন যে এই যোগসাধনায় আমি সিদ্ধিতে পৌঁছতে পেরেছি। আমার মৃত্যুর পরই জগৎ বলতে পারবে এর কতটা সার্থক হয়েছে, আর কতটা "বিফল বাসনারাশি" মাত্র। আমার জীবনমন্ত্রটি এই—জগতে কোনো খাঁটি জিনিষ, কোনো সাধু প্রচেষ্টা, কোনো সত্য জ্ঞান, নষ্ট হয় না। ফল পাবার আকাঙ্ক্ষা না করে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাও, ভগবান সেটাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। হে কর্মী! অনেক সময়েই তুমি নিজে তার ফল পাবে না। ধন খ্যাতি সুখ বা প্রতি-পত্তি কিছুই তোমার লাভ হবে না। কিন্তু তোমার কাজটি যদি খাঁটি জিনিষ হয় তবে তা বিশ্বমানবের সম্পত্তি হয়ে থাকবে, তা তোমার দেশকে ঐ এক দিকে ধনী করবে; আর কখন কখন বাইরের জগৎও তাকে চিনবে, আদর করবে, তার অনুসরণ করবে। শস্যের সুস্থ বীজ পাথরের গর্তে পড়লেও অনেক বছর পরে সুবিধাজনক জলবায়ু পেয়ে অঙ্কুর গজায়, গাছ হয়, সহস্রগুণ ফল প্রসব করে। সত্য কাজের, সত্য কথার, খাঁটি জিনিষের মধ্যে এই অজেয় প্রাণ-শক্তি আছে, এই চিরন্তনী সঞ্জীবতা আছে। হে সত্যব্রত সাধক! তোমার সাধনা বর্ত্তমানে কেউ আদর করলে না বটে, কিন্তু বিশ্বরাজের এই বিধি তোমার হৃদয়ে সান্ত্বনা ও দৃঢ়তার কারণ হবে।

এ পথে যে পথিক হবে তার শুধু মনের বল নয়, অসীম ধৈর্য্যও চাই। তাকে অল্পে সন্তুষ্ট হলে চলবে না, সহজে কাজ সারব, এই ফন্দি করলে তার চেষ্টা শেষে পণ্ড হবে। যে ছাত্র পাঠ্য পুস্তক না প'ড়ে, শুধু সংক্ষিপ্ত নোট পড়ে বা

বাছা বাছা প্রশ্নগুলির উত্তর মুখস্থ করে, সে পরীক্ষা পাস করতে পারে, কখন কখন এই প্রদেশে ফার্ষ্ট ডিভিশনেও স্থান পায়, কিন্তু তার প্রকৃত বিদ্যা হয় নি, সে শিক্ষক হতে পারে না, আর হলেও ঠিক নিজের মত ছাত্রই তৈরি করবে। যে কাজ খাঁটি, যার ফল স্থায়ী হবে, তাকে সম্পূর্ণ করতে বেশী সময় লাগে, তার জন্য অনেক দিন ধরে অনেক রকম উপকরণ জোগাড় করতে হয়, এবং অনেক নূতন বিষয় পড়ে নিজকে সেই কাজের উপযুক্ত কারিগর করে তুলতে হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের চরিত্রের চিহ্ন হচ্ছে এই ধৈর্য্য, এই সুদূর পরিকল্পনা, এইমত সস্তা মেকী জিনিষের প্রতি বিমুখতা। নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি, কোনো একজন দিল্লীর বাদশা অথবা মারাঠা রাজার ইতিহাস লিখতে গিয়ে আমাকে প্রথমে দশ বছর ধরে তার উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে; সেগুলি সাজিয়ে, সংশোধন ক'রে, আলোচনা ক'রে, মনের মধ্যে হজম ক'রে, দশ বৎসর পরে ঐ পুস্তকের লেখা আরম্ভ করি, তার আগে নয়। পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুষ্প্রাপ্য পুস্তক কিনতে ও ফার্সী হস্তলিপির নকল নিতে বোধ হয় আমার উদ্বৃত্ত আয়ের অর্দ্ধেক খরচ হয়েছে; মারাঠা দেশে ত্রিশ-বত্রিশ বার এবং আগ্রা, দিল্লী, মালয়, রাজপুতানা, প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রদেশে বারো-তেরো বার বেড়িয়েছি। এছাড়া ঐ উপকরণসমূহ রীতিমত বুঝবার জন্য আমাকে ফার্সী, মারাঠী ও পোর্তুগীজ প্রভৃতি নূতন ভাষা শিখতে হয়। এই দশ বৎসর বাইরের জগতের কাছে আমার কাজ সম্বন্ধে নীরব থাকতে হ'ত। কেন অসময়ে ঘোষণা করে, লোককে আশা দিয়ে পরে নিজকে হাস্যাস্পদ করব? কিন্তু এই দশবর্ষ-ব্যাপী উদ্যোগপর্ব্বই আমাদের ধৈর্যের শেষ পরীক্ষা নয়। আমাদের গবেষণার ফলটি প্রকাশিত হবামাত্র চারদিক থেকে তার মূল্য সম্বন্ধে অবিশ্বাস, ঈর্ষ্যার কুৎসিত অপবাদ আমাদের ঘিরে ফেলে। কিন্তু যাই বিলাতের কোনো বিখ্যাত পত্রিকায় কোনো সাহেব আমাদের গবেষণার প্রশংসা করলেন, অমনি আমাদের স্বজাতীয় নিন্দুকগণ একেবারে চুপ হয়ে গেল।

খাঁটি কাজের পুরস্কার অনেক সময় এ জীবনেই পাওয়া যায়। কত অপরিচিত বিদেশী আমার প্রাথমিক লেখা প'ড়ে আমাকে ফার্সী, পোর্তুগীজ হস্তলিপি পাঠিয়ে, বা স্থানীয় খবর দিয়ে সাহায্য করেছেন। পরে শিষ্যগণ এসে আমার চারদিকে জুটেছে। আজ সমস্ত সভ্যজগৎ এক দেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া যেখানেই কোন খাঁটি জিনিষ বা নূতন সত্য বাহির হয়, অমনি সমস্ত সভ্যজগৎ তা জেনে নেয়, নিজের ক'রে ফেলে, এ রকম দৃষ্টান্ত আমার জীবনকালেই দেখা গেছে। পরাধীন ভারতে দু-জন ভারতবাসী বিশ্বপূজ্য হয়েছেন, নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। যেসব যুবক নীরবে খাঁটি কাজ করবার জন্য বুক বেঁধেছে, আমি নিজ দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের এই আশ্বাস দিচ্ছি—তোমরা ঠিক পথ বেছে নিয়েছ, তোমরা সফল হবেই হবে, "জীবনে না হয়, মরণে।"

আমাদের শিক্ষিত লোকদের দুর্ব্বল চরিত্র ও নীচ মন দেখে দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শেষ বয়সে misanthrope হয়ে পড়েন, অর্থাৎ মানবজাতিকে অবিশ্বাস ও ঘৃণা করতেন। কিন্তু দেখ, দেশসেবায় তাঁর যে জীবন উৎসর্গ হয়েছিল, তা নিষ্ফল হয় নি; যদি তিনি আজ জীবিত থাকতেন তবে এদেশে নানা রকম সমাজ-সংস্কার কার্য্যে এবং নানা ক্ষেত্রে বাঙালীর যা কখনও ভাবা যায় নি, এমন সব প্রতিভা ও কৃতিত্ব দেখে তিনি আনন্দিত হতেন। সেইমত আমি নিজে দেখেছি, বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দেশবাসীর স্বার্থপরতায় চটে গিয়ে চেঁচাচ্ছেন—"এই গু-খেকো জাতের কিছু হবে না।" হায়! আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন ত দেখতে পেতেন যে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর সায়েন্স-এর সেই বৌবাজারের পুরানো বাড়ীতে গবেষণা ক'রে একজন ভারতবাসী জগদ্বরেণ্য হলেন, মৌলিক আবিষ্কারের জন্য রমন বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেলেন। মহেন্দ্রলালের জীবন ব্যর্থ হয় নি।

যে যুবক-সাধক এই মহা আদর্শ বরণ করবে, তাকে প্রথমে চারদিক থেকে দৈন্য হিংসা দুর্নাম এবং বহু বাধা বিপত্তি নীরবে সহ্য করতে হবে। এজন্য তার পক্ষে চাই একটি অন্তর্জগৎ, অর্থাৎ মনের মধ্যে একটা দুর্গ সৃষ্টি করা,—যেখানে বসে তার চিত্ত স্নিগ্ধতা শান্তি ও বল পেতে পারে। সেই জগৎটা হচ্ছে পূর্ব্বগামী মনীষিগণের রচিত সাহিত্য। আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ হয়েছে এই গ্রন্থের সাহচর্য্য। উপনিষৎ ও সংস্কৃত কাব্য, ইউরোপীয় কাব্য, ইতিহাস ও জীবনী, বাংলার ত কথাই নাই,—এগুলি আমাকে এক নূতন রাজ্য দিয়েছে যেখানে কোনো শত্রু প্রবেশ করতে পারে না, সেখানে গিয়ে আমি নূতন প্রাণশক্তি পাই। এটিও আমার পিতার কাছ থেকে শিখেছি।

সাহিত্য বা কলার সাধনা ঠিক যোগসাধনার মত। এতে কঠিন জিনিস দেখে ভয় পেলে চলবে না। যে লোক ভাবে যে সস্তায় কাজ হাসিল করবে, সে কখন কখন যশ বা ধন পেতে পারে বটে, কিন্তু তার জীবনের ফল একটি অসার প্রাণহীন শুষ্ক শস্যের খোসামাত্র। মেকী জিনিষ বেশী দিন চলে না।

যোগসাধনে রত তপস্বীর মতই আমাদের গবেষককে সরল শ্রমসহিষ্ণু জীবন যাপন করতে হবে, দীর্ঘকাল কঠোর দারিদ্র্য সহ্য করে তারপর সিদ্ধি আসবে। এইজন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে আমরা বিজ্ঞান-তপস্বী বলি। তিনি জীবনে Chemistry এবং দেশী লোকের যৌথ ব্যবসা—এই দুটিই ধ্যান করেছিলেন, সুখ নহে।

বর্তমান যুগে এইরূপ সাধনা আগের চেয়ে বড় কঠিন হয়ে পড়েছে। আমরা বলে থাকি এটা জনতন্ত্রের যুগ, age of democracy, কিন্তু যেখানে জনগণ অশিক্ষিত, অ-সংঘবদ্ধ, সেখানে রাজনৈতিক জুয়াচোরের প্রাধান্য হবেই হবে। যে ফন্দিবাজ লোক ব্যবসা বা বিষয়কর্ম্মে লাভবান হবার সম্ভাবনা নাই দেখলে, সে দল পাকিয়ে নেতা হয়ে নিজের আত্মীয় ও অনুচরদের দেশের টাকায় ধনী করলে। চারদিকে এইরূপ অবিচার ও অসাধুতার প্রাধান্য দেখে চিন্তাশীল স্বদেশভক্ত যুবক হতাশ্বাস হতে পারে, সে ভাবতে পারে, "দূর ছাই! ভাল খাঁটি কাজ করা এদেশে অসম্ভব। চারদিকে চোরের রাজত্ব, ঘুষের জয়। আমি একক, তৃণমাত্র, এই বন্যার স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভেসে যাব।"

আমি তাকে বলব—"হতাশ হয়ো না। সত্যের জয় হবেই হবে, হয়ত তোমার মৃত্যুর পর। কিন্তু দেশের সকল সুসন্তানই যদি হতাশ হয়ে দেশের জন্য খাঁটি কাজ করার ব্রত মাথায় তুলে নিতে পিছুপা হয়, তবে দেশের কোন ভবিষ্যৎ থাকবে না, অসাধুতার বিরোধী সৈন্যদল গঠন করা কারও পক্ষে কখনও সম্ভব হবে না। সমস্ত জাতিটা লোপ পাবে। অযোগ্য প্রাণী, জুয়াচোর জাতি ধ্বংস হবে, প্রকৃতির এই কঠোর নিয়ম অনিবার্য্য।"

খাঁটি কাজের, জ্ঞানসাধনার, দেশসেবার কঠোর ব্রত কখন কখন সাধককে জীবিত কালেই পুরস্কার দেয়; আমি নিজে তা পেয়েছি। তাই, যে যুবক কর্ম্মী এই পথে চলে আমার চেয়ে কম ভাগ্যবান্ হবে, তাকে বলি—কোন বাধা, বাইরের কোন চক্রান্ত, সত্যসন্ধানী দেশসেবককে একটি সান্ত্বনা হতে বঞ্চিত করতে পারবে না—সে সান্ত্বনা এই, তোমাকে মৃত্যুশয্যায় বলতে হবে না—

জন্মেদং বন্ধ্যতাম্ নীতং ভব-ভোগোপলিপ্সয়া,
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ময়া।

অর্থাৎ হায়! আমি কি ঠকাই ঠকেছি! সারা জীবনটা মাটি করলাম, টাকা সুখ যশ এই সব ভোগের সামগ্রী খুঁজে খুঁজে। আমি একটা দৈব শক্তিসম্পন্ন মণি পেয়েছিলাম, যেটা আমাকে যা চাই তাই এনে দিতে পারত। অথচ আমি সেই চিন্তামণি ফেলে দিয়ে এক টুকরা চক্চকে অসার কাঁচ নিলাম।"*

* অল্-ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে প্রকাশিত। প্রবন্ধটি ১২ই অক্টোবর ১৯৪৮ কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রে পঠিত হয়।

জিজ্ঞাসা

শ্রীকমলরাণী মিত্র

চিহ্নিত করিয়া রাখো শোণিত অক্ষরে
সেই দিনগুলি, হে কালের ইতিহাস,
নারীর সম্মান যবে আর্ত কণ্ঠস্বরে
পূর্ণ করি ভারতের আকাশ-বাতাস,
ভারতের পৌরুষেরে করিল আহ্বান
চরম লাঞ্ছনা হ'তে লভিতে উদ্ধার।
সেদিন জাগে নি সাড়া; প্রলয়-বিষাণ
গরজি উঠে নি বাজি হানিয়া সংহার
ধর্ম্মঘাতী কামাচারী পাপিষ্ঠের বুকে।
লাঞ্ছিতের ভগবান তুমিও সেদিন
অনন্ত-শয়ানে ছিলে—তোমার সম্মুখে
সতীত্বের পুণ্যব্রত হ'ল ধূলিলীন।

মিথ্যা স্তোকবাক্যজালে কর্ত্তব্যের দায়
কোনক্রমে সারা হ'ল সান্ত্বনার ছলে;
রাষ্ট্রনীতি মনুষ্যত্বে করিল বিদায়,
দুরাচার স্ফীতকায় প্রশ্রয়ের কোলে॥

সেদিন চিহ্নিত থাক্, কহিতে ধিক্কার
অপদার্থ পৌরুষের নির্বিকার মুখে;
সেদিন চিহ্নিত থাক্, নিতে অঙ্গীকার
তিলে তিলে প্রতিশোধ হানিতে কৌতুকে!
সেদিন চিহ্নিত থাক্ ধ্বনিতে জিজ্ঞাসা
দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট স্বচ্ছ মেঘমন্দ্রভাষা;
"প্রহসন স্বাধীনতা কোন্ মূল্যে আজ
কিনিয়াছ বলো জনগণ-অধিরাজ!"

জয়দেবের দুকূল

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

জয়দেবের কৃষ্ণ দুকূল পরিধান করিয়া গোপাঙ্গনাদের সহিত বিহার করিতেন। অবশ্য একখানি দুকূল নয়, দুইখানি। একখানি অন্তরীয়, অপরখানি উত্তরীয়। উত্তরীয় প্রাবরণ, উড়ানী। তদ্দ্বারা উর্ধ্বাঙ্গ আবৃত থাকিত। এই বস্ত্রযুগের নাম উদ্গমনীয়। এই কারণে কাহাকেও বস্ত্র দিতে হইলে ধুতি উড়ানী দিতে হয়। উড়ানী আবরণী, নারীর ওড়না। বহু প্রাচীনকাল হইতে বস্ত্র-ধারণের এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। কেহ কোথাও একবস্ত্রে যায় না। মলিন কিম্বা ছিন্ন বস্ত্রেও যায় না। কোন ভদ্রলোক গৃহে আসিলে যুগ্মবস্ত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার রীতি ভারতের সর্বত্র অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ইহার অন্যথা হইলে অসভ্যতা হয়। উদ্গমনীয় ধৌত বস্ত্রের হইত। ধৌত শব্দ হইতে ধৌতি। ধৌতি হইতে ধোতি, ধুতি আসিয়াছে।

জয়দেব লিখিয়াছেন, "বিচকর্ষ করেণ দুকূলে।" কৃষ্ণ কুঞ্জগত হইলে কৌতুক করিতে কোন গোপাঙ্গনা করদ্বারা দুকূলদ্বয় আকর্ষণ করিল।

কি বর্ণের দুকূল? গৌর দুকূল। পূজারি-গোস্বামী জয়দেবের টীকাতে গৌর অর্থে পীত করিয়াছেন। গৌর পীত বটে, কিন্তু আ-পীত। দুকূল পীত অর্থাৎ হরিদ্রাবর্ণ হইত না। কৃষ্ণ নব-নীরদবর্ণ ছিলেন না, ছিলেন আকাশ বর্ণ বা অতসীকুসুম বর্ণ, সে বর্ণ আ-নীল বা আ-কৃষ্ণ। আ-কৃষ্ণ অঙ্গে আ-পীত বসন বর্ণের বৈপরীত্যগুণে একের শোভা অন্যে বৃদ্ধি করে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় রক্ত ও হরিৎ, পীত ও নীল পরস্পর পরিপূরক বর্ণ। রাধিকা গৌরী ছিলেন, তাঁহার অঙ্গে নীলাম্বরী শোভা পাইত। কিন্তু সে নীল গাঢ় নীল নয়। প্রাচীন বঙ্গীয় কবি মেঘ-ডম্বর শাড়ীর উল্লেখ করিয়াছেন। ডম্বর সংস্কৃত শব্দ, অর্থ, সদৃশ। মেঘ-ডম্বর, মেঘের তুল্য নীল। বঙ্গীয় নারী মেঘ-ডম্বর শাড়ী পরিতে ভালবাসিতেন। অতএব তিনি গৌরী ছিলেন, কৃষ্ণা ছিলেন না। কৃষ্ণের পরিহিত দুকূল অবশ্য ধৌত। দুকূলের বর্ণ প্রক্ষালনে নষ্ট হয় নাই। বোধ হয় দুকূলের স্বাভাবিক বর্ণ পাণ্ডুর ছিল।

আমরা দুকূল দেখিতে পাই না। দুকূল কি বস্ত্র, জিজ্ঞাসা করিতে হয়। অমরকোশে দুকূল শব্দ আছে। ক্ষৌম ইহার পর্যায় শব্দ। অমরকোশের টীকাকার মহারাষ্ট্রীয় ভানুজি দীক্ষিত এই দুই বস্ত্রকে পট্টবস্ত্র বলিয়াছেন। ইহা এক মহা ভ্রম, পরে বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা ক্ষুমাজাত, ইংরেজীতে Linen.

বঙ্গদেশে দ্বাদশ খ্রীষ্ট শতাব্দে সর্বানন্দ অমরকোশের এক টীকা করিয়াছিলেন। তিনি ক্ষৌম ও দুকূলের অর্থ করিয়া লিখিয়াছেন, মল্ল নামে খ্যাত। আপ্টে-কৃত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানে বিশেষণ মল্ল শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট। অতএব মল্ল বলিলে উৎকৃষ্ট বস্ত্র বুঝাইত। আর সেই বস্ত্র দুকূল। মল্ল শব্দ হইতে বাংলায় ও হিন্দীতে মল্‌মল্ শব্দ আসিয়াছে। ইংরেজ বণিকের নিকট ইহার নাম মল্ (Mull)। কেহ কেহ ঢাকার সূক্ষ্ম বস্ত্রকে ঢাকাই মসলিন বলে। কিন্তু মসলিন ইংরেজী শব্দ। ইহা ঢাকাই মল্‌মল্। ইহা কার্পাস নির্মিত, ক্ষুমা নির্মিত নয়, কিন্তু এত সূক্ষ্ম যে দেশে-বিদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। জয়দেব সর্বানন্দের সমসাময়িক। তিনি নিশ্চয় মল্ল দেখিয়াছিলেন, আর কৃষ্ণের অঙ্গে সেই সূক্ষ্ম বস্ত্র অর্পণ করিয়াছিলেন।

দুকূল পট্টবস্ত্র নহে, ক্ষৌমবস্ত্র। ক্ষুমা-জাত ক্ষৌম। অমরকোশে 'অতসী স্যাৎ উমা ক্ষুমা', এক গাছের তিন নাম। অতসীর বাংলা নাম তিসী। ইহার বীজ মসিনা, সংস্কৃত মসৃণা। মসিনায় তৈল আছে। সে তৈলের নিমিত্ত বঙ্গে ও বিহারে তিসীর বিস্তর চাষ হইতেছে। তিসীর দুই তিন জাত আছে। কোনটার ফুল প্রায় শ্বেত, কোনটার আ-নীল, কোনটার অরুণাভ আ-নীল। কৃষ্ণ অতসীকুসুম শ্যাম ছিলেন। মৎস্য পুরাণ পাঠে জানা যায় হিমালয়-কন্যা পার্বতী কৃষ্ণা ছিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া গৌরী হইয়াছিলেন। বোধ হয় সেই কারণে অতসীর এক নাম উমা হইয়াছিল। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি অতসীর বল্কলে কোমল স্নিগ্ধ অংশু আছে। সেই অংশুর সূত্র ও বস্ত্র নির্মিত হইত। সেই বস্ত্রের নাম ক্ষৌম। সূক্ষ্ম ক্ষৌমের নাম দুকূল ছিল। রামায়ণে, কালিদাসে, ভট্টিতে ক্ষৌম বস্ত্রের বহু উল্লেখ আছে। দুকূল এত সূক্ষ্ম হইত যে দেহলগ্ন অলঙ্কার উহার মধ্য দিয়া দেখিতে পাওয়া যাইত।

এখানে এদেশের বস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিতেছি। উপরে দেখাইয়াছি, দ্বাদশ খ্রীষ্ট শতাব্দে বঙ্গের দুকূল বহুজাত মল্ল নামে খ্যাত ছিল। কিন্তু এক শত বৎসরের মধ্যে দুকূল ও ক্ষৌমের দুর্গতি হইয়াছিল। বঙ্গদেশে ত্রয়োদশ খ্রীষ্ট শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে মেদিনীকোশ সঙ্কলিত হইয়াছিল।

এই কোশে দুকূল শব্দে শ্লক্ষ্ণ বস্ত্র ও ক্ষৌম আছে। শ্লক্ষ্ণ বস্ত্র কোমল স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম বস্ত্র। অর্থাৎ তৎকালে ক্ষুমাজাত দুকূল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। তৎপরিবর্ত্তে লোকে শ্লক্ষ্ণবস্ত্রকে দুকূল বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পট্ট এইরূপ বস্ত্র হইতে পারে, এই বিবেচনায় সেই সময় হইতে ভ্রমের আরম্ভ হইয়াছিল। তৎকালে ক্ষৌমবস্ত্রও দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিতেছিল। ইহার প্রমাণ মেদিনীকোশে পাওয়া যায়। ইহাতে ক্ষৌম শব্দের অর্থ অট্ট, দুকূল এবং বল্কলজাংশুক, শণজ ও অতসীজ বস্ত্র। প্রথম দুই অর্থ অমরকোশ হইতে গৃহীত, অন্য অর্থ কালক্রমে আসিয়াছিল। ক্ষৌম অতসীজ বুঝি, শণজ নূতন, আর বল্কলজ আরও নূতন। শণজ বস্ত্রের নাম শাণ। এই শণ বর্তমানে জ্ঞাত পীত পুষ্প শণ নহে। শণ শব্দ দ্ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন শণ ভঙ্গা বা সিদ্ধি গাছের নামান্তর। এই শণ গাছের বল্কলে অংশু আছে। সে সাদৃশ্যে পীত পুষ্প শণের নাম হইয়াছে। ভঙ্গার ফুল নগণ্য।

ভঙ্গা হইতে পৃথক করিতে পীত পুষ্প শণের নাম ফুলশণ আছে। সংস্কৃত কোশে ও আয়ুর্বেদে শণ ভঙ্গা। অন্য অর্থ নাই। ভঙ্গা শণের অংশুতে বস্ত্র হইত। সে বস্ত্র শাণ (Canvas)। এই শণের বীজে তৈল আছে। লোকে সে তৈল পাইত। অতসীর যেমন অংশু ও তৈল, ভঙ্গা শণেরও তেমন অংশু ও তৈলের নিমিত্ত বিস্তর চাষ হইত। সমগ্র উত্তর-ভারতে, মধ্য ভারতেও এই শণের চাষ ছিল। গ্রামে চতুর্দশ ধান্যের চাষ হইত। তন্মধ্যে শণ একটি ধান্য (ধান্য অর্থে ধান, কলাই, তিল ইত্যাদি খাদ্যবীজ)। মনুসংহিতায় উপনয়ন কালে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীকে শাণবস্ত্র, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীকে ক্ষৌমবস্ত্র এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারীকে মেষলোমজবস্ত্র পরিতে বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশে শাণবস্ত্র ও ক্ষৌমবস্ত্র অজ্ঞাত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী শাণবস্ত্রের অভাবে পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেছেন। ওড়িয়্যায় কেঅটরা বড় জালের নিমিত্ত যেমন ফুলশণের সরু স্থতলি করে তেমন স্থতলি দিয়া ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়নের জন্য প্রায় জালের মত পাতলা ছোট কাপড় বুনে। হাত দুই লম্বা, পোয়া তিনেক চওড়া। বাঁকুড়ায় উৎকল শ্রেণীর অনেক ব্রাহ্মণের বাস আছে, কিন্তু উৎকলের কেঅট নাই। পুরোহিত ব্রাহ্মণ-বালকের উপনয়ন কালে বালকের কটিতে ফুল শণের অংশু বিছাইয়া মেখলা দ্বারা বদ্ধ করেন। বঙ্গদেশে ভঙ্গার চাষ ছিল না। বোধ হয় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে শাণবস্ত্র আসিত। শাণবস্ত্র স্থূল। ইহার চাদর হইত। আমরা কেম্বিশের থলিয়া, জুতা দেখিতেছি। কেম্বিশ এই শাণবস্ত্র।

মেদিনীর কালে যাবতীয় বল্কলজাত বস্ত্রের নাম ক্ষৌম হইয়াছিল। বস্ত্র কেবল পরিধেয় বস্ত্র নয়; চাদর, চটও বস্ত্র। তৎকালে ফুলশণের চাষ অধিক ছিল না। তৎপরিবর্তে পাটশণ সমধিক প্রচলিত ছিল। ইংরেজ বণিক গাছ পাটের (অর্থাৎ নালিতা পাটের) চাষ বিপুল আকারে বাড়াইয়াছে। পূর্বে অংশুর জন্য এই পাটের চাষ ছিল কিনা সন্দেহ। পাটশণের গাছ জবাগাছের তুল্য। ফুলের আকার জবাফুলের আকার; কিন্তু পীত-বর্ণ। এই পাট উচ্চভূমিতে কিন্তু নালিতা পাট নিম্ন ভূমিতে জন্মে। বাঁকুড়া ও মানভূমে এই পাটের চাষ এখনও চলিয়াছে। পূর্বে ইহারই নাম পাটশণ ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে সিংহলে বাণিজ্যে "পাটশণ বদলে ধবল চামর।" অর্থাৎ পাটশণ ধবল চামরের তুল্য উজ্জ্বল, এই কারণে বণিকেরা পাটশণের দ্বারা কৃত্রিম চামর করিত। শূন্য পুরাণে ইহারই নাম বেরাল-পাট, অর্থাৎ বেরাল-লোমের তুল্য উজ্জ্বল পাট। বেরাল পাট নাম অদ্যাপি বাঁকুড়ায় প্রচলিত আছে। অন্যত্র ইহার নাম মেষ্টা পাট, অর্থাৎ মেষ-লোমের তুল্য উজ্জ্বল পাট। পাটশণকে কোথাও কোথাও কেবল পাট বলিত। চৈতন্যদেবের সময়ে নবদ্বীপে শ্রীধর নামে এক পাট-ব্যাপারী ছিল। এই কারণে তাহার নাম পাটুয়া শ্রীধর হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে খুল্লনাকে খুঞা পরিতে হইয়াছিল। যেমন ভূমি শব্দ হইতে ভূমি+ইয়া=ভূমিয়া, ভূঞা; তেমন ক্ষৌম অপভ্রংশে খোম; খোম+ইয়া=খোমিয়া, খুমিয়া, খুঞা। এই খুঞা নিশ্চয় অতিশয় স্থূল বস্ত্র। বোধ হয় পাটশণের চট। খুঞা বুনিবার পৃথক তাঁতী ছিল। ভারতচন্দ্র খুঞা তাঁতীর উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব শণ শব্দে বৈদিক কাল হইতে অর্থ ভঙ্গা, পরে ফুলশণ ও পাটশণ আসিয়াছে। পট্ট শব্দেরও সেই দুর্দশা হইয়াছে। পট্ট অর্থাৎ গরদ কৃমিজ; তাহার সাদৃশ্যে বেরাল পাট নাম এবং ইহার সাদৃশ্যে গাছ পাট বা জুট।

কি কারণে ক্ষৌমের এই অধোগতি হইল তাহা ঐতিহাসিকের চিন্তনীয়। বোধ হয় জয়দেবের পূর্ব হইতেই দুকূল-বয়ন-কলার হ্রাস ও অবনতি হইতেছিল। তদুপরি মনে হয়, দেশে অশান্তিও চলিতেছিল। উদবেগের সময়ে কলার অবনতি অবশ্যম্ভাবী। লোকে ভালমন্দ বিচার করে না, যাহা পায় তদ্দ্বারা কাজ চালায়। বর্তমানে আমাদের সেই দশা হইয়াছে। তখন বোধ হয় কার্পাস চাষ অধিক চলিতে লাগিল এবং ক্ষুমা ক্রমশঃ অপরিচিত হইয়া পড়িল। লোকে মনে করিতে লাগিল বল্কলজাত বস্ত্র মাত্রই ক্ষৌম। টীকাকারেরা ক্ষৌম ও দুকূল না পাইয়া ইহার অর্থ কৌষেয় (তসর) ও পট্টবস্ত্র বুঝিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা পতিগৃহে যাইবেন, তাঁহার পরিধানের নিমিত্ত কণ্ব ঋষির তপঃপ্রভাবে বৃক্ষ হইতে আ-পাণ্ডুর ক্ষৌম আসিল। টীকাকার বুঝিলেন, কৌষেয়। কারণ তসর কোষ বৃক্ষে উৎপন্ন হয়। শকুন্তলা ঋষির আশ্রমে বল্কল পরিধান করিয়া থাকিতেন। সকল বৃক্ষ হইতে বল্কল পাওয়া যায় না। ইহা দীর্ঘও হয় না, কারণ এক হাত ব্যাসের অধিক স্থূল বৃক্ষ কাটিয়া তাহার বল্কল উন্মোচন করা সোজা কাজ হয় না। বৃক্ষের কাণ্ডের ব্যাস এক হাত হইলে বল্কল তিন হাত পাওয়া যাইবে। গুঁড়ির দুই হাত আড়াই হাত ছেদ করিয়া মুগুর দিয়া গাত্র পিটিতে থাকিলে বল্কল শিথিল হয় এবং খোলের ন্যায় পৃথক করিতে পারা যায়। তখন লম্বা-লম্বি চিরিয়া জলে ভিজাইয়া মুগুর দিয়া পিটিতে থাকিলে বল্কলের শ্লেষ্ম ও শুষ্ক অংশ দূরীভূত হয় এবং ভিতরের অংশু-জাল থাকে। ইহাই পরিধেয় বল্কল। শকুন্তলাকে দুইখানি বল্কল পরিতে হইত। একখানি কটি বেষ্টন করিয়া মেখলা-বদ্ধ থাকিত, বোধ হয় আঁঠু পর্য্যন্ত লম্বিত হইত। অপর একখানি ছোট, ঊর্দ্ধাঙ্গ আবরণ করিত। স্কন্ধদেশে ডোরের গ্রন্থি দেওয়া হইত। বল্কল অদ্যাপি অদৃশ্য হয় নাই। ওড়িষ্যায় কুম্ভীপটিয়া নামে এক সম্প্রদায় আছে। তাহাদের এক জনকে বল্কল পরিয়া সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া সূর্য প্রণাম করিতে দেখিয়াছি। কটিতে ডোর বাঁধা, আঁঠু পর্যন্ত লম্বিত, খদির বর্ণ, কোমল। ওড়িষ্যায় ও অন্যত্র জম্বুকাদি বর্গের কুম্ভী নামে এক বৃক্ষ আছে। তাহার ফল কুম্ভাকার, এই হেতু বৃক্ষের নাম কুম্ভী। কুম্ভী ও পট সংস্কৃত শব্দ। কুম্ভীর বল্কল পট (বস্ত্র) হইয়াছে যাহার, কুম্ভীপট+ইয়া—কুম্ভীপটিয়া। কুম্ভীর বৈজ্ঞানিক নাম Careya arborea. প্রাচীনকালে মৃগচর্ম পরিধেয় হইত। চর্ম কেমন করিয়া স্থায়ী ও কোমল করিতে হয়, তাহা জানা ছিল। কিন্তু বল্কল ও চর্ম বস্ত্র-গণ্য হইত না।

অমরকোশে বস্ত্রের চতুর্বিধ উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে; বল্কলজাত, যেমন ক্ষুমা ভঙ্গা; ফলজাত যেমন কার্পাস, লোমজাত যেমন ঊর্ণা; কোষকীট-জাত, যেমন তসর ও পট্ট। আমার অনুমানে অমরকোশের বর্তমান সংস্করণ তৃতীয় খ্রীষ্ট শতাব্দে হইয়াছিল। ইহাই কিন্তু মূল অমরকোশ নহে। সর্বানন্দ বৃদ্ধ অমরকোশ পাইয়াছিলেন। তাহা অন্ততঃ দুই-তিন শত বৎসরের পূর্ববর্তী হইবে। তাহাতে বস্ত্রের চতুর্বিধ উৎপত্তি থাকিবার কথা।

কিন্তু এই সময়ের পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশ ক্ষৌম ও দুকূলের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ইহার চারি শত বৎসর পূর্বে কৌটিল্য বঙ্গের দুকূলের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইতিহাস-পাঠক জানেন, চাণক্য পণ্ডিতের বুদ্ধিকৌশলে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি মুরা জাতীয়া কন্যার পুত্র ছিলেন। এই হেতু ইনি মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। চাণক্য শ্লোকে চাণক্যের নীতি বালকদিগেরও পরিচিত হইয়াছে। তিনি কুটিল নীতি দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের শত্রুদমন করিয়াছিলেন। এই হেতু তিনি কৌটিল্য নামেও খ্যাত হইয়াছেন। তিনি রাজ্য পরিচালনার নিমিত্ত "অর্থশাস্ত্র" নামে এক অমূল্য গ্রন্থ রচিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় এমন নীতি ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ আর একটি নাই। শুক্র-নীতি, বৃহস্পতি-নীতি, কামন্দক-নীতি, বিদুর-নীতি প্রভৃতি গ্রন্থে যাহা নাই, কৌটিল্যের অর্থনীতি গ্রন্থে তাহা আছে। মহীশূর রাজ্যের রুদ্রপট্টণ শামশাস্ত্রী মহারাজার গ্রন্থপাল ছিলেন। তিনি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আবিষ্কার ও প্রকাশ করেন, পরে ইংরেজীতে অনুবাদও করিয়াছিলেন। অনুবাদে দ্রব্যনির্ণয়ে অসংখ্য ভুলও করিয়াছিলেন। ইহাতে আশ্চর্যের কথা নাই। কারণ কেবল ভাষাজ্ঞান কিম্বা কেবল বিষয়জ্ঞান কিম্বা দ্রব্যজ্ঞান দ্বারা এইরূপ গ্রন্থ বুঝিতে পারা যায় না। এই তিনের সংযোগ সুদুর্লভ। তদুপরি অর্থশাস্ত্রের ভাষা অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও দুরূহ। তথাপি শামশাস্ত্রী-কৃত ইংরেজী অনুবাদ দ্বারা পাঠকের প্রভূত দিগ্‌দর্শন হইয়াছে। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও বেদবিদ্যায় অধিকার সর্বদা সুলভ নয়। অর্থশাস্ত্রের এক অধ্যায়ে রাজকোষে রক্ষার উপযুক্ত রত্ন ও আবশ্যক বস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ তালিকা আছে। সেখানে মাত্র তিনটি স্থানের দুকূলের উল্লেখ আছে। বঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুবর্ণকুড্য। বঙ্গ ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী দেশ, পুণ্ড্র পদ্মার উত্তরদেশ, সুবর্ণকুড্য কামরূপ। কৌটিল্য লিখিয়াছেন—"বঙ্গদেশ-জাত দুকূল শ্বেতবর্ণ স্নিগ্ধ, পুণ্ড্রদেশ-জাত শ্যামবর্ণ মণিতুল্য স্নিগ্ধ এবং সুবর্ণকুড্য-জাত সূর্যবর্ণ মণিতুল্য স্নিগ্ধ। এই সকল দুকূলের কোনটা এক-অংশু, কোনটা অর্ধ-অংশু অথবা দুই-তিন-চারি অংশু দ্বারা নির্মিত।"

কৌটিল্য ভারতবর্ষের মধ্যে উক্ত তিন দেশেরই দুকূল এবং কাশী ও পুণ্ড্রদেশের ক্ষৌম শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া রাজকোষে রাখিতে বলিয়াছেন। একটি অংশুর অর্ধাংশের দুকূল না জানি কত সূক্ষ্ম হইত! ক্ষৌম স্বভাবতঃ শ্বেত বা আ-পাণ্ডুর। শ্যামবর্ণ ও সূর্যবর্ণ নিশ্চয়ই রঞ্জিত বস্ত্র। ক্ষৌমে পাকা রং করা কঠিন। রঞ্জন-কলার কত উন্নতি হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাইতেছি। বঙ্গের ঐতিহাসিকেরা এই উল্লেখের গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন কি না সন্দেহ। খ্রী-পূ চতুর্থ শতাব্দে যে কলার এত

উৎকর্ষ হইয়াছিল, কত শত বৎসর পূর্ব হইতে ইহার অনু-
শীলন চলিতেছিল? এই দুকূল ও ক্ষৌম কে পরিত?
কাহারা নির্মাণ করিত? নিশ্চয় বঙ্গীয়েরা। তৎকালে
ক্ষুমার চাষও নূতন ছিল না। যজুর্বেদে ক্ষৌমের উল্লেখ
আছে। সে বেদ খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দে রচিত হইয়াছিল।
ইহারও কত শত বৎসর পূর্ব হইতে ক্ষুমার চাষ চলিয়া
আসিতেছিল তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। শণ
(ভঙ্গা)ও বহু প্রাচীনকাল হইতে বস্ত্রের প্রধান উপাদান
হইয়া আছে। আমরা দেশের ইতিহাস জানি না।
হিমালয়ের দক্ষিণাংশে পশ্চিম হইতে পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত প্রতি-
বৎসর ভঙ্গার জঙ্গল হইয়া থাকে। মজঃফরপুরে ও বিহারের
উত্তরাংশে, মালদহে এমন কি বীরভূমের নদীকূলে ভঙ্গা
জন্মিতেছে এবং বৃথা নষ্ট হইতেছে। অদ্যাপি শুনি নাই,
কেহ সে ভঙ্গার অংশু দ্বারা সূত্র ও বস্ত্র নির্মাণ করিতেছে।

জয়দেবের দুকূল চিন্তা করিতে করিতে বহু দূরে গিয়া
পড়িয়াছি। এখন নিবৃত্ত হই।

প্রবাহ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

৯

পরদিন যথাসময়ে মৃন্ময় দেশের মাটিতে পা দিল। রাত তখন ন'টা। অন্ধকার রাত্রি। আকাশে চাঁদ নাই। শুধু এখানে-ওখানে দুটি-একটি তারকা দেখা যায় মাত্র। আশেপাশের বড় বড় গাছগুলি অন্ধকারে খানিকটা বর্ণভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। ধীরে ধীরে মৃন্ময় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পশ্চাতে নৌকার মাঝি জিনিষপত্র লইয়া তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। রাত বেশী হয় নাই, কিন্তু এরই মধ্যে গ্রাম যেন ঘুমে আচ্ছন্ন। শুধু থাকিয়া থাকিয়া দুই-একটা বাদুড় খাদ্যান্বেষণে উড়িয়া যাইতেছে। এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যেই মৃন্ময় মানুষ হইয়াছে। রাতের এই ঘুমন্ত প্রাণময় জগতের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। এই মাটিতে পা দিতেই মন তাহার বিপুল আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে।

আরও খানিক অগ্রসর হইতেই একসঙ্গে বহু লোকের স্বর মৃন্ময়ের কানে আসিল। সে ক্ষণকালের জন্য থামিল। প্রতিমার সাজ-পোশাক লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। কর্ম-কারদের প্রতিমায় রং দেওয়া হইতেছে।

মৃন্ময় পুনরায় চলিতে সুরু করিল। সম্মুখেই জমিদার-ী। বাড়ীময় একটা চাঞ্চল্যের আভাস যেন। দ্বিতলের হল-ঘরে একসঙ্গে অনেকগুলি মানুষের ছায়ামূর্তি ঘোরা-রা করিতেছে। মৃন্ময়ের কেমন সন্দেহ হইল। মঞ্জুষার ার অসুস্থতার সংবাদ সে জানিত। দারবানকে জিজ্ঞাসা া সন্দেহের মীমাংসা করিল। উহারা সকলে ভালই ই।

আর একটি বাঁকের শেষেই মৃন্ময়দের বাড়ী। কিন্তু বাড়ীর ায় আসিয়া কাহারও সাড়াশব্দ পাইল না, কেননা কে সে কোন খবর দেয় নাই। তাহার আসিবার নিশ্চয়তা ছিল না বলিয়াই দেওয়া সম্ভব হয় নাই। গ্রামের আজকাল কি দুরবস্থাই না হইয়াছে। পূজা আসন্ন অথচ কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য নাই। মৃন্ময়ের নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল। পূজা-অর্চনায় সেকালের মত উৎসাহ বর্তমানে বড় একটা দেখা যায় না। কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলের মধ্যেই তখন সাড়া পড়িয়া যাইত। প্রতিমার গড়ন, তার মুখশ্রী, আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা লইয়া রীতিমত প্রতিযোগিতা চলিত। সেদিনের উৎসাহীর দল আজ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেশের প্রতি কাহারও তেমন মমতা নাই।

ছেলেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া মা অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিলেন। একমুখ হাসিয়া কহিলেন, তবে যে উনি বলছিলেন তুই আসবি নে···এবং খবর না দিয়া আসিবার জন্য তিরস্কার করিতেও ভুলিলেন না।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, তোমায় মোটেই ভাবতে হবে না মা। ষ্টীমারে আমি পেট ভরে খেয়ে এসেছি।

মা কহিলেন, তোর যেমন কথা। পথে-ঘাটে আবার খাওয়া হয় নাকি। ঘরের ডাল-ভাতও ভাল।

মৃন্ময় পুনরায় কি বলিতে যাইতেই মা বাধা দিয়া কহিলেন, তোকে আর বাজে বকতে হবে না। যা বলি তাই শোন। হাত-মুখ ধুয়ে আমার কাছে বসবি আয়।

খড়ম পায়ে প্রতুলও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি কহিলেন, তোর চেহারাটা ত তেমন ভাল ঠেকছে না মিনু। কলকাতার জলবায়ু বুঝি সহ্য হচ্ছে না?

মা কহিলেন, পথ-ঘাটের কষ্টটাই কিছু কম মনে করছ তুমি? মৃন্ময়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন। মুখ, হাত-পা ধুয়ে নে। পুকুরে যেতে হবে না, তোলা জল আছে। আর বাপু ঐ

রাস্তা-ঘাটের কাপড়চোপড়গুলো বাইরেই ছেড়ে রাখিস। বার জাতের ছোঁয়াছুঁয়ি। তোদের ত আর জ্ঞানগম্যি কিছু নেই। কথা বলতে গেলেই তর্ক করবি, বলবি জাত মানি না। জাত না মানিস অসুখ-বিসুখ তো মানতে হয়।

মৃন্ময় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কোন জবাব দিল না। মা পুনরায় আপন মনেই বলিয়া চলিলেন, বোকা ছেলের কাণ্ডখানা দেখ তো! একটা খবর দিয়েও কি আসতে নেই। সকালবেলার অমন মাছটা…কিন্তু তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস কেন। তুই ফিরে আসতে-আসতেই আমি সব গুছিয়ে নেব। ঘরে ডিম আছে—কৈ মাছ আছে।

মৃন্ময় চলিতে চলিতে শুনিতেছিল, মা বাবাকে বলিতেছেন, চেহারাটা ওর সত্যিই বড় খারাপ হয়ে গেছে। কলকাতার বাড়ীতে কি কিছু খাওয়া জোটে! গোনাগুণতি সব কিছু—তাও আবার ঠাকুর-চাকরের হাতে প্রাণ। আর তেমনি হয়েছে মিনু। ছুটি-ছাটা পেলেই যদি ছুটে আসে, দুটো খাইয়ে দাইয়ে একটু মানুষ করে পাঠাতে পারি।

প্রতুল একটু হাসিয়া কহিলেন, ছুটিছাটা বছরে দশ বার পাওয়া যায় না।

মা কহিলেন, তা নাই বা পেলে লম্বা ছুটি। ছুটকো-ছাটকা তো প্রায়ই পায়। এই তো মঞ্জু বলছিল, মাসখানেক আগেও নাকি কি একটা পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে সাত দিনের ছুটি ছিল। পথের কষ্ট তো একটি দিন মাত্র। তা ছেলেও হয়েছে তেমনি।

প্রতুল প্রস্থান করিলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্ষেত হইতে গোটাকয়েক বেগুন লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, কহিলেন, মিনুকে ডেকে দিও। বেশী আর হাঙ্গামা এই রাত দুপুরে করো না। যা হোক একটা ব্যবস্থা করে দিলেই চলবে।

প্রতুল চলিয়া গেলেন। কিন্তু যাঁহাকে যাহোক-একটা ব্যবস্থার বিধি দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন তাঁহার এত সহজে মন উঠিল না।

মৃন্ময় ফিরিয়া আসিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল, তোমার যত কাণ্ড মা। বললাম আমার খিদে নেই। ভরপেট ষ্টীমারে—

মা ধমক দিলেন, ওখানে একটা আসন পেতে চুপ করে বসে থাক্।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, শরীরটাও তেমন ভাল ঠেকছে না। দুটো ভাতে ভাত হলেই ভাল হ'ত।

মা কহিলেন, বালাসনে মিনু। সেই ব্যবস্থাই হয়েছে।

মৃন্ময় সহসা প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হইল, আসবার পথে জমিদার-বাড়ীর দোতলায় অনেক লোকজন আর আলো জ্বলতে দেখে এলাম মা। মঞ্জুদার মা ভাল আছেন তো?

মা কহিলেন, মঞ্জু আজ বলছিল বটে ওরা কাল হাওয়া বদল করতে বেরিয়ে পড়বে। ওর মার ভাঙা শরীরটা কিছুতেই আর জোড়া লাগছে না।

মৃন্ময় কহিল, সামনে পুজো ফেলে এমন অসময়ে যে…

মা কহিলেন, প্রাণের চেয়ে তো আর বড় কিছু নেই বাবা—তা বলে মঞ্জুর বাবা এখুনি যাচ্ছেন না। তিনি যাবেন সেই কালীপুজোর পরে। সরকারমশাই আর ঠাকুর-চাকর সহ মঞ্জু তার মাকে নিয়ে যাচ্ছে। ভালোয় ভালোয় আরোগ্য হয়ে ফিরে আসেন তবে তো হয়।

মৃন্ময় কথা কহিল না। তাহার গ্রামে আসিবার আগ্রহের সুর কোথায় যেন কাটিয়া গেল।

মা পুনরায় কহিলেন, ভাবতেও কষ্ট হয়। নইলে এমন মাটির মানুষ—কোন দিক দিয়ে কোন অভাব তাঁর নেই, অথচ তাঁর মনে শান্তি নেই। ছেলে যদি অশান্তির কারণ হয় তা সব মা বাপের পক্ষেই মর্ম্মান্তিক। কাল সকালে উঠেই একবার দেখা করে আসিস মিনু। মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না।

মৃন্ময় তথাপি নীরব।

মা পুনশ্চ কহিলেন, তুই আসবি নে শুনে মঞ্জুর মা দুঃখ করছিলেন। নিজের পেটের ছেলে পর হয়ে গেল—তাই পরকে নিয়েও তার সোয়াস্তি নেই। বলেন, নাড়ির বাঁধন যখন ছেলেকে আটকাতে পারে নি তখন কথার দাম আর কতটুকু।

মৃন্ময় মনে মনে হাসিল।

মা যেন আপন মনেই বলিয়া চলিলেন, যেন মুখের কথার কোন দাম নেই।

মাতা-পুত্রের আলোচনাটা নিতান্ত একতরফা হওয়ায় এক সময় আপনিই তাহা থামিয়া গেল।

পরদিন অতি প্রত্যূষেই মৃন্ময়ের ঘুম ভাঙিল। সকাল-বেলার মুক্ত বায়ু তার দেহমনকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। সে উঠিয়া পড়িল। নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া আসিতে হইবে এবং ফিরিবার পথে মঞ্জুদাদের বাড়ী হইয়া আসিবে। জমিদার-বাড়ীতে ভোর হয় আটটায়, সুতরাং তাদের ওখানে এখন যাওয়া চলে না।

রাস্তায় পা দিতেই ভূদেবের সহিত দেখা। মঞ্জুর ছোট ভাই ভূদেব। এই সামান্য কয়েক মাসের ব্যবধানেই সে যেন কিছু লম্বা আর রোগা হইয়া গিয়াছে। মৃন্ময় কহিল, ভাল আছ ভূদেব?

ভূদেব হাসিয়া কহিল, ভালই আছি মিনু-দা। কিন্তু আপনি শুনছিলাম এবার আসবেন না। কাল রাত্রে পৌঁছুলেন বুঝি।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, কথাটা এরই মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু মন যে বাধা মানে না ভাই। উভয়ে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। যেন মস্ত বড় একটা হাসির কথা হইয়াছে।

ভূদেব কহিল, বৌদি কালও বলছিলেন, দেখে নিস্ ভুদু, মিনু ঠাকুর-পো সময়মত নিশ্চয়ই আসবে। খবরটা তাকে দিতে হবে।

মৃন্ময় অন্য প্রসঙ্গে আসিল, গ্রামের আজকাল হাল-চাল কি ভূদেব। নূতন খবর কিছু আছে নাকি?

ভূদেব কহিল, না নূতন খবর আর থাকবে কোত্থেকে।

মৃন্ময় একটু নিরাশ হইল, কহিল, খবর সব সময়ই থাকে ভূদেব। শুধু খুঁজে পেতে নিতে হয়। সে যাকগে, যাবে নাকি আমার সঙ্গে নদীর পাড়ে বেড়াতে?

ভূদেব কহিল, এইমাত্র আমি বেড়িয়েই ফিরছি।

মৃন্ময় আর কথা বাড়াইল না। একলাই পথ চলিল। রাস্তার পাশ হইতে এঁঠেল গাছের এক টুকরা ডাল ভাঙিয়া লইল। পথ চলিতে চলিতে দাঁতন করা যাইবে। নদীর তীর ধরিয়া আরও খানিকদূর অগ্রসর হইয়া যাইতেই একটা বাঁকের মুখে রাধু বোষ্টমের সহিত মুখোমুখি দেখা। মৃন্ময় কহিল, কে, বোষ্টমদা না?

হাসিমুখে রাধু বোষ্টম কহিল, চিনতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি। উভয়ের গতি মন্থর হইল।

মৃন্ময় কহিল, না চেনার কথা নয় বোষ্টমদা কিন্তু তোমার চোখ দুটো অমন লাল কেন?

রাধু সশব্দে হাসিয়া উঠিল, বোকা লোকগুলো কি কোন কালে হিসেব করে চলতে জানে দাঠাকুর। চেয়ে আছ কি, এইমাত্র শ্মশান থেকে ফিরেছি। বাপ-খুড়ো, পাড়া-পড়শী মরদগুলো সব বোতল বোতল গিলে এসেছেন। গতি করবার বেলা এই রাধু বোষ্টম, কি করি বৌটা এসে কেঁদে পড়েছে।

মৃন্ময় বিস্ময় বোধ করিল। কহিল, তুমি কি সব উল্টা-পাল্টা বকছ রাধুদা? কার আবার গতি করে এলে?

রাধু কহিল, চণ্ডে বাগ্দীর দু'বছরের ছেলেটার। ঐ একটা মাত্র ছেলে। না পড়ল এক কৌটা ওষুধ, না পেলে একটু সেবা-শুশ্রূষা। বৌটা সকালে বেরুল গোঁসাইপাড়ায় ধান ভানতে। ছেলেকে রেখে গেল ঘর আগলাতে। ফিরে এসে দেখে ছেলেটা মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। একেবারে আসল কলেরা। সন্ধ্যে নাগাদ সব ঠাণ্ডা। পাড়া-পড়শীরা সন্ধ্যার পর কারখানা থেকে এলেন মত্ত অবস্থায়। কাল পেয়েছে হপ্তার মাইনে। তখন ওদের সামলাতেই লোকের দরকার। চণ্ডের বৌটা এসে কেঁদে পড়ল। কি করি বল!

মৃন্ময় বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। রাধু পুনরায় বলিয়া চলিল, চণ্ডের নেশা ছুটে গেলেও আর কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। কি অলক্ষুণে কারখানাই হ'ল, গ্রামকে শেষ না করে আর ও ক্ষান্ত হবে না। রাধু একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, গিয়ে দেখি চণ্ডে তার মরা ছেলেটাকে বুকে নিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

৪

মৃন্ময় তথাপি নীরব।

রাধু পুনরায় কহিল, কারখানা করেছিস্ বেশ করেছিস, কিন্তু তার মধ্যে মদের দোকান কেন।

মৃন্ময় বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, ওটা দরিদ্রকে দমিয়ে রাখবার পাকা বুনিয়াদ বোষ্টমদা। দেড়শ' বৎসর বিদেশী রাজত্বের করুণার দান।

রাধু বোষ্টম বারকয়েক মাথা নাড়িয়া কহিল, কথাটা ঠিক বুঝলাম না দাদাঠাকুর। দোষটা সত্যি কাদের। রাজার জাতের না আমাদের নিজেদের। এ করুণার দান তোমরা মাথায় তুলে নিয়েছ কেন। ঝেড়ে ফেলবার শক্তি এবং সাহস যখন তোমাদের নেই তখন মিথ্যা দোষ দেওয়া আর আত্ম-প্রবঞ্চনা করা একই কথা। রাধু বোষ্টম থামিল। তাহাকে যেন একটু উত্তেজিত মনে হইল।

মৃন্ময়ের বিস্ময় সীমা ছাড়াইল। তার পরিচিত রাধু বোষ্টমকে যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না। ক্ষেপাটে আত্ম-ভোলা অর্দ্ধশিক্ষিত রাধু বোষ্টমের এ যেন আর এক রূপ। মৃন্ময় বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতে রাধু বোষ্টম পুনরায় কহিল, ছোট মুখে বড্ড বড় কথা হয়ে গেল। কিন্তু কথাটা আমার নয়। ধার করা দাদাঠাকুর।

মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে কহিল, তা হোক। কিন্তু বড় খাঁটি কথা বলেছ তুমি বোষ্টমদা। সাহস এবং সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির অভাবই আমাদের প্রতিপদে অতলে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর মুষ্টিমেয় জনকয়েক স্বার্থান্বেষী তারই সুযোগ নিয়ে নিজেদের কায়েমী স্বার্থের পাকা ইমারত গড়ে তুলেছে।

মৃন্ময় একটু থামিয়া পুনরায় উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, তাদের সাবধান করে দিতে হবে যে, যাদের অস্থি-পঞ্জর দিয়ে তোমাদের ইমারতের গাঁথুনি তৈরি করেছ তারা একদিন নূতন প্রাণশক্তি নিয়ে বেঁচে উঠবে, যার প্রচণ্ড আলোড়নে কর্পূরের মত উবে যাবে তোমাদের ঐ নির্লজ্জ উৎপীড়নের উপায়গুলো।

রাধু বোষ্টম সহসা হাসিয়া উঠিল। কহিল, এ যেন শূন্যে হাত-পা ছুড়ে বীরত্ব দেখানো দাদাঠাকুর।

মৃন্ময় অত্যন্ত লজ্জা পাইল। রাধু সহসা অন্য কথা পাড়িল, আছ তো দিনকয়েক দাদাঠাকুর? সময় করে একবার যেয়ো। গোটাকয়েক কথা আছে। রাধু আর উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াইল না। মাঠের পথে দ্রুত প্রস্থান করিল।

রোদ উঠিয়াছে। রাধু বোষ্টমের জন্য মৃন্ময়ের অনেকটা বিলম্ব ঘটিল। আজ আর বেড়ান হইবে না। কিন্তু তার জন্য একটুও দুঃখিত সে নয়। রাধুকে সে বরাবরই ভিন্ন চোখে দেখে। কিন্তু আজ ওর সম্বন্ধে তার মনে একটা কৌতূহল জাগিল। মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলিতেছিল। তেওয়ারীর কণ্ঠস্বর তার কানে যাইতেই তাহাকে থামিতে হইল। কোন

প্রকার ভূমিকা না করিয়াই তেওয়ারী জানাইল যে, মঞ্জুষা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে।

মৃন্ময় কহিল তোমাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম তেওয়ারী। চলো। একটু থামিয়া মৃন্ময় তেওয়ারীকে প্রশ্ন করিল, আমি এসেছি এ খবর তোমাদের মঞ্জুদিদি পেলে কেমন করে?

তেওয়ারী গোঁফের আড়ালে মৃদু হাসিল। প্রকাশ্যে কহিল, সে তাহা জানে না।

মৃন্ময় অকারণে খানিকটা খুশী হইল।

বাহির-মহলেই মঞ্জুষা অপেক্ষা করিতেছিল। মৃন্ময়কে সহাস্যে অভ্যর্থনা করিল, সু-প্রভাত মিনুদা। তোমার বেড়ানো হ'ল।

মৃন্ময় হাসিল, কোন উত্তর করিল না। তেওয়ারী সময় বুঝিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। উভয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধটা এ বাড়ীর সকলেরই জানা।

মঞ্জুষা কহিল, আবার হাসছ কোন্ মুখে। সেই ভোর ছ'টায় এই পথ দিয়ে গেছ আর ফিরলে প্রায় সাড়ে আটটায়। তাও আমাকে ডেকে পাঠাতে হ'ল। নইলে এ বেলা হয়তো এখানে আসবার সময়ই হ'ত না তোমার।

চমৎকার অভিযোগ। কিন্তু প্রতিবাদ করা বৃথা। তথাপি হাসিমুখেই মৃন্ময় জবাব দিল, সকালবেলার মিষ্টি রোদটুকুর মোহ আমার কম নয় মঞ্জু।

মঞ্জু কহিল, এ মোহ আবার কবে থেকে?

মৃন্ময় কহিল, যদি বলি আজ থেকে এবং তা তোমার আহ্বান পৌঁছুবার আগে পর্য্যন্ত তা হলে কি তুমি তা বিশ্বাস করবে?

মঞ্জুষা দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া কহিল, যার কথা এবং কাজে কোন মিল নেই তাকে কেমন করে বিশ্বাস করা যায় বল তো। মঞ্জুষা ক্ষণকালের জন্য থামিয়া পুনরায় কহিল, তোমার চিঠি পেয়ে আমার যা রাগ হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন ধরেই আমার মন বলছিল তুমি আসবে। কিন্তু এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? ভেতরে চলো।

মৃন্ময় কহিল, তোমার মা কেমন আছেন?

মঞ্জুষা কহিল, মাঝে বুকজ্জ বাড়াবাড়ি গেছে, ইদানীং খানিকটা ভালই আছেন। তাই হাওয়া বদলের ব্যবস্থা হয়েছে। আজই যাবার কথা ছিল কিন্তু ভোরবেলা উঠে বাবা মত বদলালেন। পুজোটা সামনে রেখে যাওয়া হতে পারে না। অথচ এ প্রশ্ন আগেও উঠেছিল, কিন্তু বাবা কারুর কথায় কান দেন নি।

মৃন্ময় কহিল, বিদেশে যাবার জন্যে তুমি বুঝি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছ?

মঞ্জুষা কহিল, বরং তার উল্টো। কিন্তু আমার কেমন ভয় করে। বাবা হয়তো মার মৃত্যু আশঙ্কা করছেন।

মৃন্ময় কিছু বলিবার জন্যই হয়তো মুখ তুলিয়াছিল, সহসা জীবানন্দের গলার সাড়া পাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ প্রশ্ন করিলেন, কে মিনু এসেছ নাকি!

মৃন্ময় নত হইয়া প্রণাম করিল। জীবানন্দ তার মাথায় হাত রাখিলেন। কহিলেন, প্রতুল বলছিল পড়াশুনার ক্ষতি হবে বলে এবার পুজোর সময় তুমি আসবে না। পড়াশুনোর অবহেলা করতে বলছিনে, তা বলে পুজো-পার্ব্বনের সময় মা বাপের কাছে ফিরে আসতে হয় বৈকি। তাদের দিকটাও একবার ভেবে দেখা দরকার। জীবানন্দর কণ্ঠস্বর কেমন একটু ভারি ঠেকিল। তিনি পুনরায় কহিলেন, তা ছাড়া দেশ-গাঁয়ে আসা-যাওয়াটা একবার বন্ধ হয়ে গেলে শেষ পর্য্যন্ত ঐটেই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। নইলে গ্রামের আজ এ দুরবস্থা হবে কেন। তিনি থামিলেন।

মৃন্ময় নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু পিতার অলক্ষ্যে মঞ্জুষা একটু হাসিল। মৃন্ময়ের এই বিব্রত ভাবটিতে সে বেশ মজা পাইতেছিল। এতকাল শহরে থাকিয়াও তার মিনুদা ঠিক তেমনি লাজুক রহিয়া গিয়াছে।

জীবানন্দ পুনশ্চ কহিলেন, ছুটি-ছাটা পেলেই মা-বাপের কাছে আসতে হয়। এগুলি বন্ধন। তিনি প্রস্থান করিলেন।

মৃন্ময় এতক্ষণে কথা কহিল, ভারি কাজিল হয়ে পড়েছ মঞ্জু।

মঞ্জুষার দু'চোখে আনন্দ উপছাইয়া পড়িতেছে। সে হাসিয়া কহিল, অবশ্য তোমার মত লাজুক হয়ে পড়িনি। আচ্ছা কি হলে আমার খুব মানাত মিনুদা? লজ্জায় মুখ লাল করে ছুটে পালিয়ে গেলে, না আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার দিকে চেয়ে থাকলে? মঞ্জুষা আর এক দফা হাসিয়া উঠিল।

মৃন্ময় প্রসঙ্গান্তরে যাইতে চায়। কহিল, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, না তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাবে।

মঞ্জু পথ চলিতে চলিতে পুনরায় প্রশ্ন করিল, আর তখন চিঠি দিয়েছি, আর একটা চিঠিরও উত্তর দেওয়া তুমি দরকার মনে কর নি মিনুদা।

মৃন্ময় কহিল, তোমার চিঠি পাইনি বলেই হয়তো।

মঞ্জুষা হাসিয়া কহিল, উপস্থিত দায় এড়াবার এর চেয়ে সহজ পন্থা আর কিছু নেই মিনুদা!

মৃন্ময় কহিল. তা হলে তুমি বলতে চাও যে, আমি তোমায় মিথ্যে বলেছি?

মঞ্জুষা কহিল, মিথ্যে বলতে আমারও বয়ে গেছে।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, কি লিখেছিলে অতগুলো চিঠিতে?

মঞ্জুষা প্রত্যুত্তরে হাসিমুখে কহিল, চমৎকার প্রশ্ন তোমার। সব কথা আমি যেন মনে করে বসে আছি। যখন যা মনে এসেছে তাই লিখেছি।

মৃন্ময় কোন কথা কহিল না।

মঞ্জুষা থামিতে পারিল না। কহিল, আচ্ছা সে কথা শুনে তোমার কি লাভ হবে মিনুদা।

মৃন্ময় কহিল, সে কথা জেনেই বা তোমার কি হবে মঞ্জু।

মঞ্জুষা হঠাৎ একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, তুমি বুঝি রাগ করেছ?

মৃন্ময়ও গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল, রাগ করিনি, কিন্তু দুঃখ পেয়েছি তোমার স্মৃতিশক্তির অপচয় ঘটতে দেখে।

মঞ্জুষা হাসিয়া ফেলিল। ধমক দিয়া কহিল, আবার বাজে কথা।

মৃন্ময় হাসিল। মৃদু কণ্ঠে কহিল, অনেকটা এগিয়ে গেছ দেখছি। শাসন করতেও দিব্যি শিখেছ।

মঞ্জুষা হঠাৎ যেন একটু লজ্জা পাইয়াছে এমনি ভাবে কহিল, আমি যেন তাই বলেছি। না না, তুমি ভারি অসভ্য হয়েছ…ছি…মঞ্জুষা অকস্মাৎ অন্যত্র প্রস্থান করিল। মৃন্ময় মঞ্জুষার মায়ের ঘরে প্রবেশ করিল।

মৃন্ময়কে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মঞ্জুষার মায়ের দুটি চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি মৃদুকণ্ঠে তাহাকে কাছে ডাকিয়া পাশে বসাইলেন। কহিলেন, আমি জানি মিনু আমার তেমন ছেলে নয়। পুজো-আর্চ্চার দিনে সে নিশ্চয় মায়ের কোলে ফিরে আসবে। মঞ্জুষার মা থামিলেন। অতর্কিতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। চোখের কোণে দেখা দিল অশ্রু-রেখা। মৃন্ময় অকারণে অপরাধীর মত ভাব দেখাইয়া বসিয়া রহিল। বলিবার মত কোন কথাই তার মুখে যোগাইল না। মঞ্জুষার মা পুনরায় কহিলেন, মঞ্জু বলছিল এটা তোমার পরীক্ষার বছর। পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে আসবে না। বোকা মেয়েটা শুধু পড়াশুনোর কথাটাই ভেবেছে, সেই সঙ্গে মা-বাপের কথাটা ভেবে দেখে নি। মা-বাপকে অসুখী রেখে কেউ কোন দিন বড় হতে পারে না।

দরজার পাশে মঞ্জুষা দেখা দিল। মা ডাকিলেন, তোর মিনুদা এসেছে মঞ্জু, ওর জন্য একটু খাবার দিয়ে যেতে বল মা।

মঞ্জুষা মায়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, আমি জানি মা। খাবার এখুনি বামুন-মা দিয়ে যাচ্ছে।

মঞ্জুষার মা কহিলেন, আমি তখনই তোকে বলেছিলাম না, মিনু আমার তেমন ছেলে নয়। ও নিশ্চয় পুজোর দিনে আসবে।

ইহার পরে যে কোন্ কথা আসিবে এ খবর মঞ্জুষার জানা। সে ব্যস্ত ভাবে অন্য কথা পাড়িল। ঐ দেখ মা কথায় কথায় কত বড় ভুল হয়ে গেছে। ন'টা বেজে গেল, তোমার ওষুধ দেওয়া হয় নি এখনও। কেষ্টর মাকে দিয়ে যদি একটা কাজ কোন দিন হয়।

মা হাসিয়া কহিলেন, কেষ্টর মা ত কোনোদিন আমায় ওষুধ দেয় না মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, দেয় এ কথা আমি বলছি নে মা। দিলেও তো পারে এক আধ দিন। জান মিনুদা, এ বাড়ীর চাকর-বাকরগুলো হয়েছে এক-একটি খুদে বাদশা। এই যে বামুন-মাকে এক ঘণ্টা হ'ল খাবার দিয়ে যেতে বলেছি, এল এখনও। ফাঁকি দেবার সুযোগ পেলে এতটুকুও সে ছাড়ে না।

বামুন-মার আবির্ভাবে প্রসঙ্গটা আপাতত চাপা পড়িলেও মঞ্জুষার অভিযোগের জের এইখানেই শেষ হইল না। পুনরায় অন্য পথে প্রকাশ পাইল। মঞ্জুষা মাকে পুনশ্চ কহিল, এই যে সরকার মশাই—যাকে নিয়ে আমরা বিদেশে যাবার আয়োজন করেছিলাম তার উপরও আমার একটুকু আস্থা নেই। কাল ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার ফরমাসমত সব জিনিস পত্র ঠিক করে রাখা হয়েছে ত?

মাথা চুলকে জানালেন, প্রায় সবই ঠিক আছে। তবে… এই তবের হিসেব নিতে গিয়ে দেখা গেল প্রায় সব কিছুই তখনও ঠিক হয় নি। কি ভাগ্যি এখন আমাদের যাওয়া হ'ল না।

ইহার পরে মঞ্জুষা আর এক কাণ্ড করিয়া বসিল। মাকে ঔষধ খাওয়াইয়া তাঁর গাঁ ঘেঁষিয়া বসিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, একটা কাজ করলে হয় না মা।

মঞ্জুষার মা এবং মৃন্ময় একসঙ্গে তার মুখের পানে চাহিলেন। মঞ্জুষা তেমনি মৃদুকণ্ঠে কহিল, মিনুদাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেলে হয় না মা। ওর তো প্রায় দেড় মাসের ছুটি।

মায়ের মুখে হাসি দেখা গেল। মৃন্ময়ের চোখে বিস্ময়।

মা কহিলেন, গেলে তো ভালই হ'ত, কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব হবে মা, এত দিন পরে মিনু তার মা বাবার কাছে এসেছে।

মঞ্জুষা কহিল, কিন্তু আমরা তো আর দু-চার দিনের মধ্যেই যাচ্ছি নে। মিনুদা তার মা-বাবার কাছে থাকবার সুযোগ তো পাচ্ছেনই।

মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, মিনুর সুবিধে-অসুবিধের কথাটাও একবার ভাবা দরকার মঞ্জু।

মৃন্ময় হয়ত কিছু বলিবার জন্য মুখ তুলিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে মুখ খুলিবার অবকাশমাত্র না দিয়া মঞ্জুষা পুনরায় কহিল, মিনুদার সুবিধে-অসুবিধের কথা তোমায় ভাবতে হবে না মা, জ্যাঠাইমাকে ডেকে তুমি বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মায়ের মুখে মুহূর্তের জন্য একটুখানি হাসির রেখা দেখা দিল। কি ভাবিলেন তিনিই জানেন, প্রকাশ্যে কহিলেন,

কথাটা মঞ্জু মেহাত মন্দ বলে নি মিনু। আমাদের সঙ্গে দিন কয়েকের জন্ত ঘুরে আসবে চল। তোমার মায়ের অনুমতি আমি চেয়ে নেব।

মৃন্ময় কথা বলিবে কি! সে এই নির্লজ্জ মেয়েটির কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। সে না পারিল মুখ তুলিয়া চাহিতে, না পারিল একটা সহজ প্রতিবাদ করিতে এবং আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ হইল সে আসিয়াছে। এখন ফিরিতে হইবে। বেলা তখন দশটার কম নহে।

১০

দিনকয়েক পরে। মৃন্ময় মঞ্জুষাকে কহিল, তুমি যে এমন ছেলেমানুষি করতে পার এ আমি কোনদিন ভাবতেও পারি নি। আমি অবাক হয়ে সেদিন তোমায় দেখছিলাম। তুমি কি পাগল মঞ্জু।

মঞ্জুষা প্রতিবাদ করিল, কহিল, এর মধ্যে আবার পাগলামি তুমি কোথায় দেখলে। বাবা আপাততঃ সঙ্গে যাবেন না। সরকারের সঙ্গে যেতে আমার ভাল লাগে না।

মৃন্ময় বাধা দিয়া কহিল, কিন্তু আমার তো আসবার কথা ছিল না মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, তুমি না এলে একথা আমারও বলতে হ'ত না। যখন এসেছ তখন আমাদের সঙ্গে যেতে তোমার আপত্তি কেন? তোমায় সত্যি বলছি মিনুদা কতকগুলো বাজে অজুহাত দেখিয়ে আমায় দিয়ে একটা কেলেঙ্কারী করিয়ো না।

মৃন্ময় শান্ত কণ্ঠে কহিল, এ তোমার অন্যায় কথা। তা ছাড়া এর মধ্যে কেলেঙ্কারীর কি থাকতে পারে আমি বুঝে পাই না মঞ্জু। একটু থামিয়া মৃন্ময় পুনরায় কহিল, সব কথা বাদ দিলেও আর সামান্ত ক'টা মাসের ব্যবধানে আমার পরীক্ষা এ কথা ভুললে ত চলবে না। যত গুরুতর অভিযোগই তোমার থাক তার সঙ্গে আমার যাওয়া-না-যাওয়ার কি সম্পর্ক।

মঞ্জুষা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, হয়ত তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু এ কথাও আমি বুঝি যে যে দু-বছরের অভ্যাস দু-সপ্তাহের অনভ্যাসে কতখানি ক্ষতি-গ্রস্ত হ'তে পারে।

মৃন্ময় কহিল, তুমি শুধু দু-সপ্তাহের অনভ্যাসটার কথাই ভাবছ। মনের দিকটা দেখছ না।

মঞ্জুষা মৃন্ময়কে কেমন করিয়া বুঝাইবে তার মনের এক আশ্চর্য্য অনুভূতির কথা। তার জীবনে মৃন্ময়ের প্রয়োজন যত বড় হইয়া উঠিতেছে কোথা হইতে দুইখানা অদৃশ্য বাহু যেন তাকে সবলে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতে চায়।

মঞ্জুষা বিস্মিত হয়, চমকিত হয়। মৃন্ময়কে কাছে পাইয়া সে চঞ্চল হইয়া উঠে। তাহাকে সাধ্যমত নিজের কাছে ধরিয়া রাখিতে চায়। মনকে সে ধমক দেয়, বলে এ তার ভাববিলাস। কিন্তু মনের এই কাল্পনিক ভীতি তাহাতে দূর হয় না।

মঞ্জুষার চিন্তিত মুখের প্রতি ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া মৃন্ময় পুনরায় কহিল, চুপ করে আছ যে।

মঞ্জুষা রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, মনের দিকটা যে চোখে দেখা যায় না মিনুদা, না হলে এ অনুযোগ তুমিও আমায় দিতে না; দুঃখ পেতে। কিন্তু এসব আলোচনা এখন থাক, আমি বড় ক্লান্ত। মঞ্জুষা ম্লানমুখে প্রস্থানোদ্যত হইতেই মৃন্ময় তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, আর একটু বসবে না—

মঞ্জুষা উত্তর দিতে গিয়া থামিল। পিওন আসিয়াছে। চিঠি আছে। মৃন্ময়ের চিঠি—লিখিয়াছে নান্টু। শিরোনামার হস্তাক্ষর দেখিয়াই মৃন্ময় আন্দাজ করিয়াছে। মঞ্জুষা মৃন্ময়ের পাশে ঘন হইয়া বসিল।

নান্টুর চিঠি:—

তোমাদের নান্টুর পুনর্জন্ম হয়েছে। আজ যে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছে সে তোমার পূর্ব্বপরিচিত নান্টু নয়। এক নূতন মানুষ নূতন চেতনা নিয়ে তোমাদের স্মরণ করছে। তাকে বিশ্বাস ক'রো ভাই। পাহাড়ের সেই কাহিনীটি বোধ হয় আজও ভুলে যাও নি। মানুষের দুষ্কৃতির ছাপ এত সহজে মন থেকে মুছে যেতে পারে না। কথাটা আমি জানি। তাই বলছিলাম যে তোমাদের সে নান্টুর মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু এই নবজন্মে যে জীবন আমার আয়ত্তে এসেছে তা অমূল্য। সেই কথাই বলব।

গানে আমার দখল ছিল এ কথা তুমি জান। নদীর তীরে বসে কত দিন যে আমরা গলা মিলিয়ে গান করেছি মঞ্জুকে শ্রোতা করে সে কথা কি ভুলেছি মনে কর। যদিও অতীত আমার কাছে মৃত, কিন্তু আমি যেন জাতিস্মর হয়ে পুনর্জন্ম লাভ করেছি।

পাহাড় থেকে পালিয়ে গেলাম কলকাতায়। সহায়হীন, সম্পদহীন আমি। কে আমায় জানে, কে আমায় চেনে। আমার বিদ্যার দৌড় তোমার অজানা নয়। পাহাড়ের অবাঙালীর মধ্যে নিজেকে কোন রকমে চালিয়ে দিতে পারলেও আমার জাতভাইদের কাছে আমার কোন মূল্যই নেই। দৈনিক তিন চার ঘণ্টা পরিশ্রমের পরিবর্তে কেউ দশটি টাকা দিতে প্রস্তুত নয়। আমার যথার্থ মূল্য এরা চোখের পলকে বুঝে নিয়েছে—এখানে ফাঁকি চলবে না।

আবার বেরিয়ে পড়লাম। যদি না খেতে পেয়ে রাস্তায় শুকিয়ে মরতে হয় তবে অপরিচিত স্থানে গিয়ে মরাই ভাল। তবু নিজেকে শেষ পর্য্যন্ত লাঞ্ছনা দিতে পারব। কেউ আঙুল

দেখিয়ে বলবে যা, হতভাগাটা না খেতে পেয়ে রাস্তায় পড়ে মরেছে।

রেল-কোম্পানীকে কোন রকমে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্ণৌ গিয়ে পৌঁছলাম। বেঁচে থাকবার মত একটা আশ্রয় পেলাম ব্যারিষ্টার মিঃ সেনের বাড়ীতে। আমার ভিক্ষুকের বেশ সেই দিনই ত্যাগ করতে হ'ল। আপত্তি করি নি, এর প্রয়োজন হয়তো আমার শেষ হয়েছে। কিন্তু নষ্ট করি নি, আজও সুটকেশে তা সযত্নে রেখে দিয়েছি।

অল্প কিছুদিনেই খানিকটা সুবিধা করে নিয়েছি। মিঃ সেন কেন জানি না খুব খুশী হতে পারেন নি। যদিও পিঠ চাপড়ে বলেছেন, নিজের পায়ে দাঁড়াবার এই চেষ্টাকে আমি সাধুবাদ দিচ্ছি কিন্তু বিপদ-আপদ মানুষমাত্রেরই আছে। প্রয়োজনের দিনে স্মরণ করো। ভদ্রলোক সত্যাই সজ্জন।

এখানকার সঙ্গীত-কলেজে ভর্ত্তি হলাম। জীবনে কোন কিছুই করি নি। নিজেকে নিয়ে ডুবে থাকবার মত একটা অবলম্বন ত আমার চাই।

এখানে অল্পেই বেশ একটু নাম হয়েছে। বন্ধু-বান্ধব এবং ভক্তের সংখ্যাও নিতান্ত মন্দ নয়। ছোট-খাট পার্টি থেকেও প্রায়ই ডাক আসছে। এক কথায় বেশ আছি। অকস্মাৎ মনে পড়ল তোমাকে। দুঃখের দিনে আত্মগ্লানিতে যখন আমি একেবারে বোবা হয়ে বেঁচে ছিলাম সে দিনেও তোমাদের জন্য মন আমার কেঁদে উঠত। আজও তার এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটে নি।

আজ কিছুদিন ধরেই অতীতের দিনগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। কি ছিলাম—কোথায় এসেছি, অদৃষ্ট আবার কোন্ পথে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এ আমার উচ্ছ্বাস নয় অথবা জীবন-দর্শন নিয়ে বক্তৃতাও দিচ্ছি না। বর্ত্তমানের সঙ্গে অতীতের তুলনা করতে গিয়েই একথাটি আমার বারবার মনে পড়ছে। মানুষের চাওয়ার যেমন শেষ নেই, সুযোগেরও তেমনি অন্ত নেই। শুধু চিনে নেবার অপেক্ষা—আঁকড়ে ধরবার ইচ্ছাশক্তি।

এখানে এক বিদেশী ভাই এবং বোনকে পেয়েছি। তাদের বাঙালী বললেও ভুল বলা হয় না যদিও তারা তা নয়। আমাদের সম্পর্কটা কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করেও না। কিন্তু আমার আর তাতে ভয় নাই। নিজের সম্বন্ধে আজকাল আমি অত্যন্ত সচেতন। মন আর মুখের মধ্যে একটা সম্মান-জনক ব্যবধান রেখে কথা বলি, তাতে আর যাই হোক কোন গোলযোগের সৃষ্টি হয় না। আমার উপর ওদের অগাধ বিশ্বাস, নির্ভরতার অন্ত নেই। লোকমুখে শোনা যায় দাদা নাকি তার বোনটির ভার আমার উপর দিয়ে কয়েক মাসের জন্য আমেরিকায় পাড়ি দেবেন। এটা গুজব, কিন্তু এই গুজব যদি সত্যি হয় তবে আমাকে আরও সংযত হতে হবে। মানুষের বিশ্বাসের মূল্য আজকাল কতকটা দিতে শিখেছি। তা ছাড়া তোমাকে বলতে আমার লজ্জা নেই—লোভও দেখি যে। একটা কথা কি জান? রক্তের যেখানে সম্বন্ধ নেই সেখানে ভাই বোন সম্বন্ধটা মধুর হলেও নিরাপদ নয়। সেখানে ভয় আছে এবং বিচিত্র সম্ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এসব আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক কারণ তার দাদা সত্যিসত্যিই এখুনি যাচ্ছেন না। ওদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানাবার আছে। বারান্তরে লিখব। শুধু মেয়েটির নামটা তোমায় জানিয়ে রাখছি। ওকে লীলা রাও বলেই মনে রেখো। বড় ভাল মেয়ে। ভাল কথা—আমাদের মঞ্জুর খবর কি? এত দিনে বোধ হয় অনেকটা বড় হয়েছে। ওকে আমার স্নেহ দিও। এখানে নানা জনের ভিড়ের মাঝেও ওকে সব সময় মনে পড়ে। কত বাজে চিন্তা এসে মনকে নাড়া দেয়। অসম্ভব কল্পনা...তাই নিজেকে শাসন করি। চিঠির উত্তর পেলে খুশী হব।

নাড়ু

মঞ্জুষা কহিল, নাড়ুদা কিন্তু বিনিয়ে বিনিয়ে বেশ লিখতে পারে। কবি-মানুষ!

মৃন্ময় কহিল, নাড়ু বেশ আছে। এক কথায় যাকে বলে ভ্রাম্যমাণ জীবন। আজ এখানে, কাল ওখানে। গতি ওর কোথাও রুদ্ধ হয় না। ওকে আমি একতিল বিশ্বাস করি না। কালই হয়তো আর এক চিঠিতে লিখবে, চলিলাম বন্ধু লক্ষ্ণৌ ছেড়ে পেশোয়ার। এমনি ছন্নছাড়া ওর স্বভাব। ওর জীবনের এইটেই হ'ল স্বাভাবিক পরিণতি।

মঞ্জুষা কহিল, তুমি যতই বল, নাড়ুদা এবারে বদলেছে।

মৃন্ময় একটু হাসিয়া কহিল, এটা ওর পরিবর্ত্তন নয়—এর নাম সাময়িক অবসাদ।

মঞ্জুষা কহিল, মিনুদা ভুলে যাচ্ছ যে নাড়ুদাও মানুষ। তারও মন বলে একটা পদার্থ আছে।

মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখে উত্তর দিল, এরা আর এক জাতের মানুষ। এদের মনের সুর অন্য পরদায় বাঁধা। দৃষ্টিভঙ্গী ওদের আলাদা।

মঞ্জুষা অকস্মাৎ নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে মৃন্ময়কে প্রশ্ন করিল, এই যদি নাড়ুদার সত্যিকার জীবনের ধারা হয় তো তার দাম কি বেশ থাকা? এর মধ্যে আনন্দ বা পরিতৃপ্তি কোথায়? অথচ একেই তুমি ভালো বলে একতরফা রায় দিয়েছ।

মৃন্ময় বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মঞ্জু? এ যে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

মঞ্জুষা কহিল, তুমি চাপা দেবার চেষ্টা করো না মিনুদা।

মৃন্ময় তেমনি বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, এর মধ্যে চাপা দেবার কি থাকতে পারে আমি ত ভেবেই পাই না। একটু থামিয়া সে পুনরায় কহিল, সব কথার মধ্যে নিজেদের টেনে আন কেন, এতে সহজ কথাটাও যে আর সোজা ভাষায় বলা চলে না, অথচ মন নিরর্থক সঙ্কুচিত হয়ে উঠে।

মৃন্ময়ের কথা থামিয়া লইয়া মঞ্জুষা কহিল, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমার কথা তোমায় ঠিক বোঝাতে পারব না। একটা অদ্ভুত অনুভূতি যেন আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যায়। আমার চোখের সামনে একটা বিশৃঙ্খল ভবিষ্যৎ জীবনকে দেখতে পাই। আমার সাধারণ বুদ্ধিও কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

মৃন্ময় হাসিয়া উঠিল।

মঞ্জুষা পুনরায় কহিল, হেসে উড়িয়ে দিতে চাও—দাও, কিন্তু দোহাই মিনুদা এর মধ্যে তোমার যুক্তি-তর্ক টেনে এনো না। আমি মেনে নিচ্ছি তোমার যুক্তির কাছে দাঁড়াবার মত কোন পুঁজি আমার নেই।

মৃন্ময় তাহার হাসি থামাইয়া কহিল, না মঞ্জু, হাসি বা যুক্তি দিয়ে তোমাকে আমি বিব্রত করতে চাই না, কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝি না, হঠাৎ এই ধরণের চিন্তা তোমার মাথায় স্থান পেল কেন? আমার যতদূর বিশ্বাস আমার তরফ থেকে এমন কোন ব্যবহার তুমি পাও নি...

মৃন্ময়কে তার কথার মাঝখানে থামাইয়া দিয়া মঞ্জুষা কহিল, কোন কারণ নেই বলেই ত যুক্তিতর্কের প্রশ্ন তুলেছি। কিন্তু...জ্যাঠাইমা আসছেন, চুপ্।...

মৃন্ময়ের মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কহিলেন, মঞ্জু কতক্ষণ এসেছ মা? এইমাত্র তোমাদের ওখান থেকেই আসছি। তোমার মা ডেকে পাঠালেন, কিন্তু আমি এক সমস্যায় পড়েছি মিনু। অথচ না বলতেও পারলাম না। অনেক করে বললেন।

মঞ্জুষা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। মৃন্ময় মায়ের মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মা আপন মনে বলিয়া চলিলেন, তা ছাড়া ভেবে দেখলাম যে, তোর শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। এক কাজে দু'কাজই হয়ে যাক্।

মৃন্ময় বাধা দিয়া কহিল, কি বাজে বকছ মা। আমার শরীর আবার তুমি খারাপ দেখলে কোথায়? আর এক কাজে দু'কাজ কাকে বলছ তুমি?

মা ধমক দিয়া কহিলেন, কথার উপর কথা বলিস নে মিনু। আমার এক জোড়া চোখ আছে। বলুক না মঞ্জু, আমি মিথ্যে বলেছি কি সত্যি বলেছি!

মৃন্ময় কহিল, তুমি বলতে চাও কি মা?

মা বলিলেন, এটা তোর পরীক্ষার বছর তাও আমি ভেবে দেখেছি। কিন্তু সঙ্গে খানকয়েক বই নিয়ে গেলেই ত চুকে যায়। মঞ্জুদের সঙ্গে তোকে কক্স্ বাজার যেতে হবে—সেই কথাই হচ্ছিল ওর মার সঙ্গে।

মৃন্ময়ের ইচ্ছা হইতেছিল চীৎকার করিয়া বলে, ছাই চুকিয়া যায়। মা যদি কিছু বোঝেন। কিন্তু সে নীরব রহিল।

মা পুনশ্চ কহিলেন, মঞ্জু ওরা লক্ষ্মীপুজোর পরেই যাবে। ওর মার ইচ্ছে তুই সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসিস।

মৃন্ময় কহিল, আর তুমিও অমনি চট করে কথা দিয়ে এলে, কিন্তু আমি ভাবছি তোমার কথা থাকে কিনা। আমাকেও এক সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা ফিরতে হবে মা।

মা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, আমরা ত আর লেখাপড়া-জানা-মা নই যে হিসেব করে কথা দেব। তিনি চলিয়া গেলেন।

মঞ্জুষা এতক্ষণ একটি কথাও কহে নাই, কিন্তু মৃন্ময়ের মা প্রস্থান করিতেই সে কহিল, কথাটা একটু পরে বললেও পারতে মিনুদা। উনি কি ভাবলেন বলতো?

মৃন্ময় কহিল, যা আমাকে বলতেই হবে তা এখন বলা আর দু'মিনিট পরে বলা একই কথা। কিন্তু তুমি কি বলছিলে ত?...যে কথা বলিতে গিয়া মঞ্জুষাকে মাঝপথে থামিতে হইয়াছে মৃন্ময় সেই সম্বন্ধে একটা খোলাখুলি আলোচনা করিতে চায়।

মঞ্জুষা কহিল, আমার যা বলবার সে ত বলা হয়ে গেছে মিনুদা।

মৃন্ময় কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, অবশ্য তোমার আপত্তি থাকলে আমার বলবার কিছু নেই। জোর করতেও চাই না।

মঞ্জুষা মৃদু কণ্ঠে কহিল, তোমার সম্বন্ধে আমার বড় ভয় হয় মিনুদা। মঞ্জুষার কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভারী ঠেকিল। মুহূর্তের জন্য থামিয়া পুনরায় কহিল, আমি তোমায় কেমন করে বোঝাই বল তো যা নিজেই আমি ভাল করে বুঝে উঠতে পারি না।

মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে কহিল, অথচ এই নিয়েই তোমার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। আমার সত্যিকার মনের কথা তুমি কি জান না মঞ্জু?

মঞ্জুষা কহিল, সেই একই কথায় আমরা আবার ফিরে এসেছি মিনুদা। আমি সব বুঝি। যা বুঝি না তা নিতান্তই ব্যক্তিগত।

মৃন্ময় কহিল, তা হলে কি এই কথাই আমি বুঝব যে, আমার তোমাদের সঙ্গে না যেতে চাওয়া নিয়েই তোমার মনে খটকা বেধেছে?

মঞ্জুষা নীরব রহিল।

মৃন্ময় পুনরায় কহিল, চুপ করে থেকো না মঞ্জু।

মঞ্জুষা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, এক কথা বার বার বলে কোন লাভ নেই। কিন্তু আর নয় এবারে আমি যাই।

মৃন্ময় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, তুমি রাগ করেছ, এ সব রাগের কথা মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, রাগ! না রাগ করতে যাব কেন। সে আর দাঁড়াইল না। চোখের পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল। মৃন্ময় ডাকিল, আমার কথা আছে—দাঁড়াও মঞ্জু—কথাটা মঞ্জুষা শুনিয়াও শুনিল না।

ক্রমশঃ

উত্তর-ব্রহ্মের কথা

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্মদেশে আসিয়াছি। কর্ম্মোপলক্ষে স্বাধীন ব্রহ্মের শেষ রাজধানী মান্দালয়ে আছি। ব্রহ্মরাজ মিণ্ডন (১৮৫৩-৭৮) ১৮৫৭ সালে মান্দালয় নগর স্থাপন করিয়া অমরপুর (স্থানীয় ভাষায় অমরাপুরা) হইতে এই স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মান্দালয়ের প্রাচীন নাম রত্নবন। মিণ্ডনের পুত্র থিব (১৮৭৮-৮৫) ব্রহ্মের শেষ স্বাধীন নরপতি। ১৮৮৫ সালে তিনি ইংরেজ-সরকার কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া বন্দী অবস্থায় বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত রত্নগিরিতে প্রেরিত হন। ১৯১৬ সালে এখানেই তাঁহার দেহাবসান হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মহিষী সুপিয়ালা দেশে ফিরিয়া আসেন। কয়েক বৎসর পর তিনি পরলোকগমন করেন। রাজা থিবর এক কন্যা এখন ভারতবর্ষে তাঁহারই এক ভূতপূর্ব্ব পাচকের গৃহিণী। ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।
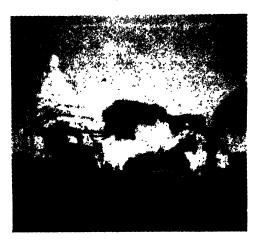
অমরপুরের একটি প্রাচীন প্যাগোডা

ব্রহ্মদেশে, বিশেষ করিয়া উত্তর-ব্রহ্মে, ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত বহু দর্শনীয় স্থান আছে। কিন্তু আজকাল উক্ত অঞ্চলে ভ্রমণ মোটেই নিরাপদ নহে। দেশে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব চলিতেছে। লোকে বলে ইহা সাম্যবাদী বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে বহু স্থানে যাতায়াত-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং চোর ডাকাতের উপদ্রব বাড়িয়া গিয়াছে। সরকারী শাসনযন্ত্রের কার্য্যকারিতাও যেন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মদেশে বরাবরই প্রায় গোটা অক্টোবর মাস কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। কোজাগরী পূর্ণিমায় বৌদ্ধ-শ্রমণদিগের চাতুর্ম্মাস্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। সেই দিন ব্রহ্মদেশের দেওয়ালী উৎসব। ৩০শে সেপ্টেম্বর তিন সপ্তাহের জন্য কলেজ ছুটি হইল। যে কয়জন বাঙালী অধ্যাপক একসঙ্গে ছাত্রাবাসে আছি, তাহার মধ্যে একজন ছুটি হইবার দিনই

সণ্ডার্স উইভিং ইন্‌ষ্টিটিউট, অমরপুর

কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। আর একজন রেঙ্গুনে যাওয়ার কথা বলিতেছেন। আমার পক্ষে কলিকাতা যাওয়া সম্ভব নহে। হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, যাওয়ার মজুরী পোষায় না। হাতে কোন কাজ নাই। একেবারে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকাও যায় না।

সময় কাটাইবার একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। ছাত্র কো থান সিন রাজা মিণ্ডন মিনের পরিত্যক্ত রাজধানী অমরপুর এবং ইরাবতীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত সাগাইং লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিল। বলা বাহুল্য, সানন্দে সম্মত হইলাম।

৩রা অক্টোবর প্রাতরাশের পর আমরা মোটরে যাত্রা করিলাম। কো থান সিনের নিজের গাড়ী এবং সে নিজেই চালক। যাত্রী চার জন—বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক উ মং মং জি, ছাত্র থান সিন ও কো মিয়া সিন এবং লেখক।

পথে প্রথমেই পড়িল অমরপুর। মান্দালয় হইতে ইহার দূরত্ব ৭।৮ মাইল। স্থানীয় ভাষায় ইহাকে টাউংমিয়ো অর্থাৎ দক্ষিণ নগর এবং মান্দালয়কে মিয়োওমিয়ো অর্থাৎ উত্তর বলে। পিচ-ঢালা প্রশস্ত রাজপথে মোটর চলিতে লাগিল। শহর ছাড়াইতেই রাস্তার দুই ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সবুজের প্রাচুর্য্য চক্ষু জুড়াইয়া দিল। যত দূর দৃষ্টি চলে কেবল ধান-ক্ষেত। মধ্যে মধ্যে গ্রাম। ক্বিঞ চাউং অর্থাৎ সঙ্ঘারাম ব্রহ্মদেশের প্রায়ের

একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। ছোট, বড়, মাঝারি প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ একটি চাউং অবশ্যই থাকিবে। মধ্যে মধ্যে প্যাগোডা বা বৌদ্ধমন্দির। ক্রমে অমরপুরে আসিয়া পড়িলাম।

আভা ব্রিজ

ব্রহ্মরাজ আলুম্পায়ার (১৭৫২-৬০) পুত্র বোডপায়ার (১৭৮২-১৮১৯) সিংহাসনারোহণের এক বৎসর পর তদানীন্তন রাজধানী আভা হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী অমরপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। বোডপায়ার জ্যোতিষীগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে আভার সৌভাগ্যের দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পুত্র বাজিড (১৮১৯-৩৭) পুনরায় আভাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৮৩৭ সালে বাজিডর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা থারাওয়াডি মিন (১৮৩৭-৪৬) রাজা হইয়া পুনরায় অমরপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। সেই হইতে ১৮৫৭ সালে রাজা মিণ্ডনের সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত অমরপুর ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল।

বর্ত্তমান অমরপুর মান্দালয় জেলার একটি চৌকি। প্রাচীন গৌরবের কোন নিদর্শনই এখানে বিদ্যমান নাই। রাজপ্রাসাদের বা দুর্গের চিহ্নমাত্রও নাই। প্রাচীন রাজপ্রাসাদসমূহ কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল বলিয়া ব্রহ্মদেশের কোথাও কোন রাজপ্রাসাদের অস্তিত্ব নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্য্যন্ত একমাত্র মান্দালয় রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন-বিমানবহরের প্রচণ্ড আক্রমণে আজ তাহার ভিত্তিমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনেকগুলি প্রাচীন ছোট-বড় প্যাগোডা দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এক দিন অসংখ্য উপাসক-উপাসিকার সমাগমে এইগুলি কোলাহলমুখরিত থাকিত। কালচক্রের আবর্ত্তনে সেদিন শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ এইগুলির অধিকাংশই পরিত্যক্ত, জনহীন, শৃগাল, কুকুর, সর্প ইত্যাদির আবাস-স্থল। অমরপুরের সরকারী বয়ন-বিদ্যালয় বিখ্যাত। সরকারী কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত এই বিদ্যালয়ে রেশম এবং সূতার কাপড় বুনিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। অধ্যক্ষ উ কো কো জি-র সহিত আলাপ হইল। বেশ অমায়িক, মিষ্টভাষী, তরুণ যুবক। জাপান হইতে বয়নবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হইয়া আসিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাকাল দুই বৎসর। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শ্রেণীতে ত্রিশ জন করিয়া মোট ষাট জন ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইহারা প্রত্যেকেই মাসিক ৩০৲ টাকা করিয়া সরকারী বৃত্তি ভোগ করে। ব্রহ্মদেশে রেশমের চাষ হয় না। ইংরেজ আমলে মান্দালয়ের মহকুমা মেমিওতে পরীক্ষামূলক রেশমের চাষ আরম্ভ করিয়া সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহাদির দরুন আজ পর্য্যন্ত ব্যাপকভাবে রেশমের চাষ করা সম্ভব হয় নাই। চীন হইতে ভামোর পথে রেশমের সূতা আনিয়া তাহা দ্বারা লুঙ্গি (স্থানীয় ভাষায় লুঞ্জি) ইত্যাদি তাঁতে বোনা হয়। সাধারণ সূতার জন্যও ব্রহ্মদেশ পরমুখাপেক্ষী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্য্যন্ত জাপান এবং ভারতবর্ষই প্রধানতঃ তাহার সূতার চাহিদা মিটাইত।

অমরপুরে বাজার, হোটেল, দোকানপাট, চায়ের দোকান ইত্যাদি সমস্তই আছে। এমন কি দুইটি ছবিঘরও আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্রহ্মদেশের অন্যতম প্রাচীন রাজধানী আভা এখান হইতে মাত্র ৬ মাইল। বর্ত্তমানে উহা একটি গণ্ডগ্রাম। বর্ষাকাল বলিয়া রাস্তা খুব খারাপ। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও এ যাত্রা আভা যাওয়া হইল না।

অমরপুরের নিকটেই ব্রহ্মদেশের অন্যতম প্রধান নদী ইরাবতী। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চিন্দুইন এবং সিতাং ব্রহ্মদেশের অপর দুইটি প্রধান নদী। অমরপুরের নিকট ইরাবতীর উপর বিখ্যাত রেলওয়ে-সেতু—আভা ব্রিজ। এইখানে ইরাবতীর বিস্তার এক মাইল বা তাহার কিছু বেশী হইবে। সেতুর উপর একদিকে পায়ে চলার এবং অপর দিকে যানবাহনাদি চলাচলের পথ। মধ্যস্থলে রেল-রাস্তা। ১৯৩৪ সালে ব্রহ্মদেশের প্রদেশপাল সার হিউ ল্যান্সডাউন ষ্টিফেন্স আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সেতুর উদ্বোধনকার্য্য সম্পন্ন করেন। বর্ত্তমানে এই সেতু অব্যবহার্য্য। ১৯৪২ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে পলায়নকালে ইংরেজগণ এই সেতুর কিয়দংশ ডিনামাইটের সাহায্যে উড়াইয়া দিয়াছিল। এখনও মেরামত হয় নাই। স্থানীয় লোকেরা জ্বালানি রূপে ব্যবহার করিবার জন্য জায়গায় জায়গায় রেল-লাইন হইতে কাঠের স্লিপারগুলি কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। এখানে-সেখানে কর্ত্তিত স্লিপারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে।

সেতুমুখ হইতে একটু দূরে পূর্ব্বদিকে একটি প্রাচীন ইমারতের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইহা একটি দুর্গের

ভগ্নাবশেষ। ব্রহ্মদেশীয়গণ ইহাকে থাপিয়ে তাব বলে। রাজা মিণ্ডনের রাজত্বকালে ফরাসীগণ রাজ-দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। জলপথে আক্রমণকারী শত্রুর উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্ত তাহারাই এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই সময় মান্দালয় দরবারে ফরাসীগণের প্রভাব এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, অনেকেই মনে করেন, ১৮৮৬ সালে ইংরেজগণ ব্রহ্মদেশ অধিকার না করিলে অবিলম্বে ইহা ফরাসী-কবলিত হইয়া পড়িত। ১৮৮৫ সালে ব্রহ্মরাজের সহিত ফরাসীদের একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে ফরাসীরা টাঙ্গু হইতে মান্দালয় পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণের অধিকার লাভ করিল। কথা রহিল যে, ১৫ বৎসরে পর ইহা ব্রহ্মরাজের সম্পত্তি হইবে। ফরাসী এবং ব্রহ্মদেশীয় মূলধনে পরিচালিত একটি ব্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। এই ব্যাঙ্ক রাজা থিবকে শতকরা ১২৲ টাকা এবং অন্যান্যদের শতকরা ১৮৲ সুদে টাকা ধার দিবে। পরিকল্পিত ব্যাঙ্ককে ব্রহ্মদেশে মুদ্রা তৈরি করিবার একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইল। এই সময় ফরাসীগণ ইরাবতী নদীতে ষ্টীমার লাইন খুলিবার সঙ্কল্পও করিয়াছিল। সুতরাং নিজ স্বার্থের খাতিরে ইংরেজ কর্ত্তৃক উত্তর-ব্রহ্ম জয় রাজনীতির দিক হইতে সমর্থনযোগ্য হইলেও বিশুদ্ধ নীতির দিক হইতে ইহাকে কোনক্রমেই সমর্থন করা চলে না।

আভা ব্রিজের নিকট প্রাচীন ফরাসী দুর্গের ভগ্নাবশেষ

আভা ব্রিজ পার হইলেই ইরাবতীর পশ্চিম কূলে সাগাইং। ইহার প্রাচীন নাম জয়পুর (ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় জয়পুরা)। ইহা উত্তর-ব্রহ্মের সাগাইং বিভাগের প্রধান শহর। বিগত যুদ্ধের সময় এই শহর বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। শহরের সর্ব্বত্র বিমান আক্রমণের সুস্পষ্ট চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। ১৩১৫ সালে আথিন থায়া নামক শান সামন্ত পানিয়া শান-রাজের অধীনতা অস্বীকার করিয়া সাগাইঙে রাজধানী স্থাপন করেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ৪৯ বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার পৌত্র থাডোমিন পায়া পরবর্ত্তী কালে, ১৩৬৪ সালে ব্রহ্মদেশের রাজধানী আভা নগর স্থাপন করেন। ১৫৩৪ সাল পর্য্যন্ত সাগাইং স্বাধীন শান-রাজগণের রাজধানী ছিল। ১৭৬০ সালে ব্রহ্মের শেষ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আলুন্‌পায়ার পুত্র নংদজির (১৭৬০-৬৩) রাজত্বকালে সোয়েবো হইতে পুনরায় সাগাইঙে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর সাগাইং পরিত্যক্ত হয়।

আভা ব্রিজের উপর ভ্রমণসঙ্গীদ্বয় সহ লেখক

আমরা আভা ব্রিজে মোটর রাখিয়া শাম্পানে ইরাবতী পার হইলাম। নৌকার মাঝিমাল্লা সবাই চট্টগ্রামের মুসলমান। যাত্রী, মাল এবং গাড়ী পারাপার করিবার জন্ত লঞ্চের ব্যবস্থাও আছে। ভাড়া যাত্রী প্রতি ০ এবং প্রতি মোটরের জন্ত ৫৲।

সাগাইঙে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র কো বা সি-র বাড়ী গেলাম। এইখানে প্রথম ব্রহ্মদেশীয় আতিথেয়তার পরিচয় পাইলাম। কো বা সি-র পিতা জীবিত নাই। আমরা কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্র এই কথা বলিবামাত্র কো বা সি-র মাতা সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া আমাদিগকে বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। আসন গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃন্ময় পাত্রে শীতল জল আনিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর একে একে পান চুরুট এবং পাখা আসিল। কোন প্রকার আতিশয্য নাই। সকলেরই সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব। আপ্যায়নের আতিশয্যে অতিথিকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয় না।

কো বা সি-র মাতা তাঁহার দুই কন্তার সহায়তায় একটি চুরুটের কারখানা পরিচালনা করেন। তাঁহার চারিটি ছেলের মধ্যে একটি পুলিস বিভাগে চাকুরি করে, আর একটি স্বর্ণ-কারের ব্যবসায় করে, আর দুইটি পড়ে। তাঁহার কারখানায় কাজ করিয়া প্রায় ৫০ জন শ্রমিক জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

সবাই নারী-শ্রমিক। ইহারা ১০০ চুরুট প্রস্তুত করিবার জন্য ।৶০ আনা করিয়া মজুরি পায়। একজন শ্রমিক দৈনিক ৩০০। ৪০০ চুরুট প্রস্তুত করিতে পারে। ইহারা প্রাতরাশের পর কাজে আসে এবং একেবারে দিনের শেষে গৃহে ফিরে। মধ্যে কাজের ফাঁকে একবার কিছু খাইয়া লয়।

বসিবার ঘরে আমরা কথাবার্তা বলিতেছিলাম। কো বা সি-র মাতা আমি ব্রহ্মদেশীয় ভাষা জানি না শুনিয়া রহস্য করিয়া বলিলেন যে কয়েক দিন তাঁহার চুরুটের কারখানায় যাতায়াত করিলে আমি নিশ্চয়ই তাঁহাদের ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিব। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া এবং কফি, বিস্কুট, কলা, বাতাবিলেবু এবং নারিকেল ইত্যাদি বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা এখান হইতে বাহির

মাতা, ভগ্নী এবং ভ্রাতা সহ কো বা সি

হইয়া সাগাইঙের বিখ্যাত পঞ্চতল প্যাগোডা, ঙা-টা-জি (Nga-tut-gyi) দেখিতে চলিলাম। বিদায়কালে গৃহস্বামিনীর জ্যেষ্ঠা-কন্যা একটি ফুলের তোড়া উপহার দিল।

ঙা-টা-জি বা পঞ্চতল প্যাগোডা সাগাইং শহরের এক-প্রান্তে অবস্থিত। ইহার এই নামকরণ কেন হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। ব্রহ্মরাজ থালনের (১৬২৯-৪৮) পুত্র মিনে ন্যমিট কর্তৃক ১৬৪৮ সালে এই প্যাগোডা নির্মিত হইয়াছিল। জুতা খুলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, ইহাই নিয়ম। ভিতরে প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি। ব্রহ্মদেশে আসিয়া বুদ্ধদেব চেহারায় খাঁটি মঙ্গোলীয় বনিয়া গিয়াছেন। অল্পদিন হইল ব্রহ্মদেশে আসিয়াছি। খুব বেশী ভ্রমণ করিবার সুযোগ এখনও হয় নাই; যত বুদ্ধমূর্তি দেখিয়াছি তন্মধ্যে মান্দালয়ের নিকটস্থ মহামুনি প্যাগোডাতে স্থাপিত, আরাকান হইতে আনীত বুদ্ধমূর্তি ব্যতীত সুন্দর মূর্তি একটিও চোখে পড়ে নাই। এই মূর্তিটি মহামুনি নামে পরিচিত। অপূর্বসুন্দর মূর্তি। দু'দণ্ড চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। আমরা যে দিন ঙা-টা-জি প্যাগোডায় গেলাম তাহার তিন-চার দিন পরেই একটি উৎসব আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। উৎসব উপলক্ষ্যে বুদ্ধমূর্তি সাজাইবার ব্যবস্থা

পঞ্চতল প্যাগোডা, সাগাইং

হইতেছিল। দোকানপাট ইত্যাদিও আসিতে আরম্ভ হইয়াছিল।

সাগাইং শহর হইতে আন্দাজ আড়াই মাইল দূরে সাগাইং পাহাড়। এখানে অনেক বৌদ্ধ মন্দির, সঙ্ঘারাম ইত্যাদি আছে। ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ সঙ্ঘারামের ব্যবস্থা আছে। শেষজীবন সাগাইং পাহাড়ে কাটাইবার আকাঙ্ক্ষা অনেক ধর্মপ্রাণ ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ নরনারীর প্রবল। ইহা যেন এখানকার বৌদ্ধদের বারাণসী-স্বরূপ। সময় অল্প বলিয়া সাগাইং পাহাড়ে যাওয়া হইল না।

আবার সাম্পানে করিয়া ইরাবতী পার হইলাম। খেয়া-ঘাটে একটি দশ-বার বৎসরের বালিকা দেখিয়া মনে হইল ভারতীয়। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে সত্যই সে ভারতীয়। পিতার নাম বলিল রহিমউল্লা। ভারতীয় মুসলমানগণ বিষয়কর্ম উপলক্ষ্যে ব্রহ্মদেশে আসিয়া অনেকেই বর্মী-স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করিয়া এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা বনিয়া গিয়াছে। আচার-ব্যবহারে এবং কথাবার্তায় ইহারা পুরাপুরি ব্রহ্মদেশীয়। কিন্তু ইহারা স্বধর্ম এবং গোঁড়ামি কোনটাই ত্যাগ করে নাই। দিনের পর দিন ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিছু দিনের মধ্যেই ব্রহ্মদেশে একটি স্বতন্ত্র ইসলাম রাষ্ট্র স্থাপনের আন্দোলন আরম্ভ হওয়া অসম্ভব নহে। ব্রহ্ম-সরকারের এখন হইতেই এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

মান্দালয়ে যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে। থান সিনুদের বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। তাহার পিতা উ-লা-ব মহাশয়ের সহিত আলাপ হইল। ইনি মান্দালয়ের একজন সম্পন্ন ব্যবসায়ী। ইঁহার

পিতামহ চীনের ইউনান প্রদেশ হইতে প্রথম ব্রহ্মদেশে আসেন।

খাবার টেবিলে গিয়া দেখি সমস্ত আহার্য্যই ভারতীয় প্রণালীতে প্রস্তুত। থান সিন্ বলিল যে, আমার জন্যই বিশেষ করিয়া এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডাল, ভাজা, মাছ, মাংস, সালাদ, সয়াবিন সিদ্ধ এবং পুডিংয়ের চাটনি ছিল। প্রায় আড়াই মাস পূর্ব্বে দেশ ছাড়িয়াছি। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন দিন এত তৃপ্তির সহিত আহার করি নাই। খাওয়া শেষ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিবার পর কিছু আতা এবং কলা আনিয়া দেওয়া হইল। বেন-বা-সিদের গৃহের মত এখানেও দেখিলাম যে, অতিথিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি রহিয়াছে। কিন্তু কোন প্রকার আতিশয্যের বালাই নাই। গৃহস্বামী এবং গৃহকর্ত্রীর সহিত সামান্য কিছু কথাবার্ত্তার পর আমরা মান্দালয় শহরের এক প্রান্তে মান্দালয়

দূর হইতে মান্দালয় পাহাড়ের দৃশ্য

পাহাড় দেখিতে বাহির হইলাম। এই পাহাড় প্রায় ১,০০০ ফুট উচ্চ। চূড়ায় উঠিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিকে চারিটি সোপান-পথ রহিয়াছে। পাহাড়ের গা কাটিয়া সিঁড়িগুলি তৈরি করা হইয়াছে। সিঁড়ির উপর আগাগোড়া টিনের চালা। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের গায়ে সমতল স্থান। কোথাও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, কোথাও তাঁহার পদচিহ্ন, কোথাও বা আবার ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাসের চিত্রাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে। আমরা সমতলবাসী। পাহাড়ে উঠা-নামা করিবার অভ্যাস নাই। কিছুদূর উঠিতেই পায়ে ব্যথা ধরিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়া উঠিতে লাগিলাম। অবশেষে চূড়ায় পৌঁছিলাম। চারিদিকে চাহিয়া চক্ষু জুড়াইয়া গেল। দূরে খরস্রোতা, বক্রগতি ইরাবতীকে এক খণ্ড স্থূল রৌপ্যসূত্রের মত দেখাইতেছে। চারিদিকে মাইলের পর মাইল জুড়িয়া চলিয়াছে হরিতের মেলা। কোথাও ছেদ নাই। মনে হয় যেন জুড়িয়ার বিরাট একখানা সবুজ গালিচা পাতা। মনে পড়িল

প্যাগোডাশোভিত মান্দালয় পাহাড়ের একাংশের দৃশ্য

বাঙালী কবির গান,—"এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে"। দেখিতেছি ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধেও এ কথা সমভাবেই প্রযোজ্য। মান্দালয় পাহাড়ের চূড়া হইতে ইরাবতীর পশ্চিমকূলে মিঙ্গুন প্যাগোডা দেখা যায়। এইখানে সর্ব্ববৃহৎ অক্ষত ঘণ্টা রক্ষিত আছে। ব্রহ্মরাজ বাজিত এই প্যাগোডা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহা অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে।

বিগত যুদ্ধের সময় মান্দালয় পাহাড়ে ইংরেজ ও গুর্খা এবং জাপ সৈন্যের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের পর গুর্খা সৈন্যদল এই পাহাড় অধিকার করে। বার্কশায়ার রেজিমেণ্ট ও গুর্খা সৈন্যদলের বীরত্ব-কাহিনী প্রস্তরফলকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। প্যাগোডা, সিঁড়ির চালা, মূর্ত্তি ইত্যাদিতে যুদ্ধের ধ্বংসলীলার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান।

মান্দালয় পাহাড় হইতে নিম্নের দৃশ্য

ভিক্ষু উ-খান্তির নাম ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। মান্দালয় পাহাড়ের প্যাগোডা ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার চেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছে। যাঁহারা যাঁহারা এই কার্য্যে অর্থসাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নাম পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে খোদিত

করিয়া রাখা হইয়াছে। ইঁহাদিগের মধ্যে বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকই আছেন।

পাহাড়ের পাদদেশে কুথোড প্যাগোডাতে ৭২৯খানি প্রস্তরফলকে সমগ্র ত্রিপিটক উৎকীর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা ব্রহ্মরাজ মিণ্ডনের কীর্ত্তি।

সমস্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। মান্দালয় পাহাড়ে ডাকাতের উপদ্রব আছে। আমরা পা চালাইয়া দিলাম। যখন মোটরে উঠিলাম তখন ধরিত্রীর আননের উপর তিমির-যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে। ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীন বাংলাদেশ

শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী

এ পর্য্যন্ত যা-কিছু প্রমাণ ও নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয়েছে তা থেকে আমরা এটুকু বুঝতে সমর্থ হয়েছি যে, অষ্ট্রিক জাতি এ দেশে নদীমাতৃক সভ্যতার প্রচলনকারী। সিন্ধু সভ্যতার মূলেও রয়েছে এই অষ্ট্রিক জাতির দান। অন্ততঃ প্রথম স্তরের সভ্যতা, যা নিঃসন্দেহে দ্রাবিড় উপনিবেশের পূর্ব্বযুগের ব্যাপার—তা যে কতকটা অষ্ট্রিক জাতীয় উপনিবেশস্থাপনকারীদের হাতে গড়া—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে যারা এই রকম প্রাগৈতিহাসিক তমসাচ্ছন্ন যুগে এসে বাসস্থাপন করেছিল এবং গ্রামীণ-সভ্যতার প্রচলন সুরু করেছিল তাদেরই কতকগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা উপজাতি[১] শতধাবিচ্ছিন্ন, নূতন পলিমাটির দেশ বাংলায় এসে তার প্রধান নদী[২] গঙ্গার তীরে সিন্ধু-সভ্যতার প্রথম স্তরের কিছুকাল পরে বসবাস করতে সুরু করে। তাই ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা "গঙ্গা" শব্দকে অষ্ট্রিক শব্দ বলেই ধরে নিয়েছেন। তাঁদের মতে এই শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে নদী। তবে পূর্ব্বরূপ গঙ্গা ছিল না; হয়ত "গ্যাঙ্" বা "গঙা" ছিল। আজও দক্ষিণ বাংলায় নদীপথে গাঙ্ শব্দ খুব বেশী প্রচলিত। যদিও "জাং" শব্দের অর্থই আলাদা, তবু শুনতে অনেকটা গাঙ্ (গাং)-এরই মত। জাং শব্দের পূর্ব্বতন রূপ হয়ত "জাঙ্" বা "জঙা" ছিল। এর থেকে সংস্কৃত "জঙ্ঘা"-শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে। আমাদের পুরাণ বলে, জহ্নুমুনির জঙ্ঘা দিয়ে গঙ্গা বেরিয়েছিল, তাই তার অন্যতম নাম "জাহ্নবী"। পুরাণের এই কাহিনী মনে হয় কোন অষ্ট্রিক উপাদানের উপর গড়ে উঠেছিল। অনুসন্ধান করলে এর মিল পাওয়া যায় আফ্রিকার নীল নদে বন্যার আবির্ভাব ও শ্বেতনীলের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাকালে যে সব উপকথার প্রচলন ছিল তার সঙ্গে। গাঙ্ ও জাং ছাড়া, ভূমিবাচক "মাল", বন্ধনবাচক "জাল", "নল, কল, ছিট, জঞ্জাল, ঝোপ, কটাল, ডিঙি, ডেঙা, ছিপ, ঠ্যাং, বাসি (বিশেষণ), ঝোপ, ঝাড়, কানি, কোয়ার, ভাঁটা, গণ, কুলি, ঘুঁটি, ডাক, ডাল (বিশেষ্য), সিম, বাঁশ, বাটাং, টোকা, চেলা, ভেঁড়, ডাঙা, ওং, আঠা" প্রভৃতি শব্দ অষ্ট্রিক।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন পর্ব্বে ভারতে বিভিন্ন অষ্ট্রিক উপজাতির সমাগম হয়েছিল। অন্যান্য ভারতীয় প্রদেশগুলির তুলনায় বাংলায় তাদের অধিকসংখ্যক উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। পরবর্ত্তী কালে হয়ত বাংলা থেকে তারা কিছু কিছু সরে ছোটনাগপুরে ও আসামে গিয়েছিল। এখানে কিন্তু তাদের প্রথম আগমন কবে ঘটেছিল তা ঠিক করে বলা শক্ত। শুধু তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি লক্ষ্য করে বলা যেতে পারে হর-আহর (সূর্য্য পুত্র) বা প্রথম মেনেসের[৩] রাজত্বকালের পরে। অন্যদিকে বাংলায় তাদের প্রভাব প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৮০০ অব্দ পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল বলেই বৈদিক সাহিত্য ও মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয়। এই একমাত্র অষ্ট্রিক প্রভাবাধীন যুগে বাংলাদেশ কয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে[৪], তাই এখানে এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

১। ১৩৫৪-মাঘের প্রবাসীতে প্রকাশিত "প্রাগৈতিহাসিক বাংলাদেশ" প্রবন্ধে উপজাতিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে।

২। ভারতের অন্যতম প্রধান নদী সিন্ধুর তীরবর্তী ভূখণ্ডে দ্রাবিড় ও অন্যান্য জাতির উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব্বেই অষ্ট্রিক উপজাতীয়দের সমাগম হয়েছিল। এমন কি মিশরের নীলনদের তীরেও প্রথমে যে সভ্যতার বিকাশ হয় তা অষ্ট্রিক উপজাতীয়দেরই।

৩। ইনি মিশরে রাজবংশের পত্তনকারী এবং প্রথম রাজা। ইনি নিজেকে সূর্য্যপুত্র বলে ঘোষণা করেন। এঁর আমল থেকে রাজাই দেবতা। এ ধরণের চিন্তার সূত্রপাত হয়। সমাজ ও মানুষের জীবনযাপন-পদ্ধতি সম্বন্ধে এঁর প্রচারিত বহু বিধান প্রাচীন মিশরীয়রা পালন করতে সুরু করেছিল। সংস্কৃত "মনু" শব্দ এই "মেনেস" শব্দ থেকেই উদ্ভূত, আবার "মন্বন্তর" নামে রাজশাসনান্তর একই কারণে উদ্ভূত। আমাদের "অষ্টাভিশ্চসুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতো নৃপঃ" এবং এই জাতীয় অন্যান্য উক্তি সেই মেনেসের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

৪। ১৩৫৪ মাঘ সংখ্যার প্রবাসীতে প্রকাশিত "প্রাগৈতিহাসিক বাংলাদেশ" প্রবন্ধে।

এর পর দ্রাবিড় প্রভাবের যুগ। তাই রাজ্যের নাম হিসাবে পাই "হরিকেল", "পট্টিকের" শব্দ। গ্রামের নাম হিসাবে পাই "আউহ গড্ডি, দিজমক্কাজোলি, অজ্‌ঝ চাটেৌবল, বান্নহিট্টা,[৫] কণামেট্টকা" ইত্যাদি শব্দ। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে তথাকথিত বয়-পঞ্চালের অনুমিত প্রকৃত-রূপ বেরম-জোলের জোল অংশ, জোড়াসাঁকোর পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ "জোড়া" বা জোল হওয়াই সম্ভব, "ময়না জোলি'র জোলি অংশ মূলতঃ দ্রাবিড় শব্দ। এ ছাড়া "জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ি-"র গুড়ি অংশ যা হয়ত আসলে নগরার্থক "কুড়্‌" শব্দ ছিল, নিঃসন্দেহে তা দ্রাবিড়ীয়।

অষ্ট্রিক প্রভাব বাংলাদেশে বরাবরই বেশী থাকায় দ্রাবিড় প্রভাব কোনদিন প্রবলতর আকার ধারণ করে নি বলেই মনে হয়। অন্য দিকে অষ্ট্রিক সভ্যতা দ্রাবিড়ীয় বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণগুলি অল্পকালের মধ্যেই এবং সহজেই আত্মস্থ করে ফেলেছিল— এমন কথা বলা যায়।

দ্রাবিড়-সভ্যতার দুই রূপ ছিল—গ্রামীণ ও নাগরিক। অষ্ট্রিক জাতি এদেশে অনেকটা তাদেরই অনুসরণে নাগরিক সভ্যতার পত্তন করেছিল। তাই জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়, ময়নাগুড়ির পাশাপাশি আমরা গৌড়, সমতট, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি অষ্ট্রিক নগরীর সন্ধান পাই। তবু অষ্ট্রিক সভ্যতার অনেক কিছু, যেমন—রাজা, রাজপ্রাসাদ, পূজা, শিল্প, সজ্জা প্রভৃতি ব্যাপার নিঃসন্দেহে দ্রাবিড়দের দান। বর্ত্তমানের হিন্দুধর্ম্মের রূপ তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর পূজার পূর্ব্বে যা ছিল, তা হচ্ছে অষ্ট্রিকদের লিঙ্গপূজা, প্রেতপূজা, বৃক্ষপূজা, প্রস্তরপূজা ইত্যাদি। আজও আমরা তাই মনসাপূজা করতে মনসা নামক কাঁটা গাছের ডাল ব্যবহার করি, ষষ্ঠীপূজা করতে বটের ডাল ব্যবহার করি, পিতৃলোককে আকাশ-প্রদীপ দিয়ে আলো দেখাই বা শিব বলতে পাথর পূজা করি। কিন্তু বসুধারা আঁকা, আল্‌পনা দেওয়া, ফুল দিয়ে পূজা করা—এগুলি হচ্ছে দ্রাবিড়দের দান—যা অষ্ট্রিক রীতি-নীতির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। শিব শব্দটি দ্রাবিড়ীয়। মূলতঃ উহা ছিল "শিবন্", আর "শম্ভু" শব্দটি ছিল "সেম্‌বো"। শিবন্ অর্থে রাঙা৬ রঙ্ হয়। তাই পরবর্ত্তীকালে আর্য্যভাষায় শিবন্ শব্দের সহিত "ধুর্" [লোহিত-সৌন্দর্য্য অর্থে] যুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে "শিবনধুর্" শব্দ। ঐ শিবন্‌ধুর থেকে এসেছে বর্ত্তমানের "সিন্দুর" শব্দ। গরুকে গুরু[৭] জ্ঞানে পূজা, নারায়ণের ও লক্ষ্মীর[৮] পূজা খুব সম্ভবতঃ দ্রাবিড়দের দান।

বাংলায় দ্রাবিড়দের আগমন হয়েছিল সম্ভবতঃ বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৬০০-১৫০০ অব্দ নাগাদ।

দ্রাবিড়দের আগমনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কাল হচ্ছে আর্য্যবিজয়ের ও আর্য্যপ্রভাবের যুগ। মহাভারতের বিবরণে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কাল নিরূপিত হয়ে থাকে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০০০-এর কাছাকাছি কোন সময়ে, অর্থাৎ লৌহযুগের দ্বিতীয় পর্ব্বে। মহাভারতের আদি, সভা, বন ও দ্রোণ পর্ব্বে আমরা পাই বাংলার অঞ্চলবিশেষের, বহু উপজাতির ও বহু উপভাষার উল্লেখ। সেই সঙ্গে এমন অনেক রাজার নাম পাই যা আর্য্যভাবাপন্ন বা সংস্কৃত হয়ে উঠেছে, যেমন—পৌণ্ড্র বাসুদেব, চন্দ্রসেন, সমুদ্রসেন, নরক প্রভৃতি। সমুদ্রবন অঞ্চলের রাজা ছিলেন সমুদ্রসেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক সুন্দর[৯] বন বা সোঁদর বন শব্দের সৃষ্টি হয়েছে এই সমুদ্রবন থেকে। যেমন— সমুদ্রবন>সঁউদরবন>সোঁদরবন, আবার, সমুদ্রবন>সমুন্দর-বন>সুমুন্দরবন>সুন্দরবন। আবার এই সব রাজা কোনও কোনও আর্য্য রাজচক্রবর্ত্তীর অধীনতা স্বীকার করত এবং কর প্রদানও করত। তারা ব্রাত্য স্তোমের দ্বারা শুদ্ধ হয়ে আর্য্যের সম্মান বা আর্য্যত্বলাভ করত। অনার্য্য রাজাদের এই রকম আর্য্য হয়ে ওঠার উদাহরণ অবশ্য বহু পরবর্ত্তী কালীন। এর কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় ১৩৫৩ সালের মাঘ সংখ্যা জয়শ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায়ের "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে জাতীয় সংস্কৃতির কথা" এবং হিন্দুস্থান পত্রিকার ১৩৫৩ পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত "অহম রাজ স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ" নামক প্রবন্ধ দুটিতে। আসাম, মণিপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের অনার্য্য রাজারা নিজেদের অনার্য্য নামের পাশাপাশি আর্য্য বা সংস্কৃত নাম গ্রহণ করে ক্রমশঃ হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছিলেন তারই নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাই আমরা উক্ত দুটি প্রবন্ধে।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কিছুকাল আগে থেকে কি পরবর্ত্তী যুগের মধ্যেই তীরভুক্তি, সমুদ্রবন, সমতট, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি সংস্কৃত নাম কিয়ৎকাল কল্পিত হয়ে থাকতে পারে।

এর পরই হচ্ছে জৈন-প্রভাবের যুগ। আচারাঙ্গসুত্ত, কল্পসুত্ত, ভগবতীসুত্ত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে জৈনধর্ম্ম প্রচারকদের রাঢ়ে ও সুহ্মে[১০] আগমনের কথা জানতে পারা যায়। "নাথ" ও "নেঙ্‌টা" শব্দ বাঙালীর জীবনে জৈন-প্রভাবের চিহ্ন। সংস্কৃত "জ্ঞাতৃকপুত্র" শব্দ প্রাকৃতে "ঞ-ঞাতপুত্ত" রূপ পায়।

৫। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা" ও *Origin and Derelopment of the Benyali Language*, vol. 1 (2nd Edn. 1926) এ নামগুলি পাওয়া যায়।

৬। *Origin and Develoment of the Bengali Language*. vol. 1. [প্রথম দিক]।

৭। বঙ্গশ্রী—আশ্বিন ১৩৫৫ "ধ্বনি ধ্বংসে ধ্বনির জন্ম" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

৮। "রুক্মিণী" শব্দ থেকেই বর্ত্তমানের "লক্ষ্মী" শব্দ এসে থাকতে পারে। একথা অন্যত্র বলেছি।

৯। আসলে ঐতিহাসিক ৺নিখিলনাথ রায় মহাশয় সুন্দরবনকে সমুদ্রবনের সঙ্গে অভিন্ন বলে প্রস্তাব আনেন। তাঁর "মুর্শিদাবাদের ইতিহাস"-এর প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১০। "Jainism in Bengal"—Promode Lal Pal, *Indian Culture*—pp. 524-25—[Miscellaneous]

ঞ-ঞাতপুত্ত পরবর্ত্তীকালে "নাথপুত্ত" হয়ে দাঁড়ায়। শব্দটির শেষবর্ত্তী পুত্ত অংশ খসে গিয়ে বাকী থাকে "নাথ" অংশটুকু। পরে আবার এই নাথ শব্দ সংস্কৃতে ফিরে গিয়ে স্বামী অর্থে [বা প্রভু অর্থে] ব্যবহৃত হতে থাকে আর উপাধিবাচক আখ্যায় পরিণত হয়। জৈনদের একটি আখ্যা ছিল "নির্গ্রন্থ"। এর অর্থ হয় বন্ধনহীন। প্রাকৃতে এর রূপ দাঁড়ায় "নিগ্‌গণ্ঠ্‌।" অপভ্রংশ পর্ব্বে তার পরিণতি হয় "নিঅণ্ঠ'-তে। আবার বাংলায় তাই হয়ে দাঁড়ায় "নেঙ্‌ট"—"নেঙ্‌টা"। "বর্দ্ধমানপুর" ও "রাঢ়া পুরী" নামের সঙ্গেও জৈনস্মৃতি জড়িয়ে আছে। "বর্দ্ধমান" ছিল মহাবীরের অন্যতম নাম। আজও শুনতে পাওয়া যায়—বাংলার কোন কোন গ্রামের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে "নাথ" শব্দ। বাংলার যোগীসম্প্রদায়ের মধ্যে "নাথ" উপাধি বহুকাল ধরে চলে আসছে। নাথধর্ম্ম আমাদের অজ্ঞতার ফলে মূলতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম বলে প্রচারিত হয়ে আসছে। এর একমাত্র কারণ গোড়ার দিকে সমধিক প্রভাবসম্পন্ন ও প্রতিযোগী বৌদ্ধধর্ম্ম অনেক জায়গাতেই জৈনধর্ম্মের উপরে আপতিত হয়ে তাকে কোণঠাসা করে দিয়েছিল। প্রকৃত তথ্যসংগ্রহ ও অনুসন্ধানের ফলেই জানা যেতে পারে যে, যেসব জায়গায় জৈনধর্ম্ম আগে এসে আধিপত্য বিস্তার করেছিল সেই স্থানে পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এসে জৈন-প্রভাবকে বিনষ্ট ক'রে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিল। প্রচারের দিক থেকে প্রতিযোগিতার ভাব থাকায় বৌদ্ধধর্ম্মকে এক দিন হিন্দুধর্ম্মের কাছে এমন আঘাত পেতে হয়েছিল যে ভারত থেকে তাকে চির বিদায় গ্রহণ করতে হয়। বাংলায় জৈনধর্ম্মের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে মাটির তলা থেকে উদ্ধৃত বহু জৈন-মূর্ত্তিতে[11]। তার ওপর নির্ভর ক'রে আজ আমরা অনুমান করতে সাহস পাই যে, বাংলায় বৌদ্ধ-মাগধী সভ্যতার ধারা এসে প্রবেশ করবার আগেই রাঢ়[12], গৌড়, সুহ্ম প্রভৃতি অঞ্চলে জৈনধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও তার বাহন হিসাবে অর্দ্ধ-মাগধী ভাষা এসে পৌঁছেছিল। তাই বাংলা ভাষার প্রাচীন স্তরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে অর্দ্ধ-মাগধীর দান—"য়[13]-শ্রুতি", "ব-শ্রুতি"কে।

বাঙালীর জীবনে জৈন-প্রভাব খুব গুরুতর হয়ে না উঠলেও বা দীর্ঘকালস্থায়ী না হলেও তার মেয়াদ আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতক থেকে দ্বিতীয় শতক পর্য্যন্ত। আর তার পরে তার অস্তিত্ব চলে আসছে বৌদ্ধমিশ্রিত জৈনধর্ম্ম ও হিন্দু-বিমিশ্র বৌদ্ধধর্ম্ম বলে। দর্শনের দিক থেকে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে জৈনধর্ম্মের অমিল থাকলেও আচার-অনুষ্ঠানগত মিল ছিল বলেই বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষে জৈন-সত্তাকে গ্রাস করে ফেলা সহজ ও সম্ভব হয়েছিল। তা না হলে নাথ উপাধিধারী যোগী সম্প্রদায়কে হিন্দুভাবমিশ্রিত বৌদ্ধ বলে মনে করার কোন কারণ দেখি না।

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব জৈনধর্ম্মের অনুসরণের ফলেই ঘটে থাকতে পারে। প্রথম সমাগম অশোকের রাজত্ব-কালের কাছাকাছি কোন সময়েই হয়ত হয়েছিল। বুদ্ধদেবের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপস্থিতির কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। মহাস্থান-গড়ের ভগ্ন শিলালিপি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে বাংলাদেশ বৌদ্ধ রাজাদের শাসনাধীন হয়েছে। এই শিলালিপির ভাষা অশোকের অনুশাসনের ভাষার প্রায় অনুরূপ। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, এই শিলালিপি অশোকের যুগের না হলেও, তাঁরই কোন নিকট-বংশধরের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হয়ে থাকবে। লিপিখানির পাঠোদ্ধার করেন ডক্টর দেবদত্ত রাম-কৃষ্ণ ভাণ্ডারকর। তাঁর প্রদত্ত পাঠ[14] এই রকম :—

"..........নেন সংবংগীয়ানং গলদনস
দুমদিন মহামাতে সুলখিতে পুড নগলতে
এতং নিবহিপয়িসতি। সংবংগীয়ানং চ দিনে
ধনা ধানিয়ং। নিবহি সতি দংগাতিয়ায়িকে
দেবাতিয়ায়িকসি। সু অতিয়ায়িকসিপি গংডকেহি
ধানিয়িকেহি এস কোঠাগালে কোসং ভরণীয়ে।"

এর যথাযথ আক্ষরিক সংস্কৃত অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছেন অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন, তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে[15]। এখানে তার উল্লেখ করছি :—

"..........অনেন সংবংগীয়ানাং গলর্দনস্
—মহামাত্র সুলক্ষীতঃ পুণ্ড্রনগরতঃ এতং নির্বাহয়িষ্যতি।
সংবংগীয়াশ্চ দত্তং তথা ধান্যং। নির্বাহয়িষ্যতি দ্রঙ্গারাত্যায়িকং
দৈবারাত্যায়িকে। স্ব-ত্যায়িকেঽপি গণ্ডকৈঃ ধান্যকৈঃ
এষ কোষাগারে কোষং ভরণীয়ং।"

১১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আদিনাথের মূর্ত্তি, চারজন নাথ যোগীর মূর্ত্তি ও লেখকের ভ্রাতার নিকট রক্ষিত পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি প্রভৃতি। শেষোক্ত মূর্ত্তিটি জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বোদরা গ্রামে কোন একটি পুষ্করিণী খননকালে আবিষ্কৃত হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের কোনও স্থানে মাটির তলা থেকে উদ্ধৃত একটি জৈন স্তূপ রাজেন্দ্র সিং সিংঘী মহাশয়ের বালিগঞ্জের বাড়ীতে সংরক্ষিত আছে।

১২। রাঢ়া পুরী নিয়ে কিন্তু মতদ্বৈধ আছে। প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। দ্রষ্টব্য : বিশ্বভারতী পত্রিকা—বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩। আবার "সংহতি" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে প্রভাসচন্দ্র পাল রাঢ়া পুরীর অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন।

১৩। দ্রষ্টব্য :—"চর্য্যাপদ" শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা ২য় খণ্ড ১৩২৬-৭৫-১০৪ পৃষ্ঠায় সর্ব্বানন্দ বন্দ্যঘটীর দেওয়া প্রাচীন বাংলা শব্দাবলী [২ দফায়]।

১৪। *Epigraphia Indica*—Vol. XXI, Part II.

১৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪।

এখন এই দুটি পাঠ আর ব্যাখ্যা থেকে মনে হয়—গলদনস বা গর্লর্দনস কোন মহামাত্রেরই নাম। অন্ততঃ ডক্টর ভাণ্ডারকর এটাই সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। বিপরীতে আমরা দেখতে পাই যে, (প্রাকৃত) গলদনস বা (সংস্কৃত) গর্লর্দনস প্রকৃতপক্ষে (সংস্কৃত) "করদানস্ত" বা "করাদানস্ত"-এর সমান। "কর" শব্দ "গল" হয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক, কিন্তু গলদনস নাম হওয়াটা অস্বাভাবিক। কর-আদায়কারী বা কর আদায়ের কাজে নিযুক্ত মহামাত্র—অর্থ করা অসঙ্গত হয় না। এর পর সুকুমারবাবুর ত্রুটি হয়েছে "ছমদিন" শব্দটিকে বাদ দিয়ে যাওয়ায়। আমাদের মনে হয় [প্রাঃ] ছমদিন শব্দ [সং] "দেবদত্ত" বা "ধর্ম্মদত্ত" শব্দের সমান। ফলে দেখা যায় যে, ঐ দেবদত্ত বা ধর্ম্মদত্ত হচ্ছে মহামাত্রটির নাম। সুতনুকা লিপিতে ছমদিন-এর প্রায় সমান শব্দ "দেবদিনে" আছে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা [প্রাঃ] দেবদিনেকে [সং] দেবদত্তের সমান বলে ধরে নিয়েছেন। এর পর আলোচনা করতে হয় "সুলখিতে" শব্দটিকে নিয়ে। সুকুমার বাবুর অনুবাদ মতে "সুলক্ষ্মীতঃ" না হয়ে শব্দটি "সুরক্ষিত" হতেও পারে। "সুরক্ষিত-পুণ্ড্র নগরতঃ" একটি সমাসবদ্ধ পদ, এবং তার সঙ্গত অর্থও হয়। "তথা" শব্দ এখানে "তত্র" অর্থাৎ—সেখানে অর্থ করে। তা হলে সমগ্র লিপিখানির অর্থ দাঁড়ায় এই রকম :—

এতদ্দ্বারা সংবংগীয়দের কর-আদায়ের কাজে নিযুক্ত (বা কর-আদায়কারী) ধর্ম্মদত্ত (বা-দেবদত্ত) মহামাত্র সুরক্ষিত (বা সুলক্ষ্মীসম্পন্ন) পুণ্ড্রনগর হইতে ইহা নির্ব্বাহ করিবেন। সংবংগীয়গণ সেখানে (বা সেইরূপ) ধান্য প্রদত্ত হইল। দৈব বিপৎকালে আর্থিক অভাব কাটিয়া যাইবে। সুদিনে ধান্য ও গণ্ডার দ্বারা এই কোষাগারের কোষ যেন ভরিয়া দেওয়া হয়।

পরবর্ত্তীকালে মন্ত্রযান, কালচক্রযান, বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি মতবাদের উদ্ভব ও প্রচলন হয়। আসল ধর্ম্মমতের এই রকম বিকৃতি ঘটার ফলেই বোধ হয় হিন্দুরা বৌদ্ধদের ঘৃণা করতে থাকে এবং বাংলায় কপটার্থক "ভণ্ড" শব্দের১৬ উৎপত্তি হয়। আবার ব্যর্থতাবোধক "পণ্ড" শব্দের উদ্ভব হয় ঐ শব্দ থেকে। "বুদ্ধ" শব্দ থেকে বাংলায় বুড্ঢ>বুড়া, বুড়ো শব্দেরও অপভ্রংশত্বপ্রাপ্তি ঘটে। বুদ্ধকে কোন-কোন জায়গায় শিব বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং সেই সব জায়গায় বুদ্ধ থেকে উৎপন্ন "বুড়ো" হয়ে দাঁড়িয়েছে১৭ শিবের বিশেষণ। তবু একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলায় বৌদ্ধ-ধর্ম দীর্ঘকালস্থায়ী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। আজকের দিনের বহু বৈষ্ণব ছিলেন মূলতঃ সহজযানপন্থী, বহু শাক্ত ছিলেন বজ্রযান ও কালচক্রযান পন্থী। বৌদ্ধজ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ, আচার্য্য শীলভদ্র, শান্তিদেব, বিভূতিচন্দ্র প্রভৃতি বাঙালী মনীষিগণের দানে একদা বৌদ্ধ ধর্ম্মজগৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বাঙালী তান্ত্রিক বৌদ্ধ অভিনবগুপ্ত এক দিন শঙ্করাচার্য্যের মত মহাপুরুষের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সুদূর সিংহল,১৭(ক) চীন ও তিব্বতের সঙ্গে প্রাচীন বাংলার সংযোগ বহুকাল ধরে অক্ষুণ্ন ছিল।

মৌর্য্য সম্রাটদের নিযুক্ত উপরিক বা মহামাত্রদের অধীনে কিছুকাল থাকার পর বাংলাদেশ আবার আগেকার মত১৮ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশদ্বারা শাসিত হতে থাকে। এই সব রাজবংশের অধিকাংশই ছিল আর্য্যীকৃত অনার্য্য এবং এরা শূর, বর্ম্ম, সিংহ, ঘোষ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করত। কিন্তু কোন্ বংশ কতকাল রাজত্ব করেছিল এবং কোন্ অঞ্চল শাসন করত তার সঠিক প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি।

প্রায় পাঁচ শত বৎসর ব্যাপী এক অন্ধকার-যুগের পর গুপ্ত, পাল, সেন, শূর প্রভৃতি বংশের রাজত্বকালের কথা মুদ্রা, লিপি, কাব্য, ইতিহাস ও বিদেশী পর্য্যটকদের বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয়। এই সময়টা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত এবং ইতিহাসে এই যুগের পরিচয় হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ বলে।

গুপ্তবংশের শাসনকালে বাংলাদেশ আবার অখণ্ডত্ব লাভ করে। তার ফলে সমগ্র প্রদেশটি চারিটি ভুক্তিতে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক ভুক্তি কতকগুলি বিষয়ে এবং প্রত্যেক বিষয়ে কতকগুলি বীথি বা মণ্ডলে, আবার প্রত্যেকটি বীথি কয়েকটি চতুরকে বিভক্ত হয়ে শাসিত হতে থাকে। এ ছাড়া নূতন আরও দু-রকমের বিভাগের খবর পাওয়া যায়, যেমন পট্ট বা পাটক আর আবৃত্তি। যাবতীয় বিভাগের সর্ব্বনিম্ন স্তর ছিল গ্রাম। মনে হয় যে ভুক্তি অনেকটা এখনকার বিভাগের মত, বিষয় অনেকটা জেলার মত, মণ্ডল বা বীথি মহকুমার এবং চতুরক প্রায় চৌকি বা থানার মতই ছিল।

ভুক্তির প্রধান রাজকর্ম্মচারীর পদের নাম ছিল উপরিক, প্রতিরাজ। কুমারামাত্য, মহারাজ, মহাসামন্তও তাঁকে বলা হ'ত। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ থাকত সামন্ত বা বিষয়পতিদের। সামন্তদের সংযোগ থাকত মাণ্ডলিকদের সঙ্গে।

জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর সাহায্যে উপরিক ভুক্তির শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করতেন। এই প্রতিনিধি-

১৬। [illegible]> [illegible]> [illegible]। ১৭। যেমন, বুড়ো-শিবতলা।

১৭। (ক) বঙ্গশ্রী—১৩৫৩ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লেখকের "প্রাচীন বাংলা শিশু সাহিত্য" নামক প্রবন্ধে প্রমাণ করা হয়েছে যে, "সিংহলীয়" থেকে হিম্‌হলি হয়ে বাংলা "হেঁয়ালি" শব্দের সৃষ্টি হয়েছে।

১৮। পৌরাণিক যুগে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারত থেকে। মৌর্য্যরাজাদের আমলে বাংলাদেশ যে অখণ্ডত্ব লাভ করে তার প্রমাণ পাওয়া যায় মহাস্থানগড়ের শিলালিপির "সংবংগীয়ানং" শব্দ থেকে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে আবার যে বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণও পাওয়া যায় সমুদ্রগুপ্তের স্তম্ভলিপি থেকে।

মণ্ডলী বা শাসন-পরিষদের নাম ছিল "অধিষ্ঠানাধিকরণ"। অধিষ্ঠানাধিকরণের সভ্যসংখ্যা ছিল চার। প্রথম নগরশ্রেষ্ঠী কিম্বা Banker, দ্বিতীয় প্রথম সার্থবাহ, অর্থাৎ বণিক-সমাজের প্রতিনিধি (President of the Chamber of Commerce), তৃতীয় প্রথম কুলিক অর্থাৎ উৎপাদক-শিল্পী-দের প্রতিনিধি (Representative of the Industrialists) এবং চতুর্থ প্রথম কায়স্থ বা জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, অর্থাৎ রাষ্ট্র-দপ্তরের Chief Secratry। গুপ্তযুগের শেষদিকের তাম্রপট্টলিপিতে অধিষ্ঠানাধিকরণের সভ্যদের নামের উল্লেখ নেই। তার কারণ উপরিক তখন স্বাধীন শাসক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মতামতের মূল্য অনেক কমে গিয়েছিল। তাম্রপট্টলিপিগুলি থেকে এটুকু জানা যায় যে, কারও দেবতার উদ্দেশে বা ব্রাহ্মণকে দান করবার জন্য জমি ক্রয় করবার ইচ্ছা হলে সেকথা তাকে সর্ব্বাগ্রে জানাতে হ'ত প্রথম পুস্তপালকে (Chief Record-keeper)। প্রথম পুস্তপাল দেখে শুনে জমি জরীপ করে সংবাদ দিলে পর উপরিক ও অধিষ্ঠানাধিকরণ সেই দান বা ক্রয় মঞ্জুর করে স্থানীয় মাতব্বর ব্যক্তিদের উদ্দেশে তাম্রশাসন দান বা তাম্রপট্ট-লিপি উৎকীর্ণ করাতেন।১৯

এই সময়ে আরও কতকগুলি নূতন পদ-পদবীর সৃষ্টি হয়েছিল—যেমন, মহামুদ্রাধিকৃত, মহাসর্ব্বাধিকৃত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, হট্টপতি, মহাপীলু পতি, মহাগণস্থ এবং মহাব্যূহপতি।২০ বর্তমান উপাধি "রায় চৌধুরী" যাকে আমরা রাজ-চতুর্ধারিক বা রাজ-চতুর্ধারী থেকে উৎপন্ন বলে মনে করি তার উৎপত্তি এই যুগেই কিনা তার কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি।

কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদে প্রধান অমাত্য বা মহাসান্ধি-বিগ্রহিক, রাজস্থানীয়, অঙ্গরক্ষ, ষষ্ঠাধিকৃত, চৌরোদ্ধরণিক, শৌল্কিক, দাশাপরাধিক, তরিক, মহাক্ষপটলিক, ক্ষেত্রপ, প্রমাতৃ, মহাদণ্ডনায়ক বা ধর্ম্মাধিকার, মহাপ্রতীহার, দাণ্ডিক, দাণ্ডপাশিক, দণ্ডশক্তি, মহাসেনাপতি, কোট্টপাল, প্রান্তপাল প্রভৃতি কর্ম্মচারীর পদ ছিল।

তখন রাজস্বকে বলা হ'ত—ভাগ, ভোগ, কর, উপরিকর ও হিরণ্য।

তাম্রপট্টলিপি থেকে যে সব মহত্তর২১ বা মুখ্য ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় তা এই রকম :—ধৃতিপাল, রিভু (ঋভু) পাল, বন্ধু-মিত্র, বসুমিত্র, স্থাণু দত্ত, বরদত্ত, নরসেন, প্রভুচন্দ্র, রুদ্রদাস, গুহ নন্দি, ভবনিষ্ঠু, দামরুদ্র, বসুশিব, শিবকুণ্ড, ধনস্বামী, সোমঘোষ, কালঘোষ, জয়নন্দী, অপর শিব, প্রবর কুণ্ড, বোধিদেব, যোগদেব, শ্রীনাথ, ভবনাথ, বীরনাগ, রাজ্যনাগ, নরশর্ম্মা, গুণশর্ম্মা, জন্মভূতি, যশোদাম, কেদার মিত্র, ভরব মিত্র, প্রজাপতি স্বামী, শৌণক স্বামী, ধূর্ত্ত ঘোষ ইত্যাদি। মনে হয় যে, এই সব নামের প্রথম ও শেষাংশ পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে ব্যবহৃত হতে থাকায় কালে উপনামে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং সেই সব উপনাম থেকে বর্তমানের ঘোষ, বোস, দাঁ, সাঁই, রুদ্র, ভদ্র, ভঞ্জ, মিত্র, হুই, গুহ, নন্দী, কুণ্ড, দাস, পাল, নাথ, দত্ত, চন্দ্র, দেব, দে, সেন, শর্ম্মা, নাগ, ধর, শী প্রভৃতি উপাধির প্রচলন হয়েছে। আরও পরবর্তীকালে—সপ্তম থেকে দ্বাদশ খ্রীষ্টীয় শতকের মধ্যে সৃষ্ট হয়—মুখ্যোপাধ্যায়>মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি উপাধিগুলি২২।

বাংলায় পাল আমলের সমসাময়িক আর একটি রাজবংশ সম্ভবতঃ বরাবর দক্ষিণাংশ বা "অরণ্য প্রদেশ" শাসন করত সেটি হচ্ছে শূরবংশ। এই বংশের প্রথম রাজা আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা যথেষ্ট সন্দেহ রাখেন, কেমন তাঁর নামের কোন মুদ্রা, কি শীলমোহর বা অপর কোন বিশ্বাস-যোগ্য নিদর্শন ঐতিহাসিকদের চোখে পড়ে নি। একমাত্র কুলজী গ্রন্থগুলিতে তাঁর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কুলজীর উক্তি অনুযায়ী আদিশূর গৌড়ের রাজা ছিলেন এবং বাঙালীর জাতিভেদ ও সমাজব্যবস্থা যা ঠিক মনুসংহিতা অনুযায়ী নয়, ব আর্য্যিক বিভাগের অনুরূপ নয়, তা তাঁরই কীর্ত্তি। এই শূর বংশের অন্যান্য রাজা— ক্ষিতিশূর, ধরাশূর, রণশূর ও লক্ষ্মীশূর অনুশাসনের লিপিতে রণশূর ও লক্ষ্মীশূরের উল্লেখ আছে রাজেন্দ্র চোল যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করেন তখন ধর্ম্মপাল গোবিন্দচন্দ্র ও রণশূর যথাক্রমে দণ্ডভুক্তি, দক্ষিণ রাঢ় ও বঙ্গাল দেশ শাসন করতেন২৩। অরণ্যপ্রদেশ ও অপর মন্দারের (হুগলী অঞ্চলের) রাজা লক্ষ্মীশূর কৈবর্ত্তরাজ ভীমের সহিত রামপালের যুদ্ধে শেষোক্তকে সাহায্য করেছিলেন। এখন এই অনুশাসন লিপি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের ব'লে স্থিরীকৃত হয়েছে। সুতরাং এই লিপি-বর্ণিত রণশূরের পূর্ব্বপুরুষ আদিশূরের তারিখ পড়ে সপ্তম-অষ্টম শতকেই। এই সময়ের সঙ্গে কুলজী কিম্বদন্তী তারিখের খুব বেশী তফাৎ নেই।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে পঞ্চম শতক

১৯। দ্রষ্টব্য—বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সিরিজের অন্তর্ভুক্ত "প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী"—ডক্টর সুকুমার সেন।

২০। দ্রষ্টব্য—ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের "বাংলাদেশের ইতিহাস" ও *History of Bengal*—Dacca University Studies.

২১। এগুলি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের ব্যক্তিদের নাম।

২২। বাগচী শব্দের উদ্ভব হয় এইভাবে, যেমন, বঙ্গজী (=বঙ্গজিৎ)>বগ্‌গজিজ>বাগজী, বাগচী। পাকড়াশী-র, যেমন-পাকুর+বাসী>পাকুড়াশী>পাকড়াশী। লাহিড়ী ও ভাদুড়ী-র উৎপত্তি কথা বলেছি "প্রাগৈতিহাসিক বাংলাদেশ" প্রবন্ধে। দ্রষ্টব্য-প্রবাসী মাঘ ১৩৫৪।

২৩। নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত শূন্য পুরাণের ভূমিকা ও ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলাদেশের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

পর্য্যন্ত। তার পর স্বাধীন-বঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপচন্দ্রের তারিখ ৫২৫ খ্রীঃ। এর পর ধর্ম্মাদিত্য ও সমাচারদেবের তারিখ ৫৭৫ খ্রীঃ। তাঁদের পরে শশাঙ্ক বা নরেন্দ্র গুপ্তের শাসনকাল ৬০০—৬৩৮। শশাঙ্কের পর খড়্গ বংশের ৬৫০—৭০০; পালবংশের ৭৫০—১১৬০; বর্ম্মবংশের ১০৭৫—১১৫০ ও সেনবংশের রাজত্বকাল ১০৯৫—১২৫০। ইহাদের পর রণ-বঙ্ক মল্ল হরিকাল দেবের ১২০০—১২২৫ ও দেববংশের শাসনকাল ১২২৫—১৩০০ পর্য্যন্ত।

এই সুদীর্ঘ হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে সমগ্র বঙ্গদেশ বিভিন্ন নদ-নদী দ্বারা বিখণ্ডিত থাকার দরুন মোটামুটি কয়েকটি দ্বীপে[24] বিভক্ত হয়েছিল, যেমন,—সিংহদ্বীপ, তালীদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, বৃদ্ধ-দ্বীপ, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, সুহ্মদ্বীপ, নলদ্বীপ প্রভৃতি, যেগুলি থেকে পরবর্ত্তীকালে সিংদিয়া, মাঝদিয়া, নদীয়া, তালদী, সুন্দিয়া, নলদী প্রভৃতি স্থানের নামের প্রচলন হয়। তাদের সাদৃশ্যে অথবা "-দিয়া" অংশকে প্রত্যয়রূপে ধরে আরও পরবর্ত্তীকালে বহু গ্রামের নাম রাখা হয়, যেমন—হুড়ুবদিয়া ইত্যাদি। এমন কি মোগল সরকারের ডিহি বিভাগের "ডিহি" শব্দকে ভুল করে কেউ কেউ এই '-দিয়া' অংশের মূল শব্দ বলে মনে করেন, এরূপ দেখা গিয়েছে। আর নারিকেল পাটক, তালী পাটক, সপ্ত পাটক, (অ)লাবু পাটক প্রভৃতি "পাটক" বিভাগ ছিল, যা থেকে পরবর্তী কালে—নারকেল বেড়ে, তাল বেড়ে, সাত বেড়ে, লাউ বেড়ে প্রভৃতি গ্রাম-নামের উৎপত্তি হয়েছে। "পাটক" ও "পট্ট" প্রায় সমার্থক শব্দ। এর অর্থ হ'ত পাড়া। বন্দর বা নৌকাঘাট বোঝাতে ব্যবহৃত "পত্তন" দিয়ে স্থানের নাম রাখা হ'ত, যেমন—শম্বুক পত্তন, চাঙ্গট পত্তন, মনসা পত্তন ইত্যাদি। এই নামগুলি পরবর্ত্তী কালে—শামুক পোতা, চিংড়ি পোতা, মনসা পোতায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিল্ব শব্দ দিয়েও স্থানের নামকরণ হ'ত, যেমন—কেন্দু বিল্ব, মনসা বিল্ব, অক্রূর বিল্ব, চাতক বিল্ব ইত্যাদি। সেইগুলি থেকে বর্ত্তমানের কেঁদুলি, মনসার বিল, শঙ্কুকের বিল, চট্টকীর বিল এসেছে। গ্রাম ও পাড়া বোঝাতে "পট্ট, পট্টিক" শব্দ প্রায়ই ব্যবহৃত হ'ত, যেমন—চম্প-পট্টিক, দ্রংশক পট্ট, মন্ত্র পট্ট, যেগুলি থেকে বর্ত্তমানে চাঁপাটি, ধৰির আটি, মাদার আটি হয়েছে। আবার "পাটক" থেকে বহু জায়গায় "পাড়া" শব্দ এসে গেছে, যেমন—নব পাটক দক্ষিণ পাটক, বৃদ্ধ পাটক থেকে ন' পাড়া, দখিন পাড়া, বুড়া পাড়া ইত্যাদি। "পার্শ্ব" ও "সায়র" দিয়ে গ্রামের নামকরণ হ'ত, মহেশ্বর পার্শ্ব, সিদ্ধি পার্শ্ব, শঙ্খসায়র,[25] চন্দন সায়র ইত্যাদি। এদের থেকে পরবর্ত্তীকালে মহেশ্বরপাশা, সিদ্ধি-পাশা, শাঁক স'র, চন্দন স'র প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। "পুর" ও "গ্রাম" দিয়ে স্থানের নামকরণ সবচেয়ে বেশী হ'ত। তার প্রমাণ—নিত্যানন্দপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর, রামপুর, শান্তিপুর, বনগ্রাম, নবগ্রাম, বালুগ্রাম ইত্যাদি। "নগর" দিয়ে কিছু কিছু নামকরণ হ'ত, যেমন—রামনগর, দেবনগর, কায়স্থ নগর>কোন্নগর, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি। এগুলি ছাড়া সংস্কৃত থেকে বাংলা অনুবাদ করা গ্রামের নামও পাওয়া যায়, যেমন—যমল বৃক্ষিকা=জাওল গাছি; পুষ্পবৃত্তিকা=ফুল বেড়ে ইত্যাদি। এ ছাড়া, বক্ত-ক-ত্রা, যা থেকে—বক্ত ক-ত্তা> বক্লগদ্দা>বানগদা; বজ্রকুক্ষিকা, যা থেকে বজ্জগুঞ্জিআ> বজর ঘুঁজিয়া>বেজার ঘোঁজ; বৃহিশাল>বিরিশাল>বরি-শাল; স্রোত কুক্ষি>সোটকোখি>সুঁটখেক; কোল্লানাম> কোলানাং>খোলনা, খুলনা; রক্ত মৃত্তিকা>রক্ত মট্টিআ>রাঙা-মাটি; কর্ণসুবর্ণ>কন্নসুঅন্ন>কানসোনা ইত্যাদি স্থানের নাম ক্রমবিকাশ লাভ করে। জনপদমূলক যে বিভাগ ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়—"ভূমি"-যুক্ত স্থানের নামে, যেমন, বীরহম্মভূমি>বীরভূমি>বীরভূম; মল্লভূমি>মল্লভূমি>মল্ল-ভূমি>মালভূম, মানভূম; সুহ্মভূমি>সুম্হভূমি>সিংহভূমি> সিংভূম; দামলভূমি>দাবলভূমি>দজলভূম>ধলভূম ইত্যাদি। সে যুগে নদ-নদীর নাম হয়েছিল—ত্রিবেণী, যমুনা, কালিন্দী, কুজভোয়া, ময়ূরাক্ষী, ব্রাহ্মণী, সরস্বতী ইত্যাদি।

আর্য্যদের সমাজ-ব্যবস্থার অনুসরণে বাংলায় ঠিক চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ হয় নি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী অবধি অন্ততঃ খুব বেশী স্বেচ্ছাচারিতা বিদ্যমান ছিল। তখন ছিল বৃত্তিমূলক উপনাম। ফলে ব্রাহ্মণের ঘোষ-উপনাম হ'ত, কৈবর্ত্তও ক্ষত্রিয় হ'ত। বিবাহ বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসৃত হ'ত না। কিম্বদন্তী অনুযায়ী গৌড়াধিপতি আদিশূর পশ্চিম ভারতীয় ভাবের অনুসরণ করবার জন্য কান্যকুব্জ থেকে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আনিয়ে এদেশে কুলপ্রথার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁর আমলে কৈবর্ত্তরাও সম্মানের আসন পেয়েছিল, বৈদ্যরাও উচ্চবর্ণ বলে গণ্য হ'ত। একাদশ শতকে বল্লালসেন বাঙালী হিন্দু সমাজের পুনর্ব্যবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে ভাঙলেন। ফলে, কৈবর্ত্তরা নীচে নেমে গেল। তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হ'ল—হালিক ও জালিক। কায়স্থ হ'ল তিন রকমের, যেমন—কায়স্থ, করণ ও বদজ। তার মধ্যে আবার কুলীন ও মৌলিক বিভাগ হ'ল। বৈদ্যদের পরিচয় খুব গোলমেলে হয়ে দাঁড়াল। কায়স্থদের মধ্যে করণরা ছিল মসীজীবী, আর অন্য শ্রেণীর কায়স্থেরা ছিল

২৪। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র দ্রষ্টব্য।

২৫। বাংলা ব্যাকরণ, প্রথম খণ্ড—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রণীত।

২৬। আবার এমনও হতে পারে—মহেশ্বরাবাস>মহেশ্বরা পাশ>মহেশ্বরপাশা এবং সিদ্ধাবাস>সিদ্ধাপাশ>সিদ্ধপাশা>সিদ্ধি পাশা।

অসিজীবী। কায়স্থ শব্দটি এসেছে ক্ষত্রিয়[২৭] শব্দ থেকেই, যেমন—ক্ষত্রিয়> কস'ত্তয়> কসয়াত্তর> কায়াথ> কায়থ, কায়েথ। তারই সংস্কৃত রূপ "কায়স্থ"। এখনকার দিনে অবশ্য করণ ও কায়েথ মিলে এক হয়ে গিয়েছে। অন্ত্যজ শ্রেণী ছিল দুই রকমের—এক জলাচরণীয় ও অন্যটি জলানাচরণীয়। এখনও অনেকটা সেই রকমই আছে। নাপিত, তাঁতি, সেকরা, কুমার, কামার প্রভৃতির স্থান ছিল কায়স্থকুলের নীচেই।

২৭। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ—ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও ডঃ সুকুমার সেনের—'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী' পত্র।

কলঙ্ক

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

করমা গাঁয়ের লালসিং পুরা[১] গৃহস্থ। দশ বিঘা ধানক্ষেত, বাস্তিঘর, তিনখানা লাঙ্গল, গাই, মোষ তো আছেই, তা ছাড়া আরো আছে কিছু নগদ টাকা। লালসিং-এর সাঁঝিল[২] মেয়ের নাম রুকিয়া. বয়স হইবে তের কি চৌদ্দ, পাতলা গড়ন, কাঁধ পর্য্যন্ত কোঁকড়া চুল, চোখ দুটি হাসি হাসি, গায়ের রং তিল শাঁওর,[৩] দেখিতে ভারি সুন্দর। মনোমত পাত্র পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া রুকিয়ার এই বয়সেও বিয়ে হয় নাই। লালসিং-এর মত লোক যাহার তাহার ঘরে তো আর মেয়ে দিতে পারে না, তাই খোঁজাখুঁজি চলিতেছে।

অবশেষে তিন ক্রোশ দূরে কোশীগাঁয়ের ভাতুসিং-এর ছেলে রূপনাকে পছন্দ হইল। ভাতুসিং-এর অবস্থা লালসিং-এর মত অত ভাল না হইলেও ঘরে খাবার আছে, দশ-বিশটা গাইগরু আছে তা ছাড়া ছেলেটি ভারি কাবিল[৪]। বয়েস আঠার-উনিশ, বলিষ্ঠ লম্বা দেহ, কালো কুচকুচে রং, দাঁতগুলি ঝকঝকে সাদা, ঠোঁট দুটি যামানসই পুরু, কানে সোনা। ছেলের শুধু যে রূপ আছে তা নয়, গুণও আছে। ঘর-গৃহস্থালির কাজে পাকা, আবার বাঁশী ও মাদল বাজাইতে ওস্তাদ। অতএব মহাদেওয়ের বিহার[৫] পরে ফাগুনের এক শুভলগ্নে রূপনার সহিত রুকিয়ার বিবাহ হইয়া গেল।

শ্বশুরবাড়ী আসিয়া রুকিয়ার দিন আনন্দেই কাটে। একে তো বড়লোকের রূপবতী কন্যা, তার উপর শ্বশুরের আদুরে পুত্রবধূ—রুকিয়াকে সংসারের কাজ বিশেষ কিছু করিতে হয় না। শাশুড়ী-ননদেরাই সব কাজকর্ম্ম করে, হাসিয়া খেলিয়াই তাহার বেশী সময় কাটে।

স্বামী রসিক, সুন্দরী স্ত্রীর মর্য্যাদা রাখিতে জানে, আদর করিয়া, গান গা'হয়া, মাদল বাজাইয়া সব সময়েই খুশী করিতে চেষ্টা করে। আর রুকিয়া খুশীও হইয়াছে খুব; এমন স্বামী পাইয়া কোন্ মেয়ের না আনন্দ হয়। এক মণ কাঠের বোঝা জঙ্গল হইতে সে অনায়াসে মাথায় করিয়া বাড়ী লইয়া আসে, বিঘাদুই জমি এক বেলায় চাষ দিয়া ফেলে, আবার জ্যোৎস্না রাত্রে আঙ্গিনাতে বসিয়া যখন মাদল বাজাইয়া গান সুরু করে তখন মনের মধ্যেটা কেমন করিয়া ওঠে—ইচ্ছা করে তার কালো মিষ্টি মুখখানার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে।

এই ভাবে দিন কাটে।

একদিন সকালবেলা মরদেরা যে যাহার কাজে গিয়াছে, ননদী গিয়াছে গোবর কুড়াইতে, শাশুড়ী রান্না লইয়া ব্যস্ত; হঠাৎ ডাকিয়া কহিল, 'কনিয়া[৬] গে, জল নেই, এক ঘইলা[৭] জল নিয়ে আয়'। রুকিয়া আস্তে আসিয়া খালি ঘইলাটা তুলিয়া লইল, তারপরে ঘরের বাহিরে আসিয়া সেটি নামাইয়া রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। খানিক পরে শাশুড়ী ডাকিল 'কনিয়া কনিয়া গে', রুকিয়া সাড়া দিল না। শাশুড়ী আবার ডাকিল, কিন্তু রুকিয়া নীরব; এইবার শাশুড়ী ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিল, এক ডেগ[৮] দূরে পাশের বাড়ীতে কুয়া, এই সময়ে দশ ঘইলা জল আনা যায় অথচ বউটা করে কি? শাশুড়ী বাহিরে আসিয়া দেখিল খালি ঘইলার পাশে বউ দাঁড়াইয়া আছে। শঙ্কিত হইয়া শাশুড়ী কহিল, 'জল আন্‌তে যাসনি যে, শরীর কি খারাপ হয়েছে, না কেউ কিছু বলেছে!' রুকিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, কেহ কিছু বলে নাই। কি হইল তাহার—জল আনিতে গেল না কেন, শাশুড়ীর কোন প্রশ্নের উত্তরই সে দিল না—ঘইলার পাশে যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনি দাঁড়াইয়াই রহিল। ইতিমধ্যে ননদী আসিয়া উপস্থিত হইল, শাশুড়ী তাহাকে কহিল, 'তোর ভৌজিকে[৯] পুছ কি করছে ওর, এক ঘইলা জল আন্‌তে বল্লাম তা জলও আনে না—জবাবও দেয় না।'

তার পরে ঘইলা তুলিয়া লইয়া নিজেই জল আনিতে চলিয়া গেল। ননদী রুকিয়ার আঁচল টানিয়া কহিল, 'কি হয়েছে বল না ভৌজি, তোকে ভূতে পেয়েছে নাকি?' ইহার

(১) সম্পন্ন, (২) সেজো, (৩) শ্যামল, (৪) উপযুক্ত (৫) শিবরাত্রি, (৬) বউ, (৭) কলসী, (৮) পা (৯) বৌদি,

উত্তরে রুকিয়া যাহা কহিল তাহা শুনিয়া ননদী চোখ দুটি বিস্ময়ে বড় বড় করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

শাশুড়ী জল লইয়া ফিরিতেই ননদী চেঁচাইয়া উঠিল—'শুনেছ মাইয়া, ভৌজি বলে কি? বলে পরের বাড়ীর কুয়োতে সে কোন দিন জল আনতে যায় নাই, কোন দিন যাবেও না।' শাশুড়ী জলের ঘইলা লইয়া ঘরে ঢুকিতেছিল, শুনিয়া দোর-গোড়ায় থ' হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। রাগে, অপমানে তার মুখখানা কালো হইয়া গেল, দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিল, 'পরের বাড়ী! পরের বাড়ী! গোতিয়ার১০ বাড়ী জল আনতে যেতে অপমান! কেন আমরা যাই কেমন করে, আমাদের বুঝি ইজ্জত নাই?' উনুনের উপরে যে ডাল চাপানো সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া শাশুড়ী ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'বড়লোকের বেটি, লাখপতির বেটি, রাজার বেটি, গোতিয়ার বাড়ী থেকে জল আনতে অপমান বোধ হয়! আসল কথা বাড়ীতে কুয়ো নাই সেই কথাটা বলা হচ্ছে। আসুক তোর শ্বশুর, আসুক তোর ভাতার, তারাই এ কথার জবাব দেবে।' বকিতে বকিতে শাশুড়ী ঘরে ঢুকিল।

এদিকে ছোট হইলে কি হয়, ননদীটির মর্য্যাদাবোধ খুবই টনটনে—ভৌজির কথার গোপন ইঙ্গিতটা যে কি তা সে বুঝিতে পারিয়াছে—ভৌজির বাপ যে বড়লোক আর তার বাপ যে গরীব ভৌজি সে কথাই বলিতে চায়। বাপের বাড়ীর গরব লইয়া বাপের বাড়ীতেই তো সে থাকিতে পারিত—এখানে আসিল কেন? রুকিয়া এ কথার উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল, 'আমার বাপ গোরপড়কে১১ তোদের বাড়ী আমাকে রেখে যায় নি।' আর যায় কোথায়, কলহের সুযোগ পাইয়া ননদী আঙিনাময় নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল, এ বিষয়ে সে যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছে, অনেক বুড়ীকে পর্য্যন্ত সে ঘায়েল করিয়া দেয়, ভৌজির মত একটা ছুঁড়িকে কাত করিতে কতক্ষণ! যাহা যাহা অশ্লীল বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, ভৌজির বাপ মা হইতে সুরু করিয়া তার ঊর্দ্ধতম চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত কাহাকেও রেহাই দিল না। বাক্-যুদ্ধে রুকিয়াও অপটু নহে, কিন্তু ইতিমধ্যে শ্বশুর আসিয়া পড়ায় সে চুপ করিয়া রহিল, ভিতরটা তাহার জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল। ব্যাপার শুনিয়া শ্বশুরও যখন তাহাকে আক্রমণ করিল তখন আর সে সহ্য করিতে পারিল না—নিজের ঘরে ঢুকিয়া মেঝের পড়িয়া সে কাঁদিতে লাগিল, দুঃখে নহে—রাগে।

অনেক বেলায় স্বামী বাড়ী আসিল, অবিলম্বে তাহার কাছে শ্বশুর, শাশুড়ী এবং ননদী একযোগে নালিশ রুজু করিল। রুকিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল, স্বামী কি বলে, সকলের গলার আওয়াজই পাইল, পাইল না স্বামীর।

যাইতে তাহার ইচ্ছাও নাই, তাহাকে কেউ ডাকিলও না। আহারান্তে স্বামী যখন ঘরে ঢুকিল তখনও সে ভূমি-শয্যায় শুইয়া ছিল। স্বামী কাছে বসিয়া গায়ে হাত দিতে ফোঁস করিয়া উঠিয়া বসিল, কিন্তু তাহার প্রশান্ত মুখের পানে চাহিয়া ভিতরের উত্তাপ অনেকখানি কমিয়া আসিল। স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, 'সত্যি বল, কি হয়েছে?' রুকিয়া জবাব দিতে যাইতেছিল এমন সময় ননদী আসিয়া উঁকি মারিল, তাহাদের কথাবার্ত্তা তখনকার মত আর হইল না।

ইহার পরে দিন কাটিতে লাগিল বটে, কিন্তু তেমন সুখে স্বচ্ছন্দে নহে। নতুন বৌয়ের আদরের মাত্রা একেবারেই কমিয়া গেল, খুঁটিনাটিতে ত্রুটির জন্য রুকিয়া কড়া কথা শুনিতে লাগিল। কোন কোন দিন সেও জবাব দিত, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিত, কড়া কথা গালাগালিতে পরিণত হইত।

বিষয়টা রুকিয়ার বাপ লালসিং-এর কানে পৌঁছিল। মাথায় মস্ত বড় মুরেঠা১২ বাঁধিয়া সে সমধিকে শিক্ষা দিতে রুকিয়ার শ্বশুরবাড়ী চলিল। সম্বর্দ্ধনা খুব সমারোহেই হইল, লালসিং মুরেঠা লইয়া ফিরিল বটে, কিন্তু মান লইয়া ফিরিতে পারিল না।

ইহার পরে রুকিয়া যখন-তখন লাঞ্ছিত হইতে লাগিল, স্বামী তাহাকে লাঞ্ছনার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। এই অবস্থায় স্থানীয় প্রথানুসারে সকল বউ যাহা করে রুকিয়াও তাহাই করিল—এক দিন সুযোগ বুঝিয়া পলাইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

ইহার ফলে দুই পক্ষই ভীষণ রুখিয়া গেল। ভাতুসিং কহিল, এমন বউকে সে আর ঘরে আনিবে না, লালসিং জবাব দিল যদি ভাল চায় তবে ভাতুসিং যেন ফারকাতি১৩ দিয়া দেয়, তাহার মত চামারের বাড়ী সে মেয়ে পাঠাইবে না।

বর্ষা আসিয়া পড়ে, কিছুদিনের মত জলহড়িয়োর স্থগিত রাখিয়া মেয়েপুরুষে ক্ষেত-খামারের কাজে লাগিয়া যায়। ধান্য রোপণের গানে মাঠ-ঘাট মুখর হইয়া উঠে।

বর্ষান্তে আসে শরৎ—সবুজ ধানক্ষেত রোদে ঝলমল করিতে থাকে, বাতাসে শাখসিহর১৪ ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসে। লোকের এখন অখণ্ড অবসর, একটার পর একটা পরব আসিতে থাকে—কর্ম্মা, জিতিয়া, দশহরা। গ্রামের দশ জন মেয়ের মত রুকিয়াও হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, উৎসবে যোগ দেয়, নাচে, গান গায়। দিন কাটিয়া যায়।

একদিন নদীর ঘাটে রুমির মা আর মুদীবউ একটা কথা লইয়া হাসাহাসি করিতেছিল, মোহনের মা সেইখান দিয়া জঙ্গলে যাইতেছিল, কহিল, 'কথাটা কি, এত হাসি কেন?' মুদীবউ জবাব দিল 'হাসির কথা বলিয়াই এত হাসি।' জঙ্গলে যাওয়াটা স্থগিত রাখিয়া মোহনের মা আরও কাছে আসিয়া

১০ জাতি ১১ পায়ে ধরে

১২ পাগড়ি ১৩ বিবাহ-বিচ্ছেদের পত্র ১৪ শিউলি

কহিল 'বল্ না ভাই, শুনে আমরাও একটু হেসে নিই।' মুদীবউ রুমির মাকে কহিল 'তুই বল্।' রুমির মা গলা খাটো করিয়া কহিল 'শুনিস্ নি বুঝি ঐ লালসিং-এর মেয়ে রুকিয়ার কথা?' মোহনের মা কহিল, 'শুনেছি বইকি, মেয়েটাকে আর শ্বশুরবাড়ী পাঠাবে না।' রুমির মা হাসিয়া কহিল, 'কি দরকার ওর শ্বশুরবাড়ী।' মোহনের মা গালে হাত দিয়া কহিল, 'কেন, কি করেছে?' মুদীবউ বলিল, 'কি আর করেছে —পিরীত করেছে।'

দেখা গেল কথাটা অনেক স্থানেই আলোচিত হইতেছে। সন্ধ্যাবেলা কুয়ার ধারে জল লইতে আসিয়া ঘইলা কাত করিয়া পাড়ার বউ ও মেয়েরা ঐ কথাই বলাবলি করিতেছে। একটি বউ কহিল, 'ওর চং দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সব সময় অত ঠাট-বাট কেন।' রুকিয়ার এক প্রতিবেশিনী কহিল, 'সত্যি বলছি সেদিন নিজের চোখে দেখেছি।' নিজের চোখে কি দেখিয়াছে তাহা বলিবার জন্য চারিদিক হইতে একই সঙ্গে অনুরোধ আসিল। সে বলিল, 'মরদ মদ খেয়ে এসে রাতে আমার সঙ্গে ঝগড়া সুরু করল, আমি রাগ করে ঘরের বাইরে এসে বসে থাকলাম, প্রহরখানেক রাত হয়েছে এমন সময় দেখি ছুঁড়ি চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি বড় মহুয়া গাছটার দিকে চলে গেল।' একটি যুবতী কহিল, 'ও বাবা, ঐ মহুয়া গাছটায় যে ভূত আছে গো।' আর একজন কহিল, 'আছে বৈকি, বড় রসিক ভূত।' উচ্চ হাসির রোল পড়িয়া গেল।

যাহা রটে তাহা বটে। কে একজন প্রায়ই অনেক রাত্রে রুকিয়াদের বাড়ীর পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়, দরজা খুলিয়া রুকিয়া বাইরে আসে, দুটিতে মিলিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া যায়। আবার হাটবার দিন দুপুরবেলা গাঁয়ের মেয়েপুরুষ যখন হাট করিতে যায় তখন রুকিয়া একটা ঝুড়ি মাথায় লইয়া নদীর ওপারে শালবনটার সরু পথ ধরিয়া চলিতে থাকে, হঠাৎ কে আসিয়া তার চোখ দুটি পিছন হইতে চাপিয়া ধরে, রুকিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করে না, হাসিয়া ওঠে, তার পরে দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া গভীর বনে প্রবেশ করে।

ইহাও গাঁয়ের লোকের এক রকম গা-সহা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু দশহরার মেলার দিন রুকিয়া যে রকম বাড়াবাড়ি করিল তাহাতে প্রবীণারা তো বটেই, নবীনারা পর্য্যন্ত ছি ছি করিতে লাগিল। লাল টুকটুকে ঝুলা[১৫] ও ছাপাশাড়ি পরিয়া কানে তারপাত, গলায় হাঁসুলী আর খাড়িয়া, হাতে বাঁক এবং কাংনা পরিয়া সে গ্রামের দশ জন মেয়ের সঙ্গে মেলায় গেল, কিন্তু খানিক পরে দল ছাড়িয়া যে কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল তাহা কেহ বলিতে পারিল না। আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরিবার সময় সে আসিয়া আবার দলে ভিড়িল।

কথাটা লালসিং-এর কানেও গেল; সে রাগে গর্জ্জিয়া উঠিল, মান-ইজ্জত আর থাকিল না। মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, ভবিষ্যতে সে যদি এমন কাজ আর করে তাহা হইলে মেয়ে বলিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবে না, ছোঁড়াটা যেই হউক তাহাকে তো কাটিবেই, মেয়েকেও কাটিয়া দুই টুকরা করিবে।

লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাত, মাঠঘাট জ্যোৎস্নায় ভাসিয়া যাইতেছে। গ্রামখানি ঘুমন্ত, রাত অনেক, এমন সময় রুকিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, গায়ে তার লাল ঝুলা, পরনে ছাপা-শাড়ি, সর্ব্বাঙ্গে গহনা। সে নিঃশব্দে বড় মহুয়া-গাছটার নীচে গিয়া দাঁড়াইল। সেখানটা আবছায়া অন্ধকার, সেই অন্ধকার হইতে কে এক জন রুকিয়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, চুপি চুপি কহিল, 'ইস্ বড্ড যে সেজেগুজে এসেছিস্।' রুকিয়া হাসিতে লাগিল, তার পরে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, 'একটা কথা বলব তোকে।' যুবক কহিল, 'কি বলবি বল্।' রুকিয়া কহিল, 'বাপ্পা[১৬] বড় হাঁকাহাঁকি করেছে, বলেছে কেটে ফেলবে।' যুবক উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, 'তাই নাকি!' রুকিয়া যুবকের বুকের কাছে ঘেঁষিয়া কহিল, 'আমি বলি, দু'জনে কোথাও চলে যাই, কোন পরদেশ।' যুবক একটু ভাবিল তার পরে কহিল, 'তবে তাই চল্, কোথাও গিয়ে দু-তিন মাস নোকরি করব, তার পরে আবার ঘরে ফিরে আসব, তখন দেখবি সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।' দুই জনে মহুয়াতলা হইতে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পথে আসিয়া দাঁড়াইল, আলো আসিয়া পড়িল যুবকের কালো কুচ কুচে সুকুমার মুখে, কানের সোনা তাহার ঝকমক করিয়া উঠিল। দু'জনে পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

[১৫] মেয়েদের গায়ের কুর্ত্তা [১৬] বাপ

মুনি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

গুহার গোপনে মুনি চক্ষু মুদি করে ধ্যানযোগ
সহজে সকলে বলে বেঁচে থাকা তার কর্ম্মভোগ।
কি কাজে লাগে সে মিথ্যা চোখ পোরা মরদেহ ধরে?
জীবন্তে সমাধি যার সে কেন সমাধি-চিন্তা করে?
গুণী জানে, জানে জ্ঞানী তাঁহার চিন্তার স্রোত হতে
কল্যাণ-জাহ্নবী-ধারা বহে যেন গোমুখীর পথে;
বেতারের সুর-ধারা সহস্র যোজনে যেন পশে
ধ্যানের প্রবাহ তার সুন্দরের মন্দাকিনী রসে,
উষরে উর্ব্বর করে দেহে মনে স্বাস্থ্য করে দান,
ধরায় পরায় স্বর্গে, নিখিলের করে সে কল্যাণ।

আমার দাদামশায়—রাজনারায়ণ বসু

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী

দাদামশায় রাজনারায়ণ বসুর বাড়ী কলিকাতার নিকটে
গ্রামে। দাদামশায়ের বাবার নাম নন্দকিশোর বসু।
জা রামমোহন রায়ের শিষ্য ছিলেন। তিনি দেখিতে
দীর্ঘকায়, সুপুরুষ ছিলেন। উপযুক্ত বয়সে তাঁর
ঠিক হয়। সুন্দরী কন্যাকে দেখে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা
রেন। কন্যার রূপের প্রশংসা তিনিও শুনেছিলেন।
মেয়ে বর গিয়ে বসলেন বিবাহ-বাসরে।

দৃষ্টির সময় বর আগ্রহের সঙ্গে যখন কন্যার মুখের
তাকালেন তখন চমকে উঠলেন—"একি! এ যে
কুরূপা কন্যা। কার জায়গায় কে এলেন! তিনি তখনি
'এ মেয়েকে আমি বিয়ে করব না।' এমন করে
ঠকিয়েছেন!" তিনি বিবাহ-বাসর থেকে উঠে

ার বাবা বললেন—হাঁ, অন্যায় হয়েছে, আমার মেয়ে
সেজন্য কেউ পছন্দ করে না—কি করি! আমায় শেষে
তারণা করতে হয়েছে, আমাকে ক্ষমা কর—এখন
ন রক্ষা কর।

ার মন তখন এ রকম অন্যায় আচরণের জন্য আক্রোশে
তিনি কিছুতেই আর বিবাহের বাকি অনুষ্ঠানাদি করবেন
খন কন্যার পিতা রাজা রামমোহন রায়ের কাছে
। সেখান থেকে ফিরে এসে বরকে বললেন—তোমাকে
মমোহন রায় এখনি ডেকেছেন।

। রামমোহন রায় তাঁর গুরু। গুরু শিষ্যকে ডেকেছেন,
তিনি আর না গিয়ে পারলেন না। তিনি সেই
র দুঃখে দুঃখী মহাপ্রাণ ভগবদ্ভক্তের কাছে গেলেন।
হন তাঁর প্রিয় শিষ্যের মাথায় স্নেহভরে হাত রেখে
দ করে বললেন—"দেখ, দেখতে খারাপ হলে
? দেহের সৌন্দর্য্য ক'দিন থাকে! মেয়েটি গুনেছি
। হলেই হ'ল।"

র তিনি রামমোহনের উপদেশ ভক্তিভরে গ্রহণ কর-
ং অবশেষে সেই কালো মেয়েকেই ঘরে আনলেন।
বা গেল, রাজা রামমোহন রায়ের আশীর্ব্বাদ ফলেছে—
শিষ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজনারায়ণ বসু ধার্ম্মিক, বিদ্বান ও
ক্ত হওয়াতে সকলের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করেছিলেন।
ল বৎসর বয়সে দাদামশায়ের বিদ্যালয়ের লেখা-পড়া
। তিনি ঐ বয়সে লাইব্রেরী (এখনকার পি.আর.এস.)
র উত্তীর্ণ ও ৪০৲ টাকা বৃত্তি পান। যখন তিনি
র ছাত্র ছিলেন তখনই তাঁর লেখা ইংরেজী প্রবন্ধ
র কালের গেজেটে প্রকাশিত হ'ত।

কলেজ থেকে বার হয়ে তিনি শিক্ষকতা-কর্ম্ম গ্রহণ করেন। মেদিনীপুর ছিল তাঁর কর্ম্মস্থল। তিনি সেখানকার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি তখন তথাকার অধিবাসীদের ও ছাত্রদের সর্ব্ববিষয়ক উন্নতি ও নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। তিনি সেজন্য কতক-গুলি সভা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—যেমন আত্মোন্নতি সভা, সুরাপান-নিবারণী সভা ইত্যাদি। শেষে তথাকার লোকেরা বলতেন—এবারে একটা সভা-নিবারণী সভা করতে হবে।

তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি, কর্ম্মতৎপরতা ও সততা দেখে সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দিতে চেয়েছিলেন। সেই প্রস্তাব শুনে তাঁর মুখ চিন্তাক্লিষ্ট ও গম্ভীর হয়ে গেল। আমার দিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে কেন! কি এমন ভাবছ? কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে কি?

দাদামশায় বললেন—হাঁ, মনটা খারাপ হয়েছে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমায় ডেপুটির পদ দিতে চান। কিন্তু আমি স্কুলের কাজই সবচেয়ে ভালবাসি।—শেষ পর্য্যন্ত তিনি ডেপুটির পদ প্রত্যাখ্যান করলেন। এ কথা শুনে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বললেন—"Rajnarain is a mad chap—he neither wants promotion nor position" "রাজনারায়ণ দেখছি পাগল—সে উন্নতি লাভ করতেও চায় না, বড় পদও চায় না।

মেদিনীপুরে তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়াতে তিনি দেওঘরে বসবাসের আয়োজন সুরু করলেন। সেখানে ডাক বাংলার পাশে প্রচুর জমি কিনে সুন্দর বাড়ী করলেন। আমৃত্যু সেখানেই ছিলেন। এখন সে বাড়ী অন্য লোকে কিনে নিয়েছে।

দেওঘরে কত লোক তাঁকে দেখতে আসতেন। কেউ কেউ বলতেন, "বৈদ্যনাথে দুই মহাদেব আছেন—একজন পাথরের, আর একজন সজীব।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি তাঁকে দেখতে আসতেন এবং তাঁর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। অতিথিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁর কি প্রখর দৃষ্টি ছিল তা স্বচক্ষে দেখেছি।

শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায় যখন দেওঘরে অতিথি হতেন তখন বাড়ীখানি সর্ব্বদা হাস্যমুখরিত হয়ে থাকত। দুই বন্ধুতে এমন প্রাণখোলা হাসি হাসতেন যা দুর্লভ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায় কত মজা করে অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি এঁকে চিঠি লিখতেন, তা পড়ে আমরা তো হেসেই আকুল। তাঁর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের কত চিঠি আমার মা যত্ন করে একটা বাক্সে রেখেছিলেন।

মহর্ষি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর পারিবারিক সুখ-দুঃখের সব সংবাদ রাখতেন। মহর্ষির একখানি চিঠি আমার কাছে আছে, সেটি এখানে তুলে দেওয়া হ'ল—

ওঁ কাতুয়া

৬ মাঘ ৫১

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার,

আমার প্রতি তোমার যেমন অনুরাগ, তোমার প্রতিও আমার তেমনি অনুরাগ। তুমিও আমার guide, philosopher and friend—তুমিই আমার এক নিয়ত বন্ধু। Essay on Theism বিলাতে প্রকাশিত হইলে কোরাণ হইতে ঈশ্বর বিষয়ক বাক্য সকল সংগ্রহ করিয়া তাহা মুসলমান সমাজে প্রচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ। হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান তিন সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা তোমার চিরকালের লক্ষ্য—ইহা তোমার মনোগত স্পৃহা। ইহা সিদ্ধ হইলে মহাত্মা রামমোহন রায়েরও জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্গদেশের অবস্থা যে অতীব শোচনীয় তাহাও চিরকাল থাকিবে না। শুষ্ক বাটীও একদিন পুষ্পোদ্যান হইবে, অতএব শোক করিও না।

....

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে তোমার যে প্রকার ধৈর্য্য ইহাতে অবশ্য তোমার জয় হইবে। হাফেজ বলিয়াছেন যে ধৈর্য্য ও জয় পরস্পর পুরাতন বন্ধু, ধৈর্য্যের সংসর্গে জয়ের অভ্যুদয় হয়।

আমার সঙ্গে একটি আমার ছান্দোগ্য ব্রহ্মচারী আছেন। তিনি এখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অনুবাদ করিয়া দিতেছেন, তাঁহার নাম প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। তাঁহারই লিখিত এই পারসী অক্ষরের সহিত তোমার নিকট তাঁহার পরিচয় দিতেছি। ইনি আমার অতি যোগ্য শিষ্য।

তুমি যেমন হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছ, মহোদয় ভয়সী (Voysy)-ও সেইরূপ আবার ইহুদী সমাজে তাহা প্রচার করিতে যত্নবান। ব্রাহ্মধর্ম্মেরই এই যুগ। "সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সংপ্রাপ্তে তু কলৌ যুগে।" পুরাণের এই ভবিষ্যদ্বাণী অকাট্য। তুমি য়েভরেণ্ড ভয়সীকে এই দেশে লিখিবে যে উনিশ জনের মধ্যে আদিব্রাহ্মসমাজও ৫০ পঞ্চাশ পৌণ্ড Theistic Church নির্ম্মাণের জন্য সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

যখন আমরা স্কুল-কলেজে পড়তাম তখন প্রতি বৎসর পূজার সময় দেওঘরে যেতাম। সেখানে কত আনন্দে আমাদের দিন কাটত। দেওঘরের নির্ম্মল, স্বাস্থ্যপ্রদ বায়ুসেবন ও সেখানকার টাট্‌কা তরিতরকারী ও ভেজালশূন্য দুধ, ঘি ইত্যাদি আহার করে নব বল ও স্বাস্থ্য নিয়ে আবার কলিকাতায় ফিরতাম।

দেওঘরের বাড়ীর সম্মুখে অনেকটা খালি জমি ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ফুলের বাগান এবং দক্ষিণে তরিতরকারী, ফলের বাগান ও মস্ত কুয়া ছিল। আমরা বাগানে বেড়িয়ে, ফুল তুলে, মালা গেঁথে কত আনন্দ পেতাম।

প্রতি বৎসর কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা তিথিতে রাত্রে দেওঘরের বাড়ীতে উপাসনা হ'ত। বহু লোককে নিমন্ত্রণ করা হ'ত। উপাসনার পর বাড়ীর সম্মুখে চারদিকে গোলাপ গাছে বেষ্টিত চত্বরে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন হ'ত—পরে বাগানে গিয়ে গান হ'ত। আমার দিদি কুমুদিনী বসু ও আমি গান করতাম—

—ফুটন্ত ফুলেরি মাঝে দেখরে মায়ের হাসি
কিবা মৃদুমন্দ সুধাগন্ধ বহে তাতে রাশি রাশি।
"(আমার) মা হাসেন ফুলের ভিতরে তাই ফুল এত ভালবাসি।"

—গানটি তাঁর অতি প্রিয় ছিল। আর একটি গান প্রতি বৎসর ঐ দিনে গাইতাম—

তোমারি মধুর রূপে ভরেছে ভুবন
মুগ্ধ নয়ন মন পুলকিত মোহিত মন

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ধরণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে দাদামশায় সকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তার ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন। ভক্তের মুখখানি ভগবৎ প্রেমে কি উজ্জ্বল হয়ে উঠত! তিনি বলে উঠতেন—"এমন রাতে ঘুম আসে না—তামাম রাত ভগবানের নাম হোক।"

তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধর্ম্মসঙ্গীত শুনতে ভালবাসতেন আর স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত সঙ্গীত শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। স্বদেশপ্রেমের স্রোত তাঁর শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল। আমরা যখন গাইতাম—

কত কাল পরে বল ভারত রে
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে—

তখন দুঃখে তাঁর হৃদয় ভেঙে পড়ত—আর যখন ঐ চরণটি গাইতাম—

তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে—

তখন বলে উঠতেন—ও গান গাস নে, ও গান গাস নে, সহ্য হয় না—আর সহ্য হয় না।

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি প্রাণ
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র পরাণ।"

এ গানটি তাঁর অতি প্রিয় ছিল। এত উত্তেজিত হয়ে উঠতেন যে, পক্ষাঘাত রোগে পঙ্গু দেহকে সোজা করে বিছানার উপর উঠে বসতেন ও ভগ্নকণ্ঠে যুবকোচিত উৎসাহের সহিত আমাদের সঙ্গে গাইতেন। বৃদ্ধবয়সেও তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হ'ত—মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠত!

তাঁর মাথার কাছে একটি ছোট টেবিলের উপর সব ধর্ম-গ্রন্থ থাকত—গীতা, উপনিষদ, বাইবেল, ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি। হাফেজের কাব্যও এগুলির একসঙ্গে স্থান পেত। এগুলি ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী, প্রাণের প্রাণ। হাফেজের গজলগুলি তিনি আবৃত্তি করতে খুব ভালবাসতেন।

শেষ বয়সে দেওঘরে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েক মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর কাছে গেলে তুলার মত নরম হাতখানি আমার সারা মুখে কত স্নেহের সঙ্গে বুলোতেন—কত আদর করতেন তা স্পষ্ট মনে আছে।

যখন আরও ছোট ছিলাম তাঁর খাটের কাছে বসে তাঁর পাকা চুল বেছে দিতাম—তিনি তখন বলতেন, 'তোমার খেয়ে ফেলি ?' মা বলতেন, 'একথা শুনে আমি তাঁর দিকে চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকতাম, তখন তিনি কাছে ডেকে কত আদর করতেন।'

দেখতাম তাঁর মাথার কাছে একটা ছোট কাঠের বাক্স থাকত। আমরা, ছোটরা সে বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি করতে খুব ভালবাসতাম। দেখতাম যে বাক্সে দিয়াশলাই, মোমবাতি, নানা আকারের পেরেক, দড়ি, চিঠির কাগজ, খাম, পোষ্টকার্ড, ডাক টিকিট ইত্যাদি কত টুকিটাকি জিনিষ যা আমাদের চক্ষে অপ্রয়োজনীয় ঠেকত। আমরা বলতাম—আচ্ছা দড়ি রাখেন কেন ?

তারপরে দেখি কি, এক দিন এমন হয়েছে বাড়ীতে একটিও দিয়াশলাই নাই—বাজার তো দেড় মাইল দূরে, কাছেও কোন দোকানপাট নেই, বাড়ীতে বিশিষ্ট অতিথি এসেছেন—জলখাবার তৈরি করতে হবে, উনুনে আগুন দিতে হবে। তখন তাঁর বাক্সে হাত পড়ত—মশারির দড়ির দরকার, কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন তাঁর শরণাপন্ন হতে হ'ত।

সংসারে সামান্য সামান্য জিনিষের জন্য কত মুশকিলে যে পড়তে হয়। লোকে সে সব জিনিষ তুচ্ছ মনে করে, কিন্তু অনেক প্রয়োজনীয় কাজ সেগুলির অভাবে হয় না।

একবার একজন কুষ্ঠরোগী তাঁকে দেখতে আসে। দাদা-মশায়কে কি শ্রদ্ধা-ভক্তি সে করত। দাদামশায় তাকে স্নেহের সঙ্গে আলিঙ্গন করেছিলেন—উপস্থিত সকলে সে দৃশ্য দেখে অবাক।

আমার সেজ মাসিমা বিধবা হবার পর তাঁর পুত্র-কন্যা সহ দাদামশায়ের কাছেই থাকতেন। আমার সেই মাসতুতো দাদা অবিনাশ বরাবরই রুগ্ন ছিলেন। তাঁর ভাত সহ্য হ'ত না—সাগু তরকারি ইত্যাদি দিনের বেলা খেতেন। দেওঘর স্কুলে তিনি পড়তেন। শিক্ষকেরা তাঁকে খুব ভাল-বাসতেন। তিনি বুদ্ধিমান্ ও সচ্চরিত্র ছিলেন—ক্লাসে সর্ব্বদাই প্রথম হতেন। আঠারো বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

আসন্নমৃত্যু, হাস্যে উজ্জ্বল দেওঘরের বাড়ীতে মৃত্যুর ছায়া পড়াতে সকলেই শোকে আচ্ছন্ন, বাড়ীটি কিন্তু নীরব নিস্তব্ধ—শোকের ক্রন্দনোচ্ছ্বাস নেই। দাদামশায় যে পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী, এ অবস্থায় তাঁকে কি করে তাঁর প্রিয় নাতির মৃত্যু-সংবাদ দেওয়া যায়। সে তাঁর কত সেবা করত, সে যে দাদামশায়ের দক্ষিণ হস্ত ছিল। এ শোক যে তাঁর বুকে শেলসম বিঁধবে। আর তা যদি সহ্য করতে না পারেন, সকলে সেজন্য সে গভীর শোক বুকের মধ্যে চেপে রেখে নীরবে অশ্রুজল ফেলত।

দাদামশায় অবিনাশের অসুখের সংবাদ শুনেছিলেন। তিনি কেবল বলতেন অবিনাশের খাটটা ধরে আমার কাছে নিয়ে এস। তখন আমার বড়মামা বললেন—সে আর নেই।

তখন দাদামশায় বললেন—একথা আমাকে জানাও নাই কেন ? এ তো আনন্দের কথা। এখন তার সব ভার স্বয়ং ভগবান নিয়েছেন। আর তার জন্য কোন ভাবনা নেই।"

এই গভীর শোকের সময় তাঁর অসীম ধৈর্য্য ও ঈশ্বরবিশ্বাস দেখে সকলে স্তম্ভিত। উপনিষদের সেই শ্লোকটি মনে পড়ল—যিনি ঈশ্বরপ্রেমিক তিনি সুখে দুঃখে বিচলিত হন না।

তিনি ১৩০৫ সনে ৩০শে ভাদ্র পরলোকগমন করেন।

তাঁর ছাত্রজীবনের কথা ও তখনকার দেশের হালচাল ও রীতিনীতির কথা কি সুন্দরভাবে তাঁর 'আত্মচরিতে' এবং 'সেকাল ও একালে' লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আমার দিদিকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তাঁর নাম কুমারীরত্ন রেখেছিলেন। দিদিকে তাঁর আত্মচরিত প্রকাশিত করবার সব ভার দিয়েছিলেন।

তাঁর আত্মচরিত পড়ে রবীন্দ্রনাথ দিদিকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন—

ওঁ শিলাইদহ

কল্যাণীয়াসু—

মাতঃ। তোমার প্রেরিত রাজনারায়ণ বাবুর আত্ম-চরিত পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। সেই সরল সহাস্য সরস-হৃদয় সাধুভক্তের জীবনী বঙ্গ-সাহিত্যে বিশেষ সমাদরের সামগ্রী হইয়াছে সন্দেহ নাই। বাল্যকাল হইতে একদিকে তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিয়াছি আর একদিকে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ আশা আনন্দের প্রাচুর্য্যে তাঁহাকে আমাদের নিকটবয়সী অনন্তযৌবন সুহৃদের মত জ্ঞান করি-য়াছি। অল্প বয়সে যখন সকলের চেয়ে বড় কথাকে গ্রহণ করিবার শক্তি ছিল না তখন সেই চিরপ্রফুল্ল হৃদয়ের নিত্য উৎসারিত রসপ্রবাহ হইতে আমরা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও স্বদেশের প্রতি প্রেমে অভিষেক লাভ করিয়াছি। আজ তোমাদের পরিবারের মধ্যে যে দুঃখদুর্দিনের গৌরব*

* তখন আমার পিতৃদেব কৃষ্ণকুমার মিত্র নির্ব্বাসনে ছিলেন।

অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার মধ্যে তোমার মাতামহের সেই শুভ্র হাস্ত সমুজ্জ্বল পবিত্র আশীর্ব্বাদ বিকীর্ণ দেখিতে পাইতেছি।

ইতি ১৭ই মাঘ ১৩১৫
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দাদামশায়ের মৃত্যুতিথিতে এই গানটি আমরা প্রার্থনার সময় গেয়ে থাকি আর ভাবি এ গানটি যে তাঁরই জীবনের ছবি—

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো
ধরায় আস।
এই অকূল সংসারে, দুঃখ আঘাত তোমার
প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে;
ঘোর বিপদ মাঝে কোন্ জননীর মুখের
হাসি দেখিয়া হাস?

যখন দাদামশায় শেষ রোগশয্যায় শায়িত তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায় আমার বড় মামা যোগীন্দ্রনাথ বসুর নিকট এই চিঠি লেখেন—

কলিকাতা
যোড়াসাঁকো
(No more Park Street)
বুধবার
Probably
২০শে জ্যৈষ্ঠ

প্রিয় যোগিন,

রাজনারায়ণবাবু সেই তখনকার আনন্দের হাসিতে ভরা—আর এখানকার তিনি প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া অস্তাচলাভিমুখে—আমাদের নিকট অস্তাচলাভিমুখে কিন্তু দেবগণের নিকট উদয়াচলাভিমুখে—ধরি হস্তে করিয়া চলিতেছেন। আমি তোমাদের ওখানে যাই ইহা আমার আন্তরিক প্রাণগত ইচ্ছা কিন্তু আমি যেরূপ নানা চক্রাচক্রের মধ্যে পড়িয়া আছি তাহা এক প্রকার প্রাণবধকারী মাকড়সার জাল—তাহা কাটাইয়া মুক্ত বায়ুতে উত্থান করা সুকঠিন।

I am the 'dot' in the middle of the vortex, যাহাই হউক না—আমার Love, affection regards, admiration towards রাজনারায়ণবাবু—The same as always and will remain so for ever—দুঃখ কেবল এই যে চাক্ষুষ মিলন কখন ঘটিবে ঠিক বলিতে পারিলাম না। তাঁহাকে আমি গতবারে যেরূপ দেখিয়াছিলাম তাহার তুলনায় এক্ষণে তিনি কিরূপ আছেন আমাকে আর একটু খুলিয়া লিখিবে। তাঁহাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার এবং তোমাদিগকে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ—তোমরা নির্ব্বিঘ্নে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ধর্ম্মপথে অটল থাক—এবং কুশলে থাক—সাংসারিক সম্পদ, বিপদ যেন তোমাদিগকে জয় করিতে না পারে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

"নিষ্ঠুর ধরার বুকে"

শ্রীমীরা ভট্টাচার্য্য

নিষ্ঠুর ধরার বুকে সংসারের রিক্ত পাত্র ভরি
যে প্রেম এনেছ তুমি মন্দারের মধুগন্ধ হতে,
তাহারে কঠিন হাতে নিয়ে যাব আহরণ করি
ভাবিতে বেদনা পাই, নিয়ে যাব বেদনার পথে।
আমার ক্ষমতা ক্ষুদ্র তোমার সে প্রেমের সম্মান
দুঃখের ধরার মাঝে পারিবে না রাখিতে অক্ষত;
অমরাবতীর হেম ধরণীরে কেবা দিল দান,
মানবের প্রাণে তাই বাসা নিল ব্যথিত দুর্গত।

মানুষ যে চিরদিন মরণেরে ভয় করে মরে,
প্রেমের অমৃত-স্বাদ মানুষের হৃদয়-ব্যথায়—
পাবার বাসনা কাঁদে নিশিদিন হারাবার ডরে
দুখের কালিমা-লেখা আঁকা তাই জীবন-খাতায়।
তাই তো মোদের বুকে কাঁদে নিত্য অমর্ত্ত্যের প্রেম
"ভুলিয়া সরণী-রেখা কোথা হতে কোথায় এলেম।"

মৌ-পিঁপড়ের মধুর জালা

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন.

আমরা সচরাচর আমাদের ঘরে ও বাইরে যে-সব পিঁপড়ে দেখতে পাই মৌ-পিঁপড়ে তাদের থেকে আলাদা। এরা ঠিক আমাদের দেশের পিঁপড়েও নয়, অন্ততঃ এখনও পর্য্যন্ত আমাদের দেশে ওদের খোঁজ পাওয়া যায় নি। প্রথম এদের আবিষ্কার করেন ডঃ ম্যাক কুক সাহেব আমেরিকার কোলোরেডো প্রদেশে। এখন মেক্সিকো এবং অষ্ট্রেলিয়ারও কোন কোন স্থানে ওদের খোঁজ পাওয়া গেছে। ওদের আবিষ্কার করতে ম্যাক কুক সাহেবকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। পাথরের তলায় গভীর সুড়ঙ্গের ভিতরে ছিল ওদের বাসা। মুখের দু'পাশের ছোট দুটি দাঁড়া দিয়ে পাথর কেটে পিঁপড়ের পাল সে-সব সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিল কতদিনে তা জানা নেই। সুড়ঙ্গ-বাসার একটি মাত্র মুখ—ভিতরে অন্ধকার। উপর থেকে ভিতরে কোথায় কি আছে তা জানবার কোন উপায় নেই। সুতরাং ম্যাক কুক সাহেবকে বাসা ভাঙতে হ'ল। কিন্তু সে কাজ তেমন সহজ ছিল না—হাতুড়ী, বাটালি, ছেনি, করাত প্রভৃতি লৌহযন্ত্র দিয়ে দিনের পর দিন একটু একটু করে অতি সাবধানে পাথর কেটে তাকে বাসার ভিতরের রহস্য উদ্ঘাটন করতে হয়েছিল। আজ ওদের সম্বন্ধে যে-সব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তা ম্যাক কুক সাহেবেরই চেষ্টার ফল।

মৌ-পিঁপড়ে মধুভক্ত। সবজাতীয় পিঁপড়েই অল্পাধিক পরিমাণে মধু বা মিষ্ট দ্রব্য খেতে ভালবাসে। কিন্তু মৌ-পিঁপড়েরা একান্তই মধুপিয়াসী—মৌমাছির মত মধু ভিন্ন অন্য কোন খাদ্যে ওদের রুচি নেই। মৌমাছির মত ওদের পিঠে ডানা নেই, ওদের গতিও খুব দ্রুত নয়। সুতরাং মধুর জন্য ফুলের ওপর ওদের নির্ভর করা চলে না—ফুল থেকে মধু সংগ্রহের জন্য মৌমাছির সঙ্গে প্রতিযোগিতা না ক'রে ওরা আবিষ্কার করল এক নূতন উপায়। কি করে ওরা এক দিন জানতে পারল, গল-পোকার গা থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তা মধুরই মত মিষ্টি, তেমনি সুস্বাদু।

দিনের বেলায় ওদের বাসা কোথায় তা খুঁজে বের করা শক্ত। গরম দেশ ও মরুবাসী হলেও অত্যধিক সূর্য্যের তাপ ওরা সহ্য করতে পারে না। তাই দিনের বেলায় বাসা থেকে বের না হয়ে স্নিগ্ধ অন্ধকারবেষ্টিত খোপগুলির ভিতরেই ওরা দিন যাপন করে। কিন্তু ঘুমিয়ে বা কুঁড়েমি করেও নয়। আহারের সন্ধানে ওদের সুড়ঙ্গ থেকে উঠে বাইরে আসতে হয়। ভিতরে ওদের অনেক কাজ। গর্তের ভিতরে সুড়ঙ্গ বা ছোট ছোট কুঠরি একটি দুটি নয়। গর্তের ভিতরটি যেন একটি প্রকাণ্ড দুর্গ। তার ভেতরে সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ, কুঠরির পর কুঠরি, ছোট বড় নানা আকারের পথ নানা দিকে চলে গেছে। সুড়ঙ্গগুলি সোজা নেমে গেছে গভীর

গাছের ডালে একাইড বা পিঁপড়ের "দুগ্ধবতী গাভী"

তলদেশে—দু'ধারের দেয়াল দুর্গপ্রাকারের মত খাড়া, জায়গায় জায়গায় ধারে ধারে ছোট ছোট কুঠরি। তার কোনটিতে সদ্যজাত বাচ্চা, কোনটিতে অপেক্ষাকৃত বড় বাচ্চা, কোনটিতে ডিম। এদেরই একটির মধ্যে থাকে রাণী। রাণীর কুঠরিটি অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থানে ও সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত। বাচ্চাগুলিকে তার দিনে বার বার ক'রে খাওয়াতে হয়। ওদের গা পরিষ্কার করে দিতে হয়। কোথাও একটু বেশী ঠাণ্ডা বা গরম বোধ হলে বাচ্চাগুলিকে অন্যত্র সরাতে হয়, নিয়ে যেতে হয় অন্য কুঠরিতে। কুঠরিগুলির কোথাও একটু ময়লা বা ধুলোবালি জমতে পারে না। বাসার বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে থাকবার জন্য নূতন নূতন কুঠরি করবারও প্রয়োজন হয়। তখন নূতন কুঠরি তৈরি করতে হয়, নূতন সুড়ঙ্গ খুঁড়তে হয়—বাসার ভিতরে দিনের বেলায় সর্ব্বক্ষণেই এই সব কাজ চলে। সুতরাং দিনের বেলায় বাসা হতে বের না হলেও ঘরে বসে বসে ওদের বিশ্রাম বা কুঁড়েমি করবার সময় কোথায়?

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ওদের মধুসঞ্চয়ের ব্যবস্থা। মৌমাছি মধুসঞ্চয় করে ওদের চাকে, ছোট ছোট খোপের মধ্যে।

জ্যান্ত জালার মুখ থেকে মধুপানরত কয়েকটি ক্ষুধার্ত্ত পিঁপড়ে

সে চাক ও খোপগুলি ওরা মোম দিয়ে তৈরি করে। এই মোম ওদের গায়েরই নিঃসৃত রস। মৌ-পিঁপড়ের মধু সঞ্চয়ের জন্ত মোম দিয়ে খোপ তৈরি করবার শক্তি নেই। কেননা মৌমাছির মত ওদের গায়ে মোম জমে না; অথচ মৌমাছির মত ওদেরও মধু সঞ্চয় করা প্রয়োজন। বাসায় মধু সঞ্চয়ের ব্যবস্থা না থাকলে, দুর্দিনে অভাবের সময় ওরা কি খেয়ে বাঁচবে? বাচ্চাগুলি মধু ভিন্ন অন্ত খাবার মুখে দেবে না, রাণী মধু খেতে না পেলে ডিম পাড়া বন্ধ করে দেবে। আর কর্ম্মীগুলি? ওদেরও তো খাদ্য এক মধুই। অথচ ফুলের ন্তায় গল-পোকা যেখানে সেখানে বা যখন তখন পাওয়াও যায় না। গল-পোকার মধ্যেও একমাত্র ওক্ গাছের গলের গা হতে নিঃসৃত রসই ওদের খাদ্য। সুতরাং ওক্ বনের শিকারভূমিতে গলের প্রাচুর্য্য যখনই ঘটে তখন বাসার সকল কর্ম্মীরা মিলে যতটা পারে বাসায় সঞ্চয়ের জন্ত গল-পোকার গায়ের রস সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। বাসায় এনে বড় বড় জালাতে সঞ্চয় করে।

জালার কথা বলতেই আমাদের কুমোরের চাকে তৈরি পেটমোটা মাটির বড় বড় জালার কথা মনে পড়ে। কিন্তু মৌ-পিঁপড়ের মধুর জালা সেরূপ নয়, তাদের সে জালা নিজের হাতে তৈরিও করতে হয় না। বাসার ভিতরে যে সব কুঠরিতে জালাগুলি রক্ষিত হয় সেখানে ওগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলে অবাক হতে হয়। সারি সারি জালাগুলি কুঠরির ছাদ থেকে ঝুলছে, মনে হয় ছাদের গায় যেন সারি সারি কতকগুলি বাতির ডুম ঝুলে আছে। ডুমের ভিতরের বাতির ন্তায় জালার ভিতরে মধুর রঙও তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি ঝকঝকে। কিন্তু এ জালা মাটি, ইট, কাঠ, পাথরে তৈরি নয়, এগুলি সবই এক একটি জীবন্ত পিঁপড়ে। বাসার অন্তান্ত পিঁপড়ের ন্তায় ওদেরও আছে হাত, পা, মুখ, মাথা, পেট। জ্যান্ত কয়েকটি পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে তাদের কুঠরির ছাদ। বাসার অন্তান্ত কুঠরির ছাদ যেমন মসৃণ এ কুঠরির ছাদগুলি তেমন মসৃণ নয়। ছাদের দেওয়াল খসখসে। মসৃণ ছাদে পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে ঝুলে থাকা শক্ত হ'ত।

যে পিঁপড়েগুলি ছাদে ঝুলে আছে ওদেরই উদরে উদ্বৃত্ত মধু সঞ্চিত হয়। তাদের প্রত্যেকটিরই উদর এক একটি মধুর জালা—জ্যান্ত জালা। মধুর ভারে উদরটি বিস্তৃত হয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার বেলুনের আকার ধারণ করেছে। পাকা টুসটুসে আঙুরের রসের ন্তায় উদরের মধুর উজ্জ্বল আভা যেন চামড়া কেটে বের হয়ে আসছে। গম্বুজাকৃতি ছাদের গা ওরা পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে—গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে। মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিচ্ছে, মাথা নাড়ছে, কাঁধ এদিক ওদিকে নড়ছে, কিন্তু পায়ের অবলম্বন কিছুতেই খসছে না। একবার পা আলগা হয়ে নীচে পড়ে গেলে আর উপরে ওঠবার উপায় নেই। যে স্থানে পড়ে সেই স্থানেই চিৎ হয়ে ব্যাকুল ভাবে হাত, পা, মাথা নাড়তে থাকে। অনেক সময় উপর থেকে পড়ে গিয়ে অন্তদের চলার পথও বন্ধ করে দেয়। সে পথ দিয়ে চলতে গিয়ে পথে বাধা পেয়ে বাসার অন্তান্ত পিঁপড়েরা পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কেউ এসে ওকে উপরে ছাদের গায়ে তোলবার চেষ্টা বা কোন রকম সাহায্যও করে না। এক মাস, দু-মাস এমন কি তিন মাস কালও ওরা সেই একই স্থানে একই ভাবে পড়ে থাকে। অন্তান্ত পিঁপড়েরা পাশ দিয়ে যাবার সময় জিব দিয়ে চুষে চুষে গা পরিষ্কার করে দেয়, গায়ে শুঁড় বুলিয়ে বুলিয়ে আদরও জানায়। হয় ত দীর্ঘকাল দিনরাত্রি ক্রমাগত ঝুলে থাকার পর এই নূতন অবস্থায় ওরা একটু আরামও বোধ করে। আরামই বোধ করুক অথবা জ্বালা-যন্ত্রণাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুতেই সবকিছুর অবসান হয়।

কখন কখন ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে জালাটি যে ফেটেও না যায় তাও নয়। তখন মধু ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এত দিনের সযত্নে রক্ষিত মধুর শেষ পরিণাম এরূপ হবে, বেচারা জ্যান্ত জালাটি হয় তো কখনো ভাবে নি। কিন্তু ওর আর কিছুই করবার নেই। জালা ফাটবার শব্দ হয় তো বাসার অন্তান্ত পিঁপড়ের কানে গিয়ে পৌছয়, হয় তো বা গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে একটি দুটি করে সেদিকে আসতে থাকে। নাক তুলে এদিকে ওদিকে শুঁকতে থাকে। অচিরেই বুঝতে পারে বাসার বহু দিনের সঞ্চিত সম্পদ মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সেই সম্পদ চেটে চুষে খাবার জন্ত তখন তাদের সে কি ব্যগ্রতা। একটু একটু করে নিঃশেষে সবটুকুই ওরা পান করে নেয়। কিন্তু এ শুধু পান করবারই আনন্দ—এর একটু স্বাদ, একটু গন্ধেই ওরা সন্তুষ্ট। নিজেদের খাদ্যরূপে এর অতি সামান্তই ওরা

পিঁপড়ের বাসার ছাদে লম্বিত জ্যান্ত জালার সারি

উদরে গ্রহণ করে। খাদ্যসংগ্রহের জন্য ওদের উদরে দুটি করে থলে থাকে। একটি থলেতে ধর্ম্ম-গোলার ন্যায় বাসার সকলের জন্য মধু সংগ্রহ করা হয়। সে মধু ওক্ গাছের গল-পোকার মধুই হোক্, কিম্বা ওদেরই পূর্ব্বে সংগৃহীত জালার পেট থেকে ঝরে-পড়া মধুই হোক। ধর্ম্ম-গোলাটি মধুতে ভরে গেলেই পেটের জালাগুলি যে ঘরে আছে সে ঘরে ওরা সোজা চলে আসে। তার পর একে একে ছাদে উঠে উদরের ধর্ম্ম-গোলায় সংগৃহীত সবটুকু মধুই জীবন্ত জালার উদরে ঢেলে দেয়।

পূর্ব্বেই বলেছি দিনের বেলায় মৌ-পিঁপড়ে বাসায় নানা কাজে ব্যাপৃত থাকে। সন্ধ্যা হলেই ওরা একে একে বের হয় মধু আহরণের জন্য। মধু সংগ্রহের জন্য ওদের বেশী দূরে যেতে হয় না—বাসার নিকটেই ওদের মধু-ক্ষেত্র ওকের বন। ছোট ছোট ঝোপগুলি কচি পাতায় ভরে গেছে। তারই পাতায় পাতায় ডালে ডালে গল-পোকার বাসা। সন্ধ্যা হতে না হতেই ওরা বাসা থেকে বের হতে থাকে। দেখতে দেখতে বাসার মুখ ও তার চারধার পিঁপড়ের পালে ছেয়ে যায়। একটু পরেই দেখতে পাওয়া যায় সার বেঁধে সকলে চলেছে ওক্ বনের দিকে। এ পথ ওদের অপরিচিত নয়, আগে মধু নিয়ে এ পথে বহু বার ওরা আনাগোনা করেছে। এক বৃহৎ সৈন্য-বাহিনীর মত নির্দ্দিষ্ট গতিতে পথ অতিক্রম করে একে একে সকলে এসে ওকের বনে প্রবেশ করে। মধু আহরণের জন্য তখন তাদের সে কি আনন্দ, সে কি উল্লাস! ওদের সন্ধানী দৃষ্টি ওক্ ঝোপের প্রতি ডালে, প্রতি পাতায় খুঁজে বেড়ায় গল্-পোকার বাসা। উদরের ধর্ম্ম-গোলাটি ক্রমশঃ মধুতে ভরে উঠতে থাকে। রাত ১২টা ১টা অবধি এই ভাবে মধুর সন্ধান চলে। তার পরেই সুরু হয় বাসায় ফিরবার পালা। ফিরবার পথে সৈন্যবাহিনীর নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষিত হতে পারে না। মধুর ভারে অনেকের গতি ধীরমন্থর, সংযত হয়ে আসে। যাদের উদর হালকা, যারা মধুতে পেট ভর্ত্তি করতে সমর্থ হয় তারা আগে আগে ছুটে চলে আসে। বাসার দিকে যতই ছুটে চলে আসুক না, বাসায় ঢোকবার পূর্ব্বে কিন্তু একবার গর্ত্তের মুখের কাছে তাদের সকলকেই দাঁড়াতেই হয়। সেখানে দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে ঢোকবার জন্য দ্বারপালকে প্রত্যেকেরই ছাড়পত্র দেখাতে হবে। দ্বারপাল মুখের দু'ধারের দুটি শুঁড় প্রত্যেকের গায়ে বুলিয়ে পরীক্ষা করে গায়ের গন্ধ নেবে। গায়ের গন্ধ দিয়ে ওরা বুঝতে পারে কে শত্রু, কে মিত্র। প্রতি বাসার পিঁপড়ের গায়ে থাকে একটি বিশেষ গন্ধ। গায়ের সেই গন্ধটিই ওদের ছাড়পত্র।
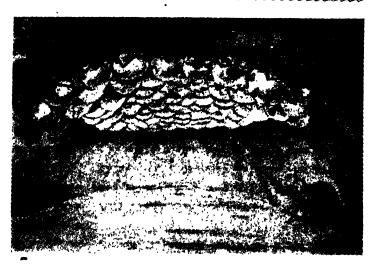
এর মধ্যে ভিতরে সাড়া পড়ে যায় মধু-আহরণকারীরা সব ফিরে এসেছে। পিঁপড়ের দল ঠেলাঠেলি করে ভিড় করে এসে দাঁড়ায় গর্ত্তের মুখের কাছটিতে। সকলেই তাদের ভারমুক্ত করতে ব্যস্ত। মুখের কাছে মুখ এনে হাঁ করে দাঁড়াতেই আহরণকারীরা এক এক ফোঁটা মধু তাদের মুখের ভিতরে ঢেলে দেয়। সেই মধু সবই সঞ্চিত হয় জ্যান্ত জালার মধ্যে দুঃসময়ের জন্য। যারা নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত তারা সঙ্গে সঙ্গে দু-এক ফোঁটা পানও করে।

ওদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় কতকগুলোর ক্ষুধা যেন আর কিছুতেই মিটছে না। ফোঁটার পর ফোঁটা মধু গলাধঃকরণ করেই যাচ্ছে। উদরটি মধুর ভারে বেশ ফুলে উঠেছে, তবু যেন ওদের তৃপ্তি নেই। মধুর আশায় কেবলই ওরা হাঁ করেই আছে—আহরণকারীরাও ফোঁটার পর ফোঁটা ওদের মুখে ঢেলেই দিচ্ছে। ওরা জানে এ মধু ভবিষ্যতে ওদেরই কাজে লাগবে, ভবিষ্যতে এরাই হবে মধুর এক একটি জ্যান্ত জালা—কারও আদেশে নয়, কারও প্ররোচনাও নয়, নিজেদেরই ইচ্ছায়। মধুর জালা হয়ে ছাদে আশ্রয় নেবার পূর্ব্বে নিজেদের উদরগুলিকে ওরা একবার উত্তমরূপে ভরতি করে নেয়, তারপর যেমন মধু ক্ষয় হয় তেমনি সেই ক্ষয় পূরণ হতে থাকে বাসার কর্ম্মী-পিঁপড়েদের দ্বারা।

পরবর্ত্তী সারা জীবনই ছাদে লম্বমান হয়ে ওরা বৎসরের পর বৎসর একই অন্ধকার কুঠরিতে একই অবস্থায় ঝুলে থাকে। মধুর ভারে উদরের বিস্তৃতি প্রায় আট দশ গুণ বেড়ে যায়। এই বৃহৎ ভারটি নিয়ে ছাদ থেকে ঝুলে থাকবার একমাত্র

অবলম্বন পায়ের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কয়েকটি থাবা বা নখ। কখন কখন কারোর উদরটি শূন্য হলে সে নীচে নামবার সুযোগ পায়। কিন্তু এরূপ সৌভাগ্য খুব অল্পই ঘটে।

বৎসরের পর বৎসর কেটে যায়, ঋতুর পর ঋতু আসে, বাসার কর্মীদের মুখে মধুর প্রাচুর্য্য থেকে ওরা বুঝতে পারে বাইরে এবার ওকের ডালে পাতায় নূতন নূতন গল-পোকার বাসা হয়েছে, এবার উদরে মধু সঞ্চয় হবে। আবার শীত আসে, গলের বাসা শুকিয়ে যায় মধুর প্রাচুর্যও কমে আসে। এবার উদরের মধু ক্ষয় হবে, এবার ওদের মধু বিতরণের পালা। প্রতি বাসায় আট-দশটি করে কুঠরি থাকে মধুর জ্যান্ত জালাগুলির অবস্থানের জন্য আর প্রতি কুঠরিতে থাকে ৩০টি বা ততোধিক জালা।

আকস্মিক ঘটনায় না হলেও জরা-ব্যাধির আক্রমণে এদেরও একদিন মৃত্যু ঘটে। প্রাণ হারিয়েও ওরা ছাদেই ঝুলে থাকে। পিঁপড়েরা যখন মধু নিতে এসে দেখতে পায় জালাটি প্রাণহীন, তখন তাকে ছাদ থেকে নামানো হয়। প্রথমে উদরের অংশটি কেটে নীচে নামানো হয়—বৃহৎ ভার, কাঁধ দিতে হয় অনেককে। একবার নীচে নামানো হলে গড়িয়ে গড়িয়ে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতি বাসাতেই একটি করে সমাধিক্ষেত্র থাকে। জালাটি তেমনি মধুতে ভরা, মধুর স্বাদ এবং গন্ধও পূর্ববৎ। কত শিশু, কত কর্মী, কত রাণীর খাদ্য তার মধ্যে বোঝাই হয়ে আছে। কিন্তু কেউ তাতে হাত দেবে না—মধুর লোভে মৃতদেহকে খণ্ডিত করে কখনও তাকে ওরা অপবিত্র করে না। এ যেন সমাধিক্ষেত্রে উৎসর্গীকৃত দেবভোগ। এর উপর এখন ওদের আর কোন দাবি নেই। সমাধিক্ষেত্রে পাশাপাশি এরূপ অনেক জালা দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলি যেমন উজ্জ্বল তেমনি সোনালী মধুতে ভরা।

গল-পোকার গায়ের রসের ন্যায় একাইড বা জাব-পোকার গায়ের রসও পিঁপড়ের একটি অতি প্রিয় খাদ্য। একাইডকে পিঁপড়েদের দুগ্ধবতী গাভীও বলা হয়। গাইয়ের বাঁটের দুধের ন্যায় পিঁপড়েরা একাইডের পিঠ থেকে রস দোহন ক'রে পান করে। দোহন করবার যন্ত্র ওদের মুখের শুঁড় দুটি। সেই শুঁড় দিয়ে একাইডের পিঠে সুড়সুড়ি দিলেই রস নির্গত হয়। মৌ-পিঁপড়ে সেই রসধারা বা দুগ্ধ পেট ভরে পান ক'রে বাসায় নিয়ে এসে ওদের জ্যান্ত জালায় জমায়। বনে বুনো গোলাপ ফুটলে তার মধ্যে এক জাতীয় জাব-পোকার আবির্ভাব হয়। তখন মৌ পিঁপড়ের দল ওক বনের দিকে না গিয়ে একাইডের রস দোহন ক'রে মধু সংগ্রহ করতে গোলাপের বনে আসে। একাইডের গায়ে এরা রস পায় প্রচুর—এক একটি একাইডের গা থেকে ওরা দিনে প্রায় ত্রিশ ফোঁটা ক'রে রস দোহন করতে পারে। এই একাইড বা এদের দুগ্ধবতী গাভীগুলিকে এরা সযত্নে পালন করে।

কেন্দ্রীয় রাজস্বনীতি ও পশ্চিম বঙ্গের দাবি

শ্রীমনকুমার সেন

কেন্দ্রের সহিত প্রদেশসমূহের আর্থিক সম্বন্ধ নিরূপণ করা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান সমস্যা। ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রে এই সম্বন্ধের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা না থাকায় কেন্দ্রের সহিত প্রদেশগুলির আর্থিক সম্পর্ক লইয়া বহু বার বহু ভাবে তিক্ততা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় রাজস্ব-নীতির এই ত্রুটি ও গলদ প্রকারান্তরে প্রদেশগুলিকে আদায়ীকৃত রাজস্বের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কৃপাদৃষ্টি ও সুবিবেচনার উপর প্রদেশগুলির অর্থনৈতিক বিন্যাসকে নির্ভরশীল করিয়া রাখিয়াছে। বলা বাহুল্য, এইরূপ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত বণ্টন-ব্যবস্থা জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল। শুধু প্রদেশগুলিরই নহে, পরোক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিও এই ত্রুটিপূর্ণ নীতির ফলে হ্রাস পাইতেছে। ব্রিটিশ সরকারের তাঁবেদাররূপে পরাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট শাসন ও শোষণের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই প্রদেশগুলিকে যথাসম্ভব কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার ফলে যে প্রদেশে কেন্দ্রের যতটুকু কৃপাবর্ষণ হইয়াছে সেই প্রদেশ ততটুকু আর্থিক সঙ্গতিলাভ করিয়াছে, পর্য্যাপ্ত পাওনার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহা না পাওয়ায় কোন প্রদেশই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ উন্নয়নমূলক আর্থিক পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় নাই। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে এই ত্রুটির সংশোধন ও রাজস্ব সম্পর্কে প্রদেশগুলির পাওনার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ পরিষদে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এই বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁহার আনীত একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদ গ্রহণ করেন। প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই : "ভারতের খসড়া শাসনতন্ত্র এমনভাবে সংশোধিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে

প্রদেশগুলিকে রাজস্বের ব্যাপারে ভারতীয় পার্লামেন্টের ভোটাভুটির অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করিয়া না থাকিতে হয়, এবং প্রতি বৎসর কেন্দ্রের সম্মতি ও অনুমোদন সাপেক্ষ না রাখিয়া প্রদেশগুলির প্রাপ্য আয়কর সম্পর্কেও শাসনতন্ত্রে সুনির্দ্দিষ্ট বিধান থাকে।" প্রস্তাবটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ ইহার সহিত জড়িত।

১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রে ভারতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শ নির্দ্ধারিত হওয়ার পর প্রদেশসমূহের পক্ষ হইতে রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্ব্বণ্টনের জন্য দাবী জানানো হয়। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীসভা গঠিত হইলে এই দাবি প্রবলতর হয়। ভূমিরাজস্ব ব্যতীত প্রদেশগুলির উল্লেখযোগ্য কোন আয়ের উৎস না থাকায় মন্ত্রীসভা চালু হইবার পর প্রায় সকল প্রদেশেই বিক্রয়কর, শিক্ষাকর, কৃষি-আয়কর প্রভৃতি নূতন নূতন কর প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে; পক্ষান্তরে আয়কর, আমদানী-রপ্তানী শুল্ক, যানবাহন, ডাকবিভাগ প্রভৃতি সম্প্রসারণশীল আয়ের উৎসগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারভুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াও কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি যাবতীয় জাতিগঠনমূলক কর্ম্মের দায়িত্ব প্রদেশগুলির স্কন্ধে চাপানো হয়। এই দায়িত্ব পালনের জন্য কেন্দ্র হইতে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয় বটে, কিন্তু ঘাটতি প্রদেশরূপে পরিগণিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের প্রত্যাশী হইয়া থাকিতে কোন কোন প্রদেশ অসম্মত হয়। অধিকন্তু বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশ এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করে যে, আয়কর প্রধানতঃ এই দুইটি প্রদেশ হইতে আদায় করা হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন। অন্যান্য প্রদেশগুলিও এক বা একাধিক যুক্তি দেখাইয়া তাহাদের আপত্তি জ্ঞাপন করে। এই সমস্ত দাবির তীব্রতায় বাধ্য হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত করেন এবং স্যার অটো নিমেয়ারের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের সুপারিশগুলি উত্তরকালে 'নিমেয়ার সিদ্ধান্ত'রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কমিশন 'তুলা ও পাট রপ্তানী-কর' এবং 'আয়কর' সম্পর্কে পরিবর্ত্তনের সুপারিশ করেন। এইরূপ প্রস্তাব করা হয় যে, উক্ত দুইটি পণ্যের রপ্তানীকারী বন্দর-যে যে প্রদেশে অবস্থিত সেই সেই প্রদেশ উহাদের রপ্তানী-শুল্ক-লব্ধ রাজস্বের একটি অংশ পাইবে। এই ব্যবস্থার ফলে বাংলা ও বোম্বাই কিঞ্চিৎ সুবিধার অধিকারী হয়। আয়কর সম্বন্ধে কমিশন সিদ্ধান্ত করেন যে, আয়কর যে প্রদেশ হইতে আদায়ীকৃত হইবে, আদায়ের পরিমাণ ও লোকসংখ্যার আনুপাতিক বিচার করিয়া সেই প্রদেশকে আয়কর-লব্ধ রাজস্বের একটি অংশ প্রদান করা হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আয়করের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রের জন্য সংরক্ষিত রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ প্রদেশগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত হারে বণ্টন করা হয়:—

প্রদেশ	শতকরা হার
বোম্বাই	২০
বাংলা	২০
মাদ্রাজ	১৫
যুক্তপ্রদেশ	১৫
বিহার	১০
পঞ্জাব	৮
মধ্যপ্রদেশ	৫
আসাম	২
সিন্ধু	২
উড়িষ্যা	২
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১

উল্লিখিত হিসাব দৃষ্টে বুঝা যাইবে, দাবি নির্দ্ধারণের নীতির বিচারে প্রদেশগুলির জন্য যে হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা যুক্তিসহ হয় নাই। তাহা ছাড়া যে সকল ঘাটতি প্রদেশ পূর্ব্ব হইতেই কেন্দ্রীয় আর্থিক সাহায্যের অধিকারী বলিয়া স্থির হইয়াছে, পুনরায় তাহাদের রাজস্ব পুনর্ব্বণ্টনের অন্তর্ভুক্ত করাও সঙ্গত হয় নাই। শুধু ইহাই নহে, তদানীন্তন বাংলার জনসংখ্যা বোম্বাইয়ের প্রায় তিন গুণ থাকা সত্ত্বেও রাজস্বের ব্যাপারে উভয় প্রদেশকে সমশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। রাজস্ব-নীতির গলদ প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল। স্বাধীন ভারতের খসড়া শাসনতন্ত্র রচনাকারী কমিটি এই বিষয়ে অনবহিত ছিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহারা দেশের বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থার অজুহাতে পূর্ব্বব্যবস্থাই আরও পাঁচ বৎসর-কাল বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কমিটির এই সিদ্ধান্তের ফল এই দাঁড়াইবে যে, কেন্দ্রের রাজস্ব আদায়ের প্রশস্ত পন্থা বিদ্যমান থাকিলেও প্রদেশগুলিকে পর্য্যাপ্ত অর্থের অভাবে প্রতিপদে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া আর্থিক সাহায্যের জন্য কেন্দ্রের দ্বারস্থ হইতে হইবে। নিজেদের প্রাপ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত ও নিঃসংশয় হইতে না পারিলে প্রদেশগুলির পক্ষে কোন বৃহৎ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ঝুঁকি লওয়া সম্ভব নহে, সঙ্গতও নহে। আমরা বিশেষরূপে পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলিতেছি। ভারত-বিভাগ ও তাহার অনিবার্য্য পরিণতিস্বরূপ বঙ্গ-বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ একটি অতি ক্ষুদ্রায়তন প্রদেশে পরিণত হইয়াছে—খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সর্ব্বোপরি আশ্রয়-প্রার্থী সমস্যায় এই প্রদেশ যৎপরোনাস্তি বিব্রত। বহু টালবাহানার পর কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বসতির দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন সত্য, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্পর্কে তাহাদের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের উপরই বর্ত্তাইয়াছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টকে যদি

কেবলই কেন্দ্রের কৃপাপ্রার্থী হইয়া থাকিতে হয় এবং কেন্দ্রের আদায়ীকৃত রাজস্বে তাঁহাদের পাওনা সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা না থাকে তাহা হইলে প্রকারান্তরে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। শুধু ইহাই নহে, কেন্দ্রে যে প্রদেশের যতটুকু প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা আছে তদনুযায়ীই সেই প্রদেশের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হইবে না এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। ইতিমধ্যেই নানা কারণে প্রদেশগুলির পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতার অভাব ঘটিয়াছে, তদুপরি কেন্দ্রের রাজস্ববণ্টনে উক্তরূপ অবাঞ্ছনীয় বৈষম্য আরও তিক্ততার সৃষ্টি করিবে সন্দেহ নাই। অথচ শাসনতন্ত্রে রাজস্ববণ্টন সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট বিধান থাকিলে, তদনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশ পৃথক পৃথক ভাবে আদায়ীকৃত রাজস্বের অংশ লাভ করিবে, কাহারও কোন অভিযোগের কারণ থাকিবে না।

এই সকল সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য ভারতীয় গণ-পরিষদের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ একটি অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ সমিতি নিয়োগ করিয়াছিলেন। অভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত এই সমিতি রাজস্ববণ্টন বিষয়ে শাসনতন্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকাই সঙ্গত এরূপ সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত হইয়াছি। বিস্ময়ের বিষয়, সমিতির সুপারিশসমূহ মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করিয়াও কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্বের নির্দ্দিষ্ট হার এমনভাবে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন যদ্দ্বারা পশ্চিমবঙ্গকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন করা হইয়াছে। নূতন ব্যবস্থা এইরূপ :—

প্রদেশ	শতকরা হার
বোম্বাই	২১
পশ্চিমবঙ্গ	১২
মাদ্রাজ	১৮
যুক্তপ্রদেশ	১৯
বিহার	১৩
মধ্যপ্রদেশ	৬
পূর্ব্ব-পঞ্জাব	৫
আসাম	৩
উড়িষ্যা	৩

অর্থাৎ বাংলার প্রাপ্যকে প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ হ্রাস করিয়া তদ্দ্বারা অন্যান্য কতিপয় প্রদেশের উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ আয়তনে অবিভক্ত বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশে পরিণত হইয়াছে, সম্ভবতঃ এই একমাত্র স্থূলদৃষ্টিকোণ হইতেই পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করা হয়। অথচ বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কয়েক গুণ অধিক এবং বাংলা হইতে যে রাজস্ব আদায় করা হইত, সেই বাৎসরিক আয়করের প্রায় সমস্তটাই বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ হইতে আদায় করা হইতেছে। কাঁচা পাটের প্রধান অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গ-বহির্ভূত এলাকায় পড়িলেও চটকলগুলি সম্পূর্ণরূপে এই প্রদেশে অবস্থিত। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পাট-জমির অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের এলাকার অধীন। যে ৫৪ লক্ষ টাকা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আদায় হইত তাহা পশ্চিমবঙ্গের ৬ কোটি টাকার তুলনায় এতই নগণ্য যে তজ্জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য রাজস্ব শতকরা ২০ ভাগ হইতে ১২ ভাগে হ্রাস করিবার পশ্চাতে কোন যুক্তি নাই। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা বর্ত্তমানে বোম্বাই অপেক্ষা অনেক বেশী। অধিকন্তু ভারতীয় ইউনিয়নের সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় এই প্রদেশের কতকগুলি নিজস্ব সমস্যাও রহিয়াছে যাহার সমাধানের উপর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ নির্ভর করে। এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য হ্রাস করা অসঙ্গত ও অসমীচীন এবং বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রতিকূল। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য রাজস্বের হার পূর্ব্বাপেক্ষাও বর্দ্ধিত করিয়া, পরিষদের গৃহীত প্রস্তাবে প্রস্তাবকলিত পশ্চিমবঙ্গবাসীর ন্যায্য দাবি সামগ্রিকভাবে স্বীকার করিয়া লইবেন ইহাই আমরা আশা করি।

অচেনা

শ্রীশান্তশীল দাশ

হে অচেনা, তোমায় আমি চিনবো কেমন করে,
আসবে কিগো, অরুণ বরণ উজল রথের 'পরে,
আসবে কিগো, নদীর বুকে সোনার তরী বেয়ে,
আসবে কিগো রূপের আভার সারা আকাশ ছেয়ে,
আসবে কিগো নৃত্য-পাগল কাল-বোশেখীর সনে,
আসবে কিগো শাওন-মেঘে অঝোর বরিষণে,
আসবে কিগো শিউলি-ঝরা শিশির-ভেজা প্রাতে,
আসবে কিগো দখিন বায়ে ফুলবালাদের সাথে,
আসবে কিগো ভোরের আলোয় পাখীর গানে গানে,
আসবে কিগো সাঁঝের বেলা নদীর কলতানে,
আসবে কিগো ঘুমের মাঝে নীরব নিঝুম রাতে,
নাম-না-জানা স্বপনপুরীর রাজকন্যার সাথে।
হে অচেনা, তোমায় আমি চিনবো কেমন করে,
জানি না হায়, আসবে কখন, কোন মুরতি ধরে।

সংস্কার

শ্রীহেমেন্দ্র মল্লিক

রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে।

মিলিটারী ক্যান্টিনের পাশের ঘরে চুপচাপ বসিয়া আছি রাত্রি সাড়ে দশটা হইতে। বাহিরে চতুর্দ্দিক প্রগাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিলেও চট্টগ্রামের এই পার্ব্বত্য সেনানিবাসটির প্রতি অংশেই সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মব্যস্ততার চাপা আভাস ক্ষণে-ক্ষণেই পরিস্ফুট হইতেছিল।

বিশ্রামাগারের বড় টেবিলখানার একদিকে আমি বসিয়া আছি। সম্মুখে সিগারেটের টিন এবং খালি কফির পেয়ালা। মাথার উপরে কালো কাপড়ে ঢাকা বিদ্যুতের আলো। টেবিলের আশেপাশে দুই-এক হাত পরিমিত স্থানটুকু জুড়িয়া মাত্র সে আলোকের রাজত্ব। বিমান আক্রমণ ও আত্মরক্ষার সামরিক বিধান অনুযায়ী কক্ষের বাহিরে আলো প্রতিফলিত হওয়া তো দূরের কথা, বাহির হইতে জানালা বা দ্বারপথে সে আলো দৃষ্টিগোচর হওয়াও গুরুতর অপরাধ।

আধ-আলো ও আধ-অন্ধকার এই ঘরখানিতে একই ভাবে বসিয়া আছি প্রায় তিন-চার ঘণ্টা। আরও কতক্ষণ এই ভাবে থাকিতে হইবে জানি না তবে আরব্ধ কার্য্য অর্দ্ধপথে ত্যাগ করা এবং মানসিক দৃঢ়তাকে বিসর্জ্জন দিয়া পরাজয় স্বীকার করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

যেকব ছত্রির অমানুষিক গাম্ভীর্য্যের প্রাচীর আমি ভাঙিবই। যেকব ছত্রি জাতিতে নেপালী—ধর্ম্মবিশ্বাসে খ্রীষ্টান। তাহার বয়স আন্দাজ ত্রিশ-বত্রিশ। বলিষ্ঠ ও অসমসাহসী যেকব ছত্রি আমাদের সেনানিবাসের একটি রত্ন। বিমান-মারা কামানের গোলা ছুড়িতেই যে তাহার একমাত্র দক্ষতা তাহা নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী অরণ্য-সংঘর্ষ, সঙ্গীনের সংঘাত ইত্যাদিতে কৃতিত্বপ্রদর্শন এবং বোমার আগুন নিভানোতেও তাহার মত ক্ষিপ্রগতি সাহসী সৈনিক আমাদের ছাউনীতে বিরল। অতএব, যেকব ছত্রি সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র। তাহার বর্ত্তমান দুর্ঘটনা ও বিপর্য্যয়ে সকলেই ব্যথিত, শোকগ্রস্ত ও উৎকণ্ঠিত।

যেকব ছত্রির জন্যই আমাকে এইভাবে বসিয়া বসিয়া রাত্রি যাপন করিতে হইতেছে। তাহাকে এই সময়ে বিশেষরূপে চোখে চোখে রাখিতে না পারিলে তাহার সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। উচ্ছ্বাসপ্রবণ পার্ব্বত্য আদিম জাতির মানুষ সে। শিক্ষা, সভ্যতা ও মিশনরী প্রভাবের দ্বারা যথেষ্ট ভদ্র, মার্জ্জিত ও নিয়ন্ত্রিতস্বভাব হইলেও এতবড় শোকের আঘাতকে সম্পূর্ণরূপে সামলাইয়া উঠা তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রতিকষ্টে দাঁড়াইয়া থাকা তাহার এই অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের বাঁধ যে-কোন মুহূর্ত্তেই ভাঙিয়া ধ্বসিয়া যাইতে পারে এবং সেই উন্মাদ অসংযমের সন্ধিক্ষণে তাহার দ্বারা সবকিছুই সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। আত্মহত্যা করা অথবা নিজের বন্দুক লইয়া অফিসার ও সাধারণ কর্ম্মচারী নির্ব্বিশেষে যাহাকে-তাহাকে হত্যা করা—কিছুই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

হাতঘড়িতে সময় দেখিলাম—দুইটা বারো। আর একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিতেছি এমন সময়ে কক্ষের মধ্যবর্ত্তী দ্বারপথে একটা অস্পষ্ট পদধ্বনি শোনা গেল। একটু পরেই নার্স ইথেল সন্তর্পণে কক্ষমধ্যে আসিয়া কহিল, আর কফি লাগবে, রেভারেণ্ড?

কহিলাম না, ঘণ্টাখানেক পরে হলেই চলবে।

নার্স ইথেল সাবধানে যেকবের দিকে ইঙ্গিত করিয়া নিম্ন-স্বরে প্রশ্ন করিল, কথা বলেছে একটাও?

না, তবে সাড়া দিয়ে মাথা নেড়েছে কয়েকবার।

একটা সিগারেট দিয়ে দেখুন না?

সে সমস্তই হয়ে গেছে নার্স। চিন্তা ক'রো না, সমস্ত রাতই আমি জেগে বসে থাকবো ওর জন্য।

২

দুই সপ্তাহের ছুটিতে কলিকাতায় গিয়াছিলাম। যে-দিন ফিরিয়া আসিলাম সেই দিনই ঘটিল যেকব ছত্রির এই দুর্ঘটনা। বেচারা ক্ষুদ্র একটি অগ্রবর্ত্তী বাহিনী লইয়া চল্লিশ মাইল দূরে এক পাহাড়ের জঙ্গলে গিয়াছিল শত্রুপক্ষের গুপ্ত ঘাঁটি আক্রমণ ও ধ্বংস করিতে। একটার জায়গায় দুই-তিনটি ছোট ও বড় ঘাঁটি বিধ্বস্ত করিয়া এবং কয়েকটি বন্দী লইয়া নিজের ছাউনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সে সংবাদ পায় যে, ষাট মাইল উত্তরে পাহাড়ের ধারে অবস্থিত নেপালী গ্রামখানি শত্রুর বিমান আক্রমণে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। যেকব ছত্রি বিশ্রাম করিবার জন্য কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়াই ছুটিল সেই গ্রামের উদ্দেশে। বেচারা তখনও আশা করিতেছিল যে, নব-পরিণীতা তরুণী বধূ, বৃদ্ধা মাতা ও নাবালক ভ্রাতা—তার জীবনের এই তিনটি শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, পরম আত্মীয়কে সে হয়তো তখনও ছুটিয়া গিয়া প্রাণে বাঁচাইতে সক্ষম হইবে। কিন্তু প্রাণে বাঁচানো দূরে থাক, তাহাদের ঘরখানির চিহ্নমাত্রও সে সারাদিন খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে, পাহাড় ও প্রান্তরে—খুঁজিতে কোথাও সে বাকী রাখে নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ হতাশ হইয়াই তাহাকে ফিরিতে হইল।

চট্টগ্রাম বন্দরে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই এ সংবাদ

পাইয়াছিলাম। ছাউনীতে আসিয়া আরও শুনিলাম যে, ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য অনেকেই নানাভাবে প্রবোধ দিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে যেকব ছত্রির এই অসাধারণ ও অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যকে ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে স্বাভাবিক ও সহজ অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে, কিন্তু নিদারুণ শোকাহত যেকব ছত্রি অফিসারের সিগারেট, ক্যাপ্টেনের হুইস্কী অথবা তরুণী নার্সদের সহাস্য নিমন্ত্রণ—কিছুতেই যেন আকৃষ্ট হইবার মত কিছু খুঁজিয়া পায় নাই।

ছাউনীর সর্ব্বত্র সংবাদটা ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা শোকের ছায়া নামিয়া আসিল। সাহস ও শক্তি এই দুটির জন্য সেনানিবাসে যেকব ছত্রির বন্ধু ও গুণমুগ্ধের অভাব ছিল না। বিমান আক্রমণের চরম সঙ্কট-মুহূর্ত্তে—যখন উচ্চ ও নিম্নপদস্থ সমস্ত অফিসার ও কর্ম্মচারীই অল্প-বিস্তর ভীত ও উত্তেজিত হইয়া অপেক্ষা করিতেন, সে সময়ে বিমান-মারা কামানের পিছনে দাঁড়াইয়া সমস্ত ছাউনীকে একাধিক বার রক্ষা করিয়াছে যেকব ছত্রি একাই! একই রাত্রে দুই বার আক্রমণের সময়ে শত্রুপক্ষের দুইখানি বিমান ভূ-পাতিত করার পর হইতেই যেকব ছত্রিকে আপনার করিয়া লইয়াছে ছাউনীর সকলেই, হাসপাতালের সাত-আট জন নার্সও তাহার একান্ত অনুগত হইয়া উঠিয়াছিল। কে জানে, তাহাদের বিচারে যেকব ছত্রিই সম্ভবত একমাত্র বীর-পুরুষ।...

সকল চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হইয়াছে তখনই আমি আসিয়া পড়িলাম। বয়সে প্রবীণ না হইলেও ছাউনীর খ্রীষ্টান কর্ম্মচারী ও অফিসারদের সমস্ত ধর্ম্মকৃত্যে পৌরোহিত্য করার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। অতএব খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী যেকব ছত্রিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার ভারও পড়িল আমারই উপরে। কেননা সকলের মতে যেকবের অসুস্থতাটা মানসিক এবং সে চিকিৎসায় আমিই নাকি একমাত্র ভরসা!

প্রথমে আমার নিজের জীপে করিয়া তাহাকে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইলাম। ভাবিলাম মুক্ত বায়ুতে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কিছুক্ষণ থাকিলে বেচারার মানসিক উদ্বেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইবে। তারপরে একে একে মিলিটারী ক্যান্টিন, ষ্টেশনারী ষ্টোরস্, ডান্সিং হল এবং জিমনাষ্টিক গ্রাউণ্ড—সর্ব্বত্রই তাহাকে লইয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিলাম। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর কশাঘাতে মুহ্যমান যেকবকে তাহার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও নিস্তব্ধতার আবরণ হইতে যে-কোন উপায়ে একবার মুক্ত করিতে পারিলেই যে জটিল সমস্যার অনেকটা সরল হইয়া যাইবে—ইহা নিশ্চিত বুঝিয়াই নিজের বিশ্রাম ও স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে লইয়া সারাটা সন্ধ্যা এখানে-ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেলেও যেকব ছত্রির মুখমণ্ডলে কোন প্রকার সজীব ভাবের লক্ষণ দেখা গেল না। সম্মোহিত ব্যক্তির মত নিষ্পন্দ হইয়াই সে আমার পাশে বসিয়া রহিল। তাহাকে সিগারেট দিয়াছি মাথা নাড়িয়া সে জানাইয়াছে—খায় না! সিগারেট না খাইলেও মাথা নাড়ার সাড়া পাইয়া উৎসাহিত ভাবে পরবর্তী ধাপ হিসাবে নিজে পাত্রী হইয়াও তাহাকে সহাস্যে হুইস্কী অফার করিলাম। তৃতীয় বার বলার পরে যেন পাষাণ-মূর্ত্তিতে প্রাণের সাড়া জাগিল। ছোট ছোট দুইটি চক্ষু সে আমার পানে নিবদ্ধ করিয়া আর একভাবে পুনরায় মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, এখন ইহাতে তাহার প্রবৃত্তি নাই। পুনরায় জীপে চড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আর বেড়াতে চাও, যেকব?

পুনরায় মাথা নাড়িয়া সে জানাইল—না।

৩

তাহার পর হইতেই আমরা ক্যান্টিনের পাশের এই ঘরে বসিয়া আছি। নরম গদীওয়ালা সোফায় তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিয়া নিজে একখানা বেতের চেয়ারে বসিলাম এবং দুই পেয়ালা কফির আদেশ দিলাম।

বলা বাহুল্য, এবারেও কোন প্রকার সাড়া প্রথমে সে দেয় নাই। তবে বিগত কয়েক ঘণ্টার সাহচর্য্য ও ঘনিষ্ঠতায় আমার প্রতি বেচারার কিঞ্চিৎ সখ্যভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াই হয়তো আর এক বার অনুরোধ করিতেই সে সুবোধ বালকের ন্যায় পেয়ালা তুলিয়া কয়েক চুমুক পান করিল।

কিন্তু তাহার পর হইতেই আবার যেন সে সুদীর্ঘ ধ্যানে মগ্ন হইয়াছে, মনে হইল গত দুই-তিন ঘণ্টার সমস্ত প্রয়াস ও উদ্যম আমার যেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল। যেকব ছত্রির বক্ষরুদ্ধ জমাট অশ্রুশিলাকে বুঝি কিছুতেই গলাইতে পারিলাম না।

আর এক বার হাতঘড়িতে সময় দেখিলাম—প্রায় তিনটা। দুই দিনের পথশ্রম ও ক্লান্তিতে সমস্ত শরীরটা ভাঙিয়া পড়িতে চাহিলেও সর্ব্বান্তঃকরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম, যেকব ছত্রির নিস্তব্ধতার পাষাণ-প্রাচীরকে ভঙ্গ করিবই, নচেৎ বিশ্রাম দূরের কথা, পুরোহিতের ব্রতই আমি পরিত্যাগ করিব।

শেষ উপায় হিসাবে একবার সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরকে স্মরণ করিলাম। কহিলাম, হে মঙ্গলময় সর্ব্বস্রষ্টা, আমার চেষ্টা ও আমার আন্তরিকতায় মধ্যে নিশ্চয়ই ত্রুটি আছে। আমার অজানা হলেও তোমার কাছে তা অজানা নয়। যেকব ছত্রিকে সুস্থ করা যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তা হলে তাকে তুমি সুস্থ করে, স্বাভাবিক করে তোল। আমার উদ্যমকে সফল করতে তোমার অনন্ত শক্তির সাহায্য প্রেরণ কর।

ইহার পরে কেন জানি না সংশয় ও সন্দেহ-ভারাক্রান্ত অন্তর যেন কেমন হালকা ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মনে হইতে
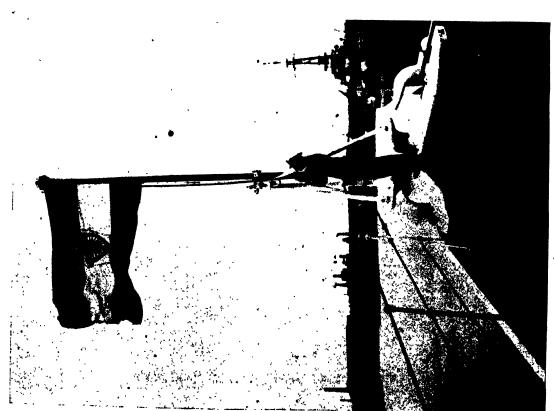
৭০০০ টন যুদ্ধ-জাহাজ 'দিল্লী'তে
ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন

জনসভায় বক্তৃতারত
প্যাটেল

নিউ দিল্লীতে বেলজিয়ান ট্রেড ডেলিগেশন প্রদত্ত প্রীতিভোজে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু

চীনের প্রাচীন মাঞ্চু রাজবংশের রাজধানী মুকডেনে রাজকীয় সমাধি-মন্দির

লাগিল, যেকব হজির আরোগ্যের পথে আর কোন বাধা, কোন সঙ্কটই নাই। তাহার চিকিৎসা-ব্যবস্থার ভার যেন সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক ভগবান নিজের হস্তেই তুলিয়া লইয়াছেন।

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখি যেকব যেন সামান্ত একটু নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিয়াছে। ক্ষণকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মনে হইল, সে যেন একান্ত উৎকর্ণভাবে দূরাগত কোন ক্ষীণ শব্দ শুনিবার চেষ্টা করিতেছে।

সচকিত হইয়া উঠিলাম। শত্রুবিমান নহে তো? আমাদের এই অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটিতে সব সময়ে সঙ্কেত-জ্ঞাপক 'সাইরেন' বাজে না। অনেক প্রকার অসুবিধার জন্যই তাহা সম্ভবপর হয় না। শত্রুবিমানের আগমন-ধ্বনিই আমাদের নিকটে সতর্কতার সঙ্কেত বহন করিয়া আনে। চাঞ্চল্য দমন করিয়া আমিও নিজের কর্ণেন্দ্রিয়কে সজাগ করিয়া তুলিলাম।

মিনিটখানেক পরে তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, কি শুনছ যেকব—এনিমি প্লেন?

যেকব নির্ব্বাক, নিশ্চল! সহসা মনে হইল, সংসারের সহিত বাহ্যিক সম্পর্ক রহিত হইয়া সে যে এত শীঘ্র শত্রু-বিমানের আগমন-ধ্বনি শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইবে তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে।

কক্ষদ্বারে আর এক বার মৃদু পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। নার্স ইথেল গরম কফির পাত্র লইয়া নিকটে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, কি খবর?

তাহার প্রশ্ন এড়াইয়া কহিলাম—আচ্ছা, নার্স ইথেল, তুমি কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছ? যেকবকে দেখেছ? কিছুক্ষণ থেকেই ঐ ভাবে বসে আছে বেচারা!

এক বার মাত্র যেকবের দিকে চাহিয়াই নার্স ইথেল কি যেন আবিষ্কার করার মত কহিয়া উঠিল, বুঝতে পেরেছি। নাইট-ওয়াচাররা গ্রামোফোন বাজাচ্ছে। আপনি কি গান শুনতে খুব ভালবাসেন, মিঃ হজি? আচ্ছা, আপনি খান, আমি গান শোনাচ্ছি একটা।

নার্স ইথেল সুকণ্ঠী—নার্স ইথেল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তরুণী এবং সর্ব্বোপরি সে যেকব হজির বর্ত্তমান ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সম্পূর্ণ দরদী। প্রাণ ঢালিয়া সে নূতন শেখা একখানি চমৎকার গান গাহিতে লাগিল।

এদিকে যেকব হজির মুখাবয়বেও একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের সাড়া যেন ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। যেন আষাঢ়ের মেঘাবৃত দিনে আকস্মিক রৌদ্রাভাস! মনে হইল যেকব হজির প্রতি এতক্ষণে বিধাতা সদয় হইলেন। নার্স ইথেলের সুললিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই যেন তাঁহার মঙ্গল-ইচ্ছা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া লইতেছে।

কিন্তু এ কি? কফির পেয়ালা টেবিলে রাখিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেকবের মুখের ঔজ্জ্বল্য যেন ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। পূর্ব্ববৎ গভীর ভাবে আর একবার সে বাতায়ন-পথে বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল…

চিন্তিত হইলাম। যেকব গান ভালবাসে, অথচ ইথেলের সুললিত প্রেমসঙ্গীতে সে আকৃষ্ট হইল না কেন? কি গান সে চায়? তাহার প্রিয়বিয়োগবিধুর শোকসন্তপ্ত অন্তর এখন কোন্ সঙ্গীতের জন্য পিপাসার্ত্ত?

প্রশ্নের উত্তর মনের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই আমার কণ্ঠ হইতে গান বাহির হইয়া পড়িল—

"Lead kind y light
Amid the encircling gloom
Th · night is dark
And I am far from home"!

"হে দয়াময়, অন্ধকারে তোমার আলো দেখাও। রাত্রি অন্ধকার—ঘর থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি আমি।"

চক্ষের সম্মুখেই আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটল! সোফায় সোজা হইয়া বসিয়া যেকব একান্ত আন্তরিকতার সহিত গানে যোগদান করিল। মনে হইল এই সরল বিশ্বাসী অন্তর-খানি যেন বিধাতার কাছে প্রার্থনা প্রেরণ করিবার জন্যই এতক্ষণ নিরুদ্ধ আবেগে বোবা হইয়া ছিল। নার্স ইথেল আরম্ভ হইতেই এই অতিপরিচিত গানে তাহার মধুর ও দরদভরা কণ্ঠস্বর মিশাইয়া দিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে আমাদের দুই জনের সমবেত কণ্ঠস্বরকে ছাপাইয়া যেকবের রুদ্ধাবরুদ্ধ অথচ আন্তরিকতাপূর্ণ কণ্ঠধ্বনিতে কক্ষ মুখরিত হইয়া উঠিল। তাহার বাধিত অন্তরের গাম্ভীর্য্য-প্রাচীর ভাঙিয়া এতক্ষণে তাহার বুক জুড়িয়া যেন আত্মপ্রকাশের আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যেন এই একখানি মাত্র গানের ভিতর দিয়াই সে তাহার প্রিয়তমা পত্নী, বৃদ্ধা জননী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্তিম যাত্রাপথের নিরাপত্তার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের নিকটে নিজের সকল শুভকামনা ও প্রার্থনাকে রূপ দিতে চাহিল।

অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে সমগ্র ক্যান্টিন মুখরিত করিয়া, শেষ রাত্রের আকাশ-বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সে গাহিতে লাগিল:—

"When other helpers fail
And comforts flee
Help of the helpless
O! Abide with me"!

"যখন অন্য সহায়করা ব্যর্থ, সব সান্ত্বনা যখন দূরে চলে যায়, ওগো অসহায়ের সহায়—তুমি আমার সঙ্গে থেকো—"

শ্রীশচন্দ্র গুহ

শ্রীনিরুপমা দত্ত

গত ২৪শে জুলাই মালয়প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের একটি অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। সেখানকার ভারতীয়দের নেতা শ্রীশচন্দ্র গুহ উক্ত দিবসে অকস্মাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে শ্রীশচন্দ্র শুধু একজন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু সুদূর মালয়ে তাঁহার বিভিন্নমুখী প্রতিভার বিকাশ তাঁহাকে সকলের নিকট শ্রদ্ধাভাজন করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার নিষ্কলুষ চরিত্র, দানশীলতা প্রভৃতির কথা মনে হইলে এমার্সনের উক্তি মনে পড়ে—

"His heart was as great as the world but there was no room in it to hold the memory of a wrong!"

এই অমর উক্তি শ্রীশচন্দ্রের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল।

১৮৯১ সালে ১৫ই অক্টোবর কলিকাতার একটি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-পরিবারে শ্রীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ শ্রীঅম্বিকাচরণ গুহের তেজস্বিতা ও দানশীলতার কাহিনী কলিকাতায় সুবিদিত ছিল। বাল্যকাল হইতে শ্রীশচন্দ্রের তীক্ষ্ণ ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া পিতা তাঁহাকে ছাত্রাবস্থায়ই বিলাতে পাঠান। সেখানে যথাসময়ে বি-এ পাশ করিয়া এবং পরে আইন পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিয়া শ্রীশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে কয়েক বৎসর ওকালতী করিবার পর ১৯১৯ সালে তিনি মালয়ে আগমন করেন।

মালাক্কা শহরে কিছুদিন ওকালতী করিয়া তিনি সিঙ্গাপুরে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সময় কয়েকটি কূট-চক্রান্তমূলক জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ করাতেই শ্রীশচন্দ্র এ-দেশে একজন শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ বলিয়া সুপরিচিত হন এবং ব্যবহারজীবী-মহলের ব্যাঘ্র নামে অভিহিত হন।

মালয়প্রবাসী ভারতীয়দের বিবিধ সমস্যা ক্রমশঃ শ্রীশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারত হইতে আগত হাজার হাজার শ্রমিকের ক্রীতদাসের ন্যায় শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন। সংবাদপত্র ও সভা মারফত তিনি মালয়-সরকারের আন্তর্জাতিক আইনবিরুদ্ধ শাসননীতির তীব্র সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি মালয়ের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। শ্রীশচন্দ্রের প্রেরণায় ভারতবাসীরা তখন ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্পর্কে দেশব্যাপী আন্দোলন চালাইতে থাকে। ফলে ভারত-সরকার এ বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য একজন নিরপেক্ষ প্রতিনিধিকে মালয়ে প্রেরণ করেন। মালয়-কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণ সহজেই ধরা পড়ে। উক্ত প্রতিনিধির রিপোর্ট নয়াদিল্লীতে পৌঁছাইতেই ভারত-সরকার মালয় কর্তৃপক্ষের নিকট এই মর্মে একখানি পত্র দেন যে, মালয়ের বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কারখানাদিতে নিয়োজিত ও নির্যাতিত ভারতীয় শ্রমিকদের যেন অবিলম্বে স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

যখনকার কথা বলিতেছি তখন ভারতীয় শ্রমিক ছাড়া মালয়ের খনি ও রবার-শিল্প পরিচালনা করা একরূপ অসম্ভবই ছিল। অবশ্য চীনা শ্রমিকের তখন অভাব ছিল না; কিন্তু ভারতীয় শ্রমিকদের ন্যায় ন্যূনতম বেতনে তাহারা কখনই সন্তুষ্ট হইত না। সুতরাং উক্ত পত্র পাইয়া মালয়-সরকার চোখে সরিষার ফুল দেখিলেন। শ্রমিকদের শতকরা ৫০ টাকা হারে বেতন বৃদ্ধি করিবার এবং তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত ঔষধাদিসহ কয়েকজন বিশিষ্ট ডাক্তারকে প্রেরণ করার জন্য অবিলম্বে রবার এষ্টেটের মালিকদের উপর হুকুম জারী হইল। মালয়-সরকারের প্রবর্তিত নীতিতে ভারত-সরকার সন্তুষ্ট হন। তখন হইতে ভারতবাসীদের স্বার্থ-সংরক্ষণের নিমিত্ত একজন করিয়া ভারতীয় প্রতিনিধি মালয়ে প্রেরণ করা হয়। অসহায় প্রবাসী ভারতবাসীদের দুর্গতিমোচনের এই পরিকল্পনাটি শুধু শ্রীশচন্দ্রের অক্লান্ত চেষ্টায় বাস্তবে রূপায়িত হয়।

১৯৩১ সালে এখানে 'ইণ্ডিয়ান ইয়ুথ লীগ' নামে একটি স্বতন্ত্র ভারতীয় সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীশচন্দ্র তাহার স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। দুর্গত প্রবাসী ভারতবাসীদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ও তাহাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করা এই সংঘের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়। স্থানীয় ভারতীয় প্রতিনিধির কার্য্যেও ইহার সদস্যেরা বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকেন।

১৯৪১ সালে মালয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে শ্রীশচন্দ্র হাজার হাজার নিরাশ্রয় নরনারীর জীবন রক্ষা করিয়া যেরূপ মহানুভবতা ও মানবহিতৈষণার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার তুলনা বিরল। উত্তর-মালয়ে অবতরণ করিয়া জাপবাহিনী যখন বন্যার জলের মত হু হু করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন ঐ সকল স্থান হইতে সহস্র সহস্র সর্বহারা নরনারী সিঙ্গাপুরে পলাইয়া আসে। বোমা-বিধ্বস্ত সিঙ্গাপুরের অবস্থাও তখন অতীব শোচনীয়। এই সমস্ত শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া ও তাহাদের আহার্য্য সরবরাহ করা কর্তৃপক্ষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। এখানকার চীনা অধিবাসীরা কেবলমাত্র চীনা

আশ্রয়প্রার্থীদের খাদ্য ও আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করে। ফলে অন্যান্য জাতীয় লোকেদের দুর্গতির আর পরিসীমা রহিল না। আশ্রয়হীনদের এই দুর্গতি দেখিয়া শ্রীশচন্দ্রের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তিনি কয়েকজন সদাশয় ব্যক্তির সহযোগিতায় একটি বিরাট রেফিউজি ক্যাম্প বা আশ্রয়-শিবির প্রতিষ্ঠা করিলেন। উক্ত ক্যাম্পটির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইহাতে শুধু ভারতীয় নয়, বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের ২৫০০০ নরনারী—তন্মধ্যে শিশু এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংখ্যাও কম নয়—আশ্রয় ও আহার লাভ করে। রেফিউজি ফণ্ডের অর্থ নিঃশেষিত হইলে শ্রীশচন্দ্র নিজেই সেই বিরাট লোকহিতকর কর্মের ব্যয়ভার বহন করেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই এদেশের হাজার হাজার নরনারী ভারতবর্ষ কিম্বা অষ্ট্রেলিয়ায় পলায়ন করিতে উদ্যত হয়। তখন প্রায় প্রতিদিনই জার্মান ইউ-বোট দ্বারা ব্রিটিশের বহু জাহাজ জলমগ্ন করা হইতেছিল; অবশিষ্ট জাহাজগুলি নিযুক্ত ছিল যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ-কার্য্যে। সুতরাং উপরোক্ত নিরাপদ স্থানসমূহে গমনেচ্ছু নরনারীদের পাঠাইবার ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। গোড়ার দিকে যে জাহাজ কয়খানি পাওয়া গিয়াছিল, সরকারের নির্দ্দেশে সেগুলিতে শুধু শ্বেতাঙ্গ নারী ও শিশুদের পাঠানো হয়। 'কালা আদমি'দের অপেক্ষা করিতে বলা হয়। ধনী ব্যক্তিরা অবশ্য জাহাজ কোম্পানীর অনুগ্রহের প্রত্যাশা না করিয়া চতুর্গুণ ভাড়া দিয়া বিমানযোগে স্থানান্তরে চলিয়া যান, কিন্তু শতকরা নব্বই জনের পক্ষেই থালা ঘটি-বাটি বিক্রয় করিয়াও উড়ো-জাহাজের একখানি মাত্র টিকিট ক্রয় করা সাধ্যাতীত। কাজেই প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও জাহাজ কোম্পানীর আপিসে প্রত্যহ শত শত নরনারী বৃথা ধরণা দিতে থাকে। এই দৃশ্য দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র স্থির থাকিতে পারিলেন না। গবর্ণমেণ্টের সামরিক আইন লঙ্ঘন করিয়া তিনি তৎকালীন লাটবাহাদুরকে তীব্র ভাষায় একখানি পত্র লেখেন। শুধু বনামধন্য ব্যারিষ্টার বলিয়া নয়, শ্রীশচন্দ্রের স্পষ্টবাদিতা, নির্ভীকতা ও মানবহিতৈষণার জন্য লাটবাহাদুর তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। সুতরাং তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া, বরং দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্রোত্তরে জানান যে, প্রধান সেনাপতির হস্তেই লোকাপসারণ-কার্য্যের ভার; অতএব শ্রীশচন্দ্রকে তাঁহার দ্বারস্থ হইবে। শ্রীশচন্দ্র এই সঙ্কটজনক অবস্থায় প্রধান সেনাপতির অনুগ্রহলাভের আশায় বৃথা বসিয়া না থাকিয়া অবিলম্বে ভারতের বড়লাট, কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড ও মহাত্মাজীকে তিনখানি টেলিগ্রাম পাঠাইলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। দুই সপ্তাহের মধ্যে ভারত-সরকার আশ্রয়প্রার্থীদের নিমিত্ত কয়েকখানি জাহাজ প্রেরণ করিলেন। এই সমস্ত জাহাজযোগে তাহারা নিরাপদে ভারতবর্ষে গিয়া পৌঁছে। শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত এরূপ অনেক ভারতীয় ছিল যাহাদের জাহাজ-ভাড়া দিবার ক্ষমতা ছিল না, শ্রীশচন্দ্র তাহাদের টিকিট কিনিয়া দেন।

শ্রীশচন্দ্র গুহ

মালয় হইতে অনেক ভারতীয় চলিয়া গেলেও অর্দ্ধেকের বেশী এখানেই থাকিতে বাধ্য হইলেন। মালয়প্রবাসী ভারতীয়দের নেতৃস্থানীয় অনেকেই আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই ভারতে চলিয়া যান। কিন্তু তিন লক্ষাধিক ভারতবাসীকে এই বিপদের মুখে ফেলিয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইতে শ্রীশচন্দ্রের মন সরিল না। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও তিনি সিঙ্গাপুরে রহিয়া গেলেন।

সিঙ্গাপুরের উপর বিমান-হানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সরকারের শাসনব্যবস্থাও শিথিল হইয়া পড়িল। শ্রীশচন্দ্র তখন ভারতবাসীদের একটি সভা আহ্বান করিলেন, এবং অবিলম্বে তিন হাজার ভারতীয় যুবক লইয়া 'ইণ্ডিয়ান প্যাসিভ ডিফেন্স কোর' নামে একটি সঙ্ঘ গঠিত হইল। যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীশচন্দ্রের নেতৃত্বে এই স্বেচ্ছাসেবক দলটি যে কি ভাবে বোমাবিধ্বস্ত সিঙ্গাপুর শহরের শান্তিরক্ষা কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

শ্রীশচন্দ্রের নিঃস্বার্থ সেবায় মুগ্ধ হইয়া তৎকালীন গবর্ণর স্যর সেণ্টন টমাস তাঁহাকে 'ভারত-সরকারের মালয়স্থ এজেণ্ট-জেনারেল' নিযুক্ত করেন। সিঙ্গাপুরের পতনের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় স্যর সেণ্টন টমাস বেতারযোগে নয়া-দিল্লীতে এই

বাণী প্রেরণ করেন, "I have much pleasure in bringing to the notice of the Government of India the valuable services rendered by Mr. S. C. Goho of Singapore in the evacuation of women and children and in the fine example of courage and determination which he has set to his countrymen, and indeed to us all."

সিঙ্গাপুরের পতন হইলে পর আর একটি বিরাট দায়িত্ব শ্রীশচন্দ্র নির্ভীক চিত্তে গ্রহণ করিলেন। তাহা হইল পরাজিত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ৬৪০০০ অসহায় ভারতীয় সৈন্যের তত্ত্বাবধানের ভার। জাপানীরা শহর দখল করিয়া ব্রিটিশ সৈন্যদের আগে বন্দী করে। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদের বন্দী করার দিকে তাহাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। ওদিকে চৌষট্টি হাজার সৈন্য খাভাভাবে শহরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে এবং নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতে থাকে। জাপানী সামরিক কর্ত্তারা তখন শহরের হাজার হাজার চীনা পরিবারকে একেবারে সমূলে উচ্ছেদ-কার্য্যে মহা ব্যস্ত। ভারতীয়দের উপরও অনুরূপ অত্যাচার আরম্ভ হইতে পারে ভাবিয়া শ্রীশচন্দ্র স্বয়ং তাহাদের নিরাপত্তার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এতগুলি সৈন্যকে আশ্রয় দেওয়া, বিশেষতঃ দৈনিক দুই বার আহার্য্য সরবরাহ করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়, ধনী ব্যক্তিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিমুখ হইয়া অবশেষে শ্রীশচন্দ্র নিজের সঞ্চিত অর্থ দিয়া ভারতীয় সৈন্যদের খোরাক যোগাইতে লাগিলেন। যখন সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হইল তখন তিনি স্ত্রীর মূল্যবান অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া টাকা যোগাড় করিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে তাহাও ফুরাইয়া গেল। এবার তিনি নিজের প্রাসাদতুল্য গৃহ ও অন্যান্য ভূ-সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলেন। এই সময় প্রধান সেনাপতি ইয়ামাশিতার আদেশে উক্ত ভারতীয় সৈন্যেরা যুদ্ধবন্দী বলিয়া গণ্য হইল।

ইহার পর ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা ও প্রতিনিধি রূপে শ্রীশচন্দ্র জাপানী জঙ্গীলাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জঙ্গীলাট তাঁহার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন। জাপানী সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীশচন্দ্র ইণ্ডিয়ান ইউথ লীগকে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগে রূপান্তরিত করেন। তিনিই ইহার সভাপতি পদে বৃত হন। এই সময়ে জাপানী প্রধানমন্ত্রী হিদেকী তোজোর আহ্বানে তিনি অন্যান্য ভারতীয় নেতৃগণ সমভিব্যাহারে টোকিও যান এবং সেখানে গিয়া জানিতে পারেন যে বর্ম্মা বিজিত হইলে পর জাপান ভারত আক্রমণ করিবে। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য ভারতে সাম্রাজ্য-বিস্তার নহে, তাহাদের অভিপ্রায় এই যে ভারতবর্ষ জয় করিয়া ভারতবাসীর হস্তেই তাঁহারা দেশের শাসনকার্য্যের ভার অর্পণ করিবে। জাপ-কর্তৃপক্ষ কিছু ভারতীয় স্বেচ্ছা-সেবক ও সৈন্যের সাহায্য চান। মালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীশচন্দ্র সোৎসাহে দুই হাজার স্বেচ্ছাসেবক ও বন্দী-কৃত সাত শত ভারতীয় সৈন্য লইয়া একটি ভারতীয় মুক্তি-ফৌজ গঠন করিলেন। তাহার কিছুদিন পরেই নির্ব্বাসিত প্রবীণ নেতা শ্রীরাসবিহারী বসু টোকিও হইতে মালয়ে আগমন করিলেন। এক দিন জাপানের ভাবী ভারত-আক্রমণ সম্পর্কে রাসবিহারীর সহিত শ্রীশচন্দ্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়। রাসবিহারী বলেন যে, ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ শক্তিকে বিতাড়িত করিয়া জাপান ভারতবাসীর হস্তেই দেশের শাসন-ভার অর্পণ করিবে। তবে এতকাল পরাধীন থাকায় ভারত-বাসী নাকি এখনও দেশরক্ষা করিতে শিখে নাই; সেইজন্য ভারত-জয়ের পর জাপানী সৈন্যের কয়েকটি দখলদার বাহিনী (occupation army) ভারতে পঁচিশ বৎসর অবস্থান করিবে। তাঁহার শেষোক্ত কথাগুলি কূট-আইনজ্ঞ শ্রীশচন্দ্রের মনঃপূত হইল না। তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, না তাহা কিছুতেই হইতে পারে না; উহারা পঁচিশ বৎসর কাল ভারতে থাকিলে ভারত দ্বিতীয় মাঞ্চুরিয়াতে পরিণত হইবে; আমি এই চুক্তিতে কখনই রাজী হইতে পারি না। এই ব্যাপার লইয়া রাসবিহারীর সহিত শ্রীশচন্দ্রের মনোমালিন্য ঘটে এবং তিনি ভগ্নহৃদয়ে লীগের সভাপতির আসন ত্যাগ করেন। এই কারণে নবগঠিত মুক্তি-ফৌজেও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ায় তাহা ভাঙিয়া গেল। অফিসারদের বন্দী করা হইল। জাপানীরা শ্রীশচন্দ্রকে নজরবন্দী করিয়া রাখিল।

কয়েক মাস পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র মালয়ে আসেন। ইহার কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীশচন্দ্র মুক্তি পাইলেন। কিন্তু মধ্য-রাত্রে জাপানী গেষ্টাপো তাঁহার গৃহে আসিয়া গোপনে তাঁহাকে শাসাইয়া যায় যে, ভবিষ্যতে রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যেন পুনঃ-প্রবেশ না করেন; করিলে জাপ-সরকার তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। গেষ্টাপো অফিসারটি তাঁহাকে আরও বলে যে, এই সমস্ত গণ্ডগোলের কথা তিনি যেন নেতাজীর কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না করেন; এবং নেতাজী যদি তাঁহাকে কোন দায়িত্ব বা পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন তাহা হইলে শ্রীশচন্দ্র যেন হার্টের অসুখের অছিলায় তাহা অস্বীকার করেন।

মালয়ে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে নেতাজী শ্রীশচন্দ্রকে কোন একটি বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। এবার শ্রীশচন্দ্রের উভয়সঙ্কট। ম্লান হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, "জাপানী ডাক্তার আবিষ্কার করেছে আমার নাকি হার্টের অসুখ আছে, কাজেই রাজনীতিক্ষেত্রে জন্মের মত আমার প্রবেশ নিষেধ...।"

নেতাজী পূর্ব্বেই অনেক অফিসারের নিকট ইহার আংশিক খবর পাইয়াছিলেন, এবার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। দুঃখের সহিত বলিলেন, "আচ্ছা, এখন

দু'দিন বিশ্রাম দিন তবে ভারত স্বাধীন হলে আপনিই হবেন তার প্রথম আইনসচিব…।" "হ্যাঁ, জাপানী চিকিৎসক যদি অনুমতি দেন তা হলে নিশ্চয়ই আপনার কথায় রাজী হবো"— শ্রীশচন্দ্র সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন।

তাঁহার অগ্রজ শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর সহপাঠী এবং বন্ধু বলিয়া শুধু নয়, শ্রীশচন্দ্রকে একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক বলিয়াও নেতাজী বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। বহু বার নিজের বাংলোয় শ্রীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করিয়া নেতাজী তাঁহার সহিত অনেক বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছেন।

জাপানী কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে শ্রীশচন্দ্র রাজনীতিতে যোগ না দিয়া আইন-ব্যবসায়ে আবার বিশেষ মনোযোগ দেন। এই সময় তিনি জানিতে পারেন, যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করে নাই, তাহাদের বাকি দুর্দশার পরিসীমা নাই। এ সংবাদ অবগত হইবার পর শ্রীশচন্দ্র সর্বজ্ঞ জাপানী পেটাপোর অজ্ঞাতে সেই দুর্গত সৈন্যদের আর্থিক সাহায্য করিতে লাগিলেন। জাপানীরা জানিতে পারিলে যে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বোপার্জিত অর্থে কুলাইত না বলিয়া তিনি কয়েক লক্ষ ডলার কর্জ করিয়া সেই সকল বন্দীকে পাঠাইয়াছিলেন।

যুদ্ধবিরতি হইলে ব্রিটিশ সরকার মালয়ে পুনঃপ্রবেশ করেন। ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, শ্রীশচন্দ্র জাপানীদের সহযোগিতা করিয়াছিলেন; এই অপরাধে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যে-সব বন্দী সৈন্যের জীবন তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন, নয়াদিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহারা তদানীন্তন ভারত-সরকারের নিকট শ্রীশচন্দ্রের মহানুভবতার কাহিনী বর্ণনা করে। ভারত গবর্মেণ্ট ধন্যবাদপূর্ণ একখানি অভিনন্দনপত্র মালয় সামরিক কর্তৃপক্ষের মারফত শ্রীশচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। উক্ত পত্র দেখিয়া স্থানীয় সরকার অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং অবিলম্বে শ্রীশচন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হয়। সেই সময়ে দিল্লী হইতে মালয়ের ভূতপূর্ব যুদ্ধবন্দী মেজর জেনারেল চৌধুরী (বর্তমান হায়দ্রাবাদের সামরিক শাসনকর্তা) শ্রীশচন্দ্রকে যে অপূর্ব পত্রটি লেখেন তাহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হইল:—…"You were the first Indian in Singapore who came forward to help us at the risk of your own life. You saved many precious lives and for this our gratitude can never be wanting…." "সিঙ্গাপুরে আপনিই প্রথম ভারতীয় যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আপনি অনেক মূল্যবান জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেজন্য আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অভাব কখনো হইবে না।" এ বৎসরের গোড়ার দিকে এ দেশের প্রথম ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচনকালে শ্রীশচন্দ্র একজন সদস্য নির্বাচিত হন। শ্রীশচন্দ্র এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, এইবার তিনি ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুষ্ঠিত ত্রুটিগুলির মূলোচ্ছেদ করিতে তৎপর হইবেন।

গত কয়েক মাস হইতে তিনি হৃৎপিণ্ডের অসুখে বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসকেরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহাদের কথা না শুনিয়া তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্যেই বিরাট কর্তব্যের বোঝা বহন করিয়া চলিতে থাকেন। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার দুর্বল শরীর একেবারেই ভাঙিয়া পড়ে। গত ১২ই জুলাই বাধ্য হইয়া ছয় সপ্তাহের বিশ্রাম লইবার উদ্দেশ্যে তিনি বিমানযোগে কলিকাতায় যান।

কিন্তু সেই বিশ্রামই তাঁহার কর্মময় জীবনের চিরবিশ্রাম হইল। অকস্মাৎ একদিন তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হইল। সেই দীপশিখা মালয়-প্রবাসী ভারতীয়দের পথনির্দেশ করিবার জন্য আর প্রজ্বলিত হইবে না।

বৃথাই প্রহরী আর

শ্রীরঘুনাথ ঘোষ

ধাবমান কালো ধোঁয়া কুণ্ডলাকার কালো অন্ধকার
পৃথিবীর বুকে নামে কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমীর রাত,
উপবাসী আত্মা মোর অবিরাম বেয়ে চলে পথ
পিপাসিত মরুভূমি কাঁদে বৃথা: ডাকে হিম হাত।
আকাশের বুক থেকে ঝরে গেছে শুকতারা সব
ধ্রুবতারা মুছে গেছে চুপে চুপে অজ্ঞাতে কখন,
দিগভ্রষ্ট অন্ধকারে সীমাহীন কালো পারাবারে
ভেসে গেছে মিশে গেছে কত হায় সোনার স্বপন।

তবু গতি, তবু চলা, কুলুকুলু কালিন্দীর জল;
শিবা যে দেখায় পথ: ক্রুর কংস খুঁজিছে কাহারে?
দেবকীর হাহাকার, বসুদেব আঁখি ছলছল,
বৃথাই প্রহরী আর মথুরার কারার দুয়ারে।
চঞ্চল অধীর প্রাণ, অপেক্ষার নাহি অবসর;
কোটি কণ্ঠ আর্তস্বরে অবিরাম মাগে প্রতীকার,
এসেছে লগন আজ কালপূর্ণ হ'ল এত দিনে
বজ্রবদ্ধ শিলাবৃষ্টি তাই বোমে ডাকে অনিবার।

স্থায়ী বাঙালী পল্টন

শ্রীমন বাহাদুর সিংহ
(সুবেদার, ৪১শ বেঙ্গলী রেজিমেন্ট)

প্রায় দুই শত বৎসর পরাধীনতার পর সম্প্রতি ভারতবাসীরা ইংরেজের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের ইচ্ছানুযায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন আজ আমাদের হাতে। ইংরেজ আমলের ভারতের সৈন্যবাহিনীতে রংরুট-নীতি ও সামরিক শিক্ষার বাধাবিঘ্নসমূহ আজ আর নেই। রাষ্ট্রের ভিতরে শৃঙ্খলা বজায় রাখবার এবং বাইরের শত্রু-আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য সৈন্যবাহিনী দরকার। ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষে মাত্র কয়েকটি প্রদেশের মধ্যেই সৈন্যবাহিনী গঠন সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজ বাঙালী জাতিকে "অসামরিক জাতি" বলে বহু বৎসর কোণঠাসা করে রেখেছিল। কারণ ইংরেজ ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল যে, এই বাঙালী জাতির মধ্যে মস্তিষ্ক ও বাহু এ দুটো শক্তি মিলিত হলে তাদের আর ভারতবর্ষে বেশী দিন রাজত্ব করতে হবে না। ইংরেজ রাজত্বের গোড়া থেকে যদি বাঙালীর জন্য সামরিক শিক্ষার পথ উন্মুক্ত থাকত তা হলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের রূপ বহুদিন আগেই বদলে যেত।

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে বাংলাদেশের নেতাদের অনেক পীড়াপীড়িতে ইংরেজ এক দল বাঙালী পল্টন গঠন করতে অনুমতি দিয়েছিল। সাত হাজার বাঙালী ছেলেদের নিয়ে বাঙালী পল্টন গঠন করা হয়েছিল। তারা সামরিক শিক্ষা পেয়েছিল, তাদের যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল—কিন্তু যুদ্ধের শেষে পল্টন ভেঙে দেওয়া হ'ল, বাঙালীরা ভারতের রেগুলার আর্মিতে কোন স্থান পেল না—এই হ'ল ফল। ইংরেজ বাঙালীদের সৈন্যবাহিনীর রংরুট-নীতির আসল পথ ইচ্ছে করেই দেখিয়ে দেয় নি এবং বাঙালী নেতারাও এই রংরুট-নীতির সম্বন্ধে ইংরেজের কূটনীতি সে সময় বুঝতে পারেন নি। এই রংরুট-নীতির ভুলের জন্যই বিগত প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বাঙালী পল্টন সফলতা লাভ করতে পারে নি।

আজ বাংলাদেশে ইংরেজ আমলের রংরুট-নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তনসাধন করতে হবে। কে বলে বাংলাদেশে সৈন্যবাহিনী পাওয়া যাবে না? বাংলাদেশে দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠবে, যদি আমরা নিজেদের মধ্যে দলাদলি, তর্কবিতর্ক ইত্যাদিতে অযথা সময় নষ্ট না করে একযোগে স্থায়ী বাঙালী ব্যাটেলিয়ন গড়ার কাজে মন দিয়ে ভবিষ্যৎ বাঙালীর সামরিক শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করি।

শতাব্দীর এক পাদের মধ্যে পৃথিবীতে পর পর দুটো ভীষণ যুদ্ধ এসেছে—যুদ্ধকালে বাংলাদেশে মুষ্টিমেয় বাঙালীদের নিয়ে এক একটি পল্টন গড়ে উঠছে—যুদ্ধ চলে গেলে, বাঙালী পল্টনও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ফলে বাংলায় বাঙালীদের স্থায়ী সৈন্যদল গঠন আর হচ্ছে না। এর কারণ কি ভেবে দেখা দরকার। আমি এক সময় আমাদের কম্যান্ডিং অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাঙালীকে রেগুলার আর্মিতে রাখা হবে কিনা। তিনি সে প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, নিশ্চয় রাখা হবে যদি তারা চায়। কিন্তু বাঙালী তখন চায় নি—এর জন্যে নেতাদের উদাসীনতা অনেকখানি দায়ী। কয়েকজন বাঙালী অফিসার এ বিষয়ে নেতাদের কাছে দরবারও করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা বলেছিলেন—যুদ্ধ যখন থেমে গিয়েছে তখন পল্টনের আর দরকার নেই।

বাংলাদেশের নেতাদের ও বাঙালী পল্টনের দোষ দেখিয়ে নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। গত যুদ্ধের রংরুট-নীতি এবং বাঙালী পল্টনের কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য করে ভবিষ্যতে বাঙালী নেতারা সাবধান হয়ে বাংলায় স্থায়ী সৈন্যদল গঠনের দিকে যাতে মনোনিবেশ করেন সেইজন্যেই আজ বাঙালী পল্টনের মন্দের দিকটার সব কথা স্পষ্ট করে খুলে বলতে প্রবৃত্ত হচ্ছি—মনে হয় এর দরুন বাংলায় সৈন্য সংগ্রহের কাজ কতকটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে। আজ বাঙালীকে পোশাকী সৈনিক হলে চলবে না; আজ তার মনে প্রাণে সৈনিকের ধর্মে দীক্ষিত সৈনিক-বাঙালী হওয়া চাই।

১৯১৪ এবং ১৯৩৯ সালের যুদ্ধে বাংলায় ভ্রান্ত রংরুট-নীতির দরুনই বাঙালীরা সৈন্যবাহিনী হিসাবে সফলতা লাভ করতে পারে নি; তার কতকগুলি কারণ নিয়ে দেওয়া হ'ল।

(১) ৪৯তম বেঙ্গলী রেজিমেন্ট এবং বেঙ্গল কোষ্টাল ডিফেন্স ব্যাটারিতে শতকরা প্রায় নব্বই ভাগের বেশী উচ্চবংশ-জাত, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবক ভর্তি হয়েছিল।

(২) পল্টনের ছেলেদের মধ্যে যারা একটু শিক্ষিত, তারা অনেকেই এই ধারণা নিয়ে পল্টনে যোগ দিয়েছিল যে ভবিষ্যতে গবর্ণমেন্টের অধীনে লাভজনক উচ্চ অসামরিক পদ তারা পাবে। দেখা গেছে যুদ্ধফেরত খাকাকালীন অনেকেই ভারত গবর্ণমেন্টে বড় পদের জন্য দরখাস্ত করেছিল।

(৩) এদের মধ্যে অনেকেই নূতন কিছু করার উন্মাদনা থেকেই সৈনিকরূপে পল্টনে যোগ দিয়েছিল। দেখা গেছে, পরে যখন তাদের স্বপ্ন ভেঙে গেল তখন বহু ছেলে নানা রকম ছুতো করে পল্টন ছেড়ে চলে এসেছিল।

(৪) এদের মধ্যে অনেকেই সংসারের নানা রকম ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে না পেরে মা, বাবা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের

সঙ্গে ঝগড়া করে, স্কুল-কলেজ পালিয়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেছিল। অনেকে মামলা-মোকদ্দমা থেকে রেহাই পাবার জন্য, আবার অনেকে বহু আপিসে চাকুরির সন্ধান করে পরে হতাশ হয়ে পল্টনে ভর্তি হয়েছিল। পুলিশের হাত এড়াবার জন্য সন্ত্রাসবাদী দলের কয়েকজন যুবকও পল্টনে গিয়েছিল। তাদের অনেকের মা, বাবা, স্ত্রী এবং বহু আত্মীয়স্বজন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নৌশেরা ও করাচী ব্যারাক এবং সুদূর মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র, তাদের ছেলেদের ও স্বামীদের পল্টন থেকে ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে পল্টনের কমাণ্ডিং অফিসারকে অনুরোধ করে আবেদন-নিবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন।

(৫) যারা দেশভক্ত, তারা এই সুযোগে সামরিক শিক্ষা লাভের জন্য পল্টনে ভর্তি হয়েছিল।

৬। যুদ্ধ শেষ হলেই তারা ঘরে ফিরে আসতে পারবে এই ধারণা নিয়ে অনেকেই 'ভলাণ্টিয়ার' হিসাবে পল্টনে ভর্তি হয়েছিল।

৭। সাধারণতঃ বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে এদের অধিকাংশই যুদ্ধে গিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সৈনিক জীবনে 'Stamina' এবং 'Tenacity' বলে যে দুটি গুণ থাকবার কথা, এই সব শিক্ষিত বাঙালী যুবকের মধ্যে তার বিশেষ অভাব ছিল।

৮। বাঙালী ছেলেরা ভারতীয় পদ ও বেতন (Indian Rank Pay) সম্বন্ধে মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। কারণ ভারতীয় ও ব্রিটিশ অফিসার এবং সাধারণ সৈনিকের বেতনে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বাঙালী সৈনিকেরা প্রথম দিকে মাসিক এগার টাকা বেতন পেত। এই এগার টাকায় খাওয়ার খরচ চালাতে হ'ত। পরে অবশ্য খাই-খরচা সরকার থেকে পাওয়া যেত। আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে মনিঅর্ডার যোগে ব্যারাকে ছেলেদের টাকা পাঠাতেন।

৯। একটি পল্টনে সাধারণ সিপাহী হিসাবে ভর্তি হলে, সেই পল্টনের প্রত্যেক সিপাহী যে অফিসার পদে উন্নীত হবে এমন হতে পারে না। রংরুট থেকে সিপাহী পদ লাভ করতে হলে প্রায় দু-বৎসর সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন। সিপাহী থেকে ল্যান্স্‌নায়ক, নায়ক, হাবিলদার, হাবিলদার-মেজর, জমাদার, সুবেদার এবং সুবেদার-মেজর পদলাভ করতে হলে সামরিক বিদ্যার বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন এবং তা সময়-সাপেক্ষ। গত দুই মহাযুদ্ধে শিক্ষিত বাঙালী যুবকেরা সাধারণ সৈনিক হিসাবে পল্টনে ভর্তি হবার দরুন ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, একজন বি-এ, একজন আই-এ, এক জন ম্যাট্রিকুলেট, এক জন স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া, এক জন সামান্য বাংলা লেখা-পড়া জানা, আর এক জন আকাট মূর্খ একই সঙ্গে ভর্তি হয়ে একই ধরণের সামরিক শিক্ষা লাভ করল। সামরিক শিক্ষা অন্তে পরীক্ষার সময় দেখা গেল যে, যে দু'জন মাত্র বাংলা লিখতে পড়তে পারে ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে তারা পাস করে বেরিয়ে এল। সৈন্যদলে থাকতে হলে যে গুণগুলি থাকা নিতান্ত দরকার, যথা—দেহের গঠন, শক্তি, হুকুম মানা ও দেওয়া, গুলিছোড়া এবং পরিচালনা করবার ক্ষমতা, সেগুলি এদের ছিল বলেই এ দু'জনকে উচ্চ-পদে উন্নীত করা হ'ল। আর তিন জন পাস করা নিতান্ত 'ভাল মানুষ' পিছনে পড়ে রইল, তারা সাধারণ সিপাহী হয়েই রইল। এইখানেই পল্টনের মধ্যে একটা অসন্তোষের ভাব দেখা দিল। পাস করা শিক্ষিত ব্যক্তি উচ্চপদ পেল না, পেল কিনা ঐ দু'জন মূর্খ? শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বিরাট একটা ষড়যন্ত্র চলল। যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দুক, গুলি, রিভলবার, মেসিন-গানের অভাব নেই। এই সব অস্ত্রশস্ত্র সকল সময় সৈনিকদের নিকটেই থাকত। সুদূর মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে একটি সামরিক ক্যাম্পে এক দিন গভীর রাত্রে এক দল উচ্চবংশীয়, শিক্ষিত যুবক তিন জন দুর্দান্ত বাঙালী অফিসারকে গুলি করে—ফলে এক জন অফিসার তৎক্ষণাৎ মারা যান, আর দু'জন ভীষণ ভাবে আহত হন। সামরিক বিচারে হত্যা-কারীদের মধ্যে দু'জনের সাধারণ কয়েদীর ন্যায় ফাঁসি হয়েছিল, আর এক জনকে পল্টন থেকে বিতাড়িত করা হয়। এইখান থেকেই বাঙালী পল্টনের অবনতি আরম্ভ হয়। ইংরেজও এই রকম কিছু একটা চেয়েছিল। বাঙালী পল্টনের এই কলঙ্কের কাহিনী এখনও বোধ হয় দিল্লী এবং লণ্ডনের সমর-দপ্তরের নথিপত্রে দেখতে পাওয়া যাবে। এর দরুন তখনকার বাংলাদেশের নেতাদের এবং বেসরকারী সৈন্যসংগ্রহ প্রতিষ্ঠান-গুলির কর্মকর্তাদের মাথা কতখানি নিচু হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এক দিন লক্ষ লক্ষ নরনারী হাওড়া ষ্টেশনে বাঙালী ছেলেদের বিদায়-অভিনন্দন জানিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধের শেষে বাঙালী সৈনিকেরা বাংলায় দীনবেশে ফিরে এল। বাঙালী সৈনিকেরা সেদিন বাংলার রাস্তায় রাস্তায় অন্নের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে। বাংলার নেতারা তখন একবারও তাদের দিকে ফিরে তাকান নি।

(১০) ১৯১৪ সালের যুদ্ধে বাঙালী অফিসার ছাড়া সাধারণ সৈনিকেরা যা বেতন পেত তাতে পল্টনে কাজ ক'রে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাধারণ সৈনিকের পক্ষে সংসার চালান অসম্ভব ছিল। সাধারণ সৈনিক থেকে অতি অল্প দিনের মধ্যে অফিসার পদে উন্নীত হবে তারও ভরসা ছিল কম। ভারতীয় অন্যান্য পল্টনের মধ্যে দেখা গেছে যে, সাধারণ সৈনিকেরা সৈন্যদলে কাজ করে নিজেদের সংসার বেশ ভাল ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। চাকুরি শেষে ঘরে বসে পেন্‌সনও ভোগ করছে। এমনও দেখা গেছে পল্টনে কাজ করে সারাটা

জীবন কাটিয়ে দিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধের মুখ কোন দিন দেখতে পায় নি।

বাঙালী ছেলেদের মধ্যে অনেকের এই ধারণা হয়েছিল যে তাদেরও বুঝি এই ভাবে পল্টনে জীবন কাটাতে হবে। এটাও একটা কারণ যার জন্যে পল্টনে ছেলেরা ভাল করে কাজ করে নি।

(১১) সৈন্যবাহিনীতে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা নিতান্ত দরকার। সৈনিকদের সর্ব্বক্ষেত্রে নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করলে চলে না। বাঙালী পল্টনের ছেলেদের মধ্যে আজ্ঞানুবর্ত্তিতার অভাব অত্যন্ত বেশী ছিল।

এক সময় খুর্দ্দিস্থানে ভীষণ বিদ্রোহ দেখা দেয়। খুর্দ্দিদের দমন করবার জন্য মেসোপটেমিয়া থেকে খুর্দ্দিস্থানে একটি খুর্দ্দি 'এক্সপিডিশনারি ফোর্স' পাঠানো হয়। ব্রিটিশ, গুর্খা, পঞ্জাবী এবং বাঙালী সৈন্যদল নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল। এই দলগুলি সমস্ত খুর্দ্দিস্থানকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে বিদ্রোহীদের দমন করায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। এই অবস্থায় এক সময় খুর্দ্দিস্থানে কোন একটি জায়গায় সমস্ত পল্টনের সৈনিক দল একসঙ্গে মিলিত হয়। বাঙালী সৈন্যদল শেষের দিকে ঐ দলগুলির সঙ্গে যোগ দেয়। সেখানে পৌঁছেই তারা দেখল গুর্খা সৈনিকেরা পাশের একটি খুর্দ্দি গ্রামের উপর মেসিন-গান চালিয়ে গ্রামটিকে পুড়িয়ে দিয়েছে! গ্রামের যুবক-যুবতীরা ঘোড়ায় চড়ে আগে থেকেই পাহাড়ে পালিয়ে গেছে। ভস্মীভূত গ্রামের অবশিষ্ট বুড়োবুড়ী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে বুক চাপড়াচ্ছে ও কাঁদছে। বাঙালী সৈনিকেরা দগ্ধ গ্রামের শোচনীয় অবস্থা এবং বুড়োবুড়ী ও বাচ্চাদের কান্না দেখে গুর্খা সৈনিকদের ওপর ভীষণ চটে গিয়ে বলতে লাগল, কি অন্যায়! গরীবদের গ্রাম পুড়িয়ে নিরীহ বুড়োবুড়ী ও ছোটদের উপর এ কি রকম অত্যাচার? বাঙালী ছেলেদের মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনা ও বিদ্রোহের ভাব দেখা গেল। গুর্খা সৈনিকদের এই অমানুষিক কার্য্যের প্রতিবাদ জানাতে মনস্থ করে কয়েক জন বাঙালী সৈনিক কমাণ্ডিং অফিসারের নিকট অগ্রসর হ'ল। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত কয়েক জন বাঙালী অফিসার এদের অনেক কষ্টে শান্ত করলেন।

সৈন্যবাহিনীতে এই রকম আচরণ সৈনিকের ধর্ম্ম নয়। সৈনিকের একমাত্র ধর্ম্ম হচ্ছে—"হুকুম মানা, তোপ্ দাগানা, বাত না বোল্না"—আদেশ পালন কর, গুলি ছোঁড়ো, কথা বলো না। সৈন্যবাহিনীতে ন্যায়-অন্যায় বিচারের ভার সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতির উপর।

(১২) সৈন্যবাহিনীতে উচ্চবংশ-নীচবংশ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদির কোন প্রভেদ নেই, মান-অভিমানের পালা নেই। একসঙ্গে উঠে-বসে কাজ করতে হয়। বাঙালী পল্টনে দেখা গেছে উচ্চবংশীয়, ধনী, শিক্ষিত সাধারণ সৈনিকেরা নিম্ন সম্প্রদায়ের এবং মূর্খ ও দরিদ্র সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ঘৃণা বোধ করত।

(১৩) মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত বাঙালী ছেলেরা সাধারণ সৈনিক হিসাবে রেগুলার আর্মির পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। এরা অবশ্য খুব চালাক-চতুর এবং অল্পদিনের মধ্যেই সামরিক শিক্ষা আয়ত্তে আনতে পারে। শান্তি ও যুদ্ধের সময় শহর এবং শহরতলীতে 'Garrison duty', 'Ceremonial parade' প্রভৃতি অস্থায়ী কাজ খুব প্রশংসার সহিত করতে পারে। উত্তেজনার বশে হাসিমুখে প্রাণও দিতে পারে। দেশে স্থায়ী বা অস্থায়ী পল্টন গঠনের সময় হাজার হাজার ছেলে ভর্ত্তি হতেও পারে, কিন্তু এরা অল্পদিনের মধ্যেই পল্টন থেকে সরে যাবে।

(১৪) এই সব শিক্ষিত যুবককে স্থায়ীভাবে পল্টনে রাখলে অনেক সময় নেতাদের মধ্যে দলাদলি ও রাজনৈতিক মতবাদ ইত্যাদির চাপে দেশের মধ্যে বিদ্রোহ হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করবে। রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে সৈনিকের মাথা-ঘামানো মোটেই উচিত নয়।

(১৫) শিক্ষিত যুবকদের মধ্য থেকে উপযুক্ত লোক বেছে নিয়ে কমিশন্ড অফিসার পদে নিযুক্ত করা যেতে পারে। তা ছাড়া মেকানাইজ্ড আর্মির জন্য যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষিত যুবকের প্রয়োজন। পদ ও বেতনের দিক থেকেও অসন্তুষ্টির কোন কারণ থাকবে না। শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকেদের টেরিটোরিয়াল ফোর্সে নিযুক্ত করে সামরিক শিক্ষা দিয়ে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখা দরকার।

(ক) বাংলা গবর্ণমেণ্ট এবং ছোট-বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারী, ২০-৪৫ বৎসরের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের বাংলা টেরিটোরিয়াল ফোর্সে নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। চাকুরীই যাদের সংসার প্রতিপালনের একমাত্র সম্বল তারাই হবে টেরিটোরিয়াল ফোর্সের উপযুক্ত সৈনিক। কারণ এক দিকে সংসারের টান, অপর দিকে চাকুরির মায়া—এই দুই দিকের টানে বাইরের কোন ব্যাপার সহজে এদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিষ্ট পার্টি, প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্রীড়াক্ষেত্র এই বাংলাদেশ। তা ছাড়া এই সব দলের সভ্যদের মধ্যে নানা মুনির নানা মত, শতকরা আশি জন নেতা কুড়ি জন কর্ম্মী—ভাঙতে ওস্তাদ—গড়তে ভার্কিক। এই সব নানা প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে বাংলাদেশে সৈন্যদল গঠন করা বড় সোজা কথা নয়। এই সব কারণে বাংলাদেশে টেরিটোরিয়াল ফোর্স গঠন করতে হলে প্রথমেই গবর্ণমেণ্টকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। গবর্ণ-

মেন্টকে শক্তিশালী করতে হলে দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহের উচিত গবর্ণমেন্টের সহযোগিতা করা—ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করতে হলে দেশে চাই যথেষ্ট সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত সৈনিক, আর সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত সৈনিক গড়ে তুলতে হলে উপরোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক।

(খ) গবর্ণমেণ্ট এবং বাংলাদেশের প্রত্যেক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের মধ্যে বাছাই করে সামরিক শিক্ষার জন্য মাসে দুদিন অর্থাৎ বৎসরে চব্বিশ দিন বেতনসহ ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে। এই কোর্সের মেয়াদ হওয়া উচিত পাঁচ বৎসর।

(গ) আপিসের বড়বাবু, ছোটবাবু এবং সাধারণ কেরানী একসঙ্গে সামরিক শিক্ষা লাভ করবে। দেশের কাজে এখানে মান-অপমান সব ভুলে যেতে হবে। এই সব ভদ্রলোকের শিক্ষার জন্য রেগুলার আর্মির কমিশনড্ এবং নন-কমিশনড্ অফিসারদের মধ্য থেকে Instructor বা শিক্ষক নিযুক্ত থাকবেন। বিলিতি পল্টনের অবসরপ্রাপ্ত বুনো কর্ণেল, মেজর, ক্যাপ্টেন এবং সরকারী বেসরকারী আপিসের বড়কর্ত্তারা রেগুলার আর্মির সাধারণ এক জন সার্জ্জেণ্ট ইন্‌ষ্ট্রাকটারের অধীনে সামরিক শিক্ষালাভ করতে লজ্জা বোধ করেন না। ষাট বৎসরের এক জন কর্ণেল প্যারেডের সময় 'এটেনশ্যান' অবস্থায় হাতের আঙুল একটু নেড়েছেন—অমনি সার্জ্জেণ্ট চীৎকার করে উঠল—"Sir, stop moving your b'oody finger"। কর্ণেল তৎক্ষণাৎ তাঁর আদেশ পালন করলেন। এই রকম আদেশ শুনলে আমাদের দেশের আপিসের বড়বাবুর রক্ত হয়ত মাথায় চড়ে উঠবে।

(ঘ) এই অতিরিক্ত সৈন্যদলের সামরিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করবার জন্য এদেশের ছোট-বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহের বাৎসরিক লভ্যাংশের উপর শতকরা এক টাকা হারে কর ধার্য্য করে "ভারতীয় জাতীয় সমরশিক্ষা ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য।

(১৬) ১৯১৮ সালে মেসোপটেমিয়ায় "কুট-এল্-আমারা" নামক স্থানে ব্রিটিশ এবং ভারতীয় অ-বাঙালী অফিসার দ্বারা একটি বিরাট সামরিক মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে ৪৯তম বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের সিপাহীদের physical examination বা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই পরীক্ষা নিম্নলিখিত ভাবে হয়েছিল :—

(ক) প্রত্যেক সৈনিককে পুরো ইউনিফর্মে এবং সৈনিকের 'কিট' যথা—খাকি হাফ্‌প্যাণ্ট, কোট, হ্যাট, মোজা, বুট, পটি, বন্দুক, সঙীন, গুলিভর্ত্তি ব্যাণ্ডোলিয়ার, জলভর্ত্তি ওয়াটার বটল, নানা জিনিষে ভর্ত্তি হ্যাভারস্যাক, ছোট একটা কোদাল এবং পিঠে একটা মোটা কম্বল বহন করতে হবে।

(খ) দশ কি পনর মাইল ঠিক মনে পড়ছে না, উঁচুনীচু জায়গা দিয়ে কখনও বা রাস্তা দিয়ে মার্চ করতে হয়েছিল। রাস্তার মধ্যে মার্চ করবার সময় জল পান করবার হুকুম ছিল না। রেজিমেণ্টের এ বি সি ডি এই চারটি কোম্পানীকেই (কোম্পানীর সিপাহী থেকে সুবেদার মেজরকে পর্য্যন্ত) পরীক্ষায় যোগ দিতে হয়েছিল। ব্রিটিশ অফিসাররা অবশ্য ঘোড়ায় চড়ে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। যারা অসুস্থ, অথবা ক্যাম্পে ডিউটিতে ছিল তাদের পরীক্ষায় যোগদান করতে হয়নি। মেডিক্যাল বোর্ডের প্রধান কর্ত্তা ঘড়ি দেখে মার্চ করবার হুকুম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মার্চ সুরু হ'ল। সকালের দিকে এই পরীক্ষা হয়েছিল। চারটি কোম্পানী পর পর মার্চ করে চলেছে। মাথার উপর প্রচণ্ড রোদ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মার্চ করে ক্যাম্পের দিকে ফিরে আসবার সময় দেখা গেল রাস্তার মধ্যে ছেলেদের 'fall out' আরম্ভ হয়েছে। সে একটা বিশ্রী ব্যাপার। টপাটপ লাইন থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেরা রাস্তার দু'পাশে শুয়ে পড়ছে। ভারতীয় ও ব্রিটিশ অফিসাররা ছেলেদের উৎসাহ দেবার জন্য চীৎকার করছেন। এক লাইন থেকে অন্য লাইনে দৌড়াদৌড়ি করছেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে— অনেক ছেলের মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে, কেউবা জল খাচ্ছে, অনেকেই বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, পিঠ থেকে কম্বল সরিয়ে ফেলেছে— আবার কেউ কেউ বা নিজেদের বুক ও পেট চেপে ধরে রাস্তার বসে পড়ছে আর বলছে "সার আর পারছি না"। রাস্তার দু'ধারে দলে দলে ছেলেরা সব শুয়ে, বসে হাঁপাচ্ছে। ক্যাম্পে এসে যখন আমাদের মার্চ শেষ হ'ল, তখন দেখা গেল পল্টনের প্রায় অর্দ্ধেকসংখ্যক ছেলে 'fall out' করেছে। দুঃখে, রাগে ও অপমানে সমস্ত শরীরে আমার জ্বালা ধরে গিয়েছিল এটুকু বেশ মনে পড়ে। যারা ক্যাম্পে এসে পৌঁছাতে পেরেছিল ডাক্তার সাহেবেরা তাদের পুনরায় নাড়ী-পরীক্ষা করেছিলেন।

এই মেডিকাল বোর্ডের রিপোর্ট লণ্ডনে ও ভারতে কি ভাবে গিয়েছিল তা জানা যায় নি, তবে বাঙালী পল্টনের অফিসার কমাণ্ডিংএর একখানা চিঠি পড়লেই কতকটা অনুমান করা যেতে পারে। পত্রখানির কিয়দংশ এই—

"When it comes, however, to furthering appeals for the formation of further Bengalee Regiments, I consider that the Association is going beyond its province, and I certainly would not allow my name to be associated in any way with such a movement.

Moreover you and all the old soldiers of The 49th Bengalis must be well aware that the Battalion was not a success in Mesopotamia, and

that I personally expressed my opinion quite clearly that the Bengali was not good material for front line soldiering.

Those of you, and you yourself are possibly one of them, who were present at the physical examination of the Battalion by a Board of Officers assembled for the purpose at Kut in 1918, must know quite well how adverse the report of that Board was, and how lamentably the Battalion failed to pass the very easy test provided"

(গ) ইংরেজের এই মেডিকাল বোর্ড বসানোর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীদের সৈন্যবাহিনী থেকে সরিয়ে নেওয়া।—কাজ ফুরালে পাজী।

(ঘ) বাঙালী শিক্ষিত সৈনিকেরাও দেশে ফিরে আসবার এই একটা মস্তবড় সুযোগ পেয়েছিল। আমি জানি বহু ছেলে ইচ্ছে করে এই পরীক্ষায় 'fall out' হয়েছিল। কেমন করে 'fall out'-এর অভিনয় করেছিল তাই ব'লে অনেক ছেলেকে বাহাদুরি নিতে দেখা গেছে। শিক্ষিত বাঙালী সৈনিকেরা বুঝতে পারলে না, বাংলাদেশকে তারা সেই সময় দুনিয়ার লোকের চক্ষে কতটা হেয় করে তুলেছিল। বাঙালী নেতারা এই সব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের বাঙালী ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন—যুদ্ধ শেষ হলে ইংরেজ ভারতবাসীদের স্বায়ত্তশাসন দেবে এই ভরসায়।

(১৭) বাংলাদেশের নেতারা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকর্তারা, কলিকাতা এবং বাংলার জেলা-শহরগুলিতে সভা করে এবং খবরের কাগজে প্রচার করে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত, মূর্খ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বৈশ্য, শূদ্র, ধোপা, নাপিত, মুসলমান, খ্রীষ্টান, স্কুল-কলেজের ছাত্র, থিয়েটারওয়ালা, যাত্রাওয়ালা, মুদি, কেরাণী, উকিল, জমিদার এবং কৃষক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর প্রার্থীকেই সৈন্যদলে ভর্ত্তি করতে আরম্ভ করলেন। দলে দলে ছেলেরা কলিকাতায় এসে রংরুট আপিসে ভর্ত্তি হতে লাগল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নৌশেরা এবং করাচী ব্যারাকে সামরিক শিক্ষালাভ করে যুদ্ধেও গেল। বাংলার নেতারা বাঙালী যুবকদের সেই সময় নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে পল্টনে ভর্ত্তি করেছিলেন, কিন্তু বাঙালী পল্টন ভেঙে দেবার পর বহু বাঙালী শিক্ষিত যুবকের ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

(১৮) লোকের কাছে বাহবা পাবার আশায় অথবা যুদ্ধের সময় একটা উত্তেজনার বশে এই ভাবে সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক একটি সৈন্যদল গঠন ক'রে—পরে ভেঙে দেওয়া হবে এ ধরণের পরিকল্পনা বর্ত্তমান লেখকের নয়। বাংলাদেশে যাতে স্থায়ী সৈন্য সংগ্রহ, সৈন্যদল গঠন, সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন এবং সৈনিক বংশ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়—এই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

১৯। স্থায়ী বাঙালী ব্যাটেলিয়ন গঠন করতে হলে নিম্নলিখিত ধরণের রংরুট-নীতি অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন :—

(ক) "খাস-বিচালিয়" দেশেই আমাদের যেতে হবে। নমঃশূদ্র, রাজবংশী, বাগ্দী, সাঁওতাল, মাহিষ্য, মুসলমান প্রভৃতি চাষীসম্প্রদায় থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে। এই সব সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে সৈনিক হবার গুণ যথেষ্ট আছে। দেহে শক্তি আছে, রোদ, জল, ঝড় সহ্য করে কাজ করবার ক্ষমতাও এরা রাখে। এরাই হবে প্রকৃত আজ্ঞানুবর্ত্তী। এরা সাধারণতঃ গরীব ও মূর্খ। এরা উত্তেজনাপ্রবণ নয়। ভারতীয় পল্টনের সৈনিকের বেতনেই এরা সন্তুষ্ট থাকবে। জীবিকার উপায় হিসাবে সহজ সৈনিক-জীবন গ্রহণ করতে এরাই সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সৈনিক বংশের ন্যায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এই সব সম্প্রদায় সৈনিক বংশে পরিণত হবে।

(খ) "বেঙ্গল হাইল্যাণ্ডার্স" বলে দুর্দ্ধান্ত সৈন্যদল গঠন করতে আমাদের বেশী দূর যেতে হবে না। বাংলার অধীনে পার্ব্বত্য-অঞ্চলের অধিবাসী—গুর্খা, কোচ, কোল, ভীল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

(গ) আর একটি সম্প্রদায় থেকে সৈন্যদল গঠন করা যেতে পারে। বাংলায় ও বাংলার বাইরে বহু আশ্রম আছে—সেখানে বিভিন্ন কারণে সমাজ পরিত্যক্ত বহু বাঙালী শিশু-সন্তান প্রতিপালিত হয়। এই সব শিশুসন্তানকে মানুষ করে, সৈন্যদলে ভর্ত্তি করে রাষ্ট্রের এবং সমাজের উন্নতিসাধন করা দরকার। এদের জন্য বাংলাদেশে একটি আলাদা 'কলোনি' বা আবাসভূমি স্থাপন করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে ভবিষ্যতে এদেরই বংশ সৈনিক-বংশ বলে গণ্য হতে পারবে। বাংলায় বাঙালীর আশ্রম ছাড়া অন্যান্য জাতির বহু অনাথাশ্রম আছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের শিশু-সন্তানদের সৈন্যদলে ভর্ত্তি করে এদের জীবনের মান উন্নত করতে হবে।

(২০) ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়নের সমর-দপ্তরের নির্দ্দেশ অনুসারে পশ্চিমবাংলার গবর্ণমেণ্টকেই বাঙালী পল্টনের সৈন্যসংগ্রহের ভার গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশে প্রত্যেক জেলায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, স্থানীয় কয়েকজন জমিদার, ধনী ব্যবসায়ী এবং (তিন অথবা চারটি মিলিত জেলার জন্য) এক জন সামরিক কমিশনভূক্ত অফিসারকে নিয়ে ডিষ্ট্রিক্ট রিক্রুটিং কমিটি গঠন করা আবশ্যক। এই কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে জেলার ভৌগোলিক অবস্থান এবং গ্রামের লোকসংখ্যা অনুসারে ২০।২৫টি গ্রাম একত্রিত করে, গ্রামের মোড়লদের নিয়ে এক একটি "Village Recruiting Committee" বা গ্রাম রং-রুট কমিটি গঠন করতে হবে। প্রত্যেক গ্রামেই এক জন করে মোড়ল বা মাতব্বর থাকে, যার কথা সাধারণ

চাষীরা মেনে চলে। এই সব মোড়লই হবে গ্রাম রংরুট কমিটির দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ।

স্বাধীন দেশের সৈন্যবাহিনীতে চাষী-সৈনিকের স্থান কোথায়, এবং চাষীর জীবিকা অর্জনের পক্ষে সহজ সৈনিক-জীবন কিরূপ সহায়ক—গ্রামের মোড়লদের সে সম্বন্ধে আগে শিক্ষাদান করা নিতান্ত দরকার। গ্রামের মোড়লরাই কৃষকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে সৈন্যদলে ভর্তি করবে।

বাংলাদেশে সৈন্যসংগ্রহের এই ব্যবস্থা ততদিন চালু রাখতে হবে, যতদিন না বাংলায় একটি "সামরিক শিক্ষার ইউনি" স্থাপন, সৈন্যসংগ্রহ, স্থায়ী একটি ব্যাটেলিয়ন গঠন সৈনিকদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় এবং চাষী-সম্প্রদায় জীবিকা অর্জন হিসাবে সহজ সৈনিক-জীবন গ্রহণের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

(২১) গ্রামে কোন পরিবারে দু'জন যুবক থাকলে তাদের মধ্যে এক জনকে সৈন্যদলে ভর্তি করে আর এক জনকে রাখতে হবে ক্ষেতের কাজ করবার জন্য। চার জন থাকলে দু'জনকে বাড়ীতে রেখে দু'জনকে সৈন্যদলে নিতে হবে। এমন ভাবে চাষীদের ভিতর থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে যাতে দেশের কৃষিকার্য্যের কোনরূপ ক্ষতি না হয়। এই সব কাজ ধীরে ধীরে করা দরকার। হঠাৎ যদি ধড়াচুড়া পড়ে এক দল সৈনিক ঢাকঢোল বাজিয়ে গ্রামের মধ্যে উপস্থিত হয় এবং সৈন্য-সংগ্রহের জন্য বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করে তো ফল উল্টো হতে পারে।

সৈন্যদলে ভর্তি হলে মাসিক বেতন, প্রত্যেক মাসে বাড়ীতে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা, বাৎসরিক ছুটি, কার্য্যান্তে পেন্‌সনপ্রাপ্তি, সরকারী ব্যয়ে খাওয়া-থাকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, ডাক্তার, ঔষধপত্র, ধোপা, নাপিত, ছুটিতে যাতায়াতের খরচ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় কৃষক-দের স্পষ্ট ভাবে বুঝাতে হবে। এই রংরুটদের উৎসাহিত করবার জন্য ভ্রাম্যমাণ সিনেমা বা চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা করা দরকার। গ্রাম রংরুট কমিটির মোড়ল-সভ্যদের মাসিক টাকা দেবার ব্যবস্থা করাও উচিত। গ্রামের যে মোড়ল ভাল কাজ করতে পারবে তাকে একটা লাঙল, এক জোড়া বলদ দিয়ে পুরস্কৃত করা উচিত। এর ফলে প্রত্যেক গ্রামে মোড়লদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাবে।

কোন একটি জেলা থেকে দু'শ কৃষক সৈন্যদলে ভর্তি হবার পর, অমনি এদের নিয়ে ট্রেনে ষ্টীমারে চড়িয়ে হৈ চৈ করে কলিকাতা, ব্যারাকপুর অথবা বাংলার বাইরে কোন সহরে সামরিক শিক্ষার জন্য পাঠানো মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ :—

(ক) এরা গ্রাম থেকে কলিকাতা পৌঁছবার পর ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেল মাত্র ১০০ শত জন উপযুক্ত বিবেচিত হ'ল।

(খ) যে ১০০ শত জন 'unfit' বা অযোগ্য বিবেচিত হ'ল, তাদের গ্রামে ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে, এতে গবর্ণ-মেণ্টের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি এবং সময় নষ্ট হবে।

(গ) যারা পল্টনে রইল তাদের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠবে যখন দেখবে যে সঙ্গীরা গ্রামে ফিরে যাচ্ছে।

(ঘ) এই সব রংরুট সৈন্য শহরে রাখলে দুষ্ট লোকেরা এদের কানে নানা রকম কুমন্ত্রণা দিয়ে সৈন্যদল থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করবে।

(ঙ) গ্রামের রংরুট কমিটির আপিসে এই সকল রংরুটের মেডিকাল এগজামিনেশনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

(চ) বাংলাদেশের মধ্যে শহর থেকে দূরে গ্রামের নিকটে একটা 'Traning camp' বা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে এই সব রংরুটের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

(২২) এই সব রংরুটের জন্য দু'বেলা ভাত, ডাল এবং তর-কারী—মাঝে মাঝে রুটী, মাছমাংস, এবং চিঁড়ে গুড় ইত্যাদি জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। দু'বেলা চাষীরা যাতে পেট ভরে খেতে পারে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

টিনের দুধ, ফল, চা, চিনি, পাঁউরুটি, বিস্কুট, মাখন, বাথ-সোপ, সিগারেট, গন্ধতেল, বাবু মোজা, চটি, টুথপেষ্ট, পাউডার, টাওয়েল প্রভৃতি এই সব রংরুটকে যেন দেওয়া না হয়।

যদি কোন প্রতিষ্ঠান এই পল্টনের সৈনিকদের কিছু দিতে চায় তা হলে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি দিতে পারে :—মোটা ধুতি, মোটা গেঞ্জি, গামছা, কাপড় কাচা সাবান, গায়ে ও মাথায় মাখবার সরিষার তেল, বিড়ি, দেশলাই ইত্যাদি। নানা রকম দেশী শাকসব্জীর বীজ এবং চারা কলম ইত্যাদি দিলে আরও ভাল হয়। এই সব জিনিষ তাদের গ্রামে পাঠিয়ে তারা চাষের উন্নতি করতে পারে। এতে একটা খুব ভাল ফল পাওয়া যাবে—সমস্ত চাষীর মধ্যেই সৈন্যদলে ভর্তি হবার বিশেষ উৎসাহ দেখা যাবে।

(২৩) পশ্চিম বাংলার প্রত্যেক জেলা থেকে নিম্নলিখিত সংখ্যক লোক সংগ্রহ করে একটি বাঙালী পল্টন গঠন করা যেতে পারে।

	জেলা	রং-রুট সংখ্যা
১।	মেদিনীপুর	১০০
২।	বাঁকুড়া	৫০
৩।	হাওড়া	৫০
৪।	হুগলী	৫০
৫।	বীরভূম	৫০
৬।	বর্দ্ধমান	১০০
৭।	মুর্শিদাবাদ	১০০
৮।	নদীয়া	১০০
৯।	২৪ পরগণা	১০০

১০।	মালদহ	৫০
১১।	দিনাজপুর	৫০
১২।	জলপাইগুড়ি	১০০
১৩।	দার্জ্জিলিং	১০০
	মোট	১০০০

প্রত্যেক জেলা থেকে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোক সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্য—

(ক) সৈন্যবাহিনীতে প্রত্যেক জেলার অধিবাসীদের সমান অধিকার।

(খ) একটি জেলা থেকে অধিকসংখ্যক লোক সংগ্রহ করলে উক্ত জেলায় চাষের ক্ষতি হতে পারে।

(গ) জেলার মধ্যে সৈন্যসংগ্রহের ব্যাপারে একটা কল্যাণকর প্রতিযোগিতার ভাব আনয়ন করা।

(ঘ) জেলা রংরুট কমিটির সভ্যগুলির কাজ সহজসাধ্য করে তোলা।

(২৪) প্রথম অবস্থায় এই অল্পসংখ্যক রংরুট সংগ্রহ করে একটি বাঙালী ব্যাটেলিয়ন গঠন করতে হবে। ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়নের অন্যান্য প্রদেশের স্থায়ী সৈন্যদলের ন্যায় এই ব্যাটেলিয়ানও রেগুলার আর্মিতে স্থান গ্রহণ করবে। রেগুলার আর্মির এই প্রথম বাঙালী পল্টনকে গড়ে তোলবার সময় খুব সাবধানতার প্রয়োজন হবে। রংরুটদের বাইরের লোকের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়। এই সব রংরুট যাতে সকল রকম সুখ-সুবিধা পায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। কারণ এই এক হাজার বাঙালী রংরুটই হবে ভবিষ্যৎ বাংলার রেগুলার আর্মির পথপ্রদর্শক। এই পল্টনের সৈনিকদের পুরো দু'বৎসর সামরিক শিক্ষালাভের পর প্রথমে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জেলায়, পরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে 'garrison duty' এবং সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শিক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকবে। এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় বাঙালী-সৈন্যদল (রংরুট-সংখ্যা বাড়িয়ে ২০০০ করা উচিত) গঠিত হয়ে সামরিক শিক্ষা লাভ করবে। এই দ্বিতীয় দলের চাকুরীর মেয়াদ হবে মাত্র এক বৎসর। এই দলের সৈনিকেরা রেগুলার আর্মির প্রথম দলের সৈনিকদের মত সব সুযোগ-সুবিধাই পাবে, কিন্তু পেন্‌সন পাবে না। এতে দেশে শিক্ষিত সৈনিকের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং গবর্ণমেণ্টের পেন্‌সনের টাকাও বেঁচে যাবে। এই দ্বিতীয় দলের কার্য্যকাল পূর্ণ হলে তারা পুনরায় গ্রামে ফিরে যাবে—চাষবাসের কাজ করবে। এমনি ভাবে এক এক বৎসর অন্তর এক একটি দল সামরিক শিক্ষা লাভ করে গ্রামে ফিরে যাবে।

এই ভাবে বাংলাদেশে সমস্ত গ্রামের কৃষকদের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে এবং আর এক দিকে দেশের মাটির সম্পদকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তা হলে দেশে যত বড় যুদ্ধবিগ্রহই আসুক না কেন, বাংলায় বাঙালী সৈন্য-বাহিনীর অভাব হবে না।

বাংলাদেশের কৃষকেরা বংশপরম্পরায় যে আবহাওয়ার মধ্যে জীবন যাপন করে আসছে তাতেই তাদের আনন্দ ও শান্তি। চাষের জমি ও গ্রাম এদের সুখদুঃখের লীলানিকেতন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত গ্রামে বাস করেই এরা জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছে—বাইরের টানে এদের মন বড় টলে না।

আজ যদি হঠাৎ এদের গ্রাম থেকে বাইরে টেনে আনা হয় তা হলে সৈন্যদল গঠনে অসুবিধা হবে। মাটির মায়া ছেড়ে আসা বাঙালী কৃষকদের পক্ষে বড় কঠিন। এইজন্য বাংলাদেশের মধ্যেই শহর থেকে অনেক দূরে পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর স্থানে সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা উচিত—যাতে এই সব রংরুট মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে গ্রামে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখে আসতে পারে। আত্মীয়-স্বজনেরাও এখানে এসে এদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারে। তা হলে আত্মীয়বিচ্ছেদজনিত মনঃকষ্ট এদের অনেক কমবে। চাষীর জন্মগত অভ্যাসকে বজায় রাখবার জন্য শিক্ষাকেন্দ্রের সন্নিকটে বেশ কিছু জমি রেখে চাষের কাজও এদের দ্বারা করানো যাবে। এদের মধ্যে স্থায়ী বাঙালী ব্যাটেলিয়ন গড়ে তুলতে পারলে সুফল হবে এই যে, এদের পক্ষে পুরাতন আবহাওয়া থেকে ক্রমেই নূতন আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়ায়—গ্রাম থেকে জেলা-শহরে—শহর থেকে রাজধানী কলিকাতা, দিল্লী এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে।

সামরিক শিক্ষালাভের পর যোগ্যতা অনুসারে ল্যান্স-নায়ক থেকে সুবেদার মেজর প্রভৃতি পদ এই সম্প্রদায়ের সৈন্য-দলের মধ্যে থেকে হওয়া উচিত।

(২৫) ইংরেজ আমলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে বাংলা-দেশের গ্রামের। ইংরেজ গ্রামের দিকে একবারও তাকিয়ে দেখে নি, বা সেগুলোর কোন রকম উন্নতিসাধনের চেষ্টাও করে নি, গ্রামগুলোকে তারা শ্মশানে পরিণত করে চলে গেছে; অথচ এই গ্রামই হচ্ছে বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড। শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করতে হলে প্রথমেই গ্রামের উন্নয়ন নিতান্ত দরকার। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত "পিলেবাহিনী" গঠন করলে চলবে না। বাঙালী নেতাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিশেষ করে চিন্তা করে তদনুরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য,—

(ক) পতিত জমি উদ্ধার।

(খ) চাষের জমির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সার যোগানো।

(গ) পুকুর, খাল, বিল ও নদীর উন্নতি সাধন করা।

(ঘ) রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থা।

(ঙ) গৃহপালিত পশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা।

(চ) ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ করা।

(ছ) 'Mobile Hospital' বা চলন্ত হাসপাতালের (মোটর বাস এবং নৌকা সহযোগে) ব্যবস্থা।

(জ) গ্রামে পাঠশালার সংখ্যা বাড়ানো।

(২৬) আর একটা বিষয় সব সময় বাংলাদেশে নেতাদের মনে রাখা উচিত—সেটা হচ্ছে সৈন্যবাহিনীর খাদ্য-সঞ্চয়-ব্যবস্থা। সৈন্যদলের খাদ্য এমন ভাবে সঞ্চয় করে রাখতে হবে যাতে অনির্দিষ্টকাল যুদ্ধ চললেও হাজার হাজার সৈনিকের খাদ্যাভাব না ঘটে।

(২৭) বাঙালী পল্টনের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা ও দায়িত্ব ভারত ডোমিনিয়নের হাতে থাকলেও বাংলায় বাঙালীদের এরূপ নূতন সৈন্যদল গঠনের কাজে এই সময় পশ্চিম বাংলার গবর্ণমেণ্ট এবং নেতাদের সহযোগিতা নিতান্ত দরকার। রেগুলার আর্মির কমিশনড্ এবং নন্‌কমিশনড্ (Instructor) অফিসারদের উপর এই প্রথম বাঙালী সৈন্যদলের শিক্ষার ভার দেওয়া উচিত। ভাষা বুঝিয়ে দেবার জন্য বাঙালী অফিসার দরকার হবে।

(২৮) তুচ্ছ রাজনৈতিক কারণে সৈন্যবাহিনীতে যাতে কোন বিদ্রোহ না হয় তার জন্য এক জাতির পল্টনে অন্য জাতির কমিশনড্ অফিসার রাখবার ব্যবস্থা করা উচিত। দেখা গেছে ভারতের বড় বড় ছাউনিতে ভিন্ন ভিন্ন জাতের পল্টন একসঙ্গে রাখবার ব্যবস্থা আছে। তার কারণ রাজপুত পল্টন যদি বিদ্রোহী হয়—গুর্খা পল্টনকে দিয়ে দমন করা যায়। গুর্খা পল্টন বিদ্রোহী হলে মারাঠা পল্টন দিয়ে দমন করা যেতে পারে।

(২৯) বাঙালী পল্টন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে "সামরিক মেডিক্যাল কোর"-ও গঠন করা কর্তব্য। ১৯ (গ)-বর্ণিত অনাথাশ্রমের মেয়েরা নার্সের কাজে উপযুক্ত হবে।

(৩০) বাঙালী পল্টনের সৈনিকদের শিক্ষার শেষে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন পল্টনের মধ্যে এক সঙ্গে রেখে 'garrison duty' দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। সব সময় সৈনিকদের এক স্থানে রাখা উচিত নয়। নানা দেশে পাঠালে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারে, তা ছাড়া সৈনিকদের মন প্রফুল্ল থাকে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। ব্রিটিশ সৈন্যদের রক্ত তাজা রাখবার জন্য ইংরেজ একটা চমৎকার উপায় বের করেছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সব সময় যুদ্ধ লেগেই থাকত। আফ্রিদিরা এক এক জন নেতার অধীনে পরিচালিত হ'ত এবং মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে লড়াই করত, আর সুযোগ পেলেই এরা ইংরেজ সৈন্যদের বন্দুক বা খাদ্যসামগ্রী লুঠতরাজ করে আত্মসাৎ করত। ব্রিটিশ সৈন্যদের এই সব প্রদেশে কিছুকালের জন্য রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল—উদ্দেশ্য আফ্রিদি দমন এবং যুদ্ধ-শিক্ষা—এক সঙ্গে দু'কাজই চলত।

যদিও সৈন্যদলের সকল দায়িত্ব ভারত-গবর্ণমেণ্টের, তাই বলে বাংলাকে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভায় সামরিক শিক্ষাও বহুমুখী। বহু বাঙালী ধনী বিশ্ববিদ্যালয়কে অজস্র টাকা দান করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তেমনি বাঙালীদের সামরিক শিক্ষার জন্য অর্থ দান করে বিত্তশালী বাঙালীরা কীর্তিমান হয়ে থাকতে পারেন। বাংলায় স্থায়ী সৈন্যদল গঠনের কাজে বাঙালী লেখকদেরও লেখনী পরিচালনা করে দেশবাসীকে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

প্রায় দুই শত বৎসর পরাধীনতার জন্য বাঙালী জাতির মধ্যে যে জড়তা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তা দূর করতে বহু চিন্তা, নানা পথের সন্ধান, বহু অর্থব্যয়, পরিশ্রম এবং সময়ের প্রয়োজন। শিখ, পঞ্জাবী, গুর্খা, মারাঠি এবং রাজপুত সৈন্যেরা ইংরেজ রাজত্বের গোড়া থেকেই এ পথে এগিয়ে চলেছে—আজ বাঙালী জাতিকেও ইংরেজ রাজত্বের অবসানে সামরিক সংগঠনের দিক দিয়ে নূতন পথে যাত্রা সুরু করতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে বাঙালী জাতির মস্তিষ্ক ও বাহুর মিলিত শক্তিতে পৃথিবীর মধ্যে একটি বিরাট এবং শ্রেষ্ঠ সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠবে—এ আশা অসঙ্গত নয়।

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

শনিবার প্রাতঃকালে হোবার্ট ত্যাগ করিয়া দুই গাড়ী বোঝাই হইয়া চলিয়াছি। এক গাড়ীতে রবিনসন, উড, করেষ্টার ও আমি। আমার সহযাত্রীরা সকলেই সদালাপী। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া ডার ওয়েণ্ট নদীর তীর ধরিয়া চলিয়াছি। সুন্দর দিন। সুন্দর দৃশ্য। দুই-এক স্থানে ধূসর এবং কৃষ্ণ হংস-শ্রেণী দেখিলাম। রবিনসন ভারতবর্ষের কথা তুলিলেন। উড বলিলেন, "আজকের কাগজ দেখিয়াছেন কি? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ওয়াভেলের স্থলে মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতবর্ষের বড়লাট নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ১৯৪৮এর ১৫ই জুনের মধ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।"

আমি—"যত দূর জানি ওয়াভেলের উপর ভারতবর্ষের কংগ্রেস-নেতাদের বেশ আস্থা ছিল। তবে ভারতবর্ষে এখন দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে।"

রবিনসন তাঁহার বাল্যকালের কথা তুলিলেন। বলিলেন,

"আমার পিতা আফগান-যুদ্ধে সেনাপতি লর্ড রবার্টসের এক জন সহকর্মী ছিলেন। আমার জন্ম হয় টাসম্যানিয়ায়। কিন্তু জীবনের প্রথম চার বৎসর আমি ভারতবর্ষে অতিবাহিত করি। কান্দাহার, রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর প্রভৃতি শব্দ তখন আমাদের পরিবারে সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতাম।"

একটু ভাবিয়া বলিলেন, "এখনও বোধ হয় দু-চারিটি হিন্দুস্থানী কথা স্মরণ করিতে পারি। সহস্। বাবুর্চি। খিদ্‌মদ্‌কার। ঠিক বলিতেছি ত?"

একটু থামিয়া সলজ্জ ভাবে হাসিয়া বলিলেন, "আর যে দু-একটা কথা মনে পড়িতেছে সেগুলি বোধ হয় গালাগালি। যেমন, শূয়ারকা বাচ্চা। একবার ভারতবর্ষে যাইয়া আমার বাল্যস্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা আছে।"

হোবার্ট হইতে প্রায় দশ মাইল আসিয়া পড়িয়াছি। অদূরে চকোলেট, কোকো প্রভৃতি প্রস্তুতকারক ক্যাডবেরী কোম্পানীর কারখানা। কারখানাটির চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর; নিকটে ক্লিয়ার মণ্ট শহর। পাশ দিয়া আভাই কুট গেজের রেলগাড়ী চলিয়াছে। পরে বেয়া শহর। সেখানে অষ্ট্রেলিয়ান নিউজ প্রিণ্ট মিল অবস্থিত। এখানে প্রচুর খবরের কাগজ প্রস্তুত হয়। কাছেই নিউ নরফোক শহর। পরে গ্রেটনা গ্রীন ও হ্যামিলটন নামক দুইটি গ্রাম অতিক্রম করিলাম। এ সব স্থানের দৃশ্য ও আবহাওয়া নাকি স্কটল্যাণ্ডের মত। মাঝে মাঝে হপ্‌স্ বৃক্ষের কুঞ্জ ও বড় বড় আপেল-ক্ষেত। একটি গৃহস্থের বাড়ী সুদীর্ঘ পপ্‌লার বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা ঘেরা। বৃক্ষশ্রেণী যেন ব্যূহবদ্ধ হইয়া উন্নত শিরে পবনদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। শীর্ণা 'উজ' নদী পার হইয়া একটি চটিতে চা পান করিলাম।

পরে 'নাইভ' নদী পার হইলাম। তারপর রাস্তার দু'ধারে বিস্তীর্ণ বিরাটকায় ইউক্যালিপটাস্ বা গাম গাছের জঙ্গল আরম্ভ হইল। পাহাড়গুলিও এখন বড়। ক্রমশঃ জঙ্গলের চেহারা বদলাইল। এখন ওয়াট্যাল, সাসাফ্রাস ও ফার্ণ গাছই বেশী। মধ্যাহ্নে টেরেলিয়া শ্যালেটে উপস্থিত হইলাম। শ্যালেট অনেকটা আমাদের ডাক-বাংলো বা সার্কিট-হাউসের মত। এখানে 'ইওলো সাইপ্রাস্' বা স্বর্ণলতার বেড়া বড়ই মনোরম লাগিল। টেরেলিয়া শ্যালেট একটি খাড়া পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত। পাহাড়ের নীচে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কেন্দ্র—উপর হইতে ক্ষুদ্র কুটিরের মত দেখায়। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বাহির হইয়া পড়িলাম। সরিষা ফুলের মত একপ্রকার হলুদ ফুলে জঙ্গল ভর্ত্তি। ক্রমশঃ বাটলার্স গর্জে উপস্থিত হইলাম। অদূরে লেক, সেণ্ট ক্লেয়ার। গর্জের ভিতর দিয়া জল সবেগে নামিতেছে। সেখানে একটি বাঁধ তৈরি হইতেছে। অদূরে পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া সেগুলিকে ক্রেনে করিয়া ট্রেনের মধ্যে ঢালিয়া রেলপথে একটি মিশ্রণকারী যন্ত্রের মধ্যে ঢালা হইতেছে। সেখানে কংক্রিট প্রস্তুত হইয়া যন্ত্রসাহায্যে বাঁধের উপর পতিত হইতেছে।

ওয়াডামানা শক্তিগৃহের সম্মুখে

এইরূপে কংক্রিটের বাঁধটি গাঁথিয়া তোলা হইতেছে। বাঁধটির নাম নিউ ক্লার্ক বাঁধ। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সমস্ত দেখিলাম। পরে আবার টেরেলিয়ায় ফিরিলাম। সেণ্ট ক্লেয়ার হ্রদ হইতেই ডার ওয়েণ্ট নদীর উৎপত্তি। বাটলার্স গর্জের নিকট হইতে ডার ওয়েণ্টের জল টেরেলিয়া পর্য্যন্ত আনা হইতেছে। কাজেই ডার ওয়েণ্ট এখানে ক্ষীণকায়া। জলের রকমারি বাহন। কখনও কংক্রিটের খাল, কখনও লোহার চোঙ, কখনও একুইডাক্ট এবং যেখানে জল উপরে উঠাইতে হইতেছে সেখানে ইনভার্টেড সাইফন। এইরূপে জল টেরেলিয়ায় আনিয়া তত্রত্য খাড়া পাহাড়ের গা দিয়া ৮৫৫ ফুট নীচেকার শক্তিগৃহে প্রেরণ করা হইতেছে। টেরেলিয়ায় ফিরিয়া রাত্রে নীচে নামিয়া শক্তিগৃহ দেখিতে গেলাম। শ্যালেটের উচ্চতা ১৯৫৫ ফুট। যেস্থানে শক্তিগৃহ অবস্থিত তাহার উচ্চতা ১১০০ ফুট। জল পাহাড়ের মাথা হইতে ৮৫৫ ফুট নীচে পড়িতেছে। শক্তিগৃহে পাঁচটি টারবাইন। তিনটি চলিতেছে। টারবাইন ঘুরাইয়া দিয়া জল নামিয়া যাইতেছে। 'নাইভ' নদীর ভিতর দিয়া এই জলরাশি আবার ডার ওয়েণ্টকে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে। রাত্রে শ্যালেটেই ঘুমাইলাম। এখানে বেশ শীত। ঘরে বিদ্যুৎ-উত্তাপক জ্বালাইয়া রাখিতে হইল। ঐ দিন মোট ৯৫ মাইল পথ চলিয়াছি। হোবার্ট হইতে 'উজ' ৫৫ মাইল। উজ হইতে টেরেলিয়া ২৫ মাইল। টেরেলিয়া হইতে বাটলার্স গর্জ ১৫ মাইল। বাটলার্স গর্জ হইতে টেরেলিয়া ফিরিতে এই ১৫ মাইল পথ দ্বিতীয় বার অতিক্রম করিয়াছি।

পরদিন রবিবার প্রাতরাশের পর বাহির হইয়া পড়িলাম। জনশূন্য বন্ধুর 'নাইভ' উপত্যকার ভিতর দিয়া চলিয়াছি। দূর হইতে একটি শিশু দৃষ্টিগোচর হইল। নিশ্চয়ই রাস্তার কোন

চৌকিদার নিকটে ঘর বাঁধিয়া আছে। এ তাহারই শিশু। যে-রাস্তা দিয়া চলিয়াছি, তাহার নাম 'মিসিংলিঙ্ক' বা হারানো

টাসম্যানিয়া মালভূমিতে সঙ্গীগণসহ লেখক
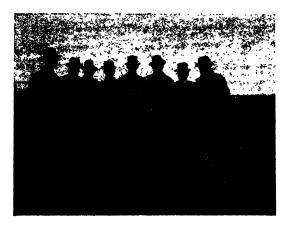
যোগসূত্র। রাস্তাটি নাকি উত্তর ও পশ্চিম উপকূলগামী রাস্তা-দ্বয়কে সংযুক্ত করিয়াছে। একটি সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়িলাম। ইহার নাম 'ওয়াইল্ড ডগ প্লেন্স' বা পাগলা কুকুরের সমভূমি। চারিদিকে পাহাড় ও জঙ্গল। জঙ্গলের মাঝখান দিয়া চলিয়াছি। প্রথমে ছোট ছোট পাইন গাছ, পরে বড় বড় ইউক্যালিপটাস বা গাম গাছের জঙ্গল। এই জঙ্গলে কতকগুলি মেষ চরিতেছে। ইউক্যালিপটাস জঙ্গলের যেন শেষ নাই। ঠিক যেন ঝাড়গ্রামের শালবনের মত। লম্বা লম্বা গাছ সোজা উঠিয়া গিয়াছে; খুব মোটা ও সুগোল। দেখিতে বড় ভাল লাগে। গাছগুলিকে অনায়াসে মারিয়া ফেলিবার জন্য তাহাদের গোড়ায় আংটি কাটিয়া রাখা হইয়াছে। শিকড়গুলি মাটি হইতে যে রস টানিতেছে তাহা আর এই আংটির উপরে উঠিতে পারিতেছে না। ফলে গাছগুলি শুকাইয়া মরিতেছে। নগ্ন অনাহার-ক্লিষ্ট গাছগুলি পঞ্চাশের মন্বন্তরে লঙ্গরখানার সামনে দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট বাঙালীর মত হাত বাড়াইয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এখানে ভূমি নীরস। মাটির সমস্ত রসটুকুই যদি গাম গাছগুলি টানিয়া লয় তবে ঘাস জন্মায় না। ফলে মেষগুলি খাইতে পায় না। ঘাসের বৃদ্ধির জন্যই গাম গাছগুলিকে এভাবে মারিয়া ফেলা হইতেছে। গাছগুলিকে এত উপর হইতে নীচে লোকালয়ে লইয়া গেলে খরচ পোষায় না। তাই বড় বড় সুদৃঢ় গাছগুলিকে ধ্বংস করিবার এই স্বল্পব্যয়সাধ্য উপায় অবলম্বন করা হয়। জ্বালানি কাঠ করিবে সেরূপ লোকও এখানে নাই।

আমরা গ্রেট লেকের পাড় ধরিয়া শানন শক্তিগৃহে পৌঁছিলাম। এখানে একটি শক্তিগৃহে তিনটি কল। শক্তি-গৃহটি খাড়া পাহাড়ের গোড়ায়। পাহাড়ের মাথা হইতে নলের সাহায্যে শক্তিগৃহে জল নামানো হইতেছে। চাকা ঘুরাইয়া দিয়া জল খাল দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে নাকি একটি নববিবাহিতা যুবতী স্বামীর সহিত 'মধুচন্দ্র' যাপনার্থ এখানে আসিয়া এই খালে পড়িয়া গিয়া সলিল-সমাধি লাভ করেন। লোকে এখনও সেকথা স্মরণ করে। এখানকার জল খাল দিয়া ওয়াডামালায় নীত হইতেছে। এখান হইতে আমরাও ওয়াডামালায় পৌঁছিলাম। তখন মধ্যাহ্নকাল।

ওয়াডামালা শক্তিগৃহটি একটি ক্ষুদ্র সমতল উপত্যকায় অবস্থিত। উপত্যকাটির চারিদিকই পাহাড়ে ঘেরা। সবুজ বৃক্ষশ্রেণী পাহাড়গুলির সানুদেশকে যেন ভেলভেটে মুড়িয়া রাখিয়াছে। এখানে দুইটি শক্তিগৃহ। একটিতে নয়টি টারবাইন, অপরটিতে তিনটি। এখানে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। উপত্যকাটি বড় মনোরম। ভোজনের পর উপত্যকা-ভূমিতে অনেকক্ষণ পায়চারি করিলাম। সহসা দেখি একটি পাহাড়ের গায়ে একটি রামধনু লাগিয়া রহিয়াছে। মনে হইল আগাইয়া গেলে রামধনুটিকে হাত দিয়া ধরিতে পারিব।

বাটলার্স গর্জের নিকট পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া ক্রেনের সাহায্যে রেলগাড়ীতে তোলা হইতেছে।

দণ্ডায়মান (বামদিক হইতে)—রিচার্ডসন, রবিনসন, নাইট কেনেলি, লেখক—দূরে আলাপরত ফিটজিরাল্ড ও উড্

ওয়াডামালা ত্যাগ করিয়া আমরা অপরাহ্নে গ্রেট লেকের তীরে 'মিয়েনা' হোটেলে পৌঁছিলাম। হোটেলটি একতলা পনর-ষোলটি ঘর। বারান্দার নীচেই দিগন্তবিস্তৃত হ্রদ। হ্রদের মধ্যে একটি ছোট পাহাড়। হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে একটি বড় বাঁধ। তাহার উপর ঘুরিয়া বেড়াইলাম। বাঁধটি ১১৮০ ফুট দীর্ঘ। বাঁধে চল্লিশ ফুট চওড়া সাতাশটি খিলান এবং পাথরকার্য এক শত ফুট গাঁথুনি আছে। এই বাঁধের ভিতর দিয়া হ্রদের জল শানন শক্তিগৃহে নীত হইতেছে। এই স্থানে বহুলোক বঁড়শি দিয়া মাছ ধরিতে আসে। এই হোটেলটি

ভ্রমণবিলাসীদের একটি বড় আড্ডা। বাঁধের ওপারে মাছের পোনা পালন করিবার কয়েকটি অগভীর পুকুর। সেখান

হকৃসবেরি নদীর পুলের উপর দণ্ডায়মান সান্যাল মহাশয় ও লেখক

হইতে এদেশে পোনা সরবরাহ করা হয়। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছোট ছোট পোনাগুলির সন্তরণলীলা দেখিলাম। হোটেলের বারান্দা হইতে হ্রদ, পাহাড় ও বাঁধের দৃশ্য পরম মনোজ্ঞ।

আমাদের জলবিদ্যুতের কাজগুলি দেখা শেষ হইয়াছে। কয়েক দিন যাবৎ সঙ্গীদের সঙ্গে একত্র ঘুরিয়াছি, একত্র খাইয়াছি, একই গৃহে শয়ন করিয়াছি। রবিনসন, উড এবং কয়েট্টার বড় রসিক। ইঁহারা পথে নানা গল্পগাছা করিয়া আড্ডা বেশ জমাইয়া রাখিয়াছেন। মাঝে মাঝে সমস্বরে চীৎকার করিয়া গানও ধরিয়াছেন। একবার যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের গান জুড়িয়া দিলেন। একবার আমার নামে গান রচনা করিয়া গাহিলেন। একবার একটি গান ধরিলেন, তাহার ভাবার্থ—

সে এত রূপ লইয়া জন্মিল কেন?

সে আদৌ জন্মিল কেন?

এই সব বিষয়ে উডই অগ্রণী। তাহার উৎসাহ অফুরন্ত।

রবিবার রাত্রে ভোজনের পর হোটেলের লাউঞ্জে জোর আড্ডা চলিল। উড দিবাভাগে একটি রস-রচনা লিখিয়াছেন। তিনি এই মৌলিক রচনাটি পাঠ করিলেন। আমাদিগের প্রত্যেককেই তাহার সমালোচনা করিতে হইল। দেখিলাম বৃদ্ধ কিইভিয়ালড এবং কেনেডিও কম রসিক নন। কেবল বৃদ্ধ সেক্রেটারী রিচার্ডসন বরাবর তাঁহার বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন আর মাইট সসম্ভ্রমে দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর হোটেল ত্যাগ করিয়া হোবার্ট অভিমুখে রওনা হইলাম। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া ছুটিয়াছি। পথে একটি ছোট শহরের মত গ্রাম। নাম বথওয়েল। এখানে ক্যাসল হোটেলে লঘু জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিপ্রহরে নিউ নরফোক শহরে পৌঁছিলাম। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন করিলাম। কয়েট্টারের সঙ্গে ক্যামেরা ছিল। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের ছবি লইতেছিলেন। আমাকে চারিটার মধ্যে হোবার্ট পৌঁছিতে হইবে। আমাদের গাড়ী মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরই ছাড়িবে। কমিশনের সভ্যগণ ঐ দিন নিউ নরফোকে থাকিয়া যাইবেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর রবিনসন ও আমি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিউ নরফোক হইতে রওনা হইলাম।

হোবার্টে পৌঁছিয়া প্রথমেই রবিনসনের সঙ্গে ট্রেজারীতে গেলাম। সেখানে বিন্‌স ও অস্‌বোর্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কানাডার অর্থ-বিভাগের কার্য্য দেখিতে বিন্‌স আগামী বৎসর অটোয়া যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহাকে অটোয়ার আপিসগুলির বিবরণ দিলাম, তত্রত্য কর্মচারিগণের নাম ও ঠিকানা দিলাম। পরে ইঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলাম এবং প্রধান মন্ত্রী কস্‌গ্রোভকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিয়া বিমানের নগরস্থিত আপিসে পৌঁছিলাম। বেলা চারটায় হোবার্ট হইতে বিমানঘাটির দিকে রওনা হইলাম। বিমানে টাসম্যানিয়ার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত উড়িয়া সমুদ্রে পড়িতে হইবে। বিমান হইতে টাসম্যানিয়ার অভ্যন্তরস্থ পর্ব্বতসঙ্কুল মালভূমি ও তদুপরি গ্রেট লেক দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সমুদ্রের মধ্যে সূর্য্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য দেখিলাম। পশ্চিম আকাশ পরিষ্কার। দিগন্তের একটু উপরে কোদালে মেঘের সজ্জা। কোদালে মেঘগুলি যেন মণিমুক্তা-খচিত সোনার ঝালর। সূর্য্য ধীরে ধীরে সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করিলেন। নীচে নামিয়াও যেন আকাশের মেঘমালার পানে তাকাইয়া আছেন। মেঘমালা তখনও তাঁহারই অনুরাগের রঙে রঞ্জিত। ধীরে ধীরে মেঘের নীচেকার অংশ গাঢ় লাল হইল। রক্তিমাভা ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। অবশেষে মেঘ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। যেন তাহার উপর কেহ কালি লেপিয়া দিয়াছে।

বিমানে বসিয়া সংবাদপত্রে দেখিলাম, কেসি মহাশয় ব্রিটিশ সরকারের ১৯৪৮-এর ১৫ই জুনের পূর্ব্বে ভারতত্যাগের সঙ্কল্প-ঘোষণার প্রশংসা করিয়াছেন। রাত্রি আটটায় মেলবোর্ণের হোটেলে পৌঁছিলাম। ক্যানবেরার ট্রেজারী ডিপার্টমেণ্ট আমার জন্য এই হোটেল ঠিক করিয়া সেকথা আমাকে টাসম্যানিয়ার ঠিকানায় জানাইয়া দিয়াছিলেন। হোটেলটির নাম 'হোটেল সিসিল'; শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

হোটেলে কেসি সাহেবের চিঠি আমার জন্য অপেক্ষা

করিতেছিল। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁহার আপিসে যাইবার জন্ত আমাকে লিখিয়াছেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সকালে প্রাতরাশের পর সহর দেখিতে বাহির হইলাম। শহরটি সুন্দর। কেন্দ্রস্থলে মার্কিণ প্রথায় সমান ও সমান্তরাল সারি সারি রাজপথ। বাড়ীগুলি সাধারণতঃ পাঁচ ছয় তলা। ঘুরিতে ঘুরিতে চিড়িয়াখানায় উপস্থিত হইলাম। পাখীর ঘরটি খুব ভাল লাগিল; চঞ্চল পাখী-গুলির গায়ে রকমারি রঙের বাহার। অনেক প্রকারের ক্যাঙ্গারু দেখিলাম। দুইটি জানোয়ার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি প্লাটাপুস্, অপরটি এচেণ্ডন। প্লাটাপুস্ জীবজগতের ব্যতিক্রম। ইহা অণ্ডজ অথচ স্তন্যপায়ী। অণ্ডজ জীব যে স্তন্যপায়ী হইতে পারে তাহা ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতেন না। অষ্ট্রেলিয়ান প্লাটাপুস একদিন বৈজ্ঞানিক-জগতে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। এচেণ্ডন ছোট সজারুর মত। গায়ে কাঁটা ভর্ত্তি। আয়তনে বিড়ালের মত। ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম জানোয়ারসমূহের অন্যতম। সন্ধ্যায় সমুদ্র-তীরে বেড়াইতে গেলাম।

তখন সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে; কিন্তু দিনের আলো ঈষৎ কিছু রহিয়াছে। বেলাভূমি পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। নগর-কর্ত্তৃপক্ষ এখানে স্নানের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। বেলাভূমি প্রায় জনশূন্য। সমুদ্রে অল্প অল্প ঢেউ। দু-এক জন স্ত্রী-পুরুষ সমুদ্রে স্নান করিতেছে। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে শহরের দুইটি হাতা সমুদ্রের মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সহসা শহরের আলো জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল যেন বসুন্ধরা কাঞ্চনাভরণ খচিত হাত দুইটি জননী সিন্ধুর পানে বাড়াইয়া দিল। জননী পা টিপিয়া পিছাইয়া যাইতেছেন। কিন্তু আনন্দে তাঁহার তরঙ্গ-বন্ধুর বক্ষ কাঁপিতেছে। উপরে পঞ্চমীর চাঁদ মিটি মিটি হাসিতেছে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী বুধবার কমনওয়েলথ গ্রাণ্টস্ কমিশন আমার সুবিধার্থে একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করিয়াছিলেন। ঐ দিন সকালে ও বিকালে তাঁহাদের আপিসেই কাটাইলাম। কমিশন পূর্ব্বদিন টাসম্যানিয়া হইতে ফিরিয়াছেন। বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহারা আমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সকালে কেসি সাহেবের আপিসে গিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি বাংলাদেশের খবর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইংরেজের ভারত-ত্যাগের সঙ্কল্প-ঘোষণাকে প্রশংসা করিলেন। আলাপান্তে বলিলেন, "আমরা গ্রামে থাকি। শহরে আমাদের একটি ছোট বাড়ী আছে। আমার স্ত্রী আজ সেখানে গিয়াছেন। আপনি যদি বৈকালে আমাদের শহরের বাড়ীতে যাইতে পারেন তবে আমার স্ত্রী বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন।" আমি তাঁহার বাড়ীর ঠিকানা লইয়া হোটেলে ফিরিলাম। মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া অধ্যাপক উডের সহিত মিলিত হইলাম। তিনি তাঁহার সহ-কর্ম্মিগণের সহিত আমাকে আলাপ করাইয়া দিলেন। পরে একটি বড় বইয়ের দোকানে লইয়া গিয়া অষ্ট্রেলিয়া সম্পর্কে কয়েকটি ভাল বইয়ের তালিকা দিলেন। বৈকালে কেসী সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কেসী-গৃহিণী ও কেসী মহাশয় আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সেখানে তাঁহাদের বঙ্গ-প্রবাসকালের সেক্রেটারী মিস্ প্যাট জ্যারেট উপস্থিত ছিলেন। কেসী-গৃহিণী বাংলাদেশের অনেকগুলি নারী-প্রতিষ্ঠানের কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, তিনি এখনও তাহাদের কোন উপকারে আসিতে পারিলে কৃতার্থ হইবেন। আমাকে পানীয় প্রদান করিলেন। আমি মদমিশ্রিত কোন পানীয় গ্রহণ করিব না শুনিয়া তিনি যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কেসী সাহেব অরেঞ্জ কোয়াসের কথা মনে করাইয়া দিলে তিনি যেন থৈ পাইলেন। আমি অরেঞ্জ কোয়াস পান করিলাম। কেসী সাহেবের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্বন্ধে নানা বিষয়ে কথা হইল। কেসী পকেট হইতে একটি সুন্দর রেশমের রুমাল বাহির করিয়া বলিলেন, "বাংলার একটি জেলায় এগুলি তৈরি। এগুলি আমার বড়ই পছন্দ। আপনি যদি এরূপ দু'ডজন রুমাল তৈরি করাইয়া আমাকে পাঠাইতে পারেন তবে আমি বিশেষ উপকৃত বোধ করিব।" আমি স্বীকার করিলে নমুনা-স্বরূপ একটি রুমাল আমাকে দিলেন। গান্ধী, নেহরু ও জিন্নার কথা উঠিল। কেসী-গৃহিণী বলিলেন, "লাটভবনে আমাদের শ' তিনেক ভৃত্য ছিল। যখনই গান্ধী লাট-ভবনে আসিয়া-ছেন তখনই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তিন শত ভৃত্য তাঁহার পদধূলি লইয়াছে। কিন্তু নেহেরু বা জিন্না যখন লাট-ভবনে আসিয়াছেন তখন কাহারও এরূপ আগ্রহ দেখি নাই। তবে কি নেহেরু বা জিন্না সেরূপ জনপ্রিয় নন?"

আমি—"নেহেরু বা জিন্নার চেয়ে বেশী জনপ্রিয় নেতা ভারতবর্ষে নাই। তবে গান্ধীর কথা স্বতন্ত্র। গান্ধী শুধু জনপ্রিয় নেতা নন, তিনি তদপেক্ষা আরও বেশী কিছু।"

কেসী—"হাঁ, গান্ধী সাধারণের চক্ষে দেবতা।'

প্যাট জ্যারেট আমার নিকট একটি বিবৃতি চাহিলেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও কানাডা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতের, অষ্ট্রেলিয়ার এবং ভারত-অষ্ট্রেলিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কের কোন্ রূপ আমার চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে তাহা আমার নিকট জানিতে চাহিলেন। আমি স্বভাবতঃই প্রচার-পরাঙ্মুখ। কিন্তু কেসী সাহেবের আগ্রহাতিশয্যযুক্ত ইহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। স্থির হইল পরদিন সকাল ৮টায় প্যাট জ্যারেট বিবৃতি শুনিবার জন্ত আমার হোটেলে যাইবেন।

সেদিন মেলবোর্নে বেশ গরম পড়িয়াছিল। তাপ ৯৫° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় হোটেলে পার্শ্বের জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি বলিলেন, "এখানে বায়ুর আর্দ্রতা বড় বেশী। কাজেই অল্প গরমে বেশী কষ্ট হয়; ঘামও বেশী হয়। আমাদের পার্থে যখন তাপ ১১০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে তখনও এত কষ্ট হয় না। বরং গ্রীষ্মে আমরা বেশ স্ফূর্তিতে থাকি।" এদেশে এখন গ্রীষ্মকাল চলিতেছে। টাসমানিয়ায় গ্রীষ্মকালে তাপ ৮০° ডিগ্রীর উপরে উঠে না। মেলবোর্নে তাপ সাধারণতঃ ৭০ ৮০ ডিগ্রীর মধ্যে থাকে, কখন কখন ১০০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে। ক্যানবেরায়ও তাপ সাধারণতঃ ৮০° ডিগ্রীর নীচে থাকে। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় মাঝে মাঝে তাপ ১০০ ডিগ্রী ছাড়াইয়া যায়। কুইনসল্যাণ্ডের অবস্থাও তদ্রূপ। এখন পিচ ও পিয়ার ফল পাকিয়াছে। এগুলি টিনে ভরিয়া সেখানকার লোকেরা চালান দেয়। চিনির কারখানায় ষ্ট্রাইক চলিতেছে। সেজন্য ফল টিনে পুরিবার কারখানাগুলি চিনি পাইতেছে না। হাজার হাজার টন ফল হয়তো ইহার দরুন নষ্ট হইয়া যাইবে।

ঐদিন রাত্রিতে খাইবার সময় এক ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত আলাপ হইল। ভদ্রলোক লিবারেল পার্টির প্রচার-সচিব। কেসী সাহেব লিবারেল পার্টির এক জন নেতৃস্থানীয় সভ্য। উপরোক্ত ভদ্রলোক কেসী সাহেব ও বাংলাদেশের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভদ্রলোক গৃহাভাবে সপরিবারে হোটেলে বাস করিতেছেন। বলিলেন, "এদেশে গৃহ-সমস্যা বড় কঠিন। সরকার কিছুই করিতে পারিতেছেন না। ইহুদীগণ শহরে আসিয়া বহু বাড়ী কিনিয়া ফেলিতেছে, এবং সেলামী প্রভৃতি লইয়া লোকের উপর জুলুম করিতেছে।" ভদ্রলোকের স্ত্রীর জ্যোতিষী বা ভবিষ্যদ্বক্তার উপর খুব আস্থা। ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষীগণের সুনাম তাঁহার কানে পৌঁছিয়াছে। তাঁহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি বলিলাম, "ভারতবর্ষে অনেক ভাল জ্যোতিষী আছেন। আবার অনেক ভণ্ড জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীও আছে। তবে জ্যোতিষীর কথার উপর আস্থা স্থাপন করিতে আমি আপনাকে পরামর্শ দিব না, তাঁহাদের নিকট ভবিষ্যৎ জানিয়া লইবার আগ্রহকেও আমি প্রশংসা করি না। অন্ধকার জীবনপথে চলিবার জন্য ভগবান মানুষকে একটি সুন্দর প্রদীপ দিয়াছেন। সেটি তাহার বুদ্ধি। এই ভগবদ্দত্ত প্রদীপের সাহায্যে পথ চলাই শ্রেয়ঃ। এই প্রদীপটি নির্বাণ হইলে বা ইহার উপর আস্থা চলিয়া গেলেই বিপদ।"

ভোজনান্তে এই দম্পতির সঙ্গে অনেক বিষয় আলাপ হইল। স্বামী-স্ত্রী দুজনে আমাকে নিজেদের ঘরে লইয়া গিয়া ইহাদের আট ও দশ বৎসর বয়সের কন্যা দুইটির সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিলেন। কন্যাদ্বয় কলিকাতার কথা শুনিয়াছে। কলিকাতার মানুষ দেখিয়া খুশি হইল।

পরদিন ২৮শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার প্রাতরাশের পর প্যাট জ্যারেট আসিয়া উপস্থিত। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁহার নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দিয়া হোটেল ত্যাগ করিয়া এরোড্রোমে পৌঁছলাম। ক্যানবেরায় গিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন সম্পন্ন করিলাম।

ঐ দিন বৈকালে "হোটেল ক্যানবেরায়" ওয়াণ্টার স্কট নামক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি এদেশের এক জন বিখ্যাত কস্ট-একাউন্টেণ্ট। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে থাকিবে কিনা এই প্রসঙ্গে নানা আলাপ-আলোচনা হইল। স্কট বলিলেন, "আমাদের দেশে সর্ব্বসাধারণের মনে ইংরেজের প্রতি একটা প্রীতির ভাব আছে। অন্য সব বিষয়ে আমাদের মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু ইংরেজদের জন্য সকলেরই মনে খানিকটা স্নেহ বিদ্যমান।"

আমি—"আমরাও ইংরেজজাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সেক্সপীয়র বা নিউটনের নামে সকল ভারতবাসীই মাথা নোয়ায়। শুধু শাসক-ইংরেজের প্রতিই ভারত বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে। ভারতের শাসন-ব্যাপারে হস্তক্ষেপে বিরত হইলে ইংরেজের প্রতি ভারতবাসীর বিরূপ মনোবৃত্তির কোন কারণ থাকিবে না।"

স্কট—অবশ্য আপনারা যা ভাল বোঝেন তাহাই করিবেন। তবে আমার মনে হয় আপনারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে থাকলেই ভাল হইত।

সারিপুত্র ও মোগ্‌গল্লান

শ্রীসুধাময়ী সেনগুপ্ত, এম-এ

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ হয়ত অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সংবাদটি এই যে ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয় সারিপুত্র ও মোগ্‌গল্লানের অস্থিপাত্র বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারত গবর্ণমেণ্টকে উপহৃত হইয়াছে। শীঘ্রই উক্ত অস্থি ভারতে আনয়ন করা হইবে এবং সাঁচী স্তূপের নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে উক্ত অস্থিপাত্র রক্ষিত হইবে।

এই সারিপুত্র ও মোগ্‌গল্লান সম্বন্ধেই যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

সারিপুত্র বুদ্ধের প্রধান শিষ্য ছিলেন এবং মোগ্‌গল্লানের স্থান তাঁহার পরেই ছিল। অবশ্য আনন্দ, উপালী, মহাকশ্যপ প্রভৃতি বুদ্ধের আরও কয়েকজন প্রধান শিষ্য ছিলেন, কিন্তু এই দুই জনের স্থান ছিল সর্ব্বোচ্চে।

সারিপুত্র ও মোগ্‌গল্লান উভয়েই বুদ্ধদেব অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। সারিপুত্র রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী নালক-গ্রাম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল বঙ্গন্ত ব্রাহ্মণ এবং মাতার নাম ছিল রূপসারি। এই রূপসারির পুত্র বলিয়াই তিনি সারিপুত্র (পালি সারিপুত্ত) নামে পরিচিত হন। অনেকের মতে তাঁহার আসল নাম ছিল উপতিষ্য। সারিপুত্রের চুন্দ, উপসেন ও রেবত (পরে খদির-বনিয় নামে খ্যাত) আরও তিন ভ্রাতা এবং চালা, উপচালা ও শিশুপচালা নাম্নী তিন ভগ্নী ছিলেন। তাঁহারা সকলেই পরে বৌদ্ধ সঙ্ঘে যোগদান করেন।

মোগ্‌গল্লান (মৌদ্গল্যায়ন) রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী কোলিতগ্রামে এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই একই দিনেই সারিপুত্রেরও জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ঐ গ্রামের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল মোগ্‌গলী (মৌদ্গলী)। এই দুই পরিবারের মধ্যে সাত পুরুষ ধরিয়া প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। উভয় পরিবারের বালকদ্বয়ও শৈশব হইতেই পরস্পরের বিশেষ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠেন। একদা দুই বন্ধু এক অভিনয় দেখিতে যান এবং সেই অভিনয়দৃষ্টে সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া উভয়ে গৃহত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। তাঁহারা প্রথমে সঞ্জয় নামে এক আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তৎপরে তাঁহারা সদ্‌গুরুলাভের আশায় সমগ্র জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া সমুদয় জ্ঞানী ব্যক্তির সহিতই ধর্ম্মালোচনা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা স্থির করিলেন যে, উভয়ে পৃথক ভাবে পরম তত্ত্বের সন্ধান করিবেন এবং যিনিই প্রথমে উভয়ের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান লাভ করিবেন, তিনিই অপরকে সংবাদ দিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা দুই জনে দুই দিকে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে সারিপুত্র রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অসসজী নামে বুদ্ধের এক শিষ্যের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। তাঁহার মুখে উচ্চারিত একটি শ্লোক শুনিয়াই সারিপুত্রের ধারণা জন্মিল যে, তিনি এতদিন ধরিয়া যে বস্তুর অন্বেষণ করিতেছিলেন, ইঁহার নিকট তাহা লাভ করিবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং 'স্রোতাপন্ন' হইলেন। (বৌদ্ধ ধর্ম্মসাধনার চারিটি স্তর, যথা—স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত্ত্ব। স্রোতাপন্ন—অর্থাৎ যে নির্ব্বাণ-স্রোতে আপন্ন অর্থাৎ নির্ব্বাণলাভের প্রয়াসে যত্নবান। সকৃদাগামী—অর্থাৎ যাহাকে নির্ব্বাণ লাভ করিবার জন্য আরও একবার আসিতে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। অনাগামী—অর্থাৎ যাহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, এই যাহার শেষ জন্ম এবং এই জন্মেই যে অর্হত্ত্ব লাভ করিবে—এই চতুর্থ ও শেষ স্তরই অর্হত্ত্বলাভ)। তৎপরে তিনি মোগ্‌গল্লানকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং অসসজীর প্রমুখাৎ শ্রুত শ্লোকটি তাঁহার সম্মুখে আবৃত্তি করিলেন, শুনিয়া মোগ্‌গল্লানও স্রোতাপন্ন হইলেন। তখন তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বগুরু সঞ্জয়ের নিকট গিয়া তাঁহাকেও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সঞ্জয় রাজী হইলেন না। সঞ্জয়ের পাঁচ শত শিষ্য তাঁহাদের অনুগমন করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং তাঁহারা সদলবলে ভগবান বুদ্ধকে দর্শন করিতে বেণুবনে উপস্থিত হইলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন এবং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্ঘভুক্ত করিয়া লইলেন। সঙ্ঘে প্রবেশের সপ্তাহকাল মধ্যে মোগ্‌গল্লান ও পক্ষকাল মধ্যে সারিপুত্র অর্হত্ত্বলাভ করিলেন।

সারিপুত্র ও মোগ্‌গল্লানের সঙ্ঘ-প্রবেশের দিনেই বুদ্ধদেব ঘোষণা করিলেন যে, এই দুই জনকে তাঁহার প্রধান শিষ্যপদে অভিষিক্ত করা হইল। নবাগত ভিক্ষুদ্বয়ের প্রতি এইরূপ শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শিত হওয়ায় অন্যান্য পুরাতন ভিক্ষুরা বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁহাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, জন্মে জন্মে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই নবীন ভিক্ষুদ্বয় তাঁহার নিকট এই বহুআকাঙ্ক্ষিত পদলাভ করিবার জন্য কত দুঃসহ কঠোর ক্লেশই না সহ্য করিয়াছেন।

বুদ্ধ সারিপুত্র ও মোগ্‌গল্লানকে আদর্শ শিষ্যরূপে গণ্য করিতেন এবং অপরাপর ভিক্ষুদিগকে তাঁহাদের আদর্শ অনু-

সরণ করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি সারিপুত্রকে সঙ্ঘের শিক্ষাদাত্রী জননী ও মোগ্গল্লানকে ধাত্রীর সহিত তুলনা করিতেন। এই দুই শিষ্য তাঁহার পরম বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন এবং সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানের ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার ভার তিনি ইঁহাদের হস্তেই অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও তাঁহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। ধম্মপদ অট্‌ঠ কথায় বর্ণিত আছে যে, দেবদত্ত যখন সঙ্ঘ-মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া পাঁচ শত ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে চলিয়া যান তখন তাঁহাদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য বুদ্ধ এই দুই জনকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ইঁহারা সফলকামও হইয়াছিলেন। অঙ্গুত্তর নিকায়ে একটি ঘটনার উল্লেখে জানা যায় যে এক সময় মোগ্গল্লান একটি দুর্বৃত্ত ভিক্ষুকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

সারিপুত্র বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন, বিশেষতঃ অভিধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। স্বয়ং বুদ্ধদেব সারিপুত্রকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র চতুরার্য্য সত্য (দুঃখ—অর্থাৎ জড়জগতের সব কিছুই দুঃখময় এই জ্ঞান; সমুদয়—অর্থাৎ এই দুঃখের কারণ ও উৎপত্তিমূল, এই দুঃখ নিরোধ এবং নিরোধগামী অষ্টাঙ্গিক মার্গ) তিনি অত্যন্ত সরল ও সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। ভিক্ষুগণ কোনরূপ সঙ্কটে পড়িলে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। ভিক্ষুগণ তাঁহার উপদেশ প্রদানের বিষয় বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। সংযুত্ত নিকায়ের টীকায় এক স্থলে আছে, বুদ্ধ যখন তাবত্রিংশ স্বর্গে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া সঙ্কাশ্য নামক স্থানে অবতরণ করেন, সেই সময়েই সারিপুত্রের জ্ঞানের চরম পরীক্ষা হয়। বুদ্ধদেব সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকট একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং একমাত্র সারিপুত্র ব্যতীত কেহই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। সঙ্ঘের বিধিনিষেধসমূহের খুঁটিনাটি তিনি বিশেষ প্রযত্নের সহিত পালন করিতেন। সঙ্ঘের একটি নিয়ম ছিল এই যে, কোন সন্ন্যাসী একাধিক সামন বা শিক্ষার্থীকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবেন না। সুতরাং যে পরিবার দ্বারা তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন এইরূপ একটি পরিবারের এক বালক তাঁহার নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়া আসিলেও তিনি তাহার পিতামাতার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হন নাই। অবশেষে বুদ্ধদেব এই নিয়ম শিথিল করায় তিনি বালকটিকে উপসম্পদা দান করেন। অপর একটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, সারিপুত্র একবার উদরের যন্ত্রণায় বিশেষ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। মোগ্গল্লান তাঁহাকে ঔষধরূপে রশুন খাইতে অনুরোধ করেন। তিনি নিজেও জানিতেন যে, রশুন ভক্ষণ করিলে আরোগ্যলাভ করিবেন। কিন্তু ভিক্ষুর রশুন সেবন নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া তিনি কিছুতেই রশুন আহার করিতে রাজী হন নাই। অবশেষে বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করাতে তিনি রশুন সেবন করিলেন। দরিদ্রের প্রতি তাঁহার গভীর করুণা ও তাহাদের দুঃখমোচন করিবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা —'তবদাধিক' 'পুণ্য ও তাঁহার পত্নী', 'কুণ্ডকুচ্ছি'সন্ধব', 'জাতক ও 'লোকসতিস্স' প্রভৃতি গল্প হইতে প্রমাণিত হয়। কাহারও সামান্যতম উপকারও তিনি বিস্মৃত হইতেন না। মহাবগ্গে একটি কাহিনীতে উল্লিখিত আছে যে, এক সময় এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস-গ্রহণাভিলাষী হইয়া সঙ্ঘে আগমন করেন। কিন্তু দেখা গেল কোন ভিক্ষু তাঁহাকে উপসম্পদা দান করিতে ইচ্ছুক নহেন। ব্রাহ্মণ সেইজন্য মনকষ্টে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন, এবং দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকেন। একদা বুদ্ধের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হওয়ায় তিনি ভিক্ষুদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ভিক্ষুগণ কারণ বিবৃত করিলে, বুদ্ধ সকল ভিক্ষুকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, কেহ এই ব্রাহ্মণকৃত কোন উপকার স্মরণ করিতে পারিতেছেন কিনা। সারিপুত্র তদুত্তরে বলেন, একদা যখন তিনি নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভিক্ষার্থে গ্রামে প্রবেশ করেন তখন এই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এক চামচ অন্নদান করিয়াছিলেন—(যদিও তাহাতে তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি না হইয়া ক্ষুধানলে ইন্ধনই প্রদত্ত হইয়াছিল)। যাই হোক, এখন বুদ্ধের আদেশে সারিপুত্র সেই ব্রাহ্মণকে উপসম্পদা দান করেন। সঙ্ঘের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও পরিচ্ছন্নতার দিকেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ধম্মপদ টীকায় বর্ণিত আছে, যে সঙ্ঘারামে তিনি বাস করিতেন তথাকার অন্যান্য ভিক্ষুগণ ভিক্ষায় বহির্গত হইলে তিনি সমস্ত সঙ্ঘারাম ঘুরিয়া দেখিয়া বেড়াইতেন। কোন স্থান অপরিষ্কৃত থাকিলে স্বয়ং তাহা সম্মার্জ্জনী দ্বারা মার্জ্জিত করিতেন, আসবাবপত্র যথাস্থানে ঠিক করিয়া রাখিতেন এবং পানীয় ও পদপ্রক্ষালনের জলাধারসমূহ জলপূর্ণ করিয়া রাখিতেন, পাছে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী কেহ সঙ্ঘে আসিয়া বলে যে দেখ, গৌতম বুদ্ধের শিষ্যগণের আবাসস্থান দেখ! এখানে কি অপরিচ্ছন্নতা, কি অব্যবস্থা!

আচার্য্যাদের প্রতি সারিপুত্রের বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াই তিনি তাঁহার পূর্ব্বগুরু সঞ্জয়কে বুদ্ধের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিতে ও সঙ্ঘে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সঞ্জয় অবশ্য তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের শরণ লইবার পরামর্শ যিনি দেন তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের সেই পথপ্রদর্শক গুরু অসসজীর প্রতিও তাঁহার বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। কথিত আছে, তিনি অসসজী যে দিকে আছেন বলিয়া জানিতেন, প্রতি রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সেই দিকে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিতেন ও সেই দিকে মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিতেন। সারিপুত্র পিষ্টক ভক্ষণ করিতে বিশেষ

ভালবাসিতেন, কিন্তু পিণ্ডক ভক্ষণে লোভের প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়া তিনি উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সঙ্ঘস্থ ভিক্ষুগণের মধ্যে কাহাকেও বুদ্ধ বচন অনুসরণে অননুরাগী দেখিলে তাহার প্রতি তাঁহার মনোভাব যেরূপ কঠোর হইয়া উঠিত, কাহারও ধর্ম বিষয়ে অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে তিনি সেইরূপই আনন্দিত হইতেন। মোগ্‌গল্লান ঋদ্ধিশক্তিতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিলে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মোগ্‌গল্লানের ঋদ্ধিশক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি ধ্যান ইত্যাদি বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া ব্যতীত কেবলমাত্র চর্ম্মচক্ষেই প্রেতযোনি ও অন্যান্য অশরীরী আত্মাদের দেখিতে পাইতেন এবং বিভিন্ন লোকে গমন করিয়া তথাকার সংবাদাদি বুদ্ধকে আনিয়া দিতেন। বিমান বত্থু নামক গ্রন্থে তাঁহার এইরূপ বিভিন্ন লোকপরিভ্রমণের বহু উল্লেখ পাওয়া যায় এবং কথিত হয় যে, তিনি দেবলোকের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। সংযুত্ত ও মজ্‌ঝিম নিকায় এবং সুত্ত নিপাতে তাঁহার ঋদ্ধিশক্তির বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। একবার 'মিগার মাতু পাসাদে' বুদ্ধদেব অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ছিলেন উপরিস্থিত প্রকোষ্ঠে—তাহা সত্ত্বেও, নিম্নস্থ প্রকোষ্ঠে ভিক্ষুগণ প্রগল্‌ভ ভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন। তখন বুদ্ধের অনুরোধে মোগ্‌গল্লান ভিক্ষুদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য তাঁহার বিপুল পদভারে সেই গৃহ প্রকম্পিত ও ঘর্ঘরধ্বনি উত্থিত করিয়াছিলেন। অপর এক সময় শক্রের (ইন্দ্র) অহঙ্কার চূর্ণ করিবার এবং তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য তাঁহার বৈজয়ন্ত পুরীও তিনি কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার ঋদ্ধিশক্তির উৎকর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায় নন্দোপনন্দ নামক নাগের দমনে। অপর কোন ভিক্ষুর পক্ষে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর হইত না; কারণ অপর কেহ মোগ্‌গল্লানের ন্যায় এত শীঘ্র ধ্যানের চতুর্থ স্তরে উন্নীত হইতে পারিতেন না; এবং সেইজন্যই বুদ্ধদেব অপর কোন ভিক্ষুকে ঐ নাগদমনের অনুমতি প্রদান করেন নাই।

কিন্তু ঋদ্ধিশক্তি মোগ্‌গল্লানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও জ্ঞানের দিক দিয়াও তিনি হীন ছিলেন না। এ বিষয়ে সারিপুত্রের পরেই ছিল তাঁহার স্থান। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সারিপুত্র ও মোগ্‌গল্লানের ভিক্ষুদিগকে নানা বিষয়ে উপদেশ প্রদানের বহু উল্লেখ বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ বুদ্ধ এক সময় কপিলাবস্তুতে শাক্যগণের নবনির্ম্মিত বিতর্ক গৃহে উপদেশ প্রদানান্তে ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং মোগ্‌গল্লানকে ভিক্ষুদিগের নিকট কিছু বলিবার জন্য আদেশ দেন। তদনুসারে মোগ্‌গল্লান তাঁহাদের নিকট কামনা ও তাহা হইতে মুক্তি-লাভের উপায় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাশেষে বুদ্ধ তাঁহার উপদেশ প্রদান-ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অপর এক স্থলেও ধ্যান ও মুক্তিলাভের উপায়সমূহ সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সারিপুত্র ও মোগ্‌গল্লান এই দুই জনের পরস্পরের প্রতি গভীর প্রীতি ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। ইঁহারা দুই জনে পরস্পরের গুণাবলীর যে কিরূপ প্রশংসা করিতেন বহু শ্লোকে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভগবান্ বুদ্ধের প্রতি উভয়ের অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এই দুই বন্ধুকে দৃঢ়তর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল। বুদ্ধের নিকট হইতে দূরে থাকাকালে তাঁহারা দিব্য দৃষ্টি ও দিব্য শ্রুতি দ্বারা কোন তত্ত্ব বুদ্ধের সহিত কিরূপ তত্ত্বালোচনা করিতেন, তাহা অবগত হইয়া কেবলমাত্র এই বিষয় লইয়াই আলাপ-আলোচনা করিতেন। বুদ্ধের অনুগত সকল ভিক্ষুর প্রতিই সারিপুত্র বন্ধুভাবাপন্ন হইলেও, মোগ্‌গল্লান ও আনন্দের প্রতি তিনি সবিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। বুদ্ধপুত্র রাহুলের প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত স্নেহ ছিল। এক সময় সারিপুত্রের জ্বর হইলে মোগ্‌গল্লান মন্দাকিনী-সরোবর হইতে পদ্মমৃণাল আনিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। গৃহস্থগণের মধ্যে অনাথপিণ্ডক সারিপুত্রের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং তাঁহার, অসুস্থ অবস্থায় তিনি যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য একাধিকবার তাঁহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে সেকথা উল্লিখিত আছে।

বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের কয়েক মাস পূর্ব্বে সারিপুত্র পরলোকগমন করেন। সংযুত্ত নিকায়ে দেখা যায়, তাঁহার জন্মস্থান নালক গ্রামেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার মৃত্যুতে বুদ্ধ তাঁহার উদ্দেশে এক প্রশস্তিবাণী উচ্চারণ করেন। টীকাগ্রন্থে তাঁহার মৃত্যুর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাতে আছে, বুদ্ধ বেলুব গ্রামে শেষ বর্ষা যাপন করিয়া শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, সারিপুত্র সপ্তদিবস মধ্যে নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মাতাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে পাঁচ শত ভিক্ষুসহ পৈতৃক বাটীতে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। কারণ তাঁহার মাতার সাতটি সন্তান অর্হত্ত্ব লাভ করিলেও তিনি স্বয়ং সঙ্ঘে আস্থাশীলা ছিলেন না। সপ্তম দিনে সারিপুত্র নালক গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র উপরেবতের মারফত মাতাকে তাঁহার আগমন-সংবাদ প্রেরণ করিলেন। পুত্র পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে মনে করিয়া মাতা আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গীদের অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সারিপুত্র বাটীতে আসিয়া সেই গৃহে আশ্রয় লইলেন—যেখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথম তিনি পৃথিবীর আলো-বাতাসের স্পর্শলাভ করিয়াছিলেন। এখানে তিনি আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। পুত্র পূর্ব্ববৎ সন্ন্যাসীই আছে দেখিয়া মাতা বিষণ্ণ অন্তরে নিজ গৃহেই আবদ্ধ থাকিতেন, সেইজন্য এ বিষয়ে কিছু জানিতে পারিলেন না। শক্র মহাব্রহ্ম-প্রভৃতি দেবতারা এবং সারি-

পুত্রের ভ্রাতা চুন্দ তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা ঐ সকল দেবতাকে দেখিয়া পুত্রের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি যথার্থই ঐ সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিনা। সারিপুত্র স্বীকার করিলে মাতা পুত্রের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই অবসরে সারিপুত্র তাঁহার নিকট ধর্মব্যাখ্যা করিলেন এবং ফলে তিনিও স্রোতাপন্ন হইলেন। তখন সারিপুত্র মাতৃঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে ইহা উপলব্ধি করিয়া সন্ন্যাসীদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিলে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার সন্ন্যাসীজীবনের সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহাদিগের নিকট কোন অপরাধ করিয়াছেন কি না? তাঁহারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলিলে তিনি শয়ন করিলেন। প্রত্যূষের সঙ্গে সঙ্গে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অমৃতলোকে প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় বন্দোবস্ত করেন। বিশ্বকর্ম্মা তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন। সারিপুত্রের দেহ ভস্মীভূত হইবার পর তাঁহার প্রিয় শিষ্য অনুরুদ্ধ সুগন্ধি বারিসেচনে চিতা নির্ব্বাপিত করেন। চুন্দ তাঁহার অস্থি, ভিক্ষাপাত্র ও বহির্বাস শ্রাবস্তীতে আনয়ন করিলেন।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন সারিপুত্রের দেহাবসান ঘটে। ইহার এক পক্ষকাল পরে, অমাবস্যা তিথিতে মোগ্‌গল্লান দেহ-রক্ষা করেন। টীকাকারদের মতে মোগ্‌গল্লানের মৃত্যু ঘটে নির্গ্রন্থ (জৈন) সম্প্রদায়ের এক চক্রান্তের ফলে। মোগ্‌গল্লান বিবিধ লোকে যাতায়াত করিতেন এবং আসিয়া সংবাদ দিতেন যে, বুদ্ধের পন্থাবলম্বীরা সুখে স্বর্গবাস করিতেছেন; কিন্তু বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বীগণ পুনর্জন্ম লাভ করিয়া, অশেষ দুঃখ-ভোগ করিতেছে। এই সকল সংবাদে অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনুগামীদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের টাইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিল। কালশিলার এক গুহায় মোগ্‌গল্লানের অবস্থানকালে ঐ সকল লোক উক্ত গুহা ঘিরিয়া ফেলিল, কিন্তু তিনি তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া এক ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। উপর্য্যুপরি ছয় দিন এইভাবে বিফল-মনোরথ হইবার পর সপ্তম দিবসে শত্রুরা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিতে সমর্থ হইল এবং প্রচণ্ড প্রহারে মৃতকল্প অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি বহু কষ্টে প্রভু বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া চিরবিদায় প্রার্থনা করিলেন এবং সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু নাকি তাঁহারই এক পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফল। স্ত্রীর প্ররোচনায় তিনি তাঁহার অন্ধ পিতামাতাকে বনের মধ্যে লইয়া যান এবং তাঁহারা তস্কর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন, এই-রূপ ভান করিয়া প্রহারপূর্ব্বক তাঁহাদের মৃত্যু ঘটান। এই পাপের ফলে তাঁহাকে বহু দিন নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এবং শেষ জন্মে এইরূপ প্রহারের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মোগ্‌গল্লানের বর্ণ ছিল নীলোৎপল অথবা নবীন জল-ধরের ন্যায় শ্যামল। সিংহল দেশে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, বহুদিন নরকে বাস করার জন্য তাঁহার বর্ণ ঐরূপ হইয়াছিল।

রাখী বন্ধন

শ্রীশান্তি পাল

হৃদয় দেউলে কে দিল আঘাত?
দ্বারের কাছে,
হেরি পরিচিত পান্থ সেথায়
দাঁড়ায়ে আছে!
কতো বেদনার ছায়া ঘনাল আমার মনে,
কতো অতীতের মায়া জাগাল নীরব ক্ষণে,
কেন অকারণ নেচে ওঠে বুক,—
কলাপী নাচে?
কাহারে যাচে!
বন্ধু এখন ছুঁয়োনা আমায়
দাঁড়াও স'রে,
রাতের নেশায় প্রাণের পেয়ালা
রয়েছে ভ'রে!

কেন কলরব এতো মদির নয়ন হানি?
কেন হাসা-কাঁদা এতো বুকের কাছেতে টানি?
কেন চেয়ে থাকো ছল-ছল দিঠি,
মুখের 'পরে?
আবেগ ভরে!
বন্ধু যখন ভোরের আলোয়
ডাকিবে পাখী,
তখন আমার দেউলে পশিও
সুরভি মাখি!
যতো কথা আছে বোলো বিরলে বসিয়া একা,
যতো গান আছে গেয়ো পুরানো দিনের শেখা,
অধরের ছোঁয়া একটু তখন দিও,
চপল আঁখি,
বাঁধিও রাখী!

আরব রাসায়নিক প্রক্রিয়া

এম. আকবর আলী, এম-এস্‌সি

আরব রসায়ন-বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করলে একটা জিনিষ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটা হ'ল এর মধ্যে সুশৃঙ্খল সুনিয়ন্ত্রিত পন্থাগুলি। আরব রাসায়নিকগণ নানা বিষয়ে হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করলেও তাঁদের গবেষণার প্রকৃত রসায়ন বলতে যেটুকুর সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে হেঁয়ালীর স্থান নাই। অবশ্য এই প্রকৃত রসায়ন কতটুকু বা কি সে সম্বন্ধে বাদানুবাদের যথেষ্ট অবকাশ আছে। তবে প্রকৃত রসায়ন হিসাবে এর মূল্য যাই হোক না কেন, এতে অনুসৃত প্রক্রিয়াগুলির মূল্য কিন্তু কিছুতেই কম নয়। অষ্টম শতাব্দীতে এগুলির উদ্ভাবনা বা কার্য্যকরী ভাবে ব্যবহারিক মূল্যও উপেক্ষণীয় নয়। আরব রসায়নের মধ্যে যেটুকু প্রকৃত রসায়নের সন্ধান পাওয়া যায় তার সবই যে এমনি ধরণের সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণের ফলে উদ্ভূত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আরব রাসায়নিকেরা রসায়ন-বিজ্ঞানে যে সমস্ত প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়েছিলেন এই প্রবন্ধে তারই উল্লেখ করা যাবে।

এই প্রক্রিয়াগুলির অধিকাংশেরই সন্ধান পাওয়া যায় প্রথম আরব রাসায়নিক জাবিরের গ্রন্থে। তবে স্পষ্ট বর্ণনা ও উদাহরণ দিয়ে প্রক্রিয়াগুলি সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক রাজী অগ্রগণ্য। জাবিরের সম্বন্ধে নানা সন্দেহ ও বাদানুবাদের অবকাশ থাকলেও রাজী ও রাজীর গ্রন্থাবলীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের ঐকমত্য আছে। সেইজন্যই উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলি যে আরব রাসায়নিকদেরই আবিষ্কৃত এবং পরবর্ত্তী কালের প্রক্ষিপ্ত নয় সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে। প্রক্রিয়াগুলি থেকে আবিষ্কৃত নানা রাসায়নিক দ্রব্য দেখে মনে হয়, আরব রাসায়নিকদেরই হাতে এ বিজ্ঞানের আরো উন্নতি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয় নাই। পরবর্ত্তী রাসায়নিকদের অধৈর্য্য ও অস্থিরচিত্ততাই হচ্ছে এর কারণ। বস্তুতঃ জাবিরের এবং রাজীর প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক ধারাকে যদি তাঁদের পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ এমনি সুস্পষ্ট, সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে অনুসরণ করতেন তা হলে আরব রসায়ন-বিজ্ঞানের অগ্রগতি হঠাৎ এভাবে ব্যাহত হত না। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে রসায়ন-বিজ্ঞানের যে উন্নতি হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য করলে অনায়াসে বলা চলে যে এমনি উন্নতি আরব রসায়নেও নবম দশম শতাব্দীতেই হয়ত অসম্ভব হ'ত না। রাজীর পরে যাঁরা রসায়ন-চর্চ্চা করেন তাঁদের অনেকেই বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বিশেষ করে পরশ-পাথর ও অমরত্বলাভের সাধনাকেই আঁকড়ে ধরেছেন, এইজন্যই তাঁরা পূর্ব্বেকার বৈজ্ঞানিকদের কাজের ধারা অনুসরণ না করে তাঁদের হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষার প্রকৃত ব্যাখ্যা বের করতে লেগে গেছেন। আর তারই ফলে কূট তর্কজালের আশ্রয় নিয়েছেন। দুই-এক জন সামান্য একটু বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধির আশ্রয় নিলেও সহানুভূতির অভাবে তাঁদের অনেকেরই কাজ এগুতে পারে নি। Stapleton এবং Azo আরব রসায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—

"If Ar-Razi had been followed by men as keen as himself an experimental work in chemistry might have come into being several hundreds of years before it actually was born. As it was, subsequent writers on Alchemy were content either to copy or in many cases to pervert with results that are only evident when we follow up any particular experiment given by Jabir or Ar-Razi."

জাবিরের ও রাজীর পরবর্ত্তী কালের আরব রসায়ন সম্বন্ধে Stapleton এবং Az .-এর উক্তি যে অনেকটা সত্য, আরব রসায়ন আলোচনা করলে তা স্বতঃই হৃদয়ঙ্গম হবে।

আরব রাসায়নিকেরা রসায়ন-শাস্ত্র আলোচনায় যে সমস্ত প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতেন এখানে তার কিছু বর্ণনা দেওয়া গেল।

বিশুদ্ধি করণের প্রণালী

১। তাক্‌তির—"ক'র" (cucurbit) এবং আম্বিক (alembic) ব্যবহার করে বিন্দু বিন্দু (কাতরা) পতিত নির্য্যাসকে একটি গ্রাহকের [কাবিলার (Receiver)] মধ্যে ধরা। এটিকে বর্ত্তমানের Distillation প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। সাধারণতঃ পাতন-পন্থা হিসাবেই এটি ব্যবহৃত হ'ত। তবে সব সময়েই তাক্‌তির বলতে এই পন্থাই অনুসরণ করা হয়েছে এ বলা চলে না। অনেক সময় দুটি জিনিষের মিকচার বা মিশ্রণ থেকে সাধারণভাবে জল অপসারণ বা অন্য জিনিষ মিশ্রিত তরল পদার্থকে থিতাতে দিয়ে উপরকার তরল পদার্থ আস্রাবণ বা এমনি কাগজ কিম্বা কাপড়ের সাহায্যে ফিলটার করার প্রথাকেও "তাক্‌তির" নামে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্ত্তমানের Filtration ও Decantation পন্থাকেও তাক্‌তির প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক কথায় তাক্‌তির প্রধানতঃ Distillation পন্থা হলেও সময় সময় Filtration ও Decantation হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে।

২। ইসতিনযাল—মূষার উপরে অন্য একটি সচ্ছিদ্র মূষা (বুত বার বুত)—Descensory) ব্যবহার করে জিনিষ-

গুলোকে বিশুদ্ধ করা। যে জিনিষটাকে শোধন করতে হবে সেটিকে তলায় ছিদ্রবিশিষ্ট মুচিতে রেখে গরম করা হয়। গরম করলে জিনিষটি গলে ছিদ্র দিয়ে নীচের মুচিতে জমা হয়। ময়লা, অপরিষ্কার গাদ ইত্যাদি সব উপরের মুচিতেই রয়ে থাকে। রাজীর মাদখাল ও কিতাবুল আসরার গ্রন্থের যন্ত্রপাতির বর্ণনার মধ্যে এ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। সাধারণতঃ লোহা গলানোর ব্যাপারেই এ-পদ্ধতির বেশী ব্যবহার দেখা যায়। লোহাকে প্রথমে আরসিনো সালফাইডে পরিণত করে ইসতিনজাল করে গলানো হ'ত। ইসতিনজাল অর্থ নীচে নামানো (making descend)। মুখা দুটি কাদা দিয়ে জোড়া লাগানো হ'ত।

তাকসিদ—প্রক্রিয়া হিসাবে একে ইসতেনজালেরই অন্যতম প্রক্রিয়া বলা চলে। তবে এ একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তাকসিদের ধাতুগত অর্থ হ'ল যে জিনিষটি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে তার মধ্যে একটি বিশুদ্ধীকৃত উপাদান (আসাদ) বসিয়ে দেওয়া—ধাতু ও তৎকালীন বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক প্রস্তর নামে অভিহিত নানা ধাতব পদার্থের উপর এই প্রথা প্রয়োগ করা হ'ত। তবে ধাতুগুলির মধ্যে লোহাই একমাত্র ধাতু যার উপর এই পদ্ধতি সাধারণতঃ প্রযুক্ত হ'ত। এর কারণও বোধ হয় লৌহের বৈশিষ্ট্য। এরিষ্টটলের মতে অন্য পাঁচ ধাতুর চেয়ে এতে মৃত্তিকার অংশ বেশী। (Meteorologica—Webster's translation.) ধাতু ছাড়া প্রস্তর নামে অভিহিত ছয়টি পদার্থের উপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই ছয়টি জিনিষ হ'ল মারকাসীসা (Pyrites), মাগনিসিয়া (earthly minerals), তাউস (Iron oxide), কাঁচ, তালক (mica and asbestos) ও জিবসিন (Gypsum)—অবশ্য লৌহের উপর প্রযুক্ত পদ্ধতি ও ইসতিনজাল প্রথা একই। রাজীর ধারণামতে লোহার সঙ্গে যদি উসরুব (সীসা) এবং একটু সাদা এলিক্সির মিশানো যায় তা হলেই লোহা বিশুদ্ধ রৌপ্যে পরিণত হবে।

৩। তাশবিয়াহ—এর ইংরেজী অনুবাদ দাঁড়াবে Assation বা Roasting। যে জিনিষটিতে তাশবিয়াহ প্রথায় রাসায়নিক প্রক্রিয়া চালাতে হবে সেটিকে প্রথমে একটি "সালাইয়াহ"র উপর রেখে জল দিয়ে ভিজিয়ে নেওয়া হ'ত। তারপর ভিজা জিনিষকে, চারদিকে ভাল করে লেপা একটি বোতল বা বাটিতে রাখা হ'ত। অন্য একটি পাত্র আগে থেকেই চুল্লীর উপর রেখে দেওয়া হ'ত। যখন আগুনের উত্তাপে অতিরিক্ত জল উবে গিয়েছে বলে মনে হ'ত তখন বোতলটির মুখ বন্ধ করে দেওয়া হ'ত। তারপর যতক্ষণ না প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় ততক্ষণ তাপ দেওয়া চলতে থাকত। প্রক্রিয়াটি বর্তমানের airbath-এর অনুরূপ। একেও airbath বলা চলে। এ প্রক্রিয়াটির একটি বিশেষত্ব হ'ল এই যে, এতে পরিমিত তাপ পাওয়া যায়। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তৎকালীন বৈজ্ঞানিকগণও পরিমিত তাপের সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং তারই জন্যে তাঁরা Airbath পন্থা উদ্ভাবন করেন। সে হিসেবে এ প্রক্রিয়াটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

৪। তাবখ—এ তাশবিয়াহরই অন্যতম প্রণালী। ইংরেজী অনুবাদে একে Coction বা digestion বলা যায়। জিনিষটি যদি খুব বেশী আর্দ্র হ'ত তা হলেই এ প্রণালী প্রযুক্ত হ'ত।

৫। তালগিম—আলগাম—Amalgamation—ধাতুর সঙ্গে পারদের সংমিশ্রণ-প্রথাই তালগিম নামে পরিচিত। শব্দটির ধাতুগত অর্থ হ'ল বন্দী করা। সাধারণতঃ ঊর্দ্ধপাতন (sublimation) ও ভস্মীকরণের (calcination) পূর্ব্ব-ব্যবস্থা হিসাবে এ প্রণালীটি প্রযুক্ত হ'ত। যে জিনিষ বা ধাতুকে ঊর্দ্ধপাতন বা ভস্মীকরণ করতে হবে সেটিকে প্রথমে পারদের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে এলয় প্রস্তুত করে নেওয়া হ'ত। এই এলয়-প্রস্তুত-প্রথাকেই তালগিম বলে। যে ভাবে এই এলয় প্রস্তুত করা হ'ত তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় একে তালগিম বা বন্দীকরণ নাম দেওয়া হয়। এই প্রথাটি দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত একই ভাবে প্রচলিত থাকে। প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে যে, এই তালগিম শব্দ থেকেই বর্ত্তমান ইংরেজী amalgam শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। তালগাম শব্দটির past participle হ'ল "মুলগাম"—অর্থাৎ, "যাকে এই প্রথায় উজ্জীবিত করা হয়েছে।" রাজীর কিতাবুল আসরারে বর্ণিত একটি উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করা গেল। তার থেকে এ প্রথাটি সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যাবে। "দুই খণ্ড সীসা একসঙ্গে একটি লোহার চামচে (মিগরাফা) গলিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে এক জায়গায় রেখে দাও। যখন এগুলো প্রায় শক্ত হয়ে আসতে থাকবে তখন খলের একটি মুষল নিয়ে চামচের উপর জিনিষগুলোতে চাপ দিতে থাক, এবং আস্তে আস্তে এই চামচের মধ্যে পারদ ঢেলে দিতে থাক। যতক্ষণ না পারদ এগুলির সঙ্গে মিশে শক্ত পাথরে পরিণত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এমনিধারা চালাতে হবে। এই পারদকে কিন্তু পূর্ব্বে থেকেই বিশুদ্ধ করে নেওয়া দরকার। মিশ্রণপ্রক্রিয়ার পূর্ব্বে বিশুদ্ধ পারদকে জলপাইয়ের তেলে সিক্ত পশমী কাপড়ের মধ্যে রেখে দিয়ে পারদ ভাল ভাবে নিংড়ে নিতে হবে।

৬। গোসল—lavation বা washing—এটিও ঊর্দ্ধপাতনের পূর্ব্বেকার পদ্ধতি। এর নানা প্রণালীর সন্ধান পাওয়া যায়। এক প্রণালী হ'ল জিনিষটির সঙ্গে লবণ মিশিয়ে গরম করা। এমনি ভাবে গরম করা জিনিষটিকে কিস্টারের উপর জল দিয়ে ধোয়া হ'ত। এই হ'ল গোসল। এই গোসলের পরেই এ জিনিষটি ঊর্দ্ধপাতন করবার উপযোগী হয়েছে বলে মনে করা হ'ত।

তাসিদ—ঊর্দ্ধপাতন (sublimation) প্রথা বর্ত্তমানের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে ভাবে ব্যবহৃত হয় আরব-রসায়নে

তাসিদ প্রথাও অনেকটা সেই ভাবেই নিষ্পন্ন হ'ত। "উছালে" (Aludel) এ পদ্ধতির কাজ সমাধান হ'ত। অবশ্য সময় সময় তাসিদ ও তাকতির একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল-কেমীবিদগণ এই উছালকে একটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র বলে মনে করতেন। উছাল কি ভাবে তৈরি করতে হয় "রাসথাল" এবং "কিতাবুল আসরারে" সে সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ সম্বন্ধে যন্ত্রপাতি বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। তাসিদের কাজ কি ভাবে চলত, পারদ ঊর্দ্ধ-পাতনের বর্ণনা থেকে তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। জাবিরের Book of Seventy-র ৬১তম অধ্যায়ে পারদ ঊর্দ্ধ-পাতনের বর্ণনা আছে। রাজী তাঁর কিতাবুল আসরার গ্রন্থেও ঠিক একই ভাবের বর্ণনা আছে। রাজী যে জাবিরের পন্থারই অনুসরণ করেছেন দুইটি বর্ণনার সামঞ্জস্য থেকেই তা বেশ বোঝা যায়। তবে এটি জাবিরের নিজস্ব উদ্ভাবনা, না পূর্ব্বেকার গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থ থেকে নেওয়া সে বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। Stapleton ও Azo-র মতে জাবির খুব সম্ভব এটি গ্রীক বৈজ্ঞানিক-গ্রন্থ থেকে পেয়েছেন। রাজীর পারদ ঊর্দ্ধপাতনের পন্থাটির এখানে উল্লেখ করা গেল।

"পারদ ঊর্দ্ধপাতনের দুইটি পন্থা আছে। একটি লাল পারদের জন্য, অন্যটি সাদা পারদের নিমিত্ত। এই ঊর্দ্ধপাতনের মধ্যে দুটি বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। এক হ'ল একে আর্দ্রতাবিমুক্ত করা, আর অপরটি হ'ল একে শুষ্ক করা যেন এটি বিশোষক হতে পারে। আর্দ্রতা দুই ভাবে বিদূরিত করা যেতে পারে। প্রথমে, যে জিনিষটির সঙ্গে ঊর্দ্ধপাতন করতে হবে তার সঙ্গে এটিকে ভাল করে মেড়ে নাও। এই ভাবে মাড়া জিনিষটাকে একটা শিশির (কারুরা) মধ্যে পুরে নিয়ে মৃদু আগুনের জ্বালে তাপ দিতে থাক। শিশিটার চার দিক আগে থেকেই কাদা দিয়ে ভাল করে লেপে নিতে হবে। খানিকক্ষণ তাপ দেওয়ার পর আবার মেড়ে নাও। আবার তাপ দাও। এই রকম সাত বার কর যতক্ষণ না পারদ সম্পূর্ণ ভাবে 'মরে' যায়। তার পর একে আবার যে জিনিষের সঙ্গে ইচ্ছা ঊর্দ্ধপাতন কর। এর পর আবার মৃদু তাপে গরম করে এলুডালে রেখে দাও। পারদে যে আর্দ্রতা আছে সেটুকু সব নিঃশেষে পাতিত করবার জন্যে এলুডালের উপর অল্পপরিসর নলবিশিষ্ট কাঁচ অথবা সবুজ মৃন্ময় পাত্র রেখে দিতে হবে। নলের নীচেও একটি পাত্র (মুস্তুররুজাহ্) রেখে দিতে হবে।

এলেমবিকের জায়গায় এলুডালের মাথার উপর একটা ঢাকনা (মিকাববাহ্) ভাল করে বসিয়ে নিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এর উপরে যেন একটা ছিদ্র থাকে। ছিদ্রটা এমন হবে যে বড় একটি সূচের মাথা এর মধ্যে অনায়াসে ঢুকতে পারে। এই ছিদ্রের মধ্যে প্রদীপের একটি পশমী সলিতা রেখে দিতে হবে। সলিতার একদিক পাত্রের উপর ঝুলে থাকবে যেন পারদের মধ্যে যত আর্দ্রতা আছে সবই তাতে পাতিত হতে পারে।

এর পর এই এলেমবিক বা ঢাকনাটা সরিয়ে ফেলে অন্য একটা ঢাকনা দিয়ে এলুডালের মুখটি বন্ধ করতে হবে। ঢাকনা যেন এমন হয় যে এলুডালের মুখের উপর সুন্দর ভাবে বসানো যেতে পারে। ঢাকনাটি বসিয়ে দিয়ে জোড়ের জায়গায় উত্তমরূপে কাদা দিয়ে এঁটে দিতে হবে।

এলেমবিক ব্যবহারের চেয়ে অধিকতর উপযোগী হয়, যদি এলডালের উপর একটি সচ্ছিদ্র ঢাকনা ব্যবহার করা যায়। ছিদ্রটি কনিষ্ঠ অঙ্গুলি প্রবেশ করতে পারে এমনি বড় হওয়া দরকার। এমনি ভাবে এলুডালে কাজ করতে যতক্ষণ না জিনিষটিকে সাদা বা কালো ধূলির মত উপরে উঠতে দেখা যায় ততক্ষণ ছিদ্রটি খোলাই রাখতে হবে। সাদা বা কালো রঙের ধূলির মত জিনিষ উপরে উঠতে দেখলেই বোঝা যাবে যে পারদের আর্দ্রতা বিদূরিত হয়ে গেছে। এর পর জাবির ইবনে হাইয়ানের নির্দ্দেশ অনুসারে মসৃণ একটি কাঠির মাথায় ন্যাকড়া জড়িয়ে ছিদ্রটি বন্ধ করে দিতে হবে।

সাধারণতঃ নিম্নোক্ত জিনিষগুলির সঙ্গে পারদ ঊর্দ্ধপাতন করা যেতে পারে—ফটকিরি, তুতিয়া, লবণ, গন্ধক, চুণ, গুঁড়া ইট, কাঁচ, লাক্ষার (gall nut) ছাই, ওকের ছাই, মারকাসীদা —এবং তরল পদার্থের মধ্যে ভিনেগার, তুতিয়ার জল, সাল এমোনিয়াকের জল, ফটকিরির জল "জাদ আর রাগওয়া" নামক সেই পারদ ও গন্ধকের জল।

"সাদা"র জন্য পারদ ঊর্দ্ধপাতন

এক 'রতল' পরিমাণ জমানো পারদ নাও এবং সাদা ফটকিরি লবণ ও ছাই প্রত্যেকটি সম-পরিমাণ নিয়ে একসঙ্গে উত্তমরূপে গুঁড়া করে মিশাও। গুঁড়াগুলোকে একটা ছালাইয়ার উপর বিছিয়ে নিয়ে ভিনেগার ছিটিয়ে দাও। তারপর সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা করে অর্থাৎ সারাদিনে তিন ঘণ্টা করে খুব ভাল করে গুঁড়া মিশাও। তারপর কাদা দিয়ে আবৃত একটা বোতলের মধ্যে রেখে দাও। এইবার বোতলটার মুখ বন্ধ করে যে উনুনে এই মাত্র রুটি সেঁকা হয়েছে তার গরম ছাইয়ের উপর রেখে দাও। এই ভাবেই এক রাত থাকতে দাও। সকালবেলা জিনিষটাকে গুঁড়া করে এলুডালের পাত্রের মধ্যে রাখ। কিছু গুঁড়া লবণ এলুডালের তলায় রেখে দাও। এইবার পূর্ব্বের মত এলুডালের উপর এলেমবিক ভালরূপে স্থাপন কর। তারপর এই ভাবে তাপ দিয়ে জিনিষটির আর্দ্রতা বিদূরিত কর। এর পর এলেমবিক তুলে নিয়ে তার জায়গায় অন্য একটি ঢাকনা রাখ এবং জোড়ের জায়গা কাদা দিয়ে লেপে দাও। কিন্তু যতক্ষণ না এই আগুনের মৃদু তাপে আর্দ্রতা বিদূরিত হয়ে যায় ততক্ষণ এর নীচে অল্প আগুন জেলে রাখ। ঢাকনা বেশ ভাল করে লাগিয়ে

নিয়ে এলুডালটিকে ঘণ্টাখানেক ধরে মৃদু তাপ দিতে থাক। তারপর আগুনের জোর একটু বাড়িয়ে অধিকতর তাপ উৎপাদন কর। প্রত্যেক রতল জিনিষের জন্ত ১২ ঘণ্টা ধরে এমনি ভাবে তাপ দিতে হবে। যখনই ঢাকনার পাশটা বেশী উত্তপ্ত হয়ে উঠবে তখনই আগুন কমিয়ে দিও—তা না হলে ঢাকনার নীচে তাকে যে জিনিষ জমা হবে তা আগুনে পুড়ে যেতে পারে এবং নষ্টও হতে পারে। এই ভাবেই চলতে থাকবে যতক্ষণ না সমস্ত জিনিষ ঊর্দ্ধপাতন হয়। যা হোক এই উৎক্ষেপকে আবার অবশিষ্টাংশের সঙ্গে মিশিয়ে গুঁড়া করে নিয়ে পুনর্ব্বার উৎক্ষিপ্ত করতে হবে। তিন বার এই রকম করতে হবে।

চুল্লী (আতানিন) থেকে পোড়া হাড় নিয়ে খুব ভাল করে গুঁড়া কর। উৎক্ষেপের সঙ্গে সমপরিমাণ গুঁড়া-করা পোড়া হাড় এক ঘণ্টা ধরে উত্তমরূপে বিচুর্ণ কর। প্রত্যেক বার নূতন নূতন হাড়ের গুঁড়া দিতে হবে। তৃতীয় বারে সাদা ময়া বিশোধক জিনিষ বেরিয়ে আসবে। ঢাকনার এক পাশে একটা ছিদ্র রাখা দরকার। ছিদ্রটি এমন হবে যেন একটি বড় সূচ তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। মাথায় তুলা জড়ানো একটা কাঠি এর মধ্যে ঢুকিয়ে রাখ। এই কাঠিটি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বের করে দেখতে হবে। এর সঙ্গে যে উৎক্ষেপ লেগে থাকবে তা একটি তাকের ওপর রেখে দাও। এই ভাবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় পর্য্যবেক্ষণের পর যখন দেখা যাবে যে, আর কোন উৎক্ষেপ বেরিয়ে আসছে না তখন আগুন নিবিয়ে দেবে। এবার যন্ত্রটিকে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে দাও। তারপর জোড়টি আস্তে আস্তে ভেঙে দিয়ে শেলকের উপর যে জিনিষগুলো জড়ো হয়েছে সেগুলোকে সংগ্রহ কর। এই সংগৃহীত জিনিষগুলো রেড়ীর তেল (খিরওয়া) দিয়ে ভিজিয়ে নরম করে একটি কাদা দিয়ে লেপা শিশির মধ্যে রাখ। শিশিটিকে একটি ছাইভরা পাত্রের উপর রেখে একখণ্ড কাঠের টুকরা দিয়ে বন্ধ করে দাও। ছাইয়ের পাত্রটির নীচে আগুন জালিয়ে দাও যাতে আর্দ্রতা বিদূরিত হয়। তারপর শিশিটির মুখ খুব ভাল ভাবে সীল করে দিয়ে উপরে ছাইচাপা দাও। এই ছাইয়ের গাদার উপর ছোট ছোট কয়লা রেখে আগুন জালিয়ে দাও। এমনি ভাবে শিশির মধ্যেকার জিনিষগুলো জমে যাবে। চীনা আয়না তৈরি করতে যে ধাতু ব্যবহৃত হয় এটা দেখতে তারই মত হবে। এটা হয়ে গেলে এর এক দিরহাম বিশ দিরহাম তামার উপর ঢেলে দাও। জিনিষটা তার মধ্যে প্রবেশ করে বেশ কাজ করবে।

তাথনিক—তারখিম। তাথনিক (Constriction) বা তারখিম (Incubation) তাসিদেরই একটি সহজ পন্থা। এতে ফ্লাক (কারাবি) ব্যবহৃত হয়। জিনিষটি ফ্লাকের মধ্যে রেখে আস্তে আস্তে তাপ দিতে হবে। তবে যদি জিনিষটির সারাংশ বের করতে হয় তা হলে তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ফ্লাকে রাখতে হবে। তাপ দিতে দিতে জল বা তৈলাক্ত জিনিষটি যখন উবে যাবে তখন বোতলের মুখ বন্ধ করে তাপের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হবে। যতক্ষণ না সমস্ত জিনিষটি উৎক্ষিপ্ত হয়ে ফ্লাকের গলার কাছে জমা হয় ততক্ষণ এমনি তাপ দিতে হবে।

৮। তাকলিস—এর অর্থ ভস্মীকরণ। বর্ত্তমানের calcination নামে প্রচলিত পন্থাটির অনুরূপ। এর প্রক্রিয়া অনেকটা তাশবিয়ার অনুরূপ। এতে কাদা লেপা পাত্রটিকে প্রত্যক্ষভাবেই আগুনের তাপে দেওয়া হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জিনিষটি গুঁড়ো হয়ে যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এমনি তাপ দেওয়া চলতে থাকে।

রাজী কি ভাবে এই প্রক্রিয়ায় কাজ করতেন "কিতাবুল আসরার" থেকে তার একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা গেল। এ থেকে অতি সহজেই প্রতীয়মান হবে যে, Phlogiston Theory বর্ত্তমান রসায়নের ইতিহাসে যে সময় থেকে প্রথম উদ্ভাবিত হয় বলে বর্ণিত,তার প্রায় সাড়ে সাত শ' বৎসর আগে থেকেই বৈজ্ঞানিকদের মনে উঁকিঝুঁকি মারছিল। "আজসাদ (দেহ অর্থাৎ ধাতু), পাথর, লবণ পদার্থ, গাদ, ডিমের খোসা এবং আসদাফ (শুক্তি ও শামুকের খোলস) ইত্যাদির উপর তাকলিস-প্রথা প্রয়োগ করা হয়। এদের আসল কাজ হ'ল তাদের দৈহিক উপাদান নষ্ট করা। তাদের মধ্যে যে তেল ও গন্ধক জাতীয় জিনিষ রয়েছে সেগুলো পুড়িয়ে দেওয়া এবং এই ভাবে তাদের সাদা চুনে পরিণত করা। এর পর অবশ্য আর অধিক ভাগ করা যেতে পারে না। দ্রবণীয় পদার্থের বেলায় নিম্নোক্ত তিন ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রথম পুড়িয়ে, দ্বিতীয় তাশ'দয়াহ অর্থাৎ মরিচাযুক্ত করে এবং তৃতীয় প্রথা হচ্ছে এমালগাম করে। তাশদিয়াহ হ'ল অন্ত রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে রাসায়নিক প্রথায় কাজ করা।

প্রথম প্রথায় পুড়িয়ে রৌপ্যের ভস্মীকরণ—"দশ দেরহাম রৌপ্য লও এবং এর সঙ্গে আধ দেরহাম ওজনের গলান হলদে গন্ধক মিশিয়ে দাও। এগুলিকে সালাইয়াহর উপর রেখে খুব ভালভাবে মেড়ে এতে লবণ-জল দাও (আরবী—একে লবণ-জল খেতে দাও)। যতক্ষণ না পদার্থটি একেবারে শুকিয়ে যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এমনি করে মাড়তে থাক। এইভাবে মাড়া হলে পর একে একটি কাদালেপা পাত্রে (কুঁজো) তুলে নিয়ে উনুনের উপর রেখে দাও। খানিক পরে পাত্রটি সরিয়ে নাও। বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভিতরকার জিনিষ বের করে নাও। এগুলো আবার মেড়ে নিয়ে ধুয়ে নাও। এমনি ভাবে বার বার মাড়তে থাক—যতক্ষণ না জিনিষটি এমন সাদা গুঁড়োতে পরিণত হয় যে একে আর বেশী ভাগ করা যাবে না।

তাশ্‌দিয়াহ—তাকলিসের অন্যতম প্রথা হ'ল তাশ্‌দিয়াহ। কিতাবুল আসরারের নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে তাশ্‌দিয়াহ প্রথার রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

(ক) তাশ্‌দিয়াহ প্রথায় সোনা ভস্মীকরণ—ইচ্ছামত কিছু সোনার টুকরা লও এবং একটি সালাইয়াহর উপর সমপরিমাণ পরিস্রুত সুরা সির্কা (Wine-Vinegar) মিশানো সাল এমোনিয়াক দিয়ে মাড়তে থাক যতক্ষণ না সোনা ধুলার মত গুঁড়োতে পরিণত হয়। দরকার হলে ত্রিশবার পর্য্যন্ত (ত্রিশ দিন) এমনি মাড়তে হবে।

(খ) তাশ্‌দিয়াহ প্রথায় রৌপ্য ভস্মীকরণ—ইচ্ছামত কিছু রৌপোর টুকরা ও সমপরিমাণ সালএমোনিয়াক লও। এগুলোকে একত্রে জল দিয়ে ভিজাও। এর পর এগুলোকে তিন বার জল দিয়ে খুব ভাল করে নাড়া দাও। যখন জল শুকিয়ে যাবে তখন আবার জল দিয়ে ভাল করে ঝাঁকুনি দিতে থাক। এম্‌নি ভাবে যতক্ষণ না রৌপ্য সাদা ধূলিবৎ—"জানজারে" পরিণত হয় ততক্ষণ জল দিয়ে নাড়াতে হবে। (জানজারের ধাতুগত অর্থ হ'ল যার কোন অংশ নেই।) তার পর পদার্থটিকে ধুয়ে নিয়ে জল ও লবণ দিয়ে assate কর এবং যতক্ষণ না সাদা চূনে (নুরাহ) পরিণত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত assate করতে থাক।

(গ) তাশ্‌দিয়াহ প্রথায় তামা ভস্মীকরণ—তামাকে জানজারে পরিণত করার জন্য এ প্রথা প্রয়োগ করা হয়। একটা তামার পাত নিয়ে গাঢ় (গালিজ) সির্কাতে চুবিয়ে দাও। (লিপজিগের পাণ্ডুলিপিতে সির্কার স্থানে "টাটকা দুধ" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। খুব সম্ভব এ ভিনেগারেরই তৎকালীন রাসায়নিক পরিভাষা মাত্র।) তারপর তামার পাতটিকে বাঁশের চাটাইয়ের উপর রেখে, চাটাইটিকে ভিনেগার ভরা অন্য একটি পাত্রের (বাতিয়াহ) উপর স্থাপিত কর; এতে তামা জানজারে পরিণত হবে। পাতের উপরকার কিয়দংশ জানজার বা গুঁড়ো হয়ে গেলে সেটি চেঁচে নাও এবং আবার পূর্ব্বপ্রথামত কাজ চালাও। এতে আস্তে আস্তে গোটা তামার পাত জানজারে পরিণত হবে।

অন্য একটি উৎকৃষ্ট পন্থা—তামার টুকরো এক রুল এবং সালএমোনিয়াক একসঙ্গে এক আউন্স নিয়ে সুরা ভিনেগারে চুবিয়ে দাও। দিনের মধ্যে এগুলোকে কয়েকবার ঝাঁকিয়ে দিতে হবে। যখন ভিনেগার শুকিয়ে যাবে তখনই আবার ভিনেগার দিয়ে ঝাঁকাবে। এভাবে এই মিশ্রণজাত পদার্থ পুরোপুরি জানজারে পরিণত হবে।

অন্য একটি উৎকৃষ্টতর পন্থা—এক রতল পরিমাণ সুন্দর রুসাখতাজ (পোড়া তামা অর্থাৎ তাম্রাম্ল—Copper oxide) নিয়ে ভালভাবে মেড়ে তার সঙ্গে এক আউন্স পরিমাণ সাল-এমোনিয়াক মিশাও। এখন দুই রতল পরিমাণ ভাল সুরা ভিনেগার দাও এবং তার সঙ্গে এক আউন্স সাল-এমোনিয়াক মিশ্রিত কর। এক রাত এমনি থাকতে দাও। তার পর ফিল্টার কর। এবার সালাইয়াহর উপর মাড়া রুসাখতাজ মিশিয়ে রেখে দাও। দিনের বেলায় এমনি মেড়ে নিতে হবে, এবং রাত্রে আরও ভিনেগার দিয়ে রেখে দিতে হবে। যখনই শুকিয়ে যাবে তখনই ভিনেগার মিশাবে—যতক্ষণ না সবটুকু জানজারে পরিণত হয়।

অবশ্য এই তিনটি প্রক্রিয়ায়ই copper acetate তৈরি হবে। তৃতীয় প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। এতে রাসায়নিকের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়। রাসায়নিক বুঝতে পেরেছিলেন যে, শেষ ফল অর্থাৎ copper acetate, ভস্মীভূত তামা থেকে যেমন তৈরি করা যেতে পারে তেমনি সাধারণ তামা থেকেও প্রত্যক্ষ ভাবেই তৈরি করা যেতে পারে।

(ঘ) লৌহ ভস্মীকরণ—লৌহের বেলায় অবশ্য এই ভস্মীকরণ প্রথা অতি সহজ। ভস্মীকরণ অর্থ লৌহে মরিচা ধরানো। মরিচা-ধরা লোহা বর্ত্তমান রসায়নে Iron oxide নামে পরিচিত। আরব-রসায়নে এর নাম হ'ল "জাফরান"। সাধারণ জলের সঙ্গে বাতাসের সাহায্যে অথবা লবণ ও ভিনেগার মিশানো জলের সঙ্গে বাতাসের সাহায্যে লোহাকে জাফরানে পরিণত করা হ'ত। একটি প্রক্রিয়া এখানে বর্ণনা করা গেল। "ভাল লোহার কতকগুলো টুকরা লও। এগুলোকে কয়েকবার জল ও লবণ দেয়ে ধোও যেন এর সমস্ত ময়লা বিদূরিত হয়। এই পরিষ্কৃত লোহার টুকরো-গুলোকে একটা কাঁচের বোতলে রেখে, বোতলের ভিতরে সুরা ভিনেগার ঢেলে দাও। এইবার মিশ্রিত পদার্থকে দিনের মধ্যে কয়েকবার ভাল করে ঝাঁকিয়ে দেবে। যখনই শুকিয়ে যাবে তখনই আবার ভিনেগার দিয়ে ঝাঁকাবে—যতক্ষণ না সমস্ত লোহার টুকরো জাফরানে পরিণত হয়।" লৌহ ভস্মীকরণের অন্য একটি পদ্ধতিও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এ পন্থায় আর্সেনিক সালফাইড ব্যবহার করা হয়েছে। লোহার টুকরা প্রথমে আর্সেনিক সালফাইডের সঙ্গে গরম করলে যে Iron Arseno Sulphide তৈরি হয় তাকে তুতিয়া (জাজ) মিশানো ভিনেগার দিয়ে বিয়োজন করা হ'ত। তারপর যতক্ষণ না লাল গুঁড়োতে পরিণত হয় ততক্ষণ এই বিয়োজিত জিনিষকে তাপ দেওয়া হ'ত।

তাসবিল—বিশুদ্ধিকরণের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হ'ল তাসবিল। মাকাতিহল ওলমের তৃতীয় খণ্ডে এ পন্থাটির উল্লেখ দেখা যায়। ইংরেজীতে Lixivation বলতে যা বুঝায় এ শব্দটির মূল অর্থও অনেকটা তাই। এর উদ্দেশ্য ছিল জিনিষটাকে এমন সূক্ষ্ম দানাতে পরিণত করা যেন সেগুলি জলের উপর ভাসতে থাকে। প্রক্রিয়াটিতে অবশ্য ভস্মীকরণ-প্রথাও নিহিত রয়েছে।

বিশুদ্ধিকরণের দ্বিতীয় স্তর

তাশমি—এর ইংরেজী অর্থ দাঁড়াবে Ceration, পদার্থ-গুলির অতিরিক্ত সমস্ত ময়লা উপরোক্ত এক বা ততোধিক পন্থায় পরিষ্কার করে নিয়ে সেগুলির উপর তাশমি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

জাবিরের 'Book of Seventy'র অন্যতম গ্রন্থে তাশমি প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর মতে তাশমি হ'ল যে সমস্ত জিনিষ থেকে রুহ ও নাফস পৃথক করা হয়েছে সেই সমস্ত জিনিষে রুহ ও নাফস ফিরিয়ে আনা। কিতাবুল আসরারে রাজী সংমিশ্রণের তৃতীয় বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পদ্ধতি সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মূলও বোধ হয় জাবিরের এই থিওরী।

রাজীর বর্ণনা নিম্নরূপ—নাফস আগে পৃথক ভাবে তাশমি করে দ্রব কর, তারপর রুহও পৃথক ভাবে তাশমি করে গালিয়ে দাও। তারপর 'দেহ' (আজসাদ) পৃথক ভাবে তাশমি করে দ্রব কর। এই তিনটি দ্রবণ সমপরিমাণে একত্রে মিশিয়ে চল্লিশ দিন মাটির নীচে পুঁতে রাখ—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তারা বিশুদ্ধীকৃত হয় এবং একটি অন্যটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে মিশে যায় ততক্ষণ এমনিভাবে রাখতে হবে।

এই তাশমি প্রক্রিয়া চার শ্রেণীর পদার্থের উপর প্রয়োগ করা যায় বলে রাজী তাঁর কিতাবুল আসরার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই চার শ্রেণীর পদার্থ হ'ল নাফসীয় (আত্মিক বস্তু), আজসাদ (দৈহিক বস্তু), লবণ পদার্থ এবং প্রস্তর-বস্তু। তাশমি করা হয় চার প্রকার বিকারক (Reagent) দ্বারা। এই চার প্রকার বিকারক হ'ল আত্মিক বস্তু, লবণ-পদার্থ, তৈল-পদার্থ ও সোহাগা জাতীয় (Borax) পদার্থ।

আত্মিক বস্তুগুলোকে লবণ পদার্থ, তৈল পদার্থ এবং সোহাগা জাতীয় পদার্থ দিয়ে, দৈহিক বস্তুগুলোকে আত্মিক বস্তু, লবণ পদার্থ এবং সোহাগা জাতীয় পদার্থ দিয়ে প্রস্তর বস্তু, লবণ-পদার্থ ও সোহাগা জাতীয় দ্রব্য এবং লবণ-পদার্থগুলোকে শুধু তৈল পদার্থ দিয়ে তাশমি করা যেতে পারে। তাশমি করে যে জিনিষ পাওয়া যাবে সেটা যদি কোন তপ্ত রৌপ্য বা তামার পাতের উপর ফেলা যায় তা হলে গলে যাবে এবং ধাতুর মধ্যেও প্রবেশ করবে। এই সমস্ত তাশমি-করা বস্তু ধাতুগুলোকে কিছু রঙীনও করে তুলতে পারে।

এই তাশমি প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত জিনিষগুলো কি তা স্থির নিশ্চয় করে জানা যায় না। তবে খুব সম্ভব এগুলো কতিপয় দ্রবণীয় বস্তুর একত্র সমাবেশ। এখানে রাজীর গ্রন্থে বর্ণিত সোনা তাশমি করার দুইটি পন্থার উল্লেখ করা গেল। এর প্রথমটি গ্রীক পদ্ধতির অনুরূপ। এই পদ্ধতিতে গ্রীক আলকেমী-বিদ্‌গণ রাসায়নিক পরীক্ষা চালানোর জন্য নানা রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করতেন। দ্বিতীয়টি থেকে মনে হয় বৈজ্ঞানিক খুব সম্ভব দ্রবণীয় Double chloride of gold তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১। আত্মিক বস্তু দিয়ে সোনা তাশমি করা—"যতটা ইচ্ছা লাল সোনা লও এবং তা থেকে পাতলা পাত তৈরি কর। একটা কাদালেপা পাত্র লও এবং এতে বাষ্পীভূত গন্ধক—যাতে কাল রঙের কোন চিহ্নই নেই, স্তরে স্তরে সাজাও। এতে পাতলা সোনার পাতগুলোও স্তরে স্তরে সাজিয়ে দাও। এখন পাত্রটি ভিট্রিওল (জাজ) দিয়ে পূর্ণ কর। এই-বার একটা ঢাকনা দিয়ে মুখ বন্ধ করে জোড়ার জায়গাটা ভাল করে এঁটে দাও। এখন পাত্রটিকে মাঝারি রকম উত্তাপের চুল্লীর (তান্নুর) উপর রাখ। মাঝারি উত্তাপ বলতে ঘুঁটের জালের মত জাল বুঝায়। তারপর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তুলে নাও। এমনি ভাবে করতে থাক যতক্ষণ না গলে যয়ে যায়।

প্রক্রিয়াটির বর্ণনা থেকে মনে হয় ভিট্রিওল Copper sulphide এবং Iron sulphide-এ পরিণত হবে। এরই সঙ্গে সোনা ও গন্ধকে সংমিশ্রিত যে Gold sulphide তৈরী হবে, তার সঙ্গে হয়ত Copper sulphide বা Iron sulphide যুক্ত হয়ে double salt তৈরি হতে পারে।

লবণ দিয়ে সোনা তাশমি করা—গুঁড়া সোনার ভস্ম নাও এবং একে সালএমোনিয়াক সলিউসনে ভাল করে ভিজাও যাতে সমস্ত অংশই উত্তমরূপে একত্র হতে পারে। যতক্ষণ না শুষ্ক হয়, একে মাড়তে থাক। তারপর পিছনে কাদা দিয়ে একটি লেপা থালায় (সুকুর রুজা) অনাচ্ছাদিত করলার আগুনের উপর রেখে দাও। যখন দেখা যাবে এই মিশ্রিত পদার্থগুলি উপরে উপরে থামছে তখন উপরের ডালাটা তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য অন্যত্র তুলে রাখ। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আবার ডালা বন্ধ কর। এমনি ভাবে দশ বার কর। তারপর সালএমোনিয়াক সলিউসন দিয়ে ভাল করে ভিজিয়ে মাড়তে থাক। এভাবে দশ বার কর—যতক্ষণ না জিনিষগুলো জলগ্রাহী (deliquescent) লবণে পরিণত হয়।

হল-তাহলিল—Solution—শব্দটির ধাতুগত অর্থ হ'ল পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাসমূহকে পৃথক করে দেওয়া। এতে তাশমি প্রথায় যতটুকু পরিবর্ত্তন হয়েছে তার চেয়ে আরও অধিক পরিবর্ত্তন বুঝায়। বর্ত্তমান রসায়ন-শাস্ত্রে solution বলতে যে প্রক্রিয়া বুঝায় আরব-রসায়নেও তাহলিল ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহৃত হ'ত।

রাজী তাঁর তৃতীয় গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'হল' প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যে কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন, এখানে তন্মধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃত করা গেল। এ থেকেই প্রক্রিয়াটিতে কি প্রথা অনুসৃত হ'ত তার আভাস পাওয়া যাবে।

(ক) আলমিয়াহ আলহাদ্দাহ—'তীক্ষ্ণ' জল দিয়ে কতক-

গুলি জিনিষের একটি বিচিত্র সংগ্রহ বলা যেতে পারে। মূত্র এবং অন্যান্য অজৈব পদার্থ থেকে প্রাপ্ত নানাবিধ তরল পদার্থ এবং ভিনেগারও এই 'তীক্ষ্ণ' জল নামে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়াও সালএমোনিয়াক মিশানো কষ্টিক সোডা, গাঢ় এমোনিয় সলিউসন, ক্যালসিয়াম সালফাইড (আদআর রাগওয়াহ) এবং সালএমোনিয়াকে পারদের সলিউসনও ব্যবহৃত হ'ত। সালএমোনিয়াকে পারদ সলিউসন অবশ্য বিশেষ করে ভস্মীকৃত জিনিষগুলোকে দ্রব করবার জন্যই ব্যবহৃত হ'ত। (গাঢ় এমোনিয়া সলিউসন সাধারণত: সাল-এমোনিয়াক ও তাম্রার একত্রে পাতন করে, সালএমোনিয়া ও colocynth pulp মিশিয়ে নিয়ে এই পাতিত জিনিষটি তৈরি হ'ত।)

খনিজ অম্ল পদার্থের (mineral acid) আবিষ্কারের দিক দিয়ে রাজীর এই পন্থা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এ পন্থায়ই রাজী হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈরি করতে সক্ষম হন। রাজীর গ্রন্থের এই অধ্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত প্রক্রিয়াটি থেকেই বুঝা যায় যে, তিনি সত্য সত্যই হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈরি করতে পেরেছিলেন। সে হিসেবে এটিকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড প্রস্তুতের অন্যতম প্রাথমিক প্রণালী বলা চলে। অবশ্য এখানেও মতভেদ আছে। বেকম্যান ও অন্যান্য প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের মতে রাজী সত্য সত্যই যাবতীয় খনিজ অম্ল (mineral acids) আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, কিন্তু ষ্টেপলটন ও তাঁর সহকর্মীরা এ বিষয়ে বেকম্যান প্রভৃতির সঙ্গে একমত নন। তাঁদের মতে বেকম্যান ও তাঁর সহকর্মীরা খুব সম্ভব Liber Bubacaris গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত কয়েকটি পরিচ্ছেদের উপর নির্ভর করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ষ্টেপলটন ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের মতের সমর্থনেও কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণাদি উপস্থাপিত করেন নাই।

সাতটি লবণের সলিউসন

সম-পরিমাণ সুমিষ্ট লবণ, তিক্ত লবণ, তাবারজাদ লবণ, আনদারাণী লবণ, ভারতীয় লবণ, আলকিলি লবণ লও। এর সঙ্গে সম ওজনের দানাদার কেলাসিত সালএমো-নিয়াক মিশিয়ে নিয়ে সামান্য জল দিয়ে দ্রব কর। এইবার সংমিশ্রণটিকে পাতন কর। ফলে 'তীক্ষ্ণ' জল পরিস্রুত হয়ে বেরিয়ে আসবে এবং পাথরকে (সাখর) মুহূর্তের মধ্যে গলিয়ে ফেলবে। (লিপজিগের পাণ্ডুলিপিতে "সাখর" শব্দের পরিবর্তে "তালক্" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।)

ষ্টেপলটন ও তাঁর সহকর্মীরা, এসিডের দিকে রাজীর পরিচয় ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান। তাঁদের মতে, রাজীর সময়ে নাইটর (Nitre) অন্যান্য লবণ-পদার্থ থেকে পৃথক করা হয় নাই। একথা মেনে নিলে এই সময় নাট্রিক এসিড সম্পূর্ণ পৃথকভাবে তৈরি হয়েছিল বলে মনে হয় না। যদিও রাজী ভিট্রিওল শুকপাতন করেছিলেন তবুও তিনি সাল-ফিউরিক এসিড তৈরি করেন নাই বলেই মনে হয়। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতদের ধারণা, রাজী শুধু রূহ ও নকস পৃথকীকরণের চেষ্টায়ই এমনিধারা পরীক্ষণ করেছিলেন এবং সেইজন্যই পাতিত করে প্রাপ্ত জিনিষকে আবার আলেমবিকে অবশিষ্টাংশের মধ্যে মিশিয়ে দেন। এই পাতিত করে প্রাপ্ত জিনিষ যে একটি বিশেষ শক্তিসম্পন্ন দ্রাবক সেটা হয়ত তাঁর নজরে পড়ে নাই।

ষ্টেপলটন অবশ্য এ মতের সমর্থনে কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করেন নাই। তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা লাউফার প্রমুখ পণ্ডিতগণের মত খণ্ডন করে নাইটর যে আরবদের সুপরিচিত ছিল সে বিষয়ে প্রমাণ দিয়েছেন। লাউফারের মতে আরবগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে saltpetre-এর সঙ্গে পরিচিত হন। এই সল্টপিটার চীন থেকে প্রাপ্ত বলেই এর নাম দেন "ছালজ আস সিনি"—চীনের তুষার। (Sino Iranica. P. 55.) ষ্টেপলটন ও তাঁর সহকর্মীরা লাউফারের এ মত সমর্থন করতে পারেন নাই। প্রথমত: ইবনে বাইতারের মতে সল্টপিটার এবং আসিয়ুস একই জিনিষ। আসিয়ুস অর্থ Stone of Assos ডিসকোরাইডিস এবং গালেনের গ্রন্থে এই আসিয়ুসের উল্লেখ দেখা যায়। ইবনে বাই-তারের মতে এ জিনিষটি মরক্কোতে "বারুদ" নামে পরি-চিত ছিল। ইবনে বাইতার ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে মরক্কো পরিদর্শন করেন। ইবনে বাইতারের এই প্রমাণ ছাড়া স্বয়ং জাবিরের গ্রন্থেই এই জিনিষটির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর "কিতাবুল মিজান" গ্রন্থ থেকে মনে হয় তিনি এই জিনিষটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

(*Book of Balances*—Berthelot & Hondas, La Chimie III, p. 155.)

(খ) গোবরে সলিউসন—এতে জিনিষটি সমচতুষ্কোণ পাত্রে পুরে পাত্রটিকে গোবরের মধ্যে পুঁতে ফেলা হ'ত। রাজীর কিতাবুল আসরার গ্রন্থে এ প্রক্রিয়াটি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নিম্নে পদ্ধতিটি বর্ণিত হ'ল।

বায়ুশূন্য স্থানে দুটি খাল খনন কর। খালগুলি দুই হাত (জিরা) গভীর ও এক হাত চওড়া হওয়া চাই। ওলকপির রস দিয়ে মিশানো পোষা পায়রার মল দিয়ে গর্ত দুটি ভাল করে লেপে নাও।

এইবার ঘোড়ার তাজা পুরীষ এবং সমপরিমাণ পায়রার মল একসঙ্গে মিশিয়ে এই মিশ্রিত জিনিষগুলোর মধ্যে ওল-কপির রস দিয়ে বেশ করে মাখ যেন ঘন কাঁইয়ের মত হয়। ঘোড়ার পুরীষ টাটকা হওয়া চাই সেইজন্য সেদিনকার পুরীষ নিতে হবে। এই কাঁই দিয়ে একটা গর্তের এক হাত পরিমাণ

কুমারেশ

জায়গা ভর্ত্তি কর। যে জিনিষটিকে দ্রব করতে হবে সেটিকে একটি চওড়া তলাযুক্ত সমচতুষ্কোণ বোতলে (কারুরা) রাখ। এই বোতলটির সমান আকারের একটা ছাঁচও (কালিব) সঙ্গে রাখতে হবে। এববার এই ছাঁচটি কাঁইয়ের মধ্যে ঠেসে বসিয়ে দাও। একটু নাড়াচাড়া করে এমন ভাবে বসাতে হবে যে ছাঁচটি যেন এর মধ্যে আলগা আলগা ভাবে লেগে থাকতে পারে। এর পর ছাঁচটি তুলে নিয়ে তার জায়গায় বোতলটি বসিয়ে দাও। বোতলটির মুখ আগে থেকেই প্লাস্টার (সারুজ) দিয়ে ভাল করে এঁটে দিতে হবে। এইবার বোতলের উপর একটি ভিজা ঝুড়ি (সাল্লাহ) জড়িয়ে দাও এবং তদুপরি গোবর দিয়ে চাপা দাও। এইবার সমস্ত জিনিষটা একটা বড় কুঁজো (ইজ্জনাহ) দিয়ে ঢাকা দাও এবং জোড়ের জায়গাটি বন্ধ করে দাও। প্রত্যেক দিন কুঁজোটা তুলে নিয়ে গোবরের উপর গরম জল ছিটিয়ে দেবে এবং সপ্তাহে একবার করে গোবরও বদলে দেবে। অতঃপর অন্য গর্ত্তটির অর্দ্ধেকটা পায়রার মল দিয়ে পূর্ণ কর, তারপর আরও গোবর এর মধ্যে দিয়ে ছাঁচটিকে বসাও এবং এক রাত্রির জন্য কুঁজো দিয়ে ঢেকে রাখ, তবে জোড় বন্ধ করো না। সকাল বেলা গোবরে ডুবিয়ে রাখা বোতলটি তুলে নাও এবং দ্বিতীয় গর্ত্তে বসানো ছাঁচটি তুলে নিয়ে সেই ছাঁচের জায়গায় বোতলটি বসিয়ে দাও। এইবার বোতলটির উপর একটি ঝুড়ি বসিয়ে দিয়ে ঝুড়িটাকে গোবর দিয়ে ঢেকে দাও। এখন সবগুলোকে কুঁজো দিয়ে ঢেকে দিয়ে জোড়ের জায়গা বন্ধ করে দাও। যতক্ষণ না জিনিষটি সম্পূর্ণভাবে দ্রব হয়ে যায় ততক্ষণ এমনিধারা করতে থাক। এই প্রক্রিয়াতেই যাহা সহজে গলে না, তেমন জিনিষও দ্রব করা যাবে।

(গ) ভিজা বাতাসে সলিউসন—এতে জিনিষসমেত পাত্রটিকে ভিজা বালির মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। জিনিষটি বাতাসের হাওয়া থেকেই আস্তে আস্তে দ্রব হয়ে যায়।

(ঘ) "দানে" সলিউসন—রাজী দানের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, এ হ'ল চওড়ামুখো ৩০ দাওরাক তরল জিনিষ ধরবার মত পাত্র। আইন্নুস সানাহ গ্রন্থ অনুযায়ী এক দাউরাক জলের ওজন হ'ল ১০৪০ দেরহাম। ১২৮ দেরহাম এক পাউণ্ডের সমান এবং ১০ পাউণ্ড এক গ্যালনের সমান ধরে নিলে এক দানের ধারকত্ব হবে ২৪ গ্যালন। প্রক্রিয়াটির বেলায় দেখা যায়, এমনি একটি পাত্রের দুই-তৃতীয়াংশ সির্কা দিয়ে ভর্ত্তি করা হ'ত। যে জিনিষটি দ্রব করতে হবে সেটি আলগা ভাবে একটা নেকড়ায় বেঁধে একটা হাতলে রেখে পাত্রের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত। নেকড়ার পুঁটুলির চার আঙুল নীচে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে তাই দিয়ে জিনিষগুলোকে গরম করা হ'ত। "দানের" মুখটি শক্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হ'ত। দানের বহির্ভাগ, পায়রা ও পশুর মল পাঁজরের রসের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে খুব ভালভাবে লেপে দেওয়া হ'ত। প্রদীপটা ভিতরে যে ভাবে রাখা হ'ত তাতে মনে হয় তার আয়ু খুব দীর্ঘ হ'ত না। এটা খুব শীঘ্রই নিবে

যেত, তাপের পরিমাণও খুব বেশী হ'ত না। যা হোক প্রত্যেক দিন দুই বার করে ঢাকনার উপর দিয়ে গরম জল ঢেলে দেওয়া হ'ত। এমনিভাবেই কাজ চলত যতক্ষণ না সমস্ত জিনিষ দ্রব হয়ে যেত। বৈজ্ঞানিকদের মতে এই পন্থাটি কঠিন ভস্মীকৃত জিনিষগুলোকে দ্রব করবার পক্ষে খুবই সুবিধাজনক।

(ঙ) কড়াইতে (মিরজাল) সলিউসন—কড়াইটি জল, তুষ বা ছোট ছোট করে কাটা ভেড়ার লোম, এবং পায়রার মল দিয়ে পূর্ণ করা হ'ত। জিনিষ সমেত পাত্রটি এই তুষ, জল ও মলপূর্ণ কড়ায়ের মধ্যে রেখে কড়াইটিতে জ্বাল দেওয়া হ'ত। যতক্ষণ না জিনিষটি দ্রব হয়ে যেত ততক্ষণ পর্যন্ত এমনি জ্বাল দেওয়া হ'ত।

(চ) 'তীক্ষ্ণ' জল দিয়ে কারও আলেমবিকে সলিউসন—যে জিনিষটি দ্রব করতে হবে সেটিকে খাতের মধ্যে এবং তীক্ষ্ণ জল কারে রেখে দিয়ে আলেমবিক দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর পর সমস্ত পাত্রটি একটি জলের পাত্র বা ছাইয়ের উপর বসিয়ে দেওয়া হয়।

(ছ) সিরদাবে কারাকস নিয়ে সলিউসন—সিরদাব বা সাবদান কি ধরণের যন্ত্র সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু অবগত হওয়া যায় না। "সিরদাব" অর্থ হল "ঠাণ্ডা ঘর" বা বরফের বাক্স। পূর্ব্ববর্ণিত প্রথামত এতে জিনিষটি কারকাসের সঙ্গে মিশিয়ে একটি পাত্রে রাখা হ'ত। পাত্রটি একটি হাতলের থেকে যন্ত্রের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত। যন্ত্রটির ঢাকনা ভাল করে বেঁধে দিয়ে খাইশ (সুতী কাপড়) দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হ'ত। খাইশের উপর মধ্যে মধ্যে জল ছিটিয়ে দেওয়া হ'ত। এমনি ধারা চলত যতক্ষণ না জিনিষটি দ্রব হয়ে যেত।

(জ) তাকতির দ্বারা সলিউসন—বিশেষভাবে লবণ ও ভিট্রিওলের জন্যই এ পন্থা প্রযুক্ত হত। জিনিষটি প্রথমতঃ অল্প অল্প ভিজিয়ে রাত্রে খোলা বাতাসে রেখে দেওয়া হ'ত। পরদিন সকালে এটা পাতন করা হ'ত। পাতনের পর অবশিষ্ট অংশ দুই বার করে জলে ভিজিয়ে আবার শুকিয়ে নেওয়া হ'ত। তার পর পাতিত দ্রব্যও এর সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হ'ত। যতক্ষণ পাতিত দ্রব্য ওজনে বাড়তে থাকত ততক্ষণ পর্য্যন্ত এমনিধারা বার বার পাতন, জলে ভিজানো এবং শুকানো চলত। যখন ওজনে কমতে থাকত তখনই এই প্রক্রিয়ার সমাপ্তি হ'ত।

৪। তামজিজ বা মিজাজ—একে ইংরেজীতে বলা চলে combination। এই তামজিজ করতে তিনটি প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে বলে রাজী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই তিনটির মধ্যে অবশ্য তৃতীয় পন্থাটিই (সলিউসন করে এক সঙ্গে মিশানো) সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলে মত প্রকাশ করেছেন। প্রথা তিনটি হ'ল (১) প্রথমে মেড়ে নিয়ে assation করা ;· (২) মেড়ে নিয়ে পরে ceration করা (৩) সলিউসন করে একত্রে মিশানো।

৫। আকদ—ইংরেজীতে একে বলা চলে coagulation প্রথা। অবশ্য Fixation-ও বলা যেতে পারে। আলইক-সির তৈরি করতে এইটিই হ'ল চরম প্রক্রিয়া। এটিও নানা ভাবে করা যেতে পারে। (ক) assation করে (খ) ঞ্লাক্ষ এবং পাক্ক করে (গ) দাফন বা গোবরে পুঁতে (ঘ) আলেমবিকে উত্তপ্ত করে।

পুস্তক-পরিচয়

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড: ১৮২৪—১৮৫৮। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ১৩৫৫। পৃঃ ৯০। মূল্য দুই টাকা।

সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি; আলোচ্য গ্রন্থটি কলেজের ১২৫ বৎসর পরিপূর্তির উপলক্ষ্যে কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষের উৎসাহে রচিত। যোগ্য ব্যক্তির উপরই গ্রন্থ-রচনার ভার দেওয়া হইয়াছিল; কারণ এই যুগের শিক্ষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথের মত বিশেষজ্ঞ নাই বলিলেও চলে। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও তথ্যনিষ্ঠার সহিত তিনি উক্ত কলেজের নথিপত্র ও সরকারী দপ্তরের দলিলদস্তাবেজ হইতে ইহার প্রথম যুগের, অর্থাৎ ১৮২৪ সনে প্রারম্ভ হইতে ১৮৫৮ সনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধ্যক্ষতা কাল পর্য্যন্ত, একটি নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিক বিবরণ দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এই শিক্ষায়তনের যাঁহারা প্রাণস্বরূপ ছিলেন, সেই সকল শিক্ষক ও কৃতী ছাত্রদের বৃত্তান্ত যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু গ্রন্থখানি শুধু একটি কলেজের ইতিবৃত্ত নহে। আমাদের বর্তমান যুগের সংস্কৃতির ও গত যুগের শিক্ষা-বিস্তারের মূলে যে দুইটি সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল, তাহার একটি হইতেছে হিন্দু কলেজ (পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ) ও অন্যটি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ। হিন্দু কলেজের ইতিহাস আছে, কিন্তু বাংলাদেশের অন্যতর প্রাচীন বিদ্যালয়ের ইতিহাস ছিল না। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশেরই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাস। এই হিসাবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের কাছে এই গ্রন্থ যে ইহার বহু মূল্যবান্ উপকরণের জন্য অপরিহার্য্য ও আদরণীয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে প্রকাশ করিবার সংকল্প আছে; আশা করি ব্রজেন্দ্রনাথের মত সতর্ক ও বহুজ্ঞ গবেষকের সাহায্যে এ সংকল্প অচিরে সিদ্ধিলাভ করিবে।

শ্রীসুশীলকুমার দে

মহা-বিপ্লবী রাসবিহারী—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র। হরিহর লাইব্রেরী, ২৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২০৬ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা মাত্র।

এই পুস্তকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটা অধ্যায়ের ইতিহাস পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে দেশে যে জাগরণের উদ্ভব হয়, তাহার কর্ম্ম-নায়কদের মধ্যে রাসবিহারী বসু বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার জীবন-কথা বলিবার সময় আজ আসিয়াছে; এতদিন ইংরেজের আইনের প্রতিকূলতায় যাহা প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না, সেই বাধা আজ দূর হইয়াছে। সুতরাং রাসবিহারী বসুর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত এখন আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি। আজ পর্য্যন্ত যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নয় বলিয়া একটা ক্ষোভ থাকিয়া যায়। বর্ত্তমান গ্রন্থখানিও সে অভাব মিটাইতে পারে নাই। কারণ ১৯১৫-১৯৪৫ সাল—রাসবিহারীর এই ত্রিশ বৎসরের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ইহার মধ্যেও নাই।

এই অভাব পূর্ণ হইবে না, যত দিন না জাপান-প্রবাসী কোন ভারতবাসী এ বিষয়ে উদ্যোগী হইবেন। তাঁহার আবার রাসবিহারী বসুর সহকর্ম্মী হওয়া চাই। সেইরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম। শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবীর (দেশবন্ধুর ভগিনী) জামাতা শ্রীআনন্দমোহন সহায়ের নাম এই সম্পর্কে মনে পড়ে, আর মনে পড়ে রাসবিহারী বসুর পুত্র মাসুকী বসু ও কন্যা ভারতী বসুর নাম। তাঁহাদের এই বিষয়ে একটা কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃদেবের স্বদেশসেবার কাহিনী আমাদের শুনাইতে পারেন। কোন বাঙালী প্রতিষ্ঠান অগ্রণী হইয়া এই উদ্যোগ করিতে পারেন।

হয় ত এই বিষয়ে আমাদের কৌতূহল অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বিপ্লবীর জীবন বিপদের মধ্যে কাটিয়া যায়; এই বিপদের মধ্যে ইতিহাস লিখিয়া যাইবার সময় ও সুযোগ পাওয়া দুষ্কর। বিপ্লব সার্থক হইবার পর যদি বিপ্লবী বাঁচিয়া থাকেন, তবে তাঁহার জীবন-কথা জানিবার সম্ভাবনা থাকে। বর্ত্তমান যুগে এইরূপ ভাগ্যবানদের মধ্যে লেনিন, মাজেরিক, বেনেস্ প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কদের নাম উল্লেখযোগ্য। দুর্ভাগ্য যে, রাসবিহারী বসু, নেতাজী সুভাষ প্রভৃতি বিপ্লবী-প্রধানগণ তাঁহাদের জীবনব্যাপী সাধনার পরিণতি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। সেইজন্য তাঁহাদের জীবন-কথার অসম্পূর্ণ বিবরণ শুনিয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

ব্যাঙ্কের কথা—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা। ৵৹+১৩৭ পৃষ্ঠা। দাম তিন টাকা।

এই বইখানি বাস্তবিকই সুপাঠ্য। সহজ ভাষায় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য সকল কথাই লেখক যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। সাধারণ বাঙালী পাঠক, ব্যবসায়ী ও ছাত্র, সকলেরই এই বইখানি উপকারে আসিবে। অর্থনীতি বিষয়ে এই বিশেষজ্ঞ লেখক পরিভাষা সম্বন্ধে অধিকতর অবহিত হইলে বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। সাধারণ ক্রেতার পক্ষে মূল্য একটু বেশী মনে হয়।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

বোরখা, ইনসাফ ১ম ও ২য় খণ্ড (উপন্যাস)। **দাদীর আসমান** (গল্প-সংগ্রহ)—নেশাদ বাবু। দি ফিনিক্স প্রেস লিমিটেড, ৫৩, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ও সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৪, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—যথাক্রমে—২৲, ২।০ (প্রতিখণ্ড) ও ২।০ সিকা।

অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকখানি উপন্যাস ও গল্প রচনা করিয়া নেশাদ বাবু পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। নিজ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে—মুসলমান-সমাজের পারিপার্শ্বিক গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস তাঁর রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বাতন্ত্র্য আছে এবং চিন্তার ঐশ্বর্য্যও বিরল নহে। অল্প কথায় গভীর ভাবপ্রকাশ, দুই-একটি ছত্রে সুদূর-প্রসারী ইঙ্গিত এবং ভাষাটি সুমিষ্ট ও সাবলীল হইলেও প্রকাশভঙ্গী স্ব-মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নহে। বিশিষ্ট সাহিত্যিকের বাক্ ও প্রকাশ-ভঙ্গীর ছায়া রচনার বহু স্থানে লক্ষ্য করা যায়। বহুস্থানে বাস্তবকে লঙ্ঘন করিয়া অতিনাটকীয় ঘটনায় চমকসৃষ্টির প্রয়াস আছে। তরল কৌতুক-

রসের অবতারণায় গল্পের মূল রস ফিকা হইয়া গিয়াছে—এমন দৃষ্টান্ত 'দাদীর আসমানে'র কয়েকটি গল্পে বিরল নহে। 'দাদীর আসমান' গল্পটিই একটি উৎকৃষ্ট গল্প বলিয়া গণ্য হইত, যদি চৌদ্দ বৎসরের ছেলে তমিজুদ্দিন ও মাষ্টার সাহেবের কথোপকথনে কাজলাদির চূড়ান্ত নিদর্শন রাখিয়া লঘু-গুরুত্বের সীমা লঙ্ঘন না করা হইত। অথচ 'মাটির মসনদ' প্রকাশ-সংযমের দরুন একটি চমৎকার গল্প হইয়াছে।

'বোরখা' ও 'ইনসাফ' উপন্যাসে মুসলমান সমাজের পারিপার্শ্বিক কতকটা ফুটিয়াছে, কিন্তু তাহার চেয়ে বেশী ফুটিয়াছে—রোশেন সেলিনার রোমান্টিক মনের প্রতিচ্ছবি। গল্পের মধ্যে ঘটনা-বিস্তৃতির অবকাশ অল্প বলিয়া হয়ত বোরখার রোমান্স তেমন উগ্র হয় নাই। এই নাটকীয় ঘটনার বহু সমাবেশে চমকসৃষ্টির প্রয়াস ইনসাফ উপন্যাসে লক্ষণীয়। ইনসাফের আরম্ভটি ভাল। ঝরঝরে লেখার ভঙ্গীতে—সুষ্ঠু বর্ণনায় ডক্টর জসীম উদ্দিন, সেলিনা, জয়নুল, আম্মা, খানবাহাদুর প্রভৃতি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু শেষাংশে নির্বাচনের গোলকধাঁধায় ও রোমান্স-সৃষ্টির ধোঁয়ায় তাঁহারা বাস্তবের বেলাভূমি হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। উপন্যাসের শেষ অংশে ঘটনা ও সংলাপ সৃষ্টিতে নাটকীয় ভাবটা রসবোধকে বড় বেশী পীড়িত করে। রোমান্সের কল্পনাজাল বুনিবার অথবা গল্পের গতি বাড়াইবার তাগিদে সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে তাড়াতাড়ি একটা পরিণতিতে পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে চরিত্র মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, বাহিরের ঘটনার সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গতি রক্ষা হয় নাই। ডক্টর জসীম উদ্দিনের চাঁদ দেখার প্রসঙ্গে সেকেন্দার দালালকে পরবীণ-স্মৃতিতে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া রোমান্সের চমক দিবার কোন আবশ্যকই ছিল না।

যাহা হউক, আলোচ্য উপন্যাস ও গল্প সংগ্রহগুলির মধ্যে একটি জিনিস অস্বীকার করা যায় না—সেটি নেশাদ বাণুর প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা। অনুভূতিশীল মন, পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও ভাষার উপর দখল—তাঁহার লেখার বৈশিষ্ট্য।

মৃত্তিকা-শৃঙ্খল—সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার মিত্র। "লেখনী" ১বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

মৃত্তিকা-শৃঙ্খল একখানি ছোট গল্পসংগ্রহের বই। মোট বারটি গল্প ইহাতে আছে। এই বারটি গল্পের কোন কোন লেখককে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় কখনও হয়ত দেখিয়া থাকিব; তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত বলিয়া পরিচয়ের ক্ষেত্রে স্পষ্ট হইয়া উঠেন নাই। কিন্তু গল্পসংগ্রহ-পুস্তকখানি পড়িয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে বিশেষ করিয়া চেনা যায়, তাঁহাদের লেখনীকে সাধুবাদ না দিয়া পারা যায় না। গল্পগুলি আকারে ছোট তো বটেই—ছোটগল্প লেখার কলা-কৌশলও লেখকেরা বেশ খানিকটা আয়ত্ত করিয়াছেন। কল্পনায়, বাস্তবে এবং সর্ব্বোপরি লেখনীর সংযমে প্রায় সবগুলি গল্পই জমিয়াছে ভাল। এতগুলি নূতন লেখকের সাধনার রূপটিকে পাঠকদের গোচরে আনিবার এ ধরণের সাধু প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে বিরল। এজন্য প্রকাশক ধন্যবাদার্হ।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা—শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস। সরস্বতী লাইব্রেরী। সি ১৮।১৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৯৫, মূল্য ১।০।

এই স্বল্পপরিসর পুস্তকে গ্রন্থকার পাঁচটি অধ্যায়ে ভারতীয় সভ্যতার পটভূমিকা, হিন্দু-মুসলমান সভ্যতার বিকাশ, ভারতে মুসলিম শাসন যুগ, সংস্কৃতি, মিলন প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হিন্দু মুসলমান বলিয়া দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতি ত নাই-ই, এমন কি হিন্দু সভ্যতা ও মুসলিম সভ্যতা বলিয়া দুইটি পুরাপুরি পৃথক সভ্যতা বা সংস্কৃতিও নাই। বহু লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তির লেখা হইতে গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্যের সপক্ষে নজীর সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে বর্ত্তমান ভারতে যে সাম্প্রদায়িক কলহ চলিয়াছে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক কিম্বা ধর্ম্ম ও নেতৃত্বের দিক দিয়া এই দ্বন্দ্বের কোন ভিত্তি নাই। কিন্তু ভিত্তি না থাকিলেও দ্বন্দ্ব রহিয়াছে এবং বাড়িতেছে। ইহারও অবশ্য কারণ আছে। মিলনের পক্ষে যেরূপ যুক্তি আছে, ঝগড়া বাধাইবার জন্য সেরূপ যুক্তি না থাকিলে দ্বন্দ্বকারীদের বক্তব্য অবশ্যই আছে। বর্ত্তমান জগতে ন্যায়যুক্তি সুবিধাবাদীর কুচক্র ভেদ করিতে পারে নাই। আর সর্ব্বসাধারণ অনেক সময়েই হুজুগে মাতিয়া কাজ করে, যুক্তির ধার ধারে না। ইহার উপর আবার শক্তিশালী পররাষ্ট্র ও শত্রুপক্ষের কারচুপি আছে। এইজন্যই কোন সুযুক্তিতে ফল হয় নাই, ভারত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—পাকিস্থান মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। অপর অংশ ভারত নামে পরিচিত হইলেও তাহাকে ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানগণ হিন্দুস্থান বা হিন্দু রাষ্ট্র বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কারণ হিন্দু বৈচিত্র্য স্বীকার করে, অপরের ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এজন্য হিন্দুর তথাকথিত 'রিলিজিয়ন' নাই, আছে 'ধর্ম্ম'—যাহা তাঁহার জীবনের প্রত্যেক দিককে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু তাঁহার চিন্তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে না। ইহাই ভারতের বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যের ছিটেফোঁটা ইসলাম 'রিলিজিয়নে'ও সংক্রামিত হইয়াছিল, তাই এদেশে হিন্দু মুসলমানে মিলন সম্ভব হইয়াছিল, তাই বেদান্তের পাশাপাশি সুফীমত আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে দারাশুকো যেমন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, বাদশা ঔরঙ্গজেবও তেমনি গোঁড়া মুসলমান সুতরাং একই ছন্দে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গাঁথা চলে না। তাই মিলনের সঙ্গে ভ্রাতৃবিরোধ ভারতের ভাগ্যলিপি। ভারতের মুসলমান যদি আপনাকে অ-ভারতীয় মনে করে তবে তাহাকে যুক্তিদ্বারা বুঝাইতে পারে এইরূপ শক্তির অভাব দেখা গিয়াছে। অবশ্য ভারতীয় কোন মুসলমান যদি নিজেকে এদেশের মনে করে তাহা হইলে তাহাকে উল্টা বুঝাইতে পারে এরূপ শক্তিও যে নাই তাহাও সত্য। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, ভারতীয় মুসলমান নিজেদের হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী হইতে 'পৃথক জাতি' মনে করে এবং এইজন্যই পাকিস্থান সৃষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় মুসলমানদের ইচ্ছা না থাকিলে পাকিস্থান কায়েম্ করে এ ক্ষমতা ইংরেজের ছিল না, এবং আজও মুসলমানদের অনিচ্ছায় পাকিস্থান এক দিনও টিকিতে পারে না। সুতরাং গ্রন্থকারের যুক্তির মূল্য যাহাই হউক, পালিটিক্সে তাহা আপাততঃ অচল বলিয়াই মনে হইতেছে। তবে এরূপ সদ্‌গ্রন্থের প্রচার

বনস্পতির সেরা
রসুই
RASOI
VANASPATI
২, ৫, ১০ ও ৩৭ পাউণ্ড টিনে পাওয়া যায়
হিন্দুস্থান ডিভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস:
চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা
ম্যানেজিং এজেণ্ট :
এন. আর সরকার অ্যাণ্ড কোং লিঃ
HDX4
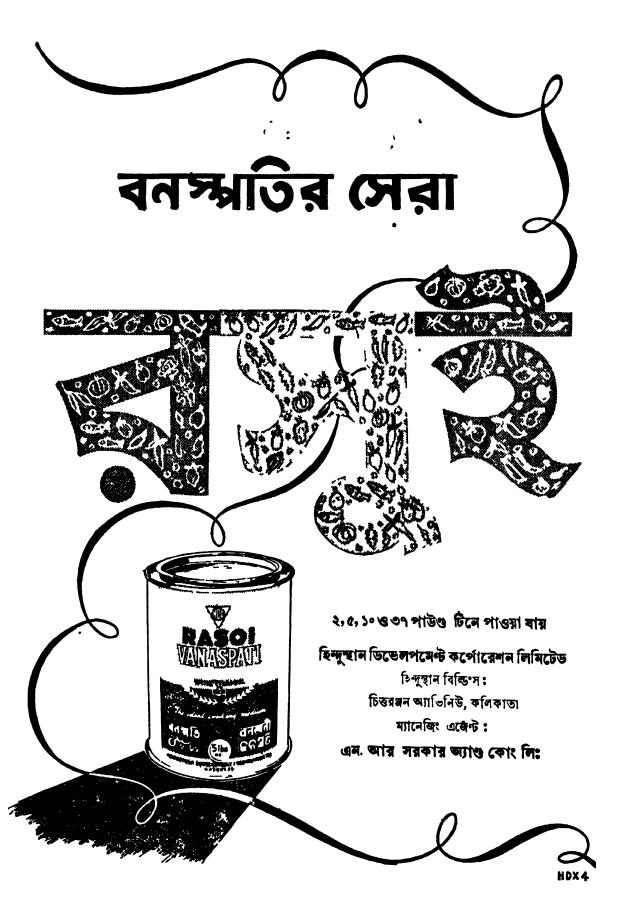
সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। মুসলমান পাঠকগণের মধ্যে এরূপ গ্রন্থের প্রচার খুবই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—নং ৬৯, ৭১ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য—প্রত্যেকখানি এক টাকা।

প্রথমখানিতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের জীবনচরিত আছে। তিন জনই সমসাময়িক। দ্বিজেন্দ্রলাল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া মাত্র পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। রঙ্গমঞ্চে তাঁহার চন্দ্রগুপ্ত ও সাজাহান আজও পূর্ব্বের ন্যায় জনপ্রিয়। তাঁহার স্বদেশী সঙ্গীতগুলি অপূর্ব্ব। তাঁহার প্রবন্ধগুলিতেও যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'আর্য্যগাথা', 'আলেখ্য' ও 'মন্দ্র' এই তিনখানি তাঁহার কাব্যগ্রন্থ। 'ত্রিবেণী' খণ্ডকাব্য। 'আষাঢ়ে' ব্যঙ্গ-কাব্য। সীতা' নাট্য-কাব্য। নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ ও কাব্য লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল বত্রিশখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

'প্রবাস চিত্র' 'পথিক' হিমালয়' 'হিমাচল-বক্ষে' প্রভৃতি ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়া জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯) খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত ছোট গল্প একদা বাঙ্গালী পাঠককে মুগ্ধ করিয়াছিল। 'বিশুদাদা' 'তিন পুরুষ' প্রভৃতি তাঁহার উপন্যাস। তাঁহার রচিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধ শত। সুচনা হইতে সুদীর্ঘকাল অতীব যোগ্যতার সহিত তিনি "ভারতবর্ষ" মাসিকপত্র সম্পাদন করেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) খ্যাতনামা নাট্যকার। তাঁহার 'রঘুবীর' 'আলমগীর' 'নর নারায়ণ' প্রভৃতি নাটক বাঙ্গালী দর্শকের মনে প্রচুর আনন্দ বিতরণ করিয়াছে। তাঁহার রচিত রঙ্গনাট্য 'আলিবাবা' অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার 'নারায়ণী' উপন্যাস-সাহিত্যে নূতনত্ব আনয়ন করিয়াছিল। তিনি অর্দ্ধশতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা।

একসপ্ততি-সংখ্যক 'চরিতমালা'য় রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, নিখিলনাথ রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী আছে। উনবিংশ শতাব্দীর পুরাতত্ত্ববিদ্ হিসাবে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরই রামদাস সেনের নাম করিতে হয়। মাতৃভাষায় এই বিষয়ে গ্রন্থরচনায় রামদাস সেনই (১৮৪৫-১৮৮৭) অগ্রণী। তাঁহার তিন ভাগ 'ঐতিহাসিক রহস্য' বিবিধ-বিষয়ক প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞানের ভাণ্ডার। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় তিনি "বঙ্গদর্শনে" অনেকগুলি পুরাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ রচনা করেন। রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) প্রসিদ্ধ "সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাসে"র রচয়িতা। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম পত্রিকা-সম্পাদক। ঐতিহাসিক সাহিত্য-রচনায় তিনি একজন পথপ্রদর্শক। দেশ ও জাতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার উৎস। ইতিহাস, জীবনচরিত ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি একুশখানি গ্রন্থ রচনা করেন। নিখিলনাথ রায় (১৮৬৫-১৯৩২) অক্ষয়কুমার মৈত্রের সমসাময়িক। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ইতিকথা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি যশস্বী হন। তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধ একদা বিখ্যাত সাময়িক পত্রসমূহ অলঙ্কৃত করিত। অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২) গীতিনাট্য প্রণয়ন করিয়া নাট্যজগতে স্বকীয় স্থান অধিকার করেন। তাঁহার দৃশ্যকাব্য 'নন্দবিদায়' একদা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার শিরী-ফরহাদ, লুলিয়া তুফানি প্রভৃতি বহুদিন সুখ্যাতির সহিত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-১৮৬৯) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। 'গাও হে তাঁহার নাম রচিত যাঁর বিশ্বধাম' এই বিখ্যাত ব্রহ্মসঙ্গীতটি তাঁহারই রচনা। তিনি

স্বদেশপ্রেমিক। কংগ্রেসের অগ্রদূত চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কে তাঁহার উৎসাহ এবং প্রেরণা স্মরণীয়।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

দেশবিদেশের ছেলেমেয়ে—শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী ও শ্রীরঞ্জিৎ (?) সিংহ। দেশবন্ধু বুক ডিপো। ৮৪এ, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা ৬। দাম ১।•।

দেশে দেশে নব জাগরণের ঢেউ উঠিয়াছে। ভারতবর্ষেও রাষ্ট্রে, সমাজে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই জাগৃতির দিনে বঙ্গ-সন্তানদের পক্ষে অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েদের উন্নতি-প্রচেষ্টার কথা জানা দরকার। সে বিষয়ে বইখানি সাহায্য করিবে।

গীতিমঞ্জরী—শ্রীকানাই সামন্ত। সাহিত্যিকা। ১২৩, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

সুন্দর সরস এই গীতিগুলি শেফালির মত স্নিগ্ধ ও সুরভি। রবীন্দ্র-প্রতিভার কিরণে ইহারা পাপড়ি মেলিয়াছে, কিন্তু স্বকীয় লাবণ্য লইয়াই দেখা দিয়াছে।

বন্দনা—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ঊষা পাবলিশিং হাউস্। ৩৪, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য ৫৲।

পুরাতন ও নূতন স্বদেশী গানের সংগ্রহ। কবির নির্বাচন তাঁহার খ্যাতির উপযুক্ত হইয়াছে। ভূমিকায় তিনি 'জাতীয় সঙ্গীতের ধারা' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। যে সকল গান লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল অথচ জাতির মুক্তি-সংগ্রামে এক কালে প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে, সেগুলিকে রক্ষা করার এই প্রয়াস সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। ভারতের স্বাধীনতালাভের পরে রচিত কয়েকটি গান শেষের দিকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

রাত্রে যারা ভয় দেখায়—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। এন্. এম্. রায় চৌধুরী কোং লিঃ, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

বালকবালিকাদের জন্য কৌতূহলোদ্দীপক উপন্যাস রচনায় হেমেন্দ্র-বাবুর কৃতিত্ব অসাধারণ। এ গ্রন্থের কয়েকটি গল্প মৌলিক, অন্যগুলি বিদেশী কাহিনীর অনুসরণ। সব কয়টি গল্পই চিত্তাকর্ষক।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হিন্দুধর্ম্ম পরিচয় (দ্বিতীয় সংস্করণ)—স্বামী শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ। কলিকাতা—২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটস্থ 'মডেল পাবলিশিং হাউস' কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১ম-২য় ভাগ একত্রে ৪৪ পৃঃ মূল্য ।৵• এবং ৩য়-৪র্থ ভাগ একত্রে ৭৬ পৃঃ মূল্য ।৵•।

আলোচ্য পুস্তিকাদ্বয়ে যথোচিত সরল ভাষায় হিন্দুধর্মের পরিচয় বর্ণনা করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ভাববর্জ্জিত হিন্দু ধর্মের মূল রহস্য বুঝিবার এবং দৈনন্দিন জীবনে আচরণ করিবার বহু উপকরণ স্তরে স্তরে পরিবেশিত হইয়াছে। হিন্দু ধর্মের সার এত সংক্ষেপে ও সরল ভাবে বর্ণনার জন্য গ্রন্থকার প্রশংসার্হ।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শতাব্দী—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। পূরবী পাবলিশার্স। ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে যে কয়খানি সার্থক উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে শ্রীরমেশচন্দ্র সেনের শতাব্দী তাহাদের অন্যতম। এই পুস্তকের একটি প্রধান আকর্ষণ ইহার ভাষা। এই নিরলঙ্কৃত অথচ রসসম্পৃক্ত ভাষার এমনি একটা যাদু আছে যে, ইহা পাঠকের মনকে কাহিনীর মধ্যে একেবারে তন্ময় করিয়া রাখে।

কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে পূর্ববঙ্গের বিলাম অঞ্চলের পল্লীগ্রাম মঞ্জরীকে কেন্দ্র করিয়া। লেখক ধ্যানযোগে নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের অন্তর-সত্তার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিয়াছেন। বাংলার মাটি, জল, মাঠ, ঘাট, নদী, ডোবা, খাল, বিলের সঙ্গে পল্লীর নরনারীর যে কি গভীর নাড়ীর যোগ তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া যেন হৃদয়ের সবটুকু দরদ ঢালিয়া দিয়া লিখিয়াছেন। বাংলার যে চাষী-সম্প্রদায় এদেশের মাটিতে সোনা ফলায়, তাহাদেরই একজন, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের রাজেশ্বর এই উপন্যাসের নায়ক। সে ছিল সহায় সম্বলহীন দরিদ্রের সন্তান, কিন্তু মাটির দৌলতে হইল অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক। তাহার আমলে শহর ও গাঁয়ের মধ্যে ঘটে মিতালি, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের স্রোত মঞ্জরীতে প্রবেশ করিয়া সেই ক্ষুদ্র পল্লীটিতে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করিল। রাজেশ্বরের জীবনে আসিতেছে পর পর আঘাত ব্যর্থতা মৃত্যুশোক আদর্শসংঘাত; কিন্তু সবকিছুতে অবিচলিত থাকিয়া সে যে অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিতেছে, তাহা বিস্ময়কর। মাটির প্রতি তাহার গভীর টান আর তাহার অপরাজেয় পৌরুষ ক্নুটহামসুনের *Growth of the Soil* উপন্যাসের নায়ক চাষী আইজাকের কথা মনে করাইয়া দেয় এবং আইজাকের মত—He is the man, the leader,—এই কথাগুলি তাহারও প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। চুম্বক যেমন লোহকে আকর্ষণ করে তেমনি এই চরিত্রটি অন্য সব কয়টি চরিত্রকে এক অদৃশ্য আকর্ষণে নিজের ব্যক্তিসত্তার পার্শ্বে টানিয়া রাখিয়াছে, এবং সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের আওতায় প্রত্যেকটি চরিত্রই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে পল্লী ও শহরের ব্যবধান ক্রমবিলীয়মান। পল্লীর পথল মহানগরীর ভাবগঙ্গার বিপুল প্লাবনে উচ্ছ্বসিত, বাংলার পল্লী আজ নবযুগের নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। "শতাব্দী"তে একদিকে যেমন আছে সেই যুগচেতনার প্রতিফলন, অন্য দিকে তেমনি আছে "দেশে আগত এক নূতন অতিথির" প্রতি স্বাগত-সম্ভাষণ। এই নবাগতের নাম কম্যুনিজম, রাজেশ্বরের মত খাঁটি গান্ধীবাদী অসহযোগী পর্য্যন্ত অবশেষে যাহার ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

এই বাজারে অল্পকালের মধ্যে উপন্যাসখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়ায় বাঙালী পাঠকের সাহিত্যপ্রীতির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ভারতের মুক্তিসন্ধানী— শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। ভারতী বুকষ্টল, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৷৹

'মুক্তির সন্ধানে ভারত' প্রণেতা শ্রীযোগেশ বাগল মহাশয় প্রচুর গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানাদি দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীর কৃতী ও দেশবরেণ্য মনীষিগণের জীবনী আলোচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহার সেই খ্যাতিকে বর্দ্ধিত করিবে। এই গ্রন্থে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, রামগোপাল ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কয় জন বরণীয় ব্যক্তির জীবনী ও কৃতির কথা আলোচিত হইয়াছে। দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ইঁহাদের সকলেরই অবদান অতুলনীয়। শিক্ষাবিস্তারে, মাতৃভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে, দেশের সংস্কৃতি, শিল্পবাণিজ্যের প্রসারে, স্বদেশের উন্নতি-পরিপন্থী আইনের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষে, সকল দিকেই ইঁহাদের সর্ব্বতোমুখী প্রচেষ্টা ও উদ্যম প্রত্যেক দেশবাসীর স্মরণীয় ও অনুধাবনযোগ্য। ইঁহাদের বিস্মৃতপ্রায় কীর্ত্তিকাহিনী তথ্যপ্রমাণাদিযোগে সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া গ্রন্থকার দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ভবিষ্যৎ সংস্করণে গ্রন্থকার ডবলিউ সি ব্যানার্জ্জি, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ আরও কয়েকজন মুক্তিসন্ধানী সাধকের জীবনী এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহা অধিকতর উপযোগী হইবে। কয়েকখানি ফটো পুস্তকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

দেশ-বিদেশের কথা

সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিগত ১৬ই পৌষ (২রা ডিসেম্বর), বৃহস্পতিবার, উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট জন-সেবক এবং কংগ্রেস-কর্ম্মী, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন কৌন্সিলর সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় মাত্র সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ পিতামাতা এবং আত্মীয় ও বন্ধুবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত বিজড়িত ছিলেন। রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ তাঁহার বিদ্যানুরাগকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। খেলাধুলার প্রতি অনুরাগও তাঁহার অল্প ছিল না। বি-এ এবং বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার ছোট আদালতে তিনি ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাহার পরই ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু হয়। কংগ্রেসকর্ম্মী রূপে তিনি সেই বিরাট আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যগণ একে একে কারাগমন করিলে উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির পরিচালন-ভার এই তরুণ কর্ম্মীর উপর পড়ে। অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত সম্পাদক-পদের গুরু দায়িত্ব পালন করিয়া সুধীরকুমার কারাবরণ করেন।

১৯৩১ সনে ছয়ের পল্লী হইতে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কৌন্সিলর নির্ব্বাচিত হন। ঐকান্তিক সাধুতা, সচ্চরিত্রতা এবং কর্ম্মদক্ষতার গুণে তিনি এতই জনপ্রিয় হইয়াছিলেন যে পৌরসভার ত্রৈবাৎসরিক নির্ব্বাচনে তিনি পর পর তিন বার জয়লাভ করেন। এই সম্মানের আসনকে তিনি কখনও পদমর্য্যাদা হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। জনগণের নিঃস্বার্থ সেবাই তাঁহার ব্রত ছিল। পৌরসভায় স্থানলাভ করিয়া এই ব্রত উদ্‌যাপনে সুধীরকুমার তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের এজেন্ট নিযুক্ত হন। সর্ব্বশুদ্ধ এগার বৎসর তিনি পৌরসভায় ছিলেন। ইহার পর বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও সুধীরকুমার আর নির্ব্বাচনপ্রার্থী হন নাই। তাঁহার কার্য্যকালে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ, সুযোগ্য ও সত্যনিষ্ঠ কৌন্সিলররূপে পরিচিত ছিলেন। জনসাধারণকে আপনার জন মনে করিতেন বলিয়া তিনি সকলের পরম প্রিয় ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ প্রবল ছিল। তিনি বহু দিন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্য এবং শেষ পর্য্যন্ত 'রবিবাসরে'র উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রচারণাহীন পরোপকার এবং নিঃস্বার্থ দান তাঁহার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ছিল। তাঁহার নিকট উচ্চনীচ-ভেদ ছিল না, সুমিষ্ট ব্যবহারের জন্য ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। আন্তরিকতা, সাধুতা এবং কর্ম্মনিষ্ঠা গুণে সুধীরকুমার নেতাজীর স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। এই আজীবন কৌমার্য্যব্রতধারী, পরহিতব্রতী, নিরহঙ্কার, অমায়িক, প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী, চরিত্রবান, জন-সেবকের অকাল তিরোধানে দেশ একজন একনিষ্ঠ কর্ম্মী এবং নির্ভীক স্বদেশপ্রেমিককে হারাইল। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

[illegible]——শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস [illegible]

দ্রোণাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে একলব্য
শ্রীচিত্রনিভা চৌধুরী
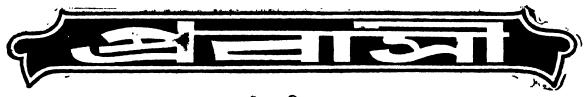
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

এলাহাবাদে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৩৬তম অধিবেশনে উদ্বোধন-বক্তৃতা প্রদান-রত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড } মাঘ, ১৩৫৫ { ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিম বাংলা

পশ্চিমবঙ্গ পরিচালনে বহু বাধাবিপত্তি ও সমস্যা প্রতি-পদে চালকদিগকে বিব্রত করিতেছে। এ অবস্থায় ক্রমাগত শাসন-পালনের দোষত্রুটি নির্দেশ করিয়া সমালোচনা করা সমালোচক ও প্রদেশচালক দুই পক্ষেরই নিকট অপ্রিয় ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে। অথচ বাংলার বর্ত্তমান দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা—যাহা দুই যুগ ব্যাপী কুশাসন ও দমননীতি অনুসরণ এবং কংগ্রেস কর্ত্তৃক অবহেলার ফল—ইহার সংশোধন ভিন্ন এদেশের আশা-ভরসা নাই। পূর্ব্বে দেশের শাসিত ও শাসনের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল ব্রিটিশ শাসকের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যবধানের কারণ দূরীভূত হইয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ শাসকের ভৃত্য ও অনুচরবর্গ এবং তাহাদের পদ্ধতি ও শাসন-প্রকরণ পূর্ব্ববৎ রহিয়া গিয়াছে। উপরন্তু ব্রিটিশ শোষক-বর্গের উত্তরাধিকারীর দল, যাহারা প্রথমে ব্রিটিশ শাসকবর্গের কৃপায় বাংলার লুণ্ঠন ও শোষণ কার্য্যে সফলকাম হইয়াছে, তাহারা আজ অতিপ্রবল। এই দুই বীজাণুর আক্রমণে সমস্ত জাতির জীবন-স্রোত আজ রোগাক্রান্ত এবং বাংলাদেশে ঐ রোগের প্রকোপ এখন ব্যাপক মহামারীতে পরিণত। ইহার ফলে সেই মামুলী ব্যবধান আজ পুনঃস্থাপিত হইতে চলিয়াছে। উহা যদি আবার পূর্ব্বরূপ ধারণ করে তবে দেশে অরাজকতা, জনবিক্ষোভ ও জাতির অধোগতি অনিবার্য্য।

"দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন" যেমন চিরাচরিত সুশাসনের নীতি, তেমনই সৎকার্য্যে উৎসাহদান ও দুষ্কর্ম্মের প্রচণ্ড প্রতিরোধও দেশ-চালনার প্রধান কর্ত্তব্য। দেশের জন-সাধারণের অভাব-অভিযোগ এক দিনে দূর করিবার মন্ত্র পৃথিবীতে কেহ কখনও খুঁজিয়া পায় নাই। কিন্তু দেশের শাসক ও চালকবর্গ সত্য সত্যই দেশের জনসাধারণের অবস্থা উন্নয়নের জন্য চেষ্টিত ও ব্যস্ত একথা যদি স্পষ্টই বুঝা যায় তবে দেশের আশার বায়ু বহিতে আরম্ভ করে, যাহাতে ধীরে ধীরে জনবিক্ষোভ শান্ত হয় এবং শাসক ও চালকগণ সাধারণের সাহায্য ও বিশ্বাস লাভ করিয়া ক্রমেই দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে সক্ষম হইতে পারেন। এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন দেশের চালক ও শাসকবর্গ এবং দেশের সাধারণের মধ্যে সহানুভূতি ও বিশ্বাসের সূত্রযোজনা।

দেশের শাসকবর্গের প্রয়োজন প্রতিপদে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের নিয়োজিত কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যপদ্ধতিতে দেশের লোকের জীবনযাপন ক্রমে স্বাভাবিক হইতেছে কিনা এবং দেশের লোক বুঝিতেছে কিনা যে ঐ কর্ম্মচারীবর্গ তাহাদেরই সেবায় নিযুক্ত। ব্রিটিশ আমলে দেশের লোক, বিশেষতঃ বাংলা-দেশের লোক, পুলিস বলিতে মোটামুটি বুঝিত একদল ঘুষখোর, মদ্যপ ও দুশ্চরিত্র উৎপীড়ক, যাহারা বিদেশী অধিকারীবর্গের বিশেষ অনুগত ও আজ্ঞাবাহী ভৃত্য এবং দেশের জনসাধারণের বিষম শত্রু। সাধারণে জানিত যে, পুলিসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকার নাই, কেননা কোনও পুলিস কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে উৎপীড়ন বা দুর্নীতির অভিযোগ করিলেই তাহার পদোন্নতি হইত, উপরন্তু অভিযোগকারী নিজের মাথায় পুলিসের ক্রোধ টানিয়া আনিয়া দুর্দশাগ্রস্ত হইত। আজ বাংলাদেশের চালক-বর্গের একান্ত অবহিত হওয়া প্রয়োজন যে, বর্ত্তমানে পুলিস ও জনসাধারণের মধ্যে বিশ্বাস ও সহানুভূতি কতটা আসিয়াছে।

ব্রিটিশ আমলে "সিভিল সাপ্লাই" বলিতে লোকে বুঝিত দুর্নীতিপরায়ণ রাজকর্ম্মচারী ও অর্থপিশাচ চোরাকারবারীর সপ্তম স্বর্গ। সেখানে আসল কথাই ছিল কাহাকেও কোন ব্যাপারে অযথা অধিকার দিয়া, এবং জনসাধারণকে নিষ্পেষণ করিয়া, কতটা "রস" তাহার কুক্ষিগত হয় এবং কতটা অধিকারীবর্গের আয়ত্তে আসে। আজ দেশচালকবর্গকে দেখিতে হইবে সেই অবস্থার কতটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ব্রিটিশ আমলে "লীগ"দলের স্বার্থের পূরণই ছিল উচ্চতম অধিকারী-বর্গের একমাত্র আদর্শ। দেশের লোকের উন্নতি বা সুখ ছিল নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। আজ আমাদের দেখিবার সময় আসিয়াছে যে, দলগত স্বার্থের জন্য জনসাধারণের স্বার্থ কতটা সঙ্কুচিত হইয়াছে।

সাধারণের দিক হইতে এখন নিয়ম-শৃঙ্খলার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিবার সময় আসিয়াছে। বাচাল, কর্ম্মবিমুখ, সুবিধাবাদীর কথায় ভুলিয়া নিজের ও দেশের সর্ব্বনাশ আমরা যথেষ্টই করিয়াছি, এখন দেশপ্রেমের উন্নত ধরণের মানদণ্ড স্থাপনের সময় আসিয়াছে।

দেশব্যাপী অসন্তোষ

গত কার্ত্তিক মাসে কাশী নগরীতে এক বক্তৃতা উপলক্ষে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছিলেন :

"কংগ্রেস তাহার আদর্শ-চ্যুত হইয়াছে ; মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।...কংগ্রেসের লোকেরা পরস্পর ঝগড়া-ঝাঁটি করিতেছে ; ক্ষমতা লাভের জন্য কাড়াকাড়ি করিতেছে।"

জয়পুর কংগ্রেসের অঙ্গ-স্বরূপ "সর্ব্বোদয়" প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্মোচন উপলক্ষে গত ১লা পৌষ আচার্য্য বিনোবা ভাবে বলেন :

"আজিকার কংগ্রেসসেবীরা তাঁহাদের বিগত আত্ম-ত্যাগকে বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে নবতর আত্মত্যাগের আর কোনও প্রেরণা নাই। বর্ত্তমানে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সত্যের যেন আর স্থান নাই। ক্ষমতা লাভের জন্য অভব্য কাড়াকাড়ি এবং ঈর্ষা ও অসূয়া কর্ম্মীদের মধ্যে প্রতিনিয়ত দেখা যাইতেছে।...আজিকার কংগ্রেস অতীতে যে মূলধন সঞ্চয় করিয়াছিল, সেই মূলধন ভাঙাইয়া চলিতেছে। সত্য ও অহিংসার যে মহামতবাদ গান্ধীজী এতকাল ধরিয়া প্রচার ও প্রসার করিয়া গেলেন বর্ত্তমান কংগ্রেস সে মতবাদ হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে।"

গত ৮ই পৌষ মাদ্রাজ নগরীতে এক জন-সভায় বক্তৃতা উপলক্ষে আচার্য্য সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন :

"ক্ষমতার নেশা আমাদের উন্মত্ত করিয়াছে। যদি আমরা জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও উন্নত করিতে ইচ্ছা করি তবে আমাদের যথেষ্ট উদার ও সহৃদয় হইতে হইবে।

"মহাত্মাজী আমাদের মুক্তির দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিয়া আমাদের মধ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার দেওয়া শিক্ষাকে যদি আমরা কার্য্যে রূপান্তরিত করিতে না পারি, তবে নবলব্ধ স্বাধীনতা জোনাকির ক্ষণিক আলোকের মত অর্থহীন হইয়া যাইবে।

"জনসাধারণের প্রতি ব্যবহারের মান সংক্রান্ত প্রস্তাব জয়পুর সম্মেলনে যে বিপুল সমর্থন লাভ করিয়াছে তাহা হইতে মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষের ইঙ্গিত পরিস্ফুট হইয়াছে। আমাদের শাসক সম্প্রদায় সে অসন্তোষের কথা জানেন ; এই ঘটনার মধ্যে তাঁহাদের সতর্ক করিবার ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে। আজ সে অসন্তোষ অচল অবস্থায় ছিন্নভিন্ন হইয়া থাকিলেও একদিন তাহা সক্রিয় হইয়া উঠিবেই।...

"যদি আমরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে না পারি ও কেবলমাত্র অর্থহীন চীৎকার এবং শ্রমিকদের রক্তশোষক ধনিকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে অসমর্থ হই তবে এই অসাম্য দেশব্যাপী অসন্তোষের আগুন জ্বালাইতে বাধ্য।

"এখনও আমাদের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, যেন বিদেশী-দের ধারণা না হয় আমাদের সরকার ধনিকদের স্বার্থ-রক্ষায় ব্যস্ত ও ধনিকদের দ্বারা পরিচালিত। যদি আমরা তাহা না করিতে পারি তবে এ দেশ সত্যকার সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রের সৃষ্টি করিতে পারিবে না।"

এই তিনটি উক্তি আমাদের দেশের যে তিন জন প্রধান ব্যক্তি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম জন ভারতরাষ্ট্রের মন্ত্রী—সহকারী প্রধান মন্ত্রী। অপর দুই জন দেশের চিন্তানায়ক। তিন জনই যে রোগের নিদান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার আরোগ্যের উপায় কি, তৎসম্বন্ধে এখনও কোন সুনিশ্চিত পন্থা ধরিয়া আমরা চলিতে পারিতেছি না। এই বিষয়ে দায়িত্ব কাহার, তৎসম্বন্ধে কাহারও মনে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। ভারতরাষ্ট্রের প্রজাপুঞ্জের একটি ক্ষমতাশালী অংশের নৈতিক অবনতি হইয়াছে। এই বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। এই শ্রেণীকে সংযত ও পরিশুদ্ধ করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এই বিষয়ে রাষ্ট্রকে শিক্ষক হইতে হইবে ; গান্ধীনীতি ও তৎ-প্রদর্শিত কর্ম্মপদ্ধতি এই সংশোধনকার্য্যে কোন সাহায্য করিতে পারে কিনা তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রনায়কগণের। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্থির সিদ্ধান্ত দেশের লোককে জানাইয়া দেওয়া উচিত। দফাওয়ারিভাবে কংগ্রেসকর্ম্মী বা ধনিকদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলে চলিবে না। ব্যক্তিকে দেখাইয়া বলিতে হইবে—"তুমি, তুমি পাপী, কালাবাজারী, মুনাফালোভী, সমাজের অনিষ্টকারী।" এইভাবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবার সাহস না থাকিলে ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গের কর্ত্তব্যচ্যুতি হইবে, এখনও হইতেছে। প্রশ্রয় পাইয়া অন্যায় এমন ভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে যে দেশের লোকের মনে একটা নিরাশা ও নিরুৎসাহ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই মনোভাব হইতে সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপে অবহেলা, অ-দরদ। সেইজন্য আমরা বলিতেছি "কাণ্ডারী! হুশিয়ার!"

ভারতরাষ্ট্রের সহিত ব্রিটেনের সম্বন্ধ

কংগ্রেসের জয়পুর অধিবেশনের বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় কংগ্রেসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতারূপে ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া ভারতরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতির ব্যাখ্যা করেন। এতৎ-সম্পর্কে সহজেই ভারতরাষ্ট্রের সহিত ব্রিটেনের সম্বন্ধের কথাটা আসিয়া পড়ে এবং পণ্ডিতজীর কথা হইতে বুঝা যায় যে, যদিও গণ-পরিষদের উপর এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার দেওয়া হইয়াছে, তবুও এই কথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে

করিবেন বা করিয়াছেন। কারণ তাঁহারাই গণ-পরিষদেরও নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি, এবং তাঁহাদের মতামতের বিরুদ্ধে গণ-পরিষদের পক্ষে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং ভবিষ্যতে গণ-পরিষদ কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে তৎ-সম্বন্ধে একটা ধারণা করিবার জন্ত কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু যাহা বলিয়াছেন তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই :

"আমরা জাতি হিসাবে স্বাধীন। মধ্যবর্ত্তী সময়ের জন্ত আমাদের ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিতে হইলেও আমাদের আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক নীতি গ্রহণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। আমাদের উপর কেহই সর্দ্দারী করিতে পারিবে না। আমাদের বর্ত্তমান নীতির পরি-বর্ত্তনের জন্ত পৃথিবীর কোন জাতিই চাপ দিতে পারিবে না। স্বাধীনতা কথাটির পূর্ণ অর্থ ধরিয়াই আমরা স্বাধীন হইয়াছি। নিজেদের ভবিষ্যৎ সংগঠন করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমরা নিজেরাই লইয়াছি।...কিন্তু তথাপি আমাদের দেখিতে হইবে, সত্যিকারের স্বাধীনতা বলিতে কিছু পৃথিবীতে আছে কিনা। পৃথিবীতে কোন্ দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন? স্বাধীনতা বলিলে যদি কাহারও অধীনতা না মানার কথা বুঝাইতে চান, তাহা হইলে দেখিবেন পৃথিবীতে কোনো দেশই স্বাধীন নয়,—এমন কি আমেরি-কার যুক্তরাষ্ট্রও নয়, সোভিয়েট রুশিয়াও নয়। অন্তান্ত দেশের তো কথাই নাই।..."

এই কথার মধ্যে ভায়ের খেলা যাহা আছে, তাহা উল্লেখ করিয়া আমরা মূল বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা করিব। পণ্ডিতজী প্রশ্ন করিয়াছেন "পৃথিবীতে কোন্ দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন?" কিন্তু এইখানেই তিনি থামিলেন কেন তাহা বুঝিলাম না। মানুষ কি স্বাধীন? সৃষ্টি কি অটুট বিধানে আবদ্ধ নয়? "সত্যিকারের স্বাধীনতা বলিতে কিছু আছে কিনা"—এই প্রশ্নের মধ্যেই পণ্ডিতজীর চিন্তাধারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক অবোধ্য শাসন-ব্যবস্থার অধীনে তাহাকে বাস করিতে হইতেছে অনাদি অনন্ত কাল হইতে ইহাই যদি মানবের অবস্থা হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অপ্রাপ্য এবং তাহার কল্পনা মানব-মনের ভাববিলাস মাত্র। কিন্তু তবুও যুগ-যুগান্ত ধরিয়া তাহার আকুতি বন্ধন-মুক্তির জন্ত এবং সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রকৃত বন্ধন-মুক্তির কোন সম্ভাবনা দেখিতে না পাইয়াই সে এক অতীন্দ্রিয় মুক্তির কল্পনায় ও তাহার সাধনায় আনন্দ পায়।

কিন্তু ইহা হইল তত্ত্ব-কথা। ব্যবহারিক জগতে মানব-মন একটা গোঁজামিল দিয়া বাস্তব-জীবনের কাজ চালাইয়া যাইতেছে, এবং এই গোঁজামিলের দিক হইতেই ভারত-রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্বন্ধের কথা আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। যদিও আমাদের নেতৃবৃন্দ বলিতেছেন যে, ভারত-রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ থাকিতে চায়, তবুও এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে, ব্যবহারিক জগতে 'নিরপেক্ষ' বলিয়া কোন ব্যবস্থা থাকিতে পারে না। সজ্ঞানেই হউক অজ্ঞানেই হউক, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমাদের কোন-না-কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তিবৃন্দ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এই সংঘর্ষের আশঙ্কায় পৃথিবী হইয়া পড়িয়াছে সন্ত্রস্ত, এবং যদিও কেহই এই সংঘর্ষে জড়াইয়া পড়িতে চায় না, তবুও কাহারও নিরপেক্ষ থাকিবার উপায় নাই। এই অবস্থায় ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকিবার কল্পনা করিয়া নিস্তার পাওয়া যাইবে না। একটা অবস্থার কল্পনা করা যাইতে পারে যাহার ফলে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ড যে অবস্থার কল্যাণে নিরপেক্ষ থাকিতে পারিয়াছিল, তাহা সম্ভব কিনা ভাবিবার বিষয়। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাষ্ট্র পরস্পর বিরোধী শক্তি; পৃথিবী জুড়িয়া তাহারা তাহাদের ঘাঁটি প্রস্তুত করিতেছে। ভারতরাষ্ট্র দক্ষিণ-এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে বসিয়া আছে। ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের হাত-ধরা এবং ব্রিটেনের সহিত আমাদের সম্বন্ধ থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ভারতরাষ্ট্রের উপর চাপ দেওয়া সহজ। এই চাপ সোভিয়েট রাষ্ট্র সহ্য করিবে না। তৃতীয় মহাযুদ্ধের সমর-নীতিতে ভারতরাষ্ট্রের স্থান কোথায়, তৎ-সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাষ্ট্র মাথা ঘামাইতেছে আমাদের অপেক্ষা বেশী।

ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট নানা পত্রিকা প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে দেখিয়াছি একখানি পররাষ্ট্র-নীতির বিষয় লইয়া আলোচনা করে। কিন্তু তাহার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এমন কোন ইঙ্গিত পাইলাম না যাহা হইতে ভারত-রাষ্ট্রের সমর-নীতি সম্বন্ধে আমরা কোন চিন্তার খোরাক পাইতে পারি। ভারতরাষ্ট্র দুনিয়ার অভিনয়-ক্ষেত্রে কোন্ খেলা খেলিতে পারিবে—ভূগোল ও ইতিহাস তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান জগতে—বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে—কোন্ খেলা আমরা খেলিব বা খেলিতে পারিব, তৎসম্বন্ধে আমাদের রাষ্ট্র-নায়কবৃন্দের একটা দায়িত্ব আছে। ব্রিটেনের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখিলে খেলিতে হইবে এক খেলা; নিরপেক্ষ থাকিতে পারিলে খেলিতে পারিব আর এক খেলা; সোভিয়েট রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিলে তাহা হইবে অন্তরূপ। এই তিনটি সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের দেশের জন-মত অস্পষ্ট; কারণ এই বিষয়ে জ্ঞান নাই বলিলেই হয়। এই জ্ঞানদান ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গের একটা দায়। সেই জ্ঞান দান না করিয়া, দেশকে অজ্ঞানে রাখিয়া, ব্রিটেনের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিলে অন্তায় হইবে।

ভারতরাষ্ট্রে শিক্ষা-বিস্তার

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির পঞ্চদশ বার্ষিক

অধিবেশনের সভায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর অভিভাষণ নৈরাশ্যপূর্ণ। "আমরা অতি উৎসাহী হইয়া যথাসম্ভব দ্রুত শিক্ষা-বিস্তার সংক্রান্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে চাহিয়াছিলাম; আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমি শিক্ষা উন্নয়নের কার্য্যের গতিবেগ মন্দীভূত করিতে সম্মত হইয়াছি; মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বেগ এমনই প্রবল হয় যে মন্ত্রীসভা…ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিতে বাধ্য হন। সেই কমিটি সকল দপ্তরে ব্যয়-সঙ্কোচের প্রস্তাব করেন এবং বলেন যে সকল প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনা বন্ধ করিতে অথবা ইহার কার্য্যের গতি মন্দীভূত করিতে হইবে।"

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বক্তৃতার এই সকল মন্তব্য হইতে এই ধারণা পরিষ্কার হইয়া যায় যে, গত চার-পাঁচ মাস হইতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে সব কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল এবং নানাপ্রকার পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য সরকার পক্ষ হইতে যে সব তাগিদ আসিতেছিল তাহা শেষ পর্য্যন্ত আলেয়ার রূপ ধারণ করিবে।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সভায় বলিয়াছেন ইংরেজ আমলের শেষ বৎসরে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট শিক্ষা কার্য্যে দুই কোটি টাকার কিঞ্চিৎ-ঊর্দ্ধ পরিমাণ ব্যয় করিতেন। বর্ত্তমান বৎসরে তাহার দ্বিগুণের বেশী ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। অথচ বয়স্কদের শিক্ষার ব্যয়ের জন্য কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট শতকরা ৫০ টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাঁহার এলাহাবাদের বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের ভাণ্ডারের খবর পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট হইতে বয়স্ক শিক্ষার জন্য যে সাহায্য পাইবার আশা করিয়া নানা প্রদেশে নানা বিরাট পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে বা হইতেছে তাহা বানচাল হইয়া যাইবে। এই বিষয়ে যাঁহারা আগ্রহান্বিত তাঁহাদের আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে, এবং প্রাদেশিক গবর্মেণ্টসমূহ নিজের ঘাড়ে এই বোঝা না তুলিয়া বে-সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে এই কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া দিলে ফলপ্রসূ হইবে। প্রাদেশিক ভাণ্ডার হইতে কয়েক লক্ষ টাকা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের হাতে দিলে সরকারী ব্যয়বহুলের ও গড়িমসির হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি সরকারের অতি সামান্য সাহায্য পাইয়া নিজের চেষ্টায় বয়স্কদের শিক্ষা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে প্রথম চেষ্টায় জন্য যে সাহায্য পাওয়া যাইবে তাহা অপ্রচুর হইতে পারে। কিন্তু দেশের লোকের আগ্রহ থাকিলে এই সামান্য সাহায্য লইয়াই অনেক দূর আগাইয়া যাইতে পারে, যেমন পারিয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি লোক-সেবা সঙ্ঘ। অন্যান্য দেশেও এইরূপ উদাহরণ আছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার একটা বর্ণনা নিম্নে তুলিয়া দিলাম:

"গত যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ যে ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয়ের (School on Wheels) প্রবর্ত্তন করেন এখনও তাহা চালু আছে। এইবার দ্বিতীয় বারের জন্য এই ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয়টি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র পরিক্রমায় বাহির হইয়াছে এবং আগামী ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ইহার তেরটি ষ্টেট ঘোরা সম্পূর্ণ হইবে। হাসপাতাল, সামরিক, নৌ এবং বিমান ঘাটিগুলিই এই ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয়ের গন্তব্যস্থল।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্যদলের নানারকমের শিক্ষা এবং উপদেশ দান করাই এই বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। সাধারণ শিক্ষাকেন্দ্রে সৈন্যরা যে শিক্ষালাভ করে তাহার পূরক হিসাবেই এই অতিরিক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথম পরিক্রমায় বাহির হইয়া এই চলমান স্কুল দক্ষিণ-পূর্ব্ব রাষ্ট্রগুলির আঠার হাজারেরও বেশী সৈনিককে বহু প্রয়োজনীয় সংবাদ এবং উপদেশ দিয়াছিল।

মার্কিণ সামরিক বিভাগগুলিতে বর্ত্তমানে প্রায় দুই লক্ষ সৈনিকের নাম আছে। তাহাদিগকে ভাষা, সমাজ-বিজ্ঞান, গণিত, ব্যবসা ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষাদান ব্যাপারে আমেরিকার ৫৪টি বিশ্ববিদ্যালয় সামরিক বিভাগের সহিত সহযোগিতা করিয়া থাকেন।"

স্ত্রী-শিক্ষায় শিল্প-শিক্ষার স্থান

কয়েক দিন পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশের একখানি দৈনিক ইংরেজী সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে ঐ প্রদেশের গবর্মেণ্ট শিল্প-শিক্ষার জন্য একটি বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন; এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রদেশের স্ত্রী-শিক্ষার পাঠ্যের মধ্যে শিল্প-শিক্ষার স্থান করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে। পঞ্জাব হইতে বাস্তত্যাগী স্ত্রীলোকদের অবলম্বন করিয়াই এই নূতন শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইবে। এই পরিকল্পনার ব্যয়ের মধ্যে দেখিয়াছিলাম যে প্রতি স্ত্রী-শিক্ষার্থিনীকে মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট ব্যাপারের গুরুত্বটা উপলব্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কেবল চার-পাঁচ লক্ষ বাস্তত্যাগী স্ত্রীলোকের শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই কর্ত্তব্যের শেষ হইবে না। যুক্তপ্রদেশের প্রায় সাত কোটি লোকের মধ্যে অর্দ্ধেক হইবেন স্ত্রীলোক; তার অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক শিল্প-শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী মনে করিলে প্রায় আশি-নব্বই লক্ষ স্ত্রীলোকের শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে কাশীতে একটি বিধবাশ্রম দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল; তৎপূর্ব্বে ভ্রমণ উপলক্ষে কাশীর সন্নিকটস্থ গ্রামসমূহ ও "ব্রজ-মণ্ডলের" গ্রামসমূহের জীবনযাত্রা দেখিয়া

ছিলাম। সেই অভিজ্ঞতার ফলে বলিতে পারি যে, যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এক বিরাট কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেছেন।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা হইতে এই বিষয়ে আমরা আরও নিশ্চিতভাবে মতামত প্রকাশ করিতে পারি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা অবলা বসু "নারী-শিক্ষা-সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন; এই কার্য্যে তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ ছিলেন ৺কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক। সাধারণ লিখন ও পঠন লইয়া এই শিক্ষার সূত্রপাত হয়। সমিতির বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর অভাব মিটাইবার জন্য "বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনে"র প্রতিষ্ঠা হয়। দুই-তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই দেখা যায় যে, যে শ্রেণী হইতে শিক্ষয়িত্রী-শিক্ষার্থিনীরা আসিতেছেন তাঁহাদের অবস্থা এমন ধাপে নামিয়াছে যে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জন্য কোন উপার্জ্জনের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সেইজন্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইল "মহিলা শিল্প-ভবন" নামে শিল্প-বিদ্যালয়। আজ প্রায় বাইশ বৎসর এই বিদ্যালয় নীরবে কর্ম্ম করিয়া যাইতেছে। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা অবৈতনিক ছিল; এখনও শিল্প শিক্ষার দ্রব্যাদি বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ের ব্যয়ের জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা কর্পোরেশনের দানের উপর মুখ্যতঃ নির্ভর করিতে হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে দান ছিল, তাহার পরিমাণ বাড়ে নাই। সুতরাং এই বিদ্যালয় শিক্ষা-বিস্তার করিতে পারিতেছে না; ছাত্রীসংখ্যা বাড়াইতে এক প্রকার অপারগ।

"নারী-শিক্ষা-সমিতি" কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়টির এই অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, কলিকাতা নগরীতে শিল্প-দ্রব্যের উৎপাদন কঠিন নয়। কিন্তু এই শিক্ষা-বিস্তার প্রদেশব্যাপী করিতে হইলে যে বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সজাগ নহেন।

ভারতরাষ্ট্র, কাশ্মীর ও "পাকিস্থান"

কাশ্মীরের রণাঙ্গনে "যুদ্ধ-বিরতির" নির্দ্দেশ প্রতিপালিত হইতেছে। এই বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিতাম যদি "পাকিস্থান" নিজের অন্যায় বুঝিয়া "যুদ্ধ-বিরতি" করিতে পারিত। ১৯৪৮ খ্রীঃ জানুয়ারী মাস হইতে ভারতরাষ্ট্র যে নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছে, "পাকিস্থান" সে নীতি মানিয়া লইলে বার মাস এই দুই রাষ্ট্র এরূপভাবে ধনে-প্রাণে নষ্ট হইত না। কাশ্মীরের জনগণের ভোটের উপর সব দায়িত্ব ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিল ভারতরাষ্ট্র; "পাকিস্থান" গায়ের জোরে কাশ্মীরে আগুন জ্বালাইয়া, ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া, নরহত্যা করিয়া, স্ত্রীলোকের অসম্মান করিয়া, কাশ্মীর দখল করিতে চাহিয়াছিল বলিয়াই চৌদ্দ মাস দশ দিন যুদ্ধ চলিয়াছে। ১৯৪৭ খ্রীঃ অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে যাহা হইতে পারিত, ১৯৪৯ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী তাহা স্বীকার করিয়া "পাকিস্থান" সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘের নির্দ্দেশ পালন করিয়াছে; সঙ্ঘের শুভ-বুদ্ধির অনুজ্ঞা পালন করে নাই।

এই বিষয়ে আমাদের রাষ্ট্রপাল চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী যে ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ভারতরাষ্ট্রের পরিচালকবর্গের ভাবালুতার পরিচয় প্রদান করে; সেইরূপ ভাবালুতার অনুপ্রেরণায়ই তদানীন্তন রাষ্ট্রপাল লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেনের উৎসাহে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কাশ্মীরের যুদ্ধ-বিগ্রহকে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, কাশ্মীরের গণভোট স্থির করিবে—"দ্বি-জাতি" তত্ত্ব সত্য, ন্যায় ও সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা। *বর্ত্তমান জগতে এই "দ্বি-জাতি" তত্ত্ব অচল ও অনিষ্টকর এই বিশ্বাসের বলেই আমাদের রাষ্ট্রপাল ঘোষণা করিয়াছেন কাশ্মীরে 'যুদ্ধ-বিরতি'র অর্থ শুধু ইহাই নয় যে, কাশ্মীরের ভূ-ভাগে অস্ত্র-সম্বরণ হইয়াছে; দুইটি প্রতিবেশী 'ডোমিনিয়ন', ভারত ও পাকিস্থান পরস্পরের প্রতি যে ঘৃণা ও অবিশ্বাসের ভাব পোষণ করিতেছিল, তাহারও অবসান হইয়াছে। আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্থানের রাষ্ট্রপাল খাজা নাজিমুদ্দিন কিন্তু এত আশাবাদী বা ভাবালু নহেন। "যুদ্ধ-বিরতির" অব্যবহিত পরে তিনি বলিয়াছিলেন—ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে শান্তি ও প্রীতি কেবল কাশ্মীরে "যুদ্ধ-বিরতির" উপরই নির্ভর করে না; আরও অনেক ব্যাপার আছে যাহার মীমাংসা না হইলে, এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা কম। এই দুইটি উক্তির মধ্যে ভবিষ্যতের চাবিকাঠি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

যুদ্ধ-বিরতি ত হইল। ততঃ কিম্। সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘের পর্য্যবেক্ষকগণ তাহার সর্ত্তপালনের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। শেখ আবদুল্লার অধীনে যে গবর্ণমেণ্ট দেশের শাসনব্যবস্থা চালাইতেছে গণ-ভোটের সময়ে তাঁহার ক্ষমতা কতদূর অব্যাহত থাকিবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের পক্ষ হইতে যে সব বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেক প্রস্তাব আছে যাহার অর্থ অনিশ্চিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। "Local Officials" (স্থানীয় শাসকবৃন্দ) বলিতে কাহাদের নির্দ্দেশ করে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। পাকি-স্থানীরা ও আজাদ কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট বলিয়া পরিচিত প্রতিষ্ঠান কাশ্মীরের অনেক এলাকা অধিকার করিয়া আছে; সেই সব স্থানে শাসন-কার্য্য চালাইবার জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছে। "Local Officials" বলিতে এই সব লোকদের বুঝাইবে, না শেখ আবদুল্লা কর্ত্তৃক নিযুক্ত বা পাকিস্থান কর্ত্তৃক কাশ্মীর আক্রমণের পূর্ব্বে যে সরকারী কর্ম্মচারীরা সেখানে ছিল তাহাদের বুঝাইবে, এই কথা এখনও অনিশ্চিত রহিয়া গিয়াছে। যদি পাকিস্থানী কর্ম্মচারীদের অধিকৃত অঞ্চলে থাকিতে দেওয়া হয়, তবে গণ-ভোট পাকিস্থানের দিকে হেলিয়া পড়িবে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আর একটা কথা। সমগ্র কাশ্মীর-জম্মুর ভাগ্য গণ-ভোটের

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, না খণ্ড খণ্ড অঞ্চল লইয়া গণ-ভোট চলিবে, এই বিষয়ে নানারূপ কল্পনা জল্পনার কথা শুনিতেছি। বর্ত্তমানে পাকিস্থান হইতে এই কথাটাই খুব জোরের সহিত প্রচারিত হইতেছে যে, সমগ্র কাশ্মীর গণ-ভোটের আওতায় আসিবে; পাকিস্থান চায় না খণ্ডিত কাশ্মীর বা জম্মু যেমন চাহিয়াছিল খণ্ডিত ভারতবর্ষ। হঠাৎ এই বুদ্ধি গজাইল কেন তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। পাকিস্থানীরা মনে করে মহারাজ হরি সিং-এর রাজ্য যখন মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ, তখন তাহা সমগ্ররূপে পাকিস্থানে আসিতে পারে। কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লা মনে করেন যে, কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় "দ্বি-জাতি" তত্ত্বের মোহে আপনাদের নাক কাটিয়া ভারতরাষ্ট্রের যাত্রা ভঙ্গ করিবে না। এইরূপ আশা পোষণ করিবার কোন কারণ আছে কিনা, তাহা আমরা জানি না। এবং না জানিলে কাশ্মীর-জম্মুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

কিন্তু এই সব আলোচনা অনেকটা অবান্তর বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। কোন্ অবস্থার চাপে পড়িয়া বা কাহার পরামর্শে পাকিস্থান কাশ্মীর-রণাঙ্গনে "যুদ্ধ-বিরতির" নির্দ্দেশ মানিয়া লইল তাহা আমাদের এখনও জানিতে দেওয়া হয় নাই। একথা মনে করিলে অন্যায় হইবে না যে, প্রকৃত পক্ষে 'ব্রিটিশ নাটের গুরু'র অঙ্গুলী হেলনে পাকিস্থানের শাসকবৃন্দ চলিতেছেন। যে উদ্দেশ্য লইয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট পাকিস্থান অর্জ্জনে সাহায্য করিয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য এখনও নির্জ্জীব হইয়া যায় নাই। এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ "ডোমিনিয়নের" কর্ত্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করিলেও অন্যায় হয় না এবং বর্ত্তমানে সেই উদ্দেশ্য বলবৎ আছে। ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের সম্বন্ধ এই ব্রিটিশ নীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছে। এবং যত দিন তাহা হইবে, তত দিন এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে কোন স্বার্থের বন্ধন দৃঢ় হইতে পারিবে না। ইংরেজের ইচ্ছা নহে যে এই দুই রাষ্ট্র এক নীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শক্তিশালী হইয়া উঠুক। ইংরেজ নিজের স্বার্থের প্রয়োজনে মুসলীম রাষ্ট্রমণ্ডলীকে তোয়াজ করিতেছে। পাকিস্থান এই কথা বুঝে বলিয়াই সে ইংরেজের সাহায্যে নিজের ঘর গুছাইতে ব্যস্ত। ইংরেজকে চটাইবার তার সাধ্য নাই।

ভারতশাসন আইন সংশোধন

গণ-পরিষদ কর্ত্তৃক ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের কয়েকটি বিধান সংশোধন করা হইয়াছে। সর্দ্দার প্যাটেল বিলটি উত্থাপন করেন এবং বলেন যে, উহা আনিবার দুইটি প্রধান কারণ আছে। উহার প্রথম উদ্দেশ্য, গত এক বৎসরে ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যসমূহের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার সামঞ্জস্য বিধান। উড়িষ্যার ২৫টি, মধ্যপ্রদেশের ১৫টি, মাদ্রাজের ৩টি, বোম্বাইয়ের ৪১টি ও পূর্ব্ব-পঞ্জাবের ৩টি রাজ্যের শাসনভার ঐ সব রাজ্যের নৃপতিবর্গ ভারত-সরকারের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন এবং ভারত-সরকার উহাদের শাসন-ভার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া ভারত-সরকার কয়েকটি রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন; ঐগুলি চীফ কমিশনার ও লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের প্রদেশের ন্যায় শাসিত হইতেছে। পূর্ব্ব-পঞ্জাবের পার্ব্বত্য দেশীয় রাজ্যগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশের ন্যায় চালানো হইতেছে। কচ্ছ রাজ্যটি পাকিস্থানের সীমান্তবর্ত্তী বলিয়া উহাকে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে রাখা বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ভারত-সরকার কচ্ছে একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর এবং দুইটি রেল পথ (একটি ব্রড গেজ, অপরটি মিটার গেজ) নির্ম্মাণের জন্য বহু টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। নৃপতিদের সহিত ভারত-সরকারের যে সব চুক্তি হইয়াছে বর্ত্তমানে তদনুসারে কাজ চলিতেছে। কিন্তু ইহাতে অসুবিধা আছে। কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের কোন আইন দেশীয় রাজ্যে প্রযুক্ত হইতে পারে না; ইহার জন্য ভারতশাসন আইনের সংশোধন আবশ্যক। এই সংশোধনের পর এখন দেশীয় রাজ্যের প্রজাদেরও রাজনৈতিক অধিকার বাড়িবে, তাঁহারা এখন সংশ্লিষ্ট প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন।

বিলটির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, শ্রমিক বিরোধ আইন কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্বন্ধে যে সকল বাধা দেখা দিয়াছে তাহা দূরীকরণ। শ্রমিক বিরোধ মীমাংসাকল্পে প্রদেশসমূহ নিজ নিজ এলাকায় ট্রাইবুনাল গঠন করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের এই সকল ট্রাইবুনালের কার্য্যে ও সিদ্ধান্তে কোনরূপ সামঞ্জস্য নাই এবং এজন্য নূতন নূতন জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে। প্রাদেশিক ট্রাইবুনালসমূহের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল শুনিবার এবং উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে বিলে একটি কেন্দ্রীয় ট্রাইবুনাল ও আপীল আদালত গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, ফিল্ম সেন্সর করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠনের কথা বিলে বলা হইয়াছে। ফিল্ম সেন্সর সম্বন্ধে বর্ত্তমানে বিশৃঙ্খলা চলিতেছে। একই ছবি প্রদর্শন কোন প্রদেশে নিষিদ্ধ হয়, কোথাও বা উহার অনুমতি দেওয়া হয়। ইহা দর্শক এবং ফিল্মের ব্যবসা উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। এরূপ একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলেই একমত। কেন্দ্রীয় বোর্ড এই ক্ষমতা গ্রহণ করিলে ফিল্ম সেন্সর কার্য্যে সামঞ্জস্য দেখা দিবে।

ভারতবর্ষ এই প্রথম ভারতশাসন আইনের সংশোধন নিজ পার্লামেণ্টে করিল। ইহা দ্বারা ভারতরাষ্ট্রের পূর্ণ সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ভারতীয় রাষ্ট্রবিধিতে সংখ্যালঘুদের আসন সংরক্ষণ

ভারতীয় আইন-সভাসমূহে সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিধান সম্পর্কে পুনরায় আলোচনার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সংখ্যালঘু অধিকার কমিটি পূর্ব্বে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণের এবং সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকার দানের সুপারিশ করিয়াছিলেন। দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা লাভ এবং ভারতবর্ষকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণার পর আইন-সভায় আসন সংরক্ষণের আর কোন প্রয়োজনীতা নাই বলিয়া গণ-পরিষদের বহু সদস্য মত প্রকাশ করায় উক্ত কমিটি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচনা করিতেছেন। ভারতীয় খ্রীষ্টান ও পার্শীরা প্রথম হইতেই ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহারা কোনরূপ সংরক্ষণ-ব্যবস্থা চাহেন না। শিখ সম্প্রদায়ের অন্ততঃ এক প্রগতিশীল দল অন্যান্য বিষয়ে কিছু কিছু অতিরিক্ত দাবি জানাইলেও আসন সংরক্ষণের কোন কথা বলেন নাই। তবে এ বিষয়ে শিখ প্রতিনিধিদের সকলের মতামত এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

একমাত্র তপশীলীরাই তাঁহাদের আসন সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহাদের দাবি প্রত্যাহারের জন্য কোন কিছু করেন নাই। হিন্দুদের মধ্যে বর্ণহিন্দু ও তপশীলী এই দুইটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ভাগ ইংরেজ সরকার নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনে করিয়া গিয়াছিল। তপশীলভুক্তিটা করা হইয়াছিল অস্পৃশ্যতা এবং জল অচলের ভিত্তিতে। সম্প্রতি গণ-পরিষদে অস্পৃশ্যতাকে অপরাধরূপে ঘোষণা করিয়া প্রস্তাব পাস হইয়াছে। ইহার পর অস্পৃশ্যতার ভিত্তিতে হিন্দু সমাজে দুইটা ভাগ আর থাকিতে পারে না। অনগ্রসরতা 'মাইনরিটিদের' মাপকাঠি হইতে পারে না; বর্ণহিন্দুর মধ্যেও এমন বহু লোক আছেন যাঁহারা তপশীলীদের চেয়েও অনগ্রসর।

মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে ডাঃ সিংহের মন্তব্য

ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের হায়দরাবাদ অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক জে. সি. সিংহ তাঁহার অভিভাষণে ভারতের অর্থনৈতিক কার্য্যক্রম সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে দেশের মূল সমস্যাগুলির প্রতি তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময় অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য ব্রিটিশ ডোমিনিয়নকে শিল্পোন্নতির যে সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল ভারতবর্ষকে তাহা দেওয়া হয় নাই। ভারতে যুদ্ধকালীন ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলাফল আলোচনা করিয়া তিনি বলেন, টাকার দিক হইতে আয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং আয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিপুল পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অর্থের এক বৃহৎ অংশই বিত্তশালীদের হাতে সঞ্চিত রহিয়াছে। কর ধার্য্য করিয়া অন্যান্য দেশের তায় উহা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমানো সম্ভব হয় নাই, কারণ এ দেশে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে কর ফাঁকি দেওয়া হইয়াছে। কথাটা খাঁটি সত্য। এই সব সঞ্চিত অর্থ কোথায় গিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া ডাঃ সিংহ বলেন যে, আনুমানিক ৩৫০ কোটি টাকা চোরাকারবারের জন্য মজুত রহিয়াছে।

ব্রিটেনের অবস্থার সহিত ভারতের অবস্থার তুলনা করিয়া তিনি বলেন, ব্রিটেন কেবলমাত্র মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিঙের কার্য্যকরী পন্থাই অবলম্বন করে নাই, উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিঙের সুবিধা গ্রহণ করিয়া নিজস্ব অর্থনৈতিক সমস্যাকে ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছে।

মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপকতা আলোচনা করিয়া অধ্যাপক সিংহ বলেন, যুদ্ধকাল অপেক্ষাও ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৪৮-৪৯ সালে পণ্যমূল্য অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাজেটে ঘাটতি থাকিলেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে, এমন কোন কথা নাই। আমাদের সমস্যার আসল কথা এই যে, বাড়তি ক্রয়-ক্ষমতা দূর করা হয় নাই। বরং, এই অর্থের এক অংশ চোরাবাজারে মাল মজুত রাখার জন্য "নিয়োগ" করা হইয়াছে। ফলে প্রকাশ্য বাজারে এ সকল মালের অভাব দেখা দিয়াছে এবং চোরাকারবারীদের হাতে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। কর-ভার হ্রাস করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া যায় কিনা সে সম্পর্কে আলোচনা করিয়া অধ্যাপক সিংহ বলেন, গবর্মেণ্ট যদি এখন উচ্চতর আয়ের উপর কর-ভার হ্রাস করিতে চাহেন, তবে জনসাধারণের বাড়তি ক্রয়-ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং বর্ত্তমান মুদ্রাস্ফীতি আরও ব্যাপক আকার ধারণ করিবে। যুদ্ধকালে যে সকল কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, সেগুলির স্থলে নূতন কলকারখানা না বসাইয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে ব্যয় বেশী হইবে এবং উৎপাদন কম হইবে। কর হ্রাস করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইবে না। নিম্নোক্ত অসুবিধাগুলি দূর করাই প্রয়োজন:

(ক) যানবাহনের অভাব; (খ) যন্ত্রপাতি ও কলকারখানার দুষ্প্রাপ্যতা; (গ) শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রার অভাব; (ঘ) কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী লোকের অভাব; (ঙ) শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে অসন্তোষজনক সম্পর্ক।

বিভিন্ন প্রদেশে ও কেন্দ্রে উদ্বৃত্ত বাজেটের সম্ভাবনা আলোচনা করিয়া তিনি বলেন, যাহাদের আয় বেশী তাহাদের উপর আরও করের বোঝা চাপাইতে গেলে কর ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তিই বৃদ্ধি পাইবে। একথাও ঠিক যাহাদের আয় কম, তাহাদের উপর নূতন কর চাপাইতে গেলে তাহারা আরও বিপন্ন হইবে। কেননা বিত্তহীন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বর্ত্তমান শিল্প-শ্রমিকদের অপেক্ষাও বেশী কষ্ট সহ্য করিতেছে। মুদ্রাস্ফীতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পরোক্ষ কর নির্দ্ধারণও অসঙ্গত হইবে।

কেননা উহার ফলে মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনাই দেখা দেয়। কিন্তু বিলাসদ্রব্যের উপর কর নির্দ্ধারণের প্রস্তাব সঙ্গতই হইয়াছে।

চোরাকারবার দমন করিবার কাজে সাহায্য লাভ করিবার পর দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিবার নীতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং যে হারে উৎপাদন হইবে, সেই হারেই দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিতে হইবে। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সহিত মুদ্রা-নীতির সামঞ্জস্য সাধনের জন্য ভারতের এখন হইতেই প্রস্তুত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

উপসংহারে ডাঃ সিংহ বলেন, এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকে তাহার যথাসাধ্য করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়। কিন্তু জনসংখ্যার এক বিরাট অংশের মনে যদি সামাজিক অন্যায়বোধ জাগ্রত থাকে তবে ইহা সম্ভবপর নয়।

বাঙালী সম্মেলন

সম্প্রতি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে বাঙালী সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় শ্রীশচীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বাঙালীর দুর্ব্বলতা ও তাহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ প্রদর্শন করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। আজিকার বাঙালীকে শুধু তাহার অতীত গৌরব কাহিনী শুনাইলেই চলিবে না, তাহার দোষ ত্রুটি ও দুর্ব্বলতাগুলিও তাহাকে চোখে আঙুল দিয়া নির্ম্মমভাবে দেখাইয়া দিতে হইবে। বাঙালীকে তাহার পূর্ব্ব গৌরবে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। শচীন্দ্রবাবু নেতার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। কথাটা ঠিক, কিন্তু সেই নেতার আবির্ভাব কবে হইবে তাহার আশায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বুদ্ধিমান ও স্বদেশপ্রাণ বাঙালীকে আজ এক নেতার অভাবে সজ্ঘনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। বাঙালীর স্বাধীনতা-প্রিয়তা এবং বিপ্লববাদের প্রতি তাহার অন্তরের টানের পরিচয় লাভের পর হইতে ইংরেজ বাঙালীকে চূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করিতে ইংরেজ বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু ধ্বংস করিয়াছিল বাঙালীর ব্যবসাকে। স্বদেশী আন্দোলনের পরেই প্রথমে পাটের ব্যবসায়ে, পরে খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবসায়ে মারোয়াড়ীর আবির্ভাব হয় ইংরেজের চেষ্টায়, এবং ইংরেজের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া কলিকাতার ব্যবসাক্ষেত্র হইতে বাঙালীকে ইহারা বিতাড়িত করিতে সক্ষম হয়। বাঙালী ব্যবসায়ী হটিয়া গিয়া আশ্রয় লয় ঢাকায়। খাদ্য ব্যবসাক্ষেত্রে মারোয়াড়ীর আবির্ভাব বাঙালীর স্বাস্থ্যের উপর যে প্রতিক্রিয়া আনিয়াছে তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। একই দ্রব্য নিজের খাওয়ার জন্য এবং বিক্রয়ের জন্য আলাদা করিয়া রাখার পদ্ধতি ইহারাই এদেশে আমদানী করিয়াছে।

শচীন্দ্রবাবুর বক্তৃতার কতকাংশ নীচে উদ্ধৃত হইল :

বাঙালীকে, বাঙালীর ভাষাকে অনাদর করিবার একটা প্রবৃত্তি স্থানে স্থানে বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভারত-বর্ষের পক্ষে বড়ই দুর্দ্দিনের কথা হইবে, যদি সত্য সত্যই বাঙালী এবং বাঙালীর ভাষা অবহেলায় অবজ্ঞাত হয়।

কিন্তু ভিন্ন অঞ্চলবাসীদের সম্বন্ধে এই বিষয়ে ক্ষোভ জানাইবার পূর্ব্বে আমাদের নিজেদের ভারতীয়দের মধ্যে যে মানবগোষ্ঠী বাঙালী বলিয়া পরিচিত, তাহাদেরও এই সম্বন্ধে অনেক কিছু করিবার আছে। অবহেলা এবং অবজ্ঞা তাহাকেই করা চলে যাহার ব্যক্তিত্ব নাই—যাহার চরিত্রবল অটুট নহে, যে হীন কর্ম্ম করিয়া বেড়ায় এবং যে নিজেকে হীন মনে করে। ব্যক্তির পক্ষে এই কথাগুলি যেমন খাঁটি, সমষ্টির পক্ষেও ঠিক তাই। বাংলাদেশে যদি বাঙালীর রাজনীতিতে এবং দেশ শাসনে অনুদারতা না থাকে, দলগত নীচতা যদি প্রশ্রয় না পায়, বাঙালীর অর্থনীতি এবং ধনব্যবস্থা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যদি নীচ লোভ এবং চৌর্য না থাকে, বাঙালী যদি নিজেকে নিজে সম্মান দেয়, তবে সাধ্য নাই যে অন্য কোন অ-বাঙালী বাঙালীকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করিতে পারে। সকল অ-বাঙালী একত্রিত হইয়া ষড়যন্ত্র করিয়াও পারে না।

প্রশ্ন হয়—"সবই তো ঠিক—কিন্তু আমি একা সাধারণ বাঙালী কি করিতে পারি? আমাদের নেতাদের মধ্যে যদি অসাধুতা প্রশ্রয় পায়—আমাদের ব্যাঙ্কারদের মধ্যে যদি অন্যায় মনোবৃত্তি দেখা দেয়—আমাদের যুবকদের মধ্যে যদি উচ্ছৃঙ্খলতাই আদরণীয় হইয়া উঠে তবে আমি একা কি করিতে পারি?"

আমার জবাব হইল আপনি সবই করিতে পারেন। আপনি একাই সব কিছুর প্রতিকার করিতে পারেন, যদি আপনি তেমন ভাবে সাধনা করিতে প্রস্তুত থাকেন—এবং করেন। গণতন্ত্রের যুগে যদিও সমষ্টির ক্ষমতা এবং অধিকার সম্বন্ধে একটা মোহ সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তবু ইহা সত্য এবং ঐতিহাসিক সত্য যে, ব্যক্তির ক্ষমতা সমষ্টির অক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান্, যদি ব্যক্তিটির পিছনে থাকে সাধনার শক্তি। দ্বাদশ বর্ষ বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া, কঠিন সাধনায় শক্তি অর্জ্জন করিয়া গুরুগোবিন্দ সিংহ যে পঞ্জাবের মুচি মেথর এবং ঝাড়ুদারদের সমষ্টির সমস্ত অক্ষমতার গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া ঐ লোকসমষ্টিকে মহাশক্তিমান শিখ জাতির অন্তর্গত করিয়াছিলেন, ইহা মিথ্যা নহে। একা শিবাজী যে পাহাড়িয়া মারাঠীদের সমস্ত সমষ্টিগত অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতার বিনাশসাধন করিয়া এক বিরাট মারাঠী জাতি ও সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাও ঐতিহাসিক সত্য। আর একা মহাত্মা গান্ধী আমাদের সকলের সমষ্টিগত অক্ষমতা কতখানি দূর করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

যাঁহারা কথায় কথায় বিপ্লবের বুলি যত্রতত্র বিতরণ করেন, তাঁহাদিগকে পঞ্চাশ সালের কথা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। চরম দুরবস্থায়ও বিপ্লব আনয়ন করিতে পারে নাই।

কারণ কি ? কারণ হইল এই যে, বিপ্লব করে শক্তিমানেরাই। শক্তিহীনেরা চরম দুরবস্থায় পড়িলেও বিপ্লব করিতে পারে না। সহস্র সহস্র শক্তিহীন একত্রিত হইলেই শক্তির বিকাশ হয় না। লক্ষ লক্ষ উপবাসী নরনারী কলিকাতার পথে ঘাটে একত্রিত হইয়াছিল কিন্তু কলিকাতার কোথায়ও কোনও শক্তির বিকাশ দেখা যায় নাই। "একতাই বল" কথাটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। সবলের একতায় বল আনয়ন করে, কিন্তু বহু সহস্র দুর্বল একত্রিত হইলেও শক্তির স্ফুরণ হয় না। যদি অক্ষম এবং দুর্বলের উপর অবিচার হইলে আপনা হইতেই ন্যায় বিচার হইত তবে দুর্ভিক্ষপীড়িত মরণশীল স্বজাতীয় নরনারীর মুখের দিকে না তাকাইয়া যাহারা বিদেশীয় যুদ্ধোদ্যমকে সাহায্য করিবার বিনিময়ে নিজেদের ঘৃণা স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাদের বিচারের জন্যও আজ চতুর্দ্দিক হইতে অদম্য দাবি উত্থিত হইত। যাহাদের জিহ্বা বাঙালীর গৌরব—ভারতবর্ষের গৌরব, সমগ্র মানব জাতির গৌরব—সুভাষচন্দ্রকে পর্য্যন্তও "কুইসলিং" বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই সমস্ত পামরদেরও গড়ের মাঠে সর্ব্বসমক্ষে বিচার হইত এবং ঐ সমস্ত পাপজিহ্বা চিরতরে অসাড় হইয়া যাইত।

বাঙালীর অসম্মানের অবধি নাই। বাঙালীর বাসস্থান বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। সুজলা, সুফলা বাংলা মায়ের বুকের উপর পাকিস্থান বাসা বাঁধিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের "হে পদ্মা আমার" আর আজ আমার পদ্মা নয়। প্রায় চারি কোটি বাঙালী সন্তান আজ আর বাঙালী নয়—পাকিস্থানী। কেন আমাদের এই দুর্দশা হইল ? আমাদেরই দোষে।

সামরিক শিক্ষা

কাঁচড়াপাড়ায় বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষীদলের শিক্ষাকেন্দ্রে রক্ষীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সর্দ্দার বলদেব সিং বলেন যে, জনসেবা এবং দেশসেবার ক্ষেত্রে সামরিক শিক্ষা পবিত্র দায়িত্বস্বরূপ। ১১৮৬ জন রক্ষী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষাকেন্দ্রে মাত্র দুই সপ্তাহ অবস্থান করিয়াই পারদর্শিতালাভ করায় দেশরক্ষা-সচিব তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন যে, শুধু তাঁহাদের জেলা এবং প্রদেশ নহে, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইলেও সামরিক শিক্ষা গ্রহণের দ্বারা তাঁহারা স্বদেশসেবা ও জনসেবারূপ জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শে দীক্ষিত হইতেছেন। সর্দ্দার বলদেব সিং আরও বলেন :

"শত শত বৎসর হইল দেশ নানাবিধ গোলযোগ ও অসুবিধাসমূহের সম্মুখীন হইয়াছে ; তন্মধ্যে অধিবাসীদের অন্তর্বিরোধই প্রধান অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে দেশ বিদেশী শক্তির পদানত ছিল। এইজন্য যাহারা আমাদের সহিত একত্রে থাকিতে অসম্মত হয় তাহাদের নিমিত্ত দেশ বিভক্ত করিয়া ক্ষুদ্র একটি অংশ ছাড়িয়া দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সহস্র বৎসর পরে ভারতবর্ষ পুনরায় স্বাধীন হইয়াছে। এই কষ্টার্জ্জিত স্বাধীনতা রক্ষার্থ আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। দেশরক্ষা ব্যবস্থায় পুলিস ও সৈন্যদলের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু অধিবাসীরা নিজেরা যদি দেশরক্ষার্থে অগ্রসর না হয় তাহা হইলে কোন দেশরক্ষা-ব্যবস্থাই কার্য্যকরী হইতে পারে না। ভারতের বৃহৎ পুলিসবাহিনী ও শক্তিশালী সৈন্যদল ছিল। কিন্তু যত দিন পুলিসবাহিনী, সৈন্যদল ও জনসাধারণ সমবেতভাবে দেশসেবা করিতে এবং দেশকে শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী না হইয়াছিল তত দিন পর্য্যন্ত তাহাদের পক্ষে দেশের শক্তি ও গৌরব বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নাই।"

পশ্চিমবঙ্গের যুবকদের সামরিক শিক্ষা ও অস্ত্রদানের জন্য আমরা বহু দিন ধরিয়া আন্দোলন করিতেছি ; সামরিক শিক্ষাগ্রহণ ও অস্ত্রচালনায় দক্ষতা অর্জ্জন পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে অপরিহার্য্য। মেয়েদেরও এই শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমাবর্ত্তনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক কথা। ডাঃ রায় বলিয়াছেন :

"অতীতে বাংলার যুবকেরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে এবং দেশের জন্য ফাঁসিমঞ্চে আত্মাহুতি দিয়াছে। এদেশের জলবায়ুর প্রভাবে শারীরিক গঠনে তাহাদিগকে দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইলেও, মনোবল তাহাদের অটুট। লোকে যাহা মনে করে তাহা নহে ; আমাদের যুবকগণ কঠিনতর উপাদানে গঠিত। ইহাদিগকে আপনি সামরিক শিক্ষা দিন, যেন ইহারা বাংলা ও ভারতের গর্ব্বের বস্তু হইতে পারে।"

বাঙালী ও সামরিক বৃত্তি

গত পৌষ মাসে বড়দিনের সময় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সমর-সচিব সর্দ্দার বলদেব সিং যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সময়ের কথা বলিবার লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজনের ফলে আমরা এই বিদ্যালয়টিকে পাইয়াছি। প্রথম অবস্থায় এই বিদ্যালয়ের যে শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল তাহার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ এই বিদ্যালয় ব্যবহারিক শিক্ষার কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে ; সেইজন্য তাহার নামও বদ্‌লাইয়াছে। রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, ও শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর দানে ইহার ভিত্তি স্থাপিত হয়। সরকারী সাহায্য-প্রাপ্তি তখন কল্পনাতীত ছিল ; কারণ "জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ" ছিল বিপ্লবী বাঙালীর রং-রুট কেন্দ্র। আজ যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যালয় ভারতরাষ্ট্রের সাহায্য-পুষ্ট। বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভাপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দান

৪২ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। বিভালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সাতটি নূতন বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে; যথা—অসামরিক পূর্ত্ত-বিভা, ভূ-তাত্ত্বিক পূর্ত্ত-বিভা, বয়ন পূর্ত্ত-বিভা, কৃষি পূর্ত্ত-বিভা, নির্ম্মাণ পূর্ত্ত-বিভা, সামরিক পূর্ত্ত-বিভা ও বৈমানিক বিভা। এই প্রত্যেকটি বিভাগের জন্ত তিন লক্ষ টাকা ও পরিচালনার জন্ত ত্রিশ হাজার টাকা করিয়া লাগিবে।

ডাঃ রায়, সর্দ্দার বলদেব সিং, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু প্রত্যেকের অভিভাষণে বর্ত্তমান যুগসন্ধির সময়ে এই সকল বিভার অনুশীলনের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়, কেবল গতানুগতিক শিক্ষার জন্ত নয়। ডাঃ রায়ের ভাষায় বলিতে হয়—"দেশরক্ষা কেবল অস্ত্র-শস্ত্র ও সরঞ্জাম মাত্র নহে। উহাদের প্রয়োগ জানা চাই। যুব-সমাজে সুশৃঙ্খল আচরণ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি সামরিক মনোভাবের অনুশীলন করিলেই প্রকৃত দেশরক্ষার ব্যবস্থা হইবে।"

সর্দ্দার বলদেব সিং বলিয়াছেন,—অতীতে যাহাই হউক না কেন, মৌলিক ও অপরিহার্য্য শিল্পসম্ভার আহরণে স্বাধীন ভারত বিদেশের মুখাপেক্ষী থাকিতে পারে না। শিল্প ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জ্জন না করিতে পারিলে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে অর্দ্ধসমাপ্ত বলাই সমীচীন হইবে।

জাতীয় ও দেশরক্ষা ব্যাপারে আজ আমরা বলিতে গেলে সর্ব্বতোভাবেই বিদেশী প্রতিভার মুখাপেক্ষী, ভগবান না করুন, যুদ্ধের ব্যাপার যদি কখনও উপস্থিত হয়, তবে ইহাকে আমরা দেশের লোক ছাড়া আর কাহারও উপর ন্তস্ত করিতে পারি না। সুতরাং পরিণামে তাঁহাদিগকে দেশীয় লোকের প্রতিভার উপরই নির্ভর করিতে হইবে। অতএব রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেমন শিল্পের স্বাধীনতা ব্যতীত অসম্পূর্ণ, তেমনি দেশীয় লোকের পরিচালনা ছাড়া শিল্পোন্নয়ন নিরর্থক।"

যাদবপুর বিদ্যালয়ে যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বা হইতেছে তাহা দেশের আর্থিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য। সকল সাফল্যের মেরুদণ্ডস্বরূপ এই শিক্ষা—এই কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু। "পূর্ত্ত দক্ষতা ও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ পূর্ত্তবিদ্‌গণের সহযোগিতার উপরই আজ যে স্থান মরুভূমি বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে সেখানে সহস্র সহস্র গোলাপ-বাগিচার সৃষ্টি নির্ভর করিতেছে।"

যাদবপুর বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাঙালী সমাজ হইতেই অধিক সংখ্যায় আসিবে। এই শিক্ষায় শিক্ষিত যাঁহারা তাঁহারা দেশের নানা উন্নতি-প্রচেষ্টার সংগঠক হইবেন এই ভরসা আমরা করিতে পারি। তাঁহাদের মধ্য হইতে দেশের নানা বিভাগের নেতা বাহির হইবেন। সামরিক পূর্ত্তবিদ্যা ও বৈমানিক বিদ্যা বাঙালী জীবনের পক্ষে বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। পূর্ব্ব পঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ ভারতরাষ্ট্রের পশ্চিম ও পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত বলিয়াই তৎ-প্রদেশবাসীর দেশরক্ষার ব্যাপারে দায়িত্ব বাড়িয়াছে। ইংরেজের আমলে পঞ্জাবের লোকসমষ্টির সামরিক শিক্ষা ব্যাহত হয় নাই। কিন্তু বাঙালীর অবস্থা তাহার উল্টা। বাঙালী কলম পিষিয়া ইংরেজের সেবা করিতে স্বীকার করিয়া প্রকৃতপক্ষে লাভবান হয় নাই। এই কথাটা আজ আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। সেইজন্তই দেশরক্ষাকার্য্যে বাঙালী যুবকদিগকে সুযোগ দিবার জন্ত দেশরক্ষা-সচিবের নিকট আবেদন জানাইয়া বাংলার প্রধান মন্ত্রী দাবি করিয়াছেন—"অতীতে বাংলার যুবকেরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে এবং দেশের জন্ত ফাঁসিমঞ্চে আত্মাহুতি দিয়াছে। এদেশের জলবায়ুর প্রভাবে শারীরিক গঠনে তাহাদিগকে দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইলেও মনোবল তাহাদের অটুট। লোকে যাহা মনে করে তাহা নহে; আমাদের যুবকগণ কঠিন-তম উপাদানে গঠিত। ইহাদিগকে আপনি সামরিক শিক্ষা দিন, যেন ইহারা বাংলা ও ভারতের গর্ব্বের বস্তু হইতে পারে।"

এই কথাগুলির মধ্যে বাঙালীর মর্ম্মবাণী ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও ভুলিতে চাই না যে, সামরিক জীবনে বাঙালীর নিজের পথ নিজে কাটিয়া তৈয়ার না করিলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কিছু করিতে পারেন না। যাদবপুর কলেজের শিক্ষায় কোন কোন বিষয়ে সামরিক বৃত্তি অবলম্বনের সুবিধা হইবে। কিন্তু সর্দ্দার বলদেব সিং-এর কথায় বলিতে চাই:

> দেশেরক্ষা-ব্যবস্থায় পুলিস ও সৈন্তদলের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু অধিবাসীরা নিজেরা যদি দেশরক্ষার্থ অগ্রসর না হয় তাহা হইলে কোন দেশরক্ষা-ব্যবস্থাই কার্যকরী হইতে পারে না।

এই কথার অর্থ বুঝিতে পারিয়াই আমরা বাঙালীর মধ্যে ক্ষাত্রবৃত্তি পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্ত প্রতি মাসেই তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে এই বিষয়ে উৎসাহ ও আগ্রহের সৃষ্টি করিতে না পারিলে যাদবপুরের শিক্ষা ব্যর্থ হইবে, যেমন হইয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা।

পশ্চিমবঙ্গে সামরিক শিক্ষাবিষয়ে দায়িত্বটা কাহার এই বিষয়ে একটা স্পষ্ট ঘোষণার প্রয়োজন। গত মাসের একটা সংবাদের উপর আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম যে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব বোধ হয় একটু বাড়িয়াছে; কর্তব্যপথ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে পূর্ব্বের ভায় কণ্টকিত নহে। গতানুগতিকের বাধা তুচ্ছ করিয়াই আমাদের চলিতে হইবে। "বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষীদল" সম্পর্কে ১১৮৬ জন লোককে শিক্ষা দিলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিব না, এবং দুই সপ্তাহের শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করিবার কথায় সর্দ্দার বলদেব সিং-এর মত প্রশংসাও করিতে পারিব না।

মাধ্যমিক শিক্ষাবিল

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ২০শে ডিসেম্বর সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে বলেন যে, কার্য্য পরিচালনা ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিবিধানের জন্ত উক্ত

বোর্ডের প্রভূত ক্ষমতা থাকিবে। তবে তত্ত্বাবধান, বিশেষতঃ উন্নয়ন বিষয়ে গবর্মেন্টের হস্তেও কতকগুলি ক্ষমতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইবার উপযোগী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন, প্রবণতা ও সামর্থ্যের অনুরূপ বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয় সমন্বিত মাধ্যমিক শিক্ষার একটি সম্পূর্ণ প্রণালী ক্রমে ক্রমে উদ্ভাবিত হয় তদুদ্দেশ্যেই গবর্মেন্ট হস্তে উপরোক্ত ক্ষমতা রাখিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নামে যে বিল রচিত হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের আগামী জানুয়ারী মাসের অধিবেশনে উহা উত্থাপিত হইবে এবং বিলটি পরিষদে পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বিলের ধারাসমূহ কার্য্যকরী হয় তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষাসচিব বলেন যে, সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কৃষি, শ্রমশিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক শিক্ষাও বোর্ডের আমলে আসিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গ্রহণে বিরত হইলে তাঁহাদের যে আর্থিক ক্ষতি হইবে তাহার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কেও বিলটিতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত সরকারী ক্ষমতা সম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত রায় চৌধুরী বলেন যে, বিলে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, বোর্ডের রচিত বিধানাবলী গবর্মেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষ হইবে। বোর্ডের বাৎসরিক বাজেটেও গবর্মেন্টের অনুমোদন আবশ্যক। বোর্ডের কার্য্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সেরূপ ক্ষেত্রে গবর্মেন্ট বোর্ডকে বাতিল ও উহাকে পুনর্গঠিত করিতে পারিবেন।

৪০ জন সদস্য লইয়া বোর্ড গঠিত হইবে এবং ইঁহারা আরও ২ জন নারী সদস্য কো-অপ্ট করিবেন; অর্থাৎ প্রেসিডেন্টসহ ৪২ জন সদস্য লইয়া বোর্ড গঠিত হইবে এবং প্রেসিডেন্ট গবর্মেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। উক্ত ৪২ জনের মধ্যে শিক্ষা, শ্রমশিল্প, কৃষি ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরগণ এবং কারিগরী বিদ্যা, নারীশিক্ষা ও মাধ্যমিক স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টরগণ—মোট ৮ জন—পদাধিকার বলে বোর্ডের সদস্য হইবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন সদস্য পদাধিকার বলে এবং ৭ জন নির্ব্বাচিত হইয়া বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। স্কুলসমূহের ৯ জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি থাকিবেন; ইঁহাদের পরিচয় এইরূপ:—৪ জন প্রধান শিক্ষক, ২ জন প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও ম্যানেজিং কমিটিসমূহের ৩ জন সদস্য। বোর্ডে আইনসভার তিন জন প্রতিনিধি থাকিবেন। এংলো-ইণ্ডিয়ান প্রাদেশিক এডুকেশন বোর্ড, টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড এবং বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে বোর্ডে ১ জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন। কৃষি, শ্রমশিল্প, বাণিজ্য, ঔষধ প্রভৃতি বিষয়ে ৬ জন বিশেষজ্ঞকে গবর্মেন্ট বোর্ডের সদস্য মনোনীত করিবেন। বোর্ডের অন্যান্য সদস্য ২ জন নারী সদস্যকে কো-অপ্ট করিবেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত রায় চৌধুরী বলেন যে, যাহাই হউক না কেন, বোর্ডে সরকারী কর্ম্মচারীদের সংখ্যা কোনক্রমেই সদস্যসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের অধিক হইবে না। প্রেসিডেন্ট সহ ১৬ জন সদস্য লইয়া বোর্ডের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ গঠিত হইবে। শিক্ষা বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর এবং কারিগরী শিক্ষা, নারীশিক্ষা ও মাধ্যমিক স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টরগণ মোট ৫ জন পদাধিকার বলে উক্ত পরিষদের সদস্য হইবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততঃ ৪ ব্যক্তি পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। এতদ্ব্যতীত নারীশিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা এবং স্কুলের শিক্ষাদান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ৫ জন নির্ব্বাচিত সদস্য থাকিবেন। বালিকাদের শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হইবে। নারী সদস্য লইয়াই এই কমিটি গঠন করা হইবে। শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল শ্রেণী পশ্চাৎপদ তাহাদের শিক্ষার প্রসারের জন্যও একটি বিশেষ কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত (ক) রিকগ্‌নিশন ও গ্রাণ্টস্ কমিটি, (খ) পরীক্ষা কমিটি, (গ) কারিগরী শিক্ষা কমিটি, (ঘ) শরীরচর্চা শিক্ষা কমিটি এবং (ঙ) বিশেষজ্ঞগণের কাউন্সিল কমিটিও গঠিত হইবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনাও বোর্ডের একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য; ঐ সকল পরিকল্পনা অনুমোদিত হইলে গবর্মেন্ট উক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে যে সকল ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট হইতে পারেন তাঁহাদের মতামত বিবেচনা করিবেন। তৎপরে সাম্প্রতিক ইংলিশ এক্টের ন্যায় এডুকেশন অর্ডারের দ্বারা ঐ সকল পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনা ও উহার উন্নতিসাধনের জন্য একটি পৃথক কর্তৃপক্ষ গঠন করার প্রয়োজনীয়তা বহু দিন স্বীকৃত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ বোর্ড গঠনের সুপারিশ করেন। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারের আমলে এইরূপ বোর্ড গঠনের জন্য কোন চেষ্টা করা হয় নাই। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন পাস হওয়ার পরে এইরূপ বোর্ড গঠনের জন্য সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা বিলসমূহে সাম্প্রদায়িক আসন-সংরক্ষণ প্রভৃতি মূলক কতকগুলি ধারার জন্য ব্যর্থ হইয়া যায়। ঐ সকল বিষয় জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য ছিল না।

অন্যান্য দেশে আধুনিক শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারের প্রবণতা এই যে, মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার গবর্মেন্টেরই গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত সমগ্র জাতির জন্য সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা না যায় তত দিন পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করা গবর্মেন্টের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

বোর্ডে সরকারী সাহায্যদান প্রসঙ্গে শিক্ষাসচিব বলেন যে, বর্ত্তমান গবর্মেন্ট আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও ৩০ লক্ষ টাকা সরকারী সাহায্য দিয়া বোর্ড আরম্ভ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

প্রয়োজনক্ষেত্রে বোর্ডের বাৎসরিক বাজেট বিবেচনা করিয়া উক্ত সাহায্য বৃদ্ধি করা হইবে। ১৯৪৪ সালে মুসলিম লীগ গবর্মেণ্ট শেষ যে বিলটি উত্থাপিত করেন তাহাতে সমগ্র বাংলার জন্ম ২৫ লক্ষ টাকা প্রাথমিক সাহায্য দিয়া বোর্ড সুরু করার প্রস্তাব করা হয়। পূর্ব্বেকার আয়তনের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ; সুতরাং ৩০ লক্ষ টাকা প্রাথমিক ব্যবস্থা একেবারে অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না, ইহাই তাঁহার ধারণা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অনুগামী নহে অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্ত এইরূপ একটি শিক্ষা প্রণালীর উদ্ভাবনই বোর্ডের মুখ্য লক্ষ্য হইবে। ছাত্রগণকে এরূপ শিক্ষা দেওয়াই লক্ষ্য হইবে যাহা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ, অথচ যাহারা বিবিধ বিষয়ে আরও উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে চাহে তাহাদিগকেও উহা সাহায্য করিবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটির উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠে যে, এই বোর্ডের এখনই আবশ্যক হইল কেন? একমাত্র যুক্তপ্রদেশ ভিন্ন ভারতের আর কোন প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠিত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। যুক্তপ্রদেশে ইহার প্রয়োজন আছে এইজন্ত যে সেখানে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়, কাজেই মাধ্যমিক শিক্ষার সামঞ্জস্ত বিধানের জন্ত একটা বোর্ড দরকার।

পশ্চিম বাংলার কথা একেবারে আলাদা। পশ্চিমবঙ্গ একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ এবং আসামের ন্যায় পাহাড় জঙ্গলে ছড়ানো নয়, ঘনবসতিপূর্ণ একটি ঠাসা প্রদেশ। এখানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত স্কুলবোর্ড, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং উচ্চশিক্ষার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই তিনটি পৃথক এবং স্ব-স্ব প্রধান প্রতিষ্ঠান রাখিবার প্রয়োজনীয়তা কি? এই তিনটি আলাদা আপিস বজায় রাখিবার ব্যয়বাহুল্যেরই বা আবশ্যকতা কি? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়টিকে নূতন ছাঁচে গড়িয়া লইলে তাহার দ্বারা একার্য্য চলিতে পারে না কি?

পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির পরিকল্পনা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র সংযুক্ত বঙ্গের কৃষি বিভাগের উন্নতিমূলক কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন পরদেশী শাসন-ব্যবস্থার দাপটে অনেকের সদিচ্ছাই কার্য্যকরী হইবার সুযোগ পায় নাই। মিত্র মহাশয়ের অন্তান্ত নানা কল্পনাও সেইরূপ তাঁহার হৃদয়েই লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজ স্বাধীন রাষ্ট্রের অধীনে সেই সুযোগ পাওয়া যাইবে বলিয়া অনেকেই আশান্বিত হইয়াছিলেন। "খাদ্য-উৎপাদন" পত্রিকার ১৬ই পৌষ সংখ্যায় মিত্র মহাশয় দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্ত কোন "কার্য্যকরী পরিকল্পনা প্রস্তুত হ'ল না।" তাহার কারণ সম্বন্ধেও একটা নির্দ্দেশ এই পত্রিকার একটি মন্তব্যের মধ্যে পাই। "একজন আই, সি, এস্ একবার ব'লিয়াছিলেন—'Our wits do not go beyond our nose.' অর্থাৎ গতানুগতিক কাজ করিতেই আমরা অভ্যস্ত।" নাকের ডগার বাহিরে তাহাদের দৃষ্টি যায় না। এইরূপ স্বীকৃতির কথা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়; কবুতরখানার তত্ত্বাবধায়কবৃন্দ এখনও বলেন—নূতন কিছু করা আমাদের কর্ম্ম নয়। কিন্তু এইরূপ কর্ম্মের সুযোগ করিয়া দিবার ইচ্ছাও তাহাদের নাই বলিয়া সমস্ত পরিকল্পনা কাগজপত্রের মধ্যেই থাকিয়া যাইতেছে। এই রোগের চিকিৎসা কি?

পশ্চিমবঙ্গের "নোকরসাহি"

"সংগঠনী" পত্রিকা চব্বিশ পরগণার পূর্ব্বাঞ্চলের মুখপত্র। তাহার পাঠক অধিকাংশই পল্লীগ্রামের লোক। নিম্নলিখিত হিসাব ও মন্তব্য এই পত্রিকার ১৬ই পৌষ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া পল্লীগ্রামের লোকে কি ভাবিতেছে ও কি ব'লিতে পারে, তৎসম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রীমহাশয়ের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। গতিশীল, ক্রিয়াশীল শাসনকার্য্য (dynamic administration) সম্বন্ধে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে লালদীঘির দপ্তরের নোকরসাহী (bureaucracy) হইতে কতটুকু সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটা হিসাব লইবার সময় আসিয়াছে। মাহিনা সম্বন্ধে পল্লীগ্রামের মুখপাত্রের মন্তব্য এইরূপ:

> লালদীঘির দপ্তরে স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়নের পতাকা উড়িল। কিন্তু মাহিনা কমিল না। যে কর্ম্মচারী ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ২,৫৫০৲ বেতন পাইতেন তাঁহার মাহিনা হইল ৩,৭৫০৲; জেলাকোর্টের জজ পাইতেন ২,২৫০৲, স্বাধীন হইবার পর তাঁহার আরও ৫০০৲ ভাতা বৃদ্ধি হইল। যে পুলিশ কর্ম্মচারী পাইতেন ১,২৯০৲, তিনি ২,৩১০৲ পাইয়া লালগদীতে জাঁকিয়া বসিয়া, এবার স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়নকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।
>
> অর্থ-দপ্তরের ১,০৫০৲ টাকার কর্ম্মচারী ১৪ই আগষ্ট-এর পর দেখিলেন মাসের শেষে তিনি ২,৭৫০৲ টাকার ধনী লোক। ১,২০০৲ মাস মাহিনার পুলিস মাসিক ১,৯৫০৲ টাকার মালিক হইলেন, আর যে ব্যক্তি ১,৫৫০৲ টাকার কর্ম্মচারী হইয়াও দিল্লীর দপ্তরে অযোগ্য বিবেচিত হইলেন তিনি আশ্রয় পাইলেন. লালদীঘির দপ্তরে ২,৭৫০৲ টাকা মাহিনায়।
>
> শিক্ষা বিভাগকে 'বিশেষ' শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্তে একজন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধকে ২,৭৫০৲র চেয়ারে বসান হইল এবং সরবরাহ বিভাগের একজন কর্ম্মীকে (!) ২,৫৫০৲ স্থানে ৩,০০০৲ পুরা করিয়া দেওয়া হইল।
>
> অবিভক্ত বাংলায় (৭৭,০০০ বর্গ মাইল) এক জন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিস ছিলেন আর ছিলেন সাত জন

তাঁহার সহকারী। বাংলা এখন এক-তৃতীয়াংশ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে (পশ্চিম বাংলা ২৮,৪৩৩ বর্গ মাইল) কিন্তু সহকারীর সংখ্যা ৬ জনের নীচে নামে নাই।

অবিভক্ত বাংলায় এক একটি বিভাগে এক একটি 'সেক্রেটারী' যথেষ্ট ছিল। দেশ স্বাধীন হইবার পর এখন সে নিয়ম নাই। পশ্চিম বাংলার এমন কোন বিভাগ আজ নাই যেখানে এডিশনাল, এক্সট্রা-এডিশনাল, জয়েন্ট এবং জয়েন্ট-এডিশনালের অভাব আছে। আজকাল আর একটা মোটা মাহিনার নূতন পদ হইয়াছে, তাহার গালভরা নাম ডিরেক্টর জেনারল অব ট্রান্সপোর্ট। তাঁহার মাহিনা ৩,৫০০্ টাকা। ৫০ খানি বাঘমার্কা বাসের স্বাভাবিক চলাচলের দায়িত্ব তাঁহার ঘাড়ে। শীঘ্রই আবার একজন মাননীয় বৃদ্ধ ৩,০০০্ মাহিনায় আসিতেছেন—তাঁহার পদ এক্‌ট্রা-এডিশনাল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি পশ্চিম বাংলার রাস্তাঘাট দেখিবেন। ১,২০০্ টাকার আরও এক জন "টাইগার" ট্রান্সপোর্টে নিযুক্ত আছেন।

পশ্চিমবঙ্গে চাষের অবস্থা

কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের খাদ্য-সচিব শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম দেশবাসীকে শুনাইয়াছেন যে, এবার আমাদের প্রয়োজনে খাদ্য-শস্য বিদেশ হইতে আরও বেশী করিয়া আমদানি করিতে হইবে। গত বৎসর এরূপ আমদানির মূল্য ছিল প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। এবার নাকি তাহা বাড়িয়া উঠিবে ১০০ কোটি টাকার উপর। এই দুরবস্থার কারণ লইয়া নানা তর্কের অবসর থাকিতে পারে; কিন্তু ফলে আমরা পাইতেছি যে, ভারতরাষ্ট্রের কৃষকশ্রেণী দেশের পরিমিত খাদ্য উৎপাদন করিতে পারিতেছে না। বাংলাদেশ বার মাসের মধ্যে একটা দুর্ভিক্ষের কল্যাণে ২৫।৩০ লক্ষ লোক হারাইয়াছে। তবুও বাংলাকে তাহার লোককে পেট ভরিয়া খাইতে দিবার জন্য ভারতরাষ্ট্রের অপর প্রদেশের প্রতি বা বিদেশের প্রতি হাত বাড়াইতে হয়। লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে সত্য; কিন্তু কৃষক ও শ্রমিকের সংখ্যাও ত বাড়িয়াছে। তবুও দেশের খাদ্যাভাব দূর হয় না কেন?

এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্বমন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। তাহার মধ্যে এই প্রশ্নের একটি উত্তর আছে বলিয়া মনে হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে বাংলা-সরকার বাংলাদেশের জমির সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া (Agricultural Statistics by plot to plot Enumeration in Bengal) প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ হিসাব পাওয়া যায়। তাঁহারা ৭৭টি গ্রাম সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাহা হইতে দেখা যায় যে, এই গ্রামগুলিতে যে সমস্ত পরিবার ছিল তাহাদের মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—(ক) জমিহীন পরিবার অথবা যে সমস্ত পরিবারের বাস্তুভিটা ছাড়া অন্য কোন খাস জমি নাই। (খ) যে সমস্ত পরিবারের বাস্তুভিটা ছাড়া মোট এক একরের (তিন বিঘা) বেশী জমি নাই। (গ) যে সমস্ত পরিবারের বাস্তুভিটা ছাড়া মোট তিন একরের বেশী জমি নাই। (ঘ) যে সমস্ত পরিবারের বাস্তুভিটা ছাড়া পাঁচ একরের বেশী জমি নাই। (ঙ) যে সমস্ত পরিবারের বাস্তুভিটা ছাড়া পাঁচ একরের বেশী জমি আছে।

ভূমিহীন বা যে সব পরিবারের বাস্তু ছাড়া অন্য জমি নাই তাহাদের (ক) শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে এবং তাহারা জনসংখ্যার শতকরা ৩৬·৪ অংশ; এবং তাহাদের দখলীকৃত জমির পরিমাণ মোট জমির শতকরা ১·৮ অংশ।

এক একরের কম জমিওয়ালাদের (খ) শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, এবং তাহাদের শতকরা হার ১৭·৭ এবং তাহাদের মোট জমির পরিমাণের হার সর্ব্বমোট জমির শতকরা ৪·২।

(গ) শ্রেণীভুক্তদের শতকরা সংখ্যা ২২·০ এবং ইহাদের সকলেরই তিন একরের কাছাকাছি জমি আছে। ইহাদের মোট জমির পরিমাণ শতকরা ১৬·৯।

(ঘ) শ্রেণীভুক্তদের শতকরা পরিমাণ ৯·৬ এবং শতকরা ১৪·৭ জমি ইহাদের দখলে আছে। ইহাদের প্রত্যেকের জমির পরিমাণ ৩ হইতে ৫ একর।

যে সব পরিবারে ৫ একরের বেশী জমি আছে তাহাদিগকে (ঙ) শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মোট জনসংখ্যা শতকরা ১৪·৩ এবং ইহাদের সকলের মিলিয়া প্রায় শতকরা ৬২·৪ একর জমি আছে।

বাংলাদেশে যে মোট জমি আছে জনসংখ্যার সহিত তাহার তুলনা করিলে দেখা যায় যে মাথা পিছু জমি ২·৪৯ একরের বেশী নয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই জমিও সমভাবে বণ্টিত নহে। যাহারা চাষ করে বা বর্গাদার তাহাদের মাথা পিছু জমি অত্যন্ত কম এবং চাষ করে না অর্থাৎ মালিক যাহারা তাহাদের হাতে জমির পরিমাণ বেশী। ঐ রিপোর্ট হইতে আরও দেখা যায় যে, বর্ত্তমানে বাংলাদেশে বহু জমি পতিত আছে। এইরূপ ভাবে জমি পতিত থাকার নানাবিধ কারণ আছে। কোথাও জল-সেচের অভাব, কোথাও জল-নিকাশের অভাব, কোথাও রাস্তার অভাব, কোথাও বা স্বাস্থ্যের অভাব। ঐ রিপোর্টে যেখানে যেখানে একসঙ্গে এক শত একর বা ততোধিক জমি পতিত তাহার মোট হিসাব লওয়া হইয়াছিল। দেখা যায় যে, কেবল মাত্র এইরূপ জমির মোট পরিমাণ পশ্চিম বাংলায় ২,৪৬,৪৬২ একর। এই বিরাট পরিমাণ পতিত জমি পতিত থাকিতে দিলে চলিবে না। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সরকার এই সমস্ত জমি যে কারণে পতিত হইয়া আছে সেই কারণগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। অনুসন্ধানে যে যে কারণ জানা যাইবে সেই সেই কারণ দূরীভূত করিয়া এই জমি উন্নত করা হইবে।

যদিও মাত্র ১১টি গ্রামে অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া এই হিসাব করা হইয়াছে, তবুও ইহা সারা পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার বর্ণনারূপে গ্রহণ করা যায় এবং মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের দপ্তরেও এইরূপ নানা হিসাব আছে, এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তবুও নূতন করিয়া আর একটা "অনুসন্ধান" করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যদি তাহা নিতান্তই প্রয়োজন হয় তবে তাহাও হউক। কিন্তু ঐরূপে কেবল তথ্য সংগ্রহে দিনগত পাপক্ষয় করিলে তো আর চলে না।

"ভূমি-সুহৃদ-সঙ্ঘ"

কৃষির উন্নতি না হইলে কোন জাতির প্রকৃত সম্পদ বৃদ্ধি হয় না। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিগণ আপনাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। "বিজলী" নামক বাংলা মাসিক পত্রিকা হইতে তার পরিচয় তুলিয়া দিলাম।

> "...প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় কতকগুলি কৃষক, ব্যবসায়ী, শিল্পব্রতী এবং সরকারী কর্ম্মচারী সম্মিলিতভাবে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় ভূমি-সুহৃদ-সঙ্ঘ।
>
> এই সঙ্ঘের কার্য্যক্ষেত্র ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং এখন ওহিও ষ্টেটের অন্তর্গত কলাম্বাস শহরে ইহার কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র কৃষি বিভাগের অন্তর্গত ভূমিসংরক্ষণ বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ডাক্তার হিউ হ্যামণ্ড বেনেটের মত লোকেরাও এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত রাজনীতির কোন সম্বন্ধ নাই।
>
> ভূমি সংরক্ষণ, চাষের কাজে জলের ব্যবহার এবং সেচ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য প্রচার করা এবং এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা এই সঙ্ঘের প্রধান কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। কোন প্রকারের আর্থিক লাভ ব্যতিরেকেই ইহা কাজ করিয়া থাকে। জাতীয় কৃষিসম্পদ বাড়ানই ইহার একমাত্র লক্ষ্য। চাষীদের অবগতির জন্ত জমির উৎপাদন-শক্তির ক্ষয় বন্ধ করিবার সমস্ত সম্ভাব্য উপায় সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করা, অতিরিক্ত বীজবপন বন্ধ করা এবং বনসম্পদ সংরক্ষণ করার জন্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করা ইহার অন্যতম কাজ।"

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার বৃদ্ধি

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রকাশিত "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" পত্রের সম্পাদক শ্রীমণিলাল গান্ধী সম্প্রতি দেশে আসিয়াছেন এবং নয়াদিল্লীতে ইউনাইটেড প্রেসের নিকট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তথাকার ভারতীয়দের উপর দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্টের দুর্ব্যবহার বৃদ্ধির বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "জাতীয় দল কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট গঠনের পর হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এশিয়া ভূমিস্বত্ব আইনের প্রয়োগ কঠোরতর করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বর্ত্তমান নীতি পরিবর্ত্তনের কোন ইচ্ছা প্রকাশ তো করেনই নাই, বরং স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে ভারতীয়গণকে স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়াই ভারতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান।" তিনি আরও বলেন,

"ভারতীয়দিগকে স্বদেশে কিভাবে প্রেরণ করা হইবে, তাহা আর একটি সমস্যা। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত বা দক্ষিণ আফ্রিকায় জাত শতকরা ৮০ ভাগ ভারতীয়েরই দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যতীত আর কোথাও বাড়ী-ঘর নাই। কিন্তু নির্ব্বাসনযোগ্য অপরাধের জন্ত নির্ব্বাসন দণ্ডদানের যে আইন রহিয়াছে তাহার পুরাপুরি সুযোগ লইতে গবর্ণমেণ্ট বদ্ধপরিকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এভাবে গবর্ণমেণ্ট কতিপয় ভারতীয়কে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। অথচ অধিকতর গুরুতর অপরাধে অপরাধী ইউরোপীয়ানদিগকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে দেওয়া হইতেছে। অধিকন্তু, কোন আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ভারতবাসীর পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস যত দূর সম্ভব দুঃসাধ্য করিয়া তুলিবার জন্য কেপটাউন সুবারবন রেলে ভারতীয়দের জন্ত পৃথক আসনের ব্যবস্থা এবং আরও নানা নিষেধাত্মক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমণিলাল গান্ধী বলেন যে, ভূমিস্বত্ব আইনের বিরুদ্ধে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহা বিশ্ববাসীর সক্রিয় সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। নাটাল ও ট্রান্সভাল ভারতীয় কংগ্রেস সাময়িকভাবে আন্দোলন স্থগিত রাখিয়াছেন এবং আন্দোলন কবে পুনরায় আরম্ভ হইবে তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

তিনি আরও বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ভারত-সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যে বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছিলেন, তাহা আশানুরূপ সফল হয় নাই। চটের থলে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি বিশেষ আবশ্যক দ্রব্য। নিষেধাজ্ঞা এড়াইয়া এই দ্রব্যটি দক্ষিণ আফ্রিকায় আমদানী করা হইতেছে। শ্রীযুত গান্ধী দুঃখের সহিত বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত-বাসীরাই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক বিধি-নিষেধ জারী করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, অথচ সেই ভারত-বাসীরাই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী। কারণ নিষেধাজ্ঞা এড়াইয়া তাহারাও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচুর পণ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া থাকে। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছিল তাহা এইভাবে ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হইতেছে এবং নিষেধাজ্ঞা নিরর্থক বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ভারত বর্ত্তমানে নিজেই বহুবিধ সমস্যায় বিব্রত। এই অবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ভারতবাসীদিগকে নিজেদের মুক্তির জন্ত নিজেদের শক্তির উপরই যে নির্ভর করিতে হইবে, তাহা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃঢ়চেতা নেতার অভাব দূর না হইবে এবং সঙ্গতিসম্পন্ন ভারতীয়দের মধ্যে

ত্যাগের মনোবৃত্তি দেখা না দিবে, ততক্ষণ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

ইন্দোনেশিয়ার উপর ডাচ আক্রমণ

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি (Security Council) ইন্দোনেশিয়ার উপর ডাচ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ উপলক্ষে যে কেলেঙ্কারির সৃষ্টি করিল তারপর কোন জাতি বা রাষ্ট্র আত্মসম্মান রক্ষার জন্য এই সঙ্ঘের উপর নির্ভর করিতে ভরসা পাইবে না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার দশা প্রাপ্ত হইতে এই সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের আর বেশী দিন বিলম্ব হইবে না। তাহার জন্য হা-হুতাশ করিয়া লাভ নাই। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সমাজ এখনও ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিতে শিখে নাই। শুভবুদ্ধির প্রেরণায় বিশ্ব-মৈত্রীর কল্পনা প্রচার হইয়াছিল ভারতবর্ষ হইতে। তিন-চার হাজার বৎসর পরে মানব সমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে বলীয়ান হইয়াও তদানুযায়ী আচরণ করিতে শিখিল না। বুঝিতে হইবে আমাদের কপালে আরও দুঃখ আছে।

গত ৩।৪ঠা পৌষ ডাচ সৈন্যবাহিনী ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ তন্ত্রের উপর পুনরায় আক্রমণ চালায় ১৬।১৭ মাস সন্ধি-শান্তির পর। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট এই সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়; জাপানীরা নিজের ক্ষমতা সাধারণ-তন্ত্রের হাতে সমর্পণ করে। "বিজয়ী সৈন্যবাহিনী যখন এই দ্বীপপুঞ্জে আগমন করে, তখন তাহারা এই ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লয়; তাহারা সাধারণ-তন্ত্রের মন্ত্রিমণ্ডলী, তাহার শাসন-প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কর্ম্মচারিবৃন্দের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলে; তাহাদের সহিত অকুণ্ঠ সহযোগিতা করিয়া চলে।" এই স্বীকৃতিটি সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের (Good Offices Committee) ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ-তন্ত্র ও ডাচ গবর্ণমেন্টের মধ্যে সদিচ্ছা স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কমিটির গত ১৮ই নভেম্বরে লিখিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করা হইল। এই বিবরণের অন্যান্য অংশ পড়িয়া এই কথা বুঝা যায় যে, ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দোনেশিয়ার উপর তাহাদের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়। এই উদ্দেশ্যে তাহারা মাদুরা, পূর্ব্ব সুমাত্রা ও পশ্চিম জাভায় কতকগুলি তাঁবেদার শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং ডাচদের রাণী জুলিয়ানা অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ-তন্ত্রের কোন স্থান নাই; বর্ত্তমান আক্রমণের উদ্দেশ্যও তাহাই। এই কথাটা উপরোক্ত কমিটির বিবরণের মধ্যেও পাওয়া যায়।

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতি টালবাহানা করিয়া ডাচ আক্রমণকারীর সুবিধা করিয়া দিতেছে; সাধারণ-তন্ত্রের সীমানার মধ্যে ঢুকিয়া তাহারা সাধারণ তন্ত্রের শাসন-ব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের নেতৃবৃন্দের ইচ্ছা থাকিলে দুই-এক দিনের মধ্যে এরূপ অন্যায় আক্রমণ বন্ধ হইতে পারে। এই কথা জানে বলিয়া এশিয়ার শত কোটি লোক সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছে। ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন আহ্বান করিয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টায় অগ্রণী হইয়াছেন। শ্বেত-জাতির রাষ্ট্রসমূহের কোন কোন সংবাদপত্র এই ধুয়া তুলিয়াছে যে, এই সম্মেলনের ফলে শ্বেত ও অশ্বেত জাতির মধ্যে বিরোধ ও বিতৃষ্ণা বাড়িয়া যাইবে। এই অজুহাতের মূল্য দিলে শ্বেত-জাতির শাসন ও শোষণ কখনও বন্ধ হইবে না।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন এই বিষয়ে বেশ একটা খেলা খেলিতেছে। কারণ উভয়েই শ্বেত-জাতির প্রাধান্য স্থাপনে বা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহশীল। ফরাসী জাতি প্রায় চারি বৎসর হইতে ভিয়েটনাম সাধারণ-তন্ত্রের উপর আক্রমণ চালাইয়া ফরাসীর প্রাণ ও অর্থ নষ্ট করিতেছে। আবার এদিকে যুক্তরাষ্ট্র তাঁহাদের টাকা যোগাইতেছে বিগত মহাযুদ্ধজনিত ধ্বংসের ক্ষতি পরিপূরণ করিতে। জানুয়ারী মাসের "মডার্ণ রিভিয়ু" পত্রিকায় একখানি মার্কিণ পত্রিকা হইতে এই সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাখানির নাম "ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ নিউজ" (United States News)। যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের গুণগানে আমরা অনেক কথা শুনিতে পাই। নূতন কথাটাও শুনিয়া রাখিলে ভাল হইবে।

> "যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য হইতে প্রায় সাড়ে এগার কোটি টাকার দ্রব্যসম্ভার ইন্দোচীনের প্রয়োজনে স্থানান্তরিত করিবার অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আবার ইন্দোচীন জয় করিবার চেষ্টা করিতেছে।"
> "সেইরূপে, ডাচ গবর্ণমেণ্ট প্রায় আঠার কোটি টাকার দ্রব্যসম্ভার ইন্দোনেশিয়ার সেই সেই অঞ্চলে পাঠাইতে যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি পাইয়াছে, যে যে অঞ্চল তাহারা পুনরধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে।"

এই সংবাদ দুইটির মধ্যেই ইংরেজ ও মার্কিণ দেশবাসীর শাসক-সম্প্রদায়ের মনোভাব স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ এখনও তাহাদের হাত-ধরা।

বৌদ্ধযুগের স্মৃতি

১৩।১৪ জানুয়ারী ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে তাহা আমাদের মনকে ২,৫০০ বৎসরের পূর্ব্ব-ইতিহাসের দিকে লইয়া যায়। বুদ্ধ-শরীরে যে বিশ্বশক্তি দিকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কপিলাবস্তু নগরীর রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, গয়া পাহাড়ে যিনি বিশ্ব সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সুখ-দুঃখের রহস্যের মধ্যে মুক্তির উপায় ধরিতে পারিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের সেই পুতস্মৃতি মনোজগতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। বুদ্ধদেবের দুই জন শিষ্যের অস্থি সিংহল দেশ হইতে কলিকাতার বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভুপাল রাজ্যের সাঞ্চিস্তূপ হইতে ইহা বিলাতে নীত হইয়াছিল। আজ তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তিস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে তাহা গ্রহণ করিবেন। আমাদের গৌরব যে, আমাদের দেশ এই সৌভাগ্য ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে জাপান পর্য্যন্ত বিরাট ভূ-খণ্ড বৌদ্ধ ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ।

আজ সেই সম্বন্ধের মাহাত্ম্য নূতন করিয়া আমাদের মনে জাগ্রত হইবে।

বুদ্ধদেবের এই দুই প্রধান শিষ্য শারিপুত্র ও মোগ্গালান ; এ বিষয়ে গত পৌষ সংখ্যার প্রবাসীতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

"নেতাজী"

আগামী ২৩শে জানুয়ারী ১০ই মাঘ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের তিপ্পান্ন জন্ম-দিবস উপলক্ষে দেশবাসী নানা আয়োজন করিতেছেন। তিপ্পান্ন বৎসর পূর্ব্বে ঐ দিবসে যে মানব-শিশু এক বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কীর্ত্তি-কথায় পৃথিবীব্যাপী স্বাধীনতাকামী নরনারী যুগে যুগে অনুপ্রাণিত হইবে; নিজের ও জাতির আত্মসম্মান রক্ষা করিবার সংগ্রামে উৎসাহিত হইবে।

ইংরেজ আমলে বাঙালী নানা বিষয়ে আপনার শক্তির পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মধ্যে বাঙালীর যে মূর্ত্তি প্রকট হইয়াছে তাহা অভূতপূর্ব্ব। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙালী বিপ্লবী দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়াছে ; কানন-কান্তার অতিক্রম করিয়া অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের হাত হইতে দেশের স্বাধীনতা উদ্ধার করিবার জন্য কেহই রণক্ষেত্রে সৈন্য-পরিচালনা করেন নাই। সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মজীবন বাঙালী ও ভারতবাসীর জীবনে অমর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতরাষ্ট্রের সমস্ত কার্য্যকলাপের বিচার হইবে। সর্ব্বকালের, সর্ব্বজনের জন্য নেতাজীর সাহস, তাঁহার আত্মভোলা চরিত্র, তাঁহার জীবনাদর্শ, তাঁহার সংগঠন শক্তি অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে।

এরূপ মহান্ কীর্ত্তি কোটি লোকের মধ্যে এক জন মাত্র স্থাপন করিতে পারেন। চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে এক জন লোকই "নেতাজী" হইয়াছেন, যেমন এক জন ভারতবাসী মাত্র "মহাত্মা"-রূপে শত শত কোটি লোকের, দেশী, বিদেশীর, শ্রদ্ধা পাইতেছেন। এই কথা স্মরণ করিয়া আমরা আগামী ২৩শে জানুয়ারীর উৎসবে যোগদান করিব।

সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভি

ষাট বৎসর পূর্ণ না হইতেই ভারতবর্ষের এক জন সাংবাদিক-প্রধান দেহত্যাগ করিলেন। যে সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হইয়াছিল পরলোকগত বেঞ্জামিন হর্নিম্যানের শিষ্যরূপে "বোম্বে ক্রনিকলের" সেবায়, তার পরিণতি লাভ হইয়াছিল "বোম্বে ক্রনিকলের" সম্পাদক রূপে। ১৯১৫-১৯৪৯ খ্রীঃ এই চৌত্রিশ বৎসর সাংবাদিক জীবনের মধ্যে আবদুল্লা ব্রেলভি জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে দেশের সেবা করিয়াছেন ; মুসলিম লীগের "দুই-জাতি" তত্ত্বের বিরোধিতা করিতে গিয়া তিনি স্বসমাজের হস্তে অনেক অপমান সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসে অটল থাকিয়া তিনি এই সব নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করিয়াছেন। শুনিয়াছি ভারতরাষ্ট্রের শুল্ক কমিশনের সভাপতি শ্রীগগনবিহারী মেহ্‌টার পিতার পরিবারের আবেষ্টনের মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হইয়াছিলেন ; সেই পরিবারের পুত্রের মতই তিনি শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সেই পরিবারে আবদুল্লা ব্রেলভির ধর্ম্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ভারত-ইতিহাসের এই মহান্ ঐতিহ্যের কথা ভুলিয়াই ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ বিভ্রান্ত হইয়াছিল ; আজও সে সঙ্কীর্ণ মনোভাব আছে বলিয়াই ভারতবর্ষের বিদেশী ও স্বদেশী শত্রুমণ্ডলী ভারতরাষ্ট্রের অনিষ্ট সাধনায় রত আছে। আবদুল্লা ব্রেলভি জীবিত থাকিলে এই শত্রুবর্গের নানা চক্রান্ত মাথা তুলিতে পারিত না। "বোম্বে ক্রনিকলের" সম্পাদকের সদাজাগ্রত মন তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিত। তাঁহার অবর্ত্তমানে সেই অভাব নূতন করিয়া অনুভব করিতেছি। তাঁহার আত্মা প্রার্থিত লোক প্রাপ্ত হউক।

জাহিদ শোহরাওয়ার্দ্দি

অবিভক্ত বঙ্গদেশের প্রধানমন্ত্রী হুসেন শহীদ শোহরাওয়ার্দ্দির পিতা জাহিদ শোহরাওয়ার্দ্দি পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙালী সমাজ মুসলিম ঐতিহ্যের এক জন গণ্যমান্য প্রতিনিধিকে হারাইল। যে সমন্বয়-চেষ্টা তাঁহার জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আজ ধুলায় লুটাইতেছে ; এই দৃশ্য তাঁহার প্রীতিপদ ছিল না। কিন্তু তাহাও তাঁহাকে দেখিয়া যাইতে হইয়াছে। সমাজগত জীবনে যেমন তাহা মর্ম্মান্তিক দুঃখ দিতেছে, ব্যক্তিগত জীবনেও তাহা সেইরূপ কষ্ট দিয়াছে। ভক্তের মন দিয়া জাহিদ শোহরাওয়ার্দ্দি এই অভিজ্ঞতার নিষ্ঠুরতা সহ্য করিয়াছেন। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইলের জমিদার প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর দেহত্যাগে বঙ্গ-বাণীর একনিষ্ঠ সাধক এক জন আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া গেলেন। এই নীরব বাণী-পূজার চিহ্ন আজ বাঙালীর চোখে পড়ে না। কিন্তু ৪০ বৎসর পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ সাহিত্যসেবীর সঙ্গে প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর নাম করা হইত। "পদ্মা", "গৌরাঙ্গ", "চিতোর-উদ্ধার" প্রভৃতি কাব্য ও নাটকে, "রূপসী পল্লীবাসিনী" প্রভৃতি গানে, প্রমথনাথের ভাব-রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যাইত। স্বদেশী ও বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের যুগে "নম-বঙ্গ-ভূমি শ্যামাঙ্গিনী, যুগে যুগে জননী লোক-পালিনী"—"শুভ-দিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়, গাহ জয়, গাহ জয় মাতৃ-ভূমির জয়"—এরূপ গান কয়টি লিখিয়া প্রমথনাথ বৃহৎ লোকসমাজে প্রথম পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি ছিল নীরবতা-পিয়াসী; লোকের নিন্দা প্রশংসার বাহিরে থাকিয়া তিনি সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী আত্ম-সমাহিত জীবন কাটাইয়া পরিণত বয়সে লোকান্তর গমন করিয়াছেন। তাঁহার পরিবার-বর্গের প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বেতস-লতা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

কালিদাস, ভবভূতি ও জয়দেব বেতস-লতার উল্লেখ করিয়াছেন। বেতসলতা কেমন লতা?

কালিদাসের শকুন্তলা-নাটকে (তৃতীয় অঙ্কে) 'বেতসপরিক্ষিপ্তে লতামণ্ডপে'—বেতসদ্বারা পরিবেষ্টিত লতামণ্ডপে শকুন্তলা ও রাজা দুষ্মন্ত আলাপ করিয়াছিলেন। রাজা দুষ্মন্ত 'বেতসগৃহ' হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। রঘুবংশে (১৩।৩৫) রামচন্দ্র লঙ্কা জয় করিয়া অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনকালে সীতাকে বলিতেছেন, "আমার স্মরণ হইতেছে ঐ গোদাবরীতীরে পঞ্চবটী বনে মৃগয়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া 'বানীর গৃহে' তোমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতাম।" 'বানীর গৃহেষু সুপ্তঃ'। (বানীর বেতসের এক নাম)। জয়দেবের গীতগোবিন্দে কৃষ্ণ গোপাঙ্গনাদের সহিত 'মঞ্জুল-বঞ্জুলকুঞ্জে' (১ম সর্গ) বিহার করিতেন—সুন্দর বেতসকুঞ্জে। (বঞ্জুল বেতসের এক নাম)। অন্য স্থানে 'কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে', সে কুঞ্জ কুটীরতুল্য।

এই কয়েকটি উল্লেখ হইতে জানিতেছি বেতস এক প্রকার স্থূল লতা। এই লতা বিস্তৃত হইয়া স্বভাবতঃ গৃহ সদৃশ হইত। সে গৃহে লোকে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করিতে ও তথা হইতে বাহিরে আসিতে পারিত। সে গৃহে কেহ বসিলে বাহির হইতে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত না। সে গৃহ এত বড় হইত যে তাহাতে অন্ততঃ পাঁচ-ছয় জন স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইতে ও শুইতে পারিত। এই গৃহই লতাকুঞ্জ।

অমরকোশে লতা দুই প্রকার,—১। বল্লী তু ব্রততী-র্লতা, যে লতা আশ্রয়তরু বেষ্টন করিয়া উঠে, যেমন অপরাজিতা। ২। লতা প্রতানিনী, যে লতা প্রতান-দ্বারা আশ্রয়তরুকে ধরিয়া উঠে, যেমন কুষ্মাণ্ড। আর এক প্রকার লতা আছে, যে লতা ভূমি আশ্রয় করিয়া বিস্তৃত হয়, যেমন দূর্বা। এই লতা ভূপদী, ইংরেজীতে ইহাই creeper; আর, বল্লী ও প্রতানিনী ইংরেজীতে climber.

কণ্ব ঋষির আশ্রম-সন্নিধানে মালিনী নদীর তীরে বেতস-লতা-গৃহ ছিল। সেখানে কোন কর্মকার গৃহ নির্মাণ করে [illegible]। বেত[illegible] আপনিই কুঞ্জ হইয়াছি[illegible] [illegible] লতা [illegible], কুটীরময় এইরূপ, গোদাব[illegible]
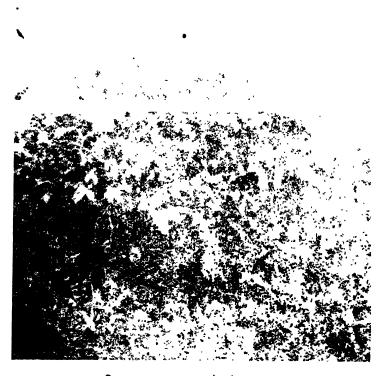
চিত্র ১। বেতসকুঞ্জ। (ফোটো হইতে)

গৃহ ও যমুনাকূলে কুঞ্জ-কুটীর স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়াছিল। অতএব বেতসলতা প্রতানিনী নয়, বল্লী। অমরকোশে "নিকুঞ্জ কুঞ্জৌ বা ক্লীবে লতাদিপিহিতোদরে"—কুঞ্জ বা নিকুঞ্জ লতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত উদর। উদর শূন্যস্থান, গৃহ। জয়দেব কুটীর বলিয়াছেন। কুটীর পর্ণশালা, কুঞ্জও লতাপাতাদ্বারা নির্মিত, অতএব কুটীর বটে। লতা ব্যতীত লতাতুল্য লম্বিত শাখাদ্বারাও কুঞ্জ হইতে পারে। মেঘদূতে জম্বুকুঞ্জ আছে। এই জম্বু আমাদের পরিচিত জম্বু বা জাম হইতে পারে না। ইহা ভূমিজম্বু। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Ardisia humilis. বাংলায় বনজাম বা কাদাজাম। ভূমিজম্বু ছোট গাছ। আর্দ্র ভূমিতে একত্র জন্মে। মেঘ-দূতেও জম্বুকুঞ্জ নদীকূলে ছিল। দীর্ঘপত্র-যুক্ত শাখা ঝুলিয়া পড়ে। ভূমিজম্বু দ্বারা কুঞ্জ হয় বটে, কিন্তু মনুষ্য থাকিলে বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। মণ্ডপ, অমরকোশে অর্থ জনাশ্রয়, যেখানে অনেক লোকে বিশ্রাম করিতে

পারে। ইহাতে স্তম্ভের উপরে চাল থাকে, চারিদিকে ভিত্তি থাকে না, যেমন আটচালা। মণ্ডপে ভিত্তি না থাকাতে চারিদিক হইতেই প্রবেশ করিতে পারা যায়। দীর্ঘ-শাখা-প্রসারী বটবৃক্ষকে বটমণ্ডপ বলা যাইতে পারে।

চিত্র ২। বেতসবল্লী
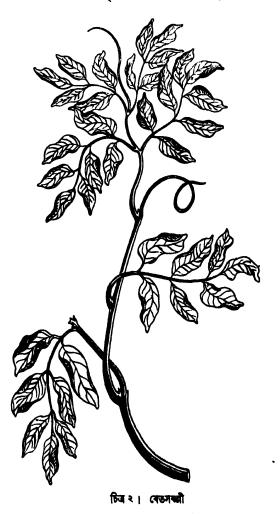
বটের শাখা বাঁকিয়া ভূমিতল পর্যন্ত আসিলে কুঞ্জ হইতে পারিত। কালিদাসের লতামণ্ডপ বেতস-পরিবেষ্টিত ছিল, সেই হেতু সে মণ্ডপ কুঞ্জ হইয়াছিল।

বেতসের কুঞ্জ দুই প্রকারে হইতে পারে। বেতসের নিকট হ্রস্ব তরু থাকিলে লতা তাহাতে উঠিয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ও পরস্পর জড়াইয়া লতার চালা হইয়া শাখা বাঁকিয়া ভূমি পর্যন্ত ঝুলিতে থাকিলে কুঞ্জ হইবে। অথবা, বেতস কিছু উচ্চ হইয়া দাঁড়াইতে পারে এবং ইহার শাখা-প্রশাখা পরস্পর জড়াইয়া চাল করিয়া ঝুলিতে পারে। কাব্যপ্রকাশে এক প্রসিদ্ধ শ্লোকে "রেবা রোধসি বেতসী-তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে,"—রেবা, নর্মদা নদীর তটে বেতস তরুতলে—এখানে বেতসকে তরু বলা হই... অতএব বেতস নিজে নিজেই দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু উচ্চ হইতে পারে না।

বেতস নদীকূলে জন্মে, জলসন্নিধানেও জন্মে। ... নাটকে বিদূষকের দৃষ্টান্তে পাইতেছি, বেতসের লম্বিত নদীজলে পড়িয়া নদীবেগে কুব্জভাব ধারণ করে। নদীকূল হইতে দূরে বনেও জন্মে। মেঘদূতে আশ্র... 'সরস' নিচুল ছিল। (নিচুল বেতসের এক নাম)। গ্রীষ্ম, তথাপি বেতস সরস ছিল।

এই কয়েকটি প্রয়োগ হইতে জানিতেছি, বেতস উৎপত্তির পর কিয়দংশ দৃঢ় ও স্থূল হইয়া তরুর ... ধরে। পরে শাখা পরস্পর জড়াইয়া চালের মত হ... সেখান হইতে চারিদিকে ঝুলিতে থাকে। এইরূপে কুঞ্জ হয়। কুঞ্জ ইংরেজীতে grove নয়, arbour।

আশ্চর্যের বিষয়, এমন কুঞ্জ-লতাকে পণ্ডিতের... মনে করিয়াছেন। বেত বল্লী বটে কিন্তু কদাপি কুঞ্জ... দেখা যায় না। বেত কণ্টকী, ঝোপের মত হয়। কেহ তাহার কাঁটায় বিদ্ধ হইতে চায় না। বেত ... বর্গের গাছ। ইহার অনেক জাতি আছে। কিন্তু... জাতিই কণ্টকী। অন্য লক্ষণ না দেখিয়াও ... বলিতে পারা যায়, বেতস কদাপি বেত অর্থাৎ বেত্র... পারে না। বেত্রের বৈজ্ঞানিক গণ-নাম Calamus

আমি আমার বাঙ্গালা শব্দকোশে সেই ভুল ক... সেখানে লিখিয়াছি, বাংলা বেত, সংস্কৃত বেতস, ... সংস্কৃত বেত্র। কিন্তু বেত্র অর্বাচীন সংস্কৃত নয়। কৌ... অর্থশাস্ত্রে বল্লীর উদাহরণে বেত্র নাম আছে। রা... নামক বৈদ্যক কোশে (পঞ্চদশ খ্রীষ্ট শতাব্দ) বে... বেত্রের নামান্তর হইয়াছে। কিন্তু বেত্র ও বেতস... বর্ণিত হইয়াছে। বৃহদ্‌-ধর্ম পুরাণে (৭।৪২) একই... বেত্র ও বেতসের উল্লেখ আছে,—"বেত্রকীচকান্‌ ... বেতসান্‌" ইত্যাদি। এই পুরাণ বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে গঙ্গার নিকটবর্তী কোন স্থানে চতুর্দশ খ্রীষ্ট... প্রণীত হইয়াছিল। অতএব বেতস ও বেত্র এক গা...

অমরকোশের টীকায় বঙ্গদেশীয় ভরতমল্লিক ... খ্রীষ্ট শতাব্দ) বেতসের ভাষা নাম 'বয়সা' লিখি... শব্দ-কল্প-দ্রুমে এই নাম উদ্ধৃত হইয়াছে। তি... করেন নাই। শতাধিক বর্ষ পূর্বে কোলব্রুক সাহে... অমরকোশে বেতসের ভাষা নাম 'বয়স' ও 'বেঁত' ছিলেন। অতএব এই সময় হইতে বঙ্গদেশে প... বেতসকে বেত ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন মহারাষ্ট্র দেশীয় ভাহুজি দীক্ষিত (সপ্তদশ খ্রীষ্ট ...

অমর-টীকায় বেতসের ভাষানাম 'বেত' লিখিয়াছেন। পাশ্চাত্য বিদ্বানেরাও এই ভুল করিয়াছেন। এক্ষণে ভারতের সর্বত্র সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা বেতসকে বেত মনে করিতেছেন। কাহারও কাহারও এই ভ্রম বদ্ধমূল হইয়াছে, তাঁহারা বেত্র ছাড়িতে পারেন না। একটা উদাহরণ দিই। আয়ুর্বেদে বেতস এক ঔষধ। চরক, সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত তাঁহার 'বনৌষধি দর্পণে' লিখিয়াছেন, বেতস বেত্র নহে, বেতস হিজ্জলের তুল্য বৃক্ষ। তথাপি তিনি বেতস ও বেত্র একসঙ্গে লিখিয়া বৈজ্ঞানিক নামে বেত করিয়া ফেলিয়াছেন। একবার সংস্কার জন্মিলে তাহা অজ্ঞাতসারে চলিয়া আসে। কিন্তু তাঁহার 'বনৌষধি দর্পণ' পড়িয়াই বেতস যে বেত্র নয়, তাহা বুঝিয়াছিলাম।

বেতস কেমন লতা? কোথায় আছে? আমি দৈবাৎ বাঁকুড়ায় একটা লতা পাইয়াছি। তাহা বেতস মনে করি। দুই বৎসরের অধিক হইল, এক দিন এক যুবকের সহিত কথায়-কথায় বলিয়াছিলাম,—"বাঁকুড়ায় বেতগাছ নাই।" সে আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছিল,—"আমাদের গ্রামের পাশ দিয়া শিলাই নদী বহিতেছে, নদীতীরে অসংখ্য বেতের ঝোপ আছে। যত দূর দৃষ্টি চলে তত দূর দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বেত কাটিয়া জ্বালন করি; গোড়া হইতে আবার গজায়। অপর পারের লোকেরা শিকড়ও উপড়াইয়া জ্বালন করিত। সে পারে একটিও বেত গাছ নাই। শীতকালে বেতের ফুল হয়, আমরা সে ফুলে সরস্বতী পূজা করি। গাছগুলি শাদা ফুলে সুন্দর দেখায়। বর্ষাকালে নদীজলে নীচের খানিকটা ডুবিয়া যায়, তখন মনে হয় জলে জন্মিয়াছে। নদীকূল হইতে দূরে জঙ্গলেও অগণ্য বেত গাছ আছে। ডোম আর সাঁওতালেরা বেতের ঝুড়ি বুনে।" আমি শুনিয়া অবাক্। ইহা কি রকম বেত! লোকে জ্বালন করে, গাছে কাঁটা নাই, শীতকালে ফুল হয়, ফুল শাদা!

"কে এই গাছকে বেত বলে?"

"আমরা [ব্রাহ্মণেরা] বেত বলি। বাপ-পিতামহের মুখে মুখে শুনিয়া আসিতেছি, যাহারা ঝুড়ি বুনে তাহারাও বেতের ঝুড়ি বলে।"

সেই অঞ্চলের আর এক যুবক অল্প-স্বল্প চিত্র লিখিতে পারিত। সে এই বেতগাছের চিত্র লিখিয়া দিয়াছিল। দেখিতে একটা বৃহৎ ছত্র। চারিদিকে ঝালর ঝুলিতেছে। মনে হইল একটি বৃক্ষমণ্ডপ। আর, সঙ্গে সঙ্গে মনে আসিল 'বেতসলতা মণ্ডপ'। চিত্রটি এত সুঠাম যে স্বাভাবিক কোন গাছের মনে হইল না। পরে শুনিলাম, অন্য লোকে এই গাছকে 'আটাঁড়ী' বলে।

তখন গ্রীষ্মকাল। আমি বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্টের ইঞ্জিনীয়র সদা-উৎসাহী শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই আটাঁড়ী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি। তিনি পূর্বে কখনও আটাঁড়ী গাছ দেখেন নাই। শুনিলেন, এক জঙ্গলে
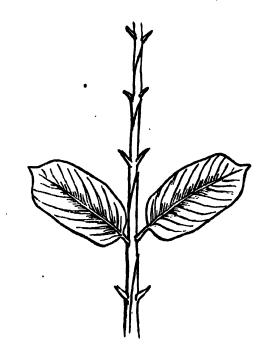
চিত্র ৩। বেতসপত্র

আছে। নিকটস্থ এক গ্রামবাসীকে লইয়া তিনি দেখিতে গেলেন। জঙ্গল নিকটবর্তী হইলে তিনি বলিলেন, "কই আটাঁড়ী?" লোকটি বলিল, "ঐ যে দুলছে।" তিনি আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন সাপের মত লতা ঝুলিতেছে, বাতাস নাই তবু দুলিতেছে। আর এক স্থানে একটা বড় ঝোপ দেখিলেন। সাপের মত লতা উপর হইতে নীচে নামিয়া মাটির উপর দিয়া অনেক দূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। তিনি ভিতরে ঢুকিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। কিন্তু তিনি দেখিলেন ঝোপের ভিতর শূন্য স্থান, শীতল। আটাঁড়ীর অসংখ্য শাখা-প্রশাখা পরস্পর জড়াইয়া উপরে চাল হইয়াছে এবং কতক শাখা দীর্ঘ হইয়া মাটিতে ঠেকিয়াছে। আর এক স্থানে দেখিলেন, একটা আটাঁড়ী ছোট গাছে উঠিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া একটি সুন্দর কুটীর করিয়াছে। সেখানে পাঁচ-সাত জন লোক দাঁড়াইতে ও শুইতে পারে। ক্রমে শীতকাল আসিয়া পড়িল। আটাঁড়ীর ফুল ও দুই-এক মাস পরে ফলও পাইলাম।

এই লতা বৃহৎ দারুময় চিরপত্রক বল্লী। জলের নিকটে ও শুষ্ক উচ্চ ভূমিতেও বহুশঃ জন্মে ইহার তরুণ

শাখার ত্বক্ পিঙ্গলবর্ণ। সহজে উন্মোচিত হয়। অন্তঃপর্ব নয়-দশ ইঞ্চি দীর্ঘ, শরের তুল্য। মজ্জা কোমল, আরক্তবর্ণ। শাখা চারিদিকে ঝুলিতে ও দুলিতে থাকে। পাতা অভিমুখী, হ্রস্ববৃন্ত। উপর পিঠ গাঢ় হরিদ্বর্ণ, চার-পাঁচ ইঞ্চি

চিত্র ৪। বেতসমঞ্জরী
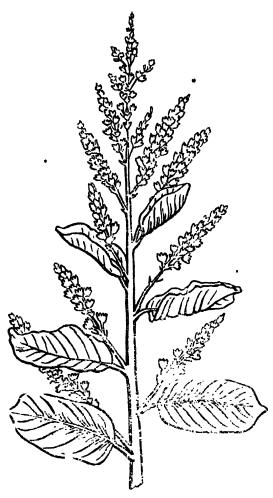
দীর্ঘ, সমবিস্তার। পাতার অগ্র ক্ষুদ্র বাণের ফলার তুল্য সূচ্যাকার। মঞ্জরীতে ছোট ছোট পাংশুবর্ণ ঘন-সন্নিবিষ্ট সুগন্ধ ফুল হয়। ফুলের মাঝে মাঝে হরিতাভ প্রায় এক ইঞ্চি দীর্ঘ পাতা হয়, দূর হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ফুল পঞ্চদল, পুং-কেশর দলের গায়ে উপরে নীচে দুই সারিতে পাঁচ-পাঁচ দশ। গর্ভকোশ দলের নিম্নস্থ। ফল এক-বীজ, নীরস, পঞ্চপক্ষ, কামরাঙ্গার মত সমস্থূল, এক ইঞ্চি দীর্ঘ। বাতাসে এই পক্ষ সাহায্যে ফল বহুদূরে বিক্ষিপ্ত হয়।

এই লতা ভারতের সকল প্রদেশে নাই। আর, যে যে প্রদেশে আছে সে সে প্রদেশের সর্বত্র নাই। পঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যভারত, সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র, পশ্চিম ভারত ও গোদাবরীর দক্ষিণ ভারতে নাই। আসাম গৌহাটিতে অপর্যাপ্ত আছে। আসামী নাম 'লতাচালি' বা 'শালি', অর্থাৎ লতার চালা বা শালা, কুটীর। উত্তর বঙ্গে কালীলতা বা কালীলহরা; বিহারে কোল ভাষায় নাম ফলাগু, সাঁওতালী নাম আটেনা, গয়া জেলায় প্রচুর; উত্তর ভারতে, যেমন দেরাদুনে, হিন্দী নাম রোয়েলা। পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিমাংশে (বাঁকুড়ায়) স্থানে স্থানে অপর্যাপ্ত, সাঁওতালী নাম আটেন, বাংলা আটাং, আটাঁড়ী, আঁতুড়ী। উড়িষ্যায় ওড়িয়া নাম আতুণ্ডী। মধ্য-প্রদেশে হিন্দী নাম দোবেলা, মরাঠী নাম পিবার বেল। এই লতার বৈজ্ঞানিক নাম Combretum decandrum, Roxb. আমি ইহাকেই বেতস মনে করি। বেতসের লক্ষণের সহিত মিলাইলেই দেখা যাইবে, বেতসের সংস্কৃত নামে সে সে লক্ষণ আছে।

অমরকোশে বেতসের সাতটি নাম আছে। আর, অম্বুবেতসের চারিটি নাম আছে। অন্যান্য গ্রন্থে আরও অনেক নাম আছে। ক্ষীরস্বামী কৃত অমরকোশের টীকা পুরাতন (মধ্যপ্রদেশ, একাদশ খ্রীষ্টশতাব্দ)। তাঁহার টীকা পড়িলে মনে হয়, তিনি অম্বুবেতস দেখিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশীয় ভানুজি দীক্ষিতের টীকা পড়িলে মনে হয় তিনি বেতস দেখেন নাই। এই কারণে বেতসকে বেত বলিয়াছেন। উপরিবর্ণিত গাছটি না দেখিলে বেতসের সমুদয় নামের অর্থ বুঝিতে পারা যাইত না। আমি এই গাছের লক্ষণের সহিত মিলাইয়া নামের ধাত্বর্থ লিখিতেছি। কোন একখানি টীকাতে এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইবে না।

(১) বেতস,—সংস্কৃত বে ধাতু বয়নে। যে লতা পরস্পর জড়াইয়া দাঁড়ায় ও বাড়ে।

(২) রথ,—বেতস দেখিতে রথের তুল্য। একালের টোঙ্গা সেই রথ। টোঙ্গার উপরিভাগ কূর্ম-পৃষ্ঠ। চাল হইতে চারিদিকে ঝালর ঝুলিতে থাকে। বেতস সেইরূপ।

(৩) অভ্রপুষ্প,—অভ্র অতিশয় উচ্চ পাংশুবর্ণ মেঘ। বেতসপুষ্প সেই বর্ণের।

(৪) বিদুল,—যে লতা সর্বদা দুলিতে থাকে।

(৫) শীত,—যে লতা-কুপের অভ্যন্তর শীতল। এই কারণে শকুন্তলার গাত্রের সন্তাপ উপশমের নিমিত্ত তাঁহাকে আশ্রমে না রাখিয়া বেতসকুঞ্জে আনা হইয়াছিল। তখন গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইয়াছে।

(৬) বানীর,—বন্ ধাতুর অনেক অর্থ আছে। এখানে কোন্ অর্থ গ্রাহ্য তাহার নির্ণয় কঠিন। ক্ষীরস্বামীর মতে বন্ ধাতু ভজনা; যে জল ভজনা করে, চায়। কিন্তু কাব্যে

প্রয়োগ দেখিলে বানীর শব্দে স্থলবেতস ও জলবেতস দুই-ই বুঝায়। বোধ হয় বন্ ধাতু সেবা। যে কুঞ্জদ্বারা মানুষ ও পশুর সেবা করে, আশ্রয়-গৃহ রচনা করে।

(৭) বঞ্জুল,—বঞ্জুল আর এক দুরূহ শব্দ। এখানেও ক্ষীরস্বামী জল আনিয়াছেন। কিন্তু বঞ্জুল শব্দে অশোক ও তিনিশ (অন্য নাম স্যন্দন) বৃক্ষও বুঝায়। তিন বৃক্ষের মধ্যে নিশ্চয় কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। বোধ হয় বঞ্চ্ ধাতু বক্রগতি। ইহা হইতে বঞ্জুল, যাহা বক্র।• এই তিন বৃক্ষের কাণ্ড ঋজু হয় না, বক্র হয়।

এই সাত নাম স্থলবেতস ও জলবেতস, দুই বেতসেই প্রযোজ্য। অমরকোশে আর চারিটি নাম কেবল জল-বেতসে প্রযোজ্য।

(৮) অম্বুবেতস,—যে বেতস জলের নিকটে জন্মে। ইহার অর্থ জলজাত নহে। হিজ্জলের এক নাম অম্বুজ, কিন্তু হিজ্জল গাছ জলে জন্মে না, জলের নিকটে জন্মে।

(৯) পরিব্যাধ,—পরি-ব্যধ্ ধাতু তাড়নে। যে জল দ্বারা তাড়িত হয়।

বিদুল,—যাহার শাখা নদী-বেগে একবার সোজা হয়, একবার কুব্জ হয়।

(১০) নাদেয়ী,—নদীকূলজাত। নাদেয়ী নদীজলজাত, এই অর্থ নয়। নাদেয়ী শব্দে ভূমিজম্বুও বুঝায়। কিন্তু ভূমিজম্বু কদাপি জলে জন্মে না, আর্দ্রস্থানে জন্মে।

অমরকোশে (১১) 'বেতস্বৎ' শব্দ আছে, যেস্থানে বহু বেতসলতা আছে; অর্থাৎ বেতসলতা যেখানে জন্মে সেখানে বহু জন্মে।

ক্ষীরস্বামী চন্দ্রকোশ হইতে বেতসের নাম তুলিয়াছেন। নূতন নামগুলি দেখিতেছি।

(১২) নিচুল,—নিচুল শব্দে হিজ্জলও বুঝায়। হিজ্জল গাছের শাখা ঝুলিয়া পড়ে বেতসেরও পড়ে। মেঘদূতে নিচুল শুষ্কভূমিতেও 'সরস' দেখাইতেছিল। টীকাকার এই নিচুল শব্দে স্থলবেতস বুঝিয়াছেন, ঠিকই বুঝিয়াছেন।

(১৩) নম্র,—যে লতা লম্বিত। রঘুবংশে (৪।৩৫) দুর্বল রাজগণ প্রবল রাজার নিকট 'বৈতসী বৃত্তি,' নম্রভাব অবলম্বন করিলেন।

(১৪) দীর্ঘপত্রক—যাহার পত্র দীর্ঘ, অর্থাৎ সমবিস্তার।

(১৫) গন্ধপত্র—বোধহয় গন্ধপুষ্পক হইবে (পরে পশ্য)।

(১৬) ঘনপুষ্পক,—যাহার মঞ্জরী বহুপুষ্প।

(১৭) সংবৃত,—লতার পল্লব দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত। (ক্ষীরস্বামীর টীকায় সভৃত, সর্বানন্দের টীকায় সংবৃত আছে। এই পাঠই শুদ্ধ মনে হয়)। জলৌকা, নদীকূল-প্রিয়, জলজাত, তোয়-কাম,—অর্থ স্পষ্ট।

ধন্বন্তরীয় নিঘণ্ট নামে সংস্কৃত বৈদ্যক কোশে বেতসের নূতন নাম—

(১৮) কলম,—বেতসের তরুণ নালের অন্তঃপর্ব দীর্ঘ ও শরের তুল্য। কাটিয়া কলম করিতে পারা যায়, কিন্তু ফাটিয়া যায়।

চিত্র ৫। বেতস ফল

(১৯) সুষেণ?

(২০) গন্ধপুষ্পক—বেতসের পুষ্প সুবাস। মালতী-মাধবে (৯) 'বানীর প্রসবৈঃ' ইত্যাদি, কুঞ্জের নিকটস্থ নদীর জল বেতসপুষ্প দ্বারা সুবাস হইয়াছে।

(২১) নিকুঞ্জক—বেতসের কুঞ্জ প্রসিদ্ধ।

(২২) বাগভটে শল্য চিকিৎসায় এক শস্ত্রের নাম 'বেতসপত্র' আছে। ইহা দেহের মাংস বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। অতএব বাণের তুল্য। বেতস-পত্রের অগ্রভাগ এইরূপ। এই সাদৃশ্যে শস্ত্রের নাম।

(২৩) কোন্ ঋতুতে বেতস পুষ্পিত হয়? বরাহ-মিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় (৩৭) বেতস-পুষ্পের প্রাচুর্য বা অপ্রাচুর্য দেখিয়া অতসীর (তিসির) ফলন জানিবার উপদেশ আছে। তিসি ফাল্গুন মাসে পাকে। বেতসের ফুল নিশ্চয় তাহার পূর্বে পৌষ মাঘ মাসে হয়। বামন পুরাণে (৬) বসন্তকালে নদীকূল বেতসকুসুম দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে। মালতীমাধবে আরও পরে ফুটিয়াছে। দেখা যাইতেছে জলবায়ুর গুণে কোথাও শীত, কোথাও বসন্তে ও গ্রীষ্মের আরম্ভে বেতসের ফুল ফুটে।

বেতস কোন্ কোন্ প্রদেশে ছিল, তাহা সংস্কৃত গ্রন্থে কিছু কিছু পাওয়া যায়। (১) পূর্বে দেখিয়াছি বৃহদ্-ধর্মপুরাণে বেতসের নাম আছে। এই পুরাণ বর্ধমান জেলার উত্তর-পূর্বাংশে প্রণীত হইয়াছিল। সেখানে বেতস থাকিবার কথা। কিন্তু কি নামে আছে তাহা জানিতে না পারিলে পুরাণোক্তির দ্বারা কিছু পাইতেছি না। অমরকোশের বঙ্গীয় টীকাকার ভরতমল্লিক (সপ্তদশ খ্রীষ্টশতাব্দ) বেতসের ভাষা-নাম 'বয়সা' লিখিয়াছেন। বর্তমানে বয়সা থাকিলে বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের নির্দেশিত স্থানে থাকিতে পারে, এই সম্ভাবনায় আমি স্বভাব-কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিককে লিখিয়া-

ছিলাম। তিনি লিখিলেন, তাঁহাদের অঞ্চলে (মঙ্গলকোট) বয়সা আছে। সেটা লতা, লোকে চিনে। দুঃখের বিষয় সে 'বয়সা' বেতস নয়, অন্য লতা। পরে আমি আট্‌াঁড়ীর পাতা পাঠাইয়াছিলাম। সেখানকার একটি লোক দেখিয়া বয়সা বলিয়াছিল। আর দুই জন বয়সা বলাতে স্বীকার করিয়াছিল। কি ঘটিয়াছে বুঝিতে পারা যাইতেছে। বয়সা নির্মূল হইয়াছে, কিন্তু নামটি আছে। তিনি লিখিয়াছিলেন, অজয় নদীর তীরে বয়সা ছিল, বীরভূমেও আছে। সেখানে নির্মূল হইলেও আরও দক্ষিণে আট্‌াঁড়ী আছে। আট্‌াঁড়ীর দুইটি শত্রু, মানুষ ও গবাদি পশু। গ্রামের নিকটে পুরাতন আট্‌াঁড়ী পাওয়া যায় না। (২) কামরূপের রাজা রত্নপালের এক শাসনে নদীকূলে বেতসের উল্লেখ আছে। (পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য কৃত কামরূপ শাসনাবলী)। সেখানে লতাচালি অর্থাৎ আট্‌াঁড়ী অপর্যাপ্ত আছে। (৩) জব্বলপুরের ছয় মাইল দূরে নর্মদা নদীর তটে বেত ও আট্‌াঁড়ী আছে। কাব্য-প্রকাশের উল্লেখ মিথ্যা নয়। (৪) মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৬) 'বঞ্জুল' উল্লেখ আছে। এই পুরাণের শেষের দিকেও দুই-তিন স্থানে বেতসের উল্লেখ আছে। এই পুরাণ মধ্যপ্রদেশে নাগপুর ও জব্বলপুরের মধ্যে কোথাও প্রণীত হইয়াছিল। আমি প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি। (৫) কালিদাসের রঘুবংশে (১৩।৩৫) গোদাবরী তীরে 'বানীর গৃহ' আছে। (৬) বামনপুরাণে বেতসের উল্লেখ পাইয়াছি। এই পুরাণ উত্তর ভারতে প্রণীত মনে হয়।

দেখা যাইতেছে, এখনও সে সে স্থানে আট্‌াঁড়ী আছে। দুই-এক স্থানে মানুষের উপদ্রবে লুপ্ত হইয়া থাকিতে পারে।

যে লতা দ্বারা বেতসের বাইশটা নামের অর্থ বুঝিতে পারা যাইতেছে, সে লতা বেতস ব্যতীত অপর কিছু হইতে পারে না। বিদুল, নম্র, নিচুল লতা থাকিতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে এই একটি লতায় কুঞ্জকুটীর ও গৃহ নাম প্রযুক্ত হইয়াছে।

সংস্কৃত কাব্যে, পুরাণে, মহাভারতে, আয়ুর্বেদে বেতসের উল্লেখ আছে। বহুকাল পূর্বের ঋগ্‌বেদে (৪।৫৮।৫) অগ্নিকে 'হিরণ্ময় বেতস' বলা হইয়াছে। অগ্নিশিখা কাঁপিতে কাঁপিতে উঠে, বেতস-লতাও লম্বিত হইয়া কাঁপিতে থাকে। অগ্নি হিরণ্ময়, পীতবর্ণ, বেতস অবশ্য তাহা নহে। এই কারণে 'হিরণ্ময়' এই বিশেষণ যোগ করিতে হইয়াছে। ঋগ্‌বেদে (২০।৯৫।৫) 'বৈতস' শব্দও আছে। বেতস বহুজাত না হইলে এই নাম আসিত না। নিঘণ্টুতে 'বৈতস' শব্দের অর্থ পুং চিহ্ন। উভয়ই দোদুল্যমান, এই সাদৃশ্যে নাম হইয়াছে। যজুর্বেদ ও অথর্ব বেদে বেতসের নাম 'অপ্‌সুজ' অর্থাৎ অম্বুজ। সেখানেও আট্‌াঁড়ীর সহিত ঐক্য পাওয়া যাইবে।

পঞ্জাবে ও পঞ্জাবের দক্ষিণে বেতস নাই। পূর্বদিকে উত্তর ভারতে আছে। অতএব, বোধ হইতেছে বেতস-সম্বলিত মন্ত্র রচনার সময়ে কতক আর্য উত্তর ভারতে বাস করিতেছিলেন। কালিদাস বেতস উত্তমরূপে চিনিতেন। কিন্তু উজ্জয়িনী কিম্বা নিকটবর্তী স্থানে বেতস নাই। কালিদাসের নিবাস মালব অনুমান করা চলে না। বরাহমিহির বৃহৎ-সংহিতায় তিন স্থানে বেতসের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাকেও উজ্জয়িনী-নিবাসী বলিতে পারা যায় না।

বেতসলতা চিনিতে ইচ্ছুক হইলে ভাবপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত এই শ্লোকে বেতসের আটটি নামের অর্থ চিন্তা করিবেন।

"বেতসো নম্রকঃ প্রোক্তো বানীরো বঞ্জুলস্তথা।
অভ্রপুষ্পশ্চ বিদুলো রথ শীতশ্চ কীর্তিতঃ॥"*

---

* এই প্রবন্ধ সমাপ্তিতে শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্‌যুক্ত সাহায্য স্মরণ করিতেছি। তাঁহাকে সহায় না পাইলে গবেষণার আরম্ভ হইত না। তিনিই বেতসের ফটো তোলাইয়া দিয়াছেন। সেই ফটো হইতে বেতসকুঞ্জের চিত্র প্রদর্শিত হইল। অপর চারিটি চিত্র এখানকার কলেজের ছাত্র কল্যাণীয় শ্রীধরণীকুমার ভট্টাচার্য লিখিয়াছে।

জীবন-ছন্দ

শ্রীজগন্নাথ সরকার

ভোরের আলোর সোনালী পরশ তখনও গ্রামখানির বুকে আসিয়া পৌঁছায় নাই। দুই-একটা পাখীর নিঃসঙ্গ কণ্ঠ শোনা যায় মাত্র—ঐকতানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাহারা যেন নিজেদের সুরতন্ত্রীকে একটু যাচাই করিয়া লয়। তাহার পর সুরু হয় প্রভাতী বন্দনা। তাহাতে যোগ দেয় দোয়েল-পাপিয়া-ঘুঘু এবং আরও অনেক পাখী। শব্দতরঙ্গের দিক দিয়া তাহা হয়ত খুব জোরালো নয়, কিন্তু ঐটুকু শব্দেই বিনোদিনীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। পাশে স্বামী সনাতন এখনও অঘোরে ঘুমাইতেছে। সনাতন চাষী—কাজেই সারাদিন ধরিয়া যেমন ভূতের মত খাটিতে জানে তেমনি মড়ার মত ঘুমাইতেও পারে। বিনোদিনী অবাক হইয়া যায়—এত ঘুমাইতেও পারে মানুষটা! বিছানা হইতে উঠিয়া ওপাশের ছোট্ট জানালাটি খুলিয়া দিল। এক ঝলক ভোরের আলো আসিয়া ঘরের ভিতর ছড়াইয়া পড়িল। পরনের শাড়ীখানা আর একটু আঁট-সাঁট করিয়া পরিয়া সে ছুটিল গোয়ালঘরের দিকে। সেখানে কত কাজ। চাষীর ঘরের মেয়ে সে—চাষীর বধূ; কাজের তাহার অন্ত নাই। গোয়ালঘরে আসিয়া সে হাঁক দিল, ও কালি, ও কালিন্দী, ও পোড়ারমুখী, এ কি করেছিস বল্ তো। খোঁটাটার সঙ্গে দড়িটা অত করে জড়িয়ে মরে-ছিস কেন? তোকে নিয়ে আর পারি নে বাপু! বুড়ী হতে চললি—এখনও তোর আক্কেল হ'ল না?

কালিন্দী নামে বিনোদিনীর আদরের কালো গাই। অনু-যোগের প্রতিবাদ স্বরূপ সে শুধু তাহার গলাটা বিনোদিনীর দিকে একটু বাড়াইয়া দিল মাত্র। বিনোদিনী আবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, আহা, পোড়ারমুখীর রকম দেখে আর বাঁচিনে। আমার আর কাজ নেই—বসে বসে তোর গলা চুলকে দিলেই দিন কাটবে। বলিয়াই সে কালিন্দীর গলার দড়িটা ঠিক করিয়া দিল। তার পর তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া সুড়সুড়ি দিতে লাগিল। নিঃসঙ্কোচ আরামে কালিন্দী তাহার কোলের উপর একেবারে এলাইয়া পড়িল। চোখে-মুখে তাহার আরামের সুস্পষ্ট ছাপ। হয় ত ভোর হইতে এই অবোলা পশুটি এই আদরটুকুরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রতিদিনই সে ইহাতে অভ্যস্ত। অধীর আগ্রহে সে গলার দড়িটা একটু বেশী জড়াইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু শুধু কালিন্দীকে লইয়া থাকিলেই তো বিনোদিনীর চলিবে না। আরো দুই জোড়া বলদ আছে—হাট হইতে কেনা নতুন দড়্মা বাছুরটি আছে। তার নাম বুধী। বুধবারের হাট হইতে কেনা—তাই এই নাম। তাহাদের দেখিতে হইবে, বিচালি দিতে হইবে, গোবর পরিষ্কার করিতে হইবে। কালিন্দীকে ছাড়িয়া সে যেই উঠিতে যাইবে অমনি কালিন্দী তাহার কোলের উপর আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু এবারে বিনোদিনীকে উঠিতেই হইল। আরো কয়টি প্রাণী যে তাহার দিকেই আকুল আগ্রহে চাহিয়া আছে। সকলেই তাহার আদর-সোহাগ চায়। সে বাহিরে আসিয়া বিচালির গাদা হইতে এক বোঝা বিচালি লইয়া প্রত্যেকটি প্রাণীর সামনের চাড়াতে ভাগ করিয়া দিতে লাগিল—তাহারা তাহা উদরস্থ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। এই অবসরে বিনোদিনী গোয়ালের গোবর সাফ করিল, গোয়ালঘর ঝাঁট দিল, তারপর হাতমুখ ধুইয়া ঘরে আসিয়া দেখে সনাতন তখনও অঘোরে ঘুমাইতেছে। শুধু ঘুমানো নয়—নাক দিয়া বিচিত্র সুরলহরী বহৃত হইতেছে। বিনোদিনীর ভারি কৌতুক বোধ হইল। কাহারও নাক ডাকিলে তাহার বেজায় হাসি পায়।

বিনোদিনী বাইশ ছাড়াইয়া সবে তেইশে পা দিয়াছে। মনপ্রাণ তারুণ্য আর চাঞ্চল্যে ভরপুর। বাল্যকাল হই-তেই সে বড় আমুদে, কৌতুকপ্রিয়। বাল্যের সে চাঞ্চল্য এখনও যায় নাই। ধীরে ধীরে সে বিছানার কাছটিতে সরিয়া আসিল। আঁচলের কোণটা খুব সরু করিয়া পাকাইয়া সনাতনের নাকের ভিতর সুড়সুড়ি দিতে লাগিল। সনাতন একেবারে হতচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল—তারপর হাঁচির পর হাঁচি। একটু ধাতস্থ হইলে চাহিয়া দেখে জানালা দিয়া আলো আসিয়া ঘর ভরিয়া গিয়াছে, এক কোণে বিনোদিনী মুখে আঁচল চাপা দিয়া উচ্ছল হাসির ঠমকে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। এ তাহা হইলে তাহারই কাজ। সনাতন কপট ক্রোধের সুরে বলিল—এই বিন্দী, এ সব কি হচ্চে বল্ তো? ঘুমুতে দিবি নে নাকি?

বিনোদিনী হাসির বেগটা একটু সামলাইয়া লইয়া মাথাটা ঈষৎ দোলাইয়া উত্তর দিল, বেশ হয়েছে—খুব হয়েছে। আর ঘুমোবে বেলা দুপুর পর্য্যন্ত?

—দুপুর? ওহো তাই তো, অনেক বেলা হয়ে গেছে দেখছি। তুই শীগগির আমার জলপানগুলো গুছিয়ে দে। আজ যে পোড়াডাঙার চকে চাষ দেবার দিন।

সনাতন উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া তৈরি হইয়া লইল। কোমরের গামছাখানি বেশ করিয়া আঁটিয়া বাঁধিল। বিনোদিনী ততক্ষণে জলপান ঠিক করিয়া দিয়াছে। এক ঘটি খাবার জল—তার উপরে একটি বাটি ঢাকা দেওয়া। একটা পুঁটুলিতে

কিছু মুড়ি আর এক দলা গুড় গামছা দিয়া বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে বাঁধা। জলখাবারের বহর দেখিয়া সনাতন হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আমি কি রাক্ষোস না কি রে? এত মুড়ি কি হবে?

—কেন, খাবে?

—খাব তো অত কি হবে?

—খাটবে, তা একটু বেশী না খেলে খিদে যাবে কেন?

—খিদে আমার—কতখানি খেলে খিদে যাবে সেটা কি তুই বলে দিবি?

—তবে কে বলবে? বনগাঁয়ের বিমলী বলে দেবে না কি?

বিনোদিনীর মুখে কৌতুকের হাসি। কবে সেই সনাতনের বাবার আমলে সনাতনের সঙ্গে বনগাঁয়ের বিমলা নামে একটি মেয়ের বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। আলাপটা অগ্রসর হইয়াছিল অনেকদূর। অবশেষে সনাতন যখন জানাইল যে, সে এই গ্রামেরই বিপিন মণ্ডলের মেয়ে বিনোদিনীকে বিবাহ করিতে চায় তখন সে সম্বন্ধটি ভাঙিয়া গেল। কিন্তু কথাটা বিনোদিনীর কানে যায়। বিয়ের পর হইতে সে এ প্রসঙ্গ লইয়া কৌতুক করিবার সুযোগ ছাড়ে না।

শুনিয়া সনাতনও হাসিল না। কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, হা রে আমার পোড়াকপাল। বিমলী আসবে এই চাষাভূষোর ঘরে! তার বিয়ে হয়েছে ভাল ঘরে। সোয়ামী তার ভদ্দর লোক, লেখাপড়া জানে। মাজিরগঞ্জে শা বাবুদের গোলায় খাতা লেখে। সেই বিমলী আসবে কি না আমাদের ঘরে।

অতখানি মন্দ কপাল সনাতনের নয়। কথাটার মধ্যে সহজ কৌতুক ছাড়া হয়ত আর কিছু ছিল না। কিন্তু বিনোদিনী যেন একটু আঘাত পাইল। ঈষৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। খানিক পরে চাহিয়া দেখিল সনাতন গোয়াল হইতে বলদ দুইটি ছাড়িয়া দিয়াছে। বেড়ার ধার হইতে লাঙলটি তুলিয়া লইয়া সে মাঠের দিকে রওনা হইল। সমস্ত দুপুর মাঠে কাটাইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে ফিরিয়া আসিবে। পোড়াডাঙার চক গ্রাম হইতে একটু দূরে। একপাশে পোড়াডাঙার বিল। গ্রীষ্মকালে শুকনো থাকে—এই সময় চাষীরা চাষ-আবাদ করে। কিন্তু বর্ষায় নূতন জল আসিলে সমস্ত মাঠ ডুবিয়া সমুদ্রের মত হইয়া যায়।

সনাতন পায়ে পায়ে অনেকটা দূর আগাইয়া যায়। আঁকাবাঁকা আলপথ ধরিয়া সে চলিতে থাকে। বিনোদিনী গোয়ালঘরের খোঁটাটা ধরিয়া সেদিক-পানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সোনালী রোদে সনাতনের সবল সুপুষ্ট দেহ বিনোদিনীর নজরে পড়ে। নিকষকালো দীর্ঘ সুঠাম দেহ। যেন পাথরে কোঁদা একটি মূর্ত্তি। গ্রামের ভিতর এমন আর একটিও দেখিতে পাওয়া যায় না। যতক্ষণ সনাতনকে দেখা যায় বিনোদিনী তেমনি একই ভাবে চাহিয়া থাকে। তারপর ধীরে ধীরে পূবপাড়ার বাঁশবনের আড়ালে সে অদৃশ্য হইয়া যায়। বিনোদিনী ফিরিয়া আসিয়া প্রাত্যহিক কাজে মন দেয়।

গ্রামখানির নাম কুমীরপোতা। নামের একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। গ্রামবৃদ্ধেরা বলে, একবার নাকি বর্ষার বানের জলের সঙ্গে গাঁয়ের ভিতরে কুমীর আসিয়াছিল। পোড়াডাঙার বিল তখন ছিল আরও বড়—কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা সব সময় জলে পরিপূর্ণ থাকিত। মাঝখানে প্রকাণ্ড বিল—চারপাশে ছিল ছোট ছোট গ্রামের সারি। বিলের এক পারের গ্রাম হইতে অন্য পারের গ্রামগুলিকে দেখা যাইত ধোঁয়ার রেখার মত অস্পষ্ট। বিলের একপাশে এখন বানভাসি বলিয়া যে মজা খালটি রহিয়াছে তাহার দ্বারা বিলের যোগ ছিল বড় গাঙের সঙ্গে। সেই খাল দিয়াই বড় গাঙ হইতে কুমীর আসিয়াছিল। কুমীরটি আসিয়াই বিভীষিকার সৃষ্টি করিল। আজ এ গাঁয়ের বাছুরকে টানিল—কাল সে গাঁয়ের মানুষকে মারিল। বিলের আশপাশের বিশ-পঁচিশটা গাঁয়ের মাতব্বরেরা মিলিয়া জমিদারের কাছারিতে ধরণা দিয়া পড়িল। কাছারিতে বন্দুক আছে, কাজেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। জমিদারবাবুর ছিল শিকারের বাতিক। তিনি খবর পাইয়া বন্দুক টোটা, বরকন্দাজ ও বজরা লইয়া ছুটিয়া আসিলেন। সমস্ত বিলটা তছনছ করিলেন—কয়েকবার জলের উপর ভাসমান কালো কাঠের গুঁড়িকে গুলি করিলেন, তারপর গোটাকয়েক চখাচখী মারিয়া বিদায় হইলেন। অবশেষে কুমীরটি মারা পড়িল এই গ্রামেরই কয়েক জনের হাতে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সেটা নাকি পোদ্দারদের গোয়ালঘরের কাছে চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল। খবর পাইয়া গ্রামের পুরুষেরা লাঠিসোটা বল্লম লইয়া তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া মারিল, তারপর গ্রামের মাঝামাঝি একটি মাঠের মধ্যে সাড়ম্বরে পুঁতিয়া ফেলিল। আশেপাশে দশ-বিশটা গ্রামের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সেই হইতে এই গ্রামের নাম হইয়াছে কুমীরপোতা। পোড়াডাঙার বিলের সেই ভয়াবহ রূপ আর নাই—সেই বানভাসির খাল এখন ধানক্ষেতে পরিণত হইয়াছে। তবে জায়গাটি খুব নীচু। বর্ষার সময় বড় গাঙ হইতে বানের জল এই পথেই বিলে প্রবেশ করে।

গ্রামের বেশীর ভাগ লোকই চাষী। বামুন-কায়েত দুই এক ঘর আছে—তাঁতি-কলুও আছে। নাগরিক সভ্যতার কোলাহল হইতে বহুদূরে গ্রামখানি অবস্থিত। দুই-এক জন ছাড়া সকলেই নিরক্ষর, সহজ সরল এদের জীবনযাত্রা। অনেকেই জীবনে রেলগাড়ী দেখে নাই—দেখিবার প্রয়োজনও হয় না। গাঁয়ে বাঁশঝাড় বেনাবন জঙ্গল আর পচাডোবার

ছড়াছড়ি। দলাদলি, সঙ্কীর্ত্তন সব কিছুই আছে—আবার ম্যালেরিয়াও আছে। সনাতনরা যে পাড়ায় থাকে তাহার নাম দাসপাড়া, তাহার পাশাপাশি আছে পোদ্দারপাড়া, মণ্ডলপাড়া, কায়েতপাড়া ও বিশ্বাসপাড়া।

বিনোদিনী এই গ্রামেরই মণ্ডলপাড়ার মেয়ে। বাপমায়ের একমাত্র আদরের মেয়ে সে। জন্মের কয়েক বৎসরের ভিতরেই সে তাহার মাকে হারাইল। তাহার বাবা বিপিন মণ্ডল ছিল আত্মভোলা খামখেয়ালী ধরণের মানুষ। চাষ-আবাদের চেয়ে কবির দল গড়িয়া মুখে মুখে ছড়া গাহিয়া বেড়ানোই সে বেশী পছন্দ করিত। রামায়ণের কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা বর্ণনা-চ্ছলে সে অনর্গল ছড়া বলিয়া যাইতে পারিত। আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায়ই তাহার কবির দলের আহ্বান আসিত। পূজার সময় জমিদার-বাড়ীতেও তাহার ডাক পড়িত। দুই-তিনটা মেডেলও সে পাইয়াছিল। তাহাই সগর্ব্বে বুকে দোলাইয়া সে আসরে নামিত। বিনোদিনী তখন আট-নয় বৎসরের বালিকা। পুকুরের শান-বাঁধানো ঘাটে গামছা দিয়া চুনো মাছ ধরিয়া আর ছুটোপুটি করিয়া তাহার দিন কাটিতে-ছিল। এমন সময় অকস্মাৎ পরপার হইতে বিপিনের ডাক পড়িল। ভাইপো গিরীনকে ডাকিয়া তাহার হাতে বিনোদিনীর সমস্ত ভার সঁপিয়া দিয়া সে চোখ বুঁজিল। গিরীন সংসারী মানুষ—অনেক দেখিয়া শুনিয়া সে শেষে এই গ্রামেরই সনাতন দাসের সঙ্গে বিনোদিনীর বিবাহের ব্যবস্থা করিল। সনাতন অবস্থাপন্ন চাষী—জমিজায়গা আছে, গরুবাছুর আছে—তা ছাড়া আছে অটুট স্বাস্থ্য। বিনোদিনীকে ঘরে আনিবার ইচ্ছা সনাতনের বরাবরই ছিল। গিরীন কথাটা তুলিতেই সনাতনের বৃদ্ধ পিতাও এক কথায়ই রাজী হইয়া গেল। তারপর তেরো বৎসর বয়সে বধূবেশে বিনোদিনী আসিয়া প্রবেশ করিল এ বাড়ীতে। গ্রামের মেয়ে সে, কাজেই অনাবশ্যক সঙ্কোচের জড়তা কোথাও নাই। বৃদ্ধ শ্বশুরের সামনেই হাসিয়া খেলিয়া, তাহার আদরযত্ন করিয়া ক্ষুদ্র সংসারটিকে শান্তির নীড় করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ পরম তৃপ্তিতে মাঝে মাঝে ভাবিত—হবে না, কত বড় গুণী লোকের মেয়ে ও।

কিন্তু এত সুখ বুড়ার কপালে বেশী দিন সহিল না। পুত্রবধূকে ঘরে আনিবার কিছু দিন পরেই সে পরপারের দিকে রওনা হইল। তার পর এই পরিবারে রহিল কেবল বিনোদিনী আর সনাতন। প্রচুর জমি—গাইগরু—কিছুরই অভাব নাই। তার উপর আছে উভয়েরই স্বাস্থ্য আর অমলিন তারুণ্য। সেই তের বছরের মেয়ে বিনোদিনী এখন তেইশে পা দিয়াছে। সনাতনের বয়স প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। গ্রামের সকলে বলাবলি করিত এমন জুড়ি দেখা যায় না—যেন সুখের পায়রা এক জোড়া। সংসারের দৈনন্দিন কাজে-কর্ম্মে হাসিগল্পে দীর্ঘ দশটি বৎসর যে কি করিয়া কাটিয়া গেল সনাতন তাহা ভাবিয়া পায় না—বিনোদিনীও কিছু বুঝিতে পারে না। তবু সময় সময় কিসের যেন একটা অভাব, একটা শূন্যভাবোধ উভয়ের মনেই জাগিয়া উঠে—দু'জনেই ভাবিয়া পায় না কেন এমন হয়।

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সময়টা হইতেছে চাষী-সম্প্রদায়ের অবসর-কাল। তখন ধান বোনা শেষ হইয়া যায়—ধূসর ক্ষেতগুলি ভরিয়া উঠে কচি কচি সবুজ ধানের চারায়। পোড়াডাঙার সারাটা মাঠ কে যেন সবুজ মখমলে মুড়িয়া দেয়। দিগন্তের স্বচ্ছ নীলিমায় মাঠের সবুজ রং মিশিয়া যায়। এই সময়টা সনাতনের বড় আনন্দে কাটে। অন্য সব চাষীরা এই অবসরে কেহ বা আগামী বর্ষায় মাছ ধরিবার জন্য জাল বোনে, কেহ বাঁশ চিরিয়া খড়ের ঘরগুলো মেরামত করিতে লাগিয়া যায়। কিন্তু সনাতন ছুটিয়া যায় মাঠের বুকে। সবুজ ধানের চারাগুলো তাহাকে যেন অদৃশ্য আকর্ষণে টানিতে থাকে। নিজের হাতে বোনা ক্ষেতের ভিতরে ঘুরিয়া বেড়াইতে তাহার বড় ভালো লাগে, দমকা হাওয়ায় চারা গাছগুলি দুলিতে থাকে—যেন সেগুলির প্রাণ আছে—নাচিয়া নাচিয়া তাহারা সনাতনকে যেন অভিনন্দন জানায়। উহাদের সঙ্গে সনাতনের যেন প্রাণের যোগ। তাহার মনে হয়, উহাদের সবুজ রঙের সঙ্গে তাহার দেহের প্রতি অণু-পরমাণু যেন কি করিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। পড়িয়া ছিল ধু ধু মাঠ শুষ্ক নিথর—সনাতন নিজের হাতে বীজ বুনিয়া জাগাইয়াছে সেই মাঠের বুকে প্রাণের চাঞ্চল্য। যাহা ছিল না, তাহারই সৃষ্টি করিয়াছে সে। এই সৃজনের আনন্দে সনাতন বিভোর হইয়া যায়—তাহার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা যেন তাহার এই আনন্দের সৃষ্টি ধানের চারাগুলিতে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। উহাদের দৈনন্দিন ক্রমিক বৃদ্ধি দেখিয়া সে অপার আনন্দ উপভোগ করে। অথচ সে সমস্ত মনটা তন্ন তন্ন করিয়াও খুঁজিয়া পায় না কেন এমন হয়। কিসের এ আনন্দ—কিসের এই আবেগ।

গ্রামের একান্তে কায়েতপাড়ায় সারা গ্রামের একটিমাত্র পুকুর। রোজ বিকালে বিনোদিনী কলসী কাঁখে সেখানে গা ধুইতে যায়। সমবয়সী বধূরা একই সময়ে ঘাটে আসিয়া জড়ো হয়। তাহাদের এই বৈকালিক আসরে বিনোদিনীকে চাই-ই—কারণ তাহার মত হাসিতে এবং হাসাইতে খুব কম মেয়েই পারে। শান-বাঁধানো ঘাটের উপর বসিয়া পা দুখানি জলে ডুবাইয়া গল্প করিতে তাহার বেশ লাগে। সেদিন এমনি এক বৈকালিক আসরে কি করিয়া যেন কথাটা উঠিয়া পড়িল। ও-পাড়ার রাঙা-বৌ বলিল, কিন্তু যাই বলো বিনোদিদি, তোমাকে আর যেন মানায় না। শুধু কলসী কাঁখে করেই দিন কাটাবে ?

বিনোদিনী বুঝিতে পারে না, বলে—তবে কি আবার কাঁখে করবো লো ?

—ও আমার পোড়াকপাল, তা বুঝি আবার মেয়ে-ছেলেকে বলে দিতে হয় !

মেয়েমহলে হাসির রোল উঠিল। রাঙা-বৌ বিনোদিনীর প্রায় সমবয়সী। সে বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কানের কাছে ফিস ফিস করিয়া কি বলিল। বিনোদিনী বিবর্ণমুখে চাহিয়া দেখিল সকলেই তাহার পানে তাকাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। এত সহজ কথাটা সে যে মেয়েমানুষ হইয়াও এতক্ষণ বুঝিতে পারে নাই সেই লজ্জায় সে মরমে মরিয়া গেল। কিন্তু লজ্জা তাহার যত হইল তাহার চেয়ে শত গুণ বেশী করিয়া দেখা দিল তাহার জীবনের অপরিমেয় শূন্যতা। কেমন যেন মন-মরা হইয়া গেল সে। কোন রকমে গা ধুইয়া, জলের কলসীটা কাঁখে লইয়া সে রওনা হইয়া পড়িল।···পড়ন্ত বেলার সোনালী রোদ বাঁশ-বাগানের মাথার উপর আসন পাতিয়াছে। সুন্দর অথচ বিদায়-ব্যথায় যেন একটু ম্রিয়মাণ। ওধারের বেতসকুঞ্জের ভিতর হইতে ঘুঘুর একটানা করুণ ডাক শোনা যায়। বিনোদিনীর সমস্ত মনটা উদাস হইয়া গেল। সত্যিই তো, তাহার জীবনে যে এতবড় ফাঁক রহিয়া গিয়াছে তাহা এতদিন সে ঘুণাক্ষরেও তো টের পায় নাই। এতখানি বয়সে জীবন ভরিয়া যাহা সে পাইয়াছে তাহাই যে চরম পাওয়া নয়—এই কথাটা যতই তাহার মনে হইতে লাগিল, ততই এই নির্জ্জন সায়াহ্নে তাহার বিক্ষুব্ধ হৃদয়খানি ব্যথার ভারে একেবারে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। অঙ্গনে পা দিতেই সনাতনের পুলককম্পিত কণ্ঠ শোনা গেল—বিন্দী, এই দেখ্ তোর কালিন্দীর কি সুন্দর একটা বাছুর হয়েছে।

বিনোদিনী চাহিয়া দেখিল গোয়ালের ওধারটায় মাটির ওপরে একটা নবজাত বাছুর আর তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া কালিন্দী অকৃত্রিম আনন্দে বাছুরটির গা চাটিয়া দিতেছে। অন্য সময় হইলে বিনোদিনীর কত আহ্লাদ হইত। কিন্তু আজ সে জীবনে সবচেয়ে বড় আঘাত পাইয়াছে—তাই এ ঘটনাটিকে সে বিধাতার এক নির্ম্মম পরিহাস ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারিল না। কোন কথা না বলিয়া সে বিরস বদনে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। সনাতন একটু অবাক হইল। কোন দিন তো সে এমন করে না। এর আগে বহুবার বিনোদিনীকে সিক্ত বসনে দেখিলে সনাতন অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিত।

বিনোদিনী তাহা লক্ষ্য করিয়া সকৌতুকে বলিত, অমন হাঁ করে চেয়ে আছ কেন ? মেয়েমানুষ দেখনি কোন দিন ?

সনাতন সরল হাস্যে উত্তর দিত,ঢের দেখেছি, কিন্তু তোর মত একটিও দেখি নি।

বিনোদিনী সলজ্জ কটাক্ষে বলিত, যাও যাও, আর মন-রাখা কথা বলতে হবে না। ঢের হয়েছে।

কিন্তু আজ যেন তাহার কি হইয়াছে। সনাতন অবাক হইয়া ভাবিল, এমন হইল কেন ?···

গভীর রাত্রে বিনোদিনীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঝম্‌ঝম্ শব্দে বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল। ঘরের পিছনের বাঁশগাছের ঝোপে টুপটাপ করিয়া শব্দ হইতেছে, পাশের ডোবাটায় ভেককুলের আনন্দ-কলরোল শোনা যায়। পাশে সনাতন অঘোরে ঘুমাইতেছে। বিনোদিনীর মনটা আবার যেন কিসের অজানা ব্যথায় ভরিয়া উঠে। এপাশ ওপাশ করিয়া কিছুতেই সে ঘুমাইতে পারে না। নিশুতি রাতে গভীর বেদনায় তাহার মনে হয় যেন তাহার জীবন বড়ই শূন্য—ব্যর্থ। তাহার সবকিছুই আছে—অথচ আসলে যেন কিছুই নাই।

ইহার কয়েক দিন পর এক সন্ধ্যায় মাঝগাঁয়ের হাট হইতে ফিরিয়া সনাতন বলিল, আজ হাটে যোগেনের সঙ্গে দেখা হ'ল। পিসিমা পরশু আমাদের এখানে আসবে। কিছুদিন থাকবে এখানে।

যোগেন সনাতনের পিসতুতো ভাই। থাকে মাঝগাঁয়ে। ছেলে, বৌ, নাতি-নাতনী লইয়া পিসীমার দিনগুলি কাটে ভাল। মাঝে মাঝে হঠাৎ ভাইপোর সংসারে আসিয়া উদয় হয়। কিছুদিন থাকিয়া আবার চলিয়া যায়।

যথাকালে কাত্তমণি অর্থাৎ সনাতনের পিসীমা আসিয়া হাজির হইল। বুড়া ঠিক নয়, আবার প্রৌঢ়াও বলা চলে না। মাথার আধপাকা চুলগুলো ছোট করিয়া ছাঁটা—তামাকপোড়ার গুঁড়াতে মাজা আর অবশিষ্ট দাঁতগুলি নিকষকালো। আসিয়াই কাত্তমণি প্রথমে পা ছড়াইয়া বসিয়া মৃত ভাইয়ের জন্য খানিকটা কাঁদিল, তারপর নিজের সংসারের কথা ভুলিয়া খানিকক্ষণ আবোল তাবোল বকিল, অবশেষে পাড়া বেড়াইতে বাহির হইল। এই গ্রামেরই মেয়ে সে—সকলেই তাহাকে চেনে। দুই এক দিনের মধ্যেই সে গ্রামবাসীদের অনেককেই চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল যে, তাহার ভাইয়ের বংশের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ যে নরকগামী হইতে যাইতেছে, গ্রামবাসীরা তাহার কি প্রতি-বিধান করিতেছে। তাহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সে আপন-জন হইয়া তো নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না।

বিনোদিনীর মনে হয় পিসীমা আসিবার পর হইতে সনাতন যেন কেমন একরকম হইয়া গিয়াছে। সদাই কেমন একটা চিন্তাকুল ভাব তার। সে হাসি-কৌতুক নাই, সে কর্ম্মোৎসাহ নাই। মাঝে মাঝে সে নির্ব্বাক স্থির দৃষ্টিতে বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া থাকে—কত কি যেন ভাবে।

বিনোদিনী সে দৃষ্টিকে মোটেই সহিতে পারে না—একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ইহার অর্থ যে সে বুঝিতে পারে না এমন নয়। কিন্তু এই বোঝাটাতেই তাহার ব্যথার বোঝা আরও দুর্ব্বহ হইয়া ওঠে।

সময় সময় পিসীমা ভাইপোতে মিলিয়া চুপি চুপি কি সব যেন কথাবার্ত্তা হয়—হঠাৎ বিনোদিনী সেখানে আসিয়া পড়িলে উভয়েই হতচকিত হইয়া পড়ে। তার পর অন্য কথা পাড়ে।

কয়েক দিন ভাইপোর সংসারে থাকিয়া কান্তমণি বিদায় লইল। কিন্তু সেই হইতে সনাতনের যেন একটা বিরাট পরিবর্ত্তন আসিয়া গেল। ছুট্ বলিতে পিসীমার গ্রামে গিয়া ঘুরিয়া আসিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলেও ঠিক সদুত্তর পাওয়া যায় না। কি যেন অজানা আশঙ্কায় বিনোদিনীর মন ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু কথাটা এক দিন অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল। ওপাড়ার তাঁতিবৌয়ের বাপের বাড়ী মাঝগাঁয়ে। ঘাটে তাঁতিবৌয়ের সঙ্গে দেখা হইতেই সে বিনোদিনীকে জানাইল যে, কান্ত-পিসীমা মাঝগাঁয়েরেই একটি মেয়ের সঙ্গে সনাতনের নূতন সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছে। মেয়েটি বেশ ডাগর। আগামী মাঘেই বিবাহ। সনাতনও তাহাতে মত দিয়াছে। শুনিয়া বিনোদিনী একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় ইহা লইয়া সনাতনের সঙ্গে তাহার তুমুল ঝগড়া হইয়া গেল। বিনোদিনী কলহপ্রিয়া নয়—কিন্তু আজ যেন তাহার কি হইল। যাহা মুখে আসে তাহাই বলিল। তারপর কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা কুটিয়া শাপান্ত করিয়া অবশেষে সেই সন্ধ্যায়ই ওপাড়ায় জেঠতুতো ভাইয়ের বাড়ীতে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। গিন্নীন সমস্ত শুনিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, তা আমার যদি দুটো ভাত জোটে, তোরও জুটবে।

গ্রামের অনেক মেয়েই সহানুভূতি দেখাইল। আকারে-ইঙ্গিতে জানাইল বিনোদিনীর কপাল পুড়িয়াছে। বিনোদিনীও জানিল যে, তাহার কপাল সত্য সত্যই পুড়িয়াছে। নহিলে এমন হইবে কেন।

চোখের জলে আর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের ভিতরে ভাইয়ের সংসারে বিনোদিনীর দিন কাটিতে লাগিল। কয়েক দিন পরে সকালের দিকে সনাতনের রাখাল ছোকরাটি একেবারে হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া হাজির। বিনোদিনীকে সামনে পাইয়া দিয়া বলিল, খুড়ীমা গো, সনাকাকার তিন দিন থেকে রামক জ্বর। গা যেন আগুন। তোমারে যেতে বলেছে।

বিনোদিনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, যেতে বলেছে? কেন? ! তোর নতুন খুড়ীমাকে নিয়ে আসুগে মাঝগাঁ থেকে। আমাকে কেন? লজ্জা করে না বলতে। বেরো বল্‌ছি হতচ্ছাড়া। নইলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবো।

বেগতিক দেখিয়া ছেলেটি সরিয়া পড়িল। কিন্তু সারা সকালটা জুড়িয়া বিনোদিনীর মনটা ব্যথায় একেবারে গুমরিয়া মরিতে লাগিল। তাহার অমন স্বামী—তাহার সোনার সংসার, তাহার কালিন্দী আর অন্যান্য অবোলা গৃহপালিত জীব—সমস্তই তাহার, কিন্তু সকল অধিকার হইতেই সে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কেন?

দুপুরে সে পুকুরঘাটে গেল স্নান করিতে। সেই পুরাতন শান-বাঁধানো ঘাটে স্নান করিতে করিতে একখানি ব্যথাক্লিষ্ট পীড়িত মুখ কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। ফিরিবার বেলায় দাস-পাড়ার পথের পানে এক বার চাহিল। সেই সুপরিচিত আঁকাবাঁকা পথ। সে পথ যেন দুর্নিবার ভাবে তাহার মনকে টানিতে লাগিল। তাহার অবাধ্য পা দুখানি সেদিক পানেই তাহাকে লইয়া চলিল। এক পা দুই পা করিয়া সে গিয়া হাজির হইল তাহার সেই সুপরিচিত আঙিনাতে। কয়েক দিনের মধ্যে উঠানে ঝাঁট পড়ে নাই। এখানে সেখানে রাজ্যের জঞ্জাল জমিয়াছে। গোয়ালঘর গোবরে ভর্ত্তি। সমস্ত দাওয়াটায় পোড়া তামাকের গুঁড়ার ছড়াছড়ি। এ কি হাল হইয়াছে তাহার সংসারের! রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিল, উনুনের উপর মাটির হাঁড়িটা চড়ানো—তাহাতে এক মুঠো আধ পোড়া আধ সেদ্ধ চাল। বোধ হয় জ্বরে শয্যা-গত হইবার পূর্ব্বে সনাতন রান্না করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল। সেই দিকে চাহিয়া সে হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। একটু ধাতস্থ হইয়া এ ঘরে আসিয়া দেখিল সনাতন উপুড় হইয়া শুইয়া জ্বরের ঘোরে ধুঁকিতেছে। বিনোদিনী কাছে আসিয়া পরম স্নেহে স্বামীর মাথার উপর হাতখানি রাখিল। সনাতন ধড়মড় করিয়া চাহিয়া দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। রাঙা চোখ দুটি মেলিয়া সে বিনোদিনীর মুখের পানে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল—যেন কত যুগযুগান্ত তাহাকে দেখে নাই। তার পর তাহার হাতখানি নিজের উত্তপ্ত বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিল—আমায় মাপ কর্ বিন্দী। এ সংসারে আর কাউকে আমি আনতে পারব না, কিছুতেই না। আমি পিসীমাকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি এ বিয়ে হবে না—কখনও নয়। তুই চলে যাবি নে বল্?

বিনোদিনী কিছুই বলিল না। শুধু উষ্ণ অশ্রুধারায় তাহার গণ্ড ভিজিয়া উঠিল। খানিকক্ষণ এমনি ভাবে থাকিয়া সে স্বামীকে ভাল করিয়া শোয়াইল। গায়ের চাদরটা আর একটু টানিয়া দিল। তারপর পূর্ব্বেকার মত সংসারের কাজে লাগিয়া গেল।...

ইহার কয়েক দিন পর সনাতন সুস্থ হইয়া উঠিয়া সকালের দিকে দাওয়াতে বসিয়া এক মনে হুঁকা টানিতেছিল। বিনোদিনী রাখাল ছোকরাটিকে ডাকিয়া বলিল, যা তো বাবা রতন, এক বার পিসীমাদের গাঁয়ে। তাকে বলবি

বিনোদিনী বুঝিতে পারে না, বলে—তবে কি আবার কাঁখে করবো লো ?

—ও আমার পোড়াকপাল, তা বুঝি আবার মেয়ে-ছেলেকে বলে দিতে হয় !

মেয়েমহলে হাসির রোল উঠিল। রাঙা-বৌ বিনোদিনীর প্রায় সমবয়সী। সে বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কানের কাছে ফিস ফিস করিয়া কি বলিল। বিনোদিনী বিবর্ণমুখে চাহিয়া দেখিল সকলেই তাহার পানে তাকাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। এত সহজ কথাটা সে যে মেয়েমানুষ হইয়াও এতক্ষণ বুঝিতে পারে নাই সেই লজ্জায় সে মরমে মরিয়া গেল। কিন্তু লজ্জা তাহার যত হইল তাহার চেয়ে শত গুণ বেশী করিয়া দেখা দিল তাহার জীবনের অপরিমেয় শূন্যতা। কেমন যেন মন-মরা হইয়া গেল সে। কোন রকমে গা ধুইয়া, জলের কলসীটা কাঁখে লইয়া সে রওনা হইয়া পড়িল।...পড়ন্ত বেলার সোনালী রোদ বাঁশ-বাগানের মাথার উপর আসন পাতিয়াছে। সুন্দর অথচ বিদায়-ব্যথায় যেন একটু ম্রিয়মাণ। ওধারের বেতসকুঞ্জের ভিতর হইতে ঘুঘুর একটানা করুণ ডাক শোনা যায়। বিনোদিনীর সমস্ত মনটা উদাস হইয়া গেল। সত্যিই তো, তাহার জীবনে যে এতবড় ফাঁক রহিয়া গিয়াছে তাহা এতদিন সে ঘুণাক্ষরেও তো টের পায় নাই। এতখানি বয়সে জীবন ভরিয়া যাহা সে পাইয়াছে তাহাই যে চরম পাওয়া নয়—এই কথাটা যতই তাহার মনে হইতে লাগিল, ততই এই নির্জন সায়াহ্নে তাহার বিক্ষুব্ধ হৃদয়খানি ব্যথার ভারে একেবারে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। অঙ্গনে পা দিতেই সনাতনের পুলককম্পিত কণ্ঠ শোনা গেল—বিন্দী, এই দেখ্ তোর কালিন্দীর কি সুন্দর একটা বাছুর হয়েছে।

বিনোদিনী চাহিয়া দেখিল গোয়ালের ওধারটায় মাটির ওপরে একটা নবজাত বাছুর আর তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া কালিন্দী অকৃত্রিম আনন্দে বাছুরটির গা চাটিয়া দিতেছে। অন্য সময় হইলে বিনোদিনীর কত আহ্লাদ হইত। কিন্তু আজ সে জীবনে সবচেয়ে বড় আঘাত পাইয়াছে—তাই এ ঘটনাটিকে সে বিধাতার এক নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারিল না। কোন কথা না বলিয়া সে বিরস বদনে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। সনাতন একটু অবাক হইল। কোন দিন তো সে এমন করে না। এর আগে বহুবার বিনোদিনীকে সিক্ত বসনে দেখিলে সনাতন অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিত।

বিনোদিনী তাহা লক্ষ্য করিয়া সকৌতুকে বলিত, অমন হাঁ করে চেয়ে আছ কেন ? মেয়েমানুষ দেখনি কোন দিন ?

সনাতন সরল হাস্যে উত্তর দিত, ঢের দেখেছি, কিন্তু তোর মত একটিও দেখি নি।

বিনোদিনী সলজ্জ কটাক্ষে বলিত, যাও যাও, আর মন-রাখা কথা বলতে হবে না। ঢের হয়েছে।

কিন্তু আজ যেন তাহার কি হইয়াছে। সনাতন অবাক হইয়া ভাবিল, এমন হইল কেন ?...

গভীর রাত্রে বিনোদিনীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঝম্‌ঝম্ শব্দে বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল। ঘরের পিছনের বাঁশগাছের কোপে টুপটাপ করিয়া শব্দ হইতেছে, পাশের ডোবাটায় ভেককুলের আনন্দ-কলরোল শোনা যায়। পাশে সনাতন অঘোরে ঘুমাইতেছে। বিনোদিনীর মনটা আবার যেন কিসের অজানা ব্যথায় ভরিয়া উঠে। এপাশ ওপাশ করিয়া কিছুতেই সে ঘুমাইতে পারে না। নিশুতি রাতে গভীর বেদনায় তাহার মনে হয় যেন তাহার জীবন বড়ই শূন্য—ব্যর্থ। তাহার সবকিছুই আছে—অথচ আসলে যেন কিছুই নাই।

ইহার কয়েক দিন পর এক সন্ধ্যায় মাঝগাঁয়ের হাট হইতে ফিরিয়া সনাতন বলিল, আজ হাটে যোগেনের সঙ্গে দেখা হ'ল। পিসিমা পরশু আমাদের এখানে আসবে। কিছুদিন থাকবে এখানে।

যোগেন সনাতনের পিসতুতো ভাই। থাকে মাঝগাঁয়ে। ছেলে, বৌ, নাতি-নাতনী লইয়া পিসীমার দিনগুলি কাটে ভাল। মাঝে মাঝে হঠাৎ ভাইপোর সংসারে আসিয়া উদয় হয়। কিছুদিন থাকিয়া আবার চলিয়া যায়।

যথাকালে কাত্তমণি অর্থাৎ সনাতনের পিসীমা আসিয়া হাজির হইল। বৃদ্ধা ঠিক নয়, আবার প্রৌঢ়াও বলা চলে না। মাথার আধপাকা চুলগুলো ছোট করিয়া ছাঁটা—তামাকপোড়ার গুঁড়াতে মাজা আর অবশিষ্ট দাঁতগুলি নিকষকালো। আসিয়াই কাত্তমণি প্রথমে পা ছড়াইয়া বসিয়া মৃত ভাইয়ের জন্য খানিকটা কাঁদিল, তারপর নিজের সংসারের কথা তুলিয়া খানিকক্ষণ আবোল তাবোল বকিল, অবশেষে পাড়া বেড়াইতে বাহির হইল। এই গ্রামেরই মেয়ে সে—সকলেই তাহাকে চেনে। দুই এক দিনের মধ্যেই সে গ্রামবাসীদের অনেককেই চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল যে, তাহার ভাইয়ের বংশের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ যে নরকগামী হইতে যাইতেছে, গ্রামবাসীরা তাহার কি প্রতি-বিধান করিতেছে। তাহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সে আপন-জন হইয়া তো নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না।

বিনোদিনীর মনে হয় পিসীমা আসিবার পর হইতে সনাতন যেন কেমন একরকম হইয়া গিয়াছে। সদাই কেমন একটা চিন্তাকুল ভাব তার। সে হাসি-কৌতুক নাই, সে কর্মোৎসাহ নাই। মাঝে মাঝে সে নির্ব্বাক স্থির দৃষ্টিতে বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া থাকে—কত কি যেন ভাবে।

বিনোদিনী সে দৃষ্টিকে মোটেই সহিতে পারে না—একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ইহার অর্থ যে সে বুঝিতে পারে না এমন নয়। কিন্তু এই বোঝাটাতেই তাহার বাথার বোঝা আরও দুর্ব্বহ হইয়া ওঠে।

সময় সময় পিসীমা ভাইপোতে মিলিয়া চুপি চুপি কি সব যেন কথাবার্ত্তা হয়—হঠাৎ বিনোদিনী সেখানে আসিয়া পড়িলে উভয়েই হতচকিত হইয়া পড়ে। তার পর অন্ত কথা পাড়ে।

কয়েক দিন ভাইপোর সংসারে থাকিয়া কাত্তমণি বিদায় লইল। কিন্তু সেই হইতে সনাতনের যেন একটা বিরাট পরিবর্ত্তন আসিয়া গেল। ছুট্‌ বলিতে পিসীমার গ্রামে গিয়া ঘুরিয়া আসিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলেও ঠিক সদুত্তর পাওয়া যায় না। কি যেন অজানা আশঙ্কায় বিনোদিনীর মন ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু কথাটা এক দিন অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল। ওপাড়ার তাঁতিবৌয়ের বাপের বাড়ী মাঝগাঁয়ে। ঘাটে তাঁতিবৌয়ের সঙ্গে দেখা হইতেই সে বিনোদিনীকে জানাইল যে, কাত্ত-পিসীমা মাঝগাঁয়েরই একটি মেয়ের সঙ্গে সনাতনের নূতন সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছে। মেয়েটি বেশ ডাগর। আগামী মাঘেই বিবাহ। সনাতনও তাহাতে মত দিয়াছে। শুনিয়া বিনোদিনী একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় ইহা লইয়া সনাতনের সঙ্গে তাহার তুমুল ঝগড়া হইয়া গেল। বিনোদিনী কলহপ্রিয়া নয়—কিন্তু আজ যেন তাহার কি হইল। যাহা মুখে আসে তাহাই বলিল। তারপর কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা কুটিয়া শাপান্ত করিয়া অবশেষে সেই সন্ধ্যায়ই ওপাড়ায় জেঠতুতো ভাইয়ের বাড়ীতে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। গিরীন সমস্ত শুনিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, তা আমার যদি দুটো ভাত জোটে, তোরও জুটবে।

গ্রামের অনেক মেয়েই সহানুভূতি দেখাইল। আকারে-ইঙ্গিতে জানাইল বিনোদিনীর কপাল পুড়িয়াছে। বিনোদিনীও জানিল যে, তাহার কপাল সত্য সত্যই পুড়িয়াছে। নহিলে এমন হইবে কেন।

চোখের জলে আর বুককাটা দীর্ঘশ্বাসের ভিতরে ভাইয়ের সংসারে বিনোদিনীর দিন কাটিতে লাগিল। কয়েক দিন পরে সকালের দিকে সনাতনের রাখাল ছোক্‌রাটি একেবারে হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া হাজির। বিনোদিনীকে সামনে পাইয়া বলিয়া বসিল, খুড়ীমা গো, সনাকাকার তিন দিন থেকে ভয়ানক জর। গা যেন আগুন। তোমারে যেতে বলেছে।

বিনোদিনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, যেতে বলেছে? কেন? যা তোর নতুন খুড়ীমাকে নিয়ে আয়গে মাঝগাঁ থেকে। আমাকে কেন? লজ্জা করে না বলতে। বেরো বল্‌ছি হতচ্ছাড়া। নইলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবো।

বেগতিক দেখিয়া ছেলেটি সরিয়া পড়িল। কিন্তু সারা সকালটা জুড়িয়া বিনোদিনীর মনটা ব্যথায় একেবারে গুমরিয়া মরিতে লাগিল। তাহার অমন স্বামী—তাহার সোনার সংসার, তাহার কালিন্দী আর অন্যান্য অবোলা গৃহপালিত জীব—সমস্তই তাহার, কিন্তু সকল অধিকার হইতেই সে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কেন?

দুপুরে সে পুকুরঘাটে গেল স্নান করিতে। সেই পুরাতন শান-বাঁধানো ঘাটে স্নান করিতে করিতে একখানি ব্যথাক্লিষ্ট পীড়িত মুখ কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। ফিরিবার বেলায় দাস-পাড়ার পথের পানে এক বার চাহিল। সেই সুপরিচিত আঁকাবাঁকা পথ। সে পথ যেন দুর্নিবার ভাবে তাহার মনকে টানিতে লাগিল। তাহার অবাধ্য পা দুখানি সেদিক পানেই তাহাকে লইয়া চলিল। এক পা দুই পা করিয়া সে গিয়া হাজির হইল তাহার সেই সুপরিচিত আঙিনাতে। কয়েক দিনের মধ্যে উঠানে ঝাঁট পড়ে নাই। এখানে সেখানে রাজ্যের জঞ্জাল জমিয়াছে। গোয়ালঘর গোবরে ভর্ত্তি। সমস্ত দাওয়াটায় পোড়া তামাকের গুঁড়ার ছড়াছড়ি। এ কি হাল হইয়াছে তাহার সংসারের! রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিল, উনুনের উপর মাটির হাঁড়িটা চড়ানো—তাহাতে এক মুঠো আধ পোড়া আধ সেদ্ধ চাল। বোধ হয় জরে শয্যা-গত হইবার পূর্ব্বে সনাতন রান্না করিবার জন্ত ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল। সেই দিকে চাহিয়া সে হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। একটু শান্ত হইয়া এ ঘরে আসিয়া দেখিল সনাতন উপুড় হইয়া শুইয়া জরের ঘোরে ধুঁকিতেছে। বিনোদিনী কাছে আসিয়া পরম স্নেহে স্বামীর মাথার উপর হাতখানি রাখিল। সনাতন ধড়মড় করিয়া চাহিয়া দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। রাঙা চোখ দুটি মেলিয়া সে বিনোদিনীর মুখের পানে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল যেন কত যুগযুগান্ত তাহাকে দেখে নাই। তার পর তাহার হাতখানি নিজের উত্তপ্ত বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিল—আমায় মাপ কর্‌ বিন্দী। এ সংসারে আর কাউকে আমি আনতে পারব না, কিছুতেই না। আমি পিসীমাকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি এ বিয়ে হবে না—কখনও নয়। তুই চলে যাবি নে বল্‌?

বিনোদিনী কিছুই বলিল না। শুধু উষ্ণ অশ্রুধারায় তাহার গণ্ড ভিজিয়া উঠিল। খানিকক্ষণ এমনি ভাবে থাকিয়া সে স্বামীকে ভাল করিয়া শোয়াইল। গায়ের চাদরটা আর একটু টানিয়া দিল। তারপর পূর্ব্বেকার মত সংসারের কাজে লাগিয়া গেল।...

ইহার কয়েক দিন পর সনাতন সুস্থ হইয়া উঠিয়া সকালের দিকে দাওয়াতে বসিয়া এক মনে হুঁকা টানিতেছিল। বিনোদিনী রাখাল ছোকরাটিকে ডাকিয়া বলিল, যা তো বাবা রতন, এক বার পিসীমাদের গাঁয়ে। তাকে বলবি

বিনো-খুড়ীমা পাঠিয়ে দিয়েছে—তোর সনাকাকার বিয়ে এই মাঘ মাসেই হবে। তাকে বলিস সব ব্যবস্থা যেন করেন।

সনাতন একেবারে অবাক হইয়া গেল। কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বিনোদিনী তাহার আগেই বলিয়া উঠিল—না, কোন কথা নয়। এতে অমত করলে আমি মাথা কুটে মরব। আমাকে আর ঘাঁটিয়ো না।

রতন রওনা হইয়া পড়িল। কিছুদূর যাইতেই সনাতন পিছন হইতে ডাক দিল, শুনে যা রতন। শোন নে।

কিন্তু সে তখন অনেকটা দূর অগ্রসর হইয়াছে, শুনিতে পাইল না। সনাতন বিনোদিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, এ কি করলি বিন্দী? এ যে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডেকে আনলি।

বিনোদিনী কলসী কাঁখে করিয়া পুকুরের দিকে রওনা হইতেছিল। শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, সর্ব্বনাশ কোথায় গো? এ তো আমার সৌভাগ্য। নইলে আমার বেঁচে থাকবার কি মানে হয় বল তো? আমি মরে গেছি, তাই বলে তোমাকে ত আমি মরতে দিতে পারি নে। এ ভালই হ'ল, তোমার ভেতর দিয়েই আমি বেঁচে থাকতে পারবো।

সনাতন কিছুই বুঝিতে পারিল না। বিনোদিনী এমন হেঁয়ালীও জানে। হয়ত গুণী বাপের ধারা সে পাইয়াছে। শুধু কেন যেন একটা বুকভরা দীর্ঘশ্বাস সনাতনের মর্ম্মস্থল মথিত করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

লিপি-বিভ্রাটে অনর্থপাত

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চৌধুরী

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'বাংলা নব লিপি' নামক প্রবন্ধটি সময়োপযোগী হইয়াছে। দেবনাগর বর্ণমালার 'র' এবং অনুস্বার গ্রহণ করিয়া তিনি বাংলা ও দেবনাগরের মিলনপথ সুগম করিয়াছেন। এ-কারকে বর্ণের পরে বসাইয়া ও বহু যুক্তাক্ষর বাদ দিয়া দ্রুত লেখার এবং টাইপ-যন্ত্রে লেখার সুবিধা করিয়াছেন। কিন্তু আজ বাংলার দৃষ্টির পরিসর বাড়াইতে হইবে। আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে কেবলমাত্র বাংলার চতুঃসীমায় আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না।

বাংলার বঙ্কিম ভারতকে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছেন। বাংলার, তথা পৃথিবীর রবি ভারতকে 'জনগণমনের' সাম্য-সাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। এই দুই মন্ত্রের শক্তি সত্ত্বেও ভারতের অঙ্গচ্ছেদের উপক্রম দেখিয়া বাংলার সুভাষ স্বাধীন ভারত সৃষ্টিকল্পে জয় হিন্দ্ ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছেন। বাংলার সন্ন্যাসী, সাধক ব্যবহারজীব চিকিৎসক ও অধ্যাপক ভারতের দূরস্থিত শহর ও গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়া দেশসেবার পরিচয় দিয়াছেন। আজ সেই সমস্ত অঞ্চলে স্থানীয় লোকেরাই এই সকল বৃত্তিতে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতের বিরাট সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলার কাজ ফুরাইয়া যায় নাই। বাংলা নিজের সাহিত্যকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সমান আসনে বসাইয়াছে। এইবার ভারতের সকল শাখা ও উপশাখা-ভাষার মিলন ঘটাইয়া ভারত-ভাষাকে তাহার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

তাহার প্রথম ধাপ হইবে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালার খেয়ালের সৃষ্ট অবান্তর অংশগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারতে একই লিপি প্রচলন করা। আসাম ও উড়িষ্যার সহিত একযোগে কাজ করিয়া, বাংলা তাহার বর্ণমালা কথঞ্চিৎ সংশোধিত করিয়া, প্রয়োজনমত সংশোধিত দেবনাগর বর্ণমালার সহিত ঐক্যবিধান করুক। অচিরেই দেখা যাইবে যে, ভারতের অপর প্রদেশগুলিও এই মহৎ আদর্শ সানন্দে গ্রহণ করিবে।

ভারতের প্রাদেশিক শাখা ও উপশাখা-ভাষাগুলি যদি অবৈজ্ঞানিক পথে চলিয়া নিজ নিজ ভাষাকে স্বতন্ত্রভাবে বড় করিবার চেষ্টায় রত থাকে, তবে ক্রমে দেখা যাইবে যে, ভাষা তো বড় হইবেই না, অপিচ ভারতভূমিতে ভাষা-বৈরিতার বৃহৎ প্রাচীর উঠিয়া অখণ্ড ভারতকে ভাষা-কচকচির 'টাওয়ার অব বাবেলে' পরিণত করিবে। বিদেশী বণিক-শাসকদল অনবরতই এই চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ভারত-ভাষার সুদৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তি পদে পদে তাহাদিগকে প্রতিহত করিয়াছে। প্রতীচ্যের ভাষাবিদগণ ভারত-ভাষাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে লা ক্রোজ (La Croze) তাঁহার অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ সংস্কৃত-ভাষার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জোহান ফ্রিড্রিক (Johan Friedrich) ভারতের বর্ণমালার প্রশংসা করিয়া য়ুরোপকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কাসিয়ানো বেলিগত্তি (Cassiano Beligatti)—দেবনাগর লিপির বৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রশংসা করিয়াছেন। আমাদুতিয়াস (Amadutius)—ভারতের কাশী বিশ্ববিদ্যাপীঠের ভাষা বুলির বর্ণনার দ্বারা প্রতীচ্যের ভাষা-বৈজ্ঞানিকদিগের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। ভাষাবিজ্ঞানী স্যর জর্জ গ্রীয়ারসন বলেন যে, এই বিশাল ভারতের অধিবাসিগণ ভারত ভাষার নাম কেবল 'ভাষা' বলিয়াই জানে।

কিন্তু বিদেশী শাসক ভারতের ভাষাকে খণ্ড খণ্ড করিবার প্রয়োজন বোধ করিল। তাহাদের প্রথম অস্ত্র হইল দাক্ষিণাত্য ও আর্য্যাবর্ত্তকে ভাষার বিরোধিতার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে পরদেশী এই বোধ জন্মাইয়া দেওয়া। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে বি এইচ. হজসন মহাশয় 'Dravidian' বা দ্রাবিড় নামক এক নূতন শব্দের আবিষ্কার করিয়া বসিলেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাষাবিদ্ বলিতেছেন: "তাহার পূর্ব্বে তামিল, তেলেগু, কানাড়ী ও মালয়ালম উপ-ভাষাগুলিকে সংস্কৃত ভাষার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা হইত।"

বিশপ কালডোয়েল আবার বলিয়াছেন, "দ্রাবিড়-ভাষা-সমূহ তুর্কী, ফিনল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে।" আর এক জন কূটনীতিজ্ঞ বলিতেছেন যে, দাক্ষিণাত্য ভারতের অঙ্গই নহে; ইহা অধুনালুপ্ত লীমুরীয় (Lemurian) মহাদেশের এক বিচ্ছিন্ন অংশ।

ভাষা-বিজ্ঞান কিন্তু স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছে যে, প্রাচীন ব্রাহ্মী-লিপি ও তামিল-লিপি একই অভিন্ন লিপি। ভাষা-বিজ্ঞান বলিতেছে, তামিল আর্য্যাবর্ত্তের ভাষা, এবং জৈন-লেখকদের দ্বারা পুষ্ট। তামিল-ভাষা সংস্কৃত শব্দে সমৃদ্ধ। কানাড়ী বর্ণমালাও ব্রাহ্মী হইতে উদ্ভূত। তেলেগু ভাষা অন্ধ্রের ভাষা। ইহাও সংস্কৃত-শব্দপূর্ণ।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভাষাবিদ্ জে. ষ্টিভেনসন দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় আর্য্যভাষায় বহু দ্রাবিড় শব্দ প্রচলিত। আর্য্যভাষার বিস্তৃতি সম্বন্ধে অধ্যাপক হিলব্রাণ্ট (Hille Brant) বলিতেছেন যে, কান্দাহার, অর্থাৎ গান্ধারের পূর্ব্বনাম ছিল আর্য্যযশ (Arachosia), এবং কতিপয় বৈদিক মন্ত্র তথায় রচিত হইয়াছিল।

বিদেশী বণিক-শাসকদের ভারত-ভাষা বলিদানের আর এক শ্মশান আসাম, প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষপুর।

বাংলা ভাষা ও অসমীয়া ভাষার লিপি প্রায় অভিন্ন। কিন্তু ভারতের ঘরভাঙানো বিদেশী, "আমেরিকান মিশনরী প্রেস এই অসমীয়া ভাষাকে বাংলা ভাষার সংস্রব হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে।" (গ্রিয়ারসনের *Linguistic Servey of India*, vol. ix)

স্বদেশীয়ের প্রতি এই ভাবে বিরাগ জন্মাইয়া বন্ধুর ছদ্মবেশে সরলপ্রাণ আসামবাসীদের মন তাহাদেরই একান্ত আপন উন্নত ভারতীয় ভাষা ও সভ্যতার প্রতি বিরূপ করিয়া কৌশলে রোমান বর্ণমালা চালাইবার অশেষ চেষ্টা হইয়াছে। খাসিয়া উপভাষা ইতিমধ্যেই এই ভুল করিয়া বসিয়া আছে।

ভারতের ভাষাবিদ্‌গণ এই বর্ণমালা বিনাশের প্রতিকারের জন্ত চেষ্টা করেন নাই। অথচ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভাষা-বৈজ্ঞানিক পিয়েত্রো দেল্‌লা ভাল্লে (Pietro Della Valle) দেবনাগর বর্ণমালার সহিত ইউরোপকে পরিচিত করান। ইউরোপকে তিনি জানান যে, ভারতের জাতীয় ভাষা, Lingua Indica সংস্কৃত। কিন্তু স্যর আথেলষ্টেন বেন্‌স্—ভারতীয়দের সংস্কৃত-প্রীতি দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলেন। ("He looked askance at this fondness for Sanskrit of the average Indian")। ইতিমধ্যে ইহার প্রতিকারও আরম্ভ হইয়াছিল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গিলক্রাইষ্ট একটি নূতন ভাষার নামকরণ করিলেন। তাহার নাম দিলেন হিন্দোস্তানী, এই ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া ইউল মহাশয় বলিলেন যে, এই হিন্দোস্তানী শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে। তখন অবশ্য ইহার নাম ছিল ইন্দোস্তানী।

ভাষা-বৈজ্ঞানিক কিন্তু বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও হিন্দোস্তানী ভাষার নাম ছিল 'মোয়র' (the Moor's language)। তার পরে ইহার নাম হইল ওর্দু। বিখ্যাত মুসলমান সাহিত্যিক মীর আম্মন ওর্দু ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন যে, কতকগুলি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ও লুঠেরা ছোট ছোট উপজাতির কথ্য ভাষার সংমিশ্রণে এই সঙ্কর-ভাষার জন্ম।

"It is a mongrel mixture of the languages of the tribes who flocked to the Delhi bazar."

গ্রীয়ারসনের মতে তুর্কী-তাতার-মুঘল রক্তে জাত মুঘল নামে পরিচিত সম্রাটদের দিল্লীর প্রাসাদসংলগ্ন, তাতার-তুর্কী-ইরাণী সিপাহীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত বাজারের ভাষা রূপে এই ওর্দু ভাষার জন্ম। ওর্দু শব্দটি ওর্দু-এ-মুয়াল্লা, অর্থাৎ সম্রাটের সামরিক বাজার, এই কথা হইতে উদ্ভূত। তাঁহার মতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজের প্রভাবের ফলেই ওর্দু গদ্যের সৃষ্টি।

"Urdu prose came into existence in the eighteenth century due to English influence."

উত্তর-ভারতের শক্তিশালী সমাজনেতাগণ সনাতন ভারতীয় ধর্ম্মের রক্ষক। তাঁহারা ধর্ম্মবিপ্লবের আশঙ্কায় ধর্ম্মের ব্যবহারিক দিকটাতে এত বেশী ঝুঁকিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মতত্ত্বের মূল বাঁধন যে কোথায় কি ভাবে ছিঁড়িয়া গেল সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবসর পান নাই। তাহার ফলে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থল বারাণসী আজ তাহার নিজের নাম হারাইয়া বসিয়া আছে। আজ আমাদের দেশের গৌরব কাশী বিশ্ববিদ্যাপীঠের নাম সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষায়, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি নামে প্রচলিত।

কাশীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে প্রবাহিত বরুণা ও অসী নদী হইতে বারাণসী নামের উদ্ভব।

ভারতের সার্ব্বজনীন ভাষা লইয়া যে বিতণ্ডা চলিতেছে, তাহা অমূলক। ভারতের ভাষা সম্পূর্ণ জীবন্ত থাকিয়া ভারতকে এক অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহার

রামায়ণ-গান ভারতের ঘরে ঘরে নিত্য গীত হইতেছে। গোস্বামী তুলসীদাস প্রভুর 'রামচরিতমানস' ও ভজনাবলী, সুরদাস প্রভুর 'সুর সাগর' এবং মীরাবাঈয়ের ভজনের ভাষা ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের লোকেই সহজে বুঝে। ইহার কোনটিতেই 'হিন্দু' বা 'হিন্দী' শব্দের উল্লেখও পাওয়া যায় না। ইহাদের ভাষা, ব্রজভাষা, অযোধ্যার ভাষা বা রাজস্থানী ভাষা। এই সকল মূলত: একই ভাষা এবং সংস্কৃত হইতে জাত। ভারতের মূল সংস্কৃত ভাষা হইতে জাত প্রাকৃত ভাষা ক্রমে শৌরসেনী ও মাগধী রূপ ও নাম লইল। মাগধী আবার তিনটি রূপ ধারণ করিল—ওড্র বা ওড়িয়া, গৌড় বা বাংলা এবং আসামী বা অসমীয়া।

শৌরসেনী ভারতের কেন্দ্রস্থলের ভাষা। তাহা কেবল ভাষা নাম লইয়াই সন্তুষ্ট। তাহাই গোস্বামী তুলসীদাসের ভাষা, নাম অন্তর্বেদী।

প্রাকৃতের আর এক রূপ হইল—বৈদর্ভ। বৈদর্ভের দুই রূপ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাতী। তাহার ফলে এই অবস্থা দাঁড়াইল —ভারতের পশ্চিম প্রান্তের ভাষা বৈদর্ভ, পূর্ব্ব প্রান্তের ভাষা মাগধী এবং ইহারা পরস্পর সংযুক্ত হইতেছে কেন্দ্রীয় ভাষা, "ভাষার" দ্বারা।

ভারত-ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পুস্তকে ভাষাবিদ্ গ্রীয়ারসন লিখিতেছেন,—

"ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তস্থিত ডিব্রুগড় হইতে গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া পদব্রজে চলিতে থাক ; ক্রমে বোম্বাই পার হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থিত দরদীস্থান দর্শন কর। কোথাও দেখিবে না যে, এক গ্রামের ভাষা পাশের গ্রামের ভাষা হইতে পৃথক, এই দুই হাজার আট শত মাইল দীর্ঘ পথ এক পরস্পর-বোধ্য ভাষার সূত্রে গ্রথিত।

"অথচ ইউরোপের সুইজারল্যাণ্ডের দুইটি সংলগ্ন গ্রাম, লা ফেরিয়ের এবং লে বোআ (La Ferrier and Les Bois) একই সমতলস্থিত এবং কেবল একটি ঘণ্টার পথ ; অথচ তাহারা পরস্পরের ভাষা বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। একটি গ্রামের অধিবাসীরা শিল্পব্যবসায়ী ও প্রটেষ্টাণ্টধর্ম্মী। অপরটির অধিবাসীরা চাষী ও পশুপালক এবং ক্যাথলিকধর্ম্মী।"

ইউরোপের ভাষার এই অক্ষমতার তুলনায় ভারতের সার্ব্বজনীন ভাষা যুগ যুগ ধরিয়া অতি সুষ্ঠু ভাবে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে।

দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইতেছে এই ভাষার নাম লইয়া। এক শ্রেণীর মত, ইহার নাম হোক 'হিন্দী'। এই হিন্দী নামের জনক হইল 'হিন্দুস্থান' শব্দটি। আবার তাহার জনক হইতেছে 'হিন্দু' শব্দ। পারশীকগণ সিন্ধু শব্দ উচ্চারণ করিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। ভারতবাসীরা তো অক্ষম নহে। তবে তাঁহারা সিন্ধু না বলিয়া হিন্দু বলিতে বাধ্য হইবেন কেন? এখনও ভারতের চৌদ্দ আনা স্থান, হিন্দুস্থান নামে যে অঞ্চল পরিচিত, তাহার সীমার বাইরে। আসাম, বাংলা, ওড়িষ্যা, মাদ্রাজ, সৌরাষ্ট্র, মহাকোশল, এসব অঞ্চল হিন্দুস্থানী বলিতে বোঝে বিহার, আগ্রা, অযোধ্যা ও পঞ্জাবের লোকেদের। রাজপুতানা রাজস্থান ; হিন্দুস্থান নয়।

কাশীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রামদাস গৌড় মহাশয়ের "হিন্দুত্ব" নামক গ্রন্থখানি ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের একটি বিশ্বকোষবিশেষ। মহাপণ্ডিত শ্রীমাধব বিষ্ণু পদাডকর বলিতেছেন, "হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে এমন কোনও বিষয় নাই যাহা এই পুস্তকে যথাস্থানে লিখিত না হইয়াছে।"

পুস্তকখানিতে রামদাস গৌড়জী লিখিতেছেন, "সংস্কৃত ভাষার কোনও অভিধানে হিন্দু বলিয়া কোনও শব্দ নাই। ফারসী-ভাষার অভিধানে হিন্দু শব্দ, এবং এই শব্দ হইতে উদ্ভূত অনেক শব্দই পাওয়া যায়। যথা, হিন্দসা, হিন্দসা, হিন্দুবাণীয়, হিন্দবানা, হিন্দুএচর্ব, হিন্দমন্দ, হিন্দুকুশ, হিন্দবার, হিন্দুবার, হিন্দী, হিন্দুবা ইত্যাদি। সিন্ধুনদ ও তাহার শাখা স্বাত, গোমতী, কুভা, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, ইহাদের মিলিত নাম সপ্তসিন্ধু। ফারসী জবানে তাহা হইল হপ্তহিন্দু। ফারসী-সাহিত্যে হিন্দু শব্দটির সব চাইতে পুরাতন রূপ, হপ্তহিন্দু। ফারসী শব্দকোষে হিন্দু শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে—ডাকু, সেবক, দাস, নাস্তিক ও পাহারাদার।"

লী লায়াল তাঁহার 'হিন্দুস্তানী ভাষার জন্মকাহিনী'—*Sketch of the Hindostan Language*—পুস্তকে লিখিতেছেন যে, হিন্দো শব্দটির পূর্ব্বের রূপ ছিল হিন্দাও। ইহার প্রাচীন পারশীক রূপ, হেন্দব। হেন্দব শব্দের অর্থ, হপ্তহিন্দু দেশবাসী। (এই সপ্তসিন্ধু দেশই সরস্বতী ও দৃশদ্বতী হারাইয়া এখন পঞ্জাব নাম লইয়াছে)।

ওর্দুভাষা সম্বন্ধে ভাষাবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষিগণের মনঃপূত হইবে না, তাঁহারা বলিতেছেন,—

"উচ্চশ্রেণীর ওর্দুতে ব্যাকরণাংশ ব্যতীত আর কিছুই ভারতীয় নয়। অথচ এই ওর্দু বিজেতা-শাসকদের দ্বারা জোর করিয়া ভারতবাসীদের স্কন্ধে চাপানো হয় নাই। হিন্দুজাতির প্রকৃতিগত বস্তু স্বভাবের দরুন তাহারা বিদেশী শাসকের ভাষা ও চালচলন আপনার করিয়া লয়। ইহার লেখকগণও পারশীক বা পারশীক ভাবাপন্ন তুর্কীরা নয়। তাহারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নিজেদের ভাষাতেই সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া গিয়াছে। এই ওর্দুভাষার গ্রন্থকার ছিলেন ফারসী ভাষাভিজ্ঞ কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়গণ।"

এই ওর্দুর দোসর হিন্দী-ভাষার স্পষ্ট রূপও পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই।

ভারত-সরকারের ভাষা-নীতি সমিতির ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চের সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হইয়াছে,—

"ভারতের জনগণের দ্বারা অনুমোদিত শব্দতালিকা তৈয়ারী করিতে আর একবার চেষ্টা না করিয়া হিন্দুস্থানী ভাষাকে ভারতের সার্ব্বজনীন ভাষারূপে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। এই উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানী ভাষার শব্দতালিকা তৈয়ারী করিবার জন্য একটি সমিতি গঠন করা হইল।"

ইন্দোর নগরীতে ১৯৪৬ সনের ১২ই ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী বলিয়াছেন, "দাক্ষিণাত্যবাসিগণ জিজ্ঞাসা করেন যে, যখন উত্তর-ভারতের অধিবাসীরাই এ পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারিতেছেন না যে, হিন্দুস্থানী ভাষার শব্দতালিকায় কোন্ কোন্ শব্দ স্থানপাইবে, তখন আর আমাদের হিন্দুস্থানী শিখিবার জন্য চেষ্টা করিবার প্রয়োজন কি?"

ভারতের ভাষা "ভাষা"কে হিন্দী নামে চালাইবার চেষ্টাতেই এই সকল অনর্থের সৃষ্টি হইতেছে, এই ভাষা-সমস্যার সমাধান হইতে পারে দুই উপায়ে।

প্রথম উপায়, হিন্দী নামের জন্য অন্যায়ভাবে জিদ না করা।
দ্বিতীয় উপায়, ভাষার ভিত্তি বর্ণমালার বখ্যাট মিটাইয়া ফেলা।

সংস্কৃত ভাষার বাহন দেবনাগর অক্ষর ভারতের সর্ব্বত্র পূজ্য ও প্রিয়।

তাহার কারণ ভারতের ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও পুরাণাদি এখনও এই দেবনাগর অক্ষরেই লিখিত ও পঠিত হয়। এই দেবনাগর অক্ষর সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণের দর্দিক (বা পিশাচ) শাখার কাফীর, দরদ, কাশ্মীরী, কোহিস্তানী ও মায়াঁ উপশাখায় ব্যবহার হয়। কিন্তু দক্ষিণে আসিয়া ইহা লণ্ডা, শাপুর, তাকরী, শারদা, গুরুমুখী, জাঠকী, পঞ্জাবী, জাংলী, মুলতানী, সিন্ধী ও মারাঠীতে ব্যবহার হয়। তার পরে গুজরাতী, কাঠিয়ারী, খান্দেশী, রাজস্থানী, ভীলী, ছত্রিশগড়ী, মালয়ালম, কানাড়ী, তেলেগু, তামিল, ওড়িয়া, অসমীয়া, বাংলা, অযোধ্যী, বাঘেলী, ওধী, লাড়িয়া, কনৌজী, গাড়োয়ালী ও ব্রজভাষায় ইহা ব্যবহৃত হয়।

একই জননীর সন্তান, এই সকল ভাষার লিপিমালাকে সুসংস্কৃত করিয়া একরূপে পরিণত করা ভারতের কৃষ্টি, ঐক্য ও সংহতি রক্ষার একমাত্র উপায়।

অনুসন্ধিৎসুগণ দুইখানি পুস্তকে উক্ত ঐক্যসাধন-পথের সন্ধান পাইবেন। পুস্তক দুইখানি 'জীবন-শিক্ষা-পাঠ' বা 'Life Education Service' হইতে প্রকাশিত এবং জীবন-শিক্ষা-পাঠের সভ্যগণকে বিনামূল্যে দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাদের নাম,—(১) বাস্তব ভাষার বিজয় অভিযান ও বৃহত্তর ভারতের জটিল সমস্যার সমাধান (বাংলায়) এবং (২) ভারত-ভাষার স্বরূপ প্রকাশ বা *Lingua Indica Revealed.*

ভারত আজ বিনাযুদ্ধে স্বাধীনতা লাভ করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে আত্মিক বলের অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছে। তাহার এই আত্মিক বলের অন্যতম হেতু তাহার দেবভাষার শক্তি। এই দেবভাষার দেবনাগর অক্ষরের সহিত ভারতের উপভাষাসমূহের আশ্চর্য্য ঐক্যের পরিচয় নিম্নের তালিকা হইতে পাওয়া যাইবে:

গুরুমুখী ভাষা শিখধর্ম্মের পরম আদরের ভাষা। তাহার গ, ট, ঠ প্রভৃতি দশটি অক্ষর দেবনাগর ও বাংলা অক্ষরের মত।

কাশ্মীরের উত্তর ও পশ্চিমাংশের লন্ড ভাষায় হ, ড ও ঙ,—তাকরী ভাষায় চ, ছ, ত, ল—এবং শারদা ভাষার খ, হ, দ, ল প্রভৃতি ঠিক বাংলার অনুরূপ। ইহাদের অন্য আটটি অক্ষর দেবনাগরের অনুরূপ।

দাক্ষিণাত্যের তামিল ভাষার মোট অক্ষর-সংখ্যা পঁচিশ, বারটি ব্যঞ্জন ও তেরটি স্বর। ব্যঞ্জনের ক-বর্গের চারিটি অক্ষর একটি অক্ষরের দ্বারা বোঝানো হয়। ইহার অ, ও, চ প্রভৃতি আটটি অক্ষর।

তেলেগু ভাষায় ই, ও, ক, গ প্রভৃতি বারটি অক্ষর।

কানাড়ীর ত, ন, এ প্রভৃতি নয়টি অক্ষর এবং মালয়ালমের ক, এ, গ প্রভৃতি নয়টি অক্ষর বাংলা অক্ষরের অনুরূপ।

গুজরাতী অক্ষর প্রায় দেবনাগর অক্ষরেরই প্রতিরূপ। পার্থক্য এই যে, ইহার অক্ষরের কোনও মাত্রা নাই। এই ভাষারও ঙ, ঠ, ড প্রভৃতি আটটি অক্ষর দেবনাগরের অপেক্ষা বাংলারই অধিকতর অনুরূপ।

মারাঠী বর্ণমালা দেবনাগরের সহিত অভিন্ন। বরং এক্ষেত্রে দেবনাগরই সুবিধার জন্য তাহার জটিল অ-কার ত্যাগ করিয়া মারাঠীর সরল অ-কার লইয়াছে।

অসমীয়া বর্ণমালা প্রায় বাংলার অক্ষরের সহিত অভিন্ন।

ওড়িয়া ভাষার এ, দ, ল প্রভৃতি আটটি অক্ষর বাংলার সহিত অভিন্ন এবং ক, স, ব প্রভৃতি দেবনাগরের সহিত এক।

বর্ণমালার ঐক্যের জন্য ইংরেজ বালক অনায়াসে ইংরেজীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলে। সমগ্র ইউরোপের ভাষাগুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। ব্যাকরণও তাহাদের ভিন্ন। ফরাসী ও ইটালীয়ানে ক্লীবলিঙ্গ নাই। ইংরেজী, জার্ম্মান, রুষ, লাতিন, গ্রীকে আছে; অথচ বর্ণমালা এক হওয়াতে তাহাদের ভাষা-শিক্ষার প্রধান বাধা অপসারিত।

আর, ভারতের এক রামায়ণ, এক মহাভারত, এক গীতা ঘরে ঘরে পঠিত হইলেও বর্ণমালার বিভিন্নতার প্রাচীর তুলিয়া ভারতবাসী তাহার দেশের ভ্রাতা-ভগিনীকে পরদেশীতে পরিণত করিয়াছে। যেদিন এই সকল প্রাদেশিক ভাষার লিপি এক হইবে, সেইদিন হইতেই সকলের কাছে সকল প্রদেশের ভাষা সরল হইয়া যাইবে। তখন এক প্রদেশ অন্য প্রদেশের ভাষার গুণের পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। এইরূপে এই লিপির ঐক্যের দ্বারা অতি সত্বরই ভাষারও ঐক্য সাধিত হইয়া ভারতের প্রাদেশিকতা লোপ পাইবার পথ সুগম হইবে।

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

পরদিন ১লা মার্চ শনিবার, মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় কয়েক-জন অষ্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। ইঁহারা সাংবাদিক। ইঁহারাও ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইঁহাদের অজ্ঞতা সীমাহীন। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ইহাদের ভীতিমিশ্র বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ভারত-বর্ষে টাটা কোম্পানীর মত বিরাট ইস্পাতের কারখানা আছে, অর্দ্ধ ডজনের উপর এফ.আর এস আছেন, সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মনীষীরা আছেন। আমার প্রমুখাৎ এই সমস্ত সংবাদ শুনিয়া ইঁহারা বিস্ময় বোধ করিতেছিলেন। এক ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির নাম লিখিয়া লইলেন। এদেশে অবশ্য নোবেল প্রাইজ এখনও আসে নাই; এবং এফ. আর. এস-এর সংখ্যাও অনেক কম। ইংরেজের কথা উঠিল। ইঁহারা ইংরেজের প্রতি খুব দরদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রতি এরূপ দরদ নাই কেন তার কারণ জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

আমি পূর্ব্বদিন স্কটকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই ইঁহাদের বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিলাম। কিন্তু তথাপি যেন ইঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না। আমি একটু বিরক্তি বোধ করিতে-ছিলাম। তখন এদেশের বড়লাট নিয়োগ লইয়া সংবাদপত্রে খুব আলোচনা চলিতেছিল। বর্ত্তমান বড়লাট রাজার খুল্লতাত। তাঁহার স্থলে কুইনসল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীকে বড়লাট মনোনীত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে একবার মাত্র এদেশে একজন অষ্ট্রেলিয়ান বড়লাট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন হাইকোর্টের জজ। তাঁহার নিয়োগে সবাই খুশি হইয়াছিলেন। এবার-কার মনোনয়ন লইয়া বড়ই বিতর্ক উপস্থিত। সকলেই অবশ্য অষ্ট্রেলিয়ান বড়লাট চাহেন। তবে দলগত ভিত্তিতে এক জন সক্রিয় রাজনৈতিককে বড়লাট নির্ব্বাচন করায় অনেকেই আপত্তি করিতেছেন। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আমি বলিলাম,"আচ্ছা, আপনারা তো ইংরেজের বড় ভক্ত। এক জন মাত্র ইংরেজ ভদ্রলোক আপনাদের দেশে আছেন। তিনি রাজার খুল্লতাত, নির্বিরোধী এবং শাসন-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করেন না। তথাপি আপনারা এই ভদ্রলোককে বরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না কেন বলিবেন কি?"

তখন ইঁহারা বলিয়া উঠিলেন, "এটা অবশ্য আপনি আমাদিগকে ঠিকই শুনাইয়াছেন।"

সাম্রাজ্যের প্রতি ইঁহাদের মনোভাব যেন খানিকটা ভাবাবেগমূলক। নিউজিল্যাণ্ডেও নাকি এইরূপ। কানাডার কিন্তু এ বিষয়ে অনেক বেশী বিচারশীল মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছি। কানাডা স্বতন্ত্র সিটিজেনশিপ বা নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, প্রিভি কাউন্সিলে আপীল উঠাইয়া দিয়াছে। ইহাতে নিউজিল্যাণ্ডের একটি সংবাদপত্র আপশোস করিয়া লিখিয়াছিল, "আশা করা গিয়াছিল প্রাচীনতম ও বর্দ্ধিষ্ণুতম ডোমিনিয়নটি সাম্রাজ্য-বন্ধন দৃঢ়তর করিতে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে। আমাদের এ আশা আজ ক্ষুণ্ণ হইল।" ইহার জবাবে আটোয়ার 'মর্ণিং জার্ণাল' (১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী) লিখিল, "আমাদের অকল্যাণ্ডের সহযোগীর রসবোধ কম বলিয়া মনে হইতেছে। আমরা সভা করিয়া আইন পাস করিয়া গম্ভীর ভাবে প্রচার করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি কানাডায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহার পিতা এবং পিতামহ এদেশে জন্মিয়াছে সে নিজেকে কানাডীয় বলিতে পারিবে। আর আমাদের অকল্যাণ্ডের সহযোগী বলিতেছেন যে, ইহাতে সাম্রাজ্যের মূল ছিঁড়িয়া যাইতেছে। যাহার তিন পুরুষ কানাডায় জন্মিয়াছে সে নিজেকে কানাডীয় ভিন্ন আর কি বলিতে পারে? আর প্রিভি কাউন্সিলের আপীল উঠাইয়া দেওয়ায় প্রিভি কাউন্সিল নিজে কোন আপত্তি করিলেন না, করিলেন অকল্যাণ্ডের হেরাল্ড।"

ভারতবর্ষে কনষ্টিটুয়েন্ট এসেমব্লি বা বিধান পরিষৎ যখন ভারতবর্ষে স্বাধীন সার্ব্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঘোষণা করিল তখন আমি কানাডায়। ভারতবর্ষের এই সিদ্ধান্তকে কানাডীয়গণ সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইবার সিদ্ধান্ত বলিয়াই প্রথমতঃ মনে করিয়াছিল। কিন্তু তথাপি কানাডীয়-গণ এই সিদ্ধান্তকে বেশ সহজ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। লণ্ডনের কোন কোন কাগজ লিখিয়াছিল যে, এই সিদ্ধান্ত আইনে অগ্রাহ্য। ইহাতে মন্ট্রিয়েলের 'ডেলি ষ্টার' (২৩শে জানুয়ারী, ১৯৪৭) লিখিল, "প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এমন একটি মুহূর্ত্ত আসে যখন আইনের বিচারের মাপকাঠিতে তাহার ফলাফল নির্দ্ধারণ আর সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষে আজ সেই মুহূর্ত্ত উপস্থিত।" মন্ট্রিয়েলের গেজেট লিখিল, "আজ হইতে ভারতবর্ষ প্রাচ্যের অশ্বেতকায় জাতিগণের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা হইল। প্রাচ্যের এই জাগরণ বলপূর্ব্বক দমন করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি দেশীয় নেতাগণ ন্যূনতম দায়িত্বজ্ঞান বজায় রাখিতে পারেন তবে ইঁহাদিগকে ডিমোক্রেসির পথে পরিচালিত করা এখনও সম্ভব।"

অষ্ট্রেলিয়ার সাম্রাজ্যের প্রতি যে ভাবাবেগপূর্ণ মনোবৃত্তি

পরিলক্ষিত হয় তাহার বিশেষ কারণ আছে। অশ্বেতকায় জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত দেশসমূহের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া শ্বেতাঙ্গ-সভ্যতার অবরুদ্ধিসবল ঘাঁটি। জাপানের দ্রুত উন্নতি ইহারা সভয়ে দেখিয়াছে। জাপানের পতনে ইহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে! কিন্তু প্রাচ্য জাতির দ্রুত উন্নতির উদাহরণরূপে জাপানের স্মৃতি এখনও ইহাদের ভয়ের কারণ। ইহাদের জনসংখ্যা মাত্র ৭৫০০০, অথচ শ্বেতাঙ্গ-সভ্যতার বিশিষ্টতা বজায় রাখিতে ইহারা বদ্ধপরিকর। তাহাদের ধারণা অশ্বেতকায় জাতির লোকেদের দেশে অবাধ প্রবেশাধিকার দিলে শীঘ্রই তাহাদের সংখ্যাধিক্য হইয়া পড়িবে এবং ক্রমশঃ শ্বেতাঙ্গ-সভ্যতা দেশ হইতে লোপ পাইবে। দক্ষিণ আফ্রিকা আজ সংখ্যাগুরু অশ্বেতকায় জাতিদের লইয়া বিব্রত। তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে কত ব্যবস্থাই না অবলম্বন করিতে হইতেছে। এই সময়ে রাজারাণী দক্ষিণ আফ্রিকায়। ৩রা মার্চের মেলবোর্ণ হেরাল্ডে অষ্ট্রেলিয়ান এসোসিয়েটেড প্রেসের একটি সংবাদের মধ্যে পড়িলাম, "যখন দরিদ্র অশ্বেতকায় জাতির স্কুল মাষ্টার বান্টু সঙ্গীত পরিচালনা করে, তখন রাণী অবশ্য সহজ মধুর হাসিদ্বারাই তাহাকে পুরস্কৃত করেন। কিন্তু তিনি কি জানেন যে, তাঁহার এইরূপ কর্ম প্রকাশ করা আইনে নিষিদ্ধ ?"

আজ অষ্ট্রেলিয়ার উভয়সঙ্কট। সে অশ্বেতকায় জাতিকে অবাধ প্রবেশাধিকার দিয়া নিজের স্বার্থহানি করিবে? না, বর্ণবিদ্বেষ নীতি দৃঢ়তার সহিত অনুসরণ করিয়া অশ্বেতকায় জাতির শত্রুতা উদ্রেক করিবে? অষ্ট্রেলিয়া অবশ্য দ্বিতীয় পন্থায়ই চলিতেছে, কিন্তু ইহাতে তাহার নিজের মনে এখনও খট্‌কা আছে। তাই ভারতবাসী দেখিলেই ইহারা 'সাদা অষ্ট্রেলিয়া' নীতির দোহাই দেয়, 'সাদা সভ্যতার' ঘাঁটি বলিয়া নিজেদের না ভাবিয়া পারে না। এক দিকে পশ্চিম-ইউরোপ হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় স্থায়ী বাসিন্দা আমদানী করিবার জন্য ইহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, অপর দিকে মরুবহুল অষ্ট্রেলিয়ায় অধিক লোকবসতির উপায় নাই বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। এই কারণেই অষ্ট্রেলিয়ার কল্পনায় সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে একটি সক্রিয় শাসনব্যবস্থা প্রয়োজনীয়। কিন্তু কানাডা সাম্রাজ্যকে সম-রাজ্যরূপেই দেখিতে চায়। চীন ও ভারতবর্ষের প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার দৃষ্টি বিশেষ সজাগ। এই সময় একটি কাগজে লিখিল, "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সাম্রাজ্যের প্রশ্ন। অতএব অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য ডোমিনিয়নের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ইহার মীমাংসা করা উচিত। ব্রিটেন একা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে অন্যায় হইবে।" এই সময় এক দিন পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধের মানচিত্রে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংস্থান দেখিলাম। দেখিয়াই ভারতবর্ষের প্রতি অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মনোভাবের ব্যাখ্যা যেন পরিষ্কার হইয়া গেল। দেশমাতৃকার এমন রূপ ত পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। ভারতমাতার "ভারত মহাসাগরের অধীশ্বরী" মূর্ত্তি যেন অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল।

এই সময় দিল্লী হইতে এক সংবাদ প্রচারিত হইল যে, ভারত-সরকার ভারতীয়গণের অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে অষ্ট্রেলিয়া-সরকারের সহিত আলোচনা করিতে চান। ইহাতে 'সাদা অষ্ট্রেলিয়া' নীতি লইয়া এখানকার সংবাদপত্রে কিছু কিছু আলোচনা হইল। ১লা মার্চের ডেলি টেলিগ্রাফের ম্যাগাজিন সেক্‌সনে এই সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ বাহির হইল। লেখক তাঁহার প্রবন্ধ এই রূপে আরম্ভ করিয়াছেন—

"সেদিন অনেক মার্কিন পর্য্যটক এশিয়ার বিরুদ্ধে প্রাচীর তুলিবার জন্য আমাদিগকে নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যে, 'সাদা অষ্ট্রেলিয়া নীতি' শান্তির অন্তরায়। ইহার উত্তরে আমরা বলিয়াছিলাম যে, ভদ্রলোকটি যে দেশের অধিবাসী সে দেশকে আমাদের মত এশিয়ার জনসংখ্যার চাপ অনুভব করিতে হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর শেষে যখন এশিয়ার জনসংখ্যা দুই শত কোটিতে দাঁড়াইবে এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হইবে তখন মার্কিন ভদ্রলোকেরাও কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়িতে পারেন। অবশ্য তত দিন যদি সর্ব্বসাধারণের ভয়কে তাঁহারা জয় করিয়া ফেলিতে পারেন তবে সেকথা স্বতন্ত্র।"

তার পর লেখক বলিয়াছেন, এ কথা মানিতেই হইবে যে, 'সাদা অষ্ট্রেলিয়া নীতি' একটি বর্ণগত বাধা। আমরা অবশ্য বুঝাইতে চেষ্টা করি যে, সাদা অষ্ট্রেলিয়া নীতির মূলে কোন বর্ণগত প্রশ্ন নাই এবং ইহার কারণ অর্থনৈতিক। এশিয়ার কুলী আসিয়া অল্প মাহিনায় কাজ করিতে সুরু করিলে আমাদের জীবনযাত্রার মান নামিয়া যাইবে, শুধু এই ভয়েই আমরা সাদা অষ্ট্রেলিয়া নীতি অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু আমরা তো কুলী ও ধনীর মধ্যে প্রভেদ করি না। এশিয়ার জীবনযাত্রার মান যদি আজ উঁচুও হইত তবু আমরা সাদা অষ্ট্রেলিয়া নীতি পরিত্যাগ করিতে পারিতাম না। ইহার কারণ সহজ। অষ্ট্রেলিয়াবাসীগণ তাহাদের ইউরোপীয় রক্ত ও কৃষ্টি বিশুদ্ধ রাখিতে চায়। অন্যান্য শ্বেত জাতি অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়ানদের এই ভয় বেশী প্রকট; কারণ অষ্ট্রেলিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান প্রায় এশিয়ারই মধ্যে এবং অষ্ট্রেলিয়া ইউরোপীয় জাতির পৃথিবীব্যাপী শক্তিব্যূহের দুর্ব্বলতম অংশ। সম্প্রসারণকামী এশিয়া নিজের ঘর গুছাইতে পারিলেই এই দুর্ব্বল অংশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে। এক্ষণে ইউরোপীয়গণ আমাদের এই কথা শুনিয়া হাসিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচ্য জাতিগণ যে কত দ্রুত উন্নতি করিয়া ঘর গুছাইয়া শক্তি-সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতে পারে জাপান তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এক দিন এই বিপদ সাদা জাতির অন্যান্য অংশও

জানিতে পারিবে। তখন তাহারা বুঝিবে যে, সাদা অষ্ট্রেলিয়া নীতি শুধু ৭৫ লক্ষ লোকের খামখেয়ালপ্রসূত নয়, ইহা পৃথিবীতে ক্রমবর্দ্ধমান অশ্বেতকায় জাতির পার্শ্বে পাশ্চাত্ত্য জাতির অরক্ষিত অবস্থার প্রতীকমাত্র। অষ্ট্রেলিয়ার 'বর্ণনীতি'তেই এক দিন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শক্তিপরীক্ষা হইবে। শুধু বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জন্যই যে অষ্ট্রেলিয়া এশিয়ার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিবে তাহা নয়; অষ্ট্রেলিয়াকে ঘাঁটি করিয়াই ব্রিটিশ ও মার্কিন শক্তিচক্র ভূমণ্ডল পরিক্রমণ করিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং এশিয়ার অভ্যন্তরে যুদ্ধ চালাইবার সামর্থ্যও লাভ করিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জাতি যে, এই সুযোগ ও সুবিধা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিবেই তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ইংরেজ তাহার প্রাচ্যের সাম্রাজ্য ত্যাগ করিতে সুরু করিয়াছে। চীনকে পূর্ব্বেই ছাড়িয়াছে; শীঘ্রই ভারত-ত্যাগ করিবে। মালয়, বর্মা, ইন্দোচীন ও জাপান ক্রমশঃ পরিত্যাগ করা হইবে। এইরূপে একদিন শ্বেত জাতিকে হয়ত অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডও ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা পরম অপমানকর পরিণাম। কিন্তু অল্প শক্তি লইয়া এশিয়াকে দাবাইয়া রাখা এখন অসম্ভব। ইহা বুঝিতে পারিতেছে না বলিয়াই আজ পাশ্চাত্ত্য শক্তিসমূহ অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সাহায্যে ভূমণ্ডলব্যাপী শক্তিব্যূহ প্রতিষ্ঠিত করিতেছে না।

ইহার পর প্রবন্ধকার বলিতেছেন, হয় তো একদিন মানুষের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইবে। জনৈক দার্শনিক বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত একুশটি সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছে, তন্মধ্যে চৌদ্দটি কালপ্রভাবে বিলুপ্ত। সভ্যতার উৎপত্তি ও বিলোপের হার যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে তবে পৃথিবী ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে আরও ১৫ লক্ষ সভ্যতার উদ্ভব হইবে। দুই শত বৎসর পরে ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে যে জাতিসমূহ বাস করিবে তাহারা হয়ত আর শ্বেতকায় থাকিবে না, হয়ত তাহাদের বর্ণ-সাঙ্কর্য্যের ভীতিও থাকিবে না; কিন্তু আমরা বিংশ শতাব্দীর মনোভাব লইয়াই চিন্তা করিতে পারি। বর্ত্তমানে সাদা জাতির বর্ণসাঙ্কর্য্য-ভীতি, এশিয়া-ভীতি স্বকীয় সভ্যতাপ্রীতি প্রবল। অপর পক্ষে এশিয়াও সাদা জাতিকে ভয় করে; কিন্তু সে ক্রমশঃ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া সাদা জাতির এলাকায় নিজের প্রভাব সম্প্রসারিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া উঠিতেছে। সাদা জাতি যদি হটিয়া যায় তবে অশ্বেতকায় জাতির সম্প্রসারণ বাড়িয়াই চলিবে। পরে ইহা সাদা জাতির অসহ্য হইবে। ফলে যুদ্ধও অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

সাদা জাতি এই সম্প্রসারণে বাধা দিতে চাহিলে শুধু ধাপ্পার উপর বেশী দিন বাধাপ্রদান চলিবে না। ধ্বংসকারী হিংসার হাত হইতে শ্বেতকায় জাতির বাঁচিবার একমাত্র উপায় পূর্ব্বাহ্নেই শক্তিব্যূহ রচনা করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকা। শুধু প্রস্তুত থাকিতে পারিলেই অপর পক্ষ সাদা জাতিকে ঘাঁটাইতে সাহস করিবে না। যুদ্ধ দূরে সরিয়া পড়িবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে মানুষের মনোভাব পরিবর্ত্তনের সময় পাওয়া যাইবে। সাদা অষ্ট্রেলিয়া নীতি এই প্রকার মনোভাবেরই প্রতীক। এই নীতির দায়িত্ব শুধু অষ্ট্রেলিয়ার নয়—সমস্ত সাদা জাতির।

প্রথম বার যখন ক্যানবেরায় ছিলাম তখন আমার ছাতাটি হারাইয়া যায়। হোবার্টে গিয়া ছাতাটির কথা মনে পড়িল। মনে হইল ক্যানবেরার জেনারেল পোষ্ট আপিসে ফেলিয়া আসিয়াছি। জেনারেল পোষ্ট আপিসের মত স্থানে ছাতা ফেলিয়া আসিলে পুনরায় পাওয়া যায় তাহা ভাবিতেও পারি নাই। এবার আসিয়া সেখানে গিয়া ছাতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে জনৈক কর্ম্মচারী ছাতাটি আমাকে দিয়া বলিলেন, "৭।৮ দিন ছাতাটি ঐ স্থানে পড়িয়া ছিল। পরে আমরা ভিতরে আনিয়া রাখিয়াছি।" ছাতাটি পাইয়া যতটুকু আনন্দিত হইলাম, তার চেয়ে অনেক বেশী বিস্মিত হইয়াছিলাম।

এবার ক্যানবেরায় পরাঞ্জপে মহাশয়ের কন্যা শকুন্তলা ও চার-পাঁচ বছরের নাতনীর সহিত আলাপ হইল। পরাঞ্জপে মহাশয়ের খাস সেক্রেটারী ডাক্তার গোরে, তদীয় গৃহিণী ও পুত্র; প্রচারসচিব ডামলে ও তাঁহার গৃহিণী—ইঁহারা সকলেই এবার ক্যানবেরায় উপস্থিত ছিলেন। সপত্নীক ডামলেও ছুটির পর ক্যানবেরায় ফিরিয়াছেন। ইঁহাদের যত্নে ও আতিথেয়তায় দিনগুলি বেশ কাটিল। লাইব্রেরীতে আমার কাজও দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল।

একদিন পরাঞ্জপের গৃহে আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের রাষ্ট্রদূত কিয়ার্ণনের পত্নীর সহিত আলাপ হইল। দেখিলাম আইরিশে ও ভারতবাসীতে ব্রিটিশ-শাসনের কুফল সম্বন্ধে বেশ সহজ ভাবেই আলাপ করা চলে। ব্রিটিশের ট্যাক্স ফাঁকি দিবার জন্য আইরিশ যুবক চন্দ্রালোকে মদ চোলাই করিতে করিতে যে গানটি গাহিত তাহা পরাঞ্জপের নাতনী সুন্দর শিখিয়াছে। গানটি সরল। ইহার মর্ম্মটি এইরূপ :—"আমি ক্ষুধার্ত হইলে খাই, তৃষ্ণার্ত্ত হইলে পান করি। হে চাঁদের আলো, তুমি যদি আমাকে বধ না করো, তবে আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত বাঁচিব।"

কিয়ার্ণন-পরিবার ও আমি একই হোটেলে আছি। পরদিন হোটেলে মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় কিয়ার্ণন-পত্নী তাঁহার স্বামী, কন্যা ও জামাতার সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিলেন।

এক দিন পরাঞ্জপের গৃহে বড় একটি পার্টি হইল। স্থানীয় মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং সমস্ত দেশের রাষ্ট্রদূতগণ এই পার্টিতে নিমন্ত্রিত ছিলেন। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনারের নিমন্ত্রণ হয় নাই। কারণ, সে দেশের সহিত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রগত সম্পর্ক কিছুদিন যাবৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই পার্টিতে অনেকের সহিত আলাপ-পরিচয়

হইল। রুশ দূতাবাসের জনৈক যুবকের সহিত আলাপ করিলাম, বলিলাম "আপনার দেশের খাঁটি খবর পাওয়া বড়ই কঠিন। আমরা যে সমস্ত বই পাই তাহার অধিকাংশই প্রচারাত্মক।" ভদ্রলোক নীরব। কথাটি খুব পছন্দ করিলেন কিনা সন্দেহ হইল। তখন বলিলাম, "আপনাদের দেশের কিছু খাঁটি খবর পাই সর্বপ্রথম আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠিতে। তিনিই প্রথম আপনাদের সাফল্যের চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করেন"—ভদ্রলোক উৎফুল্ল হইলেন। বলিলেন, "হাঁ, রবীন্দ্রনাথের কথা আমি জানি। তিনি যখন রাশিয়ায় যান তখন আমি বালক। আমাদের ভাষায় তাঁহার সমস্ত বইয়ের অনুবাদ হইয়াছে।"

এক দিন পরাঞ্জপ্যের গৃহে রাত্রিতে আহার করিলাম। আমি ভিন্ন অপর চারি জন অতিথি ছিলেন—কেম্ব্রিজের জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপক সার হ্যারল্ড জোন্‌স, এখানকার সরকারী জ্যোতিষ-বিভাগের মার্টিন ও উলি এবং সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের উইলসন। জোন্‌স ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। সেখান হইতে এদেশে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কথা বলিলেন। পরাঞ্জপ্যে তাঁহার আমলের কেম্ব্রিজের কথা বলিলেন, এবং জোন্‌সের নিকট কেম্ব্রিজের বর্তমান অবস্থার কথা আগ্রহের সহিত শুনিলেন।

এক দিন গোরের বাড়ী এবং এক দিন ডাম্‌লের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলাম। ডাম্‌লের বাড়ীতে এবারও এক দিন নিমন্ত্রণ হইল। ভোজনের পর রেডিওতে দিল্লীর গান শুনিলাম। তার পর সবাই মিলিয়া এদেশের পার্লামেণ্টে গেলাম। তখন পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলিতেছিল। ছোট হল। সভ্যসংখ্যা বেশী নয়। অনেকেই অনুপস্থিত। বিরোধীদল বক্তৃতা করিতেছেন। সরকার-পক্ষের নিশ্চিন্ত ভাব। প্রধানমন্ত্রী চিফ্‌লীকে দেখিলাম। সভায় কোন ব্যস্ততা বা সজীবতা লক্ষ্য করিলাম না। খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া হোটেলে ফিরিলাম। ডাম্‌লে, শকুন্তলা, ডাম্‌লে-পত্নী স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

এক দিন ডাক্তার গোরের সহিত তাঁহাদের সামরিক বিদ্যালয় ডাণ্টরুন গেলাম। শহরের অদূরে সুন্দর জায়গায় কলেজটি অবস্থিত। ছোট ছোট কয়েকটি বাড়ী। প্রায় জনশূন্য। গোরে তাঁহার পুত্রকে এখানে ভর্তি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা রাজী আছেন, তবে ভারত-সরকারকে বলিতে হইবে যে, শিক্ষার পর ইহাকে ভারতীয় সৈন্যবিভাগে গ্রহণ করা হইবে। এদেশের সৈন্যবিভাগে ইহাকে লওয়া সম্ভব নয়। যদি ভারত-সরকারও ইহার ব্যবস্থা না করেন তবে ইহার শিক্ষা ব্যর্থ হইবে। সেইজন্যই ইঁহাদের এই সর্ত। নিউজিল্যাণ্ডের সামরিক শিক্ষাও এই কলেজে হয়।

৮ই মার্চ শনিবার সকালে ক্যানবেরা ত্যাগ করিয়া সিডনিতে 'হোটেল অষ্ট্রেলিয়ায়' আসিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন করিলাম। ১১ই মার্চ মঙ্গলবার সিডনি ত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিব। এখানে বিমানের টিকিট ও ডাচ্ 'ভিসা' সংগ্রহ করা ভিন্ন অন্য কোন কাজ নাই। বিমান ওলন্দাজ অধিকৃত স্থানের উপর দিয়া যাইবে বলিয়া তাহাদের 'ভিসা' প্রয়োজন। যে দু'দিন এখানে ছিলাম সান্ন্যাল ও সান্ন্যাল-পত্নীর আতিথেয়তা এবং যত্নে মুগ্ধ হইয়াছি।

সান্ন্যাল মহাশয় এখানে ভারতীয় নাবিকদের তত্ত্বাবধায়ক এবং কার্যতঃ ভারতীয় হাই কমিশনারের সিডনিস্থ প্রতিনিধিস্বরূপ। তাঁহার পত্নী স্বচ্ছ, স্বামীকে ও স্বামীর দেশকে যথার্থই ভালবাসেন। সান্ন্যাল-গৃহিণী আমাকে ক্যানবেরায় পত্রদ্বারা ভোজনের ও থিয়েটার দর্শনের নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শনিবার বৈকালে সান্ন্যাল-দম্পতি আমার হোটেলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা শহরের উপকণ্ঠে তুরা মুরা নামক স্থানে একটি হোটেলে থাকেন। স্থানটি আমার হোটেল হইতে ১০।১২ মাইল। তাঁহাদের সহিত তুরা মুরা গিয়া ভোজনান্তে পুনরায় শহরে আসিয়া থিয়েটার দেখিলাম। থিয়েটারটির নাম মিনার্ভা থিয়েটার। যে নাটকটি অভিনীত হইতেছিল তাহার নাম "মৃত ক্রাইষ্টোফার বিন্‌স্"। মিস মেগ্ জেঙ্কিন্‌স্ নামক লণ্ডনের জনৈক বিখ্যাত অভিনেত্রী প্রধান ভূমিকায় নামিয়াছেন। এখানে থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে কেহ ধূমপান করে না। আটটা হইতে সোয়া দশটা পর্যন্ত থিয়েটার চলিল। ভালই লাগিল। সান্ন্যাল-দম্পতি আমাকে হোটেলে পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় নিলেন। স্থির হইল পর দিন তাঁহারা আসিয়া আমাকে নগরোপকণ্ঠে ভ্রমণার্থ লইয়া যাইবেন।

সিডনি শহরটি প্রশান্ত মহাসাগরের তটভূমিতে অবস্থিত। আশেপাশে অনেকগুলি পাহাড়। অষ্ট্রেলিয়া বহু প্রাচীন দেশ; কাজেই এখানে খুব খাড়া পাহাড় নাই। নগরোপকণ্ঠে পাহাড় ও সমুদ্রের লুকোচুরি খেলা পরম চিত্তাকর্ষক। গাছপালা যথেষ্ট। দূর হইতে গাছ ও পাহাড়গুলি যেন নীলবর্ণ বলিয়া মনে হয়। আমার হোটেলটি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এটিই শহরের সব চেয়ে বড় হোটেল। উত্তরে অদূরে 'সার্কুলার কোয়ে' বা বৃত্তাকার সমুদ্রতীর। সমুদ্রতীরে অনেকগুলি 'হেড' আছে। পাহাড়গুলি মাঝে মাঝে সমুদ্রের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই পাহাড়গুলির সমুদ্রগর্ভস্থ অগ্রভাগকে 'হেড' বা 'মাথা' বলা হয়। বন্দরের নাম পোর্ট জ্যাকসন। ইহা খুব বড় বন্দর। সমুদ্রের একটি 'ইন্‌লেট' বা খাড়ির উপর অবস্থিত। 'সার্কুলার কোয়ে' এই খাড়ির পাড়ে অবস্থিত। ওপারে উত্তর-সিডনি; খাড়ির উপর অবস্থিত একটি বৃহৎ সেতু উত্তর ও দক্ষিণ সিডনিকে সংযুক্ত করিয়াছে। পোলটি সুদৃশ্য। দক্ষিণ সিডনির দক্ষিণে বটানী উপসাগর। পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর।

৯ই মার্চ রবিবার। বেশ গরম পড়িয়াছে। পশমী বস্ত্র পরিধানই চলিতেছে। তবে একটু কষ্ট বোধ হইতেছে। ১১॥টার সান্যালদের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম। 'হারবার' সেতু পার হইয়া উত্তর-সিডনিতে রোজভিলে যেরা স্নানের ঘাটে জনসমাবেশ দর্শন করিয়া, 'ফ্রেঞ্চেস্ ফরেষ্ট' নামক জঙ্গলের মধ্য দিয়া দুইটি পাহাড় ও তন্মধ্যবর্তী দুইটি উপত্যকা অতিক্রম করিয়া দূরে 'ম্যান্‌লি বিচ' নামক বেলাভূমি দেখিয়া একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে আসিয়া পড়িলাম। সার্থক-নামা মহাসাগর পাটির মত পড়িয়া আছে। কোথাও এক একটা পাহাড় জল-মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত আগাইয়া গিয়া খাড়া ভাবে সমুদ্রে নামিয়া গিয়াছে। তাহার উপর সবুজ বৃক্ষশ্রেণী। কোথাও বা মানুষের বাস। কোলুবস স্নানের ঘাটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গচুম্বিত সুন্দর সৈকত। এই স্থান হইতে পাহাড়ের মধ্য দিয়া একটি 'ইন্‌লেট' বা খাড়ির পাড় ধরিয়া চলিলাম। দুই ধারে ঘনসবুজ বনানীসমাবৃত খাড়া পাহাড়। মাঝখানে 'ইন্‌লেট' বা খাড়ি। পাহাড়ের গা দিয়া রাস্তা। পাহাড়গুলি কখনও তরঙ্গায়িত, কখনও বা পাহাড়ের পার্শ্বে গভীর উপত্যকা। খাড়টি কখনও আড়ালে যাইতেছে, কখনও সহসা নয়নপথে পতিত হইতেছে। বেলা ১টায় 'বেন্ডিউ' নামক রেষ্টুরেন্টে চা পান করিলাম। রেষ্টুরেন্টটি উপসাগরের তীরে। দু'ধারে বনানীসমাচ্ছন্ন পাহাড়, মাঝখানে উপসাগর। রেষ্টুরেন্টে বসিয়া পাহাড় দুইটির ফাঁক দিয়া নজরে পড়িল, উপসাগরে বহু ছোট-বড় নৌকা ভাসমান। রেষ্টুরেন্ট ত্যাগ করিয়া হক্‌সবেরি নদীর সেতুর উপর আসিলাম। চারিদিকে পাহাড়। নদীতে একটি ছোট ষ্টীমার চলিতেছে। দূরে রেলের পোল। মনোরম দৃশ্য। তখন বেলা প্রায় ৪টা। মাঝে মাঝে সান্যাল ও সান্যাল-পত্নী হাত-ক্যামেরায় ছবি তুলিতেছেন। এখান হইতে 'রবিন্ হেডে' পৌঁছিলাম। সেখানে লোকের বড় ভিড়। কেহ স্নান করিতেছে, কেহ নৌকা বাহিতেছে, কেহ বন-ভোজনরত, কেহ নৌকায় বসিয়া ছিপে মাছ ধরিতেছে। রবিবারে সর্ব্বত্রই লোকের ভিড়। এখানে গাছের মধ্যে গামই বেশী। বড় বড় ওকও কিছু দেখা যায়। দৃশ্য মনোরম—তবে বৈচিত্র্য কম। গাছগুলি সুন্দর, কিন্তু পর্য্যাপ্ত পুষ্পসমৃদ্ধ নহে। পাখীগুলি সুদৃশ্য, কিন্তু তাঁদের কণ্ঠে গান বেশী শুনিলাম না। কুমারসম্ভবের শ্লোক মনে পড়িল, "প্রায়েন সামগ্র্য বিধৌ গুণানাং পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ।" কু-রিং গাছ পার্কের মধ্য দিয়া 'ভুরাপুরা' পৌঁছিলাম। ফিরিবার সময় আলোকিত সিডনি সহরের পরম মনোরম দৃশ্য চোখে পড়িল। ভোজনের পূর্বে হোটেলে ফিরিলাম। যাতায়াতে ১০০ মাইলের উপর ঘুরিয়াছি। আমাকে হোটেলে পৌঁছাইয়া সান্যাল-দম্পতি গৃহে ফিরিলেন।

১০ই মার্চ রবিবার সহরে ফিরিয়া ভারতীয় ট্রেড কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। ভদ্রলোকের নাম শকসেনা। তিনি আমাকে মধ্যাহ্ন-ভোজন আপ্যায়িত করিলেন। সহরটি বড়, পরিচ্ছন্ন ও কর্মব্যস্ত, এখানে লটারীর রেওয়াজ একটু বেশী দেখিতেছি। লোকেরা রাস্তায় বসিয়া লটারীর টিকিট বিক্রয় করিতেছে। পরদিন যে মহিলা কর্মচারীটি আমার হোটেলের পাওনা বুঝিয়া লইতেছিলেন, আমি কলিকাতার অধিবাসী শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'আঃ! কলিকাতায় সুন্দর একটা রেস কোর্স আছে।"

এখানে অনেক ভারতীয় নাবিক দেখিতেছি। সকলেই খালাসী। বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে। সান্যাল মহাশয় ইহাদেরই তত্ত্বাবধায়ক।

১১ই মার্চ মঙ্গলবার সান্যালের আপিসে গেলাম। সেখানে অনেক ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হইল। কেহ ছাত্র, কেহ ফিজি হইতে ভারতে যাইবার জন্য জাহাজে স্থানসংগ্রহের যোগাড়যন্ত্র করিতে আসিয়াছে। সান্যাল আমার টিকিট ও ভিসা নিজেই সংগ্রহ করিয়া দিলেন। দিবাভাগেই আমার মাল বিমান-আপিসে জমা দিয়া আসিলাম। ব্যাঙ্ক হইতে কিছু ভারতীয় টাকা কিনিলাম; তারপর সান্যাল-দম্পতির সঙ্গে চিড়িয়াখানা দেখিলাম। এখানকার চিড়িয়াখানাটি বেশ বড়। খাড়ির তীরে অবস্থানটি বেশ নয়নানন্দকর। সান্যাল-দম্পতি সন্ধ্যায় আমার হোটেলে আসিলেন। একত্র ভোজন সমাপন করিলাম। ভোজনান্তে সান্যাল-দম্পতি শহরের অনেক স্থানে ঘুরাইয়া দেখাইলেন। যে বিমানে আমি যাইব ইহা ফ্লাইং বোট। জলে নামে এবং জল হইতে উড়ে। 'রোজবে' নামক উপসাগর হইতে উড়িবে. সান্যাল-দম্পতি আমাকে 'রোজবে' পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় দিলেন। সান্যাল-পত্নী বাংলা শিখিতেছেন। বিদায়কালে তাঁহাকে বলিলাম, "কলিকাতায় যখন আপনার সহিত দেখা হইবে, তখন কিন্তু আমরা বাংলায় আলাপ করিব।"

রাত্রি ১১॥ টায় বিমান উড়িল। আলোকমালাখচিত সিডনীর নৈশরূপ আকাশ হইতে অপরূপ মনে হইল।

মূক-শিক্ষা

শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার

উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা মূক-বধির বালক-বালিকাদিগকে যে মানুষ করিয়া তোলা যায়, সে বিষয়ে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই অবহিত নন। এমন কি শিক্ষিত-সম্প্রদায়ও একথা সহজে বিশ্বাস করিতে চান না যে, মূক-বধিরেরা উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে আর দশ জনের মত কথা বলিতে ও অন্যের কথা বুঝিয়া যথাযথ ভাবে উত্তর দিতে পারে। গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের ঔদাসীন্যই আমাদের দেশে মূক-বধির-শিক্ষার আশানুরূপ উন্নতি না হইবার কারণ। সরকারী শিক্ষা-বিভাগও এই হতভাগ্যদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন বলিয়া মনে হয় না।

৬০ বৎসরের চেষ্টায় আজ সারা ভারতে বিভিন্ন স্থানে মাত্র ৪০টি মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা অত্যন্ত কম—মাত্র ১২০০ জন। ভারতে মূক-বধিরের সংখ্যা, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুযায়ী ২৩,০০,০০০। উপস্থিত যে ৪০টি শিক্ষায়তন আছে তন্মধ্যে ১০।১২টি ব্যতীত অন্যগুলি কেবলমাত্র নামেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান; কারণ ঐ সমস্ত বিদ্যালয় উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ও আর্থিক অনটনের জন্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। মূক-বধির বালক-বালিকাদের শিক্ষা দিবার নির্দ্দিষ্ট ও বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি আছে, সুতরাং শিক্ষকগণের এই দিকে উপযুক্ত শিক্ষালাভ ও দক্ষতা অর্জ্জন করা আবশ্যক। যে সকল শিক্ষক এই বিশেষ শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ নহেন তাঁহারা এই কাজের যোগ্য নন।

কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের শিশু-বিভাগ

কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে দুই জন ছাত্রসহ পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল

মূক-বধিরদের শিক্ষা-পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ-রত পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু

বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিক্ষা দিবার উপায় আয়ত্ত করা শিক্ষকদের একান্ত প্রয়োজন। অনভিজ্ঞ শিক্ষকের দ্বারা সুফলের

মূক-বধির বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর এক প্রশ্নের উত্তর বোর্ডে লিখিয়া দিতেছে

পরিবর্তে কুফলই বেশী হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়গুলির আমূল সংস্কার করারও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকৃষ্ট না হইলে উন্নতির আশা করা যায় না।

মূক-বধিরেরা কেবল ভাষার অভাবেই সাধারণের তুলনায় অতি শোচনীয় ভাবে জীবন কাটায়, কিন্তু তাহাকে কথা বলিতে ও ভাষা শিক্ষা দিতে পারিলে সে ঐ অসহায় অবস্থা হইতে নিজেকে অনেকটা উন্নত করিতে পারে। শিক্ষিত মূক-বধিরেরা সর্ব্ব বিষয়ে আর দশ জনের সমকক্ষ না হইলেও

বধির দর্জ্জি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্তের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত দর্জ্জির দোকান

যদি শিক্ষা পায় তাহা হইলে তাহারা আর সংসার ও সমাজের গলগ্রহ হইয়া থাকে না। সুযোগ পাইলে ইহারাও সমাজের অনেক কল্যাণকর কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গদেশে চট্টগ্রাম, রাজসাহী, সিউড়ী এবং কলিকাতা, শ্যামবাজার মূক-বধির বিভালয় এবং কটকের ও কাশীধামের মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপন করেন কতিপয় শিক্ষিত মূক-বধির। মাত্র কয়েকজন শিক্ষিত মূক-বধির নিজেদের স্বার্থত্যাগ, উদ্যম ও পরিশ্রমের দ্বারা তাহা সম্ভব করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনগুলিতে অধুনা বহু অসহায় মূক-বধির বালক-বালিকা মানুষ হইবার সুযোগ লাভ করিতেছে।

এতদ্ব্যতীত শিক্ষিত মূক-বধিরগণ নানাস্থানে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছেন ও যোগ্যতার সহিত নানা প্রকার দায়িত্বপূর্ণ কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছেন।

প্রতিভাশক্তিসম্পন্ন বালক-বালিকাগণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা না পাইলেও অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবে নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারে; কিন্তু যাহার কোন প্রকার

১৯৪৫ সনে কাশীতে মূক-বধির শিক্ষা বিস্তারের প্রাথমিক উদ্যোক্তাগণ

ভাষাজ্ঞান নাই এমন একজন মূক-বধির শিক্ষা না পাইলে কেবল সমাজ ও সংসারের গলগ্রহই হইবে না, ভবিষ্যতে নিজের ছোটখাটো অভাবপূরণের জন্য চুরি প্রভৃতি নিন্দনীয় কার্য্যে লিপ্ত হইবে। সুতরাং মূক-বধিরদিগের শিক্ষার প্রতি রাষ্ট্র-পরিচালকদের মনোযোগী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য দেশে মূক-বধিরদিগের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে এবং ইহাদের শিক্ষার জন্য বহু শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ ইহাদের শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া থাকেন।

সেণ্ট্রাল এডুকেশনাল এডভাইসরী বোর্ডের পরিকল্পিত সার্জ্জেণ্ট রিপোর্টে মূক-বধিরদের সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, মূক-বধিরদের সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্যাদি না পাওয়ায় এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখা হয় নাই। সার্জ্জেণ্ট কমিটি ইহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্যসংগ্রহ করিবার কি প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান লেখকের জানা নাই। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি

বাস্তবিক পক্ষে ঐ কমিটি আন্তরিকতার সহিত তথ্যানুসন্ধান করিতেন তবে প্রয়োজনীয় অনেক সংবাদই তাঁহারা পাইতে পারিতেন। সার্জেন্ট রিপোর্টের উত্তরে নিখিল-ভারত মূক-বধির শিক্ষক সম্মেলনের তরফ হইতে ভারতবর্ষের মূক-বধির বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ এক পরিকল্পনা করেন এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির সঙ্গে আলোচনা করিবার অভিপ্রায়ও জানান, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এসম্বন্ধে কোনই সদুত্তর পাওয়া যায় নাই।

উক্ত সম্মেলনের পক্ষ হইতে বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-দপ্তরে আর একটি পরিকল্পনা দাখিল করা হইয়াছিল এবং তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দ মহাশয় সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সম্পাদক শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার, (বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক) কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীঅটলচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা বি. এম. সেন ও

চট্টগ্রাম ও রাজসাহী মূক-বধির বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা
স্বর্গীয় ভোলানাথ ঘটক

শ্রীঅমলেশচন্দ্র সেন প্রভৃতির সহিত মূক-বধির শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনাও করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্তও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মূক-বধিরদের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে তাঁহাদের কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নাই।

দেশ স্বাধীন হইয়াছে; এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক সৃষ্টি করিবার উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা চাই। এই সময়ে মূক-বধিরদের শিক্ষা-ব্যাপারে যে সকল শিক্ষাবিদ্ সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটি শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রস্তুত করা উচিত। যে মুষ্টিমেয় কর্ম্মীদল এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে

কটক মূক-বধির বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, মূক-বধির শিল্পী
শ্রীবিপিনবিহারী চৌধুরী, এ-আর-সি-এ (লণ্ডন)

বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সহিত সর্ব্বদাই সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত।

সুখের বিষয়, যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি মূক-বধির-দিগের শিক্ষার উন্নতিকল্পে, নিখিল-ভারত মূক-বধির শিক্ষক-সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ এবং লক্ষ্ণৌ মূক-বধির বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চতুর্বেদীর সহযোগিতায় এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত প্রদেশের অধুনাপ্রতিষ্ঠিত এলাহাবাদ মূক-বধির বিদ্যালয় ও লক্ষ্ণৌ মূক-বধির বিদ্যালয় দুইটি বিশিষ্ট মূক-

বীরভূম মূক-বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভৌমিক
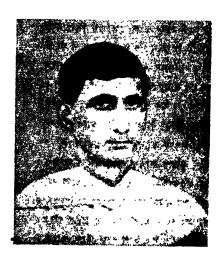
শ্যামবাজার মূক-বধির বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমাখনলাল মজুমদার

বধির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এতদ্ব্যতীত আরও পাঁচ-ছয়টি মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ পরিকল্পনা সমগ্রভাবে কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় "Training College for the Teachers of the Deaf" নামে একটি কলেজ লক্ষ্ণৌ শহরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এক জন অধ্যাপককে মূক-বধিরদের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিবার জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারে পাঠানো হইয়াছে। ইনি বিদেশ হইতে ঐ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া লক্ষ্ণৌ শহরস্থ মূক-বধির কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন। নূতন পরিকল্পনার কার্য্য যাহাতে উপযুক্ত লোকাভাবে বন্ধ না হইয়া যায় তজ্জন্য যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক এবং নিখিল-ভারত মূক-বধির শিক্ষক সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সাময়িক ভাবে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া লইয়া গিয়াছেন। জানুয়ারী মাস হইতে এই কলেজের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আশা করি, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশগুলিও অসহায় মূক-বধিরদের শিক্ষার সম্বন্ধে সচেতন হইবেন।

গ্রামের মেলা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ছোট্ট একটি গ্রাম, ছোট্ট নদীর তীর,
সেথায় বসে মেলা লক্ষ লোকের ভিড়।
কিসের লাগি মেলা? কার লাগি উৎসব?
কোন্ সে মহাত্মার প্রাপ্য এ গৌরব?
বৃদ্ধ জনেক কয়, শুনুন মহাশয়,
সামান্য এক লোক, রাজা উজীর নয়।
লোকটি ছিল ভাল, লোকটি ছিল খাঁটি,
একাই ছিলেন তিনি উজল করে গাঁ'টি।
শিক্ষা দিলেন সবে—হিংসা করা পাপ,
বধবে যারা প্রাণী আনবে অভিশাপ।
গ্রামে যে সব পাখী আছে এবং আসে,
কুলায় যারা বাঁধে বাড়ীর চারি পাশে,
রক্ষা সবাই করো, রক্ষা করা চাই,
তীর্থ করার অধিক পুণ্য তাতে ভাই।
গ্রামের সকল লোকে তখন থেকে আর
মারতো নাক' পাখী, ভাবতো আপনার।
গ্রামের প্রতি ঘরে, গ্রামের প্রতি গাছে
আনন্দেতে সবাই কুলায় বেঁধে আছে।
দুষ্ট বালকরাও মারবে নাক ঢিল
জানে পাখীর দল, ভয় করে না তিল।
হেথায় তারা আছে, যেন মায়ের কোলে
ওই যে তেঁতুল গাছে হাজার বাদুড় দোলে।
ঢাকলে দীঘির জল বুনো হাঁসের ঝাঁক,
পাড়ায় পাড়ায় শুনুন শত পাখীর ডাক।
অযুত কাকের ভেরা গ্রামের বেণু বনে,
নোয়ায় বাঁশের ডগা পুকুর জলের সনে।
বকুল গাছে দেখুন উপনিবেশ বকের,
বটে' হরিয়ালের শিবির দেখুন সখের,
তালের প্রতি শাখায় বাবুই বোনে বাসা,
থাকে ফুলের গাছে টুনটুনিরা খাসা।
চাঁড়াল বাবু খানিক, দেখতে পাবেন গ্রামে
জোড়-মাণিকের দল জোড়ায় জোড়ায় নামে।
সুখে গ্রামেই থাকি, হয় না কোথাও যেতে
বছর বছর ফসল প্রচুর ফলে ক্ষেতে।
এই যে গ্রামের শোভা, শান্তি প্রীতি মধু
আমরা জানি দেওয়া একটি লোকের শুধু।
ছিলেন নাকো ধনী, ছিলেন নাকো বীর,
পরাক্রমে তাঁর হয় নি কেউ অধির।
নয়কো মুনি ঋষি কিন্তু তিনি সব,
মমতাময় প্রাণ ক্ষুদ্র এক মানব।
উপেক্ষাতে লোকে লক্ষ্য করে নাই,
পূজছে আজি স্মৃতি লক্ষ লোকে তাই।

চারি যুগ

শ্রীবিমলাচরণ দেব

বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে দ্বাপরের শেষ ও কলির প্রারম্ভ। দ্বাপর যাই যাই করিতেছে, কলি সবেমাত্র প্রবেশ আরম্ভ করিয়াছে।

আমার এই কথাটা আমাদের পুরাণসঙ্গত ও সাধারণ্যে প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধী। এই প্রচলিত বিশ্বাস বলে যে আমরা এখন ঘোর কলির মধ্যে আছি। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের কিছু পূর্ব্বেই দ্বাপর শেষ হইয়া কলিযুগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু যত দিন শ্রীকৃষ্ণ জীবিত ছিলেন, তত দিন কলিযুগ পৃথিবীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিলে তবে প্রবেশ করিয়াছিল।

এই সর্বজনবিদিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমার উক্ত বক্তব্যের কারণ বলি।

যুগ চারিটি সকলে জানে—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। সত্যযুগে ছিল চার পোয়া ধর্ম। ত্রেতায় এক পোয়া অধর্ম ঢুকিল। ঐ অধর্ম দুই পোয়া হইয়া দাঁড়াইল দ্বাপরে। কলিতে ঐ অধর্ম হইয়া দাঁড়াইল তিন পোয়া। তাই কলিতে মোটে এক পোয়া ধর্ম।

সত্য যুগে চার পোয়া ধর্ম ছিল বলিয়া সমস্তই পুণ্যময়, সমস্তই শান্তি ছিল। পাপ, বিরোধ, ঝগড়া, অসত্য, এ সব কিছুই ছিল না। অধর্ম প্রবেশ করিতেই এই সমস্ত খারাপ জিনিস আবির্ভূত হইল এবং অধর্ম বাড়ার সঙ্গে বাড়িয়াই চলিল।

এখন, স্বতঃই মনে হয়, অধর্ম আসিয়া ঢুকিল কেন? এ পর্যন্ত এই প্রশ্নের জবাব ঠিক কোথাও পাই নাই।

সাক্ষাৎকৃতধর্মা ঋষি কেউ নাই (অন্ততঃ দেখিতে পাই নাই), যিনি এই প্রশ্নের ন্যায়সঙ্গত প্রতিবচন দিয়া সংশয় নিরসন করিতে পারেন। তাহা হইলে, কি করিয়া সংশয় নিরসন হয়? নিরুক্ততে পাই যে, ঋষিরা যখন স্বর্গে চলিয়া গেলেন তখন মানুষ দেবতাদের কাছে এই আবেদন জানাইল, "এখন আমাদের ঋষি হবেন কে?" অর্থাৎ কোনও বিষয় সংশয় হইলে তার নিরাকরণ করিবে কে? তখন দেবতারা মানুষকে তর্কশক্তি দিলেন ও বলিলেন যে, এই তর্কশক্তিই তোমাদের ঋষির কাজ করিবে। অর্থাৎ তোমাদের সংশয়িত বিষয় তোমরা তর্কদ্বারা নির্ধারণ করিবে এবং এই নির্ধারণ ঋষিকৃত নির্ধারণের সমান হইবে। বলা বাহুল্য, এই তর্কশক্তি অনাবিল হওয়া চাই। অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা কলুষিত না হয়। এই রকম অনাবিল তর্কশক্তি যাঁহার আছে, তিনিই "বাগ্মী" হইতে পারেন। "বাগ্মী" কে? যিনি জিজ্ঞাসিত হইলে ন্যায়সঙ্গত ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারেন ও সেই উত্তরের দ্বারা সংশয় ছেদ করিতে পারেন। এই রকম "বাগ্মী"র অপেক্ষায় আছি।

এর মধ্যে (অর্থাৎ কোনও "বাগ্মী"র সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই) নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া না থাকিয়া, একটু না হয় নিজেই ভাবিয়া দেখি। ভাগবত বলিয়াছেন, "যে নিজেকে পুরুষ বলে অভিমান করে, সে তার নিজের গুরু। কারণ সে তার নিজের প্রত্যক্ষ ও অনুমান সাহায্যেই শ্রেয়ঃ লাভ করে।"

এই প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্য লইয়া মানবেতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সত্য সত্যই চারিটি যুগ আছে। তবে তাহাদের নাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি নয়। তাহাদের নাম যথাক্রমে—ক্ষত্রিয় যুগ, ব্রাহ্মণ যুগ, বৈশ্য যুগ ও শূদ্র যুগ। এই চার যুগের কথা সর্বদেশেই প্রযোজ্য, শুধু আমাদের দেশে নয়।

প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, মানবসমাজ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত। সেই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে গবেষণা করিলে এবং প্রাচীন লোকগাথা, ইতিকথা, ইতিহাস, লেখনাদি বিবেচনা করিলে সন্দেহ থাকে না যে, মানবসমাজের প্রথমাবস্থা "জোর যার মুল্লুক তার", "যার লাঠি, তার মাটি"র অবস্থা। যে ব্যক্তি ও যে সমাজ দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ, অর্থাৎ শারীরিক বল ও মানসিক দার্ঢ্যের সমন্বয়ে উচ্চ কোটিতে অবস্থিত, সেই ব্যক্তি ও সেই সমাজই প্রতিদ্বন্দ্বী অপর সমস্ত ব্যক্তি ও সমাজকে পরাভূত করিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে।

এই শারীরিক বল ও মানসিক দার্ঢ্যের সমন্বয়ই ক্ষত্রিয়ের বিশেষ লক্ষণ। এই সমন্বয়ের ফলেই ক্ষত্রিয়ের প্রশাসন সর্বলোকে। এক দিকে যেমন "ব্রহ্মবিদ্যা" আদিতঃ ও প্রকৃত ভাবে ক্ষত্রিয় বিদ্যা এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশপ্রার্থী, অপর দিকে রাজ্যশাসনে একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই অধিকার। এ যেন সেই আদর্শ সময় যে সময়ে "Kings were philosophers and philosophers were kings." জ্ঞান ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয়।

এই সময়ে সমস্ত রাজ্যের জনগণ দুই ভাগে বিভক্ত—উপরে ক্ষত্রিয় ও নিম্নে বিশ্ অর্থাৎ সমস্ত প্রজা। আমাদের প্রাচীন পুস্তকাদিতে যাহা পাই, তাহা হইতে অনুমান হয়

যে, এই ভাবে কিছুকাল চলিবার পর কালক্রমে (অর্থাৎ সমাজ কিছু পরিণত হইবার পর), জনগণের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ, সমাজরক্ষার নীতিগুলি মোটামুটি নির্ধারিত হইল। সমাজকে তথা ব্যক্তিকে ধারণ করে বলিয়া ইহা হইল "ধর্ম"। তাহা ছাড়া আবির্ভাব হইল "স্মৃতি"র, অর্থাৎ পূর্বতন সময়ে কি অবস্থায়, কি উপায় অবলম্বনে বা কি যুক্তি দ্বারা, কোন্ প্রকারের প্রশ্ন বা মতদ্বৈধের মীমাংসা হইয়াছিল, তাহাই "স্মরণ" করিয়া রাখা। তাহা ছাড়া, কালক্রমে আরও একটি জিনিস গড়িয়া উঠিল—"দেশাচার"। এই অবস্থায় যথেষ্ট মতভেদের আবির্ভাব হইল। কিন্তু ব্যবস্থা হইল যে, কোনও প্রশ্ন উঠিলে তাহার মীমাংসা করার চেষ্টা হইবে প্রথমতঃ "ধর্ম" দ্বারা, তাহাতে সম্ভব না হইলে বা তাহার সহিত "স্মৃতি"র বিরোধ হইলে, "স্মৃতি"ই বলবত্তর বিবেচিত হইয়া, "স্মৃতি" দ্বারা। "স্মৃতি" ও দেশাচার পরস্পরবিরুদ্ধ হইলে "দেশাচার"ই বলবত্তর ও নিয়ামক হইবে। কিন্তু সর্বোপরি "রাজশাসন"। "রাজশাসন" যাহা নির্দেশ দিবে, তাহাই কার্যকর, সে-ই "শেষ কথা"। মতভেদ হইলে কোন্ মত নিয়ামক হইবে, এই-ই তাহার ক্রমনির্দেশ। পরমত-সহিষ্ণুতা ও বিচারদ্বারা মতসকলের ক্রমনির্ধারণ এই যুগের বিশেষত্ব। এই কার্য্যে, অর্থাৎ কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসায়, একমাত্র রাজার অধিকার। ব্রাহ্মণ বা আর কাহারও কোনও অধিকার নাই। এইরূপে দেখিতেছি যে, ঐহিক ও পারত্রিক সর্ববিষয়ে জাতির একাধারে একমাত্র ও চরম অবিসম্বাদী নেতা ক্ষত্রিয়। তাহার কথাই "শেষ কথা"।

এইজন্যই মহাভারত বলিয়াছেন যে, "ক্ষাত্রধর্মই লোকজ্যেষ্ঠ" অর্থাৎ সৃষ্টিতে প্রথম ধর্ম ক্ষাত্রধর্ম। অপর সমস্ত ধর্ম এই ক্ষাত্রধর্ম হইতে প্রসূত। এইজন্যই আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নীচে থাকিয়া তাহার উপাসনা করে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের রথ হাঁকায় ও ক্ষত্রিয়কে চামর ব্যজন করে, ইহাও পাই। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের এই পারস্পরিক সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছিল—"যদা বৈ ক্ষত্রিয়ায় পাপং ভবতি, ব্রাহ্মণকল্পোঽস্য প্রজায়াম্ আজায়তে", অর্থাৎ যদি ক্ষত্রিয়ে পাপ প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার বংশে ব্রাহ্মণস্বভাবের সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

এই ক্ষত্রিয়-যুগই যে মানবসমাজের সর্বোজ্জল যুগ, সত্যযুগ, সন্দেহ নাই। ইহা অবিসম্বাদী সত্য যে, ব্যক্তিরই হউক, আর সমাজেরই হউক, যত দিন শারীরিক বল ও মানসিক দার্ঢ্য এবং উভয়ের সমন্বয় অটুট থাকিবে, তত দিনই ব্যক্তির ও জাতির সর্বপ্রকার সুখশান্তি, সত্তার সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি। এই অবস্থাতে সত্য সত্যই, আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী দুটি বস্তু, অর্থাৎ ভুক্তি (বা ভোগ) ও মুক্তি (বা মোক্ষ), যুগপৎ তাহার আয়ত্ত। সত্তার সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির জন্য সে যেমন "আশিষ্ঠ", অর্থাৎ কর্মে ক্ষিপ্র ও সর্বপ্রকার ভোগে প্রকৃষ্টভাবে সক্ষম, তেমনই সর্বপ্রকার ভয়ভীতি, বন্ধন, বাহিরের শত্রুপ্রভাব এবং নিজ অন্তরের নীচ বা হীন ভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তারই প্রাণের কথা "অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতম্"। "আমি মুক্ত", "আমি দীন হীন নহি", এই বৃত্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সে দৃঢ়ভাবে বলে "যাহা নিজে প্রত্যক্ষ জানিব, তাহাই লইব। পরের মুখে ঝাল খাইব না।" এই সময়কার শতপথব্রাহ্মণে এই ভাবের কথা বেশ জোরের সহিত বলা আছে—দুই জনের মধ্যে যদি এক জন বলে "অহমদর্শম্", আমি দেখিয়াছি, এবং অপর জন বলে "অহমশ্রৌষম্", আমি শুনিয়াছি, প্রথম ব্যক্তিকে, অর্থাৎ যে "অহমদর্শম্" বলে, তাহাকেই বিশ্বাস করিব।

আমার মনে হয়, জনক রাজা এই অবস্থারই "ব্যক্তি-রূপ"-এ মূর্ত বা চিত্রিত। "এদিক ওদিক দু' দিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটী"। এই অবস্থা একমাত্র পূর্ণ ক্ষত্রিয়েরই সম্ভব। আর, এই অবস্থার ব্যক্তি বা জাতির সংস্পর্শে যে-ই আসিবে, প্রাকৃতিক নিয়মে তাহার কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

দেখিতেছি এই যুগের বিশেষত্ব মতভেদ ও পরমত-সহিষ্ণুতা। মানুষ থাকিলেই মতভেদ থাকিবে। কিন্তু ক্ষত্রিয় এই মতভেদকে মতবিরোধে পরিণত হইতে দেয় নাই। ধীরভাবে বিচার করিয়া এই সমস্ত মতের পারস্পরিক বলের ক্রমনির্দেশ করিয়া দিয়াছিল এবং সর্বোপরি রাজশাসন দৃঢ়মুষ্টিতে সমস্ত ধরিয়া ছিল বলিয়া সমাজ এলাইয়া যাইতে পারে নাই।

ক্ষত্রিয়হস্তধৃত "দণ্ড" কঠোরভাবে দণ্ডায়মান। রাজ-শাসননির্দিষ্ট পথ ভিন্ন অন্য কোনও পথে কাহারও যাওয়া অসম্ভব।

এই যুগের অধিদৈবত ক্ষত্রিয় এবং প্রতীক খাপখোলা তলোয়ার।

এমন সোনার সত্যযুগ, "ক্ষত্রিয়যুগ" গেল কেন ? স্বতঃই প্রশ্ন মনে আসে।

আমি যেটুকু জানি তাহাতে একমাত্র চরক সংহিতাতে সত্যযুগ চলিয়া গিয়া ত্রেতাযুগ আসার কারণ নির্দেশের চেষ্টা পাই। চরকেও মোটে ত্রেতা পর্য্যন্ত আছে। দ্বাপর বা কলির কথা নাই। যাহা হউক, সত্যযুগ চলিয়া যাইবার

কারণ বলা হইয়াছে যে, সত্যযুগের শেষাশেষি, ভাল রকম খাওয়া-দাওয়ার দরুন, কাহারও কাহারও "শরীরগৌরব" হইল, অর্থাৎ শরীর ভারী হইয়া পড়িল। তাহা হইতে শ্রম, শ্রম হইতে আলস্য, আলস্য হইতে সঞ্চয়, সঞ্চয় হইতে পরিগ্রহ ও পরিগ্রহ হইতে লোভ আবির্ভূত হইল। তার পর ত্রেতা যুগ আসিয়া পৌঁছিলে, লোভ হইতে অভিদ্রোহ, অভিদ্রোহ হইতে অমৃতবচন, অমৃতবচন হইতে কাম, ক্রোধ, মান, দ্বেষ, পারুষ্য, অভিঘাত, ভয়, তাপ, শোক, চিত্তোদ্বেগ প্রভৃতি সব আসিল।

এ কেমন মনে লাগে না। কেহ কেহ ভাল রকম খাওয়া-দাওয়া করিল, কাহারও কাহারও "শরীরগৌরব" হইল। বাকি সকলের হইল না কেন? সত্যযুগে যখন সকলে সমান ধার্মিক, তখন "কেহ কেহ", এ রকম পার্থক্য হয় কেন?

কাজেই এই ক্ষত্রিয়যুগ ভ্রংশের কারণ নির্ধারণ জন্য স্বতন্ত্রভাবে মানবেতিহাসের বিবেচনে আসিতে হয়। আদিম মানবের মনোবৃত্তি অপরাপর জন্তুর মনোবৃত্তি হইতে অল্পমাত্র উপরে ছিল, এ কথা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। এই কথাই শতপথব্রাহ্মণ উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন বলিয়া মনে হইল যখন তাহাতে পাইলাম যে, প্রথমসৃষ্ট জীব তাহার প্রথম শব্দ উচ্চারণ করিল (অর্থাৎ প্রথম শ্রোত্রগ্রাহ্য বাক্ উচ্চারণ করিল) ভয়ে "ভ্যাঁ" করিয়া। এইরূপে দেখিতেছি, শ্রুতিগোচর বাক্-এর উৎপত্তি ভয় হইতে।

এইভাবেই, ধর্মেরও উৎপত্তি ভয় হইতে। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উদ্দাম বেগ ও তৎকৃত বিপর্যয়ে মানুষ বিহ্বল ও ভীত হইয়া পড়ে। ইহা হইতেই ভয়নিবারণ জন্য সেই সমস্ত শক্তির উদ্দেশে স্তবস্তুতি। সভ্যতার উন্নতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই স্তবস্তুতি ফলাও হইয়া ক্রমে পূজা যাগরূপে যজ্ঞাদি পরিণত হয়। তারপর মানুষের চিন্তাশক্তির পরিণতির ফলস্বরূপ ক্রমে এক সর্বব্যাপী শক্তির অনুভব। এই সমস্তের মূলে আদিম ভয়।

এইরূপে যাহা পাই তাহাতে দেখি যে, এখানে ক্ষত্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই স্তবস্তুতি, যজন, যাগযজ্ঞাদি নিজেরাই করিতেন। কালক্রমে ব্যক্তিবিশেষ কোনও সময়ে নিজের যজনের সহিত পরের যাজন করিলেন। এইরূপে নিজের কাজের সহিত পরের কাজ করা ক্রমে ব্যাপক ভাবে হইয়াছিল এবং তাহার ফলে যাজন অর্থাৎ পরের জন্য যাগযজ্ঞাদি করিবার জন্য একটা শ্রেণীর আবির্ভাব হইল। এই শ্রেণীই ক্রমে বিশ্ হইতে পৃথক্ হইয়া, পরবর্তী সময়ের "ব্রাহ্মণ"-এর মূল রূপ।

আমার মনে হয়, এই শ্রেণীর উত্থানেই মানবসমাজে প্রথম শ্রেণী-স্বার্থ ও ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি এবং কালক্রমে এই শ্রেণীর অভ্যুত্থানে সেই ঝঞ্ঝাটের পরিণতি ও চরম ফল,—ক্ষত্রিয় ও তৎসহ সমগ্র জাতির অবনতি। এই উত্থান ও অভ্যুত্থান এবং তাহার চরম ফল যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। ক্রমে বলিতেছি।

যখন এই শ্রেণীর উত্থান হইল, সেই শ্রেণীভুক্ত লোকেরা স্বাভাবিক নিয়মেই নিজ শ্রেণীর স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হইল। এই অবহিত হওয়ার দুটি প্রধান ফলের কথা বলি। প্রথমটি—এই নিয়ম হইল যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নিজের নিজের যজন করিতে পারিবে। কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কাহার যাজন করিতে পারিবে না। অপরের যাজন করার অধিকার একচেটে ব্রাহ্মণের। দ্বিতীয় ফল হইল, যজমান লইয়া যাজকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি। যজমান নামী যাজকের দ্বারা যজ্ঞাদি করাইতে উৎসুক বটে, কিন্তু যাজকদের মধ্যে রেষারেষি নামী (অর্থাৎ দাতা) যাজককে লইয়া ভীষণ। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই মহাভারতে, দেবযাজক বৃহস্পতি ও তাঁহার ভ্রাতা সম্বর্তের ব্যাপার রাজা মরুত্তকে লইয়া। প্রথমে মরুত্ত বৃহস্পতিকে অনুরোধ করিলেন যাজন করিতে। কিন্তু বৃহস্পতি প্রত্যাখ্যান করিলেন এই বলিয়া যে, তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের যাজক, মরণধর্মী মানুষের যাজন করিবেন না। তাই তাঁর ভ্রাতা মরুত্ত গেলেন সম্বর্তের কাছে। সম্বর্ত মরুত্তের যাজক হইতে রাজী হইলেন। তার পরই বৃহস্পতি শুনিলেন, মরুত্ত এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন, সে ব্যাপার "অতিমানুষ", তাহাতে সমস্ত ভাণ্ড সোনার। ইহা শুনিয়া বৃহস্পতি বিবর্ণ ও কৃশ হইয়া গিয়া ইন্দ্রকে বুঝিয়ে ধরিলেন, যাহাতে তিনি বৃহস্পতিকে যাজক করিতে মরুত্তকে রাজী করান। ইন্দ্র প্রথমে অগ্নিকে ও তার পর গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে পাঠাইলেন মরুত্তকে রাজী করাইবার জন্য। বলা বাহুল্য, পর পর দুই জনই নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

যজমানের জন্য যাজকের এই আকুলি-বিকুলির কথা বেশ একটু শ্লেষের সহিত পাই ঋগ্বেদে যেখানে বলা হইয়াছে —"সকলেই নিজের নিজের ধান্দায় ঘুরে বেড়ায়। ছুতোর খুঁজে বেড়ায় কার কাঠের জিনিস ভেঙেছে, মেরামতের কাজ পাব; বৈদ্য খুঁজে বেড়ায়, কোথায় রোগী পাই; আর ব্রহ্মা (যাজক) খুঁজে বেড়ায়, কে যজ্ঞ করবে।" মনে হয় যে, মনুসংহিতায় যেখানে "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই"কে শাস্ত্রসম্মত বলা হইয়াছে, তারও মূল উদ্দেশ্য যজমানসংখ্যা বাড়ানো। কারণ সেখানে বলা হইয়াছে "পৃথগ্ বিবর্ধতে ধর্মঃ", অর্থাৎ ভাইয়েরা সকলে একসঙ্গে থাকিলে সকলে মিলিয়া মোটে একপ্রস্থ ধর্মানুষ্ঠান হইবে, কিন্তু তাহারা

আলাদা হইয়া যাইলে ধর্ম বাড়িবে, অর্থাৎ প্রত্যেক ভাইয়ের একপ্রস্থ করিয়া ধর্ম হইবে, অর্থাৎ যতগুলি ভাই, তত গুণ ধর্মানুষ্ঠান। "The more the merrier." এই সঙ্গে যাগ-যজ্ঞাদির আড়ম্বরবৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক দক্ষিণা প্রভৃতিতে ব্যয় বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী রূপে হইল।

এইটি হইল এই শ্রেণীর স্বার্থপ্রণোদিত সক্রিয়তার বাহ্য রূপ। এই বাহ্য রূপ জাতির পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর। কারণ ইহার ফল যজমানের কিছু ধন হস্তান্তর মাত্র।

কিন্তু এই অর্থ হস্তান্তরের ফলে যাজকের যে অবস্থা হইল, তাহা তাহার পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নহে। ইহা সর্বতোভাবে স্বীকৃত হইল যে, যাজক যজমান দ্বারা "ক্রীত" বা "পরিক্রীত", সাদা বাংলায় "ভাড়াটে"। ক্রমে যাজকের এই হীন অবস্থা যখন ভাল রকম উপলব্ধি হইল, তখন পাই যে, দেবীর পূজার জন্য পুরোহিত নিযুক্ত করিলে দেবী রুষ্টা হন ও যজমানের সর্বার্থহানি হয়।

যাহা হউক, যাজকের এই সক্রিয়তা যদি বাহ্য রূপেই (অর্থাৎ যজমানের কিঞ্চিৎ ধন যাজকের হস্তে যাওয়া) থাকিয়া যাইত ত দুঃখ ছিল না। কিন্তু এই সক্রিয়তার একটা আভ্যন্তরিক কার্য ছিল এবং তাহাই দেশের ও জাতির সর্বনাশ করিয়াছে। এই আভ্যন্তরিক কার্যের উদ্দেশ্য ছিল কি না, বা কি ছিল, তাহা অনুমানসাপেক্ষ। কিন্তু নিশ্চিত ফল হইয়াছিল ক্ষত্রিয় ও তৎসহ সমস্ত জাতিকে দৈববাদী ও তাহা হইতে, প্রচুর যাগযজ্ঞাদি দ্বারা, দৈবতোষক করিয়া তোলা। বলা বাহুল্য, দৈববাদী ও দৈবতোষকের সংখ্যা যত বাড়িবে ততই যাজকের শ্রীবৃদ্ধি।

মনে হয়, কোনও কোনও আকস্মিক ঘটনা যাজকের এই সক্রিয়তা আরম্ভের সুযোগ দিয়াছিল। যেমন, দুই দলে যুদ্ধ আসন্ন, এমন সময় হঠাৎ একটা ঝড় বা বৃষ্টি আসিয়া একটা দলকে অসুবিধায় ফেলায় অপর দল সহজে জয়ী হইল। যাজক জয়ীকে বলিল, "আমি অমুক দেবতাকে তোমার কল্যাণার্থে পূজা করায় তিনি তোমার সাপক্ষে এই আকস্মিক ঘটনা ঘটাইয়াছেন ও তাঁহার কৃপাতেই তোমার জয়লাভ হইয়াছে।" এই ভাবের আকস্মিক ঘটনা গোটাকতক ঘটিলেই দৈববাদ ও দৈবতোষণ প্রচার কার্য জোরে চলিল। মানবসমাজে স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক-রূপে ভাঁওতার আবির্ভাব বোধ হয় এই প্রথম।

এই দৈববাদ ও দৈবতোষণ নীতির ফলস্বরূপ ক্ষত্রিয়-যুগের বীর্যব্যঞ্জক "অহমদর্শম্" লোপ পাইল ও তাহার স্থলে আসিল ঠিক উল্টা, অন্ধকার ধূম্রময় "অ-দৃষ্ট"। "অহম-দর্শম্" ও "অ-দৃষ্ট" পরস্পর একান্তবিরোধী। যতক্ষণ "অহমদর্শম্" থাকিবে, ততক্ষণ "অ-দৃষ্ট", দৈববাদ দূরে থাকিবে। একবার "অহমদর্শম্"কে তাড়াইয়া তাহার স্থলে "অ-দৃষ্ট"কে স্থাপিত করিতে পারিলে দৈববাদ ও তাহার সহিত দৈবতোষণ জাঁকিয়া বসিবে। তাহাই হইল।

প্রত্যক্ষকে দূর করিয়া "অ-দৃষ্ট" লইয়া খেলা আরম্ভ হইল। প্রত্যক্ষকে ধরিয়া কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করা যায়। "অ-দৃষ্ট" সে পরীক্ষার একেবারে বাহিরে। এই নির্ভাবনার সাহসে "অ-দৃষ্ট" সম্বন্ধে নিরঙ্কুশ ভাবে নানাপ্রকারে নানা আকারে জল্পনা-কল্পনা, গল্পরচনা (অল্পবিস্তর আষাঢ়ে) হইতে লাগিল। এই সমস্ত জল্পনা-কল্পনা গল্পাদি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন আকারে হওয়ায় তাহাদের পৌর্বাপর্য বা বা সত্যাসত্য অনুসন্ধান বা নির্ধারণ অসম্ভব। কালে ইহাও দাঁড়াইল যে, এই সবের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও পাপ। নির্বিচারে বিশ্বাস কর।

নিরন্তর এই প্রচারকার্যের ফলে ক্ষত্রিয় যে কেবলমাত্র স্বধর্মচ্যুত হইল, তাহা নহে। সম্পূর্ণ স্ববিরোধী কর্মে প্ররোচিত হইল। ক্ষত্রিয়ের ধর্মে দৈববাদ ও ভিক্ষা একান্ত নিষিদ্ধ, এবং ক্ষত্রিয় সর্বাবস্থায় অভী, মন্যুমান্, অমর্ষ-পরায়ণ। মহাভারতে আছে যে, যদি কোনও ক্ষত্রিয়ের সর্বনাশ করিতে চাও, তাহা হইলে তাহার কাছে নিরন্তর দৈবের মাহাত্ম্য কীর্তন কর। তাহা হইলে সে ক্রমে দৈব, দেবতার উপর নির্ভর করিয়া নিরুৎসাহ, নির্বিরোধী, নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িবে। কতক স্থানে আছে যে, ক্ষত্রিয় নিজ অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট পর্যন্ত প্রতিগ্রহ করে না, কাহারও নিকট প্রার্থনা বা ভিক্ষা করা ত দূরের কথা। কাহারও নিকট কিছু চাহে না। যদি নেহাত বলে "দেহি", ত এক-মাত্র "যুদ্ধং দেহি", অপর কিছু নহে। যে অভী নহে, যে নির্মন্যু নহে, যে ভিক্ষা করে, সে ক্ষত্রিয়ই নহে। অমর্ষ ক্ষত্রিয়ের আর একটি বিশেষ লক্ষণ। কাহারও দ্বারা অপকৃত হইলে কখনও সে কথা বিস্মৃত হয় না।

এ হেন ক্ষত্রিয় দৈববাদী হইয়া পড়িল। "ক্রতু" শব্দের আসল অর্থ ভুলিল এবং তাহার যাজকস্বার্থানুকূল অর্থ অবশ ভাবে গ্রহণ করিয়া নানারূপ যাগযজ্ঞাদি করিতে তাহার সমস্ত প্রাণমন, সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিল। যাহার ভিক্ষা করা একান্ত নিষিদ্ধ, সে দেবতার নিকট "দেহি, দেহি" করিয়া আকাশ ফাটাইতে লাগিল। দৈববাদের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আসিল ভিক্ষাবৃত্তি।

এই "দেহি, দেহি" ফলে হইল এই যে, মানুষ যে শুধু নিজেকে অত্যন্ত হীন করিয়া ফেলিল তাহা নহে। এ পর্যন্ত দেবতারা বরাবর মানুষের সঙ্গে একত্রে মর্ত্যে বাস করি-তেন, কিন্তু মানুষের এই "দেহি দেহি"র উৎপাতে তাঁহারা

"ত্রাহি ত্রাহি" রবে মর্ত্য ছাড়িয়া স্বর্গে আশ্রয় লইলেন। এ কাহিনী আছে শতপথব্রাহ্মণে। কাজেই এই ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা কাহারই কল্যাণ হয় নাই।

ভিক্ষাবৃত্তি সমস্ত অমঙ্গলের মূল। এই বৃত্তি যাহাকে পায়, সে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে। পরের কাছে যত না হোক, নিজের কাছে সে অত্যন্ত হীন হইয়া পড়ে। আত্মসম্মান, আত্মসম্ভাবিতভাব তাহাকে ত্যাগ করে। কোথাও বা প্রত্যাখ্যান, কোথাও বা ভিক্ষালাভ, ইহাতে সে আরও দৈববাদী হইয়া পড়ে। ভয় আসিয়া প্রবেশ করে তাহার মনে। মন্যু বা অমর্ষ সেই ব্যক্তির কি করিয়া হইবে?

এইরূপে যাজকের স্বার্থপ্রণোদিত সক্রিয়তার ফলে ক্ষত্রিয়ের অকথ্য অবনতি হইল। ক্ষত্রিয় তাহার নিজস্ব বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ ভাব বিসর্জন দিয়া হীন হইতে হীনতর হইতে চলিল। এবং যাজক? "তলের মামুদ উপরে উঠিল"। সমাজে ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইল এবং ক্ষত্রিয় প্রথম হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবনীত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট হাত জোড় করিল।

এই-ই দ্বিতীয় বা "ব্রাহ্মণ যুগ" বা "ত্রেতাযুগ"।

এই ব্রাহ্মণযুগ শ্রেণীপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য পুরাতন পুস্তকাদির পরিবর্তন, পরিবর্জন, প্রক্ষেপাদি দ্বারা "সংস্করণ" ও নূতন নূতন অল্পবিস্তর আষাঢ়ে গল্প রচনার যুগ, ইহা কেহই ন্যায়সঙ্গত ভাবে অস্বীকার করিতে পারিবে না। ক্ষত্রিয়ের ক্রমবর্ধমান হীনভাবের সুযোগ লইয়া "সংস্করণ" ও রচনা দ্বারা ব্রাহ্মণ নিজেকে বিশ্ হইতে পৃথক করিয়া লইল এবং নিজেকে অদণ্ড্য ও অকর করিয়া লইল। এইরূপ কর্ম যে এই অবস্থায় স্বাভাবিক, তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

অবস্থাটা এই—ক্ষত্রিয় রাজ্যশাসনই বোঝে ও তাহাতেই ব্যস্ত। লিপিকরণ ও পুস্তক-রচনা ব্রাহ্মণের হাতে এবং তাহার সহিত ক্ষত্রিয়ের কোনও সম্পর্ক নাই। রাজ্যশাসন ব্যতীত অপর সমস্ত কার্যে ক্ষত্রিয়ের শুধু উদাসীনতা নহে, অবর্ণনীয় অবজ্ঞা। এইরূপ অবজ্ঞাপ্রসূত মনোবৃত্তি সম্বন্ধে একটি সত্য ঘটনা শুনিয়াছি। পুরুষানুক্রমে যুদ্ধব্যবসায়ী অভিজাতবংশীয় একটি ভদ্রলোক একবার আদালতে সাক্ষ্য দিবার সময় জিজ্ঞাসিত হন, "এই সহি কি আপনার?" তাহাতে তিনি তিক্ত শ্লেষের সহিত উত্তর দেন, "উও মুন্সীকা কাম হ্যায়"।

ক্ষত্রিয়যুগে ব্রাহ্মণের রূপ ও ব্রাহ্মণযুগে ব্রাহ্মণের রূপ পাশাপাশি রাখিলে একটা দেখিবার জিনিস বটে। অনবধানতাবশতঃ বা যে কোন কারণে হউক, "সংস্করণ" কোনও কোনও কথা একেবারে লোপ করিতে পারে নাই। এই জন্য ক্ষত্রিয়যুগে ব্রাহ্মণের রূপ সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু তথ্য পাই। এই রূপের কিছু উল্লেখ উপরে করিয়াছি এবং ইহাও দেখাইয়াছি ক্ষত্রিয় কি চক্ষে ব্রাহ্মণকে দেখিত।

ইহা ছাড়া অথর্ববেদে যাহা পাই তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ক্ষত্রিয় মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণের গরু লইয়া গিয়া খাইয়া ফেলিত এবং ব্রাহ্মণের স্ত্রীকে লইয়া গিয়া নিজ অবরোধভুক্ত করিত। এই সমস্ত ব্যাপারে ব্রাহ্মণ যাহা করিত, তাহাকে "নাকে কাঁদা" ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তখনও বোধ হয় "এক চাহনিতে ভস্ম করা" বা "শাপ দিয়া বিকট একটা কিছু" করার গল্প গজাইয়া উঠে নাই।

এইবারে ব্রাহ্মণযুগে ব্রাহ্মণের রূপচিত্রণ দেখি। এই রূপচিত্রণের দৌড় এক নৃগরাজার গল্পেই পরিস্ফুট। এক ব্রাহ্মণের গরু নৃগরাজার গরুর পালে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। রাজা তাহা না জানিয়া ঐ গরু অপর এক ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। পরে সেই গরুর মালিক প্রতিগ্রহকারী ব্রাহ্মণের ঘরে সেই গরুকে দেখিয়া নৃগের কাছে নিজ গরু দাবি করিল। নৃগ এক সহস্র গরুবিনিময়ে প্রতিগ্রহকারীর নিকট ঐ গরুটি চাহিলেন। সে ব্রাহ্মণ দিতে রাজী হইল না। তখন গরুর মালিককে নৃগ এক সহস্র গরু আরও কত কিছু দিতে চাহিলেন। সে প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া গেল, তাহার সেই গরুটি চাই। নৃগ গিরগিটি হইয়া গেলেন। কোন্ অপরাধে বুঝা যায় না। তবে মোদ্দা কথা লেখা আছে "খবরদার, ব্রাহ্মণের জিনিস অজান্তেও ছুঁইও না। গিরগিটিত্ব প্রাপ্ত হইবে।" উপরে লিখিত অথর্ববেদের বর্ণনা হইতে কত দূর!

এই জাতীয় আর একটি সৃষ্টি এই ব্রাহ্মণ-যুগের—পরশুরামের আষাঢ়ে গল্প। তিনি নাকি একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। এক বার নয়। একুশ বার। কাল যে ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়ের সামনে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি, আজ সেই ব্রাহ্মণ নাকি সেই ক্ষত্রিয়কে একুশ বার নির্বংশ করিতেছে। ক্ষত্রিয়যুগে ক্ষত্রিয়ের নিকট হীনভাবে থাকার প্রতিক্রিয়ায় এই গল্প রচিত এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

তবে, পরশুরাম সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায় আলোচনা করিলে একটা কথা উদ্ধার হয়। পরশুরাম বলিয়া এক ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের ঠোকাঠুকি হইয়াছিল এবং উপরে লিখিত "সংস্করণ"-এর হাত হইতে যে দুইটি ঘটনা বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, পরশুরাম অন্ততঃ দুই বার বেশ জব্দ হইয়াছিলেন। এক বার, দশরথ-

পুত্র কিশোর রামের কাছে। সে বার পরশুরামের পরশু নাড়িবারও সুবিধা হয় নাই। অপর বার ভীষ্মের কাছে। সে বার একচোট যুদ্ধের পর পরশুরামের পিতৃগণ আসিয়া পরশুরামকে বাঁচান। তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বেশ প্রণিধানযোগ্য। পরশুরামকে বলিলেন, "ভীষ্মকে যুদ্ধে হারানো তোমার পক্ষে 'শক্য' নয়"। অর্থাৎ তোমার ক্ষমতায় কুলোবে না।" অপর পক্ষে, ভীষ্মকে বলিলেন, "পরশুরামকে যুদ্ধে হারানো তোমার পক্ষে 'ন্যায্য' হবে না।"

এই হীনবৃত্তি (অর্থাৎ সংস্করণ করিয়া নিজের শ্রেণীর প্রাধান্য স্থাপন ও অপর কোনও শ্রেণীকে হেয় করার চেষ্টা) বেশ স্থায়ী হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক একটা উদাহরণ দিই। "প্রভু" অর্থাৎ মরাঠা কায়স্থরা রাজ্যশাসন ও যুদ্ধে অসাধারণ দক্ষতা দেখানোতে ব্রাহ্মণেরা বড় মনোব্যথা পাইলেন। অতএব কায়স্থদের হেয় করার উদ্দেশ্যে কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়া সহ্যাদ্রিখণ্ডে জুড়িয়া দিলেন। তখন সে দেশ বিজাপুরের নবাবের অধীন। কায়স্থরা নবাবের কাছে অভিযোগ করিতে নবাব বলিলেন যে তিনি মুসলমান, কাজেই কাশী হইতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত না আনিলে তিনি কিছু করিতে পারেন না। উভয় পক্ষ গেলেন কাশীতে। সেখানে পরীক্ষকেরা বলিতে বাধ্য হইলেন যে, সহ্যাদ্রিখণ্ডের ঐ অংশ নিছক জালিয়াতি।

আবার উল্টা দিকে, কাহাকেও খুশি করিতে হইবে— যেমন, মণিপুরের মহারাজা। মহাভারতে আছে মণলুর। নাম দেখিয়াই বেশ বোঝা যায় যে, দ্রাবিড় দেশের নাম। মহাভারতে মণলুরের যে অবস্থান বর্ণনা, তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্থানটি কলিঙ্গ ও মহেন্দ্রপর্বতের দক্ষিণে এবং সমুদ্রের নিকটে। মণিপুরের মহারাজাকে খুশি করিবার জন্য "মণলুর"কে "মণিপুর" বানানো হইল এবং তাহাকে চালান দেওয়া হইল দ্রাবিড় দেশ হইতে আসাম-ব্রহ্মের সন্ধিস্থলে ও সমুদ্র হইতে বহু দূরে।

এই যুগের এই রকম কৃতিত্বের আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। কতক পাওয়া যাইবে "প্রবাসী" ৩৩শ ভাগ, (১৩৪০), ২য় খণ্ড, পৃ, ৬৯০। অথচ এই ব্রাহ্মণযুগেরই অমর কীর্তি, জ্ঞান ও কৃষ্টির সর্বদিকে অসাধারণ অগ্রগতি এবং অসংখ্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-রচনা।

এ যুগের বিশেষত্ব অবাধ চিন্তাস্বাধীনতা, মত-অমত অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে একাধিক ও কমবেশী পরস্পর-বিরোধী মত। ক্ষত্রিয়যুগের পরমতসহিষ্ণুতা এখনও চলিতেছে। এই পরমতসহিষ্ণুতা না থাকিলে দড়িছেঁড়া চার্বাকমত এবং বেদবহির্ভূত অনাত্ম বৌদ্ধ ও জৈনমত, এ সমস্ত "হিন্দুদর্শন" মধ্যে পরিগণিত হইত না। মতভেদ থাকিলেও মত লইয়া পরস্পর কাটাকাটি বা মতবিরোধীকে ধরিয়া বাঁধিয়া পোড়ানো (যাহা পাশ্চাত্ত্যে খুব হইয়াছিল) সেইটি এদেশে হয় নাই।

তবে এই অবাধ চিন্তাস্বাধীনতার দুইটি বিষম কুফল ফলিয়াছিল। প্রথম কুফল—মতভেদের প্রাচুর্য্য ও "অরাজকতা"। যে যাহা ভাবে, নিজ "মত" বলিয়া প্রচার করে ও নিজ প্রাধান্যস্থাপন জন্য আবশ্যক মত কুতর্ক দিয়া তাহা সমর্থন করে। ক্ষত্রিয়শক্তি হীনবল, মতগুলির পারস্পরিক বলের ক্রমনির্দেশ করিয়া দেয়, এমন শক্তি দেশে নাই। কাজেই মতগুলি স্ব স্ব প্রধান। প্রত্যেকের একটি করিয়া দল। কেহই কাহারো অপেক্ষা কম নহে। মতের "অরাজকতা"।

এইরূপে মতসকলের মাতামাতি ও একত্রাবস্থানে ভাবসাঙ্কর্য্য ও ক্রমে তাহা হইতে সকলপ্রকার সাঙ্কর্য্য আবির্ভূত হইয়া সমাজকে দূষিত করিয়াছিল।

দ্বিতীয় কুফল—এই সমস্ত মতের সমর্থনচেষ্টায় পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, পক্ষে এই, বিপক্ষে এই, এই সমস্ত বলা কওয়া, ওজন করা, এই সবের বাড়াবাড়ি হইয়া পৌঁছিয়াছিল অবশেষে নব্যন্যায়ে, যাকে শ্লেষ করিয়া কেউ কেউ "গব্যন্যায়" বলে, অর্থাৎ নিছক জাবর-কাটা, "পাত্রাধার তৈল, তৈলাধার পাত্র" শুষ্ক ঘানি ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতেছে চোখবাঁধা বলদ। আশেপাশে কি আছে বা হইতেছে, বা অবস্থা বুঝিয়া কি করা উচিত, দেখিবার বা ভাবিবার ইচ্ছা বা শক্তি নাই। খাটিয়াই মরিতেছে। কিন্তু সমস্তই ভাবরাজ্যে। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকারই মধ্যে। কাজেই উৎপন্ন হইতেছে খালি "ক্যাঁচ" আর "কোঁচ"। তর্ক করিতে করিতে, যুক্তি কাটাকাটি ও ওজন করিতে করিতে, সরু কাটিতে কাটিতে জীবন কাটিয়া গেল। কাজ করিবার সময় আর হইল না। তর্কেই সব শক্তি খরচ হইয়া গেল। কাজ করিবার জন্য বাকি কিছু রহিল না। এই বিষটা ব্যাপকভাবে সারা জাতিটাকে পাইয়া বসিল। যাহার ফলে জাতটা অ-দৃষ্ট আর তর্কে মাতিয়া ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব ভুলিয়া গেল। আর, বিদেশী এই সুযোগে আসিয়া ঘাড়ে চাপিল প্রায় নির্বিবাদে।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া মনে পড়িয়া গেল 'as others see us.' অনেক দিন পূর্বে পড়া এক জন জার্মান লেখকের একখানি বইয়ের ইংরেজী অনুবাদে পড়িয়াছিলাম। তাহাতে এক জায়গায় আছে,—

We can very well imagine how to the subtle mind of the Greek of the period of decadence any decided course of action became difficult, if not impossible. The fault with him was not that he was not able to grasp the political questions with which he was confronted,

but that he grasped them so well that he was able to conceive endless solutions to them. Ways out of his difficulties he could find in numbers; but he lacked the will-power and determination to carry out any one of them with consistency. He could see not only one side of a question, but infinite sides. His misfortune was to see not only the pros of a course of action, but the cons too; and by the time the balancing of this advantage against that drawback was complete, the moment for action was gone by. He had to pay the penalty for his over-subtlety, which could not only split a hair, but split again into five or six the hair which had already been split countless times before. It was thus that the Greek, after the Roman conquest, became the little Graeculus of his victor, who was found useful as a tutor or an office-clerk, to be treated with a certain sort of mild contempt. We can quite understand the double current of feeling which we see running through Roman minds, an admiration of Hellenic culture at its best, the culture on which all Roman intellectual progress was based, and a contemptuous disdain for its latter-day representatives. The Greek under the later Roman Republic and the beginning of the Empire stood very much on the same footing as the Babu of contemporary India, another very typical example of the effects of over-intellectuality."

—Emil Reich, *Success Among Nations*, pp. 102-103.

অপরের চক্ষে আমাদিগকে কিরূপ দেখায়, উপরি-উদ্ধৃত অংশে তাহা পরিস্ফুট।

এই হইল ত্রেতাযুগ। এ যুগের অধিদৈবত যাজক ও প্রতীক কচকচিমিশ্রিত ঘণ্টাধ্বনি। দেশে ভর করিয়াছে "অ-দৃষ্ট", "বায়ুভূতো নিরাশ্রয়:", একেবারে ফাঁকা ও ফাঁকি, বাস্তবের সহিত ক্ষীণতম সম্পর্ক।

যাহা হউক, এই রকম "দীয়তাং ভুজ্যতাং" সভাসরগরম-করা কচকচি, দক্ষিণা, প্রণামী প্রভৃতি লইয়া বেশ দিনকতক চলিল। কিন্তু এইবারে বৈশ্য মাথা নাড়া দিল। বৈশ্য দেখিল যে, কৃষি, পাশুপাল্য, কুসীদাদি দ্বারা সে ধন উৎপাদন করিতেছে। ব্রাহ্মণের যতই টাকা থাকুক, সে অ-কর। কাজেই প্রধানতঃ বৈশ্যের কাছেই কর আদায় প্রভৃতি দ্বারা একদিকে রাজার রাজ্যশাসন এবং অপরদিকে রাজা ও ব্রাহ্মণের সদক্ষিণ সাড়ম্বর যজ্ঞাদি সমস্তই চলিতেছে। সে বলিল, তাহারই টাকায় যখন সব চলিতেছে, তখন তাহারই প্রাধান্য হওয়া উচিত।

এই আরম্ভ হইল তৃতীয়, দ্বাপর বা বৈশ্যযুগ। বর্তমানে বৈশ্য (পূর্ণ ও ভগ্নাংশ) দ্বারাই পৃথিবীর অধিকাংশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই যুগের লক্ষণ দেখি যে, কর্তা নিজ বৃত্তিনির্দ্ধারিত লক্ষ্যে ঠিক পৌছেন, কিন্তু কখনও সোজা রাস্তায় নয়। ডাহিনে পাশ কাটাইয়া, বামে পাশ কাটাইয়া, পিছু হাটিয়া, তলা দিয়া, সর্বপ্রকারে, কেবল সোজা রাস্তায় নয়। এরই ঠিক বিপরীত ভাব মনে পড়িয়াছিল যখন আল্হার গীত পড়ি। এই গীত যুক্তপ্রান্তে প্রচলিত। তখন রাজপুত্রকে তাঁহার প্রেমপাত্রী রাজকুমারী বলিলেন, "অমুক রাজার নিকট নওলাখা হার আছে; আনিয়া আমাকে দাও।" কুমার তাঁহার বয়স্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই ত, কি করিয়া সংগ্রহ করি?" বয়স্য জবাব দিলেন, "কি করিয়া? তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ? ক্ষত্রিয় হইয়া কিছু চাহিতে পার না। যুদ্ধ করিয়া মারিয়া লইয়া আসিবে।" রণজিৎ সিংহের কথা "কোহিনূর কা কীমৎ? পাঁচ জুতি"! যত বড়ই হউক, পূর্ণই হউক আর ভগ্নাংশই হউক, বৈশ্যের পক্ষে এ মনোবৃত্তি সম্ভব নয়। তার সমস্ত সত্তা চেষ্টা করিলেও এ ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবে না। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করা ত দূরের কথা।

এই বৈশ্যযুগের অবদান—রাষ্ট্রে "অর্থকরী রাজনীতি" অর্থাৎ রাজনীতিতে আসার আসল উদ্দেশ্য ভাঁওতা দিয়া বেশ কিছু অর্থোপার্জন। বৈশ্যের একমাত্র কাম্য অর্থ। উপায় সম্বন্ধে চিন্তিত বা লজ্জিত হইবার আবশ্যকতা নাই।

দুই-চারিটা উদাহরণ দিই। Black-birding অর্থাৎ আফ্রিকা হইতে নিগ্রোদের ধরিয়া আনিয়া গরু-বাছুরের মত বিক্রয় ব্যবসা আরম্ভ করার কৃতিত্ব ইংরেজের এবং তাহার ভাঁওতা—"নিষ্কর্মা অসভ্য লোকগুলা বৃথা জীবন-যাপন করে। তাহাদের দিয়া দ্রব্য উৎপাদন করাইলে তাহাদের উন্নতি ও মানব জাতির শ্রীবৃদ্ধি যুগপৎ হইবে"; "এই ব্যবসা অতি পবিত্র উদ্দেশ্যে করা হইতেছে, এই ভাঁওতায় খ্রীষ্টীয় পাদরী কর্তৃক 'blessing of slave-ship';" "অবাধ বাণিজ্যে বাধা দিয়া চীন অর্থশাস্ত্রমতে পরম অধর্মকরিতেছে",এই ভাঁওতায় চীনের সহিত ইংরেজের "অহিফেন যুদ্ধ", যাহার "লুট" হইল হংকং; অসভ্যকে সভ্য করিবার ভাঁওতায় একে একে 3 G's প্রেরণ অর্থাৎ প্রথমে তাহাদের নিকট Gospel প্রেরণ, তাহার পিছনে পিছনেই Gin ও তাহার পিছনে পিছনেই Gunboat। গত দুই শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক আরব্ধ প্রত্যেক যুদ্ধ—আসলে নিজ নিজ ব্যবসা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে, কিন্তু একটা না একটা নৈতিক ভাঁওতায়।

এ দেশেও ব্যাপার ঠিক এই। তবে দেশকালপাত্র ভেদ থাকায় বাধ্য হইয়া ভাঁওতার রকমফের একটু আলাদা। সর্বত্রই এদেশে ও বাহিরে কর্মক্রম এক। অর্থই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য; যদি ঐ অর্থের জন্য অনর্থ ঘটাইতে হয় ঘটাইব, সঙ্কোচ করিলে চলিবে না; পরম্পর-

বিরোধী বহুপ্রকার ভেক ও বুলি আড়ালে মজুত রাখিব এবং দরকারমত লইব ও ছাড়িব।

এই যুগের নীতি—"ইহকাল, পরকাল, সত্য, কৃতজ্ঞতা, নিজ দেশ, জাতি, সব কথার কথা; এ সব কিছুই ভাবিও না। যাহা অর্থ নহে বা অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা করে না, তাহাই অনর্থ, তাহাই হেয় ও বর্জ্য। যে-ই তোমার অর্থোপার্জনের পরিপন্থী হইবে, সে-ই তোমার পরম শত্রু।"

এই নীতির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সমাজে একটি দুর্লক্ষণের প্রথম আবির্ভাব। এই দুর্লক্ষণটি পরমতা-সহিষ্ণুতা। ইহাই এই বৈশ্যযুগের নিজস্ব লক্ষণ। ইহা অশেষ অশুভের আকর। কিন্তু ইহা অনিষ্ট, অপ্রিয় ও অপ্রার্থনীয় হইলেও, সৃষ্টিতে অন্য অন্য সকল বস্তু ও ভাবের মত ইহারও উৎপত্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মে। ইহার উৎপত্তির ক্রম বলিতেছি।

পূর্বেই দেখিয়াছি, ক্ষত্রিয়যুগে সমাজনিয়ামক স্বরূপে যথাক্রমে ছিল ধর্ম, স্মৃতি ও দেশাচার বটে; কিন্তু ইহাদের সকলের উপরে ছিল রাজশাসন। তাহার উপর কোনও কিছু ছিল না, কাজেই শেষ পর্যন্ত কোনও গোলমাল ছিল না।

তৎপরবর্তী ব্রাহ্মণযুগে বহু মত হইয়াছিল। কিন্তু মতভেদ থাকিলেও, পরমতসহিষ্ণুতা থাকায়, মতবিরোধ ছিল না।

কিন্তু তৎপরবর্তী বৈশ্যযুগে অর্থসম্বন্ধে স্বার্থসঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই স্বার্থসঙ্ঘর্ষ ততটা ক্ষত্রিয়ের বা ব্রাহ্মণের সহিত নহে, যতটা শূদ্রের সহিত। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে যাহারা শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে তাহারাও শূদ্র পর্যায়ভুক্ত, বলা বাহুল্য।

এই স্বার্থসঙ্ঘর্ষের মূলে বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে মতভেদ অর্থের উৎপাদন ও বিভাগ লইয়া। শূদ্র বলিল, "আমি নিজ শ্রমদ্বারা দ্রব্য উৎপাদন করি। তাহার ন্যায়সঙ্গত ভাগ তুমি আমাকে দাও না এবং প্রার্থনা করি যে ন্যায়সঙ্গত ভাগ আমাকে দাও।" স্বাভাবিক নিয়মে এই মতভেদ মতবিরোধে পরিণত হইল। এই মতবিরোধ এতই তীব্র হইল যে উভয় পক্ষই মারমুখো। এক জন বলিল—Strike, অপর জন বলিল—Lock-out.

এই তীব্র বিরুদ্ধভাবের ফলে সঙ্ঘবদ্ধ ও উচ্চতর স্তরে অবস্থিত ও শক্তিসম্পন্ন বৈশ্য নিম্নতর স্তরে অবস্থিত ও সঙ্ঘশক্তিহীন শূদ্রের মতের প্রকাশ বন্ধ করিবার, এমন কি দমন করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। এই উদ্দেশ্যে রাজশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া রাজশক্তির নামব্যবহারে দমনের নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবনা করিল।

এই হইল তৃতীয় বা দ্বাপর বা বৈশ্যযুগ। এই যুগের অধিদৈবত আত্মবঞ্চক, আত্মবিক্রয়ী বৈশ্য এবং প্রতীক দাঁওতামণ্ডিত টাকা।

এইবারে শূদ্র মাথা নাড়া দিল। সে ক্ষীণভাবে যে মত ব্যক্ত করিয়াছিল প্রার্থনার আকারে, ক্রমে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সে সেই মত ব্যক্ত করিল দাবির আকারে। বৈশ্য তাহার একান্তবশংবদ সহকারী ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ সাহচর্যে, এই দাবি অস্বীকার করিল। ফলে আত্যন্তিক সংঘর্ষে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-সহায় বৈশ্যশক্তিকে পরাভূত করিয়া শূদ্রশক্তির স্থাপন। বৈশ্যযুগের নাভিশ্বাস উপস্থিত।

এই স্থানে মনে পড়ে এ বিষয়ে কৃতিত্ব ইংরেজের। প্রতীচ্যের সমস্ত দেশের মধ্যে প্রথমে ইংলণ্ডেই শূদ্র রাজ-সভাসদের আবির্ভাব। মনে আছে ১৯০৪-১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে একটি মাত্র Labour Member ছিলেন, তাঁহার নাম Joseph Arch, আর এখন? এখন সারা পৃথিবীতে সর্বত্রই সোভিয়েট হাত বাড়াইতেছে। কি হইবে অনুমানসাপেক্ষ। শূদ্রযুগ প্রবেশ করিতেছে।

তাই বলিতেছিলাম, দ্বাপর যাই যাই করিতেছে, কলি সবেমাত্র প্রবেশ আরম্ভ করিতেছে।

লিপিতত্ত্ববিশারদ জেম্‌স্ প্রিন্‌সেপ
(মর্ম্মর-মূর্ত্তি হইতে শ্রীপরিমল গোস্বামী কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটো।
বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে)

বলীদ্বীপের মন্দির-নৃত্য

ক্যান্টন শহরের উপকণ্ঠে নদীতে শাম্পানের উপর ভাসমান পল্লী

বর্তমান ক্যান্টনের রাস্তায় প্রাচীন আমলে তৈরি পাই লাউস বা কারুকার্য্যখচিত তোরণ

প্রবাহ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

মঞ্জুষা চলিয়া গেল বটে, কিন্তু সারাটা পথ শুধু মৃন্ময়ের আহ্বান তার কানের কাছে ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল। "আমার কথা আছে—মঞ্জু দাঁড়াও" কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিয়া লাভ কি। শুধু একই কথার পুনরাবৃত্তি বৈ ত নয়। ধৈর্য্য থাকে না। সে অনবরত শুধু স্তুতি করিবে আর মৃন্ময় বারংবার যুক্তি দেখাইবে—ইহা তর্কস্থলে মূল্যবান হইলেও মঞ্জুষা আহত হয়। না হয় সে ভুলই করিয়াছে, কিন্তু তার অনুরোধের কোন মূল্যই কি নাই? মঞ্জুষা ভাবে, মৃন্ময় হয়ত ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে ব্যথা দিতেছে। নহিলে এই সাধারণ ব্যাপার লইয়া এত কথার সৃষ্টি হইত না। কিন্তু সেও বুঝাইয়া দিবে যে, মঞ্জুষা এসব গ্রাহ্য করে না। অথচ সঙ্গে সঙ্গে অগ্রাহ্য করিবার যত কল্পনাই মঞ্জুষা করুক না কেন গভীর রাত্রে একলা ঘরে এই কথা নূতন করিয়া ভাবিতে বসিয়া তাহার দু-চোখ জ্বালা করিয়া জল আসিয়া পড়িল। মৃন্ময় তাহার সাদর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তার অন্তরের নির্দ্দেশ প্রত্যেক বারেই মৃন্ময়ের যুক্তিতর্কের জালে জড়াইয়া পড়িয়া অচল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মনের আবেদন এত হিসাব করিয়া চলে না। অধিকারের দাবি আসিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, গণিতশাস্ত্রের চুলচেরা হিসাব সেখানে নিছক অর্থহীন।

মঞ্জুষা নূতন করিয়া ভাবিতে বসে। মৃন্ময় কি কেবল যুক্তিতর্কই দেখাইয়াছে? না যুক্তি তার আবেদনের রূপ লইয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে নিজেও কিছু কম স্বার্থপর নয়, নহিলে মৃন্ময়ের দিকটা একবারও ভাবিয়া দেখিতেছে না কেন। হয় ত এই সময় এক সপ্তাহের ক্ষতি মৃন্ময়ের কাছে নিতান্ত অবহেলার নয়, অথচ তাহাদের সহিত না যাওয়ায় কোন ক্ষতিবৃদ্ধিই হইবে না। তা ছাড়া এই সাধারণ ব্যাপারটা লইয়া মঞ্জুষা যেন কতকটা বাড়াবাড়ি করিতেছে। মৃন্ময় হয় ত এই কথাটাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে চাহে। কিন্তু মঞ্জুষা তার একগুঁয়েমির জন্য এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি করিতে চাহে না। কথাটা মৃন্ময় নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই। অযথা দশ জনকে বাজে কথা সৃষ্টির সুযোগ দিয়া লাভ কি। তার নিজের মা কি ভাবিয়াছেন কে জানে? হয় ত মেয়ের এই প্রকাশ্যভাব লজ্জা ঢাকিতে গিয়াই তাহাকে নিঃশব্দে মানিয়া লইয়া একটা সহজ পরিস্থিতির উদ্ভব করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অকস্মাৎ মঞ্জুষা যেন নিজের কাছেই অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। তবে সান্ত্বনা এই যে, তার ছেলেমানুষির সাক্ষী আছে শুধু মৃন্ময় এবং তার মা—যাদের কাছে তার লজ্জা আপনিই ঢাকা পড়িয়া যাইবে। তবুও এই একলা ঘরে মঞ্জুষা নিজেকেই বারংবার ধিক্কার দিল। কালই সে মৃন্ময়ের নিকট ক্ষমা চাহিয়া আসিবে।...দ্বিধা...সঙ্কোচ...

এ এক মজা বটে! মঞ্জুষা জানে এখানে তার দ্বিধা অথবা সঙ্কোচের কোন প্রয়োজন নাই। তবুও বাধা আসিয়া প্রতি পদে গতিরোধ করিয়া দাঁড়ায়। এই অনাবশ্যক দ্বিধা এবং সঙ্কোচ যে ব্যক্তিগত জীবনে কত বড় পরিবর্ত্তনের সৃষ্টি করে একথা সকলেই অনুভব করে, কিন্তু অভ্যাসের জের কাটাইয়া উঠা সহজ নয়। তাই পরিবর্ত্তন, তাই ভুল বোঝা, অন্যায় সন্দেহ করা—অবিচার করা। মঞ্জুষা বসিয়া বসিয়া এমনি কত কথাই ভাবিতেছিল।

ঘরের মধ্যে জমাট অন্ধকার—শুধু চুণকামের সাদা পোঁচগুলি চোখে পড়ে। মঞ্জুষা জানালা দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। কোথাও জনমানবের সাড়া নাই। শুধু থাকিয়া থাকিয়া অস্ফুট একটি গানের সুর তার কানে ভাসিয়া আসিতেছিল। কি জানি কার কণ্ঠস্বর—হয় ত রাধু বোষ্টমের। এমনি রাত-বিরেতে তারস্বরে গান করিবার তার অভ্যাস আছে। মিনুদা বলে, রাধু বোষ্টম রোজই গভীর রাত পর্য্যন্ত গান গায়। কথাটা হয় ত সত্য। কিন্তু মঞ্জুষার আজ কি হইয়াছে, এমন সামান্য কারণে এতটা বিচলিত কোনদিন সে হয় নাই। মৃন্ময়কে সন্দেহ করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু কিছু দিন হইতেই কেমন একটা অস্বস্তিকর চিন্তা তার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ইহাকে না পারা যায় ঝাড়িয়া ফেলিতে, না পারা যায় মনের মধ্যে পোষণ করিতে—অথচ সাদা চোখে চাহিয়া দেখিলে এর কোন যথার্থ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবুও মনের চাঞ্চল্য দূর হয় না। অসতর্ক মুহূর্ত্তে প্রকাশ হইয়া পড়ে। মঞ্জুষা লজ্জিত হয়। দীনু ঘোষালের মেয়েটা ত সেদিনে মুখের উপরই বলিয়া বসিল, বিয়ের আগে পরিচয় না থাকলেও, আমরাও ভালবাসতে জানি, তা বলে এমন পাগল হতেও দেখি নি। তোমাদের বড়লোকদের সবই তাই আলাদা।

মঞ্জুষা উঠিয়া আসিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল। দেউড়িতে তখন চোবে বন্দুক হাতে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে।

রাত অনেক হইয়াছে। মঞ্জুষার চোখে আজ ঘুম নাই। এই সব আজেবাজে চিন্তা করিতে তার ভাল লাগে না। কাল সকালে উঠিয়াই সব কথা সে মৃন্ময়কে খোলাখুলি বলিয়া আসিবে। কিন্তু কি বলিবে সে, বলিবার আছেই বা কি! যতটুকু

বলিবার তাহা ত সে পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছে। নূতন করিয়া একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া লাভ নাই। তা ছাড়া ভালও লাগে না মঞ্জুষার। তার মাথার মধ্যে রাশি রাশি এলোমেলো চিন্তার আনাগোনা চলিয়াছে, যাহা নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত তার লোপ পাইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল মঞ্জুষা নিঃশব্দে আপন শয্যায় ঘুমাইতেছে। কিন্তু মনের উপর ক্লান্তির বোঝা এবং অবসাদ লইয়া পরদিন যথাসময়ে তাহার ঘুম ভাঙিল।

মা বলেন, তোর শরীর খারাপ নাকি মঞ্জু?

বাবা ব্যস্ত হইয়া বলেন, এ সব ত ভাল কথা নয় মা। অসুখ হলে তার ব্যবস্থা করা দরকার।

মঞ্জুষা পিতার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে প্রতিবাদ জানাইল। কহিল, কিছু হলে তবে ত জানাব বাবা। রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি তাই।—কিন্তু আয়নায় সহসা নিজের প্রতিবিম্বের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে সে নিজেও কম বিস্মিত হইল না এবং বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটাইয়া উঠিয়াই নীরবে প্রস্থান করিল।

ঘণ্টাখানেক পরে পুনরায় মায়ের ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া মৃন্ময়ের গলার সাড়া পাইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও মঞ্জুষা বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মৃন্ময় বলিতেছিল, মার কাছে আপনার প্রস্তাব শুনলাম, কিন্তু আমার মনে দ্বিধা এসেছে। আমার পরীক্ষার আর মোটেই দেরি নেই। এ সময় একটি মুহূর্ত্তও আমার কাছে কম নয়। তা ছাড়া সাফল্য এবং অসাফল্য বলেও দুটো কথা আছে। যদি অন্ত কোন কারণেও আমি অকৃতকার্য্য হই, তা হলে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয় ত আপনাদের উপর দোষারোপ করবার ইচ্ছে আমার হতে পারে। আমাকে এ কথা ভাববার অবকাশ আপনি দেবেন না। আমি না এলেও ত আপনাদের যাওয়া আটকাত না।

মঞ্জুষার মা কহিলেন, তুমি অত চিন্তা করছ কেন মিনু! তোমার পড়াশুনোর ক্ষতি হোক এ কেউই চায় না। চাওয়া উচিতও নয় বাবা।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, আমি জানি আপনি সহজেই আমার কথা বুঝবেন। মৃন্ময় আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। দরজার পাশে মঞ্জুষার সহিত তাহার দেখা হইলেও সে একটা কথাও কহিল না। ইচ্ছা করিয়াই পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

মঞ্জুষা বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হইলেও মুখ ফুটিয়া তাহাকে ডাকিল না। কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে মায়ের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মেয়ের মুখের পানে তাকাইয়া মা কি বুঝিলেন তিনিই জানেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কতকটা যেন কৈফিয়ত দিবার ভঙ্গীতে কহিলেন, পড়াশুনোর ক্ষতির কথা যখন বলছে তখন আর জোর করে ওকে সঙ্গে নেওয়া যায় কেমন করে।

মঞ্জুষার মনের যত ঈর্ষা এবং বিরক্তি গিয়া পড়িল মায়ের উপর। সে উষ্ণ কণ্ঠে কহিল, কে তোমাকে জোর করতে বলছে শুনি যে আমাকে কথা শোনাচ্ছ!

মা হাসিমুখে কহিলেন, বলবে আবার কে মঞ্জু। সব কথা কি বলতে হয় মা। কিন্তু অত রাগ করছিস কেন?

মায়ের এই শান্ত অনুযোগে এবং নিজের অকারণ উষ্ণতায় মঞ্জুষা অত্যন্ত লজ্জিত হইল। মৃদু কণ্ঠে কহিল, রাগ ত করি নি মা। রাগ করতে যাব কিসের জন্যে। যার খুশী যাবে, যার খুশী যাবে না, তাতে আমার রাগ করবার কি থাকতে পারে।

মা পুনরায় হাসিলেন। কিন্তু মঞ্জুষা যেন আর তাঁহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না। সে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল এবং নিজের ঘরে আসিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। তার রাগও যেমন হইল, অভিমানও তার চেয়ে কম হইল না; মুখ তুলিয়া একবার চাহিল না, ডাকিয়া একটা কথাও কহিল না। মিনুদা দিন দিন সত্য সত্যই বদলাইয়া যাইতেছে। মঞ্জুষা আজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তার এইরূপ আচরণের তাৎপর্য্য কি? সে আজ নিশ্চয় ঝগড়া করিবে। মঞ্জুষা মৃন্ময়দের বাড়ী যাইবার জন্য অকস্মাৎ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু বৃদ্ধ তেওয়ারী অতত্র কাজে চলিয়া যাওয়ায় এবং রৌদ্রের প্রখরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত সে নিরস্ত হইল। কিন্তু বৈকালে রৌদ্র পড়িতেই সে তেওয়ারীকে লইয়া মৃন্ময়দের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃন্ময় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেও মঞ্জুষা গম্ভীর হইয়া রহিল, অথচ আজ সকালেও সে ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া মৃন্ময়ের সহিত একটা মীমাংসা করিয়া লইতে মনস্থ করিয়াছিল।

মঞ্জুষা একটু নির্লিপ্ত কণ্ঠেই কহিল, থাক অতটা সহ্য হবে না। তখন ত কই চিনতেও পার নি। মা কি ভেবেছেন বল ত?

মৃন্ময় বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, তিনি আবার কি ভাবতে যাবেন মঞ্জু? তুমি দেখছি শেষ পর্য্যন্ত আমায় পাগল করে তুলবে। একটু থামিয়া মৃন্ময় পুনশ্চ কহিল, তুমি ভেবো না মঞ্জু, তিনি কিছু ভাববেন না। সোজা কথাকে তিনি সহজ এবং সরল ভাবেই নিয়েছেন। যুক্তিতর্কের ধার দিয়েও যান নি।

মঞ্জুষা কহিল, যুক্তিতর্কের ধার আমিও ধারি না। আমাদের মেয়েজাতের কাছে যুক্তিতর্কের চেয়ে মনের ইঙ্গিতের মূল্য ঢের বেশী। যদি কোনদিন ঠকতেও হয় একেবারে দেউলে হতে হবে না, অন্ততঃ ভাবতে পারবে—কিছু ত পেয়েছে।

মঞ্জুষা মৃন্ময়ের অজ্ঞাতে একটি নিঃশ্বাস চাপিয়া গেল এবং নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া রহিল। সকালবেলা মঞ্জুষাদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসা অবধি মৃন্ময় বারবার করিয়া ভাবিতেছিল যে, একবার গেলে হইত। তর্কের খাতিরে যত কথাই সে বলুক না কেন মঞ্জুষার অনুরোধ তার কাছে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এই অতিবড় সত্যটা কি মঞ্জু উপলব্ধি করে না? মৃন্ময় নিজেকে নিজে বহু বার এই প্রশ্ন করিয়াছে।

মৃন্ময় সহসা মঞ্জুষার একখানি হাত ধরিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, তোমার মনে কি অবিশ্বাস দেখা দিয়েছে? আমায় বলো ত মঞ্জু।

মঞ্জুষার দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল, কহিল, না—

মৃন্ময় আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, অবিশ্বাস করো না মঞ্জু। তুমি কি আমায় জানো না? মা মনে করো অতীতকে আমি ভুলে গেছি। আমি বুঝতে পারছি, কেন তোমার এ ভাবান্তর দেখা দিয়েছে। তোমাদের সঙ্গে যেতে না চাওয়ায় আর যাই থাক তোমাকে অবহেলা করা নয়। অথচ তুমি তাই ভেবে নিজেও কষ্ট পাচ্ছ, আমাকেও দুঃখ দিচ্ছ।

একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, যে কথা তোমায় মাকে জানিয়েছি তোমাকেও সেকথা আমি গোপন করি নি। তুমি যদি সব কথাই উল্টো করে বোঝ তবে কোথায় দাঁড়াই বল ত। অথচ তোমার কাছ থেকেই আমি সকলের চেয়ে বেশী উৎসাহ পাবার আশা করেছিলাম।

মঞ্জুষা এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, তুমি আমায় মাপ করো মিনুদা। আমি হয়ত আগাগোড়াই ভুল করেছি, কিন্তু তুমিও আমায় ভুল বুঝেছ। তোমায় অবিশ্বাস আমি করি না, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমার কেমন ভয় হয়। অথচ এ ভাবটা কিছুদিন আগেও আমার ছিল না মিনুদা। নইলে আমি কি সত্যিই বুঝি না যে, তোমায় আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার এ আগ্রহ আমার কোনো দিক দিয়েই স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গ আর নয়। এ নিয়ে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। তার চেয়ে চলো যাই দু'জনে খানিক বেড়িয়ে আসি।

মৃন্ময় প্রশ্ন করিল, কোথায় যেতে চাও।

মঞ্জুষা কহিল, নদীর পাড়ে অথবা রাধু বোষ্টমদের পাড়ায়।

মৃন্ময় কহিল, পুণ্য সঞ্চয় করতে নাকি?

মঞ্জুষা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, সে আবার কি?

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, তোমার গোপন দানের খবর আমার কানে এসেছে মঞ্জু।

মঞ্জুষা ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, ঠাট্টা করছ বটে, কিন্তু সব কথা জানলে তুমিও খুশী হতে। ও-তরফের বড়বাবুর পাকা মাথা এ তরফের নিরীহ অশিক্ষিত সরল লোকগুলোকে একেবারে উচ্ছেদ না করে ছাড়বে না। ক্ষেত, খামার, লাঙল ছেড়ে সব মিলের শ্রমিক হয়েছে। পয়সাও নাকি ভালই পায় কিন্তু প্রয়োজনের দিনে কারুর ঘর থেকে পাঁচটি টাকা একসঙ্গে বেরোয় না।

বাধা দিয়া মৃন্ময় হাসিমুখে কহিল, তাই বুঝি তুমি রাধু বোষ্টমের হাত দিয়ে তাদের সাহায্য পাঠাও?

মঞ্জুষা কহিল, কথাটা তোমার কানেও গিয়ে পৌঁছেছে তা হলে। আজ বড়তরফের কারখানা প্রতিষ্ঠার যে ব্যাপারটা এই নিরালা পল্লীর মানুষগুলোর চোখে পড়েছে, তাকে নিছক একটা দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দিলে মস্ত বড় ভুল করা হবে মিনুদা। মহানগরীর হাওয়াই শুধু আজ বইতে সুরু করেছে। কিন্তু আরম্ভেই যদি এর গতিকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করা যায় তবেই গ্রামের লোকগুলো হয়তো আরও কিছুদিন মানুষের মত বেঁচে থাকতে পারবে।

মৃন্ময় প্রশ্ন করিল, তুমি বলতে চাইছ কি মঞ্জু?

মঞ্জুষা কহিল, দেশের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীদের এ অভিযানকে আমাদের থামিয়ে দেওয়া আজ একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে মিনুদা। নইলে সবাইকে নিঃশেষে লোপ পেতে হবে। সমতার ভিত্তিতে আমাদের নূতন করে গড়ে তুলতে হবে সমাজকে। তোমার আশেপাশে একবার চেয়ে দেখ ত মিনুদা। কোথায় এসে আজ আমরা দাঁড়িয়েছি—কেন নিজেদের এমন অসহায় বলে আমাদের মনে হচ্ছে।

মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে কহিল, তোমার মনে আজ এ ভাব দেখা দিয়েছে কেন তা বুঝেছি, কিন্তু তোমার দান-খয়রাতের তাৎপর্য্য আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি মঞ্জু। তা ছাড়া এই দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধই বা কোথায়?

মঞ্জু কহিল, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই রয়েছে মিনুদা। দুটো মিষ্টি কথা কিংবা জোরালো বক্তৃতায় মানুষের মনে চাঞ্চল্য দেখা দিলেও তাতে তার পেট ভরে না। তাদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে একটা নৈতিক দায়িত্ব থেকে যায়। আর সে দায়িত্ব যুগ যুগ ধরে পালন করা হয় নি বলেই আজ ছোট-বড়, উঁচু-নীচুর প্রশ্নটা এত জটিল এবং মারাত্মক হয়ে সমাজ-জীবনকে ভয়াবহরূপে পঙ্গু করে তুলছে। যে দুষ্ট ব্যাধি আজ আত্মপ্রকাশ করেছে, আমাদের চণ্ডী হিরু রাধু ভোলার দেহে এবং মনে, সময় থাকতে থাকতে তাতে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। হয়তো এখনও সময় আছে।

মৃন্ময় কহিল, তুমি পাগল হয়েছ মঞ্জু। যে ব্যাধিতে দেশের সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে গেছে তা তোমার দু-দশ টাকা দান-খয়রাতে নিরাময় হয়ে উঠবে এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমায় কে দিয়েছে মঞ্জু?

মঞ্জুষা কহিল, তুমি বারে বারেই শুধু দান-খয়রাতের কথা নিয়ে আমায় খোঁচা দিচ্ছ মিনুদা, কিন্তু এ দান-খয়রাত নয়। আমি যেমন করেই হোক বড় তরফের অতল গহ্বর

থেকে এদের উদ্ধার করব। এরই মধ্যে আমি জনকয়েককে হাত করেছি। ওরা নরম মাটি মিনুদা, এ দিয়ে যেমন দানব সৃষ্টি করা যায় তেমনি দেবতাও গড়ে তোলা যায়। ওদের শিক্ষাদীক্ষা নেই বটে, কিন্তু প্রবল অনুভূতি আছে। সেখানে ফাঁকির স্থান নেই। তাই ত আজ রক্ত এবং অশ্রুর বন্যায় আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। বাবা বলেন, এ হতেই হবে নইলে ভগবানের বিধান উল্টে যাবে যে।

মঞ্জুষাকে থামাইয়া দিয়া মৃন্ময় কহিল, আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন নিয়েই তুমি নাড়া দিয়েছ। জানি না এ খেয়াল তোমার মাথায় কে ঢোকালে। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারবে ত মঞ্জু?

মঞ্জুষা কহিল, কিছু না হোক একটা গভীর ছাপও যদি আমাদের সমাজের বুকে এঁকে দিতে পারি তা হলেও নিজেকে সার্থক মনে করব। বাবা আমার সবচেয়ে বড় সহায় হয়েছেন মিনুদা।

একটু থামিয়া মৃদু হাসিয়া মঞ্জুষা পুনরায় কহিল, আমার মাথায় অনেক মতলব আছে মিনুদা, যদি সময় এবং সুযোগ পাই তবে দেখবে। কিন্তু আজ এ সব আলোচনা থাক; কোথায় বেড়াতে যাবে বলছিলে না?......

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল। তেওয়ারী নিঃশব্দে তাহাদের অনুসরণ করিল। গাঙ্গুলীদের পুকুরের পাড়ে আসিয়া মৃন্ময় সহসা থামিল, কহিল, আর একদিন তোমাকে চেনবার একটা সুযোগ এই পুকুর পাড়েই আমার হয়েছিল। জলপদ্ম তুলবার কথা আমি আজও ভুলি নি। সেদিনও তোমায় দেখেছিলাম আজও দেখছি। আর মনে হচ্ছে ভগবানের বিচিত্র সৃষ্টি তোমরা।

মঞ্জুষা মৃন্ময়ের কথার ধরণে হাসিয়া ফেলিল।

মৃন্ময় কহিল, এগোই চলো।

উভয়ে পুনরায় পথ চলিতে সুরু করিল—কতকটা যেন অন্যমনস্ক ভাবে। সহসা রাধু বোষ্টমের আহ্বান তাদের কানে পৌঁছিল। রাধু বলিল, তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম দিদিমণি। কিছু টাকার দরকার পড়ে গেছে। ওদিককার কাজ অনেক গুছিয়ে এনেছি। নবদ্বীপ থেকে ফিরে এসেই সব ঠিক করে ফেলব।

মঞ্জুষা কহিল, আমরাও তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম বোষ্টম-দা। কিন্তু হঠাৎ নবদ্বীপ কেন?

রাধু এ প্রশ্নের জবাব না দিয়া সলজ্জভাবে একটু হাসিল। মঞ্জুষাও আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না। কিন্তু মৃন্ময় থামিতে পারিল না, কহিল, মঞ্জুর কথার জবাব দিলে না ত বোষ্টম-দা।

রাধু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কথাটা যখন নিজেই সত্যি বলে জানি না তখন আর শুনে করবে কি। একটা উড়ো খবর পেয়েছি বৈ ত নয়।

মৃন্ময় পুনরায় কি বলিতে উদ্যত হওয়ায় মঞ্জু তাহাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিল। মৃন্ময় থামিল, কিন্তু রাধু ক্ষান্ত হইল না। কহিল, যার ঘর বড়ে একবার উড়িয়ে নিয়ে গেছে, মৃদু বাতাস দেখলেই সে চমকে ওঠে দাদাঠাকুর। দুঃখ যদি পাই একলাই পাব। হঠাৎ থামিয়া রাধু কেমন একপ্রকার হাসিতে লাগিল, এবং আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া প্রস্থানোদ্যত হইতেই মঞ্জুষা তাহাকে পরদিন সকালে দেখা করিতে জানাইল। রাধু ততক্ষণে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

মঞ্জুষা কহিল, ওর কিছু একটা ঘটেছে মিনুদা।

মৃন্ময় কহিল, সে তো দেখতেই পেলাম, কিন্তু হঠাৎ নবদ্বীপ কেন? সাদি করতে মন গেছে নাকি?

মঞ্জুষা হাসিয়া ফেলিল।

মৃন্ময় কহিল, অবশ্য কণ্ঠিবদলও হতে পারে।

মঞ্জুষা কহিল, তা পারে—কিন্তু আর কতটা পথ যাবে মিনুদা?

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, রাত হোক...চাঁদ উঠুক...

মঞ্জুষা কহিল, খুব কবিত্ব হচ্ছে যে...

মৃন্ময় মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া কহিল, মৃন্ময় আজ কাকে সঙ্গে করে পথে বেরিয়েছে?

মঞ্জুষা কহিল, সঙ্গে করে নূতন বেরিয়েছে নাকি? খালি বাজে কথা।

মৃন্ময় ডাকিল, মঞ্জু—

মঞ্জুষা সাড়া দিল—কি।...

মৃন্ময় কহিল, আমাদের ছেলেবেলার কথা তোমার মনে পড়ে?

মঞ্জুষা কহিল, পড়ে। ঐ বুড়ো বটগাছতলায় তুমি চুপ করে বসে মাছ ধরা দেখছিলে আর মঞ্জু নামে একটা দুষ্টু মেয়ে এসে তোমার চোখ টিপে ধরেছিল।

মৃন্ময় কহিল, সেদিনের সেই দুষ্টু মেয়েটা এখন কিন্তু বেশ লক্ষ্মী আর শান্ত হয়েছে, কিন্তু সেদিনের সেই ভাল ছেলেটি এখন আর তেমন ভাল নেই। কথা শুনতে চায় না। কথায় কথায় ঝগড়া করে। তা বলে সেই মেয়েটিকে কিন্তু ছেলেটি রীতিমত ভয় করে।

মঞ্জুষা হাসিতেছিল, কহিল, ছাই করে।

মৃন্ময় কহিল, আলবৎ করে। সেজন্যেই সে মেয়েটিকে মায়ের ঘর থেকে পালাবার পথে দেখেও দেখতে পায় নি।

মঞ্জুষা কহিল, ওর নাম বুঝি ভয় করা?

মৃন্ময় কহিল, তবে কি? ভালবাসা...?

মঞ্জুষা কহিল, জানি না।

কিছুক্ষণ উভয়ে চুপচাপ। মৃন্ময় ডাকিল, মঞ্জু।...

মঞ্জুষা জবাব দিল, কি।...

মৃন্ময় কহিল, এবারে কলকাতা থেকে এসে শুধু ঝগড়াই করেছি—

মঞ্জুষা কহিল, আর ভালমুখে একটা কথাও বলনি।... মঞ্জুষা হাসিমুখে কহিল, তোমার কাছে এসব কথা কে শুনতে চেয়েছে মিনুদা। এরপর সত্যি সত্যিই কিন্তু রাগ করব।

তেওয়ারী জানাইল, তাহারা বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

মৃন্ময় বলিল, তুমি ফিরে যেতে পার তেওয়ারী। আমরা আরো খানিক ঘুরে বেড়াব।

মঞ্জুষা হাসিল। কথাটা যে নিতান্ত ঠাট্টা ইহা তেওয়ারীর বুঝিতে দেরি হইল না। কিন্তু সে নীরব রহিল। তাদের কথা এখনও হয়তো অনেক বাকি আছে।

মৃন্ময় কহিল, বসবে খানিক ঐ বুড়ো বটগাছতলায়?

উভয়ে গাছতলায় বসিল। মৃন্ময় ঘাসের উপর শুইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। মঞ্জুষা বাধা দিয়া কহিল, এই ধুলোবালির মধ্যে—

মৃন্ময় কহিল, ধুলোবালি আবার কোথায় দেখলে? সে সটান শুইয়া পড়িল।

মঞ্জুষা কহিল, তার পর—

মৃন্ময় বলিল, তারপর শ্রীমতী মঞ্জুষার হাতের আঙুলগুলো শ্রীযুক্ত মৃন্ময়ের মাথার চুলের মধ্যে আনাগোনা করুক।

মঞ্জুষা হাসিয়া কহিল, এ তো পুরোনো কাব্য...আর কিছু?

মৃন্ময় কহিল, চাঁদের আলো তো এখনও দেখা দেয় নি।

মঞ্জুষা কহিল, পচা কাব্য—ততোধিক জীর্ণ। এ কখনও বাঁচতে পারে না। আর কিছু?...কিন্তু তোমার কি হয়েছে বলতো আজ? পাগল হয়েছ—তেওয়ারী যে ওখানে বসে আছে—তাও কি ভুলেছ?

মৃন্ময় কহিল, ভুলব কেন?

তেওয়ারী পুনরায় তার উপস্থিতি জানাইয়া দিল।

মঞ্জুষা কহিল, তৃতীয় ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা চলে না। সব সময় এরা গোলযোগের সৃষ্টি করে থাকে। আজ এখন ওঠা যাক্।

তেওয়ারীর কান হয়তো এই দিকেই ছিল। পুনরায় সে জানাইল যে, রাত অনেক হইয়াছে। আর দেরি করা উচিত হইবে না।

উভয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া উঠিল।

মঞ্জুষা চলিতে চলিতে কহিল, আজকের দিনটা কিন্তু সত্যিই আমার ভাল কেটেছে মিনু-দা।

মৃন্ময় কহিল, হঠাৎ একথা কেন মঞ্জু?

মঞ্জুষা জবাব দিল, তা জানি না।

মৃন্ময় তার বাহুমূলে একটু চাপ দিয়া কহিল, তুমি পাগল তাই মিথ্যে কষ্ট পাও। মঞ্জুষা প্রতিবাদ করিল না। নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

১২

মৃন্ময় কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে। মঞ্জুদের সঙ্গে সে যায় নাই। মঞ্জুষাও তাহাকে যাইবার জন্ত আর অনুরোধ করে নাই। এখানে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই তার মনে পড়িল লিলিকে, মনে পড়িল সুনির্ম্মলকে। কিন্তু সুনির্ম্মলের খোঁজে আসিয়া সে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হইয়া গেল। প্রথমত সে বিশ্বাস করিল না, তার পরে বিশ্বাস যদি বা করিল কিন্তু মন নানা সন্দেহে দোলা খাইতে লাগিল। রুবি যাহা বলে তাহা সবই কেমন ভাসা ভাসা। ও বলে, কিছুই জানতাম না, তবে কোথাও যে বড় রকম কিছু গোল বেধেছে এ কথা দাদার শঙ্কিত চালচলন দেখে প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ জেগেছে।

মৃন্ময় তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, কিন্তু এ যে বড় অদ্ভুত কথা বলছেন আপনি। কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে বলেই সে অন্তায় করতে যাবে কেন!

রুবি কহিল, কিন্তু বিলেত যেতে কেউ ত তাকে কোন দিন বাধা দেয় নি যে, এমন চোরের মত পালিয়ে যেতে হবে।

মৃন্ময় কহিল, হয়তো আপনাদের তরফ থেকে কোন রকম বাধা পাবার আশঙ্কা তার ছিল।

রুবি অকস্মাৎ মৃন্ময়কে প্রশ্ন করিয়া বসিল, দাদার বিলেত যাবার কথা আপনার কাছে সে কোন দিন প্রকাশ করেছে কি?

মৃন্ময় কহিল, না।

রুবি কহিল, আপনার কথার জবাব আমি পরে দিচ্ছি, কিন্তু দয়া করে একটু বসুন আমি এখুনি আসছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া রুবি পুনরায় সুরু করিল, আপনার তরফ থেকে বাধা আসবার ত কোন কারণই ছিল না, অথচ আপনাকেও সে একথা জানায় নি। একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, মা সেই থেকে কান্নাকাটি সুরু করে দিয়েছেন।—কবির চোখদুটাও যেন সজল হইয়া উঠিয়াছে। অন্ততঃ মৃন্ময়ের সেইরূপই মনে হইল। কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। রুবি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া বলিল, কান্নাকাটির হয়তো সঙ্গত কারণ নেই, কিন্তু আমাকে বড় নিরাশ হতে হয়েছে। লিলিদির মত মেয়েকেও শেষ পর্য্যন্ত হার মানতে হয়েছে।

মৃন্ময় সহসা এক প্রশ্ন করিয়া বসিল, আমি এর অপর দিকটাও তো ভাবতে পারি রুবি দেবী।

রুবি কহিল, অসম্ভব মৃন্ময়বাবু। আমি যে ওদের ভাল করেই জানি।

মৃন্ময় কহিল, হয়তো সেইখানেই আপনার ভুল হয়েছে। কিন্তু আপনাদের লিলিদি বলেন কি?

রুবি কহিল, ওর কথা ছেড়ে দিন। তার মতে আমার ভাইয়ের খবর আমরাই সবার চেয়ে বেশী রাখি। অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করায় বললে, বিলেতে একটা তার করে দাও,

হয়ত কোন খবর পেয়ে যাবে। কি ভালো বলুন ত। খবরাখবর পাবার রাস্তাই যদি সে খোলা রেখে যাবে তবে তোমার কাছে যাব কিসের জন্য? অথচ আমার মন বলে...কথাটা সমাপ্ত না করিয়াই সে প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হইল। ও ঘরে চলুন মৃন্ময়বাবু, আমাদের চা দিয়েছে।

মৃন্ময় উঠিল। চলিতে চলিতে রুবি কহিল, আপনি এখান থেকে চলে যাবার দিন কয়েক পরেই দাদা নিরুদ্দেশ হয়েছে। একটা চিঠিতে তার গন্তব্য স্থানের নির্দেশ রেখে গেছে, কিন্তু কারণ জানায় নি। ব্যাঙ্কে খবর নিয়ে জানা গেল হাজার পনর তুলে নিয়ে গেছে। টাকার জন্তে কিছুই নয়, কিন্তু তার চলে যাওয়ার ধরণটা আগাগোড়াই যেন কেমন খাপছাড়া। এর আদি-অন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

মৃন্ময় পুনরায় কহিল, আমার মনের খটকা কিন্তু এখনও যায় নি। লিলিদেবীর তরফ থেকে কোন রকম আশাভঙ্গের কারণ ঘটে নি ত? আপনার দাদার সঙ্গে তার একটা পাকা ব্যবস্থা হয়েছে বলেই ত সবাই জানত! আমি বলি তাঁকেই আর একটু চাপ দিয়ে দেখুন না?

রুবি কহিল, লিলিদি অতল সমুদ্র। তার মনের তলায় প্রবেশ করা আমার সাধ্য নয়। এতটুকু পরিবর্তন তার কোথাও ঘটে নি। কোন দিক দিয়ে যে এক তিল ক্ষতি হয়েছে এমন মনেও হয় না। ঠিক তেমনি সহজ, তেমনি সরল। অথচ দাদার সম্বন্ধে ওর মনের কথা আমি জানি। সেখানে কোন ফাঁকি নেই।

মৃন্ময় কহিল, তা হলে কি আপনি বলতে চান—

তাহাকে বাধা দিয়া রুবি কহিল, হাঁ। মৃন্ময়বাবু, এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে আমার দাদাই বদলালেন না। পরশ পাথরকেও তার কাছে হার মানতে হয়েছে।

উভয়ে পাশাপাশি চায়ের টেবিলে বসিল। মৃন্ময়ের দিকে চায়ের বাটিটা ঠেলিয়া দিয়া রুবি পুনরায় বলিয়া উঠিল, আমাদের এখন ভারি বিপদ মৃন্ময়বাবু। টাকা আছে মানি, কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে শুধু টাকা থাকলেই চলে না।

মৃন্ময় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আপনি বলতে চাইছেন কি? ক্রমশঃ যে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ছেন আপনি!

রুবিকে কিছুক্ষণ যেন চিন্তামুক্ত মনে হইল। একটু নারী-সুলভ লজ্জাও যেন তার চোখে-মুখে খেলা করিয়া ফিরিতে লাগিল।

মৃন্ময় কহিল, আমার মাপ করবেন। আপনি লজ্জা পাবেন জানলে আমি কোন কথাই বলতাম না।

রুবি মুখ তুলিয়া চাহিল, মৃদু কণ্ঠে কহিল, আপনার কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই মৃন্ময়বাবু। আপনার সাহায্য পেতে হবে বলেই আমার সব কথা আপনাকে খোলাখুলি বলা দরকার। একটা সন্দেহ আমার মনে জেগেছে। ভগবান করুন এ সন্দেহ যেন মিথ্যে হয়, নইলে এত বড় অন্যায় তিনি কখনই ক্ষমা করবেন না।

মৃন্ময় বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কিসের অন্যায়...কিসের ক্ষমা রুবি দেবী?

রুবি কহিল, আজ থাক মৃন্ময় বাবু। আমাকে ঘটনাটা আগে বুঝতে দিন।

মৃন্ময় ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আজ তা হলে আমি উঠছি।

রুবিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কহিল, আর একটা অনুরোধ আপনাকে আমি করব। লিলিদি হয় তো পরীক্ষা দেবে। এটা তার পরীক্ষার বছর। আপনি নাকি তাকে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সে আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল। যদি সম্ভব হয়—

কথাগুলি মৃন্ময় শুনিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। সে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেই রুবি পুনরায় তাহাকে ডাকিল, মৃন্ময়বাবু—

মৃন্ময় ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রুবি কহিল, আপনি কি আর কিছুক্ষণের জন্ত বসতে পারেন না?

মৃন্ময় মৃদু হাসিয়া কহিল, সে কথা ত আপনি একবারও বলেন নি! সে পুনরায় ফিরিয়া গিয়া বসিল।

রুবি কহিল, আপনার উপর হয়তো কতকটা জুলুম করা হচ্ছে কিন্তু বিশ্বাস করুন এ ছাড়া আমাদের আর অন্ত কোন উপায় নেই।

মৃন্ময় কহিল, সে কথা ত আমি কখনও বলি নি। তবে এ কথাও ঠিক যে, আপনার দাদার বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে এসব কথার মধ্যে আমার না থাকাই ভাল।

রুবি কহিল, এই যুক্তি দেখিয়ে যদি আপনি দূরে সরে যেতে চান সে আমাদের দুর্ভাগ্য। দাদার বহু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেই আমার আলাপ আছে। আপনারও হয়তো আছে এবং আমি যে নির্ব্বাচনে ভুল করি নি একথা আপনাকেও স্বীকার করতে হবে।

মৃন্ময় কহিল, এ আপনার ঔদার্য্য।

রুবি কহিল, আমি বলি স্বার্থপরতা। কিন্তু এসব কথা এখন থাক। দয়া করে একটু খোঁজখবর রাখবেন এ আমার একান্ত অনুরোধ।

মৃন্ময় কহিল, হয়তো কোন প্রয়োজনেই আমাকে আসতে হবে না। কিন্তু তা হলেও সত্যিই যদি আমার দ্বারা কোন সাহায্য হবে মনে করেন তবে একটা খবর দেবেন। আমার যথাসাধ্য আমি করব।

রুবি কহিল, এর চেয়ে বড় প্রতিশ্রুতির আমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আপনি কি কলেজ হোস্টেলেই উঠেছেন?

মৃন্ময় মৃদু হাসিয়া কহিল, এ ছাড়া আর গতি কি? কলকাতা শহরে আপনাদের মত স্থায়ী আস্তানা ত আর আমাদের নেই।...একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিল, আজ তা হলে চললাম।

মৃন্ময় অগ্রসর হইল। সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া রুবির চোখে মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে অন্দরের পথে আগাইয়া চলিল।

মৃন্ময় ততক্ষণে রাস্তা ধরিয়া চলিতেছে। রুবির কথাগুলি তখনও তার কানে বাজিতেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া সে ভাবিতেছিল যে, সুনির্ম্মলের এই চলিয়া যাওয়ার মধ্যে উহারা বিপদের আশঙ্কা করিতেছে কিসের জন্য। তা ছাড়া সুনির্ম্মল বিলাত যাক আর জাহান্নামেই যাক তাহাতে মৃন্ময়ের কি আসিয়া যায়। ইহা লইয়া তাহার মাথা ঘামাইবার কি কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু মনে মনে সে যতই যুক্তিতর্কের অবতারণা করুক না কেন উহাদের খবরাখবর মৃন্ময়কে লইতে হয়। সুনির্ম্মল সম্বন্ধে তারও যে কোন কৌতূহল নাই তা নয়।

দিনকয়েক পরে পুনরায় সে দেখা দিল।

রুবি বলে, আপনাকে যথেষ্ট কষ্ট দিচ্ছি। পড়াশুনোরও নিশ্চয় ক্ষতি হচ্ছে।

মৃন্ময় রুবির কথায় সায় দিল। কহিল, একথা সত্য—

রুবি একটু মুষড়াইয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, তা বলে বিকেল বেলা বেড়াতে বেরোন নিশ্চয়।

মৃন্ময় স্মিতহাস্যে কহিল, তা বেরুই বটে।

রুবি কহিল, সেই সময়টুকুই না হয় আমাদের জন্য ব্যয় হ'ল—

মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখেই কহিল, সে ত হচ্ছেই। কিন্তু আর মাসখানেক আমি আসব না। বড় ক্ষতি হচ্ছে আমার। পরীক্ষাটা শেষ হতে দিন, তার পর যত খুশী বিরক্ত করুন, আমি কিছু মনে করব না।

রুবি কহিল, এখন বুঝি করেন?

মৃন্ময় হাসিমুখেই কহিল, করি যে বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে তা আপনাদের উপর নয়, নিজের উপর। নইলে সত্য সত্যই আমার কোন ক্ষতি করবার সাধ্য আপনাদের নেই।

রুবি কহিল, আজ মাসকয়েক ধরে যে ভাবে আপনাকে নিয়ে টানাটানি চলেছে এতে সহজ অবস্থায়ও মানুষের মন তিক্ত হয়ে ওঠে। আপনার ত তবু যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু একটা অনুরোধ—ভুল করে যেন অবিচার করবেন না। একটা মানুষকে হঠাৎ এতখানি বিশ্বাস করে তার উপর নির্ভর করায় অনেকখানি অসঙ্গতি থাকলেও তা সব সময় মিথ্যে হয় না। মানুষের সহজ অনুভূতি বহু কঠিন সমস্যার সমাধান করে দেয়।

মৃন্ময় নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিল, তা হয়তো দেয়।

রুবি কহিল, হয়তো কেন মৃন্ময়বাবু। এর মধ্যে দ্বিধার স্থান কোথায়? অন্তরের নির্দ্দেশকে আমি বিশ্বাস করি এবং তা মেনে চলি।

মৃন্ময় কহিল, কিন্তু আমি চলি না। বরং মন যা চায় তার উল্টো পথেই চলে থাকি।

রুবি নীরব।

মৃন্ময় পুনরায় কহিল, না জেনে শুনে কোন মানুষ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করাকে আমি ভাল মনে করি না। আপনারা কি যে করতে চান তা আজও আমি ঠিক বুঝলাম না। কিন্তু সে যাই হোক সুনির্ম্মলের কোন খবর পেলে আমায় জানাবেন। আজ আমি উঠি।

রুবিকে আর দ্বিতীয় কথা কহিবার অবকাশ না দিয়া মৃন্ময় প্রস্থান করিল।

ক্রমশঃ

বৃন্দাবনে বাঙালী সমস্যা

শ্রীগৌরগোপীদাস বাবাজী

বৃন্দাবনে পঞ্জাবী শরণার্থীর ভিড় অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে এবং দিন দিন বেড়েই চলেছে। স্থায়ী বাসিন্দাগণের জপ-ধ্যান সাধন-ভজন পূজা-অর্চ্চা নিয়ে শান্তিতে বাস করবার দিন আর নেই; চারদিকেই হাটবাজারের কলরব, অশান্তি, সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ, মহার্ঘতা। এক কথায় সে সুখময় বৃন্দাবন আর নেই যার বর্ণনা করতে গিয়ে নরোত্তম ঠাকুর গেয়েছিলেন—

এ ভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি
আর কবে ব্রজভূমে যাব।...
সুখময় বৃন্দাবন কবে হবে দরশন,
সে ধূলি মাখিব গায়।...
সব দুঃখ পরিহরি ব্রজপুরে বাস করি—
মাধুকরী মাগিয়া খাইব।

কিন্তু কালের কুটিল গতি রোধ করে এমন সাধ্য কার।

পঞ্জাবী শরণার্থীর ভিড় না হয় আজ হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখছি গত বহু বৎসর ধরে দলে দলে বহু বাঙালী এসেও বৃন্দাবনের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন—তাঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য যে একান্তমনে বৃন্দাবনচন্দ্রের শরণাগতি এবং রাধা-গোবিন্দ প্রেমভক্তির যজন-যাজন তা ত নয়।

প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা, মাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ কয়েকজন গোস্বামী প্রথমে আসেন ব্রজভূমে, পরে স্বয়ং মহাপ্রভুই আসেন এবং ব্রজমণ্ডলের তীর্থরাজি প্রকট্ করেন। তখন থেকেই নিয়মিত ভাবে বৈষ্ণবভাবাপন্ন বাঙালী ভক্ত গৃহস্থ ও উদাসীন বৈষ্ণবেরা আসতে থাকেন। কেউ কেউ বা সংসার থেকে অবসর নিয়ে শেষজীবনটা পুণ্যতীর্থে কাটাবার উদ্দেশ্যে আসতেন; অবশ্য নিজেদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করতেন। আর যাঁরা ভজন-পিপাসু হয়ে আসতেন তাঁরা এখানে পৌছে কোন প্রাচীন ভক্ত বৈষ্ণবের অনুগত হয়ে কিছুকাল শিক্ষগ্রহণ করার পর বেশ পরিবর্ত্তন করে ভেক বা সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক ভজন করতেন, তাঁরা ব্রজবাসীদের ঘরে দিনান্তে এক বার মাধুকরী (রুটির টুকরা) ভিক্ষা করে কোনরকমে জীবন রক্ষা করতেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ইদানীং দেখা যায়, বাংলাদেশে যারা কোন রকম পরিশ্রম করে না বা করতে চায় না, নিজেদের কর্ম্মদোষে বা সামাজিক অব্যবস্থায় যাদের জীবিকার সংস্থান হয় না, যারা অকর্ম্মণ্য কর্ম্মকুণ্ঠ অথচ কর্ম্মক্ষম ও বলিষ্ঠ—এমন সব যুবক-যুবতী দলে দলে বৃন্দাবন এসে কেউ-বা নামমাত্র ভেক নিয়ে, কেউ-বা ভেক না নিয়েই নকল সাধু সেজে; কেউ বা অতটা কপটতা না করে সহজ সাধারণ বেশে মুষ্টিভিক্ষা (এক মুষ্টি আটা) বা মাধুকরী (তৈরি রুটি বা রুটির টুকরো) ভিক্ষা করে দিন যাপন করে। এদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনেরই উদর ভরণের জন্য সাধুর বেশ গ্রহণ বা বৃন্দাবনে আসা—প্রকৃত ভজন-পিপাসু শতকরা পাঁচ জন মেলা কঠিন। অনেকে তো সমস্ত দিন ভিক্ষাই করে; কেউ কেউ ভিক্ষালব্ধ আটা বিক্রয়পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করে দেশে পাঠায়। তা ছাড়া বিভিন্ন স্থানের রাজা মহারাজা ধনী শেঠ সাউকার বেনিয়া এসে বৎসরের নানা সময়ে কাপড় জামা চাদর কম্বল ইত্যাদি যখন তখন দান করেন, তা গ্রহণ করবারও যথেষ্ট সুযোগ আছে; দাতারা অবশ্য সাধুর বেশ দেখে সাধু জেনেই দেন; বৈষ্ণববেশধারীরা অনেক সময় প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত কাপড় চাদর সংগ্রহ করে এবং সেগুলো বিক্রয় করে টাকা-কড়ি জমাতে থাকে ও দেশে পাঠায়।

পূর্ব্বে ব্রজবাসীরা মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব বাবাজী-দের খুবই প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। নিজেরা না খেয়েও বৈষ্ণবদের খেতে দিতেন। কিন্তু মেকী কত দিন চলে। আজ তাঁরা সাধুবেশী বৈষ্ণব বাঙালীদের আচরণ দেখে ক্রমেই শ্রদ্ধা হারাচ্ছেন, সন্দিগ্ধ হচ্ছেন, বাঙালীদের ঘৃণার চক্ষে দেখছেন এবং উল্লিখিত কপটতা ও প্রবঞ্চনার প্রতিকারার্থ আন্দোলনও সুরু হয়েছে। আজকাল বিহার, উড়িষ্যা, আসামে যেরূপ বাঙালী-বিতাড়ণ আন্দোলন হচ্ছে, তাতে মনে হয় বাঙালী ভাবুক, নেতা, দেশসবক কর্ম্মীরা এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মণ্ডলেশ্বর মোহন্তেরা সময় থাকতে সাবধান না হলে, ধর্ম্ম ও আচারের বিকৃতি রোধ না করলে, এবং অনুপযুক্ত বালক বা যুবাদের ভেক সন্ন্যাস দেওয়া বন্ধ না করলে বৃন্দাবনধামেও বাঙালীরা দিন দিন নিন্দিত ও ঘৃণিত হয়ে উঠবেন, অসাধু ও সাধু সমভাবেই নিগৃহীত হবে এবং ব্রজবাসী ও বাঙালীর মধ্যে কলহ-বিদ্বেষও বৃদ্ধি পাবে।

এই তো গেল খাস বৃন্দাবনে বাঙালীদের অবস্থা, আবার আর এক শ্রেণীর বৈষ্ণব বাবাজী আছেন, যাঁরা সাধারণতঃ উচ্চশিক্ষিত বা ভদ্রবংশজাত নন। তাঁরা বৃন্দাবন থেকে বাংলা বা উড়িষ্যার স্থানে স্থানে গিয়ে খুবই অকিঞ্চন ভজনানন্দী সাধুর ভান করেন। ধীরে ধীরে প্রতিপত্তি জমান, শেষ পর্য্যন্ত গুরুর তিরোভাব-উৎসব, নয় তো মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, আশ্রম সংস্কার, আশ্রম, মঠ বা বিদ্যালয় স্থাপন, নয় তো নামযজ্ঞ সম্পাদন—একটা না একটা অছিলায় অর্থ ভিক্ষা করতে থাকেন। আসলে ও সব কাজ করা অভিপ্রায় নয়। অথবা যদিই করেন সে নামমাত্র, অল্পব্যয় খরচ করে যা উদ্বৃত্ত হয় তা "বাবাজীর" পুঁজি হিসাবে জমতে থাকে। রীতিমত ব্যবসা বললেও অত্যুক্তি হয় না। এঁদের মধ্যে যাঁর একটু লেখাপড়া জানা আছে, তিনি হয় তো একটা বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বসলেন বা কয়েকজন মিলে নিজেদের মনগড়া সভার রেজিষ্টারী দলিল দেখিয়ে সরলপ্রাণ দাতাদের চক্ষে ধূলি দিলেন। উল্লিখিত ছলচাতুরীপূর্ণ ব্যবহারে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, অকপট ভক্তির পথে এই সব কপটতা এসে গোপনে বাসা বাঁধছে এবং মহা-প্রভু-প্রবর্ত্তিত নির্ম্মল পবিত্র ধর্ম্মকে কলুষিত করতে চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে বাঙালী মাত্রেরই, বিশেষ করে ধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষিত ব্যক্তিদের, ভক্ত গৃহস্থ সাধুদের অবহিত হয়ে যথাযোগ্য প্রতিবিধানের উপায় চিন্তা করবার ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে তা কার্য্যকরী করার সময় উপস্থিত হয়েছে।

হিমালয়-ক্রোড়ে পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার দর্শন

শ্রীবিনয়ভূষণ দত্ত

পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার (বরফের নদী) আলমোড়া জেলার অন্তঃপাতী আলমোড়া শহর হইতে ৭৫ মাইল উত্তরে গাড়োয়াল জেলার এক প্রান্তে অবস্থিত। এই গ্লেসিয়ার দেখিতে হইলে ৭৫ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। গাড়োয়াল জেলায়

স্কেচ নং ১ (ক)। পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল

গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী প্রভৃতি অনেকগুলি গ্লেসিয়ার আছে কিন্ত এই সকল গ্লেসিয়ার দুরধিগম্য। ভারতবর্ষে পিণ্ডারী গ্লেসিয়ারে যাতায়াতই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য।

হিন্দুস্থান স্কাউট এসোসিয়সনের গ্রীষ্মকালের স্কাউটিং শিক্ষা-কেন্দ্র আলমোড়া জেলাস্থিত শীতলাক্ষেত হইতে আমরা পিণ্ডারী গ্লেসিয়ারের উদ্দেশে যাত্রা করি। নিম্নোক্ত সাতটি স্থানে আমাদিগকে এক এক রাত্রির জন্য বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল—(১) আলমোড়া গবর্ণমেণ্ট নর্ম্যাল স্কুল (৯ মাইল দূরে অবস্থিত), (২) তাকুলা ডাকবাংলা (১৬ মাইল দূরে), (৩) বাগেশ্বর ডাকবাংলা (১১ মাইল দূরে), (৪) কাক্‌-কোট ডাকবাংলা (১৪ মাইল দূরে), (৫) লোহারক্ষেত ডাকবাংলা (১০ মাইল দূরে), (৬) খাতি ডাকবাংলা (১১ মাইল দূরে), (৭) ফুরকিয়া ডাকবাংলা (১০ মাইল দূরে)। এই ফুরকিয়া ডাকবাংলাই উক্ত গ্লেসিয়ারের পথে শেষ ডাক-বাংলা এবং এই স্থান হইতে পাঁচ মাইল দূরে গিয়া গ্লেসিয়ার দর্শন করিতে হয়। আলমোড়া হইতে গ্লেসিয়ার পর্য্যন্ত একটি রাস্তা গিয়াছে এবং সেই রাস্তা ৭৫নং মাইল ষ্টোনে শেষ হইয়াছে। শীতলাক্ষেত হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত ৯ মাইল আমরা অতিরিক্ত হাঁটিয়াছি। গ্লেসিয়ার যাইবার অপেক্ষাকৃত ভাল রাস্তা ও. টি. রেলওয়ের শেষ সীমার দুইটি ষ্টেশন পূর্ব্বে—হালদোয়ানী ষ্টেশন হইতে ৬৷৷০ ভাড়া দিয়া মোটর-বাসে গরুড় নামক স্থানে যাইতে হয়, সে স্থান হইতে হাঁটিয়া বাগেশ্বর (১৩ মাইল দূরে) যাওয়া যায়। বাগেশ্বর হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত পথে গন্তব্য স্থলে পৌঁছিতে হয়। শীতলাক্ষেত (৬০০০ ফুট উচ্চ) হইতে আলমোড়া (৫২০১ ফুট উচ্চ) পর্য্যন্ত ৯ মাইল রাস্তা বড়ই দুর্গম। কোশী নদী পার হইবার পর চড়াই এত খাড়া যে, কোন কোন স্থান অতিক্রম করিতে আমাদিগকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছে। আলমোড়া

স্কেচ নং ১ (খ)। পিণ্ডারী গ্লেসিয়ারের পথ নির্দ্দেশ

হইতে তাকুলা (৩২০০ ফুট উচ্চ) পর্য্যন্ত ১৬ মাইল রাস্তা ক্রমোচ্চভাবে উঠিয়া অবশেষে দুই মাইল খাড়া নীচে নামিয়া আসিয়াছে। অতিক্রম কালে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হয় এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হইতে থাকে। তাকুলা হইতে বাগেশ্বর (৩২০০ ফুট উচ্চ) পর্য্যন্ত ১১ মাইল রাস্তার

ছুইটি চড়াই এবং ছুইটি উৎরাই আছে। অনেকটা রাস্তা, সরযূ নদীর ধারে ধারে সমতল ভূমির উপর দিয়া যাইতে হয়। ইহা অযোধ্যা-প্রবাহিণী সরযূ নহে। ইহা একটি পার্ব্বত্য নদী, শারদা নদীতে পড়িয়াছে। নিম্ন উপত্যকায় অবস্থিত

২ নং চিত্র

হওয়ায় পথের এই অংশে গ্রীষ্মাধিক্য অনুভূত হয়। বাগেশ্বর ডাকবাংলার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। সম্মুখে ছোট-বড় প্রস্তরখণ্ডসমূহের প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া সরযূ নদী শ্রবণমুগ্ধকারী শব্দ করিতে করিতে বহিয়া গিয়াছে। ডাকবাংলার সম্মুখে ও পশ্চাতে অতি নিকটেই নীল ও নল নামে সমান উচ্চ ছুইটি পাহাড় অবস্থিত। বাগেশ্বর হইতে কাফ্‌কোট (৩৫০০ ফুট উচ্চ) চৌদ্দ মাইল—পথ সুগম, অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। কাফ্‌কোট হইতে লোহারক্ষেত (আনুমানিক ৫০০০ ফুট উচ্চ) দশ মাইল। রাস্তার শেষ দুই মাইলের মধ্যে খুব উঁচু চড়াই আছে। লোহারক্ষেত হইতে ১১ মাইল দূরে "খাটি" (৭২৫০ ফুট) নামক স্থানে পৌঁছিতে হইলে ধাকুরী (৯৩০০ ফুট) অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ধাকুরী পর্য্যন্ত সাড়ে ছয় মাইল রাস্তা অতিশয় দুর্গম। প্রথম পাঁচ মাইল চড়াই এত খাড়া যে, পর্ব্বত আরোহণকারীর একেবারে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইবার উপক্রম হয়। ধাকুরী শৃঙ্গে (৯৩০০ ফুট) আরোহণ করিলে তিন-চারিটি শৃঙ্গসমন্বিত তুষারাবৃত হিমালয়ের একটা বিরাট্ অংশ হঠাৎ গিরি-অভিযানকারীর বিস্মিত বিমুগ্ধ দৃষ্টির সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়। ধাকুরী ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতে নাকি বরফে ঢাকা হিমালয়ের এতখানি বিরাট্ অংশ একসঙ্গে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই স্থান হইতে গ্লেসিয়ার প্রায় ২০ মাইল দূরে। ধাকুরী হইতে দুই বরফের শৃঙ্গ পথিককে কেবলই যেন সম্মুখের পানে হাতছানি দিয়া ডাকিতে থাকে। ধাকুরী পৌঁছিলেই শুরু হয় সুগম রাস্তা; অনেকটা পথ বেশ আরামেই অতিক্রম করা যায়। ধাকুরীর পর দুই মাইল খাড়া উৎরাই আছে। খাটি হইতে ফুড়কিয়া (১০,৩০০ ফুট) দশ মাইল, পথে দুই মাইল বেশ খাড়াই আছে। ফুড়কিয়া হইতে গ্লেসিয়ার (১৩,০০০ ফুট উচ্চ) পর্য্যন্ত পাঁচ মাইল আবার দুর্গম বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ।

ফুড়কিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পিণ্ডারী নদীকে বরফ-জমা (frozen) অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু দূরে দূরে বরফের আবরণ ফাটিয়া গিয়াছে এবং সেই ভগ্ন ফাটল দিয়া উৎসারিত নদীর জল প্রচণ্ড বেগে সগর্জ্জনে বহিয়া যাইতেছে। দক্ষিণে এবং বামে অনেকগুলি বরফের নালা সর্পিল গতিতে উচ্চ পর্ব্বতের গাত্র বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে, এবং বরফ-জমা পিণ্ডারী নদীতে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। ফুড়কিয়া ডাকবাংলা যেখানে অবস্থিত সেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে নয়নমনমুগ্ধকারী সুন্দর দৃশ্য। নীচে বরফ-জমা পিণ্ডারী নদী, চতুর্দ্দিকে পাহাড়ের উপর বরফ সঞ্চিত; এজন্য আবহাওয়া আর্দ্র, বাতাস খুব শীতল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে জায়গাটিকে যেন স্বপ্নপুরী বলিয়া মনে হয়। ফুড়কিয়া হইতে গ্লেসিয়ার পর্য্যন্ত অন্ততঃ

৩ নং চিত্র

পঁচিশ-ত্রিশটি বরফ-জমা নালা এবং ছোট নদী পার হইতে হয়। ধাকুরী হইতে উচ্চ পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি প্রশস্ত রজত-রেখা দৃষ্ট হইয়াছিল। ফুড়কিয়া ছাড়াইয়া যখন আমরা বরফজমা নালা এবং ছোট নদী পার হইতে লাগিলাম, তখন এগুলি আসলে কি তাহা বুঝিতে পারিলাম। এগুলি পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নিঃসৃত জলধারা। এগুলিই নীচে নামিয়া অসংখ্য বরফের নদীনালার সৃষ্টি করিয়াছে। ১০টার পর হইতেই তুষারাবৃত শিখরসমূহ মেঘে ঢাকিতে আরম্ভ হয়। যাহাতে মেঘোদয়ের পূর্ব্বেই গ্লেসিয়ার দেখা যাইতে পারে সেজন্য ভোর ৫টার সময়ই ফুড়কিয়া ডাকবাংলা হইতে

রওনা হইয়া পড়িলাম। গ্লেসিয়ার দুইটি উচ্চ খাড়া পাড়ের moraine-এর মধ্যে অবস্থিত। বাঁ দিককার moraine-এর নিম্ন ভাগ দিয়া পিণ্ডারী নদীর বরফ-জমা সৈকতে নামিয়া আসিতে হয় এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া Snout-এ পৌঁছিতে হয়। এই Snout-কেই বলা হয় গোমুখ। এই স্থান হইতেই গ্লেসিয়ারের বরফ প্রথম বিগলিত হইয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাই নদীর আদি উৎপত্তিস্থান। গো-মুখের উপরের দিকে শুধু বরফ ছাড়া আর কিছুই নাই। চতুষ্পার্শ্বস্থ উচ্চ পর্ব্বতগুলি শিখরদেশ হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত বরফের আস্তরণে আবৃত। গোমুখ হইতেই এক ক্ষীণ জল-ধারা বাহির হইয়াছে। এই জলধারা, অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফ হইতে উৎপন্ন ছোট ছোট নদী এবং ঝরণার জলরাশি দ্বারা পুষ্ট হইতেছে। পিণ্ডারী নদী নন্দকোট পর্ব্বত (২০,৭৪০ ফুট) হইতে উদ্ভূত পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার হইতে প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদী গাঢ়োয়াল জেলায় অলকা-নন্দা নদীতে পড়িয়াছে। মন্দাকিনী, ভাগীরথী এবং পিণ্ডারী নদীর জলধারায় পুষ্ট হইয়া, বহুদূর প্রসারিত পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া অলকানন্দা হরিদ্বারের নিকটে সমতল ভূমিতে নামিয়াছে এবং এখান হইতে গঙ্গা নামে পরিচিত হইয়া আর্য্যাবর্ত্তের ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। হিমালয় পর্ব্বতে তুষারাবৃত অঞ্চলে প্রায় প্রত্যহই বৈকালের দিকে বৃষ্টিপাত হয় এবং ছোট ছোট শিলাবৃষ্টিও হয়। ফুরকিয়া ডাকবাংলায় বহু কাল যাবৎ 'লগ-বুক' সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তাহাতে দর্শকেরা নিজ নিজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপি-বদ্ধ করিয়া যান। এরূপ চারি খণ্ড লগ-বুক আছে এবং ঐগুলিতে লিপিবদ্ধ তথ্যসমূহ খুবই চিত্তাকর্ষক। বৈকালের দিকে বৃষ্টি হওয়া সম্বন্ধে কানিংহাম সাহেব লগ-বুকে যে মন্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি :—সূর্য্যের রশ্মি হিমালয়ের বরফের উপর পড়িয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। সেজন্ত তাহা হইতে বাষ্প সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না, ফলে বরফ হইতে বাষ্পীভবন (evaporation) হয় না। কিন্তু চতুর্দ্দিকে বরফের জন্ত হিমালয়ের অত্যুচ্চ অংশ সর্ব্বদা আর্দ্রতায় (moisture) পূর্ণ থাকে এবং সূর্য্যের কিরণ এই আর্দ্রতাকে বাষ্পে পরিণত করে। এই বাষ্প হইতে মেঘের সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন মধ্যাহ্নের পর এই মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত হয়।

হিমালয় পর্ব্বতে, বিশেষতঃ গ্লেসিয়ারের নিকটে ঝরণার প্রাচুর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এলাহাবাদ বিশ্ব-বিত্তালয়ের ভূগোলের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ দুবের সহিত তথায় সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি যাহা বলেন তাহা নিম্নে লিখিতেছি। পাহাড়ের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং পাহাড়ের শৃঙ্গে পুঞ্জীভূত বরফ হইতেই এই সকল ঝরণার সৃষ্টি হইয়াছে। কতকগুলি পাথরের ভিতর দিয়া জল চুয়াইয়া যাইতে পারে এবং কতকগুলি পাথরের (যথা স্লেট পাথরের) ভিতর দিয়া তাহা সম্ভবপর

৪ নং চিত্র

হয় না। এই পাথরগুলিকে ভেদ্য (pervious) এবং অভেদ্য (impervious) পাথর বলে। ভেদ্য পাথরের ভিতর দিয়া বৃষ্টি ও বরফের জল চুয়াইয়া নীচে যায়, কিন্তু অভেদ্য পাথরের নিকট পৌঁছিয়া জল আর অধোগমন করিতে পারে না। ফলে অভেদ্য পাথরের উপরিভাগে নৈসর্গিক জলাধার সৃষ্ট হইয়া থাকে। জল পাহাড়ের ভিতর দিয়া অদৃশ্যান্বিত ভাবে বহিয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে এই জল পাহাড়ের গাত্র ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে এবং ঝরণার সৃষ্টি করিতেছে। পর্ব্বতশ্রেণীর ভিতর দিয়া ঢেউয়ের মত প্রবহ-মাণ এই জলধারার জন্তই চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত পাহাড় হইতেও আমরা ঝরণা নির্গত হইতে দেখি।

হিমালয় পর্ব্বতে ৬০০০।৭০০০ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চে "দেওদার" (pine) গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ঊর্দ্ধে কয়েক প্রকার ওক এবং চেস্‌নাট দৃষ্ট হয়। ১৩,০০০। ১৪,০০০ ফুটের ঊর্দ্ধে কোন বৃক্ষাদি দেখা যায় না। গ্লেসিয়ারের নিকটে শুধু তৃণভূমি—অতি উৎকৃষ্ট চারণ-ভূমি গ্লেসিয়ারের নিকটে দৃষ্ট হয়। আমি রাখালদিগকে হাজার হাজার ভেড়া এবং ছাগ গ্লেসিয়ারের নিকটে চারণ-ভূমিতে চরাইতে দেখিয়াছি। পশমের জন্তই এই ভেড়া ও ছাগলগুলির বিশেষ আদর। সুইজারল্যাণ্ডেও রাখালেরা গ্রীষ্মের সময় তাহাদের ভেড়াগুলিকে চরাইতে আল্পস্ পর্ব্বতের তৃণময় চারণ-ভূমিতে লইয়া যায়।

যে সকল বরফ-জমা নদী ও নালা আমরা পার হইয়া আসিয়াছি, জুনের শেষাশেষি সেগুলি গলিয়া যাইবে। প্রতিবৎসর শিখরদেশে যে সব বরফ পুঞ্জীভূত হয় তাহাও

বিগলিত হইবে, কিন্তু তাহার নিম্নে যে চিরন্তন তুষার রহিয়াছে তাহা গলিবে না।

গ্লেসিয়ার দর্শনের জন্ত দুইটি সময় নির্দ্দিষ্ট আছে—মে মাসের প্রথম ভাগে এবং অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে। অক্টোবর মাসই প্রশস্ততর সময়। লগ-বুকে দেখা যায়, পদহ অনেক লোকই অক্টোবর মাসে গ্লেসিয়ার দেখিতে যান। আমরা শীতলাক্ষেত হইতে ২৭শে মে রওনা হইয়াছিলাম এবং ১২ই জুন ফিরিয়া আসি।

পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার দর্শন বাবদে আমার মাত্র ১০০৲ টাকা খরচ হইয়াছে। স্কাউট-দলের সঙ্গে যাওয়াতেই খরচটা অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে। যাঁহারা বেশী খরচ করিতে পারেন, তাঁহারা ঘোড়া (pony) ব্যবহার করিতে পারেন। ঘোড়ার ভাড়া প্রতিদিন ৬৲ টাকা করিয়া। পাহাড়ের

৫ নং চিত্র

রাস্তায় ঘোড়া খুব হুঁসিয়ার এবং ইহার পদক্ষেপ খুব নিশ্চিত। বোঝা বহন করিবার জন্ত একজন কুলীকে রোজ ২।০ টাকা দিতে হয়। এখানকার একজন কুলী দুই জনের মাল বহন করিতে পারে। বরফের উপর চলিবার জন্ত লোহার পেরেক বসানো চামড়ার জুতা লওয়া দরকার। আমি বরফের উপর চলিতে বাটা কোম্পানীর রবার-সোল-দেওয়া ক্যাম্বাসের টেনিস শু ব্যবহার করিয়াছি।

পাহাড়ের জলবায়ুর মধ্যে একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে। কোন কোন দিন ক্লান্তিতে আমরা নির্জ্জীবপ্রায় হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু পাহাড়ের জলবায়ুর এমনই গুণ যে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর দেহে যেন আবার সঞ্জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে।

বৃদ্ধা ইউরোপীয় মহিলারাও গ্লেসিয়ার দর্শন করিতে এই দুর্গম স্থানে আসিয়া থাকেন। বোম্বাই প্রদেশের এক নবদম্পতি বিবাহের এক সপ্তাহ পরে মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্ত পিণ্ডারী গ্লেসিয়ারের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলেন। রাস্তায় তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। এলাহাবাদের আর একটি অল্পবয়স্কা মহিলাও তাঁহার ভাইয়ের সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া গ্লেসিয়ার দেখিতে গিয়াছিলেন।

গ্লেসিয়ার হইতে দেড় মাইল দূরে একটি গুহা আছে। এই গুহাতে পাঁচ ছয়-জন লোক থাকিতে পারে। এই গুহাটিও একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান। দর্শকেরা পূর্ব্বদিন বৈকালে গুহায় গিয়া রাত্রিবাস করিলে পরদিন প্রচুর আনন্দ-লাভ করিতে পারিবেন। গুহার চতুষ্পার্শ্বের স্থানগুলির মনোরম দৃশ্য দেখিয়া ভ্রমণকারীর সকল পরিশ্রম সার্থক বলিয়া মনে হইবে। রাত্রে জ্বালাইবার জন্ত পূর্ব্বাহ্নেই কিছু কাঠ কুলীর মারফত আনাইয়া রাখা উচিত। যে সকল দর্শক অতি প্রত্যূষে ফুড়কিয়া ডাকবাংলা হইতে রওনা হন, পাঁচ মাইল চড়াই অতিক্রম করিতেই তাঁহারা এত ক্লান্ত হইয়া পড়েন যে, গ্লেসিয়ারের আশেপাশের স্থানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার উৎসাহ তাঁহাদের থাকে না, বিশেষতঃ দশটার আগে বৃষ্টিপাত সুরু হইবার পূর্ব্বেই সবকিছু দ্রষ্টব্য জিনিষ না দেখিলে সারা-দিন মেঘের জন্ত কিছুই দেখিবার উপায় থাকে না। সাধুর গুহায় রাত্রিবাস করিলে, উক্ত স্থানগুলি অতি সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। (৫ নং চিত্র)

ঝঞ্ঝা

শ্রীঅমর্ত্ত্যকুমার সেন

উঠিছে মাতিয়া প্রলয় ঝঞ্ঝা ঊর্ম্মি উঠিছে উচ্ছলি,
ঘন কালো মেঘ ভরেছে আকাশ সাগর নাচিছে কল্লোলি।
থেকে থেকে হেরো বিদ্যুৎ জ্বলে মেঘ-ডম্বর-গর্জ্জনে,
ওই শোনো ঘন বজ্র হানিছে সাগরে কঠিন তর্জ্জনে।

দিকে দিকে যেন ক্ষিপ্তের দল উঠিছে সবেগে হুঙ্কারি,
সূর্য্য, চন্দ্র নিভে গেছে সব—অশনি উঠিছে ঝঙ্কারি।
চারিদিক ঘোর তমসাবর্ণ সমুখ না হয় দর্শিত
আকাশ হইতে মুষলধারেতে হইতেছে ঘন বরিষণ।

তাহার মাঝেতে উল্কা বেগেতে ছুটিছে নবীন তরণী যে,
ঢেউয়ের আঘাতে আকাশে উঠিছে নিয়ে ফেলিয়া ধরণীরে।
প্রবল বেগেতে ঊর্ম্মি-আঘাতে তরণী হবে যে নিমগ্ন,
কোথা কাণ্ডারী, এ বিপদ ভারী, আসে নি আজিকে সুলগ্ন

ভয় নাই কিছু, ভয় নাই ভাই, ভারত-মাতাই কাণ্ডারী,
প্রলয়নৃত্যে নাচুক সাগর, বাজুক দামামা ঝঙ্কারি।
ভারতভাগ্য-তরণী ছুটিবে আঁধার ভেদিয়া কল্লোলি,
উদিবে সূর্য্য, বাজিবে তূর্য্য—সাগর উঠিবে উচ্ছলি।

তাঁবু

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

১

একটা প্রবল ঝড় উঠে তাঁবুটাকে অতিমাত্রায় কাঁপিয়ে দিতে লাগল।

শুধু ঝড় নয়। শিলাবৃষ্টিও সুরু হয়েছে। অপ্রত্যাশিত দুর্য্যোগ।

জীর্ণ তাঁবু। মজবুত নয়। স্থানে স্থানে অসংখ্য ছিদ্র। ওদিকে আবার মাথার উপর একটা কাটল দেখা যাচ্ছে।

২

লোকটা কাঁসারি…বালা-কাঁসারি। বালাইয়ের কাজ করে। দুটি স্ত্রী ওর। একটি নয়…দুটি। এই দুটি স্ত্রীকে নিয়ে সে তাঁবুর মধ্যে স্তূপীকৃত খড়ের গাদার উপরে উপবিষ্ট। তাঁবুর প্রবেশপথের ফাঁক দিয়ে ওরা তিন জনেই সুমুখের জলাশয়ের পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

কারুর মুখে কোনো কথা নেই। তারা যেন মূকস্তম্ভিত।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাচ্ছিল তারা। আকাশের অবস্থা দেখে আর অগ্রসর হতে পারলে না। এখুনি আসবে ঝড়বৃষ্টি। তাই আজকের দুর্য্যোগ-রাত কাটিয়ে দিতে ওরা পর্ব্বতের একটা কন্দরাবৃত খাতে তাঁবু খাটালে। না খাটিয়ে উপায় কি!

ওদের সঙ্গে একটা গাড়ী। সেটা দেখতে অনেকটা ঠেলাগাড়ীর মত। বেশ বড়। একদিকে একটা গাধা দড়ি দিয়ে বাঁধা। বেশ নধর, গাধা।

৩

এক সময়ে কাঁসারি তাঁবুর উপরদিকে বহুক্ষণ অপলক চক্ষে চেয়ে রইল। তারপর পার্শ্বোপবিষ্টা দুটি স্ত্রীকে মৃদু ঠেলা দিলে। মুহূর্ত্তকাল পরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাঁবুর উপর দিকে কাটলটার ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

তারা উভয়েই চোখ তুলে সেদিকে চাইলে।

কিন্তু কেউ কোনো কথাই বললে না। তখন কাঁসারি শুধু নিঃশব্দে বসে বসে সিগারেট টানে, আর মুখ উঁচু করে ধোঁয়া ছাড়ে।

এমনি কিছুক্ষণ কেটে গেল।

সহসা কাঁসারির বক্ষস্থল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বাইরে বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ও মাটিতে নেমে দাঁড়ায়। দাঁড়ায় সিধে হয়ে।

বললে: তাঁবুটার মাথায় ওপর ছ্যাঁদাটা বন্ধ ছুঁচে ফেলতে হবে দেখছি।…হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ছুঁচে ফেলতে হবে। নইলে, এই বর্ষণে আমাদের…

কথাটা অসমাপ্তই রয়ে গেল।

কাঁসারি সত্য সত্যই নির্ব্বাক্যে গুটিকয়েক খালি চটের বস্তা তাঁবুটার উপরিভাগে নিক্ষেপ করতে লাগল।

৪

তাঁবুর প্রবেশপথে সামান্য একটু দক্ষিণ পাশ ঘেঁসে জ্বলছে একটা অগ্নিকুণ্ড।

কাঁসারি তাঁবুর বহির্দ্দেশে দাঁড়িয়ে। গাধাটা একটা লম্বা দড়ির সাহায্যে গাড়ীর সঙ্গে বাঁধা। হঠাৎ পদাঘাত পড়ল বেচারার পিঠে। এই আকস্মিক আঘাতের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না সে।

তা না থাকলেও ধীরে ধীরে ও এগিয়ে এল আগুনের কাছে। ভারি শীত করছে হয়ত। অগ্নিকুণ্ডে জ্বলছে কাঠের আগুন। আগুনের শিখা উঠছে…ঊর্দ্ধপানে…আকাশের দিকে।

৫

ছিদ্র-বন্ধ তাঁবু।

ঝড় তুচ্ছ করে, বৃষ্টি মাথায় করে ক্ষিপ্রহস্তে সেলাই করল, বাল-কাঁসারি নিজে তাঁবুর উপরে উঠে। লোকটা সেলাই করতেও জানে।

শুধু জানা নয়…ভাল করেই জানে।

তাঁবুর উপর থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে পড়বার উপক্রম করতেই কাঁসারির নজরে পড়ল—আধ মাইলটাক দূর থেকে একটা লোক যেন এদিক পানেই এগিয়ে আসছে। কাঁসারি দু'চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখে, লোকটা নিজের মাথাটা নীচু করে ক্ষিপ্রপদে তাঁবুর দিকেই আসছে।

কাঁসারির ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

অজ্ঞাতসারেই ওর কাঁধ দুটি নড়ে উঠল সজোরে।

৬

আগন্তুকের দেহের গড়ন অতিশয় মজবুত। বহু দীর্ঘ শরীর। ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা। মুখটা লম্বাটে ধরণের। শক্ত দুটি চোয়াল। বিষাদমাখা বড় বড় চোখ। সমগ্র মুখাবয়বে এমন একটি কাঠিন্য ও রুক্ষতার ছাপ লেগে রয়েছে যে, প্রতীতি হয়, লোকটি সৈনিক।

সৈনিক? হবেও বা!

বুক টান করে ও এসে দাঁড়ায়—দাঁড়ায় বরাবর কাঁসারির সুমুখে। লোকটার ভয়ডর নেই। নির্ভীক। ওর বেশভূষায় মার্জ্জিত রুচির পরিচয়।

দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই মুখে। সযত্নে ক্ষৌর-

কার্য্য করা। দক্ষিণ-হস্তের উল্টো পিঠটা সবুজ উল্কিতে বিচিত্রিত।

বিষণ্ণ বড় বড় চোখ দুটি মেলে আগন্তুক কাঁসারির মুখের পানে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারে না। নির্ব্বাকভাবে পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করে। প্রথমে আগন্তুকই সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। ও বললে, নমস্কার।

কাঁসারি ঘাড় নাড়ে। প্রতি-নমস্কার জানায়। কথা বলে না একটিও। একটা শঙ্কিত ভাব ওর চোখেমুখে। আগন্তুকের আপাদমস্তক বারংবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করে। ওর প্রতীতি জন্মে -আগন্তুক সৈনিক, কিম্বা পুলিসের হোমরা-চোমরা কেউ।

শেষে কাঁসারির মনে সাহসের সঞ্চার হয়। আগন্তুককে লক্ষ্য করে বললে—ভ্রমণে বেরিয়েছেন?

হাঁ, ভ্রমণেই বেরিয়েছি বটে। ঘুরে ঘুরে দেখছি—কোথাও অন্ততঃ আজকের রাতটার জন্যে একটু আশ্রয় পাই কিনা।

তাঁবুটার চারদিকে ও দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

কাঁসারি জিজ্ঞাসা করে—কত দূর যাবেন?

প্রশ্নটা মনঃপূত হয় না আগন্তুকের। বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললে, জানি নে।

ক্ষণকাল মৌন থেকে হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে। ঠিক যেন উন্মাদের চীৎকার—জানি নে, জানি নে। কতদূর যাব, কোথায় যাব আমি—জানি নে কিছুই। যাবার আমার জায়গা নেই। আমি আশ্রয়হীন। ভবঘুরে।

সমবেদনায় কাঁসারি বলে উঠল—আচ্ছা আসুন। ভেতরে আসুন আপনি।

তাঁবুর ভিতরে এল আগন্তুক। আগে কাঁসারি, পিছনে সে।

সতর্ক পদক্ষেপে কাঁসারিকে অনুসরণ করে তার স্ত্রী-দুটির সম্মুখে এসে দাঁড়াল আগন্তুক। মাথার টুপি হাতে নিয়ে সে ওদের অভিবাদন করল।

আগন্তুকের দিকে চোখ পড়তেই ফিক্ করে দু'জনেই হাসলে। আগন্তুক দৃষ্টি ফিরিয়ে এক বার সতর্কদৃষ্টিতে তাকালে কাঁসারির মুখের পানে।

অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বস্থিত একটা কাঠের বাক্সের উপর উপবেশন করল আগন্তুক। ঠাণ্ডায় তার হাত দুটি অসাড় হয়ে আসছে। বিনা বাক্যব্যয়ে ও আগুন পোয়াতে লাগল।

কাঁসারি সৌজন্য দেখাতে আগন্তুকের চোখের উপর একটা সিগারেট তুলে ধরল। বললে: সিগারেট—সিগারেট খাবেন একটা?

আগন্তুক শুধু ঈষৎ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। কোন কথা বলে না। হাতটা এক সময়ে বাড়িয়ে দেয়।

সিগারেট ধরায় আগন্তুক। ঘন ঘন টান দেয়। ভারি জোর টান। মুখভর্ত্তি ধোঁয়া ছাড়ে—ঊর্দ্ধপানে। সর্পিলাকারে ধোঁয়া যায় আস্তে আস্তে তাঁবুর বাইরে।

কাঁসারির দুটি গৃহিণী দু'রকম আকৃতি প্রকৃতির। একটির বিপরীত আর একটি। বড়-গিন্নীর মাথার চুল কুচকুচে কালো, সুবিন্যস্ত। চোখ দুটিও গভীর কালো, কটা নয়। মুখের চেহারা রুক্ষ। লালিত্যের অভাব। কেমন যেন পুরুষালি ভাব। অতিমাত্রায় আত্মসচেতন এবং সাবধানী। চেহারা মোটাসোটা।

ছোট-গিন্নীকে সুন্দরী বলতে দ্বিধা হয় না আদৌ। পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত সাধারণ। চুলের রঙ কালো নয়, সোনালী। মাথাটি ছোট। চোখ দুটি ভাসাভাসা—নীল আকাশের মতই স্বচ্ছ। পাতলা ঠোঁট। শাদা ধবধবে দাঁতের সারি। ইঁদুরের মত, ছোট ছোট দাঁত। উন্নত গ্রীবা। দেহ রোগাও নয়, মোটাও নয়। দোহারা চেহারা। সামঞ্জস্যপূর্ণ অপূর্ব্ব দেহশ্রী।

৮

অতিথিসৎকারের আয়োজন করতে হবে। বড়-গিন্নী কিটি স্বামীর আদেশ পেয়ে উঠে দাঁড়াল। একটা কালো রঙের জল-ভরা পাত্র আগুনের উপর বসিয়ে দিলে। রান্না সুরু হ'ল।

আগন্তুক ক্ষণকাল কিটির কর্ম্মব্যস্ত হাতের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠল—চমৎকার!

কাঁসারি ওর ঐ কথায় ফিরে তাকালে। বললে—চমৎকার? কি চমৎকার?

আগন্তুক এ প্রশ্নের জবাব দেয় না। মৃদু মৃদু হাসে। হাসতে হাসতেই জামার বুকের পকেট থেকে হুইস্কির একটা বোতল বের করে সকলের চোখের উপর তুলে ধরে। বলে: এই আমার একমাত্র সম্বল। শুধু এটি সঙ্গে করেই আমি চলে এসেছি। এ ছাড়া দ্বিতীয় সম্বল আমার নেই।

মদের বোতল দেখে কাঁসারির চোখ দুটি নিমেষের মধ্যেই অসম্ভব বিস্ফারিত হয়ে উঠল। ভয়ে নয়, একটা চাপা খুশিতে?

ওদিকে ছোট-গিন্নী তখনও একপাশে উপবিষ্ট। ওরও বোতলটির উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে।

ঔৎসুক্যব্যাকুল নেত্রে আগন্তুকের মুখপানে থাকে চেয়ে ও। শুধু চেয়েই থাকে না, জিবটা গালের ভিতর দিয়ে বারকয়েক বুলিয়ে নেয়।

নেশার লোভ জেগেছে হয় তো।

কিটিও ফিরে তাকায়। চোখে তারও প্রলুব্ধ দৃষ্টি।

ওদের মনের অভিলাষ আগন্তুকের নজরে ধরা পড়ে যায়।

বলে—এসো না, সকলে মিলে একটু একটু ভাগ নি।...

আঃ, কি মুশকিল! ছিপিটা যে খোলা যাচ্ছে না ছাই! তোমাদের কারুর কাছে একটা কর্ক-স্ক্রু আছে? কর্ক-স্ক্রু?

কাঁসারি কান খাড়া করে শোনে ওর কথা। পকেট থেকে একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি বার করে। ছুরিটার এক ধারে একটা কর্ক-স্ক্রু।

টক্ করে ছিপি খোলার শব্দ হ'ল। আগন্তুকের হাত থেকে বোতলটা কাঁসারি চিলের মতই ছোঁ মেরে নিয়ে সজোরে বুকে আঁকড়ে ধরে! ভারি খুশী হয়ে উঠেছে মন। বেশ লাগছে ওর।

কিটির পাশে এসে দাঁড়াল কাঁসারি। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে—খাবে?

ফিক্ করে হেসে ফেললে কিটি। কোন কথা কইলে না। শুধু হাতের পাশ থেকে একটা পাত্র তুলে নিয়ে স্বামীর হাতে দিলে।

৯

আগন্তুক বলে—কি মজার ব্যাপার! মানুষ যখন খিদের জ্বালায় ছটফট করতে থাকে, তখন খেতে পায় না সে। কাছে পায়—এক বোতল মদ। খাদ্যের চেয়ে মদ পাওয়া তার পক্ষে সোজা·· সুলভ।

এক মুহূর্ত নীরব থেকে পুনশ্চ বলে—আজ সকাল বেলায় ডাব্লিন শহরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পথে হঠাৎ দেখা। সে জানে, আমি একেবারে ফতুর। নেই কিছুই। এক বেলা আহারের পর্য্যন্ত কোন সংস্থান নেই আমার। এ কথা জেনেও সে আমাকে খাবার জন্যে অনুরোধ করলে না। টাকাও দিলে না, দিলে—ঐটে, ঐ হুইস্কির বোতলটা। সারাটা দিন ওটাকে সযত্নে পকেটে নিয়ে ঘুরেছি রাস্তায় রাস্তায়। কোথাও খুলি নি। চেষ্টাও করি নি।

কাঁসারি সেকথার উত্তরে কিছু বললে না। হঠাৎ অন্য কথা পেড়ে বসল। জিজ্ঞেস করলে, আপনি কি এই মহল্লায় থাকেন?

আগন্তুক অপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

এই মহল্লায় থাকি মানে? হুঃ! জীবনে এখানে আমি এর পূর্ব্বে আর পদার্পণ করি নি। এই প্রথম এবং হয় তো এই শেষ।

কিছুক্ষণের জন্য মৌন হয়ে থাকে আগন্তুক।

আবার বলে—গতকাল ডাব্লিনের একটা কারখানায় একটা কাজ জুটিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার! কর্তৃপক্ষ সদয় হলেন না। আমাকে দিলেন তাড়িয়ে। যাক—আবার সম্ভবতঃ সৌভাগ্যের মুখ দেখব। সেই সৌভাগ্য তোমার এই আশ্রয়টাকেই অবলম্বন করে হয় তো গড়ে উঠবে। ভগবানকে ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ!

১০

আগন্তুক এক সময়ে বললে—আমার নাম—কার্ণে।

কেউ জিজ্ঞাসা করে নি ওর নাম, ও বললে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই।

—আমি বার্ণে, জো বার্ণে। কাঁসায় কালাইয়ের কাজ আমার।—বললে কাঁসারি।

—ওঃ, জো বার্ণে? কাঁসারি—কাঁসারির কাজ করো?

—হাঁ।

—ভাল।

কার্ণে মৌন হয়ে থাকে। একটু পরে বলে—শোন। দু'মাস আগেও আমি সৈন্যবিভাগে সার্জেন্ট-মেজর ছিলাম। এখন? এখন আমি ভবঘুরে। কোন আশ্রয় নেই, কাজকর্ম্ম নেই। আজ আমি নিরাশ্রয়, অকেজো, নিঃস্ব! পথে পথে ঘুরে বেড়াই। যদি একে কাজ বল, তবে এই আমার সেরা কাজ!

একটা দীর্ঘশ্বাস ওর বুকখানা মথিত করে বাইরে বেরিয়ে আসে।

১১

রাত্রি তখন ক'টা কে জানে! ঝড়-জল-শিলাবৃষ্টি থেমেছে।

জো বার্ণে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলে।

ওপাশে খড়ের গাদার ওপর কিটি একখানা চাদর বিছিয়ে শুয়ে। ঘাড়টা ঈষৎ উপরদিকে তুলে স্বামীকেই উদ্দেশ করে বললে: আমাকে একটা দাও ত!

জো বার্ণে নিঃশেষিত সিগারেট-কেসটা খুঁজে তুলে ধরে। দুর্ভাগ্য! সিগারেট একটিও নেই।

কার্ণে দেখতে পায়।

বলে: নেই? তাতে কি? আমার কাছে আছে। কত চাই?

পকেট থেকে ও সিগারেট বার করে। একটা ছুঁড়ে দেয় কিটির দিকে।

১২

হুইস্কির বোতলটা কার্ণের হাতেই ধরা।

সবাই মিলে সুরাপান করেছে ভাগাভাগি করে। জো বার্ণে, কিটি এবং তার সতীন। কেউ বাদ যায় নি। কার্ণেও পান করেছে।

কিন্তু আরও চাই। আকাঙ্ক্ষা মেটে নি!

কার্ণে বাকীটুকু গলার ভেতরে ঢেলে দিলে।

বিরক্ত হয়ে বললে: দুত্তোর! গলাই ভিজল না।

হঠাৎ বার্ণে ছিনিয়ে নেয় বোতলটা।

মাথাটা ঘাড়ের দিকে কাত করে হাঁ করে! বোতলটা তুলে ধরে মুখ-গহ্বরে। দু'চার ফোঁটা তরল-পদার্থ ছিটকে

আসে। জিব দিয়ে চাটতে চাটতে বললে : যুে হাই। বোতল একেবারে চাঁচা-পোঁছা।

ক্রোধের আতিশয্যে শূন্য বোতলটা বাইরে নিক্ষেপ করে।

১৩

কি জানি কেন, জো বার্গে আর কিটি তাঁবুর বাইরে যায়।

বার্গের ছোট গিন্নী হঠাৎ উঠে এল কার্গের কাছে। নিঃসঙ্কোচে বসে পড়লে তার পাশে।

কার্গে এরই প্রতীক্ষায় ছিল হয়ত।

বার্গের বৌ জিজ্ঞেস করে :—

—আপনার ভাল লাগে আমাকে ?

—ভারি ভাল লাগে।

—যেৎ, মিথ্যে কথা! হেসে গড়িয়ে পড়ল লাবণ্যময়ী।

কার্গের সংযমের বাঁধ বুঝি ধ্বসে যায়।

বঙ্কিম কটাক্ষে কার্গের মুখের পানে চায় মেয়েটি। মুখে তার হাসির রেখা।

কার্গেও নিঃশব্দে হাসে।

ধীরে ধীরে একটু একটু করে এগিয়ে আসে সে। তারা দু'জনে ঘনীভূত হয়ে বসে।

১৪

—আচ্ছা এখন যদি বার্গে এসে পড়ে ? কার্গে বললে।

—বার্গেকে তা হলে ভয় করছেন ? রূপসী বললে।

—ভয় ? না, ভয় আমি করিনে। কাউকেই না। ভগবানকেও না। কম্পিত কণ্ঠে কার্গে বললে।

১৫

সহসা তাঁবুর প্রবেশ-পথ থেকে একটা ফিস্‌ফিস্ শব্দ আসে। দু'জন যেন কানে কানে কি বলছে।

জ্যা-মুক্ত ধনুকের মত সিধে হয়ে দাঁড়ায় কার্গে।

সর্ব্বনাশ! দোরগোড়ায় বার্গে আর কিটি দাঁড়িয়ে। কখন এল ওরা, কে জানে!

জো বার্গে একেবারে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে।

কিন্তু কিটিকে দেখা যায় ওর পিছনে। দেহটা তার অদৃশ্য থেকে যায়, শুধু ওর মুখখানাই তাদের নজরে পড়ে।

স্বামীর কাঁধের ওপর দিকে মাথাটা বাড়িয়ে দিলে কিটি। ও হাসে। শব্দ-হীন রহস্যময় হাসি!

১৬

—শোন এদিকে। বাইরে এস বেরিয়ে।

জো বার্গে বললে বজ্রগম্ভীর স্বরে।

ধক্ ধক্ করে জ্বলছে যেন ওর গোলাকার চোখ দুটি। বুঝিবা এখুনি, এই মুহূর্ত্তে ঝলকে ঝলকে আগুন ঠিকরে আসবে। পুড়িয়ে ছাই করে দেবে তাকে। বিশ্বাসঘাতক আগন্তুক...কার্গে!

তাঁবুর বাইরে আসতেই লাফ দিয়ে পড়ে জো বার্গে কার্গের ঘাড়ের উপর। সিংহ যেমন করে শিকার ধরে, তেমনি।

অমন দীর্ঘ সবল দেহ। তবু কার্গে তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। আর্ত্তনাদ করে উঠে : ছেড়ে দাও...ছেড়ে দাও...মরে গেলুম রে বাবা...খুব হয়েছে...আরনা—আরও গোটাকয়েক ঘুষি মেরে জো বার্গে ক্ষান্ত হ'ল।

উভয়েই কোঁস কোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে, হাঁপায়। হাঁপাতে হাঁপাতে জো বার্গে গিয়ে দাঁড়াল ওদিকটায়।

কিন্তু তখনও কার্গে ওঠে নি। পারে না উঠতে। কিটি ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল—দু'হাত দিয়ে জোর করে ওকে তুলে দাঁড় করায় কিটি। রক্ত...রক্ত। ঝর্ ঝর্ করে টাটকা রক্ত ঝরে পড়ছে কার্গের কপাল বেয়ে।

কিটি মুছিয়ে দেয় নিজের পরনের পোশাক দিয়ে।

জো বার্গের মনে লেশমাত্রও করুণা জাগে না। মুখখানা অতি বিশ্রী করে গালাগাল দিতে থাকে।

কার্গে ভ্রূক্ষেপ করে না। কান দেয় না সে কথায়। টলতে টলতে সে তাঁবুটাকে পিছনে ফেলে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে থাকে। ডান হাতখানা মাথার উপর তুলে অস্ফুটে বলে : ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

ঝড়-বৃষ্টি-শিলাবর্ষণ আবার সুরু হ'ল।*

* আইরিশ লেখক লিয়াম ওফ্লেহার্টির গল্প অবলম্বনে।

সমবায়

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, এম-এ

সন্নিকর্ষ ও সমবায়

এক বর্ণের পর অন্য বর্ণের সন্নিকর্ষকে ব্যাকরণকারগণ সংহিতা বলিয়াছেন। [পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা, পা ১।৪।১০৯।] ন্যায়-শাস্ত্রমতে লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে সন্নিকর্ষ দুই প্রকার। উভয় সন্নিকর্ষে ব্যাকরণের বর্ণসন্নিকর্ষ নামে কোনও বিভাগ নাই, তবে লৌকিক সন্নিকর্ষের ছয় বিভাগের মধ্যে 'শব্দস্থ সমবায়তঃ' অর্থাৎ শব্দ-সমবায় স্বীকৃত হইয়াছে।

সমবায় বৈয়াকরিক সংজ্ঞা; ব্যাকরণে ইহার বিশেষ প্রচার নাই, তবে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁহার পস্পশাহ্নিকে বলিয়াছেন, 'বৃত্তি সমবায়ার্থো বর্ণানামুপদেশঃ।' বৃত্তি

শব্দে শক্তি ও লক্ষণার অন্যতর সম্বন্ধ—বৃত্তিশ্চ শক্তি লক্ষণান্যতর সম্বন্ধঃ (ভাষা পরিচ্ছেদ ৮১ কারিকার সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী) এবং শক্তি বলিতে পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ (শক্তিশ্চ পদেন সহ পদার্থস্য সম্বন্ধঃ ; ভাষা পরিচ্ছেদ—ঐ) বুঝায়। উপদেশ বুঝিতে যে প্রাচীন কারিকা প্রচলিত আছে—ধাতুসূত্র গণোনাদি বাক্যলিঙ্গানুশাসনম্। আগম প্রত্যয়াদেশা উপদেশাঃ প্রকীর্তিতাঃ। তাহার মধ্যে আগম ও আদেশ এই উভয় প্রকার উপদেশ সংহিতায় স্বীকৃত হয়। এই দুই প্রকার উপদেশই বৃত্তি সমবায়ের কারণ, অতএব মহাভাষ্যকার মতে পদ, পদার্থ ও লক্ষণার সম্বন্ধ-সমবায় জন্যই আগম বা আদেশের আবশ্যকতা।

ন্যায়মতে নিত্যসম্বন্ধই সমবায়ত্ব অর্থাৎ যাহা নিত্য ও সম্বন্ধ স্বরূপ তাহাই সমবায়। উহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইলেও পাশ্চাত্য ন্যায়মতে আবার উপমান (analogy) সিদ্ধ। দীধিতিকার পদার্থতত্ত্ব নিরূপণে সমবায়কে যে নানা পদার্থ বলিয়াছেন [সমবায়োঽপি চনৈকো… পরন্ত নানৈব পদার্থতত্ত্ব নিরূপণম্ ; ১৬ পৃঃ] তাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ন্যায়মতের সামঞ্জস্যসাধক। প্রভাকর মতে এই সমবায় নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। নিত্য অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সমবায় অনিত্য। নিত্যানিত্য বা অনিত্য অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সমবায় অনিত্য। যাহা হইতে কার্য উৎপন্ন হয় তাহা হইতেই এই অনিত্য সমবায়ের উৎপন্ন হইয়া থাকে—ইহাই প্রভাকর সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। কিন্তু অনিত্য ভাব পদার্থমাত্রই সমবায়ী কারণ, অসমবায়ী কারণ ও নিমিত্ত কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা ন্যায় বৈশেষিক সিদ্ধান্ত এবং প্রভাকরেরও স্বীকৃত। উভয়প্রকার সমবায়কে একত্রে বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, সন্নিকর্ষের অন্যতম বিভাগ শব্দ-সমবায় সংহিতার কারণ বলিয়া অনিত্য সমবায় এবং আগম ও আদেশের নিমিত্ত কারণ বৃত্তি-সমবায় নিত্য সমবায়ের শ্রেণীভুক্ত।

বাংলা সন্ধি বা সংহিতা অনিত্য হইলেও সংস্কৃত ভাষায় সংহিতা নিত্য। স্বর সন্ধিতে কয়েকটি বিষয়ে প্রগৃহ্য নির্দেশ দ্বারা ব্যতিক্রম বিধি থাকিলেও সংস্কৃতে একাধিক স্বরের সমাবেশ অসম্ভব। বাংলাভাষায় পাঁচটি স্বরেরও একটি সমাবেশ হইতে পারে। ব্যঞ্জনসন্ধির যে সকল নিয়ম সংস্কৃত ভাষা মানিয়া চলে তাহাতে ব্যতিক্রমদুষ্টি নাই, কিন্তু বাংলাভাষা এ বিষয়েও নিজস্বপন্থী। বাংলায় সু বিভক্তি না থাকিলেও সম্রাট্, বণিক প্রভৃতি পদ এবং দিগকে, কে প্রভৃতি বিভক্তিযোগে ঝলাং জশোঽন্তে ; পা ৮।২।৩৯ এবং ঝলাং জশ্‌ঝশি ; পা ৮।৪।৫৩ সূত্র অমান্য করিয়া বিভ্রাটকে, সম্রাট-দিগকে ঋত্বিকের, বিরাটকে বিভ্রাটটি প্রভৃতি পদ সিদ্ধ হয়।

বাংলা ব্যাকরণে বহুকারণে ১মার একবচনে সু বিভক্তিকে স্বীকার করার আবশ্যকতা আছে কিন্তু এরূপ স্বীকৃতি দ্বারা "ঝলাং জশোঽন্তে ; পা ৮।২।৩৯" এবং "ঝলাং জশ্ ঝশি পা ৮।৪।৫৩" সূত্রদ্বয়ের অনিবার্যতায় প্রতিরোধ করা যায় না। সু বিভক্তির ধর্ম বাংলা ভাষায় আরোপ জন্য উৎপন্ন অতিদেশের সহিত উক্ত দুই নিয়ম সূত্রের বাংলায় আরোপে বিরোধ নাই বরং ইহাদের সমবায়েই বাংলা ব্যাকরণের সন্ধি অধ্যায় গঠিত হয়। ন্যায়শাস্ত্রেও নিয়ম এই যে, স্বরূপ সম্বন্ধ বিশেষ এব—তথা প্রতীতি নিমিত্তমিতি চেন্ন সমবায়োচ্ছেদ প্রসঙ্গাৎ—পদার্থতত্ত্ব নিরূপণম্, পৃঃ ৭৭। অতএব এই দুই সূত্রনিয়মে—ঋত্বিগ্‌গণ বিভ্রাড্ডের, সম্রাড্‌দিগকে প্রভৃতি পদ সিদ্ধ হওয়া উচিত।

কিন্তু বাংলায় কুত্রাপি এ প্রকার শব্দরূপ প্রত্যক্ষ হয় না। ন্যায়শাস্ত্র মতে—সম্বন্ধস্য পরিচ্ছেদ সংজ্ঞয়া সজ্ঞিনাসহ। প্রত্যক্ষা-দেব সাধ্যত্বাদুপমান ফলং বিদুঃ—কুসুমাঞ্জলি ।৩।১০। অতএব কোন্ উপমান প্রয়োগে প্রচলিত রূপ স্বীকার করা যায়? সিদ্ধান্ত কৌমুদীকার ভট্টোজি দীক্ষিত একটি সূত্রদ্বারা সংসর্গ বা সম্বন্ধ বিশেষের অদ্ভুতত্ব নিরূপিত করিয়াছেন, অথ বিভক্ত্যর্থাঃ অধ্যায়ে ১ম সূত্র অর্থাৎ পাণিনি ২।৩।৪৬ সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন—প্রত্যয়ার্থে পরিমাণে প্রকৃত্যর্থোঽভেদেন সংসর্গেণ বিশেষণম্ অর্থাৎ পরিমাণ প্রভৃতি-সূচক প্রত্যয় প্রকৃতির সহিত অভেদ সংসর্গ বা সম্বন্ধ সৃষ্টি করিলে প্রত্যয়ের বিশেষণ সংজ্ঞা হয়। "বিভ্রাটটি" শব্দে "টি" প্রত্যয় দ্বারা "বিভ্রাট" শব্দের সহিত অভেদসংসর্গ সৃষ্টি করায় "টি" শব্দ বিশেষণ অর্থাৎ প্রত্যয় নহে পদ এবং সেই কারণে ইহাকে নির্দেশক বা article বলা যায় এবং বাংলায় সমাসভিন্ন অন্যত্র বিশেষ ও বিশেষণ পদে অর্থাৎ অবচ্ছেদকত্ব সম্বন্ধে সন্ধি হয় না বলিয়া "বিভ্রাটটি" পদে সন্ধি (ট-বর্গ বর্গীয় ৩য় বর্ণ নহে বলিয়া পাণিনি ছাড়া অন্য সংস্কৃত ব্যাকরণমতেও সন্ধি নিষেধ) আবশ্যক নাই। বিভক্তিমাত্রই প্রত্যয় এই মহাসংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় "এর (এ সর্বনামের বিভক্তিযুক্তরূপ), গুলি, গণ, দিগকে" প্রভৃতি বিভক্তিও "ঋত্বিক, বিরাট, সম্রাট, বিভ্রাট প্রভৃতি পদের সহিত টি-নির্দেশকের ন্যায় অভেদ সংসর্গ সৃষ্টি করিয়াছে এবং অভেদসংসর্গকেই উপমানরূপে সন্ধি নিয়ম-ভঙ্গের বা বৈশিষ্ট্য সিদ্ধির কারণ ধরা যাইতে পারে। কাজেই "ঋত্বিকগণ, বিভ্রাটের, সম্রাটদিগকে" প্রভৃতি ব্যাকরণ-বৈশিষ্ট্য পদ ন্যায়শাস্ত্র (Inductive Systom>Induct=সমুপস্থিত বা সমানীত=সমবেত=উদ্বোধিত অর্থাৎ Inductive system=সমবায় প্রকরণ) অনুসারে সিদ্ধ।

অতএব সন্নিকর্ষ, পৃথকত্ব, উপমান, প্রত্যক্ষ প্রভৃতির সমবায়েই বাংলার শব্দবৈচিত্র্য স্বীকার্য হইতেছে। পদার্থতত্ত্ব নিরূপণেও তার্কিক শিরোমণি রঘুনাথ বলিয়াছেন—বৈশিষ্ট্যমপি পদার্থান্তরম্ অর্থাৎ এই সকলের সমবায়ই ন্যায়-শাস্ত্রের অন্যতম বিভাগ।

সমবায়ের স্বরূপ

ন্যায় ও বৈশেষিক মতে—

দ্রব্যং গুণস্তথা কর্ম সামান্যং সবিশেষকম্
সমবায়স্তথাঽভাবঃ পদার্থাঃ সপ্তকীর্তিতাঃ ॥
(ভাষাপরিচ্ছেদ—২য় কারিকা)

এই সপ্ত পদার্থের মধ্যে অভাব এবং গুণের অন্যতম বিভাগ অদৃষ্টকে প্রতিযোগীরূপে উপস্থাপিত করিয়া সমবায়ের স্বরূপ আলোচনা করা যাইতেছে।

পাণিনি বলিতেছেন—চোঃ কুঃ (৮।২।৩০) এবং ব্রশ্চভ্রস্জ সৃজ মৃজ যজ রাজ ভ্রাজ চ্ছশাং ষঃ (৮।২।৩৬)। প্রথমটির অর্থ এই যে, ঝল্‌সংজ্ঞক অর্থাৎ বর্গের পঞ্চম বর্ণ এবং য, র, ল, ব, হ ভিন্ন ব্যঞ্জন বর্ণাদি প্রত্যয়ের পূর্ববর্তী চ-বর্গ ক-বর্গ হয় এবং দ্বিতীয়টির অর্থ এই যে, অনুরূপ প্রত্যয়ের পূর্ববর্তী ব্রশ্চ-প্রভৃতি সাতটি ধাতুর চ ও জ-কার এবং ছ ও শ-কারান্ত ধাতুর ছ ও শ-কার ষ-কারে পরিণত হয়। পাণিনি গৃহীত মাহেশ্বর সূত্রানুসারে স-বর্ণ ঝল্‌সংজ্ঞক বর্ণ এবং সেজন্য স-বিভক্তি পরে থাকিলে প্রথম সূত্রানুসারে সম্রাজ্, বিরাজ্, বিভ্রাজ্ প্রভৃতি শব্দের জ-কার ষ-বর্ণে পরিণত হয়। ইহা ছাড়া "ষ্টুনা ষ্টুঃ ; পা ৮।৪।৪১" এবং "ষটুরষাভ্যাম্ মূর্ধাঃ" এই শিক্ষা সূত্রানুসারে দ্বিতীয় সূত্রফলে আদিষ্ট ষ-কার ট-বর্গে পরিণত হয়।

হল্ঙ্যাব্ভ্যো দীর্ঘাৎ সুতিস্যপৃক্তং হল্ ; পা ৬।১।৬৮ সূত্রানুসারে হলন্ত বর্ণের পরবর্তী সু বিভক্তির লোপ হয়। এখন বিবেচ্য এই যে ষ-কারের এই ট-বর্গ প্রাপ্তি পাণিনি অনুসারে সু বিভক্তির লোপের পূর্বে না পরে। সু বিভক্তির লোপের পর এই প্রাপ্তি ঘটিলে "ঝলাং জশোঽন্তে ; পা ৮।২।৩৯" সূত্রপ্রাপ্তি অনিবার্য হইয়া পড়ে এবং ফলে পাণিনি ১।১।৫০ সূত্রানুসারে "বণিগ্, ঋত্বিগ্, সম্রাড্, বিরাড্, বিভ্রাড্" প্রভৃতি ঘোষ বর্ণান্ত পদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু বাংলায় কেবলমাত্র এবং সংস্কৃতে বিকল্পে "বণিক, ঋত্বিক, সম্রাট, বিরাট, বিভ্রাট," প্রভৃতি অঘোষ বর্ণান্ত পদই স্বীকৃত। অতএব শব্দগুলির অন্ত্যবর্ণ স্থানে অঘোষ বর্ণ প্রাপ্তি সু বিভক্তি লোপের পূর্বেই ঘটে, ইহা স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই।

এখন বিবেচ্য এই যে, "দিগকে, গুলি, এর" প্রভৃতি বিভক্তি বা গণ (এর-কে "এ" সর্বনামের বিভক্তিযুক্ত রূপ ধরিলে তাহাও এই শ্রেণীভুক্ত হয়) প্রভৃতি পদ বা বিভক্তি যোগে শব্দগুলির কিরূপ অবস্থা হইবে। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন এই যে "এর" এই স্বরাদ্য শব্দটি ছাড়া অন্যগুলির যোগে উক্ত শব্দগুলি সু বিভক্তির অপেক্ষা না রাখিয়াই "ঝলাং জশ্ ঝশি ; পা ৮।৪।৫৩" নিয়মে এবং এর প্রভৃতি স্বরাদ্য শব্দযোগে উক্ত রূপেই ঝলাংজশোঽন্তেঃ, পা ৮।২।৩৯ নিয়মে শেষ বর্ণের পরিবর্তে বর্গ তৃতীয় বর্ণ প্রাপ্তি হয়। সু বিভক্তির ক্রিয়াও লোপের পর ইহাদের সন্নিকর্ষেও অনুরূপ ক্রিয়া সুনিশ্চিত।

কিন্তু বাংলায় এই তৃতীয় বর্ণান্ত রূপ একেবারে অস্বীকৃত। কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে সু বিভক্তি বর্তমানেই অঘোষ বর্ণ প্রাপ্তিকে আশ্রয় করিয়াই অন্য বিভক্তির যোগ হয় এবং সেই আশ্রয় নাশ না করিয়াই বিভক্তিগুলির ব্যধিকরণ হয়; নচেৎ প্রচলিত রূপ আমরা দেখিতে পাই না। বাংলায় সু-বিভক্তি যোগের পর অন্য বিভক্তি যোগ স্বীকার করিলে ন্যায়-শাস্ত্র মতে অন্য বিভক্তির আশ্রয় সু বিভক্তির নাশ অসিদ্ধ হয়, কারণ নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ভাষা পরিচ্ছেদ ১১৩নং কারিকায় সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীতে বলিয়াছেন—পৃথক্ প্রত্যয় সাধারণ কারণম্ পৃথক্ত্বম্।...আশ্রয়নাশান্নশ্যতি। কাজেই সু বিভক্তির অদৃষ্ট অবস্থা লক্ষিত হইলেও বাংলায় লোপাবস্থা স্বীকৃত হইবে না।

কিন্তু সু বিভক্তির এই অদ্ভুত লক্ষণের স্বরূপ কি। ন্যায়-শাস্ত্র মতে সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব বা ভেদ এই দুই প্রকার অভাব এবং সংসর্গাভাব আবার প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব এই তিন ভাগে বিভক্ত। কিন্তু সু বিভক্তির লক্ষণে ইহাদের কাহারও সহিত মিল নাই, তবে নৈয়ায়িক শিরোমণি তাঁহার সিদ্ধান্ত লক্ষণ দীধিতি গ্রন্থে বলিয়াছেন—ন চ সংসর্গাভাব বিশেষোঽত্যন্তাভাবঃ, সংসর্গাভাবত্বঞ্চ সংসর্গা-রোপ জন্য প্রতীতি বিষয়াভাবত্বরূপং, জন্যতা ঘটক নিয়ম ঘটিতমিতিবাচ্যম্, ১১৫।৬ পৃষ্ঠা। কাজেই সু বিভক্তির এই লক্ষণকে জন্যতা ঘটক নিয়ম ঘটিত অতিরিক্ত সংসর্গাভাব বলা চলে। আচার্য উদয়নও বলিয়াছেন—সংসৃজ্যমান প্রতিযোগি-নিয়প্যোঽভাবঃ সংসর্গাভাবঃ—কিরণাবলী (৩২৯ পৃ)।

সুপরিচিত প্রাচীন কারিকামতে—

শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান
কোশাপ্তবাক্যাদ্‌ব্যবহারতশ্চ।
বাক্যস্য শেষাৎ বিবৃতের্বদন্তি
সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধ পদস্য বৃদ্ধাঃ ॥

এবং এই প্রমাণে ব্যবহার ও শক্তিগ্রাহক। কিন্তু তাহাতেও প্রশ্ন জাগে এই যে উল্লিখিত পদগুলিতে বর্গীয় তৃতীয় বর্ণান্ত পদ ব্যবহার করিলেও কি তাহা স্বীকৃত হইবে। ইহার উত্তর এই যে সু বিভক্তির অভাব লক্ষণে সংসৃজ্যমান বা ঘটকাবস্থা আছে এবং এই সংসৃজ্যমান অবস্থার ফলে লক্ষণা না থাকিলেও উদ্বোধক শক্তিদ্বারা তাৎপর্য গ্রাহক হয়। মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য তাঁহার শক্তিবাদ গ্রন্থে বলিয়াছেন—উদ্বোধকাত্তরোপস্থিতেঽপি সংসর্গে তাৎপর্য গ্রহ-সম্ভবাচ্চ বৃত্তিজ্ঞানজন্যাপেক্ষিতত্বাৎ ৩৯ পৃঃ।

ন্যায়শাস্ত্র মতে ব্যধিকরণ ও সমানাধিকরণ পৃথক বস্তু। দীধিতিকার রঘুমণির অবচ্ছেদকত্ব নিরুক্তি মতে—অভাবশ্চ প্রতিযোগিব্যধিকরণো বোধ্যঃ। কাজেই অভাব ও প্রতি-যোগীর লক্ষণ যেখানে আছে সেখানে ব্যধিকরণ স্বীকার করিতে

হয়। বাংলায় এই যে সু বিভক্তির যোগকে আশ্রয় করিয়াই অন্ত বিভক্তির যোগ হয় তাহাদের ব্যধিকরণ বলিতে হয়, সমানাধিকরণ বলা যায় না ; কারণ মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য সামান্ত নিরুক্তি প্রকরণে বলিয়াছেন—আশ্রয়াসিদ্ধিশ্চ তৎ সামানাধিকরণ্যেন তদবচ্ছেদেন বা বিশেষ গুণবত্বম্, পৃঃ ২৩৬। প্রতিযোগীর লক্ষণ সম্বন্ধেও একটা কথা মনে রাখা দরকার এই যে সংসর্গাভাবের প্রত্যক্ষে প্রতিযোগীর যোগ্যতা আপেক্ষিত-সংসর্গাভাব প্রত্যক্ষে প্রতিযোগিনো যোগ্যতা… ২পেক্ষিতা (ভাষাপরিচ্ছেদ—৬২ কারিকার সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী)।

কৌণ্ডভট্ট তাঁহার পদার্থদীপিকায় বলিতেছেন—"অযুত-সিদ্ধানাং সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ" এবং বিনাশক্ষণ পর্যন্তং যয়োরাশ্রয়া-শ্রয়িভাবস্তাবযুত সিদ্ধৌ। কাজেই বাংলায় ১মা ১বচন বিভক্তি-যোগ স্থলে যে সম্বন্ধ তাহা সমবায়।

সমবায়ের লক্ষণ

পূর্বাচার্যগণ বলিয়াছেন—স্তায়মতে সমবায়ঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধঃ অর্থাৎ স্তায় মতে সমবায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার। পৃথক্ পৃথক্ কতকগুলি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া প্রকৃত ব্যাপারবোধক নিখিলসাধ্য নির্ব্বক্তিতে (universal proposition) উপস্থিতিকেই সমবায়ী সাধ্যাভাব (inductive inference) বলে। সাধ্যাভাব ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগী—সাধ্যাভাব ব্যাপকী-ভূতাভাব প্রতিযোগিত্বমিত্যর্থঃ [ভাষা পরিচ্ছেদ—১৪২ কারি-কার সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী] এবং তাহা পৃথিবীত্বাবচ্ছেদে অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে (সাধ্য) সিদ্ধ হয়—সাধ্য প্রসিদ্ধিস্ত…পশ্চাৎ পৃথিবীত্বাবচ্ছেদেন সাধ্যত, ইতি বদন্তি [ঐ]। কাজেই সাধ্যাভাব বা সমবায়ী অবধারণ প্রত্যক্ষ এবং প্রাকৃতিক সমত্ব (uniformity of nature) সিদ্ধ একটি বিশ্বব্যাপক প্রকৃত নির্ব্বক্তি মাত্র। ইহার লক্ষণ বুঝিবার জন্ত ত্রিবিধ বিষয়ে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য :—

১। সমবায়ের দ্বারা যে নির্ব্বক্তি সিদ্ধ হয় তাহা সাধারণ সংস্কার (notion) হইতে পৃথক্। সংস্কার সাধারণতঃ কোন এক ভাবনা (idea) বা গুণ (quality) বিশেষ মাত্র কিন্তু সমবায়ী নির্ব্বক্তি (inductive proposition) দুইটি সামান্ত সংস্কারের সম্বন্ধ বুঝায়। ভাবনা বা গুণের বহুত্ব জন্ত সংস্কারের জটিলতা হইতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ স্থলে সংস্কারসমূহে ভাবনা বা গুণসমূহের সংসর্গ সহজেই ধরা পড়ে। এরূপ জটিল সংস্কার কিন্তু সমবায় হইতে পৃথক্। জটিল সংস্কারের সংসর্গটুকু অনায়াসেই নির্দ্ধারিত হয় কিন্তু সমবায়ান্তর্গত সংসর্গ পরীক্ষা ও প্রমাণ সিদ্ধ।

২। সামবায়িক নিগমন, উপনয় অপেক্ষা অধিক ব্যাপক। কয়েকটি মাত্র ব্যাপার লক্ষ্য করাতেই এই সাধ্যাভাব, সাদৃশ ব্যাপার মাত্রেরই গ্রাহক হয়। এই সাধ্যাভাবের প্রতি-যোগিতাক নাই, কেননা ইহা কেবলান্বয়ী অনুমান মাত্র এবং বিপক্ষ শূন্ত। ব্যতিরেকে ব্যাপ্তিজ্ঞান এই সাধ্যাভাবের কারণ বলিয়া সমবায়ে "কতক" হইতে "সমূহে" উপস্থিত হওয়াই প্রকাশ করে। সমবায় দ্বারা দৃশ্যমান ঘটনা হইতে অদৃশ্যমান ঘটনা পরম্পরায় উপস্থিত হয়, এক সঙ্গে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল বিষয়ক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, নিকট ও দূরের ব্যবধান অপসারিত হয় এবং পরিচিত ও অপরিচিতের পার্থক্য থাকে না। সাধ্যাভাবে কালের বিভেদ স্বীকৃত না হওয়ায় অতিরিক্ত কালগ্রাহ্য হয় না, কেননা অতিরিক্ত কাল কল্পনা অসমবায়ী কারণ সংযোগাশ্রয়ে ঘটে। সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীও বলিতেছেন—পরত্বা পরত্বয়োরসমবায়ী কারণ সংযোগাশ্রয়ো দাষবাদতিরিক্ত কাল এব কল্পত।

৩। আগেই বলা হইয়াছে স্তায়মতে সমবায় প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ব্যাপার, ব্যবহারিক সত্য নির্ণয় বা ব্যবহারিক সামঞ্জস্য বিধান, অনুমানের অন্তিম লক্ষ্য কিন্তু বাস্তব সত্য নির্ণয় বা বাস্তব সামঞ্জস্য বিধানই সমবায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। বাস্তব বিরোধী যে কোনও অনুগম অতিরিক্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া সমবায়ে পরিত্যক্ত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বেদের পুরুষসূক্তে উল্লিখিত ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সেজন্ত উত্তমবর্ণ প্রাপ্তিও শ্রেষ্ঠত্ব এবং হিন্দু সমাজের জাতিভেদ এই অনুমান সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করা যাউক। প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোনও প্রাণীর প্রকৃতি ভিন্ন মুখ হইতে উৎপত্তি হয় না, অতএব প্রাণীমাত্রেরই প্রকৃতিসম্ভবতা স্বীকার করিয়া উক্ত পুরুষসূক্তের অনুমান অস্বীকার করিতে হয়। ফলে ব্রাহ্মণের উত্তম বর্ণত্ব বা হিন্দু সমাজের জাতিভেদ ভাবনায় নিষেধ হয়। সরোজ বজ্রের "দোহা কোষ" গ্রন্থের টীকায় অদ্বয় বজ্রও বলিয়াছেন—

তত্র প্রথমস্তো জাতিভেদঃ। তেষাং বাক্যং যতশ্চতুর্ব্বর্ণা-নামুত্তমো ব্রাহ্মণবর্ণঃ তন্নিষিধ্যতে। প্রমাণাগমত্যাৎ যুক্ত্যা চ। তর্হি যদি তাবৎ জাত্যা ব্রাহ্মণঃ। ব্রাহ্মণোমুখমাসীদিতি বচনাৎ। তদা তস্মিন্নেবকালে ব্রাহ্মণ উচ্যতে। নোহকস্মাৎ ভৎকথং। ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণাৎ যোনি সম্ভাবাচ্চেতি। পূর্ব্বাভাব স্বমাৎ। একাভাবে অনেক পর্য্যালোচিতং বস্তু ন স্তাৎ। তেষামপি যৎমুখ আসীদিতি স্বষেব বচনং ধূর্ত্তবচনাদিতি।

মুখ হইতে নহে, প্রকৃতি হইতে জন্মাভাব ব্রাহ্মণে না থাকায় অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে জন্ম এই অত্যন্তাভাবের ফলে জাতিভেদ অভাব। বর্ণ বা জাতি ভেদ সংস্কার বিশেষ হইলেও নিখিলসাধ্য নিখিলসাধী নির্ব্বক্তি নহে, অতএব সমবায় লক্ষণ বহির্ভূত।

পল্লী-গাথায় উপমা ও বর্ণনায় সুসঙ্গতি

শ্রীকামিনীকুমার রায়

যৌবনের জয়গান কে না করে? কে না সে গান শুনিতে ভালবাসে? যৌবন-স্তুতিতে মানুষের চিত্ত, মানুষের সাহিত্য, তাহার চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য—সব ভরপুর। পল্লীকবি নয়ন দাস একটি বালিকার যৌবনে পদার্পণ উপলক্ষে এই যৌবনের স্বরূপটি কত অল্প কথায় কত মনোজ্ঞ করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন:

"বার না বছরের কন্যা তেরতে পড়িল।
আপনে দেখিয়া আপনে চিন্তিত হইল॥
বেশের নাহি আদর যতন কেশের বন্ধনী।
কোথা হইতে আইল পাগল জোয়ারের পানি॥
একেশ্বরী হইয়া লীলা থাকয়ে বিজনে।
ফুটিয়া বনের ফুল থাকে যেমন বনে॥
সোনার যৌবনকাল কহে নয়ান দাসে।
সাধিলে না থাকে যৌবন যত্নে নাহি আইসে॥"

যৌবন জোয়ারের জলের মত পাগল; উহা যে হঠাৎ কখন আসিয়া মানুষের সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়া দেয়, মানুষ তাহা নিজেই বুঝিতে পারে না। সে নিজের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া যায়, ভাবে, তাহার এই পরিবর্ত্তন কি করিয়া সম্ভব হইল? বনের ফুল যেমন বনে অযত্নে ফুটে, বালিকা লীলাও তেমনি গর্গের কুটিরে অযত্নে বর্দ্ধিত হইয়াছিল; সে বেশভূষা করে নাই, কেশ বাঁধে নাই, তবু তাহার দেহে যৌবন-লাবণ্য আসিয়া দেখা দিল। যৌবনের অভ্যর্থনায় কোন উদ্যোগ-আয়োজনের প্রয়োজন হয় না, সময় হইলে সে অযাচিতভাবে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়, কোন আমন্ত্রণের প্রত্যাশা করে না, ধনীর প্রাসাদেও যেমন আসে, দরিদ্রের পর্ণকুটিরেও তেমনি তাহার আগমন হয়, কিন্তু সময় না হইলে শত সাধ্যসাধনাতেও তাহাকে আনা যায় না। আবার আসিয়া সে দীর্ঘদিন থাকেও না, কখন অতর্কিতে আপনিই চলিয়া যায়, কোনরূপ স্তব-স্তুতি তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, কোনরূপ বাধানিষেধ সে মানে না।

যৌবনসমাগমে মানুষের দেহ অপূর্ব্বসুন্দর হইয়া উঠে। এই দৈহিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্য পরিপূর্ণ। বাংলার পল্লী-কবিরা অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃতজ্ঞ উচ্চশ্রেণীর অভিরুচি বা তাঁহাদের নাসিকাকুঞ্চনের দিকে না চাহিয়া প্রকৃতি-রাজ্যের সহজদৃষ্ট পরিচিত বস্তু বা দৃশ্যের ইঙ্গিতে রূপের চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পল্লীর অমার্জ্জিত ভাষায় অতি সাধারণ দৃশ্যের উল্লেখে একটি পল্লী-নায়িকার যৌবন-শ্রী কত মনোজ্ঞ ও স্পষ্ট হইয়া এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে:

শাউনিয়া নদী যেমন কূলে কূলে পানি।
অঙ্গে নাহি ধরে রূপে চম্পকবরণী॥
ভাদ্রমাসের চান্নি যেমন দেখায় গাছের তলা।
বৃক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলা॥

শ্রাবণ মাসে নদী-নালা কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে, নদীর বুকে পণ্যভরা তরণী ভাসিয়া চলে—দুই তীরে বন, ঝোপ ঝাড়, মধ্যে মধ্যে লোকালয়, মঠ-মন্দির—মানুষের মনে একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যানুভূতি জাগাইয়া তোলে। যৌবনও কিশোরীর জীবনে হঠাৎ প্লাবনের মত আসে—যখন আসে তাহার দেহ পরিপুষ্ট ও সুন্দর হইয়া উঠে, তাহার চলন-বলন বসন-ভূষণ আবেষ্টনী সবকিছুতে মিলিয়া সৌন্দর্য্যের একটা পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়, সে মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শক আকৃষ্ট হয়, আনন্দ পায়। শুধু কি তাই? সুন্দরী নিজেই নিজেকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়। কবি সেই কথাটিই একটি নায়িকাকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন:

"নদীর কিনারে কন্যা গো কলসী রাখিয়া।
চাহিল নদীর জলে আঁখি ফিরাইয়া॥
হেরি সে সুন্দর রূপ চমকে সুন্দরী।
শীঘ্রগতি ঘরে ফিরে লইয়া গাগরী।

যৌবনে বালিকাসুলভ চাঞ্চল্য থাকে না, কেমন যেন একটা লজ্জার ভাব আসিয়া তাহার স্বচ্ছন্দ গতি-পথে বাধা দেয়, চালচলনে সে অনেকটা ধীর স্থির ও গম্ভীর হইয়া উঠে। পল্লী-কবি সুন্দর একটি উপমায় যৌবনের এই চাঞ্চল্যহীন মূর্ত্তিটি আঁকিয়াছেন:

ভরা কলসী যেমন নাহি ঝলকে পানি।
সেইমত লীলার চাইল চলনী।

এই লীলা একটি পল্লী-গীতিকার নায়িকা। যৌবন-প্লাবন তাহার সর্ব্বাঙ্গে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। দেশে যখন রেল-ষ্টীমার ছিল না, তখন সুরম্য 'পান্সী' নৌকাতেই অপেক্ষাকৃত অবস্থা-পন্ন লোকেরা যাতায়াত করিত, বিহার করিত। বর্ষার ভরা নদীতে মৃদুমন্দ তরঙ্গে দোলায়িত রঙীন 'পান্সী' তখন দর্শকের মানস-পটে সৌন্দর্য্যের একটি মধুর চিত্র আঁকিয়া দিত। অনেক কবিই উহার সঙ্গে নায়িকার যৌবন-শ্রীর তুলনা করিয়াছেন:

"আষাঢ় মাসে দীঘলা পান্সীরে নয়া জলে ভাসে।
সেহি মত সোনাইর যৌবন খেলায় বাতাসে।"

'সোনাই' আর একটি কাব্যের নায়িকা। অবিবাহিতা যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া কবি আবার বলিয়াছেন,—"এমন সোনার পান্সী তাহাতে মাঝি নাই।"

আর একজন কবি কত অল্প কথায় একটি বালিকার অপরূপ যৌবন-শ্রীর বর্ণনা করিয়াছেন :

"আষাইঢ়া জোয়ারের জল যৌবন দেখিলে।
পুরুষ দূরের কথা নারী যায় ভুলে।"

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন, পুরুষ নারী দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যই নাকি প্রীতির প্রকৃত সোপান। পুরুষ যে নারীকে ভালবাসে, আবার নারী যে পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার মূলগত কারণই হইতেছে, একে অপরের মধ্যে এমন একটা বস্তুর সন্ধান পায়, যাহার অভাব সে নিজের মধ্যে অনুভব করে এবং সেই অভাব মিটাইবার জন্ত অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বাস্তবতঃ পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের রূপ দেখিয়া ভুলে, হয়তো একে অন্তকে শ্রেষ্ঠতর মনে করে। কিন্তু যে নারীর যৌবন-শ্রী দেখিয়া পুরুষের ত কথাই নাই, নারীরাই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে, সেই নারীর রূপের যে তুলনা নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

নায়ক-নায়িকার যৌবন-শ্রীর এইরূপ বর্ণনায় পল্লীগীতিকাগুলি ভরপুর। প্রকৃতিরাজ্যে যাহা কিছু সুন্দর এবং সহজদৃষ্ট—চাঁদ, তারা, পদ্ম, মল্লিকা, মেঘ, রামধনু, তেলাকুচা ফল, আষাঢ়ের জোয়ারের জল, ভাদ্রের ভঁরা-নদী—সমস্তই উপমার বস্তুরূপে গৃহীত হইয়াছে। এখানে আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :

"সভা কইর্যা বইস্যা আছে ঠাকুর নন্দার চান
আস্মানে তারার মধ্যে পূর্ণমাসীর চান।"
* * *
আস্মানের চান্দ যেমন জমিনে পড়িয়া
নিদ্রা যায় নদীয়ার চান অচৈতন্ত হইয়া।

একটি নায়িকার সম্বন্ধে বলা হইতেছে :

জলের না পদ্মফুল শুকনায় ফুটে রইয়া
আস্মানের তারা ফুটে মঙ্কেতে ভরিয়া।

শুধু অখণ্ড যৌবন-শ্রীর চিত্রই নহে, নায়ক-নায়িকার বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনাগুলিও কত সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। পল্লী-কবিরা এইগুলিতে অনেক স্থলেই একটি অভিনব কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। উপমায় রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে উপমান এবং উপমেয় দুইটি বস্তুরই পাশাপাশি উল্লেখ করিবার রীতি সুপ্রচলিত। কিন্তু পল্লীগাথা-রচয়িতারা স্থলবিশেষে উপমানের সহিত উপমেয়কে ওতপ্রোত ভাবে মিশাইয়া দেখিয়াছেন এবং মুখ্য বস্তুটির উল্লেখমাত্র না করিয়া শুধু উপমানের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহাতে রূপের চিত্রটি আরও মনোজ্ঞ ও রসমণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আবার কখনও বা উপমেয় বা উপমান কোনটিরই উল্লেখ না করিয়াও উদ্দিষ্ট বস্তুর রূপের চিত্রটি মনের মধ্যে অভিনব ইঙ্গিতে ধরিয়া দিয়াছেন :

"দেখিল সুন্দর কন্তা জল লইয়া যায়
মেঘের বরণ কন্তার পায়েতে লুটায়।"

এখানে নায়িকার আলুলায়িত, সুদীর্ঘ, কৃষ্ণ কেশের বর্ণনা করা হইতেছে, অথচ কেশের উল্লেখ নাই; ইঙ্গিতেই কেমন তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে :

"পরথম যৌবন কন্তা সদা হাসি খুশি
হাসিলে বদনে ফুটে মল্লিকার রাশি।
* * *
হীরামণ্ডি জলে কন্তা যখন নাকি হাসে।"

মল্লিকার ও হীরামণির শুভ্রতার সঙ্গে দাঁতের শুভ্রতার তুলনা করা হইতেছে, কিন্তু দাঁতের নামগন্ধও নাই, অথচ কাহারও বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

"চাঁচর চিকণ কেশ লীলার বাতাসেতে উড়ে
বর্ষাতিয়া চান্দে যেমন ক্ষণে আবে ঘিরে।
* * *
উপরে জোড় ভুরু নীচে নয়ন তারা।
মধু লোভে পুষ্পে যেমন বৈসাছে ভ্রমরা।"

কত অল্প কথায়, কত সহজে নায়িকার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি কবি আমাদিগকে দেখাইলেন।

প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ লেখকের লেখারই একটা অনির্বচনীয়তার ইঙ্গিত রসজ্ঞ পাঠককে মুগ্ধ করে, লেখকও অতিবর্ণনার দায় হইতে রক্ষা পান। যাহা আমরা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করি, অনুভব করিয়া আনন্দ পাই, তাহা সব সময় ভাষায় প্রকাশ করিয়া অপরকে বুঝাইতে পারি না; সেরূপ স্থলে আভাসে-ইঙ্গিতেই বক্তব্য মনোজ্ঞ হইয়া উঠে। পল্লীকবিদের লেখায় অনেক স্থলেই প্রচলিত বাক্যাংশের একটা গূঢ়ার্থ, একটা স্নিগ্ধ-মধুর অস্পষ্টতা আমাদিগকে পুলকিত করে।

এক নায়কের উদ্দেশে নায়িকা বলিতেছে :

"উইড়া উইড়া আইসে ভমর রে ফিরা ফিরা যায়।
কোন্ বা ফুলের মধুর আশায় রে ঘুরিয়া বেড়ায়।"

ফুলের মধু কি তাহা আমরা বুঝি, জানি; কিন্তু যৌবনের মধু যে কি তাহার সংজ্ঞা সহজে দেওয়া চলে না। এখানে অস্পষ্টতাই আমাদিগকে আনন্দ দেয়।

নায়িকার পূর্ব্বরাগের একটি চিত্র :—জলের ঘাটে, কেয়া বনের ধারে, প্রস্ফুটিত কদম্বতলে সহসা এক সন্ধ্যায় দুইটি যুবক-যুবতীর প্রথম দৃষ্টি বিনিময় হইল। যুবতী গৃহে ফিরিয়া মনের ভিতরে চাহিয়া দেখে কোন্ অলক্ষ্যে সেই যুবক তাহার মনো-রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইয়া বসিয়া আছে। সে আনমনা হইয়া গেল, নিজের দেহের আদর-যত্ন ভুলিল, কর্ত্তব্যে তাহার অমনোযোগ আসিল। এক দিনেই তাহার দেহ-মনের কি যেন একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে সে সম্যক্ অবহিত না হইলেও ননদিনীদের নিকট তাহা গোপন রহিল

না, তাহাদের নিকট এ পরিবর্ত্তন ধরা পড়িল এবং ঠাট্টা করিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল :

"আউলা বাউলা অঙ্গের বসন মাথার কেশ খোলা।
আজি কেন জলের ঘাটে গিয়াছিলা একলা॥
আধা কলসী ভরা দেখি আধা কলসী খালি।
আইজ যে দেখি ফোটা ফুল কাইল দেখ্যাছি কলি॥
কি হইয়াছে জলের ঘাটে সত্য করি বল।
না ভাড়াইও ননদিনী না করিও ছল॥"

অনুরাগের প্রথম অবস্থায় নায়িকার কেবলই ইচ্ছা হয়, সেই মনের মানুষকে আর একটি বার দেখিতে। সে কৌশলে তাহাকে দেখিবার সুযোগ করিয়া লয়: জলের ঘাট তাহাকে সে সুযোগ দেয়। পল্লীবালার সেই ঘাটে না গিয়া উপায় নাই, কত বার কত কাজেই না তাহাকে সেই ঘাটে যাইতে হয়! সেই যাতায়াতে সে পায় বন্ধন-মুক্তির অবকাশ, পুনর্মিলনের সুযোগ। কবি একটি নায়িকার পূর্ব্বরাগ সঞ্চারের পরের এই অবস্থাটিই বর্ণনা করিতেছেন :

"মেঘ আরা আষাঢ়ের রইদ গায়ে বড় জ্বালা।
ছান করিতে জলের ঘাটে যায় যে একেলা॥
কিসের ছান কিসের পানি কিসের জল ভরা
দুইয়ের প্রাণে টান পইড়াছে এমন প্রেমের ধারা॥"

দুইটি হৃদয় যখন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন তাহারা একের প্রতি অন্যের অনুরাগের তীব্রতা বুঝাইতে কত কি না বলে! নায়ক বলে :

"বাগবাগিচা ফুলের শোভা চক্ষে নাহি লাগে।
পাগল হইয়াছে কন্যা তোমার অনুরাগে॥
তুমি আমার চন্দ্রসূর্য্য তুমি নয়ন-তার।
তুমি আমার মণি-মুক্তা তুমি গলার হার॥

এইখানে শেষ নয়। তুমি যদি উপেক্ষাও কর, আমি অভিমানে দূরে সরিয়া যাইব না।

"তুমি যদি ছাড় কন্যা আমি না ছাড়িব।
পায়ের গুঞ্জরী হইয়া পায়েতে থাকিব॥"

নায়িকা উত্তর দেয়, ছি ছি! তুমি ও সব কথা কি বল?

"তুমি হও তরু রে বন্ধু আমি হই লতা।
বেইড়া রাখব যুগল চরণ ছাইড়া যাইব কোথা॥"

কিন্তু নায়ক-নায়িকার এত কথা,—এত আত্ম-নিবেদন অনেক সময়ই সংসার-সমাজের বিরুদ্ধতায় ব্যর্থ হইয়া যায়। তাহাদের হৃদয় বিচ্ছেদ-বেদনায় ভরিয়া উঠে। চারিদিকের মুক্ত স্বাধীন প্রকৃতিরাজ্যের দিকে চাহিয়া নায়িকা বলিয়া উঠে :

ফুল হইয়া ফুটিতাম বন্ধু রে যদি কেওয়া বনে
নিতি নিতি হইত বন্ধু দেখা তোমার সনে।
তুমি যদি হইতেরে বন্ধু আসমানের চান
রাত্র নিশা চাইয়া থাকতাম খুলিয়া নয়ান।
তুমি যদি হইতেরে বন্ধু ঐ সে নদীর পানি
তোমারে চাহিয়া দিতাম তাপিত পরাণি॥

এই বিচ্ছেদ-বেদনার চিত্র পল্লীকবি শুধু মানুষের সমাজ হইতেই অঙ্কিত করেন নাই, প্রকৃতি-রাজ্যেও যে একটা বিরহ-ব্যথার করুণ রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, তাহা কবির দৃষ্টি এড়ায় নাই। বর্ষার জলে পৃথিবী পরিপূর্ণ, যে দিকে চোখ যায়—শুধু জল আর জল, কিন্তু চাতকের তো তাহাতে তৃষ্ণা মিটে না, সে জলে তো তাহার অধিকার নাই। বৃষ্টির ক্ষীণ ধারা পান করিয়া তাহাকে থাকিতে হয়। অবিরাম জল ঝরিতেছে, বাজ পড়িতেছে, কিন্তু সে সব দুর্য্যোগ উপেক্ষা করিয়া আর একটা পাখীও যে 'বউ কথা কও', 'বউ কথা কও' বলিয়া তাহার প্রিয়ার সন্ধানে ফিরিতেছে! কবি তাহারই চিত্র আঁকিয়াছেন :

"রৈয়া রৈয়া চাতক ডাকে বর্ষে জলধর।
না মিটে আকুল তৃষা পিয়াসে কাতর॥
কোন্ না বিরহী নারী হায় অভাগিনী
অভেদ নাহিক জানে দিবস রজনী॥
শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে।
বউ কথা কও বলি কান্দি ফিরে পথে॥"

নায়ক-নায়িকার মিলনানন্দের একটি চিত্রও দেখুন। দীর্ঘ বিরহের পর প্রিয়সম্মিলনের যে আনন্দ তাহার শেষ কথা কেহ কি বলিতে পারিয়াছেন? বিদ্যাপতি পারেন নাই, চণ্ডীদাস পারেন নাই, আমাদের পল্লী-কবিরাও পারেন নাই। পৃথিবীর যে-কোনও মিষ্ট সামগ্রী অপেক্ষা ইহার মিষ্টত্ব অধিক; এই মিষ্টত্বের তুলনা হয় না, তাই কবি অনেক মিষ্ট দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াও শেষে হার মানিয়া গেলেন :

মেওয়া মিস্রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গাজল
তার থাক্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল
তার থাক্যা মিঠা দেখ দুঃখের পরে সুখ
তার থাক্যা মিঠা যখন ভরে খালি বুক
তার থাক্যা মিঠা যদি পায় হারানো ধন
সকল থাক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন!

পল্লীকবিরা অনেক স্থলে এমন সব উপমা দিয়া এমন সব ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, যে ভাবসমূহ অন্য কোনও উপমা প্রয়োগে তত স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া প্রকাশ করা যাইত কি না সন্দেহ।

"এক খোবের বাঁশ রাখী নছিবেতে লেখা।
কেউ হয় ফুলের সাজি কেহ হাড়ির ঝাঁটা।"

আমরা সচরাচর কি দেখিতে পাই? একই মাতাপিতার কিংবা একই পরিবারের এক ছেলে বিদ্যায় বুদ্ধিতে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত; আর এক ছেলে অশিক্ষায় অনাদরে সকলের ঘৃণা কুড়াইয়া দিন কাটাইতেছে। সাধারণ লোক ইহাকেই বলে অদৃষ্ট। পল্লীকবি কত সংক্ষেপে, কত সুন্দর এবং মর্ম্ম-

স্পর্শী কথায় একটি উপমা দিয়া এই কথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন। একই ঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া কেহ ফুলের সাজি তৈয়ার করিতেছে, আবার কেহ বা করিতেছে হাড়ির ঝাঁটা। উভয়েই বাঁশ, উভয়েরই জন্ম এক ঝাড়ে—এক বংশে। অথচ দুইয়ের পরিণতিতে কত পার্থক্য !

একটা প্রচলিত কথা আছে—'যার মনে লাগে যারে।' এই মনে 'লাগা'র ক্ষেত্রে সৌন্দর্য্যের কোনও মাপকাঠি নাই। একজন যাহাকে সুন্দর বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে, অপরে হয়ত তাহাকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছে। আবার একজন যাহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না, অপরে হয়ত তাহারই জন্ত সর্ব্বস্ব হারাইয়া পাগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মহুয়া পালাগানে দেখি, মহুয়া নদের চাঁদের অনুরাগিণী হইয়াছে ; তাহার পালক-পিতা কন্তার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তাহাদের মিলনে বাধা দিতেছেন এবং সুজন নামে স্বজাতীয় এক সুন্দর যুবকের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে চেষ্টা করিতেছেন। পিতা কন্তাকে বুঝাইলেন, "তুমি যদি প্রাণে বাঁচিতে চাও, নদের চাঁদকে হত্যা করিয়া সুজনকে বিবাহ কর। সুজন সুন্দর যুবক এবং আমাদের স্বজাতি।" মহুয়া ম্লান হাসিয়া উত্তর দিল, "পিতা, তুমি ত তোমার চোখ দিয়া নদের চাঁদের সৌন্দর্য্যের বিচার করিতেছ, তাই তাহাকে সুজনের তুলনায় তোমার অসুন্দর মনে হইতেছে। কিন্তু আমার সুন্দরকে যদি তুমি আমার চোখ দিয়া দেখিতে তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে সে কত সুন্দর ! আমার বঁধু সোনার তরু—কাঁচা সোনা, চন্দ্র-সূর্য্য যা কিছু বল, সব :

আমার বন্ধু চান্দ সুরুজ, কাঞ্চা সোনা জ্বলে।
তাহার কাছে সুজন বান্ডা৫ জোনি৬ যেমন জ্বলে ॥
সোনার তরুয়া বন্ধু একবার দেখ।
আমার চক্ষু নিয়া তুমি নয়ান ভইরা দেখ ॥"

পল্লীকবি সামান্ত কয়েকটি কথায় একটা চিরন্তন সত্যকে কি সুন্দর ভাবেই না ব্যক্ত করিয়াছেন !

শুধু নর-নারীর বাহ্যিক রূপ এবং মানসিক অবস্থার বর্ণনাই নহে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনায়ও এই পল্লীকবিগণ অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। পল্লী-কবি মনুষ্য-সমাজ হইতে উপমান সংগ্রহ করিয়া তাহার ইঙ্গিতে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যেন আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। সে সৌন্দর্য্য আমরা মানুষী মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি, যেমন বর্ষার একটি চিত্র :

"হাতেতে সোনার ঝারি বর্ষা নামি আসে
নবীন বয়সা জলে বসুমাতা ভাসে।"

আকাশ-ভরা মেঘের খেলা, অবিশ্রান্ত জল ঝরিতেছে, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাইতেছে ; পথঘাট মাঠ, নদী পুকুর জলে একাকার। কবি কল্পনায় ছবি আঁকিলেন যেন সোনার ঝারি হাতে বর্ষা মানুষী মূর্ত্তিতে নামিয়া আসিতেছে। চিত্রটি পরম উপভোগ্য।

আর একটি বর্ণনায় আছে, শ্রাবণ যেন জলের পসরা মাথায় করিয়া মর্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে, এবং সর্ব্বত্র জল ছড়াইয়া চলিয়াছে, সে জলধারার কি দুর্ব্বার শক্তি !

"শ্রাবণ আসিল মাথে জলের পসরা।
পাথর ভাসাইয়া বহে শাওনিয়া ধারা ॥"

পল্লী-কবিদের অনাড়ম্বর ভাষায় নিম্নের কয়টি ছত্রে বর্ষার কেমন একটি সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে :

কুড়ায় ডাকে ঘন ঘন আষাঢ় মাস আসে
জমীনে পড়িল ছায়া মেঘ আসমানে ভাসে
গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে ঝিক্কি৭ ঠাডা৮ পড়ে
অভাগী জননী দেখ ঘরে পুইড়া মরে।
* * *
আসমানে থাকিয়া দেওয়া ডাকছ তুমি কারে
ঐ না আষাঢ়ের পানি বইছে শত ধারে
গাং ভাসে নদী ভাসে শুকনায় না ধরে পানি
এমন রাতে কোথায় গেল কিছুই না জানি ॥

বর্ষারম্ভে কুড়া পাখীর ডাকে পল্লীর মাঠ, বিল-ঝিল, ঝোপ-ঝাড় মুখরিত হইয়া উঠে, আকাশে কাল মেঘ ভাসিয়া বেড়ায়, মাটিতে তাহার ছায়া পড়ে, মেঘের গুরু গুরু শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত হইতে থাকে, বিদ্যুৎ চমকায়, বাজ পড়ে, বৃষ্টি ঝরে। দেখিতে দেখিতে শত দিকে শত ধারায় আষাঢ়ের জল গড়াইয়া চলে, পথ-প্রান্তর নদী-নালা প্লাবিত হইয়া যায়। পল্লীবাসীর এই চিরপরিচিত দৃশ্যটি পল্লী-কবির বর্ণনায় যেন আবার নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই বর্ষার দিন মানুষের চিত্তে যে প্রিয়-বিরহ-ব্যথা জাগাইয়া তোলে, কবি তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যান নাই।

বঙ্গ-পল্লীর আর একটি অতিপরিচিত করুণ দৃশ্যের উল্লেখ করিতেছি। একটি পল্লী-যুবকের বিদেশযাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন :

"বৈদেশেতে যায় যাদু যতদূর দেখা যায়।
পিছন থাক্যা চাইয়া দেখে অভাগিনী মায় ॥
বাঁশের ঝাড় বন-জঙ্গলে পুতের পিঠে পড়ে
আঁখির পানি মুছ্যা মায় ফির‍্যা আইল ঘরে ॥

পুত্র বিদেশে চলিয়াছে, জননীর হৃদয় ভারাক্রান্ত। তিনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া পথের মুখে দাঁড়াইলেন, যতদূর দেখা যায় পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গ্রামের পথ অপ্রশস্ত, দুই দিকে গভীর জঙ্গল ; মধ্যে মধ্যে বাঁশের ঝাড়, নানা গাছ সে পথের উপর একেবারে হেলিয়া পড়িয়াছে, পুত্রের সমগ্র দেহখানি আর দেখা যাইতেছে না, ক্রমে সে বননিবিড় পল্লীপথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। মা আঁচল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

এইরূপ বিচিত্র বর্ণনায় পল্লী-গীতিকাসমূহ ভরপুর। আমরা আর অধিক দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করিব না।*

শব্দার্থ : ১ শ্রাবণের। ২ জ্যোৎস্না। ৩ বর্ষাকালে। ৪ অলঙ্কার বিশেষ। ৫ বেদে। ৬ জোনাকি। ৭ বিদ্যুৎ। ৮ বাজ।

* বর্তমান প্রবন্ধের উদ্ধৃতাংশগুলি চন্দ্রকুমার দে সঙ্কলিত, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত মৈমনসিংহ-গীতিকার 'কঙ্ক ও লীলা,' 'দেওয়ান ভাবনা,' 'মহুয়া,' 'মলুয়া,' 'কমলা' প্রভৃতি বিবিধ পালাগান হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

লিপিতত্ত্ববিৎ কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতায় বর্ত্তমানে আমরা যে এশিয়াটিক সোসাইটি দেখিতেছি, তাহার সূচনা হয় ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের গোড়া-পত্তনের অল্প দিন পরে—১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি সার্ উইলিয়ম জোন্স কতিপয় ইউরোপীয় পণ্ডিতের

সার্ উইলিয়ম জোন্স

সহায়তায় ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। জোন্সের লক্ষ্য ছিল প্রতিষ্ঠানটিকে প্রাচ্য জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চ্চার কেন্দ্রস্থলরূপে গড়িয়া তোলা। এ বিষয়ে তাঁহার বাণী উদ্ধারযোগ্য :—

"It will flourish, if naturalists, chemists, antiquaries, philologers, and men of science, in different parts of *Asia,* will commit their observations to writing, and send them to the Asiatic Society at Calcutta; it will languish, if such communications shall be long intermitted; and will die away, if they shall entirely cease."

উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা নানা ভাবে সাহায্যদান করিয়া প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহাদেরই চেষ্টায় সোসাইটির মিউজিয়মটি প্রত্নদ্রব্য ও জীবতত্ত্ব-সম্পর্কীয় উপকরণে দিন দিন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। প্রত্নদ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত বহু তাম্রশাসন ও শিলালেখের প্রতিলিপি ছিল। কিন্তু প্রাচীন লিপি-জ্ঞানের অভাবে সেগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া ঐতিহাসিক মূল্য যাচাই করিবার উপায় ছিল না। ১৮৩৭ সনে সেগুলির পাঠোদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা হয়। এই দুরূহ কার্য্যে অগ্রণী হন—জেম্স্ প্রিন্সেপ, সোসাইটির তদানীন্তন সেক্রেটরী ও এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালের সম্পাদক। তিনি লিখিয়াছেন :—

"Our own attention has been principally taken up this last year with Inscriptions. Without the knowledge necessary to read and criticise them thoroughly, we have nevertheless made a fortunate acquisition in paleography which has served as the key to a large series of ancient writings hitherto concealed from our knowledge . . . 1st January 1838." (*J. A. S. B.*, 1837, Preface.)

প্রকৃতপক্ষে একা প্রিন্সেপের চেষ্টায় ১৮৩৭-৩৮ সনে বহু উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপির—বিশেষ করিয়া অশোকের অনুশাসনের পাঠোদ্ধার হইয়াছিল। তিনিই প্রথমে ব্রাহ্মী-লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া ভারতেতিহাসের একটি রুদ্ধ কক্ষের দ্বার উন্মোচিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু লিপিতত্ত্ববিশারদ হিসাবে প্রিন্সেপের খ্যাতির মূলে যিনি ছিলেন, তিনিও আজ বিশেষভাবে স্মরণীয়। পরিতাপের বিষয়, "আত্মবিস্মৃত" বাঙালী তাঁহার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে; তিনি এ-দেশেরই বহুনিন্দিত প্রাচীন পণ্ডিত-সমাজের একজন, নাম—কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার।

কমলাকান্তের বংশ-পরিচয় বা আদি নিবাসের কোন সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কলিকাতায় আড়কুলিতে তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ৬০৲ বেতনে ইহার অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হন। ১৮২৭ সনের মে মাস পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়া তিনি মেদিনীপুর আদালতের জজ-পণ্ডিতের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর আমরা তাঁহাকে ১৮৩৭ সনে জেম্স্ প্রিন্সেপের পণ্ডিত-রূপে দেখি। প্রাচীন ভারতীয়-লিপির পাঠোদ্ধারে তিনি প্রিন্সেপের প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮৩৭-৪১ সনের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে প্রকাশিত বহু লিপির পাঠোদ্ধার কমলাকান্তেরই সাহায্যে হইয়াছিল। কমলাকান্তের সাহায্যের কথা প্রিন্সেপ একাধিক ক্ষেত্রে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। দু-একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Lt. Kittoe also presented facsimiles of a coppe grant in three plates dug up in the Gumsur country of which the Secretary with the aid of Kamala Kar
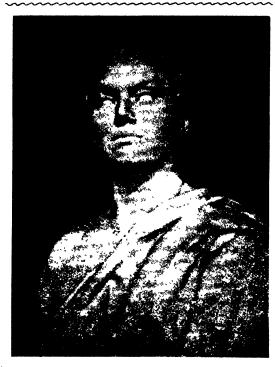
জেম্‌স প্রিন্‌সেপ
[এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত মর্ম্মর-মূর্ত্তি হইতে শ্রীপরিমল গোস্বামী কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটো। বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে]

Pandit supplied a translation." (*J.A.S.B.*, Vol. VI, May 1837, p. 402.)

"Although, as will be seen, the slab [Brahmeswara Inscription, Cuttack] was in a state of considerable mutilation, yet from the inscription being in verse, my pandit, Kamalakanta Vidyalankara, has been able by study of the context to fill up all the gaps, with, as he says, hardly a possibility of error, and indeed where the outline of the letters is preserved I have found his restoration quite conformable. The translation has been effected by Sarodaprasad* under his explanation, but I have not leisure to read it over with Kamalakanta." (*J.A.S.B.*, June 1838, p. 557.)

* সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীও প্রিন্‌সেপের অন্যতর সাহায্যকারী ছিলেন; তাঁহার সম্বন্ধে প্রিন্‌সেপ এক স্থলে লিখিয়াছেন :—

"For the translation, instead of adopting Wilkins' words, I present if anything a more literal rendering by Sarodaprasad Chakravarti, a boy of the Sanskrit College, who had studied in the English class lately abolished. I do this to shew how useful the combination of Sanskrit and English grammatically studied by these young men might have been made both to Europeans and to their own country. . . . The same boy assisted Captain Troyer in the translation of many Sanskrit class books. (*J.A.S.B.*, Aug. 1837, p. 673.)

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে পীড়িত হইয়া প্রিন্‌সেপ এদেশ ত্যাগ করিলে ডাঃ ওসাগ্‌নেসী সোসাইটির অস্থায়ী সম্পাদক হন। তাঁহার আমলে, ১৮৩৯ সনের আগষ্ট মাসে, কমলাকান্ত এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির কার্য্যবিবরণে (viii 527) প্রকাশ :—

"The Secretary brought to the notice of the Meeting that the present Pundit, Ramgovind Gossamee, has been found incompetent to decypher the Inscriptions to which the Society are most desirous to give publicity, either in their monthly publication, or in their Transactions, he therefore proposed that the celebrated Kamalakantha Vidyalankar be appointed for that office, and also as the Librarian for the Oriental Books. The proposition was unanimously carried." (Proceedings 7 Aug. 1839.)

এশিয়াটিক সোসাইটির কল্যাণে দেশে পুরাতত্ত্বের চর্চ্চা ক্রমেই প্রসারলাভ করিতেছিল। সরকারী শিক্ষা-সংসদ্ সংস্কৃত কলেজের একদল ছাত্রকে পুরাতত্ত্ব শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত কলেজ হইতে স্বতন্ত্র বেদান্ত-শ্রেণী লোপ করিয়া তাহার স্থলে "Ancient History and History of the Hindoos" শিখাইবার জন্য ১৮৪২ সনের অক্টোবর মাসে "পুরাবৃত্ত" নামে একটি শ্রেণীর সৃষ্টি করেন। এই শ্রেণীর অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হন—কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। তাঁহার নিয়োগপত্রখানি এইরূপ :—

"I have the honour to inform you that the Section of the Council of Education for the Sanskrit College has been pleased to appoint you Professor of Ancient Literature and History of the Hindoos at the Sanskrit College on a salary of Eighty Company's Rupees per month. You are immediately to set about preparing a syllabus of your proposed lectures and report progress to me weekly specifying what has been done and what is to be done in the following week to be submitted to the Section monthly. In addition to this you are to teach Vedant to as many students as may wish to learn that Science. (Letter dated 1st Jany. 1842 from Russomoy Dutt, Secy., Section Council of Education, Sanskrit College.)

কমলাকান্তের বয়স হইয়াছিল। তিনি ১৮৪৩ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়া শয্যাগ্রহণ করেন; পরবর্ত্তী ৮ই অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়; সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কলেজ হইতে পুরাবৃত্ত-শ্রেণীটিও লোপ পাইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সভাপতি ও সেক্রেটরী হেন্‌রি টরেন্স (Torrens) যে প্রশস্তি করেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি :—

"I have, with much regret, to report the death of the aged, and highly respected Pundit Kamalakanta

হেন্‌রি টরেন্স

Vidhyalankar, the friend and fellow labourer of James Prinsep. With him has expired the accurate knowledge of the ancient Pali and Sanskrit forms of writing; for although we now possess a key to these ancient characters, no Pundit has exercised himself in the s of decyphering to the extent to which has Kamal kanta. Like all learned persons of his class, he careful avoided the communication of his peculiar knowled . . . the Society owes a debt of gratitude to Kamal kanta, and of respect to him as the Collaborator James Prinsep." (Proceedings 13 Nov. 1843 : *J.A.S.I* 1843, pp. 1013-14.)

(বঙ্গানুবাদ)—অত্যন্ত দুঃখের সহিত জেম্‌স প্রিন্‌সেপের সুহৃৎ ও সহকর্ম্মী, বহুমানাস্পদ বর্ষীয়ান্ পণ্ডিত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন পালি ও প্রাচীন-সংস্কৃত-লিপিপদ্ধতির যথাযথ জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটিল; কেন না, ইদানীং এই সমস্ত প্রাচীন লিপি পাঠের মূলসূত্রটি আমাদের অধিগত হইয়াছে বটে কিন্তু আর কোন পণ্ডিতই প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারে কমলাকান্তের ন্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার সমশ্রেণীর পণ্ডিতদের মত তিনিও তাঁহার এই বিশিষ্ট বিদ্যা প্রকাশের সুযোগ পরিহার করিয়া চলিতেন।...জেম্‌স প্রিন্‌সেপের সহকর্ম্মী হিসাবে সোসাইটি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ এবং সেজন্য তিনি উঁহার শ্রদ্ধার পাত্র।*

* কমলাকান্ত কলিকাতার ধর্ম্মসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫)। স্বদেশযাত্রার প্রাক্কালে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি রেঃ ডবলিউ. এইচ. মিল-কে বিদায়-অভিনন্দন দিবার জন্য যে সভার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে প্রিন্‌সেপের নির্দ্দেশে মিলের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কমলাকান্ত যে প্রশস্তি করিয়াছিলেন তাহা ইংরেজী অনুবাদসহ এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে মুদ্রিত হইয়াছে (*J. A. S. B*, 1387, Aug. pp. 707, 710-11. ২২ এপ্রিল ১৮৪০ তারিখে, ৪১ বৎসর বয়সে, বিলাতে জেম্‌স প্রিন্‌সেপের মৃত্যু হইলে পরবর্ত্তী ৩০শে জুলাই তাঁহার গুণগ্রাহী বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক কলিকাতার টাউন-হলে যে স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয় তাহাতে কমলাকান্ত, বাংলাদেশের পণ্ডিতবর্গের প্রতিনিধিস্বরূপ, সংস্কৃতে প্রশস্তি কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন (*Asiatic Journal*, Nov. 1840: "Asiatic Intelligence," pp 190-91.)

বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের সমস্যা

শ্রীশান্তিদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, এম-এস্‌সি

বিগত দেড় শত বৎসরে বিজ্ঞান বহু দূরে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। এই অগ্রগতির ইতিহাস বিদেশী ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাই আমরা পড়িয়া আসিয়াছি। এক একটি নূতন কথা সৃষ্টি হইয়াছে, আর রোমান হরফে লেখা সমস্ত বিদেশী ভাষা পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিত রূপে তাহা গ্রহণপূর্বক নিজস্ব করিয়াছে। আজ আমরা এই সুদূরপ্রসারী বিজ্ঞানকে বাংলায় প্রকাশ করিতে নানা দ্বিধা ও মুশকিলে পড়িয়াছি। বিজ্ঞানের গতির সহিত ভাষা এতকাল তাল রাখিয়া চলে নাই, একটু একটু করিয়া শব্দ চয়ন বা শব্দ গঠন হয় নাই। আজ তাই সমস্ত বিজ্ঞানকে একসঙ্গে মাতৃভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়া কত সমস্যারই না সৃষ্টি হইতেছে। এত কাল এবিষয়ে যে চেষ্টা চলিয়াছে, তাহা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষার তালিকা মাত্র দিয়াছেন—তাহাও সম্পূর্ণ নহে। কিন্তু শুধু অভিধান লইয়া যেমন সাহিত্য সৃষ্টি করা চলে না, তেমনি শুধু পরিভাষার তালিকা লইয়া বাংলায় উচ্চ বিজ্ঞানের প্রকাশ চলে না।

আমাদের প্রধান বিপদ বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে ভাষাকে লইয়া লেখকদের স্বেচ্ছাচারিতা। ইংরেজীতে এই রকম নজির বিরল। কোন ইংরেজ লেখক "positive electricity"কে "yes-electricity" বলিয়া বর্ণনা করিবেন না। কিন্তু বাংলা ভাষায় হাঁ-ধর্মী ও না-ধর্মী বিদ্যুৎ উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় দেখিয়াছি। ঋণাত্মক, ধনাত্মক, পর, অপর, পরা, অপরা, পজিটিভ, নিগেটিভ—এসব তো আছেই। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে আমাদের সুধীবৃন্দ সম্মিলিতভাবে যে তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন বা ভবিষ্যতে দিতে পারেন সকলেরই তাহা মানিয়া চলা উচিত। এইরূপ তালিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রস্তুত হইলেও বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, লেখকেরা প্রবন্ধ লিখিবার সময় উক্ত তালিকায় নির্দিষ্ট পরিভাষা ব্যবহার না করিয়া তাহা হইতে নিকৃষ্ট বা দুর্বোধ্য পরিভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সঙ্কলন যে সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে তাহা নহে, কিম্বা ইহা যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক কিম্বা পারিভাষিক শব্দাবলীর প্রতি সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছে তাহাও নহে, তবুও যত দিন ইহা হইতে ভাল কিছু না পাওয়া যায়, ততদিন বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ-লেখকদের সর্বতোভাবে ইহা মানিয়া চলা উচিত।

Atomic energy কথাটি নিতান্ত হালের। সকলকেই ইহার বাংলা অনুবাদ করিতে দেখি 'আণবিক শক্তি'। কি হিসাবে যে এই অনুবাদ করা হইল, বুঝিতে পারা গেল না। atom-এর বাংলা পরমাণু, আর molecule-এর বাংলা অণু; সুতরাং শক্তি যখন atom ভাঙিয়া পাওয়া যায়, molecule ভাঙিয়া নহে, তখন atomic energy-র বাংলা যে পরমাণবিক শক্তি না হইয়া আণবিক শক্তি কেন হইল তাহা বুঝা কঠিন। স্বীকার করিতে হয় যে, পরমাণবিক কথাটি ওজনে ভারী। কিন্তু ওজন কমাইবার খাতিরে অর্থ উল্টাইবার অধিকার কাহারও নাই। যদি ওজন কমাইতে হয়, atomic energy-র বাংলা হইতে পারে কণা-শক্তি। এটম ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রন, প্রোটন প্রভৃতি প্রত্যেকটিই 'কণা'-দলীয়। সুতরাং "কণা-শক্তি" এই অনুবাদ "আণবিক শক্তি" হইতে অনেক ভাল বলিয়াই মনে হয়। এটম কথার অর্থ এখন বদলাইয়া গিয়াছে। বস্তুর চরম অবস্থা যে পরমাণু নহে, তাহা হইতেও চরমতর অবস্থা আছে তাহা আমরা মাত্র এই শতাব্দীর প্রারম্ভে জানিতে পারিয়াছি। এটম কথাটিতে সমাস নাই বলিয়া তাহার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় নাই। তাহা ছাড়া পরমাণু হইতেই যেসব সূক্ষ্ম বস্তুকণার আবিষ্কার হইয়াছে—ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি সেগুলিকে তো বিদেশী নামেই আমাদের ভাষায় স্থান দিতে হইয়াছে। এত নামের ভিতর এটম আর মলিকুলকেও যদি ইংরেজী নামে বাংলায় চালাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে atomic energy-কে এটম-শক্তি বলিলেই সমস্ত গণ্ডগোল মিটিয়া যায়। এ প্রস্তাব পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রের পুস্তক-লেখকদের বিশেষ বিবেচনার যোগ্য।

বর্তমানের রসায়ন-শাস্ত্রকে বাংলায় রূপ দিতে হইলে সমস্ত মৌলিক পদার্থের, এমন কি লৌহ, সোনা, রূপার পর্যন্ত ইংরেজী নামকরণ গ্রহণ করিতে হইবে। Oxygen, carbon, hydrogen, gold, iron প্রভৃতির বাংলা প্রতিশব্দ আছে বটে, কিন্তু xenon, neon, krypton, germenium, radium ইত্যাদি অধিকাংশ মৌলিক পদার্থের কোন বাংলা বা সংস্কৃত নাম নাই। সুতরাং বাংলা রসায়ন-বিদ্যার পুস্তকে কার্বনকে অঙ্গার না বলিয়া কার্বন বলাই ভাল। রসায়নের পুস্তকে Zincকে দস্তা না বলিয়া জিঙ্কই বলিতে হইবে, Sulphuric Acidকে গন্ধকাম্ল না বলিয়া সোজা সালফিউরিক এসিডই বলা সঙ্গত। সালফিউরিক এসিডকে গন্ধকাম্ল বলিয়া চালাইলেও, Sulphurous Acidকে কি বলিব? ঐ সালফিউরাস এসিডই বলিতে হইবে।

ইহার পরের কথা রাসায়নিক সংঘটনসমূহের (chemical reacton) সাংকেতিক প্রকাশ। একার, আকার, ওকার ইত্যাদির দরুন বাংলা হরফে সংঘটন-সঙ্কেত প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সালফিউরিক এসিডের ভিতর দস্তার টুকরা ফেলিয়া দিলে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈয়ার হইতে থাকে। রাসায়নিক ক্রিয়া বা সংঘটনকে বাংলা হরফে লিখিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায়:—

জি+হা$_2$ সা অ$_8$ = জি সা অ$_8$+হা$_2$

ইহা একেবারেই সুবিধার হইল না। গন্ধকের পরমাণুর সঙ্কেত ইংরেজীতে 'S' হইলেও বাংলায় 'সা' একেবারেই মানাইতেছে না। ক্যালসিয়ামের ইংরেজী সঙ্কেত ca. আর ক্যাডমিয়ামের cd.। বাংলায় সাংকেতিক লিখিতে হইলে দুই ক্ষেত্রেই 'ক্যা' লিখিতে হয়, অথবা প্রথম ক্ষেত্রে 'ক্যাল' এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'ক্যাড'। ফরমুলার দিক হইতে এ সবই অচল। সুতরাং সাংকেতিক লিখনে রোমান হরফের আশ্রয় না লইয়া উপায় নাই। উপরের সংঘটন রোমান হরফে এই রকম দাঁড়ায়:—

$$Zn + H_2 SO_4 = Zn SO_4 + H_2$$

ইহার পরে জৈব রসায়নের (organic chemistry) কথা। সে এক বিশাল জগৎ। তাহার পরিধি এডিংটনের সম্প্রসারণশীল বিশ্বের ন্যায় ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। এ ক্ষেত্রেও নামের বেলায় পুরাপুরি ইংরেজীর আশ্রয় লইতে হইবে। "Fatty acid"কে চর্ব্বি-অম্ল না বলিয়া বোধ হয় ফ্যাটি এসিড রাখাই ভাল। তবে এলকোহলের সুন্দর বাংলা করিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 'এল' কাটিয়া শুধু কোহল রাখিয়া। কোহলকে পুরাপুরি মানিতে কোন আপত্তি নাই, তবে মুশকিল হইতে পারে কোহল-রাসায়নিক-পরিবারের অগ্রপশ্চাৎ লইয়া। Paraffinকে আংশিক অক্সিজেনযুক্ত করিয়া alcohol, alcoholকে আবার আংশিক ভাবে অক্সিজেনের সহিত যোগ ঘটাইয়া aldehyde বা ketone পাওয়া যায়, এবং সর্ব্বশেষে পুরামাত্রায় এই যোগ ঘটাইয়া aldehyde বা ketone হইতে ঐ পর্য্যায়ের জৈব এসিড পাওয়া যায়। ইহার সাংকেতিক প্রকাশ এইরূপ হইতে পারে:

প্যারাফিন $\xrightarrow{\cdot}$ (এল) কোহল $\xrightarrow{\cdot}$ এলডিহাইড বা কিটোন $\xrightarrow{\cdot}$ এসিড।

এলডিহাইডের যদি 'এল' না কাটা হয় তবে এলকোহলের, 'এল' কাটিবার বিশেষ সার্থকতা নাই। এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা-তালিকায় ("চলন্তিকা"র পরিশিষ্টে ইহা প্রকাশ করা হইয়াছে) acid-এর পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে "অম্ল", বা "এসিড"। "অম্ল"কে একেবারে বাদ দেওয়াই ভাল। Acid is sour, ইহার বাংলা অম্লের স্বাদ টক বা অম্লের স্বাদ অম্ল এইরূপ লেখা হাস্যকর। ইহার চেয়ে লেখা ভাল এসিড টক বা এসিডের স্বাদ টক। বাংলায় নাম লিখিবার বেলায় উচ্চারণের সঙ্গতি রাখিয়া য ফলা ইত্যাদি যত বাদ দেওয়া যায় ততই ভাল। এলকোহল, (যদি 'কোহলে'র পরিবর্ত্তন করিতে হয়), তবে এলকোহল, এলডিহাইড, এসিড লিখাই ভাল। ইহাতে লিখিবার ও ছাপাইবার ঝঞ্ঝাট অনেক কমিবে, বিশেষতঃ যখন এই সব শব্দ যে-কোন জৈব রসায়নের পুস্তকে বহু বার লিখিতে হয়। "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়" acid-এর বানান (চলন্তিকায় যাহা আছে) অ্যাসিড লিখিয়াছেন বলিয়া ইহার উল্লেখ করিতে হইল। তাই বলিয়া ক্যালসিয়াম ও ক্যাডমিয়ামকে কেলসিয়াম ও কেডমিয়াম লিখিলে চলিবে না।

চলন্তিকায় যে পরিভাষার তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্ব্বল। দুই-একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথার কোন পরিভাষা আবার দেওয়াই হয় নাই। পদার্থবিদ্যার তালিকায় "condenser"এর বাংলা দেওয়া হয় নাই। অথচ এই কথাটির প্রয়োগ বিদ্যুৎ ও রেডিওর পুস্তকে হাজার হাজার বার দরকার হয়। "condensation যখন "ঘনীভবন" condenser-এর বাংলা করা যাইতে পারে "ঘনকার" অথবা ঘনী যন্ত্র। "Balance"-এর বাংলা দেওয়া হইয়াছে "তুলা"। যদি বাংলা করিতে হয়—The cotton used in this experiment was weighed on a sensitive balance, তাহা হইলে কি লিখিব যে, 'এই পরীক্ষাতে যে তুলা ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা একটি বিশেষ অনুভূতিশীল তুলায় ওজন করা হইয়াছিল?'—বর্ত্তমান লেখকের মতে balance-এর বাংলা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যালান্স রাখাই ভাল, বিশেষতঃ কথাটি যখন সকলের এত বেশী পরিচিত।

রেলগাড়ীর বাংলা বহুক্ষেত্রে বাষ্পীয় শকট দেখিয়াছি, কিন্তু এখন হইতে ইহাকে বাষ্পীয় শকটের পরিবর্ত্তে ষ্টীম শকট বলিতে হইবে। Gas, Steam, ও Vapour এই তিনটি কথা ভাবিয়া দেখিবার মত। Gas ও Vapour-এর ভিতর গুরুতর বৈজ্ঞানিক প্রভেদ থাকায় জন্য বিশ্ববিদ্যালয় Gas-এর বাংলা গ্যাসই রাখিয়াছেন। Steam আর Water Vapour-এর ভিতরেও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য, সেইজন্য Steam-এর বাংলা ষ্টীমই রাখা হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত বেশ বুঝিতে পারা গেল। কিন্তু Vapour-এর বাংলা যে কেন বাষ্প করা হইল বুঝা গেল না। Chlorine Vapour-এর বাংলা হইবে ক্লোরিণ বাষ্প, Water Vapour-এর জল-বাষ্প। ভাষার দিক হইতে ঠিক সুর বাজিতেছে না। বাংলা ভাষার জলের সহিত বাষ্পের সংস্কারের যোগ রহিয়াছে, যদিও সে যোগ বৈজ্ঞানিক নয়। বাংলা উপন্যাসের নায়িকা অশ্রু-বাষ্পের

ভিতর দিয়া প্রিয়তমের মুখছবি দেখিয়া থাকে, বাংলাদেশে বাষ্পীয় শকট দেশ হইতে দেশান্তরে পাড়ি দেয়। সুতরাং Gas আর Steam যখন গ্যাস ও ষ্টীম রহিল, তখন Vapour-ও ভেপার থাকিলেই ভাল ছিল। এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় কিছু কিছু সমালোচনার অবকাশ রহিয়াছে, সুতরাং এই তালিকাকে চূড়ান্ত না ধরিয়া পুনরায় ইহার আলোচনা, সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন।

ইহার পরে গবেষণার কথা। কোন্ ভাষায় আমরা আমাদের গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করিব? গবেষণা ব্যাপক ব্যাপার। আমাদের গবেষণা এখনও এমন স্তরে আসিয়া পৌঁছায় নাই যে, বিদেশীরা ইহার জন্ত বাংলা, হিন্দী বা অন্ত কোন ভারতীয় ভাষা শিখিবে। রামন-এফেক্ট-এর মত গবেষণামূলক কার্য্য দৈনন্দিন ব্যাপার নহে। বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার দিনে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্রে নিজের মৌলিক দাবি প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে যত শীঘ্র সম্ভব গবেষণার ফলাফল বিদেশী ভাষায় বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। অনেক সময় একই সমস্যা লইয়া দেশে দেশে যুগপৎ কাজ হইয়া থাকে, সকলের আগে যিনি সমাধান দাখিল করিবেন কৃতিত্ব তাহারই। রামণ-এফেক্ট প্রকাশ করিতে দেরি করিলে হয়ত পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আসিত না। সুতরাং গবেষণার ফলাফল আমাদের ইংরেজী ভাষাতেই সাধারণতঃ প্রকাশ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া গবেষণা করিতে হইলে পৃথিবীর কোথায় কি বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কার্য্য হইতেছে তাহা জানা দরকার। সেইজন্ত ইংরেজী ও দুই-একটি ইউরোপীয় ভাষা, বিশেষ করিয়া জার্ম্মাণ ভাষা জানা দরকার। এ অবস্থায় জাপানী গবেষক-বিদ্যার্থীদের মত আমাদের ছাত্রদেরও, বিশেষ করিয়া যাঁহারা গবেষণা করার আকাঙ্ক্ষা রাখেন তাঁহাদের ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্ত বিশেষ যত্নপরায়ণ হইতে হইবে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-পাঠ আমাদের পক্ষে একান্ত নূতন। জড়তা ভাঙিতে সময় লাগিবে। এই জড়তা দূর করিবার পক্ষে একটি বিশেষ মাসিক বা পাক্ষিক বৈজ্ঞানিক বাংলা পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন বিষয়ে এই পত্রিকায় শুধু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও পুস্তক ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে বিশেষ আলোচনা বিভাগ থাকাও দরকার। ইহাতে নানা লেখকের প্রকাশভঙ্গী হইতে নূতন নূতন শব্দ চয়ন ও বৈজ্ঞানিক ইডিয়মের সৃষ্টি হইবে। এইরূপ একটি পত্রিকা অন্ততঃ প্রথম দিক দিয়া যে লাভজনক হইবে না, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ একটি পত্রিকা-প্রকাশের প্রয়াস যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে না তাহাও মানি। কিন্তু বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রসারের দিক হইতে এইরূপ একটি পত্রিকার প্রয়োজন এত বেশী যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহার প্রকাশ ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত এবং সরকারের কর্ত্তব্য ইহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা। লক্ষ লক্ষ টাকা অকারণে খরচ না করিয়া উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া এইরূপ একটি পত্রিকা কয়েক বৎসর চালাইলে যে সুফল পাওয়া যাইবে তাহার তুলনায় খরচের অঙ্ক অকিঞ্চিৎকর। যে-সব বাঙালী বৈজ্ঞানিকের মাতৃভাষায় লিখিবার ক্ষমতা আছে তাঁহারা বিজ্ঞানের সহজ ও দুরূহ আলোচনা উভয়ই প্রবন্ধাকারে বা পুস্তকাকারে এই পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন। এই পত্রিকা সর্ব্বসাধারণের জন্ত হইবে না, ইহা শুধু বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের চাহিদা মিটাইবে।

সর্ব্বসাধারণের জন্ত ইংরেজীতে যাহাকে বলে lay public, সাময়িক পত্রিকায় সহজ ও সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আরও বেশী পরিমাণে প্রকাশিত হওয়া উচিত। যে যে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের উপযুক্ত বিভাগীয় সম্পাদনার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। ইহা না থাকিলে লেখায় যথেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কোন ডাক্তার-লেখক একটি বিশিষ্ট বাংলা মাসিক পত্রিকায় কয়েক বৎসর আগে ক্যালোরির সংজ্ঞা দিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন যে এক সের জলের তাপমাত্রা এক ডিগ্রী বাড়াইতে যতটা উত্তাপের প্রয়োজন তাহাই এক ক্যালোরি। ক্যালোরি কথাটা যখন সর্ব্বত্র ব্যবহৃত, তখন এক সের এক কিলোগ্রামের যতই কাছাকাছি হউক না কেন, সংজ্ঞায় সেরের পরিবর্ত্তে কিলোগ্রামই লেখা উচিত ছিল।

আর একজন লেখক কোন নাম-করা বাংলা দৈনিকের রবিবারের আসরে "শিল্পক্ষেত্রে আণবিক শক্তির প্রয়োগ" বুঝাইতে গিয়া লিখিয়াছিলেন,—"…এক কিলোওয়াট ঘণ্টায় বৈদ্যুতিক শক্তিতে চারটা কারখানা চলে—আণবিক শক্তি ব্যবহার করিলে বিশেষ ক্ষেত্রে ৮টা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত কারখানাও চলিতে পারে।" কি ধরণের কারখানা, তাহার মোট বোঝার (total load) পরিমাণ কি তাহার উল্লেখ নাই, তবুও লেখক এক কিলোওয়াটে ৪টি কারখানাই চালাইবেন এবং যে পরমাণবিক শক্তি বর্ত্তমান সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে পারে, তাহার দ্বারা মাত্র ৮টি হইতে ১২টি পর্য্যন্ত কারখানা চালু রাখিবেন। এইরূপ বৈজ্ঞানিক লেখা প্রকাশ করা সমীচীন নহে। উক্ত লেখক ঐ প্রবন্ধেই পরমাণবিক শক্তি যে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্ত শীঘ্রই বটিকাকারে পাওয়া যাইবে এমন ভরসাও দিয়াছিলেন। তাহা না পাওয়াতে কবিরাজী ও পেটেন্ট ঔষধের কারবার যাঁহারা করেন তাঁহারা হয়ত হতাশ হইবেন, কিন্তু আমরা হতাশ হইতেছি বাংলা বৈজ্ঞানিক

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ মনে করিয়া। এ বিষয়ে বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলির দায়িত্ব গুরুতর। একদা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সহজ সরল প্রাঞ্জল বাংলায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙালী পাঠকদের বিস্মিত করিয়াছিলেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের মত দিক্‌পাল সাহিত্যিকের দেখা সচরাচর সাহিত্য-জগতে মিলিবে না। কিন্তু দিক্‌পাল না হইলেও যে-সকল বৈজ্ঞানিক সাহিত্য-ক্ষেত্রে আছেন, দেশের প্রতি তাঁহাদের গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। তাঁহারা যতটা সম্ভব শ্রম ও যত্ন-সহকারে তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সকল রচনা করিবেন এবং যে সম্পাদকেরা তাহা ছাপাইবেন তাঁহারা দেখিবেন যে কোন ভুল তথ্য যেন সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিবেশন করা না হয়। এক কথায়, যে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য বাংলা ভাষার অব-হেলার ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিতেছে তাহার প্রতি আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে যত্নশীল হওয়া উচিত।

ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা-পদ্ধতি

শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত

ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা-পদ্ধতি একেবারে সূচনা হইতেই বহুক্ষেত্রে বিরূপ সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। পুরাতন ও চলিত শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত এই নূতন পদ্ধতির পার্থক্য এতই বেশী যে, শিক্ষাজগতে ইহা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। রাজনীতি এবং শিক্ষার সংমিশ্রণও অনেকের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকিবে। মহাত্মা গান্ধী এই শিক্ষা-পরিকল্পনাটি প্রথম প্রকাশ করেন বলিয়া কংগ্রেস বিরোধীদল ইহাতে কংগ্রেসী নীতির গন্ধ আবিষ্কার করিয়া ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে থাকেন। লীগপন্থী মুসলমানগণ ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় ইসলামবিরোধী আদর্শের ছায়া দেখিয়া ইহার কাছই ঘেঁষিলেন না। হিন্দু-মহাসভা, সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট নেতারা নিজ নিজ রাজনৈতিক আদর্শ লইয়া এতই ব্যস্ত যে, এই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতিটি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজনও তাঁহারা বোধ করিলেন না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভেদবুদ্ধি-প্রণোদিত সমালোচনা বাদ দিলেও অনেক নিরপেক্ষ শিক্ষাবিদ্ ওয়ার্দ্ধা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলির যৌক্তিকতা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনার স্বাবলম্বনের দিকটা সমালোচকদের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে, বুনিয়াদী বিত্তালয়ের ছেলেরা যাহা উৎপন্ন করিবে, তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে শিক্ষকের মাহিনা এবং বিত্তালয়ের অন্যান্য খরচ চলিবে। বুনিয়াদী বিত্তালয় সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইতে পারে কিনা এবং ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কি কি আছে তৎসমুদয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, মহাত্মা গান্ধী স্বাবলম্বনের উপর এতটা জোর দিয়াছিলেন কেন? ১৯৩৭ সালে গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত করেন। তখন ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসীদল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেও দেশ পরাধীন ছিল। বিদেশী শাসকসম্প্রদায় শিক্ষাবিস্তারের জন্য তত ব্যগ্র ছিল না, তাই শিক্ষাবিস্তারের জন্য উপযুক্ত অর্থাভাবের অজুহাত সকল সময়েই দেখানো হইত। দেড় শত বৎসর ইংরেজশাসনে এদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে শতকরা মাত্র দশ জন। দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিদেশী সরকারের উপর ষোল আনা নির্ভর করিলে দেশের নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর হইবার আশা সুদূরপরাহত বলিয়াই মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে স্বাবলম্বী করিতে চাহিয়াছিলেন।

বুনিয়াদী শিক্ষার বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—বিদ্যালয়কে স্বাবলম্বী করিতে হইলে শিশুকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে; তাহাতে শিশুর স্বাস্থ্য ভাঙিয়া যাইবে এবং তাহার লেখাপড়ার দিকে শৈথিল্য আসিবে। কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে কর্ম্মের স্থান গৌণ, শিক্ষার স্থানই প্রধান—কর্ম্ম হইবে শিক্ষার বাহন। বিদ্যালয়কে স্বাবলম্বী করিতে হইলে বাহনকে আরোহীর চেয়ে বেশী মর্য্যাদা দিতে হয়। শিশু চায় নিজের হাতে জিনিষপত্র নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে, ভাঙিতে এবং গড়িতে। বদ্ধ ঘরের মধ্যে বসিয়া মুদ্রিত পুস্তকের উপর মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে শিশুর চঞ্চল চিত্ত অস্থির হইয়া উঠে। বিত্তালয়ে শিশুকে বিভিন্ন প্রকার হাতের কাজ করিতে দিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে এক দিকে যেমন শিশুর ভাঙাগড়ার প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে, অন্য দিকে তেমনি তাহাকে শিক্ষাদান করাও সহজসাধ্য হইবে। কিন্তু এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কর্ম্মযোগী মহাত্মাজী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা শিক্ষাকে দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে জগতে কর্ম্মেরই প্রাধান্য—কর্ম্মকে বুঝিবার জন্যই জ্ঞানের আবশ্যকতা। গান্ধীজীর মতে বিদ্যালয়গুলি কর্ম্মকেন্দ্রিক হইবার উদ্দেশ্য, শিশু বিদ্যালয়ে থাকিবার সময়েই কাজ করিতে শিখিলে কর্ম্মজীবনে তাহাকে ধাক্কা খাইতে হইবে না।

উক্ত শিক্ষাপদ্ধতির একদল সমালোচক বলেন—শিশুর একটি নিজস্ব জগৎ আছে। সেই কল্পনার জগতে তাহার একচ্ছত্র আধিপত্য। শিশু কোন দ্রব্য পাইলে তাহাকে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তোলে—প্রয়োজনের তাগিদে নয়, তাহার কল্পনার প্রেরণায়। যদি বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে স্বাবলম্বী হইতে হয় তাহা হইলে শিশুকে এমন জিনিষ তৈরি করা শিক্ষা দিতে হইবে বাজারে যাহার বিশেষ চাহিদা আছে। কিন্তু ইহাতে শিশুর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, সে আপন কল্পনার তাগিদে যাহা ইচ্ছা তৈরি করিতে পারিবে না—পূর্ণবয়স্কদের পছন্দ অপছন্দ তাহার কাজের উৎকর্ষাপকর্ষের মাপকাঠি হইবে। এই প্রয়াসের ফলে শিশুকে তাহার শিশুত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া পূর্ণবয়স্কের ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত করা হইবে।—এই শ্রেণীর সমালোচকরা ভুলিয়া যান যে, শিশুর জগৎ পৃথক হইলেও তাহা পূর্ণবয়স্কদের অনুকরণে গঠিত। শিশু আপন-মনে যে কাজ করে তাহাতে সে পূর্ণবয়স্কদের অনুকরণ করে। অতএব যদি শিশুকে সামান্য একটু নির্দেশ ও শিক্ষা দিলেই সে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈয়ারি করিতে পারে তাহাতে দোষের কি আছে? তাহা ছাড়া শিশু যখন দেখে যে, তার হাতের তৈয়ারি জিনিষ তার বাপ, মা, ভাই-বোন ব্যবহার করিতেছে, তখন তাহার যে আনন্দ হয় তাহার তুলনা কোথায়?

কেহ কেহ বলেন, খেলাই শিশুর শ্রেষ্ঠ কাম্য। খেলিতে পাইলে শিশু যে আনন্দ পায় আর কিছুতেই তাহা সম্ভব নয়। হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিবার সময় শিশু-চরিত্রের এই দিকটার প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তুলা, তকলী, চরখা, কাঠ এবং ছুতারের যন্ত্রপাতি, উদ্যান-রচনার যন্ত্রপাতি শিশুর হাতে দিতে হইবে। শিশু এই যন্ত্রপাতি লইয়া নিজের ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করিয়া খেলা করিবে। কিন্তু দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিবার দিকে অতিরিক্ত নজর দিলে শিশু-মনের স্বাভাবিক আনন্দ নষ্ট হইবে এবং তাহার উপর বাহির হইতে জোর করিয়া কাজের বোঝা চাপানো হইবে। এখানে সমালোচকেরা একটা কথা ভুলিয়া যান—শিশুরা স্বেচ্ছায় ও মনের আনন্দে যে কাজ করিতেছে সে কাজের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রাখিলে তাহার মানসিক আনন্দ লোপ পাইবে। শিশু যে জিনিস তৈরি করিবে তাহার প্রয়োজনীয়তা এবং উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য না থাকিলে শিশু-চরিত্রে নিয়মানুবর্তিতার অভাব এবং কাজে শিথিলতা পরিলক্ষিত হইবে। ইহার ফলে শিশুর পক্ষে ভবিষ্যৎ জীবনে একাগ্রচিত্তে এবং একনিষ্ঠ ভাবে কর্ম্ম সম্পাদন করা কঠিন হইবে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মত সমৃদ্ধিশালী দেশে বিভিন্ন প্রকারের মূল্যবান উপকরণ লইয়া শিশুদের খেলা করিতে দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে আমরা সামান্য জিনিষও বৃথা নষ্ট হইতে দিতে পারি না। মনে হয় এই বিষয় বিবেচনা করিয়াই গান্ধীজী প্রয়োজনীয় জিনিষের উৎপাদনের উপর জোর দিয়াছেন। অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্য ও শিক্ষাদান ব্যতিরেকে বুনিয়াদী শিক্ষায় সফলতা লাভ করা কঠিন। অনুপযুক্ত শিক্ষক হয়তো দ্রব্যাদি উৎপাদনের উপর অতিরিক্ত জোর দিবেন—তাহাতে শিশুর মনের আনন্দ নষ্ট হইয়া যাইবে; কিম্বা হয়তো তিনি উৎপাদনের দিকে একেবারেই নজর রাখিবেন না, যাহার দরুন শিশু-চরিত্রে শিথিলতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব প্রকাশ পাইবে। শিক্ষককে এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে সমভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে।

অনেক শিক্ষাবিদের মতে ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার প্রধান দোষ হইতেছে এই যে, ইহাতে ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা একই রূপ করা হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানে বলা হইয়াছে, ১১ বা ১২ বৎসর বয়সটি শিশুর জীবনে একটা সন্ধিক্ষণ। এই বয়ঃসন্ধিকালে প্রথম সে শৈশব হইতে কৈশোরে পা দেয়, তাহার শারীরিক ও মানসিক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষের শরীর ও মনের ক্রমবিকাশের যে বিভিন্ন স্তর আছে তন্মধ্যে ১১ হইতে ১২ বৎসর বয়সের যে স্তর তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা যে ভাবে চলে, ১১।১২ বৎসর বয়সে তাহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। কিন্তু ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনায় ৭ হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক-বালিকাদের একই ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। মনে হয়, ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনার এটা সত্যকার একটা ত্রুটি এবং পরিকল্পনা-প্রণয়নকারীরা ঐ দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করেন নাই। ১১ এবং তদূর্দ্ধ বৎসর-বয়স্ক শিশুর শিক্ষা তন্নিম্ন বয়সের শিশুদের অপেক্ষা ভিন্ন ধরণের হওয়া দরকার। ১১ বৎসর বয়সে একটা সাধারণ পরীক্ষা লইয়া শিশুদের যোগ্যতা এবং রুচি অনুসারে বিভিন্ন রকমের শিক্ষা-ব্যবস্থা করা উচিত।

কাহারও কাহারও অভিযোগ এই যে, বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে একই হাতের কাজের মাধ্যমে সকল শিশুকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু পাত্রভেদে শিশুদের রুচি আলাদা আলাদা। বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন শিশুদের একই ধরণের কাজ ভাল লাগিতে পারে না। সকল শিশুকে একই হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিবার চেষ্টা মনোবিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। এই অভিযোগ যাঁহারা করেন, তাঁহাদের একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, একই কাজের নানা স্তর আছে—বিভিন্ন প্রকৃতির শিশু কাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে মনঃসংযোগ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনায় সূতা কাটাকে আধারিক (basic শিল্প বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কার্পাসের

বীজ বপন হইতে সুতা কাটা পর্য্যন্ত এই শিল্পের এতগুলি স্তর আছে যে, প্রত্যেক শিশুরই ইহার কোন না কোন স্তর ভাল লাগিবার কথা। যাঁহারা একই বিভালয়ে বিভিন্ন প্রকারের শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বিভিন্ন প্রকার শিল্প শিক্ষা দিবার যোগ্য শিক্ষক পাওয়া কঠিন এবং আমাদের মত দরিদ্র দেশে বিভিন্ন প্রকার শিল্প শিক্ষা দিবার খরচ প্রত্যেকটি বুনিয়াদী বিভালয়ের পক্ষে বহন করাও কঠিন। তাহা ছাড়া আর এক কথা, একই শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রদান করিলে তাহার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় আছে তৎসম্বন্ধে বিশদ পরীক্ষা চলিতে পারে।

অনেকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, সকল বুনিয়াদী বিভালয়ে সুতা-কাটাকে আধারিক শিল্প হিসাবে লওয়া হইবে কেন? সকল বিভালয়ে সুতা কাটাকেই আধারিক শিল্প হিসাবে লইতে হইবে এমন কথা নাই—বরং জাকির হোসেন রিপোর্টে বলা হইয়াছে, যে অঞ্চলে কোনও বিশেষ শিল্প সমধিক প্রচলিত আছে তাহাকেই আধারিক হাতের কাজ হিসাবে বুনিয়াদী বিভালয়ে গ্রহণ করা উচিত। তবে কার্য্যতঃ সকল বুনিয়াদী বিভালয়েই সুতা কাটাকে আধারিক শিল্প হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার কারণ, যাহাতে শিক্ষার্থী স্বাবলম্বী হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। আজকাল দেখিতে পাই, পাড়াগাঁয়ের ছেলে একটু লেখাপড়া শিখিলেই শহরের দিকে চাকরীর খোঁজে ছুটে—কারণ বিভালয়ে সে হাতে-কলমে এমন কিছু শিখে নাই যাহাতে গ্রামে থাকিয়াই সে নিজের জীবিকার সংস্থান করিতে পারে। এইজন্যই গান্ধীজী শিক্ষার্থীদের স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। স্বাবলম্বী হইতে হইলে জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করিবার উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করা উচিত। অন্ন ও বস্ত্রই মানুষের জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন। এইজন্যই দেখি প্রত্যেক বুনিয়াদী বিভালয়ে সুতা কাটাকে আধারিক শিল্প এবং কৃষিকার্য্যকে সহায়ক কাজ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। গান্ধীজীর মতে, শিশুদের হাতের তৈয়ারী দ্রব্যাদির বিক্রয়মূল্য দ্বারা বিভালয়ের খরচ চলিবে। ইহাতে অনেকেই বলিয়াছেন যে, শিশুদের হস্তনির্ম্মিত জিনিষের চাহিদা বাজারে হইবে না, কারণ পূর্ণবয়স্কদের তৈয়ারি জিনিষের তুলনায় তাহা নিতান্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইবে। অতএব বুনিয়াদী বিভালয়ে এমন জিনিষ তৈয়ারি করিতে হইবে যাহার চাহিদা থাকিবেই। আমাদের দেশে অন্ন ও বস্ত্রের অভাব অভাবিক—কাজেই এই দুইটি জিনিষের চাহিদাও সবচেয়ে বেশী। ধরা যাক, কোন স্থানে ছুরি, কাঁচি ভাল তৈয়ারি হয়। কাজেই সেই স্থানের বুনিয়াদী বিভালয়ে ছুরি কাঁচি নির্ম্মাণকে আধারিক শিল্প হিসাবে গ্রহণ করা হইল। ছেলেরা যে ছুরি কাঁচি তৈয়ারী করিল তাহা উন্নত ধরণের না হওয়ারই সম্ভাবনা। ছুরি কাঁচি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ নহে। কাজেই কোন পরিবারের লোক যখন একখানি ছুরি কিনিবে তখন দেখিয়া শুনিয়া কিছু বেশী দাম দিয়া ভাল জিনিষই ক্রয় করিবে। অপেক্ষাকৃত কম দাম হইলেও শিশুদের তৈয়ারি ছুরি কাঁচি লোকে সাধারণতঃ কিনিতে চাহিবে না। কাজেই মনে হয়, প্রত্যেক অঞ্চলের বুনিয়াদী বিভালয়ে সুতাকাটা বা কৃষিকার্য্যকে আধারিক হাতের কাজ হিসাবে গ্রহণ করিয়া স্থানীয় কোন না কোন বিশিষ্ট শিল্পকে সহায়ক শিল্প হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। ইহার মধ্যে আরও একটা কথা আছে। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় সুতাকাটা ও কৃষিকার্য্যের বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে শিক্ষা-দানের সুযোগ অনেক বেশী, কাজেই সুতাকাটা ও কৃষি-কার্য্যকে আধারিক হাতের কাজ হিসাবে গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

বুনিয়াদী বিভালয়ে কোন পাঠ্য পুস্তকের স্থান নাই। শিশু শিক্ষালাভ করিবে কাজের মাধ্যমে। অনেক শিক্ষাবিদ্ বলেন, কাজের মাধ্যমেই শিক্ষা আরম্ভ করা উচিত, কিন্তু কেবল কাজের মাধ্যমেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে। দেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবিদের রচনার সহিত পরিচিত হইতে হইলে তাঁহাদের রচিত পুস্তকাদি নিয়মিত পাঠ করা উচিত। ইতিহাস সম্বন্ধেও একথা বলা যাইতে পারে যে, শুধু কাজের মাধ্যমে এ বিষয়ে পরিপূর্ণ এবং সুসংবদ্ধ জ্ঞান দান করা সম্ভব নহে। অবশ্য সুতা কাটার সময় শিশুদের নিকট বিভিন্ন যুগে ভারতের এবং অন্যান্য দেশের পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে—ভারতের বস্ত্রব্যবসায়ের ইতিহাস আলোচনা করাও সম্ভব। কিন্তু এ ধরণের কাজের মাধ্যমে ইতিহাসের ধারাবাহিক জ্ঞানদান করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কাজের মাধ্যমে শিশুর মনে ভূগোল সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এভাবে ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর ভূগোল সম্বন্ধে সম্যক্ শিক্ষাদান করা সম্ভব নহে। বুনিয়াদী শিক্ষার সমর্থকেরা বলেন, শুধু যে আধারিক শিল্পের মারফতেই শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা নহে, শিশুর জীবনযাত্রার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যখনই সুযোগ ও সুবিধা হইবে এবং প্রয়োজন দেখা দিবে তখনই তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই প্রকারে জ্ঞাতব্য প্রায় সকল বিষয়ই অধিগত করা শিশুর পক্ষে সম্ভব হইবে। তদুপরি ইঁহারা বলেন যে, শিশুর অভিজ্ঞতার বাহিরে যে শিক্ষা প্রদান করা হয় তাহাতে তাহার কোন প্রয়োজন নাই। যখন প্রয়োজন বোধ করিবে শিশু তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইবার চেষ্টা করিবে। তাহাদের মতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাবাহিক ঘটনাগুলি

জোর করিয়া শিশুদের গলাধঃকরণ করাইবার চেষ্টার দরকার নাই। অশোকের কত শতাব্দী পরে আকবর রাজত্ব করিয়াছেন, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি এ সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া না জানিলে শিশুর কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু আমার মনে হয়, কাজের মাধ্যমে শিশুর বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ জাগাইয়া তোলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সকল বিষয়ে সুসংবদ্ধ জ্ঞান দান করা কর্তব্য এবং তাহা করিতে হইলে সুলিখিত পাঠ্য পুস্তকের সাহায্য লওয়া উচিত।

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে পরীক্ষার আসন খুব উচ্চে। ইহাতে শিশুর সারা বৎসরের পরিশ্রমের কোন মূল্যই দেওয়া হয় না যদি না সে পরীক্ষায় নিজের কৃতিত্ব দেখাইতে পারে। সারা বৎসর বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্য্যে অবহেলা করিয়া, পরীক্ষার পূর্ব্বে কয়েক দিন রাত্রি জাগিয়া পাঠ মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাইলেই তাহাকে ভাল ছেলে বলিয়া অভিহিত করা হয়। পরীক্ষার দুই-তিন ঘণ্টা সময়ের শিশুর কার্য্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে তার স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষ সাধন হয় বটে, কিন্তু তার অন্যান্য মানসিক বৃত্তির বিকাশের দিকে ততটা লক্ষ্য রাখা হয় না। তাহা ছাড়া পরীক্ষার দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোবৃত্তিকে উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রায় সকল শিক্ষাবিদ্ স্বীকার করেন যে, চলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রকৃত শিক্ষালাভ না হওয়ার কারণ পরীক্ষার উপর এরূপ গুরুত্ব আরোপ করা। বুনিয়াদী শিক্ষায় পরীক্ষার স্থান নাই। বৎসরে দুই বার প্রদর্শনী হয় এবং শিক্ষকেরা শিশুদের কাজের একটা রেকর্ড রাখেন। এই প্রদর্শনী এবং শিক্ষকদের রাখা রেকর্ড পরীক্ষার স্থান দখল করিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে আজকাল বুদ্ধিবৃত্তি পরিমাপের পদ্ধতি (intelligence test) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় বুদ্ধি এবং বিচার-শক্তির উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। এইজন্য বিরূপ সমালোচকেরা বলেন, বুনিয়াদী শিক্ষায় হাতের কাজের দিকেই কেবল লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, কিন্তু মানসিক বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ-সাধনের প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা করা হইয়াছে। পরীক্ষার দ্বারা শিশুর উপস্থিতবুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি ও বিচারশক্তির বিকাশ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি পরিমাপের দ্বারা প্রমাণ হয় শিশু কি পরিমাণ বুদ্ধি ও বিচারশক্তি লইয়া জন্মিয়াছে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য শিশুর দেহমনের সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন করিয়া তাহাকে সুস্থ ও দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিকে পরিণত করা। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে শরীর ও মনের শক্তিনিচয়ের বিকাশের দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বুনিয়াদী শিক্ষার পরিপোষকেরা মনে করেন যে পরীক্ষার দ্বারা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা যতটা দোষের সমষ্টিগত প্রতিযোগিতা ততটা দোষের নহে। কাজেই পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়া ছাত্রদের প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি ভাবে ভাগ না করিয়া মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

মহাকাব্যের দিনগুলি এলো

শ্রীসুবলসখা বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখেছি সেদিন বাতায়ন-পাশে ঘুমভাঙা মাঝরাতে—
তারার দেশেতে প্রদীপের মালা আলোর জোয়ারে মাতে।
প্রশ্ন জেগেছে হৃদয়ের কোণে—ঐ দেশে থাকে কারা ?
উত্তর তার পাইনিকো খুঁজে, বিস্মিত আঁখিতারা।
রাতের আকাশে শুধায়েছি আমি, শুধায়েছি কত বার—
কত ব্যবধান তারার মাটিতে ? উত্তর নাহি তার।
অমরারা বুঝি মাতে উৎসবে সাজায়ে বরণডালা ?
মধু-যামিনীতে তাই-যে দেখেছি লক্ষ প্রদীপ-জ্বালা।
কাননে সেথা আগুন জ্বলে কি ফুল দোল-জাগা বনে ?
ব্যথার অশ্রু কখনও কি ঝরে উৎসব-শুভক্ষণে ?
সুখের স্বপন ভাঙিলে কি কাঁদে জেগে ওঠে অভাগিনী ?
ভুলো না বন্ধু, চির-বসন্তে সে দেশ অনিন্দিতা।

মনের ভুমিতে প্রশ্নেরা নাচে মেলে দিয়ে নীল পাখা—
নীরব পৃথিবী ; ঊর্দ্ধ-আকাশে আকাশ-গঙ্গা বাঁকা।
ওইখানে আছে সেকালের কবি হঠাৎ ভাবিয়া পাই,
আর আছে যারা অমর অথচ এইখানে যারা নাই।
প্রথম ছন্দ-রচয়িতা জানি তুমি যে মরণহীন,
শ্যামায়িত বনে সেথা পড়ে আজো তোমারই কি পদ-চিহ্ন ?
ক্রৌঞ্চ-মিথুন আজও কি কাঁদিছে তোমার হৃদয়-দ্বারে ?
নব কবিতার মালা কি গেঁথেছ ? পরায়েছ সেথা কারে ?
মানুষের বুকে হেথা মহাসুখে মানুষের চিতা জ্বলে—
মিনতি আমার নেমে এসো কবি মৃত ধরণীর তলে।
নতুন দিনেতে দেখে যাও নব কবিতার আয়োজন,
সৃষ্টির হীন-মানুষে লইয়া রচে কোটি রামায়ণ।

নেপালচন্দ্র রায়

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্রয়, সাহচর্য্য, সান্নিধ্য—এই তিনটি মানবচরিত্রের পরিচয়-লাভের প্রকৃষ্ট উপায় মনে হয়। স্বর্গগত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত আমার যাহা কিছু পরিচয় হইয়াছিল, তাহা এই তিনের মধ্যে সান্নিধ্য জন্যই; এক পল্লীতেই আমাদের উভয়ের বাস ছিল; এই নিকট-বসতি হেতুই উভয়ের সময় সময় দেখা-শুনা, কথাবার্ত্তা, আলাপ-সালাপ চলিত; তাই এই পরিচয় সান্নিধ্যজন্যই ফল। ঐরূপ সূত্রে তাঁহার বিষয়ে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

অধ্যাপনা:—কবির আদেশে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে অধ্যাপনার কার্য্যে আমার যোগ দেওয়ার কয়েক বৎসর পরে নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় (আমার নেপাল-দা) আশ্রমে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—বিশ্বভারতীর প্রারম্ভকাল—শৈশবাবস্থা। ইহার পূর্ব্বে এলাহাবাদে 'এংলো বেঙ্গলী' বিদ্যালয়ে তিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অধ্যাপনায় বিশেষ পারদর্শিতার জন্য তাঁহার বেশ খ্যাতিও ছিল। বঙ্গ-বিভাগ জন্য আন্দোলনের সময়ে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং পরে কবির আহ্বানে আশ্রমে অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁহার বাসগৃহ শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বপ্রান্তে নূতন বাড়ীর পশ্চিম দিকে ছিল, পরে বর্ত্তমান 'হিন্দীভবনে'র সম্মুখে 'নেপাল-রোডে'র উত্তরপার্শ্বস্থ একটি গৃহে কিছুকাল বাস করিয়া শেষে গুরুপল্লীতে আমার বাসার নিকটে একটি গৃহে অবস্থান করেন। ইহাই তাঁহার শেষ বাসস্থান। এই সময়ে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত আমাদের ক্রমে বিশেষ পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়।

আত্মীয়তা:—মানুষ সহজেই সামাজিক; তাই সে একাকী কখনও কোথাও থাকিতে ভালবাসে না; যেখানেই থাকুক না কেন, সমাজবদ্ধ হইয়া থাকা তাহার স্বাভাবিক; এই সমাজবন্ধনই আত্মীয়তার মূলসূত্র। সরলতা নেপালদার স্বভাবগত একটি লক্ষণীয় গুণ ছিল; ইহা আত্মীয়তার পরিপুষ্টি-সাধক; ইহাই তাঁহাকে অনেকেরই আত্মীয় করিয়াছিল। আমার কোন কোন বিষয়ে তাঁহার এই অমায়িক আত্মীয়তার পরিচয় পাইয়াছিলাম। তিনি আমার 'নেপালদা', তাই আমার ছেলেমেয়েদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল 'জ্যেঠা-মশায়'। তিনি কেবল সম্পর্কেই জ্যেঠামহাশয় ছিলেন না, তাহাদের প্রতি তাঁহার তদনুরূপ আন্তরিক স্নেহ-মমতায় সে সম্পর্ক সার্থকই হইয়াছিল। তাহাদের জ্যেঠিমারও (আমার মাননীয়া বৌদিরও) তাহাদের প্রতি অপত্য-নির্ব্বিশেষে স্নেহপ্রবণতার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাঁহার বাসায় যখন যাহা কিছু আসিত, তাহাতেই আমাদের কিছু না কিছু অংশ নির্দ্দিষ্টই থাকিত। নেপাল-দারও ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয় ছিল। তাই বলি, কেবল কথায় নয়, কার্য্যেও তাঁহাদের আত্মীয়তা ও বাৎসল্য সপ্রমাণ হইত। অনাত্মীয়কে এইরূপ সর্ব্বপ্রকার আত্মীয়তার চক্ষুতে দেখা স্বভাবের স্বচ্ছতাই প্রতিপন্ন করে।

আমার ছোট মেয়ে মায়া (কমলিনী) জ্যেঠামশায়ের ও জ্যেঠিমার বিশেষ স্নেহপাত্রী ছিল। মায়ার অন্যের মন আকৃষ্ট করিয়া স্নেহভাজন হওয়ার শক্তি মায়ার একটি অনন্যসাধারণ স্বাভাবিক গুণ। মায়ার এই মায়ায় পড়িয়াই নেপাল-দা জ্যেঠামশায়ের স্নেহে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বৌদির স্নেহও সেই একই আকর্ষণী শক্তির ফল। তাঁহাদের কন্যা এবং জামাতাও মায়ার এই মায়া-ফাঁদ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই।

আত্মীয়তার সূত্রপাত:—একবার বিদ্যালয়ের অবকাশের পরে শান্তিনিকেতনে আসার সময়ে হাওড়া ষ্টেশনে আমার স্ত্রীকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া দেখিলাম, বৌদি সেই গাড়ীতে বসিয়া আছেন। তখন স্ত্রীকে বৌদির নিকটে গিয়া বসিতে বলিলাম। উভয়ের এই সাক্ষাৎকার ও সমাগম বস্তুতই শুভক্ষণেই হইয়াছিল; রায়-পরিবারের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ পরে স্থাপিত হইয়াছিল, এই মিলনই তাহার বীজস্বরূপ। আচার-ব্যবহারে, কাজ-কর্ম্মে, সাংসারিক কথা-বার্ত্তায় উভয়ের এই সম্বন্ধ ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সূত্রেই নেপাল-দাও আমার পরিবারবর্গের প্রতি স্নেহাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যখনই শান্তিনিকেতনে আসিতেন, তখনই আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া একে একে সকলের কুশল-প্রশ্ন করিতেন। রায়-দম্পতির এই সরল স্নিগ্ধ স্বভাব আমরণ আমাদের স্মৃতির বিষয় হইয়া থাকিবে।

কৌলীন্য:—নেপাল-দার পরিবার একান্নবর্ত্তী; কৌলীন্য বা আভিজাত্য একান্নবর্ত্তিতার একটি প্রধান কারণ। তাঁহার পরিবার ভাই-পো ভাই-ঝি পুত্র পৌত্র দৌহিত্র প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনে অতি বৃহৎ। মূলঘরের এই রায়বংশ যেমন আভিজাত্য-সম্পন্ন, তেমনই কুলোচিত ক্রিয়াকলাপে সুপ্রসিদ্ধ। বিশিষ্ট বৈদ্যবংশের সহিত এই বংশীয়দিগের বৈবাহিক ও সামাজিক সম্বন্ধ ইহার অন্যতম প্রমাণ। এই বংশের অনেক বালক-বালিকা শৈশব হইতে আমার ছাত্র-ছাত্রী ছিল; তাহাদের স্বভাবগত আচরণে ব্যবহারে শান্তশিষ্টতায় আভিজাত্যের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম। যৌথ পরিবারের একটি বিশেষ ফল এই যে, সম্মিলিত বাস হেতু সকলেরই সঙ্গে সর্ব্বদা মেলা-

বেশায় অন্তরঙ্গতা বর্দ্ধিত ও দৃঢ় হয় এবং সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে পালি-পার্ব্বণে অথবা আপদ-বিপদে সকলের সমবেত চেষ্টায় অনায়াসেই কার্য্য সমাধান হয়। রায়বংশের এই সব বিষয়ে সকলের সহকারিতা কখন কখন জানিতে পারিয়াছি। একান্নবর্ত্তী পরিবারের সম্মিলিত চেষ্টার ফলের উপমায় প্রচলিত প্রবচন—"ঝাড়ের বাঁশ ঝড়ে পড়ে না, অর্থাৎ পরস্পর-জড়িত বংশগুচ্ছ প্রবল ঝড়েও উন্মূলিত হয় না। যৌথ পরিবারের গুণগরিমা এইরূপই মহান্। এইরূপ পরিবার যেমন সুখকর, তেমনই পরম সৌভাগ্যের পরিচায়ক। নেপাল-দা এইরূপ পরিবারের ভাগ্যবান্ কর্ত্তা ছিলেন।

মণিকাঞ্চন সংযোগের ন্যায় মাননীয়া বৌদি নেপাল-দার অনুরূপা সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। ভাগ্যেই এই সুখসম্বন্ধ ও সম্মেলন ঘটিয়া ছিল। আমার স্ত্রীর সহিত বৌদির প্রণয়-সূত্রেই তাঁহার স্বভাবের নানা বিশেষত্বের পরিচয় পাইয়াছিলাম। আভিজাত্য এইরূপই সুফলপ্রদ।

সময়নিষ্ঠা :—নেপাল-দার মন একটু ভোলা-ভোলা রকম ছিল। এই হেতু তাঁহার কার্য্যে সময়নিষ্ঠার অভাব জনা ত্রুটি লক্ষিত হইত। এই দোষ তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে, স্বাভাবিক; বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ইহার সংশোধন করিতে পারিতেন না। অধ্যাপনাকালে এই সময়নিষ্ঠার অভাবের কথা ছাত্রদের নিকটে শুনিয়াছি। পাঠনার সময়সূচী প্রায়ই উঁহার মনে থাকিত না, হঠাৎ মনে হইলে ব্যস্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় শেষে আসিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিতেন, সময়ের পরিমাণের কথা মনে থাকিত না, পড়াইয়াই যাইতেন। অন্য অধ্যাপক আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, জানিতে পারিলেই, অপ্রস্তুত হইয়া উঠিয়া যাইতেন। সভা-সমিতিতেও উপস্থিতির সময়ে কখন কখন এইরূপ ত্রুটি ঘটিত।

তিনি যখন এলাহাবাদে শিক্ষকতা করিতেন, তখনও তাঁহার এইরূপ সময়ের ব্যতিক্রম হইত শুনিয়াছি। একবার কলিকাতায় যাইবার সময়ে আমি তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলাম। তাঁহার স্বভাবগত দীর্ঘসূত্রতা জানিতাম, তাই সময়ে প্রস্তুত হইবার বহু আগেই তাঁহাকে তাগিদও দিয়াছিলাম, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও সেই দুরত্যয় স্বভাবের হাত হইতে তিনি নিষ্কৃতি পান নাই।

এই সময়বেদিতার অভাব হেতু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে 'ব্রহ্মন্' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, অর্থাৎ তাঁহার দিন, ব্রহ্মার দিন, অতিসুদীর্ঘ কাল, লৌকিক সৌর দিন নহে।

সর্ব্বাধ্যক্ষতা :—আশ্রমের সর্ব্বাধ্যক্ষের পদে তিনি কিছু কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার নানা কার্য্যের মধ্যে একটি প্রশস্ত রাস্তা-নির্ম্মাণের কথা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, মনে হয়। তখন আশ্রমে পথের কোন সুব্যবস্থা ও পারিপাট্য ছিল না। বোলপুর ষ্টেশন হইতে শান্তিনিকেতন পর্য্যন্ত যে বড় রাস্তা আছে, তাহার সহিত মিলিত করিয়া তিনি একটি বড় রাস্তা-নির্ম্মাণের উদ্যোগ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আশ্রমের বালকেরাই স্বহস্তে মাটি কাটিয়া এই রাস্তা বাঁধিবে; তিনি আপনিও এই কর্ম্মে বালকদিগের সহকর্ম্মী হইয়াছিলেন। রাস্তা-বাঁধা কিছুদূর অগ্রসর হইলে, বালকগণের পক্ষে এই কার্য্য অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া আশ্রমের ব্যয়ে মজুর দিয়া অবশিষ্ট অংশ বাঁধাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই রাস্তার এখনও কোন বিশেষ নামকরণ হয় নাই, সাধারণভাবে ইহা 'নেপাল রোড' নামে অভিহিত।

স্বদেশসেবা :—স্বদেশের সেবাকার্য্যে একান্ত অনুরাগ তাঁহার স্বভাবের একটি সর্ব্ববিলক্ষণ গুণ ছিল। সময়-সুবিধা পাইলেই তিনি স্বদেশের কার্য্যে উদ্যোগী ও অগ্রসর হইতেন, সমিতিতেও তদ্বিষয়ে বক্তৃতাও করিতেন। স্বর্গগত প্রবাসী-সম্পাদক প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী মনীষিগণের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। দেশের উন্নয়নকল্পে তিনি উৎসাহী ও অগ্রণীগণের অন্যতম ছিলেন। বিশ্বভারতীর গ্রামসংস্কার-বিভাগের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের সংস্কার-কার্য্যে তিনি কোন কোন সময়ে সহযোগী হইতেন এবং গ্রামের জনসভায় বক্তৃতাও করিতেন।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় টাউন হলের সভায় বিরোধীদলের সহিত সংঘর্ষে লাঠির আঘাতে আহত হইয়া তিনি কিছুকাল শয্যাগত ছিলেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, বার্দ্ধক্যেও জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য স্বদেশসেবাব্রত পালন করিতে তিনি বিরত হন নাই। জনসেবার আহ্বানে শারীরিক অসুস্থতাও তাঁহাকে যোগদানে পশ্চাৎপদ করিতে পারে নাই। ধন্য সেই স্বদেশসেবকের স্বদেশানুরাগ।

আমোদপ্রিয়তা :—হাস্যকৌতুক বিষয়ের রসজ্ঞতা তাঁহার স্বভাবের অন্যতম বিশেষ গুণ ছিল। তাঁহার বাসপল্লীর সকল বালকবালিকার সহিত সম্পর্কে তিনি ছিলেন 'দাদা-মশায়', তাই নাতি-নাতনীর দল লইয়া তাঁহার হাস্য-পরিহাস রঙ্গ-তামাশা বেশ অবাধেই চলিত। বার্দ্ধক্যেও বালক সাজিয়া তিনি বাল্যসুলভ কথাবার্ত্তায় তাহাদের সঙ্গে একেবারেই মিশিয়া যাইতেন। প্রভাতে উঠিয়া পাড়ার বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তিনি ছেলেমেয়েদের নাম ধরিয়া ডাকিতেন, উত্তর না পাইলে 'অলস' 'অকর্ম্মণ্য' বলিয়া বিদ্রূপ দিয়া উপহাস করিতেন। নাতি-নাতনীরা এই ভয়েই সকালে সকালে উঠিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিয়া থাকিত; পক্ষান্তরে তাঁহার উঠিতে একটু বিলম্ব হইলে, তাহারাও "আজ আপনার হার' বলিয়া হাসিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতে ছাড়িত না। এইরূপে তিনি তাহাদিগকে লইয়া প্রহসন-নাট্যের অভিনয় বালকবৎ বেশ উপভোগ করিতেন। তিনি জ্যেঠামশায়

হইলেও, তাঁহার এই নাট্যের ভূমিকায় মায়ার অভিনয় বাদ পড়িত না।

কবিবর একবার লিখিয়াছিলেন, "youth is still living in mo (?) অর্থাৎ যৌবন আমার মধ্যে এখনও (বার্দ্ধক্যেও) জীবিত আছে। শিশুর সঙ্গে শিশু সাজিয়া তাঁহার শৈশবের অভিনয়ও দেখিয়াছি। নেপাল-দাদার বার্দ্ধক্যে বাল্যযৌবনসুলভ কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি যখন যে দলে যোগ দিতেন, তখনই সেই দলের মত সাজিয়া আমোদ-সাহ্লাদে বেশ মশগুল হইতেন।

অধ্যাপকগণের ও ছাত্রছাত্রীদের বনভোজনের নিমন্ত্রণে তিনি সহযাত্রী হইতেন। বার্দ্ধক্যে এই সহযোগ বিশেষ ক্লেশকর এবং অনিয়মিত স্নানাহার পীড়াজনক বুঝিয়াও, এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। তাঁহার স্বভাব এমনই আমোদপ্রিয় ছিল।

ধর্মমত :—ধর্মবিষয়ে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক মতামত তাঁহার মুখে কখনও শুনি নাই। যত দূর জানি, তিনি এ বিষয়ে মৌনীই ছিলেন। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে লিখিয়াছেন,—"দেবতাকে তিনি একটা কোন স্থানে বা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ করেন নাই; বিশ্বমানবের পূজাকে তিনি শ্রেষ্ঠ পূজা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং এই সুদৃঢ় বিশ্বাস হইতে কখনও বিচলিত হন নাই।" তাঁহার যাবজ্জীবন স্বদেশসেবাব্রত সম্পাদক মহাশয়ের এই উক্তি বিশেষ সমর্থন করে।

প্রয়াণ—নেপালচন্দ্র পরলোকগত, স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত। আমাদের সহিত তাঁহার আত্মীয়-সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার তৃপ্ত্যর্থ আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি ও শোকশান্তির নিমিত্ত কবির কথায় বলি,—"তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী!"

দরিদ্র বাঙালী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

১৯২১-২২ সনের বাংলার বিস্তৃত শাসন-বিবরণীতে বাঙালীর জীবিকার উপায় সম্বন্ধে অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তখন যুক্তবঙ্গের লোকসংখ্যা ছিল পৌনে পাঁচ কোটি। ১৯৩১-এর গণনায় লোকসংখ্যা হয় ৫ কোটি ১ লক্ষ। ১৯৪১-এ লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৬ কোটি ৩ লক্ষ—অর্থাৎ ১৯২১-এর লোকসংখ্যা হইতে প্রায় দেড়গুণ বেশী। লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও বাঙালীর জীবিকা নির্ব্বাহের মূল ভিত্তির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই, বরং তাহার উপার্জ্জনের ক্ষেত্র আরও সঙ্কীর্ণ হইয়াছে।

যে যে উপায় বা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাঙালী অর্থ উপার্জ্জন করিত তাহার একটি পরিচয় আছে উক্ত শাসন-বিবরণীর ১৩৫-৩৬ পৃষ্ঠায়। নিম্নে সেইটি উদ্ধৃত করিতেছি—

বৃত্তি	লোকসংখ্যা (হাজারের ঊর্দ্ধসংখ্যা বর্জ্জিত)
Exploitation of animals and vegetation—অর্থাৎ কৃষি গো-পালন এবং ভূমির উপর নির্ভরশীল—	৩ কোটি ৭৪ লক্ষ ২৯ হাজার
Exploitation of minerals—খনির কার্য্যে নিযুক্ত	৯৭ হাজার
Industry—শিল্প	৩৬ লক্ষ ২১ হাজার
Transport—যানবাহনাদি কার্য্যে নিযুক্ত	৭ লক্ষ ৩৯ হাজার
Trade—বাণিজ্য	২৪ লক্ষ ৩৯ হাজার
Police force—পুলিস বাহিনী	১ লক্ষ ১৭ হাজার
Public administration—সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত	১ লক্ষ ৪৪ হাজার
Profession or Liberal arts—আইন, চিকিৎসা ইত্যাদি ব্যবসায়ে নিযুক্ত	৭ লক্ষ ৮৩ হাজার
Persons living on their own income—স্ব স্ব সঞ্চিত উপার্জ্জনের উপর নির্ভরশীল	৩৭ হাজার
Insufficiently described occupation—অস্পষ্ট ব্যক্ত পেশা	৯ লক্ষ ৮০ হাজার
Unproductive occupation—ধন উৎপাদনহীন পেশা	৪ লক্ষ ৫২ হাজার

ঐ পুস্তকে ইহাও বলা হইয়াছে, লোকসংখ্যার $\frac{1}{5}$ অংশ ভূমির উপর নির্ভরশীল। ছোটবড় ভূম্যধিকারী এবং তাহাদের কর্ম্মচারীগণ উক্ত সংখ্যাভুক্ত। কৃষকের সংখ্যা লোকসংখ্যার $\frac{3}{4}$ অংশ।

এই কয় বৎসরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু ভূমির পরিমাণ বাড়ে নাই। উক্ত পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৯২১-২২-এ বাংলাদেশে যে খাদ্য উৎপ

হইত তাহাতে নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিত। সেই উদ্বৃত্ত ধান্য বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে এবং কলিকাতা, চট্টগ্রাম বন্দর হইয়া বিদেশে রপ্তানী হইত। ১৯২৯-৩০-এর শাসন-বিবরণীতেও এই কথা সমর্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ, ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত বাংলার ধান্য বাঙালীর প্রয়োজন মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিত।

ইহার পর ১৮ বৎসর অতীত হইয়াছে, লোকসংখ্যাও এক কোটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। জমির পরিমাণ কিন্তু একই রহিয়াছে, সুতরাং কিছু অনটন হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ধান্যের উৎপাদন হ্রাসপ্রাপ্ত হইবার আরও কারণ রহিয়াছে। বাংলার নদী, নালা, খাল ইত্যাদি জঙ্গল ও কচুরি পানার আক্রমণে মজিয়া বুজিয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে কর্ষণযোগ্য ভূমিও কচুরিপানার জঙ্গলে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। অপর দিকে জমির উর্ব্বরাশক্তিও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। যে জমি কর্ষণ করিয়া একটি কৃষক-পরিবার বৎসরের খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিত তাহা উত্তরাধিকারসূত্রে একাধিক খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় এক একটি কৃষকের জমির আয়তন কমিয়া গিয়াছে। ফলে কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া কৃষক-সম্প্রদায় জীবন ধারণ করিতে পারিতেছে না।

আবার যে সকল তাঁতি, যুগী বস্ত্রবয়ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, দেশী ও বিদেশী কলের তৈরি বস্ত্রের আমদানী হওয়ায় তাহাদের রুজি-রোজগার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহারা এবং তাহাদের মত আরও অনেকে পুরাতন বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে, সুতরাং ভূমির উপর অধিক লোক নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে অথচ কৃষিকার্য্য দ্বারা এই সকল লোকের অন্নসংস্থান সম্ভবপর হইতেছে না। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কৃষকের দারিদ্র্য। শুধু দারিদ্র্য নহে; দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে উপায়ান্তরবিহীন কৃষক ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ায় তাহাদের দুরবস্থা চরমে পৌঁছিয়াছে।

এই ত গেল কৃষকদের কথা। বাংলার শ্রমিক কোথায় কত জন আছে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। যে সকল বাঙালী শ্রমিক খনিতে বা কলকারখানায় কাজ করিত তাহারা অবাঙালী শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছে। এখন দেখা যায় খনি ও কলকারখানায় অবাঙালী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশী।

বাঙালী হিন্দু শ্রমিক ও কৃষক বেশী পরিশ্রম করিতে পারে না। তাহারা নানা কারণে অলস এবং আরামপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা অপেক্ষাকৃত পরিশ্রমী এবং নিরলস। মুসলমান শ্রমিক কৃষক তাহাদের অপেক্ষাও অধিক পরিশ্রমী, সাহসী এবং উদ্যমশীল। সেই জন্যই পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান-কৃষকের সংখ্যাই বেশী এবং কর্ষণযোগ্য জমির বারো আনা আন্দাজ অংশ মুসলমান কৃষকের দখলে চলিয়া গিয়াছে।

এতক্ষণ যুক্তবঙ্গের কথাই বলা হইয়াছে। ১৯৪৭-এ বঙ্গ বিভাগের ফলে পশ্চিম বঙ্গে সমগ্র বাংলার যে এক-তৃতীয়াংশ ভূমি পাওয়া গিয়াছে তাহার অবস্থাও তেমন আশাপ্রদ নহে। পশ্চিম বঙ্গের কৃষক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে রুগ্ন। ইহারা থাকিলেও বেশী পরিশ্রমের কাজ করিতে সমর্থ হয় না। এই ক্ষুদ্র প্রদেশে যে পরিমাণ শস্য এখন উৎপন্ন হয় তাহা এই অর্দ্ধমৃত কৃষক-সম্প্রদায়ের ন্যূনতম পরিশ্রমের ফল। কৃষকের দেহ নীরোগ না হইলে কৃষির উন্নতির আশা করা যায় না।

ঠিক অনুরূপ অবস্থা পশ্চিম বঙ্গের বাঙালী শ্রমিকদের। যাহাদের আমরা "বুনো" জাতি বলিয়া অবজ্ঞা করি, তাহারা পল্লী অঞ্চলে আমাদের অনেক কাজ করিয়া দেয়, কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও পরিমিত।

হিন্দু শ্রমিকেরাও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, রুগ্ন ও উদ্যমহীন। ইহাদের মধ্যে অনেকে শ্রমবিমুখ এবং হয়ত শ্রমসাধ্য কর্ম্মকেও হেয় জ্ঞান করে। ভৃত্যাদিরও অভাব দেখা যাইতেছে। মেদিনীপুর অঞ্চলের কিছু কিছু লোক ছাড়া অন্য জেলার কোনও লোক ভৃত্যের কার্য্য করিতে আসে না।

আগে পল্লী অঞ্চলে যে সব কামার, কুমার, নাপিত, ধোপা ছিল তাহারাও নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিবার চেষ্টায় আছে। সে উপার্জ্জনের ক্ষেত্রও তাহাদের জন্য মুক্ত এবং প্রতিযোগিতাশূন্য নহে। দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, কলিকাতায় নিমন্ত্রণাদিতে অথবা মিঠাইয়ের দোকানে যে খুরি, গ্লাস, ভাঁড় ইত্যাদি মাটির দ্রব্যাদির ব্যবহার হয় পূর্ব্বে বাঙালী কারিগররাই তাহা প্রস্তুত করিত, এখন তাহা হিন্দুস্থানীরা করিতেছে। এখানেও প্রতিযোগিতায় বাঙালীরা হটিয়া যাইতেছে।

উপার্জ্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র কলিকাতা শহর। কিন্তু কলিকাতার অনেক রাস্তায় বাহির হইলে মনে হয় না যে, ইহা বাঙালীর শহর। প্রায় সমস্ত শ্রমসাধ্য কাজে অবাঙালী নিযুক্ত। রেলের ষ্টেশনে একটি বাঙালী কুলী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। করপোরেশনের শ্রমসাধ্য কর্ম্মে বাঙালী নাই বলিলেই হয়। বাজারে গিয়া দেখা যায় মাছ, তরকারি, ফল বিক্রয় করিতেছে অবাঙালী। চাল, ডাল, মিঠাইয়ের সাধারণ দোকানও সংখ্যায় তাহাদেরই বেশী। রিকসা, ট্যাক্সি চালায় অবাঙালীরা। বাঙালী ধোপা বড় দেখা যায় না। বাঙালী নাপিত ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান করিতেছে। চুলকাটা দোকান চালায় মুসলমান অথবা হিন্দুস্থানী লোকেরা।

১৯৪৭-এর বঙ্গ-বিভাগে অনেকে আনন্দিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সান্ত্বনা ও উৎসাহের বিষয় ছিল এই যে, কলিকাতা শহর তাহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া গেল। কিন্তু কলিকাতা শহরে বাঙালীর আর্থিক প্রতিপত্তি কোথায়? সবই যে

মারোয়াড়ী ও অন্ত প্রদেশবাসীরা আসিয়া দখল করিয়া বসিয়া আছে। এই মারোয়াড়ীদের সংখ্যা কি রকম বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা অনেকের ধারণা নাই। ১৯০১-এ তাহাদের সংখ্যা ছিল ১১১৭ জন মাত্র। ১৯১১ সনে দাঁড়াইল ৫৫২৪—ইহারা তখন কলিকাতা শহর এবং উত্তর বঙ্গে, বিশেষ করিয়া রংপুরে এবং এদিকে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে তাহারা প্রবেশ করিতে পারে নাই (প্রবন্ধের প্রারম্ভে উল্লিখিত পুস্তকের ১৩২-৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এখন না জানি মারোয়াড়ীদের সংখ্যা কত গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি বাঙালীদের শ্রমবিমুখতার মাপকাঠি-স্বরূপ। মারোয়াড়ী ছাড়া অন্ত প্রদেশ-বাসী যাহারা বাংলায় উপার্জ্জনের লোভে আসিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা ১৯২১-এ ছিল ১৮ লক্ষ ৩৯ হাজার। এখন শুনিতে পাই ইহাদের সংখ্যা ৩০ লক্ষের কম হইবে না।

যুক্তবঙ্গের অন্তর্বাণিজ্য এক সময় পূর্ব্ববঙ্গের সাহা-সম্প্রদায়ের একচেটিয়া ছিল। তাহার নিদর্শন এখনও হাট-খোলা, উল্টাডিঙি, বেলেঘাটা অঞ্চলে পাওয়া যায়। ইহারা পরিশ্রমী, ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সৎপ্রকৃতির লোক। মারো-য়াড়ীদের আক্রমণ হইতে ইহারা পূর্ব্ববঙ্গের বাণিজ্যক্ষেত্র রক্ষা করিয়াছিল। বর্ত্তমানে বঙ্গ বিভক্ত হওয়ায় সমগ্র বাংলায় ইহাদের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

অবাঙালী, বিশেষ করিয়া মারোয়াড়ীদের অর্থবল এবং ব্যবসায়ের কূট-কৌশলের কাছে বাঙালীরা পরাভূত হইতেছে। এই অবাঙালীরা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বাঙালীর দুর্ব্বলতা বুঝিয়া লইয়াছে। রেলের কুলীরা পর্য্যন্ত বাঙালীর উপর জুলুম করিয়া বেশী পারিশ্রমিক আদায় করে। তাহাদিগকে কিছু বলিবার উপায় নাই।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে চাকুরীজীবীই বেশী। যাঁহারা আইনের ব্যবসায় করেন তাঁহাদেরও ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। জমিদারী-প্রথা বিলুপ্ত হইলে ইঁহাদের উপার্জ্জনও কমিয়া যাইবে। চিকিৎসা ব্যবসায়ে কলিকাতা শহরেই কয়েকজন চিকিৎসকের বেশ পয়সা হয়। মফস্বলে চিকিৎসকগণ অধি-কাংশই বিনা পয়সায় খাতিরের রোগী পাইয়া থাকেন। খরচ করিয়া ডাক্তার দেখানো অনেক বাঙালীর সামর্থ্যে কুলায়ও না। তার পর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের আয় হইতে ব্যয় বেশী। তাহাদের ঠাট বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। পুত্র-কন্যার শিক্ষাদান ও বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্মে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিয়া তাঁহারা নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছেন। সুতরাং পুষ্টিকর খাদ্য ইঁহাদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের তেমন জোটে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, বাঙালী ছাত্রদের স্বাস্থ্যের কতদূর অবনতি ঘটিয়াছে।

সৎপথে থাকিয়া নিজের বুদ্ধি, কৌশল এবং পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার বাঙালীদের মধ্যে বিরল। যদি বা কেহ এইরূপ ব্যবসায় অথবা শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলেন পুঁজির অভাবে তাহা অবশেষে মারোয়াড়ীর নিকট বিক্রয় করিতে হয়। অনেক ব্যাঙ্ক বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অনভিজ্ঞ কুচক্রী লোকের হাতে পড়িয়া সেইরূপ অনেক প্রতিষ্ঠান উঠিয়া গিয়াছে। ফলে বাঙালীর স্থাপিত যৌথ প্রতিষ্ঠানের উপর বাঙালী জনসাধারণ আস্থা হারাইতে বসিয়াছেন।

এই সকল চিত্র দেখিতে ভাল লাগে না, শুনিলেও হৃদয় নিরাশায় অভিভূত হইয়া পড়ে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র পুনঃ পুনঃ বাঙালীকে এই সব বিষয় স্মরণ করাইয়া সতর্ক করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তখন আমরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করি নাই। আজ তাঁহার সেই সতর্ক-বাণী নূতন করিয়া আমাদের স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে।

এদিকে যাঁহাদের হাতে বাংলার শাসনভার অর্পিত তাঁহারা প্রায়শঃ দলাদলি করিতেই ব্যস্ত। তাঁহাদের মুখে অনেক গালভরা পরিকল্পনার কথা শুনিতেছি, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে কত বৎসর লাগিবে এবং আদৌ কিছু হইবে কিনা কে বলিতে পারে?

এই যে লক্ষ লক্ষ অবাঙালী আসিয়া আমাদের উপার্জ্জন-ক্ষেত্রে একাধিপত্য স্থাপন করিতে চলিয়াছে, তাহাতে বাঙালীর প্রবেশপথ সুগম করিবার উপায় কি, কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারেন? কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বশীল কর্ম্মে বাঙালীর স্থান অতিশয় সঙ্কীর্ণ। রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে বাঙালীর নেতৃত্ব আর নাই। আইন-সভায় বাঙালী সদস্যেরা নীরব হইয়াই থাকেন। এই অবস্থায় নিজেদের প্রদেশেও যদি আমরা উপার্জ্জনের সম্পূর্ণ সুযোগ না পাই তাহা হইলে বাঙালীকে ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে।

—
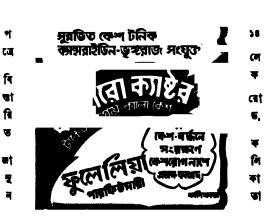
ভগবদ্ গীতা*

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ইহা সুবিদিত যে, গীতার উপর সংস্কৃতে বহু টীকা ও ভাষ্য রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ভারতীয় ও অভারতীয় ভাষায় গীতার উপর এবং গীতা সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। হঠাৎ কেহ সেগুলির তালিকা চাহিলে তাহার অর্দ্ধেকেরও নাম আমরা করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। বাংলা এবং অন্যান্য হরফে গীতার সংস্করণও যে কত হইয়াছে তাহা বলা কঠিন।

হাজার বছরের উপর এই গ্রন্থ পঠিত, পাঠিত এবং চিন্তিত হইয়া আসিয়াছে। শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া অরবিন্দ পর্য্যন্ত ভারতের কোন্ মনীষী গীতা সম্বন্ধে বলেন নাই? এই প্রকার একখানা বই সম্বন্ধে একেবারে নূতন কথা বলা সহজ নয়। তথাপি গিরীন্দ্রবাবুর এই বই পড়িয়া আমরা নূতনত্বের আস্বাদ পাইয়াছি। প্রথমেই আমাদের মনে রাখা উচিত যে, লেখক প্রধানতঃ এক জন প্রখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্। আলোচ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, বিজ্ঞানী লেখক ইহার আলোচনায় বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী কোথায়ও পরিত্যাগ করেন নাই। একদিকে অন্ধ বিশ্বাস বা অতি বিশ্বাস এবং অন্য দিকে অবিশ্বাস—এই উভয়ের মধ্যপন্থাই বিচারমূলক সমালোচনার দৃষ্টিপথ; এই মধ্যপন্থাই বিজ্ঞানেরও পথ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গীতার আলোচনা যাঁহারা করেন তাঁহারা ইহাকে বিজ্ঞানেরও উপরে স্থান দিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞানেরও সীমা আছে সত্য, কিন্তু প্রাচীনদের কাছেই কি সূক্ষ্ম-অসূক্ষ্ম সমস্ত তত্ত্বের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছিল? আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বের জ্ঞান আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান দিতে অসমর্থ, সে জ্ঞান ভারতের প্রাচীন মনীষিগণই শুধু আয়ত্ত করিয়াছিলেন, ইত্যাদি ধরণের উক্তি আমরা প্রায়ই শুনি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে আমরা এত রকমে ঋণী ও এত রকমে ইহার অধীন, এবং বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার এত রকমে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে যে ইহা জানিয়াও এবং এই পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়াও বর্ত্তমানে বিজ্ঞানকে অবহেলা করা বুদ্ধি-বিভ্রমের লক্ষণ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। সুতরাং বিজ্ঞানে জ্ঞান নাই, কোন সূক্ষ্ম তত্ত্বের সন্ধান বিজ্ঞান রাখে না, বিজ্ঞানের সহস্র কৃতিত্বের মধ্যে বাস করিয়া এইরূপ উক্তি করা অর্ব্বাচীনের অসংযত বাক্য মাত্র।

প্রাচীনকালের সিদ্ধান্ত বিনা বিচারে যাঁহারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এই সব

* শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত। কলিকাতা ১৪, পারসীবাগান লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৫৭১ পৃষ্ঠা, মূল্য সাড়ে নয় টাকা।
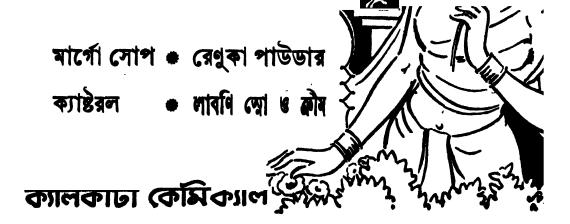
সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া যাঁহারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা বিজ্ঞানকে অবহেলা করিতে পারেন না। গিরীন্দ্রবাবুও তাহা করেন নাই। ঠিক এইখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনদের উক্তি এবং তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠার প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা আছে। বিজ্ঞানের প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা কম নয়। এই উভয়ের সংস্পর্শে তিনি উত্থাপিত প্রশ্ন-সকলের বিচার করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রন্থের পরিশিষ্টে পুনর্জন্ম, সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতি কয়েকটি প্রশ্নের আলোচনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব আলোচনায় পাশ্চাত্য দর্শনের কথাও সহজেই উঠিতে পারিত এবং তাহা হইলে বোধ হয় আলোচনা আরও পূর্ণাঙ্গ হইত। কিন্তু ইহা না হওয়াটাকে আমরা একটা বড় রকমের ত্রুটি বা দোষ মনে করিতেছি না।

এই সব বিষয়ে লেখকের সমস্ত সিদ্ধান্তই আমরা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি এমন নহে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আলোচনার ধারাটি উপভোগ্য এবং শ্রদ্ধার উপযুক্ত। তিনি গীতায় বর্ণিত বিভিন্ন মার্গের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই তালিকাটি আমাদের কাছে কিঞ্চিৎ দোষস্পৃষ্ট মনে হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকটি পৃথক মার্গ, না একটি আর একটির অঙ্গ, সেই সম্বন্ধে অন্তত দুই-এক জায়গায় প্রশ্ন উঠিতে পারে। যথা :—প্রাণায়ামকে আসন, মুদ্রা ইত্যাদির ন্যায় যোগাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই সকলে ভাবিয়াছেন, পৃথক মার্গ নয়। তেমনি ইন্দ্রিয়সংযম, উপবাস, দান ইত্যাদিকে পৃথক মার্গ অথবা 'বাদ' অথবা ধর্মবিশ্বাস (পৃঃ ৩৪৭) মনে করিলে এই সব শব্দের অর্থ অনাবশ্যকরূপে স্ফীত করা হয়। এই সমস্তের অধিকাংশই কর্মের অন্তর্ভুক্ত। উপবাস বা দান স্বতন্ত্র সাধন-মার্গরূপে কোথায়ও বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। 'অন্তকালে ব্রহ্মস্মরণ'ও সাধন-মার্গরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহাকে কি একটি পৃথক ধর্মবিশ্বাসই বলা যাইতে পারে? কারণ 'অন্তকাল' মানুষের জীবনে একবারই সম্ভব হয়। জটাধারণ কিম্বা কৌপীন পরিধান যেমন কোন কোন সম্প্রদায়ের আচারের অন্তর্ভুক্ত, পৃথক সাধনমার্গ নহে, তেমনি ওঁকার ধ্যান, অহোরাত্রবিদ্যা প্রভৃতিকেও স্বতন্ত্র সাধনপদ্ধতি কিংবা ধর্মবিশ্বাস মনে করা উচিত নহে। ইহাদের প্রায় সমস্তকেই কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই প্রসিদ্ধ মার্গত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং এত কাল তাহাই হইয়া আসিয়াছে। আর বৌদ্ধ, জৈন অথবা ইসলামের মত ধর্মবিশ্বাসও এগুলি নয়। দেবযান ও পিতৃযান সম্বন্ধে গ্রন্থকার বেদান্ত সূত্রের সিদ্ধান্তের কোন উল্লেখ করেন নাই। সেখানে এই প্রশ্নের যে ভাবে এবং যে মীমাংসা

হইয়াছে তাহা গীতার সর্বৈতিক সিদ্ধান্তের ঠিক অনুরূপ নহে।

এই সমস্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ, উল্লেখ-অনুল্লেখ সত্ত্বেও আমরা এই বইখানিকে গীতার একটি পরিপূর্ণ আলোচনা বলিয়াই মনে করিয়াছি। যাঁহারা শুধু অর্থবোধ সহকারে গীতা পাঠ করিতে চান তাঁহারা ইহার একাংশে গীতার শ্লোকগুলি এবং পাশাপাশি সরল বঙ্গানুবাদ পাইবেন। যাঁহারা শুধু পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে চান না, গীতায় উত্থাপিত বিবিধ প্রশ্নের সূক্ষ্ম আলোচনা এবং বৈজ্ঞানিক বিচার চাহেন, তাঁহারা এই বইয়েরই অন্যত্র তাহাও পাইবেন। এইজন্য গীতার এই সংস্করণটি আমাদের কাছে পূর্ণাঙ্গ মনে হইয়াছে। বিশেষ করিয়া আধুনিক মনোবিদ্যা যে গীতার অর্থবোধে সহায়তা করিতে পারে ইহা একটি মূল্যবান কথা। বিজ্ঞান, ভক্তি ও প্রগাঢ় বিশ্বাসের সমন্বয় ঘটাইয়া যে গীতা পাঠ চলিতে পারে তাহা এই বইখানিতে আমরা দেখিতে পাই।

গিরীন্দ্রবাবুর বইখানা যে বহু পাঠক কর্তৃক অধীত হইবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে এবং এ আশা আমরা পোষণ করি। আর এই গ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠ করিলে যে পাঠক নানা ভাবেই উপকৃত হইবেন, সে কথাও আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

ভ্রম-সংশোধন

প্রবাসী, পৌষ ১৩৫৫, ২৯২ পৃষ্ঠা "দেশ-বিদেশের কথা"য় 'সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়' নিবন্ধে প্রথম পংক্তিতে, '১৬ই পৌষ' স্থলে '১৬ই অগ্রহায়ণ' পড়িতে হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

প্রাচীন প্রাচী—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিমিটেড। ১৩, গণেশ এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

এখানি কাব্যগ্রন্থ। এশিয়া, ভারতবর্ষ ও বাংলা—এই তিনটি নাতিদীর্ঘ কবিতার বইখানি সম্পূর্ণ। কবিতাগুলি পড়িয়া আনন্দ হইল। প্রচলিত কাব্য হইতে ইহা একান্ত বিভিন্ন। কাব্যে হোক, নাটকে হোক অথবা কথা-সাহিত্যে হোক, প্রাচীন অতীতের পুনর্গঠনে ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রয়োজন। সেই জ্ঞানের পরিচয় ইহাতে আছে, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত পাণ্ডিত্যপ্রকাশের অসংযম নাই।

টাইগ্রিসের তীরে তীরে মৃৎপুরীর মালা
চন্দ্রসূর্য্যের আকাশ সেখানে বন্দী !
উরের মন্দিরচত্বরে অরণ্যদেবতার লিপিরচনা—
বাবিলনের প্রাচীরগাত্রে পাহাড়ের অভ্রভেদী স্বপ্ন—
আকাশ আর পৃথিবীকে আলিঙ্গনে জড়ালো মানুষের প্রথম সৃষ্টি !
এশিয়ার ইতিহাস-দেবতা চোখ মেলে তাকালেন।

প্রাচীন ইতিহাস হইতে উপাদান আহরণ করিয়া সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য কাব্যের বিষয়বস্তুর পরিধি বিস্তার করিয়াছেন। এই প্রকৃতির রচনা খানিকটা মননশীল হইতে বাধ্য এবং ইহা ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশও নয়, কিন্তু যেখানে বিস্ময় ও বৈচিত্র্য সেখানে কাব্য স্বতই রোমান্টিক হইয়া উঠে।

পীতহরিতের আলিম্পনে
এবার তোমার সপ্তবর্ণ— এবার তোমার ইন্দ্রধনু, এশিয়া ! ··
তবু কি শেষ তোমার মহাকবিতা রচনা—
মহাকবি এশিয়া ?
তিমির হরণের গান বুঝি সমাপন হয়নি—
অবিরাম বিচরণ করেছে তোমার চারণমন।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব, স্বপ্ন ও স্মৃতি, আনন্দ ও বেদনা, অতীতের প্রেরণা এবং ভবিষ্যতের আশা কাব্যকে বৈচিত্র্যদান করিয়াছে। বাংলার সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,

প্রাণের অর্চ্চনায় ধরিত্রীর সঙ্গিনী হ'ল গঙ্গাভূমি।··
আহিতাগ্নির মাটির বেদনা থেকে যায়—
বিস্মৃত হয়েও মাটির আগুন রেখে যায় অগ্নিবীজ---
আগুনের স্পর্শমণি।···
সে মশাল জ্বললো বাংলার আকাশে
পুরবইয়া আগুনের ফিনকি স্পর্শ করল দিল্লীর শেষ মসনদ—
পেশোয়ার শেষ রক্ত।
কোন্ অগ্নিদেবতায় ঢালতে হবে হবি---
জানে নি ভারতবর্ষ।
জানে তা বাংলা --জেনেছে অগ্নিগর্ভ শ্যামভূমি।

"প্রাচীন প্রাচী" পড়িয়া কাব্যামোদী পাঠক পরিতৃপ্তিলাভ করিবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের কয়েকটি উপন্যাস

পাঁচ টাকা

ও

এক টাকা এগারো আনা ॥

মরাঁমাটি

দ্বিতীয় সংস্করণ

দুই টাকা চার আনা ॥

দিনান্ত

দ্বিতীয় সংস্করণ

সাড়ে তিন টাকা ॥

কস্মৈদেবায়

দ্বিতীয় সংস্করণ

তিন টাকা ॥

পাঁচ টাকা ॥

কল্লোল

পাঁচ টাকা

শৈলেন ঘোষের উপন্যাস

দুই টাকা ॥

মহানগর

সকল গল্পরচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত লেখক। যে ক'জন লেখকের সাধনার মধ্যে দিয়ে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের পথ-পরিক্রমা সুরু হয়েছিলো প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের অন্যতম। কবিতায়, গল্পে, লঘু প্রবন্ধে, শিশুরঞ্জন সাহিত্যে ও অন্যবিধ বিচিত্র ভাবের লেখায় প্রথম থেকেই যে-কারণে প্রেমেন্দ্র মিত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তা ভাষার তীক্ষ্ণতা নয়, প্রকাশভঙ্গীর উগ্রতা নয়, ভাবের বৈপ্লবিকতা নয়, তা আটপৌরে ভাষার মধ্যে দিয়ে গূঢ়ার্থ প্রকাশের ক্ষমতা, পরিমিত কাব্যের প্রয়োগে অপরিমিত রহস্যের উদ্ঘাটনকুশলতা। সব জড়িয়ে তিনি তাঁর গল্পে (এবং কবিতায়) যে ভাবটি পরিস্ফুট করে তোলেন তা এমনি অনির্ব্বচনীয় রসে পরিপূর্ণ যে আপনি যদি রসের অভিসারী হন এবং জীবনের দার্শনিক তাৎপর্য্য উপলব্ধি করবার দিকে যদি আপনার মনের সহজ প্রবণতা থাকে, সোজা কথায় আপনার যদি জীবনবোধ থাকে, তা হলে তাতে আপনি অভিভূত হবেনই হবেন। দু' টাকা ॥

খেলনা

আজকের দিনের উদ্‌ভ্রান্ত অনিশ্চয়তায় ঠুনকো খেলনার মতোই দেখায় অজস্র মধ্যবিত্তের নষ্টভ্রষ্ট জীবনের 'ছবি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সাম্প্রতিক গল্প-সাহিত্যে এ-জন্যই বিশিষ্ট যে তাঁর নায়ক-নায়িকার চরিত্রে বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে ভঙ্গুর খেলনারই করুণ প্রতিভাস। ব্যর্থ যৌবনের দীর্ঘশ্বাস, উচ্চাভিলাষের করুণ পরিণতি, দারিদ্র্যপিষ্ট কুমারী-হৃদয়ের বোবাকান্না, আর সামঞ্জস্যহীন জীবন-যাত্রার হাস্যকর অভিনয়—সব যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর গল্পে। দেড় টাকা ॥

পতাকা

সাহিত্যক্ষেত্রে নেমে খুব অল্পদিনের মধ্যেই যাঁরা পাঠকসাধারণের কাছ থেকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করতে সমর্থ হন, তাঁদের সংখ্যা সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যে খুব বেশী নয়, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মিত্র সেই অল্পসংখ্যক লেখকদের অন্যতম। ছোটো ছোটো ঘটনার মধ্যে দিয়ে মানবমনের যে আবর্ত্তন, তা-ই নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনায়। 'পতাকা' তাঁর সর্ব্বাধুনিক গল্প-গ্রন্থ। বাংলা গল্পসাহিত্যের ধারা আজ কোন্ পথ দিয়ে বয়ে চলেছে, জান্তে হলে 'পতাকা' সংগ্রহ করা প্রয়োজন। দু' টাকা ॥

পরশুরামের কুঠার • শুক্লাভিসার

আধুনিক বাংলা ছোটগল্প সৃষ্টিতে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তার অনেকখানিই এনে দিয়েছিলেন সুবোধ ঘোষ। আশ্চর্য্য এক রূপ ও রসের আমদানী করে তিনি যেন বাংলাসাহিত্যের গতিকেই মোড় ফিরিয়ে নতুনতর পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর ভাষাও এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সুবোধ ঘোষের গল্পের আলোচনা-প্রসঙ্গে চতুরঙ্গ বলেছিলেন: 'রবীন্দ্রনাথের পর কি বিষয়বস্তুতে কি রচনাশৈলীতে বাংলা ছোটগল্পের মোড়কে তিনিই দিয়েছেন নূতনের যাত্রাপথের ইঙ্গিত। সুবোধবাবুর গল্প দুঃখবিলাসের কান্না নয়, মুক্তির বাণীর অদম্য প্রেরণাতেই সেগুলি গতিবান, ফলে শিল্পচাতুর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন।' দাম যথাক্রমে দু' টাকা, দু' টাকা চার আনা ॥

পূর্ব্বাশা-প্রকাশিত অন্যান্য বই-এর সম্পূর্ণ তালিকা সংগ্রহ করে রাখুন

পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা

বি-কেলাস—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বসু। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল ৩৲ টাকা।

প্রথম দর্শনে এবং প্রকাশকের সংক্ষিপ্ত ভাষণে 'বি-কেলাস' ছোট গল্পের সংকলন বলিয়া বোধ হয়। এক চোখে বস্তু ও অন্য চোখে স্বপ্ন এই দর্শনের মধ্যে নিরবধি কালের লীলায় জীবন-তরঙ্গের সৃষ্টি। ছোট গল্পের মধ্যে এই সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করা যায় হয়ত। কিন্তু প্রত্যেকটি গল্প পৃথক কয়েকটি পাপড়ির সংযোগে বৃন্তলগ্ন পুষ্পের মত অখণ্ড প্রতীয়মান হয়। 'বি-কেলাসে'র মধ্যে এই রূপটি স্পষ্টতর।

১৯৪২-এর আগষ্ট হইতে ১৯৪৬-এর মে পর্যান্ত কারাপ্রাচীরের অন্তরালে পরাধীন জাতির প্রায় দুই শত বৎসরের নিপীড়ন-ইতিহাস 'বি-কেলাসে' স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। স্পষ্টীকৃত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহারাই উজ্জ্বল হইয়াছে যাহাদের সামাজিক মূল্য সম্বন্ধে জনসাধারণ সচেতন নহেন। এরা অবহেলিত চাষী, মজুর, গুণ্ডা, খুনী, করণিক, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের মানুষ। অপরাধ ইহাদের যুক্ত নহে—মুহূর্ত্তের মনোবিকৃতির ফল, কিন্তু কারাগৃহস্থ কলুষিত আবহাওয়ায় ইহাদের অবশিষ্ট মনুষ্যত্বটুকুকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থায় এতটুকু ত্রুটি নাই। মনুষ্যত্বের ক্রমাবলুপ্তির উত্তেজনার স্বাদে মেরুদণ্ডহীন জেলি মাছের মত সমুদ্রতরঙ্গে ইহারা নৃত্যরত বটে। সে নৃত্য নিত্য আনন্দ-উদ্ভূত জীবনের বলিষ্ঠ ভঙ্গি নহে—সে নৃত্য ক্ষীয়মাণ জীবনের কামনাবিলাস মাত্র। একটি জাতির জীবনদীপ নির্ব্বাণের সুচারু ষড়যন্ত্র ইহার মূলে। লেখক বন্দী-নিবাসের সঙ্কীর্ণ পরিধিতে বসিয়া এই অলক্ষ্য মৃত্যুর লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বুদ্ধিজীবী মনের প্রতিচ্ছায়ায় কাব্যরসিক মনের আলো পড়িয়াছে। মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে যুক্ত করিয়া খোলা চোখে একটির পর একটি বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছেন। পটভূমিকা, পরিপ্রেক্ষিত, বিচার, রং, রেখা ও কল্পনাবোধ কোনটিই শিল্পসীমা অতিক্রম করে নাই। সরু মোটা তুলির টান পরিমিত এবং ক্ষিপ্র করাঙ্গুলির লীলা সমানই বিস্ময়কর। ছবিগুলি উজ্জ্বল, স্পষ্ট ও জীবন্ত। ঘটনা-বিশ্লেষণের দক্ষতা, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, বৈদগ্ধ্য প্রভৃতি রসসৃষ্টির অনুকূল প্রতিবেশে একটি অনাহত সুর শেষ পর্য্যন্ত বহিয়া উপন্যাসের ক্ষেত্রটির পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে। বস্তুনিষ্ঠা ও সৌন্দর্য্য-পিপাসা কোথাও পরস্পরকে আঘাত করে নাই—বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গিকে বাহন করিয়া তাহাদের গতি হইয়াছে অবাধ। এই পরিবেশ-প্রসূত চরিত্র, সমাজ, তথাকথিত ধর্ম্ম, রীতিনীতি, মানবমনের আদি ও পরম কামনা সবকিছু লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে সভ্যতা-কৌলীন্যে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন জাতি। তাহার পতন অভ্যুদয় চিহ্নিত-পথরেখা কতকগুলি বিচিত্র শ্রেণীর অপরাধী ও অপরাধ-তত্ত্বের মধ্যে হারাইয়া যায় নাই। এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে বি-কেলাস-খণ্ড অংশের প্রকাশে কতকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন গল্প নহে—তথ্যের গুরুপাকে শুষ্ক প্রবন্ধসমষ্টিও নহে; পরশাসন-পর্য্যুদস্ত একটি সুপ্রাচীন জাতির জীবনধারার সন্ধান ইহার মধ্যে পাওয়া যায়।

জীবনের বসন্ত—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ। সরস্বতী লাইব্রেরী, সি ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ২৷৹।

সাধারণতঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা গল্প-রচনার অন্যতম উপাদান। এই অভিজ্ঞতা কখনও বস্তুনিষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করে, কখনও বা কল্পনা-পিয়াসী চিত্তের রসভূয়িষ্ঠতাকে প্রমাণ করে। আলোচ্য গল্পের লেখক রাজনৈতিক কর্ম্মী; তাঁহার কাছে রাজনীতির তত্ত্ব আশা করা স্বাভাবিক, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এগুলি রাজনীতি ছাড়া সম্পূর্ণ এক ভিন্ন জগতের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে। সে জগতে গভীর অনুভূতির সঙ্গে কল্পনা ও চিন্তার প্রসার লেখকের কবি-মানসকেই প্রাধান্য দিয়াছে। যে গল্পগুলিতে আদর্শবাদ ও কল্পনার ঐশ্বর্য্য আছে সেইগুলিই ভালভাবে উৎরাইয়াছে। 'রাত্রির অবসান', 'শিল্পভ্রষ্ট,' 'ব্যথার বাঁশী,' 'দীক্ষা' প্রভৃতি গল্পগুলি দৈনন্দিন ঘটনা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। শুধু অনুভূতির দ্বারা, ভাবকল্পনার দ্বারা এগুলির মর্ম্মগত রসকে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

নয়া-বাঙলা— শ্রীসুধীরকুমার মিত্র। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৯৮+।০ মূল্য—৩৲

এই গ্রন্থে এগারটি অধ্যায়ে লেখক বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রাচীন, মধ্যযুগীয়, ইংরেজ আমলের এবং সাম্প্রতিক বহু তথ্য পাঠককে উপহার দিয়াছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং বাঙালী হিন্দুর এই দুর্দ্দিনে প্রত্যেকেরই তাহা জানিয়া রাখা উচিত। কেন হিন্দু মুসলমানে মিলন হয় না তাহার বহু কারণ রহিয়াছে। কেবল 'মিলন মিলন' বলিলেই মিলন হয় না, ইতিহাস খুঁজিয়া মূলগত কারণ বাহির করার এবং মিলনের বাধাসমূহ দূর করার একান্ত প্রয়োজন। সুধীরবাবু বহু রচনাদি হইতে বিশিষ্ট লেখকদের রচনা উদ্ধৃত করিয়া যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যদি না বাঙালী হিন্দু সময় থাকিতে অতীতের ত্রুটি বিচ্যুতি এড়াইয়া নূতন করিয়া এই জাতিকে গড়িয়া তোলে তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল হইবে না। খণ্ডিত ভারতে তাই হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বাংলাদেশ আজ বহুভাবে খণ্ডিত, বাঙালী জাতি আজ বহু মতবাদে বিভ্রান্ত, বাংলার আর্থিক অবস্থা আজ অত্যন্ত হীন—এই সমস্তের প্রতিকার না হইলে বাঙালীর ভবিষ্যৎ যে তমসাচ্ছন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, সুতরাং বাংলাকে এখন নূতন করিয়া বাঁচিবার প্রয়াস করিতেই হইবে। সুধীরবাবুর গ্রন্থ এই প্রয়াসে বাঙালীকে উৎসাহ দিবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সন্দ্বীপের চর—শ্রীবিষ্ণু দে। দি বুকম্যান। ৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

লেখক খ্যাতনামা। কবিত্ব এবং বিদ্যা দুই-ই তাঁহার আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায়ই তিনি ভুলিয়া যান যে, কবিতা কসরৎ নহে। এককালে কোন কোন কবিওয়ালা সহজ আবেগের পরিবর্তে শব্দপ্রয়োগ কৌশলকে বড় করিয়া তুলিতেন, জনসভায় বাহবা পাইলেও রসিকচিত্তের সমর্থন তাঁহারা পান নাই। এ যুগেও কৌশল, মতবাদ এবং গালাগালির হাতিয়ার লইয়া যাঁহারা কাব্যক্ষেত্র দখল করিতে উদ্যোগী, তাঁহারা হানাদার মাত্র। তাঁহাদের জয় এবং অধিকার-প্রতিষ্ঠা আজিও সন্দেহের বিষয়।

"আকাশের পেশী নাই, সে স্বদেশী পেশীতে চাপড়
দেয়না লড়াই নেই, বড়াই-এর মঞ্চ নেই, দেয় নাকো রড়
জারজ আশ্রয়ে কেউ সেলুকাস পাশে"—

বুর্জোয়া বা প্রলিটারিয়েট কোন শ্রেণীর কবিতা বলিয়াই মনে হইতেছে না।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অভিজ্ঞান—শ্রীকানাইলাল ঘোষ। প্রাপ্তিস্থান—২০৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা। মূল্য ৩৲।

দেশসেবার অপরাধে দ্বীপান্তরিত পিতার একমাত্র পুত্র অসীম পিতার জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত ও মাতার সহায়তায় উৎসাহিত হইয়া দেশের মুক্তি-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ফলে তাহার জীবন এক বিচিত্র পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল এবং এই চলার পথে তাহার সাক্ষাৎ মিলিল সীমা, আশুবাবু, নির্ম্মলা, হেড মাষ্টার, বিপ্রদাস ও অজয়ের সঙ্গে। অসীম মুক্তি-সংগ্রামের অক্লান্ত সৈনিক। তার এই বন্ধুর পথযাত্রাকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসখানি রচিত। লেখায় আন্তরিকতা আছে, কিন্তু মাত্রাজ্ঞানের অভাবে রসসৃষ্টি ব্যাহত হইয়াছে। উপন্যাসের গতিও অত্যন্ত শ্লথ। উপন্যাসখানি বক্তৃতাগন্ধী। এই সব ত্রুটি পরিহার করিতে পারিলে লেখক একখানি ভাল উপন্যাস সৃষ্টি করিতে পারিতেন। তাঁর বলিবার ভঙ্গীটি ভাল এবং বিষয়-নির্ব্বাচন প্রশংসার যোগ্য।
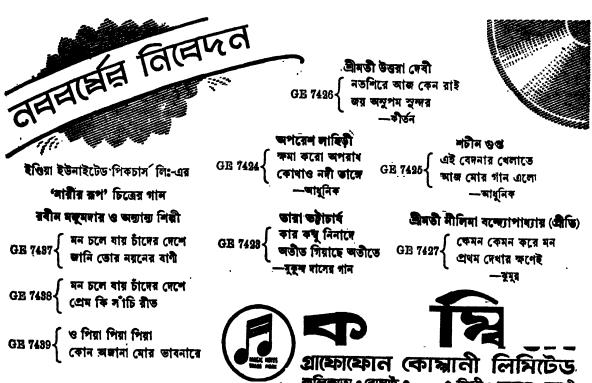
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

রত্নদ্বীপ (নাটক)—শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। 'সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা।

'রত্নদ্বীপ' স্ত্রী-ভূমিকাবর্জ্জিত কিশোর-নাটক। ভারতের সাম্প্রতিক স্বাধীনতা আন্দোলন, মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব, মুসলিম লীগের জেদনীতি, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেশবিভাগের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রভৃতি প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাগুলি একটি রূপকের সাহায্যে নাটকাকারে গ্রথিত হইয়াছে। কিন্তু ঘটনার বিবরণ সংলাপের আকারে লিখিলেই তাহা নাটক হয় না। নাটকের একটি বড় লক্ষণ—'সিচুয়েশন' সৃষ্টি। রত্নদ্বীপে কোথাও তাহা করা হয় নাই। ভাষাও বক্তৃতাধর্ম্মী—নাটকের উপযোগী নয়।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

মধুগীতি—শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার। ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা। ৩৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

মাইকেল মধুসূদন স্মৃতিদিবস উপলক্ষে মধুকবি, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, সুভাষ, রামকৃষ্ণ, জন্মভূমি প্রভৃতির উদ্দেশে রচিত গানগুলি মধুর লাগিল।

মহাত্মার মহাপ্রয়াণে—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক। দাশগ্রাম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, মেদিনীপুর। মূল্য ৷৵০।

মহামানবের তিরোভাবে তাঁহার প্রতি দেশের ও বিশ্বের মনীষিগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও মহাত্মার জীবনের প্রধান ঘটনাবলী ও বাণীসমূহ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১। আবোল তাবোল ২। হ য ব র ল ৩। পাগলা দাশু ৪। ঝালাপালা—শ্রীসুকুমার রায়। সিগনেট প্রেস, ১০।২, এলগিন রোড, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে ২৷৷০, ২৲, ২৷০ ও ২৲।

বাংলা শিশুসাহিত্যে সুকুমার রায়ের দান অতুলনীয়। মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। কিন্তু যে প্রতিভা ও মননশীলতা লইয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন, তাহা যে-কোন সাহিত্যে বিস্ময়-স্বরূপ। সন্দেশ পত্রিকায় তাঁহার বহু রচনা ও চিত্র এখনও ছড়াইয়া আছে, তাহার সকলগুলি সংগৃহীত হইলে পাঠক বহু অনাস্বাদিত রসের আস্বাদ পাইয়া ধন্য হইবেন। একাধারে তিনি সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনা ও চিত্রের বৈশিষ্ট্য অনবদ্য হাস্যরস সৃজন-ক্ষমতায়। কবিতায়, চিত্রে ও সংলাপে তাঁহার হাস্যরসের ফুলকি তুবড়ীবাজীর মত অজস্রধারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাতরঙা রামধনুর মত অনাবিল দিলদরিয়া হাসিখুশির অজস্র ধারা তাঁহার সমস্ত রচনায় পরিব্যাপ্ত। 'আবোল তাবোলে'র কবিতাগুলি হাসির বারুদে ঠাসা, 'হ য ব র ল'র কৌতুকজনক স্বপ্নকাহিনী অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব, 'পাগলা দাশু'র গল্পগুলি মজার কথায় ভরা, 'ঝালাপালা'র ছেলেদের নাটকগুলি হাস্য কৌতুকের ভাণ্ডার। প্রায় প্রত্যেক রচনাই তাঁহার স্ব-অঙ্কিত চিত্রে সমুজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'সুকুমারের রচনা সম্বন্ধে বলা যায়, এমন আর কোথাও নেই।'

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

পট ও ভূমিকা—শ্রীসুভো ঠাকুর। দি বুক এমপোরিয়াম লিমিটেড। ২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ১৲ টাকা।

চিত্রশিল্পী হিসাবে শ্রীসুভো ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা আছে, কিন্তু লেখনী চালনায়ও তিনি কম ওস্তাদ নহেন। তাঁহার মনের পটে গান্ধী মহারাজ, রবীন্দ্রনাথ, রাজাগোপালাচারিয়া, মৌলানা আজাদ, জওয়াহরলাল, নেতাজী, অরুণা আসফ আলী, পি সি যোশী এই কয়জনের যে ছবি অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে তাহাকে তিনি ভাষায় রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে জহরলাল এবং নেতাজীর সংস্পর্শে যাইবার সৌভাগ্য লেখকের হয় নাই, দূর হইতে দু'এক ঝলক তাঁহাদের তিনি দেখিয়াছেন মাত্র। অন্যান্যদের সান্নিধ্য তিনি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কাহারও সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। সেইজন্য গতানুগতিক চরিত্র-চিত্রণের প্রয়াস বা ঘটনার খুঁটিনাটি বর্ণনা বর্ত্তমান পুস্তকে নাই; আছে শিল্পী-মনের পট-ভূমিকায় চকিতে ভাসিয়া ওঠা এক একটি ছবির টুকরা—দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিসত্তার বিশিষ্ট এক একটি রূপকে ফুটাইয়া তুলিবার সার্থক প্রয়াস। লেখক 'আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া' যে নিপুণ আলেখ্য রচনা করিয়াছেন, প্রতীক চিত্রের সহিত তাহা তুলনীয়। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। অরুণা আসফ আলিকে তিনি দেখিয়াছিলেন আগষ্ট আন্দোলনের দিনে যখন সেই বিপ্লবী মহিলা আত্মগোপনের জন্য আশ্রয় লইয়াছিলেন কলিকাতার এক অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীতে। তখনকার দিনের অরুণাকে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন "বিপ্লব আর বিষণ্ণতার বাণীমূর্ত্তি" বলিয়া। বাক্যটি গূঢ়ার্থযুক্ত ও ব্যঞ্জনাময়। এমনি ভাবে প্রত্যেকটি চরিত্রেরই এক একটা বিশিষ্ট দিক অভিনব আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে।

লেখক শুধু চিত্রশিল্পী নহেন, ভাষা-শিল্পীও বটেন। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহার শিল্পীজনোচিত মাত্রাবোধের পরিচয় পাইলাম না। এই পুস্তকে অকারণ আত্মকথা শুনাইয়া তিনি পাঠকদের ধৈর্য্যের উপর অত্যাচার করিয়াছেন—আত্মপ্রচারের উৎকট প্রয়াস যে অশোভন, একজন আদর্শবাদী শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও এ বোধ তাঁহার নাই কেন?

পনেরোই আগষ্ট—শ্রীসত্যেন সেন। দি সিটি বুক কোম্পানী। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীসত্যেন সেন সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত না হইলেও রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনার যোগ্যতা যে তাঁহার আছে সমালোচ্য গ্রন্থের প্রত্যেকটি অধ্যায়ে তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। উক্ত দিবসেই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক আনুষ্ঠানিক ভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তর-পর্ব্ব সম্পন্ন হয় এবং ভারতবাসী দেশ-শাসনের অধিকার লাভ করে। দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের ফলে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইল বটে, কিন্তু দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় ঐক্যবদ্ধ, মুক্ত ও গণতান্ত্রিক অখণ্ড ভারত-রাষ্ট্র স্থাপনের যে মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দীর্ঘকাল যাবৎ সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছিল তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। একটা

জাতির ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় দুর্ঘটনা আর কি হইতে পারে, কিন্তু এই দুর্ঘটনার মূল কারণসমূহ কি তাহা আজ মোহমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি লইয়া বিচার করা প্রয়োজন, শুধু জিন্না এবং মুসলিম লীগের উপর দোষ চাপাইয়া লাভ নাই। এ কথা সত্য যে, দেশের স্বাধীনতা লব্ধ হইয়াছে মুখ্যতঃ কংগ্রেসেরই প্রচেষ্টায়, কিন্তু কংগ্রেস ভ্রান্তির অতীত নহে। তাহার নীতির কোনও ফাঁকে শনি প্রবেশ করিয়া তাহাকে সময়বিশেষে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিয়াছে কিনা তাহাও আজ বিশেষ ভাবে বিচার্য্য।

পুস্তকখানি চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে লেখক ১৯৩৭-৪৭ এই দশ বৎসরের রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন এবং বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করিয়াছেন। স্বাধীনতা আসিলেও দেশের মূঢ় মূক অগণিত জনসমষ্টির দুঃখ-দুর্গতি কেন ঘুচিতেছে না, 'কংগ্রেস কোন্ পথে' নামক অধ্যায়ে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন—"যে স্বাধীনতা আন্দোলন জাতীয়তাবাদী ধনিকশ্রেণীর সহায়তায় সার্থকতা লাভ করে তাহা স্বভাবতঃই উগ্রধর্ম্মী ও গণতন্ত্রবিরোধী হইতে বাধ্য।"

লেখক বামপন্থী রাজনৈতিক মতাবলম্বী। তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি অনেকের সমর্থন না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার চিন্তার স্বচ্ছতা এবং মতের দৃঢ়তাকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। লেখক কংগ্রেসের অনেক দোষ-ত্রুটি দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে অনাবশ্যক ঝাঁজ নাই, অশ্রদ্ধার অশোভন প্রকাশ নাই। লেখকের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী চমৎকার। নীরস রাজনৈতিক তত্ত্ব ও তথ্যকে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিয়া পরিবেশন করিবার কৌশলটি তিনি বেশ আয়ত্ত করিয়াছেন;

হে সৈনিক তোল নিশান—শ্রীবীরেন দাশ। ভারত বুক এজেন্সি। ২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া যে কয়খানি উপন্যাস রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীবীরেন দাশের 'হে সৈনিক তোল নিশান' উল্লেখযোগ্য। লেখক সুরু করিয়াছেন বঙ্গভঙ্গের সময়কার স্বদেশী-আন্দোলনের যুগ হইতে, আর কাহিনীর জের টানিয়াছেন—আইন-অমান্য আন্দোলন-কালে ২৬শে জানুয়ারীর স্বাধীনতা উৎসব পর্য্যন্ত। স্বদেশী-যুগ হইতে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন পর্য্যন্ত বাংলায় যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন লোকচক্ষুর অন্তরালে পুষ্ট হইয়া মাঝে মাঝে বৈপ্লবিক কার্য্যে আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক তদানীন্তন বিদেশী শাসকজাতিকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে তাহাকেই পটভূমিকা করিয়া লেখক কল্পনায় বাস্তবে মেশানো যে কাহিনীটি রচনা করিয়াছেন তাহা একেবারে যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্যামল, উজ্জ্বলা, শেফালি, সুনী এই কয়টি চরিত্রই ভাল ফুটিয়াছে। সন্ত্রাসবাদী দলের নেতা শ্যামল অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল, তাহার স্ত্রী উজ্জ্বলা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বৈপ্লবিক আদর্শেই অনুরক্ত রহিল, দেশদ্রোহী পাঁচুকে হত্যা করিয়া সে স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মাহুতি দিল। উজ্জ্বলা ও শ্যামল এই দুইটি চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া অহিংস আন্দোলন আর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের আদর্শগত বিরোধটিকে লেখক সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গঙ্গা-যমুনা ধারার মত এই পুস্তকে বৈপ্লবিক আন্দোলন ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের ধারা একই লক্ষ্যাভিমুখী হইয়া পাশাপাশি চলিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনে কোনটিই যে কম কার্য্যকরী হয় নাই, এই কথাটি কাহিনীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

পাঠকের মনকে সব চেয়ে বেশী অভিভূত করে পার্কে ভূলুণ্ঠিত পতাকার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া ক্ষুদ্র বালিকা শেফালির মৃত্যুবরণের দৃশ্য। শেফালিকে লেখক অত্যন্ত দরদ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। উপন্যাসের উপসংহারটি বড় করুণ। পড়িতে পড়িতে পার্কে পতাকাহস্তে শেফালির প্রাণহীন দেহের ছবি যেন চোখের সামনে ভাসিতে থাকে তাহাকে মন হইতে মুছিয়া ফেলা যায় না—চরিত্রসৃষ্টির সার্থকতা এইখানেই।

লেখকের ভাষাটি বেশ ঝরঝরে—দু'একটি কথায় গ্রাম্য প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি মাঝে মাঝে মিঠা হাতের পরিচয় দিয়াছেন। পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে কুঞ্জ দাদু, এমন কি ভৃত্য বৈকুণ্ঠও পাঠকের মনে ছাপ রাখে। লেখক যে সমবেদনা দিয়া চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন পাঠকের মনে তাহা সঞ্চারিত হয় এবং কাহিনী শেষ হইলে তাহার হৃদয়ের তন্ত্রীতে যেন বেদনার করুণ রাগিণী ধ্বনিত হইতে থাকে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

সত্যদর্শন—শ্রীমৎ কালিকানন্দ স্বামী প্রণীত এবং ১০৫নং সদানন্দ বাজার, বেনারস হইতে শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৬৬৬ পৃঃ, মূল্য পাঁচ টাকা।

বর্ত্তমান সুদীর্ঘ গ্রন্থে সুপণ্ডিত ও জ্ঞানী স্বামীজী একচল্লিশটি বিভিন্ন বিষয়ের সুচিন্তিত আলোচনা করিয়াছেন সত্যান্বেষী নরনারী 'সত্যদর্শনের' প্রত্যেকটি বিষয় পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। বিশেষ করিয়া 'আমি ও আমার', 'আত্মা বা আমি কে?', 'মনস্তত্ত্ব', 'মনকে ধরিবার কৌশল', 'কালীর মূর্ত্তি', 'আত্মজ্ঞান বিনা মুক্তি নাই,' 'দেহ ও মনের উপাসনা', 'যোগ', 'শান্তি কোথায়?' ইত্যাদি বিষয়গুলির আলোচনা পাঠে সত্যদর্শনের নূতন আলো পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দেশ-বিদেশের কথা

হেমনলিনী রায়

জয়পুর রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, পরলোকগত রায় সাহেব নবকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী হেমনলিনী রায় গত ১লা অগ্রহায়ণ বগুড়ায় তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাসভবনে লোকান্তরগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মানুরাগিণী ও অতিথিসৎকার-পরায়ণা ছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ নন্দী

বিগত ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামে ভূপেন্দ্রনাথ নন্দী জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৯ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রেলবিভাগে শিক্ষানবিশ হিসাবে কর্ম্মজীবন সুরু করেন। তিনি সিনিয়র গ্রেডের প্রথম ভারতীয় ও বাঙালী ক্যারেজ-বিভাগে ফোরম্যান ছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ ৩৮ বৎসর কর্ম্মজীবনের [illegible] বৎসরকাল তিনি লিলুয়ায় অতিবাহিত করেন। শেষ [illegible] বৎসর [illegible] থাকিয়া তাঁহার কর্ম্মের পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। ভূপেন্দ্রনাথ সারাদিন কারখানায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ছুটির পর রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউটের সেক্রেটারীর কাজ করিতেন। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতার নিদর্শনস্বরূপ ইন্‌স্টিটিউটের প্রেক্ষাগৃহটি এখনও বিদ্যমান আছে। ইন্‌স্টিটিউটের গ্রন্থাগারটির পরিচালনা ব্যাপারেও তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখান।

ভূপেন্দ্রনাথ নিখিল-বঙ্গ গ্রন্থাগার সমিতির এক জন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতায় বেতার-কেন্দ্রে 'গল্প-দাদুর আসরে' গল্প-দাদুর ভূমিকায় বিশেষ কৃতিত্বপ্রদর্শন করেন। তিনি এক জন সাহিত্য-রসিকও ছিলেন। গত ১২ই ডিসেম্বর হুগলী তালডাঙ্গির বাসভবনে তিনি দেহত্যাগ করেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

দেবদত্ত ও অজাতশত্রু
শিল্পী শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৫৫ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

যুবশক্তি ও গণ-আন্দোলন

বিগত মাসে আমরা দুই জন ক্ষণজন্মা পুরুষকে স্মরণ করিয়াছি। প্রথমে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, পরে দেশের ও জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণের স্মারক কৃত্যাদি হয়। বলা বাহুল্য, দুইটি ব্যাপারেই বাহ্যিক আয়োজন সমারোহ কোন কিছুরই ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু কয়জনের অন্তরে এই দুই জনের পুরুষকারের প্রকৃত চিত্র সম্যক্ ও স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হইয়াছে ?

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বাংলার যুগযুগব্যাপী স্বাধীনতা-যজ্ঞের শেষ হোতা। তিনি জীবিত না মৃত সে সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে, কিন্তু তাঁহার অভাবে আজ বাংলা 'গত গৌরব হৃত আসন নত মস্তক লাজে', সকলের দ্বারে ভিখারীর অবজ্ঞা ও অবহেলার পাত্র এ বিষয়ে কাহার সন্দেহ আছে ? কে আছে আজ, তাঁহার মত জীবন-মরণ পণ করিয়া, বাংলার তথা সমগ্র ভারতের জন্য শোণিত-তর্পণে এই পুণ্যভূমিকে সিক্ত করিয়া দেশের অতীত গৌরবকে জাগ্রত করিতে প্রস্তুত ? কাহার আছে সেই ভয়-দ্বিধাহীন দৃঢ় সিদ্ধান্তযুক্ত চিত্ত, কোথায় আছে সেই স্থির সংকল্প, অদম্য উৎসাহপূর্ণ হৃদয়, কে আছে পুরুষসিংহ, যাহার কণ্ঠনিঃসৃত বাণী বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় সমস্ত দেশের লোকের মন আলোড়িত করিতে পারে ? দেশের আজ চরম দুর্দিন ; অভাব-অভিযোগ চতুর্দ্দিকে, এবং বাংলার আজ সর্ব্বাপেক্ষা নিদারুণ অভাব নেতৃত্বের। কংগ্রেসের দল আজ দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থের চিন্তায় বিভ্রান্ত ও আদর্শচ্যুত এবং সেই অবকাশে দেশে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতেছে রাষ্ট্র-ধ্বংসকারী বিদেশীর চরবৃন্দ।

নেতাজীর জয়ধ্বনি "জয় হিন্দ্" শুনা যায় চতুর্দ্দিকে, শতকণ্ঠে লোকে গাহে "কদম কদম বঢ়ায়ে যাও"। কিন্তু তাঁহার কঠোর সংযম, সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গের উদাহরণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার লোক তো কোথায়ও দেখা যায় না। নেতাজী সুভাষ ছিলেন বাংলার যুবশক্তির জাগ্রত প্রতীক। কিরূপে তাঁহার মধ্যে স্বাধীনতার জলন্ত পাবক মূর্ত্ত হইয়া "আজাদ হিন্দ্ ফৌজ"কে অনুপ্রাণিত করে সেকথা কোটি লোকে শুনিয়াছে। কিন্তু কি সাধনা, কত তপস্যার ফলে তাহা সম্ভব হইয়াছিল সেকথা কেহই একবারও চিন্তা করে না। যে যুবশক্তি বাংলার ভবিষ্যতের আশাভরসা তাহা আজ ভুল পথে চালিত ও ব্যর্থ চেষ্টায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছে। আজ বাংলাদেশে কেহ নাই তাহাদের বুঝাইতে যে, বিনা সংযম-শৃঙ্খলার উদ্দাম গতিতে চলিলে তাহাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুইই অন্ধকার। সম্প্রতি কলিকাতায় নেতাজী-দিবসের অব্যবহিত পূর্ব্বে, ছাত্রবিক্ষোভের ফলে যে নিদারুণ বিপর্য্যয় দেখা গেল তাহা বিষম নৈরাশ্যজনক। ঐ ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া সস্তায় বাহবা লাভের সহজ উপায়—মন্ত্রীমণ্ডলী ও অধিকারীবর্গকে গালি দেওয়া ও অভিযোগ-অনুযোগের গগনভেদী চীৎকারে চতুর্দ্দিক কম্পিত করা। কিন্তু দেশের মঙ্গল ও জাতির প্রগতি-কামী ব্যক্তিমাত্রেই উহাতে আশ্বস্ত বা সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। চিন্তাশীল লোকমাত্রেই ইহাতে দেখিবেন শক্তির অপচয় ও জাতির অধোগতি। কেননা এতগুলি জীবন নষ্ট হইল, এতটা শক্তি ও সম্পত্তির নাশ হইল অযথা ও বিফলে। সত্যসত্যই ঐ যুবশক্তির উদ্দাম ও বিশৃঙ্খল অপপ্রয়োগে যদি বিশেষ লাভ কাহারও হইয়া থাকে তবে তাহা হইয়াছে দেশের ও জাতির শত্রুপক্ষের। আমরা উহাকে অপপ্রয়োগ বলিতে বাধ্য, কেননা ঐ শক্তি যথাযথ ভাবে, সংযম ও শৃঙ্খলার সহিত, প্রযুক্ত হইলে উহা সহস্র গুণ কার্য্যকরী হইতে পারিত।

সর্ব্বোদয় দিবস

গান্ধীজীর মহাপ্রস্থানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে কংগ্রেসের সর্ব্ব-ভারতীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি নিম্নলিখিত সঙ্কল্প-বাক্য ও কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিদারুণ হত্যাকাণ্ড ঘটে এক শুক্রবারে, মাঘ মাসের ১৬ তারিখে ; এ বৎসর তার বার্ষিকী পড়ে রবিবারে, ১৭ই মাঘে। দেশের লোক অনেকটা গতানুগতিকভাবে এই দিবস গান্ধী-প্রশস্তিতে কাটাইয়াছেন ; চিন্তাশীল লোকে নূতন করিয়া গান্ধীজীর ভাব ও কর্ম্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিগত তিন শত

পরবর্ত্তী দিনে জীবনেও আচার-অনুষ্ঠানে কতদূর তাহা কার্য্যে অনুষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার হিসাব ব্যক্তিগত ব্যাপার। কারণ গান্ধীজী মূলতঃ ব্যষ্টির সততার ও দক্ষতার উপর নিজের সংস্কার-প্রচেষ্টার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেইজন্য কংগ্রেস কমিটির সংকল্প-বাক্য জাতির উদ্দেশে ঘোষিত হইলেও তাহার সাফল্য নির্ভর করে একান্তভাবে ব্যষ্টির উপর। এই কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজনে, তাহা ব্যষ্টির ও জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিলাম :

"ভারতের সুদীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম, যে সংগ্রাম পুরুষ পরম্পরায় পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের জীবন হইতে পরবর্ত্তীদিগের জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার ইতিহাসে ভারত দুঃখ ও সাফল্য উভয়েরই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। যেমন বহুক্ষেত্রে পরাজয় তেমনই বহুক্ষেত্রে জয়লাভও করিয়াছে। কিন্তু জাতির পিতার সর্ব্বতোশ্রেয় নেতৃত্বের গুণে দুঃখ জনসাধারণের জীবনকে সৎ ও শুদ্ধ করিয়াছে, প্রত্যেক পরাজয় জনসাধারণের প্রয়াসকে দ্বিগুণ উৎসাহে উদ্বোধিত করিয়াছে এবং জয়লাভের ভূমিকা রচনা করিয়াছে।

"সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি বৎসর পরীক্ষা ও বিপত্তির কালরূপে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এই সময়েও গান্ধীজীর বাণী পুনরায় জাতিকে প্রেরণা দান করে। এই কয়েকটি বৎসরের প্রয়াস কিছু পরিমাণে সাফল্যও লাভ করে এবং যে স্বাধীনতার জন্য পুরুষ পরম্পরায় আমাদের জাতি সংগ্রাম করিতেছে ও দুঃখ সহ্য করিয়াছে, সেই স্বাধীনতাও আমরা লাভ করিয়াছি।

"কিন্তু একটি বড় ক্ষতি স্বীকার করিয়া আমাদিগকে এই স্বাধীনতা লাভ করিতে হইয়াছে, কারণ মাতৃভূমি দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। দেশ খণ্ডনের এই শোচনীয় ঘটনার পরে জনসাধারণের মধ্যে যে উন্মাদের মত ক্রিয়াকলাপের মত্ততা দেখা দেয়, তাহাতে মনে হইয়াছিল যে, সেই প্রত্যেকটি মহৎ আদর্শ যাহার জন্য গান্ধীজী সাধনা করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা সকলই যেন সেই সময়ের মত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অন্ধকারময় অবস্থাও পুনরায় গান্ধীজীর আশাময় বাণীর আলোকে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং বেদনাপীড়িত অসংখ্য হৃদয় সেই বাণী হইতে সান্ত্বনা ও শক্তি লাভ করে।

"তাহার পর আসে সবচেয়ে দারুণ আঘাত। যিনি ভারতের অপরাজেয় আত্মিক শক্তির এবং প্রেম ও করুণার মূর্ত্ত প্রকাশ, তাঁহাকেই হত্যা করা হইল। এই কারণে যে প্রাপ্তির জন্য ভারত প্রয়াস পাইয়া আসিতেছিল এবং সুদীর্ঘ সংগ্রামের পরিণতিরূপে যাহা লাভ করা হইল, সেই স্বাধীনতার সহিত স্বাধীনতার উদ্দীপনা আসিল না— আসিল দুঃখ ও ভয়বিহ্বলতা।

"গান্ধীজীর স্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব রক্ষা করিয়া এবং তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া দেশ এই সকল ভয়ঙ্কর সঙ্কটের প্রতিবিধান করিতে প্রবৃত্ত হইল। সকল সঙ্কটের মধ্যে সবচেয়ে ভীষণ হইয়াছিল আত্মার সঙ্কট, যাহার ফলে ভারতের চিত্ত মলিনতায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং সেই লোকগুরু যে মহৎ শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা দেশ কিছুকালের মত বিস্মৃত হইয়াছিল।

"যিনি জাতিকে স্বাধীনতা ও নবজীবন দান করিয়া গিয়াছেন তাঁহার তিরোভাবের পর পূর্ণ একটি বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। তাঁহার তিরোভাবের প্রথম বার্ষিক দিবসে আমরা তাঁহার মহান্ আত্মার ও মহৎ বাণীর প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। জীবনসঞ্চারিণী সেই বাণী হইতে শিক্ষার আলোক গ্রহণ করিয়া আমরা ভারতের জনসাধারণ ও নিখিল মানবের সেবা করিতে থাকিব, আজ এই সঙ্কল্প আমরা গ্রহণ করিতেছি।

"গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংসার পথে সমগ্র জাতির জন্য রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে, এক্ষণে আমাদিগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদিগকে অবশ্যই স্মরণে রাখিতে হইবে যে, জনসাধারণের সেবা করিবার কাজকেই সবচেয়ে বড় সুযোগ ও ব্রতরূপে আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, ভবিষ্যতে এই জনসেবার কাজকেই ব্রতরূপে আমাদিগের পালন করা উচিত এবং পালন করিতে হইবে। যাঁহারা এই দায়িত্ব ভুলিয়া গিয়া সরকারী পদ ও ক্ষমতার জন্য প্রলুব্ধ হইতেছেন তাঁহারা দেশেরই ক্ষতি করিতেছেন।

"গান্ধীজীর নিকট হইতে বিশেষভাবে আমরা এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে, শান্তিপূর্ণ পন্থায় শ্রেণীবৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় জন্য, গোষ্ঠী ও বর্ণ অনুসারে মানুষের মর্য্যাদা বিচারের প্রভেদমূলক প্রথা ঘুচাইয়া দিতে হইবে, ভারতের সর্ব্বসমাজের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং সেই লক্ষ্যের দিকেই সকল সেবামূলক প্রচেষ্টা বেশী করিয়া নিয়োজিত করিতে হইবে। সবার উপর তিনি এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, সর্ব্ব অবস্থায় সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়াও নৈতিক সততার প্রতি নিষ্ঠা রাখিতে হইবে, কারণ জীবনের তাৎপর্য্যই এই নৈতিক সততার দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে।

"স্বাধীনতার সহিত ভারতের নৈতিক মর্য্যাদা যেন উত্তরোত্তর প্রসারিত হইতে পারে এবং গান্ধীজী যে সকল মহৎ লক্ষ্যের প্রতি তাঁহার সাধনা নিয়োজিত করিয়াছিলেন তাহা অর্জন করা সম্ভব হইতে পারে, তাঁহারই বাণীর নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া জাতীয় ও সর্ব্ব-জাতীয়

সক্ট এবং বিপত্তির প্রতিবিধান করিবার জন্য আমরা সকল আগ্রহ লইয়া প্রয়াস করিব।"

সর্ব্বোদয় কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ

গান্ধীজীর "সর্ব্বোদয়ের" আদর্শ কোন বিশেষ জাতি, বর্ণ ও দেশের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। প্রাচীন ভারতের "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই আদর্শ গান্ধীজীর জীবনে ও কর্ম্মে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। জগতের কোটি কোটি লোক তাঁহার জীবনের আলোকে এই আদর্শের মর্ম্ম কথা আজ নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতেছে। তিনি কেবল আদর্শ প্রচার করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না; আজীবন তাহার নির্দ্দেশ নিজের জীবনে স্বাচরণ করিয়া, এই আদর্শকে আমাদের পক্ষে সহজ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই সাধনার উত্তর-সাধক তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য বিনোবা ভাবে তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি এই "সর্ব্বোদয়" দিবস উপলক্ষে, এই সহজ কর্ত্তব্যগুলি আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন:

১। প্রত্যেক কর্ম্মী নিয়মিত সুতা কাটিবেন।

২। তিনি খাদি পরিধান করিবেন—এই খাদি নিজ হাতের সুতায় তৈয়ারি হইবে অথবা সঙ্ঘের তৈরী প্রমাণিত হইবে।

৩। তিনি যথাসম্ভব গ্রামে প্রস্তুত জিনিষপত্র ব্যবহার করিবেন।

৪। নিজের ঘরে থাকিলে যাহাতে গরুর দুধ পান সেই চেষ্টা করিবেন।

৫। মাসে অন্ততঃ একদিন তিনি নিজে পায়খানা সাফ বা গ্রামের স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কীয় কোন কাজ করিবেন।

৬। যে স্থানে বুনিয়াদী শিক্ষালয় আছে সেখানে থাকিলে নিজের ছেলেদের ঐ শিক্ষালয়ে পাঠাইবেন।

৭। তিনি দেবনাগরী, উর্দু এবং দক্ষিণ ভারতের যে কোন একটি লিপি শিখিবেন।

গান্ধী পাঠের ইহাই "অ, আ, ক, খ"। এই পাঠ অতিক্রম করিয়া "গভীরে" গেলেই সর্ব্বোদয় বিদ্যায় পণ্ডিত হওয়া যায় এবং গান্ধীজীর আদর্শকে রূপদান করিবার শক্তি অর্জ্জন করা যায়।

কলিকাতায় জনতার বিক্ষোভ

গত মাঘ মাসের ৩-৪-৫ তারিখে কলিকাতার বুকের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গেল, তদুপলক্ষে শিক্ষিত জনতার কার্য্যকলাপের যে পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি তাহাতে বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। এই উন্মাদনার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা সময় সাপেক্ষ। কিন্তু এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী-মণ্ডলী ও অধিকারীবর্গ যে বিবেচনার অভাবের ও কংগ্রেস কমিটি যে অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দিয়াছেন তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলে কর্ত্তব্য-চ্যুতি হইবে। দেশের মধ্যে সমাজ-বিরোধী লোকের তৎপরতা বাড়িয়াছে, এই তথ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেও, কোন সান্ত্বনা লাভ করা যায় না; বর্ত্তমান অসন্তোষে ইন্ধন যোগাইবার লোকের অভাব নাই বলিয়া পুলিসের গুলি চালাইয়া সে সমস্যার সমাধান হইবে না। কোনও দেশে কোনও কালে তাহা হয় নাই। ইংরেজ আমলের অভিজ্ঞতার পর এইরূপ চেষ্টার ব্যর্থতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুত্যাগীর অভাব-অভিযোগ লইয়া দরবার করিবার জন্য শিয়ালদহ ষ্টেশনে এক বিরাট জনতা জমায়েত হয়। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আয়োজন-উদ্যোগ হইয়াছিল নিশ্চয়ই। বিনা চেষ্টায় সহস্র সহস্র স্ত্রী-পুরুষ এক স্থানে মিলিত হইতে পারে না। এই চেষ্টার সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কি পৌঁছে নাই? পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিবরণীতে এই সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখিলাম না। আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলির সঙ্গে গবর্ণেণ্ট বা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অন্তরের যোগ থাকিলে এইরূপ অসাবধানতার পরিচয় পাইতাম না।

তারপর শুনিতে পাই, শিয়ালদহ ষ্টেশনে সমবেত জন-মণ্ডলীর নিকট পুলিসের একজন ডেপুটি কমিশনার উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করেন যে, তাহাদের মধ্যে চার-পাঁচ জন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সহিত দেখা করিতে পারেন; সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। এই কথায় আমাদের সন্দেহ প্রমাণিত হয় যে, কর্ত্তৃপক্ষ সময়মত জন-বিক্ষোভের সংবাদ পান নাই বা তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। শিয়ালদহ ষ্টেশনে যখন জনতা সমবেত হইয়া গিয়াছে, তখন হাতের পাশা কসকাইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে বলিলে অন্যায় হইবে না। তাহার পর "টিয়ার গ্যাস" ও "লাঠি চার্জ্জ"; অন্য কোন অস্ত্র ত পুলিশের জানা নাই।

শিয়ালদহের ব্যাপারের প্রতিবাদে কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া উঠিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় সভা করিল এবং লালদীঘির পারের শাসক-সম্প্রদায়কে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য রওয়ানা হইল। ইন্দো-নেশিয়ার উপর ডাচ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও নাকি এই সঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। পুলিস ছাড়া আর কাহাকেও পাওয়া গেল না যাঁহারা এই শিক্ষিত জনতাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। সেইরূপ চেষ্টা করিয়াও নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। কংগ্রেসের নামে যাঁহারা দেশের লোকের প্রতিনিধি সাজিয়া চরিয়া ফেরেন তাঁহাদের দেখাও পাওয়া গেল না সুতরাং পুলিস ও ছাত্রেরা সর্ব্বাধীন হইয়া এমন এক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিল যার ফলে কলিকাতার ট্রামগাড়ী, বাস

গাড়ী পুড়িল, কয়েকজন বাঙালী সন্তান পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারাইল।

এই ঘটনার ফলে গবর্ণেণ্টের বিরুদ্ধে একটা বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের লোকের মন যদি এমন করিয়া দেশের শাসনব্যবস্থা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় তবে ভবিষ্যতের ভরসা কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের সকলকে খুঁজিতে হইবে। ইংরেজের আমলে অনেক দোষাদোষীর কারবার করা হইয়াছে। আজ সেই পথ ও পন্থা অচল। যাহাদের হাতে ভারতরাষ্ট্রের ও তাহার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশসমূহের শাসনভার আসিয়া পড়িয়াছে নূতন মন লইয়া বর্ত্তমানের সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হইতে যদি তাঁহারা না পারেন, তবে কোন সমস্যার সমাধান হইবে না। এই নূতন মন পাইতে হইলে ফাইলের উপর মুখ গুঁজিয়া থাকিলে চলিবে না, জনতার সঙ্গে মিশিতে হইবে, জনতার নাড়ী টিপিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, জনতার অভাব-অভিযোগের মধ্যে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করিতে হইবে, নিজের তথাকথিত শিক্ষিত মনের নানা সংস্কার ত্যাগ করিতে হইবে, এবং যে সংবেদনশীলতার দৌলতে গান্ধীজী ভারতীয় জনতার মনে স্থান পাইয়াছিলেন, তাহার অনুশীলন করিতে হইবে। নূতন যুগের এই নূতন সাধনা মনেপ্রাণে গ্রহণ না করিতে পারিলে, আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হইবে।

জনসভায় অনেক পরিকল্পনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই পরিকল্পনা জীবনে ও কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা আরম্ভও হয় নাই। লোকেরা অধৈর্য্য হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। অসততা ও লোভ দেশের ধনিক শ্রেণীর একাংশের মনে যেরূপভাবে দানা বাঁধিয়াছে, তাহা ভাঙিতে না পারিলে, গণমনের অধৈর্য্য রক্তক্ষয়ী অন্তর্বিদ্রোহে পরিণত হইবে। কলিকাতার গত মাসের শিক্ষা এই আশঙ্কাই আগুনের অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে।

নূতন বিক্রয়-কর

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক দিনের মধ্যে বিক্রয়-কর সংশোধন বিলটি পাস করাইয়া লওয়া হইয়াছে; উহার তাৎপর্য্য কি জনসাধারণ তাহা বুঝিবার একটুও সুযোগ পায় নাই। নূতন আইনানুসারে দিয়াশলাই, কয়লা, সরিষার তৈল, জ্বালানি কাঠ, ফুল, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রভৃতির উপর টাকায় তিন পয়সা হারে বিক্রয় কর বসিবে; অর্থাৎ উনুন ধরানো হইতে সুরু করিয়া, স্নানে, আহারের প্রতিগ্রাসে, এমন কি মৃত্যুর পর চিতারোহণে পর্য্যন্ত সকল বাঙালীকে বিক্রয় কর দিয়া যাইতে হইবে। নিউ ইয়র্কের ন্যায় ধনকুবেরের দেশেও সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রকে বিক্রয়-কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে; পাকিস্থানের ন্যায় শিশু রাষ্ট্রও বিক্রয়-কর হইতে পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়াছে। গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশের পক্ষে গণ-শিক্ষার উপর কোনরূপ কর ধার্য্য করাই অন্যায়; শিক্ষা যত ব্যাপক হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই কর্ত্তব্য। ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যগণ সভ্যতার এই মূলনীতির প্রতিও লক্ষ্য রাখেন নাই এমনই তাঁহাদের বুদ্ধি বিবেচনা।

আশ্বিন মাসে আমরা বিক্রয়-কর লইয়া কিছু মন্তব্য করিয়াছিলাম। আমরা লিখিয়াছিলাম যে, এমন কয়েকটি বাছাই করা দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর বসানো যায় যাহাতে জনসাধারণের কোন অসুবিধা হয় না, অথচ সরকারের প্রচুর আয় হয়। এই সম্পর্কে আমরা চট ও থলিয়া, শেয়ার মার্কেট এবং ডিসপোজালের মালের উপর বিক্রয়-কর বসাইবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। গত বৎসর কলিকাতা হইতে ১২৭ কোটি টাকার চট ও থলিয়া বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে; ইহার উপর বিক্রয়-কর থাকিলে তিন পয়সা হারে প্রায় ছয় কোটি টাকা আদায় হইত। বাংলার চটকলের লাভের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই যায় ব্রিটেনে; পাট বেচাকেনার লাভ যায় জয়পুর, মারোয়াড় ও বোম্বাইয়ে; কাঁচা পাটের দামের তিন-চতুর্থাংশ যায় পাকিস্থানে এবং শ্রমিকের মজুরী যায় বিহারে। চটকলে যে পরিমাণ লাভ হয় তাহাতে টাকায় তিন পয়সা ট্যাক্স দেওয়া তাহাদের পক্ষে কিছুই নয়। গবর্ণেণ্ট বলিয়া থাকেন যে, রপ্তানী দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর বসাইলে বাজার খারাপ হইবে। কথাটা সত্য নহে। মাদ্রাজের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য চামড়া; তাহার উপর দীর্ঘকাল যাবৎ বিক্রয়-কর আছে, তাহাতে মাদ্রাজের এই রপ্তানী ব্যবসায় ক্ষতি হইয়াছে বা বাজার খারাপ হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই।

ফ্রান্সেও বাংলার ন্যায় প্রথমটা এলোপাথারি সকল দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর বসান হইয়াছিল। কার্য্যকালে দেখা গেল বহুসংখ্যক গরীবের উপর এই কর চাপাইতে গেলে আদায় কম হয়, লোকের ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার প্রবৃত্তি দৃঢ়তর হয় এবং অসন্তোষ বাড়ে। অতঃপর ফরাসী গবর্ণেণ্ট অল্পসংখ্যক বাছাই করা দামী জিনিষের উপর বিক্রয়-কর বসাইয়া নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি বাদ দিয়া দেন, তাহাতে লোকেও সন্তুষ্ট হয়, সকলের আয়ও বাড়ে। শেয়ার মার্কেটকে তাঁহারা বিক্রয়-করের আওতায় আনেন। কলিকাতার শেয়ার মার্কেটকেও বিক্রয় করের আমলে না আনিবার কোন কারণ নাই; ইহারও লাভের অধিকাংশই জয়পুর, মারোয়াড় প্রভৃতি প্রদেশে যায়, খানিকটা না হয় বাংলায় থাকুক।

কলিকাতায় প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকার ডিসপোজালের মাল বিক্রয় হইতেছে, ইহার উপরও বিক্রয়-কর নাই। থাকিলে বার্ষিক কোটি টাকার উপর সরকারের আয় বাড়িবার কথায়। ইহার বিরুদ্ধে সরকারী যুক্তি এই যে, গবর্ণেণ্টকে ট্যাক্স করা যায় না। কথাটা ঠিক নয়। বাংলা-সরকার তাঁহাদের পুস্তকাদি যাহা কিছু বিক্রয় করেন তাহার উপর বিক্রয়-কর আদায় হয়,

সুতরাং ভারত-সরকারের দ্বারা বিক্রীত দ্রব্যে বিক্রয়-কর আদায় করা যাইবে না কেন? তাহা ছাড়া করটা দিবে ক্রেতা।

বিক্রয়-করের পরিমাণও বাংলাদেশে অত্যধিক। নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি আমেরিকার অধিকাংশ ষ্টেটেই বিক্রয়-করের পরিমাণ শতকরা দুই টাকা মাত্র, কালিফোর্নিয়ার আড়াই টাকা। ভারতবর্ষেও মাদ্রাজে টাকায় এক পয়সা, বোম্বাই বিহার যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতিতে টাকায় দুই পয়সা, একমাত্র বাংলাতেই বিক্রয় কর টাকায় তিন পয়সা অর্থাৎ শতকরা ৪৸৵০ আনা। পঞ্চাশের মন্বন্তরের এবং ভারত-বিভাগে বিধ্বস্ত বর্ত্তমান বাংলায় এত উচ্চহারে কর বস্তুতঃই পীড়াদায়ক, তাহার উপর মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা আয় বাড়াইবার জন্য আবশ্যমাত্রার সকল দ্রব্যের উপর ঐ কর সম্প্রসারণ ত রীতিমত অত্যাচার।

আশ্বিন মাসে আমরা আর একটি কথা লিখিয়াছিলাম যে, বিক্রয়-কর আদায়-ব্যবস্থা ভাল না হইলে জনসাধারণ ট্যাক্স দিয়া মরে কিন্তু উহার অধিকাংশই সরকারী কোষাগারে পৌঁছায় না, যায় অসাধু ব্যবসায়ী ও দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারীদের কবলে। বিক্রয়-করের পরিসর বৃদ্ধির আগে গবর্ন্মেণ্ট এ বিষয়েও কিছু অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই, বরং কার্য্যতঃ উহার বিপরীতই দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান বিক্রয়-কর কমিশনার এই বিভাগ পরিচালনায় দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। শোনা যায় একজন এসিসটাণ্ট কমিশনারের বিরুদ্ধে কয়েক মাস আগে দুর্নীতি দমন বিভাগের অনুসন্ধান আরম্ভ হইলে তিনি ছুটি লইয়া বিলাত চলিয়া গিয়াছিলেন; সম্প্রতি তিনি ফিরিয়া আসিয়া কাজে যোগ দিয়াছেন ইহা কি সত্য? তাঁহার সম্বন্ধে ঐ তদন্ত শেষ হইয়াছে কি? ইনি কি পূর্ব্বে আয়কর বিভাগে কাজ করিতেন, সেখান হইতে তিনি ছাড়িয়া আসিলেন কেন—সে বিষয়েও কোন সন্ধান লওয়া হইয়াছে কি? সেণ্ট্রাল সেক্সনে ভারপ্রাপ্ত এসিসটাণ্ট কমিশনারের এলাকা সমগ্র বঙ্গদেশ কিন্তু তাঁহার হাতে ছোটখাট বাঙালী ব্যবসায়ী ভিন্ন বড় বড় ব্যবসায়ীর উপর ট্যাক্স ধার্য্য হয় না কেন? একজন এসিসটাণ্ট কমিশনার বহুসংখ্যক ফাইল জমাইয়া পদত্যাগ করিয়াছেন এবং এখন ঐ আপিসেই ওকালতি করিতেছেন। এ কথা কি ঠিক এবং সত্য হইলে ইহার প্রশ্রয় কে দিল? কোন কোন ট্যাক্স অফিসার বড় বড় ব্যবসায়ীদের উপর কর ধার্য্য করিলে উহা কমাইবার বা ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য উপর হইতে চাপ আসে, এমন কথা প্রায়ই শোনা যায়। গবর্ন্মেণ্ট ইহা জানেন কি? গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীতে শাসিত দেশে শোনা কথা—hearsay allegations—যখন প্রবল হইয়া উঠে তখন তাহাকেও উপেক্ষা করিতে নাই—বিলাতের লিন্স্কী ট্রিবিউনালের এই শিক্ষা আমাদেরও গ্রহণ করা উচিত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হাইকোর্টের জজ লইয়া বিক্রয়-কর আপিসের কার্য্যকলাপ ও আদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান কমিটি অবিলম্বে গঠন করা একান্ত আবশ্যক। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত বাঙালীকে সম্পূর্ণ রূপে অব্যাহতি দিয়াও বিক্রয়-কর হইতে বাংলা-সরকারের বহু কোটি টাকা আয় হইতে পারে এবং বিক্রয়-কর বিভাগ সৎ ও দক্ষ কর্ম্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হইলে অসাধু ব্যবসায়ীদের উপদ্রব অনেক কমিতে পারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

পাবলিক প্রসিকিউটারের যোগ্যতা

আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটারের আচরণ সম্পর্কে একটি তদন্তের বিষয় আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম যে, তদন্তটি মাঝপথে থামাইয়া না রাখিয়া উহা শেষ করা উচিত ছিল। একটি মামলা সম্পর্কে তদন্তটির উদ্ভব। মামলায় যাহাদের প্রধান আসামী হওয়ার কথা, সেই সব ব্যক্তি রাজসাক্ষী হয় অথবা অন্যান্য উপায়ে উপযুক্ত শাস্তি এড়াইয়া যায় এবং মামলা পরিচালকদের দোষে ইহা হইয়াছিল কিনা—ইহাই ছিল তদন্তের বিষয়বস্তু। অর্দ্ধেক তদন্তে নানাপ্রকার তথ্য প্রকাশ পায়, তাহার পরই পাবলিক প্রসিকিউটার কার্য্যকাল শেষ হওয়ার তিন সপ্তাহ আগে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আমাদের মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর ইহা ঘটে। এই সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ের প্রতি গবর্ন্মেণ্ট মনোযোগ দেন নাই বলিয়া বোধ হইতেছে। মামলা যখন আরম্ভ হয় তখন আলিপুরে একজন পাবলিক প্রসিকিউটার, একজন এডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটার এবং একজন এসিসটাণ্ট প্রসিকিউটার ছিলেন। তদন্তকারী পুলিস অফিসার মামলার অভিমত লওয়ার জন্য নিয়মানুসারে প্রথমে তৎকালীন পাবলিক প্রসিকিউটারের কাছে যান কিন্তু তাঁহার কার্য্যকাল তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে বলিয়া তিনি এডিশনাল প্রসিকিউটারের কাছে অফিসারটিকে যাইতে বলেন। তিনি তৎপরিবর্ত্তে প্রথমে যান এসিসটাণ্টের কাছে। ইনি যে অভিমত দেন তাহার ফলে একজন আসামীর বিশেষ সুবিধা হয়, সে মূল আসামী না হইয়া রাজসাক্ষী হইতে পারে এবং তাহার বাড়ী তল্লাসীতে প্রাপ্ত খাতাপত্র ও মূল সার্চলিষ্ট আদালতে উপস্থিত হয় না। অতঃপর পুলিশ ডায়েরীর পরিবর্ত্তন ইত্যাদি লইয়া গোলযোগ হয়। প্রথম পাবলিক প্রসিকিউটারের এবং এসিসটাণ্ট প্রসিকিউটারের অভিমত প্রভৃতি প্রথমে হারাইয়া যায়, পরে তদন্তকারী পুলিস অফিসারের নিকট হইতে উদ্ধার হয়। ইতিমধ্যে তৎকালীন এডিশনাল প্রসিকিউটার পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত হন। ইহাই মামলার প্রধান বিষয় এবং উপরোক্ত এসিসটাণ্ট পাবলিক প্রসিকিউটারের আচরণও তদন্তের বিষয়ের মধ্যে। কিন্তু উপরোক্ত নূতন প্রসিকিউটার পদত্যাগ করায় ইনিই সম্প্রতি পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত হইয়াছেন।

একই মামলায় তিন জনের আচরণ তদন্তের বিষয় ছিল; তন্মধ্যে একজন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, একজনের পদোন্নতি হইল এবং তৃতীয় জন স্বপদে বহাল রহিলেন। তদন্ত সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে, তদন্ত সম্পূর্ণ হইবার পরে হইলে কিছু বলিবার ছিল না।

পাবলিক প্রসিকিউটার যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদের আচরণ সম্পর্কে জনসাধারণের মনে কোনরূপ প্রশ্ন যাহাতে জাগিতে না পারে তৎপ্রতি সরকারের বিশেষ মনোযোগ থাকা উচিত। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের পক্ষ হইয়া লড়িবার জন্ত যাঁহারা নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা কোন কারণে আসামী পক্ষকে আইনের হাত এড়াইবার জন্ত গোপন পরামর্শ বা সাহায্য করিতে পারেন, লোকের মনে এরূপ ধারণা জন্মিতে দেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে সমূহ অনিষ্টকর। পাবলিক প্রসিকিউটারদের সততা Cæsar's wife-এর ন্যায় সকল সন্দেহের অতীত হওয়া প্রয়োজন।

চান্দিনা প্রজাস্বত্ব বিল

কলিকাতা ও সহরতলী এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যাল এলাকার বহির্ভূত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্যান্য স্থানের চান্দিনা প্রজাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্ত ৯১ ধারা সম্বলিত চান্দিনা প্রজাস্বত্ব বিলটি ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। বিলে চান্দিনা প্রজাগণকে প্রজা ও অধীন প্রজা এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই সকল প্রজা বাসস্থানের বা ব্যবসার জন্ত অথবা অন্ত কোন উদ্দেশ্যে জমি বন্দোবস্ত লইতে পারেন। স্বত্বাধিকারের কাল অনুযায়ী এই সকল প্রজাকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যদি কোন চান্দিনা প্রজা সম্পত্তি হস্তান্তর আইন বলবৎ হইবার পূর্ব্ব হইতে প্রজাস্বত্বের অধিকারী হইয়া থাকেন অথবা তাঁহার স্বত্ব গ্রহণের সময় যদি অজ্ঞাত থাকে অথবা তাঁহার স্বত্বাধিকার কাল যদি ১২ বৎসরের কম না হয়, তবে সেই চান্দিনা প্রজা স্বত্বে তিনি স্থায়ী, হস্তান্তরযোগ্য এবং উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগদখলের অধিকার পাইবেন এবং ঐ জমিতে তিনি পাকা বা অন্ত কোন গৃহনির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষাদি রোপণ ও ফল ভোগ করিবার অধিকারী হইবেন। যে সব চান্দিনা প্রজা ১২ বৎসরের কম সময়ের স্বত্বাধিকারী, তাঁহারা উপরোক্ত শ্রেণীর প্রজাগণ অপেক্ষা কিছু কম অধিকার পাইবেন।

এই বিলের বিধান অনুযায়ী চান্দিনা প্রজার খাজনা শতকরা ১২।০ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইবে না এবং একবার বৃদ্ধি করিবার পর খাজনা আর ১৫ বৎসরের মধ্যে বাড়ানো যাইবে না। আদালত ইচ্ছা করিলে খাজনা হ্রাস করিতে পারিবেন। যে সব অধীন প্রজা চান্দিনা প্রজাদের অধীনে জমি দখল করিয়া থাকিবেন, তাঁহাদিগকেও চান্দিনা প্রজাদের অধিকারের অনুরূপ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অধীন প্রজাদের খাজনা শতকরা ৪০৲ টাকার বেশী বাড়ানো যাইবে না। চান্দিনা স্বত্বের জমি হস্তান্তর, খাজনা-বিরোধের নিষ্পত্তি, খাজনা দাখিলের পদ্ধতি, বে-আইনী অর্থ আদায়ের জন্ত দণ্ডদান এবং কৃষি জমির স্বত্ব চান্দিনা স্বত্বে পরিণত করিবার বিধানও বিলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মফঃস্বলের চান্দিনা প্রজা ও শহরের ঠিকা প্রজা লইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ আন্দোলন চলিতেছে। চান্দিনা প্রজাদের স্বার্থরক্ষার জন্ত একটি বিল বঙ্গ বিভাগের পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের শেষ অধিবেশনে গৃহীত হয়, কিন্তু বঙ্গবিভাগের ফলে উহা আর ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করা যায় নাই বলিয়া বিলটি আইনে পরিণত হয় নাই। বর্ত্তমান বিলটি গৃহীত হওয়ায় এই অসুবিধা দূর হইল।

ঠিকা প্রজা বিল

কলিকাতা ঠিকা প্রজা বিলে কলিকাতার শহরতলী ও হাওড়ার ঠিকা প্রজা ও মালিকদের অধিকার ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিলে শহরের, শহরতলীর ও হাওড়ার চান্দিনা প্রজাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিলটি উত্থাপন করিয়া রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব বলেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব কলিকাতা ও হাওড়ার বস্তিগুলি তুলিয়া দিয়া ঐগুলির পরিবর্ত্তে উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা যায় ততই মঙ্গল এবং গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্ত বিশেষ আগ্রহান্বিতও বটে। ঐসব নূতন বাসগৃহ এমন পরিকল্পনায় নির্ম্মাণ করা উচিত যাহাতে বিভিন্ন বাড়ী বিভিন্ন আয়ের লোকের বাসের উপযুক্ত হয়। কিন্তু ঐরূপ বৃহৎ পরিকল্পনা যত দিন না কার্য্যকরী হইতেছে এবং যত দিন বস্তি থাকিতেছে তত দিন মালিকের ইচ্ছানুসারে বস্তি প্রজার অযথা উৎখাত বন্ধ থাকা উচিত। রাজস্ব সচিব আরও বলেন যে, বস্তিবাসীদের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্ত সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে একটি তদন্ত করেন। কলিকাতার শতকরা ১০টি বস্তিতে ঐরূপ তদন্ত করা হয় এবং তাহার অর্দ্ধেকের ফল জানা গিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের নথি অনুসারে শহরে এখন ৪৩৭১টি বস্তি আছে। এই সব বস্তিতে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক বাস করে। এক শ্রেণী হইতেছে ঠিকা প্রজা; অপর শ্রেণী তাহাদের ভাড়াটিয়া। ঐরূপ একটি ভাড়াটিয়া তাহার ঠিকা প্রজাকে যে ভাড়া দেয় তাহা মাসে গড়পড়তা ৭৲ টাকারও উপর। ভাড়াটিয়াদের মধ্যে শতকরা ৪২ জনের অধিক লোকের আয় মাসে ৫০৲ টাকা বা তাহারও কম। শতকরা বড় জোর ৩১টি বস্তির কামরাতে আলো-বাতাস চলাচল ভাল বলা যায়। বস্তিগুলিতে জল সরবরাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই তদন্তে স্পষ্ট জানা গিয়াছে, বস্তি-প্রজারা যে অবস্থায় বাস করে তাহার উন্নতি অবিলম্বে হওয়া দরকার, বিশেষতঃ জলের উন্নতি এখনই হওয়া উচিত। বস্তির অবস্থা ভাল হইলে শহরের রোগ কমিয়া সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হইবে।

পতিত জমির উদ্ধার

পতিত জমির উদ্ধার করিয়া ভারতরাষ্ট্রের খাদ্যশস্য বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণকল্পে গত ৫ই মাঘ দিল্লী নগরীতে এক সম্মেলন আহূত হয়। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজয়রামদাস দৌলৎরাম এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ জন মাথাইও উপস্থিত ছিলেন, আর ছিলেন বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব্ব পঞ্জাব, উড়িষ্যা, মধ্যভারত, বিন্ধ্য প্রভৃতি প্রদেশের, পাতিয়ালা, জয়পুর ও ভূপাল রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী বা ঐ বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীবর্গ। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ হইতে কেহ উপস্থিত ছিলেন, এই সংবাদ কার্য্যবিবরণীতে পাইলাম না। পশ্চিমবঙ্গে এরূপ চেষ্টার প্রয়োজন নাই, বোধ হয়।

এই সম্মেলনে একটি বিরাট পরিকল্পনাকে রূপদান করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে ২৭১ কোটি টাকা। এই ব্যয়ের মধ্যে ১৪৬ কোটি টাকা ভারতরাষ্ট্রের মুদ্রায় ও বাকী ১২৫ কোটি টাকা ডলার ও পাউণ্ডে ব্যয় হইবে। অর্থাৎ, ১২৫ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি যুক্তরাষ্ট্র ও বিলাত হইতে আমাইতে হইবে, এবং তজ্জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের নিকট এই পরিমাণ অর্থের জন্য ঋণদানের আবেদন করিতে হইবে।

এই পরিকল্পনার একটি কার্য্যসূচীর হিসাব দেখিয়াছি। ৬০ লক্ষ একর, প্রায় ২ কোটি বিঘা চাষের উপযোগী জমি ৭ বৎসরের মধ্যে কৃষির উপযোগী করিতে হইবে। ৪,৫০০টি গভীর কুয়া কাটাইতে হইবে প্রায় ৩০ লক্ষ একর অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি বিঘা জমিতে জলদান করিবার জন্য। কৃত্রিম সার উৎপাদন করিতে হইবে। এই কার্য্যসূচীর মধ্যে মাছের চাষেরও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে দেখিলাম। দেশের প্রায় ৫,০০০ বর্গ মাইল সমুদ্রতীরে পাঁচটি সামুদ্রিক মৎস্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়া গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যে ৬০ লক্ষ একর অর্থাৎ প্রায় ১৮০ লক্ষ বিঘা জমির উদ্ধার সাধন করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত প্রদেশ ও রাজ্যের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—পূর্ব্বপঞ্জাবে ১৫ লক্ষ বিঘা, পূর্ব্বপঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যে ১২ লক্ষ বিঘা, উড়িষ্যায় ১৫ লক্ষ বিঘা, মধ্যপ্রদেশে ও বেরারে ৯ লক্ষ বিঘা, যুক্তপ্রদেশে ৯ লক্ষ বিঘা। বিহারের প্রয়োজন এখনও জানা যায় নাই। এই ১৮০ লক্ষ বিঘার মধ্যে প্রায় ১৬ লক্ষ বিঘা জমি হইবে নূতন, প্রায় ১২০ লক্ষ বিঘা হইবে কাশ প্রভৃতি ঘাসে আবৃত জমি।

এই আয়োজন ও অর্থব্যয় সার্থক হইলে প্রায় ৫ কোটি ৪০ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমানে প্রায় ১১০ কোটি মণ খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করা হইতেছে, তাহার জন্য প্রায় ১৩০ কোটি টাকা নগদ গুনিয়া দিতে হইতেছে। যে ৭ বৎসরে পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা হইবে, সেই সময়ের মধ্যে আমাদের দেশে প্রায় ২ কোটি লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। এই সম্ভাবনার কথা মনে করিয়া অনেকে বলিতেছেন যে, ভারতরাষ্ট্রে জন্মের হার কমাইতে বা নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে খাদ্যফসলের বৃদ্ধিতে তার খাদ্যসমস্যা মিটিবে না। ৭ বৎসর পরে হয়ত দেখিব যে, আরও ১৮০ লক্ষ বিঘা জমিতে ফসল উৎপাদন করিয়া আমাদের অবস্থা যথাপূর্ব্বম্ আছে। শুনিতেছি, সমস্ত পৃথিবীব্যাপী খাদ্যাভাব আরও ৫।৬ বৎসর থাকিবে। জনসংখ্যাও এই সময়ে বাড়িবে। এই সমস্যার বিজ্ঞানের উত্তর কি? জন্মনিরোধ না জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি?

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগ

শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-মন্ত্রী। তাঁহার শক্তির উপর পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যশস্য উৎপাদনের উন্নতি নির্ভর করে। এই কার্য্যে তিনি প্রায় বার মাসের মধ্যে কিরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন তাহা আমাদের জানিতে হইবে। কৃষির সঙ্গে গো-জাতির উন্নতি অজাদি ভাবে জড়িত। পাঁজা মহাশয় এই বিভাগের জন্যও দায়ী। ইংরেজ আমলে এই বিভাগের কৃতিত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছি; অনেক অপদার্থতার পরিচয় পাইয়াছি। পাঁজা মহাশয়ের আমলেও সেইরূপ কথা শুনিতে হইতেছে বলিয়া আমরা দুঃখিত। বাংলাদেশের কৃষি বিভাগের পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সম্পাদিত "খাদ্য উৎপাদন" পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের আইন-পরিষদের কোন সভ্য প্রশ্ন করিয়া এই বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয়ে সাহায্য করিলে কৃতজ্ঞ থাকিব:

> গোজাতির উন্নতি বিধানে সরকারী প্রচেষ্টা
>
> গত বৎসর ২৪ পরগণা জেলায় উন্নত শ্রেণীর কতকগুলি ষাঁড় বিতরণ করা হইয়াছিল। পঞ্জাব প্রদেশ হইতে এই সকল ষাঁড় আনা হইয়াছিল। ২৪ পরগণায় ষাঁড় বিতরণ করিবার পর লোকে দেখিতে পাইল যে, কতকগুলি ষাঁড় "নিম আণ্ডা" অর্থাৎ বলদ এবং কতকগুলি এত অল্পবয়স্ক যে, যে উদ্দেশ্যে তাহাদের আনা হইয়াছিল এবং বিতরণ করা হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য সাধনে তাহারা একেবারে অক্ষম। আমরা অতি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, লাঙল বা গাড়ী টানার জন্য "নিম আণ্ডা" ষাঁড়গুলিকে চুঁচুড়া কৃষিক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অল্পবয়স্ক ষাঁড়গুলিকে খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া বড় করা হইতেছে। যে সকল কর্ম্মচারী পঞ্জাবে গিয়া এই সকল ষাঁড় নির্ব্বাচন করিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন এবং পঞ্জাব হইতে ২৪ পরগণা জেলায় পাঠাইয়াছিলেন তাঁহারা এখন কোথাকার কৃষিক্ষেত্রে কি কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন, তা

আমরা জানিতে পারি নাই ; পিজরাপোলে ইহাদের সংবাদ লওয়া উচিত নয় কি ?

বিহারে বাংলা ভাষা

পুরুলিয়ার "সংগঠন" পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত মন্তব্য হইতে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রদেশের শাসকবর্গের মতিগতির একটা পরিচয় পাওয়া যায় :

…হঠাৎ এই স্কুলটিতে (পুরুলিয়া জিলা স্কুল) বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া বর্ত্তমান ইংরেজী সাল হইতে কর্ত্তৃপক্ষ কেবল মাত্র হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্কুলটির ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনেরও বেশী ছাত্র বাংলা-ভাষাভাষী। ১৯৪৮ সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত প্রবেশিকা বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রেণীতে যে সব ছাত্র বিভিন্ন বিষয় তাহাদের মাতৃভাষা বাংলাতে শিক্ষা করিয়াছে, তাহারা বর্ত্তমান প্রবেশিকা বর্ষে (Matric Class) উত্তীর্ণ হইয়া হঠাৎ সব বিষয় হিন্দীতে কিরূপে বুঝিতে পারিবে তাহা যে কোন সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগোচর।

গত ৫ই ও ১২ই মাঘের যুক্ত-সংখ্যায় এই মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। তার পর সংবাদপত্রে দেখিতে পাই যে, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পুরুলিয়ার উকীল-সভা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই ঘোষণাও কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, বিহার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই ব্যবস্থা ২৮শে জানুয়ারীর মধ্যে বাতিল না হইলে তাঁহাদের পোষ্য ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইবেন। তাহার পর সংবাদ আসিয়াছে, পুরুলিয়া জিলার সমস্ত স্কুলের বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ধর্ম্মঘট করিয়াছে, এবং এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহাদের অভিভাবকেরা প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু যখন-তখন প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন ; সরদার প্যাটেলও এই তানে খেয়াল মত যোগদান করেন। বিহারে যাহা ঘটিতেছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জানিলে ভাল হয়। এবং এই উপলক্ষে বিহার প্রদেশের পূর্ব্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে বাঙালীর সমস্যার কথা তাঁহাদের আবার জানাইয়া রাখিতে চাই। প্রায় ছয়-সাত শত বৎসর হইতে এই অঞ্চলে বাঙালীরা বাস করিতেছেন ; ১৯১২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তাহা বাংলাদেশের শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ইতিহাস মনে রাখিলে বাঙালী ছাত্রবৃন্দের শিক্ষার জন্য হিন্দী চাপাইয়া দেওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। বিহারের কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট সেই কাজ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ফলে বাঙালী সমাজের মনে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে।

এইরূপ অত্যাচারের মূল উৎপাটন করিবার উদ্দেশ্যেই আজ পঁচিশ বৎসর হইতে বাঙালী সমাজ দাবী করিতেছেন যে, বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল বিহার হইতে বিযুক্ত করিয়া পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হউক। পূর্ব্বকালে বিহারী নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবে আপত্তি করেন নাই। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদও প্রকাশ্যে এই বিভাগের সমর্থন করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার মনে হিন্দী ভাষা প্রসারের লোভ জন্মিয়াছে। এই মনোভাব বিহারের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মনে সংক্রামিত হইয়াছে। পুরুলিয়ার জিলা-স্কুলের নূতন ব্যবস্থায় তাহার প্রমাণ পাইতেছি। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বলিতেছি, "আপনি মজিলি, ভাই ! লঙ্কা মজাইলি"—এই দুঃখ করিবার সময় হয়ত একদিন আসিবে।

আসামে বাঙালী বিদ্যালয়ে অসমীয়া প্রবর্ত্তন

আসামের তেজপুর বাঙালী বালিকা বিদ্যালয়ে অসমীয়া ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করিবার জন্য যে চেষ্টা হইতেছে তাহার পূর্ণ বৃত্তান্ত এবং অভিভাবকদের প্রতিবাদের বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল। সংবাদটি ২৬শে মাঘের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে :

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

তেজপুর, ৬ই ফেব্রুয়ারী :—এই বৎসর হইতে অসমীয়া ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করায় তেজপুর বাঙালী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আলোচনার জন্য অভিভাবকগণ অদ্য সন্ধ্যায় সমবেত হন। ডাঃ হেমচন্দ্র দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দে প্রমুখ ব্যক্তিগণ সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে এই বিদ্যালয়ের ইতিহাসের উল্লেখ করেন। বিদ্যালয়টি প্রধানতঃ বাঙালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যালয়ের পরিচালক কমিটির এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের সকলেই প্রতিবাদ করেন।

সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের বিনা নির্দ্দেশে ও অভিভাবকগণের অনুমতি না লইয়া বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি অসমীয়া ভাষাকে একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম করিয়াছেন বলিয়া এই কার্য্য বিধি-বহির্ভূত। আর একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, পাঠ্য পুস্তকের তালিকা অসমীয়া ভাষায় দেওয়া হইয়াছে ; সুতরাং ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, পরিচালন কমিটি জোর করিয়া বাঙালীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে বদ্ধপরিকর। ইহাদের সিদ্ধান্তই সুপারিশ বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং এই প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, এইরূপ স্বেচ্ছাচারমূলক কার্য্য কখনই বরদাস্ত করা যাইবে না। পরিচালন কমিটিকে এই সিদ্ধান্ত নাকচ করিতে হইবে, তাহা না হইলে এই সভা সদস্যগণের ও সম্পাদকের পদত্যাগ-দাবী জানাইবে ; কারণ এই কার্য্যের জন্য ইঁহারাই দায়ী।

দশ দিনের মধ্যে বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহাদের প্রস্তাব

প্রত্যাহার করিতে বলিয়া একটি চরমপত্র দেওয়া হইয়াছে। সভায় আরও বলা হইয়াছে যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যার শতকরা ৪০ জন বাঙালী এবং বিদ্যালয়ে বাঙালীর দানই বেশী, সুতরাং পরিচালন কমিটিকে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে হইবে; সিদ্ধান্ত বাতিল না হইলে অভিযোগ দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। একটি প্রতিনিধিদল আসামের শিক্ষামন্ত্রী এবং গৌহাটিতে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইবেন। পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদকল্পে অভিভাবকগণ এই অভিমত জানান যে, এই দশ দিন তাঁহাদের কন্যারা বিদ্যালয়ে যাইবে না। প্রস্তাবের প্রতিলিপি ভারত গবর্মেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী, আসাম গবর্মেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী, আসাম গবর্মেণ্টের বিদ্যালয়-সমূহের পরিদর্শিকার নিকট পাঠা'নো হইয়াছে।

ভারতের গৃহসমস্যা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গৃহসমস্যা সম্পর্কে ইউনাইটেড নেশ্যন্স কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য-সংক্রান্ত বিবরণীতে ভারতবর্ষের গুরুতর গৃহসমস্যা এবং দীর্ঘ মেয়াদী গৃহ-নির্ম্মাণ পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ইউনাইটেড নেশ্যন্সের সমাজ-কল্যাণ বিভাগ এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। এই রিপোর্টে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আর্থিক দুরবস্থার ফলে ভারতবর্ষ এখন যে শোচনীয় গৃহসমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

আমাদের মতে এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন বা রিপোর্ট প্রণয়ন ভারতীয় গৃহসমস্যা সমাধানের উপায় নহে। এই সমস্যা সমাধানের সহজ উপায় আমাদের হাতে আছে। গৃহসমস্যা সম্বন্ধে ভাবিতে গেলেই আমরা আগে চিন্তা করি সিমেণ্টের কথা—অর্থাৎ পাকা ইমারৎ বাড়ীই যেন আমাদের একমাত্র বাসস্থান বা কর্ম্মস্থান। সোভিয়েট রাশিয়ার গৃহসমস্যা আমাদের চেয়ে শত গুণ বেশী, কারণ যুদ্ধে তাহার গৃহাদির যে ক্ষতি হইয়াছে সেরূপ কম দেশেই হইয়াছে। অথচ রাশিয়া বাড়ী বলিতে আগে বুঝে কাঠ এবং কাঠের বাড়ী তৈরি করিয়া তাহারা গৃহসমস্যা প্রায় সমাধান করিয়া আনিয়াছে। আমরা যদি সিমেণ্টের পরিবর্ত্তে বাড়ী তৈরীর সরঞ্জাম বলিতে যাহা সহজে পাওয়া যায় তাহা দিয়াই কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতাম, তবে আজ বাসগৃহের এ দুর্দ্দশা হইত না।

বাঙালী ব্যাঙ্ক পতনের ফল

গত তিন-চারি বৎসরের মধ্যে প্রায় ১৫।১৬টি বাঙালী ব্যাঙ্কের পতন হইয়াছে; তাহার ফলে বাঙালী সমাজ প্রায় ৫০ কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই পতনের মুখ্য কারণ সম্বন্ধে আজ কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। পরিচালক-বর্গের অসাধুতা তাহার মধ্যে প্রধান ও প্রথম। এই সম্বন্ধে দেশের মন কিরূপ বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহা "বরিশাল হিতৈষীর" নিম্নলিখিত মন্তব্যে স্পষ্ট বুঝা যায়। এই পত্রিকার সম্পাদক শ্রীদুর্গামোহন সেন অশ্বিনীকুমারের মন্ত্র-শিষ্য; তিনি আজীবন ত্যাগের পথে চলিয়াছেন; ন্যায় ও সততার পক্ষ লইয়া সংগ্রাম করিয়াছেন; অনর্থক কাহারও উপর বিদ্বেষ পোষণ করেন নাই। এহেন ব্যক্তির মনে যখন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা জাগিয়া উঠে, তখন বুঝিতে হইবে অসাধু ব্যাঙ্ক-পরিচালকবৃন্দ কি করিয়া অগণিত লোকের অভিশাপের ভাগী হইতেছে। "বরিশাল-হিতৈষী" পূর্ব্ববঙ্গের গবর্মেণ্টের নিকট যে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত। ভারতরাষ্ট্রের এই বিষয়ে কোন কর্ত্তব্য নাই কি? "বরিশাল-হিতৈষী" বলিতেছেন যে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এই ভাবে টাকার রপ্তানি বন্ধ হইলে "গৃহ-ত্যাগ"ও বন্ধ হইবে।

"বরিশাল সহরে এখনও কয়েকটি ব্যাঙ্কের অবশেষ দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা এখনও টাকা আদায় করে ও তাহাদের হেড অফিসে কলিকাতায় পাঠায়। অথচ এই টাকাগুলি ভিন্ন ডোমিনিয়নে চালান বন্ধ হইলে পাকিস্থানের অধিবাসিবৃন্দের পাওনা টাকাগুলি অনায়াসে আদায় হইয়া পাকিস্থানের আর্থিক অবস্থা ভাল করিতে পারিত। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কথা। যত দূর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে এই ব্যাঙ্কের প্রায় ২০।২৫ লক্ষ টাকা বরিশালেই আছে—লোকের পাওনার পরিমাণ ইহা অপেক্ষা কম। অথচ এই ব্যাঙ্কের পাওনাদার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের গরীব লোক। ইহারা পাকিস্থান গবর্মেণ্টের প্রজা। পাকিস্থান গবর্মেণ্ট কি দেখিবেন না—তাহারা নিরপরাধ নিরক্ষর গরীব (ধনী হইলেই বা কি) প্রজার টাকাগুলি তাহাদের সম্মুখ হইতে অন্যেরা লইয়া কলিকাতায় বসিয়া মহোৎসব না করে? তেমনি কথা ব্যাঙ্ক অব্ ক্যাল-কাটার। তাহারা যখন ঋণদান সমিতি নেয় তখন এক সর্ত্ত ছিল স্থানীয় পাওনাদারদের প্রাপ্য শোধ না করিয়া তাহারা এখানকার টাকা অন্যত্র লইয়া যাইতে পারিবে না। তবু কেন কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষ এখনও নগদ টাকা এখান হইতে চাহিবে?"

"ইউনিয়ন ক্রেডিট ব্যাঙ্ক—বেশ লক্ষ লক্ষ টাকা মারিয়া কলিকাতা পগার পার হইয়াছে। অথচ তাহাদের সব ব্যবসায়ে লাভ জমকালভাবে চলিতেছে। তাহাদেরও যাহা *asset* (সম্পত্তি) আছে তাহা দ্বারা পাওনাদারদের দেনা শোধ হইতে পারে—যদি কলিকাতা হইতে টাকা শোষণ না করে, ইত্যাদি ইত্যাদি—*People's Bank*,

Speci Bank প্রভৃতির প্রতিও কঠোর ব্যবস্থাবলম্বন করা উচিত।"

শিক্ষার সংস্কার

মাতৃগর্ভ হইতে মানব-শিশু বহির্গত হইয়া আলো-বাতাসের এক নূতন পরিবেশের মধ্যে পড়ে ; তাহার শরীর মনের একটা শিক্ষাদীক্ষা আরম্ভ হয়। সহজাত শক্তি ও সংস্কার এই নূতন পরিবেশের মধ্যে কি ভাবে রূপান্তরিত হয়, তাহার কার্য্য-কারণ এখনও পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় নাই। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুণ ও অগুণ নূতন পরিবেশের চাপে পড়িয়া রূপান্তরিত হয় কিনা, এই মূল সমস্যা লইয়া নৃতত্ত্ব-বৈজ্ঞানিক-দের মধ্যে এখনও তর্ক চলিতেছে এবং সে রূপান্তর উত্তর-পুরুষে সংক্রামিত হয় কিনা, তৎসম্বন্ধে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক ও অ-সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক একটা বিরাট বিতণ্ডায় ব্যাপৃত আছেন।

আমাদের দেশের প্রাচীন সমাজ-সংগঠকগণ এই বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নানা ভাবে বিক্ষিপ্ত নানা ইঙ্গিত আমরা পাই ; এই সিদ্ধান্তের পিছনে যে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা চলিয়াছিল, তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। সুতরাং আমাদের দেশে নূতন করিয়া এই বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিতে হইবে। আমাদের সমাজ-সংগঠকগণ মানব জীবনকে—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, যতি ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমে ভাগ করিয়া মানবশিক্ষার যে ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রথম আশ্রমটি বর্ত্তমান স্কুল কলেজের শিক্ষার পর্য্যায়ে পড়ে, এবং যদিও প্রাচীন আদর্শ ও উপায় আমরা গ্রহণ বা অনুসরণ করি না, তবুও দেশব্যাপী আলোচনার মধ্যে মাঝে মাঝে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে "স্বদেশী" যুগে আমাদের দেশের চিন্তা-নায়কগণ এই বিষয়ে একবার মনোযোগ দিয়াছিলেন। ব্রিটিশ আমলের শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের মানুষ করিতে পারে নাই, ঐ বিশ্বাসের প্রেরণায় তৎকালীন আলোচনা চলিয়াছিল ; স্বাধীন দেশের উপযোগী সে শিক্ষা ছিল না ; এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার গুণাবলীও সেই শিক্ষার কল্যাণে অর্জ্জিত হয় না। এই অভাব বোধের তাড়নায়ই তখন আমাদের পূর্ব্বজগণ "জাতীয় শিক্ষার" কথা বলিতেন এবং "জাতীয়" স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই যুগের চিন্তা রাজনৈতিক প্রয়োজনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের প্রধানগণই সেই আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছিলেন।

প্রায় সেই সময়েই মিসেস অ্যানি বেশান্ত প্রাচীন হিন্দু সংস্কারের ভিত্তির উপর নূতন যুগের উপযোগী শিক্ষার পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। কাশী নগরীতে কেন্দ্রীয় হিন্দু কলেজ (Central Hindu College) স্থাপিত হয়। তাঁহার কল্পনার পরিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে। তাহার প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে, বোলপুরের কান্তারে প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ "শান্তিনিকেতন" স্থাপন করেন। রাজশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে সেই চেষ্টা সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয় নাই। প্রায় ৮০ বৎসরের ইংরেজী শিক্ষায় দেশের মতিগতি এমন ভাবে বদলাইয়া গিয়াছিল যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় ঐ পুরাতন আদর্শ ও রীতি অবলম্বন করিতে সাহস পাইতেছিলেন না। এই বিষয়ে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্ত্তিত আর্য্য সমাজের একটি "শাখা" মাত্র অধিকতর সাহসের পরিচয় দিয়াছে।

এই ইতিহাসের পাশাপাশি রাজশক্তি সমর্থিত শিক্ষাদীক্ষা অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। সেই শিক্ষার মধ্যে সংস্কারের চেষ্টা যে হয় নাই, তাহা নয়। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে বড়লাট রিপণের আমলে একটি শিক্ষা কমিশন বসে ; বড়লাট কার্জ্জনের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার উন্নতিকল্পে আর একটি কমিশন বসে ; প্রায় ১২ বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নতিকল্পে অপর একটি কমিশন বসে। এ তিনটি কমিশনের সিদ্ধান্তাবলী ও সংস্কারোদ্দেশ্যে প্রস্তাবাবলী আমাদের দেশে শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। তাই নূতন করিয়া অনুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে, এবং ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। আচার্য্য সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাহার সভাপতি।

প্রায় সত্তর বৎসরের মধ্যে চারিটি শিক্ষা-কমিশনের নিয়োগ হইয়াছে। দেশের চিন্তা-নায়কগণ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সব মতামত অনুযায়ী সংস্কার-চেষ্টা হয় নাই, একথাও বলা যায় না। তবুও তাহা ব্যর্থ হইল কেন বা তাহা আশানুরূপ ফলদান করে নাই কেন, তাহার একটি বা ততোধিক কারণ আছে। সেই কারণ বাহির করিতে না পারিলে, বর্ত্তমান অনুসন্ধানের পর পুরাতন ব্যর্থতা আবার আমাদের বিব্রত ও নিরুৎসাহ করিতে পারে। এই কথা বলিলে যথেষ্ট হইবে না যে, এই তিনটি কমিশন বিদেশী সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল ; আর রাধাকৃষ্ণণ-কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন স্বাধীন "ভারতরাষ্ট্র"। ইংরেজ কখনও বলে নাই যে, তাহার আমলের শিক্ষা ভারতবর্ষের লোককে "অমানুষ" করিয়া রাখুক ; ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তক মেকলে সাহেবের আশা ছিল—ভারতবাসী ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া বর্ত্তমান জগতের আদর্শানুযায়ী জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হইয়া উঠিবে।

মেকলের আদর্শ ও সেই আদর্শের সাফল্যের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে, এই কথা অস্বীকার না করিয়াও কি

বলা যায় যে, ইংরেজী শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে? বর্তমান ভারতবর্ষের একজন চিন্তানায়ক আচার্য্য যদুনাথ সরকার ফেব্রুয়ারী মাসের (১৯৪৯ খ্রীঃ) "মডার্ণ রিভিউ" মাসিক পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মনে হয় না যে ভারতরাষ্ট্রের শিক্ষা-সংস্কারে বিগত এক শত পঁচিশ বৎসরের ইতিহাসের শিক্ষা ও পদ্ধতি অবান্তর করিয়া ফেলিতে হইবে, এইরূপ মনোভাব গ্রহণীয় ও মঙ্গলপ্রদ। সুতরাং রামমোহন রায়ের যুগে প্রাচীন ভারতের আদর্শের ও বর্ত্তমান যুগের আদর্শের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে বিতর্ক ও আলোচনা চলিয়াছিল, আজও তাহার অবসর আছে। আমাদের নিজের লোকের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসিয়াছে বলিয়া দেশের জনমত এই বিষয়ে, এই আলোচনা সম্বন্ধে, অনেকটা নিশ্চেষ্ট। ইংরেজের আমলে বিতর্ক ও আলোচনা প্রখর হইয়াছিল; কারণ, তখন রাষ্ট্রের ক্ষমতা শিক্ষার সাহায্যে আমাদের "অমানুষ" করিতেছে এইরূপ একটা বিশ্বাস আমাদের মনে বদ্ধমূল ছিল।

গান্ধীজীর আমলে এ বিশ্বাস উগ্র হইয়া উঠে। সেই জন্য তিনি ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে অসহযোগের বিধান দিয়াছিলেন। তার পর বর্তমান শিক্ষার গোড়ায় গলদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি শিক্ষা সংস্কারের আমূল পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন; তারই নাম "বুনিয়াদী শিক্ষা।" ইংরেজী শিক্ষা ছিল শহর-ঘেঁষা; তাহা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে জাতীয় জীবনের শক্তি-মুখ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। সেই ব্যবধান দূর করিতে হইলে নূতন শিক্ষার প্রয়োজন; দুই-তিন কোটি শিক্ষিত সম্প্রদায় নয়, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ কোটি লোক-সমষ্টির শিক্ষার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে দেশে "মানুষ" সৃষ্টি হইতে পারে না। এই বিশ্বাস বা মনোভাবের নির্দ্দেশে ভারতরাষ্ট্রের শিক্ষা-সংস্কারের চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হইবে কিনা এই তর্কের মীমাংসা যত দিন হইবে না, তত দিন শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের "মন-মুখ" এক হওয়া সম্ভব নয়; চিন্তা ও কর্ম্মের মধ্যে ব্যবধান থাকিয়া যাইবে। একাগ্র মন লইয়া শিক্ষা-সংস্কারে হাত দিতে পারিব না।

ভারতরাষ্ট্রে নৈরাশ্য ও তিক্ততা

যে নিরাশা ও তিক্ততা ভারতরাষ্ট্রের গণ-মনে ধূমায়িত হইতেছে, তাহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধে তর্কের আর কোন অবকাশ নাই। ভারতরাষ্ট্রের নেতৃবর্গ তাহা জানিয়া শুনিয়াও এই মেঘ দূর করিতে পারিতেছেন না এবং তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিয়া মনে হয় যে তাঁহারাও গতানুগতিকতায় গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। বিদেশী পর্য্যবেক্ষকগণও ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। এই অবস্থায় অনেকেই যে তুষ্ট হইয়াছেন, এই বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। দুই-এক জন বন্ধুভাবে আমাদের সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছেন, ধৈর্য্য না হারাইবার কথা বলিতেছেন।

World-Over Press (ওয়ার্লড ওভার প্রেস) নামক মার্কিনী সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্তা উইলিয়ম এলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন। সম্প্রতি তিনি World in Brief News Service—এই নামের আর একটি সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্তা হইয়াছেন। ভারতরাষ্ট্রের "স্বাধীনতা দিবসে"—১৯৪৮ খ্রীঃ ১৫ই আগষ্ট তারিখে তিনি আমাদের দেশের নানা ব্যর্থতার ও নিরাশার প্রতিষেধক রূপে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভের প্রথম দশ বার বৎসরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, এই অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতরাষ্ট্রের কার্য্যকলাপের বিচার। আধুনিক পরাক্রমশালী (fantastically mighty U. S. A.) মার্কিনী যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরূপ নিরাশা ও ব্যর্থতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল এবং এই ঘরোয়া সংগ্রামে জয়লাভ করিবার ধৈর্য্য ছিল বলিয়াই আজ যুক্তরাষ্ট্র জ্ঞানে বিজ্ঞানে, অর্থে সামর্থ্যে পৃথিবীর চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছে।

বর্তমান নিরাশা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমরা এতটা স্পর্শকাতর হইয়া উঠিয়াছি বলিয়াই উইলিয়ম এলেন আমাদের নূতন করিয়া শুনাইয়াছেন যে, মানবশিশুর জীবনে যেমন সেইরূপ জাতির জীবনেও প্রথম কয়েক বৎসর নানা রোগ-শোকের, নানা দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া যাইতে হয়। নেতৃবৃন্দের ত্রুটিবিচ্যুতির কঠোর সমালোচনা করিতে হইবে; কিন্তু নিরাশ হইলে চলিবে না, নিরাশার প্রশ্রয় দিলে চলিবে না। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য প্রকাশ (despair) দণ্ডনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। আমাদেরও আজ সেই কথা স্মরণে আনিতে হইবে। সেই জন্য উইলিয়ম এলেনের এই প্রবন্ধ প্রণিধানযোগ্য। এলেন তাঁহার প্রবন্ধের তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন ম্যাসাচুসেটস শিল্প-বিজ্ঞান পরিষদের (Massachussets Institute of Technology) অধ্যক্ষ ডক্টর ওয়াকারের *The Making of a Nation* (একটি রাষ্ট্রের ও জাতির সংগঠন) নামক পুস্তক হইতে। উত্তর আমেরিকার আট্‌লান্টিক মহাসমুদ্রের উপকূলস্থিত ১৩টি উপনিবেশ জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ইংরেজের শাসনপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। ১৭৭৬ খ্রীঃ বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়, ১৭৮১ খ্রীঃ এই বিদ্রোহ সার্থক হয়। ১৭৮৭ খ্রীঃ রাষ্ট্রতন্ত্র সঙ্কলিত হইয়া দেশের লোকের সম্মতিলাভের জন্য ভোটে দেওয়া হয়। নয়টি প্রদেশের (State) সম্মতি লাভ করিলে এই রাষ্ট্রতন্ত্র সর্ব্বজনগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে স্থির হয়। কয়টি প্রদেশ যোগদান করিবে, তৎসম্বন্ধে নেতৃবর্গের মনে নানা আশঙ্কা ছিল। দুর্ব্বলতর ও আকারে ক্ষুদ্র প্রদেশগুলি প্রথমে রাষ্ট্রতন্ত্র গ্রহণ করে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রদেশ ভার্জিনিয়া ক্ষুণ্ণ হয় এই ব্যবস্থায় যে, উচ্চতর আইন সভায় (Senate) তাহার মর্য্যাদা ও ক্ষমতা ক্ষুদ্রতম প্রদেশের সমান, সকল প্রদেশই দুই জন করিয়া

প্রতিনিধি (Senator) নির্ব্বাচনের অধিকারী হইবে। জর্জ ওয়াশিংটনকে বলিতে শুনা গিয়াছিল : "প্রদেশগুলি (States) যদি এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ না করে, তবে পরবর্ত্তী রাষ্ট্রতন্ত্র রক্তের অক্ষরে লিখিত হইবে।" ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ প্রদেশটি যোগদান করে।

পূর্ব্বের গবর্মেণ্ট যে ঋণ করিয়াছিল তাহা এই যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে ; যুদ্ধের ব্যয় যুক্ত হইয়া একটা বিরাট ঋণের বোঝা এই নূতন রাষ্ট্রের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। এই ঋণ স্বীকার করিয়া গবর্মেণ্ট যে "কোম্পানীর কাগজ" দিয়াছিল তাহার দাম আসল মূল্যের আট ভাগের এক ভাগে নামিয়া যায়। বিদেশের নিকট ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে কোন মতবিরোধ ছিল না ; কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিকবর্গের নিকট ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয় ; ওয়াশিংটনের উত্তরাধিকারী টমাস জেফারসন্ প্রমুখ নেতৃবর্গ আসল মূল্যে এই ঋণ পরিশোধের প্রবল বিরোধী ছিলেন ; প্রতিপক্ষের নেতা ছিলেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন। তাঁহার মতই কয়েক বৎসর পরে গৃহীত হয় এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই কার্য্যের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের (Federal Authority) প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে একটা মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রেও এই নূতন রাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করা সহজ ছিল না ; বিদেশে এই বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল যে, "আত্মশক্তির জোরে নয়, ফ্রান্সের সাহায্যের জোরে যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে"—(The Americans owed their independence more to their ally, France, than to their own streagth)। হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স আমেরিকার রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় টাকা ধার দিয়াছিল ; এই ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে বহুদিন মনকষাকষি লাগিয়াই রহিল। যুক্তরাষ্ট্রের জন্মের অব্যবহিত পর ফরাসী বিপ্লবের আবির্ভাব হয় ; এই বিপ্লবে এই নূতন রাষ্ট্র একেবারে নিরপেক্ষ থাকিতে পারে নাই। তার ফলে, ফরাসী বিপ্লবের বাগ্‌বিতণ্ডার ফলে, প্রায় বিশ বৎসর এই নূতন রাষ্ট্রের মন নানাভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল ; এই নূতন "নেশন" নিজের নানা সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে নাই।

এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া উইলিয়ম এলেন বলিতে চান যে, ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের নৈরাশ্যগ্রস্ত হইবার কোন কারণ নাই। স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তার শক্তি এইরূপ নানা সমস্যার দ্বারাই পরীক্ষিত হয়। নেতৃবর্গের আত্মবিশ্বাস থাকিলে দেশের লোকের অভাব অভিযোগ, অসন্তোষ দূর করা কঠিন নয়। সকল কালে, সকল দেশে এইরূপ সমস্যা নানা আকারে হয়ত দেখা দিয়াছে ; তাহার সমাধান করিয়াই দেশসমূহ আত্মশক্তির পরিচয় লাভ করিয়াছে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে ; সুসংসিদ্ধ হইয়াছে। এই ভরসায়ই সকলে কর্ম্ম করিয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের জন্য কোন নববিধান হইতে পারে না।

আন্তঃপ্রাদেশিক প্রচারসচিব সম্মেলন

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের প্রচারসচিবদের একটি সম্মেলন নয়া দিল্লীতে হইয়া গিয়াছে। ভারত-সরকারের প্রচারসচিব শ্রীযুক্ত দিবাকর সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন এবং সম্মেলন উদ্বোধন করেন পণ্ডিত নেহরু। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। প্রাদেশিক গবর্মেণ্টসমূহ কাজ করুক বা না করুক, নয়া-দিল্লীতে কো-অর্ডিনেশন সম্মেলন বেশ ঘন ঘন হইতেছে এবং তাহার জন্য রাহা খরচও মন্দ হইতেছে না। সম্মেলনে শ্রীদিবাকর বলিয়াছেন, "প্রত্যেক লোকায়ত্ত গবর্মেণ্টেরই তাঁহাদের প্রভু জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং গবর্মেণ্ট তাঁহাদের জন্য কি করিতেছেন তাহা বর্ণনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।" দিবাকর মহাশয় এই কার্য্যটি সরকারী প্রচার বিভাগ মারফত বৈজ্ঞানিক উপায়ে করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে আমাদের মনে হয় যে, সরকারী কর্ম্মচারীরা যদি প্রত্যেকে কর্ত্তব্যপরায়ণ হন, ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিসের বড়কর্ত্তারা পূর্ব্বের ন্যায় যদি যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে আপিসে আসিয়া প্রকাশ্যে বসেন ও সাধারণের বক্তব্য কিছু সময় শুনিয়া অভিযোগের দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে সরকারের উপর জনসাধারণের আস্থা অটুট রাখিবার জন্য প্রচারকার্য্যের প্রয়োজন কম হয়। ইংরেজ আমলেও যত দিন এই নিয়ম প্রচলিত ছিল তত দিন প্রচারবিভাগের ব্যয়বাহুল্য হয় নাই ; বিপ্লবীদের ভয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেবরা যেদিন হইতে প্রকাশ্য আপিস ছাড়িয়া খাসকামরায় প্রবেশ করিলেন সেদিন হইতেই জনসাধারণের সহিত সরকারের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং প্রচারবিভাগের প্রয়োজন বাড়িয়াছে। এখন তো আর সে ভয় নাই। এখন প্রত্যেক জেলায় তিন-চার জন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, তাহার উপর মহকুমা হাকিম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি আছেন। পুলিসের তো ছড়াছড়ি, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, অতিরিক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডেপুটি কমিশনার প্রভৃতিরও অন্ত নাই। ইঁহারা যদি সময় মত আপিসে আসেন এবং জনসাধারণকে অভিযোগ জানাইবার সুযোগ দেন তাহা হইলে বর্ত্তমান সরকার যে লোকায়ত্ত গবর্মেণ্ট, লোকে তাহা বুঝিবার সুযোগ পায়।

কেবলমাত্র প্রচার বিভাগের খরচ বাড়াইয়া যে গবর্মেণ্টের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়ানো যায় না, বাংলাদেশ তাহার প্রমাণ। এখানে লীগ গবর্মেণ্টের আমলে প্রচার বিভাগে ব্যয় অসম্ভব বাড়ানো হইয়াছে, তাহার পর বর্ত্তমান বঙ্গদেশ

এক-তৃতীয়াংশ হওয়ার পর ঐ বিভাগের খরচ দেড় গুণ বাড়িয়াছে, কিন্তু সরকারের প্রতি সাধারণ লোকের মনে যে বিরূপ ধারণা ক্রমশঃ জন্মিতেছে তাহা তদনুপাতে কি কমিয়াছে, না বাড়িয়াছে? খরচের নমুনা আমরা বাজেট হইতে উদ্ধৃত করিলাম :

সরকারী প্রচার বিভাগের ব্যয়—

	১৯৪৫-৪৬	১৯৪৮-৪৯
গেজেটেড্ অফিসার ...	৪৯,৩১০৲ টাকা	৭০,০০০৲ টাকা
কেরাণী ...	৩৭,৮৫০৲	৩২,০০০৲
চাপরাসী ...	১,৯৯০৲	১,৮০০৲
অস্থায়ী কর্ম্মচারী ...	১,৩৩,৫৮৩৲	২,৩০,০০০৲
বাড়ীভাড়া ও অন্যান্য ভাতা	৪৬,১৩২৲	১১,০০০৲
মাগ্‌গি ভাতা ...	৭৩,০৩৬৲	৮৫,০০০৲
রেশনের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা	নাই	৪,৫০০৲
ভ্রমণ ভাতা ...	নাই	৭২,০০০৲
কন্টিঞ্জেন্সি ...	২,১৫৭৲	৮,৪০০৲
আপিস খরচ ও বিবিধ ...	১,৮৫,৫৪০৲	২,৮৫,০০০৲
বই ও সাময়িক পত্র ...	নাই	৯,০০০৲
	৫,২৯,৫৯৮৲	৮,১০,১০০৲

এটা স্বরাষ্ট্র বিভাগের অন্তর্গত প্রচার বিভাগ। তাহা ছাড়া সিভিল সাপ্লাইয়ের মধ্যে আর একটা প্রচার বিভাগ আছে এবং তাহার খরচও উপেক্ষণীয় নয়। এটির নমুনা নিম্নোক্ত রূপ :

সিভিল সাপ্লাইয়ের পাবলিসিটি প্রোডাকশন আপিস—

	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৮-৪৯
অফিসারদের বেতন ...	১৭,৭০০৲ টাকা	১৩,২০০৲ টাকা
কেরাণীদের বেতন ...	১১,৩০০৲	১০,৭০০৲
ভাতা ...	৭,৮০০৲	৭,৬০০৲
কন্টিঞ্জেন্সি ...	৪,৫৩,৪০০৲	২,০০,০০০৲
	৪,৯০,২০০৲	২,৩১,৫০০৲

জনসাধারণ এখন রেশন সম্পর্কে অভ্যস্ত হইয়াছে। এখন রেশনের বিজ্ঞাপন মুসাবিদা করিবার জন্য এত বড় বিভাগ বজায় রাখিবার কোন প্রয়োজন আছে কি? "আপনার রেশন কার্ডের মেয়াদ বাড়ান" অথবা "আপনার রেশন কার্ডের মেয়াদ বাড়ানো না হয়ে থাকলে রেশন কার্ডখানা বাতিল হয়ে গেছে" —এই বিজ্ঞাপন হাজার হাজার টাকা ব্যয়ে ষ্টেটসম্যান, অমৃত বাজার, হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই, কারণ ঐ সব কাগজ যাঁহারা পড়েন রেশন কার্ডের মেয়াদ বাড়ানো সম্বন্ধে তাঁহারা সজাগ থাকিবেন ইহাই আশা করা উচিত। এ বিষয়ে একটি সরকারী প্রেসনোট তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। অশিক্ষিত সাধারণ লোকের জন্য রেশনের দোকানে বড় করিয়া বিজ্ঞাপন দিলেই কাজ চলিতে পারে। যে সব রেশন কার্ড হোল্ডারের নজরে এর একটিও পড়িবে না, বুঝিতে হইবে তাঁহাদের রেশন কার্ডের গরজ নাই।

এশিয়ার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘ টালবাহানা করিয়া ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রের উপর ডাচ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণে প্রশ্রয় দিতেছে। আমরা বহুবার বলিয়াছি যে, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য না পাইলে হল্যাণ্ডের প্রভুত্ব দু-দিনের বেশী ইন্দোনেশিয়ায় টিকিতে পারে না। একটা হিসাবে দেখিয়াছি যে, ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৪০০।৫০০ কোটি টাকা; ব্রিটিশের মূলধন প্রায় ১০০ কোটি টাকা, এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকবর্গের মূলধন প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। এই ত্রয়ীর মূলধন রক্ষার জন্য ব্রিটিশ ও মার্কিনী পুঁজিপতিরা ডাচ সাম্রাজ্যবাদকে জিয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাই হইল ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রের উপর আক্রমণের গোড়ার কথা।

১৯৪৫ খ্রীঃ জাপানের পরাজয়ের পর ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর পিছনে পিছনে ডাচ সৈন্যবাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় ঢুকিয়া পড়ে। সেই সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাপানী শাসনকর্তৃপক্ষ সাধারণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ব্রিটিশ ও ডাচ সৈন্যাধ্যক্ষেরাও এই ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছিল। এই স্বীকৃতির বলেই ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্র আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রায় স্বাধীন দেশের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। ডাচ গবর্মেণ্টের অসম্মতি ও আপত্তি সত্ত্বেও সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘের অধীনস্থ নানা প্রতিষ্ঠানে এই সাধারণতন্ত্রের পৃথক স্থান আছে। এই মর্য্যাদা ও স্বীকৃতি মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই।

এই স্বীকৃতির কথা মনে রাখিয়াই ব্রিটিশ ও আমেরিকার সাংবাদিকগণ ডাচ আক্রমণের নিন্দা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তাঁহাদের অনেক মন্তব্য পাঠ করিবার সুযোগ আমরা পাইয়াছি। কিন্তু এই ভর্ৎসনা ও তাঁহাদের গবর্মেণ্টের কার্য্য-কলাপের মধ্যে কোন সঙ্গতি দেখিতে পাইলাম না। "ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটার" নামে যুক্তরাষ্ট্রের একখানি প্রসিদ্ধ ও চিন্তাশীল পত্রিকা আছে। ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপার লইয়া পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু যে সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে পত্রিকাখানি পাশ্চাত্য জগৎকে এই বলিয়া সাবধান করিয়াছে যে, কম্যুনিজমের জুজুর ভয় দেখাইয়া এশিয়ার গণ-তন্ত্র ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ নিজের হাতে নিজের মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করিবে। অদূর অতীতে সে চেষ্টা হইয়াছে এবং ব্যর্থও হইয়াছে।

ওয়াল্টার লিপম্যান একজন বিখ্যাত সাংবাদিক। তাঁহার

একই প্রবন্ধ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সংবাদপত্রসমূহে এক দিনে প্রকাশিত হয়। একটা হিসাবে দেখিয়াছি যে, এই সব সংবাদপত্রের পাঠক প্রায় চার-পাঁচ কোটি। তিনিও পাশ্চাত্য জগৎকে সাবধান করিয়াছেন এই বলিয়া যে, জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হইতে পারে; কিন্তু সে একটি কাজ করিয়াছে; সে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ও প্রাধান্যের জারিজুরি ভাঙিয়া দিয়াছে। ঘটনার দ্রুত পরিবর্তনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্র-শক্তিবর্গ আজ প্রায় দুইটি বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্জে বিভক্ত এবং অবস্থার তাড়নায় ইউরোপ খণ্ডের কয়েকটি দেশ আত্মরক্ষার জন্য আপনাদের শক্তি ও সামর্থ্য একত্র করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড পূর্ব্ব-এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী বলিয়া পরিচিত। সোভিয়েট ইউনিয়নের ভয়ে ইহারা একত্রিত হইতেছে। কিন্তু এই বিশ্বাস এশিয়াবাসীর মনে দৃঢ় হইতেছে যে, ইউরোপের এই জাতি-সঙ্ঘ এশিয়ার সম্ভ্রম ও স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য এক-কাট্টা হইতেছে, ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদ রক্ষার জন্য দল বাঁধিতেছে (a syndicate for the preservation of decadent empires)। কেবল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই তাহার কার্য্যকলাপ দ্বারা এই বিশ্বাস নষ্ট করিতে পারে। কিন্তু সে ভরসা কোথায়? যুক্তরাষ্ট্র ডাচ সাম্রাজ্যবাদকে কি সংযত করিতে পারিয়াছে?

স্বাধীন ব্রহ্মের সমস্যা

আমাদের প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশের উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। সাত আট বৎসরের মধ্যে জাপানী অভিযানের কল্যাণে তাহার জীবন ধনেপ্রাণে বিধ্বস্ত হইয়াছে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এক দিনে এক সময়ে ছয় জন নেতা নিহত হইলেন, তাঁহারাই ছিলেন নবব্রহ্মের রচয়িতা, এই সম্পর্কে ইউ আউঙ সানের নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে। তাঁহার হত্যাকারীরা তাঁহার সহকর্ম্মী ছিল জাপানী যুদ্ধের সময়, আউঙ সান সহ ছয় জন মন্ত্রীকে হত্যা করিয়া তাহারা প্রমাণ করিল যে, জাতি-শত্রুর মত নিষ্ঠুর শত্রু আর কেহ নাই।

তারপর ইংরেজের শাসন-ক্ষমতা প্রত্যাহৃত হইয়াছে; যাইবার সময় ইংরেজ ব্রহ্মদেশকে ব্রিটিশ রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার জন্য অনুরোধ করে নাই; করিয়া থাকিলেও ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু ও তাঁহার সহকর্ম্মিবৃন্দ এরূপ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদিগণ এই ব্যবস্থা মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহারা ব্রহ্মদেশে অন্তর্বিরোধী নানা দলের শত্রুতায় ইন্ধন যোগাইতেছেন। আউঙ সান, থাকিন নু প্রভৃতি ব্রহ্মদেশের নেতৃবর্গের কল্পনা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। উগ্রপন্থী কম্যুনিষ্ট দল এই চেষ্টার বিরোধী, তাঁহাদের নেতৃত্বে ব্রহ্মদেশের একাংশ থাকিন নু-র গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু তাঁহার গবর্মেণ্টের প্রধান শত্রু হইয়াছে কারেণ জাতি। ইহাদের অনেকেই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, সেইজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহারা মনেপ্রাণে ইংরেজের হইয়া লড়িয়াছিল, এই অবসরে সামরিক নানা কৌশল তাহারা আয়ত্ত করে। ইহাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেকটা "পাকিস্থানী" মনোভাবাপন্ন; রক্তে ও ধর্ম্মে ব্রহ্মদেশের জনসমষ্টি হইতে পৃথক বলিয়া ইহারা নিজেদের জন্য পৃথক একটি রাষ্ট্রের দাবী করিতেছে। থাকিন নু-র গবর্মেণ্ট এই দাবী স্বীকার করিয়াছেন। তবুও কারেণ বিদ্রোহীরা অস্ত্র সংবরণ করে নাই। ব্রহ্মদেশের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ একজন কারেণ; এই ব্যবস্থায় মনে হয় যে, থাকিন নু-র গবর্মেণ্ট কোন জাতি-বৈর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না এবং আমাদের ভরসা আছে যে, তিনি এই বিদ্রোহ দমন করিয়া কারেণ-প্রধানগণের সঙ্গে একটা সম্মানজনক মীমাংসা করিতে পারিবেন।

ব্রহ্মদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে চট্টগ্রামের মুসলমানেরা দুই-তিন শত বৎসর হইতে বসবাস করিতেছে। ভারতীয় মুসলমানদের দেখাদেখি তাহারা "পাকিস্থানী" স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা সেই স্বপ্ন সার্থক করিবার জন্য সুযোগ সুবিধার অপেক্ষায় আছে। পূর্ব্ব পাকিস্থানের শাসকসম্প্রদায় এই বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। জানি না, থাকিন নু-র গবর্মেণ্ট এই প্রতি-শ্রুতির উপর ভরসা করিয়া বর্মী "পাকিস্থানী"দের অবহেলা করিতে পারিবেন কিনা।

আর একটা সমস্যা ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবর্গ সম্পর্কে দেখা দিয়াছে। তামিল দেশের চেট্টিসম্প্রদায় জমি বন্ধক রাখিয়া ব্রহ্মদেশের চাষী সম্প্রদায়কে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ধার দিয়াছিল। এই ঋণ চেট্টিসম্প্রদায়ের গলায় কাঁটার মত বিঁধিয়া আছে। গুজরাটি ও অন্যান্য ভারতীয় নাগরিক ব্রহ্মদেশের নানা ব্যবসায়ে নেতৃত্ব করিতেছিল, তাহাদের নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ কত জানি না। প্রায় কয়েক সহস্র ভারতীয় নাগরিক ইংরেজ আমলে সরকারী চাকুরী করিতেছিলেন; তাঁহাদের শেষাংশ প্রায় ২,৫০০ লোকের নিকট বর্মী গবর্মেণ্ট নোটিশ দিয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের চাকুরী বাতিল হইয়া যাইবে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, এই ২,৫০০ ভারতবাসী ব্রহ্মদেশের নাগরিক হইতে স্বীকার করিতে পারেন নাই বলিয়াই এই নিষ্ঠুর বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই বিষয়ে কোন মীমাংসা হইতে পারে কিনা তাহার জন্য চেষ্টা করা ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। অন্যান্য ভারত-ব্রহ্ম সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া রেঙ্গুনে যাইবার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কারেণ বিদ্রোহ সেই আয়োজন

পিছাইয়া দিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, ব্রহ্মের রাষ্ট্রবিপ্লবে ভারতীয় নাগরিকবর্গকে ক্ষতি স্বীকার করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে হইবে—ব্রহ্মের নাগরিক হইবার ইচ্ছা যখন তাহাদের নাই।

মার্কিনে ভারতীয় পুস্তক ও সংবাদপত্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ পৃথিবীর "গণতন্ত্রের" নেতা। সেইজন্য পৃথিবীর লোকের নিকট আত্ম-পরিচয় দিবার জন্য একটা বিরাট আয়োজন গড়িয়া তোলা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিক কার্য্যকলাপেই কেবল প্রচারিত হয় না; "মার্কিন বার্ত্তা" পাঠ করিয়া দেশের সমগ্র জীবনের, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎসা বিষয়ক নানা তথ্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়। পৃথিবীর অপরাপর দেশ সম্বন্ধেও তাঁহাদের কৌতূহলের অন্ত নাই; এবং তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার আগ্রহ অফুরন্ত। ইহার দৃষ্টান্ত পাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চতম পরিষদের লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে একটি ঘোষণার মধ্যে—ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থানের সকল প্রধান ভাষায় লিখিত পুস্তকই কংগ্রেসের লাইব্রেরিতে স্থান পাইবে। এখন উর্দু এবং হিন্দী ভাষায় রচিত প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বই এই লাইব্রেরিতে আছে। এইগুলি ছাড়াও বাংলা, পাঞ্জাবী, সিন্ধি এবং গুজরাটি প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় লেখা বই এখানে রাখা হইবে। এই নূতন পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে, ভারত-"পাকিস্থান" এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ়তর করা। এইজন্যই এখন কংগ্রেসের লাইব্রেরীতে এই দুইটি দেশ হইতে বহুসংখ্যক সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রাদি আনা হইতেছে। লাইব্রেরীর প্রধান পাঠককে এইগুলি রাখা হয়, যাহাতে সহজেই ইহারা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবন-যাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জনে এই প্রচেষ্টা আমাদের অনুরূপ কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করুক। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। সুতরাং ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ব্যাপকতর আয়োজন করার সময় আসিয়াছে।

বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি

ডক্টর মোহম্মদ শহীদুল্লাহের সভাপতিত্বে পূর্ব্ব পাকিস্থান সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন সম্প্রতি ঢাকা নগরীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি সাহিত্য-শখার সভাপতিও ছিলেন। এই শাখায় বক্তৃতা উপলক্ষে তিনি এমন কতকগুলি কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন যাহার জন্য তিনি "আজাদ" প্রভৃতি উগ্র "দ্বি-জাতি"-তত্ত্বে বিশ্বাসীদের নিন্দাভাজন হইয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্ম ও ইসলাম দুইটি পৃথক ধর্ম্ম; নানা আচার-অনুষ্ঠানে এই পার্থক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পার্থক্যের উপর ভিত্তি করিয়া মুসলমান সমাজের বহুজনের মনে এই ভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে যে, হিন্দু এক জাতি (নেশন), মুসলিম আর এক জাতি (নেশন)।

ডক্টর শহীদুল্লাহের বক্তৃতায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙালী মুসলমান সমাজের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই "দ্বি-জাতি"-তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। আমরা "পাকিস্থানের" অন্তর প্রদেশের কথা বলিতে পারি না। কিন্তু ডক্টর শহীদুল্লাহের বক্তৃতায় যে ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারি।

> "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোনও আদর্শের কথা নয়; এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় অণুবীক্ষণযন্ত্র চোখে ধরে হয়ত আবিষ্কার করতে পারেন, কার শরীরে দু' চার ফোঁটা বেশী বা কম আর্য্য, আরব, পাঠান বা মোগল রক্ত আছে। কিন্তু ঋষি-কবির কথাই ঠিক—
>
> "হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য
> হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
> শক-হুন-দল পাঠান মোগল
> একদেহে হোলো লীন।"

প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে "আজাদ" পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা আকরম্ খাঁ বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, পাঁচ শত বৎসর মুসলিম আধিপত্য বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও বাঙালী হিন্দু মুসলিমের জীবনে ইসলামের ছাপ নিরেট হইয়া বসে নাই; চিন্তায়, কবিতায়, গানে বাঙালী মুসলিম হিন্দুর ঐতিহ্য মানিয়া লইয়াছিল অনেক ক্ষেত্রে। ইহা তাঁহার মতে ইসলামের কলঙ্ক; বাঙালী মুসলিমের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। সেইজন্য মৌলানা সাহেব সেই যুগকে বাঙালী মুসলমানের পক্ষে "অন্ধকারের যুগ" (dark age) বলিয়া নিন্দা করিতে দ্বিধা-বোধ করেন নাই।

এরূপ প্রচারণের ফলেই "পাকিস্থানী" মনোভাবের সৃষ্টি হইতে পারিয়াছিল, এবং আজ বাঙালী মুসলমানকে তাহার মাতৃ-ভাষার গৌরব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আন্দোলন করিতে হয় "নিজ বাসভূমে"।

কিন্তু দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বাঙালী মুসলমান অন্য ভাবের ভাবুক ছিলেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ নোয়াখালির সন্দীপ-নিবাসী আবদুল হাকিমের, "নূরনামার" লেখকের, একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙালী মুসলমান সেই পরিচয় ভুলিতে চায়।

> "যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
> সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি।
> মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
> দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।
> দেশী ভাষা বিদ্যা মনে না জুয়ায়—
> নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায়।"

আচার্য্য যদুনাথ সরকারের জন্মোৎসব

আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের অষ্ট-সপ্ততিতম বর্ষ পরিপূর্ত্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিগত ২৪শে মাঘ তারিখে পরিষদ-ভবনে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যে মানপত্র পাঠ করা হয় তাহার প্রথম ও শেষ পংক্তি কয়েকটিতে আচার্য্য-দেবের জীবনের আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। "পরাধীন ভারতবর্ষের কলঙ্কিত ইতিহাস মন্থন করিয়া...অশেষ দুর্গতি ও নৈরাশ্যের মধ্যে মহিমময় অতীতকে স্মরণ করাইয়া আশা ও উদ্যমে আমাদের জীবন সঞ্জীবিত" করিয়াছিলেন তিনি। ইংরেজ ঐতিহাসিক বর্ণিত আমাদের অনৈক্য ও অপদার্থতার পরিচয় পরীক্ষা করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়াছিল বলিয়া আচার্য্য যদুনাথের "ইতিহাস-অনুশীলন কার্য্যকে" আমরা এরূপভাবে মন-প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাঁহার পূর্ব্বজগণের মধ্যে পশ্চিম-ভারতের মহাদেও গোবিন্দ রাণাডে ও রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকারের নাম করা যায়; বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম স্মরণীয়। তাঁহার অনু-প্রেরণায় ও শিক্ষায় যে "শাখা" বা শিষ্যমণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা আমাদের পূর্ব্ব-ইতিহাসের উপর আলোকপাত করিতে পারিবে, এই ভরসা আমরা করিতে পারি। কুশলী গুরুর কুশলী শিষ্য তাঁহারা।

বাংলাদেশের বাহিরে কর্ম্ম-জীবন কাটাইয়াও আচার্য্য যদুনাথ বঙ্গবাণীর সেবায় অকুণ্ঠ ছিলেন; আজিও বার্দ্ধক্য-কালে "মনের তারুণ্য সতেজ" আছে। সেই সেবার পরিচয় দিবার যোগ্য অধিকারী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ। প্রাণের আবেগে সেই স্বীকৃতি করিয়াছেন পরিষদ,—

> সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে তুমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়াছ, নিজের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রীতির দ্বারা তোমার উত্তরসাধকদের তুমি পথপ্রদর্শক হইয়াছ। তোমার নিরলস কর্ম্মসাধনা আজিও সঙ্কটকালে বার বার পরিষদকে রক্ষা করিতেছে, রমেশচন্দ্র জগদীশ-চন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র হরপ্রসাদ রামেন্দ্রসুন্দর হীরেন্দ্রনাথের দ্বারা তুমিই বহু ক্লেশে অব্যাহত রাখিয়াছ, তোমাকে আমরা কিছুতেই অবসর দিতে পারিতেছি না, অসহায়ভাবে বার বার তোমাকে আশ্রয় করিতে চাহিতেছি,..."

এই উৎসব উপলক্ষে আচার্য্যদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাপঞ্জী সবলিত একখানি পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে আচার্য্যদেবের জ্ঞানসাধকোচিত জীবনের নানা প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়; ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসু ইহার মধ্যে নিজের যাত্রাপথে অনেক অঙ্গুলিনির্দ্দেশ দেখিতে পাইবেন। কত সংবাদপত্রের আনাচে-কানাচে তাহা পড়িয়া আছে; দুই দিন পরে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইত না। এই পুস্তিকাখানিতে তার একটি সংগ্রহ মুদ্রিত হইল; দূর কালের জন্যও স্থায়িত্বলাভ করিল।

ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের ত্রিনবতিতম জন্মদিবস

ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের ত্রিনবতিতম জন্মদিবস উদ্‌যাপনের আয়োজন হইতেছে ইহা সুখের বিষয়। বাংলার যে সব সন্তান বুকের রক্ত চিরিয়া স্বদেশী মন্ত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং আজীবন স্ব স্ব ক্ষেত্রে পরম নিষ্ঠার সহিত স্বদেশের সেবায় আপনার সকল শক্তি নিয়োজিত রাখিয়াছেন, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস তাঁহাদেরই একজন। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে :

শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের বয়ঃক্রম বর্ত্তমানে ৯৩ (?)। স্বল্পায়ু বাঙালী সমাজে এরূপ দীর্ঘজীবন লাভই পরম গৌরব। তদুপরি বিশেষ স্মরণযোগ্য এই যে, তাঁহার এই দীর্ঘজীবন দেশ ও দশের কল্যাণে পূর্ব্বাপর নিয়োজিত। এই আত্মভোলা, বর্ষীয়ান লোকসেবীকে সম্মান প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে তাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষ রূপায়িত আদর্শে আস্থা জ্ঞাপন মাত্র। অন্ধকার দিনে ইহার উপযোগিতা, এবং প্রয়োজন অবিসংবাদিত, তাই শ্রীহট্ট সম্মিলনী যথোচিত উপচারে তাঁহার ত্রিনবতিতম (?) জন্মবর্ষ উদ্‌যাপনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমরা সানন্দে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। ডাঃ সুন্দরীমোহনের গুণমুগ্ধ লোকের অভাব নাই। তাঁহাদের সকলকেই এই অনুষ্ঠানে সর্ব্বাঙ্গীণ সাহায্য দানের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। যোগাযোগ স্থাপনের কেন্দ্র : বঙ্গবাসী কলেজ-সংলগ্ন আচার্য্য গিরীশচন্দ্র ছাত্রাবাস, ৩৫ স্কট লেন, কলিকাতা—৯। কার্য্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা শ্রীমতী মাধুরী ভট্টাচার্য্য।

তেজ বাহাদুর সাপ্রু

ভারতবর্ষের আর একজন মনস্বী-প্রধান দেহত্যাগ করিলেন। প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে এলাহাবাদের তেজ বাহাদুর সাপ্রুর তিরোধানে ভারতরাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। সত্যজগতময় আইনজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। দেশের রাজনীতিক জীবনে আপোষরফা করিয়া তিনি ছিলেন রাজনীতিক অধিকার আদায় করিবার পন্থায় বিশ্বাসী। যে উগ্র জাতীয়তা-বাদ ১৯০৫ সনে বাংলাদেশের হৃদয় হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল তিনি তাহার বিরোধী ছিলেন। সেইজন্য তিনি গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত অহিংস সংগ্রামেও যোগদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখনই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদ রণ-ক্লান্ত হইয়াছে, তখনই তেজ বাহাদুর সাপ্রু শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। গান্ধী-আরউইন সন্ধি তাঁহার এইরূপ চেষ্টার সাফল্যের প্রমাণ।

যুক্তপ্রদেশের সামাজিক জীবনে তেজ বাহাদুর সাপ্রুর প্রভাব শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। এই সমাজের এক স্তরে মুসলীম সংস্কৃতির অনুশীলন হইত এবং এই প্রচেষ্টার ফলে হিন্দু-মুসলীম সংস্কৃতির সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, এই প্রদেশের মুসলমান প্রধানগণই "দ্বি-জাতি" তত্ত্বের বেদীমূলে নিজের স্বার্থ ও দেশের স্বার্থ বলি দিয়াছেন। তেজ বাহাদুর এই সমন্বয়-প্রচেষ্টার প্রধান তত্ত্ব-ধারকদের মধ্যে একজন ছিলেন।

সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে পূর্ব প্রবন্ধে সিন্ধুধর্মের কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই। উহাতে মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা ও বেলুচীস্থানের তাম্রযুগের স্তূপ হইতে প্রাপ্ত পোড়া মাটির স্ত্রীমূর্তিগুলি স্ত্রীদেবতা অথবা দেবীর বিভিন্ন রূপের প্রতিমা, স্যর জন মার্শালের এই মতবাদের বিস্তারিত সমালোচনা মাত্র করা হইয়াছে। স্যর জন মার্শালের মতবাদ সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার পর প্রশ্ন উঠে, এইরূপ দুর্বল ভিত্তির উপর যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত তাহা কি কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

স্যর জন মার্শালের প্রচারিত এই মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহার দুইটি দিক আছে। সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানে প্রাপ্ত স্ত্রী মূর্তিগুলি যে স্ত্রীদেবতার মূর্তি, ইহা একটি দিক। এই মূর্তিগুলিকে স্ত্রী দেবতার মূর্তি বলিয়া স্বীকার করিলে প্রমাণ হইল যে সিন্ধুজাতি স্ত্রীদেবতার উপাসক ছিল। তারপরে বলা হইয়াছে, এই স্ত্রীমূর্তিগুলি মহাদেবী বা ধরিত্রীদেবীর বিভিন্ন রূপের প্রতিমা। মার্শালের কথায়—"repre-entatives of the local forms of the Great Mother or Great Mother-goddess." এখানে local forms কথাটি মার্শাল হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অবতারবাদ স্মরণ করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন মনে হয়।

> এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
> সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্॥
>
> (চণ্ডী ১২।৩৩)

দেবী নিত্যা হইয়াও পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হইয়া জগতের পরিপালন করিয়া থাকেন। দেবী পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হন বিভিন্নরূপে, বিন্ধ্যবাসিনী, শাকম্ভরী, শতাক্ষী, দুর্গা, ভীমা দেবী, ভ্রামরী তাঁহার বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন নামে, রূপে ও উদ্দেশ্যে দেবীর পূজা হিন্দুদিগের মধ্যে অতি পরিচিত ব্যাপার। দুর্গা কখন জগদ্ধাত্রী, কখন অন্নপূর্ণা, কখন মহিষমর্দ্দিনীরূপে পূজিতা। ইহা ছাড়াও দেখা যায় বিভিন্ন অঞ্চলে পূজিতা স্ত্রীদেবতাকে দেবীর অংশ বা একটি রূপ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কনক দুর্গা, জয় দুর্গা, বন দুর্গা, আর্য দুর্গা, শাস্তা দুর্গা, পাদ দুর্গা, নব দুর্গা, বিজয়া দুর্গা, গুপ্ত দুর্গা, আল দুর্গা, কাব্য দুর্গা,—ইহাদের প্রকৃত কুলশীল অনেকাংশে অজ্ঞাত হইলেও সকলেই দুর্গার অংশ রূপে পূজিতা। ইহারাই local forms of the Devi। সে যাহা হউক, যখন সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রীমূর্তিগুলিকে দেবীর এই প্রকার অংশ রূপে পূজিতা দেবী বা মাতাগণের প্রতিমা বলা হইতেছে তখন স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে যে সিন্ধু ধর্মে এই সকল দেবী যাঁহার local forms সেইরূপ একজন মহাদেবীও পূজিতা হইতেন। মার্শালের মতবাদের ইহাই দ্বিতীয় দিক।

সমালোচনা করিবার সময় মার্শালের মতবাদের এই দুইটি দিকের পৃথক ভাবে সমালোচনা করা প্রয়োজন। পূর্বের প্রবন্ধে প্রধানতঃ প্রথমদিকটির সমালোচনা করা হইয়াছে। এই সমালোচনা প্রসঙ্গে দুইটি যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে। একটি যুক্তি এই যে, এই সকল স্ত্রীমূর্তির মধ্যে এমন কোন চিহ্ন নাই যাহা ধর্মার্থ বা দেবত্ব বোধক। সিন্ধু জাতির ধর্মের পরিচয় দেয় এরূপ বহু সীল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল সীলে খোদিত মূর্তির ও ধর্ম অনুষ্ঠানের (cult practices, rites) দৃশ্যের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ উঠে না। কয়েকটি সীলে স্ত্রীমূর্তিও দেখা যায়। ইহার মধ্যে প্রসিদ্ধ হরাপ্পা সীলিঙের উল্লেখ করা হইয়াছে। বৃক্ষ উপাসনার পরিচয় দেয় এরূপ একটি সীলিঙে স্ত্রী-মূর্তি দেখা যায়। এই সকল স্ত্রীমূর্তির সহিত উল্লিখিত স্ত্রী-মূর্তিগুলির বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই। চক্র, স্বস্তিকা, ত্রিশূল, শৃঙ্গ, নতজানু হইয়া ও হাত উঠাইয়া ভক্তি নিবেদন করিবার ভঙ্গী, পশুবাহন—সিন্ধু ধর্মের ধর্মার্থবোধক এই এই সকল চিহ্ন পরিচিত। উল্লিখিত মূর্তিগুলিতে এমন কোন চিহ্ন বা বিশেষত্ব নাই যাহা হইতে এগুলিকে দেবী-মূর্তি বলা সমীচীন মনে হইতে পারে। পণ্ডিতগণ কর্তৃক পণ্ডিতোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলা হইলেও কতকগুলি মূর্তির কদাকার, বিকৃত নাসিকা ও পক্ষীচঞ্চুর মত মুখ এই সকল মূর্তির দেবত্বের প্রমাণ, এই কথা শুনিয়া লোকে কৌতুক বোধ করিবে।

সমালোচনায় যে দ্বিতীয় যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা parallel finds-এর যুক্তি। আলোচনা প্রসঙ্গে মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মিশর, ঈজিয়ান অঞ্চল ও আনাতোলিয়ায় প্রাচীনযুগে পূজিত বিভিন্ন দেবীকে শিল্পে যে রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সিংহবাহিনী, আয়ুধধারিণী রণদেবী, শস্যগুচ্ছ হস্তে শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে অথবা vulture hood, শৃঙ্গ, মশাল, পদ্ম, সর্প ইত্যাদি ধর্মার্থবোধক পরিচিত চিহ্নের

দ্বারা যাহাদের দেবীত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে সেই সকল মূর্তির সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রী মূর্তিগুলির কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। মার্শাল যখন parallel finds-এর যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন তখন এই সাদৃশ্য বাস্তবিক কতটা দেখা যায় পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই এইরূপ অনুমান না করিয়াও বলা যায় যে উপরে উল্লিখিত দেশগুলির যে সকল দেবীমূর্তির সঙ্গে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না সেই সকল-মূর্তির সঙ্গে সাদৃশ্যের প্রমাণে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের মূর্তিগুলিকে দেবীমূর্তি বলিয়া বর্ণনা করিবার সময় মার্শাল পূর্বগঠিত মত বা সংস্কারের দ্বারা চালিত হইয়াছিলেন। এই পূর্বগঠিত মত কি পরে বলা হইতেছে।

মার্শালের মতবাদের দ্বিতীয় দিকটি সম্বন্ধে পূর্বের প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় নাই। এখানে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে।

সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রীমূর্তিগুলি দেবীমূর্তি বলিয়া স্বীকার না করিলে এই দ্বিতীয় দিকটির অর্থাৎ এই স্ত্রীমূর্তিগুলি মহাদেবীর বিভিন্ন রূপের প্রতিমা, এ কথা উঠে না। কিন্তু এগুলিকে দেবীমূর্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও অন্যত্র মহাদেবীর বা ধরিত্রীদেবীর উপাসনা যে প্রকার documentary evidence বা প্রাচীন লেখনের প্রমাণ এবং আনুষঙ্গিক প্রমাণ হিসাবে নানাবিধ পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে সিন্ধু উপত্যকা বা বেলুচীস্থানে এই দুইটি প্রমাণের কোনটির দ্বারা মহাদেবীর উপাসনার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় নাই। এ অবস্থায় যে সকল স্ত্রীমূর্তি দেবীমূর্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না সেই সকল স্ত্রীমূর্তির প্রমাণে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানে মহাদেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল—এই মত গ্রহণ করা বিপজ্জনক এবং এইরূপ মত প্রচার করা ততোধিক বিপজ্জনক। স্যর জন মার্শালের মত সাবধানী ও সত্যানুসন্ধিৎসু পণ্ডিত যে সকলপ্রকার সাক্ষাৎ ও আনুষঙ্গিক প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও এইরূপ মতবাদ প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই ইহার মূলে রহিয়াছে পূর্বগঠিত মতবাদের প্রভাব। এই পূর্বগঠিত মতবাদের প্রভাবে তাঁহার প্রচারিত মতবাদের অসঙ্গতি ও দৌর্বল্য মার্শালের নজর এড়াইয়া গিয়াছে।

এই পূর্বগঠিত মতবাদ কি দেখা যাউক।

প্রাচীন যুগে মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিশর, ঈজিয়ান অঞ্চল, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে স্ত্রীদেবতার উপাসনার বহুল প্রচার ছিল। শুধু যে নানা প্রকারের ও প্রমাণের সাহায্যে এই তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা নহে, নানা দেশীয় পণ্ডিতগণের দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার ফলে এই উপাসনা সকল অঙ্গ সম্বন্ধে যথাসম্ভব বিস্তারিত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হইয়াছে। তারপর বিভিন্ন স্ত্রীদেবতা যাঁহার অংশরূপে প্রকাশ এইরূপ একজন প্রধানা দেবী বা মহাদেবীর উপাসনা সম্বন্ধেও বিস্তারিত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হইয়াছে। এখন মেসোপটেমিয়া ও ইরাণ হইতে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল বহু স্ত্রীদেবতা ও একজন প্রধানা দেবীর যে উপাসনা অনুমান খ্রীঃ পূঃ ২য় সহস্রক হইতে প্রচলিত ছিল দেখা যায় তাহা যে মেসোপটেমিয়া ও ইরাণের নিকটবর্তী বেলুচীস্থান ও সিন্ধু উপত্যকায় প্রসারিত হইয়াছিল এরূপ কল্পনা করিতে কোন বাধা দেখা যায় না, বরং মনে হয় ইহা খুব সম্ভব ও স্বাভাবিক। সামান্য কোন বাধা থাকিলেও মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধু উপত্যকার সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগের যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার পর এই বাধা টিকিতে পারে না। সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনসমূহ আবিষ্কার হইবার মুহূর্ত হইতে পশ্চিম এশিয়ায় এই সভ্যতার উৎপত্তির মূল অনুসন্ধানের প্রয়াসের সূত্রপাত হইয়াছিল। স্ত্রীমূর্তিগুলি আবিষ্কার হইবার সময় হইতেই এই মত গঠিত হইয়া গিয়াছিল যে এগুলি পশ্চিম এশিয়ায় প্রাচীনযুগে পূজিত দেবীমূর্তির সিন্ধু-সংস্করণ মাত্র। ইহার পরে যখন দেখা যায় বেলুচীস্থানের একশ্রেণীর কদাকার স্ত্রীমূর্তিকে proto-type of Kali বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তখন আর বিস্ময়ের অবকাশ থাকে না। সিন্ধু ধর্মের নানা অঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যাখ্যার যাহাতে সমর্থন পাওয়া যায় বিশাল হিন্দু পুরাণ সাহিত্য হইতে সেই প্রকারের টুকিটাকি উদ্ধার করিতে পণ্ডিতগণ বিস্ময়কর নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সিন্ধু উপত্যকার একটি সীলে (No. 279) দেখা যায় একটি মহিষের নাকের উপর পা উঠাইয়া একটি মনুষ্য মূর্তি এক হাতে উহার একটি শৃঙ্গ ধরিয়াছে এবং অপর হাতে একটি বর্শার (a spear with a barbed point) দ্বারা মহিষের পৃষ্ঠে আঘাত করিতে উদ্যত। মহিষ, বিশেষ গঠনের বর্শা ও মনুষ্য মূর্তির সমাবেশ। একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এই দৃশ্যের ব্যাখ্যা করিলেন শিব ও অন্যান্য দেবতা মিলিয়া মহিষাসুরকে আক্রমণ করিতেছেন। এই ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়া অপর একজন পণ্ডিত স্কন্দপুরাণ হইতে একটি কাহিনী উদ্ধার করিলেন শিবের অনুচরগণ ও দেবতারা মহিষাসুরকে হত্যা করিতেছেন। ইহা যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়াতে চণ্ডী হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে দেবী মহাসুরকে পাদপীড়ন করিয়া শূল দ্বারা তাহাকে তাড়না করিলেন। ততঃ মহাসুরং পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ। কোথায় খ্রীষ্ট জন্মের

তিন হাজার বৎসর পূর্বের সিন্ধু উপত্যকার সীলে মহিষ শিকারের দৃশ্য আর কোথায় চণ্ডী কর্তৃক মহিষাসুর বধের পৌরাণিক কাহিনী।

মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিশর, ঈজিয়ান অঞ্চল, এশিয়া মাইনরে দেখা যায় একজন প্রধানা দেবী পূজিতা হইতেন। বিভিন্ন দেশে পূজিত এই সকল প্রধানা দেবীর কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। ডি, জি, হগার্থের রচনা হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া মার্শাল এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল বুঝাইতে চাহিয়াছেন:

"In Punic Africa she is Tanit and her son; in Egypt Isis with Horus; in Phoenicia Astoreth with Tammuz (Adonis); in Asia Minor Kybele with Attis (Saberuz); in Greece Rhea with Young Zeus. Everywhere she is unwed, but made the mother, first of her companion by immaculate conception, and then of the gods and all life by the embrace of her son. In memory of these original facts her cult . . is marked by various practices and observance symbolic of the negation of true marriage and obliterations of sex. A part of her male votaries were castrated and her female votaries must ignore their married state, when in personal service, and after practise ceremonial promiscuity."

উপরের তালিকার সঙ্গে ইরাণের আনাহিতা ও মিথ মেসোপটেমিয়ার ইন্নিনী-ইস্তার ও তামুজ, কাপাডোসিয়ার আরিন্নার দেবী ও মাহ্, এবং সিরিয়ার আতরগাতিস ও তাঁহাদের সঙ্গী কিশোর দেব যোগ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া আরও দেখা যায়, বিশেষ ভাবে সুমেরো-বাবিলোনীয় ধর্মে, প্রধানা দেবী, যিনি দেবগণের মাতা ও সকল বস্তুর মাতা (Mother of the gods, Mother of all things) তিনি আবার অংশরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। কখন তিনি শস্যের অধিষ্ঠাত্রী, কখন নদী বা উৎসের দেবী, কখন যুদ্ধের দেবী, কখন প্রসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কখন আরোগ্যের দেবী।

সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রীমূর্তিগুলিকে দেবী মূর্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার পরে বিনা দ্বিধায় বলা হইয়াছে এই মূর্তিগুলি represent the Great Mother or Nature Goddess. এই মহাদেবীর উপাসনার উৎপত্তি হইয়াছিল মেসোপটেমিয়ায় বা আনাতোলিয়ায়। যে সকল তথ্যের সাহায্যে পশ্চিম এশিয়ায় এই উপাসনার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে উপরে এই উপাসনার যে সকল বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইল, সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানে সেই সকল তথ্যের সম্পূর্ণ অভাব, সেই সকল বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক কোন লুপ্ত নিদর্শনের উদ্ধার হয় নাই; কিন্তু এই সহজ, স্পষ্ট সত্য পণ্ডিতগণকে সংযত করিতে পারে নাই।

সুতরাং সিন্ধু ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, এই ব্যাখ্যা পূর্বগঠিত মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত, এই ব্যাখ্যা সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত ও উপযুক্তরূপে পরীক্ষিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সিন্ধু লেখনের পাঠোদ্ধারের ফলে নূতন লিখিত প্রমাণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রীমূর্তিগুলি যে দেবী মূর্তি এবং মহাদেবীর বিভিন্ন রূপের প্রতিমা—এই মতবাদ অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

এ পর্যন্ত যে সকল স্ত্রীমূর্তির সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত আর কোন স্ত্রীমূর্তি যাহা দেবীমূর্তি বলিয়া মনে হইতে পারে, সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গিয়াছে কিনা দেখা প্রয়োজন।

সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের পোড়ামাটির স্ত্রীমূর্তিগুলি বাদ দিলে মাত্র কয়েকটি সীলিঙে স্ত্রীমূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পুরুষ-মূর্তির তুলনায় স্ত্রীমূর্তির সংখ্যা খুব অল্পই বলিতে হয়। সীলিঙে যে স্ত্রীমূর্তিগুলি দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি যে দেবীমূর্তি বলিয়া মনে করা হইত তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। এখানে দুইটি সীলিঙের উল্লেখ করা হইতেছে। এই দুইটি সীলিঙের নারীমূর্তি বৌদ্ধ আমলের রিলিজিয়াস আর্ট স্মরণ করাইয়া দেয়। এই দুইটি সীলিং হইতে যতটা জানিতে পারা যায় তাহা হইতে মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় স্ত্রীদেবতার উপাসনার বহুল প্রচার ছিল একথা বলা সম্ভব হয় না।

প্রথমে হরাপ্পার একটি প্রসিদ্ধ সীলিঙের (M.I.C. P LXII 12) উল্লেখ করা হইতেছে।

হরাপ্পা সীলিঙের প্রসঙ্গে মার্শাল বলিতেছেন,—

"The cult of the Mother Earth is evidenced by a remarkable sealing from Harappa on which a nude female figure is depicted upside down with legs apart and a plant issuing from her womb."

মার্শাল হরাপ্পা সীলিঙের স্ত্রীমূর্তিকে ধরিত্রীদেবীর প্রতিমূর্তি বলিতেছেন এবং এই প্রকারের মূর্তির সাদৃশ্য পাইয়াছেন পশ্চিম এশিয়ায় নহে, ভারতবর্ষের গুপ্ত আমলের একটি টেরাকোটা রিলিফের সহিত (A.S.R. 1911-12 PL XIII, 40)। কিন্তু এই রিলিফের স্ত্রীমূর্তির অবস্থান ভিন্ন এবং মূর্তির স্কন্ধদেশ হইতে একটি পদ্ম বাহির হইয়াছে।

সীলিঙের অপর দিকে একটি পুরুষ ও স্ত্রীমূর্তি। পুরুষ মূর্তিটি দাঁড়াইয়া আছে, ডান হাতে কাস্তের মত একটি অস্ত্র। স্ত্রীমূর্তিটি উপবিষ্ট, প্রার্থনার ভঙ্গীতে তাহার দুই

হাত উপরে তুলিয়া আছে। মার্শালের ব্যাখ্যা এই যে পুরুষটি স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করিতে উদ্যত :

"And it is reasonable to suppose that the scene is intended to portray a human sacrifice connected with the earth-goddess depicted on the other side."

অর্থাৎ ধরিত্রীদেবীর তৃপ্তির জন্য নরবলি দিবার প্রথার পরিচয় এই দৃশ্যে পাওয়া যাইতেছে। সীলিঙের যে পৃষ্ঠে ধরিত্রীদেবীর মূর্তি আছে সেই পৃষ্ঠের বাম দিকে দেখা যায় দুইটি ব্যাঘ্র পরস্পরের দিকে চাহিয়া আছে। মার্শালের ব্যাখ্যা মতে এই ব্যাঘ্র দুইটি দেবীর animal ministrants, বাহন নহে, পুরোহিত বা পাণ্ডা।

ইহা সৌভাগ্যের বিষয় যে, হরাপ্পা সীলিঙের চিত্র হইতে শিল্পীর বক্তব্য অর্থাৎ কাহিনীটি বুঝিতে পারা যায়। এই হিসাবে সীলিঙের সাক্ষ্য মূল্যবান ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। খোদিত দৃশ্য যে ধর্মার্থবোধক তাহাতে সন্দেহ নাই। যে স্ত্রীমূর্তির উদর হইতে বৃক্ষ নির্গত হইতেছে তাহা যে বৃক্ষ বা উদ্ভিদের প্রসবিনী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে (Vegetation goddess) কল্পিত তাহা সহজে অনুমান করা যায়। এই দেবীর অনুচর বা বাহন রূপে দুইটি ব্যাঘ্রও দেখা যায়। সীলিঙের অপর পৃষ্ঠের দৃশ্যটিকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি কামনায় নরবলির অনুষ্ঠানের দৃশ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি হয় না। কারণ পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য নরবলির প্রথা অতি প্রাচীন ও পরিচিত প্রথা। সিন্ধুধর্মে উদ্ভিদ প্রসবিত্রী ধরিত্রী দেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল—এই সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে একটি মাত্র বাধা দেখা যায়। সে বাধা এই যে, মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা ও বেলুচিস্থানে যে শত শত তাম্রযুগের নিদর্শন আবিষ্কার হইয়াছে তাহার মধ্যে হরাপ্পা সীলিঙের অনুরূপ সীলিং আর একটিও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। ফলে এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে এই সীলিংটি বিদেশ হইতে আনীত কিনা।

কিশ এবং মধ্য ও উত্তর সুমেরের লাগাস হইতে আক্ষক (Akshak) পর্যন্ত অঞ্চলে প্রচলিত ধরিত্রী মাতার উপাসনা ও উহার বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় এবং ধরিত্রী মাতার যে সকল প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত হরাপ্পা সীলিঙের তুলনা করিলে দুইটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, নিপ্পুরে ধরিত্রীমাতার উপাসনা যে উন্নত স্তরে উঠিয়াছিল সেই স্তরে উঠিবার পূর্বে বিভিন্ন রূপে ধরিত্রী দেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। গেষ্টুন ছিল দ্রাক্ষার অধিষ্ঠাত্রী। নিন্দুরা শস্যের অধিষ্ঠাত্রী। উম্মা পক্ক শস্যের অধিষ্ঠাত্রী, বাউগুলা শস্যের ও প্রসবের অধিষ্ঠাত্রী। ধরিত্রী দেবীকে এই বিভিন্ন রূপে ও মূর্তিতে উপাসনাকে departmentalised worship of the Earth-Mother বলা যায়। ধরিত্রী মাতার এই সকল বিভিন্ন রূপ যাঁহার মধ্যে মিলিত হইয়াছে নিপ্পুরে সেই ধরিত্রী দেবীর উপাসনা হইত। এই হিসাবে হরাপ্পার সীলিঙে যে ধরিত্রী দেবী দেখা যায় তাহাকে departmental goddess of vegetation বলা যায়। সকলের পূজনীয়া মাতা মহী, স্থাবর জঙ্গম সকল প্রজার মাতা পৃথিবী, ভুবনের রাজ্ঞী পৃথিবী (ঋগ্বেদ)—ধরিত্রী মাতার এই সর্বব্যাপক রূপের কল্পনার আভাস এই উদ্ভিদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কল্পনার মধ্যে নাই। দ্বিতীয় লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সুসা ও মেসোপটেমিয়ায় ধরিত্রী দেবীর বিভিন্ন রূপের সঙ্গে সর্পের উপস্থিতি দেখা যায়। সর্পের সঙ্গে জীবনীশক্তির বা উৎপাদিকা শক্তির সম্পর্ক বহু ধর্মে দেখা যায়। সিন্ধু উপত্যকার নিদর্শনসমূহের মধ্যে কয়েকটি সীলে সর্পের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিন্তু উদ্ভিদের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর উপাসনার সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক নাই।

সে যাহা হউক, হরাপ্পা সীলিঙে উদ্ভিদের উৎপাদিকা শক্তিরূপে ধরিত্রীর যে রূপ দেখা যায় তাহার সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার ধরিত্রী দেবীর বিভিন্ন রূপের কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। সুতরাং হরাপ্পা সীলিং বৈদেশিক আমদানী না হওয়াই সম্ভব।

এখন মোহেঞ্জোদারোর একটি সীলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সীলে (M.I.C. Vol 1, ptc. XII—18) দেখা যায় একটি দীর্ঘকেশা নগ্ন স্ত্রীমূর্তি একটি বৃক্ষের দুইটি শাখার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। বৃক্ষটির পাতা দেখিয়া উহাকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলিয়া মনে হয়। মূর্তির মাথার দুই পার্শ্ব হইতে দুইটি শৃঙ্গ উঠিয়াছে, শৃঙ্গের মধ্যে পাতাসমেত ছোট একটি ডাল। এই স্ত্রীমূর্তির সম্মুখে একটি মনুষ্য মূর্তি ভক্তি নিবেদন করিবার ভঙ্গীতে (half-kneeling) অবস্থিত, সম্ভবতঃ উপাসক। তাহার মাথায় লম্বা চুল, দুইটি শৃঙ্গ ও শৃঙ্গের মধ্যে পাতাসমেত ছোট ডাল। তাহার পশ্চাতে একটি মানুষের মুখযুক্ত ছাগল দণ্ডায়মান। ইহার নীচে এক সারিতে সাতটি পুরুষ মূর্তি, পরনে হাঁটু অবধি ঝুলের ঘাগরা (short kilts), লম্বা বিনুনী (long pigtails) মাথার চুলে পাতা বা পালক। অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে একটি চতুষ্কোণ পাত্র (square partitioned receptacle)। নতজানু ভক্তের সম্মুখে অবস্থিত দীর্ঘকেশ, নগ্ন স্ত্রীমূর্তি যে উপাস্য দেবীমূর্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। মনুষ্যমুখ ছাগলকে মার্শাল protecting local divinity of a minor

type বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নীচের সাতটি পুরুষ মূর্তিকে ভক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

মোহেঞ্জোদারোর এই সীলটিকে সিন্ধুধর্মে বৃক্ষ উপাসনার একটি দৃষ্টান্ত বলা হইয়াছে। কতকগুলি সীলে বৃক্ষ, তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় উপাস্য। এই সীলটিতে tree spirit বা বৃক্ষসত্বা স্ত্রীরূপে কল্পিত ও রূপায়িত হইয়াছে। Tree spirit পুরুষরূপে কল্পিত হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার কয়েকটি সীলে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং বৃক্ষসত্বার স্ত্রীরূপে কল্পিত হইবার একটি দৃষ্টান্তের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা অনাবশ্যক।

মোহেঞ্জোদারোর এই সীলে খোদিত স্ত্রী-দেবতার মূর্তি ও অন্যান্য মূর্তি সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় ভারুত ও সাঁচীর কতকগুলি দৃশ্যের সঙ্গে এই সীলে খোদিত দৃশ্যের সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য এত নিকট যে চমকিত হইতে হয়। শুধু বৃক্ষশাখার অন্তরালে অবস্থিত স্ত্রীমূর্তি নহে, খাট ঘাগরা ও লম্বা বিনুনীসমেত পুরুষ মূর্তি ভারুত, সাঁচী ও অমরাবতীতে পাওয়া যায়। মার্শাল এই সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সিন্ধু উপত্যকার বৃক্ষপূজার নিদর্শন এবং পরবর্তী কালের (ভারুত ও সাঁচীর) নিদর্শনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পরবর্তীকালের নিদর্শনগুলি ট্রি-স্পিরিট যক্ষিণী বা যোগিনী রূপে কল্পিত আর সিন্ধু উপত্যকার নিদর্শনে দেবীরূপে কল্পিত। ইহার পর মার্শাল মত প্রকাশ করিয়াছেন :

"Tree-worship was essentially a characteristic of the pre-Aryan, not of the Aryan population."

এই ধরণের মত প্রকাশ করিবার সার্থকতা বা প্রাসঙ্গিকতা কি, বুঝা কঠিন। সিন্ধুধর্মে বৃক্ষ উপাসনার নিদর্শনগুলিতে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ এক জাতীয় বৃক্ষ প্রাধান্য পাইয়াছে এবং এ বৃক্ষ অশ্বত্থ। বৃক্ষ উপাসনার কেন্দ্ররূপে এই এক জাতীয় বৃক্ষ কেন সিন্ধুযুগে, বৈদিকযুগে, বৌদ্ধযুগে ও পৌরাণিক যুগে প্রাধান্য লাভ করিল (লেখকের *A Pre-historic Tree Cult*—Indian Historical Quarterly, Vol. XIX, 1943 দ্রষ্টব্য) এবং ইহার কি তাৎপর্য হইতে পারে তাহা অনুসন্ধান না করিয়া বৃক্ষ উপাসনার উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা এখানে পণ্ডশ্রম মাত্র এবং নিরর্থক। তার পর বৌদ্ধ শিল্পের সঙ্গে সাদৃশ্যের তাৎপর্য মার্শাল একপ্রকার উপেক্ষা করিয়াছেন, যদিও ইহা উপেক্ষা করিবার মত গুরুত্বহীন বিষয় নহে।

সে যাহা হউক, সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনার পরিচায়ক বিশেষ আর কোন নিদর্শনের উল্লেখ করা হয় নাই। এখানে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। পুরুষ ও স্ত্রীদেবতা একসঙ্গে দেখা যায় এরূপ কোন সীল বা আর কোন নিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। সিন্ধুধর্মে পুরুষ দেবতার সংখ্যা প্রবল স্ত্রীদেবতার সংখ্যা নগণ্য। নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের সঙ্গে (cult scenes) পুরুষ দেবতাদিগকে সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। স্ত্রীদেবতাকে মাত্র দুইটি অনুষ্ঠানের দৃশ্যে দেখা যায়। এই দুইটির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। অনুষ্ঠানের দৃশ্যগুলিতে ভক্ত বা উপাসকদিগের মধ্যেও স্ত্রীজাতিকে বিশেষ দেখা যায় না।

মনুষ্যমূর্তিতে কল্পিত স্ত্রীদেবতার উপাসনার প্রসঙ্গ ছাড়িয়া এখন অন্য এক শ্রেণীর নিদর্শনের উল্লেখ করা হইতেছে। এইগুলিকে স্ত্রীদেবতার উপাসনার পরিচায়ক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় কতকগুলি নানা আকারের রিং ষ্টোন (ring stone) বা আংটি বা চাকার মত জিনিস পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি চার ফুট হইতে চার ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট। বড় চাকাগুলি পাথরের, ছোটগুলি শাঁখের, পোরসিলেনের, নকল কার্নেলিয়ানের এবং পাথরের। (M.I.C. Vol I. Pl. XIII-9-12, XIV. 6-8)। মার্শালের ব্যাখ্যা অনুসারে এগুলি যোনির প্রতিমূর্তি। তিনি মনে করেন সিন্ধুধর্মে লিঙ্গ ও যোনি উপাসনা প্রচলিত ছিল। তাঁহার এই ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি মালাবার পয়েন্টের শ্রীগুণ্ডি প্রস্তর, তক্ষশীলায় প্রাপ্ত মৌর্য আমলের কতকগুলি আংটি বা চাকা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৌদ্ধশিল্পে এইগুলির অনুকরণ করা হইয়াছিল। শাক্ততন্ত্রের শ্রীচক্রের সঙ্গে তিনি মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার আংটিগুলির তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত,

"We are justified in supposing that the ringstones found at Mohenjo Daro may have the same cultural, fetish or magical significance that the ring stones of a later date had."

কিন্তু cultural, fetish or magical significance বলিয়া চাকাগুলির তাৎপর্যের লম্বা ফিরিস্তি দিলেও এই গোলযোগ থাকিয়া যায় যে, পরবর্তীকালের নিদর্শনগুলির তাৎপর্য কি ছিল তাহাই পরিষ্কার নহে। বলা বাহুল্য, সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে মার্শাল যে মত পোষণ করেন এই আংটিগুলির তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাখ্যা সেই মতের পরিপোষক। অপর একজন পণ্ডিত মার্শালের ব্যাখ্যার সমর্থনে এই যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন যে, মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় বহু লিঙ্গ মূর্তি (Phalli) পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং এই চাকাগুলির তাৎপর্য সম্বন্ধে মার্শাল যে ব্যাখ্যা

দিয়াছেন তাহাই সম্ভবতঃ ঠিক। এই লিঙ্গমূর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে পরে আলোচনা হইবে।

তক্ষশীলার মৌর্য আমলের চাকাগুলির উল্লেখ করিয়া মার্শাল বলিয়াছেন,—

"In these ring stones nude figures of a goddess of fertility are engraved inside the central hole, thus indicating in a manner that can be hardly mistaken the connection between them and the female principle."

তক্ষশীলার এই চাকাগুলির উপরে নানাপ্রকার কাল্পনিক দৃশ্য খোদিত দেখা যায়। এই সকল দৃশ্য হইতে চাকাগুলি কি কাজে ব্যবহৃত হইত তাহা বুঝা যায় না। ভীর স্তূপ হামিলায় প্রাপ্ত চাকাগুলি যে সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত চাকাগুলি হইতে ভিন্ন তাহা মার্শালের নিজের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় (A. S. I. 1927—28 p 66)। তার পর স্ত্রীমূর্ত্তি নগ্ন হইলেই তাহাকে goddess of fertility বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রবৃত্তি ভারতবর্ষীয় ধর্মসমূহের ইউরোপীয় ব্যাখ্যাতাদিগের মধ্যে অসম্বরণীয় দেখা যায়। অথচ বৌদ্ধ আমল হইতে ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শনগুলিতে স্ত্রী-মূর্ত্তি মাত্র নগ্ন বা অর্দ্ধনগ্ন।

সে যাহা হউক, পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, তক্ষশীলা, রাজঘাট, কোশামের প্রস্তরের চাকাগুলি (discs) সিন্ধু উপত্যকায় উল্লিখিত রিং ষ্টোন হইতে ভিন্ন ধরণের এবং তাঁহার ব্যাখ্যার সমর্থনের জন্য মার্শাল এইগুলি অপেক্ষা সাধারণে প্রচলিত কতকগুলি সংস্কার যেমন শ্রীগুণ্ডির প্রস্তর সম্পর্কে, এবং তান্ত্রিক চক্র, যন্ত্র, মণ্ডল প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণে পরিচিত তাৎপর্যের উপর অধিক নির্ভর করিয়াছেন। তান্ত্রিক, চক্র, যন্ত্র প্রভৃতির তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা এখানে অবান্তর, কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে শাক্ত তন্ত্রমতে ছিদ্রযুক্ত চক্র যোনির প্রতীক নহে, ত্রিকোণ যোনির প্রতীক। সাধারণে প্রচলিত সংস্কারের উপর মার্শাল অকারণে বেশী জোর দিয়াছেন, শাস্ত্রে এই ধরণের সংস্কারের স্থান নাই। শ্রীগুণ্ডি বা শত্রুঞ্জয়ের ছিদ্রযুক্ত বৃহৎ পাথরের চাকাকে যোনি বলিয়া বিশ্বাস এবং অশোকের স্থাপিত স্তম্ভকে শিবলিঙ্গ বিশ্বাসে পূজা, এই দুইটি সংস্কারের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এবং এই দুইটি সংস্কারের প্রকৃত কোন ভিত্তি নাই।

এই চাকাগুলির তাৎপর্যের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে।

জোহির (সিন্ধু দেশ) টাণ্ডো রহিম খাঁ স্তূপের মধ্যে একটি ছিদ্রযুক্ত গোল পাথরের চাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহা মোহেঞ্জোদারোর চাকাগুলির অনুরূপ। আবিষ্কর্তা ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে ইহা door socket। দয়ারাম সাহনী হরাপ্পায় কতকগুলি অসমান পাথরের চাকা বা আংটি পাইয়াছেন। তিনি এগুলির কোন ধর্মসংক্রান্ত তাৎপর্য আছে মনে করেন না। অন্যত্র প্রাপ্ত ঐরূপ আরও কতকগুলি চাকা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "what purpose they served remains a mystery (A.R. of A.S.I. 19 3-24, p. 53)। হরাপ্পার (main trench) চতুর্থ স্তরে এক-স্থানে প্রচুর পরিমাণে এইরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির কোন ধর্মসংক্রান্ত তাৎপর্য আছে বলা হয় নাই। চক্রধরপুরের (ছোটনাগপুর) নিকটে একটি প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার কেন্দ্রে (pre-historic site) এইরূপ পাথরের চাকার অংশ পাওয়া গিয়াছে। বলা হইয়াছে, "it was used for weighing a digging stick," অর্থাৎ এই চাকা মাটি খুঁড়িবার যন্ত্রের মাথায় পরাইয়া দেওয়া হইত। মিঃ ফ্রুসফুট দক্ষিণ-ভারতের কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের বসতি স্থান হইতে অনুরূপ ছিদ্রযুক্ত পাথরের চাকা উদ্ধার করিয়াছেন। ঐগুলি ডিস বা প্লেটের কাজে ব্যবহার করা হইত বলা হইয়াছে।

শাঁখ, পোর্সিলেন ও পাথরের ছোট আংটিগুলি মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করা হইত কেহ কেহ ইহা বলিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত বড়গুলি তাঁত বুননীর লাটাই (spinning whorl) রূপে ব্যবহৃত হইত বলা হইয়াছে। ছিদ্রযুক্ত বড় পাথরের চাকাগুলি সম্ভবতঃ স্থাপত্য কার্যে ব্যবহার করা হইত বলা হইয়াছে।

মার্শাল যে সকল যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন অন্য প্রমাণাভাবে শুধু সেই সকল যুক্তির বলে, মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় পোর্সিলেন, শাঁখ ও পাথরের আংটি বা চাকা-গুলিকে যোনির প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা মার্শালের ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। এই ব্যাখ্যার মূলে রহিয়াছে যে পূর্বগঠিত মতবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার প্রভাব।

সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে পূর্বের ও বর্তমান প্রবন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে এই তথ্যে উপনীত হয় যে সিন্ধুধর্মের একাংশ সম্বন্ধে এমন একটি ধারণা সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে সতর্ক ভাবে অনু-সন্ধান করিলে যাহার কোন যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। হিন্দুধর্মে যখন ও যে প্রকারের স্ত্রী-দেবতার উপাসনা রহিয়াছে তাম্রযুগের সিন্ধুধর্মে তাহা সেই

প্রকারে বিদ্যমান ছিল কেহ ইহা বলিলে বেশ আত্মপ্রসাদের ভাব মনে জাগে, মনে হয় সকলে জানুক হিন্দুধর্ম কত প্রাচীন। কিন্তু সিন্ধুধর্মের ব্যাখ্যাকারগণ চিনির প্রলেপ দিয়া অতি তিক্ত বটিকা গলাধঃকরণ করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মতানুসারে দাঁড়ায় হিন্দুধর্মে প্রচলিত স্ত্রীদেবতার উপাসনার উৎপত্তি ভূমধ্যসাগরের তীরে এবং প্রাচীন সেমিটিক ধর্ম হইতে। কি প্রণালীতে এই গলাধঃকরণ-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে দুইটি প্রবন্ধে তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণ সিন্ধুধর্ম হইতে একেবারে পৌরাণিক হিন্দুধর্মে নামিয়া আসিয়াছেন বৈদিক যুগকে ডিঙাইয়া। বৈদিক ধর্মকে তাঁহারা গণনার মধ্যে আনেন নাই; কারণ তাঁহাদের মতে বৈদিক ধর্ম বিদেশ হইতে আগত আর্যদিগের প্রচারিত ধর্ম। প্রাক্-আর্য যুগের সিন্ধুধর্মের স্ত্রীদেবতার উপাসনা এবং এই প্রাক্-আর্য যুগের ধারা বাহিয়া আসিয়াছে হিন্দুধর্মের যে স্ত্রীদেবতার উপাসনা, তাহার সহিত আর্যদিগের কোন সম্পর্ক নাই। স্ত্রীদেবতার উপাসনা করা যেন আর্যদিগের পক্ষে মানহানিকর ব্যাপার! কিন্তু দেখা যায় যে আর্যজাতির প্রাচীনতম দলিল ঋগ্বেদে Great Mother বা Supreme Mother-এর উপাসনা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই Great Mother যিনি পরবর্তীকালে দুর্গা বা দেবী নামে প্রসিদ্ধ তাঁহার উপাসনার ক্রমবিকাশের ধারা ঋগ্বেদ হইতে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের মধ্য দিয়া মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত অনুসরণ করা যায়। সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে মার্শালের প্রচারিত মত অগ্রাহ্য করিলে দেখা যায় সিন্ধুধর্মের সাদৃশ্য পৌরাণিক হিন্দুধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অনেক বেশী। বৈদিক ধর্মের সঙ্গেও সাদৃশ্যের অভাব নাই।

এ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে সিন্ধুধর্মে পুরুষ দেবতার উপাসনা সম্বন্ধে প্রচারিত মতবাদ পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

শরৎচন্দ্র

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

একই আকাশে রবি ও চাঁদের উদয় দেখেছে কেউ,
যে আলো লাগিয়া উথল মনের সাগরে উঠিল ঢেউ,
যে আলো জাগায়, যে আলো আবার নূতন স্বপ্ন আনে?
এমনি লগ্ন একবার আসে যুগান্ত-ব্যবধানে।
নীল নির্মল নভে যে দেখেছি শরৎচন্দ্রোদয়,
আমরা জেনেছি সূর্য্য-শশীর আলোক ভিন্ন নয়।

হে কথাকোবিদ, কে কবে এমন প্রাণের দরদ দিয়া
এঁকেছে মানুষে, সে রূপে হৃদয় উঠেছে উচ্ছ্বসিয়া!
কি সহানুভূতি, মানব-মমতা, কি প্রীতি অপরিমেয়,
ধন্য হয়েছি, নিকটে এসেছি, পেয়েছি তোমার স্নেহ।
মনোদর্পণে হে কবি তোমার সার্থক কল্পনা,
প্রেমের আগুনে পুড়িয়া মানুষ হয়ে যায় খাঁটি সোনা।

সাহিত্য নয় শিল্প শুধুই, জীবন দিয়া সে গড়া,
ব্যথা, অনুভূতি, তীব্র তৃষায়, প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরা।
কে বা অকলুষ, কলঙ্কহীন? মানব-মনের কাছে
পাপ ও পুণ্য, মধু আর বিষ মেশামিশি হয়ে আছে।
কি না সে সহিতে পারে, আর কত সে ভালবাসিতে পারে,
বিশ্বস্রষ্টা বিস্মিত চোখে বুঝি চেয়ে দেখে তারে।
সে শুধু মানুষ, সে নহে দানব, দেবতাও সে ত নয়,
তুমি যে গাহিলে বিচিত্র সেই মানবিকতার জয়।
সমাজ-শাসন, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ বাহ্য এহ,
মন যে মুক্ত, বন্ধনে তারে বাঁধিতে পারে নি কেহ।
রাজভয় আর লোকনিন্দা যে করে নি তোমারে ভীত,
তোমার বাণীর তড়িৎস্পর্শে কারা হ'ল সচকিত!
বন্দীজীবনে চকমিল যে চিন্তা কূলপ্লাবী
স্বাধীন কণ্ঠে ঘোষিলে যে সেই চলার পথের দাবী।
কত বিস্ময়, কত মাধুর্য্য সৃষ্টি-প্রেরণা মাঝে,
বন্ধু, তোমার বাণীর বীণায় জীবন-বেদনা বাজে।
জীবনের কবি, সে কি অপূর্ব্ব মহাশ্মশানের ছবি,
নরমুণ্ডের গেণ্ডুয়া খেলে যেথা মহাভৈরবী।
ধূসর বালুর প্রান্তর ভেদি বহিছে শীর্ণ নদী,
আশেপাশে ফেলে দীর্ঘশ্বাস কান্না যেন নিরবধি;
শকুন-শিশুর কান্না থামে না। তুমি সেথা একা বসি
অমারাত্রির কি রূপ আঁকিলে মনের গোপনে পশি!

সাধারণ মাঝে অসাধারণের সাক্ষাৎ পেলে তুমি,
তাই ত তোমারে অঙ্কে ধরিয়া ধন্য জন্মভূমি।
মানুষ কখনো পতিত হয় না—পতিতপাবন জানে,
সে চিরসত্যে প্রতিষ্ঠিলে কি অপরূপ রূপ-দানে।
চলিতে মানুষ পড়িতে সে পারে, পড়িয়া আবার ওঠে,
ধরায় ধূলি ত মলিন করে না; পঙ্কে পদ্ম ফোটে।

স্নেহে আর প্রেমে মায়া-মমতায় নিখিলচিত্তহারী,
হৃদয়ের পুরে বন্দিনী, তাই চির-বিজয়িনী নারী।
বৈচীর মালা উপহার দিয়া যে হ'ল মানস-বধূ,
তার সেই প্রেম অমর করিতে লেখনীতে ঝরে মধু।
প্রেম তপস্যা, দুঃখ-দাহনে কখনো করে না ভয়,
প্রেমের নিষ্ঠা নারী ও নরের শ্রেষ্ঠ সে পরিচয়।
তোমার আলোর প্লাবনে জীবনে করিল কি রমণীয়,
ভালবাসিয়াছ সকলেরে, তাই তুমি সকলের প্রিয়!
মানবপ্রেমিক তোমার স্মরণে চিত্ত উঠিছে ভরি,
জন্মভূমির স্মৃতির তীর্থে তোমারে প্রণাম করি।*

* দেবানন্দপুরে অনুষ্ঠিত শরৎচন্দ্রের একাদশ স্মৃতি-বার্ষিকী সভায় পঠিত।

প্রবাহ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

১৩

এক মাসের উপর গত হইয়াছে। মৃন্ময় সেই যে আসিয়াছে আর যায় নাই। কতকটা পড়ার চাপে এবং কতকটা নিষ্প্রয়োজন বোধে। সত্যকার দায়িত্ব তার কতটুকু।

মৃন্ময়ের পরীক্ষা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর দুই দিন বাকী। সহসা রুবির জরুরী আহ্বান আসিল। মৃন্ময় জানাইয়া দিল যে, দুই দিনের আগে তার দেখা করিবার সুযোগ হইবে না। কিন্তু দুইটা দিনের ব্যবধান আর কতটুকু! দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল।

ইহার পরে মৃন্ময়কে দেখা গেল রুবিদের বাহিরের ঘরে চিন্তিত মুখে বসিয়া থাকিতে এবং রুবিকে পাওয়া গেল তার পাশে নিঃশব্দে নতমুখে উপবিষ্ট অবস্থায়। রুবিই প্রথমে কথা কহিল, দাদার যে এত বড় অধঃপতন হতে পারে এ কথা কেমন করে ভাবা যায় বলুন ত? তার উপর সাফাই গাইবার কি নির্লজ্জ চেষ্টা দেখুন। রুবি সুনির্ম্মলের লেখা একখানা চিঠি মৃন্ময়ের দিকে আগাইয়া দিল কহিল, পড়ে দেখুন—

মৃন্ময় কহিল, আপনিই পড়ুন—

রুবি সহসা হাত কয়েক পিছাইয়া গিয়া কহিল, ঐ অনুরোধটি আমায় করবেন না। চিঠি রইল। ইচ্ছে হয় পড়ে দেখুন, নইলে ছিঁড়ে ফেলে দিন।

মৃন্ময় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আপনাকে চলে যেতে হবে না রুবি দেবী। বসুন, আমিই না হয় পড়ছি।

চিঠিখানা রুবিকেই লেখা হইয়াছে।

"আমার চলে আসা নিয়ে তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। এখানে আমি কতকটা শান্তিতেই আছি। জীবনে আমি বড় আঘাত পেয়েছি—যার জন্যে তৈরি ছিলাম না। আমার মস্ত বড় দুঃখ যে, যেখানে আমার সবচেয়ে বড় বিশ্বাস ছিল সেখান থেকেই চরম শাস্তি পেয়েছি। আমি লিলির কথা বলছি। তার রূপ আছে, শিক্ষা আছে এবং হয়তো আরও অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু তাকে আমি আর বিশ্বাস করতে পারছি না। পতন যে তার কোন্ পথ ধরে এসেছে তার প্রমাণ সে নিজেই দেবে। যতই তার শিক্ষা-দীক্ষা থাক লিলি বাঙালীর মেয়ে। নিজের আসল সত্তাকে সে কখনই উপেক্ষা করতে পারে নি। তাইতো আমাকে মুক্তির পথ বেছে নিতে হয়েছে। ভরসা করি লিলি তার নিজের জন্যেই আমাকে রেহাই দেবে।

সুনির্ম্মল"

নিজের অজ্ঞাতে মৃন্ময়ের মুখ দিয়া বাহির হইল, স্কাউন্ড্রেল। তারপরেই গভীর নিস্তব্ধতা। এমনি আরও অনেকক্ষণ কাটিল। হয়তো আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইত—সহসা একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া মৃন্ময় শুষ্ক নীরস কণ্ঠে কহিল, যেখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি সেখানে লজ্জা সঙ্কোচ ইত্যাদি স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোকে আমাদের উপেক্ষা করে চলবারই হয়তো প্রয়োজন হবে। একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, এ দুর্ঘটনার জন্ত আপনার দাদাই ষোল আনা দায়ী—এই কি আপনার অভিমত?

রুবি কহিল, এ মতামতের কথা নয় মৃন্ময় বাবু, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি আমার দাদাকেও জানি, আর লিলিদিকেও চিনি।

মৃন্ময় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, দেশে যাইবার পূর্ব্বেকার ঘটনাগুলি তার একে একে মনে পড়িতে লাগিল। যাহা অতি সামান্ত বলিয়া তখন নজরে পড়ে নাই আজ সেই সব অতি তুচ্ছ ঘটনা নূতন রূপ ধরিয়া মৃন্ময়ের মনে এক কূট চক্রান্তের আভাস দিয়া গেল। সুনির্ম্মলের চরিত্রের যে দিকটা আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে একথা ভাবিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, মৃন্ময়কে শেষ পর্য্যন্ত জালে জড়াইবার জন্যই হয়তো সে চতুর্দ্দিক দিয়া আয়োজন করিয়া রাখিতেছিল। কিন্তু সে চেষ্টা তার ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই আজ তার পলাইয়া যাইবার প্রয়োজন হইয়াছে।

রুবি কহিল, কত বড় অন্যায় বলুন দেখি। নিতান্ত মেয়ে-ছেলে বলেই কি এ অন্যায় লিলিদিকে মুখ বুজে সইতে হবে?

মৃন্ময় মনে মনে যাহাই ভাবুক না কেন প্রকাশ্যে তাহার আভাসমাত্রও দিল না। বরং একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিল, আপনি কি আপনার দাদার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে এ অনুযোগ দিচ্ছেন? লিলির সঙ্গে ইতিমধ্যে আপনার দেখা হয়েছে কি?

রুবি উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তীব্র কণ্ঠে কহিল, এর পরেও তাকে কখনও মুখ দেখানো যায় মৃন্ময়বাবু! ক্ষণকাল থামিয়া তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে রুবি বলিয়া চলিল, আমি লিলিদিকে বাঁচাতে চেষ্টা করব। তার সম্ভ্রমকে কিছুতেই ধুলোয় লুটাতে দেব না, দাদার নামে আমি কেস করাব। হোক সে আমার ভাই। তাকে আমি বাধ্য করাব লিলিদিকে গ্রহণ করতে। এ ছেলেখেলা নয়।

মৃন্ময় মৃদু হাসিয়া কহিল, আপনার মন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছে বলেই একথা বলতে পারছেন। আমার বিশ্বাস লিলি আপনার কথায় রাজী হবেন না। তিনি যদি বুদ্ধিমতী হন,

সম্মত হতেও পারেন না। কারণ যে ঘটনাটা চেষ্টা করলে একটা সুনির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে তা ছড়িয়ে পড়বে সর্ব্বত্র, আলোচিত হবে চায়ের দোকানে, জানা-অজানা লোকের মুখে মুখে…

রুবি কহিল, আপনি বলতে চান কি?

মৃন্ময় কহিল, বলতে আমি কিছুই চাই না। তবে আমার বিশ্বাস লিলি তাঁর নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবেন। অন্ততঃ আমাদের চেয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার ঢের বেশী বোঝেন। আমি বলি আপনি একবার লিলির সঙ্গেই বরং দেখা করুন। খামোকা হৈ-চৈ করবেন না। তাতে লিলির ভাল করতে গিয়ে হয়তো মন্দ করে বসবেন।

রুবি পুনরায় রুখিয়া উঠিল। কহিল, আপনি কি বলতে চান যে, এক জনের খামখেয়ালকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে আর একজন অন্যায় এবং অসম্মানের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেবে!

মৃন্ময় শান্ত কণ্ঠে কহিল, তাই যদি হয় তা হলেই বা করবার আছে কি! সামাজিক জীব যখন আমরা।

রুবি কহিল, যে সমাজ মানুষকে মানুষের মত বেঁচে থাকতে সহায়তা করে না তারই দোরগোড়ায় মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবার কিসের প্রয়োজন!

মৃন্ময় কহিল, দেখুন এসব তর্কবিতর্ক এখন না তোলাই ভালো। বর্ত্তমানে আমাদের প্রশ্ন সমাজ নিয়ে নয়; তার চেয়ে দেখুন সত্যি সত্যিই আপনি কিছু করতে পারেন কিনা।

রুবি কহিল, তর্ক করবার প্রবৃত্তি আমারও নেই। কথাটা আপনি তুলেছেন বলেই বললাম। একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিল, সমাজের কথা ছেড়ে দিয়ে তার অন্যায়ের কথাটাই যদি ধরা যায় তা হলেও কি এর প্রতিকার করাটা আপনি অন্যায় মনে করেন?

মৃন্ময় কহিল, আমার মতামত এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তার অন্যায়, ভালমন্দ নিয়েও আমি কিছু বলতে চাই না। মোটের উপর আপনার বক্তব্য এবং কর্ত্তব্য কি সেই কথাই বলুন।

রুবি কহিল, সেই কথাই আমি বলতে চাইছিলাম কিন্তু আপনিই সব গোলমাল করে দিচ্ছেন। অবশ্য এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমার লজ্জা থাকলেও কুণ্ঠিত হওয়া বা দ্বিধা করা উচিত নয়, নইলে আজ দাদার অন্যায় আচরণে আমার মাটির তলায় মুখ লুকোতে হ'ত। দাদার চিঠিখানা আজ সপ্তাহের উপর হ'ল পেয়েছি। মাকে জানাই নি—জানাবও না। অথচ একেবারে চুপ করে থাকাও চলে না। যদিও আমি জানি যত বড় ক্ষতিই দাদা লিলিদির করুক না কেন, সে কখনও মুখ খুলবে না।—রুবি থামিল। মৃন্ময় কথা কহিল না। নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

রুবি পুনরায় বলিতে লাগিল, কিন্তু সে প্রতিবাদ করবে না বলেই কি সবাই চুপ করে থাকবে। মিথ্যাটাকেই সকলে জানবে—সত্য চিরদিনই গোপন থেকে যাবে।

মৃন্ময় একটু হাসিল, কহিল, আমি ত এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে বলছি, কিন্তু আপনি যে কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না। মিথ্যাটাকে নিয়ে এত হৈ-চৈ করে শেষে সত্যকেই যে আর খুঁজে পাবেন না।

রুবি কহিল, আমার প্রগল্‌ভতা আপনি মাপ করবেন। ক্রমাগত একই কথা ভেবে ভেবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না কোন্ পথে আমার চলতে হবে।

মৃন্ময় শান্ত কণ্ঠে কহিল, আমি কিন্তু আবার বলছি আপনাকে লিলির সঙ্গে পরামর্শ করতে। ব্যাপারটাকে যত গুরুতর আপনি মনে করছেন আসলে হয়তো ততটা নয়। আর যদি আপনি নিশ্চিত জানেন যে, অন্যায়টা আপনার দাদার, তা হলে তাঁকেও কথাটা জোরের সঙ্গে জানিয়ে দিন।

রুবি কহিল, তাতে সত্যিকার কোন কাজ হবে না মৃন্ময়-বাবু। এতটুকু মনুষ্যত্ব যদি তার থাকত তবে লিলিদিকে টেনে এনে জনতার হাটে দাঁড় করাত না। আজ আমার গভীর লজ্জা যে সুনির্ম্মল আমার বড় ভাই। কিন্তু যাক এসব কথা। আমি আপনার কথামতই কাজ করব। লিলিদির কাছে কালই যাব। কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে আপনার আপত্তি আছে কি?

মৃন্ময় কহিল, আছে বৈকি। কারণ এর মধ্যে মাথা গলানো আমার পক্ষে যেমন অশোভন তেমনি রুচি-বিরুদ্ধ। আপনি এত বোঝেন আর এই সোজা কথাটা বুঝলেন না। আপনাদের কর্ত্তব্য আপনারাই ঠিক করবেন। আমার সাহায্যের যদি প্রয়োজন হয় তো দূরের থেকেই তা করব।

রুবি কহিল, কিন্তু ভুলে যাবেন না যে, আপনার উপর একটি মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন, তার মান-সম্ভ্রম সব কিছু নির্ভর করছে।

মৃন্ময় কহিল, আপনি সহজ কথাকে জটিল করে তুলছেন কিন্তু। আমার উপর কারুর ভবিষ্যৎ অথবা সম্ভ্রম নির্ভর করে না। ঘটনাচক্রে আপনাদের মধ্যে এসে পড়েছি বলেই আমার কোন দায়িত্ব থাকতে হবে এ একটা কথাই নয়।

মৃন্ময় একটু থামিয়া কতকটা নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিল, এ আপনাদের রাতারাতি অতি আধুনিক হয়ে উঠবার কুফল, তাই ফলভোগেরও প্রয়োজন আছে। নইলে এ ধরণের ব্যাপার অভাবিতও নয়, আকস্মিকও নয়। কিন্তু আর না, আমরা অনেক দূরে এগিয়ে গেছি।

মৃন্ময় একটু লজ্জিত হইয়াছে এবং এই লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই অকস্মাৎ চলিয়া গেল। রুবি একটা কথা পর্য্যন্ত কহিবার অবকাশ পাইল না।

রুবিদের ওখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মৃন্ময় সরাসরি

হোটেলে গেল না। এত দিনের শ্রান্ত-ক্লান্ত মনটা কোথায় আজ লঘু আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইবে, না কোথা হইতে এক অনাবশ্যক চিন্তা আসিয়া তাহার মাথায় ঢুকিয়াছে। ইচ্ছা করিলেও এ দায় সে এড়াইতে পারে না। যত দুর্ব্বলতা তার এইখানে। অথচ এমনি মজা যে নিজের এই দুর্ব্বলতার কথা তার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু গায়ে পড়িয়া দায় ঘাড়ে লওয়ার এক প্রকার আনন্দ আছে—নেশার আকর্ষণের মত। মৃন্ময়েরও কতকটা তাই।

১৪

মৃন্ময় ট্রামে চলিয়াছে। কথায় কথায় রুবিদের ওখানেই তার অত্যন্ত দেরি হইয়া গিয়াছে। হোটেলের একটা নিয়ম-কানুন আছে, মানিয়া চলিতে হয়।

হোটেলে ফিরিয়া মৃন্ময় মানুর একখানা চিঠি পাইল। সেদিকে মন দিবার মত অবস্থা তখন তার নয়। ওদিকে খাবার ঘণ্টা দিয়াছে। মৃন্ময় কয়েক মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া আসিল। কিন্তু খাইতে বসিয়াও সে অন্যমনস্ক ভাবে সুনির্ম্মলের কথা ভাবিতেছিল, তর্কের খাতিরে যাহাই সে রুবিকে বলুক না কেন। রুবির অনুমানই তারও সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে। রুবি সুনির্ম্মলের বোন। ভাবিতেও কেমন লাগে।

দেবল মৃন্ময়ের এই অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করিয়া একটু ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল, আজকের পরীক্ষা কেমন হ'ল মৃন্ময়বাবু?

মৃন্ময় এই আকস্মিক প্রশ্নে চমকিত হইল, মুহূর্ত্তে আত্মস্থ হইয়া কহিল, কেন ভালই? পরে ঈষৎ হাসিয়া কহিল, আনমনা ছিলাম, তাই হঠাৎ চমকে উঠলাম।

দেবলও হাসিয়া কহিল, বাড়ীর কথা ভাবছিলেন বুঝি? এতদিন ত আপনার ভাববার অবকাশও ছিল না। আশ্চর্য্য একাগ্রতা আপনার।

মৃন্ময় কোন জবাব দিল না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। মানুর চিঠিখানা ঘরে টেবিলের উপর পড়িয়া আছে। আজ সকালবেলা মঞ্জুরও একখানা চিঠি সে পাইয়াছে। কক্সবাজার হইতে লিখিয়াছে। আগা-গোড়াই মামুলি কথায় পূর্ণ। যথা:—মায়ের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হয় নাই। তাহারা হয়তো আর বেশী দিন ওখানে থাকিবে না। ইতিমধ্যে তার পরীক্ষা শেষ হইয়া থাকিলে একবার কক্সবাজার আসিলে মা বড় খুশী হইবেন। সে নিজে একটুও না···এমনি আরও কত কথা। মঞ্জু বড় সহজ। ওকে বুঝিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। কিন্তু মানু তো চিঠি লেখে না—যেন গল্প কাঁদিয়া বসে।

মৃন্ময় চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল:—

"বহুদিন পরে আবার তোকে চিঠি লিখতে বসেছি। আমার বেদনা এবং আনন্দ এ দুয়ের কোন কিছু থেকেই তোকে বঞ্চিত করতে চাই না। আজ যথার্থই আমার বড় আনন্দের দিন। আমার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মনটা হঠাৎ স্বাভাবিক হয়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছে। তোকে এর আগের চিঠিতেই জানিয়েছি যে, এখানে আমি একটি ভাই এবং একটি বোন পেয়েছি। বোনটির সকল দায়িত্ব আজ আমার উপর। দাদা গেছেন আমেরিকায়। আমরা এসেছি ওয়ালটেয়ারে। আর শ্রীমতী লীলা রাও হয়েছেন মিসেস্ চক্রবর্ত্তী। তুই হাসিস নে, এ ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন উপায় ছিল না। বাস্তবিকই না। আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ নিয়ে লোকে অশোভন আলোচনা করবে এ আমরা চাই না। অথচ এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমরা শুধু লোকের মুখ বন্ধই করি নি, তাদের কাছ থেকে রীতিমত সম্মান আদায় করে নিচ্ছি। কিন্তু মনে আমাদের কোন গলদ নেই। একথা পূর্ব্বের চেয়ে জোর গলায় আমি বলতে পারছি।

ফিরোজ ম্যানসনে বাসা বেঁধেছি। সমুদ্রের ঠিক পাশেই। দিবারাত্র সমুদ্র-বারির উন্মত্ত গর্জ্জন শুনে শুনে কেমন যেন বিরক্তি ধরে গেছে। সমুদ্রের অবস্থা এখন বড় অশান্ত।

আমরা একই ঘরে আলাদা রাত কাটাই। লীলার নির্ভরতায় ফাঁকি নেই। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে ওর সুপ্ত মুখের পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের মর্য্যাদা দিয়ে লীলা কেমন করে আমার মত একটা উচ্ছৃঙ্খল মানুষকে আগাগোড়া বদলে দিয়েছে। নিজের উপর আমার বিশ্বাস এসে গেছে।

লীলা বড় চঞ্চল। হরিণীর মত চঞ্চল, অথচ তেজস্বিনী। ওকে নিয়ে মাঝে মাঝে আমায় বড় বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। পাশের ফ্লাটের মিঃ আয়েঙ্গার প্রায়ই আমাদের চায়ের টেবিলে নিমন্ত্রিত হন। লীলা ইচ্ছা করেই ডেকে পাঠায়। আয়েঙ্গার এসে হাজির হন। মিসেস চক্রবর্ত্তীকে নিয়ে কত রহস্যের সৃষ্টি করেন। লীলা হেসে গড়িয়ে পড়ে। আয়েঙ্গার অপ্রস্তুত হয়ে চলে যান কিন্তু আবার আসেন।

আমি বলি, এ সব কেন লীলা!

লীলা বলে, লোকটা বড় হ্যাংলা, তুমি কিছু জান না মানু!

আমি বলি, জেনে আমার দরকারও নেই। কিন্তু মিথ্যা ও লোকটাকে ক্ষেপিয়ে লাভ কি!

লীলা বলে, এ এক ধরণের আনন্দ মানু। তুমি এসব বুঝবে না।

জানি না কেন লীলা আয়েঙ্গারকে নিয়ে এমন করে নাচাচ্ছে। লীলাকে বলি, এসো এখান থেকে কোথাও চলে যাই। লীলার তাতেও কোন আপত্তি নেই। বলে, তুমি যখন সঙ্গে আছ যেখানে খুশী চল। পাগল আর কাকে বলে। কিন্তু বুক আমার ভয়ে ওঠে। বিদেশে আত্মীয়বন্ধুবিহীন অবস্থায় লীলা আমার চারদিক থেকে পরমাত্মীয়ার মত ঘিরে

রেখেছে। আমার জীবনের মরা গাঙে আবার জোয়ার এসেছে। কিন্তু তাতে ঘোলা জলের আবর্ত নেই—স্বচ্ছ, সুনির্মল।

আজ আমার কি মনে হয় জানিস্। তোদের মত শান্ত-শিষ্ট ভাল ছেলে না হয়ে জীবনে আমি ঠকি নি। বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছি। কোথাও টিকে যেতে পারি নি বটে, কিন্তু অনির্দিষ্টের মধ্যে নিজের জীবন সম্বন্ধে যে উপলব্ধি আমার হয়েছে তার মূল্য চলার পথে বড় কম নয়। সে যাই হোক—এসব কথা আজ থাক। এর পরে দু-চারটে মামুলি খবরাখবরের পর আজকের মত বিদায় নেব।

তোর চিঠি আমি যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর দিতে ইচ্ছে করেই দেরি করেছি। লিখবার মত কিছু সংগ্রহ করা চাই তো!

লিখেছিস, মঞ্জু আমার চিঠিটা হজম করেছে! করলেই বা ক্ষতি কি! ওরা কক্সবাজার থেকে ফিরে এসেছে কি? আশা করি, মঞ্জুর মায়ের শরীর এখন ভালই আছে। চিঠির জবাব দিস্। ইতিমধ্যে অন্য কোথাও গেলে তোকে জানিয়ে যাব। —নান্টু"

মৃন্ময় চিঠিখানা হাতে করিয়াই বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। যে বিশ্বাস নান্টুকে মানুষ হইয়া উঠিতে সহায়তা করিয়াছে সেই বিশ্বাসই আর একজনকে শুধুমাত্র খেয়ালের খোরাকই যোগাইয়াছে। বুকে জাগাইয়া তুলিয়াছে লোলুপতা, পাশবিক আদিম ক্ষুধা। খাসা নাম—সুনির্মল। নাম তার সার্থক হইয়াছে।

টাইমপিসটা টিক টিক করিয়া অবিরাম বাজিয়া চলিয়াছে। চতুর্দ্দিকে গভীর স্তব্ধতা। পাশের বিছানায় রুমমেট অকাতরে ঘুমাইতেছে। সম্মুখে খাসা-প্রাঙ্গণের দেবদারু গাছে বাদুড়ের ঝাঁক। তাদের পাখার শব্দ, এবং মাঝে মাঝে দ্রুতগামী মোটরের আওয়াজ স্তব্ধ প্রকৃতির বুকে যেন জীবনের স্পন্দন জাগাইয়া তোলে। মৃন্ময়ের কোন দিকে হুঁস নাই। তার মাথার মধ্যে তখন অজস্র প্রশ্নের নীরব আনাগোনা চলিয়াছে।

ঠিক কথা—সহজ এবং অতি সাধারণ কথা। ঘটনা এক হইলেও মানুষের মনের উপর তাহা নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নহিলে মানুষ জীবনের ধারা আজ ভিন্নমুখী হইত। কিন্তু লিলি মেয়েটেই বা কেমন? তাহাকে দেখিলে ত সাধারণ মেয়ে বলিয়া মনে হয় না, বরং শ্রদ্ধারই উদ্রেক হয়। সে কেন এমন এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে টানিয়া আনিল। তার শিক্ষা, তার সংস্কার শেষ পর্য্যন্ত একটা খেয়ালের পায়ে মাথা খুঁড়িয়া আত্মহত্যা করিল। এই নিরভিমান মেয়েটি সম্বন্ধে কি উদার মনোভাবই না তার ছিল।

মৃন্ময় ভাবিতেছিল, মানুষের মনের আদিম প্রবৃত্তিটাই কি এত বড় হইয়া উঠিল যার কাছে শিক্ষা, সংস্কার, শ্লীলতা সব কিছু ম্লান হইয়া গেল। সংযম শুধুই কি একটা কথার কথা!

রাত অনেক হইয়াছে। মৃন্ময় সহসা আশ্বস্ত হইল। অকারণে সে এসব কি ভাবিতেছে। কালই সে টিকিট কাটিবে। রুবি অসন্তুষ্ট হইবে? তাহাতে মৃন্ময়ের কিছুই আসিয়া যাইবে না। উহাদের ভালমন্দের বোঝা সে কেন বহন করিতে যাইবে।

মৃন্ময় শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিল এবং এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

কিন্তু পরদিন বাস্তবিকই সে টিকিট কাটিতে পারিল না। বরং বিকাল হইতেই রুবির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরের ঘরেই তার সাক্ষাৎ মিলিল, সে কিন্তু একলা নয়, লিলিও সেখানে ছিল। যদিও সে লিলির উপস্থিতি আশা করে নাই তথাপি বিস্মিত হইল না। মৃন্ময় মুখে কিছু না বলিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। লিলির পূর্ব্বের চেহারা আর নাই। অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট তার মুখভাব। কিন্তু লজ্জার এতটুকু আভাস তার কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

মৃন্ময় রীতিমত বিস্মিত হইল।

রুবিই প্রথমে কথা কহিল, আপনি আমাদের সাহায্য করবেন শুনে লিলিদি অত্যন্ত খুশী হয়েছেন মৃন্ময়বাবু। তার পর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনারা বসুন, আমি দু' মিনিটেই আসছি। রুবি চলিয়া গেল।

মৃন্ময় কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। কিন্তু লিলির কোন ভাবপরিবর্ত্তন দেখা গেল না। বরং সে-ই প্রথমে কথা কহিল, রুবির কাছে হয়তো আপনি অনেক কিছু শুনেছেন। কিন্তু তা নিয়ে আমার বলবার কিছু নেই। লোকে যত নিন্দেই করুক, আমি জানি অন্যায় আমি কিছুই করিনি। অবশ্য আমার এ কৈফিয়ৎ অনাবশ্যক। তবে এটুকু আমি বুঝেছি যে, আমার নিজের ভার আমাকেই বইতে হবে, সেখানে আর কারুর সাহায্য চাইতে আমি পারব না। কিন্তু আপনি অনাত্মীয় হয়েও আমার দুর্দিনে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছেন এ আমার পরম সৌভাগ্য। অথচ...লিলি কথার মাঝে সহসা থামিয়া গিয়া প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হইল। মৃদু কণ্ঠে সে কহিল, আমার নিজের পথ আমি ঠিক করে নিয়েছি। আপনি মোটামুটি কিছু সাহায্য করলেই যথেষ্ট হবে। আমি বিদেশে চাকরি নিয়েছি। আপনি শুধু আমার পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

লিলি পুনরায় থামিল, একটু চিন্তা করিয়া কহিল, আপনার উপর হয়তো জোর করে অত্যাচার করা হচ্ছে, কিন্তু

বিশ্বাস করুন এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন উপায় আমি খুঁজে পাই নি।

মৃন্ময় ধীরে ধীরে মুখ তুলিল, মৃদু কণ্ঠে কহিল, আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না—সত্যিকারের ঘটনাটা কি? বুঝে আমার দরকারও নেই, কিন্তু তবুও আমার মন বলে, কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি রয়ে গেছে, ইচ্ছে করলেই যার প্রতিবিধান হতে পারে।

লিলির মুখে ঈষৎ ম্লান হাসি দেখা দিল। সে শান্ত সংযত কণ্ঠে কহিল, তা হয়তো পারে। কিন্তু যেখানে মনের ফাঁক বুজল না সেখানে ফাঁকি ধরে লাভ কি মৃন্ময়বাবু।

রুবি ফিরিয়া আসিয়াছে। লিলি উঠিল, কহিল, আজ আমি যাই মৃন্ময়বাবু। পরশু আমি রওনা হব ঠিক করেছি। নিয়োগপত্রও ইতিমধ্যে পেয়েছি। দার্জিলিং মেল ধরতে হবে। রুবির প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া তেমনি শান্ত কণ্ঠে সে কহিল, তোমাকে ধন্যবাদটা আর দিলাম না। তবে তোমার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। তোমার জোড়া সত্যিই মেলে না।

রুবির মনোভাব মুহূর্তের জন্য বদলাইয়া গেল। কিন্তু চোখের পলকে আত্মসংবরণ করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, এখুনি যাবে লিলিদি। আমি যে তোমার চা দিতে বলে এলাম।

লিলির চোখে মুখে এক বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি দেখা দিল। সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তোমরা অনুরোধ করেছ বলেই ত আমি তা গ্রহণ করতে পারি না রুবি। অধিকার বলেও একটা কথা আছে, মন বলেও একটা পদার্থ আছে, যাকে কোন অবস্থায় অস্বীকার করা চলে না।

লিলি আর দাঁড়াইল না।

মৃন্ময় অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, অদ্ভুত মেয়ে—

রুবি কহিল, তার চেয়েও বিস্ময়কর লিলিদির মনের জোর। এত বড় যে একটা ঘটনা ঘটল অথচ তা যেন ওকে কিছুমাত্র নোয়াতে পারে নি।

মৃন্ময় একটু অন্যমনস্কভাবে কহিল, হয়তো তার নত হবার মত কোন কারণও নেই।

রুবি চমকিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই ধীর কণ্ঠে কহিল, আমি ত আপনাকে বরাবরই বলে আসছি যে লিলিদি অতল সমুদ্র, ওকে বুঝতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

মৃন্ময় একটু হাসিয়া কহিল, এ ব্যাপারে কেউই আপনারা কম যান না। অবশ্য আপনাদের কাউকে খুঁটিয়ে বুঝবার প্রয়োজনও আমার নেই। ঘটনাচক্রে আপনাদের মধ্যে এসে পড়েছি। বাধ্য হয়ে খানিক সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি দিনের জন্যও আপনাদের মধ্যে আমায় পাবেন না। সে যাই হোক আজ আমি যাই।

রুবি স্মিতহাস্যে কহিল, এসেই আপনি উঠি উঠি করেন কেন বলুন ত। আমাদের বুঝি সহ্য করতে পারেন না।

মৃন্ময় কহিল, কথাটা একেবারে মিথ্যে বলেন নি আপনি। পাড়াগাঁয়ের লোক কিনা—হঠাৎ আপনাদের মধ্যে এসে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। আপনাদের সমস্তরের হলে হয়তো উঠতেই চাইতাম না। জোর করে তাড়াতে হ'ত।

রুবি হাসিয়া ফেলিল, আপনি আমাদের কি মনে করেন বলুন ত।

মুখে রুবি যাহাই বলুক না কেন, অন্তরে অন্তরে সে খুশী হইয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে, তাদের আলোচনাটা একটা সহজ পরিহাসের পথে ফিরিয়া আসিয়াছে। লিলি সম্বন্ধে মৃন্ময় আজ যে ভাবে কথাবার্তা শুরু করিয়াছে তাহাতে রুবি কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। কি জানি কোন্ কথায় কি কথা আসিয়া পড়িবে। লিলির সহিত দেখা হইবার পর হইতেই মৃন্ময়ের কথার ভঙ্গী কেমন যেন বাঁকা পথ ধরিয়া চলিয়াছে।

মৃন্ময় সহসা রুবিকে প্রশ্ন করিল, আপনাকে যেন একটু চিন্তিত মনে হচ্ছে।

এই আকস্মিক প্রশ্নে রুবি চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সহজ কণ্ঠে কহিল, আমার চিন্তিত হওয়া কি খুবই অস্বাভাবিক মৃন্ময়বাবু? আজ ক'মাস ধরে ক্রমাগত শুধু ভাবছি। ভেবে ভেবে কূল পাই নি। অথচ যাকে নিয়ে এত দুর্ভাবনা সে কত অনায়াসেই না একটা মীমাংসায় এসে পৌঁছেছে। আমরাও যে প্রয়োজন হলে কত শক্ত হতে পারি তার প্রমাণ একটু আগেই পেলাম। তাইতো ভাবছিলাম কি ভাগ্যি যে আপনাকে পেয়েছি, নইলে এই নিয়ে আমি হয়তো ব্যাপারটাকে জটিলতর করে তুলতাম।

মৃন্ময় হাসিমুখে রুবির মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কোন জবাব দিল না।

রুবি কহিল, আপনি হাসছেন, কিন্তু আমি একবিন্দু মিথ্যে বলি নি।

মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখেই কহিল, না আপনি খুব সত্যবাদী।

রুবির দুই চোখে বিস্ময়। মৃন্ময় বলিতে চায় কি। তার এত উদ্যোগ-আয়োজন সবই কি এই লোকটি ব্যর্থ করিয়া দিবে। মৃন্ময়ের আজিকার ইঙ্গিতগুলি কেমন যেন অর্থপূর্ণ। শেষ পর্য্যন্ত ঘাটে আসিয়া কি ভরাডুবি হইবে?

ভরা কিন্তু ডুবিল না।

মৃন্ময় তার প্রতিশ্রুতি পালন করিবে।

১৫

যাত্রার পূর্ব্বে কাজটা যত জটিল বলিয়া মৃন্ময়ের মনে হইয়াছিল আসলে তাহার কিছুই হইল না। মৃন্ময় দাদা—লিলি তার ছোট বোন, বিধবা। সদ্য স্বামী হারাইয়াছে।

মিথ্যা···হোক মিথ্যা—এমন কত মিথ্যাই ত সত্য হইয়া জগতে টিকিয়া আছে। কে তাহার খোঁজ নেয়।

অমাবস্যার অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ীখানা নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। লিলি জড়সড় হইয়া শুইয়া আছে। নিদ্রিত কিংবা জাগ্রত তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। মৃন্ময় একাগ্র দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাহিয়া আছে। মায়া হয়। কত বড় দুশ্চিন্তা লইয়া ঐ মেয়েটি দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটাইয়া দিয়াছে। আজ যদিই-বা একটা কূলের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু কে বলিতে পারে সেখানেও স্থিতিলাভ ক'রতে পারিবে কিনা! অমন নির্মল স্নিগ্ধ মুখখানিতে দুশ্চিন্তার কালো ছাপ সুপরিস্ফুট। তথাপি ওর সহজ সৌন্দর্য্য এবং স্বচ্ছ গাম্ভীর্য্য এতটুকু ব্যাহত হইয়াছে মনে হয় না।

লিলির পরনে একখানি সরুপাড় ধুতি। হাতে দুই গাছা করিয়া সোনার চুড়ি। এ ছাড়া আর অন্য কোন সোজা পথ তাদের চোখে পড়ে নাই। মৃন্ময় মৃদু আপত্তি তুলিয়াছিল। লিলি বাধা দিয়া বলিয়াছে আমার উপযুক্ত বেশভূষাই হয়েছে মৃন্ময়বাবু।

রক্ষা এই যে লিলি অবাঙালীর মধ্যে চলিয়াছে। নইলে কোন্ পথে যে বিপদ ঘনাইয়া আসিত তার সন্ধান পাওয়া কঠিন হইত। মৃন্ময় নিজেও বড় কম বিস্মিত হইল না তার নিজের এই মানসিক চাঞ্চল্যে। লিলি তার কে? তার সম্বন্ধে এত দুশ্চিন্তাই বা কেন? মৃন্ময়ের মন বলে, এগুলি মানুষের সহজ বৃত্তির স্বাভাবিক প্রকাশ।

মৃন্ময় জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ট্রেনের মধ্যে তার ঘুম হয় না। এঞ্জিনের বাঁশী তীব্র রবে বাজিয়া উঠিল। হয়তো কাছাকাছিই কোন ষ্টেশন। ট্রেনের গতিও হ্রাস পাইয়াছে, লোকালয়ের আভাস পাওয়া যাইতেছে যেন। দু'একখানি কুঁড়েঘর ও মিটমিটে আলোর রেখা ক্ষণে ক্ষণে নজরে পড়িতেছে। গাড়ী কিন্তু দাঁড়াইল না। পুনরায় তার গতি দ্রুত হইয়া উঠিল। মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া আছে। ওদিকে লিলি যে বহুক্ষণ হইল উঠিয়াছে তাহা সে টের পায় নাই। সহসা সেইদিকে দৃষ্টি পড়িতেই বলিয়া উঠিল, আপনি কতক্ষণ উঠেছেন?

লিলি কহিল, অনেকক্ষণ। শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না। কিন্তু আপনি বুঝি সেই থেকেই বসে আছেন।

মৃন্ময় কহিল, ট্রেনে আমার ঘুম হয় না। আপনার খানিকটা হয়েছে ত?

ঘুম! লিলি একটুখানি হাসিল, মৃদু কণ্ঠে কহিল, হয়েছে বৈকি। লিলি থামিল, কিছুক্ষণ মৌনভাবে কি চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিল, আপনাকে আমার গোটাকয়েক কথা বলবার ছিল। আর হয়তো সুযোগ পাব না। আপনার এখন সময় হবে কি?

মৃন্ময় কহিল, বিলক্ষণ! সময় কাটাবার ভাবনায় হাত থেকে তা হলে বেঁচে যাই যে।

লিলি কহিল, আমি রুবির কথা আপনাকে বলতে চাই। আমি জানি আমার সম্বন্ধে সে সত্যিমিথ্যে অনেক কিছু আপনাকে বলেছে। অনেক ভেবেই আমি প্রতিবাদ করি নি। নিজের যতটা ক্ষতি হবার তা তো হয়েছেই তার উপর আর নূতন করে কথা কাটাকাটি করবার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। তা ছাড়া একজন পুরুষমানুষের সাহায্যের প্রয়োজন আমার ছিল। বহু খবরের মধ্যে সুনির্মলের সঙ্গে আমার বিয়ের খবরটা রুবি নিশ্চয় আপনাকে দেয় নি।

মৃন্ময় প্রায় লাফাইয়া উঠিল। কহিল, আপনি কি বলছেন!

লিলি কহিল, সত্যি কথাই বলেছি। আপনি চমকে উঠছেন কেন। আইন আমার কথার সাক্ষ্য দেবে।

মৃন্ময়ের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে লিলির মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, অথচ আপনি বিনা প্রতিবাদে এত বড় একটা মিথ্যা কলঙ্ক মাথায় তুলে নিলেন!

লিলি শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, মাথা পেতে না নিয়ে আর কি করতে পারি আপনিই বলুন! মামলা-মোকদ্দমা করব? কিন্তু তাতে লাভ হবে কি। খামোকা মিথ্যেটাকেই আরও জীইয়ে রাখা হবে। তা ছাড়া যে লোক এত বড় প্রতারণা করতে পারে সে যে এত সহজে আমাকে মুক্তি দিয়েছে এর জন্ত আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। আজীবন আমাকে এক মিথ্যাচারী প্রবঞ্চককে নিয়ে দিন কাটাতে হবে না। সহজ ভাবে অন্ততঃ নিঃশ্বাস ফেলতে পারব।

লিলি ক্ষণকাল থামিয়া পুনরায় কহিল, আপনাকে মিথ্যে বলব না মৃন্ময় বাবু। গোপনতার দিন আমার চলে গেছে। আপনি কি মনে করেন সুনির্মলকে ঘাঁটাতে গেলে সে জয়ঢাক পিটিয়ে আমার সুনাম প্রচার করবে। সে বরং আরও নানা হীন ষড়যন্ত্র আমার বিরুদ্ধে চালাবে। এক দিনের মাত্র কয়েক মুহূর্তের চিন্তায় আমি আজ একথা বলছি না। দিনের পর দিন ক্রমাগত ভেবে ভেবেই আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। সুনির্মল অমানুষ বলেই সব মিথ্যার বোঝা আমার মাথায় তুলে নিতে হয়েছে। আমি কি কিছুই বুঝি না মৃন্ময়বাবু!

মৃন্ময় মুখ তুলিয়া চাহিল। ক্ষীণ প্রতিবাদের কণ্ঠে কহিল, কিন্তু···

লিলি বাধা দিয়া কহিল, মিথ্যা যুক্তি দেখাবেন না মৃন্ময় বাবু। যে বিশ্বাস একবার হারিয়ে ফেলেছি তা তো আর ফিরে পাব না। তা বলে আপনি মনে করবেন না যেন আপনাকেও আমি ভুল বুঝেছি, বরং আজ আমার মস্ত বড়

ভরসা এই যে, আপনাকে আমি বন্ধুর মত, ভাইয়ের মত, আমার চরম সঙ্কটের দিনে কাছে পেয়েছি।

মৃন্ময় নীরবে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, আমি আর কিছু ভাবছি না, কিন্তু রুবি আমার সঙ্গে এ ছলনা করলে কেন। কতটুকু লাভ তার এতে হয়েছে? আপনাকে মিথ্যে বলব না লিলি দেবী—রুবির সম্বন্ধে আমার খুব ভাল ধারণাই ছিল। অন্ততঃ এসব নোংরামির মধ্যে তার হাত নেই বলেই বিশ্বাস করেছিলাম।

লিলি কহিল, এর থেকেই রুবিকে অতটা ছোট ভাবছেন কেন? আমারও ভুল হতে পারে ত। তা ছাড়া পারিবারিক স্বার্থের জন্ম হয়ত তাকে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছে। এমনও ত হতে পারে যে, সে তার নিজের ইচ্ছায় চলে নি। কাউকেই আমি আর দোষ দিতে চাই না মৃন্ময়বাবু। অপরাধ যা তা আমারই একলার, নইলে আজ আমায় আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলকে ত্যাগ করে এমন করে আত্মগোপন করতে হবে কেন?

মৃন্ময় অকস্মাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, না এ কিছুতেই হতে পারে না। এমনি ক'রে পালিয়ে গিয়ে সবাইকে শুধু মিথ্যেটাই জানতে দেবে, আর সত্যিকারের অপরাধী যারা তাদের গায়ে এতটুকু আঁচ লাগবে না এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। তোমাকে আদালতের সাহায্য নিতে হবে। যা সত্য তা আর দশজনকে জানতে দিতে হবে।

মৃন্ময়কে বাধা দিয়া লিলি কহিল, আদালতের ডিক্রির জোরে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণিত করতে হবে মৃন্ময়বাবু! লিলি বারকয়েক ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, এ হতেই পারে না। আমি তা পারব না। আমাকে ক্ষমা করুন আপনি।

মৃন্ময় কহিল, আমার কথামত কাজ করলে হয়ত আরও বহু দুর্ভাগা মেয়েকে আপনি ঐ শয়তানের হাত থেকে বাঁচাতে পারতেন। আমার কথটা একটু ভাল করে ভেবে দেখে না হয় পরে এর জবাব দেবেন। কিন্তু আমি ভাবছি একথা আমায় কলকাতায় জানালেন না কেন?

লিলি মৃদুকণ্ঠে কহিল, তাতেই বা কি লাভ হ'ত। কতগুলি বাজে কথা কাটাকাটি ছাড়া কোন উপকারই আমার হ'ত না। তা ছাড়া তখন হয়ত আমার কথা আপনিও বিশ্বাস করতেন না।

মৃন্ময় শান্তকণ্ঠে কহিল, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আপনার কিছুই এসে যেত না। বিশেষ করে আপনার বিয়ের অত বড় প্রমাণ যখন রয়েছে।

লিলি কহিল, আমি হয়ত অবস্থাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি, কিন্তু যেখানে প্রকৃত ভালবাসা নেই সেখানে এ মিথ্যের বেসাতি করে কোন লাভই হ'ত না। মন বলে যে সুনির্ম্মলের কোন বস্তুই নেই, এ আগে জানলে এত বড় শোচনীয় দুর্ঘটনা কখনই ঘটত না।

লিলি ক্ষণকালের জন্ম চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, হয়ত আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু সুনির্ম্মলের চিঠিখানা কি আপনি পড়েন নি? যে নিজের একটা খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্ম এত বড় কলঙ্কের বোঝা বিনা দ্বিধায় আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে সে প্রয়োজনমত যে আরও নীচতার আশ্রয় নেবে না এমন ভরসা কি আপনি দিতে পারেন? আপনি কি জানেন সুনির্ম্মল বিলেত যায় নি—কাছাকাছি থেকেই অবস্থাটা লক্ষ্য করে চলেছে?

মৃন্ময় একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেও নীরব রহিল। তার চোখের সম্মুখে যেন ছায়াচিত্রের অভিনয় চলিয়াছে।

লিলি পুনশ্চ কহিল, আমার মনে হয় আপনি আমার অবস্থাটা এখনও ঠিক বুঝতে পারেন নি তাই একথা বলছেন। আমি বিপদকে বরণ করে নিয়েছি—আত্মরক্ষা করবার উদ্দেশ্যে। আমি বাঁচতে চাই মৃন্ময়বাবু।

লিলির কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। চোখ দুইটাও অশ্রুভারে টল টল করিতেছিল। উভয়েই নীরব। শুধু চলন্ত ট্রেনের অবিশ্রাম একঘেয়ে শব্দ ছাড়া আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। মৃন্ময় পুনরায় বাহিরে দৃষ্টি ফিরাইল। নীরন্ধ্র অন্ধকার। সীমাহীন অন্ধকারের মহাসমুদ্র যেন। সহসা লিলির পানে চাহিয়া মৃন্ময় কহিল, কিন্তু দুঃসাহসিকা আপনি।

লিলি কোন জবাব দিল না। মৃন্ময়ও আর কথা বাড়াইল না। উহাদের লইয়া সে তার অনেক মূল্যবান সময়ের অপচয় করিয়াছে, কিন্তু আর নয়। তা ছাড়া কথাটা লিলি নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই। তাহাকে হয়ত আরও গভীর ষড়যন্ত্রের জালে ফেলিয়া লাঞ্ছনার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িত। হয়ত দাঁড়াইবার মত কোন অবলম্বন লিলি আর খুঁজিয়া পাইত না। এ বরং কতকটা সে ভালই করিয়াছে। কিন্তু কি অপদার্থ এই সুনির্ম্মল! মেয়েদের জীবন লইয়া এমন ছিনিমিনি খেলা খেলিতে তার বিবেকে বিন্দুমাত্র বাধিল না। নিজের সৃষ্টিকে সে দ্বিধাহীন চিত্তে অস্বীকার করিয়া বসিল। মনুষ্যোচিত কোন স্বাভাবিক চেতনা কি তার মধ্যে নাই। খেয়ালটাই কি তার জীবনে এত বড় হইল, যার কাছে বিবেক-বুদ্ধি পর্য্যন্ত তলাইয়া গেল।

সুনির্ম্মলের কাছে লিলি ফুরাইয়া গিয়াছে। তার সম্বন্ধে যতটুকু ঔৎসুক্য তাহা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সুনির্ম্মল তাহাকে বাতিল করিয়াছে। বোকা মেয়ে নিজেকে এত বেশী সস্তা করিতে গিয়েছিলে কেন?

গাড়ী কি একটা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল।

(ক্রমশঃ)

ভারতের জনসম্পদ

শ্রীকস্তুরচাঁদ লালওয়ানী

জনসম্পদের দিক থেকে বিচার করলে ভারতকে একটি দেশ না বলে মহাদেশ বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত হবে। জনসম্পদের প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্যে এদেশ বহু শতাব্দী থেকে মহাদেশ নামের যোগ্য বলেই বিবেচিত হয়ে আসছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আছে বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন আকৃতির বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মের ভাষাভাষী লোক। গুর্খা, পাঠান, শিখ, রাজপুত থেকে আরম্ভ করে এদেশে আছে আর্য্য অনার্য্য, দ্রাবিড়, মোঙ্গল জাতীয় লোক। এদের কারও সঙ্গে সাদৃশ্য আছে প্রাচীন আর্য্যদের, কারও সঙ্গে মালয়, সুমাত্রা ও মাদাগাস্কারের লোকেদের, কারও বা সেমিটিক, মোঙ্গল প্রভৃতি বংশের লোকেদের। দেশী-বিদেশী, নবীন-প্রাচীন রক্তের সংমিশ্রণে বহু শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে ভারতীয় জনসম্পদ।

১। রক্তগত বিভিন্নতা

সারা ভারতে যত লোক আছে তাদের আমরা সাধারণতঃ বাঙালী, আসামী, বিহারী, উৎকলবাসী, ভাটিয়া, মারোয়াড়ী, মারাঠি, মান্দ্রাজী, এই সব নামেই জানি। কিন্তু এ ত রক্তের দিক থেকে বিভিন্নতা নয়, এ হ'ল একই প্রদেশে বহু দিন ধরে একই সুখদুঃখের ভিতর বাস করার ফল। তুর্কো-ইরাণী রক্ত ব্রাহুই, বেলুচি ও আফগানদের শিরায় প্রবাহিত; এদের বসবাস উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। এরা দৈর্ঘ্যে মাঝারি আকৃতির চেয়ে কিছু বড়, গৌরবর্ণ, চোখের মণি কালো, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মাথা বেশ চওড়া, নাসিকা উন্নত। পঞ্জাব, রাজপুতানা ও কাশ্মীরের ক্ষত্রী, রাজপুত ও জাঠেদের শরীরে আছে আর্য্যরক্ত। তুর্কো-ইরাণীদের সঙ্গে এদের পার্থক্য খুবই সুস্পষ্ট। যে সব আর্য্য ভারতে বসবাস স্থাপন করেন এরা তাদেরই বংশধর। পরবর্ত্তী কালে এদের শরীরে যে অন্য রক্তের সংমিশ্রণ হয় নি তা নয়; তবে মোটামুটিভাবে আর্য্যদের বৈশিষ্ট্য আজও এদের মধ্যে বেশ দেখা যায়। এরা দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ; এদের চোখের মণি কালো, মাথায় প্রচুর চুল আছে, নাসিকা উন্নত হলেও বেলুচিস্থান বা সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীদের নাকের মত লম্বা নয়। সাইথো-দ্রাবিড় রক্ত পাওয়া যায় মারাঠি ব্রাহ্মণ ও কুনবিশদের মধ্যে এবং কুর্গের অধিবাসীদের মধ্যে। এদের মধ্যে সাইথীয় ও দ্রাবিড় এই দুই রক্তের মিশ্রণ হয়েছে। দ্রাবিড় রক্তের সংমিশ্রণে এদের আকৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, মাথা লম্বা এবং নাসিকা তেমন উন্নত নয়। এদের মধ্যে যারা অভিজাতবংশীয় তাদের শরীরে দ্রাবিড় রক্ত কম; অন্যান্যদের শরীরে দ্রাবিড় রক্তের আধিক্য। এ ছাড়া ভারতে আছে আর্য্য-দ্রাবিড় রক্তের লোক। এরা সাধারণতঃ হিন্দুস্থানী নামে পরিচিত। এদের বসবাস যুক্তপ্রদেশে, বিহার ও রাজপুতানার কোন কোন অঞ্চলে। এদের মধ্যে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ থেকে আরম্ভ করে চামার পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকই আছে। মোঙ্গল-দ্রাবিড় বংশের লোক বাংলা ও উড়িষ্যার অধিবাসী। ছিটেফোঁটা আর্য্যরক্ত যে এদের শরীরে নেই তা নয়। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ থেকে আরম্ভ করে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান পর্য্যন্ত সবাই আছে। ধর্ম্মের দিক থেকে বিভিন্ন হলেও এই প্রদেশের হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে রক্তগত পার্থক্য খুবই কম। এ থেকে একথা বেশ বোঝা যায় যে, এই প্রদেশের কিছু হিন্দু অধিবাসী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছিল। অভিজাতবংশীয়দের মধ্যে সামান্য আর্য্যরক্তের মিশ্রণ হয়েছে। খাঁটি মোঙ্গল রক্তের লোক পাওয়া যায় হিমালয়-প্রান্তে, নেপাল ও আসামে, এবং দার্জ্জিলিং ও সিকিমে। এদের মাথা চওড়া, রং পীতাভ গৌর, এরা খর্ব্বকায়, মুখ চেপ্টা, নাক থেবড়া। দ্রাবিড়-বংশীয় লোকেদের বাস হ'ল লঙ্কাদ্বীপে, মান্দ্রাজে, হায়দ্রাবাদে ও মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতের প্রায় সর্ব্বত্র এবং ছোটনাগপুরে। ভারতের দ্রাবিড়-সভ্যতা অতি প্রাচীন। তার বহু নিদর্শন আজও পাওয়া যায়; পরবর্ত্তী কালে দ্রাবিড়-রক্তের সঙ্গে আর্য্য, সাইথীয়, ও মোঙ্গল রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে। এরা খর্ব্বকায়, গায়ের রং ঘোর কালো, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল আছে, মাথা লম্বা, নাক চওড়া ও চেপ্টা। এই যে বিভিন্ন জাতির লোকের কথা বলা হ'ল এরা এমনভাবে আজ দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং একে অপরের সঙ্গে মিশে গেছে যে, এদের বাসস্থান দিয়ে চুলচেরা বিচার করা কঠিন; তবে ভারতের এক প্রান্ত থেকে যদি অপর প্রান্তে যাওয়া যায় তা হলে এদের পার্থক্য অনেকখানি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং আপনা থেকেই অতি সাধারণ মানুষও এই পার্থক্য ধরে ফেলতে পারে।

২। ভারতের জনসংখ্যা

১৯৪১ সালে ভারতে পুনরায় লোকগণনা হয়। এই গণনা অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা হ'ল ৩৯০০ লক্ষ। তবে এই সংখ্যা যে কতখানি নির্ভুল সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। ১৯৩১ সালে যখন লোকগণনা হয় তখন কংগ্রেস তাতে যোগদান করে নি। ফলে কংগ্রেসের

সমর্থকেরা এই গণনা থেকে বাদ পড়ে যায়। এতে প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির সুবিধা হ'ল। ১৯৩১ সালের পর থেকে দেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে রাজনীতির ভিতর দিয়ে আমাদের সমাজদেহে যে বিষ ঢুকল, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ফলে তা সকল অবস্থার সকল বয়সের লোকের ভিতর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। তাই ১৯৪১ সালে যে লোকগণনা হয় তা প্রহসনে পর্য্যবসিত হ'ল। সকল সম্প্রদায়ের লোকই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অধিক করে দেখাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে আদমসুমারির ব্যবস্থা ভাল; গির্জ্জার বা স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে জন্মমৃত্যুর যে তালিকা থাকে তা থেকে সহজেই লোকসংখ্যা স্থির করে ফেলা চলে। এদেশেও জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা হয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের সাহায্য না নিয়ে কেন যে আদমসুমারির জন্য এত অর্থ ব্যয় করে এক বিরাট প্রহসনের অবতারণা করা হয় তা বোঝা কঠিন। সে যাই হোক, অন্য কোন সংখ্যা যখন হাতের কাছে নেই তখন জনসম্পদের বিশ্লেষণ-ব্যাপারে আমাদের সরকারী সংখ্যার উপরই নির্ভর করতে হবে। এই হিসাব অনুসারে ব্রিটিশ ভারতের জনসংখ্যা হ'ল ২৯৫৮০৮০০০ ও দেশীয় রাজ্যসমূহের জনসংখ্যা ৯৩১৯০০০০, মোট ৩৮৮৯৯৮০০০। ১৮৯১ সালে থেকে গত ৫০ বৎসরে সেই লোকসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩৯.১। ১৯৩১ সালের পর থেকে ১০ বৎসরে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে লোকসংখ্যার শতকরা বৃদ্ধি হয়েছে মোটের উপর ১৫ ভাগেরও বেশী। ১৯৩১ সালে এদেশের জনসংখ্যা ছিল—ব্রিটিশ-ভারতে ২৫৮৭৫৩০০০, দেশীয় রাজ্যে ৭৯৪৬৬০০০, মোট ৩৩৮২১৯০০০। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির এই অনুপাত নীচে দেখানো হ'ল :—

প্রদেশ	শতকরা বৃদ্ধি (১৯৩১-৪১)	দেশীয় রাজ্য	শতকরা বৃদ্ধি (১৯৩১-৪১)
মাদ্রাজ	১১·৬	বরোদা	১৬·৬
বোম্বাই	১৫·৯	কাশ্মীর	১০·৩
বাংলা	২০·৩	হায়দ্রাবাদ	১৩·২
যুক্তপ্রদেশ	১৩·৭	মহীশূর	১১·৮
পাঞ্জাব	২০·৫	কোচীন	১৮·১
বিহার	১২·৩	ইন্দোর	১৪·২
মধ্যপ্রদেশ	৯·৭	মণিপুর	১৪·৯
আসাম	১৮.৩	গোয়ালিয়র	১৩·৭
উড়িষ্যা	৮·৮	দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমষ্টি	১৩·৩
সীমান্ত প্রদেশ	২৫·২	উড়িষ্যার রাজ্যসমষ্টি	১২·৭
সিন্ধু	১৬·৭	রাজপুতানার রাজ্যসমষ্টি	১৮·১
বেলুচিস্তান	৮·২		

৩। জনসংখ্যার চাপ

জনসংখ্যার চাপ বলতে আমরা বুঝি প্রতি বর্গমাইলে গড়ে কত লোক বাস করে বা গড়ে কত লোক তাহার উপর নির্ভর করে। এটা নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের উপর, যেমন ভৌগোলিক অবস্থিতি, জীবন ও ধনের নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মান, অর্থনৈতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক বিকাশ প্রভৃতি। দেশ যদি সমৃদ্ধিশালী হয়, সম্পদের যদি প্রাচুর্য্য থাকে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের যদি সুযোগ সুবিধা থাকে তা হলে সে দেশে জনসংখ্যার যতই বৃদ্ধি হোক না কেন তাতে জীবনযাত্রার মানের উপর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা কোন কালেই ছাড়িয়ে যায় না। প্রত্যেকটি জিনিষেরই বাড়তির মাত্রা আছে; লোকসংখ্যার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু এই সীমারেখার মধ্যে যখন আর্থিক শক্তিকে ছাপিয়ে ওঠে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, আমরা তখনই বলি যে, জনসংখ্যার চাপ বেশী হয়েছে। প্রতি বর্গমাইল জমির উপর নির্ভর করে পাঁচ জনই থাক, আর পাঁচ শ' জনই থাক তাতে কিছু যায় আসে না; আর্থিক সমৃদ্ধিই হ'ল আসল মাপকাঠি। যে দেশ সমৃদ্ধিশালী, যার সম্পত্তি আছে, তার প্রতি বর্গমাইলে পাঁচ শ' লোকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হওয়াও কিছু কঠিন নয়। আর যে দেশ হয়ে পড়েছে নিঃস্ব, সর্ব্বহারা, তার পক্ষে পাঁচ জন লোকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাও কঠিন। ইংলণ্ড ও ওয়েলসে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার চাপ হ'ল ৬৮৫; অথচ তারা বেশ আছে। আর আমাদের দেশে জনসংখ্যার চাপ মাত্র ২৪৬; অথচ এতেই আমরা ম্যালথাসের থিওরী আওড়াতে থাকি। শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা উন্নত হওয়ায় ইংলণ্ডে এত বেশী লোকের চাপও কিছুই নয়। আমাদের আর্থিক উন্নতি বন্ধই হয়েছে; তাই সামান্য জনসমষ্টিকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার সামর্থ্যও আমাদের নেই বললেই চলে। আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল এই যে, 'শিল্পবিপ্লবের' আগে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই জনসংখ্যার চাপ ছিল খুবই কম। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর থেকে সকল দেশেই জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, যত দিন কৃষিই কোনও দেশের লোকের জীবিকার প্রধান অবলম্বন থাকে তত দিন সে দেশে কৃষির চরম উৎকর্ষের অবস্থায় প্রতি বর্গমাইলে ২৫০ জনের বেশী লোকের বসতি সমীচীন নয়; কারণ তাতে জীবনযাত্রার মান ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা নেমে যাবার আশঙ্কা খুব বেশী থাকে। এ হ'ল উর্দ্ধতম সংখ্যা। বাস্তবিক পক্ষে, পৃথিবীর অনেক দেশেই কৃষির চরম উৎকর্ষ হয় নি; আমাদের দেশে ত মান্ধাতার আমলের অবস্থা আজও প্রায় চলেছে। এ অবস্থায় ২৫০ জন

লোক যদি প্রতি বর্গমাইলে থাকে তা হলে এদেশে দারিদ্র্যের আধিক্য হবে না ত কি ? বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার চাপের তুলনামূলক হিসাব নীচে দেওয়া হ'ল :

দেশ	প্রতিবর্গ মাইলে জনসংখ্যার চাপ	দেশ	প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার চাপ
ইংলণ্ড ও ওয়েলস	৬৮৫ (১৯৩১)	জাপান	৪২৬ (১৯৩৫)
ফ্রান্স	১৯৭ (১৯৩৬)	মিশর	৪৫ (১৯৪৩)
জার্ম্মানী	৩৮২ (১৯৩৯)	আর্জেন্টাইন	১৩ (১৯৪৫)
বেলজিয়ম	৭০৮ (১৯৪৪)	ব্রেজিল	১২'৬ (১৯৪০)
রুশিয়া	২০'৮ (১৯৩৯)	যুক্তরাষ্ট্র	৪০'৮ (১৯৪০)
চীন	১০২ (১৯৩৬)	কানাডা	৩ (১৯৪১)
ভারতবর্ষ	২৪৫ (১৯৪১)	মেক্সিকো	২৫ (১৯৪০)

উপরে কয়েকটি দেশের নাম করা হয়েছে। এদের মধ্যে যেগুলি শিল্পপ্রধান সেগুলির জনসংখ্যা খুব বেশী বটে ; কিন্তু সেই জনসংখ্যাকে ভরণপোষণ করাবার সামর্থ্য তাদের আছে। কৃষিপ্রধান দেশগুলির মধ্যে কিন্তু ভারতবর্ষেই জনসংখ্যার চাপ সব চেয়ে বেশী। এদেশের অনুপাতে অন্যান্য কৃষিপ্রধান দেশে জনসংখ্যার চাপ নগণ্য বলা চলে। তাই সে সকল দেশের কৃষিও উন্নত, জনসাধারণও প্রগতিশীল। এদেশে লোকসংখ্যার চাপেই কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে।

৪। বিভিন্ন প্রদেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। বাংলাদেশে জনসংখ্যার চাপ যত বেশী, সিন্ধু বা রাজপুতানায় সে অনুপাতে অনেক কম। আবার পূর্ব্ববঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার চাপ অনেক কম। এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত কারণগুলি কাজ করছে। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি কারণে পূর্ব্ববঙ্গের লোকসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ব্ববঙ্গের উর্ব্বরা জমিতে অল্প আয়াসেই সোনা ফলে। অপর পক্ষে, সিন্ধু, রাজপুতানা প্রভৃতির অনুর্ব্বর জমিতে লোকে নির্ভর করবে কিসের উপর ? তাই বহুদিন থেকেই এই সব অঞ্চলের লোক জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তবে বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা যতই উন্নত হতে থাকবে, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যাকে ভরণপোষণ করাবার সামর্থ্য যতই তাদের বাড়বে, ততই এই সব অঞ্চলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাই ভারতের যে সব অঞ্চল পিছিয়ে ছিল, যাদের আর্থিক উন্নতি আরম্ভ হয়েছে বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাদের জনসংখ্যা গত ৫০ বৎসর ধরে চলেছে বাড়তির পথে, আর যে সব প্রদেশের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি একই রকম রয়েছে তাদের জনসংখ্যা বাড়লেও আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধির পরিমাণ কম হয়েছে। পৃষ্ঠার সর্ব্বনিম্নে প্রদত্ত হিসাব থেকে বিষয়টি বেশ বোঝা যায়।

৫। ধর্ম্মানুক্রমিক জনসংখ্যা

জনসংখ্যার ধর্ম্মানুক্রমিক হিসাব রাখার বিপদ আছে যথেষ্ট। ১৯৪১ সালের আদমসুমারিতে এর ফলে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যার ফলে আদমসুমারি প্রহসনে পরিণত হয় সে কথা ইতিপূর্ব্বেই বলেছি। কারণ এতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ আরও উগ্র হয়ে উঠল। ১৯৪১ সালের আদমসুমারিতে "ধর্ম্ম"কে বাদ দিয়ে লোকগণনা হয় "সম্প্রদায়" হিসাবে— হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, উপজাতীয়, এইভাবে নয় ; হিন্দু (তপশীলী ও অন্য), মুসলমান, উপজাতীয়, শিখ, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোক এই ভাবে। ১৯০১ সালে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৬৮'২৪, মুসলমানদের ২২'১৬, বৌদ্ধদের ৩'৬৫, উপজাতীয়দের ২'৩৯, খ্রীষ্টানদের ১'১৯ ও অন্যান্য ১'৭৭। ১৯৪১ সালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা ছিল নিম্নলিখিত প্রকার : (হিসাব—'০০০,০০০)

সম্প্রদায়		ব্রিটিশ ভারত	দেশীয় রাজ্য
হিন্দু	তপশীলী	৩৯'৯	৮'৯
	অন্য	১৫০'৯	৫৫'২
মুসলমান		৭৯'৪	১৫'০
উপজাতীয়		১৬'৭	৮'৭
শিখ		৪'২	১'৫
খ্রীষ্টান		৩'৫	২'৮
অন্যান্য		১'২	১'০

দক্ষিণ ও মধ্যভারত এবং মাদ্রাজ প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যায়

প্রদেশ	১৮৮১-৯১	১৮৯১-১৯০১	১৯০১-১১	১৯১১-২১	১৯২১-৩১	১৯০১-৪১
বাংলা	+ ৭'৬	+ ৭'৮	+ ৭'৯	+ ২'৭	+ ৭'৩	+ ২০'৩
বিহার-উড়িষ্যা	+ ৬'১	+ ১'১	+ ৩'৮	− ১'৪	+ ১০'৮	{ + ১২'৩ ৮'৮
বোম্বাই	+ ১৪'৪	− ১'৮	+ ৬'০	− ১'৮	+ ১৩'৩	+ ১৫'৯
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	+ ৯'৩	− ৮'৩	+ ১৬'২	− ০'০	+ ১১'৫	+ ৯'৭
মাদ্রাজ	+ ১৫'৬	+ ৭'৩	+ ৮'৩	+ ২'২	+ ১০'৪	+ ১১'৬
সীমান্ত প্রদেশ	+ ১১'৫	+ ৯'৯	+ ৭'৬	+ ২'৫	+ ৭'৭	+ ২৫'২
পঞ্জাব	+ ১০'১	+ ৬'৯	− ১'৮	+ ৫'৭	+ ১৪'০	+ ২০'৫
যুক্তপ্রদেশ	+ ৬'২	+ ১'৭	− ১'১	− ৩'১	+ ৬'৭	+ ১৩'৭

অনেক বেশী—শতকরা প্রায় ৮৭ জন। বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা ও বোম্বাই প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যায় অনেক বেশী। সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও কাশ্মীরে প্রায় সবাই মুসলমান ; পশ্চিম পঞ্জাব, পূর্ব্ববঙ্গ ও সিন্ধুতে মুসলমানেরা সংখ্যায় বেশী। আসামে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৩৪ জন, যুক্তপ্রদেশে ১৫ জন। শিখদের প্রায় সবাই থাকে পঞ্জাবে এবং জৈনেরা বাস করে রাজপুতানা, আজমীর-মারোয়াড় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে। উপজাতীয় লোকেদের মধ্যে অনেকেই থাকে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামে এবং কিছু কিছু বাংলা, মাদ্রাজ, রাজপুতানা ও মধ্যভারতে। খ্রীষ্টানদের মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী লোকই থাকে দক্ষিণ ভারত ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যে। অবশিষ্ট খ্রীষ্টানেরা ছড়িয়ে আছে সারা ভারতে। পার্শী এবং ইহুদীরা প্রধানতঃ বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসী।

৬। বাড়তি ও ক্ষয়ের পথে বিভিন্ন সম্প্রদায়

ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের দিক থেকে জনসংখ্যার কথা বলতে গিয়ে আরও দু-একটি বিষয় বলা দরকার। ভারতের জনসংখ্যা যে ভাবে ও যে হারে বাড়ছে তার অর্থনৈতিক বিচার পরে করা যাবে। তবে ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা সমান ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১০'৪, মুসলমানদের ১৩'০, শিখদের ৩৩'৯ এবং খৃষ্টানদের ৩২'৫ ও উপজাতীয় সংখ্যা কমেছে শতকরা ১৫'৩। এ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে উপজাতীয় লোকেরা চলেছে ক্ষয়ের পথে। হিন্দুদের সংখ্যা কিছু বাড়ছে বটে ; কিন্তু বৃদ্ধির হার খুবই কম। যে অনুপাতে হিন্দুদের সংখ্যা বাড়ছে মৃত্যুর অনুপাত তার চেয়ে অনেক বেশী। তাই মোটের উপর হিন্দুরাও চলেছে ক্ষয়ের পথে। এর প্রতিকারের জন্যে চাই বৈজ্ঞানিক প্রজনন-পদ্ধতি ও সম্ভব হলে নূতন রক্তের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। মুসলমানদের সংখ্যা এখন বাড়তির পথে চলেছে। জীববিদ্যাবিষয়ক সিদ্ধান্ত (লেখকের 'অর্থশাস্ত্রের রূপরেখা' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে) অনুসারে এই বৃদ্ধি চলবে কিছু দিন ধরে। এর সহায়ক হবে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি। বাড়তি যখন তার চরম সীমায় পৌঁছাবে তখন আসবে একটা সুস্থির ভাব—লোকসংখ্যার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে। তার পরই জাতি চলবে ক্ষয়ের পথে। এই উত্থানপতন, হ্রাসবৃদ্ধির ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে মনুষ্য-সম্প্রদায়। এদেশের শিখ ও খ্রীষ্টানেরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সম্প্রদায় ; তাই এরা চলেছে দ্রুত বাড়তির পথে।

৭। ধর্ম্মানুক্রমিক জনসংখ্যার উপর দেশবিভাগের প্রভাব

দেশবিভাগের পর ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩২৭৮০০০০ ও পাকিস্তানের জনসংখ্যা ৬৬১২২০০০। উভয় রাষ্ট্রে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার চাপ হ'ল যথাক্রমে ২৫৫ ও ২০০। তার পর থেকে দেশে বহু পরিবর্ত্তন হয়েছে। জিন্না সাহেব যখন লোকবিনিময়ের যুক্তি দেখিয়েছিলেন সে সময় অনেকেই সেই প্রস্তাবকে অসম্ভব ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ; কিন্তু এই প্রস্তাবের সারবত্তা অচিরেই প্রমাণিত হ'ল। তবে বাস্তুত্যাগী জনপ্রবাহ হ'ল প্রায় একতরফা। হিন্দুস্থানের মুসলমানেরা প্রায় সবাই হিন্দুস্থানেই থেকে গেল ; মধ্যে থেকে বাস্তুত্যাগ করতে হ'ল পাকিস্তানের হিন্দুদের। এর ফলে পশ্চিম-পাকিস্তান অর্থাৎ সিন্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত-প্রদেশ ও পশ্চিম-পঞ্জাব আজ প্রায় হিন্দুশূন্য। পূর্ব্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা দলে দলে চলে আসছে পরোক্ষ অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে। ভারত-সরকারের দায় এতে বেড়েছে—শুধু মুসলমানদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার জন্যই নয় ; ভবিষ্যৎ অশান্তির কালে এই সব মুসলমান কি ধরণের মনোভাব অবলম্বন করবে সেদিক থেকেও। যেখানে ধর্ম্মগত ঐক্যবোধ এত বেশী সেখানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাময়িক আনুগত্যের উপর নির্ভর করে থাকলে দেশের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা থাকাই স্বাভাবিক। অথচ যথাসময়ে একটু কম উদার হয়ে যদি বাস্তববুদ্ধি অনুসারে ভারতবিভাগের প্রশ্নের মত লোকবিনিময়-ব্যবস্থা মেনে নেওয়া যেত এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যদি এই বিনিময় হ'ত তা হলে কোন অসুবিধারই সৃষ্টি হ'ত না।

৮। যৌন ও বর্ষানুক্রমিক জনসংখ্যা

এবারে যৌন ও বর্ষানুক্রমিক জনসংখ্যার বিচার করব। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিতে এর বিশেষ উপযোগিতা আছে। ১৯৪১-এর আদমশুমারি অনুসারে সারা ভারতে পুরুষের সংখ্যা হ'ল ২০১০২৬০০০ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১৮৭৯৭২০০০ অর্থাৎ প্রতি ১০০০ পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা হ'ল ৯৩৫ জন। ১৯৩১ সালে এই সংখ্যা ছিল ৯৪০ জন। এদিক থেকে অবশ্য চিন্তিত হবার কিছু নেই। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন স্তরের কথা যদি ধরা যায় তা হলে দেখা যাবে যে, মধ্যবিত্ত ঘরে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। আবার সমাজের নীচের স্তরে অনেক স্থলেই মেয়েদের সংখ্যা কম। এর সঠিক হিসাব দেওয়া কঠিন। তবে এই বৈষম্য ধরা পড়ে কতকগুলি সামাজিক প্রথার ভিতর। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কমবেশী পণপ্রথা বিদ্যমান

আছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশী বলে শুধু যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হতে পারছে না তা নয় সেই সঙ্গে যৌতুকপ্রদান প্রভৃতি কুপ্রথাও সমাজের ওপর চেপে বসে আছে। অপরপক্ষে, সমাজের নিম্নতম স্তরে যারা আছে তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। তাই তাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের বেশ প্রচলন আছে—এর জন্ত কোন যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন হয় নি। স্ত্রীলোকদের সংখ্যা সম্বন্ধে আর একটি বক্তব্য এই যে, এদেশে বালিকাদের সংখ্যা অন্ত দেশের তুলনায় বেশী হলেও প্রাপ্তবয়স্কাদের সংখ্যা অন্ত দেশের তুলনায় কম। এর প্রধান কারণ এই যে, মেয়েরা বাল্যাবস্থায় অর্থনৈতিক এবং অন্তবিধ কারণে উপযুক্ত যত্ন পায় না; এ ছাড়া প্রায়ই তাদের বিবাহ হয় অল্প বয়সে। অল্প বয়সে সন্তান হওয়ায় এবং পর পর অনেকগুলি সন্তানের জননী হওয়ায় তাদের জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হতে থাকে। পর্দাপ্রথাও স্ত্রীলোকদের স্বাস্থ্যভঙ্গের অন্ততম কারণ—বিশেষ করে বড় বড় শহরে যেখানে জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপে একটু খোলা হাওয়া পাওয়াও তাদের অনেকের পক্ষেই কঠিন। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কাদের অকালমৃত্যুর প্রধান কারণই হ'ল অল্প-বয়সে বিবাহ। আমাদের দেশেই যে সব অঞ্চলে বিবাহের বয়স কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সে সব অঞ্চলে কিছু ব্যতিক্রমও দেখতে পাওয়া যায়। বরোদা ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে বিবাহের বয়স সামান্ত একটু বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে শিশুমৃত্যু যেমন কমেছে তেমনি মেয়েদের জীবনীশক্তিও কিছু বেড়েছে। বিধবাদের সংখ্যাও আমাদের দেশে নিতান্ত কম নয়। এখানে শতকরা প্রায় ১৬ জন স্ত্রীলোক অল্প বয়সে বিধবা হয়; পূর্ণবয়স্কা বিধবারা এই হিসাবের বাইরে। ইংলণ্ডে অল্পবয়স্কা বিধবার সংখ্যা শতকরা ৮। এদের মধ্যে অনেকেই পুনর্বিবাহ করে। কিন্তু আমাদের এদেশের শতকরা ১৬ জন স্ত্রীলোকই মাতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় সামাজিক অব্যবস্থার ফলে। বিধবাদের এরূপ সংখ্যাধিক্যের মূলেও রয়েছে অল্প বয়সে বিবাহ। অবশ্য গত ৫০ বৎসরে বিধবাদের সংখ্যা কিছু কমেছে। ১৯০১ সালে সারা ভারতে প্রতি হাজারকরা ১৫ থেকে ৪০ বৎসরবয়স্কা বিধবাদের সংখ্যা ছিল ১৩৭। ১৯৩১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১১২তে। তন্মধ্যে আবার বাংলাদেশে বিধবাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। বাংলা-দেশে ১৯০১ সালে ১৫ থেকে ৪০ বৎসর বয়স্কা বিধবাদের সংখ্যা ছিল প্রতি হাজারে ২৪০; ১৯৩১ সালে এই সংখ্যা হ'ল ১৫৫। পঞ্জাবে বিধবাদের সংখ্যা সব চেয়ে কম—হাজারে মাত্র ৬৭ জন। ভারতবর্ষে বিভিন্ন বয়সে অবিবাহিতা স্ত্রীলোক ও বিধবাদের সংখ্যা নীচে দেওয়া হ'ল :—

(১৯৩১ সালের হিসাব)

বয়স	মোট স্ত্রীলোক	অবিবাহিতা	বিধবা	মোট স্ত্রীলোকের অনুপাতে অবিবাহিতা ও বিধবা স্ত্রীলোক (শতকরা)
১৫-২০	১৫৮৯৭৫১৪	২৩৬০৯৮৪	৫৩২৭৬২	১৮'২
২০-২৫	১৬৬৯৮০৯৬	১০২৯৭৭৩	৪৭৬৬৩৫	১১·৪
২৫-৩০	১৪৭২৪৫৬৫	৩৫৪৮৭৮	১৫৮০২০০	১৩'১
৩০-৩৫	১২৮১০৪৮৬	২৪৮৯৩৪	১৯৯৯৫৮৩	১৭'৫
৩৫-৪০	১০০৮৪৮৮৮	১৪৫৭০৮	২৮৪৮০৪৩	২৯'৬

এবারে বয়সের দিক দিয়ে জনসংখ্যার বিচার করা যাক। এদিক থেকে গত ৬০ বৎসরে ভারতীয় জনসংখ্যার হিসাব নিম্নলিখিত প্রকার :—

(প্রতি হাজারে)

বয়স	১৮৯১ পুং	১৮৯১ স্ত্রী	১৯০১ পুং	১৯০১ স্ত্রী	১৯১১ পুং	১৯১১ স্ত্রী	১৯২১ পুং	১৯২১ স্ত্রী	১৯৩১ পুং	১৯৩১ স্ত্রী
০-১০	২৮৩'৭	২৯২'৩	২৬৪'৮	২৭২'১	২৭১'০	২৮১'৬	২৬৭'৩	২৮১'০	২৮০'২	২৮৮'৯
১০-২০	১৯৭'৪	১৭৫'৮	২১৩'০	১৯১'৭	২০১'৩	১৮২'৩	২০৮'৭	১৮৯'৬	২০৮'৬	২০৬'২
২০-৩০	১৬৭'৮	১৮০'১	১৬৬'৬	১৭৮'৭	১৭১'৮	১৮৯'৯	১৬৪'০	১৭৬'৬	১৭৬'৮	১৮৫'৬
৩০-৪০	১৪৫'৫	১৪০'১	১৪৫'৭	১৪০'৮	১৪৫'১	১৩৯'১	১৪৬'১	১৩৯'৮	১৪৩'১	১৩৫'১
৪০-৫০	১০০'৪	৯৪'৯	১০১'৯	৯৯'১	১০১'৪	৯৬'৯	১০১'৩	৯৬'৭	৯৬'৮	৮৯'১
৫০-৬০	৫৯'০	৫৯'৬	৬১'৪	৬২'১	৬০'৯	৬০'৭	৬১'৯	৬০'৬	৫৬'১	৫৪'৫
৬০-৭০	—	—	—	—	৩৪'০	৩৮'০	৩৪'৭	৩৭'৭	২৬'৯	২৮'১
৭০ ও ঊর্দ্ধ	৪৬'২	৫৭'৩	৪৬'৬	৫৫'৫	১৪'৫	১৭'৫	১৬'০	১৮'০	১১'৫	১২'৫

এদেশে শিশুদের জন্ম সংখ্যা হ'ল সব চেয়ে বেশী। কিন্তু জন্মহারের ভার এদেশে শিশুমৃত্যুর হারও অত্যধিক। পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই শিশুদের সংখ্যা কম। এটা কিন্তু শিশুমৃত্যুর জন্যে নয়; এ হ'ল জন্মের হার কম বলে। বিষয়টি নীচের হিসাব থেকে বোঝা যাবে :—

বয়স	জাপান	ইটালী	জার্মানী	ইংলণ্ড ও ওয়েলস	যুক্তরাষ্ট্র	ফ্রান্স
০-১০	২৫৪	১১০	১৫৮	১৮১	২১৭	১৩৯
১০-২০	২১২	২০৯	২০৫	১৯০	১৯০	১৭৭
২০-৩০	১৫৮	১৬১	১৮৪	১৬১	১৭৪	১৫০
৩০-৪০	১২০	১২৯	১৪২	১৪৬	১৫০	১৪৩
৪০-৫০	১০৫	১০৬	১২৮	১৩২	১১৫	১৩৮
৫০-৬০	৭৪	৮৭	৯৬	৯৬	৭৯	১১৪
৬০ ও তদূর্দ্ধ	৭৭	১০৯	৯২	৯৪	৭৫	১৪০

উপরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য সব দেশেই শিশুদের সংখ্যা কম। ভারতীয় জনসংখ্যার সঙ্গে অন্য দেশের জনসংখ্যার পার্থক্য হ'ল এই যে, এদেশে বিভিন্ন বয়সের লোকের সংখ্যার পার্থক্য খুব বেশী; অন্যদেশে এই পার্থক্য খুব কম। আমাদের দেশে উর্দ্ধতম সংখ্যা হ'ল ২৮৮'৯ এবং নিম্নতম সংখ্যা ১১'৫। এ দুয়ের ব্যবধান কত বেশী। বয়স্ক লোকেদের সংখ্যা এদেশে গত ৬০ বৎসর ধরে দ্রুত কমে চলেছে। ১৮৯১ সালে ৭০ বা তার চেয়ে অধিক বৎসর বয়স্ক লোকের সংখ্যা ছিল প্রতি হাজারে ৪৬'২; ১৯৩১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র ১১'৫-এ। অথচ ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশে বৃদ্ধদের সংখ্যা প্রায় শিশুদেরই সমান। ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশেও বৃদ্ধদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। প্রৌঢ় (৪০ থেকে ৫০ বৎসর) লোকদের সংখ্যাও বেশ কমেছে; অথচ অন্যান্য দেশে প্রৌঢ়দের মৃত্যুহার সবচেয়ে কম; আর দেশের সকল ক্ষেত্রেই নেতৃত্বও করে এরাই। আমাদের দেশে পঞ্চাশের উপরে গেলেই পরকালের চিন্তা এসে পড়ে, মানুষ অবসর গ্রহণ করতে চায়। তাই এদেশে কর্মক্ষম লোকের বয়স হ'ল ১৫ থেকে ৪০; ইউরোপে ১৫ থেকে ৬০ বা ৬৫ বৎসর। এর ফলে এদেশে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা হ'ল শতকরা ৪০; ফ্রান্সে শতকরা ৫৩; ইংলণ্ডে ৬০। এদিক থেকেও আমাদের জনসম্পদের দৈন্যের কথা স্বীকার করতে হবে। কারণ পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় এদেশে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা শতকরা প্রায় ২০ জন কম। কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা বাড়ানও আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ এরাই দেশকে শ্রীমণ্ডিত করতে পারবে। এর জন্য এক দিকে যেমন জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন আবশ্যক, অন্য দিকে তেমনি আবার লোকের জীবনীশক্তি বাড়াবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। ১৯২০ সালের পর থেকে অবশ্য মৃত্যুর হার অনেকখানি কমেছে; কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় আমরা যে আরও অনেক পিছিয়ে আছি তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

৯। যৌন ও বর্ষানুক্রমিক জনসংখ্যায় হ্রাসবৃদ্ধি

যৌন ও বর্ষানুক্রমিক জনসংখ্যায় হ্রাসবৃদ্ধির তিনটি মূল কারণ আছে। প্রথমটি হ'ল জন্মহারের তারতম্য; দ্বিতীয়টি মৃত্যুহারের তারতম্য; এবং তৃতীয়, ব্যাধির প্রকোপ। ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে জন্ম ও মৃত্যুহার নির্ভর করে ফসলের উপর। ফসল যদি ভাল হয় তা হলে জন্মহার বাড়বে, মৃত্যুহার কমবে। ঠিক উলটো ফল ফলবে ফসল খারাপ হলে। ব্যাধির প্রকোপের সঙ্গেও জনসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। আবার ব্যাধিরও প্রকারভেদ আছে। সব রকমের ব্যাধি সকল বয়সের লোকের হয় না। যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা; এই ব্যাধি বৃদ্ধদের বড় একটা হয় না, শিশুরা ও যুবকেরাই এই রোগে আক্রান্ত হয়। যে দেশে এই ব্যাধির প্রকোপ বেশী হবে সে দেশে প্রজননশক্তিও আপনা থেকেই কমে আসে। পাশ্চাত্য দেশ থেকে আজ এই ব্যাধি প্রায় নির্বাসিত হয়েছে। কিন্তু এদেশে এর প্রকোপ খুব বেশী। ম্যালেরিয়ার প্রভাবও ঠিক একই ধরণের। তবে এর আর একটি বিশেষত্ব হ'ল এই যে, ম্যালেরিয়ার প্রভাব যেন মেয়েদের উপরই বেশী। এদেশের মেয়েরা প্রায়ই নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপযুক্ত যত্ন নেয় না; পুরুষেরাও এ বিষয়ে প্রায় উদাসীন। এ অবস্থায় মেয়েদের শরীরে যে ম্যালেরিয়ার বীজ প্রবেশলাভ করে তা যেন স্থায়ীভাবে আড্ডা গেড়ে বসে। এতে মেয়েদের গর্ভধারণ-ক্ষমতা প্রায় হ্রাস পায়। ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোকের সন্তানও স্বভাবতই দুর্ব্বল, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাবিহীন হয়ে থাকে। উপরি-উক্ত তিনটি কারণ ছাড়া জন্মহার নির্ভর করে আর একটি বিষয়ের উপর। সেটি হ'ল স্থানান্তর-গমন। কৃষিপ্রধান দেশে জনসমষ্টিকে নির্ভর করতে হয় অনিশ্চিত নৈসর্গিক কারণের উপর। অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে যদি ফসল নষ্ট হয়ে যায় তা হলে গ্রাম থেকে বহু লোক চলে আসে সহরে রোজগারের আশায়। এদের অধিকাংশই যুবক। ফলে গ্রামাঞ্চলে লোকসংখ্যা কমতে থাকে। ফসল যদি ভাল হয় তা হলে তাদের শহরে আসার কোন প্রয়োজনই হয় না।

বীরভূমের জাতি-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌরীহর মিত্র

বীরভূমে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতি বাস করে তন্মধ্যে কতকগুলির আচার-ব্যবহার রীতিনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

ঢেকারু—বীরভূমের লাভুলে, বেড়েলা, কামমোড়া, মহলা, জাহানাবাদ, রামপুর, চাঁপডুমরো, কুঁইড়ে (কুড়িয়া), হরিপুর, কুসুটিয়া, বান্দরগুলী, মল্লিকপুর, ভাহুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে সহস্রাধিক ঢেকারু জাতির লোকের বাস। এই জাতির আদি নিবাস কিন্তু বীরভূম নহে। মহম্মদবাজার, ডেহচা, ডামরা, গণপুর প্রভৃতি গ্রামে লৌহ-নিষ্কাশন জন্ত ইহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম দেশ হইতে আনীত হয়। লৌহ-নিষ্কাশন ইহাদের জাতীয় ব্যবসায় এবং লৌহশিল্পের জন্মদাতা বলিয়া ইহাদিগকে "কম্মকার" বা "কর্ম্মকার" বলা হয়। আবার অতিরিক্ত মদ্যপান হেতু ইহারা ঢিকার (ঢক্ ঢক্ করিয়া মদ্য-পান করা) জাতি বলিয়া অভিহিত হয়। তৎকালে কয়েক বৎসর এ জেলার উপরি-উক্ত বিভিন্ন স্থানসমূহে লৌহ নিষ্কাশিত হইবার পর কারখানাগুলি বন্ধ হইয়া গেলে ইহারা স্ত্রীপুরুষে দস্যুবৃত্তির দ্বারা জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় রত হয় এবং অল্প-কাল মধ্যেই ইহাতে তাহারা বিশেষ দক্ষ হইয়া উঠে। কিন্তু সরকার বাহাদুরের অক্লান্ত চেষ্টায় ইহারা এই নিন্দনীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহারা লোহার জিনিষ এবং মিশ্রিত পিতলের মাপা সের, পাই, পোয়া ইত্যাদি তৈরি করিয়া থাকে।

ইহারা দেখিতে বলিষ্ঠকায় এবং মাল বাগ্দীদের অপেক্ষা ইহাদের আকৃতি সুন্দর। ইহাদের গায়ের রঙ ময়লা। ইহাদের মেয়েদের দেহের গঠনও সুঠাম এবং মজবুত। ইহারা এ জেলায় আসিয়া বাংলা শিখিয়াছে, তবে ইহারা নিজেদের মধ্যে ভাঙা খোট্টাই ভাষার মত এক প্রকার ভাষায় কথা বলে।

ইহাদের টটেম বা সগোত্র মেষ। এই হেতু ইহারা মেষ ভক্ষণ করে না, তবে শূকর ও গোমাংসে ইহাদের আপত্তি নাই। চিচিড়া এবং বেঙে কুমড়া ইহাদের অভক্ষ্য ও অস্পৃশ্য। কারণ তাহাদের মতে প্রথমটি মেষের শৃঙ্গ এবং দ্বিতীয়টি মেষের উদর। ইহাদের গোত্র এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, এক কামার ভোজে মেষ-মাংস পরিবেশন করিবার অভিলাষ করিয়া একটি মেষ বলি দিলে ঐ দ্বিখণ্ডিত মেষ তৎক্ষণাৎ আকাশে উড়িয়া গিয়া তিন বার ঘুরপাক খাইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। সেই অবধি ইহাদের ধারণা যে মেষ তাহাদের আদি পুরুষ। আর কামার মেষ-খাতক বলিয়া সমাজ-পরিত্যক্ত হয় ও অপর দল স্বতন্ত্র জাতিতে পরি-গণিত হয়।

ইহাদের মেয়েরা ঘরের বাহিরে অপরের কোন কাজকর্ম্ম করে না। ঢেকারু জাতির মধ্যে "সাদা" বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও তাহা নিতান্তই বিরল। কেবলমাত্র বালিকা-বিধবাদের সাদা দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

অতি অল্প বয়সেই ইহাদের বিবাহ হয়। বিবাহে বর-পক্ষকে কন্যাপক্ষের হস্তে অবস্থাবিশেষে চারি টাকা হইতে ষাট টাকা পর্য্যন্ত পণ বাবদ দিতে হয়। বরপক্ষ নিতান্ত দরিদ্র হইলে কন্যাপণের হাত হইতে রেহাই পায়। পাছে জাত্যন্তর গ্রহণ করে এই আশঙ্কায় তাহাকে উক্ত দাবি হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়।

ঠাকুর, গুরু বা সমাজের প্রধান ব্যক্তির দ্বারা বিবাহের দিন স্থির করা হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে বরের দক্ষিণ হস্তের এবং কন্যার বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নখ ব্যতীত অপর সমস্ত অঙ্গুলির নখগুলি কাটিয়া ফেলা হয়। এই অনুষ্ঠানের পরে বর কন্যার বাড়ী বিবাহ করিতে যায়। বিবাহস্থলে পাঁচটি আম্রকলস পূর্ব্ব হইতেই বসানো থাকে। বর আসিবামাত্রই উক্ত কলসগুলির মধ্য হইতে, "ছামানি" কলসের জল তাহার মস্তকে ছিটাইয়া দিয়া বসিবার আসন দেওয়া হয় এবং কন্যাকে বরের নিকট আনা হয়। পরে বর-কন্যাকে কাপড় বা চাদর আবৃত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে বরের দক্ষিণ হস্তের এবং কন্যার বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ লম্বালম্বি ভাবে কাটিয়া দুই-এক বিন্দু রক্ত বাহির করিয়া দেয় এবং দুই-চারিটি আতপ ঐ রক্ত দ্বারা সিক্ত করিয়া লয়। এই রক্তসিক্ত আতপ লইয়া কন্যার পিতা বা তাহার অনুপস্থিতিতে অন্য কোন অভিভাবক বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করে এবং পরে কিছু কাঁসা, পিতলের বাসন, সামান্য চাউল ও দুই-একটি টাকা বরকে দেয়। বর এইগুলি গ্রহণ করিয়া কন্যার কপোলদেশ সিন্দূররঞ্জিত করিয়া তাহার মাথায় ঘোমটা দিয়া দেয়। এই ভাবে বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিয়ের ভোজে মদ না হইলে চলে না। যেমন করিয়াই হোক মদ যোগাড় করিতে হয়।

ইহারা মৃতদেহ দাহ করে এবং দশ দিন অশৌচ পালন করিয়া থাকে। অশৌচান্তে পশ্চিম হইতে খোট্টা নাপিত আসিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া যায়। খোট্টা নরসুন্দর না হইলে ইহাদের অশৌচ দূর হয় না। অন্য সময় এরূপ কড়াকড়ি বিধান দেখা যায় না। অশৌচান্তে গুরু এবং নাপিতকে যৎসামান্য অর্থদানের ব্যবস্থা আছে।

ঢেকারুরা অনেকেই গলায় মালা ও মস্তকে শিখা ধারণ করিলেও, ইহারা কিন্তু নিরামিষাশী নহে। খয়রাশোল থানার

ভাতুলিয়া গ্রামের বৈষ্ণব বাবাজীরা ইহাদের গুরুগিরি করিয়া কিছু উপার্জ্জন করে।

মনসা ইহাদের উপাস্য দেবতা। মাঘ মাসে অশ্বত্থমূলে ইহারা বেদী নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার উপর আলিপনা আঁকিয়া নিরাকার মনসার পূজা করে—বেদীর উপর মনসার কোন মূর্ত্তি স্থাপন করা হয় না। পূজায় বলি দিবার প্রথা নাই। মালবাগ্দীরা কিন্তু এই পূজায় ছাগ ও মেষ বলি দিয়া থাকে।

নরী বা সুরী—হেতমপুর, ইলামবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে সুরী জাতির প্রায় তিন শতাধিক লোক বাস করে। ইহাদের আদি নিবাস পশ্চিম অঞ্চলের কোন প্রদেশ। সম্ভবতঃ গালার কারবার উপলক্ষ্যে বীরভূমে ইহাদের আগমন হয়।

পাটনা এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যাহারা গালার কাজ করে তাহাদিগকে লাহেরী বলে। অনুমান এই লাহেরী শব্দটিই প্রথমে লোরী, লারী এবং ক্রমে নরী বা সুরীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

ইহারা গন্ধবণিক বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়। ইহাদের ভিতর গৈঁতালী (গুঁই), ভদ্র, সেন, দাস, লাহা এবং মহলন্দ এই ছয় প্রকার উপাধি দেখা যায়।

গৈঁতালি বা গুঁইদের গোত্র বিষ্ণু, ভদ্রদের বিষ্ণু ও বশিষ্ঠ, সেনদের কুম্ভ, দাসদের বশিষ্ঠ এবং মহলন্দদের মহেন্দ্র বা মাহেন্দ্র।

তন্তুবায় জাতির ন্যায় সুরী জাতির স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই কর্ম্ম-বিভাগ পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। নদীয়া কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পের প্রতিযোগিতায় গালার কারবার উঠিয়া যাওয়ায় সুরীজাতির কেহ কেহ এখন চাষবাসে রত হইয়াছে।

ইহাদের আচার-ব্যবহার নবশাখ জাতির অনুরূপ। নবশাখদের ন্যায় ইহারাও অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ দিয়া থাকে। সাঙা বা বিধবাবিবাহের প্রচলন ইহাদের মধ্যে নাই। বীরভূমের লোকেরা ইহাদের ছোঁয়া জল খায় না ; কিন্তু অন্যত্র ইহারা জলাচরণীয়।

ইহাদের ব্রাহ্মণ-গুরু আছে। বর্দ্ধমান জেলার ব্রাহ্মণেরা ইহাদের ক্রিয়াকাণ্ডে পৌরহিত্য করিয়া থাকেন।

বগধ, বাগতীত বা বাগ্দী—ইহারা বীরভূমের অতি প্রাচীন জাতি। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি শুনা যায়। একবার পার্ব্বতী নাকি শিবের চরিত্রবল পরীক্ষার জন্য জেলেনীর বেশ ধারণ করিয়া শিবকে দেখা দেন। শিব জেলেনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গ লাভ করেন। পরে, পার্ব্বতী আত্মপরিচয় দিলে শিব ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান বাগ্দীরূপে পরিচিত হইবে এবং মৎস্য ধরিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিবে।

এই জাতির তেঁতুলে, দোড়া বা দুলে বা ডুলে (যাহারা ডুলি বহন করে), কুসমেটো বা কুশাগ্রয় এবং কেওট বা মেটে বা মাছাড়ো এই চারিটি শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে তেঁতুলিয়াই শ্রেষ্ঠ। ডুলেরা নিম্নশ্রেণী বলিয়া গণ্য। ডুলে ব্যতীত অপর তিন শ্রেণীর ভিতর বিবাহের আদান-প্রদান আছে। ত্রয়োদশা নামক আরও একটি শ্রেণীর কথা শুনা যায়। এদের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে মজার গল্প প্রচলিত আছে :—শিবের নাকি কতকগুলি উপপত্নী ছিল। পার্ব্বতী ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া এই উপপত্নীদের অনিষ্টসাধন করিতে আরম্ভ করিলে শিব তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলেন যে, তাঁহার গর্ভে অচিরেই একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করিবে। ফলে পার্ব্বতীর যমজ সন্তান জাত হয়। এই যমজ ভ্রাতা-ভগিনী পরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইহাদের মিলনের ফলে বিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বীরের জন্ম হয়। হাম্বীরের চারি কন্যার নাম শান্ত, নেতু, মান্ত ও কেতু। এই চারি জন হইতেই উপরি-উক্ত চারি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ইহাদের চার শ্রেণীকেই এক হুঁকায় তামাক খাইতে দেখা যায়।

ইহারা মাছ ধরে, চৌকিদারের কর্ম্ম করে, পাল্কী বহন করে, চাষবাস করে, চূণ তৈয়ারি করে এবং মজুর খাটে। মৎস্য ধরাই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা নয়। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য নানাপ্রকার কর্ম্মে ইহারা লিপ্ত হয়। ইহাদের মেয়েরা জালি লইয়া পুকুরে ছোট ছোট মাছ ধরিয়া যৎসামান্য রোজগার করিয়া থাকে।

ইহারা অতি অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেয়। বিবাহের দিন সকালবেলা প্রথমে মহুয়া গাছের সঙ্গে বরের বিবাহের অভিনয় হয়। বর ঐ গাছকে আলিঙ্গন করে, তার পর উহার গায়ে সিন্দুর লেপিয়া দেয় এবং নিজের ডান হাতের কব্জীতে সূতা বাঁধে। বৃক্ষালিঙ্গনান্তে সূতা দিয়া মহুয়া-পত্র বাঁধে। সন্ধ্যার সময় মিছিল করিয়া বর কন্যার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়। শোভাযাত্রা বাড়ীর উঠানে উপস্থিত হইলে কন্যাপক্ষীয়েরা তাহার গতিরোধ করে। তখন উভয় পক্ষে কৃত্রিম যুদ্ধ হয়। সকল ক্ষেত্রে বরপক্ষই জয়লাভ করে—ইহাই রীতি। শালপল্লবরচিত কুঞ্জের চারি দিকে তেল হলুদ প্রভৃতি রাখিয়া দেওয়া হয়। এই সময় কিছু মাছ দেখাইয়া মেয়েরা বরকে সাদরে অভ্যর্থনা করে। এইরূপ অভ্যর্থনাকে 'হেতুতি' বলে। ছাঁদনাতলায় একটি ছোট চৌকা গর্ত্ত খনন করা হয়। কনে পল্লবগুচ্ছ হস্তে বিবাহস্থলে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থান শত বার প্রদক্ষিণ করে এবং পরে গর্তটিকে মধ্যস্থলে রাখিয়া বরের মুখোমুখি বসে। পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়া বরকনে উভয়ের এবং কনের কোন বয়োজ্যেষ্ঠা আত্মীয়ার ডান হাত একসঙ্গে বাঁধিয়া কন্যাসম্প্রদানপূর্ব্বক বর-কনেকে আশীর্ব্বাদ করেন। বর সিন্দুরের কৌটা বাম হস্তে লইয়া কনের কপালে ও সিঁথিতে তিন বার সিন্দুর লেপিয়া দিয়া তাহার মাথার

ঘোমটা টানিয়া দেয়। পরে পরস্পর পরস্পরকে ফুলের মালা উপহার দিয়া থাকে। পরদিন বর বধূকে লইয়া নিজ বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে। বিবাহের পর চার দিন পর্য্যন্ত বর-কনের গাঁটছড়া বাঁধা থাকে।

তেঁতুলে বাগ্দী ব্যতীত অপর সকল শ্রেণীর ভিতর বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাবিবাহে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। বর-কনে সামনাসাম্‌নি হইয়া মাদুরের উপর বসে এবং একে অপরের কপালে হলুদ ও জল ঠেকাইয়া দেয়। পরে চাদর দিয়া বর-কনেকে আচ্ছাদিত করা হইলে বর কনের বাম হস্তে "নোয়া" (লৌহ-বলয়) পরাইয়া দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিধবা ইচ্ছা করিলে তাহার দেবরকেও সাঙা করিতে পারে।

উপযুক্ত কারণ ঘটিলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইতে পারে। সাধারণতঃ স্ত্রী বন্ধ্যা, অসতী, অবাধ্য বা সামাজিক বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে স্বামী তাহার হস্ত হইতে 'নোয়া' খুলিয়া লইয়া একটি কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলে। স্ত্রী ছয় মাস পর্য্যন্ত খোরপোষের দাবি করিতে পারে এবং সে ইচ্ছা করিলে পুনরায় বিবাহও করিতে পারে।

কেহ কোনরূপ অন্যায় আচরণ করিলে সমাজের মাতব্বর-গণ তাহার অপরাধের বিচার করে, তাহাদের বিধান অনুযায়ী দোষীকে জরিমানা দিতে হয়। অন্যথায় সে সমাজ-চ্যুত হয়।

সাধারণতঃ ইহারা শবদেহ নদীগর্ভে বিসর্জন দেয় বা মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলে, অনেকেই আবার শব দাহ করিয়া অস্থি বা ভস্মাবশেষ গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। তেঁতুলে ও কুশমেটেদের ৩১ দিনে, ত্রয়োদশাদের ১৩ দিনে, দোড়া বা দুলেদের ১১ দিনে অশৌচান্ত হয়।

ইহারা শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে বেলগাছের তলায় বেদী নির্ম্মাণ করিয়া উপদেবতার পূজা করে এবং তদুপলক্ষ্যে ছাগ, মেষ প্রভৃতি বলি দেয়। তাহাদের নিজ সম্প্রদায়েরই একজন পূজা করে। পূজাকালে তাহার উপর দেবতার ভর হয়। এই সময় পূজাস্থানে বহু স্ত্রী-পুরুষকে সমবেত হইতে দেখা যায়।

এতদ্ব্যতীত ইহারা দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা, ষষ্ঠী ঠাকরুণ, জগদ্ধাত্রী, কার্ত্তিক, মনসা প্রভৃতি বিভিন্ন দেবদেবীর ও ধর্ম্মরাজের পূজা করিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, মাঘ ও চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ষাট পূজা এবং ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও চৈত্র মাসে লক্ষ্মীপূজা করিয়া থাকে।

ইহাদের ভিতর শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আছে। তবে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেও মদ্যপান করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাথায় শিখা রাখে এবং গলায় মালা পরে। আবার কেহ কেহ ব্যাঘ্রক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে।

মাল—মাল বাগ্দীশ্রেণীর জাতিবিশেষ। ইহাদের মধ্যে (১) রাজছত্রধারী বা ছত্রধারী, (২) রাজবংশী, (৩) মল্লিক, (৪) পাহাড়ী (৫) কোল ও (৬) কাদর এই ছয়টি শ্রেণী আছে। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের আদানপ্রদান নিষিদ্ধ এবং এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোকের রান্না ভাত খায় না, এমন কি দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এক হুঁকায় ধূমপান পর্য্যন্ত করে না।

ইহারা মৎস্যশিকার, চাষবাস, জনখাটা, চৌকীদারী-কার্য্য ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। রাজছত্রধারীরা মালীর কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতে গরু, ছাগল, মেষ প্রভৃতি নানা গৃহপালিত জীবজন্তু থাকে।

উপরি-উক্ত শ্রেণীসমূহের মধ্যে মল্লিকরাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই বিধবাবিবাহের রেওয়াজ আছে। তবে সাধারণতঃ বিপত্নীকেরাই বিধবাকে 'সাঙা' করিয়া থাকে। ইহাদেরও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত আছে। ইহারা কালী, দুর্গা, মনসা প্রভৃতি দেবীর পূজা করিয়া থাকে। উপদেবতার উপাসনাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। ইহারা প্রেত-পূজায় মুরগী বলি দেয় বটে, কিন্তু ইহারা হিন্দুধর্ম্মমতে নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্যাদি আহার করে না। ইহাদের অনেকের গলায় মালা আছে।

ইহারা শব দাহ না করিয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করে।

কেবট বা কৈবর্ত্ত—মনুসংহিতায় দেখা যায় যে, নিষাদ জাতীয় এক পুরুষ মৃত-বস্ত্র-পরিহিতা কদর্য্যান্ন-ভক্ষণকারিণী স্ত্রীর গর্ভে নৌকর্ম্মজীবী দাস বা মার্গব নামক পুত্র উৎপাদন করে। আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী মানবগণ তাহাকে কৈবর্ত্ত জাতীয় বলে। পরশুরাম সংহিতায় লিখিত আছে, স্বর্ণকার পুরুষ ও কুবেরিণী নারীর মিলনের ফলে জাত সন্তান কৈবর্ত্ত জাতীয় নামে পরিচিত। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে যে, গোপ পুরুষ এবং শূদ্র স্ত্রীলোকের মিলনে ধীবর অর্থাৎ কৈবর্ত্ত এবং শুঁড়ি এই দুই জাতির উৎপত্তি হয়। আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে যে, ক্ষত্রিয় পুরুষ দ্বারা বৈশ্য নারীর গর্ভে কৈবর্ত্তের জন্ম হয়।

এই জাতি বীরভূমের বহু পুরাতন অধিবাসী হইলেও ইহাদের আদি নিবাস কিন্তু উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। ইহাদের মধ্যে কেহ চাষী কৈবর্ত্ত, কেহ জেলে কৈবর্ত্ত—কেহ বা আবার চাষবাস এবং মৎস্যশিকার এই উভয় বৃত্তি দ্বারাই জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। ইহাদের প্রধান বৃত্তিই হইল খানা-ডোবা বিল পুকুর ও নদী হইতে বিভিন্ন উপায়ে মৎস্যশিকার করা।

ইহারা শুধু কৈবর্ত্ত নামেই অভিহিত হয় না। ইহাদের পরিচয়জ্ঞাপক নিম্নোক্ত আটটি নাম পাওয়া যায়। (১) ধৈবর বা ধীবর (যাহারা সরোবরের দুই দিকে জাল বাঁধিয়া মাছ ধরে), (২) দাস (বঁড়শী দিয়া যাহারা মাছ ধরে), (৩) বৈন্দ

(মুকসপুরের নিকটস্থ জলে বিন্দুজাল দিয়া যাহারা মৎস্য-শিকার করে), (৪) শৌকল (তড়ল বঁড়শী দ্বারা মাছ ধরা যাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়), (৫) কৈবর্ত (বড় জালের সাহায্যে যাহারা মাছ ধরে), (৬) মার্গার (ইহারাও জাল দিয়া মাছ ধরে), (৭) আন্দ (ঘাটে 'সাহু' বাঁধিয়া যাহারা মাছ ধরে) ও (৮) পর্ণক (বিষাক্ত পাতা জলের উপর ফেলিয়া যাহারা মাছ ধরে)। কিন্তু আমাদের এখানে মাত্র কৈবর্ত্ত, দাস, মার্গার প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়।

এই জাতির স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই মৎস্য বিক্রয় করিতে দেখা যায়। বড় বড় কাতলা মাছ পাইলে ইহারা তাহার মুখের ভিতর হাত পুরিয়া তালুর তৈলযুক্ত অংশ বাহির করিয়া লইয়া কাঁচাই গিলিয়া ফেলে।

এই জাতির ছেলেমেয়েদের অতি শৈশবেই বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সাঙার প্রচলন নাই।

ইহারা প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে পচুই মদ খায়। এই জাতির প্রায় সকলেই নিরক্ষর, তবে আজকাল কেহ কেহ মাত্র নিজের নাম সহি করিতে পারে।

সদ্গোপ—এই জাতির প্রাচীন নাম গোপ। ইহারা সৎশূদ্র বলিয়া পরিচিত। পরাশরস্মৃতে লিখিত আছে যে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্র-কন্যার গর্ভে জাত পুত্রকে সদ্গোপ বলিয়া জানিবে। ইহাদের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলার গোপভূম পরগণা।

অতি প্রাচীনকালে ইহারা বীরভূমে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। এই জাতি নবশাখ বা নবশায়ক নামে গণ্য। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ইহাদের হাতে জল খায় এবং ইহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণরক্ষা করে। কৃষিকার্য্যই ইহাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। ইহাদের মধ্যে বিত্তশালী ব্যক্তি ও জমিদারের অভাব নাই। এই জাতির উপাধি মণ্ডল, ঘোষ, রায়, রায়চৌধুরী প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে অনেকেই লেখাপড়া শিখিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। ঘোষ উপাধিধারী সদ্গোপগণ নীলপুরের ঘোষ বলিয়া খ্যাত। এ সম্বন্ধে একটি ছড়াও প্রচলিত আছে। তাহা এই:—

বড় বড় বর্দ্ধমান,
চার চণ্ডী বিরাজমান,
উত্তরে কনকা নদী,
মধ্যে গঙ্গা ভাগিরথী,
দেখ প্রভু সনাতন
অনেকে করিয়া রণ
রণ করি নীলপুরে যায়,
নীলপুরে গিয়া দেখি চাষায়ের স্থান,
এক দিকে বসিলেন যত মুনিগণ
অপর দিকে বসিলেন গোপের নন্দন।
ঘড়িকা ঢুঁড়িয়া দেখ নাহি কোন দোষ,
সেইজন্ত বলি মোরা নীলপুরের ঘোষ।

ইহাদের ভিতর সাঙা বা বিধবাবিবাহের প্রচলন নাই।

ভল্ল—লাভপুর ও মৌরেশ্বর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধানতঃ এই জাতির বাস। পূর্ব্বে এদেশে সেন প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিধারী যে সমস্ত সামন্ত রাজা রাজত্ব করিতেন, ইহারা তাঁহাদের অধীনে সৈনিকের কর্ম্ম করিত। ইহারা ভল্ল লইয়া যুদ্ধ করিত বলিয়া ভল্ল বা ভল্লা জাতি নামে পরিচিত হয়। ইহাদের বর্ত্তমান আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়াও ইহাদিগকে বীর ও সাহসী বলিয়াই মনে হয়। বাগ্দী-জাতির সহিত নানা দিক দিয়া ইহাদের সাদৃশ্য আছে। বাগ্দীদের সহিত এক হুঁকায় তামাক খাইলেও ইহারা নিজেদের বাগ্দী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া মনে করে।

বাগ্দী-জাতির মত ইহারা মৎস্যশিকার বা পাল্কীবাহকের কার্য্য করে না। ইহারা জন খাটিয়া, চাষবাস করিয়া জীবিকার সংস্থান করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই চৌকীদারী ও দ্বারবানের কর্ম্ম করিয়া থাকে। ইহাদের জীবিকা অর্জ্জনের অন্যতম উপায় হইতেছে দস্যুবৃত্তি। ইহাদের মধ্যে অনেক ওস্তাদ লাঠিয়াল আছে।

বাগ্দীজাতির ন্যায় ইহারাও মদ্যপানে বিশেষ আসক্ত।

লেট—তীবর পুরুষ ও তৈলকার স্ত্রীর মিলনে দস্যু লেটজাতির উৎপত্তি। ইহারা মালবাগ্দীর সমস্তরের জাতি। রামপুরহাট মহকুমা অঞ্চলে প্রধানতঃ ইহাদের বাস। ইহাদের মধ্যে সিতু বা সেতু, কেতু, শাণ্ড এবং মন্ত—এই চারিটি শ্রেণী বা থাক্ আছে। তবে এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর বিবাহ সম্বন্ধীয় সম্পর্কের আদান-প্রদান হয় না। এমন কি সমশ্রেণী ব্যতীত অপর শ্রেণীর রান্না পর্য্যন্ত ইহারা খায় না। ইহারা ডাকাতি, দিনমজুরি, জালবোনা, মাছ ধরা প্রভৃতির দ্বারা জীবিকার সংস্থান করে। মালবাগ্দীর সমজাতি হইলেও ইহারা তাহাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া আহার করে না। বাগ্দীরা বলে যে, তাহাদেরই একশ্রেণী হইতে লেট জাতির উৎপত্তি; কিন্তু লেট জাতির লোকেরা এ কথা স্বীকার করে না।

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে বা তাহার খোরপোষের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে। মনসা এবং ধর্ম্মরাজের প্রতি ইহাদের বিশেষ ভক্তি। ইহারা সমারোহের সহিত উক্ত দেবতাদ্বয়ের পূজা করিয়া থাকে।

সাঁওতাল জাতি—এই জাতির সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ বাংলা মাসিক পত্রিকাদিতে বাহির হইয়াছে।

ধাঙড়—এই জাতির লোকদের বীরভূমের বহু স্থানেই দেখা যায়। ইহাদের আদি নিবাস পশ্চিম অঞ্চল। ধাঙড় জাতির দুধি কোড়া, দুধি কোড়া, ধাঙড় ও সাঁওতাল

সদ্গোপ কন্যা

সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ

এই চারিটি শ্রেণী বা থাক্ আছে। এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর বিবাহ হয় না। কথিত আছে যে, ইহারা পূর্ব্বে দীঘি, জলাশয় প্রভৃতি খনন করিত। এইজন্য ইহাদের কোড়া (খোঁড়া বা খনন হইতে) পদবী হইয়াছে। সাঁওতাল জাতির ন্যায় ইহারা সহজে কাহারও উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে না। তবে বিবাহাদি উপলক্ষে ইহারা যে পক্ষের পাল্কী বহন করে সেই পক্ষের বাড়ীতে ভোজন করে।

ইঁদুর ধাঙড় জাতির প্রিয় খাদ্য। ইহারা মদ্যপানে বিশেষ আসক্ত, সারাদিন মজুর খাটিয়া দিনান্তে ইহারা প্রচুর পরিমাণে মদ খায় এবং পরদিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখে। সকালে উঠিয়াই উহা গরম করিয়া গলাধঃকরণ করে। ভাতের সঙ্গে ইহারা ব্যাঙ বা ইঁদুরপোড়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত খাইয়া থাকে। ইহারা দুর্গা, কালী, শিব, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করে। ইহাদের বিবাহে বরপণের রেওয়াজ আছে। কনের বয়স কমপক্ষে ১০।১২ বৎসর এবং বরের বয়স ২০।২২ বৎসর হওয়া উচিত। বিবাহে কন্যাপক্ষের তরফ হইতে ছেলের বাপকে পণস্বরূপ ৭।০ টাকা দিতে হয়। ঐ পণ দিতে না পারিলে বিবাহ হয় না। বিবাহে বরপক্ষকে রূপার ও পিতলের গহনা দিতে হয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বরযাত্রী যায়। বিবাহে কর্ত্তা নিজেই পুরোহিতের কর্ম্ম করে। ইহাদের স্বতন্ত্র পুরোহিত নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহের সময় বর গাছের উপর চড়িয়া বসিয়া থাকে; আর কনে নীচে হইতে বরকে ডাকিয়া বলে—

গাছে থেকে নাম তুমি
মাটি কেটে খাওয়াব আমি।

বিবাহের সময় মাদলের বাজনা ও গীত হয়। মেয়েরা গীতচ্ছলে বরপক্ষকে উপলক্ষ্য করিয়া ঠাট্টা-তামাশা করিয়া থাকে। কোন পরিবারে সন্তানের জন্ম হইলে ইহারা অশৌচ পালন করে। সাধারণতঃ বার কিম্বা মাসের মাথে ইহাদের ছেলেমেয়েদের নামকরণ হয়। ইহাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা নাই। তবে বিধবাবিবাহ বা সাদা আছে। পুরুষ যত বার ইচ্ছা তত বার বিবাহ করিতে পারে।

ইহারা শবদাহ করে, ক্ষেত্রবিশেষে গোরও দেয়। ইহারা দশ দিন অশৌচ পালন করিয়া শ্রাদ্ধক্রিয়াদি সম্পন্ন করে। এই সময় জ্ঞাতি-কুটুম্বদিগকে ভাত আর মদ খাওয়াইতে হয়।

ইহারা স্ত্রীপুরুষ উভয়ে প্রধানতঃ মাটি কাটিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। চাষবাসের কাজও ইহারা করিয়া থাকে। ধাঙড় মেয়েরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। ইহারা এক মুহূর্ত্তও আলস্যে অতিবাহিত করে না। অবসর সময়ে ইহারা খেজুর পাতার মাদুর বুনিয়া বাড়তি বেশ দু'পয়সা উপায় করিয়া থাকে। মাঠে ধান তুলিবার সময় উঞ্ছবৃত্তি দ্বারাও ইহারা ধান্যসংগ্রহ করে। সাঁওতাল জাতির মেয়েদের ন্যায় এই জাতির মেয়েরাও গাছে চড়িতে অভ্যস্ত। ইহারা স্বর্পের সাহায্যে ধান-চাউলের ধূলাবালি পৃথক করিতে ওস্তাদ। ধাঙড় স্ত্রীলোকেরা শিশু-সন্তানগুলিকে কাপড় দিয়া পিঠে বাঁধিয়া লইয়া কাজকর্ম্ম করিতে বাহির হয়। ইহারা খুব কর্ম্মঠ। সাঁওতাল জাতির ন্যায় ইহারা কখন কখন গো-মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে।

ইহাদের নিজস্ব ভাষা থাকিলেও বাঙালীর সান্নিধ্যে বাস করায় ইহারা বাংলা বুঝিতে ও বলিতে পারে। সাঁওতালদের ন্যায় ইহারা ২০-র বেশী গুনিতে পারে না। ২০-র বেশী গুনিতে হইলে 'এককুড়ি এক' 'এককুড়ি দুই' এই ভাবে গণিয়া থাকে।

ডোম—লেট জাতীয় পুরুষের ঔরসে চণ্ডাল-কন্যার গর্ভে হাড়ি ও ডোম এই দুই সন্তানের জন্ম হয়।

সদ্যশ্চাণ্ডালকন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌনক।
বভূবতুর্স্তৌ দ্বৌ পুত্রৌ দুষ্টৌ হড্ডি ডোমৌ তথা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ

ইহারা নিজেদের উৎপত্তি ও আদি বাসস্থানের বিষয় কিছুই

সাঁওতালদের মাঝি থান

বলিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে 'বিশ ডেলে' 'আকুড়ে, 'শাজুনে' ও 'বাজুনে' এই চারিটি থাক দেখা যায়। শাজুনেরা ঝুড়ি, চৌকা, পেছি, ডালি, পাখা, খাঁচা, লাটাই, চিক, ঝাকরি প্রভৃতি বুনিয়া থাকে। বাজুনেরা নহবৎ, ঢোল, কাঁসর, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাদন করে। ইহাদের সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ইচ্ছা করিলে ইহারা শালীকে বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পুরোহিত আছে। পুরোহিত-ঠাকুরকে ইহারা "ধরম পণ্ডিত" বলে। বিবাহে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে।

ডোমজাতির মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আছে। ইহারা কালী, সরস্বতী, মনসা এবং বিশ্বকর্ম্মার পূজা করে। বিশ্বকর্ম্মাকে ইহারা "বিস্থকমূকর" বলে। ইহারা যে ছোট কাটারি দিয়া বাঁশ কাটে এবং বাঁশের শিল্পদ্রব্যাদি তৈয়ারি করে সেটি ভাদ্র মাসের শেষ দিনে বিশ্বকর্ম্মার পূজার নিবেদন করে। ইহাদের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন লোকেরা মৃতদেহ দাহ করিয়া তাহার ভস্ম বা অস্থি লইয়া গঙ্গায় দিয়া আসে। সাধারণ গরীব লোকেরা শব নদীগর্ভে বিসর্জন দেয়। ইহারা গাভীকে "মা লক্ষ্মী" বলে এবং গোজাতিকে বিশেষ সম্মান করে।

ঢোল, কাঁসর, সানাই, রসুনচৌকী, নহবৎ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদন এবং বাঁশের নানাবিধ শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ ইহাদের জাতীয় ব্যবসায়।

হাড়ি—ময়লা পরিষ্কার করা হাড়িদের জাত-ব্যবসা, কিন্তু বীরভূমের হাড়িরা সকলেই মেথরের কর্ম্ম করে না। এখানে (১) ভুঁইমালী, (২) দাই বা মূল হাড়ি, (৩) কাহার এবং (৪) মেথর এই চারি শ্রেণীর হাড়ি আছে। শেষোক্ত শ্রেণীর হাড়িরাই মেথরের কর্ম্ম করিয়া থাকে। মেথর-হাড়িরা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—বাঙালী, মঘরা ও বাঁশওয়ারী। কাহার-হাড়িরা সুরধরের কর্ম্ম করে। কাহারও দাই-হাড়ির ব্রাহ্মণ-পুরোহিত আছে। ইহাদের মধ্যে কালী-ভক্তের সংখ্যাই বেশী। ইহারা স্ত্রীপুরুষ সকলেই একসঙ্গে বসিয়া সন্ধ্যার সময় হাঁড়ি হাঁড়ি পচুই মদ খায়। ইহারা সময় বিশেষে গো-মাংস ও ইঁদুরপোড়া খাইয়া থাকে।

শৈশবেই ইহারা ছেলেমেয়ের বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া ফেলে। বিবাহ উপলক্ষ্যে স্ত্রী-পুরুষে মদ খাইয়া মাদল-বাদ্যের সহিত একসঙ্গে নৃত্য-গীত করে। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে এই জাতির অনেকেই মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

বাউরি—বীরভূমে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার বাউরির বাস; ইহাদের মোলো, ধোলে, গোবৃরে ও কাহারে—এই চারিটি "থাক্" বা শ্রেণী আছে। প্রবাদ আছে যে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মুনিঋষিদের জালানি কাঠ সংগ্রহের কর্ম্ম করিত। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ইহারা অনেকেই ব্যাঙ,

মাঝিরা নাগড়া ও মাদল বাজাইতেছে

শূকর ও গো-মাংস ভক্ষণ করে। ইহারা মুসলমানদের রান্না খায়। ইহাদের মধ্যেও অনেকেই মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

বিবাহের সময় কন্যার কোন পিতৃবন্ধু বরকে কোলে করিয়া ছাদ্‌নাতলায় লইয়া আসে এবং এইরূপভাবে কন্যাকেও তথায় আনা হয়। তৎপরে মালা বদল হইলে বর-কন্যা ঘরের ভিতর যায়। পরদিন কন্যার সিঁথিতে সিন্দুর ও হাতে

কর্ম্মরতা বাউরি রমণী

'নোয়া' পরানো হয়। ইহাদের সমাজে ছোট মেয়েও কোলে চাপিয়া শ্বশুরবাড়ীতে স্বামীর ঘর করিতে যায়।

ইহাদের সমাজে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। পিতা-মাতার মৃত্যুর ৩৬ ঘণ্টা পরে পুত্র নিমপাতা মুখে দিয়া জ্ঞাতির সহিত ভোজন করে এবং পরে আবার নিমপাতা মুখে দেয়। ইহার পর স্নান করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানে এক গুচ্ছ বেনামূল প্রোথিত করে এবং দশ দিন প্রত্যহ স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই বেনামূলে চাউল, ভিজা ছোলার দানা ও জল নিবেদন করিয়া পুনরায় স্নানান্তে বাড়ী ফিরে।

ইহারা চৈত্র-সংক্রান্তি এবং মহালয়ার দিন পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে।

মুচী—তিবর-পিতার ঔরসে এবং চণ্ডাল-মাতার গর্ভে এই মুচী বা চর্ম্মকার জাতির উৎপত্তি। 'তিবরেণৈঃ চণ্ডালাৎ চর্ম্মকারো বভূব' (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)। ইহারা রুইদাস এবং মুচীরাম দাস নামক দুই সাধু ব্যক্তির বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়।

ইহাদের মধ্যে (১) রুইদাস, (২) গুড়ে, (৩) খোলটা, (৪) শিখুরে, (৫) আদি বা রাঢ়ী ও (৬) কোনাই—এই ছয়টি শ্রেণী আছে।

ইহারা কালী এবং দুর্গার পূজা করে, কিন্তু গো-মাংস খায়।

রুইদাস মুচীদের গলায় মালা আছে। তাহারা সাধারণতঃ তাঁতের কাজ করে। অন্যান্য শ্রেণীর মুচীরা জুতা তৈয়ারি, ঢাক বাদন প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা অর্জন করে।

(১৫) তন্তুবায়—ইহারা তন্ত্রবাপ, তন্ত্রবায়, তন্ত্রী বা তাঁতি নামে আখ্যাত। এই জাতির স্ত্রী-পুরুষ রেশম, তসর ও সুতার থান, শাড়ী, ধুতি, চাদর, গামছা প্রভৃতি বয়ন করিয়া জীবিকা অর্জন করে।

ইহারা উত্তর, মধ্যম, বারেন্দ্র ও পূর্ব্বকূল—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং এই সকল থাকের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। ইহাদের উপাধি দাস, দত্ত, চন্দ্র, কুমার, কুনদাই, পুরো প্রভৃতি। পূর্ব্বোক্ত চারিটি থাক্ ব্যতীত ইহাদের শোনা, ভক্তে, বরবটে, মুহুরে, হাত-বেড়ে প্রভৃতি আরও বাইশটি থাক্ বা শ্রেণী আছে। ইহাদের সমাজে সগোত্র বিবাহের প্রচলন নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ঘৃতাচী বিশ্বকর্ম্মার কোনও আদেশ অমান্য করিলে তিনি তাঁহাকে এই অভিশাপ দেন যে, তাহাকে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ঘৃতাচীও বিশ্বকর্ম্মাকে অনুরূপ অভিশাপ দেন। ফলে, বিশ্বকর্ম্মা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ-বংশে এবং ঘৃতাচী গোপ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঘৃতাচী ঈশ্বরভক্তিপরায়ণা ছিলেন। একদিন

একটি ডোম পরিবার

যখন তিনি গঙ্গাতীরে ধ্যানস্থা তখন ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন এবং অবশেষে তাঁহারা পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। ফলে তাঁহাদের মালাকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, কংসকার, শঙ্খকার, তন্তুবায়, সূত্রধর, স্বর্ণকার ও চিত্রকর—এই নয় পুত্রের জন্মলাভ হয়।

ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে এবং গোপমাতার গর্ভে তন্তুবায়দের জন্ম বলিয়া ইহারা বিশ্বকর্ম্মাকে কুলদেবতা বলিয়া পূজা করে। ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীর দিন এই পূজা হয়।

মাল স্বামী-স্ত্রী

এই জাতি নবশায়ক সম্প্রদায় মধ্যে গণ্য—

"গোপোমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী—
কুলাল কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ।" (পরাশর সংহিতা)

এই জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ-প্রথা নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অধিকাংশই বৈষ্ণব।

তাম্বুলী—তাম্বুলীদের জাতীয় ব্যবসায় পান বিক্রয়। ইহারা তাম্বুলী, তাম্বুলিক, তাম্বুলী বা তাম্লি নামে পরিচিত।

ইহাদের 'পাক্কা গেঁয়ে', 'বিয়াল্লিশ গেঁয়ে', 'চৌদ্দ গেঁয়ে' ও 'পয়লা পেড়ে'—এই চারিটি থাক্ বা শ্রেণী আছে। এই সকল থাকের মধ্যে বিবাহাদির আদান-প্রদান হয়। তাম্বুলীদের কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, মৌদ্গল্য প্রভৃতি গোত্র আছে। ইহাদের সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে (৩৯, ১ম অধ্যায় উত্তরখণ্ড) লিখিত আছে যে, বৈশ্য পিতার ঔরসে এবং শূদ্রা মাতার গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি।

"বৈশ্যাত্ শূদ্রকন্যায়াং জাতস্তাম্বুলিকস্তথা"।

কথিত আছে যে, ইহাদের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলা। তেলেঙ্গা মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে তথায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিলে ইহারা প্রাণভয়ে দেশত্যাগী হয়। ইহারা বহু দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। ইহারা বিশেষ ঘটা করিয়া বৈশাখী পূর্ণিমায় গন্ধেশ্বরী দেবীর পূজা অর্চ্চনা করে। এই পূজার সময় ইহারা নিজেদের ব্যবহৃত জাঁতিগুলোকে দেবীর মূর্ত্তির নিকটে রাখে। ইহাদের ব্রাহ্মণ-পুরোহিত আছে।

কর্ম্মকার—এই জাতির লোকেদের মধ্যে অধিকাংশই কামারের কাজ এবং কেহ কেহ স্বর্ণকারের কর্ম্ম করে। ইহাদের মধ্যে 'মামুদ পুরে', 'উপ ছুলে', 'বন পেশে', এবং 'কামালে'—এই চারিটি থাক্ বা শ্রেণী আছে। ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং শূদ্রকন্যার গর্ভে ইহাদের আদিপুরুষের জন্ম।

কথিত আছে, এই জাতির আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলা। এক সময় বর্দ্ধমানাধিপতির সুবর্ণ-তরবারি হঠাৎ ভাঙিয়া গেলে উহা কিরূপে মেরামত হইবে এই চিন্তায় রাজা উদ্বিগ্ন হন। এই সময় এক কর্ম্মকারের এক চণ্ডাল-ভৃত্য ছিল। সে কর্ম্মকারের কাজ বেশ ভালরূপেই জানিত। চণ্ডাল-ভৃত্য ভগ্ন তরবারিখানি এরূপ নিপুণ ভাবে মেরামত করিয়া দেয় যে, তাহা দেখিয়া রাজা পরম সন্তোষ লাভ করেন। কর্ম্মকার তাহার চণ্ডাল-ভৃত্যের কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিলে রাজা তাহাকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিতে আদেশ দেন। চণ্ডাল-ভৃত্য রাজার নিকট আনীত হইলে রাজা তাহাকে পুরস্কার দিতে চাহিলেন। সে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে কর্ম্মকার-শ্রেণীভুক্ত হইতে চায়। ইহাতে রাজা সম্মতি দিলে কর্ম্মকারগণ অবিলম্বে বর্দ্ধমান পরিত্যাগপূর্ব্বক বিভিন্ন স্থানে গিয়া বসতি স্থাপন করে।

ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ নাই। স্ত্রী গুরুতর অন্যায় করিলে বা ব্যভিচারে লিপ্ত হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। পরিত্যক্তা স্ত্রী অপর স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। স্ত্রী কোন অবস্থায়ই স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে না। ইহাদের কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, আবার কেহ শৈব।

একটি বাজড় পরিবার

বাজুপতিয়া—ইহা একটি সঙ্করজাতি। মুসলমান ফকিরের ঔরসে ও হিন্দু নারীর গর্ভে এই সঙ্করজাতির উৎপত্তি। ইহাদের আকৃতি হিন্দুর মত। ইহারা অনেকেই হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দুদের ন্যায় নাম রাখে—কালী, মনসা প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা করে এবং ইহাদের ব্রাহ্মণ-পুরোহিতও আছে। ইহাদের মেয়েরা হিন্দু ললনাগণের মত সিঁথিতে সিন্দুর পরে।

কিন্তু ইহাদের মধ্যে আবার কাহারও আল্লা বা খোদার উপর বিশ্বাস। তাহারা দাড়ি রাখে, মসজিদে যায়, পশু জবাই করে, রোজা রাখে, মৃতদেহ গোর দেয় এবং গোমাংস ভক্ষণ করে।

সপুত্র মেথেন

বিবাহের সময় ইহারা কাজীকে ডাকিয়া আনে। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা মুসলমানের রান্না খায়; কিন্তু মুসলমানেরা ইহাদের রান্না খায় না বা ইহাদের ছোঁয়া জল স্পর্শ করে না। মুসলমান এবং বহু-পতিয়াদের মধ্যে বিবাহ হয় না।

রামপুরহাট মহকুমার কোন কোন অঞ্চলে ইহাদের বাস। ইহারা কাঁসার ঘটি, বাটি, অলঙ্কার, কাঁসর, ঘণ্টা, লোহার বাটখারা প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ারি করিয়া জীবিকা অর্জন করে।

উপরি-উক্ত জাতিগুলি ব্যতীত বীরভূমে তুলিয়া (জনসংখ্যা প্রায় হাজার), সুনরি (সাড়ে চৌদ্দ হাজার), মেহনা, মাতব বা কালোমালো, খাচুকি, পুন্ন বা মধু নাপিত (প্রবাদ আছে যে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মস্তক মুণ্ডন করিবার পর হইতে ইহারা অপর কাহারও ক্ষৌরকর্ম করিয়া হস্ত অশুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই), রাজবংশী, ঢুলোল, খয়রা, বেদো, বাইতি, কোনাই, দোষাদ, গাবেরি, কালোয়ার, খাত্তিক, লোহার, মুণ্ডা, ওরাঁও, তুরি প্রভৃতি আরও প্রায় সত্তর প্রকারের জাতি আছে।*

* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত কয়েকটি আলোকচিত্র শ্রীঅমলেন্দু মিত্র কর্তৃক গৃহীত।

মৃত্যুজয়ের অগ্রদূত

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

চারদিকেতে অত্যাচার, হাত মেলেছে যমদূত,
অন্তবিহীন অন্ধকার—চল্‌রে তোরা অগ্রদূত।
অন্ধকারে অবচাঁদ ঐ গর্জ্জে প্রলয় সিন্ধুজল,
শক্ত করে বক্ষ বাঁধো মৃত্যুমুখে অচঞ্চল।
আজকে মোদের অগ্নিপণ, বিষ দলো ভয়ীতাই,
করতে হবেই মৃত্যুজয় সর্ব্বদুখের মুক্তি চাই।
সমাজতরা দুর্নীতির গর্জ্জিছে ঐ ঘূর্ণীবত,
সর্ব্বনাশের ধ্বংসপাপ চূর্ণ আজি চূর্ণ কর্।
দুরপাপের অগ্নিদাহে দেশজোড়া কি বিস্ফোরণ,
শৃঙ্খলতার পঙ্কিল এ যে স্বাধীন মায়ের আলিম্পন।
সর্ব্বহারার রাত্রিদিবা দুঃখদহন অন্তরে,
সর্ব্বজ্বালার মৃত্যুগরল পান করো নীলকণ্ঠ রে!
অগ্নিদাহন পরীক্ষার ঐ সম্মুখে দিন তরুবীর,
জীবন্‌তের ঘুমপুরীতে ঘর্ষেরি আজ ভাঙ্‌ প্রাচীর।
বল্‌রে সবাই গর্জ্জে বলো ধনিক-তোষণ ধর্ম্ম নয়,
দুঃখে জীবন-যাত্রা-যাপন স্বাধীন মায়ের মর্ম্ম নয়।
শিল্পী কবি গুণী জ্ঞানী রইল যদিই অন্নহীন,
স্বাধীন হওয়ার দুর্ম যুকের মূল্য কি এই নাম রঙীন্?

করবি জাতির উচ্চ ললাট, করতে হবে অগ্নিপণ,
স্বাধীন হওয়ার মূল্য সেথায় শান্তি যেথায় চিরন্তন।
আর্ত্তজনে করবি ত্রাণ আজ দুর্নীতিরে ধ্বংস কর্,
সর্ব্বপাপের মর্ত্ত্য মুছে—আনবি তোরাই যুগান্তর।
দস্যুধনিক মিলগুলো ঐ দুঃস্থশোষণ পিঁজরাপোল,
বণিকদের ঐ অত্যাচারের ভিৎগুলো আজ উপ্‌ড়ে' তোল্।
অন্নবসন খদ্দি ও সুখ কর্ম্মীদের আজ বাঁট' দে,
দুঃস্থদের আজ সুস্থ করে' আনন্দে মন মত্ত' দে।
সর্ব্বপাপের ধ্বংসে আজি ঝঞ্ঝা উঠুক ঘোর ঘটায়,
ধূর্জ্জটিহীন যজ্ঞনাশে প্রলয় তাণ্ডব শিবজটায়।
ধৈর্য্যে চলো শৌর্য্য দুলাল শঙ্কাতে ভাই দাও টলো,
জগন্নাথের ডঙ্কা বাজাও হিম্মতে আজ পথ চলো।
দুঃখেরি এই স্বর্গপথ প্রহ্লাদেরা গর্জ্জে আয়,
রাখবি জাতির মানইজ্জৎ সত্যিকারের মুক্তি চাই।
সঙ্গী তোদের ব্রহ্মবল পিণাক বাজায় রুদ্রকাল,
দুর্জ্জয় আজি চল্‌রে চল্ খাট্‌বে হুকুম তালবেতাল।
সঙ্গী তোদের বজ্র বড় উদ্দীপনায় কি বিদ্যুৎ,
মৃত্যুমথন মন্ত্র পড়ো মৃত্যুজয়ের অগ্রদূত!

পল্লীপ্রান্তে (তেল রং)—শিল্পী শ্রীনীলরতন চট্টোপাধ্যায়

সমালোচকের দৃষ্টিতে শিল্পী ও শিল্পকলা

শ্রীঅমূল্যগোপাল সেন

আজকাল দেশের শিল্পানুরাগী জনসাধারণের মন শিল্পকলা সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হওয়ার দরুনই শিল্পীদের কাজের সমালোচনাও অনেক বেড়ে গেছে। সমালোচকদের তরফ থেকে এই শিল্পী-সমাজের বিরুদ্ধে বহু প্রকারের অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। যেমন—শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে নূতনত্বের প্রবর্ত্তন করতে পারছেন না, সমাজের বর্ত্তমান ভাবধারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছেন না, জনসাধারণের চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের দৃষ্টি চিন্তাধারার মিল নেই, ইত্যাদি। এ ধরণের সমালোচনার হাত থেকে শিল্পশিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরাও নিষ্কৃতি পায় না। এ সম্বন্ধে চিন্তা করে আমার মনে হয়েছে, প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীদের কাজের যে-কোন রকম সমালোচনা চলতে পারে, কিন্তু শিল্পকলাশিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের কাজের শুধু টেক্‌নিক্ বা আঙ্গিক নিয়েই সমালোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ শিল্পগুরুরা তো আর শিল্পী তৈরি করতে পারেন না; অক্লান্ত সাধনা করে তবে কলালক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করতে হয়। গুরু শুধু পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। কেমন করে তুলির টানে রসসৃষ্টি করা যায়, বাটালির কি রকম ঘা দিলে পাথরে প্রাণের স্পন্দন ফুটিয়ে তোলা যায়—এ সব গুরুর কাছে বসে

চাঁদের গাছ (তেল রং)—শ্রীশাহ্ মজুমদার

তরুণী (জল রং)—শ্রীসোমনাথ হোড়

শিখতে হয়—এর জন্ত নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রম দরকার। এক কথায় পরিশ্রম করে কারিগরী জিনিষটা গুরুর কাছ থেকে শিখে নিতে হয়, তারপর হাত পাকা হলে, নিজের পথ চিনে নিতে পারলে প্রতিভাবান শিল্পী নিজের মনের সকল অনুভূতিকেই স্বীয় শিল্পসৃষ্টির ভেতর দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন। কোন সমালোচক যদি একজন শিক্ষার্থীর কাছেও অভিনব বিরাট কিছু একটা প্রত্যাশা করেন তবে তাঁকে হতাশ হতে হবে বৈ কি? শিক্ষার্থীর প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য যেমন করেই হোক শিল্পের প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হয়ে সেগুলো আয়ত্ত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রচলিত এবং অপ্রচলিত মাধ্যমে পরীক্ষামূলক কাজ করা। নয়ত 'স র গ ম' না শিখে গানে নূতন সুর দিতে যাওয়ার মত, শিল্পরীতি আয়ত্ত না করে নূতন কিছু সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এক সময় দেখেছি, কলিকাতা শিল্প-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগকে, বিশেষতঃ প্রাচ্যকলা বিভাগে, পুরানো ভাল ভাল ছবি নকল করতে দেওয়া হ'ত। এই সব ছবি নকল করতে গিয়ে শিক্ষার্থী বুঝতে পারত ছবিতে কোথায় কোন্ রং কি ভাবে ব্যবহার করা যায়, কোন্ রেখাটা কোথায় কি ভাবে কতখানি টানলে ছবি সুন্দর হয়—এমনি নানা খুঁটিনাটি বিষয়। শুধু তাই নয়—সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীকে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করে নানা বিষয়বস্তুর স্কেচ্ করে আনবার জন্ত উৎসাহিত করা হ'ত। এতে শিল্পশিক্ষার্থীর একটা বিশেষ লাভ হ'ল। আঁকবার সময় প্রকৃতির যে সব খুঁটিনাটি অথচ প্রয়োজনীয় জিনিষ তার দৃষ্টি এড়িয়ে যেত, ভাল ছবি নকল করতে গিয়ে ক্রমশঃ সেগুলো তার চোখে ধরা পড়তে লাগল। এমনি করেই শিল্পী লাভ করলে প্রকৃতিকে দেখবার এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। তারপর তার নিজস্ব কল্পনা থেকে ছবি আঁকবার কাজ অনেক পরিমাণে সহজ হয়ে আসত। শুধু এইজন্তও ভাল ছবি নকল করার যথেষ্ট মূল্য আছে।

বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাঁরা পাশ্চাত্যের অতিআধুনিক কয়েকজন শিল্পীর শিল্পকলার অনুরাগী, এদেশের শিল্পীরা তাদের ঢঙের (style) নকল করুক এটাই তাঁরা পছন্দ করেন। এই অনুকরণমূলক কাজকে অভিনব শিল্পসৃষ্টি বলে তাঁরা বাহবাও দিয়ে থাকেন। নকল করব, অথচ নিজস্ব বলে প্রচার করে লোকের তাক লাগিয়ে দেব, এ মনোবৃত্তি শিল্পী এবং শিল্পশিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। যাঁরা প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন এবং যথোপযুক্ত সাধনায় যাঁদের সেই প্রতিভার বিকাশ হয়েছে—ভাল জিনিষ, নূতন সৃষ্টি তাঁদের হাত দিয়ে বেরিয়ে দেশের সংস্কৃতি-ভাণ্ডারকে একদিন নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ করবে—দু'দিন আগেই হোক্ বা দু'দিন পরেই হোক্, তার জন্ত তাড়াহুড়ো করার কোন প্রয়োজনই নেই। পাশ্চাত্য শিল্পবিদ্যালয়গুলোতে

রত্নময়তা (জল রং)—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার সেন

তেল রঙে আঁকা একটি চিত্র—শ্রীনীলরতন চট্টোপাধ্যায়

অধিকাংশ শিক্ষকই শিক্ষার্থীর কাজের মধ্যে নূতনত্ব ততটা প্রত্যাশা করেন না—শিক্ষার্থী ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রম সহকারে সাধনা করে শিল্পের প্রচলিত পদ্ধতিগুলো আয়ত্ত করার চেষ্টা করছে কিনা, সেই দিকেই থাকে সেখানকার শিল্পশিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি। শিল্পকলার ইতিহাসে সম্ভবতঃ এমন একজনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যাবে না, যিনি ছাত্রজীবনে শিল্পের প্রচলিত পদ্ধতিগুলো আয়ত্ত করেন নাই। অগ্রগতি সকলেই চায়, শিল্পীরাও চায় ; কিন্তু চলার অভ্যাস তো আগে করতে হবে, তারপর হবে অগ্রগতি।

আগেই বলেছি, যাঁরা শিক্ষানবিশীর পালা শেষ করে শিল্পীহিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তাঁদের সৃষ্টির যে-কোন রকম সমালোচনা চলতে পারে ; সুতরাং তাঁদের কথা ছেড়ে দিয়ে দেখা যাক, প্রচলিত সমালোচনায় বর্ত্তমান সময়ে শিল্প-শিক্ষার্থীদের কতটুকু লাভ এবং ক্ষতি হয়েছে। কলিকাতা সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের এবারকার বাৎসরিক প্রদর্শনীর ছবিগুলো দিয়েই বিচার করা যাক। প্রায় আড়াই শতাধিক বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীর কাজের নমুনা এই প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষামূলক কাজ এই প্রদর্শনীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় এবং আশাপ্রদ জিনিষ বলে আমার মনে হয়েছে। খুব বেশী দিন আগেকার কথা নয়—এমন সময় ছিল যখন এক বিভাগের ছাত্র অন্ত বিভাগের ছেলেদের কাজ দেখতে পর্য্যন্ত পরাঙ্মুখ ছিল। তারা মনে করত যে তাতে শিল্পী হিসাবে তারা স্বধর্ম্মচ্যুত হবে। প্রাচ্য শিল্পবিভাগের ছাত্রেরা মনে করত, তৈল-রঙের ছবি দেখলে তাদের শিল্প-রুচি খারাপ হয়ে যাবে ; আবার যারা পাশ্চাত্ত্য ধরণে তৈল-রঙের ছবি আঁকত তাদের ধারণা ছিল, প্রাচ্যকলা বিভাগে আসল বস্তু কিছু নেই, তা একেবারে সম্পূর্ণ ফাঁকির উপর প্রতিষ্ঠিত ; ওখানকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। এ দেশীয় একজন নামকরা তৈলচিত্র-শিল্পী একবার কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন—"ওরে বাবা ! হ্যাভেল সাহেব কি কম শয়তান ! এ দেশের ছেলেরা পাছে ছবি আঁকা শিখে ফেলে তাই ভারতীয় শিল্প নাম দিয়ে ফাঁকির কল পেতে রেখেছে।" প্রাচ্য চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ সমঝদার ও রসজ্ঞ হ্যাভেল সম্বন্ধে যিনি এই ধারণা পোষণ করতেন তিনি আজ পরলোকগত। কিন্তু ভাবি

প্রতিকৃতি (তেল রং)—শ্রীসাবিত্রী সেনগুপ্ত

এই ভ্রান্ত ধারণা (ভ্রান্ত হলেও সরল) কেমন করে বদ্ধমূল হ'ল একজন শিল্পীর মনে ? গোঁড়ামিই এর মূল কারণ নয় কি ? কিন্তু এর জন্ত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হলেন কে ? হ্যাভেল-বিদ্বেষী ভদ্রলোকটি একজন প্রতিভাবান শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও স্বদেশের বনিয়াদি শিল্পৈশ্বর্য্যের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না।

এ ধরণের গোঁড়ামি শিক্ষার্থী এবং শিল্পী উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর ও মারাত্মক।

প্রদর্শনীর গ্রাফিক্ আর্টের কক্ষটি খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছে, যদিও ঐ কক্ষটিতে আরও আলোর ব্যবস্থা করলে অধিকতর নয়নানন্দকর হতে পারত। গ্রাফিক আর্টে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষামূলক ভাবে যে সকল চিত্রকর্ম করছে সেগুলো খুবই প্রশংসনীয়। তন্মধ্যে চারুশিল্প বিভাগের ছাত্রী শ্রীমতী করুণা সাহার লিথো প্রেসের ছবিখানাতে (দুই রঙ লিথোগ্রাফ) উন্নত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া শ্যামলেন্দু বিকাশের ড্রাই পয়েন্ট এচিং এবং সোমনাথ হোড়ের কাঠখোদাই চিত্র খুবই উপভোগ্য হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন কায়দায় এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কেমন করে একই মাধ্যম অবলম্বনে চিত্রকর্ম করে যেতে পারে, একটু ভাল করে গ্রাফিক্ আর্টের কাজগুলো দেখলে তা বোঝা যায়।

প্রাচ্য শিল্পবিভাগেও অনেক পরীক্ষামূলক কাজের নিদর্শন দেখা যায়। ভারতীয় প্রথায় অঙ্কিত যে দুটো প্রতিকৃতি (portrait) চিত্র প্রদর্শনীতে টাঙানো হয়েছে তা শিল্পীর দুঃসাহসিক পরীক্ষামূলক কাজের নমুনা। কারণ আমরা এতকাল ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত প্রতিকৃতি-চিত্র যা দেখে আসছি তার সবগুলোই মুঘল পদ্ধতিতে অঙ্কিত ক্ষুদ্র ছবি (miniature painting)—রাজপুরুষ বা রাজকন্যা বা অনুরূপ কাহারো প্রতিকৃতি। সবগুলোরই পোশাক-পরিচ্ছদ ঝলমলে। এবারকার প্রদর্শনীতে দেখলাম—প্রতিকৃতি দুখানিই বেশ বড় করে আঁকা হয়েছে, খুব সাদাসিদে কাপড়-চোপড়-পরা অথচ খুব vivid বা সুস্পষ্ট। এত অল্প রঙে এবং অল্প রেখায় এত ভাল প্রতিকৃতি-চিত্র হতে পারে ধারণা ছিল না। এ বিভাগে ছাত্রছাত্রীদের অনেকের ছবিতে উপযুক্ত বর্ণপ্রয়োগ-নৈপুণ্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। ম্যানারিজম্ সব শিল্পীর মধ্যে কিছু না কিছু থাকে। তবু একঘেয়েমি নষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত। শিল্পীকে এক হিসাবে অভিনেতার পর্য্যায়ে ফেলা যায়; তাকে রূপরসবর্ণগন্ধবিশিষ্ট প্রকৃতির অন্তর-সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে আপন অন্তরের রসের সঙ্গে তার যোগসাধন করিয়ে তবে স্বকীয় রসসৃষ্টিকে বাইরে জনতার হাটে পরিবেশন করতে হয়; নয়ত ভোরের যে রঙ সন্ধ্যারও তাই, দুপুরেরও একই বর্ণ—উৎসবের ছবিতে যে বর্ণসমাবেশ, বিরহের ছবিতেও তাই—এতে রসের হানি হয়। ম্যানারিজম্ একটু-আধটু থাকলেও বিষয়বস্তুকে যদি অন্তরের মধ্যে যথাযথভাবে অনুভব করা যায় তা হলে রসের হানি হয় না। ম্যানারিজমের প্রভাব খুব বেশী হয় যদি মনে মনে অন্য কোন শিল্পীর বর্ণপ্রয়োগ বা রেখাবিন্যাস বা অনুরূপ কিছু নকল করার ইচ্ছা থাকে। এ সম্বন্ধে শিল্পগুরু নন্দলাল একবার আমাকে বলেছিলেন—"রাজপুত ছবি দেখ, মুঘল ছবি দেখ, পারস্য দেশীয় ছবি দেখ—ছবির রস গ্রহণ করার চেষ্টা কর, কিন্তু সাবধান—আঁকবার সময় ওসব সামনে থেকে একেবারে দূরে সরিয়ে রাখবে, এমন কি ওসব ছবির চিন্তা পর্য্যন্ত করবে না।" শুনেছি কোন একজন ছাত্র নাকি একবার হুবহু নন্দবাবুর কায়দায় একখানা পেন্সিল স্কেচ করে তাঁকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। ছবিখানি দেখে তিনি নাকি সেই ছাত্রকে প্রথমে খুব তিরস্কার করেছিলেন, পরে সস্নেহে বলেছিলেন—"ভয় কি! কায়দা আপনা থেকেই আসবে। কাজ কর খুব, কিন্তু কারও নকল করতে চেষ্টা করো না।"

প্রদর্শনীর প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই কোন কোন চিত্রকর্ম দেখে আমার মনে হয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন অল্প আয়াসে নাম করার ইচ্ছাতেই হোক, বা অন্য কারণেই হোক এদেশের এবং বিদেশের নামকরা শিল্পীর আঁকা ছবিকে মনের মধ্যে রেখে, হয়ত বা নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাঁদের নকল করে যাচ্ছে। নকল যতক্ষণ ইচ্ছাকৃত এবং তা শুধু শিক্ষার উদ্দেশ্যে করা হয় ততক্ষণ ভাল; কিন্তু নিজেকে এবং পরকে ফাঁকি দিয়ে সস্তায় বাজিমাৎ করে নাম করার উদ্দেশ্যে নকল করতে যাওয়া মারাত্মক।

তৈলরঙের চিত্রের কক্ষেও কয়েকখানা ছবিতে উন্নত রুচি এবং বর্ণসমাবেশ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ এই ছবি কয়খানার নাম করা যেতে পারে:—নীলরতন চাটুজ্যের "চানাচুরওয়ালা" (তৈল রঙ চিত্র), শানু মজুমদারের "টবের ফুল" (তৈলরঙ চিত্র), সাবিত্রী সেনগুপ্তার আঁকা একখানা তৈল রঙের প্রতিকৃতি-চিত্র (৫০ নং), জীবেন্দ্রকুমার সেনের জল রঙের রান্নাঘরের ছবি ইত্যাদি। শানু মজুমদারের "টবের ফুল" ছবিখানি যদিও উৎরে গেছে, কিন্তু তাঁর ছবিগুলো ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করে দেখলে স্পষ্টই বুঝা যায় বিলাতের কোন প্রগতিপন্থী বিশিষ্ট শিল্পীর প্রভাব তাঁর চিত্রে যথেষ্ট। ছবিতে নূতনত্ব আমদানী করবার মোহে সেই বিদেশী শিল্পীর চিত্ররচনার আদর্শকে মনের মধ্যে রেখে তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন।

কমার্শিয়াল আর্টের চাহিদা দিন দিন যেরূপ বেড়ে চলেছে, এবং জনসাধারণের রুচিরও যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন হচ্ছে তার জন্য উক্ত বিভাগের ছাত্রদের কাজ আরও উন্নত ধরণের হওয়া উচিত এবং কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া বাঞ্ছনীয়। যদিও 'লেটারিং' কমার্শিয়াল আর্টের সবখানি নয়, এবং লেটারিং বাদ দিয়ে কমার্শিয়াল আর্ট একেবারে অসম্ভব একথাও সত্য নয়, তবু এটা কমার্শিয়াল আর্টের একটা প্রধান অঙ্গ। উক্ত বিভাগে লেটারিং আরও বেশী হলেই ভাল হ'ত।

জে-মডেলিং বিভাগটি প্রায় 'ওয়ান ম্যান শো' অর্থাৎ এক ব্যক্তির প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছে। যে কাজটিই দেখতে যাই না কেন, দেখি তাতে একই ব্যক্তির নাম লেখা। সতীশ চক্রবর্ত্তীর পোর্ট্রেটের হাত ভাল, কিন্তু ডিজাইনের হাত নিপুণ নয়। সতীশবাবুর ডিজাইনের রুচি অনেক উন্নত হতে পারে যদি তিনি কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত প্রাচীন ভারতের উৎকৃষ্ট মূর্ত্তিগুলো বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করেন। ভারতের বৃহত্তম যাদুঘর এবং ভারতীয় শিল্পের সেরা গ্যালারী কলিকাতা সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের পাশেই রয়েছে। অতিআধুনিক ও প্রগতিপন্থী হওয়ার আগে উক্ত গ্যালারীর জাতীয় চিত্রাবলী এবং মূর্ত্তিগুলি ভাল করে দেখলে তাতে বিশেষ লাভবান হবারই সম্ভাবনা।

সর্ব্বশেষে টিচারশিপ বিভাগের একখানা ছবির সমালোচনা করে আমার বক্তব্য শেষ করব। প্রথমে বলে রাখি টিচারশিপ ক্লাসের ছাত্রেরা ছাত্রও বটে আবার শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীও বটে; সুতরাং তাদের কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা হওয়া উচিত বলে মনে করি। উপরোক্ত ছবিখানির বিষয়বস্তু যে কি তা আমি বহু চেষ্টা করেও বুঝতে পারি নি। তবে এটুকু দেখলাম একটা পার্ক, তাতে সাহেব-দম্পতি বসে আছেন হয়ত বা সান্ধ্যবায়ু সেবন করছেন, সামনে আইসক্রিম-ওয়ালা, ছেলে, বুড়ো, ছেঁড়া কাপড় আরও কত কি? কোন্ ভাব যে শিল্পীর মনে দেখা দিয়েছে, বিষয়বস্তুর কোন্ জায়গাটার ওপর যে তিনি বিশেষ ইঙ্গিত করছেন তা তো বোঝা গেল না। বর্ণনির্ব্বাচন, তুলির টান এবং অঙ্কন-পদ্ধতি দেখে প্রতীতি হয় কোন প্রগতিপন্থী আধুনিক শিল্পীর প্রভাব রয়েছে এই শিল্পীর মনের গহনে। সমালোচকের তীব্র সমালোচনা "শিল্পীর সৃষ্টির সঙ্গে জনসাধারণের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার যোগ নেই"—একথা তাঁর প্রাণে লেগেছে, সেইজন্য চিত্রে বাস্তব ঘটনাসমাবেশের এই জগাখিচুড়ি। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এবং জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—"শুধু ঘটনার ছবি ফুটিয়ে তুললে কি সার্থক চিত্র হয়?" শুধু আবোল-তাবোল ঘটনার বর্ণনা করে গেলে যেমন তা সাহিত্য হয় না, উচ্চরবে আর্ত্তনাদ করলে যেমন তাকে কেউ গান বলে না, তেমনি শুধু খুব বেশী করে ঘটনার ছবি এঁকে গেলে তা প্রকৃত চিত্রপদবাচ্য হয় না। যা দেখলাম, যা অনুভব করলাম, যা ভাবলাম তাকে ভালভাবে গুছিয়ে সুন্দররূপে পরিবেশন করার ক্ষমতা থাকা চাই। তার জন্য সংযম দরকার—রঙের সংযম, রেখার সংযম, রসের সংযম, ভাবের সংযম, বর্ণনার সংযম। নীলরতন বাবুর ছবিখানা দেখে আমার বার বার মনে হয়েছে—ছবিখানা সংযমের অভাবে সৃষ্টি হিসাবে ব্যর্থ হয়েছে। আধুনিক সমালোচকেরা চিত্রে নূতনত্ব আমদানী করবার জন্যে যে ভাবে উপদেশ বর্ষণ সুরু করেছেন, চিত্রকর সম্ভবতঃ তারই দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই চিত্রখানি রচনা করেছেন।

শিল্পী, রাজনৈতিক এবং সমাজসংস্কারকের কাজ এক নয়। শিল্পীর কারবার প্রধানতঃ রসের সঙ্গে, সুন্দরের সঙ্গে—তবে যদি কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনা শিল্পীর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয় (এবং তা দেবেই) তা হলে আপনা থেকে তুলির আঁচড়ে যা বেরিয়ে আসবে তাই হবে সার্থক সৃষ্টি।

শিল্প-শিক্ষার্থীরা আজকাল অনেকে বলে থাকেন—"ছবির বিষয়বস্তু খুঁজে পাচ্ছি না।" এই বিষয়বস্তু খুঁজে না পাওয়ার জন্যেও, মনে হয়, ঐ একই মনোভাব দায়ী। সমালোচকের উপদেশ পড়ে শিল্পীরা ভাবছেন, "নূতন একটা কিছু করতে হবে, চিত্রে আমদানী করতে হবে হয় রাজনীতি, নয় ত সমাজসেবার আদর্শ।" আমার তো মনে হয় অঙ্কনের বিষয়বস্তু সর্ব্বত্র ছড়ানো রয়েছে। একটা ফুল, দু-চারটে পাতা, একটা পাখী এই দিয়ে জাপানী শিল্পীরা সার্থক শিল্পসৃষ্টি করে নি কি? প্রকৃতি তো প্রতি মুহূর্ত্তে নানা রঙে রসে আমাদের চোখের সামনে নব নব রূপে মূর্ত্তিমন্ত হয়ে উঠছে। আমাদের চেতনায় তাঁকে ধরতে পারলে চিত্ররচনা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হবে। তার জন্য তো বিস্তর বই পড়ার দরকার নেই, সমাজসংস্কারক বা রাজনৈতিক নেতার চেলা হবারও প্রয়োজন নেই। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের একটা খুব মূল্যবান কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়—"চোখ খুলেই রাখতে হয়, প্রাণকে জাগ্রত রাখতে হয়, মনকে পিঞ্জরখোলা পাখীর মত মুক্তি দিতে হয়, কল্পনালোকে ও বাস্তব জগতে সুখে বিচরণ করতে হয়। প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্নধরার জাল নিজের মত করে বুনে নিতে হয় প্রথমে, তারপর বসে থাকা—বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে নিজের আসন নিজে বিছিয়ে, চুপটি করে নয়—সজাগ হয়ে।"

চশমা

শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল

দাদুর টেবিলে মেলা খবরের কাগজখানার ওপর অনেকক্ষণ ধরে খোলা পড়ে আছে চশমাখানা। এক দিকের ডাঁটিতে সুতো বাঁধা, কানে জড়িয়ে বাঁধবার জন্ত। কাচের ভেতর দিয়ে লেখাগুলোকে খাড়া খাড়া লম্বা লম্বা দেখায়, যেন চিড়িয়াখানায় দাঁড়িয়ে আছে সেই সারি সারি সারস পাখী যেগুলো এক পায়ে দাঁড়িয়ে পিঠে মুখ গুঁজে ঘুমোয় সারাদিন। কাচ দুখানার ওপরদিকে আবার অন্ত রকম দুখানা কাচ বসানো, চাঁদের মত। সেগুলো দিয়ে কিন্তু লেখাগুলো দেখা যায় আশপাশের সব লেখার মতই। দাদু কাগজ পড়তে পড়তে এক একবার ঐ ওপরের দু'টুকরো কাচের মধ্যে দিয়ে চোখ দুটো বার করে ঘাড় নীচু করে কথা বলবেন তোমার সঙ্গে। রণজিতের ভারি হাসি পায় তাঁর ঐ ভঙ্গিটুকু দেখলে। ওদের বাড়ীতে দাঁড়ের ওপর কাকাতুয়াটাও ঠিক ঐ রকম করেই ঘাড় নীচু করে তাকাবে তোমার দিকে। রণজিতের কেমন যেন একটু ভয়-ভয়ও করে, ওরা যদি ওর দিকে তাকায় অমনি ক'রে। তার মনে হয়, তার মনের সব লুকোনো কথা, খেয়াল আর মতলবগুলো যেন তারা সব দেখে ফেললে।

অথচ চশমাখানা চোখে না দিলে দাদুকে একটুও ভয় করে না। গাল-জোড়া গোঁফজোড়াটা থাকা সত্ত্বেও। খালি চোখে হাসিভরে যখন তিনি তাকান রণজিতের দিকে তখন তাঁকে তার ভারি ভাল লাগে। গলা জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। অতটা করতে আবার সাহস হয় না। আগে কখনো দেখেনি তাঁকে। এই তো মাত্র তিন মাসের আলাপ। তা ছাড়া পিপ্‌লু আর বাব্‌লুদের বাড়ী এটা। দাদু পিপ্‌লু আর বাব্‌লুকে এক এক সময়ে নিজেই টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে হেসে হেসে মাথা ঝাঁকা দিয়ে কথা বলেন তাদের সঙ্গে। রণজিতেরও ওদের মত টেবিলে উঠে তাদের পাশে বসে পা দোলাতে ইচ্ছে করে। সে কাছে গেলেই কিন্তু দাদু ঐ চশমা-খানার ওপরের কাচের ভেতর দিয়ে চোখ বের করে কেমন অদ্ভুতভাবে তাকান তার দিকে। বকেনও না, ধমকানও না, শুধু ঐরকম করে তাকান। পিপ্‌লু আর বাব্‌লুকে এক একবার ধমক দিয়ে ওঠেন। রণজিতেরও ইচ্ছে করে দাদু তাকে ধমকে ওঠেন, ঠিক ওদের মত করে। দাদু তাকে ধমকানও না, আদরও করেন না। শুধু তাকান তার দিকে চশমার ভেতর দিয়ে। এক একবার অবশ্য চশমাখানা খুলে তার দিকে চেয়ে বীজ-পড়া চোখ দিয়ে হাসেন।

বাব্‌লুর আর পিপ্‌লুর দু-জনেরই নিজের নিজের আব্বাজীর একখানা করে গাড়ী আছে। হাওয়া-গাড়ী। রণজিতের ভারী আশ্চর্য্য লাগে। হাওয়া-গাড়ী আবার কারো নিজের থাকে নাকি? ও তো শুধু ভাড়া পাওয়া যায়। এই তো সেদিন আসবার সময়ে ভাড়া করা হাওয়া-গাড়ী করে সে কত ঘুরেছে আম্মাজী আর আব্বাজীর সঙ্গে দিল্লীতে। তাই তো সে সেদিন পিপ্‌লু যখন বললে, "জানিস্‌ এটা আমার বাবার গাড়ী?" তখন রণজিৎ জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমার আব্বাজী টেক্সিওয়ালা আছে?" সে বুঝতে পারে নি, কথাটা জিজ্ঞেস করে সে কি অপরাধ করেছিল যে, তার জন্তে তার কানটা কস্‌কসে করে মলে দিয়ে এক চাচাজী শাসিয়ে গেলেন—"ঐর কভী ঐসী বাৎ নহী বোল্‌না, রণজিৎ!" এ বাড়ীতে শুধু ঐ চাচাজীই কথা কইতে পারেন ভদ্রলোকের মত। আর এরা সব যে কি বলে, রণজিৎ তা বুঝতেই পারে না; "হামি ভাত খেয়েছে", "তুমি বেড়াতে যাবি?" "হামার কিদে পেয়েছে।" এই রকম সব ওদের কথা। তা ছাড়া ওরা "ঝাড়কে" বলবে "গাছ", "মেজ্‌"কে বলবে "টেবিল", "পাখা"কে বলবে "পাখা," "বাত্তি"কে বলবে "আলো," "সুবহ্‌"কে বলবে "সকাল বেলা"। রণজিৎ শোনে সারা দিন আর হাসে মনে মনে।

দুপুরে খাওয়ার পর দাদু ঘুমোতে যান। তাঁর এক হাত ধরে পিপ্‌লু আর এক হাত ধরে বাব্‌লু। পিপ্‌লু আর বাব্‌লু খাটে গিয়ে শোয় দাদুর দু'পাশে। রণজিৎ একবার তাদের দিকে তাকিয়ে দেখে চোখ ফিরিয়ে নেয়। তারও ইচ্ছে করে ওদের মত করে দাদুর সঙ্গে শুতে। কিন্তু দাদুর হাত যে মাত্র দুখানা আর খাটের ওপর দাদুর পাশও মাত্র দুটো। কারো তিনটে হাতও নেই, তিনটে পাশও নেই। তা ছাড়া পিপ্‌লু আর বাব্‌লু ওরা তার চেয়ে অনেক অনেক ছোট। পিপ্‌লুর বয়েস মাত্র তিন আর বাব্‌লুর বয়েস যে তিনও নয়, আড়াই। হোঃ! আর রণজিতের বয়েস পুরো সাড়ে তিন! সে তাদের চেয়ে মাথায় অনেক বড়। ওদের মধ্যে ঐ পিপ্‌লুটা প্রায় দোরের কড়ার সমান। আর রণজিৎ প্রায় খিল পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছল বলে।

ঘুমিয়ে উঠে পিপ্‌লু আর বাব্‌লু দাদুর হাতে দুধ খায় গেলাসে করে বিস্কুট দিয়ে। রণজিৎকে সেই সময়ে আম্মাজী অন্ত ঘরে নিয়ে যায়। চুপি চুপি বুঝিয়ে বলে, তার জন্তে তার আব্বাজীও বিস্কুট কিনে আনবে'খন এক দিন। বাচ্চারা খাবার সময়ে ওদের দিকে অমন করে তাকাতে নেই।—আম্মাজী এসব কথা আগে জানতই না। কি বোকা ছিল, সত্যি! ও এক দিন দাঁড়িয়ে ছিল ওদের খাবার সময়ে। তখন

ওদের ঐ ঠান্ ওদের কথায় কি বললে আম্মাজীকে ডেকে। সেই থেকে রণজিৎকে আম্মাজীর কাছে ওকথা প্রায়ই শুনতে হয়। ও অবশ্য কোনো প্রতিবাদ করে না। আম্মাজীটা সত্যিই ভারি বোকা। একেবারেই বুঝতে পারে না যে, সে বিস্কুট খেতে একেবারেই চায় না। পিণ্ডীতে থাকবার সময়ে ঐ আম্মাজীই তো ওকে বিস্কুট খাওয়াবার জন্যে কত সাধাসাধি করত। সে সব কথা আম্মাজী এর মধ্যেই ভুলে গেল কি করে?

রণজিৎ বিস্কুট খেতে চায়ই না। সেধে দিলেও নেবে না। কিন্তু দাদু ওদের দুধ খাওয়াবার সময়ে কেমন সব মজার মজার গল্প বলেন। আগে সে তার কিছুই বুঝতে পারত না। এখন গল্পগুলো প্রায় মোটামুটি বুঝতে পারে। প্রায় সবগুলোই 'শেরে'র গল্প—যাকে ওরা বলে "বাঘ"। সবচেয়ে মজার হচ্ছে সেই শেরটার কথা যেটা নস্যি নিয়ে হাঁচতে হাঁচতে অস্থির হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। এক একবার সে দোরের বাইরে থেকে কান পেতে শোনে। তারপর ওদের খাওয়া হয়ে গেলে আবার ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সব কথার মানে বুঝতে পারে না। এই ধরো না কেন, "বেড়াল" মানে কি? ও কথাটা জানা নেই বলে সে সমস্ত গল্পটাই বুঝতে পারে না যে! তাই জিজ্ঞেস করে: "'বেরাল' মানে কি আছে, দাদু!" দাদু কিন্তু গল্প থামাবেন না কিছুতেই। আবার যদি ও জিজ্ঞেস করে, বেরাল মানে কি, তো দাদু চশমার ওপরকার কাচ দুখানার ভেতর দিয়ে চোখ দুটো বের করে শুধু তার দিকে তাকাবেন, একটিও কথা না বলে। কি বিশ্রী ঐ চশমাটা!

সন্ধ্যেবেলা দাদু বেড়াতে যান, হয় পিপলুর না হয় বাবলুর আব্বাজীর হাওয়া-গাড়ী করে। সঙ্গে যায় পিপলু আর বাবলু। রণজিতের অবশ্য হাওয়া-গাড়ী করে বেড়াতে খুবই ভাল লাগে। কিন্তু সে ঐ সময়টায় ওদের সঙ্গে একেবারেই যেতে চায় না। গাড়ীতেও দাদুর এক পাশে বসে পিপলু আর এক পাশে বাবলু। রণজিৎ একেবারে সামনে চাচাজীর পাশেও বসতে চায় না তখন, যদিও সামনে বসলে সুবিধে এই যে, দু'পাশের বৃক্ষগুলোকে সে দেখতে পায় আগে, পিপলু আর বাবলু দেখতে পাবার আগেই। তবুও সে একবার চাচাজীর কাছে দরবার করেছিল, পিপলু এসে বসুক না সামনের জায়গাটায়। পিপলুর বিশেষ আপত্তিও ছিল না। কিন্তু দাদুর ঐ চশমাটা! রণজিতের দিকে কটমট করে চেয়ে চক্চক্ করে উঠল, যেন চোখ রাঙিয়ে।

ঘরে কেউ নেই। খবরের কাগজের ওপর রাখা চশমাটা একবার নেড়েচেড়ে দেখলে রণজিৎ। বিশ্রী ঠাণ্ডা আর পিছল তার গা—জোঁকের গায়ের মত। কদাকার "খিলোনা" দাদুর। অথচ ওটাকে এক দণ্ড কাছছাড়া করতে দেখে নি। ওটা অষ্টপ্রহর দাদুর নাকে। এক একবার দাদু ওটাকে টেনে নামিয়ে দেন নাকের ডগায় কিছুক্ষণের জন্য। তখন অন্ততঃ চোখ দুটো একটু ছুটি পায়। তার পর আবার কাচ দুখানা চোখ দুটোকে গিয়ে চাপা দিয়ে ফেলবে। সব জিনিষ ঐ রকম ঝাপসা আর খাড়া খাড়া, লম্বা লম্বা দেখে দাদুর যে কি লাভ হয় তা সে বুঝতেই পারে না। এর চেয়ে ঐ রঙিন কাচের ছবিওয়ালা দূরবীনগুলি চোখে দিয়ে থাকা ঢের ঢের ভাল। একটু ঝাঁকানি দিলেই একেবারে নতুন একখানা ছবি।

রণজিৎ চশমাখানাকে একবার নিজের চোখে লাগিয়ে দেখলে। এক পাশের ডাঁটিটা মাথার পিছন দিক পর্য্যন্ত চলে গেল। অপর দিকের সুতোটাও কানের চারি পাশে জড়িয়ে দিলে। নাঃ, একেবারে কিছু দেখা যায় না। এমন কি নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে তাও আয়নায় মালুম হয় না। সব ঝাপসা। সেই বহুকাল আগে একবার খুব জ্বর হবার সময়ে রণজিতের যে রকম মনে হ'ত চার দিকের জিনিষগুলোকে —এই চশমাখানা চোখে দিলেও সেই রকমই মনে হয়। ওটা চোখে দিয়ে থাকতে নিশ্চয়ই দাদুর ভীষণ কষ্ট হয়। ঐটেই বোধ হয় দাদুর নাকের ওপর বসে রণজিতের দিকে ঐ রকম কটমট করে তাকায়। দাদুর এই "খিলোনাটা" সে লুকিয়ে ফেলবে নাকি? দাদুর চোখ দুটো তা হলে রণজিৎকে খুব ভালবাসবে। প্রায় হাসবে তার দিকে চেয়ে। গল্প বলবার সময়ে এইবার নিশ্চয়ই দাদু গল্প থামিয়ে ঐ বিদ্ঘুটে কথাগুলোর মানে বলে দেবেন ওঁর ঐ চমৎকার উর্দু ভাষায়। রণজিৎ চশমাটাকে চোখ থেকে নামিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দালান ছাড়িয়ে, বারান্দা পেরিয়ে সেই ওদিককার জিনিষপত্র রাখবার ঘরটার কাছে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, ঠিক কোন্ জায়গাটায় রাখলে দাদু ঐ বদমেজাজী কাচ দুখানার একেবারেই কোন হদিস পাবেন না। মনে মনে কি ভেবে সে ঢুকল জিনিষপত্র ভর্ত্তি ঘরটার ভেতরে। মেঝের ওপর থাকে থাকে সারি সারি বাক্স-পেঁটরা, দেয়ালের গায়ে টাঙানো ধামা, চালুনী, লোহার খাবার-ঢাকা, শেল্ফগুলোর ওপর বড় বড় কাচের বোতল, জার, শিশি, হাঁড়ি, সরাচাপা, মুখ-ঢাকা। কোথাও এতটুকু খালি জায়গা পড়ে নেই...

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রণজিৎ দোর বন্ধ করে দিলে আস্তে আস্তে। চোখে-মুখে তার বিজয়ের হাসি উপ্চে পড়ছে। ওদিককার বারান্দাটা থেকে বাগান দেখা যায়। ন্যাকৃটা বাগানময় কতকগুলো কাককে তাড়া করে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। কাকগুলো কিছুতে বাগান ছেড়ে যাবে না। কেবল এ-গাছ থেকে ও-গাছে গিয়ে বসছে। রণজিৎ জল-ঘর

থেকে একটা মগে করে জল ভরে নিয়ে এসে কাকগুলোকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিতে লাগল। তারা পরোয়াই করে না। কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত হয়ে রণজিৎ দালানে চলে গেল। মেঝের ওপর একটা সুতোর কাটিম পড়ে রয়েছে। সে সুতো খুলে চলল বেপরোয়া ভাবে। কি মজা, কেউ দেখতেই পাচ্ছে না কিছু। সবাই ঘুমোচ্ছে দুপুরে। তারও ঘুমোবার কথা, কিন্তু আম্মাজী তাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছে আগেই। সুতরাং রণজিতের ঘুমোবার দরকারটাই বা কি? সে ইচ্ছে করলে এখন একেবারে খালি পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে, পাশের মাঠটায় যে একটা বাড়ী তৈরি হচ্ছে সেখানে টিউবকলটা থেকে প্রচুর পরিমাণে জল তুলে কলতলাটা ভিজিয়ে ফেলতে পারে। কিম্বা ওদিককার মাঠটায় যে কতকগুলো লোক হেইলোস্সা, হেইলোস্সা বলে গান গাইতে গাইতে মোটা মোটা খুঁটি পুঁতছে, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারে কি করে খুঁটিগুলো কাদার ভেতরে বসে যাচ্ছে এক এক ঘায়ে। যতক্ষণ খুশী—কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আবার কি ভেবে রণজিৎ একটা পেন্সিল দিয়ে একটা বইয়ের পাতা খুলে হিজিবিজি কাটতে লাগল।

তার পর সে বিকেলে রুটি দিয়ে চা খেয়ে বেড়াতে গেছে মাঠে। সেখানে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ছুটোছুটি করেছে হরদম। তারা তাকে কি বলতে বলতে পিছু পিছু তাড়া করেছে অনেকক্ষণ। তাতে তার ভারি মজা লেগেছে। ঘামে জামা ভিজিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ও যখন বাড়ী ফিরল তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাড়ী ফিরেই ছুটে গেছে আম্মাজীর কাছে। চাই এক গেলাস জল। শিগ্‌গীর, শিগ্‌গীর। ভীষণ পিয়াস লেগেছে আজী।…এমন সময়ে আব্বাজী তাকে ওপর থেকে—"রণজিৎ, আও উপর্ আভী।"

আব্বাজী ফিরেছে এর মধ্যেই। কি মজা। হয়ত সেই অনেক দিন থেকে চাওয়া মার্বেল দুটোর কথা ভোলে নি। বিল্লীর চোখের মত জ্বলজ্বলে কাচের মার্বেল। আব্বাজী তাকে কোলে করে নিয়ে নিশ্চয়ই একবার ছুড়ে দেবে ঐ পাখাটার কাছাকাছি, তার পর লুফে নেবে। রণজিৎ দুটো করে ধাপ লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে ছুটে চলে। আব্বাজী।

কিন্তু এ কি? আব্বাজীর মুখ অমন গম্ভীর কেন? তার দিকে চেয়ে একটুও না হেসে জিজ্ঞেস করে: "দাদুর চশমা কোথায়?" ও হরি, সেই চশমাটা। দাদু কিছুতেই ওটার কথা ভুলতে পারে না। কি ভয়ঙ্কর ছেলেমানুষ। হ্যাঁ, সেই চশমাটা। কিন্তু কোথায় যে নিয়ে গেল, কিছু মনে পড়ছে না তার। সেই কাকগুলো, সুতার কাটিমটা সব মনে পড়ছে। কিন্তু চশমাটা যে কোথায় অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে চকচক করে চোখ রাঙাচ্ছে তা কিছুতেই মনে পড়ছে না। আব্বাজী আবার জিজ্ঞেস করে: "বল্, চশমাটা কোথায় রেখেছিস।" রণজিৎ চুপ। কেবল ভাবতে চেষ্টা করে, কোথায় রাখলে সেটাকে। "চশমা তুই নিয়েছিস?" রণজিৎ ঘাড় নেড়ে জানায়, "হ্যাঁ"। "তা হলে লে এসে এভূনি।" আব্বাজীর বজ্রকঠোর আদেশ। রণজিৎ আবার চুপ। রাগে আব্বাজী থর্-থর্ করে কাঁপছে। দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে রণজিৎ দেখে তাঁর চোখ দুটো ঠিক সেই চশমার মত হয়ে উঠেছে। চশমা না পরেও তাঁর চোখ দুটো যে কি করে ঐ রকম হয়ে যায়, তা সে ভেবেই পায় না। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে সে কেবলই মনে করতে চেষ্টা করে, কোথায় রেখেছে চশমাটাকে। দাদু আব্বাজীকে কি বললেন, চেঁচিয়ে। একটা কথার মানে জানে সে: "খোলোমী", উর্দু তে "ছুমনী"। অন্য কথাগুলোর একটাও সে বুঝতে পারে না। শুধু দেখে দাদু ভীষণ চটে উঠে আব্বাজীকে কি সব বলছেন। তারপর হঠাৎ হাত ছুড়ে চিৎকার করে উঠলেন, "প্রহার"। কে জানে আবার ঐ কথাটার মানে কি? কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আব্বাজীর চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। লাফিয়ে উঠে রণজিতের গালে পিঠে, মাথায় যেখানে পারে মারে চড়। তারপর চলে লাথি, লাথীর পর লাথী। আব্বাজী চিৎকার করে মাঝে মাঝে: "তু মর্ যা। আভী মর্ যা। তু ভৈঁসা লেড়কেকী মুখে কুছভী জুর্‌ৎ নহী। মর্ যা তু।" চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে দেয় যেন।…

মার শেষ হয়, রণজিৎ মরে না কিন্তু। ওদের সেই পিণ্ডীতে সে খেয়েছে প্রচুর ভৈঁস কা দুধ, আনার, সেব্, আঙোর। শুধু ঠোঁটটা কেটে গেছে, আর সর্বাঙ্গে তার মারের দাগ। যাক, "প্রহার" কথাটার মানে শিখে নিয়েছে সে। এক দিন সে ঐ পিপ্‌লুটাকে এ্যায়সা "প্রহার" লাগাবে। আব্বাজী এক দিনও তার গায়ে হাত তোলে নি। আজ অমন করে মারলে কেন? বিছানায় শুয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ভেবে সে কূলকিনারা পায় না। তার আব্বাজী যে দাদুর অনুমতি না নিয়ে পিণ্ডীতে বিয়ে করেছিল আম্মাজীকে, সে যে বাংলা শেখে নি, তার উপর আজ তিন মাস হ'ল আব্বাজীর চাকরি গেছে, আর তারা যে তিন জনে পিপ্‌লু আর বাবলুদের বাড়ীতে বসে বসে খাচ্ছে—এ সবের কোন খবরই রাখে না সে…ভারি পিয়াস লেগেছে তার…

কিছুদিন পরে এক দিন আব্বাজী আর আম্মাজী আবার বাক্স-পেটরা গুছিয়ে ওকে নিয়ে চলে গেল। আবার হাওয়া-গাড়ী, রেলগাড়ী, খানিকটা আবার ষ্টিমারে করে যেতে হ'ল। নূতন জায়গাটার নাম শুনলে হাসি পায়: ডিব্রুগড়। চলে যাবার সময়ে রণজিৎ তার বহু দিনের চেপে-রাখা আকাঙ্ক্ষাটা মিটিয়ে গেছে। পিপ্‌লু আর বাবলুর চোখের সামনে দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর গালে একটা চুমু খেয়ে গেছে। দাদুর চোখে নূতন চশমা। সেটাও তাকায় কটমট করে।…

তারপর কেটেছে অনেক দিন। একদিন বিছানায় বসে

বসে দাদুর কিছুতেই দুপুর কাটতে চায় না। ঠান্‌দিকে ডেকে বলেন : "আচ্ছা, সেই যে আমসত্বগুলো করেছিলে এ বছর, সেগুলো কি আমার সঙ্গে দেবে চিতের ?" সত্যিই, এমন মিষ্টি বোম্বাই আমের আমসত্বগুলোর কথা কারো মনেও নেই। সমস্ত বর্ষাটা গেছে তার ওপর দিয়ে। নিশ্চয়ই ছাতা পড়ে, পোকা ধরে সব নষ্ট হয়ে গেছে। ঠান্‌দি ছোটেন তাড়াতাড়ি আমসত্ব আনতে। প্রকাণ্ড তোলো হাঁড়িভরা আমসত্ব। তাড়াতাড়ি মালপত্র-রাখা ঘর থেকে হাঁড়িটা নিয়ে আসেন দাদুর কাছে। সরার ওপর ঢাকা দেওয়া কাপড়টা খুলেছিল কে, কে জানে ?

সরাখানা সরিয়ে দেখেন আমসত্বগুলো শুকনো খট্‌খটে রয়েছে, একটুও ছাতা পড়ে নি। উপরের খানার খানিকটা ছিঁড়ে দিতে হবে দাদুকে। দাদুর আর তর সয় না। ক'দিন ধরে ভুগে তারি ভাল-মন্দ খেতে ইচ্ছে করে তাঁর। আমসত্বখানা তুলে নেন নিজের হাতে।

ওমা, ঐ যে সেই চশমাখানা !

এক টুকরো আমসত্ব মুখে পুরে পাকলে পাকলে তাকে কায়দা করতে চেষ্টা করেন দাদু। চোখদুটো তাঁর চক্‌চক্‌ করে। চশমার দুষ্ট চক্‌চকানির মত মোটেই নয়।

অনির্ব্বাণ

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

(১)

অন্ধকারে আগুনের মত চোখ জ্বলে উহাদের
সমুদ্র-গর্জ্জনসম ভেসে আসে প্রতিবাদ-সুর—
কিন্তু সে তো মিশে যায় নিমেষেতে বুকে বাতাসের
চেতনা জাগে না মনে মদোন্মত্ত বর্ব্বর প্রভুর !

(২)

এইখানে প্রভাতের পাখী এসে গাহিত যে গান
শুকনো খড়ের চালে পড়িত যে কাঁচা-সোনা-রোদ,
চাষীরা আসিত লয়ে খুশীমনে মুঠো মুঠো ধান—
লোভীর চক্রান্তজালে তাহাদের আজি গতিরোধ !

(৩)

আজ তারা বহে শিরে ভারে ভারে কান্নার ফসল
রক্তাক্ত ক্লেদাক্ত-জীর্ণ জীবনের বন্ধুর সড়কে
মুমূর্ষুরা শ্বাস ফেলে,— ব্যর্থ হ'ল যত অশ্রুজল !
মহামারী দুর্ভিক্ষের হাত ভরে অজস্র মড়কে।

(৪)

হলুদী ফসলভরা হেমন্তের একখানি ক্ষেত
ধরে বাঁধা দুটি গরু—একখানি তীক্ষ্ণধার হাল,
ফসলের কাদে রবে সুনিশ্চিত মৌসুমী সংকেত,
মুক্ত হবে অত্যাচার-শোষণের শত বেড়াজাল—

(৫)

সুকঠিন এ কি খুব ? অত্যাচারী মানুষের দল
ক্ষমতার মদে মাতি আর কত কাটাইবে কাল ?
নূতন যুগের স্বপ্ন তিলে তিলে হতেছে বিফল,
নেহারি বর্ব্বর-লীলা অট্টহাসি হাসে মহাকাল।

(৬)

কল্পনার স্বাধীনতা আজ নাকি বাস্তবে আসীন—
ওরা চায় লভিবারে তাই তার অকৃত্রিম স্বাদ ;
নাহি চায় ক্ষয় পেতে, হয়ে যেতে দীন হতে দীন—
অগণিত কণ্ঠে তাই জানায় যে তার প্রতিবাদ !

(৭)

চোখে জ্বলে তাহাদের আশাদীপ্ত উল্কার অনল—
বিজয়-বর্ত্তিকা হয়ে চিরদিন র'বে অনির্ব্বাণ,
দাসত্ব-কঙ্কর-পথ সুমসৃণ করি' অবিরল
ওরা গেয়ে যাবে সেই জীবনের চিরজয় গান।

ব্রহ্মদেশের অধিবাসী

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্মদেশের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে সংস্কৃত ব্রহ্ম শব্দ হইতে এই দেশের নাম ব্রহ্মদেশ হইয়াছে। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন যে, চৈনিক শব্দ 'মিন' (Mein) হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে; ব্রহ্মদেশ বিরাট ইন্দোচীনের একটি অংশ। ইন্দোচীন নামটির সার্থকতা অবশ্য স্বীকার্য্য। ইহার অধিবাসীবৃন্দ সকলেই প্রায়-মালয় (Proto-Malay) এবং মঙ্গোলয়েড (Mongoloid) জাতির অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি মূলতঃ ভারতীয়।

ব্রহ্মদেশের অধিবাসীগণ মঙ্গোলয়েড জাতীয়। ১৯৪১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী এই দেশের লোকসংখ্যা ছিল ১৬,৮২৩,৭৯৩। চৈনিক, কোরীয়, জাপ, তিব্বতীয়,মালয়, পূর্ব্ব-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী এবং ব্রহ্মদেশীয়গণ মানবজাতির একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই গোষ্ঠীর যে অংশ ব্রহ্মদেশে বাস করে তাহাকে তিনটি প্রধান শাখায় ভাগ করা যাইতে পারে— (১) তিব্বত-ব্রহ্ম, (২) মন-খ্মের এবং (৩) তাই-চীন। ব্রহ্ম এবং প্রায়-ব্রহ্ম জাতি, চীন কোচিন জাতি এবং লোলো জাতি তিব্বত-ব্রহ্ম শাখার তিনটি প্রধান উপশাখা। ইহাদিগের অন্তর্গত ৩২টি উপজাতি আছে। মন-খ্মের শাখা মন বা তালাইং, ওয়া, লা প্রভৃতি ১২টি এবং তাই-চীন শাখা শান, কারেণ, শ্যাম প্রভৃতি ১১টি উপশাখায় বিভক্ত।

তিব্বত-ব্রহ্ম শাখার লোকেরা তিনটি প্রধান দলে উত্তর দিক হইতে ব্রহ্মদেশে আগমন করে। কিংবদন্তী অনুসারে এই তিনটি দলের নাম পিয়ু, কানরান এবং থেট। থেট জাতির বংশধরগণই সম্ভবতঃ বর্ত্তমানে চিন নামে পরিচিত। পিয়ুগণের এখন কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাহারা বোধ হয় ব্রহ্মজাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কানরান জাতির অবস্তন পুরুষই বোধ হয় আধুনিক আরাকানী জাতি। জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, তিব্বত-ব্রহ্মজাতি ব্রহ্মদেশে আসিবার পথে তিব্বতের পর্ব্বতে ইরাবতী নদীর উৎপত্তি স্থান অতিক্রম করিয়াছিল। এই স্থানেই চিনদের পূর্ব্ব-পুরুষ প্রধান অভিযাত্রীদল হইতে বিযুক্ত হইয়া যায়। ব্রহ্ম এবং প্রায়-ব্রহ্ম জাতি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। দীর্ঘ পথ অতিক্রমণকালে এই জাতির ছোট ছোট দল পিছনে পড়িয়া থাকে। তাহারই ফলে পরবর্ত্তী কালে ব্রহ্মদেশের উত্তর অঞ্চলে তিব্বত-ব্রহ্ম গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

লোলোগণ সম্ভবতঃ মেকং নদীর উপত্যকা-পথে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। এই জাতির কয়েকটি ছোট ছোট দল ব্রহ্মদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে ঘর বাঁধিয়াছে।

মন-খ্মের শাখা সম্ভবতঃ মেকং নদী ধরিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ইন্দো-চীন উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছিল। মন-খ্মেরগণই প্রাচীন কাম্বোডিয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইহাদিগের একটি দল মেকং নদীর পশ্চিমে শান অধিত্যকা এবং দক্ষিণ ব্রহ্মে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মন-খ্মেরগণই ইন্দো-চীনের প্রথম বহিরাগত জাতি। তবে ব্রহ্মদেশে এই দলের প্রধান শাখা মনগণ হয়ত ব্রহ্মজাতির পর ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করিয়াছিল।

তিব্বত-ব্রহ্ম এবং মন-খ্মের জাতিদ্বয়ের পর তাই-চীনগণ ব্রহ্মদেশে আগমন করিয়াছিল। ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সপ্তম শতাব্দীতে ইহারা চীনদেশের অন্তর্গত ইউনান প্রদেশে নামচাও নামে একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। সেখান হইতে পরে ইহারা দক্ষিণে শ্যাম এবং পশ্চিমে আসাম ও উত্তর-ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়াছিল।

ব্রহ্মজাতি নবম শতাব্দীতে মধ্য-ব্রহ্মের রুক্ষ ও অনুর্ব্বর অঞ্চলে (Dry Zone) বসবাস করিতে আরম্ভ করে। এই জাতীয় রাজাদের সকল রাজধানীই—পাগান, আভা, অমরাপুরা এবং মান্দালয়—এই সমস্ত 'রুক্ষ অঞ্চলে' অবস্থিত। একমাত্র পেগু ইহার ব্যতিক্রম। ব্রহ্মজাতীয় টাঙ্গু বংশীয় রাজগণ ১৫৩১ হইতে ১৬৩৫ সাল পর্য্যন্ত পেগুতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা তালুনের ১৬২৯-৪৮ রাজত্বকালে আভায় রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রহ্মরাজ অনরত (১০৪৪-৭১) উত্তর-ব্রহ্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা হরণ করিয়া একটি বৃহদায়তন রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল পাগান। ইরাবতীর ব-দ্বীপ অঞ্চল, দক্ষিণ-ব্রহ্মের তাটন জেলা এবং সিতাং উপত্যকার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত পার্ব্বত্য অঞ্চল অনরতের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্যব্রহ্মে বিকৃত মহাযান বৌদ্ধমত প্রচলিত ছিল। রাজা অনরতের উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার পরিবর্ত্তে হীনযান মত প্রচলিত হয়। এই হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মই তদবধি ব্রহ্মদেশের জাতীয় ধর্ম্ম। ১২৮৭ সালে মোঙ্গোলীয়গণ অনরত-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া পাগান অধিকার করে। এই সময় ব্রহ্মদেশ আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ইহারা সকলেই চীন-সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিত। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা টাবিনসোয়েটি (১৫৩১-৫০) এবং রাজা

বাই-ই-রাং (১৫৫০-৮১) পুনরায় সমগ্র ব্রহ্মদেশকে একতাবদ্ধ করেন। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত এই ঐক্য স্থায়ী হইয়াছিল। এই সময় ইরাবতী ব-দ্বীপের মন-জাতি প্রবল হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তাহারা এত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, উত্তর-ব্রহ্মের অনেক স্থানও তাহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মনদিগের এই আধিপত্য কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই শোয়েবোর ব্রহ্মজাতীয় নায়ক আলুম্পায়া (১৭৫২-৫৮) সমগ্র ব্রহ্মজাতিকে সুসংহত করিয়া দেশে একতা স্থাপন করেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। আলুম্পায়াবংশীয় রাজগণ এক সময় সমগ্র ব্রহ্মদেশ, মণিপুর এবং প্রায় সমগ্র আসামের উপর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। ইহার পূর্ব্বে বা পরে কোন যুগেই ব্রহ্মরাজগণের আধিপত্য এতদূর বিস্তারলাভ করে নাই। ১৮৮৫ সালে আলুম্পায়া-বংশীয় শেষ রাজা থিব মিনকে (১৮৭৮-৮৫) সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইংরেজগণ ব্রহ্মদেশ দখল করে।

ব্রহ্মজাতি আজ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ মধ্য-ব্রহ্মের রুক্ষ অনুর্ব্বর অঞ্চলেই বাস করিতেছে। ১৯৩১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ব্রহ্মদেশে ইহাদের সংখ্যা ছিল কিঞ্চিদধিক ৮,৫০০,০০০। তন্মধ্যে ন্যূনাধিক ৪,৫০০,০০০ উত্তর-ব্রহ্মের মাগোয়ে, মান্দালয় এবং সাগাইং বিভাগের অধিবাসী। ইহারা প্রধানতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ খ্রীষ্টধর্ম্মও গ্রহণ করিয়াছে। তবে ব্রহ্মজাতীয়দের মধ্যে খ্রীষ্টানের সংখ্যা নগণ্য। অন্যান্য দেশের বৌদ্ধদিগের ন্যায় ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণও জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাসী এবং তাহারা আত্মা বা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ইহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার পূজা বা উপাসনা প্রচলিত নাই। প্যাগোডা অথবা মন্দিরে স্থাপিত বুদ্ধ এবং অন্যান্য মূর্ত্তির পূজা ইহারা করে না। ইহারা দেব-যোনির (nat) অস্তিত্বে আস্থাবান এবং উপদেবতার ভয়ও ইহাদিগের যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

মদ্যপান এবং জীব-হিংসা বৌদ্ধধর্ম্মানুসারে নিষিদ্ধ হইলেও ব্রহ্মজাতীয়গণ অনেকেই মদ্যপায়ী এবং প্রায় সকলেই মাংসাশী। একথা ব্রহ্মদেশের সকল অধিবাসী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। পল্লী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তাড়ি এবং পচুই প্রস্তুত হয়। শহরের অধিবাসীরা সামর্থ্যে কুলাইলে বিদেশের আমদানি মদ্যই পান করিয়া থাকেন। অন্ন ব্রহ্মদেশের লোকেদের প্রধান খাদ্য। ঙাপ্পি (নাপ্পি—লবণের সাহায্যে রক্ষিত গলিত মৎস্য), কুক্কুট, শূকর এবং ভেড়ার মাংস ইহাদিগের প্রিয় খাদ্য। ইহারা গো-মাংসও ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে গো-মাংস ভক্ষণ গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। তাম্রকূট সেবনে ইহাদিগের অত্যাসক্তি আছে। গুরুজনদের সম্মুখে ধূমপান করা ইহাদের সমাজে দোষাবহ নহে। পার্ব্বত্য অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে অহিফেন সেবন প্রচলিত থাকিলেও ব্রহ্মজাতীয়গণ ইহার ঘোরতর বিরোধী।

স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মজাতি এবং ব্রহ্মদেশের অন্যান্য অধিবাসীরা ধর্ম্মের বহিরঙ্গের প্রতি অতিশয় মনোযোগী। ইদানীং ইহাদের সমাজে ফুঙ্গি বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সমাদর বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ইহার দুইটি প্রধান কারণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ ফুঙ্গিদের মধ্যে অনেকেই উচ্ছৃঙ্খল। অনেক অযোগ্য এবং অনধিকারী ব্যক্তিও এখন মস্তক মুণ্ডন করিয়া পীতবাস ধারণপূর্ব্বক ফুঙ্গি সাজিয়া থাকে। কোন কোন 'চাউং' বা সঙ্ঘারামও দুষ্কৃতকারিগণের রীতিমত আশ্রয়-স্থল হইয়া উঠিয়াছে। অনেক ফুঙ্গি আবার রাজনীতিতেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই জাতীয় 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী'দিগকে অবশ্য রেঙ্গুন, মান্দালয় প্রভৃতি বড় বড় শহরেই দেখা যায়। ফুঙ্গিদিগের সমাদর হ্রাসের দ্বিতীয় কারণ যুগধর্ম্মানুযায়ী প্রগতিশীল ভাবধারার প্রসার। ফুঙ্গিদিগের মধ্যে অনেকেই পীতবাস ধারণে অনধিকারী হইলেও ইঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ, আধ্যাত্মিক জগতে উন্নত এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিও আছেন।

ব্রহ্মজাতি এবং ব্রহ্মের অধিবাসী অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে জাতিভেদ এবং অবরোধ-প্রথা একেবারেই অজ্ঞাত। প্রাচীনযুগে প্যাগোডার রক্ষণাবেক্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত ক্রীত-দাসদিগকে অপাংক্তেয় বলিয়া গণ্য করা হইত। মৎস্যজীবী-দিগকে এখনও প্রাণিহত্যাকারী বলিয়া লোকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে।

ব্রহ্মজাতি স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয়, উদারহৃদয় এবং ভাব-প্রবণ। আপাতদৃষ্টিতে ইহাদিগকে অলস বলিয়া মনে হই-লেও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ইহারা অপরিসীম পরিশ্রম করিতে পারে। যাদুবিদ্যায় ইহাদের অগাধ বিশ্বাস। ইহারা বিশ্বাস করে যে, যাদুর সাহায্যে মানুষ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রের অভেদ্য হইয়া উঠিতে পারে। পূর্ব্বে ইহাদের পুরুষগণ হাঁটু হইতে কোমর পর্য্যন্ত উল্কিচিত্রিত করিত। এই প্রথা অধুনা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

লুঙ্গি (লুঙ্গি) এবং এঙ্গি (জামা) ইহাদিগের জাতীয় পরিচ্ছদ। স্ত্রী এবং পুরুষের লুঙ্গি পরিধান করিবার ভঙ্গী এক প্রকার নহে। মেয়েদের এঙ্গি পুরুষের এঙ্গি অপেক্ষা অধিক আঁটসাঁট। গাঁওবাঁও (অনেকটা পাগড়ির মত) পুরুষদিগের জাতীয় শিরস্ত্রাণ। আজকাল কেহ কেহ কোট, প্যাণ্ট ইত্যাদিও পরিয়া থাকে। লুঙ্গি, এঙ্গি এবং গাঁওবাঁও সূতী এবং রেশমী দুই প্রকারেরই হয়। ব্রহ্মজাতীয় পুরুষেরাও পূর্ব্বে লম্বা চুল রাখিত। এই প্রথা এখন প্রায় লোপ পাইয়াছে।

ব্রহ্মদেশীয় গৃহ সাধারণতঃ বাঁশ বা কাঠের মাচার উপর নির্ম্মিত হয়। বন্যা এবং বন্যজন্তুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ

মহাত্মা গান্ধী

হায়দরাবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের সভাপতি স্বামী রামানন্দ তীর্থ (বামে) ও অন্যান্য কর্মকর্তাসহ পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু

ক্যাণ্টনের বাজার হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে দুইটি গল্পরত হাস্যময়ী চীনা তরুণী

রাখিবার জন্য গৃহতল মৃত্তিকা হইতে অনেকটা উঁচু রাখা হয়। ঘরের নীচেকার ফাঁকা জায়গাই ভাঁড়ার বা গোয়ালঘর রূপে ব্যবহার করা হয়। গৃহে আসবাবপত্রের বাহুল্য নাই।

আরাকানীগণ ব্রহ্মজাতির ঘনিষ্ঠ জাতি হইলেও ইরাবতী উপত্যকার ভাষা এবং আরাকানের ভাষার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। আধুনিক আরাকানীদের ধমনীতে বাঙ্গালী রক্তের প্রচুর মিশ্রণ হইয়াছে। ইহারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ১৯৩১ সালে ইহাদিগের সংখ্যা ছিল ২০৮,২৫১। আরাকানের পর্বতশ্রেণী চিন, ম্রো, চৌংথা, কামি প্রভৃতি উপজাতির আবাসস্থল। ইহাদিগের অধিকাংশই তিব্বত-ব্রহ্মগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। টেভয় এবং মার্গুইয়ের অধিবাসিবৃন্দ মূলতঃ ব্রহ্মজাতীয় হইলেও ইহাদিগের রক্তের সহিত কিছু পরিমাণ শ্যামদেশীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। টেনাসেরিমের দক্ষিণে স্বল্পসংখ্যক মালয় এবং তাহাদের জ্ঞাতি সালোন অর্থাৎ সামুদ্রিক বেদে বাস করে।

মন বা তালাইংগণ ব্রহ্মদেশে আগমনকারী মন-খ্মের জাতির প্রধান শাখা। ইহারা প্রথমতঃ ইরাবতীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে এবং নিম্ন-ব্রহ্মের থাটন ও আমহার্স্ট জেলায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ব্রহ্মজাতির আক্রমণের বিরুদ্ধে শতাব্দীর পর শতাব্দী আত্মরক্ষা করিয়া অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইহারা ব্রহ্মরাজ আলুম্পারার হস্তে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। ১৮২৪-২৫ সালে টেনাসেরিম ইংরেজের অধিকারভুক্ত হইবার পর মনজাতীয় বহু লোক ইংরেজ অধিকারে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে ইরাবতীর ব-দ্বীপ অঞ্চল প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। মনগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। রেঙ্গুনের বিখ্যাত শোয়েডাগন প্যাগোডা ইহাদিগেরই কীর্ত্তি। ইহারা বর্ত্তমানে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মজাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে এবং ইহাদিগের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই বলিলেও চলে।

ইরাবতী এবং সিতাং উপত্যকার পূর্ব্বে, উত্তর-ব্রহ্মের ভামো জেলার দক্ষিণে এবং কারেনী রাষ্ট্রসমূহের উত্তরে শান অধিত্যকা অবস্থিত। শানজাতি প্রধানতঃ এই অঞ্চলে বাস করিলেও ইহারা বিচ্ছিন্নভাবে সমগ্র উত্তর-ব্রহ্মে এবং কিছু অধিক সংখ্যায় দক্ষিণ-ব্রহ্মের টেনাসেরিম বিভাগে ছড়াইয়া আছে। শানজাতি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশে আগমন করে। ইহারা তাই-জাতিরই একটি শাখা। সেইজন্য ইহারা তাই বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশে আগমনের পর ইহারা কালক্রমে সমগ্র উত্তর-ব্রহ্ম এবং আসামে ছড়াইয়া পড়ে। ইহারাই ১২২০ সালে আসামে অহোম রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা তাবদ্দেশও নিজেদের অধিকারে আনয়ন করে। ব্রহ্মজাতি এবং শানজাতি উভয়েই প্রধানতঃ কৃষিজীবী, পল্লীবাসী এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। শান পুরুষদের পোশাক—বাউং-মি (ঢিলা পায়জামা), এঙ্গি (জামা) গাউংবাউং (পাগড়ী) এবং বাঁশের টুপি। শান মেয়েরা ব্রহ্মজাতীয়া রমণীগণের ন্যায় লুঙ্গি (লুঙ্গি) এবং এঙ্গি পরিধান করিয়া থাকে। শানগণ সাধারণতঃ অতিথিবৎসল এবং সদাশয়। ইহারা নিপুণ শিকারী। জুয়াখেলায় ইহাদের প্রবল আসক্তি আছে। ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, "ব্রহ্মদেশের অন্যান্য সমস্ত অধিবাসীর তুলনায় ইহারা মধুরপ্রকৃতিসম্পন্ন" ("most pleasant of the races of Burma to deal with")। ১৯৩১ সালে আদমসুমারি অনুযায়ী ব্রহ্মদেশের শান অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৯০০,২০৪।* শান অধিত্যকায় শান ব্যতীত সাত্তাউং, পালাউং, ওয়া, চাউংথা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি বাস করে। শান অধিত্যকার উত্তর-পূর্ব্বাংশে কোকাং অঞ্চল প্রায় সম্পূর্ণভাবে চীনাদের দ্বারা অধ্যুষিত।

কারেনগণ তাই-চীন শাখার অন্তর্ভুক্ত। ইহারা পো এবং সাগ এই দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত। পো কারেনগণ প্রধানতঃ টেনাসেরিমের অধিবাসী। ইহারা বহুলাংশে মন জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সাগ কারেনগণ প্রধানতঃ কারেনী রাষ্ট্রসমূহে এবং ইরাবতীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে বাস করে। কারেনী রাষ্ট্রসমূহে যে সমস্ত কারেন বাস করে তাহাদিগকে লাল কারেনও বলা হয়। কারেনজাতি ব্রহ্মদেশের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ইংরেজ শাসনকালে মধ্যে মধ্যে কারেন-ব্রহ্ম বিরোধের কথা শোনা যাইত। ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর কারেনদিগের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং স্বাধীন কারেন-রাষ্ট্র স্থাপনের আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই কারেন-সমস্যা ব্রহ্মদেশের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহের অন্যতম। পর্ব্বতবাসী কারেনগণ প্রধানতঃ প্রেতোপাসক। সমতলবাসী কারেনদের মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও ইহাদিগের মধ্যে কিছু খ্রীষ্টানও রহিয়াছে। শান অধিত্যকার ভায় কারেনী এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল বিভিন্ন জাতির বাসভূমি। ইহারা প্রায় সকলেই মন-খ্মের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত জাতির মধ্যে বাশিরক জাতির কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জাতির স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বিবাহের ঘোরতর বিরোধী। ফলে ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাশিরক জাতির মাত্র কয়টি পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। আজ হয়ত তাহাও নাই।

'কাচিন' (চীনা ইয়েজিন হইতে) কথাটির প্রকৃত অর্থ অরণ্যচারী মানব। ব্রহ্মজাতি কর্ত্তৃক এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে কাচিনগণ 'জিংপ' বা নরঘাতক এই নামে অভিহিত হইত। 'জিংপ' কথাটি মূলতঃ তিব্বতীয়। এই নাম হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কাচিন জাতি একদা নরমাংস ভক্ষণ করিত। জাতীয় কিংবদন্তী অনুসারে কাচিনগণ প্রায়

১২০০ বৎসর পূর্ব্বে মধ্য-তিব্বতের মালভূমি হইতে 'ন-মাই' এবং মালি উপত্যকার পথে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। শান অধিত্যকার কেংটুং রাজ্যে কিছু কাচিন থাকিলেও ভামো, মিচিনা ও কাথা জেলায় এবং শান অধিত্যকার উত্তরাংশেই ইহাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। অল্পসংখ্যক কাচিন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেও ইহাদিগের মধ্যে প্রেতোপাসকের সংখ্যাই বেশী। কাচিনগণ উৎকৃষ্ট যোদ্ধা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহারা যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে।

কাচিন বা 'জিংপ' ভাষা তুরাণীয় ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। পূর্ব্বে ইহাদিগের কোন লেখ্য ভাষা ছিল না। বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে সরকারী কর্ম্মচারী এবং খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণের চেষ্টায় এই অভাব দূর হইয়াছে।

সামন্ত বা মাতব্বরদের সহায়তায় কাচিন-অধ্যুষিত অঞ্চলের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে হুকং উপত্যকার চতুষ্পার্শ্বে এবং চিন্দুইন নদীর পশ্চিমতীরে নাগাদের বাস। ইহারা চিন এবং কাচিন জাতির জ্ঞাতি। ব্রহ্মদেশের এই নাগা-অধ্যুষিত অঞ্চল দুরধিগম্য। ইহার অধিকাংশই ১৯৪০ সালে ইংরেজ শাসনাধীনে আসিয়াছিল। নাগাজাতির কোন কোন শাখার মধ্যে এখনও নরমুণ্ড-সংগ্রহ (Head-hunting) প্রথা প্রচলিত আছে। নাগা-অধ্যুষিত অঞ্চলে যে ধান্ত উৎপন্ন হয়, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্ত। ধান ব্যতীত কিছু ভুট্টা এবং সব্জীও এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। গৃহপালিত পশু-পক্ষীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। গরু এবং মহিষ ত প্রায় দেখাই যায় না।

বন্য-পশু এবং শত্রুরা সহসা আক্রমণ করিয়া যাহাতে সহজে কোন ক্ষতি করিতে না পারে সেইজন্ত নাগারা উচ্চস্থানে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহাদের গ্রামগুলি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। অনেক দূর হইতে ইহাদিগকে প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করিতে হয়। প্রত্যেক নাগা গ্রামেই অবিবাহিত তরুণ-তরুণীদের মিলনের জন্ত একটি ঘর থাকে। অবৈধ মিলনের ফলে কোন তরুণী অন্তর্ব্বত্নী হইলে যে তরুণ ইহার জন্ত দায়ী, সে ঐ তরুণীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। গ্রামের মাতব্বরেরা যাহাতে একত্র সমবেত হইয়া পরস্পরের সহিত পরামর্শাদি করিতে পারে সেজন্ত প্রত্যেক গ্রামেই একটি ঘর আছে। কোন বহিরাগতের পক্ষে কুমার-কুমারীদের মিলনাগারে অথবা বয়োবৃদ্ধদের 'সভাগৃহে' প্রবেশ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

নাগারা প্রেতোপাসক। বলি ইহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ। কৃষি-ঋতুর সূচনায় ও ভাদ্র-আশ্বিন মাসে যখন ফসল পাকিতে আরম্ভ করে তখন, এবং শস্তকর্ত্তনকালে পশু ও কোন কোন ক্ষেত্রে নরবলি দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অন্তান্ত সময়েও ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় পশু এবং নরবলি দেওয়া হয়। বলির সময় কোন বহিরাগত দর্শকের উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয়। যখন কোন নাগাগ্রামে পশু বা নরবলি অনুষ্ঠিত হয়, তখন গ্রামের প্রবেশ-দ্বারে একটি বৃক্ষ-শাখা পুঁতিয়া রাখা হয়। এই বৃক্ষ-শাখা দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, গ্রামে পশু বা নরবলি হইতেছে। ধনুক এবং বিষমাখানো তীর নাগাদিগের প্রধান অস্ত্র। শত্রুর আগমনপথে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্ত নাগারা স্ব-স্ব গ্রামের চারিদিকে 'পঞ্জি' ভূপ্রোথিত করিয়া রাখে। এই 'পঞ্জি' আগুনে পাকানো সূক্ষ্মাগ্র বংশদণ্ড। ইহা এত ধারালো যে, ইহাতে বুটের তলা পর্য্যন্ত ফুটা হইয়া যায়। পঞ্জিগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই বিষ মাখানো থাকে। আক্রমণকারী শত্রুকে বাধা দিবার জন্ত গ্রামে প্রবেশ করিবার সঙ্কীর্ণ পথগুলির উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত প্রস্তরখণ্ডসমূহ তাহার উপর বর্ষিত হয়।

বিভিন্ন নাগাগ্রামের মধ্যে বিরোধ এবং সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে। পোশাক-পরিচ্ছদে কোন কোন নাগা শানদের অনুকরণ করিলেও ইহারা অধিকাংশই কম্বলসর্ব্বস্ব।

চিনজাতি বহু শাখায় বিভক্ত। টিড্ডিম অঞ্চলের অধিবাসী ইহাদের অন্যতম থাডো শাখা আসামে কুকি নামে পরিচিত। ব্রহ্মদেশ অপেক্ষা আসামেই ইহাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। চিনগণের সিইন শাখা অন্তান্ত শাখার তুলনায় প্রগতি-শীল। চিনদিগের মধ্যে অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে। এক গ্রামে প্রচলিত ভাষা অনেক সময় অল্প কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকের নিকট দুর্ব্বোধ্য। চিন জাতির বিভিন্ন শাখা স্ব-স্ব প্রধানকর্ত্তৃক সরকারী তত্ত্বাবধানে শাসিত হয়। ইহাদিগের গ্রামগুলি বেশ বড়। কোন কোন চিন-গ্রামে পাঁচ শতেরও কাছাকাছি গৃহস্থ বাস করে।

ব্রহ্মদেশের অন্যতম অধিবাসী চিনবকগণ চিনদিগের জ্ঞাতি। ইহারা মেছু, মেম, নেমুন এবং রা এই চারিটি শাখায় বিভক্ত। চিনবক সুন্দরীগণ উল্কি দ্বারা মুখমণ্ডল চিহ্নিত করে। ইহাদিগের গ্রামগুলি ক্ষুদ্রায়তন। কোন গ্রামেই ১৫।২০ ঘরের বেশী গৃহস্থ বাস করে না।

ওয়া জাতি প্রধানতঃ শান অধিত্যকা এবং ইউনানের মধ্য-বর্ত্তী ব্রহ্ম-সীমান্তে বাস করে। এই অঞ্চল ওয়ারাজ্য নামে পরিচিত। শালুইন নদী এবং মংলুন নামক শানরাজ্য পর্ব্বত-বহুল ওয়ারাজ্যের পশ্চিম সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। মন-খ্মের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ওয়াগণ ব্রহ্মদেশের সর্ব্বাপেক্ষা অনগ্রসর জাতি। ইহাদিগের চাষের সময় অনুষ্ঠিত ভূমির উৎপাদিকা শক্তিবর্দ্ধক ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য্য 'অঙ্গ' হইতেছে নরমুণ্ডসংগ্রহ। বিভিন্ন ওয়া গ্রামের বাদবিসম্বাদ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ওয়াগণ স্বভাবতঃই সন্দিগ্ধপ্রকৃতি বলিয়া অপরিচিত

ব্যক্তির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। ওয়া রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে প্রতি পাঁচ দিন পর বাজার বসে। ইহারা নিজ নিজ গ্রামের নিকট পথের পাশে মানুষের মাথার খুলি সাজাইয়া রাখে। ওয়ারাজ্যের অধিবাসী লোই-লাগণও সম্ভবতঃ মন-খেমর গোষ্ঠি হইতেই উদ্ভূত। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও অধিকাংশই এখনও প্রেতোপাসক। পূর্ব্বে ইহাদিগের মধ্যেও নরবলি-প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে এই প্রথা লোপ পাইয়াছে, নরবলির পরিবর্ত্তে ইহারা এখন পশুবলি দিয়া থাকে। ওয়াদিগের মধ্যেও কেহ কেহ নরমুণ্ড সংগ্রহ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে। ১৯৩৫ সালে জাতিসঙ্ঘ প্রেরিত ইসেলিন কমিশন কর্ত্তৃক চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত নির্দ্দিষ্ট হওয়ার পর ওয়ারাজ্য ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ব্রহ্মদেশের অপরাপর অধিবাসীর মধ্যে জেরবাদী, আরা-কানী মুসলমান, আরাকানী কামান এবং মায়েড়ুগণের কথাও উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় মুসলমানদিগের ব্রহ্মদেশীয়া পত্নীর গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি জেরবাদীগণ প্রায় সকলেই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। আরাকানী মুসলমানগণ প্রধানতঃ আকিয়াব জেলার অধিবাসী। ইহারা চট্টগ্রামের মুসলমান-দিগের আরাকানী পত্নীর গর্ভজাত সন্তান। ইহারা সাধারণতঃ 'ইয়াখাইং কালা' (ইয়াখাইং = আরাকান, কালা = ভারত-বাসী। ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বে সমস্ত বিদেশীয়ই 'কালা' আখ্যায় অভিহিত হইত,) নামে পরিচিত। কামানগণ বলে যে, তাহারা শাহ-সুজার অনুচরবর্গের বংশধর। মায়েড়ুগণ উত্তর-ব্রহ্মের শোয়েবো জেলার অন্তর্গত মায়েড়ুতে বাস করে। ইহাদিগের ভারতীয় পূর্ব্বপুরুষগণ বিভিন্ন সময়ে ব্রহ্মরাজগণ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া ব্রহ্মদেশে আনীত হইয়াছিল। কামান এবং মায়েড়ুগণ সকলেই মুসলমান। আরাকানের অধিবাসী মগগণ আরাকানী-পিতা এবং বঙ্গদেশীয় (চট্টগ্রাম জেলার) মাতার সন্তান। ইহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

বসন্তের বিদায়

শ্রীকালিদাস রায়

আমি বসন্ত আসিলাম দ্বারে, কই সেই উৎসাহ ?
 কোথা পুষ্পিত ভাষায় সম্ভাষণ ?
বৎসর পরে অতিথি এলাম, উদাস চোখে যে চাহ !
 এবার কই ত দিলে না অলিঙ্গন !
শুধু 'এস' বলি জানালে স্বাগত, গলা কেন ভার-ভার ?
 কই ও কণ্ঠে কাকলিসিন্ধুর গান ?
প্রিয়া কি তোমার মানে বসিয়াছে রুদ্ধ করিয়া দ্বার ?
 অথবা তোমারি হইয়াছে অভিমান ?
অথবা তুমি কি প্রিয়ার বিরহে যাপিছ ফাগুন মাস ?
 চোখের দীপ্তি পাইয়াছে কেন ক্ষয় ?
প্রেয়সীর কথা তুলিয়া তোমার করিবারে পরিহাস,
 আজি যে আমার জাগিছে কুণ্ঠাভয় !
আমার পাখার বায়ু কেন উঠে তাতিয়া তোমার কাছে ?
 কুঞ্জে তোমার বুক কেন পিক শুক ?
কেন অলি আর প্রজাপতি তার পাখা গুটাইয়া আছে ?
 কিংশুক কেন বাহির করে না মুখ ?
তব অঙ্কের বীণা আজি কেন অযতনে আছে পড়ি ?
 গাঁথা নাই মালা, গৃহে নাই কোন সাজ !
শখ তোমার পঙ্কশয়নে যাইতেছে গড়াগড়ি ?
 লেখনী হয়েছে কর্ণভূষণ আজ।
চিনিতে তোমারে নারিতাম, দেহে ফিরিয়া গিয়াছে তোল
 কুঞ্জটি চিনি, তাই তোমা চিনিলাম,
তুষার-ধবল শিরে কুন্তল, চর্ম্ম হয়েছে লোল,
 একি হেরি কবি-জীবনের পরিণাম ?
উৎসব ছাড়া আমার বন্ধু কিছু নাই আর জানা,
 নাই এবে তব উৎসবোচিত মন,
নিরানন্দের মন্দিরে মোর প্রবেশ করিতে মানা,
 অনেক কুঞ্জে রয়েছে নিমন্ত্রণ।
প্রতি বৎসর সকলের আগে হেথা পাই আবাহন,
 হই যে রঙীন রাগে অনুরাগে ফাগে,
এবার আসর জমিবে না হেথা, নাই কোন আয়োজন,
 বিভব সবি, এ অতিথির ভাল লাগে ?
উত্তরে তুমি দক্ষিণ দও, হাসিতেছ ম্লান হাসি !
 ভালবাসি তোমা তাই হয় বড় ভয়,
বিদায় বন্ধু, বিদায় বন্ধু, এবারের মত আসি,
 ফিরিয়া আসিলে যেন পুন দেখা হয় !

সঙ্কল্প ও সিদ্ধি

শ্রীবিজয়কেতু বসু

অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে, অর্জ্জুনের পক্ষে "কর্ম্মযোগে"র পথ অনুসরণ করা উচিত। ইহাতে অর্থাৎ কর্ম্মযোগের পথে যে বুদ্ধি প্রযুক্ত হয় তাহা ব্যবসায়াত্মিকা। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি মানুষকে এক সুনির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। অব্যবসায়ীদের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ও অনন্তসংখ্যক। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় হইলে অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যের নির্ণায়ক মানসিক বৃত্তি এক হইলে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন দ্বিধা থাকে না। অব্যবসায়ী বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকেরা কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইতে অক্ষম। তাহাদের মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রাম্যমাণ। বাঙালীর রাষ্ট্রীয় জীবনে দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ তাহার এই অব্যবসায়ী-সুলভ বহুশাখাবিশিষ্ট বুদ্ধি। বাঙালী তাহার রাষ্ট্রজীবনে যখনই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে তখনই সে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন এবং বঙ্গ-ভারত সংযোগ-রক্ষার আন্দোলন—দুইটিই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথমোক্ত আন্দোলনটির চমকপ্রদ সাফল্যের পরই কেন বাঙালী রাষ্ট্রীয় জীবনে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল কুতূহলীর নিকট তাহার হেতুটি বিশেষ অনুসন্ধানযোগ্য। শেষোক্ত আন্দোলনেরও সাফল্যের জয়ধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতেই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আবার বাঙালীর চিত্তে উদ্বেগের সৃষ্টি করিতেছে। এই উভয় ঘটনাই একজাতীয় কারণ হইতে সঞ্জাত। যতক্ষণ বাঙালীর সম্মুখে একটা সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল—তাহা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদই হোক অথবা ভারত-রাষ্ট্রের অন্তর্গত স্বতন্ত্র বঙ্গ গঠনের দাবিই হোক ততক্ষণ বাঙালীর রাষ্ট্রজীবনও উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। যখনই বাঙালীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব দেখা দিয়াছে তখনই বুদ্ধিভ্রংশের ফলে আলস্য, অবসাদ ও অন্তঃকলহ তাহার জাতীয় জীবনে প্রমাদ আনিয়াছে।

ব্যক্তিগত জীবনেও দেখা যায়, একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিলে চেষ্টার দৃঢ়তা আপনিই আসে, যেমন—পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে ছাত্রদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষ্য তাহাদের অক্লান্ত পাঠাভ্যাসে অনেকখানি সাহায্য করে। মানুষের জীবনের লক্ষ্য, ভারতের ধর্ম্মানুশাসিত সমাজ-বিদ্যার বর্ণনানুসারে চার শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ। এই চারটির নামই পুরুষার্থ এবং একত্রে তাহারা চতুর্ব্বর্গ নামে অভিহিত। পুরুষার্থ মানে পুরুষ যাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে পুরুষ বলিতে স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই বুঝাইতেছে। মোক্ষকে বলা হয় আত্যন্তিক পুরুষার্থ অর্থাৎ যাহা পাইবার পর পুরুষের কাম্য আর কিছু থাকে না এবং তাহার সর্ব্ববিধ দুঃখের অবসান হয়। মোক্ষের সহিত রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কম, কেননা রাষ্ট্র ঐহিক কামনা-বাসনাযুক্ত লোকদের লইয়াই গঠিত এবং সংসারী লোকের সাধনীয় বিষয় ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম এই তিনটি পুরুষার্থ। এ স্থলে ধর্ম্ম কথাটি ইংরেজী Religion-এর প্রতিশব্দ নয়। ভারতীয় সমাজবিদ্যায় ধর্ম্মের মানদণ্ড মানুষের দৈনন্দিন সাংসারিক আচরণ। যে আচরণ মানুষের জন্মগত প্রকৃতি ও সামাজিক প্রতিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে সক্ষম এবং পরিণামে মোক্ষলাভের সহায়ক তাহাই তাহার পক্ষে ধর্ম্ম। যে আচরণ প্রকৃতি বা সমাজ এ দুয়ের যে-কোন একটির পরিপন্থী তাহাই অধর্ম্ম। মানুষ জন্মাবধি ক্ষুৎপিপাসাদি কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না অনুভব করে। এইগুলি যে পর্য্যন্ত না আয়ত্তে আসে ততক্ষণ মানুষের পক্ষে অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করা দুরূহ হয়। যে বস্তু মানুষের এই প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম তাহারই নাম 'অর্থ'। মানুষের মন কেবল প্রয়োজন মিটিলেই শান্ত হয় না, প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয়েও আগ্রহ দেখানো মানুষের স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য। এই প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয়ের প্রতি যে আসক্তি তাহার নাম 'কাম'। কামশাস্ত্র-কারগণ কামের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া দেন তাহা অপেক্ষা-কৃত সঙ্কীর্ণ। সহজাত প্রবৃত্তিসঞ্জাত বিবিধ প্রয়োজনের মধ্যে যৌন প্রয়োজন এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই প্রয়োজন না মিটিলে জীবের বংশ রক্ষাই হয় না তাই তাঁহারা ইহার স্বতন্ত্র বিচার করিয়াছেন। ধর্ম্ম লাভে মানুষ শান্তি পায়, অর্থ লাভে মানুষ স্বস্তি পায়, কাম লাভে মানুষ সুখ পায়।

ব্যক্তিগত জীবনে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিলে যেমন চেষ্টার দৃঢ়তা বাড়ে, রাষ্ট্রজীবনেও তেমনি একটা লক্ষ্য সুনির্দ্দিষ্ট থাকিলে রাষ্ট্র সুসংগঠিত হয়। রাষ্ট্র নিজে ব্যক্তি নয় বটে, কিন্তু তাহার একটা ব্যক্তিত্ব আছে—তাই তাহার লক্ষ্যেরও একটা প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব আছে বলিয়া সমাজবিদ্যায় যে সমস্ত সূত্র ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, পৃথিবীর রাষ্ট্রসমাজে রাষ্ট্রগত ক্ষেত্রেও সেই সমস্ত সূত্রই সমভাবে প্রযোজ্য হয়। সমাজে বাস করিতে গেলে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যেমন মানুষকে নিজের স্বার্থ এবং পরের স্বার্থ এই দ্বন্দ্বের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিতে হয়, রাষ্ট্রগত ক্ষেত্রেও তেমনি নিজ-রাষ্ট্রের মঙ্গল ও পর-রাষ্ট্রের অধিকার এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিতে হয়। রাষ্ট্রীয়

লক্ষ্যের বাস্তব রূপ নির্ভর করে রাষ্ট্রের পরিচালক ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ যে লক্ষ্যের বশবর্ত্তী তাহার উপর। রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোক যখন এই ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের অনুগামী হয় তখন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সংহতি দৃঢ় হয় এবং রাষ্ট্রজীবনে হতাশা দূর হয়। রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য কেবল ব্যক্তিগত লক্ষ্যের যোগফল মাত্র নয়, একটি সংগ্রহ বিশেষ। অঙ্কের যোগফল যেমন একটি স্থির সংখ্যা, রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য সেইরূপ অচঞ্চল বস্তু নয়। বিভিন্ন প্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্ভূত রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য স্পন্দমান বস্তু। ইহার বাস্তব রূপ কেবল সংখ্যাগৌরবের উপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে কোন্ প্রকৃতির লোক আপাততঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশীল তাহার উপরেও নির্ভর করে। ভারতীয় সমাজবিদ্যায় বিভিন্ন স্বভাব অনুযায়ী মানুষ তিনটি মুখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত বলা যাইতে পারে, যথা (১) সাত্ত্বিক, (২) রাজসিক এবং (৩) তামসিক। রাজসিক প্রকৃতি আবার দুই জাতীয় হইতে পারে—দৈব এবং আসুর। এই শ্রেণীবিভাগকরণের মধ্যে মনোবিদ্যা এবং শারীরতত্ত্বের একটি সুপরিচিত সূত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাহা জীবের শরীর বা মন যে-কোন ক্রিয়ার দিক হইতেই তিনটি অংশে বিশ্লেষণ করা চলে, যেমন (১) অন্তর্মুখ ভাগ (Afferent aspect), (২) কেন্দ্রভাগ (Central aspect) এবং (৩) বহির্মুখ ভাগ (Efferent aspect)। অন্তর্মুখ ভাগ জীবকে অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন করে, বহির্মুখ ভাগ তাহাকে বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে সক্রিয় করে। কেন্দ্রভাগ এই উভয় অংশের মধ্যে সেতুস্বরূপ। একজন তৃষ্ণায় জল পান করিল, এ ক্ষেত্রে তৃষ্ণার অনুভূতি তাহার অন্তর্মুখ ভাগের ক্রিয়া এবং জল পানের চেষ্টা তাহার বহির্মুখ ভাগের ক্রিয়া। জল পানের যোগ্য কি না ইত্যাদি বিচার কেন্দ্রভাগের ক্রিয়া। অন্তর্মুখ ভাগ যখন ক্রিয়াশীল হয় তখন মানুষের স্বভাব সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয় এবং বহির্মুখ ভাগ যখন সক্রিয় হয় তখন তাহা রাজসিক ভাবাপন্ন হয়। যখন কোন বাধার ফলে অন্তর্মুখ বা বহির্মুখ ভাগে জড়তা আসে তখন মানুষের স্বভাব তামসিক ভাবাপন্ন হয়। সত্ত্বগুণের লক্ষণ প্রকাশ, রজোগুণের লক্ষণ চেষ্টা, উভয় দিকেই যে গুণ বাধা সৃষ্টি করে তাহাই তমঃ। মানুষের চেষ্টা সমাজের মঙ্গলের জন্যও হইতে পারে আবার অনিষ্টের জন্যও হইতে পারে, তাই উদ্দেশ্যভেদে রাজসিক প্রকৃতিকে পুনরায় দুইটি উপশ্রেণীতে পৃথক করা হইয়াছে—দৈব এবং আসুর।

রাষ্ট্রপরিচালনায় যে প্রভাব কার্য্যকর তাহাকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, (১) ব্যক্তিগত, (২) সম্প্রদায়গত। এই দুই জাতীয় প্রভাবকেই আবার (ক) প্রাপ্ত এবং (খ) অর্জিত এই দুইটি উপশ্রেণীতে পৃথক করা সম্ভব। ব্যক্তিগত প্রভাবের উদাহরণ স্বরূপ বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী, আইনষ্টাইন, বার্ণার্ড শ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এগুলি সমস্তই অর্জিত প্রভাব অর্থাৎ ইঁহারা নিজের চেষ্টায় বিপুল প্রভাবের অধিকারী হইয়াছেন। ইহার বিপরীত উদাহরণস্বরূপ হায়দরাবাদের নিজাম প্রমুখ দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রভাব উত্তরাধিকারসূত্রে 'প্রাপ্ত' হইয়াছেন। সম্প্রদায়গত ক্ষেত্রে 'প্রাপ্ত' প্রভাবের উদাহরণ-স্বরূপ জমিদারশ্রেণীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুরুষানুক্রমে জমিদারশ্রেণী প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এই প্রভাব তাহারা অর্জন করে নাই, পূর্ব্বপুরুষ হইতে 'প্রাপ্ত' হইয়াছে মাত্র। সম্প্রদায়গত ভাবে অর্জিত প্রভাবের উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে শ্রমিক আন্দোলনের কথা। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণী উপস্থিত যতটা প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত বস্তু নয়, নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের জীবনেই অর্জিত। এইখানে আমরা যদি ইতিহাসের গতির দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে দেখিতে পাই, কালক্রমে 'অর্জিত প্রভাব' 'প্রাপ্ত প্রভাবে' পরিণত হয় এবং সম্প্রদায়গত উত্তরাধিকার ব্যক্তিগত উত্তরাধিকারে পর্য্যবসিত হয়। প্রভাব যে ভাবেই আসুক না কেন, রাষ্ট্রের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে সেই প্রভাবের ব্যবহার-প্রণালীর উপর। প্রভাব শুভ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইলেও তার আশানুরূপ সফল হওয়া বা না হওয়া কিন্তু নির্ভর করে অনেকটা প্রয়োগ-কৌশলের উপর। যে নেতা যথোচিত লক্ষ্য নির্ব্বাচনে দক্ষ এবং সেই লক্ষ্যের প্রচারে নিপুণ তিনিই লোকপরিচালনায় সমর্থ হন। উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব আকর্ষণ-শক্তি এবং প্রয়োগ-কৌশলের নিপুণতা—এই ত্রিবিধ গুণেরই সমন্বয় আবশ্যক। এতক্ষণ রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য স্থিরীকরণে রাষ্ট্রের বিভিন্ন আভ্যন্তর প্রভাবের কথাই আলোচনা করা হইল। রাষ্ট্রের লক্ষ্য নির্দ্ধারণে আভ্যন্তর প্রভাব বিশেষ শক্তিশালী হইলেও বাহ্য প্রভাবের গুরুত্বও মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। এই বিষয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ এবং বৈদেশিক প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহ উভয়েই বিশেষ ভাবে দায়ী হইয়া থাকে।

ব্যক্তিই রাষ্ট্রের মূল উপাদান এবং পরিণামে তাহার কর্ম্ম-প্রচেষ্টার উপরেই রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। অতএব রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য যে ব্যক্তির কর্ম্মপ্রচেষ্টা বৃদ্ধি করিবে তাহাই বাঞ্ছনীয়—এইটি একটি সূত্র। ব্যক্তি রাষ্ট্রের মূল উপাদান হইলেও ব্যক্তি হইতে সরাসরি রাষ্ট্রগঠন হয় না। ব্যক্তি হইতে পরিবার, পরিবার হইতে গোষ্ঠী ও নানাবিধ সমাজ-শ্রেণীর সমবায়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। সুতরাং যে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য পরিবার নির্ম্মাণে এবং পরিবার গোষ্ঠী তথা সমাজ প্রতিপালনে সহায়তা করিবে তাহাই রাষ্ট্রের আভ্যন্তর-গ্রন্থিসমূহ দৃঢ় রাখিতে পারিবে। এইটি লক্ষ্য নির্ব্বাচনের দ্বিতীয়সূত্র। পর-রাষ্ট্রের উপর প্রভাব থাকা-না-থাকার উপরেও রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধি

অনেকাংশে নির্ভর করে। এ স্থলে প্রভাব ও প্রভুত্ব এই দুইটি বিষয়ের প্রভেদ সর্ব্বদা মনে রাখা প্রয়োজন, কেননা প্রভুত্ব করিতে গেলে প্রায়ই প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়। প্রভুত্ব না করিয়াও প্রভাব বিস্তারের ঘটনা ইতিহাসে বিরল নহে। অশোকের সময় ভারতের বাহিরে ভারতীয় প্রভাব অথবা আধুনিক যুগে ভারতের বাহিরে বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য পর-রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে অথচ প্রভুত্ব করিবে না তাহাই কাম্য—এইটি রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য নির্ব্বাচনের তৃতীয় সূত্র।

রাষ্ট্রজীবনে সমৃদ্ধিলাভ যদি বাঙালীর সংকল্প হয় তবে তাহাকে সিদ্ধিলাভের জন্য উপযোগী লক্ষ্য স্থির করিয়া কর্ম্ম-প্রচেষ্টা বাড়াইতে হইবে। এই লক্ষ্য নির্ব্বাচনে চিন্তানায়কদের সাহায্য প্রয়োজন, লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে কর্ম্মনায়কদের প্রয়োজন। বাংলায় তাহার কোনটিরই অভাব না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যদি সম্প্রদায় ও প্রকৃতিনির্ব্বিশেষে সকল বাঙালীকে কালজয়ী ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তাহার তাৎপর্য্য বুঝানো যায়, যদি চিরবিকাশমান ভারতীয় সভ্যতারচনায় বাংলার দান বাঙালী বুঝে তবে সংকল্প-সিদ্ধির জন্য যে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যের প্রয়োজন তাহার নির্দ্ধারণ কষ্টসাধ্য হইবে না।

গ্রাম ও শান্তি

শ্রীনির্ম্মাল্য দাশগুপ্ত

আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষ হইবার পর বৎসর ঘুরিয়া আসিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা অর্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু আমাদের সম্মুখে কঠোরতর সংগ্রাম—সে সংগ্রাম শান্তি ও সমৃদ্ধির সংগ্রাম। বিদেশী শাসনের আমলে শান্তি ও সমৃদ্ধির অভাবের জন্য আমরা বিদেশী শাসনকেই দায়ী করিয়াছি। আজ সে শাসন অপসৃত। আজ দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির দায়িত্ব তাঁহাদেরই যাহারা রাষ্ট্রের কর্ণধার। দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়া যে কংগ্রেস দেশের দুয়ারে স্বাধীনতাকে পৌঁছাইয়া দিয়াছে আজ তাহারই হাতে দেশ-পরিচালনার ভার। সংগ্রাম ও ত্যাগ দ্বারা জন-মনে কংগ্রেস যে বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে তাহাতে কংগ্রেসী আমলে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হইবে এই আশায় সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল যে এইবার দেশে সুখ শান্তি ফিরিয়া আসিবে, অভাব দূর হইবে এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। কিন্তু এক বৎসরের অভিজ্ঞতায় জনগণের অটুট বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে আঘাত লাগিয়াছে। কংগ্রেসী নেতাদের রাষ্ট্র-পরিচালন ক্ষমতায় তাহাদের মনে সংশয় জাগিয়াছে।

এই সংশয়েরই উত্তর পাই লক্ষ্ণৌয়ে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতায়। তিনি জনসভায় সমাগতদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'Remove the Congress and you will see India fall apart'। কংগ্রেসের প্রতি অনুরাগ দেশের এখনও যায় নাই; কংগ্রেসকে ভাঙিয়া দিবার কথা দেশবাসী এখনও মনে আনে নাই। কিন্তু কংগ্রেস যে পথে চলিয়াছে সেই পথেই চলিতে থাকিলে এক-দিন আপনা হইতেই সে দেউলিয়া হইয়া পড়িবে। শিশু-রাষ্ট্রকে অনেক বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া চলিতে হইতেছে বলিয়া, বর্ত্তমানে ইহার কঠোর সমালোচনা না করিয়া ভবিষ্যৎ পরিণতির জন্য প্রতীক্ষা করিবার যে নির্দ্দেশ আমাদের দেওয়া হইতেছে তাহা অসঙ্গত নয়—কিন্তু যে শিশুর মধ্যে শৈশবেই ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দেয়, বা যে শিশুর কোনও অঙ্গ বিষাক্ত হয় সে সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করিবে কেমন করিয়া? শৈশব দেখিয়াই পরিণত কালে কি হইবে বুঝা যায়। শৈশবে যাহার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি প্রকাশ পায়, মহান্ প্রেরণার আভাস দেখা যায়—তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই আমরা আশান্বিত হই। জড়তা দেখিলে নৈরাশ্য বোধ করি।

শিশু-রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার কংগ্রেসের হাতে। কংগ্রেসী কর্ত্তৃপক্ষই আজ দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা। তাঁহাদেরই নির্দ্দেশ ও ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্রের নানা বিভাগে লোক নিযুক্ত হইতেছে। এই সব নিয়োগে কংগ্রেসের সহিত কাহার কত কালের যোগাযোগ আছে, কে কত বৎসর জেলে থাকিয়াছে তাহাই যেন যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংগ্রামের সময় যে সৈনিক নির্ভীক ভাবে অস্ত্রের আঘাত সহ্য করিয়াছে, শান্তির সময় সেই যে দেশ-পরিচালনার কাজ নির্ভুল ভাবে করিবে এমন কোন কথা নাই। সৈনিকের কাজ যুদ্ধ করা; মসনদে বসা নয়। অধিকাংশ কংগ্রেসীই বিগত ২০।২৫ বৎসর ধরিয়া ব্রিটিশ শাসনের অবসানের চিন্তা ও চেষ্টা করিয়াছেন। বিদেশী শাসনকে ধ্বংস করিবার প্রয়াসে তাঁহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটিয়া গিয়াছে। ধ্বংসের কাজে তাঁহারা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সেইজন্য গড়ার কাজেও তাঁহারা সুদক্ষ হইবেন এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

শান্তি ও সমৃদ্ধির কোন্ আভাস আজ আমরা দেখিতে

পাই? স্বাধীনতালাভের পর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটার পর একটা জটিলতা চলিয়াছেই। কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ এই উভয় দেশীয় রাজ্যের সমস্যাই গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। হায়দরাবাদ সমস্যার একরূপ মীমাংসা হইয়াছে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান এখনও সুদূর পরাহত বলিয়া মনে হইতেছে। কথায় কথায় জাতিপুঞ্জ-সংসদের (U.N O.) দ্বারস্থ হওয়াতে আমাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় না। দেশের আভ্যন্তরীণ নানা সমস্যার কোনটারই সমাধান হয় নাই। সমাধানের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্, কোথাও তো আলোর রেখাও দেখা যায় না। খাদ্য-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা, উদ্বাস্তুদের সমস্যা—ছোট-বড় নানা সমস্যা লইয়া আমরা বিব্রত। সমস্যার মীমাংসা হওয়া দূরের কথা, সকলক্ষেত্রে অবনতির লক্ষণই দেখা যাইতেছে। দেশজোড়া এই অবনতির মূলে—দেশবাসীর নৈতিক অধোগতি। যেমন তেমন করিয়া নিজের পুঁজি বাড়াইবার দিকেই লোকের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য। এই সকল পুঁজিবাদীরা নীতি মানে না, মানবতার ধার ধারে না, আইনকেও ফাঁকি দেয়। তাহারই ফলে দেশে অনাচার, অভাব অভিযোগের অন্ত নাই। এ সমস্ত নির্ম্মম হস্তে দমন করিবার ব্যবস্থা নাই। ফলে অবনতির মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। জনসাধারণ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কংগ্রেসী আমলেও স্বাধীন দেশে কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল? ইহার উপর আর এক গুরুতর সমস্যা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—প্রাদেশিকতা। প্রদেশে প্রদেশে এই যে অন্তঃকলহ ইহার জন্য দেশে আমাদের নিজেদের ক্ষতি তো হইতেছেই, বিদেশেও লজ্জার সীমা নাই। সমস্ত ভারতের প্রতিনিধি যে কংগ্রেস তাহারই হাতে দেশের শাসনভার, তবু কেন এই প্রাদেশিকতা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল?

ভারত-শাসনের খসড়া-বিধিতে আমরা অনেক বড় বড় কথা পাই—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। কথাগুলি মহান্ আদর্শের দ্যোতক, কিন্তু কার্য্যতঃ কি দাঁড়াইয়াছে? এই সব বড় বড় আদর্শের মাঝেই দুনিয়ার যত অনাচার সংঘটিত হইয়া থাকে—ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দিবে।

খসড়া-বিধিতে দেখিতে পাই—

(1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters of employment under the State.

(2) No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth or any of them be ineligible for any office under the State.

বাস্তবক্ষেত্রে ইহা কি অনুসৃত হইয়াছে? তবে ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের প্রথা প্রচলিত রহিল কি ভাবে? ভারতের এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে বিদেশী বলিয়া গণ্য হইতেছে—ইহাই কি আমরা দেখিতেছি না?

No minority whether based on religion, community or language, shall be discriminated against in regard to the admission of any person belonging to such minority into any educational institution maintained by the State.

The State shall not in granting aid to educational institution discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority whether based on religion, community or language.

কিন্তু কার্য্যতঃ দেখি, বিহারের সংখ্যালঘু বাঙালী সম্প্রদায় সব রকম সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়। ডোমিসাইল সার্টিফিকেট না থাকিলে স্কুল-কলেজে ভর্ত্তি হওয়া দুরূহ, স্কলারশিপ পাওয়া অসম্ভব। সার্টিফিকেট থাকিলেও ব্যবহারে তারতম্য করা হয়। যোগ্যতা থাকিলেও চাকুরীতে প্রমোশন বদলী ইত্যাদি বিষয়ে বাঙালীদের দাবী গ্রাহ্য হয় না। বিহারে বাঙালীদের স্বার্থরক্ষা বিষয়ে বিহারের কোনও মাথাব্যথা নাই। মানভূম, সিংভূম যাহাতে বাংলাদেশের অন্তভুক্ত না হইতে পারে সে বিষয়ে বিহার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছে। এই সব অঞ্চলে বাংলা ভাষার পরিবর্ত্তে হিন্দী প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেন সেগুলিতে হিন্দীভাষী বিহারীদেরই অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করা হয়। এই সমস্ত সত্ত্বেও কি করিয়া বলা যায় যে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের সমান দাবি স্বীকৃত হইবে, এবং ভাষার জন্য কোন তারতম্য করা হইবে না?

আসামের অবস্থাও একই প্রকার। সেখানে বাঙালী বিতাড়নের ব্যবস্থা দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিবে। লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিসংযোগও ঘটিয়াছে। এই তো সেদিন নওগাঁ ও গৌহাটিতে কত কাণ্ড হইয়া গেল। এ সমস্ত কি সংখ্যালঘুদের মধ্যে অনাস্থার সৃষ্টি করে না? উড়িষ্যাতেও বাঙালীদের লাঞ্ছনার কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। ভারতের এক প্রদেশের অধিবাসীদের যদি অন্য প্রদেশে এইরূপ দুর্গতি ভোগ করিতে হয়, তবে কংগ্রেসের বহু বিঘোষিত সাম্য ও মৈত্রী ইত্যাদি নীতির উপর জনসাধারণের আস্থা থাকে কি করিয়া?

কংগ্রেসের নীতি ছিল ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশ-সমূহের পুনর্গঠন। বহু বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস এই নীতিই ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশ সিংভূম, মানভূম ন্যায়সঙ্গত ভাবে দাবি করিয়াও পাইতেছে না, বরং এই দাবি উত্থাপনের জন্য বাঙালীরা নিন্দিত হইতেছে। পণ্ডিত নেহরু, রাজাজী ইত্যাদি রাষ্ট্রপ্রধানগণ বলিতেছেন, 'কোন্ প্রদেশে কোন্ অঞ্চল রহিল ইহা লইয়া কোলাহল ও কলহ করা উচিত নয়—যে প্রদেশেই থাক ভারতেই তো রহিল। কিন্তু বিহার, আসাম ও উড়িষ্যায় বাঙালীদের দুরবস্থার কোন প্রতিকারের চেষ্টাও তো তাঁহারা করিতেছেন না। আরও একটি কথা। অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরল ও মহারাষ্ট্রের স্বতন্ত্র প্রদেশ হওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয় বিচার অনুসন্ধানাদির জন্য কমিশন

নিযুক্ত হইয়াছে, অথচ বাংলাভাষী অঞ্চল লইয়া দাবি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতেও কর্তৃপক্ষ অনিচ্ছুক। এই বৈষম্যমূলক আচরণে কংগ্রেসের পক্ষে তাহার মর্য্যাদা অনেকাংশে হারাইবার সম্ভাবনা।

কোনও দিক দিয়া কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কি? সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু চোরাকারবার এখনও পুরাদমে চলিতেছে। সমাজের এক স্তরে লোকে ক্রমশঃই উচ্চহারে ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে, আর এক দিকে লোকে অনাহারে অর্দ্ধাহারে জীবনীশক্তি হারাইতেছে।

জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা মোচনের আশ্বাস কম্যুনিষ্ট দলের শক্তির মূলে। তাহাদের বড় বড় কথা দুর্গত শ্রমজীবীদের প্রভাব বিস্তারের কারণ। কংগ্রেস যদি চাষী মজুরের অভাব দূর করিতে আন্তরিক চেষ্টা করিত, তাহা হইলেই কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিপত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা হইত। জোর করিয়া তাহাদের মুখবন্ধ করিতে হইত না। যাহারা যথার্থ অপরাধী বিচারালয়ে তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা কি যাইত না? সেই তো ব্রিটিশ আমলের বহুনিন্দিত অর্ডিন্যান্সেরই পুনরাবৃত্তি হইল কংগ্রেসী আমলে। দেশের এই দুঃখদুর্দ্দশা ও অভাবের দিনে কমিউনিষ্ট দল যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেশের পক্ষে অহিতকর অবশ্যই, কিন্তু সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও কম্যুনিষ্ট দল একটা কাজ করিতেছিল—কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কিছু অপ্রিয় সত্য ভাষণের শক্তি তাহার ছিল। ইহা বন্ধ করা কংগ্রেসের পক্ষে সমীচীন হইয়াছে কি? দেশ-পরিচালনার ভার যাহাদের হাতে, বিরুদ্ধ পক্ষের মতামত বিবেচনা করাও তাহাদের প্রয়োজন, তাহা হইলে নিজেদের গলদ বুঝিয়া তাহারা সংশোধনের চেষ্টা করিতে পারিতেন।

কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিল। কংগ্রেস এবং সমগ্র দেশই আজও সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে গান্ধীজীর নামই উল্লেখ করে। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, গান্ধীজীর রাজনৈতিক অস্ত্র অহিংসার সাহায্যে আমরা স্বাধীনতালাভ করিলাম, কিন্তু গান্ধীজী মৃত্যুতে যে সত্যের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, সেই সত্যকে আমরা নিয়ত নানা-ভাবে অবমাননা করিয়া আসিতেছি। আমরা সত্যকে বিসর্জ্জন দিয়া অসত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছি।

স্বাধীনতালাভ করিয়া যদি আমরা সুখে ও শান্তিতে না থাকিতে পারিলাম তাহা হইলে এই স্বাধীনতার মূল্য কি? সাধারণ লোকে চাহে সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে। দিল্লীর রাষ্ট্রপাল-প্রাসাদশীর্ষে ইউনিয়ন জ্যাক উড়িল, কি চক্রচিহ্ন শোভিত ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িল তাহাতে তাহার কি আসে যায়?

আধুনিক ব্যবহারে প্রাচীন সংজ্ঞার উপযোগ

অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

উদ্বাসন (Evacuation)

ইংরেজী evacuation শব্দের অর্থ 'স্থান খালি করিয়া দেওয়া'। ঠিক এই অর্থে প্রাচীন গ্রন্থে উৎ পূর্বক বস্ ধাতু হইতে উৎপন্ন নানা রূপ পদের প্রয়োগ পাওয়া যায়।

বৈদিক গ্রন্থে সোম যাগ প্রকরণে প্রবর্গ্যোদ্বাসন নামে একটি অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে। উহার অর্থ প্রবর্গ্যসম্ভারের অপসারণ। এক স্থান খালি করিয়া সম্ভারগুলি অপর স্থানে সরাইয়া লইতে হয়—ইহাই 'উদ্বাসন'। কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রেও (৩।১৪) এই পদটির উল্লেখ আছে।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।২।৬।৭) এক শ্রেণীর দুষ্ট লোকের বিশেষণ আছে 'উদ্বাসীকারিণঃ'। ইহাদের উৎপীড়নে অধিবাসীরা উদ্বাসী হইত অর্থাৎ বাসস্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। এই উদ্বাসীকারী পদের ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য লিখিয়াছেন—'দেশম্ এতম্ উদ্বাসং নিবাসশূন্যং কুর্বন্তি'—ইহারা দেশকে 'উদ্বাস' অর্থাৎ নিবাসশূন্য করিয়া ফেলে।

পঞ্চদশ শতকে সংকলিত 'লেখ-পদ্ধতি' নামক গ্রন্থে দেখা যায়—কোন চাষী জমির ফসল সম্পর্কে অন্যায় আচরণ করিলে তাহাকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত। এই বহি-ষ্করণের নাম ছিল উদ্বাসন (গ্রামাৎ উদ্বাসনীয়ঃ—১৯ পৃঃ)। কোন এক ব্যক্তি তাহার পূর্ববাস ত্যাগ করিয়া নূতন স্থানে আসিলে তাহাকে বলা হইত 'উদ্বস' (উদ্বস-কুটুম্বিকানাম্—১০ পৃঃ)। লেখ-পদ্ধতিতে উদ্বস শব্দের অর্থ বাস্তত্যাগী। কিন্তু কল্হণের রাজতরঙ্গিণীতে (৫।৩৭৮) অনধ্যুষিত শূন্য স্থানকে 'উদ্বস' বলা হইয়াছে (নিত্যোদ্বসেষু নিরয়েষু নিগাশ্চরেষুঃ)।

উল্লিখিত উদ্বাসন, উদ্বাস, উদ্বাসনীয় এবং উদ্বস শব্দের প্রয়োগ হইতে জানা যায়—উৎ পূর্বক বস্ ধাতুর অর্থ to evacuate। এই ধাতু হইতে আর একটি পদ হয় 'উদ্বাস্তু'।

বাংলার সাহিত্যিকগণের রচনায় ভিটা-ছাড়া অর্থে উদ্বাস্তু পদের ব্যবহার আছে। সময়ে সময়ে সংবাদপত্রে বাস্তুত্যাগী-দিগকে উদ্বাস্তু নামে উল্লেখ করা হয়। 'পরিভাষা সংসদ্'ও

evacueeর জন্য উদ্বাস্তু নাম প্রস্তাব করিয়াছেন। শব্দটি অভিপ্রেত অর্থের প্রকাশক তাহাতে সন্দেহ নাই। 'উৎ' উপসর্গের এক অর্থ বিয়োজন, পৃথক্করণ। সুতরাং বাস্তুভূমি হইতে বিয়োজিত ব্যক্তি প্রকৃত উদ্বাস্তু।

যাঁহারা পাকিস্থানের বাস ত্যাগ করিয়া এদেশে আশ্রয় লইতেছেন তাঁহাদিগকে সরকারী খাতাপত্রে refugee বলা হয়। ইঁহারা আশ্রয়ের সন্ধানে ফিরিতেছেন। সেদিক দিয়া দেখিলে refugee, আশ্রয়প্রার্থী বা শরণার্থী নাম অসংগত নয়। আবার আর এক দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ সংজ্ঞা অনুপযুক্ত বলিয়া মনে হইবে। জয়পুর কংগ্রেসের সভাপতি ডা: পট্টভি সীতারামিয়া তাঁহার অভিভাষণে এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার মর্ম এই,—

> রাষ্ট্রনায়কগণের অনুমোদনক্রমে দেশবিভাগ হইয়াছে। তাহার ফলে বহু লোক পৈতৃক বসতি ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইতেছেন। এ সকল ব্যক্তি শরণার্থীরূপে ভারতবর্ষের অনুকম্পার ভিখারী হইতেছেন মনে করিলে অবিচার করা হইবে। ইঁহারা রাষ্ট্রিক অধিকার-বলেই এদেশে স্থান পাইবার যোগ্য। ইঁহাদিগকে ইংরেজীতে evacuee বলা সংগত। আমাদের ভাষায় ইঁহাদের নাম হওয়া উচিত 'পরবাসী' কিম্বা 'নির্বাসী'।

ডা: পট্টভি 'নির্বাসী' নামটি উৎকৃষ্ট মনে করেন। রাষ্ট্রপতির মন্তব্যের ফলে সংবাদপত্রে নির্বাসী পদের ব্যবহার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নির্বাসী শব্দের অপর এক অর্থ সুপ্রসিদ্ধ। তাহা ছাড়া, এ স্থলে 'নির্' অপেক্ষা 'উৎ' উপসর্গই যে সমধিক অর্থদ্যোতক হইবে তাহা উপরে প্রদর্শিত প্রয়োগগুলির আলোচনায় স্পষ্ট হইয়াছে। সুতরাং evacuee এবং তৎসম্পর্কিত ইংরেজী শব্দের জন্য নিম্নলিখিত রূপ প্রতিশব্দ গ্রহণযোগ্য হইবে বলিয়া মনে করি,—

evacuee—উদ্বাসী, উদ্বাস্তু
evacuated—উদ্বাসিত
evacuation—উদ্বাসন ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকারের অর্থপ্রকাশের জন্য এক বস্ ধাতু হইতে আরও অনেক প্রয়োজনীয় পদ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ধাতুটির যোগ্যতা অসামান্য, কয়েকটি উদাহরণ দিলেই তাহা স্পষ্ট হইবে।—

emigration—প্রবসন বা উৎপ্রবসন
rehabilitation—পুনর্বসন বা পুনরাবাসন
repatriation—প্রত্যাবাসন
immigration—অভিবসন বা অভিবাসন
domicile—নিবসন (ক্রিয়া), নিবাস (স্থান), নিবাসী (ব্যক্তি)
transportation—নির্বাসন

রাষ্ট্রভাষা ও সঙ্কীর্ণতা

অধ্যাপক শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ রায়

যে ভাষার সাহায্যে রাষ্ট্রের কার্যপরিচালনা সহজসাধ্য হয় রাষ্ট্রভাষার স্থান অধিকার করিবার যোগ্যতা তাহারই সবচেয়ে বেশী। ইংরেজ-শাসিত ভারতে ইংরেজীই ছিল রাষ্ট্রভাষা, তাই এত দিন ভারতের রাষ্ট্রভাষা লইয়া কোন বিতর্ক উপস্থিত হয় নাই। আজ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা লইয়া বহু মতবিরোধ উপস্থিত। এমন একটি ভারতীয় ভাষা রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত যাহার গতি স্বচ্ছন্দ, শব্দসম্পদ প্রচুর এবং যাহা শিক্ষা করিবার জন্য কোন প্রদেশবিশেষের অধিবাসীদের দ্বারস্থ না হইতে হয়। মাত্র এই কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা নির্দ্ধারণ করিতে গেলে প্রথমতঃ কেবলমাত্র দেবনাগর অক্ষরসম্বলিত সংস্কৃত ভাষারই নাম উল্লেখ করা যায়। ভারতের যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য, যত কিছু সমৃদ্ধি, ভারতের কাছে জগতের যাহা কিছু শিক্ষণীয় সমস্তই সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডারে সুরক্ষিত; সুতরাং আজ যদি সত্যসত্যই ভারতকে তাহার মহিমোজ্জ্বল স্বত্বসিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা নেতৃবৃন্দের মনে জাগিয়া থাকে, সত্যসত্যই আজ যদি তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য ভাব ও প্রভাবমুক্ত হইয়া দেশমাতৃকার অর্চনার যোগ্য অধিকারী বলিয়া নিজেদের মনে করিয়া থাকেন তাহা হইলে বিচিত্র শব্দসম্ভার-সমৃদ্ধ—স্বচ্ছন্দ গতিশীল প্রাদেশিক ভাগদ্ববর্জ্জিত সংস্কৃত ভাষাকে নিখিল-ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষণা করা তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। কেননা যতই দিন যাইতেছে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ বিভাগের ভার রাষ্ট্রভাষা নির্ণয় লইয়া বিরোধের তিক্ততা ততই বাড়িয়া চলিতেছে।

হিন্দুস্থানী (উর্দু ও হিন্দী-মিশ্রিত), হিন্দী, বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত এই কয়টি ভাষা লইয়া রাষ্ট্রভাষা নির্ব্বাচনের বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যেকটির দাবির যৌক্তিকতা বিচার করিলে দেখা যাইবে—

(ক) বহুসংখ্যক লোক মোটামুটি হিন্দুস্থানী ভাষা বুঝিতে

পারিলেও এবং সেই ভাষায় কোনও প্রকারে কথাবার্ত্তা বলিতে সক্ষম হইলেও শব্দসম্পদে একান্ত দরিদ্র, সাধারণের কথ্য ভাষারূপে প্রচলিত, নিজস্ব অক্ষরসম্পদহীন এই ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবি করিতে পারে না। এস্থলে একথাও স্মরণীয় যে, যাঁহারা হিন্দুস্থানীকে নূতনরূপে গঠন করিয়া রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষপাতী তাঁহারা কিন্তু উর্দ্দু ও দেবনাগর এই দুই জাতীয় অক্ষরকেই তাহার বাহন করিতে চান। তাহার ফলে এই দুই জাতীয় অক্ষরই প্রত্যেকের শিক্ষণীয় হইয়া পড়ে। অন্যথায় মুসলমানপ্রধান অঞ্চলের রাজকর্ম্মচারীদের কাগজপত্র হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ এবং হিন্দু রাজকীয় কর্ম্মচারীদের কাগজপত্র মুসলমান রাজকর্ম্মচারিগণ ও তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কোন প্রকারেই পড়িতে পারিবেন না। ইহাতে কিরূপ অসুবিধার উদ্ভব হইতে পারে তাহা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। ইহা ছাড়া আভিজাত্যপূর্ণ, সুসংস্কৃত ও সুসমৃদ্ধ ভাষার প্রতি তাঁহাদের যে স্বাভাবিক অনুরাগ আছে তাহা পরিহার করিয়া নিতান্ত সাধারণ একটা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে মর্য্যাদা দান করিবেন তাহা মনে হয় না।

(খ) হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইলে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা দুর্ব্বল হইবে এবং এই ভাষাশিক্ষার জন্য বহু প্রদেশের অধিবাসীদের হিন্দী ভাষাবিদ্ পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হইতে হইবে—অথচ পরিভাষা প্রভৃতির জন্য সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হইতেও হইবে। ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির মধ্যে হিন্দী-সাহিত্য এত সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই যে, তাহা শ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবি করিতে পারে। হিন্দীর রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবির অনুকূলে বহু যুক্তি থাকিলেও প্রতিকূল যুক্তিগুলিও অকিঞ্চিৎকর নহে।

(গ) বাংলা রাষ্ট্রভাষা হইলে হিন্দীর ন্যায় প্রাদেশিকতার দোষগুলি অবশ্যই থাকিবে। ভারতের প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে বাংলাভাষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যরথীদের রচনা অবশ্যপাঠ্য হইলেও, এবং রাষ্ট্রভাষারূপে উপস্থিত হওয়ার আপেক্ষিক যোগ্যতা তাহার থাকিলেও এমন সব কারণ বিদ্যমান আছে যাহাতে বাংলা সর্ব্বভারতের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারিবে না।

(ঘ) ইংরেজী বৈদেশিক ভাষা। কোন বৈদেশিক ভাষা কোন স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষা হইবে তাহা সমীচীন নহে।

এদেশে নাম স্বাক্ষর মাত্র করিতে সক্ষম ব্যক্তিকেও শিক্ষিতের পর্য্যায়ে ফেলিয়া যদি শিক্ষিতের সংখ্যা দশ-বার জন মাত্র হয় তবে তাহার মধ্যে কয় জন ইংরেজীশিক্ষিত আছেন তাহা সহজেই অনুমেয়। যদি এই অত্যল্প ইংরেজীশিক্ষিত লইয়া দুই শত বৎসর রাজকার্য্য পরিচালনা করা বিদেশীর পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে তবে তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক সংস্কৃত ভাষাকুশল ব্যক্তি লইয়া বর্ত্তমানে রাষ্ট্রের কার্য্যপরিচালনা অসম্ভব হইতে পারে না।

ভারতীয়দের রক্তমাংসমজ্জার সহিত সংস্কৃত ভাষা অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। সকালে "ব্রহ্মা মুরারিঃ", "অহল্যা-দ্রৌপদী" প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া "নরং পঞ্চত্বমাগতম্" পর্য্যন্ত যদি আমরা সজ্ঞানে বা অর্থ না বুঝিয়া সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকি, তবে এক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষাকে উপেক্ষা করার সপক্ষে কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। আমাদিগকে পাশ্চাত্য ভাষার মোহপাশে বাঁধিয়া যাহারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহারাই আবার সেই সুযোগে সংস্কৃত ভাষার রত্নরাজি আহরণ করিয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে। প্রাণপণ পরিশ্রম দ্বারা ছাত্র-জীবনের অর্দ্ধেকেরও অধিক সময় ব্যয় করিয়া যদি আমরা ইংরেজী শিখিতে পশ্চাৎপদ না হইয়া থাকি তবে তদপেক্ষা অল্পসময়ে আমাদের সত্তার সহিত বিজড়িত সংস্কৃত ভাষা শিখিতে পারিব না কেন?

ভারতের প্রত্যেক ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় একটা যোগসূত্র থাকায়, ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত থাকায় এবং সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর সংস্কৃত ভাষার আলোচনা থাকায় সর্ব্বভারতীয় ভাষা হিসাবে একমাত্র সংস্কৃত ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা চলে—সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিলে এক্ষেত্রে বিতর্কের বা সংশয়ের কোন হেতু থাকিতে পারে না। পৃথিবীর অনেক সভ্যজাতির মধ্যে সংস্কৃতে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত আছেন। বর্ত্তমান যুগে দেবেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণ সংস্কৃতে নিবদ্ধ উপনিষদের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অহিংসার মূর্ত্ত প্রতীক যে মহাত্মা ভারতের বৈশিষ্ট্যকে জগৎসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া সমগ্র বিশ্বকে চমকিত করিয়া গিয়াছেন সেই গান্ধীজীর সাধনালব্ধ অমূল্য রত্নসমূহ মুখ্যতঃ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গীতা হইতেই সংগৃহীত। সংস্কৃত ভাষা সম্যক্ অনুশীলিত হইলে মাত্র পাঁচ বৎসর পরেই দেখা যাইবে সংস্কৃত শিক্ষিতের সংখ্যা বর্ত্তমান ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যাকে বহুগুণে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আজ জড়বিজ্ঞান "কত অল্প সময়ে কত অল্প ব্যয়ে, কত অধিকসংখ্যক প্রাণীর প্রাণ নাশ করা যায়" এ বিষয়ে চূড়ান্ত আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই অশান্ত জগৎ কি উপায়ে শান্তিলাভ করিতে পারে তাহার উপায় ভারত ব্যতীত কোন দেশই নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হয় নাই। ভারতকে আজ হিংসা-দ্বেষজর্জ্জরিত অশান্ত জগৎকে সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচার দ্বারা উপশান্ত করিতে হইবে—তাই চাই সংস্কৃত ভাষার সম্যক্ অনুশীলন। যে ভাষা এত সুসমৃদ্ধ তাহার সম্যক্ চর্চ্চা

হইলে তাহার গতি যে দুর্ব্বার হইতে পারিবে এবং তাহাই যে এ দেশের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রভাষারূপে পরিণত হইতে পারিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষাই ভারতের সর্ব্বত্র মর্য্যাদা পাইবার অধিকারী। প্রত্যেক অভিজাত ভাষার দুইটি রূপ থাকে—তাহার সহজবোধ্য রূপ লইয়া রাষ্ট্র-পরিচালনার কোনও অসুবিধা হইবে এরূপ মনে হয় না। ইংরেজদের আগমনের পূর্ব্বে ফারসীভাষা বহুল প্রচলিত থাকিলেও সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। "অস্ত বিক্রয় কবলা-পত্র মিদং কার্য্যং" "শ্রীচরণেষু" "প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদম্" ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। সংস্কৃত যদি রাষ্ট্রভাষা হয় তাহাতে ভারতের যাবতীয় প্রাদেশিক ভাষা সমৃদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবে। ব্যাকরণদ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারে কোন কোন স্থানে অশুদ্ধি বা ভ্রান্তি যে হইবে না এরূপ কথা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু আজিকার দিনেও আমরা যে ইংরেজী বা যে প্রাদেশিক ভাষা সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতেও কি সর্ব্বক্ষেত্রে ব্যাকরণের নিয়ম মানিয়া চলি? সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতে গিয়া যদি কোন ব্যাকরণদুষ্ট পদ বা বাক্য ব্যবহৃত হয় তাহাতে অর্থবোধের বা ভাবপ্রকাশের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। পক্ষান্তরে ধীরে ধীরে বহু চলতি শব্দকেও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে স্থান দেওয়া সম্ভব হইবে। সম্প্রতি প্রত্যেক প্রদেশ স্ব-স্ব মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে গিয়া এই সংস্কৃত ভাষা হইতেই বিবিধ পরিভাষা সৃষ্টি করিতেছেন—অবিলম্বে সংস্কৃত ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইলে সারা ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলী নানা-বিষয়ক পরিভাষা ও সুখবোধ্য শব্দসমূহ গঠন করিয়া সমগ্র ভারতের কল্যাণসাধনে সমর্থ হইবেন।

ইংরেজের সহিত এতকালের যোগাযোগ সহসা ছিন্ন করা অসম্ভব—বিশেষতঃ আন্তর্জ্জাতিকতার প্রভাবও পরিহার করা সম্ভব নয় বলিয়া বহুজনকে অবশ্য ইংরেজী প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষা অবশ্যই শিক্ষা করিতে হইবে। প্রাদেশিক ভাষা সেই সেই প্রদেশের অধিবাসীদের অবশ্য শিক্ষণীয়। হিন্দুসমাজের যাবতীয় দৈব ও পৈত্র্যাদি কার্য্য সংস্কৃত ভাষায় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে বলিয়া বিশেষ করিয়া সংস্কৃত ভাষা প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্যশিক্ষণীয়।

কিন্তু যদি কোন প্রদেশ-বিশেষের ভাষা রাষ্ট্রভাষা হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় কার্য্যে প্রাদেশিকতা বৃদ্ধি পাইবে, সঙ্কীর্ণতা প্রশ্রয় পাইবে। তাই হঠকারিতার বশবর্ত্তী না হইয়া, ধীরভাবে চিন্তা করিয়া উদারতার সহিত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য নেতৃবৃন্দের সমক্ষে সবিনয়ে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি। অবিলম্বে নিখিল-ভারত সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষার প্রকৃত সংস্কার সাধিত হোক।

শিক্ষার উৎকর্ষলাভের জন্য আমাদের যদি বিবিধ বৈদেশিক ভাষাশিক্ষার প্রবৃত্তি জাগিতে পারে তাহা হইলে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে কিছু শিক্ষণীয় থাকিলে তাহা গ্রহণের জন্য সারা পৃথিবীর লোকেদের সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা জাগিবে না কেন? কাজেই সংস্কৃত ভাষার প্রতি যে একটা অবজ্ঞার ভাব নিতান্ত অসঙ্গতভাবে সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে তাহা দূর করিতে হইবে।

চন্দ্রকান্ত দত্ত খাঁ

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের রাজ্যকালে দেবতাসম পীর খানজাহান আলি সাহেব সুবা বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ছত্রিশটি মহলে গঠিত সরকার খলিফাতাবাদের অধীশ্বর হইয়া এদেশে আগমন করেন। সে সময় এদেশে অতিমাত্রায় মগজাতির প্রাধান্য ছিল। মগেরা নানা স্থানে দস্যুবৃত্তি করিত। নিরীহ প্রজাবৃন্দের উপর তাহাদের পাশবিক অত্যাচারের সীমা ছিল না। তাহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যেই সম্রাট তোগলক খানজাহানকে প্রেরণ করেন।

দিল্লী পরিত্যাগকালে খানজাহান যে সমস্ত সহকর্মী সঙ্গে লইয়া আসেন তন্মধ্যে মুসলমানও যেমন ছিলেন, হিন্দুও তেমনি ছিলেন। সকলেই অভিজাতবংশীয়, দক্ষ এবং রাজনীতিকুশল। "খান" উপাধি মর্য্যাদাসূচক। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে গুণী ব্যক্তিমাত্রই এই অভিধায় বিশেষিত হইতেন। চন্দ্রকান্ত দত্ত এই পদবীর অধিকারী হইয়াছিলেন।

বঙ্গেশ্বর আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যে পাঁচ জন কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে এ দেশে সমাগত হন তন্মধ্যে পুরুষোত্তম দত্ত অন্যতম। চন্দ্রকান্ত তাঁহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তিনি দিল্লীতে তৌজিনবীশের কার্য্য করিতেন। খানজাহানের সঙ্গীরূপে তিনি বঙ্গদেশে আগমনের সুযোগ প্রাপ্ত হন।

পঞ্চদশ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় কাল। সেই গৌরবময় যুগে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে। নবদ্বীপে

তিনি যে প্রেমের তরঙ্গ প্রবাহিত করেন, তাহাতে শুধু যে শান্তিপুর নদীয়াই ভাসিয়া গিয়াছিল তাহা নহে, সমগ্র বঙ্গদেশ সে তরঙ্গাভিঘাতে আবিলতাশূন্য হইয়াছিল। বাংলার বাহিরেও ইহার প্রভাব সম্প্রসারিত হয়।

চন্দ্রকান্ত হাবেলি খলিকাতাবাদ শহরের পূর্ব্ব দিকের যে অংশে থাকিয়া তাঁহার উপরে ন্যস্ত রাজসরকারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন তাহাই আজিকার চাঁদেরকোলা পল্লী নামে অভিহিত। চাঁদ শব্দ চন্দ্রেরই অপভ্রংশ। কোলা, স্থান-বোধক। গৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া চন্দ্রকান্ত ত্যাগের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি জীবসেবাকে জীবনের সার ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন। কর্ত্তব্যপালনে তিনি দৃঢ়চিত্ত ছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর ছিলেন না। রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ প্রজাদিগের দেয় করভার নিজেই বহন করিতেন।

বিদেশী বিলাসিতার স্রোত তখন এদেশে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই। গৃহে প্রস্তুত সূত্রে নির্ম্মিত বস্ত্রে ও উত্তরীয়ে ধনীদরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলের অঙ্গ শোভিত হইত। ইহাদের ভিতর পার্থক্য ছিল জীবসেবায়। সম্পন্ন ব্যক্তি সাধারণতঃ শিবিকাযানে গতায়াত করিতেন। তাহাতে কয়েকজন বাহক সপরিবারে প্রতিপালিত হইত। পদব্রজে গমনকালে যে ভৃত্য তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিত তাহারও পরিজনবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন এই কার্য্যে সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহিত হইত। এতদ্ভিন্ন অতিথিসেবা, আত্মীয়স্বজন-পোষণ, আশ্রিতজন-পালন, দৈব ও পিতৃপুরুষের কৃত্যাদির অনুষ্ঠান আর্থিক সঙ্গতিরই পরিচায়ক ছিল।

চাঁদেরকোলা গ্রাম চন্দ্রকান্তের সেবকগণে পূর্ণ ছিল। কাড়ুদার, চর্ম্মকার, বাদ্যকার, কুম্ভকার, নরসুন্দর প্রভৃতি জাতির তথায় অসদ্ভাব ছিল না। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ, বৈদ্যেরও বাস ছিল। অর্জ্জিত অর্থ তিনি কখনও পেটিকাবদ্ধ রাখিতেন না। "উপার্জ্জিতানাং বিত্তানাং ত্যাগ এব সংরক্ষণম্" এই নীতির অনুসরণে তিনি বার মাসে তের পার্ব্বণ উদ্‌যাপন করিতেন। তিনি পিতামাতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতেন। এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে সাধ্যানুসারে বিত্তাদি দানে পরিতৃপ্ত করিতেন, অনাথ-আতুরগণকে ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত করিতেন। তাঁহার বাটীতে নিত্য হরি-সঙ্কীর্ত্তন হইত। তাহাতেও প্রসাদবিতরণের ব্যবস্থা ছিল।

কথিত আছে, চন্দ্রকান্তের হাতে টাকা বাসি হইত না। তিনি বলিতেন—

"যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
নিজে খাও খেতে দাও সাধ্য অনুসারে।"

গো-পশ্বাদিকে আহার্য্যদানেও স্বর্গলাভ হয়।

যাসমুষ্টিং পরাং গবে সাহং দত্তাত্ যো নরঃ।
অকৃত্বা স্বয়মাহারং স গচ্ছেৎ ত্রিপিষ্টকম্।

তিনি গোজাতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন, পুষ্পচন্দনে শোভিত করিতেন, পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করিতেন। কাকবলি, শিবাবলি ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত কার্য্য তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্ম-তালিকাভুক্ত ছিল। কীটপতঙ্গের জন্য তিনি স্থানে স্থানে মিষ্ট দ্রব্যাদি রাখিয়া দিতেন।

সে যুগে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ এবং অনুরূপ কর্ম্মসমূহ ধর্মকার্য্যের অঙ্গীভূত ছিল। যাহাতে শ্রান্ত পথিক বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া ক্লান্তি অপনোদন করিতে পারেন, বৃক্ষজাত ফলে ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিতে পারেন সে কারণ শুভদিনে যাগযজ্ঞের সহিত বৃক্ষ রোপণ করা হইত। জলাশয় খননও অনুরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত করিবার রীতি ছিল। কার্য্যসমাপ্তির পর উৎসর্গক্রিয়াও একটি যজ্ঞবিশেষ। জনসাধারণের স্বচ্ছন্দ গমনাগমনের নিমিত্ত বহু অর্থব্যয়ে রাস্তা নির্ম্মিত হইত। এই সমস্তই সেবাধর্ম্মের নামান্তর।

চাঁদেরকোলা অঞ্চল হইতে রাজধানী হাবেলি খলিকাতা-বাদ পর্য্যন্ত চন্দ্রকান্ত একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ করান। হস্তী, অশ্ব, শিবিকা প্রভৃতি যানবাহনে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই পথে গতায়াত করিতেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে ফলপ্রসূ বৃক্ষসমূহ রোপিত ছিল। ক্ষুধার্ত্ত এবং পথশ্রান্ত পথিক সুমিষ্ট ফলে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন এবং তরুচ্ছায়াতলে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেন। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য স্থানে স্থানে জলাশয়ও খনিত হইত।

খানজাহান আলি সাহেবের তিরোধানের পর তাঁহার সহকর্ম্মিগণ এদেশ ত্যাগ করেন। চন্দ্রকান্তও চিরতরে চাঁদের-কোলা হইতে বিদায় লইলেন। ইহার পরই ঐ পল্লীটি শ্রীহীন হইতে থাকে।

ধনিক শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চম।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ॥

অত্রত্য অধিবাসীরা যোগ্য নায়কের অভাবে উক্ত শাস্ত্রনীতি অনুসরণ করিয়া একে একে স্থানান্তরে গমন করেন। এইরূপে এই ঐতিহাসিক জনপদটি জনশূন্য হয়। চাঁদেরকোলার অধিকাংশ ভূমিই এখন পার্শ্ববর্ত্তী সাজদিয়া ও বিছট্ নামক গ্রাম-দ্বয়ের অঙ্গীভূত। এখন মাত্র তিন-চারিটি পরিবারের বসতিতে এই পল্লীর অস্তিত্ব রক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে এক ঘর হিন্দু অপর কয়েক ঘর মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। চারি-পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেকার রাজর্ষি জনক-তুল্য ত্যাগী গৃহী চন্দ্রকান্তের কীর্ত্তি-স্মৃতি "দত্ত খাঁর রাস্তা" এখনও বিদ্যমান। কিন্তু এই রাস্তা এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত এবং সমতল ভূমির সহিত প্রায় একীভূত। বহু স্থানে কৃষকগণ লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ দিয়া ইহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। যে স্থলে একটু চিহ্ন আছে তাহাও কণ্টকলতাবৃত এবং শ্বাপদকুলের অবাধ বিচরণক্ষেত্র।

আজিও দত্ত খাঁর রাস্তার ধ্বংসাবশেষ চন্দ্রকান্তের পুণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে। তাঁহার পুণ্যকর্ম্মের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইলেও তাহা ক্ষীণ আলোকবর্ত্তিকার ন্যায় আজিও দীপ্তি বিকিরণ করিতেছে। তাঁহার অপরাপর পুণ্য-কৃত্য এখন কালের কুক্ষিগত।

চট্টগ্রাম বিপ্লব-কাহিনী

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

চট্টগ্রাম বিপ্লব কাহিনীর অনেক কথাই জনসাধারণ অবগত আছেন। এ বিষয়ে আজকাল অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ হইতেছে। লেখকের এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হইয়াছিল। আলিপুরের সরকারী উকিল স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলাগুলি সরকার পক্ষে পরিচালনা করেন। তাঁহার সহকারীরূপে লেখককে ঐ মামলা পরিচালনায় যোগদান করিতে হইয়াছিল। ঐ সকল মামলায় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত বিপ্লবের বিভিন্ন ঘটনার প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়। ১৯২৮ খৃঃ হইতে বিপ্লবী নেতা সূর্য্য সেন বিপ্লবীদল গঠন আরম্ভ করেন। ১৯৩০ খৃঃ ১৮ই এপ্রিল তারিখ রাত্রে বিপ্লবীরা দলবদ্ধ ভাবে চট্টগ্রামের বিভিন্ন অস্ত্রাগার আক্রমণ করিয়া প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিয়া চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী পাহাড় ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার পর হইতে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত পুলিস ও সৈন্য বাহিনীর সহিত বিপ্লবীদের মাঝে মাঝে সঙ্ঘর্ষ হয়। ইতিমধ্যে বিপ্লবীদের অনেকে পুলিস দ্বারা ধৃত হন এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ হয়। ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের গইরিলা গ্রামে সূর্য্য সেন পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর সহিত সঙ্ঘর্ষের পর ধৃত হন। অবশেষে ১৯৩৩ সালের ১৯শে মে চট্টগ্রামের গহিরা গ্রামে সরকার বাহিনীর সহিত শেষ সংগ্রামের পর তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত ধৃত হন।

বিপ্লবীদলের অনেক চিঠিপত্র রচনা, সাঙ্কেতিক বার্ত্তা প্রভৃতি পুলিসের হস্তগত হয়। সে সকল প্রমাণ স্বরূপ বিভিন্ন মামলায় দাখিল করা হইয়াছিল। তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। ঐ সকল কাগজপত্র মামলার নথিভুক্ত ছিল, বর্ত্তমানে তাহার অস্তিত্ব আছে কিনা জানি না। কিন্তু মামলা পরিচালনার জন্য অনেক কাগজের অবিকল নকল ছিল। তাহা হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের একখানি পত্র এবং সূর্য্য সেনের দুইটি রচনা প্রকাশ করা যাইতেছে।

সূর্য্য সেনের পরিচয় বঙ্গসমাজে দিবার আবশ্যক নাই। তাঁহার সহকারীদের মধ্যে দুই জন নারী বিপ্লবী ছিলেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার ও কল্পনা দত্ত। প্রীতিলতা চট্টগ্রাম নিবাসী জগবন্ধু ওয়াদ্দাদারের কন্যা। তাঁহার ডাকনাম রাণী। ১৯২৮ খৃঃ প্রীতিলতা চট্টগ্রাম খাস্তগীর বালিকা-বিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া আই-এ পড়িবার জন্য ঢাকায় যান এবং ১৯৩০ খৃঃ প্রথম বিভাগে আই-এ পাস করেন। তিনি বালিকাদিগের মধ্যে প্রথম স্থান ও সাধারণ প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ১৯শে এপ্রিল তারিখে পরীক্ষা অন্তে ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম ফিরিবার পথে প্রীতিলতা পূর্ব্বরাত্রে অনুষ্ঠিত অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনার বিষয়ে অবগত হন এবং বিপ্লবীদের সাহস ও বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া মুগ্ধ হন। বিপ্লবীনেতা মাষ্টারদার সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে। কিছুদিন চট্টগ্রামে থাকিয়া বি-এ পড়িবার জন্য প্রীতিলতা কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় থাকাকালীন ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি একজন বিপ্লবী বন্ধুর নির্দ্দেশে আলিপুর জেলে অবরুদ্ধ প্রাণদণ্ড-প্রাপ্ত বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সহিত ভগ্নী পরিচয় দিয়া সাক্ষাৎ করেন। এ সময় হইতে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসীর দিন পর্য্যন্ত (১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট) তিনি বহুবার রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর প্রীতিলতার মনে সাক্ষাৎভাবে বিপ্লবে যোগদান করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কিন্তু বি-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রীতিলতাকে ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিতে হয়। তিনি Distinction-এ বি-এ পাস করেন।

বি-এ পরীক্ষা অন্তে মাষ্টারদার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া প্রীতিলতা চট্টগ্রামে ফিরিয়া যান। ঐ সময়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রথম মামলা স্পেশাল ট্রাইবুনালের নিকট শুনানী হইতেছিল, তাহাতে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল প্রভৃতি অনেকেই আসামী ছিলেন। সূর্য্য সেন, নির্ম্মল সেন প্রভৃতি বিপ্লবী দলের কয়েকজন ধরা পড়েন নাই।

সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে ঐ বিপ্লবীদল তখনও নূতন সভ্য সংগ্রহ করিয়া বিপ্লবী প্রচেষ্টা চালাইতেছিলেন। কল্পনা দত্ত বিপ্লবীদলভুক্ত ছিলেন। তিনি সূর্য্য সেনের আবাসস্থল জানিতেন এবং জেলের ভিতরের ও বাহিরের বিপ্লবীদলের সহিত যোগাযোগ চালাইতেন। কল্পনা দত্তের সাহায্যে প্রীতিলতা ১৯৩২ সালের মে মাসে বিপ্লবী নির্ম্মল সেনের

সহিত এবং কয়েকদিন পরে সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন উভয়ের সহিত দেখা করেন। তাঁহারা ঐ সময়ে ধলঘাটে এক বিধবার গৃহে অবস্থান করিতেন। প্রীতিলতা ঐ স্থানে কয়েকবার তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১৯৩২ সালের ১৩ই জুন তারিখ রাত্রে পুলিস ও সৈন্যবাহিনী ক্যাপ্‌টেন ক্যামেরণের নেতৃত্বে ধলঘাটে সূর্য্য সেনের আবাসস্থল ঘেরাও করে। ঐ সময় সেখানে সূর্য্য সেন, নির্ম্মল সেন, প্রীতিলতা এবং অপূর্ব্ব সেন (ভোলা) ছিলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। নির্ম্মল সেনের গুলিতে ক্যামেরণ নিহত হন এবং পরে সৈন্যদের গুলিতে নির্ম্মল সেন ও অপূর্ব্ব নিহত হন। সূর্য্য সেন ও প্রীতিলতা ঐ স্থান ত্যাগ করেন।

ধলঘাট সংগ্রামের পর প্রীতিলতা পুনরায় তাঁহার পিতার গৃহে ফিরিয়া আসেন ও পরে ৫ই জুলাই তারিখে শেষবারের মত পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া সূর্য্য সেনের সহিত যোগদান করেন। প্রীতিলতার একান্ত আগ্রহে সূর্য্য সেন তাঁহাকে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব অর্পণ করেন। ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রে প্রীতিলতা পুরুষবেশে ঐ অভিযানের পরিচালনা করেন। বিপ্লবীদল আক্রমণের পর ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। কিন্তু প্রীতিলতা পটাসিয়াম সায়ানাইড খাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরদিন তাঁহার মৃতদেহ পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবের সন্নিকটে পাওয়া যায়। গায়ে যে জামা ছিল তাহাতে তাঁহার বক্ষস্থলে একখানি ছোট শ্রীকৃষ্ণের ছবি সংলগ্ন ছিল।

সূর্য্য সেন প্রীতিলতাকে বীরবেশে সাজাইয়া ঐ অভিযানের নেতৃত্বের ভার দিয়া সমরাঙ্গনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। প্রীতিলতা নিশ্চিত মরণ বরণ করিবার একান্ত আগ্রহ লইয়া সূর্য্য সেনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আসেন। ঐ শেষ বিদায়ের পূর্ব্বে প্রীতিলতা কয়েকখানি চিঠিপত্র লিখিয়া ঐ স্থানে রাখিয়া আসেন। তাহারই একখানি "দাদা" সূর্য্য সেনের উদ্দেশ্যে লিখিত। সেই পত্রখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল। প্রীতিলতার মৃত্যুতে সূর্য্য সেন বিশেষ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাহার ১৫ দিন পরে বিজয়ার দিনে সূর্য্য সেন "বিজয়া" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং কয়েকদিন পরে "অনুভূতি" নামে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সূর্য্য সেনের উদ্দেশে প্রীতিলতার লিখিত চিঠি এবং সূর্য্য সেনের "বিজয়া" ও "অনুভূতি" প্রকাশিত হইল। এইগুলি এবং বিপ্লবসংক্রান্ত অনেক কাগজপত্র সূর্য্য সেনের নিকট পাওয়া গিয়াছিল।

প্রীতিলতার চিঠি

দাদা—

জীবনের গোধূলি বেলায় ভগবান আমায় তোমাকে দিয়েছিলেন। আমি মাথা পেতে আনন্দভরে তাঁর এই দান গ্রহণ করে ছিলাম। আজ আমার সবাইকে ডেকে বলতে ইচ্ছা করছে—

"ওগো তোমরা শুনে যাও—আমি এমন মানুষ পেয়েছি যাকে পেলে তোমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতে—আমি এমন একটি মহান্ হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছি যা আমার জীবনকে চলার পথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে।"

দাদা! তুমি যে আমায় অনেক দিয়েছ হৃদয় উজাড় করে আমাকে স্নেহ করেছ—প্রতিদানে কেবল ব্যথাই পেয়েছ—আজ আমার সেই একমাত্র দুঃখ। তোমার শত অনুরোধসত্ত্বেও আমি ভুলতে পারলাম না—যে আমি তোমায় ব্যথা দিয়েছি, তোমার আদেশ অমান্য করেছি। কিন্তু দাদা, তুমি আমায় ভুল বুঝেছিলে এবং আজও আমি এই ধারণা নিয়েই যাচ্ছি যে তুমি আমায় ঠিক বুঝনি। বুঝবার চেষ্টা করনি—একটু ভাবলেই বুঝতে রাণীর এতটুকু দোষ ছিল না। যদি সেইজন্য একা আমি দুঃখ পেয়ে যেতাম আমার আনন্দের সীমা থাকত না—আমি যে কারও এতটুকু দুঃখ সহ্য করতে পারি না দাদা। ভেবেছিলাম যাবার আগে কাউকে এতটুকু দুঃখ দিয়ে যাব না। দুঃখ পাবার জন্য আমি বরাবরই প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু দুঃখ দিতে আমি রাজী নই।

আমার হয়ত আরও দু'একটা কথা বলবার ছিল। ইচ্ছা করলে বলতে পারতাম, কিন্তু বলিনি এই ভেবে যে তুমি ঠিক বিশ্বাস করবে না। আমি ভগবানের পায়েই আমার শেষ কথা নিবেদন করে দিলাম।

দোহাই দাদা! আমি একটা দুঃখ নিয়ে গেলাম বলে তুমি দুঃখ পেও না—তা হলে যে আমার আত্মা শান্তি পাবে না।

তুমি আমায় অনেক দিয়েছ—এতখানি পাব আমি কোন দিনও কল্পনা করিনি। তাই আমি এক একদিন ভাবতাম এত পাওয়া আমার সইবে না। আমি যে এতখানি পাবার যোগ্য নই। তোমার মধ্যে আমি শিশুর সরলতা দেখেছি—তোমার নিঃস্বার্থ স্নেহ আমাকে মুগ্ধ করেছে—তুমি বাস্তবিকই অতল। আমি তোমার নাগাল পেলাম কই? ভেবেছিলাম অনেক লিখবার আছে কিন্তু পারলাম না।

বিদায়ের বাঁশী করুণ সুরে বেজে উঠেছে। মনটা কেবলই অসীমের পানে ছুটে চলেছে।

আমি চল্‌লাম দাদা। আমায় আশীর্ব্বাদ কর, আমার সব দোষ ত্রুটী ভুলে যাও। তোমার কাছে কোন দোষ করেছি বলে ত মনে হচ্ছে না—যদিও বা করে থাকি সে আমার মেয়েলী মনের অদ্ভুতপানা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই বিশ্বাস যেন তোমার থাকে দাদা যে রাণী তোমার কাছে যেমনটি এসেছিল ঠিক তেমনটিই সে ফিরে গেছে। ইতি—

বোন্।

বিজয়া

তোমায় ঠাকুর বলব নিঠুর
কোন মুখে?
শাসন তোমার যতই গুরু
ততই টেনে লও বুকে।

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পূর্ণ কর দহন দানে।

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কত বিজয়াই তো এসে গেছে। কিন্তু আজকের বিজয়া আর অন্য বিজয়ার মধ্যে কত তফাৎ—এবারকার বিজয়া যেন সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। জীবনে যা দেখিনি, জীবনে যা পাইনি, জীবনে যা শিখিনি এমন কত অভিনব জিনিষ নিয়েই বিজয়া এলো আজ আমার কাছে। কত নূতন অভিজ্ঞতাই সে নিয়ে এলো। গত দুই মাস যেন আমার জীবনের অভিনব অভূতপূর্ব্ব অধ্যায়। এই দু'মাসের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, আনন্দ, বিষাদ, জ্বালা আমার জীবনের খুব বড় সঞ্চয়ই হয়ে রইল। আজ বিজয়ার দিনে মার কাছে প্রার্থনা করছি যেন এই অমূল্য সঞ্চয়টুকু আমার জীবনকে ঐশ্বর্য্যময় করে তোলে। এই দু'মাসের সবকিছুর মধ্যে আনন্দই সবচেয়ে ছাপিয়ে উঠেছে। এত আনন্দ জীবনে যে পাইনি, বিষাদ আর জ্বালা আনন্দকে আরও মধুময় করে তুলেছে। আমার দুর্ভাগ্য—একান্ত দুর্ভাগ্য যে এমন প্রাণমাতান আনন্দের মধুর স্মৃতিই আজ আমায় অহরহ ব্যথা দিচ্ছে। আমরা দুর্ব্বল মানব,—আমাদের কাছে এত সুন্দর আনন্দটুকুর চেয়ে এমন আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে গেল তাকে হারাবার ব্যথাই বড় হয়ে উঠল।

আড়াই বৎসরের মধ্যে তিনটি বিজয়া এলো, এর মধ্যে কত অন্তরঙ্গ বন্ধু, কত আদরের ভাইবোন জীবনের বিজয়াই চোখে দেখলাম—আর পূর্ণ দায়িত্বই ঘাড়ে নিলাম—আজ একে একে সব কথা মনে পড়ছে। আজ মনে পড়ছে কত সুন্দর অমূল্য রত্নরাজি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য সব তুচ্ছ করে হাসতে হাসতে মাতৃযজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়ে চলে গেছে, একটু দ্বিধা করেনি, একটু সঙ্কোচ করেনি, আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে স্বেচ্ছায় মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আজ এমন পবিত্র দিনে তাঁদের কথা মনে করে আমার মত কঠিনহৃদয়ের চোখের জল আসছে—তাঁদের বীরত্বের কাহিনী মনে পড়ে আমার গৌরবে বুক ফুলে উঠছে। নরেশ বিধু, টেগরা, ত্রিপুরা, মধু, অর্দ্ধেন্দু, প্রভাস, নির্ম্মল, পুলিন, মতি, শশাঙ্ক, জিতেন, আন্দু, অমরেন্দ্র, মনা, রজত, দেবু, স্বদেশ, মাখন, রামকৃষ্ণ, নির্ম্মল, ভোলা সবারই কথা আজ একে একে মনে পড়ছে। আর স্মৃতির মধ্যে দিয়ে তাঁদের বিজয়ার সম্ভাষণ জানাচ্ছি। কত জীবনের বিজয়ার নিমিত্তই হলাম—কত স্নেহময়ী জননীর বুক শূন্য করে তাঁর সোনার পুতলিকে স্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতি দিয়েছি—কতজনকে অন্তরীণে, কারাগারে, নির্ব্বাসনে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছি, ঘরে ঘরে হাহাকারের সৃষ্টি করেছি—দেশের উপর গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারে নির্য্যাতন টেনে এনেছি। এ সবের দায়িত্ব থেকে নিজেকে বাদ দেই কি করে।

মা আনন্দময়ি মা আমার, আজ তোমার বিসর্জ্জনের দিনে তোমায় একান্ত ব্যাকুল হয়েই জিজ্ঞাসা করছি—আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি? পনর বৎসর আগে অনেক ভেবে চিন্তে, ভাল মন্দ সব বিচার করে জীবনের যে লক্ষ্য, যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম আজও তাই আঁকড়ে ধরে আছি। দুর্ব্বলতা কি আসতে চায় নি? কত রকমের দুর্ব্বলতা আসতে চেয়েছে কিন্তু তবুও নিজের লক্ষ্যটিকে ত ছাড়ি নি। আজও মনে হচ্ছে, খুব নিঃসন্দেহেই মনে হচ্ছে আমি যে পথে চলেছি দেশের অনেক লোক ভুল বুঝলেও সেই পথটাই ঠিক। এ বিশ্বাস এখনও আমার অটুট আছে, যে আমি অন্যায় করছি না, পাপ করছি না, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে গেলে আমার দেশে যে হাহাকার, অত্যাচারের সৃষ্টি হয়েছে, এর চেয়ে আরও অনেক বেশীই—সব দেশেই তাই হয়েছে। আমার আদর্শের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই আমার পথেই আমি চলেছি—এখনও কোন দ্বিধা আসেনি। মা তোমায় মিনতি জানাচ্ছি, যদি আমার ভুল হয়, আমার ভুল ভেঙ্গে দিও। আর যদি ঠিক পথেই আমি চলে থাকি তা হলে আমার বিশ্বাসকে আরও শক্ত করে দাও, আমাকে আরও শক্তিমান করে দাও—আমার মধ্যে যেন কোন রকমের দুর্ব্বলতা না আসে, আমি যেন আমার পথ থেকে কোন দিন এক চুলও না সরি। আমি যেন বড় নিঠুর ছিলাম, কিন্তু গত দু'মাসের পথ চলা যেন আমার নিঠুর হৃদয়ের মধ্যে মমতা এনে দিয়েছে, কারুণ্যের সৃষ্টি করেছে, তাই অতি আদরের ছেলে, মেয়ে,

ভাইবোনকে হারিয়ে তাদের যে সব আত্মীয়স্বজন আজ বিজয়ার দিনে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন, তাঁদের কথা মনে করে আমার মনে আজ ভীষণ লাগছে। হয়ত তাঁরা আমাকে তাঁদের বুকের ধন হারাবার নিমিত্ত মনে করে আমায় অভিশাপ দিচ্ছেন—সেজন্য আমি চিন্তা করছি না, কিন্তু তাঁদের বুকভাঙ্গা ক্রন্দন, মর্ম্মভেদী হাহাকার যে আমার বুকে ভীষণ বাজছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কত স্নেহময়ী জননী তাঁর আদরের সন্তানকে হারিয়ে কি মর্ম্মান্তিক কান্নাই কাঁদছেন। কি অসহ্য বেদনায় তাঁর হৃদয় অস্থির হয়ে উঠছে—বিজয়ার এমন আনন্দের দিনটি তাঁর কাছে কত যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে। বাপ তার আদরের দুলালকে হারিয়ে বিজয়ার দিনে সমস্ত উৎসবকে বিষাদময় করে তুলেছেন। ভাইবোন তাদের স্নেহের ভাইবোনকে হারিয়ে আজ কত অসহনীয় যাতনাই ভোগ করছে। কত বড় অভাববোধ তাদের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। এ সব ভেবে আমার মত পাষাণও আজ গলে যাচ্ছে। আবার তোমায় জিজ্ঞাসা করছি মা, আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি, এত মায়ের চোখের জল, এত বাপের বুককাটা কান্না, এত ভাইবোনদের হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস, এ সবের কারণ হয়েছি বলেই আমি কি অন্যায় করেছি। যদি তাই হয় তুমি আমার ভুল ভেঙ্গে দিও। আমায় ঠিক পথে চালিও। কিন্তু আমার মনে হয় আমি ঠিক পথে চলেছি। তাই চারিদিকে শ্মশান সৃষ্টি হচ্ছে দেখে মনে ব্যথা পেয়েও আমি আমার লক্ষ্যটিকে বুকে চেপে ধরে আছি—এই আশায় যে এ সকল পবিত্র শ্মশান স্তূপের উপরে একদিন স্বাধীনতার সৌধ নির্ম্মিত হবে।

পনের দিন আগে যে নিখুঁত পবিত্র, সুন্দর প্রতিমাটিকে এক হাতে আয়ুধ, অন্য হাতে অমৃত দিয়ে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছিলাম, তাঁর কথাই আজ সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে। তার স্মৃতি আজ সবকে ছাপিয়ে উঠেছে। যাকে নিজ হাতে বীরসাজে সাজিয়ে সমরাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুমতি দিয়ে এসেছিলাম, তার স্মৃতি যে আজ পনের দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত্ত ভুলতে পারলাম না। সাজিয়ে দিয়ে যখন করুণভাবে বললাম, "তোকে এই শেষ সাজিয়ে দিলাম। তোর দাদা ত তোকে জীবনে আর কোনদিন সাজাবে না।" তখন প্রতিমা একটু হেসেছিল, কি করুণ সে হাসিটুকু! কত আনন্দের, কত বিষাদের, কত অভিমানের কথাই তাহার মধ্যে ছিল। সে নীরব হাসিটুকুর ভিতরে অফুরন্ত কথা আমার সারা জীবন ভাবলেও শেষ করতে পারব না—শেষ করতে চাইও না। তা যেন আমার জীবনে নিত্য নূতন চিন্তার উপকরণ যুগিয়ে দিয়ে আমার জীবনকে ঐশ্বর্য্যময় করে তোলে, দিন দিন উন্নত করে তোলে। সে ত নিজ হাতে অমৃত পান করে অমর হয়ে গেছে। কিন্তু মর জগতে আমরা তাঁর বিসর্জ্জনের ব্যথা যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আজ বিজয়ার দিনে, সেই দিনের বিজয়ার করুণ স্মৃতি যে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে কান্নার সুর তুলছে—চোখের জল যে কিছুতেই রোধ করতে পারছি না—
"চাপিতে গেলে উঠে দুকূল ছাপিয়া।"

সে যে আমার আনন্দের উৎস ছিল—নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, ছিল—সুন্দর, পবিত্র মহান্ ছিল। তার মধ্যে এক ধারে যত গুণ দেখেছি আর কোন মানুষের মধ্যে তত গুণ আমি দেখিনি। তার অন্তরের সৌন্দর্য্য আমায় মুগ্ধ করেছিল। তার মনের জোর, দৃঢ় সংকল্প, সাহস, বীরত্ব কারও চেয়ে কম দেখিনি। তার সরলতা, বাধ্যতা খুব সুন্দরই ছিল। তার শিক্ষা, আদর্শের অনুভূতি, সুন্দর ব্যবহার কিছুরই অভাব ছিল না। সর্ব্বোপরি কঠোর বিপ্লবী মনোভাবের মধ্যে ভগবানের উপর অটুট ভক্তি, বিশ্বাস, সে যে ভাবে বজায় রেখেছিল তা দেখলে বাস্তবিকই তাকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়। এত গুণের আধার ছিল বলে তাকে খুবই স্নেহ করতাম—হৃদয়ের সমস্ত উজাড় করে তাকে দিয়ে দিয়েছিলাম—প্রতিদানে অসীম আনন্দই পেয়েছি, এত আনন্দ জীবনে পাইনি, তাই এত স্নেহের, এত আদরের প্রতিমাকে নিজ হাতে বিসর্জ্জন দিয়ে চলে এলাম। সে দিনের কথা, আজ কেবলই মনে হচ্ছে প্রতিমাটিকে। সে এত অফুরন্ত আনন্দ আমায় দিল। এত গুণ দেখিয়ে গেল, এত মহৎ আত্মদান করে গেল, দেবতার মত শ্রদ্ধা আমায় দিল, সে সব কথা মনে করে আজ আনন্দ না পেয়ে তাকে সরাবার ব্যথাই আমার প্রাণে এত বেশী বাজছে—আজ আমার এই একমাত্র দুঃখ।

অসুরদলনী মা আমার। আজ বিজয়ার দিনে তোমার কাছে এই কামনা, তুমি আমায় এই বর দাও যেন তার স্মৃতি আমাকে আনন্দ দেয়, তার গুণের কথা মনে হলে যেন আমি গৌরব অনুভব করি। তার অপূর্ব্ব আত্মদান আমার প্রাণে যেন আনন্দ দেয়, আমাকে যেন আরও শক্তিমান করে তোলে, তার শ্রদ্ধা যেন আমাকে তার শ্রদ্ধার উপযুক্ত করে তোলে—তাকে হারাবার ব্যথাটা এত আনন্দকে ছাপিয়ে যেন কিছুতেই না উঠে।

আমার স্নেহের প্রতিমাকে বলছি—"রাণী, তোকে আমি কতদিন কত ব্যথাই দিয়েছি; আজ বিজয়ার দিনে তোর দাদার সব দোষত্রুটি ভুলে যা, আমার উপর আর অভি-

মান রাখিস না। তোকে হৃদয় উজাড় করে স্নেহ করেছি, তোর গুণ দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি—তোর ভগবৎ ভক্তি দেখে তোকে শ্রদ্ধা করেছি, তোর সঙ্গে প্রাণ খুলে নিঃসঙ্কোচে মিশেছি—এত আপনার করে নিয়েছিলাম বলেই হয়ত তোকে সামান্য দোষে অথবা বিনা দোষে কত গাল দিয়েছি, হয়ত কোন সময় ভুল বুঝে তোর মনে ব্যথা দিয়েছি, তোকে খুব স্নেহ করতাম বলে তোকে গাল দিতে কোনো দিন ইতস্ততঃ করেনি, মনে করতাম তোকে হাজার গাল দিলেও তুই আমার উপর রাগ করবি না, কোন দিন রাগ করিসও নাই—শেষ মুহূর্ত্তে তোকে ভুল করে আমি একটু গাল দিয়েছিলাম বলে তুই হয়ত অভিমান নিয়ে গেছিস। আজকের দিনে তুই যেখানে আছিস সেখান থেকেই আমার সব দোষ ত্রুটির জন্য আমায় ক্ষমা করে যা। শেষ মুহূর্ত্তে তোকে একটু কষ্ট দিয়েছি বলে আমি যে দিনরাত অশান্তির দহনে দগ্ধ হচ্ছি তা তো তুই দেখছিস। তোর দাদা যেন শান্তি পায় তার ব্যবস্থা তুই করে দে। তোর কি মনে নাই তুই তোর দাদার দুঃখ একটুও সহ্য করতে পারতিস না। তাই আবার বলছি আজকের এই পবিত্র দিনে আমার দোষত্রুটি সব ভুলে গিয়ে হাসিমুখে তোর দাদার বিজয়া-সম্ভাষণ গ্রহণ কর। আমার স্নেহের সম্ভাষণ—শ্রদ্ধার সম্ভাষণ তোকে জানাচ্ছি। আজ মিলনের দিন, ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার দিন, বিবাদ, বিসম্বাদ, দোষ ত্রুটি সবই ভুলে যাওয়ার দিন, আজ তুই আমার পাশে থাকলে যে আনন্দ আমি পেতাম দূর থেকেও সেই আনন্দ তুই আজ আমাকে দে। এমন সুন্দর দিনে মায়ের নামটি নিয়ে প্রাণ খুলে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, তোর মত নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক কাউকে আমি পাইনি। বাস্তবিক ফুলেরই মত তুই সুন্দর, পবিত্র ও মহান ছিলি। তোর অপূর্ব্ব আত্মদানে তোকে আরও সুন্দর আরও মহনীয় করে তুলেছে।

বরদাত্রী মা আমার—আমায় আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার স্নেহের প্রতিমার মধ্যে যা কিছু সুন্দর যা কিছু মহৎ দেখেছি তা যেন আমার এবং আমার প্রিয় ভাইবোনেরা জীবনে প্রতিফলিত করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি না করে।

"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

অনুভূতি

সেদিন বিজয়ার সন্ধ্যায় পাশের বাড়ীতে উঠানে কয়েক-জন লোক হরিনাম কীর্ত্তন করছিল। শরতের জ্যোৎস্নায় সারা উঠান ভরে গিয়েছিল। আমার সে দিকে খেয়াল ছিল না—যে স্নেহের প্রতিমাটিকে পনের দিন আগে হারিয়েছি। তার চিন্তায় বিভোর ছিলাম। গানও বিশেষ শ্রুতিমধুর হচ্ছিল না। হঠাৎ যেন নাম-কীর্ত্তনটা আমার কানে মধুর ঠেকল। মাথা তুলে জানলার ফাঁক দিয়ে গায়কদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গান শুনতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা সুন্দর অনুভূতি এসে আমার অন্তরে একটা আনন্দের প্রবাহ সৃষ্টি করল। মনে মনে একটা সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের ছবি খুঁজতে লাগলাম—মনে পড়ে গেল পনের দিন আগে বিসর্জ্জনের দিনে প্রতিমার সঙ্গে ছোট শ্রীকৃষ্ণের ছবিটি দিয়েছিলাম। সেই সুন্দর মূর্ত্তিটি মানস নেত্রে দেখতে দেখতে হৃদয়ের মধ্যে তার ধ্যান করতে আরম্ভ করলাম। কীর্ত্তনের সুর কানের মধ্যে মধুর বাজতে লাগল। মন প্রাণ পুলকিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল যার বিসর্জ্জনের দিনে মূর্ত্তিটি সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলাম সে কথা। মনে হ'ল হরিনাম কীর্ত্তন শুনলেই তার দু' চোখ বেয়ে জল পড়ত এবং গায়কদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে তন্ময় হয়ে হরিনাম গাইত। আমার ধ্যানের মূর্ত্তিটিও সরে গেল না, অথচ মানস নেত্রে দেখতে পেলাম যে কত যত্ন করে ফুলের আসন সাজিয়ে এই মূর্ত্তিটিকেই পূজা করছে—ধ্যানস্তিমিতনেত্রে মূর্ত্তিটির পানে চেয়ে আছে—নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবেই চেয়ে আছে। আর তার দু'চোখ বেয়ে দরবিগলিতধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। এমন পবিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার প্রাণ আনন্দে ভরে গেল। ধ্যানের মূর্ত্তিটি এবং ধ্যানে নিরত মানুষটি দু'জনকে এক সঙ্গে দেখতে দেখতে আনন্দে আমার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

কতক্ষণ পরে আমার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। চোখের জল মুছে আমার অনুভূতিটির কথা ভাবলাম। ভাবলাম যাকে হারিয়েছি তার শোকে সারা দিন রাত দগ্ধ না হয়ে এ ভাবের অনুভূতির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারলেই শান্তি পাওয়া যায়—হারাবার ব্যথাটাকে আনন্দে পরিণত করা যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে যাকে হারিয়েছি তাকে যথার্থ ভাবে অনুভব করা যায়।

ভগবান, আমাদিগকে এত দুর্ব্বল করেছ কেন? এই আনন্দটুকুকে স্থায়ী করে নেওয়ার ক্ষমতা দাওনি কেন?

"হেথা নয়, অন্য কোন খানে"

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

অভ্রভেদী নাগাপাহাড়ের সানুদেশে তরুচ্ছায়াপ্রচ্ছন্ন নিভৃত একটি পল্লী—নাম তার ওয়াকচিং। পল্লীটিতে কনিয়াক নাগাদের বাস।

ওয়াকচিং অধিত্যকার পশ্চিমপ্রান্তে এক অনতি-উচ্চ গিরি-শৃঙ্গের উপর নাগা-সর্দার শৌবার বাড়ী। সেখান থেকে যে দৃশ্য নজরে পড়ে তার আর তুলনা নেই।

ঊর্দ্ধে নিঃসীম নীল আকাশ, নিম্নে গিরিপাদমূল থেকে দিগন্তের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত ছায়ায়মান ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অনন্ত প্রসার। আকাশ ও ধরণীর এই অসীম বিস্তারের মধ্যে ওয়াকচিং যেন স্বর্গ থেকে খসে পড়া একটি নিরুপম সৌন্দর্য্যচ্ছবি।

এই পার্ব্বত্য পল্লীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আং* বংশের নাগা-সর্দার শৌবা। বংশমর্য্যাদায় আর প্রতিপত্তিতে তার জুড়ি নেই। জমিজেরাৎ ধন-দৌলত তার প্রচুর, সাংসারিক কোন অভাবই তার নেই। কিন্তু মনে তার সুখ নেই। বড় ছেলে শাঙকের বিয়ে নিয়ে মস্ত দুর্ভাবনায় পড়ে গেছে শৌবা।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর সর্দার যখন তার নিজ গোষ্ঠীর* একটি পাত্রীর সন্ধান পেলে তখন আশ্বস্ত হ'ল। পাত্রীটি তার সগোত্র চিংমাকের মেয়ে। গোটা ওয়াকচিং পল্লীতে ধন-সম্পদ, পদমর্য্যাদা, বংশ-গৌরব সব দিক দিয়েই তার পরেই চিংমাকের স্থান। চিংমাকের মেয়েটির নাম শন্দা। শন্দাকে যেমন করেই হোক পুত্রবধূরূপে ঘরে নিয়ে আসতে সর্দার বদ্ধ-পরিকর হ'ল। শাঙকের বয়স তখন তের বৎসর মাত্র। তার ভাবী বধূ কিন্তু তার চেয়ে বারো বছরের বড়। সর্দার ভাবলে তাতে ক্ষতি কি। তাদের সমাজে বড় ঘরে এ ধরণের ব্যাপার তো আর নূতন নয়।

মোট কথা শৌবা নিজের বংশমর্য্যাদার দিকটাই দেখলে, পুত্র এবং পুত্রবধূর ভবিষ্যৎ জীবনের সুখশান্তির কথা মোটেই ভাবলে না।

চিংমাক প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করেছিল, বলেছিল,—"সর্দার, ছেলে যখন তোমার বড় হবে তখন আমার মেয়ের বয়সের ভাঁটা পড়বে। তখন যদি শাঙকের শন্দাকে মনে না ধরে···আমি আমার মেয়ের ভবিষ্যতের কথাই ভাবছি।

সর্দার 'বধূ'র (বেনো মদ) পাত্রটা এক চুমুকে নিঃশেষ করে সশব্দে হেসে উঠে বললে—"আরে রেখে দাও তোমার যত সব দুর্ভাবনা। এক সঙ্গে ঘর করলে সবই ঠিক হয়ে যায় হে। আর আমি বেঁচে থাকতে শাঙকের পক্ষে শন্দার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা যে সম্ভব নয় তা তুমি জান। কিন্তু এটাও সত্য যে, আমি চিরকাল থাকব না। কিন্তু গাঁয়ের মাতব্বরদের সামনে এখুনি আমি এমন ব্যবস্থা করছি যে, আমার মৃত্যুর পর শাঙক যদি শন্দাকে তালাক দিতে চায় তা হলে তাকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে। কাজেই তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। শ্রীমান যখন বড় হয়ে সব বুঝতে পারবেন তখন আর না কাড়বেন না।

এদিকে দুই বেয়াই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল বটে, ওদিকে বর-কনে উভয়ের নিকটেই কিন্তু এ বিবাহ আপাততঃ অর্থহীন। বরটি তো নাবালক মাত্র, সে খেলাধুলো নিয়ে সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে মেতে রইল। আর পূর্ণযৌবনা কনের নিকট এ বিয়ে ছেলেখেলা বৈ আর কিছু নয়। দেখতে সে বেশ সুন্দরী। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অবিবাহিত তরুণের দল মধুলোভী ভৃঙ্গের মত তার পাশে এসে জুটেছিল এবং তাদের মধ্যে খেপাং মোরাং-এর* একটি ছেলের প্রতি সে হয়েছিল প্রণয়াসক্ত। বিয়ের পরও এই ছেলেটির সঙ্গে শন্দার প্রণয়লীলা চলতে লাগল অব্যাহত ভাবে।+

বিয়ের কিছুকাল পরে শন্দার একটি ছেলে জন্মাল। প্রথম যৌবনের প্রণয়লীলার পালা শেষ করে এবার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে এক নাবালকের ঘর করতে হবে ভেবে শন্দার মন খারাপ হয়ে গেল। যাতে এত শীঘ্র শ্বশুরবাড়ীতে না যেতে হয় সেজন্যে সে এক মনে আকাশের দেবতা গাওয়াং-এর নিকট প্রার্থনা করতে লাগল। গাওয়াং তার প্রার্থনা শুনলেন। ভূমিষ্ঠ হবার

---

* কনিয়াক নাগাদের মধ্যে আং বংশই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অভিজাত বংশ। সমাজের শীর্ষদেশে আং-পরিবারের সর্দারদের আসন। ভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে সর্দার-পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্কের আদান-প্রদান নিষিদ্ধ। এদের অভিজাত রক্তকে অবিমিশ্র রাখবার জন্যেই এই সামাজিক বিধান।

* প্রত্যেক কনিয়াক নাগা গ্রাম কয়েকটি মোরাং-এ বিভক্ত। এক এক গোষ্ঠীর লোকেরা এক এক মোরাং-এর অন্তর্গত। ভিন্ন ভিন্ন মোরাং-এর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

+ কনিয়াকদের সামাজিক বিধানমতে বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও কনে যে পর্য্যন্ত না সন্তানের গর্ভধারিণী হয় সে পর্য্যন্ত তাকে থাকতে হয় পিতৃগৃহে। এই সময় স্বামীর সঙ্গে তার দৈহিক কোন সম্বন্ধ থাকবে না। মা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু পূর্ব্ব-প্রণয়ীর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করে তাকে যেতে হবে স্বামীগৃহে। অবৈধ প্রণয়ের ফলে জাত সন্তান সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। পতিগৃহে আসার পর স্ত্রীকে কিন্তু একনিষ্ঠতা বজায় রেখে চলতে হয়।

কিছুক্ষণ পরেই ছেলেটি মারা গেল। আপদ চুকল ভেবে শদা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। সে রয়ে গেল বাপের বাড়ীতেই। বেশ আনন্দে তার দিন কাটতে লাগল।...

প্রায় এক যুগ পরে শদা আবার গর্ভে সন্তান ধারণ করলে। যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হ'ল একটি মেয়ে—মেয়েটি কিন্তু টিকে গেল। এবার আর স্বামীগৃহে না গিয়ে শদার উপায় নেই।

বিয়ের দীর্ঘ বারো বৎসর পর মেয়েটিকে নিয়ে শদা যখন প্রথম স্বামীর ঘর করতে এল তখন সে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্ত-সীমায় পা দিয়েছে। বয়স তার সাঁইত্রিশ—যৌবনে ভাঁটা পড়ে গেছে। আর শাক্কের তখন প্রথম যৌবন—বয়স তার পঁচিশ বৎসর মাত্র। তার পেশীবহুল সুগঠিত দেহের সৌষ্ঠব যেমন অনিন্দ্য, তেমনি অমিত তার সাহস আর শক্তিমত্তা। স্বামীর পৌরুষ-ব্যঞ্জক মূর্তিখানির পানে তাকিয়ে শদার বার বার এই কথাই মনে হতে লাগল যে, স্বামীগৃহে আসতে তার বড় দেরী হয়ে গেল। সে শুধু ভাবতে লাগল, নিজের চলে-যাওয়া যৌবনকে কিছুতেই কি আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

শদাকে দেখেই কিন্তু শাক্কের মন তার উপর বিরূপ হয়ে উঠল। এই বিগতযৌবনা নারীকে নিজের স্ত্রীরূপে কল্পনা করাও যে দুঃসাধ্য!

স্পষ্টই সে তার মাকে জানিয়ে দিলে যে, শদার সঙ্গে স্বামী-গিরির অভিনয় করা তার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। ফলে একই বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে তারা বাস করতে লাগল অপরিচিত অনাত্মীয়ের মত। পারতপক্ষে শাক্ক শদার মুখ দেখত না।

শাক্কের মতিগতি দেখে শৌবা হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত পেলে। তারই অবিমৃষ্যকারিতার দরুন ছেলে আর ছেলের বৌয়ের জীবন নষ্ট হতে চলেছে দেখে তার বড় অনুতাপ হতে লাগল। ভাবতে ভাবতে বুড়ো শক্ত অসুখে পড়ল। এই অসুখই হ'ল তার অন্তিম অসুখ—কয়েক দিনের মধ্যেই সে মারা গেল।

বাপের মৃত্যুর পর শাক্ক হ'ল বিপুল সম্পত্তির মালিক। বাপ যা রেখে গেছে তাতে পায়ের উপর পা তুলে বসে দিব্যি আরামে সে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে। ওয়াকাচং-এর গিরিগাত্রস্থ আড়াইশোটি শস্যক্ষেত্রের মালিক সে। এই সমস্ত ক্ষেতে প্রতিবৎসর যে পরিমাণ ধান আর জনার উৎপন্ন হয় তাতে শাক্কদের চার চারটি গোলাঘর ভরতি হয়ে যায়।

এই পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্যের মধ্যেও ঘরে কিন্তু তার শান্তি নেই। স্ত্রীর সংস্পর্শ সে সাধ্যমত এড়িয়ে চলে। কিন্তু দৈবাৎ যদি দু'জনে সামনাসামনি এসে পড়ে তো শদা বাক্য-বাণ বর্ষণ করতে করতে তার কাণ ঝালাপালা করে তোলে। তার উপর মা তো সারাক্ষণ তার উপরে চটেই আছে—চব্বিশ ঘন্টা তার ভর্ৎসনার আর বিরাম নেই।...

যাই হোক, শাক্কের দিনগুলো চলতে থাকে একই ভাবে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই সুরু হয় তার নিশাচরবৃত্তি। আজ এ মোরাং-এ, কাল সে মোরাং-এ কাটে তার রাত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিরক্তি ধরে যায়—কোথাও গিয়ে সে স্বস্তি পায় না।

শীতের অবসানে নিষ্পত্র তরুরাজি নব কিশলয়দলে ভরে উঠেছে। উন্নত আরণ্য বৃক্ষসমূহের শাখা-প্রশাখা এক রকম থোকা থোকা শাদা ফুলে সমাচ্ছন্ন। বসন্ত সমাগমে বনভূমি যেন কুসুম-ভূষণে সজ্জিত হয়েছে। ওয়াকচিং-এর নাগা-পল্লীতে সুরু হ'ল অউ-লিং-মু অর্থাৎ বসন্ত উৎসবের সমারোহ।

উৎসবদিনে ভোর হতে না হতেই বালা মোরাং-এর সর্দ্দারের বাড়ীতে মাচার উপর গ্রামের সকল কুমারীরা এসে জড়ো হ'ল, সুরু হ'ল তাদের প্রসাধনপর্ব্ব। মেয়েরা সবাই হাঁটু গেড়ে সার বেঁধে বসে গেছে—সর্দ্দারের বৌ নিজে তাদের কাঁচখণ্ড আর শাঁখের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে তৈরি মালা আর রকমারি গয়নাগাঁটি পরিয়ে দিচ্ছে। মেয়েদের চুল বাঁধতে আর সাজাতে সারা মুলুকে বালা মোরাং-এর সর্দ্দারের বৌয়ের জুড়ি নেই—তাই মেয়েরা সবাই আজ তার দ্বারস্থ।

মাচানের এক পাশে বসেছিল শিকৃনা। থেপং মোরাং-এর এক নগণ্য চাষীর মেয়ে সে—কিন্তু এমনি অনিন্দ্য তার মুখশ্রী আর দেহসৌষ্ঠব যে, কোনো আং-পরিবারে জন্মালেই বুঝি তাকে মানাত। তার প্রসাদলাভের জন্য ওয়াকচিং-এর তরুণদের চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কারুর পানে সে অনুরাগের দৃষ্টিতে তাকালে না। এই দীর্ঘাঙ্গী তরুণীর ছন্দোময় দৃপ্ত গতিভঙ্গী তরুণদের হৃদয়ে দোলা দিত, কিন্তু তার মুখের প্রতিটি রেখায় প্রবল ব্যক্তিত্বের এমনি একটা সুস্পষ্ট ছাপ ছিল যে, কেউ তার কাছে ঘেঁষতে সাহস করত না।

সকলের কেশবিন্যাস সমাপন করে শেষে সর্দ্দারের বৌ শিকনাকে নিয়ে পড়ল। তার মাথার কেশে সযত্নে সিঁথি কেটে দীর্ঘ একটি বিনুনি বেঁধে দিলে। এই একবেণীধরা নিজেই তখন ব্যাপৃত হ'ল নিজের দেহসজ্জায়। পরনের মোটা কাপড়টি পরিত্যাগ করে পরলে সে এক হাত চওড়া, নস্যাপেড়ে একটি টকটকে লাল রঙের বস্ত্রখণ্ড, অনাবৃত ক্ষীণ কটিতে বাঁধলে সারি সারি রঙীন কাঁচে খচিত একটি নীবিবন্ধ; তার পর নিজের নিরাবরণ দেহকে সজ্জিত করলে সোনালী আর হলদে রঙের রকমারি পাথরের মালা, শাঁখের টুকরো আর পিত্তলনির্মিত অজস্র বিচিত্র গয়নাগাঁটি দিয়ে। অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে ঢাকা পড়ে গেল তার সুডৌল নিটোল শুভ্র স্তনদ্বয়, তার সুকুমার পেলব বাহু দুখানি একেবারে কব্জী থেকে স্কন্ধমূল পর্য্যন্ত আবৃত হ'ল হরেক রকমের রঙীন চুড়িতে।

বেশসজ্জা শেষ করে শিকনা পায়ে বাঁধলে একবোঝা ঘুঙুর—পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো তালে তালে রুমুঝুমু রবে বাজতে লাগল।

প্রসাধনপর্ব্ব সমাপন হতে হতে বেলা হ'ল দ্বিপ্রহর। এবার সুরু হয় কুমারীদের নৃত্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা মাচার উপর পরস্পরের হাত ধরাধরি করে সমস্বরে সঙ্গীত করতে করতে বৃত্তাকারে নৃত্য করতে থাকে।

ওদিকে ছেলেরাও কিন্তু নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে নেই। বহুক্ষণ যাবৎ আংবান মোরাং-এ অবিবাহিত যুবকদের আড্ডাগৃহে তারা নিজেদের বেশবিন্যাসে ব্যাপৃত। পরস্পরের মাথার দীর্ঘ কেশ আঁচড়ে দিয়ে তারা তাদের শিরস্ত্রাণসংলগ্ন লাল ছাগলোমের ঝুঁটির ওপর একজাতীয় বন-বিহঙ্গের দুগ্ধশুভ্র পালকগুচ্ছ গুঁজে দিলে। অবশেষে সোনালী আর বেগুনি রঙের বনকুসুম কর্ণভূষণে পরে তারা প্রসাধনের পালা শেষ করলে।

সাজসজ্জা সমাপনান্তে সুদীর্ঘ বর্শা এবং সুতীক্ষ্ণ দাওলো শূন্যে ঘুরাতে ঘুরাতে গাঁয়ের পথে বেরিয়ে পড়ে তরুণের দল। তাদের প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে বন্ধুর পার্ব্বত্য পল্লীপথ—যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছে যেন দুর্দ্ধর্ষ সৈনিকের দল। তাদের শিরস্ত্রাণে গোঁজা পাখীর পালক এবং রক্ত-রাঙা পশুলোমের ঝুঁটিসমূহ ইতস্ততঃ আন্দোলিত হতে থাকে। উৎরাই পথ বেয়ে যখন তারা নিচে অবতরণ করতে থাকে তখন মনে হয় আকাশ থেকে এক ঝাঁক বিচিত্রপক্ষ বিহঙ্গ যেন মাটির বুকে নেমে আসছে।

উৎরাই-পথ অতিক্রম করে তরুণের দল অবশেষে বালা মোরাং-এর সর্দ্দারের বাসভবন-সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে হাজির হয়। তাদের অভ্যাগমে নৃত্যপরা মেয়েদের হৃৎপিণ্ড অকস্মাৎ অস্বাভাবিক দ্রুত তালে স্পন্দিত হয়ে উঠে, কারো কারো নাচের তাল কেটে যায়।

সহসা প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি সহকারে তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠে তরুণের দল, তাদের করধৃত শাণিত বর্শাফলকে সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করতে থাকে। এমনি ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পুরোদমে চলতে থাকে নাচ—ক্রমে দিন অবসান হয়, নৃত্যের হয় সাময়িক বিরতি। ছেলেরা তখন সার বেঁধে খেতে বসে যায়, মেয়েরা তাদের ভাত শূকরের মাংস আর মদ্য পরিবেশন করে।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার সুরু হয় নাচের পালা—এবার ছেলেরা আর মেয়েরা নাচছে আলাদা আলাদা দু' জায়গায়। রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে নৃত্যপ্রাঙ্গণে। মাঝখানে জ্বলছে গনগনে কাঠের আগুন—তার আভায় নাচিয়েদের মুখগুলোকে দেখাচ্ছে রহস্যময়।

ধীরে ধীরে ভিড় কমে আসছে। নাচতে নাচতে তরুণেরা মেয়েদের নৃত্য-স্থলে এসে নিজ নিজ মনোনীতাকে নিয়ে অন্তর্ধান হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে তরুণ-তরুণীরা প্রায় সবাই নৃত্য-প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করে চলে গেল—এখন তাদের আসরে অবিরাম নেচে চলেছে কয়েকটি মাত্র ছোট ছোট বালক-বালিকা।

শাক্ক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শিকনার পানে। শিকনারও অপলক দৃষ্টি তার মুখের উপর নিবদ্ধ। আজ শিকনা মন দিয়ে নাচতে পারে নি—বহুবার তালভঙ্গ হয়েছে। শাক্কের বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি আর তার অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী আজ শিকনার রক্তে দোলা দিয়েছে। নাচতে নাচতে আজ সারাদিন বার বার সে শুধু অপাঙ্গে শাক্ককেই দেখেছে। শিকনার সেই প্রশংসমান দৃষ্টি শাক্কের চোখ এড়ায় নি। সে চাউনি তার মনে একটা অপূর্ব্ব পুলকানুভূতি, একটা অসম্ভব আশার সঞ্চার করেছে।...

নাচতে নাচতে শাক্ক একেবারে শিকনার কাছে এসে দাঁড়ায়। ক্ষণকাল তারা পরস্পরের মুখের পানে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে। এই পরম ক্ষণে তাদের দু'জনের মধ্যে চোখে চোখে কি কথা হয় কে জানে?

অকস্মাৎ উভয়ে হাত ধরাধরি করে অনতিদূরবর্ত্তী বনান্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বসন্ত উৎসবের দিনকতক পরে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে শাক্ক রওনা হ'ল খেপং মোরাং-এর সর্দ্দারের গৃহাভিমুখে।

পাহাড়ের উপর নীল চন্দ্রাতপের মত টাঙানো উন্মুক্ত উদার আকাশে প্রকাণ্ড কাঞ্চন-থালার মত চাঁদ উঠেছে। আকাশ থেকে ঝরে পড়া স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোৎস্নাধারা নীচেকার বনভূমিকে যেন রূপার পাতে মুড়ে দিয়েছে। পশ্চিমে পাংশা গ্রামের পেছন দিককার চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত আকাশস্পর্শী সুনীল পাহাড়শ্রেণী যেন কোন্ এক মায়াময় দুরধিগম্য সুদূর রহস্যলোকের আভাস জাগিয়ে দিচ্ছে।

চাঁদের আলো শাক্কের মনে যেন নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। সংসারটা তার কাছে বড় মধুময় ঠেকছে—চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছে আকাশের চাঁদেরই মত গোল, পীতাভ গৌর শিকনার সুন্দর মুখখানি।...

দ্রুত পা চালিয়ে, চড়াই পথ বেয়ে শাক্ক ঊর্দ্ধে আরোহণ করতে লাগল।

সর্দ্দারের বাড়ীতে পৌঁছে সে কুমারীদের যৌথ শয়নাগারের* বহির্দ্দেশে গা-ঢাকা দিয়ে বসে রইল।...

---

* নাগা-সর্দ্দারদের বাড়ীতে পাড়ার যাবতীয় কুমারীদের জন্য একটি আলাদা শয়নাগার থাকে। কুমারীরা সকলে সেখানে একত্রে নিশিযাপন করে।

সেই অনতিবৃহৎ গৃহটির একদিকে একটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ প্রবেশ-ও-নির্গমন পথ। গৃহমধ্যে সমান্তরাল ভাবে পাতা রয়েছে কতকগুলো অপ্রশস্ত ছোট ছোট তক্তপোষ। ঘরের মাঝখানে মেঝের ওপর চুল্লীতে কাঠ জালিয়ে আগুন করা হয়েছে—সেই জলন্ত অগ্নিশিখা প্রায়ান্ধকার কক্ষে আলো-আঁধারির এক বিচিত্র মায়া সৃষ্টি করেছে। কুমারীরা নিজ নিজ শয্যার উপরে বসে উৎকণ্ঠাব্যাকুল হৃদয়ে প্রণয়ীদের আগমন-প্রতীক্ষা করছে। এদিকে রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত দ্বারপ্রান্তে তাদের প্রেমাস্পদদের পদশব্দ তো শ্রুত হ'ল না। কুমারীদের হৃদয়ে জাগে অজানা আশঙ্কা—বাসকসজ্জাদের বসন্তরজনী বুঝি বৃথাই যায়। তখন সবাই মিলে বড় করুণ এক বিষাদমাখা সঙ্গীত জুড়ে দেয়—তাতে বেজে ওঠে যেন কত যুগযুগান্তরের বিরহ-বেদনা।

সঙ্গীতের মাঝখানেই হঠাৎ ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে শাঙ্কক। সঙ্গে সঙ্গেই থেমে যায় বিরহ-সঙ্গীত।…সবাই উৎসুক চক্ষে তাকায়। কার ভাগ্য এতক্ষণে প্রসন্ন হ'ল? সহসা সবাই মিলে "চোর" "চোর" বলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠে শাঙ্ককে ঝাপটে ধরে। একটি মেয়ে শাঙ্কের মুখের কাছে মুখ নিয়ে ভাল করে তাকে নিরীক্ষণ করে উচ্চস্বরে হেসে বলে উঠে—"আরে, এ যে দেখছি শিকনার মনচোর। নে ভাই শিকনা তোর চোরকে এবার তুই শাস্তি দে।"

ক্রমে ক্রমে এক একজন করে প্রণয়ীরা সেই কক্ষে এসে নিজ নিজ প্রণয়িনীর পার্শ্বে আসন গ্রহণ করে। উচ্চ হাস্যে লঘু পরিহাসে আনন্দ-গানে গৃহখানি মুখরিত হয়ে উঠে। ক্রমে ক্রমে আগুনের দীপ্তি স্তিমিত হতে হতে শেষে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাণ হয়ে যায়, পাশাপাশি উপবিষ্ট জোড়া জোড়া প্রণয়ীদের দেয়ালে প্রতিফলিত ছায়ামূর্ত্তিগুলো মিলিয়ে যায় অন্ধকারে।…

কাটল বেশ কিছুক্ষণ…গৃহমধ্যস্থ কলরব নির্ব্বাপিত… নির্ব্বাণদীপ অন্ধকার-কক্ষে সুরু হয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মৃদু প্রণয়কূজন। অতি সন্তর্পণে শয্যাত্যাগ করে উঠল শাঙ্কক আর শিকনা। টিপিটিপি তারা বাইরে বেরিয়ে এল। চারিদিক জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে, পর্ব্বতগাত্রস্থ বেণুবন যেন জ্যোৎস্নালোকে স্বপ্ন দেখছে…শাঙ্কক-শিকনার আদিম রক্তে জেগেছে বিপুল উন্মাদনা। পরস্পরের কণ্ঠালিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে তারা বনপথ অতিক্রম করতে লাগল।

প্রিয়তমাকে নিয়ে শাঙ্কক এসে পৌছল নিজের বহির্বাটীতে গোলাঘরের খোলা বারান্দায়। সেখানে ধানের আঁটি মাটিতে বিছিয়ে শিকনা শয্যারচনা করলে।

কিন্তু এমন রাতে চোখে ঘুম আসে না—জেগে বসে দু'জনে সুরু করলে অর্থহীন অজস্র আলাপন—সারাদিন কত কথাই না দু'জনের মনে জমা হয়ে ছিল!

বাড়ীতে আর একটি প্রাণীও বিনিদ্র-রজনী যাপন করছিল—সে শাঙ্কের স্ত্রী শদা। হন্তদন্ত হয়ে সে ছুটে এল গোলাঘরে। এসেই একেবারে বোমার মত ফেটে পড়ল। শাঙ্কক একটি কথাও বললে না। শিকনার হাত ধরে গোলাঘর পরিত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়ল। বনপথের বাঁকে যখন তারা অদৃশ্য হয়ে গেল তখন ঘরে ফিরে গিয়ে ঘুমন্ত মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠল।

এদিকে জ্যোৎস্নালোকে আবার সুরু হয় শাঙ্কক-শিকনার পথচলা। অবশেষে গিয়ে পৌঁছয় তারা গ্রামপ্রান্তস্থ ধান-ক্ষেতের ধারে, শাঙ্কের দোচালা ক্ষেত্রকুটিরে।

•

এমনি ভাবে পরিপূর্ণ মিলনানন্দের ভেতর দিয়ে কাটতে লাগল এই প্রণয়ীযুগলের দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

শাঙ্কের দোচালা ক্ষেত্রকুটিরই এখন তাদের নিভৃত গোপন মিলনের স্থান। সেখানে লোকালয়ের কোনো কোলাহল তাদের কানে পৌঁছয় না। শুধু শোনা যায়, অনতিদূরে এক গিরিনদীর একটানা অশ্রান্ত গর্জ্জন।

শিকনার আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে হঠাৎ আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে শাঙ্কক বলে ওঠে—"শিকনা, তোমায় না পেলে সংসারে যে এত সুখ আছে তা আমি জানতেও পারতাম না। বিশ্বাস করো, ঐ নদীর চেয়েও গভীর আমার ভালোবাসা, এর স্রোতের চেয়েও বেশী তার বেগ।"

শিকনা কোনো জবাব দেয় না, শুধু কেমন যেন অসহায়ের মত প্রিয়তমের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ যেন তার সুন্দর মুখে নামে বেদনার পাণ্ডুর ছায়া—আনমনে সে যেন কি ভাবতে থাকে। শাঙ্কক তার এই ভাবান্তরের কোন হেতু খুঁজে পায় না।…দিন দিন শিকনার বিষাদের মাত্রা ক্রমেই যেন বেড়ে চলতে থাকে।

শেষে শিকনা একদিন সব কথা খুলে বললে, সে অন্তঃসত্বা। শুনে শাঙ্কের চোখের সামনে সারা পৃথিবীটা যেন ঘুরতে লাগল—একেবারে মাথায় হাত দিয়ে সে বসে পড়ল।

শিকনা গর্ভে ধারণ করেছে তার সন্তান, এতে তো দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী আনন্দ হওয়ার কথা ছিল তারই—কিন্তু এ অ-জাত সন্তান যে তার অবাঞ্ছিত। সে তো আসবে না তাদের উভয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্থাপন করতে। যে মুহূর্ত্তে সে ভূমিষ্ঠ হবে সেই মুহূর্ত্তেই পড়বে শাঙ্কক-শিকনার প্রণয়ে পূর্ণচ্ছেদ। শিকনা কয়েক বছর আগে থেকেই অপরের নিকট বাগ্‌দত্তা। বিয়ের প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদিও তখনই হয়ে গেছে। মা হবার সঙ্গে সঙ্গেই হবে তার মুক্ত স্বাধীন জীবনের অবসান। চিরতরে পিত্রালয় পরিত্যাগ করে নবজাত সন্তানকে নিয়ে চলে যেতে হবে তাকে স্বামীগৃহে—শাঙ্কের সঙ্গে হবে তার চিরবিচ্ছেদ।…

কিন্তু সেই চরম দুর্দিন আসতে এখনও মাসকয়েক বাকী

আছে। শিরুমার মাথার সস্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে শাঙ্কর বললে,—"শিরুমা, ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা এখন মুলতুবী থাক। সমাজের বিধানকে এক দিন তো মাথা পেতে নিতে হবেই। কিন্তু আপাততঃ সমাজ সংসার সব মিছে, মনে হচ্ছে যেন দুনিয়ায় তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই।"

শিরুমা একান্ত অনুরাগের দৃষ্টিতে শাঙ্করের মুখের পানে তাকালে—তার মনে হ'ল তাদের দু'জনের এই যে নিবিড় গোপন মিলন সংসারে একমাত্র তা-ই সত্য, বাকী সবকিছুই অবাস্তব, ছায়ার মতন মিথ্যা।

শাঙ্কর-শিরুমার প্রণয়লীলা চলতে লাগল যথাপূর্ব্বং, কিন্তু পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে চিরবিচ্ছেদের আশঙ্কা তাদের দু'জনকে ঘিরে রইল দুঃস্বপ্নের মত।...

এমনি ভাবে কাটল কয়েক মাস। এখন শিরুমা আসন্ন-প্রসবা—তার চাঞ্চল্যের হয়েছে অবসান, গতি হয়েছে মন্থর। সে বুঝতে পেরেছে শিগ্‌গিরই সে হবে সন্তানের জননী—ভাবতেও সারা দেহে যেন একটা পুলক-শিহরণ খেলে যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে সন্তান তার যেদিন প্রথম পৃথিবীর আলোবাতাসের স্পর্শলাভ করবে সেই পরম আনন্দের দিনই হবে তার কাছে চরম বেদনার দিন—সেই দিন থেকেই হবে তার সন্তানের জন্মদাতার সঙ্গে তার চির-বিচ্ছেদের সূচনা।...

সেদিন সন্ধ্যার পর দু'জনে তারা চলে গেল ওটিং-এর বনভূমিতে। আকাশে চাঁদ উঠেছিল। বনতলে পা ছড়িয়ে বসল শাঙ্কর, আর শিরুমা তার কোলে মাথা রেখে তৃণশয্যায় শুয়ে পড়ল। দু'জনেই চুপচাপ। হঠাৎ শিরুমা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না। শাঙ্করের কোলে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এ কান্না কেন শাঙ্করের তা বুঝতে বাকী রইল না। সে কোন কথা বললে না, শুধু নীরবে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

পরদিন যথারীতি সন্ধ্যার পর শাঙ্কর গিয়ে হাজির হ'ল খেপং মোয়াং-এর কুমারীদের যৌথ শয়নাগারে। ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখলে শিরুমার চৌকির উপর শূন্য শয্যাটি পড়ে আছে। পরিচিতারা সকলেই উপস্থিত। কিন্তু তার উৎসুক ব্যগ্র চক্ষু দুটি যার সন্ধান করছে সেই শুধু নেই। তবে কি...শাঙ্করের বুক দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল।

একটি প্রগল্‌ভা মেয়ে খিল খিল করে হেসে বলে উঠল—"ওদিকে তাকালে কি হবে মশাই। সে আর আসবে না... শিরুমার যে আজ দুপুরে ছেলে হয়েছে গো।...

শাঙ্করের চোখের সামনে আচম্‌কা যেন নেমে এল গভীর অন্ধকার...মনে হ'ল সবকিছুই যেন ছায়ার মত মুছে মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রায় মেঝের ওপরেই বসে পড়ে আর কি! অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে সেখান থেকে বেরিয়ে এল।...

নিজের বাড়ীতে ফিরে এসে শাঙ্কর বহির্বাটিতে মাচার ওপরেই ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। দীর্ঘ এক বৎসর পরে আবার সুরু হ'ল তার একলা নিশিযাপনের পালা। ঘুম চোখে কিছুতেই আসে না। নিজেকে কেমন যেন শিশুর মত অসহায় মনে হয়। দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় সারা রাত সে ছটফট করতে লাগল।

পরদিন ভোরে যখন সে শয্যাত্যাগ করে উঠল তখন তাকে দেখলে আর চেনাই যায় না। কুঞ্চিত ললাটে তার দুশ্চিন্তার রেখা, নিশিজাগরণক্লান্ত চোখের কোলে পড়েছে কালিমা, মুখে সর্ব্বস্ব হারানোর ছাপ। এক রাত্রে সে যেন বুড়িয়ে গেছে—বয়স তার যেন বিশ বৎসর বেড়ে গেছে।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে সে ধানক্ষেতের অভিমুখে রওনা হ'ল। ক্ষেত্রভূমিতে গিয়ে যখন পৌঁছল তখন দূর দিগন্তলীন পাতকোই পাহাড়শ্রেণীর উপর দিয়ে প্রভাত-সূর্য্য আকাশে উঠেছে। বিচিত্রবর্ণানুরঞ্জিত আকাশের পটভূমিকায় নীল পাহাড়ের চূড়াসমূহ চালচিত্রের মত শোভমান। পাহাড়ের পশ্চিম দিককার গড়ানে অংশ এখনও ছায়ায় ঢাকা। নীচেকার উপত্যকাভূমি অজস্র হিমকণায় সমাচ্ছন্ন—কে যেন রহস্যময়ী প্রকৃতির সুপ্ত মুখের 'পরে শুভ্র সূক্ষ্ম কৌষেয় অবগুণ্ঠন টেনে দিয়েছে। সূর্য্যের সোনালী রশ্মিপাতে প্রকৃতির সেই মুখাবরণখানি ঝলমল করছে।

এই মনোরম প্রভাতে ধানক্ষেতে তরুণ-তরুণীদের ভিড় জমেছে—সুরু হয়েছে ফসল-কাটার গান। শাঙ্করের মনে পড়ল, আজ থেকেই আউ নিবু (শস্য কর্ত্তন) উৎসবের সুরু। তরুণ-তরুণীদের মনে তাই আজ ভোরবেলা থেকেই খুশীর বান ডেকেছে। সবাই উৎসবানন্দে ভরপুর, শুধু তারই জীবন থেকে উৎসব নিয়েছে চিরবিদায়।

দূরে শাঙ্করের আগমনশীল মূর্ত্তিখানি দেখে তার বন্ধু-বান্ধবেরা খুশী হয়ে হর্ষধ্বনি করে উঠল। কিন্তু সে কাছে এলে তার চেহারা দেখে সবাই তো একেবারে হতভম্ব। ব্যাপারখানা কি? শিরুমার ছেলে হওয়ার খবর তাদের কানে তখনও পৌঁছয় নি।

চিনইয়াং-এর সঙ্গেই তার সকলের চাইতে বেশী বন্ধুতা। সে জিজ্ঞেস করলে—"কি রে শান্থ, আজ মচ্ছবের দিনে তোর এ ভাব কেন? ফুর্ত্তি-আমোদে যোগ দেওয়া তো দূরের কথা, দুই কথাই বলছিস না। তোর হ'ল কি, অসুখ করেছে না কি?"

শাঙ্কর জবাব দিলে, "না ভাই, অসুখবিসুখ কিছুই নয়। কাল শিরুমার ছেলে..." আর কিছু সে বলতে পারলে না, সকলের সামনে একেবারে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে।

চিনইয়াং তার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—"এ্যা, একেবারে কেঁদেই ফেললি। তুই পুরুষ-বাচ্চা, একটু শক্ত হ। আগে শদাকে তালাক দে। তার পর শিকনার স্বামীকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে শিকনাকে বিয়ে করে ফেল। তা হলেই তো সব লেঠা চুকে যায়।"

চিনইয়াং-এর কথা শুনে শাহক যেন অকূলে কূল দেখতে পেলে। সাংসারিক ব্যাপারে এবং সামাজিক নিয়ম-কানুনাদিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সে। মুস্কিল-আসানের এসব উপায়ের কথা তার মনেই আসে নি। এখন চিনইয়াং-এর পরামর্শে সে যেন অন্ধকারে একটুখানি ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পেলে। বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিদায় নিয়ে সে বাড়ীর পথে রওনা হ'ল। শাহক দৃষ্টির আড়ালে গেলে সবাই বলাবলি করতে লাগল, শাহকটা মেয়েমানুষেরও অধম।

বাস্তবিক শাহক সাহসী বীরপুরুষ হলে কি হয়। সে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, মনটা তার ভারি নরম। কনিয়াক নাগাদের সমাজে সে ব্যতিক্রম।

শাহক শদাকে তালাক দিতে চায় শুনে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মাতব্বররা তার বাড়ীতে এসে জমায়েৎ হ'ল। তার শ্বশুর-শাশুড়ীও এসে উপস্থিত হ'ল, শিকনার স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদেরও ডেকে পাঠানো হ'ল। যথাসময়ে বসল বৈঠক।

বিবাহবিচ্ছেদ করতে হলে শাহককে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ কি কি দিতে হবে একে একে তার ফর্দ উপস্থাপিত করা হতে লাগল। শদার বাপ-মা অসম্ভব রকম মোটা টাকা দাবি করলে। শিকনার স্বামীর আত্মীয়স্বজনেরা বললে, শিকনার বিয়ের প্রাথমিক অনুষ্ঠানের সময় তাদের যে পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছিল তা একেবারে কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দিতে হবে। সমাজপতিরা ফতোয়া দিলেন, বিবাহবিচ্ছেদের আগেই বাড়ীটিকে ভেঙে আবার নূতন করে তৈরি করতে হবে, কেননা যে ঘরে প্রথমা স্ত্রী বাস করে গেছে সেই ঘরেই দ্বিতীয়াকে নিয়ে আসা সামাজিক বিধানে নিষিদ্ধ।

আং-সর্দারের ছেলের বিবাহবিচ্ছেদ এ তো আর সাধারণ ব্যাপার নয়। সমাজপতিরা দেখলে মোটা রকমের দাঁও মারবার এ একটা সুবর্ণ-সুযোগ—তারা এ সুযোগ ছাড়বে কেন? গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ জরিমানা-স্বরূপ যে টাকা দাবি করলে তা দিতে হলে শাহককে সর্বস্ব বিক্রী করে কপুর হতে হয়।

গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মোড়ল লেমং শাহককে সম্বোধন করে বললে—"ওহে ছোক্‌রা, তোমার বাপের সঙ্গে আমাদের যে সব কথাবার্তা হয়েছিল সেই অনুযায়ীই আমরা আমাদের দাবি-দাওয়া উপস্থিত করছি। তুমি তখন নেহাত ছেলেমানুষ, এ সব তোমার জানবার কথা নয়। কিন্তু গাঁয়ের দশ জনের তা অজানা নয়। যাই হোক, তুমি রাজী তো।"

শাহক বুঝলে বাপ তার সব দিক দিয়ে আটঘাট বেঁধে গিয়েছে, কোথাও কোন ফাঁক রেখে যায় নি। শদাকে তালাক দিতে হলে যথাসর্বস্ব দান-বিক্রী করে তাকে পথের ভিখারী সাজতে হবে। কিন্তু তাতে সে পিছপা নয়। শিকনার চেয়ে টাকাকড়ি ধনদৌলত জমিজেরাৎ তার কাছে বড় নয়। তবে কি এখনই সমাজপতিদের কথায় সে সম্মতিপ্রদান করবে?

কিছুক্ষণ সে চুপ করে ভাবতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হ'ল, সে যদি এমন করে পৈতৃক সম্পত্তি নিঃশেষ করে দেয় তা হলে কিংওয়াং-এর কি উপায় হবে? কিংওয়াং তার একমাত্র নাবালক ছোট ভাই। বয়স তার পাঁচ-ছয় বছর মাত্র। বড় ছেলে বলে শাহক এখন বাপের সমুদয় সম্পত্তির মালিক। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে কিংওয়াং যখন উপযুক্ত বয়সে বিয়ে করে ঘর বাঁধবে তখন শাহককে তার অংশ তাকে গাঁয়ের মাতব্বরদের সামনে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়ে দিতে হবে।

দারুণ দোটানায় পড়ল শাহক। যথাসর্বস্বের বিনিময়েও শিকনাকে পেলে তার জীবনের সকল অভাব মিটবে সত্য, কিন্তু সেজন্যে কিংওয়াংকে সর্বস্বান্ত করে, তার ভবিষ্যৎ মাটি করবার কি অধিকার আছে তার।...

অনেকক্ষণ ভেবে শাহক সমাজ-পতিদের বললে—"দয়া করে আমায় আজকের দিনটি সময় দিন। কাল সকালে আমার চরম মত জানাব।"

গভীর রাত্রে শয্যাত্যাগ করে উঠল শাহক। তার সকল ভাবনা দূর হয়েছে, সকল দুশ্চিন্তার হয়েছে অবসান—মন ভরে উঠেছে বিমল আত্মপ্রসাদে।

পাশেই ঘুমিয়ে আছে কিংওয়াং। ছোট্ট ভাইটির ঘুমন্ত মুখে চুমু খেয়ে শাহক তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলে—তারপর ঘর থেকে পথে বেরিয়ে এল।

আজ সারাদিন সে অনেক ভেবেছে, ভেবে ভেবে অবশেষে সে তার কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে। প্রেম তার অনেক বড়, কিন্তু তার চেয়েও বড় আং-পরিবারের মর্যাদা। বহু পুরুষের কীর্তিকলাপ আর সঞ্চিত সম্পদের ওপর তাদের পারিবারিক গৌরবের ভিত্তি। নিজের সুখের জন্যে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত সম্পদের অপচয় করে পারিবারিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলকে সে শিথিল করে দেবে না। আজ সমাজের শীর্ষস্থানে তাদের পরিবারের আভিজাত্যের আসন, কিন্তু শদার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে গিয়ে কাল যদি সে সর্বস্বান্ত হয় তা হলে ওয়াকচিং-এর সবাই তাকে আর তার মা-ভাইকে দেখবে অবজ্ঞার চোখে। তারা তার প্রেমের মর্যাদা তো আর বুঝবে না, নাক সিঁটকে বলবে একটা মেয়ে-মানুষের জন্যে শাহক সর্বস্ব খুইয়ে আং-পরিবারের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। তার প্রেমের এত বড় অসম্মান ঘটতে সে দেবে না।...

সে বাপের অযোগ্য ছেলে কিন্তু কিংওয়াং বড় হয়ে রাখবে

বাপের নাম। সেই অবুঝ ছোট ভাইটিকে কিনা সে পথে বসাবার ব্যবস্থা করবে?—না তা হয় না। তার চেয়ে সে যদি ঘর ছেড়ে চিরতরে পথে বেরিয়ে পড়ে তা হলেই তো কত সহজে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ঘরে তার কিসের মায়া? মুখরা প্রৌঢ়া স্ত্রীর প্রতি নেই তার কোনও আকর্ষণ। পরের সন্তান তার সন্তানরূপে সমাজে পরিচিত। সবাই এ বিধানকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়ে আসছে। কিন্তু শাঙক এ সমাজ-বিধিকে প্রসন্ন মনে স্বীকার করতে পারে না। এ সমাজে নিজেকে কেমন যেন খাপছাড়া বলে তার মনে হয়—সে মর্মে মর্মে অনুভব করে এখানে তার স্থান নেই।

নিজের একাকিত্বের অনুভূতি তাকে অভিভূত করে ফেলে—মনে হয় সংসারে তার মত নিঃসঙ্গ কেউ নেই। তুচ্ছ ধন-সম্পদ, প্রিয়জনকে নিয়ে একখানি সুখনীড়ই যদি না বাঁধা হ'ল তা হলে মিছামিছি ঘরে থেকে লাভ কি?

তাই ঘর ছেড়ে সে বেরিয়েছে পথে। জন্ম-পল্লী পরিত্যাগ করে সে চলে যাবে এমন দূর দেশে যেখানে পূর্ব্ব-জীবনের সঙ্গে হবে তার সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ। যেখানে গেলে নূতন পরিবেশে শিকনার কথা, ওয়াকচিং-এর কথা, সবকিছু সে ভুলতে পারবে।

জ্যোৎস্নার প্লাবনে পাহাড়-বন-অধিত্যকা-প্রান্তর পরিপ্লাবিত। দ্রুতপদে বনপথ অতিক্রম করে সে এগুতে লাগল। ঠিক যেন নিশিতে পাওয়ার মত সে নিযুপ্ত গ্রামের উপর দিয়ে চলেছে।

পল্লীর শেষপ্রান্তে বনপথের এক বাঁকে শিকনার বাড়ী। থমকে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত বাড়ীখানির পানে এক বার তাকালে শাঙক, ভাবলে স্বামীর বুকে শুয়ে শিকনা কি এখন বিগত বসন্তরজনীর স্বপ্ন দেখছে!

কিন্তু পিছটান আর নয়—যাত্রা তার সুমুখ-পানে, গিরিবন অতিক্রম করে, সিনইয়াং নদী পেরিয়ে নরমুণ্ডচ্ছেদক নাগাদের পল্লী পাংশার অভিমুখে।

শিকনার বাড়ী ছাড়িয়ে সে সুরু করে চড়াই পথ বেয়ে ঊর্দ্ধে আরোহণ, পিছনে পড়ে থাকে শিকনার সঙ্গে প্রণয়লীলার শত স্মৃতি-বিজড়িত ওয়াকচিং পল্লী। গভীর নিশীথে দুর্গম গিরিপথে অজানার উদ্দেশে অভিযানের আনন্দে তার সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। দৃঢ় পদক্ষেপে চড়াইয়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করে সে সুমুখের সীমাহীন মহাশূন্যের পানে তাকায়।

নতোন্নীন পাতকোই পর্ব্বতমালার অভ্রভেদী সারামাটি গিরিশৃঙ্গ যেন তাকে কোন সুদূর রহস্যলোকের অভিমুখে হাতছানি দিয়ে ডাকে।*

* গল্পটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়, সত্য ঘটনামূলক। অষ্ট্রিয়ার নৃতত্ত্ববিদ্ Christoph von Fürer Haimendorf তাঁর *The Naked Nagas* নামক পুস্তকে দুটি কনিয়াক নাগা তরুণ-তরুণীর যে বিয়োগান্ত প্রণয়কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাকেই ভিত্তি করে বাস্তবে কল্পনায় মেশানো এই গল্পটি রচনা করা হয়েছে।

তারা দেখাবেই আলোর পথ

এস. এম. মুয্‌হরুল ইস্‌লাম

পৃথিবী মোদের বন্ধ্যা নয়,
ইতিহাস জানে পৃথিবী মোদের বন্ধ্যা নয়।
অমৃত-জীবন ছিল হেথা যুগ-যুগান্তর,
জয়গানে তার মুখরিত আজো নির্ব্বাক দিক-দিগন্তর।

তীব্র রাত্রিয়া এসেছিল যবে, নভতল রবিরশ্মিহীন
জমাট আঁধারে পৃথিবীর বুক হিম-তুহিন,
পিশাচেরা এসে সেই আঁধারের পথ ধরি'
দুমড়ে মুচড়ে ভেঙেছিল কত নবজীবনের মঞ্জরী।
তখনো তো তারা নির্ভয়-চিত্তে তুচ্ছ করেছে অন্ধকার,
কঠিন হস্তে হেনেছে আঘাত মুক্ত করিতে প্রকাণ্ড দ্বার,
রক্ত দিয়েছে ফাঁসির মঞ্চে, বুলেটের মুখে দিয়েছে প্রাণ
মৃত্যুর মাঝে তাহারা পেয়েছে জীবনের জয়মুগ্ধ গান।

তারাই শহীদ, তাদেরি যে খুনে লালে লাল সেই রক্ত-পথ,
খুঁজে খুঁজে আজ এখানে এসেছে নব-সূর্য্যের আলোর রথ।
পিশাচেরা আজ পালায়েছে দূরে—ঘোর-রাত্রির হয়েছে শেষ,
দিনের আলোকে অবসান হ'ল নিশীথের ব্যথা-দুঃখক্লেশ।

এই আলোকের মিনারে দাঁড়ায়ে স্মরি সেই শত শহীদ বীর,
ভুলি নি তো মোরা, ভুলিতে কি পারি তাদের দেওয়া সে
লাল রুধির?
ইতিহাস-বুকে সে মহাত্যাগের, সেই রক্তের সোনালী দাগ,
অমৃত আখরে আঁকা রবে আর ছড়াবে মহৎ প্রেরণা-রাগ।
সেই নিষ্ঠুর বেদনাকে স্মরি ফেলিব না আজ অশ্রুজল,
শুধু চাই…সেই রক্ত-লিখায় পাই যেন চির-নতুন বল,
যদি কোন দিন আঁধারের মাঝে চলিবার গতি হয়-ই রুদ্ধ,
ভয় নেই তবু, থাকি অলক্ষ্যে তারা দেখাবেই আলোর পথ।

সুফী তত্ত্বালোচনা

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পাল

সুফী (বা সূফী) মুসলমান ধর্মের একটি সম্প্রদায়বিশেষ। ইঁহাদিগকে হিন্দুধর্মের বেদান্তবাদীদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সুফী ধর্মের মতে ভগবান এক; তাঁহার কোন তুলনা নাই। তিনি নির্গুণ, অর্থাৎ গুণের অতীত; তাঁহার কোন বর্ণনা হয় না। সেই রূপহীন, নির্গুণ ভগবৎ-তত্ত্বের আলোচনা কেমন করিয়া করা যাইতে পারে? মৌলানা রূমী তাঁহার মস-নবীতে লিখিয়াছেন,

গর্ জ সির্‌র-ই-ম'রিফৎ অগা: শবী।
লব্ জ বগ্ ফারী সুয় ম'নী শবী॥

যদি সেই গূঢ় রহস্য জানিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বাক্য বা বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া সেই সত্তাকে উপলব্ধি কর। প্রকৃতই ভগবৎসত্তা উপলব্ধির জিনিষ, ইহাকে বর্ণনা দ্বারা বুঝাইবার উপায় নাই। আমরা দেখিতেও পাই যে, কোন ধর্মশাস্ত্রেই ভগবৎসত্তার সরাসরি কোন বর্ণনা নাই—এবং ইহা হইতেও পারে না; ইহার সোজাসুজি কোন বর্ণনা করিতে গেলেই সাধারণ মানুষ ইহার গূঢ় রহস্য সঠিক বুঝিতে না পারিয়া ভ্রান্তপথগামী হইবে। সেইজন্য সকল শাস্ত্রেই ভগবৎ-তত্ত্বের আলোচনা রূপকের সাহায্যেই করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট, হজরৎ মোহম্মদ প্রমুখ সকল ধর্মপ্রবর্তকগণই রূপকের সাহায্যেই ভগবৎসত্তার বর্ণনা করিয়াছেন। সেই পরম পুরুষকে পার্থিব চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করা দুষ্কর। যে ভাগ্যবান পুরুষ তাঁহার এই পার্থিব চক্ষুকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন, তিনিই কেবল ভগবৎসত্তার দর্শনলাভ করিয়াছেন।

এই রূপকবর্ণনার যথেষ্ট উপকারিতাও রহিয়াছে। সাধারণ মানুষ এই রূপককেই ভগবানের প্রকৃত সত্তা মনে করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ইহার আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি সম্যক্‌ভাবে পালন করিতে চেষ্টা করে। মুসলমান ধর্মশাস্ত্র মতে এই বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'শরি'য়ৎ'। 'শরি'য়ৎনির্দিষ্ট' আচার-অনুষ্ঠানাদি যথোচিতভাবে পালন করিয়া সাধারণ মানুষ ক্রমে সুফীনির্দিষ্ট 'ত্বরীকৎ'-এ (পথ) অগ্রসর হয়। সেখান হইতে সালিক্-ই-রহ্ (ভগবৎ-পথের পথিক) ক্রমে ক্রমে 'ম'রিফৎ' (ভগবৎ জ্ঞান) ও হকীকৎ-এর (ভগবৎসত্তা) দিকে অগ্রসর হয়। মানুষ সেই ভগবৎসত্তায় পৌঁছিলে পর দেখিতে পায় যে, সকলই এক—এক ভগবান ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু সেই স্তরে পৌঁছিবার পূর্বে কেহ সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না যে, এক ভগবানই চরাচর ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তিনিই সবকিছুতেই বিরাজ করিতেছেন এবং তদ্ব্যতীত আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। আমরা দেখিতে পাই, ধর্মগ্রন্থাদিও এরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, সেগুলিতে যদিও বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও নানা ভক্তোপদেশাদির অনেক বর্ণনাই আছে তথাপি এমন অনেক তথ্যপূর্ণ বিষয়ও রূপকচ্ছলে বর্ণনা করা হইয়াছে যাহার আসল তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা দুরূহ ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে সুফী-কবিদের প্রেমপূর্ণ 'গজল' (প্রেমগীতি) বা হিন্দুধর্মের রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-কাহিনীর কথা বলা যাইতে পারে।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাহারো ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করা নিষেধ। প্রকৃতই যাহার ব্রহ্ম বা ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয় নাই, তিনি কি করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন? কৃষ্ণের প্রতি রাধার আত্মভোলা প্রেমের স্বরূপ কয়জন সঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন? সেইজন্যই দেখা যায় কৃষ্ণলীলার অপব্যাখ্যা হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল।
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন।
ইহাকে কহি যে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ।
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম; প্রেম নির্মল ভাস্কর।

—চৈতন্য চরিতামৃত—আদিখণ্ড।

সুফী কবিগণও ঠিক এইরূপ ভাবেই প্রেমের মহিমা গাহিয়াছেন; মৌলনা রূমী বলিয়াছেন,

ম'নী আন্ বাশদ্ কি কুর্ ব কর্ কুনদ্
মর্দ্ রা বর্ নক্‌শ্-'আশিক্‌ তর্ কুনদ্

—'পরম সত্তার প্রেম দৈহিক সৌন্দর্য্যের প্রতি আসক্তির ন্যায় মানুষকে অন্ধ ও বধির করে না।' কিন্তু যতক্ষণ না মানুষ সেই প্রেমের আস্বাদ পায় ততক্ষণ সে পার্থিব প্রেমের প্রতিই আকৃষ্ট হয় এবং সেই ভগবৎপ্রেমের রসাস্বাদ হইতে বঞ্চিত থাকে। এই পার্থিব প্রেমও খাঁটি হইলে বিফলে যায় না—ইহাই ক্রমে গাঢ়তম হইয়া ভগবৎপ্রেমে পরিবর্তিত হয়। স'দী ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে গাহিয়াছেন,—

যৌক-ই-মৈয় বাদ না দানী বখুদা তা নচশ্‌ী

এই প্রেম-রসের মাদকতা যতক্ষণ না আস্বাদন করিয়াছ, ততক্ষণ ইহা সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না –।

সেই ভগবৎপ্রেম কোন আড়ম্বরের ধার ধারে না। নিঃস্বার্থপরতাই ইহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কবি হাফিজ গাহিয়াছেন,—

রাজ্-ই-দরূন্-ই-পর্দহ্ জ রিন্দান্-ই-মস্ৎ পুর্স্।
কঈন্ হাল্ নীস্ৎ জাহিদ্-ই-'আলী-মুকাম্ রা॥

হরগিজ্ নমীরদ্ আন্ কি দিলশ্ জিন্দহ্ শুদ্ ব'ইশ্ক্।
স্বতস্ৎ বর্ জরীদ-ঈ-'আলম্ দব'ম্-ই-মা॥

"ভগবৎ প্রেমের গূঢ় রহস্য প্রেমোন্মত্তদের নিকট হইতে জানিতে চেষ্টা কর, বাহ্যিক আড়ম্বরবিশিষ্ট সাধুগণ ইহার প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাত নহেন।...ভগবৎপ্রেমে যাঁহার অন্তঃকরণ সজীব তাঁহার কখনও মৃত্যু নাই—আমাদের চিরন্তন অস্তিত্ব পৃথিবীর পৃষ্ঠে চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে।" এইরূপ গজলে যেমন ভগবৎপ্রেমের বর্ণনাদি আছে ও সুফীতত্ত্বাদি আলোচনা করা হইয়াছে তেমনি সুফীতত্ত্বের বিশ্লেষণ এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য নানা গল্প বা কাহিনীর মধ্যেও বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। অনেক সুফী কবিই—যেমন, 'অত্তার্, রূমী, স'দী, সুফীতত্ত্বসমূহ নানা গল্পের সাহায্যে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কোরাণেও এইরূপ অনেক গল্পের সমাবেশ আছে। এই সকল গল্পের অর্থ দুই ভাবেই করা যাইতে পারে—এক সাধারণকে জ্ঞানদান করণার্থ নানা উপদেশের সাহায্যে চলিত রীতিনীতি ও আইন-কানুন সাপেক্ষ শরি'য়ৎ অনুযায়ী ব্যাখ্যা; দ্বিতীয়, ত্বরীকৎ ও ম'রিফৎ (যোগমার্গ ও জ্ঞানমার্গ) অবলম্বনে ভগবৎ পন্থা অনুসরণকারীদের জন্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। কোরাণে এই দ্ব্যর্থপূর্ণ শ্লোকের যথাক্রমে নামকরণ করা হইয়াছে,—

(ক) অয়াৎ-ই-বায়িনৎ (সাধারণ ব্যাখ্যাযুক্ত শ্লোক)

(খ) অয়াৎ-ই-মুতশাবিহৎ (আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদিসম্পন্ন শ্লোক)।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাযুক্ত শ্লোকের নিদর্শন-স্বরূপ কোরাণে (১৭ সুরা বা অধ্যায়ে) বর্ণিত হইয়াছে: 'একদা পয়গম্বর মুসা ভগবানের নিকট তাঁহার চেয়ে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের সন্ধান প্রার্থনা করিলেন—এবং এই সম্পর্কে খিজিরের নাম উল্লিখিত হইল। কথিত আছে, খিজির একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ এবং জীবনামৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। মুসাও সেই অমরত্বলাভের জন্য দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে তাঁহার অনুচরসহ উপস্থিত হইলেন। দেখা গেল যে, মধ্যাহ্নভোজনের জন্য আনীত ভাজা মৎস্যটির কথা তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন এবং মৎস্যটিও স্বাধীন ভাবে জলে সাঁতার দিয়া চলিয়া গেল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মুসা খাবারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিলে অনুচর পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটির কথা বলিল। মুসা আবার সেই সাগর-সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং খিজিরের। দেখা পাইলেন। মুসা আরও জ্ঞান লাভার্থে তাঁহার অনুসরণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু খিজির আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার কার্য্যকলাপ মুসা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না বলিয়া অনেক সময় এই সকল ব্যাপারে ধৈর্য্য ধারণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। মুসা বলিলেন, ভগবৎ ইচ্ছায় আমি সকল বিষয়েই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিব।... অতঃপর তাঁহারা উভয়েই অগ্রসর হইলেই এবং তাঁহাদের ব্যবহৃত নৌকাটিতে খিজির ফুটা করিয়া দিলেন। মুসা বলিলেন, আপনি আরোহীদিগের ব্যবহৃত নৌকাটি সচ্ছিদ্র করিয়া দিয়া বড় অদ্ভুত কাজ করিলেন। খিজির ইহাতে উত্তর দিলেন, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, তুমি আমার কার্য্যকলাপে ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিবে না। মুসা তখন ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। নৌকাটি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন এবং একটি যুবকের সাক্ষাৎ পাইলেন। খিজির যুবকটিকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। মুসা জিজ্ঞাসা করিলেন, একটি নিরীহ যুবককে কেন অনর্থক বধ করিলেন? খিজির আবার তাঁহার পূর্ব্বের বক্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলেন। ইহাতে মুসা ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বলিলেন, আবার যদি এরূপ হয় তাহা হইলে আপনি আর আমাকে আপনার অনুসরণ করিতে দিবেন না। তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া চলিলেন, এবং একটি জনাকীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানকার লোকদের নিকট তাঁহারা খাবার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা ইহাতে মোটেই কর্ণপাত করিল না। নিকটেই একটি দেয়াল ভূমিসাৎ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া খিজির স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহার সংস্কার করিলেন। ইহাতে মুসা প্রশ্ন করিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলেই এই কার্য্য সম্পন্ন করার যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করিতে পারিতেন। খিজির উত্তরে বলিলেন, তোমার এই প্রশ্ন আমাকে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে।

তবে যাইবার পূর্ব্বে আমি আমার কার্য্যকলাপের নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া যাইতেছি। পূর্ব্বোল্লিখিত নৌকাটি ছিল কয়েকজন গরীবের এবং তাহারা এই সাগরেই ব্যবসা করিত। আমি নৌকাটিকে ব্যবহারের অযোগ্য করিবার উদ্দেশ্যেই ছিদ্রযুক্ত করিয়া দেই—কারণ এই নৌকার উপরে ছিল একজন রাজার নজর, যিনি প্রত্যেক ব্যবহারযোগ্য নৌকাই জোর করিয়া লইয়া যাইতেন। যে যুবকটিকে হত্যা করি তার পিতামাতা ছিলেন সৎ, কিন্তু যুবকটি ছিল কাফের—তাহার নিষ্ঠুরতার দরুন সৎ পিতামাতার লাঞ্ছনা হইবার ভয়ে যুবকটিকে বধ করিয়া ফেলি। পরে ভগবৎ কৃপায় একটি সৎ ছেলে হইলে তাহার দ্বারা পিতামাতার অশেষ সুখ হইতে পারে। আর ঐ দেয়ালটি ছিল দুই জন পিতৃমাতৃহীন বালকের—দেয়ালের নীচে ছিল লুক্কায়িত ধনসম্পদ এবং তাহাদের পিতা ছিলেন একজন সৎ লোক। সেইজন্যই ভগবানের ইচ্ছা

খাঁটি ঘি দুষ্প্রাপ্য ... খাঁটি তেল দুর্মূল্য ...

ছিল যেন ছেলে দুইটি সাবালক হইয়া ইহা ভোগ করিতে পারে। যদিও তোমার মনে হইয়াছিল যে, আমি আমার ইচ্ছামতই এই সকল কার্য্যাদি করিয়াছিলাম; কিন্তু মনে রাখিও আমি কোনটিই ভগবানের সঙ্কেত ভিন্ন করি নাই।"

খিজির ও মুসা শ্রেষ্ঠ গুরু-শিষ্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পার্থিব জ্ঞান ও পরমার্থিক জ্ঞানস্বরূপ দুইটি সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে তাহাদের মিলন হয়। মৎস্যটি পার্থিব জ্ঞানের রূপক, ইহা পরমার্থিক জ্ঞানস্বরূপ সমুদ্রে পৌঁছিলে আপনা হইতেই তন্মধ্যে লুপ্ত হইয়া যাইবে। তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণার কোনই খেয়াল থাকে না—কিন্তু জ্ঞান-পথে অগ্রসর হইতে হইলে গুরুর সাহায্য ছাড়া উপায় নাই। সেইজন্য গুরুকরণ। এই বিপৎসঙ্কুল পরমার্থিক জ্ঞানস্বরূপ সমুদ্রপথে গুরু মস্ত বড় কাণ্ডারী। তিনি নৌকারূপ আধ্যাত্মিক উপদেশাদি সাহায্যে এই সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন। অপর পারে পৌঁছিয়া অর্থাৎ পরমার্থিক জ্ঞানশিক্ষা দিয়া পরে নৌকাটিতে প্রেমরূপ ছিদ্র করিয়া দিয়া ইহাকে অপর পারে অবস্থিত রাজা অর্থাৎ এই পার্থিব জগতে বিরাজমান শয়তানের ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া দিলেন। কারণ প্রেম-ভক্তিবিহীন কোন ব্যক্তিরই এই পার্থিব জগতে শয়তানের কবল হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় নাই। আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রথমেই চাই প্রেম ও ভক্তির সহিত গুরুর সদুপদেশ অনুসরণ করিয়া চলা। গুরুর দ্বিতীয় কার্য্য হইল, শিষ্যের কামনা-বাসনা বিনষ্ট করিয়া দেওয়া। যুবকটি কামনা-বসনার প্রতীক। কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ভক্ত আধ্যাত্মিক জীবনে ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিতে পারেন। তৃতীয় স্তরে ভক্ত সাধারণ লোকের উপকারই করিয়া যাইবেন, কিন্তু তাহাদের নিকট কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারিবেন না। খিজির স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ভগ্ন দেয়ালটির সংস্কার করিলেন—দেয়ালটি বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান বা শরিয়ৎ-এর এবং পিতৃমাতৃহীন বালক দুইটি সাধুতার প্রতীক।

মহাত্মাগণ তাহাদের বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদি দ্বারা জনসাধারণকে অনাচার, লুণ্ঠন প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম হইতে দূরে রাখিয়া শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন।

মৌলানা রুমীর 'মস্-নবী-ই-মন 'বী' নামক আধ্যাত্মিক কবিতা হইতে সুফীতত্ত্বপূর্ণ একটি গল্পেরও উল্লেখ করা গেল। 'মস্-নবী-ই-মন'বী'কে অনেক সময় ফারসী ভাষার কোরাণ বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং ইহা সুফীতত্ত্বের ব্যাখ্যাপূর্ণ একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহার প্রথম গল্পটির নাম 'রাজা ও সুন্দরী যুবতী'।—প্রাচীনকালে এক রাজা ছিলেন, যাঁহার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় শক্তিই করায়ত্ত ছিল। হঠাৎ এক দিন তিনি পারিষদসহ শিকারে বাহির হইলেন, কিন্তু পথিমধ্যে একটি সুন্দরী যুবতীর প্রেমে পড়িলেন। যুবতীর প্রতি তাঁহার মন এত গভীরভাবে আকৃষ্ট হইল যে, তাহাকে তিনি রাজধানীতে লইয়া আসিলেন এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু শীঘ্রই যুবতীর একটি দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা দিল। অনেক চিকিৎসকই তাহার চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু যুবতী আরোগ্য-লাভ করিলেন না। গত্যন্তর না দেখিয়া রাজা মসজিদে গিয়া ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবান তাঁহার এই কাতরোক্তি শুনিতে পাইয়া স্বপ্নে তাহাকে জানাইলেন, "পরদিন প্রাতঃকালে যে চিকিৎসকের সঙ্গে তোমার প্রথম দেখা হইবে তাঁহাকে ভগবৎপ্রেরিত চিকিৎসক বলিয়া জানিবে"। নির্দ্দিষ্ট সময়ে দৈব-চিকিৎসক উপস্থিত হইলেন এবং রাজা তাহাকে সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। দৈব-চিকিৎসক নির্জ্জন গৃহে রোগিণীকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিলেন, এবং রাজাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, ইহা মনের রোগ; ঔষধাদিতে কোন কাজ হইবে না। এই যুবতী সমরখন্দের একজন স্বর্ণকারের প্রতি প্রণয়াসক্তা। সেই স্বর্ণকার যুবককে আনাইয়া রোগিণীর সহিত তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। চিকিৎসকের আদেশ অনুযায়ী স্বর্ণকারকে দূরদেশ হইতে আনয়ন করা হইল এবং যুবতীর সহিত পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করা হইল। শীঘ্রই যুবতী পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু কয়েকদিন পর ভগবৎ ইচ্ছানুযায়ীই সেই দৈব-চিকিৎসক পানের সহিত বিষপ্রয়োগে সেই স্বর্ণকারের প্রাণনাশের ব্যবস্থা করিলেন। সেই যুবতী প্রথমে হৃদয়ে বেশ একটু বেদনা অনুভব করিলেন। কিন্তু স্বর্ণকারের প্রতি তাহার আকর্ষণ কেবল মাত্র দৈহিক ছিল বলিয়া তিনি একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন না এবং পরে রাজার সহিত পুনরায় বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এই গল্পটিতে একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বনিহিত আছে। রাজাকে তুলনা করা হইয়াছে মনের সঙ্গে এবং এই দেহ তাহার রাজধানী। মন পার্থিব ও আধ্যাত্মিক এই উভয় শক্তিতেই শক্তিমান। অর্থাৎ সকল মানুষই দোষে গুণে জড়িত। রাজা একদিন শিকারে বাহির হইলেন অর্থাৎ ভগবৎ জ্ঞানলাভার্থে বহির্গত হইলেন। কিন্তু সেই পারিষদ-মিত্র বা মনের সহচর অহঙ্কার, কাম প্রভৃতি রিপুর প্ররোচনায় পথিমধ্যে কামনা-বাসনায় জড়িত হইয়া ভোগাসক্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বেশীদিন ভোগ করিতে পারিলেন না। যুবতীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল—চিকিৎসকগণ হইলেন পার্থিব গুরুর প্রতীক। পার্থিব গুরুগণ, তাঁহাদের বুদ্ধি, মেধা ও চিন্তাশক্তিদ্বারা কেমন করিয়া মনের রোগ আরোগ্য করিতে পারিবেন? যখন রাজা (বা মন) দেখিলেন যে, এই সকল চিকিৎসকদ্বারা কোনই ফলোদয় হইতেছে

না, তখন তিনি ভগবানের প্রতি নির্ভরপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে সকল বিপদের কথা জানাইলেন। মানুষ যখন ভগবানকে আশ্রয় করে, তখন একটা উপায় খুঁজিয়া পাইবেই। ভগবানের প্রেরিত চিকিৎসকের অর্থাৎ আদর্শ গুরুর সাহায্যে তিনি জানিতে পারিলেন যে, কামনার বিকার উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং প্রথমে তিনি কামনার পার্থিব পরিতৃপ্তিলাভের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দৈব চিকিৎসক প্রথমই রাজার সকল অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু বাহ্যিক ভাবে রোগিণীকে পরীক্ষা করিলেন। সেই রূপ আদর্শগুরু প্রথম দৃষ্টিতেই শিষ্যের মনের সকল অবস্থা বুঝিতে পারেন, কিন্তু বাহ্যতঃ তাহা প্রকাশ করেন না। যুবতীর মন নীচ প্রবৃত্তিসমূহের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে—তিনি বাসনা সকল আরও চরিতার্থ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে বাসনাসমূহ চরিতার্থ করিবার পর, গুরু ভগবৎ আদেশানুযায়ী প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন—ইহাই হইল বর্ণকারের প্রাণনাশের তাৎপর্য্য। পরে দমিত কাম মনের সহিত একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া শান্তির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অধ্যাপক সাহার আধুনিক গবেষণা

শ্রীপিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের বিদগ্ধ সমাজে ও জগতের বৈজ্ঞানিক মহলে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা অপরিচিত নন। নামের সঙ্গে পরিচিত হলেও তাঁর গবেষণার জটিল তথ্য অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের মধ্যে অতি অল্প লোকেই জানেন এবং সেই তথ্য সাধারণ মানুষের সহজবোধ্য করে পরিবেশন করাও দুষ্কর। এক কথায় বলা যেতে পারে, সৌরলোকে পরমাণুদের ভাঙা-গড়ার ব্যাখ্যা নিয়েই হ'ল অধ্যাপক সাহার আধুনিক গবেষণা। সম্প্রতি দু'জন চৈনিক বিজ্ঞানীর পরীক্ষামূলক গবেষণার ফলে অধ্যাপক সাহার গবেষণার মূলতত্ত্ব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। অনেকে মনে করেন, অধ্যাপক সাহার গবেষণাকে বিজ্ঞানীরা যদি মানুষের কাজে লাগাতে পারেন তা হলে বর্তমানের পরমাণু বোমার চেয়ে বহু গুণ শক্তিশালী মারণাস্ত্র তৈরি করা সম্ভব হবে।

সূর্য্যের 'বর্ণচ্ছটা-মণ্ডল' ও কিরীটিকায় (করোনা) কয়েকটি মৌলের বিশেষ বর্ণালী-রেখার বা স্পেকট্রাম লাইন উদ্ভবের ব্যাখ্যা অধ্যাপক সাহা তাঁর আধুনিক গবেষণায় করেছেন। গ্যাসদেহী সূর্য্যকে মোটামুটি ভাবে চারটি মণ্ডলে ভাগ করা যায়। সূর্য্যের অন্তরতম মণ্ডলকে বলা হয় আলোকমণ্ডল বা ফটোস্ফিয়ার। সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলে গ্যাসের ঘনিমা (density) ও তাপের উষ্ণতা সবচেয়ে বেশী এবং সূর্য্যের প্রায় সমস্ত আলোক-তাপই আলোকমণ্ডল থেকে বিকীর্ণ হয়। আলোকমণ্ডলের ঠিক বাহিরের স্তরটিকে বলা হয় 'রেখা-হর' বা 'বর্ণ-হর' মণ্ডল ('রিভার্সিং লেয়ার'), কারণ এই মণ্ডল অতিক্রম করবার সময় সূর্য্যের সপ্ত-বর্ণী আলোর বিভিন্ন বর্ণের বিশেষ বিশেষ তরঙ্গমাত্রার আলো শোষিত হয়ে যায় ও তার ফলে সৌর-বর্ণালীতে ফ্রানহোফার (Fraunhofer) আবিষ্কৃত কালো রেখাগুলির উদ্ভব হয়। বর্ণ-হর মণ্ডলে গ্যাসের ঘনিমা ও তাপের উষ্ণতা, আলোকমণ্ডলের গ্যাসের ঘনিমা ও তাপের উষ্ণতার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম। রেখা-হর-মণ্ডলের বাইরের অংশটিকে বলা হয় বর্ণচ্ছটা-মণ্ডল ('ক্রোমো-স্ফিয়ার')। বর্ণচ্ছটা-মণ্ডল হ'ল সৌর-আবহের ক্ষুদ্র স্তর। এখানে গ্যাসপুঞ্জে নিয়তই প্রচণ্ড আলোড়ন চলে এবং আলোড়িত গ্যাসপুঞ্জের বহুবিচিত্র রক্তশিখা এখান থেকে সূর্য্যের চক্রসীমা ছাড়িয়ে বহু যোজন দূরে ছিটকে পড়ে। বর্ণচ্ছটা-মণ্ডলে তাপের উষ্ণতা ও গ্যাসের ঘনিমা বর্ণ-হর মণ্ডলের চেয়েও কম এবং বর্ণচ্ছটা মণ্ডল থেকে ছিটকে

পড়া গ্যাসের শিখায় অন্যান্য মৌলের পরমাণুর চেয়েও হিলিয়ম, হাইড্রোজেন ক্যালসিয়মের আয়নিত ('আইওনাইজড') পরমাণুর আধিক্য সবচেয়ে বেশী।

অধ্যাপক সাহার মতে সূর্য্যের অন্তরতম প্রদেশ থেকে আলো ও তাপ-রূপে বিকীর্ণ তেজের কণা-ধর্ম্মী 'কণিমার' ('ফোটন') সঙ্গে বর্ণচ্ছটা মণ্ডলে গ্যাসের পরমাণুগুলির নিয়তই 'অভিঘাত' চলেছে এবং তেজ-কণিমার সঙ্গে অবিরাম অভিঘাতের চাপে হাইড্রোজেন, হিলিয়মের মত হাল্কা ওজনের মৌলের পরমাণুগুলি প্রতিক্ষিপ্ত (রিকয়েলড) হয় সবচেয়ে বেশী, সৌর মহাকর্ষের টান কাটিয়ে সবচেয়ে দূরে ছিটকে পড়ে। প্রতিক্ষিপ্ত পরমাণুগুলি সূর্য্যের মহাকর্ষের টানে যখনই বর্ণচ্ছটা মণ্ডলে ফিরতে চাইবে তখনই আলো, তাপের কণিমার সঙ্গে ঠোকাঠুকির চাপ আবার তাদের বাইরে ঠেলে দেবে। এই ভাবে গ্যাসের শিখার ফুৎকার সূর্য্যের বর্ণচ্ছটা মণ্ডলে আলোড়িত হয়। ছোট ছেলে যেমন এক টুকরো পালক বা তুলোর আঁশকে ফুঁ দিয়ে মাটিতে পড়তে না দিয়ে হাওয়ায় নাচিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায় অনেকটা সেই ধরণেই তেজের কণিমাগুলি বর্ণচ্ছটা মণ্ডলে পরমাণুগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ক্যালসিয়ামের (শথমাল) ইলেকট্রন খোয়ানো, আয়নিত (আইওনাইজড) পরমাণুগুলি তাদের প্রায় সমতার, মাঝারি ওজনের অন্যান্য মৌলের পরমাণুগুলির চেয়ে একটি বিশেষ তরঙ্গ-মাত্রার আলো অধিক মাত্রায় শোষণ করতে পটু হয়ে ওঠে। অধ্যাপক সাহার মতে অন্যান্য মাঝারি ওজনের পরমাণুযুক্ত মৌলদের চেয়ে আয়নিত ক্যালসিয়ম পরমাণুগুলির ওপরেই বিকিরণের চাপ (রেডিয়েশন প্রেসার) তাই বেশী প্রকট হয় এবং তার ফলে অন্যান্য মৌলগুলির চেয়ে বর্ণচ্ছটা মণ্ডলের শিখা-ছটায় (প্রমিনেনসেস্) ক্যালসিয়ম বহু দূরে বিক্ষিপ্ত হয়। ক্যালসিয়মের প্রাচুর্য বেশী বলে সূর্য্যের শিখা-ছটায় রঙ প্রায় সব ক্ষেত্রেই হয় জবাকুসুমসঙ্কাশং রক্ত-লোহিত।

বর্ণচ্ছটা মণ্ডলের আলোর বর্ণলিপিতে আয়নিত ক্যালসিয়ম পরমাণুর বৈশিষ্ট্যসূচক রেখা ছাড়া যথাক্রমে একটি ও দুটি ইলেকট্রন খোয়ানো উত্তেজিত (একসাইটেড) হিলিয়ম পরমাণুর বৈশিষ্ট্যসূচক রেখাও পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা এতদিন পর্য্যন্ত সেগুলির উদ্ভবের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। অধ্যাপক সাহার আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী এর ব্যাখ্যা হ'ল নিম্নোক্তরূপ—সূর্য্যের আলোকমণ্ডলের মধ্যে বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলির কেন্দ্রের যে ভাঙাগড়া চলে তার ফলে প্রচুর পরিমাণে শক্তি ছাড়া পায় এবং তৈরি হয় দুটি ইলেকট্রন খোয়ানো হিলিয়ম পরমাণু অর্থাৎ আল্‌ফা-কণা (আল্‌ফা-

পার্টিকেল)। পরমাণুগুলির কেন্দ্রের আঘাতজাত ইলেকট্রন খোয়ানো উত্তেজিত হিলিয়ম পরমাণুগুলি অন্যান্য পরমাণুগুলির অভিঘাতের ফলে তাদের উত্তেজিত অবস্থায় অনেকখানি শক্তি অপচিত করে প্রথমে একটি ও তারপর দুটি ছাড়া-পাওয়া ইলেক্ট্রন পাকড়াও করে। এই দুটি মুক্ত ইলেকট্রন সংগ্রহ করবার সময় উত্তেজিত অবস্থায় হিলিয়ম পরমাণুগুলি যে বর্ণলিপি পাঠায় তারই ফলে পূর্বোক্ত রেখা দুটির উদ্ভব হয়।

সূর্য্যের বহির্মণ্ডলের নাম হ'ল সৌর কিরীটিকা বা কিরীটিকা-মণ্ডল (সোলার-করোনা)। বহু লক্ষ যোজন জুড়ে এর বিস্তার এবং সূর্য্যের অন্য তিনটি মণ্ডলের তুলনায় এখানে গ্যাসের ঘনিমা ও তাপের উষ্ণতা সবচেয়ে কম। সৌর-কিরীটিকা জলদবাষ্পের অণু, পরমাণু ও আয়নিত পরমাণু-কণার ভিড়ে ভর্তি এবং এর স্বাভাবিক দীপ্তি প্রায় পূর্ণচন্দ্রের দীপ্তির সমান। সূর্য্যের আলোকমণ্ডলের প্রচণ্ড দীপ্তির জন্য সাধারণ দূরবীনের দৃষ্টিতে আলোক-মণ্ডল ছাড়া তার অন্যান্য মণ্ডলগুলিকে দেখা যায় না। সাধারণ দূরবীন দিয়ে সূর্য্যের বর্ণচ্ছটা মণ্ডল ও সৌর কিরীটিকা দেখতে হলে পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কিরীটিকা থেকে বিকীর্ণ আলোর বর্ণলিপির প্রথম পাঠোদ্ধারের সময় বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে, সূর্য্যের সর্ববর্ণ আলোকের একটানা বর্ণালীর (কন্টিনিউয়াস্ স্পেকট্রাম) বদলে কয়েকটি বিশেষ তরঙ্গমাত্রার আলোকের উজ্জ্বল রেখা কিরীটিকার বর্ণালীতে (স্পেকট্রাম) ফুটে উঠেছে। বিজ্ঞানীরা এই নবাবিষ্কৃত রেখাগুলিকে তাঁদের জানা ও এতাবৎ আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থগুলির বৈশিষ্ট্যসূচক রেখাগুলির সঙ্গে তখন মেলাতে পারেন নি এবং মেলাতে না পেরে রেখাগুলিকে কিরীটিকা মণ্ডলের একটি অজানা মৌলের বৈশিষ্ট্যসূচক বলে মনে করেন আর সেই অজানা মৌলটির নাম রাখেন করোনিয়াম বা মুকুটিকা মৌল। এর পর ১৯৪২ সালে সুইডেনের লুণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী বেঙ্গট এডলেনের (Bengt Edlen) গবেষণার ফলে জানা যায়, কিরীটিকার বর্ণলিপিতে (স্পেকট্রাম) আবিষ্কৃত উজ্জ্বল রেখাগুলি লোহা, নিকেল, ক্যালসিয়ম ও আরগণ—এই চারিটি মাঝারি ওজনের মৌলদের ইলেকট্রন খোয়ানো পরমাণুগুলিরই বর্ণলিপির বৈশিষ্ট্যসূচক এবং মুকুটিকা (করোনিয়ম) বলে কোন নূতন অজানা মৌলের নয়। তাঁর মতে মুকুটিকা বলে কোনও মৌল সৌর-কিরীটিকায় থাকতে পারে না—মুকুটিকার অস্তিত্ব কাল্পনিক। লোহা, নিকেল, আরগণ ও ক্যালসিয়ামের ইলেকট্রন খোয়ানো উত্তেজিত পরমাণুগুলি মাত্র বিশেষ অস্থায়ী অবস্থায় (মেটাষ্টেবল ষ্টেট) কতকগুলি নির্দিষ্ট তরঙ্গমাত্রা আলো করায় তবেই কিরীটিকার বর্ণলিপিতে আবিষ্কৃত রেখাগুলির উদ্ভব হয়। সৌর কিরীটিকার বর্ণালীতে যথাক্রমে দশটি, এগারটি, তেরটি, চৌদ্দটি ও পনেরটি ইলেকট্রন খোয়ানো লোহার পরমাণুর, বারোটি, তেরটি ও পনেরটি ইলেকট্রন খোয়ানো ক্যালসিয়ম পরমাণুর এবং দশটি ও চৌদ্দটি ইলেকট্রন খোয়ানো আরগন পরমাণুর বৈশিষ্ট্যসূচক মোট চৌদ্দটি উজ্জ্বল রেখার সন্ধান বর্তমানে পাওয়া গেছে। বেগুনী পারের আলো থেকে সুরু করে লাল-উজানী আলো পর্য্যন্ত প্রায় সকল বর্ণের আলোর এলাকায় এই রেখাগুলির তরঙ্গমাত্রা ছড়িয়ে আছে। এখন প্রশ্ন হ'ল হাইড্রোজেন, হিলিয়ম পরমাণুগুলির চেয়ে বহু গুণ ভারী লোহা, নিকেল, ক্যালসিয়ম ও আরগনের পরমাণুগুলি কোন প্রচণ্ড শক্তির ধাক্কায় এতগুলো করে ইলেকট্রন খোয়ানো এবং সূর্য্যের অন্তরতম মণ্ডলের সীমা ছাড়িয়ে মহাকর্ষের প্রচণ্ড টান এড়িয়ে কয়েক লক্ষ মাইল উঁচুতে উঠল, কিরীটিকায় দেখা দিল, এবং আপনাদের বৈশিষ্ট্যসূচক বর্ণলিপির উজ্জ্বল রেখাগুলি উত্তেজিত হয়ে বিকিরণ করতে লাগল। শুধু তেজ-কণিকাদের ধাক্কায় এত শক্তি তাদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব। এই প্রচণ্ড শক্তির উৎস কোথায়?

তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণায় অধ্যাপক সাহা এই প্রশ্নের মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক সাহার সিদ্ধান্ত অনুসারে সূর্য্যের আলোকমণ্ডলের সীমান্তে ইউরেনিয়ম পরমাণু নিউট্রন অভিঘাতে (নিউট্রন-বোম্বার্ডমেন্ট) চার ভাগে ভেঙে যাচ্ছে এবং এই ভাঙনের ফলে তৈরি হচ্ছে লোহা, নিকেল, ক্যালসিয়ম ও আরগনের ইলেকট্রন খোয়ানো পরমাণু আর সেই সঙ্গে ছাড়া পাচ্ছে অপরিমেয় শক্তি। আধুনিক পরমাণু-বোমায় ইউরেনিয়ম পরমাণু মাত্র দু'ভাগে ভাঙা যায়। কাজেই অধ্যাপক সাহার প্রকল্প অনুযায়ী সৌরলোকে

ইউরেনিয়মের ভাঙনের শক্তি পরমাণু-বোমার চেয়ে কত বেশী সেটা সহজেই অনুমেয়। ইউরেনিয়ম পরমাণু চুরমার হয়ে ভাঙার পর যে অমিত শক্তি ছাড়া পায় তারই অভিঘাতে লোহা, নিকেল, ক্যালসিয়ম ও আরগন এই চারটি মৌলের প্রত্যেকটিরই পরমাণু চৌদ্দ থেকে ষোলটি পর্য্যন্ত ইলেকট্রন খুইয়ে উত্তেজিত হয়, সৌর মহাকর্ষের টান এড়িয়ে প্রচণ্ড বেগে আলোক-মণ্ডলের কয়েক লক্ষ মাইল উপরে কিরীটিকায় ওঠে। সেখানে মৌলগুলির ইলেকট্রন খোয়ানো পরমাণুগুলি ধীরে ধীরে তাদের খোয়ানো ইলেকট্রনগুলিকে পাকড়াও করতে সুরু করে এবং এই আয়নিত অস্থায়ী অবস্থার উত্তেজনার তেজ ছেড়ে দিয়ে তার বৈশিষ্ট্যসূচক তরঙ্গ-মাত্রার আলো বিকিরণ করে বর্ণলিপিতে আপন অস্তিত্বের সন্ধান দেয়। অধ্যাপক সাহার গবেষণা বহু বিরুদ্ধ সমালোচনার নিরসন করে কিরীটিকার বর্ণালীর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করেছে এবং কিরীটিকার বহির্মণ্ডলের গঠন ও বৈশিষ্ট্যের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। অধ্যাপক সাহার মতে দ্রুত-নির্গামী (র‍্যাপিড্ লি-এস্কেপিং) অতি বেগবান (হাই-স্পীড) ইলেকট্রনগুলির বেগ দিয়ে কিরীটিকার বহির্মণ্ডলটি তৈরি হয়েছে এবং বর্ণচ্ছটা মণ্ডলের উপরের স্তরে লোহা ও নিকেলের বেশী ইলেকট্রন খোয়ানো পরমাণুদের সঙ্গে সৌর মণ্ডলের অন্যান্য মৌলগুলির পরমাণুর সংঘর্ষ ঘটার ফলেই এই অতি বেগবান ইলেকট্রনগুলি ছাড়া পায়।

হাল আমলের খবর হ'ল—চীনা বিজ্ঞানী ইং-সিয়েন-সান-সিয়াংগ (Tsien-San-Tsiang) এবং তাঁর পত্নী শ্রীযুক্তা হো-জাহ্-উই (Ho-zah-Wei) বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী জোলিও কুরীর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে, ইনিস্টিটিউট অফ্ ন্যুক্লিয়ার গবেষণাগারেই রাসায়ণিক উরেনিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রের ত্রি এবং চতু-ভাঙনের (tri and quadri fission) অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন। এই চীনা বৈজ্ঞানিক-দম্পতির গবেষণার ফলে অধ্যাপক সাহার সৌরকিরীটিকা সংক্রান্ত আধুনিক সিদ্ধান্ত সত্য বলে সমর্থিত হওয়ায় বিজ্ঞানীমহলে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছে।

পুস্তক-পরিচয়

দিল্লীশ্বরী (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।
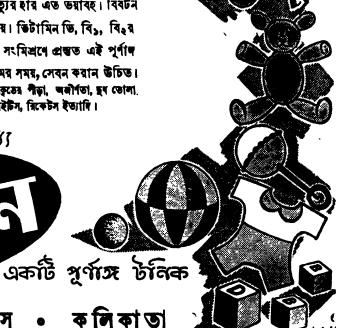
গ্রন্থকার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম মহারথী। তিনি আচার্য্য যদুনাথের প্রবীণতম শিষ্য। ইতিহাসকে সরস প্রাণস্পর্শী সাহিত্যের রূপ দান করিতে ব্রজেন্দ্রবাবু সিদ্ধহস্ত, তাঁহার প্রণীত 'বেগম সমরু', 'জহান্‌-আরা' 'মোগল-বিদুষী' একাধারে উত্তম সাহিত্য অথচ নিখুঁৎ ইতিহাস। বর্ত্তমান পুস্তক 'দিল্লীশ্বরী'-র প্রথম সংস্করণ ১৩৩০ সালে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার "নিবেদনে" তিনি লিখিয়াছিলেন—"যাহাতে ইতিহাসের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, সেইজন্য ইতিহাসের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়াও রচনা যথাসম্ভব সরস করিবার চেষ্টা করিয়াছি।" বলা বাহুল্য, ব্রজেন্দ্রবাবুর এই দুরূহ প্রয়াস সফল হইয়াছে।

'দিল্লীশ্বরী' পুস্তক সুলতানা রজিয়ৎ এবং সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ঐতিহাসিক চিত্র—সূক্ষ্ম এবং সুনিপুণ, অথচ সরস ও সুপাঠ্য। রজিয়ৎ সত্যই সাহস, কূটনীতি এবং শাসনদক্ষতায় আলতামাশের সন্তানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু যুগধর্ম্ম ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল তাঁহার প্রতিকূল।

ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, কর্ণাল জেলার কইথাল নামক স্থানে সম্রাজ্ঞী রজিয়ৎ 'তৃণতলে চিরসমাধি' লাভ করিয়াছেন। এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। কইথালে তিনি নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু উহার পরে ঐ শবদেহের কি গতি হইল ইতিহাসে লেখা নাই। অতি-বড় দুশমন্ হইলেও আলতামাশের পুত্রগণ ভগ্নীর মৃতদেহ ঐ স্থানেই ফেলিয়া আসিয়াছিল কিংবা মাটি চাপা দিয়াছিল অনুমান করা যায় না। বর্ত্তমানে পুরানা অর্থাৎ শাহজাহানের দিল্লী শহরের "তুর্কমান দরওয়াজা"-র কাছে ভদ্র ব্যক্তি—বিশেষতঃ হিন্দুর পক্ষে অগম্য এক মহল্লায় একটি সাধারণ মকবরা আছে, উপরে ছাদ নাই। এইখানে দুইটি কবর আছে, স্যর সৈয়দ্ আহমদ তাঁহার 'আসার উস-সনাদিদ' নামক পুরাবৃত্ত-গ্রন্থে এইগুলিকে আলতুনিয়া ও রজিয়ৎ-এর সমাধি লিখিয়াছেন; বোধ হয় জনশ্রুতিই প্রমাণ। আমি একবার মুসলমানের ছদ্মবেশে মহল্লার ছেলেদের মধ্যে কয়েকটি দুয়ানি বিতরণ করিয়া সম্রাজ্ঞীর কবরে "জিয়ারত" করিতে গিয়াছিলাম। রজিয়ৎকে যাহারা সোনা-জহরতের লোভে খুন করিয়াছিল তাহারা জাট-চাষা, ইতিহাসে অবশ্য লেখা আছে "হিন্দু-জমিদার"—যাহা ব্রজেন্দ্রবাবু ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় "হিন্দু-জমিদার" পদবী এক বিশিষ্ট অভিজাত-শ্রেণীর পক্ষে প্রযোজ্য। দিল্লী কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে কৃষক নিজেকে কাশ্‌তকার বলিয়া পরিচয় দেয় না, বুক ফুলাইয়া বলে "জিমীদার", ধরতী-কা মালিক; ফার্সীতে কৃষক অর্থে এই হিন্দুস্থানী শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। চষা ক্ষেতের পাশে নিদ্রিত স্ত্রীলোককে চাষা ব্যতীত আর কেহ খুন করিতে পারে না—"হিন্দু কৃষক" বলিলে সব দিক রক্ষা হয়।

'দিল্লীশ্বরী' পুস্তকের দ্বিতীয় চরিত্র "নূরজহান্" (পৃ ৪৩ হইতে ৯০)। সুন্দরী নূরজহানের ঐতিহাসিক পরিচয় অনাবশ্যক। তাঁহার জীবন-চরিত এত সংক্ষেপে অথচ সুষ্ঠুভাবে লেখা কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ব্রজেন্দ্র বাবুর 'দিল্লীশ্বরী' শুধু ছেলেরা নয়, ছেলেদের অভিভাবকেরাও পড়িবেন, পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবেন। শুধু বাংলা ভাষা নয়, ইংরেজীতেও নূরজহানের এইরূপ স্বয়ং-সম্পূর্ণ কাহিনী এবং চরিত্র-সমালোচনা লিপিবদ্ধ হয় নাই।

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

নমামি—শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী। প্রকাশক—বিমলারঞ্জন চন্দ্র, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। ৭৮ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তিকায় বাংলার বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী যুগের এমন কয়েকটি চিত্র আঁকা হইয়াছে, যাহা ঐ যুগের মাহাত্ম্যকে আমাদের চোখের উপর নূতন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে। গল্পচ্ছলে কয়েকজন বিপ্লবী-প্রধানের কার্য্য-কলাপ বর্ণনা করিয়া লেখক তাঁহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও সময়কে পাঠকবর্গের নিকট জীবন্ত করিয়াছেন; আমরা সেই যুগের বিপ্লবীদের মনোভাবের যে পরিচয় পাই, বলার কৌশলে তাহা যে-কোন দেশের পক্ষে শ্লাঘনীয়।

প্রথম বর্ণনাটি "মহারাজ" নামে পরিচিত শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জীবনের ঘটনা-সংশ্লিষ্ট; তিনি নৌকার মাঝিরূপে, কালীচরণ নমামি (নমঃশূদ্র) রূপে—"ছোট জাত"-রূপে, বাঙালীর স্মৃতিতে অমর হইয়া থাকিবেন। "স্বদেশী" ডাকাতির প্রয়োজনে তাঁহাকে এই নূতন বৃত্তিতে হাত পাকাইতে হইয়াছিল, চলাফেরা কথাবার্ত্তায় তিনি "নমামি" হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এমন করিয়া ইংরেজের চক্ষে অনেক সময় ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিতেন।

প্রত্যেকটি বর্ণনা এক এক জন বাঙালী, অবাঙালী বিপ্লবীর জীবন-কথার উপর আলোকপাত করে। বীরভূম জিলার দুকড়িবালা "মাসী"র আত্মভোলা কার্য্য কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের মহত্বের পরিচায়ক নহে, সেই যুগের মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজের প্রায় প্রতি ঘরে এরূপ মা, মাসী, দিদি, ঠাকুরমা, দিদিমা, এবং পত্নী বিরাজ না করিলে বিপ্লবী আন্দোলন ত্রিশ বৎসর টিকিয়া থাকিত না। গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জানাইতেছি—তিনি সেই যুগের হিন্দু বাঙালীর চিন্তা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার একাংশের ছবি বর্ত্তমান যুগের পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার ভাণ্ডার শূন্য হয় নাই; আমরা তাহা হইতে আরও দানের প্রতীক্ষায় থাকিব।

রাজনারায়ণ বসু—শ্রীশৈলেন্দ্র সিংহ ও শ্রীমিহিরবরণ সিংহ, ওরিয়েণ্ট বুক কোং, ৯নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৬২ পৃষ্ঠা। মূল্য বার আনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীশৈলেশ বসু। ওরিয়েণ্ট বুক কোং, ৭৫ পৃষ্ঠা। মূল্য বার আনা।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষ। ওরিয়েণ্ট বুক কোং। ৭৫ পৃষ্ঠা। মূল্য বার আনা।

শহীদ যুগল—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়। বি, সিংহ ব্রাদার্স, ৩৮নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ২৫২। মূল্য দুই টাকা বার আনা।

মহামানব—শ্রীশৈলেশ বসু। ওরিয়েণ্ট বুক কোং। ৯নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৮৮ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

এই পাঁচখানি বইয়ে ভারতবর্ষের এক শত বৎসরের ইতিহাসের পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, পাঁচ জন বাঙালী ও একজন গুজরাটীর জীবনের ঘটনা আশ্রয় করিয়া। রাজনারায়ণ বসু হইতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী পর্য্যন্ত বহু জনের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনিয়াছে। তার পূর্ব্বকথা রাজনারায়ণ বসুর জীবন-চরিতেই পাওয়া যাইবে—রামমোহন রায় হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-কথায় বর্ণনার মধ্যে।

যদিও পুস্তক কয়খানি বালক-বালিকার জন্য লিখিত, তথাপি তাহাদের পূর্ব্বজগণও ইহা পাঠ করিয়া জ্ঞান এবং আনন্দ লাভ করিবেন। ইংরেজী শিক্ষা আমাদের মধ্যে একটা মোহের সৃষ্টি করে; ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্বের উপর বিশ্বাস আমাদের মনে শিকড় গাড়িয়া বসে, আমাদের জাতীয় হীনতা আমরা স্বীকার করিয়া লই। রাজনারায়ণ বসু সেই "Young Bengal", Young Bombay"—"যুবক বাঙালী", "যুবক বোম্বাইয়ের" নেতৃস্থানীয় ছিলেন। কিন্তু বিশ বৎসর যাইতে না যাইতেই এই শ্রেণীর মধ্য হইতেই "বিদ্রোহী" দলের উদ্ভব হইল, যাদের কার্য্যের পরিণতি দেখিলাম ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে।

প্রথম তিনখানি বইয়ে এই বিদ্রোহের ভাব-নায়ক, কবি, ও চিন্তা-নায়কের জীবন-কথা বর্ণিত হইয়াছে, তৃতীয় পুস্তকখানি সন্ত্রাসবাদী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকির জীবনের তিনটি বৎসরের কীর্ত্তি-কথায় পূর্ণ। অল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন ক্ষুদিরাম জীবনের সব দুঃখ আস্বাদ করিয়া হইয়াছিল "নীলকণ্ঠ"; প্রফুল্ল চাকির মধ্যে দেখিতে পাই রুদ্রের বহিঃপ্রকাশ। এই দুই জনের জীবনে জাতীয়তাবাদের যে আবেগ বাঙালী-সমাজের বুক হইতে ফুটিয়া উঠে, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছিল ১৮৯৭ খ্রীঃ মহারাষ্ট্রের দামোদর চাপেকারের মত যুবককে অবলম্বন করিয়া। বাংলাদেশ হইতে তাহা দিকে দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

এই "বিদ্রোহের" পিছনে যে সমাজ-মন সক্রিয় হইয়া উঠিতেছিল, তার জমি আবাদ করিয়াছিলেন রাজনারায়ণ বসু-প্রমুখ মনীষীবৃন্দ; তাহাতে ত্যাগ ও কর্ম্মসাধনার ফসল ফলাইয়াছিলেন "মহামানব" উপাধিতে ভূষিত নরপুঙ্গব। তাঁহার জীবন্ত উদাহরণে দেশের গণ-মনে যে ভাব-গঙ্গার আবির্ভাব হয়, তার বুকে আমাদের জাতীয় তরণী নানা বাধা অতিক্রম করিয়া রাষ্ট্রীয় মুক্তির ঘাটে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু যাত্রা তার শেষ হয় নাই। এই পাঁচখানি পুস্তকে বর্ণিত ভাব ও কর্ম্মের প্রয়োজন এখনও আছে। তাহা নানা লোকের দেহ মন আশ্রয় করিয়া নব রূপ পরিগ্রহ করিবে। সেইজন্য তৎসম্বন্ধে জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হইবে। এই পুস্তক কয়খানির প্রকাশকবৃন্দ আমাদের দেশের ভাবী সংগঠকমণ্ডলী মধ্যে জ্ঞানবিস্তারে সাহায্য করিয়া এক বিশেষ অভাব মোচনে অগ্রণী হইয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ। অনেক অপ্রকাশিত ছবি সন্নিবিষ্ট হওয়াতে বইগুলির সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে।

এত প্রশংসার মধ্যে একটি অপ্রশংসার কথা না বলিয়া পারিলাম না। এরূপ পুস্তকে মুদ্রাকর-প্রমাদ বলিয়া পরিচিত ত্রুটির বাহুল্য বাঞ্ছনীয় নয়। বানানে ভুলও অনেক আছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

মার্ক্সবাদ—হুমায়ুন কবির। গুণ্ড রহমান এণ্ড গুপ্ত। পি১৩, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১০৭, মূল্য ২৷৷০।

ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "মার্ক্সবাদকে জানতে এবং বুঝতে হলে তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই। কিন্তু যেন তার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত বা বক্তব্যকে ধ্রুব সত্য মনে করবার মতন মোহে পরিণত না হয়।" মার্ক্সবাদ আলোচনায় গ্রন্থকার এই শ্রদ্ধা সর্ব্বত্র বজায় রাখিয়াছেন এবং তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের মতামত বিশ্লেষণ করিয়া মার্ক্সবাদের মর্ম্ম বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মার্ক্সীয় দর্শন, ঐতিহাসিক জড়বাদ, ধনতন্ত্র ও শ্রেণীসংগ্রাম এবং শ্রমিকরাজ ও সাম্য-বাদ এই চারিটি অধ্যায়ে বর্ত্তমান পুস্তক সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে মার্ক্সবাদের দার্শনিকতা কোথায় ও কেন তাহা হেগেলের বিজ্ঞানবাদ হইতে পৃথক পথে গিয়াছে তাহাই দেখানো হইয়াছে। সোজা কথায় হেগেলের শেষ সিদ্ধান্ত মার্ক্সের দার্শনিক বিচারের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা। হাজার বৎসরের ইউরোপীয় বিজ্ঞানবাদী দর্শনের পরিণতি ঘটিয়াছে হেগেলীয় দর্শনে আর তাহার মোড় ফিরিয়াছে কার্ল মার্ক্সের বিপ্লবী চিন্তায়। ঐতিহাসিক জড়বাদও এ চিন্তাধারার পরিণতি মাত্র। মার্ক্সবাদীর মতে বাস্তবের ভিত্তি জড় পদার্থ। সমাজ প্রকৃতির অংশ। প্রচলিত উৎপাদন-বিধি মানুষের সামাজিক, ঐতিহাসিক সত্তা নির্দ্ধারিত করে, এই মানুষই সমস্ত কল্পনা ও ধারণার স্রষ্টা। সুতরাং পরোক্ষে উৎপাদন-বিধিই সমস্ত দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের ভিত্তি। যান্ত্রিক জড়বাদ ও কাল্পনিক বিজ্ঞানবাদ হইতে ঐতিহাসিক জড়বাদ শ্রেষ্ঠ—এ বিষয়ে মার্ক্সের মনে কোন সন্দেহ নাই। এই নূতন দর্শনে শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণী-সংগ্রামের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। মার্ক্সীয় দর্শনের অপর বিশেষত্ব ধনতন্ত্রের বিশ্লেষণ। এই দর্শনের মতে—সমস্ত কিছুই আপেক্ষিক হইলেও শ্রমমূল্যের সূত্র শাশ্বত। ধনিকের 'অতিরিক্ত মুনাফার' উপরে খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। ধনতন্ত্রের উৎপাদন সামাজিক প্রয়োজন বা কল্যাণে নহে, লাভের তাগিদে। এজন্য অতিবৃদ্ধি ও অতিহ্রাসের মধ্য দিয়া এই উৎপাদন অর্থনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি করে। টাকা-পয়সাকে মূলধন বা পুঁজি হিসাবে ব্যবহার ধনতন্ত্রের অপর বৈশিষ্ট্য। এজন্যই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সমস্ত পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত না হইয়া ক্ষান্ত হয় না। ধনতন্ত্রে পুঁজিপতি শ্রম খাটাইয়া নিজের লাভের মাত্রা বাড়ায়। সম্পৎশালী পুঁজিপতি ও সর্ব্বহারা শ্রমিকের স্বার্থদ্বন্দ্ব শ্রেণীসংঘর্ষে রূপান্তরের আভাস দেখা দেয়—এক কথায় ধনতন্ত্রের স্ববিরোধ বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। উৎপাদনের সঙ্গে উপভোগের সম্বন্ধ শিথিল হইয়া পড়ে—অর্থাৎ উৎপাদন ও বণ্টন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ও পদে পদে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়।

মার্ক্সের সঙ্গে হেগেলের প্রধান মতবিরোধ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির সম্বন্ধ-বিচারে। হেগেলের মতে রাষ্ট্র মানুষের প্রজ্ঞার চরম বিকাশ, ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের শেষ পরিণতি ও স্তর। মার্ক্সের মতে রাষ্ট্র শোষণের যন্ত্রমাত্র, যত-দিন শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীসংগ্রাম থাকিবে, ততদিন রাষ্ট্রের প্রয়োজন। শ্রেণী-হীন সমাজে উহার কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। সেই সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজে শোষণের অবকাশ থাকিবে না—মানুষের সঙ্গে মানুষের সহযোগিতায় রাষ্ট্ররূপ বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং মার্ক্সের মতে সমাজের শেষ পরিণতি শ্রেণীহীন ও রাষ্ট্রহীন পৃথিবী। শ্রমিক-বিপ্লবের লক্ষ্য অর্থনৈতিক শোষণের পরিসমাপ্তি এবং সমাজে শ্রেণীবিভাগের অবসান। সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ উভয়ের লক্ষ্য বিপ্লব হইলেও উভয়ের চরম আদর্শ এক নহে, এজন্যই ইহাদের মধ্যে বিরোধ। শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্ব মার্ক্সবাদের অপর বিশেষত্ব, যদিও ইহা প্রথম দৃষ্টিতে গণতন্ত্র-

বিরোধী বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু সাম্যবাদীর দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিতে তাহা নহে। অথচ নৈরাজ্যবাদীর সঙ্গে মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক যদিও উভয়ের শেষ পরিণতি এক হইতে বাধ্য—উভয়ের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকে। সাম্যবাদের মূলনীতি এই দাঁড়ায় যে, সাধ্যমত সকলে পরিশ্রম করিবে আর সকলে প্রয়োজনমত উহার ফলভোগ করিবে।

বঙ্গভাষায় মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে এইরূপ সুচিন্তিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে কেহ লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। অপক্ষপাত আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সুষ্ঠু সমন্বয় এই পুস্তকের বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানপিপাসু পাঠকমহলে এই পুস্তক আদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

শুধু গল্প—শ্রীগিরীন্দ্র সিংহ সম্পাদিত। দি বুক এমপোরিয়ম লিমিটেড, ২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

এই গল্প-সঙ্কলনের একটি বিশেষত্ব—ইহা মূল্যে সুলভ। আজিকার দুর্মূল্যের বাজারে এই ধরণে গল্পরস পরিবেশনের চেষ্টা সাহিত্য-প্রীতির পরিচায়ক, এজন্য গল্প-পিপাসু পাঠকেরা প্রকাশককে অবশ্যই সাধুবাদ দিবেন। কিন্তু সম্পাদকের দায়িত্ব তাঁহার সাহিত্য-বিচার-ক্ষমতার উপর যতটা নির্ভর করে ততটা বোধ হয় সুলভ-প্রকাশের সৎসাহসে নহে। প্রসঙ্গত আশা করা যায়, স্বল্প মূল্যে প্রাপ্য বস্তু ভারে সমৃদ্ধ হইলেও রসে যেন স্বাদহীন না হয়। লেখক ও লেখা নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদকের।

আলোচ্য গল্প-সংগ্রহের সবগুলি গল্পই সুনির্ব্বাচিত নহে—এরূপ অনবধানতা ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জবাহরলালের প্রসঙ্গ কি শুধু গল্পের পর্য্যায়ে পড়ে? যদিও সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ লেখাটির মধ্যে জবাহরলালের কথা যৎসামান্যই আছে। গল্পের আসরে এটির অনধিকার-প্রবেশ সম্পাদনার শৈথিল্যেরই পরিচায়ক। সুলভ জিনিষ সম্বন্ধে সর্ব্বকালের একটি অপবাদ আছে। এই অপবাদ খণ্ডনের উপায় নির্ব্বিচারে নাম-করা সাহিত্যিকদের রচনাসংগ্রহ নহে, তাঁহাদের সাহিত্য মর্য্যাদাযুক্ত লেখাগুলিকে চয়ন করা। তেমন দৃষ্টান্ত কিছুকাল পূর্ব্বে সুলভতম মূল্যের (মাত্র দু' আনা) 'কথা ও কাহিনী' সিরিজ প্রকাশের মধ্যে ছিল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সভ্যতার অভিশাপ—শ্রীশান্তশীল দাশ। সাগরিকা স্মৃতি-মন্দির, ঘুঘুডাঙ্গা, কলিকাতা। দাম আট আনা।

'সভ্যতার অভিশাপ' স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জ্জিত কিশোর-নাটক। আধুনিক সভ্যতার সর্বনাশা রূপটিই লেখক উক্ত নাটকের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আজকাল কিশোর-নাটকে কতকগুলি বড় বড় আদর্শের বুলি প্রচার করা একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নাট্য-রস পরিবেশন করা অপেক্ষা বড় বড় কথা বলার দিকেই যেন লেখকদের ঝোঁক বেশী। 'সভ্যতার অভিশাপ'ও ঠিক সেই ধরণের নাট্যরসহীন একখানি কিশোর নাটক। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু নাটক হিসাবে এই বই রসোত্তীর্ণ হয় নাই।

স্বাধীনতা—শ্রীমাণিকলাল সিংহ, এম-এ। প্রকাশক - শ্রীভীমচন্দ্র মাহিন্দার, ২১৯, রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া।

স্বদেশী-আন্দোলনের যুগ হইতে ১৯৪২ সালের গণ-আন্দোলন এবং আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অভিযান পর্য্যন্ত জাতির মুক্তিকামনা ও স্বাধীনতা-আন্দোলনের রূপটি নাট্যকার বেশ মুন্সীয়ানার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। লেখকের ভাষা নাটকের সম্পূর্ণ উপযোগী—তবে 'সিচুয়েশন' সৃষ্টিতে অধিকতর নৈপুণ্য প্রদর্শনের দ্বারা নাটকটিতে গতিবেগ সঞ্চারের যথেষ্ট সুযোগ ছিল—নাট্যকার তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন নাই। তবে বিষয়বস্তুর জন্যই নাটকখানি পাঠকদের আগ্রহ উদ্দীপ্ত করিবে।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

গভীর ভেতর—শ্রীগুরুসদয় বসু। আই, এ, পি, কোং লিঃ। ৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

ছেলেদের উপন্যাস। মিঃ রায় বদলি হইয়া ভিতিলগড়ে আসিয়াছেন। রেলওয়ে কোম্পানীর একটা ছোট বিভাগীয় আপিসের তিনি সর্বময় কর্তা। কতকটা খামখেয়ালী এবং হয়তো বা স্পষ্টবাদীও। প্রথম দিনেই তিনি আপিসের বহুদিনের অভ্যস্ত নিয়মের কিছু পরিবর্তন সাধন করিলেন, যাহার দরুন কর্মচারীদের দৃষ্টি তাঁর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইল। কিন্তু আসল ঘটনা সুরু হইল দ্বিতীয় দিনে, যাহা এই উপন্যাসের মূল বিষয়-বস্তু।

মিঃ রায় কাজ বুঝিয়া লইবার জন্য দ্বিতীয় দিনে ঘণ্টাখানেক পূর্বেই আপিসে আসিয়াছেন। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নাই, আকস্মাৎ আলমারীর পিছনে একটা চাপা নিঃশ্বাস এবং মৃদু খস্‌ খস্‌ শব্দে তিনি উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। "কে, কে ওখানে?" একটা অজ্ঞাত রহস্যের আতঙ্কে তাঁর মন দুলিতেছিল। এইখান হইতেই উপন্যাসটি দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। কোন এক রাজবন্দী কোন রকমে ট্রেন হইতে পলাইয়া মিঃ রায়ের আলমারীর পশ্চাতে আশ্রয় লইয়াছে। সে ধরা পড়িতে চায় না। তার জীবনের সাধনাকে সফল করিতে চায়।" 'ভারত ছাড়' এই মহামন্ত্রকে জীবনের ব্রত করিয়াছে বলিয়াই সে বন্দী। মিঃ রায়ের কাছে সে আশ্রয়প্রার্থনা করিল। মিঃ রায় মহা সমস্যায় পড়িলেন, তার অন্তরের আসল মানুষটি সাড়া দিল। এই স্থান হইতেই মিঃ রায়ের চরিত্রের বিশেষত্ব আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়া।

একটির পর একটি ঘটনা অতি যত্নের সহিত চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে লেখক যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এবং তার এই চেষ্টা বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

হাসিকান্নার দেশে—শ্রীসুনির্মল বসু। বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিমিটেড, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৮৫; মূল্য—দুই টাকা।

নাম-করা শিশু-সাহিত্যিকের লিখিত ছোটদের কবিতার বই। কবিতায় গল্প বলা হয়েছে। বইটির দুই ভাগ—হাসির দেশে ও কান্নার দেশে। হাসির দেশের মোটা গজেন্দ্র আর প্যাঁকাটি মার্কা বংশলোচন কি করে 'সুন্দর বন' যে সুন্দর নয় তার পরিচয় পেল, কি করে তারা ভ্রমণের পথে বাঘ, ডাকাত আর হাতীর পালকে তাড়িয়ে দিল, টক্-ঝালের যুদ্ধে কি করে লঙ্কারাজের কূটনৈতিক ফন্দি তেঁতুল-রাজাকে সন্ধি করাতে বাধ্য করাল, গোবর-পোরা-মাথা শ্রীগোবর কি করে মাগুর মাছের হাঁড়ির বদলে গোখরা সাপের হাঁড়ি এনে বেতো রুগীর রোগ সারাল, তার কৌতুককর বিবরণ শিশুচিত্তকে আকৃষ্ট না করে পারে না। কিন্তু এর চেয়েও ভাল লাগে কান্নার দেশের কাহিনীগুলো। এগুলি উদ্ভট কল্পনা নয়—এই পৃথিবীরই দুঃখের কথা, মানুষের সহানুভূতিহীনতা, অহঙ্কার, কুসংস্কার ও নিষ্ঠুর সামাজিক ব্যবহার কত মানুষের জীবন, কত নবীন মনকে নিদারুণ ব্যথায় ক্লিষ্ট করে তোলে। এর সঙ্গে কিশোরমনের পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। কিশোর-মনেও মানুষের দুঃখ-বেদনা সমান ভাবে বাজে।

—"এরা ধনী টাকাই চেনে আর কিছু না জানে।
তেলা মাথায় তেল ঢালতে ওরা পরম পাকা,
মোদের জীবন ওদের কাছে কেবল ফাঁকি
একেবারে ফাঁকা।
ওদের কুকুর মোদের চেয়ে অনেক বেশী দামী,
কি এসে যায় ক্ষুধার জ্বালায় মরলে তুমি আমি।"

পড়তে পড়তে এই নির্মমতার বিরুদ্ধে এ যুগের কিশোর-মন বিদ্রোহী হয়ে উঠবে।

বইখানি বেশ বড় অক্ষরে ঝরঝরে করে ছাপা, ছবিগুলিও সুন্দর। ২২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় লাইনটিতে অক্ষরের আতিশয্যে ছন্দপতন ঘটেছে। "যতই হোক অকর্মার ধাড়ি"র এই স্থলে 'যতই কেন হোক আনাড়ি' বা এই ধরণের কিছুতে পূর্বাপর ছন্দের ধারা বজায় থাকিত।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

সেকালের রবীন্দ্রতীর্থ—শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী। পূরবী পাবলিশার্স। ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের সহিত শিলাইদহের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। পদ্মাতীরবর্তী এই গ্রামের সৌন্দর্য্য কবির চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল এবং সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছিল। এই গ্রামটিকেই লেখক 'সেকালের রবীন্দ্রতীর্থ' বলিয়াছেন এবং তাহার বিচিত্র কাহিনী সহজ ও সরল ভাষায় শুনাইয়াছেন। 'যুগল সা', 'জাপানী মিস্ত্রীর বৌ' প্রভৃতির বৃত্তান্ত চিত্তাকর্ষক। কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবীর কথাও গ্রন্থকার কিছু কিছু বলিয়াছেন। মানুষ রবীন্দ্রনাথকে জানিবার পক্ষে বইখানি সাহায্য করিবে।

ব্রজ-বাঁশরী—শ্রীকালিদাস রায়। ইউ, এন, ধর অ্যাণ্ড সন্স্ লিঃ। কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রেষ্ঠ ব্রজবুলি পদাবলী এবং কবি কালিদাস রায় কৃত সেগুলির এই বঙ্গানুবাদ কাব্যরসিকের পরম উপভোগ্য। বৈষ্ণব কবিতায় অনুরাগ এবং স্বীয় রচনা-নৈপুণ্যে বহুদিন পূর্বেই কবি বাঙালী পাঠকের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার 'ব্রজবেণু' এবং 'পর্ণপুটের' বৃন্দাবন-লীলারসাত্মক কবিতা আজিও অনেকের কণ্ঠস্থ। বর্তমান গ্রন্থে কেবল ভাষান্তরের দিকে নহে, মূলের মাধুর্য্যরক্ষার দিকেও কবি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। অঙ্গসজ্জা গুণে উপহারের পক্ষেও কাব্য গ্রন্থখানি উপযোগী হইয়াছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্মরণীয় যাঁরা—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য। বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

আদর্শের সন্ধান—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

দুইখানি পুস্তকেই কয়েকজন স্মরণীয় বরেণ্য ব্যক্তির জীবন-কাহিনী কিশোরদিগের জন্য লিখিত হইয়াছে। প্রথমটি মনোজ্ঞ বর্ণনায়, রচনার উৎকর্ষে, কাগজে, ছাপায় সব দিক দিয়া শোভন ও উৎকৃষ্টতর। অল্প কথায় অনেকখানি বলার কৌশল গ্রন্থকারের আয়ত্ত, বর্ণনার ভঙ্গীতে অল্প কথায় আলোচ্য ব্যক্তির সমগ্র রূপটি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় বইখানি উপদেশ ও মন্তব্যের আতিশয্যে ভারাক্রান্ত, নিকৃষ্ট কাগজে ছাপা। অবশ্য মলাটের চিত্রটি সুন্দর। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা প্রশংসনীয়। প্রথম গ্রন্থে মনীষিগণের নামকরণেও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, যথা জ্ঞানভিক্ষু শ্রীজ্ঞান, বীর-সন্ন্যাসী, রাজ-ভিখারী, বিজ্ঞান-তপস্বী, শতাব্দীর সূর্য্য, বাংলার বাঘ ও বীর বিদ্রোহী। দ্বিতীয় বইটিতে রামমোহন, দয়ানন্দ, গুরু গোবিন্দসিংহ, গান্ধী, সুভাষ, লেনিন, কামাল, জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে।

দেশমাতৃকা স্তুতি—শ্রীপুরঞ্জন মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। প্রকাশক—ডাঃ বিবেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ৫ রামকমল বর্ম্ম, খিদিরপুর, কলিকাতা। মূল্য ৸৹।

অতি অল্পমূল্যে এই সংগ্রহখানি সাধারণে প্রচার করিবার জন্য গ্রন্থকার ধন্যবাদার্হ। বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের দেশাত্মবোধক উদ্দীপনাময় কবিতা ও সঙ্গীত এবং গীতা, চাণক্যশ্লোক, তুলসীদাস প্রমুখ সাধুগণের

দোঁহা প্রভৃতির সারাংশ সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থকার দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে এই নৈবেদ্য সাজাইয়াছেন।

সংস্কৃতি সমস্যা—প্রকাশক : ডাঃ আনন্দ লাহিড়ী, পঞ্চবটী, রাঁচি ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, কলিকাতা।

বহু আত্মত্যাগ, সাধনা ও তপস্যার ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু এই স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আমাদিগকে দেশের গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না। গ্রন্থকার হিন্দুশাস্ত্রের অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার হইতে একখানি মাত্র শাস্ত্রগ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, মহাভারত শুধু আধ্যাত্মিক নহে, রাজনৈতিক, সামাজিক ও লৌকিক ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবাসীকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে।

ঘুমিয়ে ছিল রাজকুমারী—শ্রীইন্দিরা দেবী। একক সাহিত্য সম্প্রদায়, ৪৪৩।১, কালীঘাট রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের "শিশুমহলে"র পরিচালিকা ইন্দিরা দেবী ছোটদের জন্য বেতার-কেন্দ্র হইতে যে গল্পগুলি বলিয়াছিলেন তারই কয়েকটি এই বইয়ে সংগ্রহ করা হইয়াছে। গল্পগুলি সুমিষ্ট, গল্প বলার ভঙ্গীও সুন্দর। গল্পগুলি শিশুদের মনোরঞ্জন করিবে। ছবি, ছাপা ও মলাট উৎকৃষ্ট।

বাঁশীর ডাক—শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কবিতার বই। সবগুলি কবিতাই এক একটি ছোট কাহিনী অবলম্বনে সহজ ছন্দে ও ভাষায় রচিত। গাথা বা গীতিকবিতাগুলি কবি-হৃদয়ের ভাবাকুলতা ও সংবেদনশীলতার গুণে অন্তর স্পর্শ করে। মলাটের ছবিটি সুন্দর।

কয়েকটি গল্প—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। পূরবা পাবলিশার্স লিঃ। ৭।৩৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। মূল্য ২৷৹

অবজ্ঞাত, অন্ত্যজ, সমাজের সর্ব্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত মূক জনগণের জীবনেও যে উচ্চ অভিজাত-সম্প্রদায়ের মতই সুখ-দুঃখবোধ ও কল্পনাবিলাস ফল্গুধারার মতই বহিয়া চলিয়াছে, লেখক সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তাহাদের কথা 'কয়েকটি গল্পে' লিখিয়া পাঠকদের গোচরীভূত করিয়াছেন। এমন কি তিনি গৃহপালিত মূক পশুগণের মধ্যেও রোমান্সের সন্ধান পাইয়াছেন। 'কয়েকটি গল্পে' মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানিতে লেখকের রসসৃষ্টি-ক্ষমতা ও রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য সহজেই চিত্ত আকর্ষণ করে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ। ২৪৩-১, আপার সারকুলার রোড্, কলিকাতা। মূল এক টাকা।

বর্ত্তমান পুস্তকখানি সাহিত্যসাধক চরিতমালার ৭২ সংখ্যক গ্রন্থ। ইহাতে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের দুই জন প্রখ্যাত মনীষী এবং সাহিত্যসাধকের জীবন ও কৃতির কথা আলোচিত হইয়াছে।

রামকমল নিজ চেষ্টায় সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। একথা বৈষয়িক দিক হইতে যেমন সত্য, পাণ্ডিত্যের দিক হইতেও তেমনি সত্য। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্যে তাঁহার দান যথেষ্ট। কলিকাতা স্কুল বুক-সোসাইটি, হিন্দু-কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি, মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের অভাব দূরীকরণার্থে তিনি এসকল রচনায়ও মন দেন। তাঁহার ইংরেজী-বাংলা অভিধান তাঁহার সাহিত্যসাধনার বিরাট কীর্ত্তির পরিচায়ক।

পাদ্রী কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দু-সমাজের প্রতিকূলতামূলক বহু কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-সাধনা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষেই কল্যাণকর হইয়াছে। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, জীবনচরিত, দর্শন প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক নানা গ্রন্থ লিখিয়া তিনি মাতৃভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইংরেজী গ্রন্থও প্রচুর। কৃষ্ণমোহন শেষ জীবনে রাজনৈতিক আন্দোলনেও যোগ দিয়াছিলেন।

যোগেশবাবু বর্ত্তমান পুস্তকখানিতে এই সকল বিষয়ে যথাযোগ্য প্রমাণাদির উপর নির্ভর করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ব্ব-সূরিদের সাহিত্যসাধনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান করিয়া তিনি সাহিত্যানুরাগী বাঙালী পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

রাতের ছায়ামূর্ত্তি—শ্রীমণিলাল অধিকারী। রত্নাকর পাবলিশিং হাউস। ১৬৬-এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯। মূল্য এক টাকা চার আনা।

শিশুপাঠ্য ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। ইহা রত্নাকর সিরিজের ৩য় গ্রন্থ। কাহিনীটির সংক্ষিপ্তসার এই : অপরাধতত্ত্ববিদ এবং সখের ডিটেকটিভ তাপস চৌধুরী আর তার বন্ধু এবং সহকারী মলয় অবসর যাপন করিতে গিয়া উঠিয়াছিল মধুপুরের অভিজাত হোটেল 'মুন লাইটে'। সেখানে তাহারা হোটেলের ম্যানেজারের প্রমুখাৎ ঐ হোটেলে আগত শ্যামল গুহ নামে এক যুবকের রহস্যময় হত্যা-কাহিনী জানিতে পারিল। হোটেলে রাত্রে মাঝে মাঝে এক ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব হইত। তাপস বুঝিতে পারিল যে, ঐ হত্যার সঙ্গে ছায়ামূর্ত্তির সংযোগ রহিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত তাপস ও মলয়ের বুদ্ধিকৌশল ও দুঃসাহসিক কর্ম্মসম্পাদনে ছায়ামূর্ত্তির স্বরূপ ও শ্যামল গুহের হত্যার রহস্য উদ্ঘাটিত হইল।

প্রচলিত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের সঙ্গে ইহার পার্থক্য আছে—লেখক রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টিতে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। শিশু-পাঠক কম্পিত বক্ষে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কাহিনীটি শেষ করিবে।

অপমানিতা মানবী—শ্রীপ্রশান্তি দেবী। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৮ সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা।

নারীর উপর যুগ যুগ ধরিয়া পুরুষ যে অবিচার, অত্যাচার করিয়া আসিতেছে তাহার প্রতিকার এ যুগের মেয়েদের করিতে হইবে; নারীর অবমাননা আমাদের জাতির ললাটে যে কলঙ্ককালিমা লেপিয়া দিয়াছে নারীকেই আজ অগ্রণী হইয়া তাহা মুছিয়া ফেলিতে হইবে—এই মূল ভাবটিই এই উপন্যাসের মধ্যে আগাগোড়া অনুস্যূত।

যুদ্ধের সময়কার ব্ল্যাক-আউটের কলিকাতার পটভূমিকায় উপন্যাসখানি রচিত। বোমার ভয়ে কল্পনা বাপ-মায়ের সঙ্গে চলিয়া আসিল কলিকাতায়। তারপর নানা ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে অবশেষে তাহাকে মহানগরীতে চাকুরী লইতে হইল। এই নূতন জীবন অবলম্বন করিবার পর, যুদ্ধের বাজারে পুরুষরা নারীদের প্রতারিত করিয়া কিভাবে নারীত্বের অপমান করিতেছে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সে ভাবিল শুধু আত্মরক্ষা করিলেই তো চলিবে না, সমাজের সকল অপমানিতা মানবীকে চরম দুর্গতির হাত হইতে ত্রাণ করিবার ব্রত তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে—এই মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সে প্রণয়ী প্রকাশের বিবাহ-প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার প্রেমের অপমৃত্যু ঘটাইল।

উপন্যাসখানিতে লেখিকার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সংলাপ লিখিবার হাত আছে। কল্পনার চরিত্রটিকে তিনি অন্তরের সবটুকু দরদ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য চরিত্রের দিকে আরো একটু বেশী মনোযোগ দিলে ভাল হইত।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

কৃষ্ণ-বলরাম ও মাতা যশোদা
শ্রীচিত্রনিভা চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

এলাহাবাদে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৯৪৯ ইংরেজীর জানুয়ারী মাসের অধিবেশনে—সরোজিনী নাইডু

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড | চৈত্র, ১৩৫৫ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সরোজিনী নাইডু

বাংলার আকাশ হইতে আর একটি জ্যোতিষ্ক অপসারিত হইল। সরোজিনী বাংলা মায়েরই কন্যা, যদিও ভাগ্যচক্রের ফেরে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের প্রায় সমস্তই বাংলার বাহিরে কাটিয়াছিল। সাহিত্য, কাব্য, সমাজ-সংস্কার, রাজনীতির মঞ্চ, সকল ক্ষেত্রকেই তাঁহার প্রতিভার দীপ্তশিখা এরূপ উজ্জ্বল ভাবে আলোকিত করে যে সারা ভারত তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হয়। তাই আজ তাঁহার মহাপ্রয়াণের পর সমস্ত দেশে তাঁহার অভাব অনুভূত হইতেছে। তাঁহার মৃত্যুতে বিশ্বের মহিলা-সমাজের এক মহীয়সী নেত্রীর স্থান শূন্য হইল। যে অভাব আমরা প্রত্যেকে অনুভব করিতেছি তাহার প্রতিধ্বনিও বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

১৮৭৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী হায়দরাবাদে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বিক্রমপুরের এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। অঘোরনাথ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রে "ডক্টর অব সায়েন্স" উপাধিলাভের পর জার্ম্মানীর হাইডেলবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক ভ্যানটফের (Van t'Hoff) নিকট রাসায়নিক গবেষণা করেন। শোনা যায় ভ্যানটফের লিখিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে তাঁহার এই ভারতীয় ছাত্রের অসীম প্রতিভার উল্লেখ আছে। অঘোরনাথ দেশে ফিরিয়া হায়দরাবাদে নিজাম কলেজ প্রতিষ্ঠার ভার গ্রহণ করেন ও দীর্ঘদিন তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার জীবনকাহিনীও অতি আশ্চর্য্য ছিল; কেননা তাঁহার উদার চরিত্র ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রকাশ নানা দিকে হয়। তিনি আজীবন স্পর্শমণির সন্ধানে (alchemy) অক্লান্ত গবেষণা ও পরীক্ষা করেন। এই ব্যাপারে তাঁহার গৃহে শত শত সাধুসন্ত সিদ্ধ ফকীরের আনাগোনা ছিল, উপরন্তু রসবেত্তার গুণমুগ্ধ বন্ধুগোষ্ঠীও ছিল বিশাল। এই অপরূপ ও অসাধারণ পরিবেশের মধ্যে সরোজিনীর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়।

অঘোরনাথ বাস্তব জগতের স্পর্শমণির সন্ধান পাইয়াছিলেন কিনা জানি না, কেহ বলে পাইয়াছিলেন, কেহ বলে তাহা নয়। কিন্তু সরোজিনীর হৃদয় ও মনের মর্ম্মস্থলে ঐ "রসেন্দ্র চিন্তামণি" রত্নের আকর স্থাপিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। সাহিত্য ও কাব্যে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেন উহারই প্রভাবে এবং পরে রাষ্ট্রনীতির কণ্টকময় ক্ষেত্রে, শত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও তিনি মধুময় বাণী ও মধুরতর স্বভাব অক্ষুণ্ণ ও অম্লান রাখিয়া কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন উহারই অলৌকিক স্পর্শগুণে।

যে জ্যোতি ৭০ বৎসর পূর্ব্বে হায়দরাবাদে প্রজ্বলিত হয় তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেশকে আলোকিত করে। নির্ব্বাণের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্তও তাহা ক্ষণেকের তরেও ম্লান হয় নাই, ইহাই সরোজিনীর পরিচয়। তাঁহার জীবনের সম্যক্ ব্যাখ্যা বা তাঁহার গুণাবলীর পূর্ণ বিবরণ দান পত্রিকার পৃষ্ঠায় সম্ভব নহে। তিনি পরিপূর্ণ জীবনযাপন করিয়া গেলেন, তাঁহার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয় বন্ধুগণের বিশাল গোষ্ঠীর সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া আমরাও মনের ও হৃদয়ের অপূর্ণতা ও অভাব জানাইতেছি।

কিরণশঙ্কর রায়

কিরণশঙ্কর রায়ের অকাল মৃত্যুতে বাঙালীর রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে এক গুণী নেতৃত্বের অবসান হইল। পূর্ব্ববঙ্গ মাণিকগঞ্জের তেওতার জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই যুগের উপযোগী ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতির মধ্যে তিনি সুশিক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। সেই সংস্কৃতির প্রয়োজনে দেশের স্বাভাবিক সমাজ-নেতৃবর্গ দেশের অন্তরঙ্গ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয় পড়িয়াছিলেন; ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বের কৃতকর্ম্মের ফল আমাদের জাতির জীবনে অবিমিশ্র মঙ্গলপ্রদ হয় নাই। বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিকদের মতে, বিশেষ করিয়া কার্ল মার্ক্সের মতে, নূতন যুগের উৎপাদন-পদ্ধতির কল্যাণে এইরূপ ধ্বংসের প্রয়োজন ছিল।

এই ভাঙাগড়ার ফলে যে চিন্তাধারার উদ্ভব হয় ও যে জীবনযাত্রা প্রবর্ত্তিত হয়, কিরণশঙ্কর রায়ের সমশ্রেণী ও সমধর্ম্মী পর্য্যায়েই হয় তাহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আসিয়া আমরা আজ এক পরিণতির দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। এই পরিণতির প্রয়োজনে ভারতবর্ষের সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও রীতিনীতি জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে নানা জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের উদয় হয়।

কিরণশঙ্করের পরিবারও এইরূপ নানা বিরোধী ভাবের তাড়নায় দোদুল্যমান ছিলেন ভারতবর্ষের ও বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারের মত। সেইজন্য দেখিতে পাই কিরণশঙ্করকে "সবুজ পত্র" মাসিক পত্রিকার লেখক-গোষ্ঠির মধ্যে। এই গোষ্ঠি রবীন্দ্রনাথের মানসপুত্র; "সবুজ পত্রে" তাহার নানা প্রমাণ জল জল করিতেছে। "নরম দল" ও "গরম দল" উভয়ের বিরুদ্ধেই একটা কৃপামিশ্রিত তাচ্ছিল্যের ভাব এই গোষ্ঠির লেখনীর মুখে ফুটিয়া উঠিত।

কিরণশঙ্কর তাহার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করেন গান্ধী আন্দোলনের প্রারম্ভে; চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে ও সুভাষচন্দ্র বসুর সাহচর্য্যে তাঁহার অভ্যস্ত জীবনে এক বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। এই আন্দোলনের কৃচ্ছ্র সাধন তাঁহার প্রকৃতির উপযোগী ছিল না বলিয়াই তিনি এই আন্দোলনের কল্যাণে যে গণজাগরণের প্লাবন দেশের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল, তাহা সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। এইজন্য অনেক নিন্দা তাঁহাকে সহিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সংযত মন নিন্দা-প্রশংসার ঊর্দ্ধে উঠিয়া কর্ত্তব্য পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। দেশের দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার শক্তির পরিচয়ের প্রকৃষ্ট সময় যখন আসিল তখনই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল।

দমদমের ঘটনা

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী দমদমে জেসপ কোম্পানীর কারখানায় এবং বিমানঘাঁটিতে যে ঘটনা ঘটিয়াছে এবং বসিরহাট পর্য্যন্ত যাহার জের গড়াইয়াছে তাহা সারা ভারতবর্ষকে সচকিত করিয়াছে। এত বড় দুঃসাহসিক ঘটনা খুব কমই ঘটিয়াছে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি যুবক দিন দুপুরে একটি বৃহৎ কারখানায় চড়াও হইয়া উহার তিন জন শ্বেতাঙ্গ ফোরম্যানকে জলন্ত চুল্লীতে নিক্ষেপ করিল, এক জনকে অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করিতে হইল। পুলিস আগে কিছু জানিল না, ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে অকুস্থলে উপস্থিত হইতেও পারিল না, ইহাতে দেশে আইন ও শৃঙ্খলা আছে কি না, জনসাধারণের মনে সে সন্দেহ জাগিবেই। এই ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে, এবিষয়ে একটু বিশদ আলোচনা আবশ্যক। প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঘটনার সাত দিন পরে পুলিসের নিকট সকল সংবাদ লইয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার মূল কথাগুলি দেওয়া গেল। বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার আবশ্যক নাই, উহা সবিস্তারে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাঃ রায়ের বক্তব্য এই:

(১) অস্তিত্বের গুরুতর অবস্থা সৃষ্টির এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য একটি সুচিন্তিতভাবে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল গবর্ণমেণ্ট দখল করা (bid to bring about a coup.)

(২) ২৬শে ফেব্রুয়ারী যুবকেরা কলিকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ৪টি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া দমদম যায়।

(৩) বেলা ১১টা ১৫ মিনিটে জেসপ কোম্পানীতে বীভৎস ব্যাপার ঘটে এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে উহা শেষ হয়। জেসপ কোম্পানীতে তাহার দুই দিন আগে অর্থাৎ ২৪শে কতক শ্রমিক ছাঁটাই হয় এবং এতদুপলক্ষে গোলযোগের আশঙ্কা ছিল। ২৫শে তারিখে সেখানকার পুলিস পাহারা তুলিয়া দেওয়া হয়।

(৪) যুবকেরা ষ্টেনগান, ব্রেণগান, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম ইত্যাদিতে সুসজ্জিত হইয়া গিয়াছিল।

(৫) জেসপে হানার সঙ্গে সঙ্গে উহার বিপরীত দিকে অবস্থিত অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা আক্রান্ত হয়।

(৬) অতঃপর ইহারা সংখ্যায় ২৫।৩০ জন হয় এবং বিমানঘাঁটিতে গিয়া হানা দেয়। দমদমে কতক্ষণ ছিল ডাঃ রায় তাহা বলেন নাই অর্থাৎ পুলিস তাঁহাকে বলে নাই, তবে সেখানকার ঘটনার যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আধ ঘণ্টার কম লাগিবার কথা নহে।

(৭) পুলিস প্রথম খবর পায় বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরে অর্থাৎ বারটার সময়। তখন কলিকাতা ও ব্যারাকপুর হইতে পুলিস যায়। ইহাদের ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে খবর দেওয়া হয়।

(৮) অতঃপর ডাঃ রায়ের বিবৃতিতে একটি নূতন কথা পাওয়া যাইতেছে—"Soon after the raiders cut the telephone and telegraphic connections of the areas raided or about to be raided." হানা শেষ হওয়ার এক ঘণ্টা পর পুলিস ছুটিয়াছে ইহা এই অবস্থায় পরের কথা।

(৯) ইহার পর যুবকেরা যশোর রোড ধরিয়া বসিরহাট যায় এবং পথে গৌরীপুর আক্রমণ করে। গৌরীপুর থানাকে হেডকোয়ার্টার হইতে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়।

(১০) বসিরহাটে থানা এবং ট্রেজারী ও সাব-জেল আক্রমণ করিতে গিয়া, তথাকার একজন দারোগা এবং ট্রেজারী ও জেলের প্রহরীদের সতর্ক হওয়ার ফলে, ইহারা ব্রেণগান ষ্টেনগান এবং ২৬টি রাইফেল হাতে থাকা সত্ত্বেও ছত্রভঙ্গ হয় এবং দুই জন তখনই ধরা পড়ে।

এবার ডাঃ রায়ের বিবৃতির আলোচনা করিলে পুলিস অধঃপাতের কোন অতলে নামিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে।

(১), (২) গবর্ণমেণ্ট দখলের জন্য যে ব্যাপক ষড়যন্ত্র হইয়াছে তাহা একদিনে সম্পূর্ণ হয় নাই। ডাঃ রায় নিজেই বলিতেছেন উহা well laid অর্থাৎ সময় লাগিয়াছে। যাহারা এই কাণ্ড করিয়াছে তাহাদের ঘাঁটি কলিকাতা, ষড়যন্ত্রও কলিকাতাতেই হইয়াছে। অথচ কলিকাতার স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ ইহার বিন্দুবিসর্গও টের পাইল না। আমরা অনেকবার বলিয়াছি যে দায়িত্বপূর্ণ পদে আত্মীয় বা আশ্রিতবাৎসল্যের জন্য অনুপযুক্ত লোক নিয়োগ করিলে সেই বিভাগ রসাতলে যায় ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। কলিকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক নং ডেপুটি কমিশনার করা হইয়াছে এক জন মফস্বলের পুলিস সাহেবকে; দুই নং ডেপুটি করা হইয়াছে এমন এক জনকে যিনি ইংরেজ এবং লীগ আমলে ইনস্পেক্টরের ঊর্দ্ধে উঠিবার যোগ্য বিবেচিত হন নাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার

পর ইনি তখন প্রমোশন পাইয়া ডেপুটি কমিশনার হইয়াছেন। প্রধান এসিষ্টান্ট কমিশনার করা হইয়াছে খোদ কমিশনার সাহেবের ভগ্নীপতিকে। ইংরেজ আমলে ইনিও ইনসপেক্টরের উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশই নূতন, কিছু আনাড়ী এবং অপদার্থও আছে। এই টীম লইয়া কাজ করিতে গেলে ফল এইরূপই হইবে। আকাশ হইতে টাকা ঢালিয়া ইহাদিগকে ডুবাইয়া দিলেও 'এফিসিয়েন্সি' বা যোগ্যতা বাড়িবে না; এই বিভাগে সবিশেষ তদন্তের পর আমূল রদবদল করিয়া ইংরেজ-লীগ আমলের কুখ্যাতি হইতে মুক্ত স্বদেশী মনোভাবাপন্ন লোক নিয়োগ না করিলে রাষ্ট্রদ্রোহীরা এইরূপই নিশ্চিন্ত মনে কাজ করিতে থাকিবে।

(৩, ৭, ৮, ও ৯) বেলা ১১-১৫ মিনিট হইতে প্রায় এক ঘণ্টা দমদম এলাকা গোলাগুলিতে ও হত্যাকাণ্ডে তছনচ হইয়া গেল, এশিয়ার একটি বৃহত্তম বিমানঘাঁটি এবং ভারত-সরকারের অস্ত্রের কারখানা আক্রান্ত হইল, অথচ দশ মাইলের মধ্যে লালবাজার ঘাঁটি তার সংবাদ পর্য্যন্ত পাইল না। যে সব জায়গায় হানা দেওয়া হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিতে একাধিক টেলিফোন লাইন আছে; দমদম বিমান ঘাঁটিতে অনেকগুলি লাইন আছে। এই সব স্থান হইতে পুলিস প্রথম সংবাদ কখন পাইয়াছিল ডাঃ রায়ের বক্তৃতায় তাহার উল্লেখ নাই। লাইন কাটার গল্পটি পুলিসের পরবর্তী কল্পনা বলিয়া মনে হয়, কারণ হানা দেওয়ার পর জেসপ এবং বিমানঘাঁটির টেলিফোন লাইন ঠিক ছিল। ১১-১৫ মিনিটে আক্রমণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের খবর পাওয়ার ব্যবস্থা অথবা পাইয়া বিশ্বাস করিবার মত সতর্কতা থাকিলে সাইরেন বাজাইয়া পুলিস ২০ মিনিটের মধ্যে দমদম উপস্থিত হইয়া সেখানেই যুবকদের গ্রেপ্তার করিতে পারিত। পুলিস প্রথম খবর পাইয়াছে বেলা ১২টায়, অর্থাৎ ৪৫ মিনিট পর ইহা ডাঃ রায়ের নিজের কথা। ইহা লালবাজার হেডকোয়ার্টার্স এবং কণ্ট্রোল রুমের চরম গাফিলতি এবং অযোগ্যতার নিদর্শন। জেসপে গোলযোগ চলিতেছিল; সেখানকার ইউনিয়ন আই-এন-টি, ইউ-সি নয়, আর-সি-পি-আই; দুই তিন দিন আগে সেখানে গরম গরম বক্তৃতাদিও হইয়া গিয়াছে; ইহার পরেও কোন্ হিসাবে দ্বিতীয় দিনেই পুলিস তুলিয়া লওয়া হইল? বলা হইয়াছে Extra Police তোলা হইয়াছে, দেখা যাইতেছে একটা লাল পাগড়ীও রাখা হয় নাই। রাখিলে সে অন্ততঃ টেলিফোন করিতে পারিত। জেসপের লাইন ব্যবহার সম্ভব না হইলে পাশেই গ্রামো-ফোন কোম্পানী এবং আরও অনেক টেলিফোনযুক্ত বড় বড় বাড়ী আছে, সেখান হইতে দশ মিনিটের মধ্যে খবরটা পৌঁছিতে পারিত। ডাঃ রায় প্রথমে বলিয়াছেন ইহাদের ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে খবর দেওয়া হয় এবং গৌরীপুর থানা সতর্ক হয়, আবার পরক্ষণে বলিতেছেন হানা দেওয়ার পর এবং দেওয়ার লক্ষ্যস্থলগুলির টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ সংযোগ কাটিয়া দেওয়া হয়। তাই যদি হয় তবে সরকার খবর দিয়া-ছিলেন যেরূপে তাহা আগে করা সম্ভব ছিল না কি? কলিকাতার থানাগুলিকে সতর্ক করা হইয়াছিল কি? এখানে Dacoity alarm বলিয়া একটি যন্ত্র আছে; সমস্ত থানায় ঐ এলার্ম বাজাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ পুলিস বড় বড় রাস্তার মোড় আটকাইয়া দাঁড়াইয়া যায়; সমস্ত গাড়ী তখন তল্লাসী করা হয়। লালবাজার হইতে বাহির হওয়ার সময় পুলিস জানিত না ইহারা কোন দিকে গিয়াছে; কলিকাতায় আসিয়া ভীড়ে মিশিয়া যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং Dacoity alarm বাজাইয়া তল্লাসীর জন্য প্রস্তুত হইয়া ছোটা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা একেবারেই করা হয় নাই। লাল-বাজার হেড-কোয়ার্টার্সের অর্ব্বাচীন ডেপুটি কমিশনার এবং তস্য মুরুব্বী মফস্বলাগত পুলিস কমিশনার দু'জনে এই ব্যবস্থা চালু রাখিয়াছেন কি না তাহাতেও সন্দেহ আছে।

(১০) মফস্বলের কয়েকটি প্রহরী সময়মত সতর্ক হইয়াছিল বলিয়া ব্রেণগান, ষ্টেনগান এবং ২৬টি রাইফেলে সুসজ্জিত এই দলটি ধরা পড়িল। দমদমের ঘটনার পরই ইহারা যদি আর হল্লা না করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিত তবে আদৌ ধরা পড়িত কি না সন্দেহ। ভিক্টর লেন হত্যাকাণ্ডে, মন্দামে দারোগা হত্যা প্রভৃতির পর কয়েকটি ভদ্র যুবককে লইয়া টানাটানি করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যেভাবে যবনিকাপাত হইয়াছে এক্ষেত্রেও তাহাই হইত। দুই জনকে বসিরহাটের ট্রেজারী ও জেল প্রহরীরা ধরিয়া দেওয়ায় তবে অপরদের পাত্তা মিলিয়াছে এবং পরবর্তী গ্রেপ্তার ও তল্লাস সম্ভব হইয়াছে। ইহারা জোর করিয়া ধরা দিয়াছে এই কথাই আমরা বলিতে পারি; পুলিসের লেশ মাত্র কৃতিত্ব ইহাতে নাই। ইহার সরলার্থ এই যে, কলিকাতা শহরে পুলিসের পিছনে আড়াই কোটি টাকা ঢালিয়া আমরা কমিউনিষ্টদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছি।

দমদমের ঘটনা পুলিসের অকৃতকার্য্যতার প্রথম দৃষ্টান্ত নয়—চতুর্থ। প্রথম ঘটনা মহরম। ইহাতে ভারতীয় ইউনিয়নের মুখে চুনকালি পড়িয়াছে। দ্বিতীয় ঘটনা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। পুলিস এতদিনে উহাকে সাবোটাজ বলিতেছে অথচ তার সন্ধান আগে পায় নাই। ইহার পরও সতর্ক হয় নাই। তৃতীয় ঘটনা জলের কল সাবোটাজের চেষ্টা। এটা ধরিয়াছে এবং বন্ধ করিয়াছে, কর্পোরেশন—পুলিস নহে। তাহার পরেও পুলিসের চোখ খোলে নাই। চতুর্থ ঘটনা দমদম। কলিকাতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কর্মচারীবর্গকে উচ্চতম ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে বসাইলে এবং তাহাদের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলে এ ছাড়া আর কি অবস্থা হইবে?

কলিকাতা সম্বন্ধে আনাড়ী যাহারা, তাহারা নিজেদের দল ভারী করিবার জন্য City Police ও Bengal Police amalgamation-এর জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে; ইহার পরিণাম বিষময় হইবে ইহা আমরা বার বার বলিয়াছি। কর্তৃপক্ষের বিপরীত যুক্তিতে এই ব্যবস্থা অনুমোদিত হইলে শহরবাসীর ধনপ্রাণ বিপন্ন হইবে একথা আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি।

পর পর চারি বার কলিকাতা পুলিস মারাত্মক অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে। অপর স্বাধীন দেশের কথা তো ধর্তব্যই নয়—ইংরেজ আমলেও কলিকাতায় উপরোক্ত চারিটি ঘটনার প্রথমটির পরই বিশেষ তদন্ত আরম্ভ হইত। বর্ত্তমান অবস্থায় কিন্তু তিনটি ঘটনার পর বর্ত্তমান কমিশনার মহাশয়ের পদ পাকা হইয়াছে। ঐরূপ তদন্তের জন্য শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় পুলিস কমিটি স্থাপনের নিদারুণ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যদিও তাহার যোজনা তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই। দেশবাসীর এখন বুঝা প্রয়োজন যে, উচ্চতম অধিকারীবর্গের সাংঘাতিক গাফিলতির দরুন তাঁহাদের ধন-প্রাণের রক্ষণাবেক্ষণ কি ভাবে হইতেছে।

ব্যবস্থা-পরিষদে বাজেট আলোচনা

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে বাজেট আলোচনায় ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ বলিয়াছেন যে, ধনীর ধন বৃদ্ধি এবং দরিদ্রের দারিদ্র্য বৃদ্ধির একটা মনোভাব বর্ত্তমান বাজেটের মূলে ধরা পড়িতেছে। ডাঃ ঘোষের মোটামুটি বক্তব্য এই যে, সেক্রেটারীয়েটের খরচ প্রতিদিন বাড়িতেছে; সেক্রেটারীদের নিজস্ব বেতনের সঙ্গে ২৫০ টাকা ভাতা এবং ডেপুটি সেক্রেটারীদের ১৫০ টাকা ভাতা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। একটি ব্যয়সঙ্কোচ কমিটি বসাইবার কথাও তিনি বলিয়াছেন। গদী ছাড়িলে বুদ্ধি বাড়ে—ডাঃ ঘোষকে এই বাক্যটির সার্থকতা প্রমাণ করিতে দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা এবং অদ্ভুত রকমের ব্যয় বৃদ্ধির জন্য মূলতঃ ডাঃ ঘোষ দায়ী এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। সেক্রেটারী হইলেই তাঁহার বেতন ২১৫০ টাকা হইবে, এক ধাপে হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধিতেও ক্ষতি নাই—এই দৃষ্টান্তও ডাঃ ঘোষই দেখাইয়া গিয়াছেন। এখন তিনি সেক্রেটারীদের বেতন সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন অন্য সমস্ত প্রদেশ প্রথম হইতেই তাহা করিয়াছে; ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির মধ্যে একমাত্র ডাঃ ঘোষই বেতন বৃদ্ধির অস্বাভাবিক রকমের দরাজ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা এই ঐতিহ্য আর বদলান নাই, উহাকেই আর একটু বাড়াইয়া মহাজন প্রদর্শিত পথেরই অনুসরণ করিয়াছেন। খেসারত দিয়াছে ও দিতেছে গরীব দেশবাসী।

ডাঃ ঘোষের কয়েকটি অদূরদর্শী কাজের বিষময় পরিণাম সবেমাত্র দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতীত যুগে যে সব সরকারী কর্ম্মচারী ইংরেজ এবং লীগ গবর্ণমেণ্টকে তুষ্ট করিয়া চাকরির উন্নতি সাধনের জন্য দেশের অনিষ্ট করিতে বিরত হন নাই, বাছিয়া বাছিয়া সেইরূপ অনেক লোককে আনিয়া তিনি বিভাগীয় শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। অতীতে যাঁহারা 'লয়্যালটি'র চরম দেখাইয়াছেন এখনও তাঁহারাই বেশী "লয়্যাল" হইবেন ডাঃ ঘোষ এই আশা করিবার সময় এ কথা ভাবেন নাই যে দুর্নীতিপরায়ণ বা সুবিধাবাদী স্বার্থপরদের 'লয়্যালটি'র কোন মূল্য নাই। আজ যদি ইঁহারা বুঝেন যে কংগ্রেস-রাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে, এবার কম্যুনিষ্টরা হইবে নূতন প্রভু, তবে ইঁহাদের 'লয়্যালটি'র ঘোড় ঘুরিতে এক মুহূর্ত্তও লাগিবে না। ডাঃ ঘোষের এই নূতন শাসননীতিতে দেশের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, চরিত্রবান এবং দেশভক্ত যে সব কর্ম্মচারী শত অসুবিধা সহ্য করিয়াও নীতি ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন নাই তাঁহাদের চক্ষে কংগ্রেস শাসকেরা খেলো হইয়া গিয়াছেন। ইহাতে শাসনযন্ত্রের morale রসাতলে গিয়াছে। যাহারা কার্য্যদক্ষ তাহাদের কাজে উৎসাহ নাই, যাহারা স্বার্থসিদ্ধির ফিকিরে ব্যস্ত তাহাদের কর্ত্তব্যপালনের সময় নাই, ক্ষমতাও যে খুব আছে তাহা নহে। বড় বড় ব্যাপারের খবর সাধারণ লোকে পাওয়ার অনেক পরে সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাদের কানে পৌঁছে, ইহাই যেন রেওয়াজ হইয়া উঠিতেছে। লোকের পর লোক বাড়াইয়া এবং লক্ষ লক্ষ টাকা বেশী খরচ করিয়াও ফল পাওয়া যাইতেছে না, মূল সংস্কার না হইলে দেশের লোকপিছু একজন করিয়া ২১৫০ টাকার সেক্রেটারী বা ২৫০০টাকার পুলিস কমিশনার নিযুক্ত করিলেও থৈ মিলিবে না।

ডাঃ ঘোষ অনাবশ্যক ব্যয়বৃদ্ধির আর একটি সদর রাস্তা খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। শহর ও মফস্বল পুলিস আলাদা রাখার যে সনাতন এবং পরীক্ষিত নিয়ম আবহমানকাল যাবৎ বিশ্বজগতে প্রচলিত রহিয়াছে ডাঃ ঘোষ তাহা উল্টাইয়া দিয়া কলিকাতা ও বেঙ্গল পুলিসকে একাকার করিয়া গিয়াছেন। ইহার সর্ব্বনাশা দিকটা ক্রমশঃ বোধ হয় লোকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু খরচের দিকটার এখনও নজর পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। কলিকাতা পুলিসে কর্ম্মচারীদের সর্ব্বোচ্চ বেতন ইন্সপেক্টর ৩৫০৲, সাব-ইন্সপেক্টর ২০০৲, সার্জেণ্ট ২৫০৲, এসিসটাণ্ট সাব-ইন্সপেক্টর ৫০৲ এবং কনেষ্টবল ২৯৲ টাকা। বেঙ্গল পুলিসে ঐ বেতন যথাক্রমে ৩০০৲, ১৩০৲, ২২৫৲, ৪০৲ এবং ২৪৲ টাকা। নিম্নতম বেতনের তারতম্য এইরূপ। উভয় ক্ষেত্রে কাজের রকম আলাদা, শহরের চতুর, প্রভাব ও সম্পৎশালী ক্রিমিনাল ধরিবার জন্য এবং শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর শহরবাসীর প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যোগ্যতা বেশী থাকা দরকার বলিয়া কলিকাতা পুলিসে নিয়োগের মাপকাঠি উচ্চ এবং বেতনও সেইজন্য বেশী। গ্রামে এত জটিলতা নাই, সাধারণ চুরি-ডাকাতির কিনারা করিবার জন্য উচ্চশিক্ষিত লোক না হইলেও ক্ষতি নাই বলিয়া সেখানে নিয়োগের মাপকাঠি ছোট। কলিকাতার সাব-ইন্সপেক্টর

হইতে হইলে গ্রাজুয়েট হইতেই হইবে, মফস্বলে ঐ কাজের জন্ত আগে ম্যাট্রিক পাশ হইলেই চলিত, এখন আই-এ হইলেই যথেষ্ট। সুতরাং বেতন কম। এখন কলিকাতা ও বেঙ্গল পুলিস এক করিবার রায় দেওয়ার সময় ডাঃ ঘোষ কি ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন যে, দুইটি একাকার করিলে বেতনের তারতম্য রাখা যাইবে না, তখন কি মফস্বলের বেতন বাড়িবে, না কলিকাতার বেতন কমিবে? কলিকাতার বেতন কমাইলে শহর সামলাইবার উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে কি? মফস্বলের বেতন বাড়াইলে টাকাটা কে দিবে? কলিকাতা ও বেঙ্গল পুলিস এক করিবার সর্ব্বনাশা খেয়াল যাঁহাদের মাথা হইতে এখনও নামে নাই, তাঁহারা উহার এই দিকটাও একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাল করিতেন। কৃষি বিভাগেও অপচয়ের সদর রাস্তাটি ডাঃ ঘোষ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। মেদিনীপুরের খ্যাতিসম্পন্ন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন এম খাঁ ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার থাকাকালে একটি অবাঙালী সহকারী অস্থায়ীভাবে আমদানী করিয়াছিলেন। বাংলার কৃষি সম্বন্ধে এই ব্যক্তির কোন যোগ্যতা বা জ্ঞান নাই। ডাঃ ঘোষ ইঁহাকেই চাকুরীতে পাকা করিয়া কার্য্যতঃ কৃষি বিভাগের ভার ইঁহারই হাতে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ফসল বৃদ্ধি আন্দোলন এবং কৃষির অন্তান্ত বরাদ্দের মধ্যে বহু কোটি টাকা খরচ হইয়াছে তন্মধ্যে অপচয় কত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণের জন্ত একটি কমিশন বসাইলে আশ্চর্য্যজনক বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ডাঃ ঘোষের অভয়-আশ্রম-গবর্ণমেণ্ট 'কৃষক মজুর রাজের' নামে প্রজাসাধারণের ঘাড়ে অনাবশ্যক ব্যয়ের যে সব দরাজ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহার হিসাব নিকাশের সময় একদিন আসিবেই। এখনও যাঁহারা ঐ পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন এই হিসাবনিকাশ হইতে তাঁহারাও রেহাই পাইবেন না। নিজের অন্তায় আরম্ভ করা এবং পরের অন্তায় অনুসরণ করা উভয়েরই ফল সমান বিষময়। শাসনযন্ত্র এমনই জিনিষ যে উহার শীর্ষদেশে উপযুক্ত ও সৎ লোক না বসাইয়া সুবিধাবাদী বা দুর্নীতিপরায়ণ বা অনুপযুক্ত লোক বসাইলে তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ব্যয়বৃদ্ধি ও চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা।

ব্যয়বৃদ্ধির কয়েকটি নমুনা

পশ্চিমবঙ্গ বাজেটের উপযুক্ত সমালোচনা করিতে গেলে একটি বই লিখিতে হয়। সুতরাং এখানে অল্প কয়েকটি ব্যয়ের নমুনা দেওয়া গেল। এই সব ব্যয় বৃদ্ধির পর ঐ সকল বিভাগের কর্ম্মদক্ষতা বাড়িবে অথবা কমিবে জনসাধারণ তাহা বিচার করিবে।

	গত বৎসরের বরাদ্দ	এ বৎসরের বরাদ্দ
মন্ত্রী	৩,৮৬,০০০৲	৫,২৪,০০০৲

(এস্থলে উল্লেখযোগ্য ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রীসংখ্যা সবচেয়ে বেশী।)

স্বরাষ্ট্র বিভাগ	৫,৮৬,০০০৲	৭,৩৮,০০০৲
অর্থ ,,	৩,৯৬,০০০৲	৪,৩২,৫০০৲
স্বাস্থ্য ,, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ,,	গত বৎসর পর্য্যন্ত একত্রে ছিল, মোট ব্যয় ১, ৫৩,৪০০৲	এবার হইতে আলাদা হইল মোট বরাদ্দ ২,৩৫,৯০০৲
ভূমি ,,	৮৫,৮০০৲	১,৪৬,০০০৲
কৃষি ,,	১,৪০,০০০৲	১,৫১,০০০৲
শিক্ষা ,,	৭৪,৩০০৲	১,২৮,৫০০৲

(এই বিভাগটিও আগে স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে একত্র ছিল)

অন্তান্য শাখা উপশাখা
সহ সেক্রেটারিয়েটের

মোট বরাদ্দ	৩৫,২০,০০০৲	৫০,৬৪,৫০০৲
বিভাগীয় কমিশনার ...	২,৫৩,০০০৲	৩,২০,৯০০৲
জেলা শাসন ...	৬৩,৯৮,৫০০৲	৭০,০৫,০০০৲
জেল ...	৫৩,৮৬,৭০০৲	৬৪,৫৭,৬০০৲
কলিকাতা পুলিস ...	১,০৫,৪৭,০০০৲	১,৪৫,৮৬,৪০০৲
জেলা পুলিস ...	২,০৮,১৪,৬০০৲	২,৩৬,২৬,৯০০৲

কৃষি বিভাগের ব্যয়বৃদ্ধি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬-৪৭ সালের অবিভক্ত বঙ্গের সঙ্গে উহার তুলনা দেওয়া হইল, তাহাতে অবস্থাটা ভাল করিয়া বুঝা যাইবে—

কৃষি বিভাগ

	অবিভক্ত বঙ্গ	বিভক্ত বঙ্গ	
	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০
ডিরেকশন	১,৬৬,৩০০৲	২,৩৮,০০০৲	২,২৯,০০০৲
সুপারিনটেণ্ডেন্স	৫,২৩,০০০৲	৪৪,২৮,০০০৲	৩৫,৭৭,০০০৲
এক্সপিরিমেণ্টাল কার্য্য	৪,৪৮,৪০০৲	২,৭১,০০০৲	২,০৮,৫০০৲
ডিমনষ্ট্রেশন ও প্রোপাগাণ্ডা	১,৩৬,৬২,৮০০৲	১,৬৫,৯৬,০০০৲	১,৬৫,৩৬,০০০৲

এই টাকার কি কাজ গত এক বৎসরে হইয়াছে তাহার হিসাব এবং রিপোর্ট দেওয়ার কোন দায়িত্ব কি কাহারও নাই? পাবলিসিটি বিভাগের ব্যয় ক্রমেই অস্বাভাবিক হারে বাড়িতেছে। গত সংখ্যায় আমরা যাহা দেখাইয়াছি এবার তাহার চেয়েও অনেক বেশী খরচ বাড়িয়াছে। গত বৎসর পাবলিসিটির মোট বরাদ্দ ছিল ৮,১০,১০০৲; এবার হইয়াছে ১২,৪৭,৫০০৲। তন্মধ্যে গত বৎসর অফিস খরচ ধরা হইয়াছিল ২,৮৫,০০০৲, এবার হইয়াছে ৭ লক্ষ টাকা। লোকে যদি কেবলই দেখে যে গবর্ণমেণ্ট অন্নবস্ত্র সরবরাহের দায়িত্ব লইয়া উহা দিতে পারেন না, চোরাকারবার বন্ধ হয় না, খাতে

ভেজাল নিবারণ হয় না, দ্রব্যমূল্য কেবল বাড়িতেই থাকে তবে পাবলিসিটি বিভাগের খরচ বাড়াইয়া অসন্তোষ বন্ধ করা যাইবে কি?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস একটি উপযুক্ত কমিশন বসাইয়া অনুসন্ধান করিলে শাসনযন্ত্রের ব্যয়হ্রাসের অনেক উপায় বাহির হইবে। ব্যয়হ্রাসের প্রস্তাবকে ডাঃ রায় glib talk বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এটা সমীচীন হয় নাই। অনাবশ্যক খরচ ও আড়ম্বর না কমাইলে সরকারী বিভাগগুলির দক্ষতাও কিছুতেই বাড়ানো যাইবে না।

বিক্রয়-কর সংশোধন

কয়লা, কাঠ, দেশলাই, সরিষার তেল প্রভৃতি নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলিকে বিক্রয় করের আওতায় আনিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল দেখা যাইতেছে গবর্মেণ্ট এখন তাহা প্রত্যাহারের দিকে মন দিয়াছেন। এই সবগুলিকেই করের আমল হইতে আবার বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হইতেছে। এ বিষয়ে গবর্মেণ্ট জনমতের নিকট যে নতি স্বীকার করিয়াছেন তাহা অতিশয় শুভলক্ষণ।

বিক্রয়-কর আপিসের গলদ সম্বন্ধে আমরা মাঝে মাঝে আলোচনা করিয়াছি। এবার এ বিষয়ে মন দেওয়া দরকার। কলিকাতা ভারতবর্ষের এখনও বৃহত্তম বাণিজ্য-কেন্দ্র, বাংলায় বিক্রয়-করের হার সর্ব্বোচ্চ, তথাপি আদায় এখানে অনেক প্রদেশের চেয়ে কম। ট্যাক্স আদায়ের গলদ ইহার প্রধান কারণ। কর্ম্মচারীরা ট্যাক্স আদায়ে সৎ ও দক্ষ না হইলে এক দিকে গাফিলতি দেখা দেয়, অপর দিকে বাহিরের নানা প্রভাব ও প্রলোভন আসে। বিক্রয়-কর এরূপ কিছু ঘটিতেছে কি না জানা দরকার। নূতন জিনিষগুলি করের আমলে আনিয়াও আবার যখন ছাড়িয়াই দেওয়া হইতেছে তখন ঐ বিভাগে কর্ম্মচারী সংখ্যা অনেক বাড়াইবার যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাও স্থগিত রাখিলেই হয়। তাহা না করিয়া লোক নিয়োগের ব্যবস্থা হওয়ার কারণ কি? ৬০০—১০৫০৲ টাকা বেতনে একজন এসিষ্টাণ্ট কমিশনার নিয়োগ পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে না জানাইয়া গোপনে সারিয়া লওয়ার চেষ্টাই বা হইতেছে কি উদ্দেশ্যে? বাড়তি অফিসারদের মধ্য হইতে একদল সাব-রেজিষ্ট্রার ও সাবডেপুটি কালেক্টারকে বিক্রয়কর আপিসে নিযুক্ত করা হইয়াছিল; ইঁহাদিগকে সরাইয়া আবার নূতন লোক লওয়া হইতেছে কেন? কর-আদায় বিভাগে এই ভাবে বার বার লোক বদলাইলে বহু টাকা বাকী পড়িয়া নষ্ট হয় কত তাহা জানিয়াও এই ব্যবস্থা করিবার জন্ম নিছক অদূরদর্শিতাই দায়ী অথবা অপর কোন কারণ আছে তাহা অনুসন্ধান করা উচিত। বিক্রয়-কর বিভাগটির কার্য্যকলাপ অবিলম্বে একটি উপযুক্ত কমিশনের দ্বারা তদন্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের ব্যয়ের বহর

কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের অধীনস্থ নানা বিভাগ কি করিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, তাহার একটা হিসাব হাতের কাছে আসিয়াছে। খাদ্যবিভাগের কর্ম্মচারীর সংখ্যা ছিল ৪০০, তাহা নাকি কমাইয়া আনা হইবে ২৮৯-তে; যান-বাহন বিভাগের সংখ্যা ছিল ২০২, তাহা কমানো হইবে—৬৬-এ, সংবাদপত্রে সংবাদ সরবরাহ বিভাগ—৪৬৪; কমিয়া হইবে—১২৬, পুস্তক প্রকাশ বিভাগ—১৫১, কমিয়া হইবে—৮৫, প্রচার বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী—১১, কমিয়া হইবে—৪। সংখ্যা কমানো ব্যাপারটা কতদূর সফল হইবে তাহা জানি না। তবে এই কথা শুনিয়াছি ও দেখিতেছি যে নোকরসাহীর (bureaucracy) কর্ম্মপদ্ধতি সংখ্যা-বৃদ্ধির তাড়নায় পরিচালিত হয়।

আর একটা হিসাবে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের নানা বিভাগের ব্যয়ের বহর দেখিলাম। ১৯৩৮-৩৯ সাল ও ১৯৪৮-৪৯—এই দুই বৎসরের ব্যয়ের তুলনা ইহাতে পাওয়া যাইবে। নিম্নে তাহা দেওয়া হইল:

		১৯৩৮-৩৯	১৯৪৮-৪৯
		ল টাকা	লক্ষ টাকা
স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রীর	বিভাগ	২৮'৩১	৩৪'৭৫
অর্থ	”	১৫'৯৮	৮০'৭৬
ব্যবসায় বাণিজ্য	”	৬'১০	৪৫'৮২
যান-বাহন	”	২'৯৩	২১'০৬
কৃষি	”	...	২৯'৪২
শিক্ষা	”	...	২৯'৩৩
স্বাস্থ্য	”	...	৭'২৩
শিল্প ও সরবরাহ	”	...	২১'৯৬
পুনর্ব্বসতি	”	...	১৩'০০
পররাষ্ট্র	”	...	৩৬'০৪
প্রচার	”	...	১০২'৬৯
হিসাব পরীক্ষা	”	৯৮'৮৯	১৮৯'৫৮
পররাষ্ট্র	”	৬৩'৮৭	২০৮'৮১
আদিম অধিবাসী	”	৯৯'২০	৬২'৫৭
শিল্প ও সরবাহ	”	...	৩৯৩'৭১
আকাশযান	”	২৯'৮৪	২১৩'০৮
বেতার প্রচার	”	২০'৫৭	১৩২'৫৭
পূর্ত্ত	”	৮৭'৩০	৫০৭'৩১

এই ব্যয়ের বহর সম্বন্ধে কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভারত-রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের নিকট কোন জবাব দেন নাই। ব্যয় বাড়িয়াছে বা বাড়িতেছে—তার বেশী কোন কারণ প্রদর্শনের চেষ্টা আমাদের গোচরে আসে নাই। কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্যবৃন্দ দফাওয়ারিভাবে এই ব্যয়ের নিন্দা করিয়াছেন; কোন একটি

বিভাগে ব্যয়বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন মন্ত্রীকে জবাবদিহি করিতে পারেন নাই। এক এক জন সভ্যমহাশয় যদি এক এক বিভাগের ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ সমালোচনা করিতেন, তবে মন্ত্রিমহাশয়দের টনক নড়িত। বর্ত্তমানে অবস্থা দেখিয়া মনে হয় মন্ত্রিমণ্ডলী ও সভ্যবৃন্দ এই ভাবিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেছেন—"লাগে টাকা, দিবে গৌরী সেন।" তাঁরা নিজের নিজের সংসারের হিসাবে এই নীতির প্রশ্রয় দেন কিনা জানিতে ইচ্ছা হয়।

ভারতরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয়

কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে ভারত-রাষ্ট্রের সামরিক ব্যয়ের তালিকা পেশ করিতে গিয়া সমর-সচিব সর্দ্দার বলদেও সিংহ কিঞ্চিদধিক ১২১ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের বর্ণনা করেন। সৈন্যবাহিনীর জন্য ব্যয় হইবে প্রায় ৬৫।০ কোটি টাকা; নৌ-বাহিনীর জন্য ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার উপর, এবং বিমান বিভাগের জন্য প্রায় ১৩ কোটি টাকা, অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দিবার ব্যয় পড়িবে পৌনে ২৬ কোটি টাকা, এবং সমর বিভাগের অ-সামরিক নানা বিভাগের জন্য ব্যয় পড়িবে ১১।০ কোটি টাকা। প্রকৃত ব্যয় কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অনেক বেশী পড়িয়াছে—ঐ বৎসরেই। সর্দ্দার বলদেও সিংহের উক্তি যে সত্য তাহা ১৯৪৯-৫০ সালের সম্ভাব্য ব্যয়ের বহর দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত দেশরক্ষার বিভিন্ন বিভাগের ব্যয় পড়িবে ১৭১ কোটি ৯০ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। সপরিষদ রাষ্ট্রপাল এই দাবি উপস্থিত করিয়াছেন, এবং আইন পরিষদও এই ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছে।

বিগত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয় ছিল প্রায় ৬০ কোটি টাকার সমান। তখন নৌ-বিভাগ ও বিমান-বিভাগের অস্তিত্ব ছিল না বলিলেই হয়। এই ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ের বিরুদ্ধে আমরা প্রতি বৎসর প্রবল আপত্তি জানাইতাম। আজ বিনা আপত্তিতে তার তিন গুণ ব্যয় আমরা মানিয়া লইতেছি। সস্তায় দেশ-রক্ষা করা যায় না—স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা এই তত্ত্বের মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেছি; স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি।

স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে এইরূপ সামরিক ব্যয় অল্প-বিস্তর অপরিহার্য্য—যেহেতু আধুনিক সভ্যতার বিধানে পররাজ্য শত্রুরাজ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। সেই দিনের "পাকিস্থান" কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া এই সত্য প্রমাণ করিয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের দপ্তরে এইরূপ বহু শত্রুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। এই গবেষণার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের সামরিক ব্যয়। পররাষ্ট্র বিভাগ নিকটের ও দূরের শত্রু-মিত্রের অবস্থান সম্বন্ধে যেভাবে সজাগ থাকিবে, সেইভাবে ভারতরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রিত হইবে।

গত ২৫শে ফাল্গুন কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারতরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে, তদুপলক্ষে প্রায় সকল সভ্যই এই অভিমত জোরের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তর যুগের রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন যে দুইটি বিরোধী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর নেতৃত্ব করিতেছে, তাহার কোনটাতেই আমরা যোগদান করিতে পারিব না। এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা সহজ হইবে না। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ 'অনিবার্য্য' বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন এবং তাহার জন্য সকল রাষ্ট্রই কেবলমাত্র সামরিক দিক হইতেই প্রস্তুত হইতেছেন না, মানসিক দিক হইতেও যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে।" এই অবস্থায় ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে এই উভয়বিধ "প্রস্তুতি" অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছে।

এই প্রস্তুতির উপায় কি, আয়োজনের ব্যবস্থা কি ভাবে করা হইতেছে, তাহা আমাদের কল্পনা করিয়া লইতে হইতেছে। পণ্ডিত নেহরু বা সর্দ্দার বলদেও সিংহ এই কথা হাটের মধ্যে ভাঙিবেন না; ভাঙিতে পারেন না। মন্ত্রগুপ্তি বলিয়া একটা কথা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রচলিত আছে। গণতন্ত্রেও তাহা রক্ষণীয়। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু আমাদের শুনাইয়াছেন যে যুদ্ধের সাজসরঞ্জামের জন্য এখন পর্য্যন্ত আমাদের একান্ত ভাবে নির্ভর করিতে হইতেছে বিলাতের উপর। এই নির্ভরতা বিলাতের সমরনায়ক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের নিকট আমাদের মন্ত্রগুপ্তি ফাঁস করিয়া দিতেছে; ফলে মার্কিন মুলুক ও ব্রিটেনের সংযুক্ত সমরনায়ক কমিটির (Combined Chiefs of Staff Committee) নিকটও আমাদের আয়োজন-উদ্যোগ গোপন থাকিতেছে না। এই পরনির্ভরশীলতা হইতে মুক্তিলাভ না করিতে পারিলে, আমাদের রাষ্ট্রের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকিবার কথা কল্পনায় পর্য্যবসিত হইবে।

ইংরেজী-ভাষাভাষী এই দুই রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে চাহিলে তাহার জন্য একটা মূল্য দিতে হইবে; সোভিয়েট ইউনিয়নও অনুরূপ মূল্য দাবী করিবে। এই টানা-হেঁচড়ার মধ্যে পড়িয়া কর্ত্তব্য স্থির করা কঠিন। যে দুই রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর বিবাদের মধ্যে আমরা নিরপেক্ষ থাকিতে চাই, তাহা সম্ভব হইবে তখনই যখন এই দুই শক্তিপুঞ্জের সাহায্য ব্যতিরেকেও আমরা সামরিক দিক হইতে শক্তিশালী হইতে পারিব।

সেনাপতিবর্গের শিক্ষা

স্কুল কলেজের শিক্ষকবর্গ ও ছাত্রবৃন্দের মধ্যে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে গত সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সভায় আইন পাস হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক-দের কেহ কেহ সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, এই জল্পনা

আমরা করিতে পারি। ভারতরাষ্ট্রের নানা প্রদেশে এই ব্যবস্থা অনুযায়ী শিক্ষা চলিতেছে। এই সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পশ্চিমবঙ্গের প্রচার বিভাগ কর্তৃক পরিবেশিত হইতেছে বলিয়া মনে পড়ে না। একখানি অ-বাঙালী ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় দেখিলাম যে স্কুল-কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দের সামরিক শিক্ষার কার্য্যে বোম্বাই প্রদেশ প্রথম স্থান অধিকার করিতেছে; তথায় প্রায় ৬,৮৩১ জন শিক্ষক ও ছাত্র এই শিক্ষালাভ করিতেছেন। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেছেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী; এই প্রদেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫,২২০। কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দকে সিনিয়ার ডিভিসনে (Senior Division) শিক্ষা দেওয়া হয়; স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ জুনিয়ার ডিভিসনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। যে বিবরণী হইতে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি, তাহাতে এমন কিছু দেখিলাম না যে, শিক্ষার ব্যাপারে কোন তারতম্য করা হয়। আর একটা কথা পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি যে, আগামী গ্রীষ্মের ছুটির পরেই স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের মধ্যেও এইরূপ শিক্ষার প্রবর্তন করা হইবে।

ইংরেজ আমলেও কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দের এরূপ শিক্ষার একটা ব্যবস্থা ছিল; ১৯১৭-১৮ সালে দেখিতে পাই সুভাষচন্দ্র বসু এরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন। কিন্তু সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সেই শিক্ষা দান করা হইত; পদাতিক বাহিনীর উপযোগী শিক্ষার ভিন্নাংশ মাত্র দেওয়া হইত। ভারতরাষ্ট্রে এই শিক্ষাকে ব্যাপক করা হইয়াছে; সামরিক বৃত্তির সকল বিভাগের শিক্ষা দান করা হইবে—সৈন্য-বাহিনীর শিক্ষা, নৌ-বাহিনীর শিক্ষা, বিমান-বাহিনীর শিক্ষা দেওয়া হইবে এই পরিকল্পনা অনুসারে। বর্তমানে এই শিক্ষার্থী-বাহিনীর ১,৩০,০০০ সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১৮ বৎসর হইতে ৩৫ বৎসরের যে কেহ এই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন। এই শিক্ষায় শিক্ষিতেরা দেশের আপদ্ সময়ে সমগ্র সামরিক বাহিনীর পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিবেন—(Second line of defence in an emergency)। ইহারা ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুসারে সামরিক-বাহিনীর সম্প্রসারণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন।

এই শিক্ষাদান কার্য্যের জন্য ভারতরাষ্ট্রকে ৮টি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে—(১) দিল্লী; পূর্ব্ব-পঞ্জাব; রাজস্থান; মৎস্য-দেশ; মধ্য-ভারত; ভুপাল; পাতিয়ালা; পূর্ব্ব-পঞ্জাব ইউনিয়ন এবং হিমাচল প্রদেশ; (২) যুক্ত-প্রদেশ; রামপুর ও তেহ্রী-গাড়ওয়াল রাজ্য; এবং বিন্ধ্যপ্রদেশ; (৩) মধ্যপ্রদেশ বেরার ও তদন্তর্গত রাজ্যসমূহ; (৪) বোম্বাই প্রদেশ, বরোদা ও কোলাপুর রাজ্য ও সৌরাষ্ট্র ইউনিয়ন; (৫) মাদ্রাজ, কুর্গ, মহীশূর, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর; (৬) বিহার ও উড়িষ্যা ও তদন্তর্গত রাজ্য-সমষ্টি; (৭) পশ্চিমবঙ্গ; (৮) আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা ও কুচবিহার রাজ্য।

এই ভাগ-বাটোয়ারা সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। কুচবিহার রাজ্যকে কেন পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে তাহার কারণ বুঝিলাম না; আসামের গবর্ণরকে কুচবিহার রাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হইয়াছে কেন, তৎসম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের করণীয় কিছু আছে কিনা, তাহা আমাদের জানিতে হইবে। বাঙালী-প্রধান ত্রিপুরা রাজ্যেরও সেই অবস্থা; এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের লোকের বক্তব্য শুনিবার প্রয়োজন আছে; এই কথাটা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। বাঙালী হিন্দুর জন্য সম্প্রসারিত বাস্তভূমি চাই; পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে বিহারের অন্তর্ভুক্ত বাঙালীপ্রধান স্থান আছে; বাঙালীপ্রধান ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরে বিস্তৃত ভূমিখণ্ড অপেক্ষা করিয়া আছে বাঙালী হিন্দুর জন্য। যাহারা বাধ্য হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সরিয়া আসিতেছে—এই কথাটা ভুলিলে চলিবে না, এবং ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াই আমরা সামরিক-শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে বাঙালী হিন্দুর জীবন-মরণ সমস্যার কথা জুড়িয়া দিয়াছি।

সামরিক-শিক্ষার এই নূতন ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক আর একটা কথা স্মরণে আনিতে চাই। ইংরেজ আমলে বাঙালীর সামরিক ঐতিহ্য নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য কেবল সেনাপতিবর্গ সৃষ্টির চেষ্টা করিলে চলিবে না; চাই ব্যাপক সামরিক শিক্ষা যাহা সমাজের সকল স্তরের ও শ্রেণীর মধ্যে সামরিক ভাব জাগাইয়া তুলিবে। এজন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া বাঙালীর পক্ষে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙালী সেনাপতি, বাঙালী বিমান বিভাগের কর্তা দেখা গিয়াছে, কিন্তু এরূপ দুইটি বিশ্ব-যুদ্ধের পরেও বাঙালী পদাতিক, বাঙালী গোলন্দাজ দেখা যায় নাই। এই লজ্জা দূর করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টকে এই বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে। বিক্ষিপ্ত ও হৃত-জল বাঙালী সমাজকে সংবদ্ধ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সামরিক নীতি পরিবর্তনের দাবি করিতে দ্বিধা করিবার সময় আর নাই। এই কথা ঢাকিয়া রাখিবার উপায় আর নাই যে, এখনও সামরিক বিভাগে ব্রিটিশ প্রবর্তিত সামরিক জাতিদের (martial races) বর্তমান আছে। উপরোক্ত প্রথম অঞ্চল হইতে এখনও শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক সামরিক বিভাগে সংগ্রহ করা হয়; গত বিশ্ব-যুদ্ধের কল্যাণে দক্ষিণ ভারতের লোক—মাদ্রাজী-মারাঠি সম্প্রদায়ের লোক—শতকরা ১৫ জনের জন্য স্থান করিতে সক্ষম হইয়াছে; বাকী শত-করা ১৫ জন ভারতরাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হয়।

এই অসম ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হইতেছে। ভারতরাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতি কারিয়াপ্পা সম্প্রতি কলিকাতা আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট এই বিষয়ে দরবার করা হইয়াছে এবং তিনি আমাদের আশ্বস্ত করিয়াছেন যে, সামরিক বিভাগে লোক সংগ্রহে কোন ভেদ বিভেদ থাকিবে না। এই প্রতিশ্রুতির সুযোগ গ্রহণ করিবার কৌশল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অজানা থাকিবার কথা নয়। পশ্চিমবঙ্গে সামরিক শিক্ষা ও ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহাশয়কে সামরিক বৃত্তিতে বাঙালীর সুযোগ সম্প্রসারণের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, এবং এই বিষয়ে সকল তথ্য বাঙালী সমাজের গোচরে আনিবার দায়িত্ব প্রচার বিভাগের নূতন ডিরেক্টরের উপর বর্ত্তাইয়াছে। এই কর্ত্তব্যে অবহেলা করিবার, গড়িমসি করিয়া সময় কাটাইবার অবকাশ আর নাই।

পশ্চিমবঙ্গে রক্ষীদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, শিক্ষাদান এবং শিক্ষিত রক্ষী ও স্বেচ্ছাসেবকদিগকে কর্ম্মপটু রাখার ব্যবস্থা এই বৎসর হইতে করা হইতেছে ইহা আনন্দের বিষয়। কিন্তু এই কার্য্যের জন্য যেরূপ আর্থিক ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, এই বিষয়ের গুরুত্ব বা ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অর্থসচিবকে কিছুই জানানো হয় নাই। নতুবা এরূপ ব্যাপারে "ছিটে কোঁটা" ব্যবস্থা হইবার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাঙালীর মধ্যে সামরিক মনোবৃত্তি জাগাইবার জন্য এক বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন। ছেলেখেলায় তাহা হইবার নহে।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অবস্থা

গত মাসের "প্রবাসী"তে এই বিষয়ে আমরা শিক্ষিত সমাজের মানসিক নানা বাধা সম্বন্ধে দুই-একটা ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। এই মাসে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে সব ব্যবস্থার সূচনা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচলিত শিক্ষা ও বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শগত ও ব্যবহারগত বিরোধের মীমাংসা এখনও হয় নাই। আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রী ও তাঁহার দপ্তর বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে মনস্থির করিতে পারেন নাই; তাঁহাদের দ্বিধার কারণ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে কোন কথা তাঁহারা বলিতেছেন না; তাঁহাদের নিযুক্ত কমিটিতে নানা আপত্তি উঠিয়াছে যাহা তাঁহাদের দ্বিরূপ ভাবের পরিচায়ক। গত ১৫ই ফাল্গুন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রাথমিক শিক্ষকবৃন্দের অভাবপূর্ণ জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। দৈনিক সংবাদপত্রে এই বক্তৃতার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে আমরা বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে কোন মতামতের ইঙ্গিত পাইলাম না। তিনি প্রাথমিক শিক্ষকবৃন্দকে সান্ত্বনাদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এই বলিয়া যে নূতন ব্যবস্থা অনুসারে তাঁহারা মাগ্‌গিভাতাসহ ৩৬৷০, ২৮৷০ ও ২৪৷৷০ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পাইবেন। এই বৃত্তির পরও "সরকার মনে করেন যে প্রয়োজনানুপাতে বেতন বৃদ্ধি হয় নাই।" কিন্তু তাঁহারা নিরুপায়; পশ্চিমবঙ্গের এমন সঙ্গতি নাই যে, ইহার অধিক প্রাথমিক শিক্ষকবর্গকে দেওয়া যাইতে পারে। এই আর্থিক অনটন সম্পর্কে সম্মেলনে সভাপতি শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যুক্তি প্রণিধানযোগ্য। বিজয়বাবু গান্ধীবাদে বিশ্বাসী, গান্ধীজীর সামাজিক আদর্শের, সর্ব্বোদয় সমাজের সাধক; বুনিয়াদি শিক্ষা তিনি ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আর্থিক অনটন সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পৃথক।

> "শিক্ষকদের অভাবপূরণের দায় সমাজের অর্থাৎ সমগ্র দেশের সমস্ত বয়স্ক জনসাধারণের। শুধু তাহাই নহে, আজ যখন দেশব্যাপী দুর্দ্দিন ও অনটন চলিয়াছে, তখন অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীরাই বা মনুষ্যত্বের এই দায় হইতে রেহাই পাইবে কেন? সাধ্যমত এ দায় তাহারাও স্বীকার করিবে এবং শিশুকাল হইতেই এই দায়িত্ব স্বীকার করিয়া চলার গৌরব অর্জন করিবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার উল্লেখ করেন এবং বলেন, এই শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থিগণ প্রাথমিক শিক্ষার আংশিক ব্যয়ভার বহনে সমর্থ হইবেন। তিনি আরও বলেন যে, শিক্ষার ব্যয়ভার শিক্ষার্থীরা যদি আংশিকভাবে বহন না করে তাহা হইলে এদেশে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা সম্ভব হইবে না।"

এই ত গেল প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা। অর্থের অভাবের জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগ বয়স্ক শিক্ষার জন্য গৃহীত পরিকল্পনাকে গোঁজামিল দিয়া রূপ দিতে চায়। ১০ লক্ষ বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষার জন্য ৬০০টি স্কুল লইয়া কার্য্য আরম্ভ হইবে। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে বয়স্ক শিক্ষার আয়োজন বিরাট, লোকের উৎসাহ জল-স্রোতের মত পরিকল্পনাকে সার্থকতার দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। শুনিয়াছি এক হাজার শিক্ষার্থী নাকি ২৷৩ মাসের মধ্যে এক একটি কেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মধ্যপ্রদেশের প্রচেষ্টার উদ্যোগ-আয়োজন দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি কি দেখিয়া আসিয়াছেন, কি শুনিয়াছেন, সেই অভিজ্ঞতার কথা সাধারণের নিকট বলিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। সরকারী কায়দায়, অজ্ঞাত পথে বয়স্ক শিক্ষার পরিকল্পনা রূপ গ্রহণ করিতেছে। পাঁচ শত পুরুষ শিক্ষককে ও এক শত মেয়ে শিক্ষককে নূতন ভাবে শিক্ষাদানের জন্য নূতন পাঠ লইতে হইতেছে।

এইরূপ বয়স্ক-শিক্ষাদানে যে সব বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান

গত ১০।১৫ বৎসর হইতে হাত পাকাইতেছেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সাহায্য না পাইলে এই প্রচেষ্টা সার্থক হইবে না, এই কথা জানিয়া আমরা আশা করি যে, শিক্ষা-বিভাগ তাঁহাদের সহযোগিতা আহ্বান করিবেন। তাঁহাদের হাতে ১৫৲ টাকা সরকারী কর্মচারীর হাতে ১০০৲ টাকার সমান কাজ করিবে।

এই সম্পর্কে দুই জন ব্রহ্মদেশীয় শিক্ষাবিদের অভিমত প্রকাশ করিতে চাই। তাঁহারা মধ্যপ্রদেশের বয়স্ক-শিক্ষার উদ্যোগ-আয়োজন ও উপায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আসিয়াছিলেন। যে ব্যবস্থা দেখিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থায় দুঃখ প্রকাশ করিলেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিশ্রান্ত শিক্ষকবৃন্দকে বয়স্ক-শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে ব্যবস্থা অন্যরূপ। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করা যুবকবৃন্দকে ছয় মাস বিশেষ শিক্ষাদান করিয়া গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হয়; তাঁহাদের মাসিক বেতন নাকি ১৫০ টাকা। আমরা ত শুনিয়াছি যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কল্যাণে ব্রহ্মদেশে সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণ। সে কথা যাক, ব্রহ্মদেশে এই ব্যাপক শিক্ষাদানের নিয়ামক শিক্ষা-মন্ত্রীর তাঁবেদার কোন সরকারী বিভাগ নয়; এই কার্য্যের ভার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে যাহা প্রায়-স্বাধীন (autonomous)। গত কয়েক মাসের "প্রবাসী"তে আমরাও এরূপ স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি। বয়স্ক-শিক্ষা কমিটি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই; শিক্ষা-বিভাগ পরামর্শদাতা কমিটি (Advisory Committee) গ্রহণে অনিচ্ছুক নয় বলিয়া শুনিয়াছি। এই বিষয়ে মনে নানা দ্বিধা পোষণ করিয়াও এই নূতন প্রচেষ্টা সফল হউক, এই কামনা করি।

বাস্তুত্যাগী সমস্যা

গত দুই সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তত্যাগী হিন্দুর সমস্যা সম্পর্কে ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণেমণ্ট একটু তৎপর হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ইহা স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তত্যাগীদের দুরবস্থার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় নাই; দিল্লী হইতে দূর বলিয়া তাঁহারা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে পারে নাই যেমন করিয়াছে "পশ্চিম পাকিস্থানের" হিন্দু-শিখ। পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তত্যাগীদের "বন্ধুর" সংখ্যা এমনভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহাদের সমর্থনে এত লোক অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণেমণ্ট দিশেহারার মত কাজ করিয়াছেন। এই "বন্ধু"বর্গের চীৎকারে উত্যক্ত হইয়া তাঁহারা টাকা ঢুকিয়া দিয়াছেন; "বন্ধু"বর্গ তাহা লুকাইয়াছে; বাস্তত্যাগীরা তাহা পায় নাই। সম্প্রতি কয়েকটি বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষীয়েরা "লাল বাতি" জ্বালিয়াছে; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বাস্তত্যাগীদের "বন্ধুর" আচ্ছাদনে তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ লইয়াছে। এই প্রকার লুণ্ঠনকার্য্যে আইন কোন বাধা দিতে পারে নাই এবং পরস্বাপহারীরা কলিকাতার বুকের উপর দিয়া বুক ফুলাইয়া মোটর হাঁকাইয়া বেড়ায়।

এই সব বার্ত্তা কেন্দ্রীয় গবর্ণেমণ্টের কানে পৌঁছিয়াছে নিশ্চয়ই—বিলম্বে, এবং তাঁহারা বার্ত্তা লইবার জন্য পুনর্ব্বসতি সচিব প্রভৃতি বরেণ্য লোকদের পাঠাইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে আসিয়াছিলেন এই বিভাগের উপদেষ্টা শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে কেন্দ্রীয় গবর্ণেমণ্ট অবস্থার গুরুত্বটা বুঝিয়াছেন; পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তত্যাগীদের লইয়া যে জুয়াচুরী চলিয়াছে তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। খান্না মহাশয়ের বিবৃতি হইতে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

> "দুর্ভাগ্যক্রমে প্রয়োজনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী-সংখ্যক প্রতিষ্ঠান আশ্রয়প্রার্থী সেবাকার্য চালাইতেছে। এইভাবে শক্তির অপচয় অগৌণে বন্ধ করা কর্ত্তব্য। সেবাকার্য্যে রত প্রতিষ্ঠানগুলির মিলিত হইয়া দিল্লীর নিখিল-ভারত আশ্রয়প্রার্থী সমিতির অনুরূপভাবে কাজ করা উচিত। ঐভাবে গঠিত প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিমূলক হইয়া দাঁড়াইবে এবং জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষের নিকট উক্ত প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐভাবে গঠিত প্রতিষ্ঠানের সহিত সরকারী সহযোগিতা ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিবে এবং ঐ প্রতিষ্ঠান অধিকতর কার্য্যকরীভাবে জনসেবা করিতে সমর্থ হইবে।
>
> "দুঃখদুর্দ্দশাগ্রস্ত ও মন্দভাগ্য আশ্রয়প্রার্থী নরনারীর ভাগ্য লইয়া রাজনৈতিক জুয়ায় প্রবৃত্ত হওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ তুল্য।"

"বেশী সংখ্যক প্রতিষ্ঠান" বাস্তত্যাগী সমস্যাকে জটিল করিয়াছে; পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণেমণ্ট এই প্রতিষ্ঠানসমূহের লালসা সংযত করিতে চেষ্টা করেন নাই। কেন পারেন নাই, সেই প্রশ্ন তুলিয়া আর কোন লাভ নাই। কিন্তু "দুঃখদুর্দ্দশাগ্রস্ত ও মন্দভাগ্য আশ্রয়প্রার্থী নরনারীর ভাগ্য লইয়া" যাহারা "জুয়া খেলায় প্রবৃত্ত হইয়া দণ্ডনীয় অপরাধ" করিয়াছে, তাহাদের শাস্তিদানে গবর্ণেমণ্ট তৎপর হইতেছেন না কেন, সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা চাহিতেছি।

ভারতরাষ্ট্রে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন

কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের বিরাট দায় ব্যর্থ করিয়া ভারত-রাষ্ট্রের কৃষককুল কেন প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিল না তৎসম্বন্ধে নানা মুনির নানা মতের অরণ্যে দিশেহারা হইয়া যাইতে হয়। এই বাক্য-দ্বন্দ্বে যোগদান

করিবার ইচ্ছাও হয় না। কারণ প্রায় সকলেই মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন, খাদ্য-উৎপাদনকারী প্রকৃত কৃষকের মুখে এই বিষয়ে কেহ ভাষা ফুটাইতে পারেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মতামত প্রকাশ করেন, তাঁহারা কেহই হাতে-কলমে চাষবাস করেন না। সুতরাং আমরা 'বাঁশবনে ডোম কানার' মত হাতড়াইয়া দিনগত পাপক্ষয় করিতেছি। অতীত ও বর্তমানের ব্যর্থতা লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। একটু আশার কথা শুনিলে মনে শান্তি পাওয়া যাইবে, এই ভরসায় কেন্দ্রীয় পূর্ত ও বিদ্যুৎ বিভাগের সেক্রেটারী শ্রী বি. কে. গোখলের বেতার বক্তৃতার কিয়দংশ তুলিয়া দিতেছি। ১৯৫১ সালের মধ্যে দশ কোটি মণ খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, এই আশা পণ্ডিত নেহরু প্রকাশ করিয়াছেন।

"বর্তমানে গবর্মেণ্টের হাতে যে সকল নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনা রহিয়াছে সেগুলি কার্যকরী হইলে প্রায় ৬০ লক্ষ একর (১৮০ লক্ষ বিঘা) জমিতে জলসেচ করা চলিবে। দামোদর পরিকল্পনা দ্বারা বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে ৯ লক্ষ একর, বাখরা পরিকল্পনা দ্বারা পূর্ব্ব পঞ্জাবে ৩০ লক্ষাধিক একর, তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা দ্বারা মাদ্রাজ ও হায়দরাবাদে কিছু কম ১০ লক্ষ একর, হীরাকুণ্ড পরিকল্পনা দ্বারা উড়িষ্যাতে ১০ লক্ষাধিক একর জমিতে সেচ-কার্য্য চলিবে। কেন্দ্রীয় নদীনালা, সেচ ও নৌ চলাচল কমিশন, প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্য গবর্ণমেণ্টদিগের হাতে এইরূপ কয়েকটি পরিকল্পনা রহিয়াছে। এই পরিকল্পনা-সমূহ কার্য্যকরী হইলে অতিরিক্ত ৮০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য এবং ১ কোটি ৪০ লক্ষ কিলোওয়াট জলতাড়িত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। অর্থাৎ আমাদের জলসম্পদের কিয়দংশ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে প্রতি বৎসর ৩০০-৪০০ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়া যাইবে।

"বহুমুখী উন্নয়ন সময়সাপেক্ষ। নদীর উপর সু-উচ্চ বাঁধ নির্মাণের পূর্ব্বে পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশেষ ও বিস্তৃত অনুসন্ধান আবশ্যক। শত শত বৎসরের অবহেলা মাত্র কয়েক বৎসরে প্রতিকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের স্বল্পমেয়াদী যে কয়েকটি পরিকল্পনা আছে সেগুলি কার্য্য-করী হইলে অপেক্ষাকৃত কম খরচে বহু পরিমাণ জমিতে সেচকার্য্য চালান যাইবে। বৃহৎ পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সেচব্যবস্থা যথাসম্ভব কার্য্যকরী করার প্রচেষ্টা চলিতেছে।"

এই ভরসার কথার মধ্যে বাস্তবের কঠোর মূর্ত্তি ভারত-রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দকে সন্ত্রস্ত করিতেছে। এই বৎসর নাকি বিদেশ হইতে ১০ কোটি মণ খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইবে, অদ্ভুত ঘরের পয়সা বাহির করিয়া দিতে হইবে ১০০ কোটি টাকা। ভারতরাষ্ট্রের ও গৌরাষ্ট্রের কোন কোন অংশে ত ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট সজাগ আছেন বলিয়া ১৯৪৩ সালে বাংলা যে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া গিয়াছিল, তাহার পুনরভিনয় হইবে না। মাথাপিছু লোকের খাদ্য-শস্যের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ হইতে নাকি সে পরিমাণ কম। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চাষীকে ধানের দাম বৃদ্ধির আন্দোলন করায় জন উস্কানী দেওয়া হইতেছে, ফলে চাষী হাত গুটাইলে অবস্থা সঙ্গীন হইতে পারে। তৎসত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ বিভাগের সহ-মন্ত্রী ভরসার কথা শুনাইতেছেন। চাষের কর্ম্মে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ও তাহাদের উপার্জ্জনের বর্ণনা তিনি দিয়াছেন,—

"বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, লাঙ্গলে জমি চাষ করে এরূপ কৃষকের সংখ্যা ৫৮ লক্ষ জন এবং ভাগচাষীর কৃষি-মজুর প্রায় ১৭ লক্ষ। মোট ৭৫ লক্ষ জনের কর্মশক্তির পরেই পশ্চিম বাংলার খাদ্যদ্রব্য নির্ভর করছে। দেশের মজুররা নানা নামে পরিচিত। কৃষি-মজুরদের কথা অনেকেই জানেন। এরা কলখানার মজুর নয়, এরা নগদ পয়সা নিয়ে মজুরী খাটে না, গ্রামের মজুর ভাত মুড়ি অথবা চাল ডাল সমেত কিছু মজুরী পায়। মজুরীর হার অবশ্য অল্প আর এই অল্প মজুরীর বিনিময়েই এরা যুগ যুগ ধরে স্ত্রী-পুত্রসহ কৃষিকাজে মজুর হয়ে রয়েছে, এবং সরকারী শস্য সংগ্রহের কথা শুনিয়ে আমাদের নির্ভর থাকবার জন্য অনুরোধ করেছেন। বিগত বর্ষে বিদেশ হতে চব্বিশ লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার মণ চাল কিনে আনতে হয়। তার মধ্যে উড়িষ্যা থেকে দু' লক্ষ সাতাশ হাজার মণ, আসাম থেকে ঊনপঞ্চাশ হাজার মণ এবং বাকী ২১ লক্ষ ৮৩ হাজার মণ বিদেশ হতে কিনতে হয়েছিল। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এ বৎসরের ধান ও চালের সংগ্রহ গত বৎসরের এই সময়ের সংগ্রহ অপেক্ষা ভাল। ১৯৪৯ সালে বীরভূমে ধান চাল সংগ্রহ ১৯৪৮ সালের তুলনায় প্রায় দেড়গুণ বেশী। এখানে প্রত্যেক চাষীর স্বেচ্ছায় বিক্রীত ধান চালে সরকারী গুদাম গড়ে উঠছে। বর্দ্ধমানেও আশানুরূপ সংগ্রহ হচ্ছে। পশ্চিম দিনাজপুরে গত বৎসর প্রায় ১০ লক্ষ মণ চাল সংগ্রহ হয়েছিল কিন্তু যানবাহনের অভাবে মাত্র দেড় লক্ষ মণ কলকাতায় আনা সম্ভব হয়েছিল।" এই বর্ণনার মধ্যে আমরা ভরসা পাইতেছি না। পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন বাড়িয়াছে, এই কথা শুনিতে পাইলে আশ্বস্ত হইতাম।

ভাষার ভিত্তির উপর প্রদেশ গঠন—শ্রীঅরবিন্দের মত

ভারতরাষ্ট্রের দুই জন সর্বপ্রধান নেতা পণ্ডিত জবাহর-লাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বর্তমানে ভাষার ভিত্তির উপর ভারতরাষ্ট্রের পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মত প্রকাশের মধ্যে তাঁহাদের একটা

অসহিষ্ণুতা এরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা আমাদের মত অনেককেই ব্যথিত করিয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের জীবনে এমন কতকগুলি সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহা না মিটাইয়া অন্ত কোন কাজে হাত দিবার সামর্থ্য ও অবসর তাঁহাদের নাই—এই কথাকয়টি তাঁহারা নানা ভাবে আমাদের শুনাইতেছেন। কিন্তু দেশের লোক ইহার মধ্যে কোন সান্ত্বনা পাইতেছে না; এবং যতই তাঁহারা আমাদের সাবধান করিতেছেন ততই দেশের লোক অস্থির হইয়া উঠিতেছে।

এমন কি, যাঁহারা রাজনীতিক গতানুগতিক আলাপ-আলোচনা হইতে দূরে আছেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নানা উক্তিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। শ্রীঅরবিন্দ এই পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার মাহাত্ম্যের স্বীকৃতির প্রমাণ-স্বরূপ "শ্রীকট্টোমাঞ্চি রামলিঙ্গ রেড্ডি জাতীয় পুরস্কার" শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশে প্রদান করেন। এতদুপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয় তাহাতে শ্রীঅরবিন্দ একটি "বাণী" প্রদান করেন। তাহার মধ্যে ভারত-ইতিহাসের মূল সত্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য "ইংরেজের কৃত কৃত্রিম প্রদেশ ভাগের পরিবর্ত্তে নূতন রকম একটা স্বাভাবিক দেশ বিভাগের দাবী" সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করেন। আমরা তাহা "সারথি" (সাপ্তাহিক) হইতে নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

"ভারতের প্রাচীন যে পদ্ধতি ঐক্যের মধ্যে বহুত্ব—তার উপর প্রতিষ্ঠিত। এক দিকে হিমালয় আর এক দিকে মহাসাগর, এই দুই সীমানার মাঝে আবদ্ধ ভারত এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লোকের দেশ; তাদের গুণাবলী অন্যান্য লোকের গুণাবলী হতে স্পষ্টই পৃথক; পৃথক তার সংস্কৃতি, তার জীবনধারা, অন্তরাত্মার ধারা; ভিন্ন তার শিক্ষা-দীক্ষা, তার শিল্পকলা, তার সমাজ সংগঠন। যা-কিছু তার মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে তাকেই সে আত্মীভূত করে নিয়েছে, সকলের ওপর দিয়েছে ভারতীয় ছাপ, অতিবিভিন্নমুখী উপাদান সব ঢেলে মিলিয়ে ধরেছে তার মূল একত্বের মধ্যে। তবুও ভারত চিরকালই ছিল একটা বহুত্বের সমাহার—তাতে স্থান পেয়েছে বহুতর জন-সঙ্ঘ, বিভিন্ন ভূখণ্ড, কত রাজভুক্তি—প্রাচীনতর কালে প্রজাভুক্তি পর্য্যন্ত—বহুতর গোষ্ঠী, উপজাতি,—প্রত্যেকের আপন আপন বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেকেই প্রকাশ করে চলেছে পৃথক পৃথক শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা—শিল্পকলা ও স্থাপত্যের বহুতর ধারা, কিন্তু সকলে মিলে কেমন গড়ে তুলেছে একটা সাধারণ ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতি।

"ভারতের ইতিহাসে চিরকাল ফুটে উঠেছে একটা ধারা, একটা অবিরল চেষ্টা, এই সকল উপকরণ বৈচিত্র্যকে একছত্র সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় একত্বের মধ্যে গেঁথে তুলতে—যাতে ভারতবর্ষ সংস্কৃতি হিসাবে যেমন রাষ্ট্র হিসাবেও তেমনি এক হয়ে ওঠে। তবে মোসলেম জাতিদের উপপ্লাবন এখানে একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে এসে—সেখানেও তবু বরাবর চলেছিল সেই রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রচেষ্টা, দুটি বিভিন্ন সংস্কৃতি ক্রমে মিলনের দিকে পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে চলেছিল। এমন কি দু' একটি দুঃসাধ্য প্রয়াসও হয়েছিল যাতে আপাত-বিরোধী ধর্মমত দুটি মিলিয়ে একটি অখণ্ড ধর্মমত আবিষ্কার করা যায় বা গড়ে তোলা যায়। এ ক্ষেত্রেও একটি অপরটিকে প্রভাবিত করেছিল। তথাপি ভারতের ইতিহাসে কখনও রাষ্ট্রীয় ঐক্য পূর্ণ সাধিত হয় নাই—একাধিক হেতু ছিল তার। প্রথম, আয়তনের বিশালতা, স্থান-স্থানান্তরে যোগাযোগের অপ্রতুলতা—ফলে এই সব বিভিন্ন লোক-সঙ্ঘের সম্মেলনে বাধা সৃষ্টি। দ্বিতীয়তঃ, যে উপায় অবলম্বন করা হ'ত—উপায় হ'ল সামরিক শক্তির জোরে সমগ্র দেশের ওপর একটি জাতির বা রাজবংশের আধিপত্য—তার ফলে হয়েছে সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, কোন সাম্রাজ্যই স্থায়ী হতে পারে নি। শেষতঃ, একটা দৃঢ় সংকল্পের অভাব যার লক্ষ্য এই সকল বিভিন্ন দেশখণ্ডকে দলে-পিষে এক অখণ্ড যন্ত্র ও রূপে ঢালাই করা।

"এর পরে এসে গেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—সমস্ত দেশ নূতন করে ভেঙে গড়ল, দেশের আভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক সীমানা বৈচিত্র্যকে অমান্য করে, অথচ তাকে সম্পূর্ণ বিলোপ না করে, নিজের সুবিধার জন্যে সৃষ্টি করলে কৃত্রিম প্রদেশ সব। ভারতবর্ষে বহুপূর্ব্ব হতেই তার বিবিধ মূল উপাদানকে ধরে গড়ে উঠেছিল একটা উপদেশরাজির স্বাভাবিক গোষ্ঠী সব—ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সাহিত্য, ভিন্ন রীতিনীতি নিয়ে—যথা, দ্রাবিড়জাতি চতুষ্টয়, বঙ্গ, মহারাষ্ট্র গুজরাট, পঞ্জাব, আসাম, সিন্ধু, উড়িষ্যা, নেপাল, উত্তরাখণ্ডের হিন্দীভাষী, রাজপুতানা এবং বিহার। ব্রিটিশ রাজত্ব প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় এই সকল গোষ্ঠীকে একীভূত করে নি, তবে তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল সর্ব্বত্র এক অভিন্ন শাসনধারা, ইংরেজী ভাষার সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর আদান-প্রদানে অভ্যস্ত করে তুলেছিল আর তার শিক্ষা-ব্যবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাপকভাবে একটা সুদৃঢ় দেশপ্রেম, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আর সে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ঐক্য। স্বাধীনতা লাভের পক্ষে যথেষ্ট একটা সুদৃঢ় একত্ব গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হ'ল বটে, কিন্তু স্বাধীনতা এসে গেলে দেখা

গেল পূর্ণ একত্ব তাতে এনে দের নি—শুধু তা নয়, ভারত-বর্ষকে যুক্তি করে খণ্ডিত করা হ'ল, এই হেতু দিয়ে যে ভারত হ'ল দুটি নেশন, হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান—আর এ তত্ত্বের যে কি বিষময় ফল তা আমরা জানি।

"...স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে কংগ্রেস স্বয়ং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ভাষা অনুযায়ী প্রদেশ গঠন করবার—সে প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত করা অবিলম্বে যদি সম্ভব না হয়, অন্ততঃ যথাসম্ভব শীঘ্র করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবুদ্ধির কাজ। ভারতের জাতীয় জীবনের ভিত্তি তখন হবে তার স্বাভাবিক সামর্থ্যরাজি, বহুত্বের মধ্যে ঐক্য এই তত্ত্বের সঙ্গে তার নিত্যনৈমিত্তিক পরিচয় এবং এর প্রয়োগ হ'ল তার সত্তার প্রকৃতির মূল-ধারা—একের মধ্যে বহু—এই সত্যই তাকে প্রতিষ্ঠিত করবে তার অটল ভিত্তির উপর, তার স্বভাব ও স্বধর্ম্মের উপর।

"এই পরিণতিই যে ভবিষ্যতে ভারতের অনিবার্য্য ভাগ্য-ধারা, একথা বেশ বলা যেতে পারে। দ্রাবিড় মণ্ডলের অধিবাসী সব তাদের স্বায়ত্ত-শাসনের স্বতন্ত্র অধিকার দাবি করছে। মহারাষ্ট্রীয়েরাও অনুরূপ অধিকারের প্রত্যাশা করে—তার অর্থ গুজরাতেরও তদনুরূপ পরিণতি। ফলে ব্রিটিশ-কৃত মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি লোপ পাবে। পুরাতন বাংলা প্রেসিডেন্সি ইতিমধ্যেই খণ্ডিত হয়ে গিয়েছে এবং উড়িষ্যা, বিহার আর আসাম প্রদেশ হিসাবে এখন স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করেছে। তারপর মধ্যপ্রদেশের আর যুক্তপ্রদেশের হিন্দী-ভাষীরা সম্মিলিত হলে এই পরিণতি সম্পূর্ণ হবে। খণ্ডিত-ভারত যুক্ত হলেও এই সাধারণ গতিধারায় কিছু ইতর বিশেষ আসবে না। রাজন্য-রাষ্ট্র সকলের এবং প্রদেশগত জাতি সকলের সম্মেলনই হবে ভারতীয় একত্বের রূপ।"

শ্রীঅরবিন্দের বাণীর পিছনে অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী গভীর চিন্তা এবং অতি সূক্ষ্ম ও অতি সংযত দৃষ্টির পর্য্যবেক্ষণের ধারা রহিয়াছে। ঐ দৃষ্টি আধিকার সাময়িক রাষ্ট্র বিক্ষোভ বা সুবিধাবাদের কূটনীতির ভাবে সঙ্কুচিত হয় নাই। সুতরাং যাঁহাদের মনে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আছে তাঁহাদের এই মতের সারমর্ম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

"পাকিস্থানের" রাজস্ব নীতি

"পাকিস্থানের" কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিতে গিয়া মন্ত্রী গুলাম মহম্মদ ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহাদের ৯৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এই দিকে ভারতরাষ্ট্রের মন্ত্রী জন মাথাই হিসাব করিয়া আমাদের শুনাইয়াছেন যে, ১৪ কোটি টাকার উপর ঘাটতি পড়িয়াছে। এই দুইটি তথ্যের উপর নানারূপ আলোচনা চলিতেছে; এবং দুই রাষ্ট্রের রাজস্ব-নীতি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা হইতেছে। এতৎসম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণটি "পাকিস্থান" রাষ্ট্রের রীতি-নীতি সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্ত করিবে। শ্রীহট্ট জেলার মৌলবী বাজার শহরের "অভিযান" (সাপ্তাহিক) পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে।

"ডিফেন্সের (রাষ্ট্র-রক্ষার) নামে গত কয় মাস যাবৎ জনসাধারণ হইতে চাঁদা আদায় করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মোটর-যাত্রীদের নিকট হইতে মাথা পিছু ।০ আনা ও ৵০ আনা চাঁদা আদায় করা হইতেছে এবং তাহা আর কতদিন চলিবে তাহার নিশ্চয়তাও নাই। বাস-যাত্রীরা যে শুধু সখের জন্যই ভ্রমণ করিয়া থাকেন এরূপ নহে; কার্য্য কারণে বিপদে পড়িয়াই জনসাধারণ তাহা করিতে বাধ্য হয় এবং যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই এই আর্থিক অসচ্ছলতার দিনে ।৵০ আনা ভাড়ার স্থলে ৷৵০ আনা দেওয়া যে অতীব কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমেয় এবং এক ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লাইনে বার কয়েকই এই হিসাবে চাঁদার নামে ট্যাক্স দিতে হইতেছে। দেশবাসী ট্যাক্সের জ্বালায় প্রপীড়িত, এর উপর অভিনব পন্থা অবলম্বনে ট্যাক্স আদায় কতটুকু ন্যায়সঙ্গত তাহা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তার পর এ সকল আদায়ী চাঁদা (?) উক্ত তহবিলে সবগুলিই জমা হয় কি না তাহাও সন্দেহ। কারণ রাস্তার যাত্রীদের নিকট হইতে তাড়ার সঙ্গে যে চাঁদা আদায় করা হয় তাহার রসিদ দেওয়া হয় কি না, তাহা কর্তৃপক্ষ রাখেন কিনা এবং রসিদ না দেওয়া হইলে এরূপ খাঁটি লোক কয় জন আছেন যাঁহারা সুবোধ বালকের মত আদায়ীকৃত চাঁদা উক্ত তহবিলে যথারীতি জমা দিতেছেন?"

পশু-কল্যাণ সম্মেলন

ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আয়োজনে দিল্লী নগরীতে একটি পশু-কল্যাণ সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। খাদ্য- ও কৃষি-মন্ত্রী শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম এই সম্মেলনের সভাপতিরূপে কার্য্য করেন। সম্মেলনের যে কার্য্য-বিবরণী দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া ভবিষ্যতে পশু-সম্পদের উন্নতির অনেক পরিকল্পনার কথা দেখিতে পাইলাম। তৎপূর্ব্বে কৃষিমন্ত্রীর মুখে শুনিয়াছিলাম যে গো- ও- মহিষ-সম্পদের উন্নতিকল্পে ১৯৪৮-'৪৯ সালের বার মাসে ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে; ১৯৪৯-৫০ সালে হইবে ২ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। এই ব্যয় হ্রাসের কারণ কি তাহা বলা হয় নাই; এবং বর্ত্তমানে যে ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অপ্রচুর মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

পশু-সম্পদের উৎকর্ষের যে সব পরিকল্পনার কথা এই সম্মেলনে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা খাদি-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের বিরাট গ্রন্থে—ভারতবর্ষের গো-সম্পদ—পাঠ করিয়াছি। এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কৃষকের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত হইলে আমাদের দেশের লোকের ভাগে দৈনিক ১২ তোলা দুধ পাইতাম না; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তাহারা পায় দৈনিক চল্লিশ তোলা দুধ। এই পার্থক্যের কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে কৃষকের আয় বাড়িবে না, দেশের স্বাস্থ্য উন্নত হইবে না। তাহার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন, তাহার অভাব; সেই ইচ্ছাশক্তির অভাবে আমাদের শরীরকে করিতেছে দুর্বল, মনকে করিতেছে ব্যর্থতার পূর্ণ। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ এরূপভাবে পরমুখাপেক্ষী যে লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হয়। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে একমাত্র কলিকাতা নগরীতে ১,২৯৪টি দুগ্ধবতী গাভী ও ৩,০২৩টি মহিষ আমদানী হইয়াছে বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পূর্ব্ব-পঞ্জাব হইতে; পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলা হইতে ১০টি মহিষ কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশের গবর্মেণ্ট গো-সম্পদের উন্নতির জন্য ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গত বৎসরে নাকি প্রায় ১১ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। আর পশ্চিমবঙ্গের গবর্মেণ্ট প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত একটা গোশালা উত্তরাধিকারে পাইয়া গত দেড় বৎসরের মধ্যে একটি গরু বা মহিষ হরিণঘাটায় লইয়া যাইতে পারেন নাই। কেসি সাহেবের কীর্ত্তিস্বরূপ সেই গোশালা গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের অপদার্থতার কথা দিকে দিকে প্রচার করিতেছে। মন্ত্রী শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা মহাশয় অদ্যাবধি এই সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেন না। এ রোগের চিকিৎসা কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গে জাহাজ-নির্ম্মাণ

গত ১১ই ফাল্গুন তারিখে ভারতরাষ্ট্রের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেন যে, কলিকাতার নিকটে তমলুক অঞ্চলে একটি সমুদ্র-যাত্রী জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। এই বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য নৌ-শিল্প-কুশলী এক ফরাসী কোম্পানীর কাছে পরামর্শ লইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও বাংলাদেশে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মিত হইত। ইংরেজ তাহার প্রয়োজনে এই শিল্প নষ্ট করিয়াছিল। প্রায় ১৫০ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের জাহাজনির্ম্মাণ শিল্প ইংরেজের হাতে বিনষ্ট হইয়াছে। স্বর্গত রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাসে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর যে নবযুগের সূচনা হইয়াছে সেই সময়ে বাংলা দেশের "অর্ণব-পোতের" বিজয় অভিযান পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা স্বাভাবিক। একজন বাঙালী প্রধান এই বিষয়ে অগ্রণী হইতেছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

কিন্তু জাহাজ নির্ম্মাণ করিলেই চলিবে না। নূতন নাবিক শ্রেণীর সৃষ্টি করিতে হইবে। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলীর একটা বিশেষ কর্ত্তব্য আছে; দেশের লুপ্ত নৌ-বিদ্যার ঐতিহ্য নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের "খালাসীর" উপর নির্ভর করিয়া থাকা বিপজ্জনক। ইতিমধ্যে কলিকাতার জাহাজঘাটায় "পাকিস্থানী" নাবিকেরা যেমন করিয়া জোট বাঁধিবার সুযোগ পাইতেছে, তাহার প্রতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দৃষ্টিপাত না করিলে পরে পস্তাইতে হইবে। কলিকাতার বন্দরে "পাকিস্থানীর" নিয়োগ বন্ধ হওয়া উচিত। তাহার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকবৃন্দের নৌ-বিদ্যার নূতন পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। নৌ-সেনাপতি-শ্রেণী সৃষ্টি না করিলে বিকলাঙ্গ নৌবিভাগের সৃষ্টি হইবে। পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক নাবিক শ্রেণীতে দলে দলে ভর্ত্তি হইলে নৌ-বিদ্যা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই বিষয়ে অবহিত হউন।

শিশু-মঙ্গল প্রদর্শনী

কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রচার-বিভাগ ও শিল্পদ্রব্যের যাদুঘর গত ১৪ই ফাল্গুন হইতে ২৭শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত একটি শিশু-মঙ্গল প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান নাগরিক জীবনের নানা সমস্যার মধ্যে নবজাতশিশু ও তাহার মাতাকে বাঁচাইয়া সুস্থ সবল রাখা একটি কঠিন সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। আর্থিক দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আলোবাতাসহীন নাগরিক জীবনের অশিক্ষা, কুশিক্ষা মিলিত হইয়া এই সমস্যার উৎপত্তি করিয়াছে। এই শিশু-মঙ্গল প্রদর্শনী চোখে আঙুল দিয়া কলিকাতার নাগরিকবৃন্দকে তাহার রূপ দেখাইয়া দিয়াছে। যাদুঘরের ভারপ্রাপ্ত শ্রীকালীচরণ ঘোষ এই উপলক্ষে একখানি পুস্তিকা লিখিয়া সমস্যার নানা দিক আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মৃত্যুর হার ভারতবর্ষে হাজারকরা প্রায় ২৫ জন; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১০ জনের উপর; শিশু-মৃত্যুর হার সকলের মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়—ভারতবর্ষে হাজারকরা ১৬১ জন ছিল ১৯৪৪ সালে; যুক্তরাষ্ট্রে ছিল ৪০ জন ১৯৪০ সালে। এই সব তথ্য দেয়াল-পত্রিকায় নানাবর্ণের উজ্জ্বল অক্ষরে ছাপাইয়া প্রদর্শনীর দর্শকবৃন্দকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল। এরূপ প্রদর্শনীর সাহায্যে কলিকাতা নগরীর পাড়ায় পাড়ায়, পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিকে এই জ্ঞান বিতরিত হইবে; ভারতরাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ কার্য্য চলিতেছে।

এতৎসম্পর্কে বঙ্গ-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর কার্য্য দেখিয়া আশান্বিত হইয়াছি। প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর হইলেও আমাদের দেশ এই সমস্যা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিতেছে, এই প্রমাণ আশাপ্রদ।

সংবাদপত্রের দায়িত্ব

পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু নিজেকে "একজন সাংবাদিক বলিয়া মনে" করেন। কোন কোন সংবাদপত্রে তাঁহার প্রবন্ধাদি সম্প্রতি পাঠ করিয়াছি। কলিকাতায় এক অভ্যর্থনা সভায় বক্তৃতা উপলক্ষে সংবাদপত্রের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি মন্তব্য করিয়াছেন যাহা প্রণিধান যোগ্য বলিয়া মনে করি। ভারতীয় সংবাদপত্রের একটি ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

"রবিবাসরীয় সংবাদপত্রে প্রবন্ধ বিভাগ যখন দেখি, আমার বিস্ময় লাগে। মেক্সিকো, বেইরুট সম্পর্কে প্রবন্ধ থাকে। কিন্তু আমাদের সাংবাদিকগণ দেশের পল্লী অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে পারেন না কেন? আমাদের সম্মুখে বহু সমস্যা রহিয়াছে, সংবাদপত্রসমূহ তাহার উপর আলোকপাত করিতে পারেন তাহারা, চিরাচরিত পথে ভ্রমণ করিতেছেন কেন?"

এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া মনে হয় যে, সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় মতামত প্রকাশের উপর কাটজু মহাশয় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না। "প্রকৃত ঘটনা জনসাধারণকে জ্ঞাপন করা, প্রকৃত তথ্য জানাইয়া জনমতকে সুগঠিত করাই তাহাদের (সংবাদপত্রের) উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। জনসাধারণ নিজেদের মতামত নিজেরাই স্থির করিবেন।" এই কথাগুলির মধ্যে সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা সঙ্কীর্ণ ধারণার ইঙ্গিত পাই। প্রকৃত ঘটনা ও প্রকৃত তথ্য একটা সামাজিক পরিবেশের পরিচয় প্রদান করে। এই পরিবেশের মর্ম্মকথা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রয়োজন হয়।

বিভক্ত পৃথিবী

ভাব, চিন্তা ও কর্ম্মের পার্থক্যের ফলে আমাদের পৃথিবী দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে বাক্‌-বিতণ্ডার দ্বারা অবস্থাটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বৃহৎ বিষয়ে এই দুই রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী এক হইতে পারিতেছে না; ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহা হইতেছে না। সম্মিলিত জাতি-সংঘের বৈঠকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়; সংবাদপত্রের প্রবন্ধে ও সংবাদ-পরিবেশনে সেই কথাই দেখিতে পাইতেছি। ভারতরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যে অসংখ্য প্রচারপত্র প্রেরিত হয় ও দিল্লী নগরীর "সোভিয়েট সংবাদ ও অভিমত" নামে যে প্রচারপত্র প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে এই বিতর্কের গতি পরিণতির এমন একটা প্রমাণ প্রতি সপ্তাহে আমাদের কাছে জমা হয় যে, তাহা পড়িয়া প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিতেছে। সোভিয়েট প্রচারপত্রে টীকা-টিপ্পনী থাকে বেশী; যুক্তরাষ্ট্রের প্রচারপত্রে রাষ্ট্র প্রধানবর্গের বক্তৃতা ও যুক্তরাষ্ট্রের বহুমুখী জীবনযাত্রা ও কর্ম্মধারার বিবরণ থাকে বেশী।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে দিল্লী নগরীতে প্রাচ্য দেশসমূহের যে সম্মেলন বসিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে এই দুইটি প্রচার-প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রচারপত্রে সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; তদ্দেশীয় সংবাদপত্রে পণ্ডিত নেহরুর রাজনৈতিক সংযম ও বুদ্ধিমত্তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দেখিতে পাইয়াছি।

সোভিয়েট প্রচারপত্রে সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হইতে দেখি নাই; তাহার চুম্বকের উপর মন্তব্যগুলি তীব্ররূপে দেখা গিয়াছে। ২১শে ফেব্রুয়ারী (৯ই ফাল্গুন) তারিখে "প্রাভদা" পত্রিকায় অভিমত প্রকাশ করিয়া প্রচারপত্র সম্পাদক নিজের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই পত্রিকা প্রথম প্রস্তাবের এই অনুবাদ করিয়াছে—"ইন্দোনেশিয়ায় বিদেশী শাসন বজায় থাকিবে; ওলন্দাজেরা একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র-সংগঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহারই ভিত্তির উপর ইহা গঠিত।"

সংস্পৃষ্ট সরকারগুলি "একযোগে আলোচনা করিয়া একটি যুক্ত যন্ত্র (apparatus) তৈয়ারী করিবেন," এই প্রস্তাবের উপর টিপ্পনী করা হইয়াছে—"যন্ত্রটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উদাহরণ-স্বরূপ 'পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ' ও আন্তঃ-আমেরিকান চুক্তি ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়া'র দেশগুলির মধ্যে গুপ্তভাবে রাজনৈতিক জোট পাকাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।"

একখানি ফরাসী পত্রিকায় সংবাদদাতার সংবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে—"ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ মতৈক্য হইয়াছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়ায় সাম্যবাদের প্রসার রোধ করিতে হইলে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলিকে সংহত করিতে হইবে।" এই সংবাদের উপর মন্তব্য করা হইয়াছে—"ইহাই হইল দিল্লী সম্মেলনের আসল কথা।"

মার্কিনের আর্থিক সহযোগিতা

মার্কিন দেশের রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় পৃথিবীর শিল্প-বাণিজ্যে অনগ্রসর জাতি-সমষ্টির আর্থিক উন্নতি কল্পে মার্কিন পুঁজির সহযোগিতার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এরূপ সাহায্য দানের পরিকল্পনা নূতন নহে। ইউরোপখণ্ডের

১৬টি রাষ্ট্র ১৯৪৮ খ্রীঃ "মার্শাল সাহায্যে" এই নামে প্রায় ১০০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি সাহায্য রূপে পাইয়াছে; এই দ্রব্যাদির—কল-কব্জা, খাদ্যশস্য, কাঁচামাল ইত্যাদির—অধিকাংশই মার্কিন মুলুকে প্রস্তুত ও উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং এক দিক হইতে বিচার করিলে এই কথা বলা যায় যে, মার্কিন দেশ এই সব দেশে আপনার মাল চালাইয়া দিল। কম্যুনিষ্টরা এই নীতিকে মার্কিন পুঁজিবাদের অগ্রযাত্রা বলিয়া থাকে। কিন্তু এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই সাহায্য ছাড়া ইউরোপখণ্ডের এই ১৬টি দেশ যুদ্ধের দরুণ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেও পারিত না। সোভিয়েট ইউনিয়নের এরূপ সাহায্য করিবার সঙ্গতি আছে বলিয়া আমরা শুনি নাই।

গত দুই মাসের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা চলিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র সঙ্ঘের সভাপতি এরিক জনষ্টন এই বিষয়ে তাঁহার সমর্থন জানাইয়া যে কথা বলিয়াছেন তাহা সামাজিক হইতে অর্থপূর্ণ। তিনি "যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটি নিখিল-বিশ্ব শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ" করার সমর্থন করেন। ইহার সাহায্যে "সারা বিশ্বের অনগ্রসর অঞ্চলে মার্কিন অর্থনিয়োগ ও মার্কিন বিশেষজ্ঞদের প্রেরণ করিতে হইবে।...সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার হইতে ১০০ শত কোটি ডলারের (প্রায় ৩৫০ শত কোটি টাকা) অর্থ নিয়োগ করিবেন।" মার্কিন সরকারকে এই ব্যাপারে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন সম্পর্কে এরিক জনষ্টন স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন—

> "যদি কখনও কোনো দেশে এই শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয় বা অন্য কোনো কারণে উহা বাজেয়াপ্ত করা হয়, তবে মার্কিন সরকারের ঐ অর্থ হইতে মার্কিন অংশীদারদের ক্ষতিপূরণ করা হইবে।"

সাম্রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে পুঁজিবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা মনে করিয়া এরিক জনষ্টন তাঁহার কথার অর্থ সম্বন্ধে আমাদের আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন:

> "এই পরিকল্পনায় আমি নিজেদের জন্য অংশীদারত্ব চাহিয়াছি; সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষার লেশমাত্রও আমাদের মনে স্থান পায় নাই; আমরা চাই জগতের অন্যান্য জাতির সহিত বন্ধুর মত সহযোগিতা করিতে, তাহাকেও শোষণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।"

পৃথিবীর শিল্প-বাণিজ্যে অনগ্রসর দেশগুলি এই কথায় আশ্বস্ত হইবে কিনা জানি না। কিন্তু গত তিন শত বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে আমরা যে সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ভয় পাইব, তাহাও অস্বাভাবিক নয়। হয়ত বিশ্ব-বিধানে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে মার্কিনের জয়যাত্রার গতিবেগ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবে, যেমন হইয়াছিল ব্রিটেনের জয়যাত্রার আরম্ভ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। নিঃস্বার্থ মন লইয়া কোন জাতি পরদেশকে আর্থিক সাহায্য করিয়াছে, এরূপ উদাহরণ মানুষের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। মানব প্রকৃতির এই ব্যর্থতার শেষ কখনও হইবে কিনা জানি না।

সৈয়দ হুসেন

ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রাচীন মিশর দেশের কি সম্বন্ধ ছিল, তৎসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ। মুসলিম সম্রাটদের শাসনকালে যে সম্বন্ধ ছিল, তাহার প্রমাণও এখন পর্য্যন্ত অপ্রচুর। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে যে যুগের সূচনা হইয়াছে এবং নানা রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, সেই ভবিষ্যতের কথা মনে করিয়াই ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সৈয়দ হুসেনের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল। ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজে "পাকিস্থানী" মনোভাব উগ্র না হইলে, "পাকিস্থান" প্রতিষ্ঠিত না হইলে, মিশরের রাষ্ট্রদূতের পদ ও প্রভাব বিশেষ মর্য্যাদার যোগ্য না হইতে পারিত। কিন্তু এই দুই ঘটনায় মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিবার পূর্ব্বে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করিতে হয়। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু যে বিভাগের কর্ত্তা সে বিভাগ কি ভাবিয়া সৈয়দ হুসেনকে মিশরে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়।

কারণ সৈয়দ হুসেন যৌবনের প্রারম্ভ হইতে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। "বোম্বাই ক্রনিকেল" পত্রিকার বেঞ্জামিন হর্নিম্যানের হাতেগড়া মানুষ তিনি; এবং মিসেস এনি বেশান্তের নেতৃত্বে যে "হোমরুল" আন্দোলনের সূচনা হয়, সেই সময়ে তিনি লেখক ও বক্তারূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। খেলাফৎ আন্দোলনের সময় সেই খ্যাতি বিস্তারলাভ করে, এবং খেলাফৎ প্রতিনিধিবর্গের সম্পাদকরূপে তিনি বিলাত গমন করেন। এই সময়েই তিনি বিরাট বিশ্বে ভারতীয় জাতীয়বাদের পক্ষে প্রচারকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারেন, এবং প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভারতবর্ষের স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নির্লজ্জভাবে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করে। আনন্দ কুমারস্বামী, তারকনাথ দাস, সৈয়দ হুসেন প্রভৃতি ভারতপন্থীগণ এই প্রচারকার্য্য ব্যর্থ করিবার জন্য যে কাজ করিয়াছিলেন, তাহার সম্যক পরিচয় এখনও দেশবাসী পায় নাই। তখন "পাকিস্থানী" মনোভাবের বিরুদ্ধেও তাঁহাদের সংগ্রাম করিতে হয়।

"পাকিস্থানী" প্রলোভন, "পাকিস্থানী" দম্ভ তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। এই দৃঢ়তাই তাঁহার জীবনের গৌরব। আজ তাঁহার তিরোধানে নূতন করিয়া এই দৃঢ়তার মাহাত্ম্য আমরা উপলব্ধি করিতেছি।

অহিংসা

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত না করিয়াও বলা যায় যে, অহিংসা একটি উচ্চ ধর্ম। সত্য, অস্তেয় প্রভৃতির সঙ্গে অহিংসার প্রচুর প্রশংসা করা হইয়াছে; আর সেই পরিমাণে হিংসার নিন্দাও হইয়াছে। হিংসার দুইটি রূপ আছে; মানুষের প্রতি হিংসা, এবং মানুষেতর প্রাণীর প্রতি হিংসা। সেই অনুসারে আবার অহিংসাও দুই প্রকার। মানুষেতর প্রাণীর মধ্যে আবার পশু বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য; কেন না, বৈদিক যজ্ঞাদিতে পশুবলির ব্যবস্থা ছিল এবং সেই হিসাবে পশুহিংসা হইত। যুদ্ধ ছাড়া মানুষ মানুষকে হিংসা করিবে, এরূপ বিধি আর কোথাও নাই; আর, যুদ্ধও ক্ষত্রিয়েরই শুধু বিহিত ধর্ম। আচার্য্য দ্রোণ, তাঁর পুত্র এবং পরশুরাম প্রভৃতি যে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন তাহা নিয়মের প্রতিপ্রসব। সুতরাং প্রাচীন কালে হিংসা-অহিংসার প্রভেদ এবং হিংসার চেয়ে অহিংসা যে শ্রেষ্ঠ এই কথাটা স্পষ্ট হইয়া উঠে যজ্ঞে পশুবধ লইয়া।

বৈদিক হিন্দুধর্ম আর বুদ্ধের ধর্মের প্রধান পার্থক্যও এইখানেই। বুদ্ধ বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে যে অভিযান ঘোষণা করেন সেটাও প্রধানতঃ পশুবলিকে কেন্দ্র করিয়াই হইয়াছিল। শুধু বুদ্ধ কেন, নাস্তিক চার্বাকও যজ্ঞে পশুবধ লক্ষ্য করিয়া বেদকে উপহাস করিয়াছেন। পশুবধের বিরুদ্ধে ক্রম-বর্দ্ধমান অভিযোগের উত্তরেই বোধ হয় বৈদিক পণ্ডিতেরা একটা মত প্রচার করিতে থাকেন এই বলিয়া যে, যজ্ঞে নিহত পশুর সদ্য মুক্তি হইয়া যায়—সে সোজা স্বর্গে চলিয়া যায়; সুতরাং যজ্ঞে তাহাকে হত করিয়া তাহার প্রতি প্রকারান্তরে অনুকম্পাই দেখানো হয়। ঠাট্টা করিয়া চার্বাক বলিয়াছিলেন, তাই যদি হয়, তবে যজমান নিজের পিতাকে কেন সেখানে হত্যা করে না? পিতাকে স্বর্গে পাঠাইবার ইহার চেয়ে সহজ উপায় আর কি হইতে পারে?

"পশুশ্চেন্নিহতো যজ্ঞে স্বর্গগামী ভবিষ্যতি,
স্ব-পিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হন্যতে?"

এই লইয়া অনেক আলোচনা ও বিতর্ক হইয়া থাকিবে। তাহার কতকটা আভাসমাত্র ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। ক্রমশঃ বুদ্ধেরই জয় হইল; অহিংসা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইল এবং পশুহিংসা নিন্দনীয় মনে করা হইতে লাগিল।

কিন্তু তথাপি এক শ্রেণীর লোক রহিলেন, বেদে যাঁহাদের বিশ্বাস টলিল না। বেদে হিংসা বিহিত রহিয়াছে, অথচ যুক্তি দ্বারা হিংসার সমর্থন কঠিন; সুতরাং মীমাংসা দাঁড়াইল—'অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম সন্দেহ নাই, কিন্তু বেদ-বিহিত হিংসা তো হিংসা নয়!'

"যা বেদ-বিহিতা হিংসা ন সা হিংসা প্রকীর্ত্তিতা।"

মনু এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানেও গোঁড়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকে এই মত অংশতঃ অনুসরণ করেন। তাঁহারা বৃথা-মাংস গ্রহণ করেন না, অথচ নিরামিষাশীও নহেন। আবার অনেকে বেদে আস্থাবান্ হইয়াও—কোন্ যুক্তিতে জানি না—পশুবলি এবং মাংসাহার সমর্থন করেন না।

ভবভূতির 'উত্তর-রামচরিতে'ও এই দুই শ্রেণীর ঋষির—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের—সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কাহারও আপ্যায়নের জন্য মধুপর্কে বৎসতরী, মহোক্ষ বা মহাজ নির্বপিত হইত, আবার কাহারও জন্য নির্মাংস—শুধু দধি-মধু-রচিত—মধুপর্ক দেওয়া হইত।

বর্ত্তমানে ধর্মের অঙ্গ হিসাবে পশুবধ হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেই রহিয়াছে। আর কোনও ধর্মে আছে বলিয়া জানি না। কিন্তু মোটের উপর আধুনিক শিক্ষিতসম্প্রদায় ধর্মে পশুহিংসাটাকে তত প্রীতির চক্ষে দেখেন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য ইহাতে আমিষ ও নিরামিষ আহার-সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করা হইতেছে না। পশুবলি পছন্দ করেন না যাঁহারা, তাঁহারা সর্বত্রই মাংস খান না, এমন নয়। বর্ত্তমান বৌদ্ধেরা চীনে, তিব্বতে, জাপানে সর্বত্রই মাংস খান বলিয়া শুনি; অথচ, পশুবধ এখনও ইঁহাদের ধর্মে নিষিদ্ধই রহিয়াছে। সুতরাং ধর্মাঙ্গ হিসাবে পশুবধ আর মাংসাহার এই দুটিকে পৃথক্ করিয়া দেখাই ভাল।

পশুবধের বেলায় যেমন স্বীকৃত হইয়াছে তেমনই সাধারণ ভাবে জীবমাত্রের বেলায়ও অহিংসাকে প্রশংসনীয় মনে করা হইয়াছে। জীবে দয়া, বিপন্ন জীবের প্রতি অনুকম্পা যেমন প্রশংসার বিষয়, তেমনি বিপন্ন নয়, এমন কি হিংসা করিতে সমর্থ জীবের প্রতিও অহিংসা প্রশংসা পাইয়াছে। একটা কবুতরের প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া নিজের মাংস দান করিয়া শিবি রাজা মহাভারতে প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। এখানে বিপন্ন কপোতের প্রতি যেমন দয়া, হিংস্র শ্যেনের প্রতি তেমনি অহিংসা প্রকাশ পাইয়াছে। শ্যেনটিকে হিংসা করিয়া, হত্যা করিয়াও রাজা কপোতের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করেন নাই; এবং সেইজন্যই তাঁহার বেশী প্রশংসা।

যে অহিংসাকে মনুষ্যেতর জীবের বেলায় প্রশংসনীয় মনে করা হইয়াছে, সেইটিকে যে মানুষের বেলায় উচ্চ প্রবৃত্তি মনে করা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? বুদ্ধের এবং খ্রীষ্টের ধর্মে বিশেষ করিয়া ইহার প্রশংসা রহিয়াছে। খ্রীষ্টের পূর্বে নীতি ছিল—'চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁত।' যে অপরের চোখ বা দাঁত নষ্ট করিবে, সে নিজের সেই অঙ্গ হারাইয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে এবং সে অপরাধের শাস্তি লইবে। ইহাতে ক্ষমার কথা নাই—হিংসার বদলে হিংসা রহিয়াছে। কিন্তু খ্রীষ্টের শিক্ষায় 'ডান গালে চড় খাইলে বাম গাল ফিরাইয়া ধরা' উচ্চ ধর্ম বলিয়া প্রচারিত হইল। খ্রীষ্টের বহু পূর্বে বুদ্ধও এই ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে, অহিংসা দ্বারা হিংসাকে জয় করিবে—এই মহৎ নীতি তিনি নানা ভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বুদ্ধের এই শিক্ষা হিন্দু অবহেলা করিতে পারে নাই। কিন্তু পশুবধের বেলায় যেমন এখানেও তেমনই এই নীতি স্বীকার করিয়াও ইহার একটা প্রতিপ্রসব বাহির করা হইয়াছে। পশুবধের বেলায় যেমন বেদবিহিত হিংসা, হিংসা নয় বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, এখানেও তেমনই যুদ্ধে হত্যা হিংসাপদবী-বাচ্য নয়, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। গীতাও বলিয়াছেন, যুদ্ধ যে শুধু অধর্ম নয়, এমত নহে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

'ধর্মাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।'

অহিংসা ধর্ম সন্দেহ নাই ; কিন্তু যুদ্ধও ধর্ম ; সুতরাং যুদ্ধের বাহিরে যে হিংসা তাহাই শুধু নিন্দনীয়।

যুদ্ধ একের সঙ্গে একের হইতে পারে—যাহাকে সাধারণতঃ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ বলা হইত ; আবার বহুর সঙ্গে বহুরও যুদ্ধ হইতে পারে। হিংসাও তেমনই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অথবা জাতিতে জাতিতে দেখা দিতে পারে। হিংসার যখন নিন্দা করা হয় তখন এই প্রভেদ অনুল্লেখ করিয়াই নিন্দা হয়। সাধারণ ভাবে হিংসা উভয়ত্রই নিন্দনীয়। আবার যুদ্ধকে যে প্রতিপ্রসব মনে করা হয়, তাহাও উভয় প্রকার যুদ্ধের বেলায়ই করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রশ্ন এই—সত্যই কি যুদ্ধের হিংসা অহিংসার সমতুল এবং প্রশংসার যোগ্য ?

আমাদের চারিত্রনীতির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, ব্যক্তির আচরণে যে জিনিসটার আমরা নিন্দা করি, জাতির আচরণে ঠিক সেই জিনিসটি নিন্দনীয় তো নয়ই, অনেক সময় প্রশংসাও পাইয়া থাকে। রাজনীতি বলিয়া যে জিনিসটি আছে সেটি সাধারণতঃ ব্যক্তিগত চারিত্রনীতির ঊর্ধ্বে। এদেশে কৌটিল্য এবং তাঁহার স্তাবক ও শিষ্যেরা এই মত সমর্থন ও প্রচার করিয়াছেন। আর ইউরোপেও কৌটিল্যের দোসর ম্যাকিয়াভেলির অন্ত নাই। কূটনীতি বলিয়া রাজনীতির যে নূতন অঙ্গ উপজাত হইয়াছে, তাহাতে সত্য অপেক্ষা সত্যের অপলাপ, একাধিক অর্থে বাক্যপ্রয়োগ, প্রয়োজনমত প্রতিশ্রুতিভঙ্গ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধি বলিয়া প্রশংসিত হইয়া থাকে।

নীতির এই দ্বৈতবিচার হিংসার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অহিংসা সাধারণভাবে উচ্চধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হইলেও জাতিতে জাতিতে যেখানে সম্পর্ক, সেখানে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও অহিংসাকে তত বড় করিয়া কেহ ত এখনও দেখেন নাই। এই কথাটাই রুশদেশীয় ঔপন্যাসিক ডস্টয়য়েভস্কী তাঁহার এক বইয়ে তুলিয়াছেন ; এই কথাটাই থ্রেসদেশীয় দস্যু ও সেকন্দরের সেই পুরাতন, বহু-বিদিত কথোপকথনে প্রকাশ পাইয়াছে। একজনকে যে খুন করে, সে খুনী, অপরাধী, নিন্দনীয় ; একজনের বিত্ত যে অপহরণ করে, সে চোর, অপরাধী, শাস্তির যোগ্য। কিন্তু গোটা দেশ যে লুণ্ঠন করে, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশের যে কারণ হয়, ইতিহাস তাহাকে উত্তরবংশীয়দের কাছে মহাপুরুষ, বীর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকে।—যেমন, নেপোলিয়ন, যেমন সেকন্দর। কিন্তু বাস্তবিকই প্রবৃত্তিহিসাবে উভয়ত্র কোন তফাৎ আছে কি ?

কিন্তু তফাৎ আমরা করি। কোনো যুক্তি নাই, বিচার করিয়া দেখিলে অসত্য মনে হইবে, তথাপি মানুষ এই প্রভেদ করিয়া আসিতেছে। ইহার একটা অর্থ এই যে, মানুষ নিজেকে যতটা সভ্য, সচ্চরিত্র ও ধার্মিক মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সে ততটা নয়। মানুষের ভিতরে পশু বিদ্যমান রহিয়াছে ; সে পশু শিকল দিয়া বাঁধা আছে মাত্র, কিন্তু বশ মানে নাই। সমাজে বাস করার সময় সে সভ্যভব্য আচরণ করে—সমাজের শাসনে, শিকলবাঁধা পশুর মত। কিন্তু যেখানে এই সমাজ-শাসন নাই অথবা শিথিল—যেমন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্কের বেলায়—সেখানেই এই পশু তার বিকট নগ্নতা লইয়া আত্মপ্রকাশ করে।

বুদ্ধের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া অহিংসার স্তবগান করার পরেও—বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের শিক্ষার পরেও—আজ জগতে হিংসার কি উন্মত্ত, বীভৎস নৃত্যই না আমরা দেখিতেছি! শত্রুকে হত্যা হিংসা। কিন্তু এই হিংসার কত রকম প্রশংসাই না আমরা শুনিতেছি। চিত্রে বাক্যে, আলোকে অন্ধকারে, আলোক-স্তম্ভে, রাস্তার কোণে, চলন্ত গাড়ীতে—নানা ভাবে শত্রুহত্যা বড় ধর্ম, এই কথাটাই সর্বত্র প্রচারিত ও বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর। ইহা শুধু স্বার্থের বন্ধন, কোনো উচ্চ নীতি কিংবা আন্তরিক শ্রদ্ধা অথবা আকর্ষণের উপর ইহার ভিত্তি নয়। স্বার্থ ত্যাগ করিয়া এই মৈত্রী কেহ রক্ষা করে না; আর স্বার্থে আঘাত পড়িলে মুহূর্তের মধ্যে তাসের ঘরের মত উহা ভাঙিয়া পড়ে এবং এক টুকরা ছেঁড়া কাগজের মত এই মৈত্রী ত্যাগ করিতে কেহ দ্বিধা করে না। বেশী দীর্ঘ দিনের ইতিহাস ঘাঁটিবার প্রয়োজন নাই, ইংরেজ ও ফরাসীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া লড়াই করিয়াও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে হঠাৎ সুহৃদ্ হইয়া গেল এবং গত যুদ্ধের প্রারম্ভেও তাহাই ছিল, এবং এখনও তাহাই রহিয়াছে। ইংলণ্ডের ও রুশিয়ার 'সিংহ-ভল্লুকের' কলহ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯১৪ সালের মহাসমরে তাহারা এক পক্ষে। আবার রুশিয়া যেই বোলশেভিক বনিয়া গেল, অমনই তাহাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখা হইল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আবার প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদের সৌহার্দ জমাট বাঁধিতেছিল—ইদানীং আবার হাওয়া অন্ত দিকে বহিতেছে। আগের যুদ্ধের সময় যাহারা এক পক্ষে ছিল, কুড়ি বৎসর পর তাহাদের কেহ কেহ আবার পরস্পরের শত্রু হইয়া গিয়াছে—যেমন ইংলণ্ড ও জাপান।

ভালো-মন্দের কথা বলিতে চাই না। উত্তরকালে কোথায় গণতন্ত্র কায়েম হইবে আর কোথায় স্বৈর-শাসন প্রবর্তিত হইবে, তাহাও ভাবিতেছি না। এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে দেখা যাইবে যে, রাষ্ট্রের শত্রুতা ও মিত্রতা স্বার্থের উপরই প্রতিষ্ঠিত; আর, এই স্বার্থও আবার অবস্থার পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়। আদর্শের কথা, নীতির কথা আদৌ উঠে না, এমন নয়। কিন্তু স্থায়ী হৃদয়ের বন্ধন—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বন্ধুত্ব বলিলে যাহা বুঝায়, তেমন কিছু ইহাতে কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। শত্রুতার মধ্যেও অহি-নকুলের সম্বন্ধের মত নিবিড় হেতু কোথাও নাই। প্রায় অভিন্ন জাতি ও এক-ধর্মী হইয়াও ইংলণ্ড জার্মানীর শত্রু. আর অবস্থাবিশেষে ভিন্নধর্মী, ভিন্নভাষাভাষী জাপান সুহৃদ্। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সৌহার্দ বা শত্রুতা হয়, তাহার প্রতিষ্ঠা ইহার চেয়ে দৃঢ়।

রাষ্ট্রের মিত্রতা কিংবা শত্রুতা কোন প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই অদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় হিংসা কিংবা জাতীয় মৈত্রীর কথা এত জোর গলায় বলার কি সার্থকতা থাকিতে পারে? শত্রুকে মারা উচ্চ নীতি—উচ্চ স্বদেশ-বাৎসল্য এবং বড় কর্তব্য বলিয়া ঘোষিত হয়। কিন্তু শত্রু কে? আজ যাহারা মারামারি কাটাকাটি করিতেছে, কাল তাহারা হাতে হাত মিলাইয়া এক টেবিলে বসিয়া খানা খাইবে, এই দৃশ্য অকল্পনীয় নয়। অতীতে এরূপ ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতেও ঘটিতে পারে। সুতরাং যে হিংসা ও দ্বেষ উদ্রিক্ত করা হইতেছে, তাহার তো কোন নির্দিষ্ট প্রয়োগক্ষেত্র নাই। শুধু একটা নিদ্রিত প্রবৃত্তিকে জাগরূক রাখার চেষ্টা হইতেছে মাত্র।

একটা কথা আছে, বিপদে মানুষ হরির নাম লয়। যুদ্ধের বাজারেও অনেক বড় বড় বুলি শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হয়। ১৯১৪ সালের যুদ্ধে উড্রো উইলসনের 'চৌদ্দ দফা' প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ফলে কুড়ি বৎসর পরেই পৃথিবী আর একটা অধিকতর নৃশংস যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। এই যুদ্ধেও 'অতলান্তিক সনদ', 'ক্যাসাব্লাঙ্কা বৈঠক', 'কুয়েবেক সিদ্ধান্ত' প্রভৃতি মানবের ভাগ্যাকাশে জ্যোতিষ্মান্ তারকার মত মাঝে মাঝে দেখা দিতেছিল। কিন্তু এই সমস্তের পশ্চাতে বক্তা-শ্রোতার পরস্পরের স্বার্থ ও সমরনীতি ছাড়া সত্য সত্যই গভীরতর তত্ত্ব এবং উচ্চতর আদর্শ কিছু রহিয়াছে কিনা, ইতিহাসই কেবল তাহার বিচার করিতে পারিবে। যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে বিশ্বমানবের হিতের কথা চিন্তা করিবার মত স্থৈর্য বাস্তবিকই মানুষের থাকে কি?

কুরুক্ষেত্রে গীতা কথিত হইয়াছিল সত্য। তখন সেটা সম্ভব ছিল। রাত্রে যুদ্ধ হইত না। প্রাতঃকালে শত্রুকে সতর্ক করিয়া দিয়া পরে আক্রমণ করা হইত। সুতরাং ধীরে সুস্থে ধর্ম-আলোচনা সেখানে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে তাহা সম্ভব কি? তথাপি উচ্চশ্রেণীর তত্ত্বকথা আমাদের কানে পৌঁছে। অদূর ভবিষ্যতে জগৎ অভাব অধর্ম অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবে—বাক্যে ও ধর্মে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে এবং রাষ্ট্রও প্রয়োজনমত—এ সব কথা তো আজ প্রাতরাশের সঙ্গে আমরা রোজই গলাধঃকরণ করিতেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিখিতেছি হিংসাকে বড় করিয়া দেখিতে।

অহিংসার কথা আজ কেহ বলিতে সাহস করে না। কারণ শত্রুকে ত ধ্বংস করা চাই-ই। 'ডান গালে চড় খাইয়া বাম গাল ফিরাইয়া ধরিলে' শত্রুর ধ্বংস হয় না—সে আস্কারা পায়। সুতরাং 'মার মার' 'কাট কাট', এই ধ্বনি আজ আকাশে বাতাসে সর্বত্র শব্দিত হইতেছে। কেহ সাহস করিয়া অহিংসার কথা বলিতে চাহিলে কারাগারের বাহিরে তাহার স্থান থাকিবে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে আজ নিরপেক্ষ লোকেরও অভাব। নিরপেক্ষ দেশও খুব বেশী নাই। স্পেন, পর্তুগাল, আয়ার্লণ্ড ও তুর্কী প্রভৃতি কয়েকটি ছোট ছোট দেশ বাদ দিলে আজ

সমস্ত দেশই কাহারও না কাহারও শত্রু হইয়া আছে। সমগ্র মানবজাতি এক বীভৎস, লুব্ধ কাড়াকাড়িতে মত্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে জগতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা যদিও বা শুনি, অহিংসার কথা তো শুনি না। তবে কি এখন হইতে হিংসা একটা বড় ধর্ম বলিয়া গণ্য হইবে?

মাঝে মাঝে মানুষের গৃহীত নীতির নূতন করিয়া পরীক্ষা হয় ত বা দরকার। ইতিহাসে তাহা ঘটিয়াছেও বহুবার। অনার্য ইহুদী জাতিতে জন্ম লইয়া যীশু যে নীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন, গত শতাব্দীতে নীট্‌শে প্রভৃতি দার্শনিকের কাছে তাহার পুনর্বিচার প্রয়োজন হইয়াছিল এবং বিচারে তাহার অধিকাংশই বর্জনীয় প্রতিপন্ন হইয়াছিল। যীশুর মোলায়েম ধর্ম কাপুরুষের ধর্ম—ক্রীতদাসের নীতি, সিংহবিক্রমী আর্যের নয়, একথা আমরা তখন শুনিয়াছিলাম। আবারও কি এই কথাই শুনিব? নহিলে হিংসাটা এত বড় হইয়া পড়িল কেন?

যখন ঝড় বহে, বুদ্ধিমান্ লোকে তখন কোথাও আশ্রয় লইয়া সরিয়া দাঁড়ায় এবং ঝড়টাকে বহিয়া যাইতে দেয়;—উহার সম্মুখীন হইয়া উহার সঙ্গে লড়াই করে না। শক্তিদৃপ্ত, ক্রুদ্ধ জাতিরা যখন উন্মত্ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকে, তখন তাহাদিগকে ধর্মের কথা, নীতির কথা শোনানো সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, যাহারা সে-সব কথা বলিবে, তাহারাও কোন না কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত—তাহাদেরও দেশাত্মবোধ আছে—তাঁহারাও শত্রু-মিত্রের পার্থক্য করিয়া চিন্তা করেন—গীতায় উপদিষ্ট সমদৃষ্টি তাঁহাদের থাকে না। কাজেই উচ্চ চিন্তাধারার খেই তাঁহারা হারাইয়া ফেলেন। উগ্র জাতীয়তা তখন তাঁহাদিগকেও অভিভূত করিয়া ফেলে, উন্নততর মানবতা তখন যবনিকার অন্তরালে সরিয়া দাঁড়ায়। যদিই বা তেমন মহাপুরুষ কেহ কোনো দেশে থাকেন, তবে তাঁহার অদৃষ্টে কি ঘটে? যাঁহাদের হাতে ক্ষমতা, শত্রুর প্রতি হিংসায় তাঁহাদের মন আচ্ছন্ন এবং ক্রোধে তাঁহারা অভিভূত। সুতরাং সেই দেশে সেই মহাপুরুষের স্থান হয় এমন জায়গায় যেখান হইতে তিনি কাহাকেও কিছু শুনাইতে পারেন না। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের মত দেশেও যে কোন দার্শনিক এই প্রকার মতপ্রকাশের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয়। আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও মহাত্মা গান্ধীর মত লোক ছিলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে?

আসল কথা এই যে, যুদ্ধে সত্য সত্যই খুব বড় নীতি কিছু থাকে না। পাণ্ডুপুত্রেরা রাজ্য হইতে বঞ্চিত না হইলে কিংবা পরে দুর্য্যোধন কৃষ্ণের সালিশী মানিয়া লইলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইত না। যুদ্ধক্ষেত্রেও অর্জ্জুনের যে ধর্মবুদ্ধি উদিত হইয়াছিল, সেটাকে ক্লৈব্য বলিয়া উপহাসে উড়াইয়া না দিলে হয় ত সে লড়াই হইত না। সমাজে যেরূপ শ্রেণীতে শ্রেণীতে কলহ হয়—যাহাদের প্রচুর আছে আর যাহাদের নাই তাহাদের মধ্যে, তেমনই জগতে রাজ্যে রাজ্যেও তাই। আর্থিক সম্পদ সমাজে এখনও কেহ বেশী অধিকার করিয়া রহিয়াছে, আর কাহারও ভাগ্যে উহা নিতান্তই অপ্রচুর। সেইজন্য শ্রেণীতে বিভক্ত মানবসমাজ কলহের হাত হইতে এখনও মুক্ত হইতে পারে নাই। সমস্ত পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ্‌ও তেমনই বিভিন্ন জাতি ও দেশের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হয় নাই। কাহারও বহিঃসাম্রাজ্য রহিয়াছে, উপনিবেশ রহিয়াছে, নিজের দেশের সম্পদ ছাড়াও বাহিরের অনেক সম্পদের উপর অধিকার রহিয়াছে; আর কেহ বা অস্ত্রে এবং রণকৌশলে হীন না হইয়াও ঐ সকল সম্পদ হইতে বঞ্চিত। সুতরাং লড়াই অনিবার্য্য হইয়াছে। লোভে লোভে, ভোগের সামগ্রী লইয়া দ্বন্দ্ব। ইহার মধ্যে ত্যাগের স্থান নাই কোথাও—ত্যাগী কেহই হইতে চায় না। আর আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য কেহ প্রাণ দেয় কিনা সন্দেহ।

কিছুদিন আগে এদেশে একটা ভবিষ্যদ্বাণী প্রবলবেগে চলিতেছিল যে, সত্যযুগ শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে ফিরিবার তারিখ চলিয়া গিয়াছে, অথচ সত্যযুগ বাস্তবিক আসে নাই। সুতরাং আমরা এখনও কলির জীব। কলিকালে—হিন্দুদের পক্ষে অন্ততঃ—মহর্ষি পরাশরের স্মৃতিশাস্ত্রই মান্য।

"কলৌ পারাশরী স্মৃতিঃ"।

এই পরাশরের উপদেশ এই যে,

"খড়্গেনাক্রম্য ভুঞ্জীত বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"

খড়্গ দ্বারা জয় করিয়া ভোগ করিবে, বসুন্ধরা বীরভোগ্যা।

হিন্দুর অন্য শাস্ত্র সকলে না মানিলেও এইটুকু কার্য্যতঃ সকলেই মানিতেছে। পৃথিবী যে বীরের ভোগ্যা, ইহা দেখাইবার চেষ্টা হইতেছে। সমস্ত মানবজাতিকে জড়াইয়া এক বিরাট শক্তিপরীক্ষা আজ আরম্ভ হইয়াছে। ধনবল, জনবল, অস্ত্রবল কে কত সংগ্রহ করিতে পারে দেখিবার চেষ্টা চলিতেছে। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, কে বড় বীর, তাহার পরীক্ষা হইতেছে। বসুন্ধরা যে শেষ পর্য্যন্ত বীরেরই অঙ্কশায়িনী হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার ভিতর অলোভ, অক্রোধ, অহিংসার স্থান কোথায়?

কিন্তু এইখানেই কি শেষ? একটা কথা আছে যে, সব মেঘের ভিতরই একটি রূপালী আলোর রেখা থাকে। তমসাচ্ছন্ন মানব-মন আজ যে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, লোভে মোহিত হইয়া গিয়াছে, শত্রুজয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছে এবং হিংসায় সদসদ্‌-জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়াছে,—এর পরিণাম হয় সভ্যতার সম্পূর্ণ ধ্বংস, নয় ত আর এক ধাপ উন্নতি। বর্ত্তমানে যুযুধান পক্ষদের মধ্যে কাহাকেও অতিরিক্ত অসভ্য কিংবা অতিরিক্ত ধার্মিক মনে করিবার হেতু নাই। যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া লুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও হিংস্র হইয়া উঠিলেও সভ্যতার স্তরে জার্মান-জাতির স্থান জগতের কোন জাতির নিম্নে নয়; আর, আমাদের প্রতিবেশী হইলেও জাপান আমেরিকার চেয়ে বেশী সভ্য কিংবা বেশী ধার্মিক নয়। কম-বেশী সমস্তরের সভ্য জাতিরাই আজ সমরে লিপ্ত। ইহারা এখন যাহাই বলুক না কেন, —যুদ্ধের ক্লান্তি যখন আসিবে,—জয়-পরাজয় যাহারই হউক না কেন, কলহের সমাপ্তি যখন ঘটিবে—যখন এই বর্ত্তমান অতীতে পরিণত হইবে—তখন কি ইহারা একবার খতিয়ান করিয়া দেখিবে না, ভবিষ্যৎ মানব-সমাজের জন্য ইহারা কি দিয়া যাইতেছে? তখন কি ইহারা বুঝিবে না, লুব্ধ কাড়াকাড়ি পুণ্য নয় এবং হিংসা সব ক্ষেত্রেই নিন্দনীয়? শুধু ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্পর্কে নয়, জাতির সহিত জাতির সম্পর্কেও উহা অপুণ্য।

সমাজে আর্থিক সম্পদ বণ্টনের তারতম্য দূর করিয়া সমাজকে কলহ-মুক্ত করিবার কথা মানুষ ত ভাবিয়াছে। কৃতকার্য কতদূর হইয়াছে সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও ইহা ঠিক যে, রুশিয়াতে এই কলহ দূর করিবার চেষ্টাও হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। তেমনই জগতের যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ্‌ বিভিন্ন জাতির মধ্যে যথাসম্ভব সমান ভাবে এবং ন্যায়সঙ্গত রূপে বণ্টন করিয়া দিতে পারিলে যুদ্ধের কারণও ত তিরোহিত হয়। সেটা কি সম্ভব নয়? কথাটা ইতিমধ্যে উঠিয়াছে। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কেহ কেহ একাধিক বার সে কথা বলিয়াছেন; হয় ত অত্যন্ত চাপা গলায়, তথাপি বলিয়াছেন। তাঁহাদের দেশ শেষ পর্যন্ত কতটুকু স্বার্থত্যাগ করিতে পারিবে, ভবিষ্যৎ জানে। তথাপি কথাটা যে উঠিয়াছে, ইহাই মেঘের মধ্যে রূপালী আলো।

এই বণ্টন করিয়া দিবার জন্য ঊর্দ্ধ্বতর তৃতীয় শক্তি কোথাও পাওয়া যাইবে না। উদ্রিক্ত ধর্মবুদ্ধি লইয়া জাতিসমূহের নিজেদেরই উহা করিতে হইবে। কর্তব্য স্বীকৃত হইলে পন্থা আপনি আবিষ্কৃত হইবে। ঝগড়া না করিয়া আপোষে বাঁটিয়া লওয়া উচিত—এই কথাটাও যে আজ কেহ কেহ বলিতেছেন, ইহাই মেঘের কোলে রূপালী আলো।

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং"

যুদ্ধে নিহত হইলে স্বর্গবাস আর জয়ী হইলে পৃথিবীভোগ, এই বলিয়া গীতা ক্ষত্রিয়ের ধর্মযুদ্ধের প্রশংসা করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছেন। শত্রুজয়ী বীরকে আমরা বিজয়মাল্যে ভূষিত করি। শত্রুজয়ের অন্তর্নিহিত হিংসা এখনও বীরের ধর্ম। তাহার স্তবগান কবিরা এখনও করেন। যতই গর্ব করি না কেন, মানুষ আমরা খুব বেশী ভদ্র এখনও হই নাই। হিংস্র পশুর মত রক্তাক্ত লেলিহান জিহ্বা এখনও আমরা শত্রু-রক্তে পরিতৃপ্ত করিতে চাই। কিন্তু হিংসা হিংসাকেই উদ্রিক্ত করে। শত্রুজয়ে শত্রুবৃদ্ধি হয়—নূতন শত্রু হয়। ক্ষাত্রধর্মের দীর্ঘ ইতিহাসে আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সত্যেরই সাক্ষাৎ পাই।

অলোভই লোভ জয় করে, অক্রোধ দ্বারাই ক্রোধকে বশ করা যায়, আর অহিংসা দ্বারাই হিংসাকে নষ্ট করা চলে।

তবে কি শত্রুকে—আক্রমণকারীকে সব ছাড়িয়া দিতে হইবে? আত্মরক্ষা বলিয়া কি কোন জিনিস নাই? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু হিংসাই কি আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়? উহাই কি বড় নীতি? ব্যক্তির কিংবা জাতির বাস্তব জীবন হিংসা বর্জন করিলে কিরূপ দাঁড়াইবে—কিরূপে উহা পরিচালিত হইবে, সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। নীতি হিসাবে অহিংসা শ্রেষ্ঠ, এইটি স্বীকৃত হইলে ঐ প্রশ্নের উত্তর আপনি মিলিবে। বাস্তব জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ কি আকার ধারণ করিবে, সাধারণ নীতি গৃহীত হইলে পর সে প্রশ্নের মীমাংসা অসম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণ নীতি হিসাবে অহিংসা শ্রেষ্ঠ, একথা কি জগৎ মানিতে প্রস্তুত? বীরধর্মের প্রশংসাকারীরা কি তাহা স্বীকার করিবে? শক্তিমান্‌ যেমন ক্ষমাশীল হইতে পারে—শক্তির সঙ্গে ক্ষমার যেমন কোন বিরোধ নাই, তেমনই বীরও অহিংস হইতে পারে; বীরত্বের সঙ্গে অহিংসার মিলন অসম্ভব নয়, এই কথাটাই আমরা বলিতে চাই। আর ইহাও বলিতে চাই যে, বুদ্ধ-খ্রীষ্টের আবিষ্কৃত ধর্মকে এখনও অধর্ম মনে করিবার কোন হেতু মিলে নাই।

পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে লাঠালাঠি করে; কিন্তু উহা অশোভন, অত্যন্ত নিন্দনীয়। কেহ কাহারও ন্যায্য অধিকার না ছাড়িয়াও লাঠালাঠি পরিত্যাগ করিতে পারে। তেমনই জগতের ভোগ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য জাতিতে জাতিতে যে কাড়াকাড়ি এবং মারামারি

চলিতেছে, তাহাও নিন্দনীয়, অপ্রশংসনীয়। কেহ কাহারও বাঁচিবার অধিকার—এমন কি বড় হইবার অধিকার পরিত্যাগ না করিয়াও কাটাকাটি বর্জন করিতে পারে।

শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষের কাছে হিন্দু প্রার্থনা করে, 'গোত্রং নো বর্ধতাং'—'আমাদের বংশ বাড়িয়া চলুক'। 'আর আমাদের বহু অন্ন হউক, অতিথি আসুব—অতিথি আসিয়া যেন ভাত পায়'। বংশের সঙ্গে সম্পদও যদি বাড়িয়া যায়, তবে ত ভ্রাতৃবিরোধ বর্জন করা একেবারে অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। তেমনই, জগতের প্রত্যেক দ্বীপ এবং প্রত্যেক দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যদি মানুষের আয়ত্ত হয় এবং যদি উহা বৃদ্ধিলাভ করে আর সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ ভাবে সকলের মধ্যে বিতরিত হয় তবে ত যুদ্ধ শুধু একটা নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইতে পারে। একবার একটা ধুয়া উঠিয়াছিল—যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে। এইখানেই ত তাহার প্রশস্ত ক্ষেত্র রহিয়াছে।

বর্তমানের কলহ যখন সমাপ্ত হইবে,—পরস্পরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মানব-সমাজ আবার যখন প্রকৃতিস্থ হইবে—লোভ যখন চরিতার্থ অথবা সংযত হইবে—ক্রোধ যখন শান্ত হইবে, আশা হয়, তখন মানুষ আবার এই উচ্চতর আদর্শের কথা ভাবিতে পারিবে। আশা হয়, অহিংসা পুনরায় ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হইবে। সর্বজীবে না হউক, মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা নিন্দিত হইবে। আর জাতির প্রতি জাতির বিদ্বেষও প্রশংসার অযোগ্য বিবেচিত হইবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চলিতেছিল তখন এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। আজ কয়েক বৎসর হইল সে যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই আবার ঈশানে কালো মেঘের মত তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সম্ভাবনা অনেকে দেখিতেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার বিশ্ব-শান্তির কথাও অনেক শুনি। এইটি আশার আলো। কতটুকু এই আশা ফলবতী হইবে তাহা ভবিষ্যৎ বলিতে পারে। এখনও স্বার্থের সংঘাত, লোভের জিগীষা এবং পরস্পরের প্রতি সন্দেহ জগৎ হইতে দূর হয় নাই; বরং জাতিসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধে উহা প্রচণ্ড ভাবেই বর্তমান রহিয়াছে। তবে আশার কথা এই যে, বিশ্ব এখন আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন নয়। সমস্ত মানবজাতিকে এখন জাতি হিসাবে শ্বেত ও অশ্বেত জাতিতে বিভক্ত মনে করিলে ভুল হইবে না; আর রাষ্ট্র ও সমাজের আদর্শে সাম্যবাদ ও গণতন্ত্র এই দুইটি বিভাগই স্পষ্ট।

সুতরাং বিশ্বকে, সমগ্র মানবজাতিকে, একীকরণের ক্রিয়া অনেক দূর যে অগ্রসর হইয়াছে, এরূপ মনে করা চলে। তবে ইহাও স্বীকার্য যে, এই দুইটি বিভেদের ভিতর প্রচণ্ড কলহের বীজ উপ্ত রহিয়াছে। যদি তৃতীয় মহাযুদ্ধ ঘটে তবে ইহারই জন্য ঘটিবে। যুদ্ধের দ্বারাই হউক কিম্বা অন্য উপায়েই হউক এই কলহের যদি মীমাংসা হইয়া যায় তবে সমগ্র বিশ্ব এক, সমগ্র মানবজাতি এক, এই আদর্শটি কি তখনও স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে? তখনও কি উহা রূপ ধারণ করিবে না? ভবিষ্যৎ হয়ত আমাদিগকে এক মানবজাতির দ্বারা অধ্যুষিত এক-বিশ্ব প্রদান করিবে অথবা বিশ্ব ও মানবজাতির ধ্বংসের কথা ভাবিবার জন্য মানুষের মনকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

বনবাসে

শ্রীকালিদাস রায়

যৌবন যায় নি একেবারে
'বন' মোর হেরি চারিপাশে,
'যৌ' আছে মনের আঁধারে,
পঞ্চাশোর্দ্ধে আছি বন-বাসে।
লোকালয় সমাজ সংসার
সবি মোর হইয়াছে বন,
শুনি কানে শ্বাপদ-হুঙ্কার,
মনে চলে ভ্রমর-গুঞ্জন।

জীবনেরও 'জী' হয়েছে শেষ
'বন'টুকু বাকি আছে তার,
কে করিবে পথের নির্দেশ,
চারিদিকে গহন আঁধার।
বনমালী এ বনে কোথায়?
কোথা তার বাঁশরী বাজায়?

নদীর ডাক

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

নদী ওকে ডাকিয়াছিল। ডাকিয়াছিল ও জলে নামিয়া আসিয়া একটু দাঁড়াইবে। নদী ওকে একটু আদর করিবে, ওর কপালে, ওর মাথায় শীতল হাত বুলাইয়া দিবে, ওর ঘন কালো দীর্ঘ কেশের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলী সঞ্চালিত করিবে, ওর পদ্মকোরকের মত চোখের উপর আলগোছে একটি চুমা দিবে।

ওকে দেখিয়া নদীর বুক অগাধ মায়ায় ভরিয়া উঠে। শান্তি ওর সর্ব্বদেহ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। হাসি ওর কালো চোখ দুটিতে, পাংলা রাঙা ঠোঁট দুখানিতে ফুলের গায়ে তাহার রঙের মত লাগিয়া আছে। লাবণ্য ওর সবুজ শাড়ীখানার সন্তর্পণ আড়ালে লুকাইয়া আছে। দেখা অবধি ওর উপর নদীর বড় মায়া, বড় স্নেহ পড়িয়াছে। তাই নদী ওকে কাছে ডাকিয়াছিল। ডাকিয়াছিল ও জলে নামিয়া একটু দাঁড়াইবে। ও সাড়া দেয় নাই।

জলে ওর বড় ভয়। এই মাস দুই হইল এপারের গ্রামে আসিয়াছে। বিধবা মায়ের সঙ্গে, গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে রূপসীতলার ঘাটে সকালবেলা স্নান করিতে আসে। স্নান করিতে আসে কিন্তু ও জলে নামে না। সমবয়সী মেয়েরা হাত ধরিয়া টানে। ও বলে, সাঁতার জানি না যে, ডুবে যাব। সঙ্গীরা হাসিয়া উঠে। বলে, এত বড় ধাড়ী মেয়ে, এত ভয় কেন রে? আয়, আয়। সে আসে না। হাত ছাড়াইয়া লইয়া সে ঘাটে দাঁড়াইয়া হাসিতে থাকে। বিধবা মা বলেন—থাক্। ওর যখন এত ভয়, নাই-বা নামল। ঘটিতে জল তুলে মাথায় দে না। তাহার সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলেন—ছোট থেকে শহরে বাস করে এত ভীতু হয়েছে। কোনদিন নদীতে, পুকুরে নামে নাই কি না। শুনিয়া সঙ্গীরা হাসে। বলে—তাই নাকি? তাই নাকি? তাহারা কলসী ভরিয়া ঘটি ভরিয়া জল আনিয়া ওর মাথায় ঢালিয়া দেয়, বলে—বোস কলাবৌ পিঁড়িতে বোস। আমরা তোমায় নাইয়ে দি। কলসী কলসী ঘটি ঘটি জল তাহারা ওর মাথায় ঢালিয়া দেয়। ওর দম বন্ধ হইয়া আসে, ও উঠিয়া পালায়। দেখিয়া বিধবা মা একটু হাসেন।

এমনি করিয়া স্নান সারিয়া বিধবা মায়ের সঙ্গে, সঙ্গী মেয়েদের সঙ্গে রূপসীতলার ঘাট ছাড়িয়া ও এপারের গাঁয়ে চলিয়া যায়। চলিয়া যাইতে যাইতে বকুল গাছটার নীচে সকলে একটু দাঁড়ায়। গাঁয়ের বৌঝি যাহাদের কাঁখে কলসী আছে তাহারা কাঁখ বদলায়। কপালের উপরে পড়া ভিজা চুল সরাইয়া ও একবার নদীর দিকে তাকায়। তারপর গল্প করিতে করিতে সকলে নদীর আড়ালে চলিয়া যায়।

রূপসীতলার ঘাট ছাড়িয়া নদী পূর্ব্বমুখে বাঁকিয়াছে। তারপরে আসে এপারে নেতাই ঘাট। লোকে বলে এই ঘাটে কাঁঠাল কাঠের তক্তা পাতিয়া তাহার উপর কাপড় আছড়াইত নেতা ধোপানী অনেক দিন আগে সেই যখন বেহুলা ও লখিন্দর বাঁচিয়া ছিল। এপারে নেতাই ঘাট ওপারে বোকাই পীরের ঘাট। বোকাই পীর কে ছিল কেহ জানে না। কিন্তু ওপারের লোকেরা সে কথা স্বীকার করে না। বলে, ঐ তেঁতুল গাছের নীচে পীর সাহেবের আস্তানা ছিল। সেখানে বসিয়া বসিয়া তিনি দিনে স্ফটিকের মালা ঘুরাইতেন আর রাত্রে বাঘ হইয়া বাছুর মারিয়া খাইবার জন্য সাঁতরাইয়া নদী পার হইতেন। পীর সাহেবের হাল মোকাম ছিল আজমীর শরীফ। তার আগে থাকিতেন ইস্তাম্বুল মুলুকে। রূমের বাদশাহের অনুরোধে কাবার মাটি আনিবার জন্য এক দিনে ঘোড়ায় চড়িয়া ইস্তাম্বুল মুলুক হইতে মক্কা শরীফে আসিলেন। কাবার মাটির দরকার হইয়াছিল বাদশাহের কোলের ছেলেটার মালোয়ারী ব্যারাম সারাইবার জন্য। মক্কা শরীফে আসিয়া তাঁহার মনে কি হইল সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া আরবী পক্ষীরাজের পিঠে চড়িয়া এক রাত্রের মধ্যে উড়িয়া আসিলেন আজমীর শরীফে। আজমীরে থাকিবার সময়ে আলমগীর বাদশাহ তাঁহার মুরীদ হইলেন। তবে বাদশাহ মুরীদ হইলে কি হয় তাঁহার দোস্ত পবন হাজির কথায় পীর সাহেব উঠিতেন বসিতেন। মরহুম পবন হাজির বাড়ী ছিল এই গাঁয়ে। আজ প্রায় তিন কুড়ি বৎসর হইল তিনি এন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহার দরগা আছে গাঁয়ে। পবন-হাজির কথায় পীর সাহেব বাদশাহের দেওয়া ধনদৌলত ফেলিয়া এই গাঁয়ে চলিয়া আসেন। এই গ্রামে থাকিবার সময়ে তাঁহার মহৎ কীর্ত্তিগুলির তালিকা এখনও তৈয়ারী হয় নাই, এখান হইতে তিনি কোন্ অঞ্চলে প্রয়াণ করিলেন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

নদীর এপারে নেতাই ঘাট, ওপারে বোকাই পীরের ঘাট, প্রায় সামনাসামনি। এই দুই ঘাট পিছনে রাখিয়া নদী পার ঘাটা পর্য্যন্ত সোজা চলিয়া গিয়াছে। তারপর আবার বাঁকিয়াছে যেখানে মাথাভাঙা তালগাছটা দাঁড়াইয়া আছে। বাজ পড়িয়া গাছের মাথা পুড়িয়া গিয়াছিল তাই নাম হইয়াছে মাথাভাঙা তালগাছ। পারঘাটার এপারে রক্ষাকালীর মন্দির, ওপারে দুবোয়ম। রক্ষাকালীর মন্দির হইতে একটু

তফাতে বাঁ দিকে খোলা জায়গায় হাটতলার ছোট ছোট একচালা ঘরগুলি। ওপারে কুমারদের কাছে একটা নেড়া শিমুলগাছ আর বেগুনের ক্ষেত। তারপর বাঁশঝাড়, বেতবন, কলাগাছের ঝাড়, আম-কাঁঠালের গাছের আড়ালে গ্রামের ঘরবাড়ী।

শীতের সময়ে যখন নদীর জল কমিয়া যায় পারঘাটায় তখন বাঁশের সাঁকো পড়ে। নীচে তিনখানা বাঁশ পাশাপাশি বাঁধা, উপরে ডান দিকে লম্বা বাঁশ বাঁধা ধরিয়া পার হইবার জন্য। আষাঢ় মাসে নদীতে বর্ষার জল আসিলে বাঁশের সাঁকো উঠিয়া যায়, খেয়া নৌকা চড়িয়া ওপারের মানুষ এপারে আসে, এপারের মানুষ ওপারে যায়।

আষাঢ় মাসে বড় গাঙের জল আসিয়া যখন নদীতে পড়ে, নদীর জল ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়ে। দেখিতে দেখিতে কালো জল ঘোলা হইয়া যায়। জলে ঘোর স্রোত আসে। বাঁশের সাঁকো ডুবাইয়া যায়। যাত্রী ও পণ্য লইয়া নৌকায় যাতায়াত আরম্ভ হয়। কোথাকার বিল হইতে পুকুর হইতে ছোট ছোট পানা ভাসিয়া আসে নদীতে, কচুরী পানার বড় বড় দল ভাসিয়া আসে। স্রোতের বেগে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যায়। বড় বড় কচুরী পানার দল নদীর কূল ঘেঁষিয়া ভাসিয়া চলে, লম্বা ডাঁটার মাথায় বেগুনী রঙের ফুল বড় সুন্দর দেখায়। কখনও কখনও সবুজ রঙের লিক্‌লিকে সাপ ডাঁটা জড়াইয়া ভাসিয়া চলে।

রূপসীতলার ঘাটের আগে বাঁকে আসিয়া কচুরী পানার দল মাঝে মাঝে আটকাইয়া যায়। ছোট ছোট মেয়েরা দৌড়ায় বেগুনী ফুল লইবার জন্য। সদের একটু বড় ভাইয়া তাহাদের ধমকায়। বলে, খবরদার, হাত দিসনে, সাপ থাকে ওতে। লাঠি দিয়া তাহারা পানা ঠেলিয়া দেয়, বাতাসে আর স্রোতের টানে পানা আবার ভাসিয়া চলে।

নদীতে নূতন জল আসা দেখিতে রূপসীতলার ঘাটে ছেলে-মেয়েরা, বৌ-ঝিরা ভিড় করে। আষাঢ়ের বৃষ্টি ঝুপ ঝুপ করিয়া মাথায় পড়ে, তাহাদের আনন্দ আরও বাড়ে। অবেলায় কেহ কেহ জলে নামিয়া পড়ে। দুই-চারটি বৌ-ঝি এদিক ওদিক চাহিয়া শাড়ীর আঁচল দিয়া মাছ ধরিতে যায়। এ একটা আমোদ। তারপর ভিজা কাপড়ে বাড়ী যায়। খিড়কী দরজা দিয়া সন্তর্পণে বাড়ীতে প্রবেশ করে—বড়রা যাহাতে না দেখিতে পান।

শ্রাবণ আসে। অবিরাম বৃষ্টিতে পথঘাট কাদায় ডুবিয়া যায়। খালবিল ভরিয়া গিয়া নদীর জলের সঙ্গে মিশে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া ছেলে বুড়ো মাছ ধরিতে বাহির হয়। দেখিতে দেখিতে নদীর পাড়ে কচুর বন বড় হইয়া উঠে। কচুবনের মধ্যে বড় বড় ব্যাঙ দিনরাত ডাকে। মাঝে মাঝে সাপের তাড়া খাইয়া নদীর জলে লাফাইয়া পড়ে। মনসার পূজা করিয়া এপারের লোক নদীতে সোলার সাপ ভাসাইয়া দেয়। চালের ভাঁড়ার বেহুলা-লখিন্দর গড়াইয়া কলার খোলে নদীতে ভাসাইয়া দেয়। এপার ওপারের লোক মিলিয়া হাটখোলায় মনসার ভাসান গান করে।

ভাদ্র আসে। ভাদ্র মাসে এপারে রক্ষাকালীর পূজা হয়। ঘটার পূজা। মেলা বসে, পনের দিন সে মেলা থাকে। দূর দেশ হইতে কত বড় রকমের পণ্য বোঝাই নৌকা ঘাটে লাগে। এত নৌকা আসে যে নদীর জল দেখা যায় না। কেনাবেচার ধুম লাগে। যাত্রা হয়। এপারের বাবুরা, ছেলেরা সখের থিয়েটার করে। সাজাহান, বঙ্গবীর, প্রতাপাদিত্য, এই সব বই লইয়া থিয়েটার হয়। ওপারের লোক খেয়ানৌকায় চড়িয়া এপারে আসে। পাট বেচা, ধান বেচা, তরিতরকারী বেচা, মজুরী করা পয়সা খরচ করিয়া মেলায় সওদা করে। চার পয়সার জিনিষ চার আনায় কিনিয়া তাহারা পানওয়ালীর দোকানে গিয়া বসে। খোসবু দেওয়া পান খায়, টেকা মার্কা বিড়ী কিনিয়া টানে, পানওয়ালীর দিকে ড্যাবডেবে চোখ করিয়া চায়, বোকার মত হাসে। দল বাঁধিয়া চাটাইয়ের উপর বসিয়া সারারাত কটিক দাসের যাত্রা শোনে। সুভদ্রা-হরণ পালা। গোঁফ দাড়ি কামানো চোয়াড়ে চেহারার জমকালো শাড়ীপরা সুভদ্রাকে দেখিয়া তাহারা বাহবা দেয়। ভোরের দিকে যাত্রা ভাঙিলে নিজেদের মধ্যে যাত্রার পাত্র-পাত্রী সম্বন্ধে নানা মন্তব্য করিতে করিতে, যাত্রায় শোনা গানের কলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে খেয়া নৌকায় চড়িয়া তাহারা ওপারে নিজেদের গাঁয়ে চলিয়া যায়। যে কয় দিন মেলা চলে ক্ষেত খামারের কাজ বন্ধ থাকে, সারা দিন তাহারা এপারে মেলায় কাটায়। কত রকম ফুর্ত্তি করে। মেলা ভাঙিয়া গেলে আবার যে যাহার কাজে মন দেয়। ভাঁড়ে দুধ লইয়া, ধামায় তরিতরকারী, ফল-মূল লইয়া, বস্তায় চাল, ডাল, সরিষা লইয়া বিক্রয় করিতে আসে এপারের হাট-বাজারে। জিনিস বেচিয়া সেই পয়সায় মাছ কেনে জেলেদের কাছে, কেরোসিন তেল চিনি মসলা লবণ কিনে মাধব সা নিতুর দাসের দোকান হইতে, মিঠাই কিনে মধু পালের দোকান হইতে। সওদা সারিয়া নদী পার হইয়া তাহারা ওপারে চলিয়া যায়।

ওপারের লোকের হাতে চাষ-বাস। তাহারা মাটি হইতে ফসল উঠায় আর সেই ফসল বিক্রয় করে এপারের লোকের কাছে। এপারের লোক গঞ্জ হইতে জিনিষ কিনিয়া আনিয়া সেই জিনিস আবার বেচে ওপারের লোকের কাছে। ওপারের লোকের হাতে বাঁচিবার খাদ্য যোগাইবার ভার, এপারের লোকের হাতে গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করিবার ভার। ওপার ছাড়া এপারের চলে না, এপার ছাড়া ওপারের চলে না। ওপারের লোকের সংখ্যা বেশী। মাটি যাহাদের হাতে তাহাদের সংখ্যা বেশী হইয়া থাকে। এপারের লোকের

সংখ্যা কম। দোকানদারী, মহাজনী করিয়া যাহারা খায়— সংখ্যা তাহাদের কম হইয়া থাকে। দুই দলের দেন-দেন এত বেশী হইলেও থাকে তাহারা আলাদা, এক দল নদীর এপারে, অন্য দল নদীর ওপারে।

ভাদ্র যায় আশ্বিন আসে। এপারের গাঁয়ের নূতন বৌয়া ভাদ্র মাস হইতে দিন গণে। আশ্বিন পড়িলেই তাহাদের শ্বশুরবাড়ীর চিঠি আসিবে- শ্রীমতীকে আনিবার জন্য কোন্ তারিখে নৌকা পাঠাইব জানাইবেন। গাঁয়ের মেয়েরা ভয়ে ভয়ে থাকে কখন তাহাদের লইয়া যাইবার জন্য নৌকা রওনা হইবার সংবাদ আসে। পূজার আগে বৌঝিদের যাতায়াতের মরশুম পড়ে। কেহ যায়, কেহ আসে। বাপ, মা, ভাই, বোন ছাড়িয়া যাহারা শ্বশুরঘরে যায়—চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাহারা নৌকায় উঠে, লোকজন বাক্স বিছানা পোটলা-পুঁটলী নৌকায় তুলিয়া দেয়। যাহারা বাপের বাড়ী আসে তাহারা নৌকা ভাল করিয়া বাঁধিবার আগে মাথার ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া লাফ দিয়া ঘাটে নামে। কত হাসি, কত কথা তাহাদের মুখে।

আমোদ তাহাদের বেশী যাহাদের বর কিছু স্বাধীন আর সৌখীন, নিজেরা বৌ লইয়া যাইবার জন্য নৌকা লইয়া আসে। বাপ মাকে প্রণাম করিবার সময় মেয়ে একটু কাঁদে, তার পর নদীর ঘাটে পা দিয়াই মেয়ে খুশীতে চঞ্চল হইয়া উঠে। বরের আগে গিয়া নৌকায় উঠিতে চায়, লজ্জায় পারে না। নৌকা ছাড়িলে নৌকার মুখ যখন ঘুরিয়া যায় তখন আবার তাহার চোখে জল আসিয়া পড়ে। বাতাস থাকিলে বাঁকের মাথায় পাল তুলিয়া দেওয়া হয়, দেখিতে দেখিতে নৌকা চোখের আড়াল হইয়া যায়। তখন তাহার চোখে আবার একটু জল আসে। খুশীর হাওয়ায় তখনই সে জল শুকাইয়া যায়।

ওপারের গাঁয়ের বৌঝিদেরও যাতায়াতের মরশুম পড়ে। নাকে রূপার নথ, হাতে রূপার বাজু, গলায় পুঁতির মালা ঝুলাইয়া তেল চপচপে চুলে খোঁপা বাঁধিয়া ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া বৌ-ঝিরা চাটাইয়ের পাৎলা ছই-দেওয়া ডিঙি নৌকায় চড়িয়া বাপের বাড়ী যায়, শ্বশুরবাড়ী আসে। ডিঙিতে থাকে নূতন হাঁড়িতে মুড়কি, নূতন ধামায় চিঁড়া, কল যাহার দেখিতে হয় সেই গাছের পাকা কাঁঠাল। ডিঙি চলিয়া গেলেও পাকা কাঁঠালের গন্ধ আসে অনেক দূর পর্য্যন্ত। শ্বশুর-পক্ষ যাহাদের পয়সাওয়ালা চাষী তাহাদের ডিঙিতে ছইয়ের সামনে ও পিছনে কাপড় টাঙাইয়া দেওয়া হয়, মেয়ে পর্দা-নশীন হইয়া শ্বশুরঘরে যায়। পর্দানশীন মেয়ে ছইয়ের চাটাইয়ের ফাঁকে আঙুল ঢুকাইয়া ফাঁক বড় করে। সেই ফাঁক দিয়া নদীর ঘাটে বৌঝিদের স্নান করা, নদীর তীরের বাড়ীঘর, অন্য নৌকার আরোহীদের দেখে। ডিঙি রূপসী-তলার ঘাটের কাছে আসিলে যে বৌয়ের পেটে ছেলে আছে সে হাত তুলিয়া কপালে ছোঁয়ায়, মনে মনে রূপসীমায়ের দোয়া ভিক্ষা করে।

আশ্বিন মাসে নদীর জল তর তর করিয়া বাড়িয়া নদী কূলে কূলে ভরিয়া উঠে। পাল তুলিয়া, দাঁড় বাহিয়া, গুন টানিয়া কত নৌকা যায় আসে। পারঘাটায় নৌকা বাঁধিয়া মাঝি-মাল্লা, নৌকার আরোহীরা জিনিসপত্র কিনে যেখানে ঘাটে, বোকাই গাঁয়ের ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া তাহারা স্নান করে, রান্না করে। রূপসীতলার ঘাটে বিদেশী নৌকা বাঁধিতে দেয় না এপারের লোকেরা সে ঘাটে গাঁয়ের বৌঝিরা নামে বলিয়া।

সব ঘাট ছাড়িয়া নদীর মন পড়িয়া থাকে রূপসীতলার ঘাটে। রূপসীতলার ঘাটে নদী ওকে প্রথম দেখিয়াছিল।

রূপসীতলার ঘাটের উপরে ডান দিকে মাঠের মধ্যে রূপসী গাছ। গাঁয়ে কোন বাড়ীতে ছেলেমেয়ে হইলে, উপনয়ন হইলে, বিবাহ হইলে সেই বাড়ীর মেয়েরা রূপসী তলায় পূজা দিতে আসে। ছেলের বা মেয়ের মা হাঁসের ডিম, কাজললতা, হলুদ রঙে ছোপান নূতন কাপড়, তেল, সিঁদুর ও পান সুপারি নূতন কুলায় সাজাইয়া সেই কুলা মাথায় করিয়া পূজা দিতে আসে। সঙ্গে আসে গাঁয়ের বৌঝি, ছেলেমেয়েরা। ঢোল আর কাঁসী বাজাইয়া গাঁয়ের বাজনদাররা আগে আগে চলে। ছেলের মা রূপসী গাছকে প্রণাম করিয়া দুই হাতে গাছকে একবার জড়াইয়া ধরে। গাছের গায়ে তেল সিঁদুর কাজল-লতার কালী লেপিয়া দেয়। হাঁসের ডিম ভাঙিয়া গাছের গোড়ায় দেয়। নূতন কাপড় গাছের গায়ে জড়াইয়া দেয়। পান সুপারি দেয়। সকলে উলুধ্বনি দেয়, শাঁখ বাজায়। সকলে মিলিয়া গাছ প্রদক্ষিণ করে সাত বার। এই ভাবে রূপসী পূজা শেষ করিয়া সকলে বাড়ী ফিরে।

এপারে রূপসী পূজা হয় ওপারে বৌয়া পবন হাজির দরগায় চিনি বাতাসা দেয় ছেলে হইলে। তাহারা শাঁখ বাজায় না শুধু উলু দেয়। তেল সিঁদুর দেয় না, মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া দেয় দরগায়। হলুদ-ছোপান কাপড় দেয় না, শালুর টুকরা দেয় দরগায়। আগে তাহারাও রূপসীতলায় সিন্নির চিনি বাতাসা পাঠাইয়া দিত, এখন আর দেয় না।

মজুমদার বাড়ীতে প্রথম নাতি হইয়াছে। মজুমদাররা পয়সাওয়ালা লোক। ছয় দিনের দিন তিন ঢোল তিন কাঁসী বাজাইয়া পাড়ার বৌঝিদের সঙ্গে লইয়া নাতির ঠাকুমা ও মা রূপসী তলায় পূজা দিতে আসিলেন। জোর বাজনা শুনিয়া বৈশাখের নিস্তেজ, ঘুমন্ত নদীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। বাজনদার-দের পিছনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঢোলের তালে তালে নাচিতেছে। তাহাদের পিছনে কস্তাপেড়ে শাড়ী পরিয়া ছেলের বৌকে সঙ্গে লইয়া মজুমদার-বাড়ীর গৃহিণী। শেষে পাড়ার বৌঝিরা। রূপসীতলায় ভীড় জমিয়া গেল। ঢোলের বাজনা শুনিয়া ওপারের দুই-চারি জন বৌ নদীর কূলে

আসিয়া দাঁড়াইল, কৌতূহলী হইয়া পূজা দেওয়া দেখিতে লাগিল। এপারে বৌয়েরা যখন উলু দিল তাহারাও উলু দিল। ছেলেমেয়ের মা ত বটে, না দিয়া পারে না। ছেলেমেয়ের মঙ্গল সব মা চায়।

পূজা দেওয়া শেষ হইলে সকলের বৌঝিরা রূপসীতলার ঘাটে ছড়াইয়া পড়িল। কয়েকটি মেয়ে রূপসীতলার ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। নদী গাঁয়ের সব বৌঝিকে চিনিত। দেখিল দলের মধ্যে একটি নূতন মেয়ে যাহাকে সে ঘাটে কখনও দেখে নাই। তাহাকে দেখিয়া নদী চমকিত হইল, মুগ্ধ হইল।

তাহার জীবনে সে একটা স্মরণীয় দিন। নিতান্ত গ্রাম্য নদী সে, বড় গাঙের একটি ক্ষুদ্র শাখামাত্র। কোথায় গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী সে জানে না। হিমালয়ের ওপারে তিব্বতের কোন্ গিরিগহ্বর হইতে ব্রহ্মপুত্র জন্মিয়াছে সে জানে না। স্বর্ণবর্ণা সিন্ধুর কথা সে শোনে নাই। বিন্ধ্য-দুহিতা নর্ম্মদা ও গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, তুঙ্গভদ্রার নাম তাহার অপরিচিত। স্বর্গনদী অলকানন্দার তুষারহিম প্রবাহের কল্পনা করিতে সে অক্ষম। সামান্য গ্রাম্য নদী সে। বেতবন, বাঁশঝাড়, কলাবাগান, কাঁটাওয়ালা বাবলাগাছ, জংলী ফুল, কচুবন, নলবন, কাশবন—এই সকল গ্রাম্য উদ্ভিদ তাহার সঙ্গী। চাষী ও গৃহস্থ ঘরের লোকজন আর অল্পবিত্ত বেপারী লইয়া তাহার পরিচিত পৃথিবী। শান্ত, অচপল, নিস্তব্ধ, সাধারণ পরিবেশের মধ্যে তাহার দিন কাটে। বৎসরে কয় মাস বর্ষার ধারায় উপচাইয়া পড়া খাল-বিলের পাটপচা জল ও বড় গাঙের পঙ্কিল স্রোত আসিয়া তাহার জীবনে একটু চাঞ্চল্য ও গতি আনিয়া দেয়। সে কয় মাস কাটিয়া গেলে আবার তাহার আগের শান্ত, অর্দ্ধসুষুপ্ত, মন্থর জীবনযাত্রার ধারা ফিরিয়া আসে।

ঘুমন্ত গ্রাম্য নদী সে। রূপসীতলার ঘাটে ওকে দেখিয়া সে যেন ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিল। আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, কেবল বৈশাখের অর্দ্ধেক চলিতেছে, বড় গাঙের জল কি এখনই আসিয়া পড়িল তাহার স্থির জলে?

স্নানের বেলায় বিধবা মায়ের সঙ্গে ও নদীর ঘাটে আসে। স্নান করিতে আসে কিন্তু নদীর জলে নামে না। নদীর নীরব ব্যাকুলতা, নিঃশব্দ কাকুতি ও বোঝে না বোধ হয়। নদী ভাবে এত মেয়ে জলে নামে ও কেন নামে না? এইটুকু জল তাহার বুকে তবু এত ভয়? ওর মুখের দিকে ওর চোখের দিকে নিস্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া নীরবে নদী ডাকে, এস, এস। আমি ছোট নদী, তোমার মতই শান্ত, আমাকে দেখে ভয় পাবার কিছু ত নাই। আবার ডাকে, এস, নেমে এস। সে জলে নামে না। ঘাটে বসিয়া ঘটিতে জল তুলিয়া মাথায় ঢালে। নদী মনে ভাবে, আহা, ঐ এক ঘট জলের মধ্যে যদি তাহার সমস্ত দেহটাকে বিলীন করিয়া দিতে পারিত।

বিকাল বেলা সঙ্গীদের লইয়া সে রূপসীতলার ঘাটে বেড়াইতে আসে। দূর হইতে নদী ওর কচি কলাপাতা রঙের শাড়ী দেখিয়া চিনিতে পারে। যতক্ষণ ও বেড়ায় গল্প করে নদী একদৃষ্টে ওর দিকে চাহিয়া থাকে। ও কথা বলিতে বলিতে হাসে, নদীর অগভীর জলে খুশীর বুদ্বুদ ওঠে।

নদী নিজের মনেই ভাবে তাহার উপর ওর একটু মায়া পড়িয়াছে বোধ হয়। তাই যদি না হয় তবে শহরের মেয়ে ও, রূপসীতলার ঘাট কেন ওর এত ভাল লাগে? কেন ও বিকালে সাজিয়া গুজিয়া নদীর ধারে বেড়াইতে আসে? সামান্য গ্রাম্য নদী বলিয়া তাহাকে ত ও ঘৃণা করে না? জলে ও নামে না, নদী ওকে দূর হইতে দেখিয়াই সন্তুষ্ট হয়, তৃপ্তি পায়। ভাবে এক দিন আসিবে যখন ওর ভয় দূর হইবে, তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইবে না।

নদী আর ওর নীরব আলাপ এমনি করিয়া চলিতে থাকে। আষাঢ় আসিল। বড় গাঙের জল আসিবার সময় হইল।

হঠাৎ কি হইল নদী জানে না ওপার আর এপারের মধ্যে কতকালের পুরাতন সম্পর্ক ভাঙিয়া গেল। কি লইয়া গোলযোগের সূত্রপাত নদী জানে না। সামান্য গ্রাম্য নদী সে, কতটুকুই বা তাহার জ্ঞানের পরিধি। পারঘাটার কাছে জুমা-ঘরে সভা হয়, কাজকর্ম্ম ফেলিয়া লোক জড় হইয়া কিসের পরামর্শ করে। এপারের লোকের ওপারে যাতায়াত কমিয়া গেল। রূপসীতলার ঘাটে এপারের বৌঝিরা আর স্নান করিতে আসে না। কয়েক দিন হইল নদী আর ওকে দেখিতে পায় না। সে ব্যাকুল হইয়া উঠে, মনে নানা দুশ্চিন্তা আসে।

ওপারের লোকের যেন কি হইয়াছে। যখন তখন দল বাঁধিয়া তাহারা এপারে আসে। দিনে আসে রাত্রেও আসে। বাঁশের সাঁকো পার হইয়া এপারে আসে, কত কি জিনিস মাথায়, হাতে, কাঁধে বহিয়া ফিরিয়া যায়। এ ত এপারের হাটে সওদা করা জিনিস লইয়া যাওয়া নয়। এ ত এপারের মেলায় সওদা করা জিনিস লইয়া যাওয়া নয়। এত জিনিস পায় কোথা হইতে? উহাদের কাণ্ড দেখিয়া নদী অবাক্ হয়। নদী আরও লক্ষ্য করে ওপারে চিৎকার, গোলমাল বাড়িয়া চলে, এপারে নিস্তব্ধতা আরও ঘন হইয়া উঠে। এপারের লোকজনকে সে আর বড় দেখিতে পায় না। রাত্রে দূর হইতে কান্নার শব্দ সে যেন শুনিতে পায় মাঝে মাঝে। রাত্রির নিস্তব্ধতা ও অন্ধকারের মধ্যে কখন কখন আগুনের শিখা বাঁশবন, আম-জাম-কাঁঠালের বাগানের

মাথার উপর দিয়া দেখা যায়, আগুনে বাঁশঝাড়ের বাঁশ ফাটিবার শব্দ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকের হল্লার আওয়াজ আসে।

দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া নদী ভাবে কি কাণ্ড ঘটিতেছে কে জানে? ক্ষেতখামারের কাজ ফেলিয়া ওপারের লোক এত ঘন ঘন এপারে আসে কেন? পারঘাটার হাটের দিন হাটুরে লোকের যাতায়াত বন্ধ হইল কেন? সন্ধ্যাবেলায় ওপারে এত জোরে জোরে আজানের শব্দ, এপারে শাঁখের শব্দ পাওয়া যায় না কেন? এপারের লোকজনের কি হইল? জীবনে নদী কখনও এরকম ব্যাপার দেখে নাই, ইহার কোন অর্থ সে বুঝিতে পারে না।

রূপসীতলার ঘাটে ঘাস বড় হইয়া উঠে। ঘাট হইতে গাঁয়ে যাইবার পায়ে চলার সরু পরিষ্কার পথ লম্বা ঘাসে ঢাকিয়া যায়। এপারের লোকজন কি বাড়ীঘর, জোতজমি, ধানের মরাই, গোয়ালের গরু, বাড়ীর সব জিনিষপত্র ফেলিয়া, পূজাপার্ব্বণ সব বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল? না মড়ক লাগিয়া মরিয়া গেল? এপারের লোক মরিলে পারঘাটায় কাছে শ্মশানে আনিয়া পোড়ায়। এখন কি নূতন নিয়ম হইয়াছে—লোক মরিলে বাড়ীতে পোড়াইতে হইবে? এত ঘন ঘন আগুন দেখা যায় কেন? গাঁয়ে চৈত্র বৈশাখ মাসে কালেভদ্রে দুই-একটা আগুন লাগে। অসময়ে এত আগুন কেন? ছোট গ্রাম্য নদী সে, গেঁয়ো বুদ্ধিতে এসব কাণ্ডের কোন অর্থ করিতে পারে না, শুধু অস্বস্তি আর এক বুক দুশ্চিন্তা লইয়া ছটফট করে। তাহার নীরব আলাপের সঙ্গী সে মেয়েটিকে কেন্দ্র করিয়া তাহার দুশ্চিন্তা বাড়িয়া যায়। কত দিন তাহার দেখা যায় নাই, কি হইল কে জানে?

বড় গাঙের জল আসিয়াছে নদীতে। নদী একটু একটু করিয়া ফুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে ভাবে বড় গাঙ আরও জল ছাড়ে না কেন? বড় গাঙ সব জলটুকু ছাড়িয়া দিলে সে রূপসীতলার ঘাট ছাপাইয়া মাঠে উঠিবে। মাঠ ছাপাইয়া এপারে গাঁয়ের মধ্যে হুড়মুড় করিয়া প্রবেশ করিবে। কোথায় গেল গাঁয়ের লোক, কোথায় গেল ও, সে খুঁজিয়া বাহির করিবে। তার পর ওপারের গাঁয়ে ঢুকিবে। ওপারের লোকের কি হইয়াছে, ক্ষেতখামার ছাড়িয়া কি তাহারা করিতেছে, কি তাহাদের আসল মনের কথা, সব জানিয়া লইবে। কিন্তু বড় গাঙের এত জল থাকিতেও কৃপণের মত সে একটু একটু করিয়া জল ছাড়িতেছে।

নদী ক্রমে ফুলিয়া উঠিতেছে। পারঘাটার বাঁশের সাঁকো জলে ডুবিবার মত হইল। নদী আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল এখনও খেয়ানৌকার দেখা নাই। খেয়ানৌকার দেখা নাই কিন্তু ওপারের লোকের ঘাস কাটিবার ছোট ছোট অনেক ডিঙি বোকাই পীরের ঘাটে ও আঘাটার ভিড়ানো আছে। নদী লক্ষ্য করে ঘাস কাটিবার জন্য এই সব ডিঙি ব্যবহার হয় না। রাত্রে এই সকল ডিঙিতে চাপিয়া ওপারের লোক এপারে যাতায়াত করে। কেন কে জানে?

সে দিন রাত্রেও ডিঙি চাপিয়া ওপারের কয়েক দল লোক এপারে আসিয়া উঠিল। ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। চার দিক ঘোর অন্ধকার। টানিয়া টানিয়া হাওয়া দিতেছে। মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিয়া মাথা-ভাঙা তালগাছের পিছনে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারিতেছে। নদী-পাড়ের কচুবনের মধ্যে ব্যাঙ ডাকিতেছে, কান্নার মত শব্দ করিয়া শেয়াল ডাকিয়া উঠিল। শেয়ালের ডাক শুনিয়া এপারে হাটতলায় কুকুরগুলি আর আগের মত চিৎকার করিল না। কে জানে কুকুরগুলির কি হইয়াছে?

মাঝরাত্র হইয়াছে। এখনও সমানে বৃষ্টি পড়িতেছে। এপার হইতে কয়েক জন লোক কাঁধে করিয়া কি যেন আনিতেছে মনে হইল। কাছে আসিতে আবছা দেখা গেল দুই জন লোক, কোন পোঁটলা-পুঁটুলী নয়, একটা মানুষের দেহ বহিয়া আনিতেছে। তাহাদের পিছনে আরও তিন জন লোক। মাথার দিকটা যে ধরিয়াছে তাহার কাঁধ ও গা বাহিয়া লম্বা গোছা গোছা চুল ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এ কাহাকে কোথা হইতে এত রাত্রে এমন করিয়া আনিল এরা?

পারঘাটার বাঁশের সাঁকো তখন চার আঙুল জলের নীচে, বাঁশের উপর দিয়া তরতর করিয়া স্রোত চলিয়াছে। দলটি সাঁকোর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, দেহটা মাটিতে ফেলিয়া দিল। মাথার দিকটা নদীর ঢালু অংশে জলের মধ্যে পড়িল পায়ের দিকটা উপরে রহিল। পরনে কিছু নাই, শাড়ী দিয়া দুই হাত বাঁধা।

লোকগুলি দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। এক জন বলিল,—ছুঁড়িটার হাতে সোনার চুড়ি ছেলরে, কেউ তোরা সরাইছিস? তাই ত, এ খেয়াল তাহাদের কাহারও হয় নাই। দলের এক জন বলিল—ওটা আমার ভাগে। আমি আগে ওটারে পাঁজা কোলে কইর‍্যা ঘরের বাহার আনছিল্যাম। চুড়ি খুলিবার জন্য সে এক পা বাড়াইল। বাকী লোকগুলি তাহাকে ধমকাইয়া উঠিল, বলিল—আগে আনছ আগে আপন কাম হাছিল করছ। আমরা চার মরদে তো শালার খাঁটে খাইচি। চুড়িতে হাত দেবা ত দাঁইতার কোপ বসাইমু তর গলায়। ভাল চাস ত সইর‍্যা যা। তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া তাহারা আগাইয়া আসিল।

নদীর ঢালু পাড়ের নরম কাদায় ও জলের টানে দেহটা ধীরে ধীরে নদীর মধ্যে সরিয়া যাইতেছিল। এইবার সমস্ত দেহটা নিঃশব্দে গড়াইয়া নদীর মধ্যে পড়িল।

চুড়ির দাবীদার লোকগুলির একজন বলিল—আরে ছুঁড়িটা পালায় দেহি। ধর শালীরে, ধর। আয় জলে নাবি। চুড়ি লিয়্যা ওটারে গাঁকের মধ্যি পুঁত্যা ফ্যালবো। চুড়ির প্রথম দাবীদার যাহাকে সকলে ধমকাইয়াছিল সে এতক্ষণে হাসিয়া বলিল—দুঃশালা, ওটা জেন্দা হেল নাকি? আমি পয়লা উয়্যারে খতম কইর‍্যা দিছি। তারী ভিড়বিড় করতেছিল। বাকী লোকগুলি কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিল। একজন লাফাইয়া বক্তাকে ধরিতে আসিল, গর্জ্জন করিয়া বলিল—শালা, আমাগো মড়া খাওয়াইছিস্। ঠাহর পাইমি আঁধারে। তাই ত কই নড়ে চড়ে না ক্যানে? তরে আজ খ্যাব করমু।

অন্ধকারে, বৃষ্টির মধ্যে, নদীর পাড়ে মারামারি আরম্ভ হইল।

নদী বিস্মিতভাবে ইহাদের কাণ্ড দেখিতেছিল এতক্ষণ। দেহটা জলের মধ্যে গড়াইয়া পড়িতে তাড়াতাড়ি সে দুই হাত বাড়াইয়া দেহটা নামাইয়া লইল। আস্তে ওকে কোলে নামাইয়া ওর মুখের দিকে চাহিয়া নদী ভয়ানক চমকিয়া উঠিল। কে এ? কে রে? এ যে সেই রূপসীতলার ঘাটের তাহার কত পরিচিত কত আদরের মেয়েটি, তরে যে জলে নামিত না, ঘাটে দাঁড়াইয়া শুধু হাসিত। আহা, কি হইয়াছে ওর যে আজ এই অন্ধকার বাদলা রাতে তাহার ডাকে এমন ভাবে সাড়া দিয়া জলে নামিয়া আসিল? কেন ওর ছুরে শাড়ীখানা খুলিয়া শক্ত করিয়া ওর ফুলের মত নরম হাত দুখানা বাঁধিয়াছে? আদল গায়ে ওর কি লজ্জা করে না? ও যে বড় হইয়াছে সে খেয়াল কি কাহারও হয় নাই? বিধবা মায়ের মেয়ে ও, কিন্তু বাড়ীতে কি পুরুষমানুষ ছিল না? কেন তাহারা বাধা দিল না? কেমন পুরুষ মানুষ তাহারা? ওর গলায় কালো দাগ কেন? আঙুলের দাগ বুঝি? গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল বুঝি? আহা, ওর পাখীর গলার মত নরম গলা এমন করিয়া টিপিয়াছে? ওর বুকে পিঠে এত দাগ কেন? কাঁটায় ছড়িয়া গিয়াছে কি? একটু মায়া হয় নাই ফুলের মত নরম দেহে এমন করিয়া মারিতে? ঘৃণায়, লজ্জায়, দুর্ব্যবহারে ও বুঝি মূর্চ্ছা গিয়াছে? না লজ্জায় চোখ বন্ধ করিয়া আছে? রূপসীতলার ঘাটে নদী যেদিন ওকে প্রথম দেখিয়াছিল ওর চাঁপা ফুলের মত রঙের সঙ্গে হালকা সবুজ ডুরে শাড়ীতে অপরূপ মানাইয়াছিল ওকে। ওর শান্ত, সুন্দর, দেবী প্রতিমার মত রূপ দেখিয়া নদী ভাবিয়াছিল ও বুঝি পল্লীলক্ষ্মী। নদী ওকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। সেদিন ওকে নদী বিজয়িনীরূপে দেখিয়াছিল আর আজ এই বেশে দেখিতেছে এই ভাবিয়া বোধ হয় ওর লজ্জা হইয়াছে, তাই চোখ বন্ধ করিয়া আছে। নদী ওকে ডাকিয়াছিল জলে নামিতে, সে কি এই বেশে সাড়া দিবার জন্য?

আকুল হইয়া নদী ওর সর্ব্বদেহে শীতল ধারা দিতে লাগিল। ওর কপালে, চোখে, মাথায় ঠাণ্ডা হাত বুলাইতে লাগিল। ওর দীর্ঘ, কালো কেশের মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালিত করিতে লাগিল। ও যেমন শুইয়াছিল নদীর কোলে তেমনি শুইয়া রহিল। পাতলা ঠোঁট দুটিতে, ছোট্ট কপালে নদীর স্নেহশীতল স্পর্শে একটু একটু করিয়া গ্লানির রেখা মুছিয়া যাইতে লাগিল।

পরমস্নেহে ওর কচি মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া, ওর ফুলের মত কোমল দেহখানি কোলে করিয়া নদী অপেক্ষা করিতে লাগিল কখন ও জাগিয়া উঠিবে।

ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদী সে, মানুষের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের সঙ্গে তাহার পরিচয় ছিল। মানুষের সীমাহীন, লজ্জাহীন, বড় লালসার এই বীভৎস রূপের ধারণা করিতে পারিতেছিল না সে। তাই ওর কচি মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া, মায়ায় অন্ধ হইয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল কখন ও জাগিয়া উঠিবে, ভাবিতে পারিল না ও আর কোন দিন জাগিবে না।

এক স্বপ্ন

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

তোমার আঁচল ছেঁড়া—রুখু চুলে তেল নাহি জোটে
এ দীন মূরতি যবে বেদনায় মিচাড়ে পরাণ,
বিবর্ণ অধরে তব হাসির চামেলীরাশি ফোটে,
উপবাস-ম্লান মুখে সুধা-হাসি মরি কি অম্লান!
এ ছবি দুর্ব্বল দেহে ভরে দেয় শক্তি দানবের,
পাথরে শাবল মেরে মনে হয় ফসল ফলাই;
দামোদরে বাঁধ বেঁধে কবে হবে ব্যবস্থা সেচের,
অত দিন বসে থাকি—এত ধৈর্য্য এ অন্তরে নাই।
সুফলা স্বদেশে কবে দূর হবে তোমার যৌবন,
চিক্কণ কবরী কবে সাজাইব মাধবীরাশিতে,
এক স্বপ্ন নিয়ে আছি—তারি লাগি সমগ্র সাধন—
কোন ভাবনার ছায়া পড়িবে না তোমার হাসিতে।
শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত মলয়জ শীতল নিশীথে
যোদের যুগল হিয়া কখন কি পারিবে মিশিতে।

বঙ্গসাহিত্যে ইতিহাসের সাধনা

শ্রীযদুনাথ সরকার

আমি যে এত বৎসর ধরে সাহিত্য-পরিষৎ পরিচালনা করেছি, কর্ম্মীদের দৈনিক কাজে ও পরামর্শে অতি নিকট-ভাবে সঙ্গী হয়ে আমাদের চেষ্টাগুলি ফলপ্রদ করবার সাহায্য করেছি, এর মধ্যে আমার একটি লক্ষ্য লুকানো ছিল। সেটি আজ প্রকাশ ক'রে বলব। আমরা জানি যে সভা-সমিতি সর্ব্বোচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না; কারণ প্রতিভার জন্ম শুধু ভগবানের দয়ার উপরই নির্ভর করে, মানুষের পরিকল্পনা বা আয়োজনে হয় না। তবে আমরা কি করতে পারি? আমরা পারি—যেখানে প্রতিভা আগে থেকে জন্মেছে তার বিকাশে সাহায্য করতে, তাকে অকালে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে, তাকে সমাজে পরিচিত, সমাদৃত করতে। এই হ'ল পরিষদের পক্ষে সম্ভব কাজ, এ কাজ আমাদের আগেও অনেক সভা-সমিতি এবং গুণগ্রাহী ধনীলোক ক'রে এসেছেন।

কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালী সাহিত্যকর্ম্মীদের চেষ্টা একটা বিশেষ দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া এবং সেই লক্ষ্যে দৃঢ় ক'রে রাখা, যার ফলে বাঙালী-চরিত্রের এক দিককার অভাব পূরণ হবে এবং আমাদের এক শ্রেণীর কাজ স্থায়ী হয়ে থাকবে। এই অভিপ্রায়টি এখন খুলে বলব।

যে সব বিলাতী পণ্ডিত ভারতবর্ষে শিক্ষক হয়ে এসেছেন তাঁরা সহজেই ধরে ফেললেন যে, মোটের উপর ভারতীয় লোকদের প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি দর্শনের দিকে ঝোঁকে, পদার্থ-বিজ্ঞানের দিকে বড় কম। আমরা কল্পনা ও ভাবে বিভোর হয়ে থাকতে ভালবাসি, বাস্তব জগতে কাজের লোক হয়ে এবং তার উপযুক্ত প্রণালীতে চিন্তা করতে আমরা স্বভাবতই চাই না বা পারি না। এই কারণে আমাদের বিলাতী শিক্ষকেরা অনেকবার বলেছেন যে, অর্থাগম ও মানব-সুখ বাড়াবার জন্যে বিজ্ঞান-চর্চ্চা ত সব দেশেই আবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষে তার উপর অন্য এক কারণে এটা আবশ্যক। সেই বিশেষ কারণটি হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞান-শিক্ষার সংযম ও কঠোর ব্রহ্মচর্য ভিন্ন ভারতীয়দের মানসিক গঠন দৃঢ় ও বিচিত্র করা সম্ভব নহে।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন যুগে এক দল মনীষী যে বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক ছিলেন, একথা আমি অস্বীকার করি না। পাণিনির ব্যাকরণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, চরকসংহিতা এবং মানসার বা স্থপতিশাস্ত্র যে জাতি রচনা করেছিল, তারা ভাব-প্রবণ কল্পনা-বিলাসী ছিল না। কিন্তু আজ আমাদের বংশধরদের কোথায় দেখতে পাই? শত সহস্র বৎসর ধরে আমাদের চিন্তা-নায়কেরা, আমাদের গ্রন্থকারগণ, প্রাচীন ভারতের এই লক্ষ্য ভুলে শুধু ভাব ও দর্শনের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বিধর্ম্মী রাজার অধীনতা অত্যাচার অবমাননা ও দারিদ্র্য সহ্য ক'রে বাঙালীর জর্জ্জরিত প্রাণ বেদান্ত-চর্চ্চায় ও ভক্তিসাধনায় আশ্রয় নিয়ে চিত্তের একমাত্র শান্তি ও সুখ পেয়েছে। এইজন্য আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য-রচয়িতাদের আমি দোষ দিই না, ভাব ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁদের হাত থেকে বঙ্গসাহিত্য যে অনেক রত্ন পেয়েছে সে-সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন।

কিন্তু আজ যে বিশ্বময় বিজ্ঞানের রাজত্ব! আজ যে সব দেশেই, মানব-জীবনের সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের প্রণালী ও মন্ত্রতন্ত্র একাধিপত্য করছে! এ রাজত্ব শুধু রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসা ও যন্ত্রপাতির কারখানায় নয়; সাহিত্যের সব বিভাগেও—প্রকাশ্যেই হোক বা তলে তলে হোক, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত হয়েছে।

প্রথম থেকে আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কি ক'রে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও কর্ম্মপ্রণালী আনা যায়? এই কাজের জন্য চাই, ন্যায়ের তর্কের জন্য আবশ্যক তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার মস্তিষ্ক নয়,—যা শুধু শুষ্ক খড় কাটতে পারে; ভাবে উন্মত্ত বা ভক্তিরসে অশ্রুসিক্ত শুষ্ক মস্তিষ্ক—যা মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, তা নয়। এখন চাই—ধীর স্থির সংলগ্ন চিন্তাশক্তি; অসীম শ্রমশীলতা, পরীক্ষা না ক'রে কোন কথা গ্রহণ করব না—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; সমস্ত উপকরণ একত্র ক'রে, সামঞ্জস্য ক'রে তার ভিতর থেকে সত্যের খাঁটি নির্য্যাস বের করব, এই মন্ত্রে দীক্ষা। অর্থাৎ এক কথায়, যাকে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি বলে। আমাদের সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমান যুগে এই কাজ আরম্ভ করেছে এবং তার এই প্রচেষ্টায় উপদেশ ও সাহায্য দিতে পেরে আমি চরিতার্থ হয়েছি।

দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত, নৈয়ায়িকদের বংশধর, তাঁর কাজ যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এক দিকে রাখুন, আর প্রাচীনপন্থী নৈয়ায়িকদের রচনা অন্য দিকে রাখুন, এই দুইয়ের তুলনা করলেই পার্থক্য বুঝতে পারবেন। প্রাচীন আদর্শে কি ফল পেয়েছি? কবির ভাষায় বলি—

> "এক দিন নবদ্বীপে মহা তর্ক হৈল
> তৈলধার পাত্র কিম্বা পাত্রাধার তৈল?
> বাহাসতে ফুরিয়ে গেল উনিশ পিপে নস্য।"

বাঙালী মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণতার ইহা ভিন্ন আর কোন ফলই রইল না। আর দেখুন, নবীন দীনেশচন্দ্রের সাধনার ফলে বঙ্গীয় ন্যায়-রচয়িতাদের পরম্পরা ও ভাববিস্তার এবং সেন-রাজাদের সময় থেকে মুসলমান সুলতানদের রাজসভা পর্য্যন্ত বাঙালী হিন্দু বৈদ্যদের ইতিহাস অতি নিখুঁত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উদ্ধার করা হয়েছে। আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির এবং বাঙালী জাতির অতীত গতির একটি অন্ধকার কুঠুরী সম্পূর্ণ আলোকিত হয়েছে। ভারতের মানচিত্রে অঙ্গুলি দিয়ে দীনেশচন্দ্র দেখিয়ে দিচ্ছেন যে,

কোন্ কোন্ অঞ্চলে কখন কখন কোন্ চিন্তা বা জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ল, গৌড়ীয় পণ্ডিত বাঙলা থেকে কাশী, কাশী থেকে বুন্দেলখণ্ডে গিয়ে গ্রন্থ রচনা করলেন, রাজসভায় জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে দিলেন। আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই গবেষণা অমূল্য উপাদান হয়ে থাকবে। বাঙালী মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণতার এটাও জাজ্বল্য প্রমাণ।

তেমনি ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমার শিষ্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবর্ষ ধ'রে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইংরেজ-শাসনে বঙ্গদেশে যে নবজাগরণ হয় তার ইতিহাসের সব উপকরণ সংগ্রহ ক'রে তা থেকে বাঙালী সমাজ, বঙ্গভাষার সংবাদপত্র, বাঙালীর নাট্যশালা এবং শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার বিস্তারের প্রামাণ্য ইতিহাস এবং সাহিত্য-সাধকদের জীবনীর খাঁটি সত্য বিবরণ প্রকাশ ক'রে বঙ্গসাহিত্যের পাঠকদের এবং বঙ্গের ইতিহাসের ছাত্রদের চিরঋণী ক'রে রেখেছে। যোগেশচন্দ্র বাগল প্রভৃতি নবীন কর্ম্মিগণ এই কাজে সহকারী হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথের এই সব রচনার সঙ্গে আমাদের কবিদের জন্ম-শতবার্ষিকীতে যে সব প্রবন্ধ পড়া হয় তার তুলনা করলেই ইতিহাস ও জীবনীর ক্ষেত্রেও এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মূল্য কত বেশী তা বুঝতে পারবেন। এরূপ একান্ত সত্যনিষ্ঠাকে "পাথুরে ইতিহাস" ব'লে উপহাস করার দিন চলে গেছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস সেইমত বঙ্কিম প্রভৃতি সাহিত্যরথীদের গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য শিক্ষাপ্রদ সংস্করণ প্রস্তুত ক'রে সমস্ত দেশের সম্মুখে এক মহৎ দৃষ্টান্ত রেখেছে। এই কাজটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ না করলে তার লজ্জা চিরস্থায়ী হ'ত। তেমনি, আমার শিষ্য অধ্যাপক কালিকা-রঞ্জন কানুনগোর ইতিহাস-গ্রন্থগুলির সঙ্গে রজনীকান্ত গুপ্তের লেখা ভারত-ইতিহাস তুলনা করলেই নবীন ও পুরাতন লেখকদের মধ্যে গবেষণার প্রণালী এবং ফল-প্রসূতিতাতে কত পার্থক্য তা স্পষ্ট হবে।

এই সব নবীন কর্ম্মীর সত্যস্পৃহা এত বেশী যে, তাদের প্রকাশিত লেখায় কোন ভুল বা ত্রুটি দেখিয়ে দিলে, তারা তা বিচার ক'রে তার সত্য অংশটুকু পরবর্ত্তী সংস্করণে যোগ ক'রে দেয়। এরূপ নিজ ভ্রম স্বীকার করাকে তারা অপমানের কারণ ব'লে মনে করে না। এই ক্রমোন্নতির জন্য আগ্রহ, এই মুক্ত হৃদয়ে সত্য বরণ করার স্পৃহাই প্রকৃত পণ্ডিতের চিহ্ন। আমার শিষ্যগণ তা ভোলে নি।

আমার ঐতিহাসিক শিষ্যগণ, এখানে এবং অন্যত্র, কখনও আর্থিক পুরস্কার খোঁজে নি, কাগজে প্রশংসা পাবার জন্যে ষড়যন্ত্র করে নি, যে দরবারে খোশামোদ করলে বেশ অর্থাগম হ'তে পারত, সেখানে তারা ধরণা দেয় নি। গবর্ণমেণ্ট অথবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তাদের এক পয়সার সাহায্যও করে নাই। আমি এটাকেই আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব মনে করি। সংস্কৃতে আছে—

"সর্বত্র বিজয়ম্ ইচ্ছেৎ পুত্রাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্"

অর্থাৎ আর সব লোককে হারাতে চেষ্টা কোরো, কিন্তু পুত্রের নিকট পরাস্ত হ'লে তা গৌরব ব'লে মনে কোরো। এখানে পুত্র শব্দের অর্থ শিষ্য অর্থাৎ মানস-সন্তান ধরতে হবে। আমার শিষ্য-প্রশিষ্যদের ধারা পুরুষ পুরুষানুক্রমে চলতে থাকুক, বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যকে তারা স্থায়ী দানে সমৃদ্ধ করতে থাকুক, এই প্রার্থনা করেই আমি আমার সাহিত্যিক কর্ম্মজীবনের দৃশ্যের উপর যবনিকা টেনে দিলাম।*

* ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সম্বর্দ্ধনা-সভায় আচার্য্যের ভাষণ।

আচার্য্য যদুনাথ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

অমরত্ব লভে ছিল সেকালের তপস্যা কঠোর,
বিদিত পুরাণে। আজো সত্যযুগ হয়নি বিগত।
সুখদুঃখ তুচ্ছ করি' উদ্‌যাপিতে জীবনের ব্রত
একাগ্র-সাধনা-রত, হে তপস্বী, তুমি আকৈশোর।
অজ্ঞাতে করিলে জ্ঞাত, একে একে রচি দিলে ডোর
অসংখ্য বিস্মৃত তথ্যে বিক্ষিপ্ত যা ছিল ইতস্তত।
সুধিগণ-মধ্যে চির তব শির রহিল উন্নত,
সত্যের দর্শন পেলে ইতিহাসে, হে ধ্যান-বিভোর!

মুঘলের ভাগ্যচক্র, সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন,
অপূর্ব্ব শতাব্দীত্রয়—উদ্ভাসিল তোমার এষণা।
মহারাষ্ট্র-জীবনের যেখানে যে নব জাগরণ,
শিবাজী জীবন্ত হ'ল, স্রষ্টা তুমি, সার্থক সাধনা।
এলো আলো, স'রে গেল অন্ধকার-যুগ-আবরণ,
হে আচার্য্য, ধন্য তুমি, ধন্য তব বাণী-আরাধনা।

সত্য বহুমুখ। তার এক মুখ অতীতের পানে
ফিরানো যে চিরদিন। তোমারি সে রচনার মাঝে
সে মুখের পরিচয়, সে রূপের রহস্য বিরাজে।
বিস্মৃতির পার হ'তে ইতিহাস স্মৃতি কার আনে!
সময়ের বেলাভূমে তথ্যেরা বিকীর্ণ নানা স্থানে,
সিন্ধুকূলে শঙ্খসম অনাদৃত মূর্চ্ছিত তারা যে,
তাদের অন্তরে বুঝি কালের তরঙ্গধ্বনি বাজে!
কঙ্কালে পূর্ণতা দিলে তিলে তিলে দেহ-রূপদানে।
বিগত হয় না গত, জানি জানি হে ঐতিহাসিক,
অচঞ্চল অতীতের মাঝে শুনি জীবন-স্পন্দন।
ফুটালে রত্নের রাশি হে অজ্ঞাত পথের পথিক,
ভালে শোভে জয়টিকা, লহ এই মাল্য ও চন্দন!
যশের সৌরভে তব, হে বরেণ্য, পূর্ণ দিগ্বিদিক,
আচার্য্য, গ্রহণ কর অন্তরের এ অভিনন্দন।*

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক অনুষ্ঠিত আচার্য্য যদুনাথ সরকারের সংবর্দ্ধনা-সভায় পঠিত।

উইলিয়ম ইয়েট্‌স

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠাতা কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার ব্যপদেশে ভারতীয় ভাষা সাহিত্য, শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে সব কাজ করে গেছেন সে সম্বন্ধে আমরা অনেকেই অবগত আছি। এঁদের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী, অথচ এঁদেরই দলভুক্ত আর একজন বিশিষ্ট পাদ্রী ছিলেন উইলিয়ম ইয়েট্‌স। কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের চরিতকার বলেছেন, ইয়েট্‌সও ছিলেন একজন প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ এবং প্রাচ্য ভাষাসমূহে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থাদির অনুবাদ প্রকাশে কেরীর পরেই তাঁর স্থান।

ইংলণ্ডে লো বরো নামক স্থানে ইয়েট্‌স ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৪৫ সনের ৩রা জুলাই এডেনের সন্নিকট সমুদ্রবক্ষে। তিনি তখন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার মানসে এডেনের পথে জাহাজে স্বদেশাভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। ইয়েট্‌সের জীবিতকালের দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরই এদেশে কাটে। স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি, শক্তিসামর্থ্য সমুদয়ই তিনি ভারতবাসীর সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। তবে অন্যান্যদের মত তাঁর সম্পর্কেও একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ভারতবাসীরা হিন্দুধর্ম্মের আওতায় থেকে অসংখ্য দেবদেবীর পূজা করে ইহকালে সুখ এবং পরকালে শান্তি দুটোই হারাচ্ছে যুগ যুগ ধরে; খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোকে অজ্ঞানতা দূর করে তাদের সুখশান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে—এই ছিল পাদ্রীদের অভিপ্রেত। আর এ উদ্দেশ্য নিয়েই ভারতবাসীদের আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁদের এতটা প্রয়াস।

ইয়েট্‌সের আশৈশব ভাষাবিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক। জনৈকা মহিলা বলেছেন, ছেলেবেলায় ইয়েট্‌স তাঁদের বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন। তিনি ইংরেজী ব্যাকরণ সম্বন্ধে অনবরত কথা কইতে ভালবাসতেন। তিনি ভাষার বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে এমনভাবে আলোচনা জুড়ে দিতেন যে, তাতে মনে হ'ত তিনি ধরে নিতেন তাঁর শ্রোতারাও ঐ সব আলোচনায় সমান উৎসাহী। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইয়েট্‌স স্থানীয় ব্যাপটিষ্ট চার্চ্চে দীক্ষা নিলেন। ব্রিষ্টল ছিল ব্যাপটিষ্ট মিশনরীদের একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। দীক্ষা গ্রহণান্তে ইয়েট্‌স এখানে এসে খ্রীষ্ট-শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন। যাঁরা ব্যাপটিষ্ট চার্চ্চের অন্তর্ভুক্ত থেকে খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারে রত হবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করতেন বিশেষ করে তাঁদের এখানে এসে অধ্যয়ন করতে হ'ত। বাইশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই ইয়েট্‌স ব্যাপটিষ্ট চার্চ্চের অধীনে ধর্ম্মপ্রচার-ব্রত আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করলেন। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ১৮১৪ সনের ৩১শে আগষ্ট, ব্যাপটিষ্ট চার্চ্চের তিন জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি—ডক্টর রাইল্যাণ্ড, রবার্ট হল এবং এণ্ড্রু ফুলারের সম্মুখে। এর অল্পকাল পরে চার্চ্চ-কর্ত্তৃপক্ষ ইয়েট্‌সকে ভারতীয় শাখার সাহায্যার্থ এদেশে প্রেরণ করেন। ১৮১৫ সনের এপ্রিল মাসে 'ধরম্না' জাহাজে ইয়েট্‌স কলিকাতায় উপনীত হন।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। কেরী, মার্শম্যান এবং ওয়ার্ডের বেলায় দেখা যায় তাঁরা হয় উদ্দেশ্য গোপন করে ব্রিটিশ অধিকারে রয়েছেন, নতুবা দিনেমার রাজ্য শ্রীরামপুরে সরাসরি চলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রকাশ্য ভাবে ব্রিটিশ অধিকারে অবস্থান করেন নি। এর পক্ষে তখন ভীষণ বাধা ছিল। কিন্তু এই বাধা ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে নিরাকৃত হয়। নূতন সনন্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দিলেন যে, বেসরকারী ইংরেজ কি পাদ্রী সকলেই ব্রিটিশ অধিকারে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কাজ করতে পারবেন। তবে কেউ যদি রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যে লিপ্ত হয় তা হলে তার উপরে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা কর্ত্তৃপক্ষকে পুরোপুরি দেওয়া হ'ল। এর দু'বৎসর পরে ইয়েট্‌স এদেশে আসেন, কাজেই তাঁর ভাবনার কোনই কারণ ছিল না।

শ্রীরামপুরে পৌঁছে ঈপ্সিত কর্ম্মের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে ইয়েট্‌স কেরীর নেতৃত্বে শিক্ষানবিসী সুরু করে দিলেন। বিদ্যাচর্চ্চা—বিশেষ করে প্রাচ্যবিদ্যার চর্চ্চা করা হ'ল তাঁর এই সময়কার প্রধান কাজ। শ্রীরামপুর-বাসের বৎসরখানেক পরে ১৮১৬ সনের মার্চ্চ মাসে ইয়েট্‌স স্বীয় দৈনন্দিন কার্য্য সম্বন্ধে বিলাতে ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখেন,—"আমি এইভাবে কাজ করে চলেছি: প্রাতরাশের পূর্ব্বে দেড় ঘণ্টাকাল হিব্রু পাঠ করি। উপাসনান্তে বাংলা শিক্ষায় নিবিষ্ট হই। মূল গ্রীকের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলা প্রুফ দেখায় কেরীকে সাহায্য করি। সংস্কৃত ধাতুগুলি একবার পড়েছি, কিন্তু ব্যাকরণপাঠ এখনও শেষ হয় নি। আমি পণ্ডিতের সাহায্যে রামায়ণ পাঠ করছি। অপরাহ্ণগুলি গ্রীক ও লাটিন পুস্তক পাঠে ব্যয়িত হয়। ইংলণ্ড পরিত্যাগের পর দশ ভাগ গ্রীক সাহিত্য পড়ে ফেলেছি, কিন্তু লাটিন পুস্তক তিন খণ্ডের বেশী পড়ে উঠতে পারি নি। সান্ধ্য প্রার্থনার পর সাধারণতঃ ইংরেজী পড়ি ও ইংরেজী প্রুফ দেখি।"

ইয়েট্‌স এর পর লেখেন যে, এইরূপ দৈনন্দিন কার্য্য ব্যতিরেকে প্রার্থনা পরিচালনার জন্য সপ্তাহে একবার কি

দু'বার তিনি ব্যারাকপুর যান। প্রতি মাসে পালাক্রমে তাঁকে একত একবার করে কলকাতায়ও যেতে হয়।

ইয়েটস কিন্তু বেশী দিন শ্রীরামপুরে রইলেন না। শ্রীরামপুর মিশন এবং বিলাতস্থ ব্যাপ্‌টিষ্ট সোসাইটির মধ্যে নানা কারণে মতানৈক্য উপস্থিত হ'ল। এই মতানৈক্য ১৮১৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিচ্ছেদে পরিণত হয়। উইলিয়ম ইয়েটস প্রমুখ নব্য মিশনরীগণ শ্রীরামপুর ত্যাগ করে ঐ বৎসরে কলকাতায় আসেন এবং বিলাতস্থ ব্যাপ্‌টিষ্ট সোসাইটির কর্তৃত্ব স্বীকার করে এখানে একটি স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গঠন করেন। এর পর থেকেই কলকাতা হ'ল ইয়েটসের কর্মকেন্দ্র।

ইয়েটসের কলকাতা-বাস আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম ভাগ হ'ল ১৮১৭ থেকে ১৮২৭ সন। শেষোক্ত বৎসরে তিনি বিলাত যান, বৎসরখানেক পরে ফিরে আসেন। এর পর থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হ'ল তাঁর কলকাতা-বাসের দ্বিতীয় যুগ। কলকাতায় আগমনের পর ইয়েটস শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী হন, এদেশীয়দের মধ্যে ধর্মপ্রচারও তাঁর কর্তব্য মধ্যে ছিল। এই দুই উপায়ে ইয়েটসের কোনমতে জীবিকার সংস্থান হ'ত। কিন্তু তাঁর জ্ঞান-চর্চা আর্থিক অসচ্ছলতা এবং নানা রকম অসুবিধার মধ্যেও বরাবর অব্যাহত ছিল। ইয়েটস ক্রমে সংস্কৃত, বাংলা, আরবী, হিন্দী, উর্দু এই সমুদয় ভাষায়ই ব্যুৎপত্তিলাভ করলেন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ এবং এখান থেকে প্রকাশিত তাঁর পাঠ্য পুস্তকাবলীর কথা একটু পরেই বলা হবে। তিনি এখানে তাঁর সংস্কৃত-চর্চার কথা বিশেষ করে বলেন'নি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় এতখানি ব্যুৎপত্তিলাভ করেছিলেন যে, ১৮২৪ সনের পূর্ব্বেই তিনি এই ভাষায় একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন। সংস্কৃতে প্রায় হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি অভিধানও তিনি সংকলন করেন। হিতোপদেশ, নলোদয় প্রভৃতির অভিনব বিশুদ্ধ সংস্করণও তৎকর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে ইয়েটসের পাণ্ডিত্যের কথা বিদ্বৎ সমাজেও শীঘ্রই প্রচারিত হ'ল। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত *Asiatic Researches* নামক সাময়িক পুস্তকে তিনি দুইটি প্রবন্ধ লেখেন—একটি সংস্কৃত অলঙ্কার সম্পর্কে, অপরটি কাশ্মীর-নিবাসী শ্রীহর্ষ-রচিত নৈষধ-চরিতের আলোচনা। শেষোক্ত প্রবন্ধটি ১৮৩৬ সনে সোসাইটি কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ইয়েটস মাতৃভাষা ইংরেজীতেও পুস্তক লিখতেন। *The Christian Observer* নামক পাদ্রী-পরিচালিত ইংরেজী মাসিকপত্রে হিব্রু ও হিন্দুস্থানী ভাষার শব্দ, ব্যাকরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা-প্রবন্ধ লেখেন। ইয়েটস রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ধর্ম সম্পর্কে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর লেখাগুলি *Essays in Reply to Rammohan Ray* নামক পুস্তকাকারে তিনি প্রকাশিত করেন। *Memoirs of Chamberlain* ইয়েটসের আর একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এসব ছাড়া খ্রীষ্টধর্মমূলক আরও গ্রন্থাদি তিনি লিখেছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশে কেরীর পরেই তাঁর স্থান, পূর্ব্বে বলা হয়েছে। এই অনুবাদ-কার্য্যের কথা একটু বিশদ ভাবে বলা আবশ্যক। বিলাত ভ্রমণের দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৮২৫ সনে ইয়েটস লোয়ার সার্কুলার রোডের চার্চের কর্তৃপক্ষে অধিষ্ঠিত হন। স্বদেশ থেকে ফিরেও তাঁকে এই চার্চের পাদ্রীর পদ গ্রহণ করতে হ'ল। এই সময় থেকে জীবনের শেষ চতুর্দ্দশ বৎসরকাল ইয়েটস ধর্মগ্রন্থ অনুবাদে আত্মনিয়োগ করলেন। সমগ্র বাইবেল গ্রন্থখানি তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। নিউ টেষ্টামেণ্ট অনুবাদ করলেন উর্দ্দু, হিন্দী এবং সংস্কৃত ভাষায়। শেষোক্ত ভাষায় ওল্ড টেষ্টামেণ্টেরও অর্দ্ধেকটা অনূদিত হ'ল। এ ছাড়া Bunyan's *Pilgrim's Progress* (প্রথম খণ্ড) এবং দুই একখানি ধর্ম-মূলক পুস্তক তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ-কার্য্যে ইয়েটসের প্রধান সহকারী ছিলেন পাদ্রী জে ওয়েঙ্গার। তিনিও প্রাচ্যবিদ্যার বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি ইয়েটসের অনুবাদ-কার্য্যে দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ইয়েটস বিশুদ্ধ অথচ ভাবগম্ভীর রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। সহজ সরল ভাষায় তিনি সর্ব্বদা ভাবপ্রকাশ করতে চেষ্টা করতেন, আর এতে তিনি বিশেষ সাফল্যও লাভ করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে-সব পাদ্রী প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চায় অগ্রণী হয়েছিলেন, উইলিয়ম ইয়েটস তাঁদের মধ্যে অন্যতম, একথা এখন আমরা স্বীকার না করে পারি না। কিন্তু এতদ্বারা আমরা কতখানি উপকৃত হয়েছি, আমাদের ভাষা-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি কতটুকু সমৃদ্ধ হয়েছে সে সম্বন্ধেও আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। একটু আগেই কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সঙ্গে ইয়েটসের ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগের বিষয় উল্লেখ করেছি। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দের পর বহু ইংরেজ এদেশে আসেন, তন্মধ্যে পাদ্রীরা এসে নানা স্থানে স্কুল পাঠশালা স্থাপন করতে আরম্ভ করলেন। এ সব স্কুলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু এ কার্য্য সাধনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় পাঠ্য পুস্তকের অভাব। এ অভাব দূরীকরণের জন্যই কলিকাতায় স্কুল-বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। ১৮১৭ সনের জুলাই মাস থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ সোসাইটি পাঠ্য পুস্তকাদি উপযুক্ত লেখকদের দ্বারা লিখিয়ে প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন। সংস্কৃত, বাংলা, আরবী, ফারসী, হিন্দি, উর্দ্দু, ইংরেজী—নানা ভাষাতেই পাঠ্য পুস্তক রচিত হ'ত। পাদ্রী ইয়েটস বহু বৎসর যাবৎ স্কুল-বুক সোসাইটির সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ইয়েটস বহু

ভাষাবিদ্। তিনি নিজেও সোসাইটির জন্ত বিভিন্ন ভাষায় বহু পুস্তক লিখে দিলেন। তাঁর সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় রচনার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হয়েছে। তিনি সংস্কৃত ব্যতীত উপরোক্ত ভাষাসমূহেও পুস্তকাদি লিপিবদ্ধ করলেন। গল্প, কাহিনী, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জ্যোতিষ, সাহিত্য নানা বিভাগেই তাঁর বহু পুস্তক। তাঁর মৃত্যুর পর *The Christian Observer* পত্রিকায় তদ্রচিত বিভিন্ন ভাষায় পুস্তকাবলীর একটি ফিরিস্তি প্রকাশিত হয়। তা থেকে জানা যায়—তিনি ইংরেজী দুখানি, সংস্কৃত সাতখানি, হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু ন'খানি, হিন্দি চারখানি, আরবী একখানি, বাংলা দশখানি পুস্তক লেখেন। এর ভিতরে অনুবাদ পুস্তকগুলি ধরা হয় নি। বাংলা পুস্তকগুলির মধ্যে গল্প, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের পুস্তকই রয়েছে। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সেক্রেটারী রূপে এবং নিজে পাঠ্য-পুস্তক রচয়িতা হিসাবে ইয়েটস শিক্ষাপ্রচার ও প্রসারকার্য্যে এদেশবাসীর যে উপকার সাধন করেছেন এমনটি অন্ত কারো দ্বারা সাধিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

অন্তান্ত কাজের মধ্যেও ইয়েটস আমরণ এদেশে শিক্ষা-বিস্তার ব্যাপারে এতখানি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু এতেই তাঁর কাজ শেষ হয় নি। তাঁর চিন্তা, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার সহায়তা সরকারও ক্রমে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। সরকারের পক্ষে শিক্ষা-পরিচালনা কার্য্যের ভার ছিল শিক্ষা-সমাজ বা কমিটির উপর। ১৮৩৫ সনে বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নির্দ্দেশে শিক্ষাব্যবস্থার একটি আমূল পরিবর্ত্তন হয়। এতদিন সরকারী বিভালয়ে সংস্কৃত, আরবী ও ফারসীর মাধ্যমে দেশী-বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। এ সকলের পরিবর্ত্তে ইংরেজীর মাধ্যমেই যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে, ১৮৩৫ সনের নির্দ্দেশে স্থির হয়ে গেল। এর পরে প্রশ্ন উঠল বাংলা এবং অন্তান্ত দেশভাষা-সমূহ শেখাবার কি ব্যবস্থা হবে। নিম্নতন বিভালয়ে এবং উচ্চ বিভালয়ের নীচের শ্রেণীগুলিতে দেশ-ভাষার মাধ্যমেই পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা বলবৎ রইল। কিন্তু সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নূতন করে পাঠ্য পুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হ'ল। হিন্দু কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ বাংলা পাঠশালার জন্ত যে-সব পাঠ্যপুস্তক রচনা করাচ্ছিলেন সরকারের তা মনঃপূত হয় নি। শিক্ষা-সমাজ (The Council of Education) দেশভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্ত একটি কমিটি গঠন করলেন—এর নাম দেওয়া হ'ল "Section of the Council of Education for the Preparation of Vernacular Books।" ইদানীন্তন কালে গবর্ণমেণ্টের যে টেক্সট-বুক কমিটি, এই 'সেকশন'কে তারই পূর্ব্বজ বলা চলে। পাঠ্য পুস্তক রচনা সম্পর্কে তাঁরা স্বভাবতঃই উইলিয়ম ইয়েটসের পরামর্শ গ্রহণ করা সমীচীন মনে করলেন। ইয়েটস ইতি-পূর্ব্বেও কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সেক্রেটারী হিসাবে

উইলিয়ম ইয়েটস

সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন। এবারেও (১৮৪২, ২ সেপ্টেম্বর) তিনি এই মর্ম্মে লেখেন,—

'পাঠ্য পুস্তক রচনা সুনিয়ন্ত্রণের পক্ষে সকল শ্রেণীর বই-ই প্রথমে ইংরেজীতে রচিত হওয়া আবশুক। এগুলি মনঃপূত হলে তবে বাংলা ও অন্তান্ত দেশভাষায় অনূদিত হওয়া উচিত। এদেশীয় ও বিদেশীয় সুধীবর্গকে এই অনুবাদ-কার্য্যে নিযুক্ত করতে হবে।'

শিক্ষা-সমাজ ইয়েটসের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তখনকার মত বিলাত থেকে উপযুক্ত মানের পুস্তকাদি আনয়নের ব্যবস্থা হ'ল। পাঠ্য পুস্তকের ভিতর দিয়ে পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রবর্ত্তনের এই যে সূচনা হ'ল এর মূলে রয়েছে পাদ্রী উইলিয়ম ইয়েটসের উপদেশ। পাদ্রীদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষকে ভাষা-সাহিত্য এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিরূপ প্রভাবিত করেছে ইয়েটসের জীবন তার সাক্ষী।*

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিও—কলিকাতা কেন্দ্রে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কথিত। অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্তে প্রকাশিত।

জাপানের কথা

শ্রীসুনীলপ্রকাশ সোম

জাপানের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে সে দেশের সুমার্জ্জিত পরিচ্ছন্নতার কথা। জাপানে দোকানপাট, বসতবাটী ইত্যাদিতে শহরে ঘেঁষাঘেঁষি ভাব নেই। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সামনে একটুখানি খোলা জায়গা ও তাতে দু'চারটে গাছপালা আছে। রাস্তাগুলি খুব চওড়া, কিন্তু ফুটপাত নেই। রাস্তার দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে। এগুলিতে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার সংযুক্ত। শহরে রকমারি দোকানপাট অসংখ্য। সেগুলির সামনে টাঙানো বিজ্ঞাপনের বাহার দেখবার জিনিষ। বিদেশী বিলাস-দ্রব্যের দোকান জাপানের সর্ব্বত্র আছে—আর সেই সব দোকানে বিক্রেতা হ'ন মেয়েরা। ছবির দোকান, মনিহারী দোকান, হোটেল, চায়ের হল, ডাকঘর, সওদাগরী আপিস ইত্যাদি সব জায়গাতেই মেয়েরা কাজ করেন। আপনি কোন একটা দোকানে কিছু কিনতে গেলে মেয়েরা সসম্ভ্রমে বলবেন, 'থাই-ই-ই' অর্থাৎ 'স্বাগতম্'। কেনাকাটার পর চলে যাবার সময় নতমস্তকে বলবেন "আরিগাতো" অর্থাৎ ধন্যবাদ। জাপানী মেয়েদের বিনয়নম্র আচরণ বিদেশীর মনকে মুগ্ধ করে। তাঁদের কথাবার্তায়, চালচলনে এমন একটা শিষ্টাচারের পরিচয় পাওয়া যায় যা অন্যত্র দুর্লভ। তাঁদের কর্ম্মতৎপরতাও প্রশংসনীয়।

বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী বর-বধূর মিলন

দোকান-ঘরে তাঁরা জিনিষপত্র এমনি পরিপাটি রূপে সাজিয়ে রাখে যে ভেতরে ঢুকেই মন খুশী হয়ে ওঠে। তাঁদের নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং কার্য্যশৃঙ্খলাও প্রশংসনীয়। জাপানী মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে অধিকতর সামাজিক অধিকার লাভ করলেও এখনও তাঁরা পাশ্চাত্ত্যের মেয়েদের ন্যায় সকল বিষয়ে পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেন নি। ইউরোপ কিম্বা আমেরিকার মেয়েদের ন্যায় জাপানী মেয়েদের সর্ব্ব বিষয়ে সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এখনো হয় নি। নারীকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পুরুষ এখনো শেখেন নি। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইবার পর বর ভাবী বধূকে উপহার দিতেছে

ট্রামে কিম্বা বাসে কোন মহিলা দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছেন দেখলেন। আপনি উঠে হয়ত বসবার জন্য জায়গাটি ছেড়ে দিলেন, কিন্তু মহিলাটি আসন গ্রহণ করবার আগেই হয়তো একজন জাপানী পুরুষ এসে জায়গাটি দখল করে বসলেন।

বিবাহের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান—বর কনে উভয়কে এই অনুষ্ঠানে নয় বার করে 'সাকে' (একপ্রকার সুরা) পান করতে হয়

মুখে তাঁর মৃদু হাসি, 'কেয়া বাৎ দিয়া' গোছের ভাব। জাপানে এরূপ দৃশ্য হামেশাই আপনার নজরে পড়বে।

সব দেশেই স্ত্রী ও পুরুষ নিয়ে সমাজ গঠিত, কিন্তু সকল দেশে সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার নেই। দেশ-ভেদে সামাজিক নিয়ম-কানুনেরও বিভিন্নতা আছে। জাপানে স্ত্রী-স্বাধীনতা অনেক দিন থেকে প্রচলিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও আজও সেখানে স্ত্রীলোক এবং পুরুষের সামাজিক মর্য্যাদার তারতম্য আছে। অবশ্য ইদানীং অনেক জাপানী স্ত্রীলোক নানা দিক দিয়ে পুরুষদের সমকক্ষ হবার জন্য চেষ্টা করছেন। আজকাল তাঁদের মধ্যে অনেকে সমর-বিভাগেও বেশ নৈপুণ্য লাভ করেছেন।

জাপানী মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই অনেক সামাজিক শিষ্টাচার শিখতে হয়। কেমন করে পোশাক পরবে, কথাবার্ত্তা কইবে, আহার করবে, অভিবাদন করবে, সুষ্ঠু ভঙ্গীতে চলবে—সবই তাঁদের শিখতে হয়। মনে ক্রোধের সঞ্চার হলে কেমন করে ক্রোধ দমন করে মুখে প্রসন্নতার ভাব প্রকাশ করতে হয় সে শিক্ষাও তাঁরা ছোটবেলা থেকেই লাভ করে। যখন কোন জাপানী স্ত্রীলোক খুব আস্তে আস্তে চাপা-গলায় কথা বলে, তখন বুঝতে হবে সে খুব রেগেছে।

বিবাহের পূর্ব্বদিবস কনের আসবাবপত্র এবং বাসন-কোসন ইত্যাদি বরের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইতেছে

জাপানী মেয়েদের নাক চ্যাপটা, চোখ ছোট ও মুখের গড়ন নিখুঁত না হলেও তাঁদের চেহারায় এমন একটা কমনীয়তা আছে যার দরুন তাঁদের সুকুমার দেহগুলো এক অপূর্ব্ব লাবণ্যে মণ্ডিত। তাঁদের প্রতি কথায় সহবৎ-শিক্ষা ও মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের অঙ্গসঞ্চালন অনায়াস, সুন্দর ও শোভন। তাতে অতি-ব্যস্ততা নেই, অথচ জড়তারও কোন লক্ষণ নেই। জাপানী মেয়েদের অধিকাংশেরই মাথার চুল খুব ঘন, রেশমের মত কোমল ও সুন্দর। এরূপ কেশ-সৌন্দর্য্য জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মধ্যে বিরল। জাপানীদের প্রাচীন জাতীয় প্রথা অনুসারে জাপানী রমণী বিধবা হলে পর তাঁকে নিজের কেশের কিয়দংশ কেটে ফেলে স্বামীর শবাধারে রাখতে হয়। শবের সহিত তাহা কবরস্থ হয়। জাপানী মেয়েরা কেশের পারিপাট্যসাধনে যথেষ্ট যত্ন ও প্রচুর সময়ক্ষেপ করেন। তাঁদের নানারূপ চুলবাঁধার পদ্ধতি আছে। জাপানী মেয়েদের চুলবাঁধার প্রণালীও বিচিত্র। জাপানে মেয়েদের চুল বাঁধবার জন্য মাইনে-করা আলাদা এক দল স্ত্রীলোক আছে। তারা বিকালে গৃহস্থের বাড়ীতে এসে মেয়েদের চুল বেঁধে দিয়ে যায়। একবার চুল বাঁধলে তিন চার দিন তা খোলা হয় না। তুলোর বালিশে মাথা দিয়ে শুলে এরূপ সযত্নে বাঁধা খোপা নষ্ট হয়ে যায় বলে মেয়েরা অনেকে এক ধরণের কাঠের বালিশে মাথা রেখে শয়ন করেন। জিনিষটা হচ্ছে দৈর্ঘ্যে এক বিঘৎ, প্রস্থে তিন

ইঞ্চি এবং ছয় ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি কাঠখণ্ড। এই কাঠখণ্ডের উপরের দিকটা হাঁড়িকাঠের মত অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে কর্ত্তিত। মেয়েরা তাঁদের গ্রীবাদেশ এই কাঠের খাঁজের মধ্যে রেখে ঘুমিয়ে যান। মাথা শূন্যে থাকার জন্য তাঁদের খোপা নষ্ট হয় না।

জাপানী মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত নয়নাভিরাম। এগুলোকে কিমোনো বলে। গোলাপী, লাল, সবুজ, সোনালী প্রভৃতি হরেক রঙের এই কিমোনোগুলোতে জাপানী মেয়েদের বেশ মানায়। এই পরিচ্ছদের মধ্যে দুটো করে থলী থাকে। সেগুলোকে বলে সোদে। সোদের ভিতরে তাদের দরকারী টুকিটাকি জিনিষ সবই থাকে—যেমন, একখানি ছোট আয়না, ছোট একটি চিরুণী, চিঠিপত্র, রুমাল, পাতলা কাগজ (যা দিয়ে অনেক সময় রুমালের কাজ চালানো যায়) ইত্যাদি সবকিছুই সেই থলীর মধ্যে থাকে। আজকাল অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা ইউরোপ ও আমেরিকার মেয়েদের মত স্কার্ট পরেন—কিন্তু বেশীর ভাগ মেয়েরই প্রধান পরিধেয় হচ্ছে কিমোনো।

শ্বশুর-শাশুড়ী এবং অন্যান্য গুরুজনদের 'সাকে' নামক পানীয় পরিবেশন-রত কনে

জাপানী মেয়েরা খালি পায়ে থাকেন না। তাঁরা মোজার মত একপ্রকার পাদচ্ছদ ব্যবহার করেন, তাকে বলে 'তাবি'। 'তাবি' দেখতে মোজার মত, তবে খুব খাটো, পায়ের গোড়ালির উপরে পৌঁছায় না। এগুলি তুলা-ভরতি কাপড়ে তৈরি, এবং পায়ের পিছন দিকে গোড়ালী থেকে দু'তিন ইঞ্চি উপর পর্য্যন্ত তিন-চারটে আংটা দ্বারা আটকানো থাকে। ভদ্রঘরের মেয়েদের 'তাবি' না প'রে বাড়ীর বাইরে যাওয়া রীতিবিরুদ্ধ। তাঁরা ঘরে বাইরে সব সময়েই সাদা 'তাবি' পরেন। পুরুষদের 'তাবি'ও সাধারণতঃ সাদা রঙের, তবে সময় সময় তারা কালো রঙের তাবিও পরে থাকেন।

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কনের স্বামী-গৃহে আগমন

জাপানী মেয়েদের গয়নাগাঁটি অতি সামান্য। তাঁরা সর্ব্বাঙ্গ ভারি ভারি সোনা-রূপার তালে আচ্ছাদিত করে উৎকট রুচির পরিচয় দেন না। কান ফুঁড়ে বা নাক ফুঁড়ে দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করে অলঙ্কার পরবার সখ তাঁদের নেই। মাথায় গোঁজা চিরুণী, সিল্কের ফিতা, সোনার বা রূপার প্রজাপতি এবং ফুল, ছোট একটা সোনার ঘড়ি বা নেক্ চেন্ ও আংটি এই হ'ল মোটামুটি তাঁদের অলঙ্কার—আড়ম্বরহীন অথচ সুন্দর। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি দেখলে তাঁদের রুচির প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

আগেকার দিনে জাপানে বিদ্যা-চর্চ্চার চেয়ে অস্ত্রচর্চ্চার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হ'ত। সাধারণ একজন সামুরাই বিদ্যাচর্চ্চাকে অবজ্ঞার চোখে দেখত। কিন্তু বর্ত্তমানে জাপানে শিক্ষার কদর খুব বেশী। নব্য জাপানের শিক্ষা-প্রণালীতে আমেরিকার আদর্শ অনুসৃত। ডাক্তার ডেভিড মারে নামক একজন আমেরিকান শিক্ষাবিদ্ ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাপানে সর্ব্বপ্রথম সাধারণ বিদ্যালয় স্থাপন করে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করেন। ১৮৭৫-৯১ সাল পর্য্যন্ত তিনি জাপানের শিক্ষামন্ত্রীর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর পরামর্শেই প্রথম জাপানে প্রবর্ত্তিত হয়।

বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার পর কনে বাসর-ঘরে যাইতেছে

কনের বিবাহের পোশাক (শিরো-মুকু) পরিবর্তন করানো হইতেছে

জাপানী ছেলেমেয়েরা ছয়-সাত বৎসরে পা দিলেই স্কুলে যাওয়া সুরু করে। তার পূর্ব্বে বাড়ীতে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। মায়ের সঙ্গে শিশু যখন বেড়াতে যায়, তখন শিশুসুলভ স্বাভাবিক কৌতূহলবশতঃ নূতন কিছু দেখলেই সে মাকে প্রশ্ন করে। মা-ও যথাসাধ্য তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তার কৌতূহল নিবৃত্ত করবার প্রয়াস পান। শিশুকে 'চুপ কর, জ্বালাতন করিস্ নে', বলে ধমক দিয়ে নিরাশ করেন না। এমনি করে বেড়াবার সময় শিশু তার মায়ের কাছে অনেককিছুই শেখে। জাপানে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। ছয় থেকে বার বৎসরের প্রত্যেক বালক-বালিকাকেই বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখা-পড়া শিখতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে তিন-চার বৎসর লাগে। উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করতে আরও দু-তিন বৎসর লাগে। মেয়েদের লেখাপড়ার সঙ্গে সেলাই, গান-বাজনা, ছবি আঁকা ইত্যাদি এবং আরও নানাবিধ ব্যবহারিক বিদ্যা শেখানো হয়। স্কুলে জাপানী, চীনা ও ইংরেজী ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, দেশের শাসন-প্রণালী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মিতাচার, শরীরচর্চ্চা, ব্যায়াম ইত্যাদি অনেককিছুই শিক্ষা দেওয়া হয়। গরীব ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যদি কারও বই কেনবার সঙ্গতি না থাকে তা হলে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তার বই খাতা ইত্যাদি কিনে দিয়ে থাকেন। যদি কারও জলখাবারের পয়সা না থাকে তা হলে স্কুল থেকে তাকে জলখাবার দেওয়া হয়।

বিবাহ উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত কনের পোশাক-পরিচ্ছদ আসবাবপত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যের প্রদর্শনী

জাপানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৬,০০০ এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ৩,৫০,০০০ জন।

৬ থেকে ১২ বৎসর বয়সের লেখাপড়া-জানা বালক-বালিকার শতকরা হিসাব হ'ল ৯৯°৭৫—

প্রসূতির সাহায্যকারিণী একটি ধাত্রী

অর্থাৎ জাপানে লেখাপড়া-জানা বালক-বালিকার সংখ্যা শতকরা প্রায় এক শত জন। পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য দেশে এত বেশী প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক-বালিকা নাই।
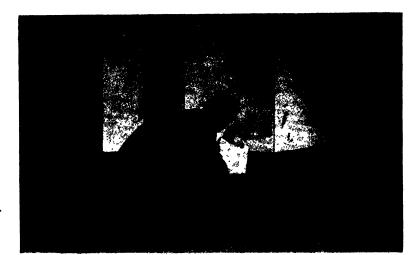
বর্ত্তমানে জাপানের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের সাহায্যে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করছেন। অনেকগুলি সিনেমায় শুধু সংস্কৃতি-মূলক ছবি এবং 'নিউজ রীল' দেখানো হয়। বর্ত্তমান জাপান শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা দিকে এক বিরাট আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠছে। ইদানীং জাপানের স্কুল-কলেজে মেয়েদের আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চা ও শিল্প-শিক্ষার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। আজকাল মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, স্কুল-কলেজের বিতর্কসভায়, খেলার মাঠে, হাসপাতালে, সমাজসেবার কেন্দ্রগুলিতে দলে দলে যোগ দিচ্ছে। গত বিশ্বযুদ্ধে জাপানের মেয়েরা শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, কৃষিকার্য্যে এবং সমর-প্রচেষ্টার সাহায্যকারিণীরূপে যে

কনের আত্মীয়রা তার সন্তানের জন্ত দেবতার আশীর্ব্বাদ লাভার্থ একটি তীর্থ-মন্দিরে যাইতেছে

প্রথম মাতৃত্ব—সন্তানক্রোড়ে জননী

অপূর্ব্ব কর্ম্মনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তা সমগ্র পৃথিবীকে চমৎকৃত করেছে। তা ছাড়া ট্রামে-বাসে, রেল-আপিসে, সওদাগরী আপিসে, যুদ্ধোপকরণ তৈরির কারখানাতে সর্ব্বত্রই জাপানী মেয়েরা কাজ করছেন। সামাজিক জীবনে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার সুবিধা থাকায় জাপানের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে প্রায়ই পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয় এবং নিজেদের পছন্দমত জীবনের সঙ্গী নির্ব্বাচন করে তারা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়। মেয়েদের সাধারণতঃ ১৮।২০ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ হয় না। জাপানে বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত এবং বহু-বিবাহ আইন-অনুসারে নিষিদ্ধ। তবে স্ত্রী বন্ধ্যা হলে সে কথা আলাদা। জাপানে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন আছে বটে, কিন্তু সাধারণ আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা হয় বলে অনেক স্ত্রীলোকই লজ্জাবশতঃ আদালতে যায় না।

জাপানের বিবাহ-ব্যাপারে কনে দেখা, কনেকে আশীর্ব্বাদ করা, শোভাযাত্রাসহ বরপক্ষের বিবাহ-বাড়ীতে যাওয়া ইত্যাদি অনুষ্ঠান আমাদের দেশেরই মত। ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানের সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে ও জাতীয় জীবনে যে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, তার বহু নিদর্শন জাপানের সাহিত্যে, সামাজিক আচার ব্যবহারে, শিল্পে, স্থাপত্যে ও ভাবধর্ম্মে আজও সুপরিস্ফুট। জাপানী মেয়েরা এখন দ্রুত প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। নব আদর্শে অনুপ্রাণিত জাপানী মেয়েরা বিবাহিত জীবনেও সমাজ-সংস্কারমূলক নানা আন্দোলনে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করছেন। ফলে জাপানের চেহারা ধীরে ধীরে একেবারে বদলে যাচ্ছে।

মহাপরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বে

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

সূর্য্যের আলোয় আলোকিত চন্দ্রের আনন্দদায়ক রূপ আমরা মুগ্ধনেত্রে দেখিয়া থাকি। সূর্য্য-প্রতিম মহামানবের অপূর্ব্ব তেজঃ-প্রভাবে সমুজ্জ্বল অনুগত জনের মধুর চরিত্রপ্রভাও আমাদিগকে আনন্দে অভিভূত করিয়া ফেলে।

প্রায় ষোল বৎসর আগেকার কথা। নাগপুর হইতে বোম্বাই যাইতেছিলাম। পথে ওয়ার্দ্ধা পড়ে। না নামিয়া থাকিতে পারিলাম না। ওয়ার্দ্ধার আশ্রমে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহাকে না দেখিয়া কেমন করিয়া যাই!

শহরে এক মারাঠী ভদ্রলোকের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। শহর হইতে কিছু দূরে মহাত্মাজীর আশ্রম। দুপুরের দিকে সেখানে গেলাম। কর্ম্মকর্ত্তা বলিলেন—"দেখা হইবে না।" আমি পুনশ্চ অনুরোধ করায় বলিলেন—"আপনি কি কাগজে পড়েন নাই, মহাত্মাজী কিছুদিন যাবৎ কাহারও সহিত দেখা করিতেছেন না।" শুনিয়া মনটা দমিয়া গেল। তখন ভদ্রলোক বলিলেন—"সন্ধ্যায় উপাসনার সময় সকলেই তাঁহার দর্শন পান। আপনিও তখন আসিবেন।"

সকলের সঙ্গে এক হইয়া তাঁহাকে দেখায় যেন আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হয়। আমি একা তাঁহাকে দেখিব, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলিবেন, আমিও দুই-চারিটি বড় বড় কথা বলিয়া তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিব—মনের মধ্যে এইরূপ ভাব অবশ্যই ছিল। কাজেই ঐরূপ দর্শনে আমার তৃপ্তি হইবার কথা নয়। তাই সাড়ম্বরে নিজের পরিচয় দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ বড় বড় লোকের প্রশংসাপত্রসমূহ তাঁহাকে দেখাইলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"যদি স্বয়ং দেবাদি-দেব মহাদেবও আসেন তবু বাপুজী এখন তাঁহার সহিত দেখা করিবেন না।"

আমি বলিলাম—"যাই হোক, আপনি দয়া করিয়া আমার পরিচয়পত্রগুলি তাঁহাকে দেখাইবেন।" তিনি স্বীকৃত হইলেন।

যথাসময়ে সান্ধ্যোপাসনায় যোগ দিলাম। বড় ভাল লাগিল। এক ঋষির আশ্রমে অবস্থান করিতেছি—অন্তরে ইহা বেশ অনুভব করিলাম। উপাসনায় বহু দেশবিখ্যাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ফিরিবার পথে লোকমুখে তাঁহাদের পরিচয় পাইলাম।

আমি চলিয়া যাইতেছি—এমন সময় এক প্রৌঢ় ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বিনীতভাবে প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কি বাংলাদেশ হইতে আসিয়াছেন?" আমিও সবিনয়ে উত্তর দিলাম—"আজ্ঞে হাঁ।" তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"আপনি পূর্ব্ববঙ্গে হরিজনগণের মধ্যে কাজ করিতেছেন?" আমি বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলাম—"হাঁ।"

তিনি অপরিসীম বিনয় ও সৌহার্দ্দের সহিত বলিলেন—"আমার নাম অমৃতলাল ঠক্কর। আমিও হরিজন-কর্ম্মী। শ্রীযমুনালাল বাজাজের গৃহ-প্রাঙ্গণে আমার তাঁবু। আপনি যদি দয়া করিয়া আজ রাত্রে আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন,

তবে আমি বড় আনন্দলাভ করি এবং আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়াও উপকৃত হই। আপনার অসুবিধা হইবে কি?"

আমি যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। ইনিই শ্রীঅমৃতলাল ঠক্কর—সেবাধর্মে মহাত্মার দক্ষিণহস্ত! এমন বিনয়ী, এত সরল, এমন নিরহঙ্কার, নিরাড়ম্বর পুরুষ।

পরম আনন্দের সহিত আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। তাঁবুতে পৌঁছিলে তিনি সাদরে সস্নেহে আমাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। নিজহস্তে তিনি অতিথির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। আমার নিকট সব কিছুই স্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল।

আহারাদির পর পূর্ব্ববঙ্গের হরিজনদের অবস্থার কথা, আমি তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে কি কাজ করিতেছি ইত্যাদি অতি আগ্রহের সহিত জানিতে চাহিলেন। আমিও যথাশক্তি যাবতীয় বিষয় তাঁহাকে জানাইলাম। আলোচনা চলিতে চলিতে রাত্রি অধিক হইয়া পড়িল। তিনি তখন স্বয়ং আমার বিছানা পাতিয়া, মশারি ফেলিয়া শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। শৌচাগারাদি দেখাইয়া দিলেন। শিয়রে পানীয় জল রাখিলেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে জানাইতে বলিয়া রাত্রির মত বিদায় লইলেন।

প্রভাতে অমৃতলাল চলিয়া যাইবেন। তাঁহার বিদায়-দৃশ্য আজিও চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। ছেলেমেয়েরা হুড়াহুড়ি করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে। তাঁহাদের জনক-জননীরাও তাঁহার চরণে মাথা লুটাইতেছেন। বালক-বালিকা তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া সকলেরই তিনি "ঠক্কর বাবা"। তাঁহার প্রতি তাঁহাদের কি প্রীতি, কি শ্রদ্ধা। এমন সর্ব্বজনপূজ্য চরণকমলের রেণুকণার প্রলোভন সম্বরণ করা আমার পক্ষেও সম্ভব হইল না।

অমৃতলাল চলিয়া গেলেন। কিন্তু অন্তরে আমার অমৃতের আস্বাদ রহিয়া গেল। তাঁহাকে দেখিয়া প্রকৃত মহত্ত্ব যে কি বস্তু তাহার পরিচয় পাইলাম।

একটু পরে আশ্রমে গেলাম। এখানে সেখানে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রাক্তন অভ্যাস-দোষে রন্ধন-শালায় ঢুকিয়া পড়িলাম। আমার লোলুপ রসনা জীবনে অন্তত এক দিন আমার ঠিক পথে লইয়া গিয়াছিল। সেখানে গিয়া দেখিলাম—মহাত্মার সহধর্ম্মিণী পুণ্যশীলা কস্তুরবা তরকারি কুটিতেছেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আরও অনেকে বসিয়া গিয়াছেন। আমিও যেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে বসিয়া পড়িয়া তাঁহাদের সাহায্য করিতে লাগিলাম।

মহীয়সী সেই নারী সেখানে এমন এক সহজ, সুমধুর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গেলাম—তিনি এক জগৎপূজ্য মহাপুরুষের মহামান্যা সহধর্ম্মিণী এবং আমি এক জন নিতান্ত অজ্ঞাত অখ্যাত সাধারণ মানুষ। তাঁহার সরল, স্নেহময় মাতৃরূপে, মাতৃবৎ আচরণে আমি দেশ-কাল-পাত্রের কথা, তাঁহার ব্যবধান একেবারে ভুলিয়া গেলাম—মনে হইল, আমি যেন আমার নিজ বাড়ীর রান্নাঘরে মা-মাসীর নিকট বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছি।

এমন সহজে, স্বচ্ছন্দে, বিনা আড়ম্বরে পরকে আপন করিবার শক্তি তাঁহার ছিল।

আশ্রমেই স্নানাহার হইল। কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয় হাসিমুখে খবর দিলেন—"বাপুজী আপনার সহিত দেখা করিতে রাজী হইয়াছেন।" অপরাহ্নে নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখা হইবে।

অধীর আগ্রহে তাঁহার দর্শনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। পূর্ব্বে মহাত্মাকে দুই-এক বার দেখিয়াছি। অতি নিকট হইতেই দেখিয়াছি। কিন্তু সকলের সঙ্গে মিলিয়া, পাঁচ জনের এক জন হইয়া দেখিয়াছি, কখনও একক মুখোমুখি বসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। সুতরাং অন্তরে যে অপরিমিত আনন্দের উদ্ভব হইয়াছিল—তাহা বলাই বাহুল্য। ঐ আনন্দের সহিত কিঞ্চিৎ দর্পও ছিল। দর্পহারী পরে তাহা চূর্ণ করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আশ্রম দেখিতেছিলাম। আশ্রমবাসীদের বিনীতভাব চিত্তকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। মহাপুরুষের পার্শ্বচরগণকে অনেক সময় বেশ গর্ব্বিত দেখা যায়। দর্শনার্থী অভ্যাগত সাধারণ জনকে অনেক সময় তাঁহারা কৃপাদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। কখনও কখনও তুচ্ছতাচ্ছিল্যও করিয়া থাকেন। এখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখিলাম।

দর্শনের সময় হইয়াছে। কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয় আমাকে মহাত্মার সকাশে লইয়া গেলেন। তিনি তখন চরকা কাটিতেছিলেন। সহাস্যমুখে আমাকে স্বাগত করিলেন। চরণবন্দনাপূর্ব্বক সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া নিবেদন করিলাম—"আমি হরিজন-কর্ম্মী। বাংলাদেশ হইতে আসিয়াছি। শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশে আমি এই কাজ করিতেছি।" তিনি স্মিতমুখে আমাকে উৎসাহ দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নূতন কিছু খবর দিয়া মহাত্মাকে খুশী করিবার লোভ হইল। একটি নূতন ঘরোয়া সংবাদ দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছি ভাবিয়া মনে বেশ গর্ব্ব অনুভব করিলাম। কিন্তু আমার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি উহা ইতিপূর্ব্বেই জানিয়াছেন।

শান্তিনিকেতনের এমন একটি টাটকা অপ্রকাশিত সংবাদ তিনি ইহারই মধ্যে এত দূর হইতে কেমন করিয়া জানিলেন ভাবিয়া অবাক হইয়া গেলাম। কবির সহিত তাঁহার কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, এই ঘটনা হইতে পরে তাহা বোধগম্য হয়।

ইহার পর বাক্যহীন নীরবতায় মহামানবের অতি সন্নিকটে মুখোমুখি বসিয়া রহিলাম। তাঁহার অব্যক্ত আশীর্ব্বাদ আমার উপর বর্ষিত হইতেছে—অন্তরে আমার এইরূপ অনুভূতি

হইতে লাগিল। তাহার পর প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। পার্শ্ববর্তী শিষ্য-শিষ্যাগণ এবং স্বয়ং মহাদেবদেব মহাত্মা আমাকে অভিবাদন করিলেন।

আশ্রমবাসীদের নিকট বিদায় লইলাম। ভারতের তপোবন এখন ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়। কিন্তু সত্যি-কারের এক তপোবন এই ভারতেই প্রত্যক্ষ করিলাম। বিশ্বামিত্র তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই তপস্যালব্ধ ব্রাহ্মণ্যের শক্তি ছিল অপরিসীম। উহা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিত। তপস্যার দ্বারা বর্তমান ভারতে এই আর একজন ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছেন। যাঁহার জীবন ধর্মের জন্য, যাঁহার জীবন পরের জন্য, যিনি দিবারাত্র ধৈর্য্য ধরিয়া রহিয়াছেন, সত্যে যাঁহার একান্ত আগ্রহ, দান যাঁহার অপরিমেয়, সকল ইন্দ্রিয়কে যিনি বশে আনিয়াছেন, অহিংসাই যাঁহার ধর্ম, ক্ষমাই যাঁহার ঈশ্বর, জীবের প্রতি করুণায় প্রাণ যাঁহার ভরপুর, শুচিতা এবং সরলতার যিনি প্রতিমূর্তি, ব্রহ্ম-সাধনায় যিনি অদ্বিতীয়—ভগবদ্বিশ্বাসে যিনি অটল—এই সেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব—কটিবাসপরিহিত ব্রাহ্মণ—গান্ধী।*

* জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থে পরার্থে যস্য জীবিতং।
অহোরাত্রং চরেৎ ক্ষান্তিং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
মহাভারত, শান্তি, ২৪৪।২৩

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা (করুণা)।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥
মহাভারত, বন, ১৮০।২১

শমোদমস্তপঃশৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবং।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যং চ ব্রহ্মলক্ষণং॥
ভাগবত, ৭।১১।২১।

কস্মৈ দেবায়

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

নন্দনে মন্দারশয্যালীন হ'য়ে থাকো ভগবান,—
ধরাতলে কাঁদি আমি অসহায় তোমার সন্তান।
হেথা নাহি চেলাঞ্চলা উর্ব্বশীর নূপুর-নিক্কণ,
ক্ষুধিতের তরে হেথা সুধা নাহি আনে কোনো জন।
কল্পতরুতলে হেথা নাহি মিলে কামনার ধন,
জীবন রাখিতে শুধু পলে পলে যায় যে জীবন।
কত দুঃখ, কত গ্লানি, কত ব্যথাভরা এ সংসার—
উচ্ছ্বসিছে চতুর্দ্দিকে উতরোল অশ্রু-পারাবার।
ঊর্ণনাভতন্তুসম সৃজি' বিশ্ব কোন্ আদিকালে,
আপনি রয়েছ স্রষ্টা, এ সৃষ্টির দৃষ্টি-অন্তরালে।
বিশ্বের ক্রন্দনে যদি থাকো প্রভু, চিরনির্ব্বিকার,—
কোন্ প্রয়োজন ছিল অহৈতুক সৃজন-লীলার?
দিন যায়—রাত্রি আসে, ষড়ঋতু আসে আর যায়
জন্মমৃত্যু, দুঃখসুখ, কান্নাহাসি, আলোক-ছায়ায়
ঘটিকার শঙ্কুসম বিশ্বচক্র চলে আবর্ত্তিয়া—
উদাসীন দ্রষ্টাসম তুমি শুধু দেখিছ চাহিয়া।
তোমার অস্তিত্বে তবে জগতের কোন্ প্রয়োজন?—
মন্দিরে মন্দিরে তবে যুগে যুগে কেন চিরন্তন
উদাত্ত এ স্তবগীতি কোটি কণ্ঠে উঠে উচ্ছ্বসিয়া—
হে বধির, হে নিষ্ঠুর, নিশিদিন তোমারি লাগিয়া?

অনন্ত ক্রন্দনরোল যদিও শুনিছ অহরহ—
দীনদুঃখী, উৎপীড়িত, ব্যথিতের তুমি কেহ নহ।
তবে তুমি কার প্রভু?—যারা শুধু তোমারি মতন
বিপুল ঐশ্বর্য্যমাঝে নর্ম্মোল্লাসে কাটায় জীবন—
জগতের দুঃখব্যথা ভুলেও দেখে না কভু চাহি'
মৃদুমন্দ চলে যারা সুখের সোনার তরী বাহি'—
তুমি কি তাদেরি শুধু? তবে কেন নয়নের জলে
বিশ্বলোক ডাকে তোমা? সে কি শুধু আত্মতৃপ্তি ছলে?
অথবা কি সব ভুল?—আমাদেরি মনের মতন
তোমারে গড়েছি মোরা যুগে যুগে করিয়া যতন।
আমাদেরি স্নেহমায়া, দুঃখসুখ তোমা আরোপিয়া
সান্ত্বনা খুঁজিয়া মরে এ সংসারদাবদগ্ধ হিয়া।
তাই তো এঁকেছি মোরা কল্পনায় সুখস্বর্গধাম,
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তুমি যেথায় ভুঞ্জিছ অবিরাম।
হয়তো তুমিও নাই—আছে শুধু অন্ধ এ প্রকৃতি,
জীবন—উদ্দেশ্যহীন, ধর্ম্ম তার নিরন্তর গতি
প্রাণহীন যন্ত্রসম জন্ম হ'তে শুধু জন্মান্তর;—
গভীর আঁধারে ঢাকা পরিণাম তার অতঃপর।
অব্যর্থ সঞ্চিত কর্ম্ম—অলঙ্ঘ্য সে প্রারব্ধ প্রাক্তন—
তাই যদি মানুষের দুঃখসুখ করে নিয়ন্ত্রণ—
কাহারে জানাই ব্যথা?—এ যে শুধু অরণ্যে রোদন,
কর্ম্মস্রোতে ভেসে যাই অসহায় তৃণের মতন।

প্রবাহ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

১৬

মৃন্ময় কহিল, ভোর হতে এখনও ঢের দেরি। আপনি ততক্ষণ একটু গড়িয়ে নিন্‌ না।

ঘুমাইবার আগ্রহ লিলির দেখা গেল না। সে পুনরায় বলিল, আমার দুর্ভাগ্যের কথা কাউকেই জানাব না ভেবেছিলাম, কিন্তু আমিও তো মানুষ—একলা একলা এ বোঝা আর বইতে পারছিলাম না। পুনরায় লিলির দু'চোখ ঝাপসা হইয়া উঠিল। চোখের কোল বাহিয়া দু-ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। মৃন্ময় বাধা দিল না। লিলির খানিকটা কাঁদা দরকার। নইলে অন্তরের আগুনে ওর ভিতরটা হয়তো একেবারে জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক হইয়া যাইবে।

লিলি মৃদু কণ্ঠে কহিল, এক এক সময় আমার মনে হয়, এত যে শিক্ষার অহঙ্কার, আধুনিক সমাজে এক বিশিষ্ট ধরণে চলাফেরা, সে সব আমার রইল কোথায়। সবাই আমাকে ভুলে যাবে, শুধু ভুলবে না আমার মিথ্যা পরিচয়কে—যা একেবারেই আমার স্বরূপ নয়। নিজের কথা আর তেমন করে ভাবি না। ভাবতে ভালও লাগে না। কিন্তু…লিলি কথাটা সমাপ্ত না করিয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল।

মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল, আমার মনে হয় এক দিন সুনির্ম্মল তার ভুল বুঝবে।…

লিলি মৃন্ময়কে কথার মাঝখানে থামাইয়া দিল। তার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কহিল, তাতে আমার কিছুই আসবে যাবে না। আমি ভেবে পাই না এর মধ্যে আপনি সুনির্ম্মলের ভুলটা কোথায় দেখলেন। এ তার স্বভাব…লিলি থামিল। তার নীরস কণ্ঠস্বর সম্ভবত তার নিজের কানেও অত্যন্ত বেসুরো ঠেকিয়াছে। সে অপ্রতিভ হইল এবং মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, যারা না জেনে ভুল করে তাদের সঙ্গে আপোষ করা চলে, কিন্তু ভুল করাটা যাদের প্রকৃতিগত তাদের সম্বন্ধে কোন কথাই বলা চলে না। কিন্তু এসব কথা এখন থাক, আমি বড় ক্লান্তি বোধ করছি। আর ভাবতে পারছি না।

মৃন্ময় বিনা প্রতিবাদে পুনরায় বাহিরের পানে দৃষ্টি ফিরাইল।

পরদিন সকাল।

অল্প রোদ উঠিয়াছে। উঁচু পর্ব্বত আকাশকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। দূরে নীল আকাশের গায় কে যেন অদৃশ্য হস্তে গভীরতর নীলের ধাপ কাটিয়া দিয়াছে। দু-পাশে আকাশের অসীম বিস্তার; মাঝখানে সোজা দাঁড়াইয়া আছে দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক। চতুর্দ্দিকে বনফুলের প্রাচুর্য্য, প্রকৃতির স্তাম অঙ্গে ওদের পূর্ণ বিকাশ। বেঙ্গল ডুয়ার্সে'র ছোট গাড়ী দ্রুত চলিয়াছে—কখনও আলো কখনও ছায়ার বুকে যেন একটা সচেতন স্পর্শ রাখিয়া।

মহুয়া ফুলের মন-মাতাল-করা সুবাস, বনফুলের তীব্র গন্ধ বাতাসের সহিত মিশিয়া স্থানটির রূপ পর্য্যন্ত বদলাইয়া দিয়াছে। এক পাশে খাড়া পর্ব্বত, অপর পার্শ্বে ছোট-বড় গাছের সারি। ডালপালা নাই বলিলেও চলে। নিরাভরণা বিধবার ন্যায় সর্ব্ববিধ বাহুল্যবর্জ্জিত। এও এক প্রকারের সৌন্দর্য্য। গাছের মাথায় পাতায় পাতায় রোদের ঝিকিমিকি; বনবিহগের কলকাকলি থামিয়া গিয়াছে। বেলা বাড়িতেছে।

ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে কখন মন্থর, কখনও দ্রুত গতিতে। চাবাগানের কুলি-কামিনদের মধ্যে কাজের মরশুম পড়িয়াছে। সামনের দিকে দোলায়মান শিশুসন্তান, পিছনে লম্বাটে ধরণের বেতের ঝুড়ি। চা-পাতা সংগ্রহে হাত উহাদের সমান ভাবে চলিতেছে। ট্রেনের যাওয়া-আসার দৃশ্য উহাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাই মনে আর নূতন কোন সাড়া জাগায় না।

মৃন্ময় নীরবে বসিয়া আছে। লিলিরও কোন সাড়াশব্দ নাই। এই কামরায় ওরাই শুধু যাত্রী নয়, আরও বহু আছে—যদিও তারা বাঙালী নয়। কিন্তু মৃন্ময় লিলির কথা যেন হারাইয়া গিয়াছে। মৃন্ময় লিলির চিন্তাকুল মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল যে, এত বড় দুঃখটাকে ঐ মেয়েটি কেমন করিয়া বিনা প্রতিবাদে এরূপ দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করিল। অকস্মাৎ কল্পনায় লিলির পাশে আসিয়া যেন দাঁড়াইল মঞ্জুষা। মুখে তার তিক্ত বিদ্রূপভরা হাসি…চোখ দিয়া যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে আগুনের শিখা।

মৃন্ময় হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তার তন্দ্রা আসিয়াছিল, আর সেই সুযোগে মঞ্জুষা যেন তাহাকে চোখ রাঙাইয়া গেল। মৃন্ময় একবার নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিল—এ কি স্বপ্ন, না নিজেরই অজ্ঞাতে এই সব উদ্ভট চিন্তাকে সে মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিল আর তন্দ্রার ঘোরে সেগুলিই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু সে ত' কাহাকেও ফাঁকি দেয় নাই। কিংবা প্রশ্রয় দিবার চিন্তাও তাহার মনে স্থান পায় নাই। মৃন্ময় নিজেকে বার বার প্রশ্ন করে, কিন্তু উত্তর মেলে না। অথচ মনটা তাহার অকারণে ভারাক্রান্ত হইয়া থাকে। মনের উপর হইতে এই পাষাণ-বোঝাকে যেন কিছুতেই নামানো যায়

না, বরং আরও ভারভার হইয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসে। কিন্তু এসব কথা তাহাকেও বলিবার উপায় নাই। মৃন্ময়ের মন সহসা দেশের পথে ছুটিয়া চলে। এখানকার কাজ শেষ করিয়া আর একটি মুহূর্তও সে অপচয় করিবে না।

১৭

প্রয়োজন হইলে মানুষ যে কত অবলীলাক্রমে অভিনয় করিতে পারে তার প্রমাণ আজ দুই-তিন দিন যাবৎ মৃন্ময় এবং লিলি দিয়া আসিতেছে। বাহির হইতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই এমনি নিখুঁত এবং সহজ তাদের অভিনয়। ভাই এবং বোন—এই তাদের পরিচয়।

রাজবাড়ীর সীমার মধ্যেই বাংলো ঠিক করা হইয়াছে। বাংলোখানি ছোট হইলেও সুন্দর। সম্মুখেই একটি ফুলের বাগান, তাহাতে নানাজাতীয় বহু পরিচিত এবং নাম-না-জানা ফুলের অপূর্ব্ব সমাবেশ। চোখ জুড়াইয়া যায়। কিন্তু মৃন্ময়ের এ জায়গাটি ভাল লাগিতেছিল না। এর চেয়ে গ্রামের উঁচুনীচু মাটির পথ, পদ্মার জলে রোদের খেলা…পুঁটিরামের বড় দীঘিতে ছেলেছোকরাদের অবাধ বাচখেলা, কিংবা কৃষক ছেলেদের নদীর জলে মাতামাতি—এগুলিতে একটা জীবন্ত অনুভূতির স্পর্শ পাওয়া যায়। এমন কি, এই সময়ে পুঁটিরামের কাঁদুনে মেয়েটার একঘেয়ে কান্নাও যেন তার কাছে বিরক্তিকর নয়।…কিন্তু এখানকার আকাশ খণ্ডিত। স্থানে স্থানে দৃষ্টি প্রতিহত হয়। ক্ষণে ক্ষণে বন-মোরগের কর্কশ কণ্ঠস্বর নিভৃত চিন্তায় ব্যাঘাত জন্মায়। এখানে তার কোন আকর্ষণই নাই, বরং একটা গভীর দুশ্চিন্তা তার চিত্তকে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তথাপি এখানে দিনকয়েক তাহাকে থাকিতে হইবে। এখানে পৌঁছিয়াই লিলি শয্যার আশ্রয় লইয়াছে, জ্বর হইয়াছে—যদিও বেশী নয়। কিন্তু ভদ্রতা বলিয়া একটা কথা আছে, মন বলিয়াও একটা বস্তু আছে। লিলি অবশ্য বলিয়াছিল—সামান্য জ্বর যখন, তখন আপনাকে আর আটকে রাখা উচিত হবে না।—কিন্তু লিলি যাহাই বলুক এখানে সে তার সহোদরা রূপে পরিচিতা তার মর্য্যাদা সকলের কাছেই আছে। মৃন্ময় এখানে কোন দিক দিয়া ত্রুটিই রাখিতে চাহে না।

রাজাবাবুর ছেলে আজ শিকারে যাইবে। মৃন্ময়ের ডাক পড়িয়াছে। তার একান্ত অনুরোধ মৃন্ময় যেন তার অনুগামী হয়; নতুবা সে দুঃখিত হইবে। ইতিমধ্যে ছেলেটির সহিত মৃন্ময়ের আলাপ-পরিচয় হইয়াছে। চমৎকার ছেলে।

মৃন্ময়কে সে ছাড়িয়া দিতে চাহে না, বলে, এখানেই তার বাবাকে বলিয়া সে তার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবে। মৃন্ময় কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিতে পারে নাই। আপাততঃ দিনকয়েকের জন্ত তার দেশে না গেলেই নয়। তার উপর পরীক্ষার ফলাফলের উপর তাহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

ছেলেটির ইচ্ছা সে মৃন্ময়ের কাছে ইংরেজী শেখে। কিন্তু এসব পরের কথা। সময়মত চিন্তা করিয়া দেখিলেও চলিবে। আপাততঃ তাহার সহিত মৃন্ময়ের শিকারে না গেলেই নাকি নয়। মৃন্ময় আপত্তি তুলিল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে নিরস্ত করিতে পারা যায় নাই। লিলির অসুস্থতার সংবাদ দিবার সঙ্গে সঙ্গে নার্সের ব্যবস্থা করিবার জন্ত লোক পাঠানো হইল। মোটের উপর মৃন্ময়কে আজকের দিনে তার চাই-ই। ছেলেটির সব ভাল, কিন্তু বড় একরোখা।

উহারা হরিণ শিকারে বাহির হইয়াছে। সুতরাং হাতি-হাওদার প্রয়োজন নাই। মৃদু সতর্ক ওদের গতি। হরিণও অত্যন্ত সাবধানী। গাছের পাতা খসিয়া পড়ার শব্দে অদৃশ্য হইয়া যায়। আপাতত তাহারা চলিয়াছে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা পাহাড়ের গা বাহিয়া। এখানে শুধু বন-মোরগ এবং পাখী মেলে। বন-মোরগ মারা হরিণ শিকার অপেক্ষা কষ্টসাধ্য। উহাদের ডাক শুনিয়া স্থানের দিশা পাওয়া আরও শক্ত।

ছেলেটি অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে। বাঘ ভালুক এদিকের পাহাড়ে বড় একটা দেখা যায় না। তারা থাকে আরও নিবিড় জঙ্গলে যেখানে দিনের বেলায়ও রোদের মুখ দেখা যায় না। এমনি নিবিড়, এমনি ঘনসন্নিবিষ্ট সেখানকার গাছপালা। সে সব পাহাড়ে ছোটবড় ঝরণার অভাব নাই। ছল ছল করিয়া ঝরণার জলধারা অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে। সেখানে সব সময় শিকার সহজলভ্য। পিপাসা মিটাইতে বন্যজন্তুর ঐ গভীর বনে ঝরণা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

সহসা ছেলেটি থামিল। নাকের কাছে মৃদুর মিষ্টি একটা গন্ধ অনুভব করিল। কতকটা কামিনী-আতপের সুগন্ধের মত। অনুচর দু'জনকে পাহাড়ী ভাষায় কি বলিয়া সে মৃন্ময়ের উদ্দেশে কহিল, একটু সাবধানে চলবেন। কাছাকাছি কোথাও পাহাড়ী সাপ বেরিয়েছে। ছেলেটি বন্দুকটা বাগাইয়া ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। কিন্তু সাপের সাক্ষাৎ মিলিল না। দেখা দিল বৃষ্টি। সে তো বৃষ্টি নয়, যেন বর্শার অগ্রভাগ দ্বারা কেহ তাহাদের খোঁচা মারিতেছে এমনি তার বেগ। তাহারা সিক্ত বস্ত্রে অগ্রসর হইয়া চলিল।

অল্পক্ষণেই রোদ উঠিল। এখানে রোদ এবং বৃষ্টি এমনি পাশাপাশি দেখা দেয়। এমনি সময়েই হরিণের সাক্ষাৎ মেলে। ছেলেটি খুশীতে চঞ্চল হইয়া উঠিল, যেন এখুনি ভয়ানক একটা কিছু সে করিয়া বসিবে। কিন্তু একটা কিছু করিয়া বসিবার পূর্ব্বেই আর এক দিক দিয়া অবস্থা জটিল হইয়া দাঁড়াইল। ছেলেটি হাসিয়া কহিল, ভয় পাবেন না, ও কিছু নয়। কিন্তু মৃন্ময় আশ্বস্ত হইতে পারিল না। থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। কোথা হইতে ছোট বড় অসংখ্য জোঁক আসিয়া জুটিয়াছে।

ছেলেটি পুনরায় হাসিমুখে কহিল, যদি গায়ের উপর—

মৃন্ময় এমন ভাবে লাফাইয়া উঠিল যে উপস্থিত সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। ছেলেটি তার পূর্ব্ব-কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া সহাস্যে কহিল…তাহলে হাতে খানিকটা থুথু মেখে ঘরে ঘরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। ভয়ের কোন কারণ নেই।

পুনরায় সুরু হইল উহাদের নিঃশব্দে পথচলা। অতি সাবধানে পথ চলিতে গিয়া মৃন্ময় রীতিমত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, সহসা চমকাইয়া উঠিল ছেলেটির বন্দুকের আওয়াজে। মৃন্ময় থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে খানিকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ধপ করিয়া একটা শব্দ। পাখা ঝটপট করিয়া ভীত ও ত্রস্ত পক্ষীকুলের দ্রুত পলায়ন। তার পরে একেবারে সব চুপচাপ। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে এখানে কোন ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা মনেও হয় না।

ছেলেটি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কহিল, শিকার পড়েছে। মস্ত হরিণ। হরিণটি সত্যই বড়। তার তখন শেষ অবস্থা। একটা যন্ত্রণাসূচক অব্যক্ত আর্ত্তনাদ যেন মানুষের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে নালিশ জানাইতেছে। দুটি করুণ চোখে যে মৌন বেদনার প্রকাশ রহিয়াছে মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না, তাই এই নির্ব্বাক পশুর বেদনায় নির্ব্বিকার থাকিয়া সাফল্যের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এমনি জীবন-মরণ লইয়াই সর্ব্বত্র নিষ্ঠুর খেলা চলিয়াছে। বর্ব্বর-যুগ হইতে সুরু করিয়া সভ্য-জগতের কোথাও এর এতটুকু ব্যতিক্রম নাই। শুধু রুচি এবং প্রয়োগের রকমফের। শুধু জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলা—কখনও বা পশুর, কখনও বা মানুষের।

ছেলেটি হরিণটিকে বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য অনুচরদের নির্দ্দেশ দিল। ফিরিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজিকার ভোজের একটা বিস্তারিত তালিকা সে মুখে মুখে বলিয়া গেল, মৃন্ময়কে নিমন্ত্রণ করিতেও সে ভুলিল না। ছেলেটির উচ্ছ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। কবে সে পিতার সহিত হাতীর পিঠে চড়িয়া বাঘ শিকারে গিয়াছিল। কেমন করিয়া তাদের শিকারী হাতী ঘ্রাণশক্তি দ্বারা কাছে-পিঠে বাঘের অস্তিত্বের আভাস পাইয়া শুঁড় আন্দোলিত করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিল; তাহার বাবা এক গুলিতে সাড়ে আট ফুট লম্বা একটা বাঘকে ঘায়েল করিয়াছিলেন, নিজ হাতে ক্ষমতা পাইলে সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন সে শিকারে যাইবে এবং অচিরেই বাবার চেয়েও পাকা শিকারী হইয়া উঠিবে—এই কথাগুলিই প্রসঙ্গক্রমে সে মৃন্ময়কে বলিয়া চলিল।

মৃন্ময় কতক শুনিতেছিল কতক বা শুনিতেছিল না। হঠাৎ উৎকর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল, 'আপনি কি বলছিলেন?'

ছেলেটি হাসিয়া উত্তর দিল, শিকারের গল্প আপনার ভাল লাগে না বুঝি? এঃ…তার ভাবখানা এইরূপ যেন মৃন্ময় একটা অপরাধ করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু মৃন্ময় তার উক্তির সহজ সারল্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

বাংলোয় ফিরিতে মৃন্ময়ের প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। ছেলেটির সাদর আহ্বানকে সে উপেক্ষা করিতে পারে নাই, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া লিলির জ্বরের তাপ দেখিয়া সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিল। নার্সকেও খুব ব্যস্ত দেখা গেল।

লিলির জ্ঞান ছিল না, মাঝে মাঝে এলোমেলো বকিতেছিল…নিজের লাঞ্ছিত জীবনের অসংবদ্ধ ইতিহাস। নার্স ইহাকে প্রলাপ মনে করিলেও, মৃন্ময়ের কিন্তু ঠিক তাহা মনে হইল না।

পরের দায় ঘাড়ে লইয়া মহা বিপদেই সে পড়িয়াছে। এখন চলিয়া যাইতেও বাধে—পড়িয়া থাকিতেও মন চাহে না। লিলির ক্লিষ্ট বিবর্ণ মুখের পানে চোখ পড়িতেই কেমন মায়া হয়। সহায়সম্পদহীন বেচারী। মৃন্ময় অপটু হাতে লিলির পরিচর্য্যা করিতে অগ্রসর হয়। নার্স বাধা দেয়, আমি যখন রয়েছি—

মৃন্ময় কহিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু আমারও তো একটা কর্ত্তব্য আছে…

উত্তর মিলিল, তা আছে বৈ কি, কিন্তু আমরা এ কাজে অভ্যস্ত, আপনি তা নন।

কথাটা সত্য। তা ছাড়া মৃন্ময় এই মুহূর্ত্তে বড় ক্লান্ত। উপকার করিতে গিয়া ক্ষতি করিয়া বসিলে তখন ঝুঁকি লইবে কে? মৃন্ময় একটু যেন লজ্জিত কণ্ঠে কহিল, কথাটা মিথ্যে বলেন নি আপনি, কিন্তু দরকার হলেই ডাকবেন আমায়। আমি পাশের ঘরেই আছি।

মৃন্ময় প্রস্থানোদ্যত হইয়া পুনরায় থামিল, কহিল—ওর মানসিক অবস্থা ভাল নয়, ভাল থাকতেও পারে না। তবে একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া আমি আবশ্যক বোধ করি। লিলির শরীরের অবস্থা বুঝে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করবেন। অবস্থাটা ডাক্তারকে জানানো হয়েছে তো?"

নার্স কহিল, আপনার উপদেশ ভুলব না। তবে আমরা এই নিয়েই তো দিনরাত আছি—দেখলেই টের পাই। ডাক্তারকে আমি সবই বলেছি। ব্যবস্থাও সেই মতই হয়েছে।

মৃন্ময় নার্সকে ধন্যবাদ দিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

খবর পাইয়া রাজাবাবুর পুত্রও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া নার্সকে বার বার সাবধান করিয়া দিল এবং মৃন্ময়কে শিকারে লইয়া যাইবার জন্য বারকয়েক দুঃখপ্রকাশ করিয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, তা বলে ভয় পাবার কিছু নেই। এখানকার জল গায়ে পড়লেই প্রায় সবাইকেই প্রথম প্রথম এমন ভুগতে হয় এক-আধবার। সয়ে গেলে আর দুর্ভাবনা থাকে না।—

তা হয়তো থাকে না, কিন্তু মৃন্ময়ের দিনগুলি যেন

অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। এমনি করিয়া চুপ-চাপ রুগীর ঘরে দিন কাটানোতে সে অভ্যস্ত নয়। তাই বড় অস্বস্তি বোধ হয়। তা ছাড়া সমস্ত ঘটনাটা তাহাকে যেন কতকটা অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

ছেলেটি রোজই একবার করিয়া দেখা দিয়া যায়। দূর হইতে দৈনন্দিন খবরাখবর লইয়া যায়। কথাবার্ত্তার ধারা একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। মৃন্ময়ের এই নিঃসঙ্গতা ভাল লাগে না।

লিলি এখন আরোগ্যের মুখে। 'জ্বরটা মারাত্মক না হইলেও ভোগান্তি কম হইল না। সে প্রায় দুই সপ্তাহ এখানে আসিয়াছে। নানা ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া মঞ্জুষা কিংবা তাঁর বাবাকেও একটা সংবাদ দেয় নাই। না জানি তাঁরা কি ভাবিতেছেন। ঘটনাচক্রে পড়িয়া সে এমনটি করিতে বাধ্য হইয়াছে।

গত কাল লিলি অন্নপথ্য করিয়াছে। আর মাত্র কয়েকটা দিন পরেই সে গ্রামের পথে যাত্রা করিতে পারিবে। আর কোন খবর সে দিবে না—যখন এতদিনই দেয় নাই। অকস্মাৎ সকলকে বিস্মিত করিয়া দিবে। মা হয়তো পূর্ব্বে না জানাইবার জন্ত ধমকাইবেন—তার বাবা হয়তো খড়ম পায়ে খট্‌খট্ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইবেন মার রান্নার তদারক করিতে। কিংবা রাত্রেই ক্ষেত হইতে গোটাকয়েক কচি বেগুন তুলিয়া আনিয়া ডালের সহিত তাজার ব্যবস্থা করিবেন।

মৃন্ময় সহসা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। গ্রামের একখানি জীবন্ত চিত্র তার চোখের সম্মুখে যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুঁটিরামের বড় দীঘির স্বচ্ছ জল তার চোখের সম্মুখে যেন টলমল করিতেছে। পড়ন্ত রোদের শেষ ম্লান আভা দীঘির জলে পড়িয়া এক অপূর্ব্ব বর্ণবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে—আর সেখানে সাঁতার কাটিতেছে বেলে হাঁসের ঝাঁক। মাথার উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে সাদা বকের সারি। মেঠো পথ ধরিয়া কৃষকেরা চলিয়াছে লাঙ্গল কাঁধে নিজ নিজ ঘরের পানে। মৃন্ময় যেন একটা জীবন্ত সত্তার অনুভূতিতে বিহ্বল হইয়া পড়িল। দীঘির পাড়ে জলের কোল ঘেঁষিয়া কত লোক দল বাঁধিয়া মাছ ধরিতে বসিয়া গিয়াছে। এইবার হয়তো অনেকেই ছিপ গুটাইয়া গৃহে ফিরিবার আয়োজন করিতেছে। রোদের ম্লান আভাটুকুও হয়তো আর নাই। নারিকেল গাছের পাতায় পাতায় আলোর নাচন এতক্ষণে থামিয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে বাজিয়া উঠিয়াছে মঙ্গল-শঙ্খ। এক যায়, আর এক আসে—এ যেন তারই আহ্বান। মৃন্ময়ের ভাল লাগে। শুধু ভালই লাগে না। সে ভালবাসে গ্রামের এই পারিপার্শ্বিককে, তার সুখ আর দুঃখকে—যার সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ।

লিলি মৃদু কণ্ঠে আহ্বান করিল। মৃন্ময় এক মুহূর্ত্তে কল্পনা হইতে বাস্তবের কঠিন স্তরে ফিরিয়া আসিল। লিলি কহিল, কাল কিন্তু একটু বেশী দূরে নিয়ে যেতে হবে। এখন তো একটু সেরে উঠেছি আমি, দেহে খানিকটা জোরও পাচ্ছি। তা ছাড়া আর কটা দিন আছেন আপনি।

একটু থামিয়া লিলি পুনরায় কহিল, বেশ হ'ল কিন্তু। সহজ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে আমরা একে অপরের আত্মীয় নই, অথচ সত্যিকারের একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠল। গড়ে যখন উঠলই তখন তা একেবারে ভেঙে ফেলবেন না। আমি যে কত বড় অসহায় তা আপনার চেয়ে বেশী তো আর কেউ বুঝবে না।

মৃন্ময় শুধু খানিক হাসিল, কোন উত্তর দিল না। অসুখের পরে লিলি যেন খানিকটা ভাবপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে।

লিলি পুনশ্চ কহিল, এবারে কিন্তু মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

কথাটা বলিয়াই লিলি কতকটা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, কিন্তু মুহূর্ত্তেই সামলাইয়া লইয়া সে কহিল, তা হলে তাকে আমার আসল পরিচয় না দিয়ে নিয়ে আসবেন না যেন।

এক মুহূর্ত্তে লিলি বদলাইয়া গেল। তাহাকে যেন আরও ফ্যাকাসে, আরও দুর্ব্বল দেখাইতেছে।

মৃন্ময় সবই দেখিল, সবই বুঝিল। সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, তোমার সত্য পরিচয়ই আমি তাকে দেব। তাতে তোমার গৌরব এতটুকু ম্লান হবে না। না জেনে যে ভুল আমি করেছিলাম তার লজ্জা এবং গ্লানি আজও আমি ভুলতে পারি নি। আমার একথা তুমি বিশ্বাস কর লিলি।

লিলি নতমস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মৃন্ময়ও তখনকার মত আর কোন কথা কহিল না। বলিবার মত কিছু হয়তো ছিলও না।...

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঝি কিছুক্ষণ হইল আলো দিয়া গিয়াছে। মৃন্ময় সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল লিলির দু'চোখের কোল বাহিয়া জল ঝরিতেছে। কিন্তু না দেখার ভান করিয়া সে পুনরায় কহিল, আমার ঠিকানা তো তোমার কাছে রইল লিলি। যখনই দরকার বুঝবে আমায় ডেকো। আমার দ্বারা তোমার অসম্মান কখনও হবে না।

মৃন্ময় হয়তো বুঝিল না যে, তার এই শেষ কথায় লিলির চোখের জলের ধারা আরও প্রবল বেগে নামিল।

মৃন্ময় পুনরায় বলিয়া উঠিল, মানুষের সঙ্গে কি করে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে হয় সে হিসাব কোন দিন আমি করে দেখি নি, কিন্তু কোন দিন যদি আমার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব দেখ আমায় বিনা দ্বিধায় স্মরণ করিয়ে দিও। আমার মনে হয় আত্মীয়তা এবং ঘনিষ্ঠতার এইটেই হ'ল ভিত্তি।

উভয়ে নীরব। ভাষা যেন দু'জনের অকস্মাৎ মূক হইয়া গিয়াছে।

ইহারই দিনকয়েক পরে শীঘ্রই আবার দেখা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মৃন্ময় গ্রামের পথে যাত্রা করিল।

১৮

আজ ঘাটে স্টীমার ভিড়িতে ঘণ্টাকয়েক দেরি হইয়াছে। মধ্যপথে চড়ায় ঠেকিয়া এই বিপত্তি। এমন প্রায়ই হইয়া থাকে। পদ্মার ভাঙাগড়া প্রতিনিয়তই চলিয়াছে। মৃন্ময় আজ চটিয়া গিয়াছে; রাগটা তার অকারণ নহে, কিন্তু তাহা কোন ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের উপরে নহে। এ রাগের ধরণ আলাদা।

নিশুতি রাত; গ্রাম স্তব্ধ, তন্দ্রাচ্ছন্ন। মৃন্ময় তার চামড়ার সুটকেশটি হাতে করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কতটুকু আর পথ। এটা নিজেই বহিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। ইহার জন্ত আবার মুটের প্রয়োজন কি; আর একটা বাঁকের পরেই মজুমদারের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, তারপর আর একটা মোড় শেষ হইলেই তাহাদের বাড়ী।

মজুমদারের বাড়ীর কাছে আসিতেই মৃন্ময়ের বুকের ভিতরটা একটা অজানা আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য! এতবড় বাড়ীর কোথাও একটা আলো নাই। প্রকাণ্ড বাড়ীটা যেন নিরেট একস্তূপ অন্ধকারের মত নিশ্চল। শুধু দেউড়ীর ফটকে দরোয়ান নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে। এমন ত কোন দিন ছিল না। মৃন্ময় অন্তমনস্ক ভাবে আগাইয়া চলিল। ভাবিতে লাগিল, মঞ্জুষার মায়ের অসুখ-বিসুখ কিছু হয় নাই ত? মনের মধ্যে কেমন একটা আশঙ্কা লইয়া সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিল। কিন্তু বিস্ময় তার সীমা অতিক্রম করিল যখন বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বিস্তর চেঁচামেচি করিবার পর কেবলমাত্র তাহার মা ঘুম হইতে উঠিয়া আসিলেন। পিতার দেখাই পাওয়া গেল না। মৃন্ময় উৎকণ্ঠিতভাবে মায়ের মুখের পানে চাহিল। সেখানে আনন্দের অভিব্যক্তির পরিবর্ত্তে কেমন একটা ক্লিষ্ট বেদনার ছাপ দেখা গেল। মৃন্ময়ের কোন প্রশ্ন করিতেও ভরসা হইতেছিল না। অবশেষে পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সংক্ষিপ্ত উত্তর পাইল ক'দিন ধরেই তাঁর শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। তাই আর উঠলেন না।" কিন্তু এটা কেমন উত্তর। আজ কতদিন পরে সে ঘরে ফিরিয়াছে, কিন্তু তাহার জন্ত কোথাও যেন এতটুকু আগ্রহ নাই, আনন্দের প্রকাশ নাই—কেমন একটা নিরানন্দ পরিবেশ যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। কিছু একটা অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটিয়াছে—ইহা কেহ না বলিলেও সে অনুমান করিয়া লইল, কিন্তু পাছে বাস্তবের আকস্মিক আঘাত মর্ম্মান্তিক হয় তাই আর এই মুহূর্ত্তে সে কোনও প্রশ্ন করিল না—শুধু অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মাকে কহিল, বড় খিদে পেয়েছে। পথে আজ এক গ্লাস জল পর্য্যন্ত খাই নি।

মা কলের পুতুলের মত অগ্রসর হইলেন...

পরদিন একটু অধিক বেলায় মৃন্ময়ের ঘুম ভাঙিল। রাত্রে সে ঘুমাইতে পারে নাই। কেমন একটা অজানা দুশ্চিন্তা সারা রাত তার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। শেষ রাত্রের দিকে একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল মাত্র। শয্যাত্যাগ করিয়া মাকে বাবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, তিনি গ্রামান্তরে গিয়াছেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। মৃন্ময়ের ধৈর্য্যের শেষ সীমা যেন অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে। সে প্রশ্নের পর প্রশ্নে মাকে অস্থির করিয়া তুলিল, কিন্তু কয়েক ফোঁটা চোখের জল ছাড়া অন্ত কোন উত্তর পাইল না। মায়ের এই নীরবতার অন্তরালে যে কোনও নিদারুণ ব্যাপার রহিয়াছে ইহা মৃন্ময়ের চোখে দিবালোকের মত স্বচ্ছ হইয়া উঠিল, কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া এই বিসদৃশ আচরণের কোনই অর্থ আবিষ্কার করিতে পারিল না। মৃন্ময় চটিয়া গিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহাতেও কি বাঁচোয়া আছে! যাহার সহিত দেখা হয় সে-ই কেমন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া থাকে—কোন কথা বলে না, পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়। তাহাকে কোন প্রশ্ন করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত দেয় না।

মৃন্ময় দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া চলিল। একবার মঞ্জুষার সহিত দেখা করা তার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু সেখান হইতেও তাহাকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। দরোয়ান পথরোধ করিয়া জানাইল যে, বাবুলোক কেহ নাই।

মৃন্ময় অসহিষ্ণু ভাবে প্রশ্ন করিল, কোই মায়ীলোক।

দরোয়ান মৃন্ময়ের মুখের পানে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় জানাইয়া দিল—কেউ নাই। বলিয়াই তাহাকে সেলাম করিল—ইহার অর্থ অতি পরিষ্কার। মৃন্ময় পুনরায় রাস্তা ধরিল। খানিক পরে রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের বুকে আসিয়া পড়িল, ভাবিল, একবার রাধু বোষ্টমের কাছে গিয়া দেখিবে। আজ একই সঙ্গে তার মা, বাবা, গাঁয়ের লোক সবাই যে তার কাছে দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল।

মৃন্ময় মেঠো পথ ধরিয়া অন্তমনস্ক ভাবে অগ্রসর হইয়া চলিল। এক পাশে লঙ্কা, অপর পাশে বেগুনের ক্ষেত—মাঝখান দিয়া চলিয়া গিয়াছে আঁকাবাঁকা রাস্তা।

এই তার গ্রাম—যার কথা প্রবাসে তার স্মৃতিতে বড় মধুর হইয়া জাগিয়া উঠিত। গ্রাম তার একান্ত আপনার—কত বড় গর্ব্বের জিনিষ তার জন্মপল্লী। গাঁয়ের মানুষই শুধু যে তার পরমাত্মীয় তা নয়, এখানকার মাটি জল বায়ু সবকিছুরই সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ; কিন্তু আজ সবাই যেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তার প্রায় শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম। ইহারই যথার্থ কারণ কি তাই সে অন্ধের মত খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

রাধু বোষ্টম তার মাটির ঘরের দাওয়ায় বসিয়া একতারা

সংযোগে একটি প্রভাতী বাউল গাহিতেছিল। মৃন্ময়কে সেই-দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে একতারাটি বাঁশের খুঁটিতে ঠেলান দিয়া রাখিয়া তাহার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মৃন্ময় দ্রুত আসিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল এবং কোন ভূমিকা না করিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেল, এ সব কি বোষ্টম-দা। গাঁয়ের সবাই আমার ওপর হঠাৎ বিরূপ হয়ে উঠল কেন?

রাধু টানিয়া টানিয়া কেমন এক ধরণে হাসিতে লাগিল। রাধুর এমন হাসির সহিত ইতিপূর্ব্বে মৃন্ময়ের পরিচয় হয় নাই। শত দুঃখেও তার প্রাণখোলা হাসির এতটুকু ব্যত্যয় কখনও ঘটে নাই।

মৃন্ময় অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল, ভূত তোমার ঘাড়েও চেপেছে দেখছি।

রাধু হঠাৎ নিরতিশয় গম্ভীর হইয়া উঠিল। শান্ত কণ্ঠে কহিল, ভূত কার ঘাড়ে চেপেছে সে মীমাংসা পরে করো। এসেছ যখন বসো। ব্যস্ত হয়ো না।—বলিয়াই অন্দরের দিকে মুখ ফিরাইয়া অনুচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিল, ঘরে অতিথি-নারায়ণ এসেছেন সৎকারের ব্যবস্থা কিছু হবে নাকি গো। পরে মৃন্ময়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, নবদ্বীপ থেকে বোষ্টমীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি দাদাঠাকুর। বোষ্টমী তার ভুল স্বীকার করেছে। তেবে দেখলাম ভুলচুক মানুষই করে থাকে—তা ছাড়া বুড়ো হয়েছি। এ বয়সে একজন দেখবার শুনবার লোকও চাই তো।

মৃন্ময় ক্রমশঃই অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। কহিল, ব্যবস্থা তুমি পরে করো। যা জানতে এসেছি, তাই আগে বলো।

রাধু শান্তকণ্ঠে কহিল, তোমরা এত লেখাপড়া শিখেছ দাদাঠাকুর, তবুও কত বড় ভুলটা করলে বলো দেখি। এ যে কেউ কোন দিন ভাবতেও পারে নি ভাই। মঞ্জুদিদির মা শেষ দিনটিতেও তোমার নাম করে গেছেন।

মৃন্ময় চীৎকার করিয়া উঠিল, তিনি কি…

বাধা দিয়া মৃদু কণ্ঠে রাধু কহিল, হ্যাঁ তিনি মারা গেছেন। এত বড় আঘাত তিনি কেমন করে সইবেন বলো দেখি। নিজের ছেলে ত বহুদিনই পর হয়ে গেছে। তার পর যাকে নিজের ছেলের চেয়েও ভালবাসতেন—যার দিকে চেয়ে এত দিন আশায় বুক বেঁধে ছিলেন শেষ পর্য্যন্ত তার কাছ থেকেও পেতে হ'ল তাঁকে দারুণ আঘাত। কক্সবাজার থেকে এসে একটি সপ্তাহও কাটল না।

মৃন্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে রাধুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

রাধু বলিয়া চলিল, আর তোমার বন্ধু সুনির্ম্মলবাবুরই বা কি আক্কেল। কথাটা এমন করে রাষ্ট্র না করলেও পারতো। তুই তো বাবু বড়লোক। এইটেই কি বন্ধুর কাজ হয়েছে? গ্রামময় ঢোল পিটিয়ে দিলে।

মৃন্ময় নিঃশব্দে শুনিতেছিল, একটা প্রতিবাদ করিতে পর্য্যন্ত সে ভুলিয়া গেল—ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে রাধুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

রাধুর কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামিয়া আসিল। কহিল, আচ্ছা দাদাঠাকুর, এক কথায় এত বড় সম্পত্তি আর মঞ্জুদিদির মত মেয়েকে কিসের মোহে তুমি ত্যাগ করলে? মঞ্জুদিদি তো তোমার অযোগ্য ছিল না। অমন মেয়ে ক'টি মেলে ভাই। আবেগে রাধুর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল—

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, যাকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছ, একসঙ্গে খেলাধুলো করে বড় হলে, তাকে তুমি চিনলে না? শেষ পর্য্যন্ত এতবড় আঘাতটা তুমি তাকে দিলে।

মৃন্ময় বোকার মত অর্থহীন দৃষ্টিতে রাধুর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া যেন তার কথাগুলির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। ওর চিন্তাশক্তি, বিচারবুদ্ধি কেমন যেন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

রাধু বলিতে লাগিল, মঞ্জুদিদির মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ওদের বাড়ীতে গেলাম। দিদি আমার ঈষৎ ম্লান হেসে বললে, বোষ্টম-দা, মা চলে গেলেন। তাঁর সে মুখ, সে হাসি আমি জীবনে ভুলব না। সান্ত্বনা দেবার ছলে বললাম, সবাইকে একদিন যেতে হবে দিদি। মঞ্জু দিদি তেমনি হাসিমুখেই জবাব দিলেন, সে তো দেখতেই পাচ্ছি বোষ্টম-দা। এক এক করে অনেকেই তো গেল।

মৃন্ময় নীরব।

রাধু বলিয়া চলিল, মিথ্যে তো সে বলে নি—জবাব দেব কি! ভাই তাদের অনেক আগেই ত্যাগ করেছে। এখন মা চলে গেলেন চিরতরে। কিন্তু তুমি কেন এমন কাজ করলে দাদাঠাকুর! তোমার যারা একান্ত আপনার জন তাদের কত বড় মনস্তাপের কারণ হলে বলো দেখি। একজন দুঃখের আঘাতে প্রাণ হারালেন। অমন যে শিবতুল্য মানুষ, বুড়ো বয়সে তিনি মেয়ের হাত ধরে বাড়ীঘর ছেড়ে চলে গেলেন। গ্রামে তিনি আর ফিরবেন না। ভাবতে পার দাদাঠাকুর তোমার সামান্য একটা বদ খেয়ালের জন্ত কত বড় শোচনীয় ব্যাপার ঘটলো। তোমার বুড়ো বাপ-মা লজ্জায় কাউকে মুখ দেখাতে পারেন না। একটা খ্রীষ্টান মেয়ের প্রতি আসক্তি তোমার এত বড় হয়ে উঠল যে, তার কাছে সমাজ, সংসার, বাপ, মা সবকিছু ভেসে গেল। তবুও দিদি আমার একটি বারও কারু কাছে নালিশ জানায় নি।

মৃন্ময়ের চোখের সম্মুখ হইতে একটা কালো পর্দা যেন ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। লিলি ঠিকই বলিয়াছে, সুনির্ম্মল বিলাত

যায় নাই। শুধু তার চরম সর্ব্বনাশসাধন করিবার জন্যই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু কেন। কেন সে তার এত বড় সর্ব্বনাশ করিল। মৃন্ময় ত তার ক্ষতি করা দূরে থাকুক, ভুলেও তার অনিষ্টচিন্তা করে নাই। আর রুবি? সেও কি আগাগোড়া তার সঙ্গে নিপুণ অভিনয় করিয়া গিয়াছে? মৃন্ময় পাগলের মত বারকয়েক মাথা নাড়িল—ঠিক হইয়াছে—নিলির কোন দাবিই যাহাতে ভবিষ্যতে না উত্থাপিত হইতে পারে ইহা তারই সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। মূর্খ সে তাই আগাগোড়াই ভুল বুঝিয়াছে। কিন্তু ভুল সে করে নাই। একটি মেয়েকে তার চরম দুর্দিনে সামান্য একটু সাহায্য করিয়াছে মাত্র। আর যাঁরা তাকে ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছে, যাঁদের সন্তান বলিয়া নিজেকে সে গৌরবান্বিত মনে করে—তাঁরা তাকে সামান্য বিশ্বাসটুকুও করিতে পারিলেন না। তাকে এতবড় নিষ্ঠুর অপদার্থ বলিয়া মনে করিতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। মৃন্ময় সহসা জলিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, আর তোমরা সকলেই যাকে কোন দিন চোখেই দেখ নি তার কথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করলে, আশ্চর্য্য!

মৃন্ময়ের তীব্র কণ্ঠস্বরে রাধু কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ়ের মত তার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, তাই কি সহজে কেউ বিশ্বাস করেছে দাদা। এ নিয়ে কলকাতায় ছুটাছুটি পর্য্যন্ত কম হয় নি। তা ছাড়া অত সাক্ষী প্রমাণ। সবচেয়ে বড় প্রমাণ তোমার অমন চোরের মত পালিয়ে যাওয়া। রাধু ক্ষণকাল থামিয়া একটু যেন উত্তেজিত কণ্ঠেই পুনরায় কহিল, তুমি কি করেছ না করেছ সে প্রসঙ্গ না হয় আর তুলব না—কিন্তু পরীক্ষা-শেষে তোমার কলকাতা ছেড়ে দূরদেশে যাবার এতই যদি প্রয়োজন হয়েছিল একটা চিঠি লিখেও ত সে কথা তুমি জানাতে পারতে দাদাঠাকুর।

মৃন্ময় ভগ্ন কণ্ঠে যেন আপন মনেই বলিয়া চলিল, ভগবান বিরূপ, নইলে এমন হবে কেন? একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাধু কহিল, এখুনি যাবে?

মৃন্ময় বড় করুণ একটু হাসিয়া কহিল, হাঁ বোষ্টম-দা, আমি এখন যাই। কিন্তু যাবার আগে শুধু একটা কথাই বলে যাই—তোমরা যা শুনেছ সব মিথ্যা। দুঃখ আমার যে তোমরা সবাই আমায় ভুল বুঝলে। একটা মুখের কথাও কেউ জিজ্ঞেস করলে না। করলে আমি মিথ্যা বলতাম না। শোন রাধুদা—না থাক, তোমরা সবাই সমান।

মৃন্ময় উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রমশঃ

ডাক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ধরণীর মাঝে কিমাশ্চর্য্য আছে বা অতঃপর।
দরীমুখ হতে বাহিরায় ধ্বনি 'আকবর' 'আকবর'।
দুরধিগম্য মরুপর্ব্বত একান্ত জনহীন,
রাখাল বালক সেই শব্দেতে চমকিত কত দিন।
রটিল বারতা—যত নরনারী দূর গ্রাম নগরীর
জমায় গুহার মুখেতে নিত্য একটা মেলার ভিড়।
করিতে পারে না নির্ণয় কিছু—পায় নাক সন্ধান,
পাহাড়ের মুখে যেন ভাষা দিল কোন্ সে শক্তিমান?

২

পল্লী হইতে সংবাদ গেল দিল্লীর দরবারে—
হোমরাচোমরা আমীর ওমরা হাসিয়া উড়ায় তারে।
বাদশাহ এই জবর খপর শুনিয়া কহেন হাসি,
'বান্দার ডাক কেন যে পড়িল চল সবে দেখে আসি।'
দূরদূরের সেই অদ্ভুত ডাক পশিতেছে যেন কানে,
রওনা হলেন বাদশাহ সেই কৌতুকী আহ্বানে।
দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রেতে 'আবু পাহাড়ের' গায়ে,
শ্রান্ত ক্লান্ত দাঁড়ালেন গিয়া কণ্টকসার ছায়ে।

উঠিতেছে ধ্বনি ক্ষীণ কর্কশ শ্রুতিকটু অতিশয়,
এ কি প্রহেলিকা? নরের কণ্ঠ শুনি যেন মনে হয়।
পাথরে আঘাত করিয়া বাদশা দাঁড়ায়ে গুহার আগে
বলেন 'হুজুর কি লাগি তলব—নফর আদেশ মাগে।'
পশ্চাৎ হতে সন্ন্যাসী আসি চাহি তাঁর মুখ পানে
কহেন 'ডাকের মূল্য বুঝেছ? বুঝিতে পেরেছ মানে?
ডাকে ভগবান আসে বলেছিনু করনি ক বিশ্বাস
মনে পড়ে তব অহমিকাভরা সে কুটিল পরিহাস?'

৪

উপেক্ষায় এই ডাকে ছুটে যদি আসেন শাহানশাহা
নিখিলের নাথ ডাকে আসিবেন অসম্ভব কি তাহা?
জেনো মানুষের জ্ঞানের বাইরে এমন জিনিষ আছে
যাহার প্রবল আকর্ষণেতে ভগবান আসে কাছে।
প্রবল প্রতাপ বাদশাহ তুমি কতই অহঙ্কার,
তবু এই ডাকে এখানে আসিয়া ঠেলিছ পাষাণধার।
আসে ভগবান, নিশ্চয় আসে, নিশ্চয় আসে ডাকে,
যে বলে একথা সত্যই বলে—বিশ্বাস করো তাকে।

সর্দার প্যাটেল মাদ্রাজে হিন্দী প্রচার-সভায় গান্ধীমণ্ডপ এবং রজত জয়ন্তী ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিতেছেন

যবদ্বীপের বেনডোয়েং-এর একটি রাস্তার দৃশ্য

সিড্নি হইতে কলিকাতা

১১ই মার্চ মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে এগারটায় সিড্নির উপকণ্ঠস্থ রোজ উপসাগর হইতে ফ্লাইং বোট উড়িল। আলোকোজ্জ্বাসিত সিড্নি নগরী ক্রমশঃ দৃষ্টির অগোচর হইল। আমরা চব্বিশ জন যাত্রী। বিমানটিতে শয়নের ব্যবস্থা আছে। বিমানের লেজের মধ্যে কয়েকটি বার্থ আছে। কয়েকটি আসনকেও বার্থে পরিণত করা যায়। ষ্টুয়ার্ড আসিয়া বলিল, আমাদের মোট ১৬টি বার্থ আছে। যাত্রীদের মধ্যে ষোল জন তাহাতে শয়ন করিতে পারেন। আমি প্রথম শুইতে চাহি নাই। শেষে বার্থ খালি থাকে দেখিয়া বিমানের লেজের মধ্যে একটি বার্থে শয়ন করিলাম। বেশ আরামেই ঘুমাইলাম। এক ঘুমে রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। প্রভাতে উঠিয়া কাপড়-চোপড় পরিতেই বিমান বাউএন উপসাগরে অবতরণ করিল। বাউএন কুইন্সল্যাণ্ড রাষ্ট্রে অবস্থিত, সিডনী হইতে ৯৭৪ মাইল। নৌকাযোগে উপসাগরতীরস্থ একটি ছোট ঘরে আমাদিগকে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে প্রাতরাশ সমাপন করিয়া পুনরায় নৌকাযোগে বিমানে ফিরিলাম। সোঁ সোঁ শব্দে দ্রুতবেগে জল কাটিয়া বিমান সগর্জ্জনে আকাশে উঠিল। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ ভারত-মহাসাগরের মধ্যে দুইটি হাত বাড়াইয়া দিয়াছে। একটি প্রায় নিউগিনি পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। অপরটি ছোট। তাহারই মাথায় পোর্ট ডারউইন। বাউএন হইতে ডারউইনের পথে হাত দুইটির মধ্যবর্ত্তী উপসাগরে আমরা সবেমাত্র পড়িয়াছি, সহসা বিমানটিতে বেশ জোর কয়েকটি ঝাঁকানি লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে বিমান আবার স্থিরভাবে চলিতে লাগিল। বিমান সবেগে ছুটিয়াছে। কিন্তু গৃহগামী মনের নিকট ইহার বেগ অতি তুচ্ছ। বেলা প্রায় ১১।টার উপসাগর অতিক্রম করিলাম। পুনরায় স্থলভাগ দৃষ্টিগোচর হইল। উপকূল-ভাগে বন-চাষ বা বসতি আছে বলিয়া মনে হইতেছে না, শুধু পাতলা গাছ দেখা যাইতেছে। বৈকাল ৩টার বিমান ডারউইনের সমুদ্রে নামিল। নৌকাযোগে তীরে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে গাড়ীতে হোটেলে নীত হইলাম। ভ্রমণক্লান্ত যাত্রীগণ স্নানাদি সমাপন করিয়া শহর দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলেন। নীচে টেলিগ্রাম করিবার ব্যবস্থা দেখিলাম। আমার আগমনবার্ত্তা জানাইয়া কলিকাতায় একটি তার পাঠাইলাম। তারপর আমিও শহর দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। শহরটিতে ৩০০০ লোকের বাস। বসতি বিরল—জনশূন্যতা চোখে ঠেকে। নারিকেল গাছ, গোল্মোহর গাছ ও তেঁতুল গাছ দেখিতে পাইলাম। তেঁতুল গাছগুলি আকারে ছোট, ফল কম। পেঁপে গাছ, কদমের বন এবং সপুষ্প অপরাজিতা লতা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। শহরের সবগুলি রাস্তা পিচ বাঁধানো নয়। বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, এশিয়া ও ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী হইতেছি। অষ্ট্রেলিয়ার এই অংশে আদিম অধিবাসীর সংখ্যাই বেশী। অনেক কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী দেখিলাম। মনে হইল ইহাদের জীবনযাত্রার মান নিম্নশ্রেণীর। হোটেলের পাশেই সমুদ্র বা উপসাগর। অদূরে সাগরতীরে স্থানীয় শাসনকর্ত্তার কুঠি। কাছে একটি "পায়ার" বা ঘাট। সেখানে দুই-তিনটি পুরাতন ষ্টীমার দাঁড়াইয়া আছে। ষ্টীমারগুলি ছোট এবং বোধ হয় বে-মেরামত অবস্থায় আছে। শুনিলাম গত যুদ্ধের প্রথমে জাপানীরা বোমাবর্ষণ করিয়া এখানে আটখানা জাহাজ ডুবাইয়া দেয়। সেগুলি এখনও এখানেই জলগর্ভে নিমজ্জিত আছে। মাত্র একখানা জাহাজ নাকি পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। উপসাগরতীরে অনেকক্ষণ ঘুরিলাম। ওপারে দূরে বনাচ্ছাদিত ভূমি দেখা যাইতেছে। ডাহিনে দূরে ভারত-মহাসাগর। বেলাভূমি বন্ধুর ও শিলাময়।

আমার সহযাত্রীদের মধ্যে একজন সুইডিস্ ভদ্রলোক ছিলেন। ভদ্রলোক ছাব্বিশ বৎসর মেলবোর্ণে ক্রিষ্ট্যাল কর্ত্তনের ব্যবসা করিয়া বৃদ্ধবয়সে সস্ত্রীক দেশে ফিরিতেছেন। ডারউইনের হোটেলে ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ভদ্রলোক পূর্ব্বে ইংরেজী জানিতেন না। মাতৃভাষা ভিন্ন ফরাসী, জার্ম্মান ও লাটিন জানিতেন। পরে মেলবোর্ণে আসিয়া ইংরেজী শেখেন। অষ্ট্রেলিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভদ্রলোকটি খুব আশান্বিত নন। তাঁহার মতে অষ্ট্রেলিয়া-সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই; সরকারী কর্ম্মচারীদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, মতামত বহু ক্ষেত্রে বালকোচিত, এদেশের শ্রমিক আন্দোলন যুক্তিপ্রতিষ্ঠ নয়, এখানকার শিল্পীরা উৎকৃষ্ট জিনিস প্রস্তুতে উৎসাহী নয়। গৃহগামী প্রবাসী বৃদ্ধের মুখে তাঁর স্বদেশের প্রশংসা খুব ভাল লাগিল। সুইডেন যুদ্ধকালে নিরপেক্ষ থাকায় যুদ্ধের আঁচড় এ দেশটির গায়ে লাগে নাই। সুইডেনে সাধারণ লোকের অবস্থা সচ্ছল। চিকিৎসার বন্দোবস্ত খুব ভাল। শ্রমিকদের বাসগৃহের ব্যবস্থা এখানে উত্তম। জনসাধারণ প্রগতিশীল এবং তাহাদের মনোভাব উদার। শ্রেণীবিদ্বেষ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

ভদ্রলোকটি সুইডেন সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিলেন। সেখানে রেল-ভাড়া সস্তা; এক রাত্রির পথ মাত্র ১৭ শিলিঙে যাওয়া যায়। বাল্টিক সাগর পার হইতে লোককে গাড়ী-বদল করিতে হয় না। গাড়ী ফেরীর পার হয়; ৫। ঘণ্টা

লাগে। প্রধান রেলপথগুলির সর্ব্বত্রই বৈদ্যুতিক শক্তিতে গাড়ী চলে। দেশে বর্ত্তমানে চল্লিশ লক্ষ অশ্বশক্তি জলবিদ্যুৎ তৈরি হইতেছে, এক কোটি দশ লক্ষ অশ্বশক্তি পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

সেখানে কৃষি ও শিল্পে সমসংখ্যক লোক নিযুক্ত। ইস্পাত ও কাগজ প্রধান শিল্প। দেশটি প্রায় স্ব-সম্পূর্ণ। তবে কফি ও তেল নাই। যে কয়টি লোহার খনিতে কাজ চলিতেছে সেগুলি আরও ২৫০ বৎসর চলিবে। ইহা ছাড়া আরও ১৫টি খনি আছে, তাহাতে এখনও হাত দেওয়া হয় নাই।

ভদ্রলোক নোবেল পুরস্কারের প্রসঙ্গ তুলিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া বলিলেন, "পুরস্কার আনিবার জন্য মনীষিগণ প্রতি বৎসর ষ্টকহোমে সমবেত হন। রবীন্দ্রনাথ যে বৎসর নোবেল পুরস্কার পান সেবারকার কথা আমার মনে আছে। মনে পড়ে ইংরেজ সরকার রবীন্দ্রনাথকে পুরস্কার আনিবার জন্য ষ্টকহোমে যাইতে দেন নাই। কেন দেন নাই বলিতে পারেন কি ?"

আমি—এরূপ কথা আমার জানা নাই।

ভদ্রলোক—আনাতোল ফ্রাঁস এবং জার্ম্মাণ অধ্যাপক নার্ষ্ট একই বৎসর নোবেল পুরস্কার পান। পুরস্কার-বিতরণীর সভায় ইঁহারা পরস্পরের করমর্দ্দন করেন। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর ইহাই ফরাসী-জার্ম্মানীর প্রথম করমর্দ্দন।

ডারউইনের হোটেলে রাত্রি কাটাইয়া ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ছয়টায় পুনরায় উড়িলাম। আমার পাশে বসিয়াছিলেন একটি প্রৌঢ় ইংরেজ ভদ্রলোক। আমাদের সামনে মুখোমুখি বসিয়াছিলেন এক জন বর্ষীয়ান্ মার্কিন ভদ্রলোক এবং এক জন অষ্ট্রেলিয়ান যুবক। ইংরেজ ভদ্রলোক সরকারী কার্য্যোপলক্ষে অষ্ট্রেলিয়া গিয়াছিলেন, এখন সিঙ্গাপুরে ফিরিতেছেন। মার্কিন ভদ্রলোকটি একটি বড় মার্কিন কেমিক্যাল কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট। পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। সিঙ্গাপুরে কয়েক দিন থাকিয়া চীন হইয়া ভারতবর্ষে যাইবেন। অষ্ট্রেলিয়ান যুবকটি একটি কোম্পানীর কাজেই লণ্ডন যাইতেছেন। আমাদের চারি জনের মধ্যে নানারূপ আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার স্থলভাগ অতিক্রম করিয়া ভারত-মহাসাগরে পড়িলাম। সাড়ে আটটায় টিমোর সাগর অতিক্রম করিলাম। পর্ব্বতময় টিমোর দ্বীপকে তাহার দক্ষিণপ্রান্তের উপর দিয়া লঙ্ঘন করিলাম। পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপমালা এক এক করিয়া পার হইলাম। সুরাবায়া উপসাগরে যখন নামিলাম তখন ডারউইন-সময় সাড়ে চারটা, সুরাবায়া-সময় আড়াইটা।

আকাশ হইতে সুরাবায়ার দৃশ্য সুন্দর দেখাইতেছিল। তখন সবেমাত্র জোর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সদ্যঃস্নাত শহর। প্রত্যেক বাড়ীতেই গাছপালা আছে। বেশ সাজানো-গোছানো। বাড়ীর ছাদগুলি প্রায়ই লাল রঙের। বেশীর ভাগ বাড়ীই দোতলা। দু-একটি তিনতলা। উপসাগরে নামিতেই শহরের রণ-বিধ্বস্ত রূপ প্রকট হইল। বন্দরটির প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। উপসাগরটির তিন দিকে স্থল। এক দিক ভারত মহাসাগরে যুক্ত। সমুদ্রগর্ভে ছয়-সাতখানা জাহাজ জলমগ্ন। প্রত্যেকটির চোং দেখা যাইতেছিল—মজ্জমান মানুষের ঊর্দ্ধপ্রসারিত বাহুর মত। অপর কয়েকটি বিধ্বস্ত জাহাজ জলমধ্য হইতে পারে তুলিয়া মেরামত করা হইতেছে। নামিবার সময় ক্যাপ্টেন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তীরে নামিয়া চা পান করিয়া আধ ঘণ্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরেই আমাদিগকে পুনরায় উড়িতে হইবে। কিন্তু নামিয়াই খবর পাইলাম যে, প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য আমাদিগকে আজ এখানেই থাকিতে হইবে। আমাদের যাওয়া পিছাইয়া গেল বটে ; কিন্তু যাত্রিগণ সুরাবায়া শহরটি দেখিবার সুযোগ পাইয়া খুশীই হইলেন। ঘাটিতেই জনৈক সরকারী কর্ম্মচারী আমাদিগকে স্থানীয় মুদ্রা সরবরাহ করিলেন এবং অব্যয়িত অংশ পরদিন ফিরিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। শুনিলাম মুদ্রাবিনিময়ের কালো-বাজার এখানে খুব চালু। বিমান-ঘাঁটির কর্ম্মচারিগণ আমাদের অবস্থানের সকল ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাস আসিয়া আমাদিগকে হোটেলে লইয়া গেল। হোটেলটির নাম ওরাঞ্জে হোটেল। শহরের বৃহত্তম রাজপথের উপর অবস্থিত। রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত। দু'পাশে দোকানের সারি। মাঝখান দিয়া ট্রাম লাইন। হোটেলটি বেশ বড়। আসবাব-পত্র চমৎকার—অষ্ট্রেলিয়ার যে-কোন হোটেল হইতে ভাল। চেয়ারগুলির বেতের কাজ যেমন মজবুত তেমনি সুদৃশ্য। ভবনটি বৃহৎ ও ইহার প্ল্যান সুরুচিসম্মত ও সুনিপুণ, কিন্তু বর্ত্তমানে যেন লক্ষ্মীছাড়া—শ্রীমাবহু প্রাচীন জমিদার-বাড়ীর মত। পাখা ও বিজলী-বাতি আছে, কিন্তু কলে জল নাই। জাপানী যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ ইন্দোনেশীয়গণের সহিত যুদ্ধরত। যে স্থান হইতে শহরের জল সরবরাহ হয় সে জায়গাটি এখনও ইন্দোনেশীয়দের হাতে—কাজেই শহরে জল নাই। শহরের দোকানপাটেরও যেন লক্ষ্মীছাড়া ভাব। মনে হয় এক সময় শহরটি উৎসব-মুখর ছিল। হোটেলের জনৈক কর্ম্মচারী বলিল, "এই রাস্তা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার হুকুম নাই এবং এই রাস্তারও খানিক দূরের বেশী যাওয়া নিষেধ।" শহর দেখিবার জন্য বড় রাস্তার উপর একা বাহির হইয়া পড়িলাম। খানিকদূর যাইতেই একটি দোকানের সামনে জনৈক শিখ ভদ্রলোককে দণ্ডায়মান দেখিলাম। তিনি আমাকে সাদরে দোকানের ভিতর লইয়া গিয়া বসাইলেন। দোকানটি বেশ বড়। তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। তিনি যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ :

"আমি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী এখানে আসি।

যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ওলন্দাজগণ তত গা করে নাই। শেষে যখন রীতিমত আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিল তখন তাহারা কিছু সৈন্যসংগ্রহ করিল। কিন্তু ইহাদের বিমান বা ট্যাঙ্ক ছিল না। যখন সিঙ্গাপুরের পতন হইল তখন ইহারা একরূপ নিরাশই হইল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জাপান সুরাবায়ায় বোমাবর্ষণ করে। সুরাবায়া হইতে প্রায় ২০০ মাইল দূরে এক জলযুদ্ধে ওলন্দাজ-রণতরীসমূহ বিপর্য্যস্ত হয়। মার্চ মাসের ৩ তারিখে জাপগণ সুরাবায়ার দশ মাইল দূরে অবতরণ করে। ওলন্দাজগণ তাহাদের মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার পূর্ব্বেই অষ্ট্রেলিয়ায় পাঠাইয়া দিয়াছিল। এখন তাহারা ৩০০ মাইল দূরে এক পর্ব্বতে আস্তানা স্থাপন করিল। জাপগণ যখন অবতরণ করিয়া তাহাদিগকে চারি দিক দিয়াই ঘিরিয়া ফেলিল তখন ওলন্দাজ-বাহিনী আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। জাপদের সংগঠন-শক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়। সাত দিনের মধ্যেই তাহারা যবদ্বীপের যাবতীয় কাজকর্ম্ম নিয়মিত রূপে চালু করিয়া দিল। সকলেরই জীবনযাত্রা ঠিকমত চলিতে লাগিল। সাড়ে তিন বৎসর জাপগণ এখানে ছিল। উহাদের দয়ামায়া কম। কঠোর সাজা দিতে বা অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে ইহারা পরাঙ্মুখ নহে। ইহাদের গুপ্তচর বিভাগ অত্যন্ত সুনিপুণ। জার্ম্মানী যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল তখন জাপানীরা বুঝিল যে অক্ষশক্তির পরাজয় অনিবার্য্য। তখন ইহারা দেশীয় লোকেদের সহিত সদয় ব্যবহার সুরু করিল। তাহাদিগকে ভাল ভাল কাজে নিযুক্ত করিল এবং স্বাধীনতার অনিবার্য্যতা সম্বন্ধে আশান্বিত করিয়া তুলিল। এদেশীয়গণ জাপানীদের কাছেই অস্ত্র-ব্যবহার শিখিল। জাপান যখন আত্মসমর্পণ করিল তখন তাহারা স্থানীয় জাপানীদের আক্রমণ করিয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইল। এখন পর্য্যন্ত ওলন্দাজগণ মাত্র চারিটি শহরের অধিকারী। দেশের বাকী অংশ সমস্তই দেশীয়গণের হাতে। উহারা এই শহর হইতে মাত্র দশ মাইল দূরে ছিল। দিন দশেক পূর্ব্বে ওলন্দাজগণ এক আক্রমণ চালাইয়া উহাদিগকে আরও মাইল পঁচিশেক হটাইয়া দিয়াছে। যেখান হইতে শহরের জল সরবরাহ হইত সেই জায়গাটি এখনও উহাদের হাতে। কাজেই শহরে জল নাই। এখনও শহরের দোকানপাট ঠিকমত চলে না। সন্ধ্যার মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়। রাত্রি ১১টা হইতে ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত "কারফিউ"।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শীঘ্র এ গোলমাল মিটিবে কি ?"

শিখ ভদ্রলোক বলিলেন, "না। একদল চায় স্বাধীনতা। অপর দল চায় উহাদিগকে অধীন রাখিতে। কাজেই গোলমাল মিটিতে পারে না। দেশীয়গণের মধ্যে শিক্ষার বড় অভাব। ভারতবর্ষে যেরূপ শিক্ষিত ও আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে অভিজ্ঞ লোকজন আছেন এখানে সেরূপ কেহ নাই। কাজেই ওলন্দাজেরা যদি ঘোষণা করে যে, আংশিক স্বাধীনতা এখনই দিয়া দিবে তবে আরও দশ-বার বৎসর এদেশে ভালভাবেই থাকিতে পারে। দেশীয়দের শিক্ষালাভের জন্য এই সময়টুকুর প্রয়োজন। কিন্তু ওলন্দাজগণ ইংরেজের মত রাজনীতিজ্ঞ নয়। ইংরেজ যেমন যথাসময়ে ভারত ছাড়িবার সংকল্প ঘোষণা করিয়া নিজের ও ভারতের মঙ্গলই করিয়াছে এবং তাহাতে লজ্জা বোধ করে নাই, ওলন্দাজেরা সেরূপ পারিবে বলিয়া মনে হয় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "এদেশে ভারতীয়ের সংখ্যা কত হইবে ?"

শিখ ভদ্রলোক বলিলেন, "সমগ্র দেশে ২০।২৫ হাজার হইবে। আর এদেশের সভ্যতা তো মূলতঃ ভারতীয়। যদি পারেন তবে একবার বলিদ্বীপে যাইবেন। সেখানে কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতির প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। সেখানকার লোকেরা ভারতীয়দের মতই ধুতি ও পাগড়ী পরে। এই উভয় দেশের অনেক কথাও এক, যেমন—রুটি, নসিব। ভারতবর্ষের মত সুন্দর সুন্দর মন্দিরও সেখানে আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "শিখজী, দেশে যাবে না ?"

শিখের শ্মশ্রুল মুখে হাসি দেখা দিল। বলিল, "দেশ থেকে চিঠি পাইয়াছি। দোকানের ভার লইবার জন্য দেশ হইতে লোক আসিতেছে। আগামী মাসেই দেশে রওনা হইতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি।"

শিখ-ভদ্রলোক আমাকে লেমোনেড্ পান করাইয়া আপ্যায়িত করিলেন। তাঁহার সহিত আলাপাদিতে পরিতৃপ্ত হইয়া আবার রাস্তায় বাহির হইলাম। পাশেই দেখিলাম দুইটি সিন্ধুপ্রদেশবাসীর দোকান।

একটু অগ্রসর হইতেই আমার সহযাত্রীদের একটি দল দেখিলাম। তাঁহারাও শহর দেখিতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলাম। ইঁহাদের মধ্যে চারি জন বিলাতের সংবাদপত্রের প্রতিনিধি। ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট খেলার রিপোর্ট করিতে অষ্ট্রেলিয়া গিয়াছিলেন। এখন স্বদেশে ফিরিতেছেন। অপর এক জন শুভ্রকেশ বৃদ্ধ। ২৭ বৎসর অষ্ট্রেলিয়ায় যাপন করিয়া বৃদ্ধবয়সে সুইট্জারল্যাণ্ডে বাস করিবার জন্য যাইতেছেন। বৃদ্ধ বেশ প্রফুল্ল। এই শহর হইতে স্মারক কোন একটি জিনিস কিনিতে ইচ্ছুক। একটি সোনা-রূপার দোকানে ঢুকিয়া এক জোড়া রূপার তারের দুল কিনিলেন। দেখিলাম পাউণ্ড পাইলে দোকানদারগণ অনেক কম দামে জিনিস বিক্রয় করিতে প্রস্তুত।

রাত্রে খাইবার সময় খবর আসিল যে, আগামী কাল আমরা সকাল ৮টায় রওনা হইয়া সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিব। ইহাতে আমাদের প্রোগ্রাম পুরা এক দিন পিছাইয়া যাইবে। কিন্তু সিঙ্গাপুর দর্শনের সুযোগ মিলিবে বলিয়া কেহ বিশেষ অখুশী হইলেন না।

১৪ই মার্চ শুক্রবার ভোরে হোটেল ত্যাগ করিয়া বিমান-ঘাঁটিতে উপস্থিত হইলাম। উপসাগর-তীরবর্তী বিমান-ঘাঁটিতে ঘাঁটির ঘরটি ছোট। কাঠের ঘর। বন্দোবস্ত সবই অস্থায়ী। সিড্‌নী হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত এই বিমান-পথটা বিলিতী বি-ও-এ-সি এবং অষ্ট্রেলিয়ার কোয়াণ্টাস এম্পায়ার এয়ার ওয়েজের সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। সিড্‌নী হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত বিমান কোয়াণ্টাসের কর্ম্মচারীগণের হাতে থাকে। সিঙ্গাপুরে ক্রু বদল হয় এবং বি-ও-এ-সি-র কর্ম্মচারিগণ বিমানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুরাবায়ার যে স্থানীয় কর্ম্মচারীটির উপর আমাদের দেখাশুনা করিবার ভার ছিল তিনি অষ্ট্রেলিয়ান। বিমান-ঘাঁটিতে আমার মার্কিন সহযাত্রী তাঁহার সুবন্দোবস্তের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশীয়দের বিবাদ কত দিনে মিটিবে?"

স্থানীয় কর্ম্মচারী—"জানি না। তবে বর্ত্তমানে জোর গুজব যে, আগামী সপ্তাহে ইহাদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। চুক্তির মুসাবিদা পূর্ব্বেই তৈরি হইয়াছে। ওলন্দাজগণ এখন আরও দুইটি সর্ত্ত যোগ করিতে চাহিতেছে। ইন্দোনেশীয়গণ তাহাতে আপত্তি করিতেছে। ইহাদের আপত্তিও যেরূপ দৃঢ় তাহাতে মনে হয় ওলন্দাজগণ সর্ত্ত দুইটি ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়া যাইবে। চুক্তির সারমর্ম্ম এই যে, দুই বৎসরের মধ্যে ওলন্দাজগণ ইন্দোনেশীয়গণকে দেশের ভার ছাড়িয়া দিবে। তবে শেষ পর্য্যন্ত হয় তো ওলন্দাজগণ দুই বৎসরের স্থলে বিশ বৎসরই থাকিয়া যাইবে।"

সহযাত্রী অষ্ট্রেলিয়ান যুবকটি প্রশ্ন করিলেন, "ইন্দোনেশীয়দের শাসনপ্রণালী কি ওলন্দাজদের শাসন-প্রণালীর মত সুনিপুণ?"

স্থানীয় কর্ম্মচারী, "মোটেই না।"

অষ্ট্রেলিয়ান যুবক, "তবে ইন্দোনেশীয়দের হাতে শাসন-ভার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়।"

স্থানীয় কর্ম্মচারী, "এ ঝুঁকি লইতেই হইবে। ভারতবর্ষে কি হইতেছে?"

আমার ইংরেজ সহযাত্রী একটু অপ্রতিভ হইলেন এবং আমার দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করিলেন।

সমুদ্রে বিমান প্রস্তুত। আমরা নৌকায় চড়িয়া বিমানে উঠিলাম। সোঁ সোঁ শব্দে জল কাটিয়া বিমান গর্জ্জন করিয়া ছুটিল।

বিমানঘাঁটির অসমাপ্ত আলাপ বিমানে বসিয়া আবার সুরু হইল।

মার্কিন ভদ্রলোকটি বলিলেন, আমি দেখিয়াছি আমরা অন্যের মমতা বা সুখদুঃখ বুঝিতেই পারি না। অন্যের শাসিত দেশ আমরা ফিরিয়া দেখিয়াছি কিরূপে দেশবাসীগণ ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া গিয়াছে। তাহাদের শাসনব্যবস্থা তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ পন্থা। আমরা ত ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিতেছি। জানি না তাহাদের শাসন-ব্যবস্থা কত দূর সুফলপ্রদ হইবে।

ইংরেজ ভদ্রলোক—ফিলিপাইনই বলুন আর ভারতবর্ষই বলুন, ইহাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের এখন সবে শৈশবাবস্থা। দাঁত উঠা, কথা বলা প্রভৃতির সময়ে শিশুর যেরূপ বিপদ উপস্থিত হয় ইহাদেরও অগ্রগতির পথে মাঝে মাঝে বিপর্য্যয় হইবেই, তাহাতে ঘাবড়াইলে চলিবে না।

মার্কিন ভদ্রলোক—আমি একবার ত্রিনিদাদে গিয়াছিলাম। সেখানে জনৈক ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন, 'আমেরিকা যদি আমাদের ভার লইত তবে বড়ই ভাল হইত'। আমি বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'আমরা আমেরিকার হাতে আসিলে ডলার পাইতাম এবং ডলার পাইলে আমাদের অনেক সুবিধা হইত।'

আমি—তাঁহার যুক্তি অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অষ্ট্রেলিয়ান যুবকটি মার্কিন ভদ্রলোককে দক্ষিণ-আমেরিকা বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। মার্কিন ভদ্রলোক উত্তরে বলিলেন, আমরা উহাদের শাসন-ব্যবস্থায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি না।

অষ্ট্রেলিয়ান যুবক—উহাদের শাসনব্যবস্থা কি খুব সুনিপুণ?

মার্কিন ভদ্রলোক—না, তবে আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করি না। কারণ আমরা তাহাদের সমস্যা বুঝি না। আমরা শুধু তাহাদের সঙ্গে ব্যবসা করিতে চাই। সে কারণে রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই ভাল।

অষ্ট্রেলিয়ান যুবকটি সসম্ভ্রমে রুজভেল্টের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মার্কিন ভদ্রলোক—"হ্যাঁ, রুজভেল্ট একটি বড় যুদ্ধ বিশেষ রকমেই লড়িয়াছেন।"

মার্কিন ভদ্রলোকটির সকল কথাতেই তাঁহার রিপাবলিকান দলীয় মত পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল।

ভারত-মহাসাগরের উপর দিয়া বিমান সগর্জ্জনে ছুটিয়াছে। আমাদের নানা বিষয়ে আলাপ চলিতেছে। মার্কিন ভদ্রলোকটি একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি চীন হইয়া ভারতবর্ষে যাইব। ভারতবর্ষ হইতে স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ আমি কি কি জিনিস আনিতে পারি?"

আমি—"কলে তৈরি জিনিষে আমেরিকা অদ্বিতীয়। তবে হাতের কাজের নৈপুণ্য ভারতবর্ষে বিশেষ রূপে দেখিতে পাইবেন। গালিচা, রেশম ও পশমের উপর হাতের কাজ, হাতীর দাঁতের কাজ, সোনা-রূপার তারের কাজ, শ্বেত পাথরের কাজ প্রভৃতি আনিতে পারেন।"

সুনীল ভারত-মহাসাগরের উপর দিয়া উড়িতেছি। কতদূর আসিয়াছি খেয়াল নাই। মাত্র ৪০০০ ফুট উপর দিয়া ঘণ্টায় ১৩০ মাইল বেগে বিমান ছুটিতেছে। স্থানীয়

সময় বেলা ১টা ১০ মিনিটে ক্যাপ্টেন ঘটা করিয়া প্রচার করিলেন যে, আমরা ভূ-বিষুব রেখা অতিক্রম করিতেছি। প্রশান্ত মহাসাগরে ভূ-বিষুব রেখা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ গোলার্দ্ধে নামিয়াছিলাম। ভারত-মহাসাগরে পুনরায় ভূ-বিষুব রেখা অতিক্রম করিয়া উত্তর গোলার্দ্ধে উঠিতেছি। ক্যাপ্টেন প্রত্যেক যাত্রীকে একখানি করিয়া সুদৃশ্য ও সুন্দররূপে ছাপানো সার্টিফিকেট দিলেন। আমার সার্টিফিকেটে লেখা ছিল—"বরুণরাজের আদেশে শ্রীবিনয়-ভূষণ দাসগুপ্ত ভূ-বিষুব রেখার উপর দিয়া উড়িয়া স্বর্গ-সংস্পর্শজনিত পুণ্য অর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্ব পাপমুক্ত হইলেন। অদ্য হইতে তিনি স্বর্গীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন।" শীঘ্রই স্থল-সান্নিধ্য প্রকট হইতে লাগিল। দু-একটা চর দেখা গেল। কোন কোন চর এখনও জলের নীচে। কোন কোন চরে বিস্তর গাছপালা, তন্মধ্যে নারিকেল গাছের প্রাচুর্য্য। ক্রমশঃ সিঙ্গাপুর শহর দৃষ্টিগোচর হইল। দূর হইতে ঘর-বাড়ীগুলি সুন্দর দেখাইতেছিল। পোতাশ্রয়ে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা বিশেষরূপে প্রকটিত। চারিদিকে শতাধিক জাহাজ, তন্মধ্যে অনেকগুলি জলমগ্ন। গত যুদ্ধে পার্ল হারবার পর্য্যন্ত জাপানের রণতাণ্ডব চলিয়াছিল। পার্ল হারবার আজ নবকলেবর লাভ করিয়াছে। কিন্তু ডারউইন হইতে বরাবর ধ্বংসের চিহ্ন দেখিয়া আসিতেছি। কত জাহাজই যে জাপান ডুবাইয়াছিল তাহা কিছু কিছু অনুমান করিতেছি। কিন্তু কত দিনে যে এই সমস্ত অঞ্চল হইতে ধ্বংসের চিহ্নসমূহ অদৃশ্য হইবে তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না। বেলা প্রায় ২টায় (স্থানীয় সময়) সিঙ্গাপুরের সমুদ্রে বিমান নামিল। নৌকাযোগে তীরে উঠিলাম। কর্ম্মব্যস্ত বিমানঘাঁটির যাবতীয় বন্দোবস্তই বেশ ভাল। আমাদের ইংরেজ বন্ধুটির পত্নী তাঁহার স্বামীকে অভ্যর্থনা করিতে বিমানঘাঁটিতে আসিয়াছেন। তিনি আমাদের নিকট বিদায় লইয়া শহরে চলিয়া গেলেন। মার্কিন ভদ্রলোকটি এখানেই থাকিবেন। তিনিও হোটেলের সন্ধানে গেলেন। আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা বিমান-ঘাঁটির রেষ্টুরেন্টেই করা হইয়াছিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমাদিগকে যে হোটেলে লইয়া যাওয়া হইল তাহার নাম র‍্যাফেল হোটেল। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই হোটেলটি বৃহৎ ও সুদৃশ্য—বন্দোবস্ত ভাল। স্বাধীনতার উপাসকদের এই সেই পুণ্যভূমি যেখানে কিছুদিন পূর্ব্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া একটি ট্যাক্সি লইয়া শহর দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ট্যাক্সিওয়ালা পঞ্জাবী। শহরটি ভারতের পুরনো শহরের মতই মনে হইতেছে। কয়েকটি রাস্তা বেশ প্রশস্ত। বীচ্ রোডে ভ্রমণ উপভোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্মারক স্তম্ভটি স্বতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শহরটিতে চীনাদের সংখ্যা সমধিক। ভারতীয়ও যথেষ্ট। ভারতীয়দের মধ্যে পঞ্জাবী ও সিন্ধী বেশী দেখিতেছি। বোম্বাই বাজার, হিন্দু রোড, বাবু রোড, ইন্ড্রিস রোড প্রভৃতি নাম যেন পরিচিত। অরচার্ড রোড ও জালান বাসের রোড খুব চওড়া। দ্বীপের একাংশ পর্ব্বতসঙ্কুল, জনবিরল এবং বনবহুল। সেই দিকে গিয়া একটি চীনা প্যাগোডা দেখিলাম। প্যাগোডাটি পাহাড়ের উপর। তিনটি সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া প্যাগোডায় উঠিতে হয়। একটি কেন্দ্রীয় গম্বুজকে ঘিরিয়া পাঁচটি গম্বুজ। স্থানটি পরম রমণীয়। প্যাগোডা হইতে সমুদ্রের দৃশ্য সুন্দর। জায়গাটি এখন জনশূন্য। সুন্দর প্যাগোডাটি অরক্ষিত এবং মাঝে মাঝে ভগ্ন। ট্যাক্সিওয়ালা বলিল যুদ্ধের সময় জাপানীরা চীনাদের তাড়াইয়া দিয়া মন্দিরটিকে স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া দেয়। সেখান হইতে দ্বীপের পার্ব্বত্য অংশের দিকে চলিলাম। অদূরে সেনানিবাস। পাশে জাপ বন্দীনিবাস। অনেক জাপানী যুদ্ধবন্দী দেখিলাম। ঐ দিকে ঘুরিয়া পুনরায় শহরে প্রবেশ করিলাম। বোটানিক গার্ডেনে নামিয়া খানিক পায়চারি করিলাম। দুই ঘণ্টায় নগর ও দ্বীপ পরিক্রমা করিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

হোটেলে এক ঘরে আমাদের তিন জনের স্থান। অপর দুই জন ইংরেজ সাংবাদিক, ইঁহারা অষ্ট্রেলিয়া হইতে টেষ্ট ম্যাচের রিপোর্ট করিয়া দেশে ফিরিতেছেন। শেষ রাত্রে উঠিতে হইবে। আমি উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সাংবাদিকদ্বয়কে জাগাইয়া দিলাম। তাঁহারা দ্রুত তৈরি হইয়া লইলেন। সমুদ্রগর্ভ হইতে ৬-১৫ মিনিটে বিমান উড়িল। তখন আলোক ও অন্ধকার মিশিয়া আছে। ক্রমশঃ আলোক ফুটিয়া উঠিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূর্য্যোদয় দেখা গেল না। নীচে সাদা ধবধবে মেঘ। সোজা মলয় উপদ্বীপের উপর দিয়া সুনীল বৃক্ষাচ্ছাদিত সমতল ভূভাগ দেখা যাইতেছে। সাদা মেঘগুলি কোথাও খুব ফাঁকা, মনে হয় যেন মেঘখণ্ডগুলি গাছের মাথায় বসিয়া আছে। কোথাও মেঘরাশি অবিচ্ছিন্ন। চন্দ্রা-তপের নীচে যেন প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলা চলিতেছে। আমরা উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূল দিয়া চলিয়াছি। গতিবেগ ঘণ্টায় ১৬২ মাইল; উচ্চতা ৬৫০০ ফুট। নীচে ডাঙ্গায় এবং জলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট পাহাড়। মাঝে মাঝে জনবসতি দৃষ্ট হইতেছে। কোথাও কৃশাঙ্গী স্রোতস্বিনী চপল চরণে আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। কুয়ালা লামপুর অতিক্রম করিলাম ৭টা ৫০ মিনিটে। ইপি শহরের উপর দিয়া উড়ি-তেছি; রাস্তা ও ছোট ছোট নদী যেন সঙ্গে সঙ্গে সর্পিল গতিতে চলিয়াছে। রাস্তার উপর দিয়া মোটরগাড়ী ছুটিতেছে। বাড়ী-ঘরগুলি সাজানো। শহরে বড় টিনের কারখানা আছে। দশ মিনিট পরে আর একটি শহর অতিক্রম করিলাম। শহরটি ছোট ও সুন্দর। নাম শুনিলাম তাইপিং। পূর্ব্ব দিকে দূরে

পর্ব্বতশ্রেণী। পশ্চিমে অনতিদূরে সমুদ্র। একটি নদী যেন বিরাটকায় সাপের মত পড়িয়া আছে। বড় বড় রবার-বাগান দেখিতেছি। বাগানে গাছগুলি ব্যূহাকারে সাজানো। দেখিতে মনোজ্ঞ। মাঝে মাঝে সুন্দর কৃষিক্ষেত্র ও গ্রাম দেখা যাইতেছে।

বিমানে ষ্ট্রেট্‌স টাইম্‌স নামক একটি সংবাদপত্র আমাদিগকে পড়িতে দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধের পর ১২ পৃষ্ঠায় এই কাগজটি প্রথম বাহির হইয়া ঘোষণা করিতেছে যে, এখন হইতে প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার ১২ পৃষ্ঠা এবং অন্য দিন ৮ পৃষ্ঠা লইয়া বাহির হইবে। কাগজে দেখিলাম সিঙ্গাপুরে যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত সাত জন জাপানী অফিসারের বিচার চলিতেছে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে চাঙ্গী উপকূলে জাপানীরা যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড করিয়াছিল একজন চীনা আদালতে তাহার ভয়াবহ বিবরণ দিয়াছে। কৃষিজ রবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এবং কৃষিজ রবার ও রাসায়নিক রবারের গুণাবলীর তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে।

বিমান সগর্জ্জনে ছুটিয়াছে। স্থলভাগ ছাড়াইয়া সমুদ্রে পড়িলাম। ক্রমশঃ উপকূল হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। ১০টা ১৫ মিনিটে (সিঙ্গাপুর সময়) আবার "পকেট" নগরীর উপরিভাগে প্রবেশ করিলাম। পকেট সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের অর্দ্ধপথ বক্র উপদ্বীপের কুব্জের উপর অবস্থিত। শহরে প্রবেশ-পথের মুখে সমুদ্রের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ ও পাহাড় ছড়ানো। একটু পরেই আবার দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রে পড়িলাম। আর স্থলভাগ দৃষ্ট হইতেছে না।

ক্যাপ্টেন বলিলেন রেঙ্গুনে এখন পর্য্যন্ত ভাল হোটেলের ব্যবস্থা হয় নাই। বন্দরে যাত্রীগণের মাল পরীক্ষা করিবার জন্য কাষ্টমস্ কর্ম্মচারী নাই; তাহাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তার নাই। যাত্রীগণকে শহরে নামানো হইবে না। আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পরই বিমান রেঙ্গুন ত্যাগ করিবে এবং অদ্যই কলিকাতা পৌঁছিবে। শুনিয়া মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

পার্ল হারবার হইতে জাপানীদের কৃত ধ্বংসলীলার কথা শুনিতেছি এবং নিদর্শন দেখিতেছি। ধ্বংসের পর পার্ল হারবার আমেরিকার ধনবলে পুনরায় নবকলেবর লাভ করিয়াছে। কিন্তু সুরাবায়া, সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের এখনও বিধ্বস্ত অবস্থা। ডারউইনেও ধ্বংসের বহু নিদর্শন দেখিয়াছি। সুরাবায়া ও সিঙ্গাপুরে বহু জলমগ্ন জাহাজ দেখিলাম।

জাপান আজ পরাজিত। সিঙ্গাপুরে বহু জাপ যুদ্ধবন্দী দেখিয়াছি। সামরিক বিচারালয়ে জাপানীদের অত্যাচার-কাহিনী বিশদরূপে বর্ণিত হইতেছে। এক দিন জাপান ছিল এশিয়ার গর্ব্ব। অশ্বেতকায় জাতির দ্রুত উন্নতির উদাহরণস্বরূপে জাপান এশিয়ার মনে আশার এবং অষ্ট্রেলিয়ার মনে ভয়ের উদ্রেক করিয়াছিল। জাপানের প্রতাপবহ্নি আজ নির্ব্বাপিত। কিন্তু নিবিবার পূর্ব্বে পার্ল হারবার হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডের উপর জাপান যে স্বাধীনতা-স্পৃহার বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া দিয়াছে তাহা কখনও নির্ব্বাণ হইবার নয়।

দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের উপর দিয়া উড়িতেছি। সহসা একখানা নৌকা দেখা গেল। নীল জল ক্রমশঃ ঘোলা হইতে লাগিল। একটি জলমগ্ন চর দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ইহার পর ইরাবতী নদীর মোহানা। নদীর উপর দিয়া উড়িতেছি। উভয় কূলে পরিষ্কার জমি। মাঝে মাঝে বৃক্ষচ্ছায়াপ্রচ্ছন্ন গ্রাম। রেঙ্গুন নগরী দৃষ্টিগোচর হইল। বিমান নগরীর উপর দিয়া উড়িয়া গেল। সুন্দর শহর, সোয়েডাগো প্যাগোডার স্বর্ণশীর্ষ রৌদ্রে চকচক্ করিতেছিল। ইরাবতীর পার ধরিয়া উড়িয়া বিমান নদীবক্ষে অবতরণ করিল। তখন বেলা ১টা। আকাশ হইতে যে নদীকে অপরিসর দেখাইতেছিল তাহা প্রস্থে অন্ততঃ তিন মাইল হইবে। নদীবক্ষে বহু জাহাজ ও নৌকা। বিমান হইতে আমাদিগকে একটি মোটর-নৌকায় নামানো হইল। আমাদের লইয়া মোটর-নৌকাটি ইরাবতীবক্ষে আধ ঘণ্টা ঘুরিল। শেষে বিমানে ফিরিলাম। ১টা ৫০ মিনিটে বিমান পুনরায় উড়িল। রেঙ্গুন-সময় সিঙ্গাপুর-সময়ের এক ঘণ্টা পিছনে।

আজ ১৫ই মার্চ্চ শনিবার। বিগত ১লা অক্টোবর স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলাম, আজ আবার নিজের দেশে ফিরিতেছি। ছয় মাসে কত দেশ দেখিলাম। মহাকালের বিধানে পৃথিবীর কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহার কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করিলাম। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যে ঘটনাবলী দ্রুত আবর্ত্তিত হইতেছিল তাহাও বিদেশে বসিয়া শুনিতেছিলাম।

মহাযুদ্ধের ধাক্কা খাইবার পর পৃথিবী আজও তাল সামলাইতে পারে নাই—সামলাইতে বেশ কিছুদিন লাগিবে। পৃথিবী আজ নানা শক্তির দ্বারা মথিত ও আলোড়িত। এটম বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রুশিয়া তাহার নূতন আদর্শ, শক্তি এবং কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া পৃথিবীকে বিষম নাড়া দিতেছে। জার্ম্মানীসহ পূর্ব্ব-ইউরোপ আজ কঙ্কালসার। পশ্চিম ইউরোপ হৃতবল। ইংলণ্ড এক নূতন ক্ষেত্র রচনা করিয়া তাহার মধ্যে দাঁড়াইবার জায়গা খুঁজিতেছে। এ বিষয়ে তাহার উদ্যম ও কষ্টসহিষ্ণুতা সত্যই প্রশংসনীয়। ফ্রান্স আর দাঁড়াইবে কি না সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিতেছে। এশিয়ায় চীন গৃহযুদ্ধে পর্য্যুদস্ত; জাপান ভূমিশায়ী। পূর্ব্ব-এশিয়ায় গণজাগরণ দেখা দিয়াছে। কিন্তু সেখানে জনগণ দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত, শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত। পশ্চিম এশিয়া বৃহৎ শক্তিপুঞ্জের প্রত্যক্ষ ক্রীড়াভূমি; সেজন্য তত্রত্য দেশসমূহের পক্ষে স্বকীয় গৌরবে দেদীপ্যমান হওয়া দুরূহ। অষ্ট্রেলিয়ায় জীবনযাত্রার স্বচ্ছন্দতা সত্ত্বেও অশ্বেতজাতি-ভীতি তাহাকে কতকাংশে খর্ব্ব করিয়াছে। আমেরিকা ও কানাডাই এখন সগৌরবে গগ-

তন্ত্রের ধ্বজা উড়াইতেছে। সেখানে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ, স্বচ্ছন্দ, চিন্তাধারা অব্যাহত—শক্তি-বিকাশের পথ উন্মুক্ত।

ভারতবর্ষকে মাথা তুলিয়া স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে, গৃহযুদ্ধ বন্ধ করিতে হইবে, বহিঃশক্তির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ এড়াইয়া চলিতে হইবে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার পথ সুগম করিতে হইবে। আজ তাহার সম্মুখে সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত। ভারতমাতার ভবিষ্যৎ এখন তাঁহারই সন্ততিগণের কর্ম এবং আচরণের উপর নির্ভর করিবে। মহাকালের প্রচণ্ড আঘাতে আজ ভারতমাতার শৃঙ্খল খসিয়া পড়িতেছে। গৃহযুদ্ধের অবসান করাই এখন তাঁহার বড় সমস্যা। নেতাজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ, স্বদেশ-প্রত্যাগত আজাদ হিন্দ ফৌজের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান মিলনের বন্যা বহিয়াছিল। সুরাবর্দী ও সতীশ দাসগুপ্ত হাতে হাত মিলাইয়া কলিকাতার রাস্তায় হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত শোভাযাত্রায় নায়কত্ব করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন। ঐ দিন পাকিস্থানের জন্য মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হয়; কলিকাতার রাস্তায় হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমানের রক্তে তাহাদের মিলন-আন্দোলন ভাসিয়া যায়। ইংরেজ বলিতেছে, ১৯৪৮এর জুন মাসের মধ্যে তাহারা ভারত ছাড়িবেই। মুক্তি আসিতেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু কোন্ পথে আসিবে, কি রূপ লইয়া আসিবে, ভারতমাতার দেহ খণ্ডিত হইবে, না অখণ্ডিতই থাকিবে—ইত্যাদি নানা সমস্যা ও সংশয় আজ ভারতবাসীর মনকে আলোড়িত করিতেছে।

ভারতবর্ষের একটি স্বকীয় চিন্তাধারা আছে। ব্যক্তিগত চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত রাখিতে ভারত চিরকাল চেষ্টা করিয়াছে। ইহারই ফলে বহু চিন্তাধারার সামঞ্জস্যসাধনেও তাহার প্রতিভা অতুলনীয়। স্বাধীন-চিন্তার সহিত সমাজ-বন্ধনের দৃঢ়তা ভারতে এক সময়ে বিশেষরূপে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আজ তাহার চিন্তা শক্তি পরাধীন, সমাজ পঙ্গু। সমাজের বন্ধন রহিয়াছে, কিন্তু জীবনাদর্শ নাই; বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আছে, কিন্তু সু-প্রয়োগ নাই। চিন্তাশক্তি স্বকীয় মূল উৎস হইতে বিচ্যুত হইয়া মৌলিকত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। ব্যক্তি হিসাবে ভারতবাসী ইংরেজ বা মার্কিন হইতে হীন নয়। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে সম্পূর্ণরূপেই ভারতবাসী ইংরেজ বা মার্কিনের সমকক্ষ। কিন্তু ভারতবাসী আজ স্বধর্মচ্যুত; কাজেই তাঁহার সংগঠন নাই, সাফল্য নাই। আমাদের ছেলেরা যে কোন দেশে পরীক্ষায় ভাল ফল করে, কিন্তু জীবনের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে হটিয়া যায়।

পাশ্চাত্য ডিমোক্রাটিক বা গণতান্ত্রিক সমাজের কয়েকটি বিশেষত্ব স্বতঃই চোখে পড়ে। প্রথমতঃ সুযোগ-সাম্য। সকলেই অন্ততঃ ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত লেখাপড়া করিবার সুযোগ পায়—পরবর্তী শিক্ষা জীবনযাত্রার সহিত সমতালে চলে। বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার দিকে কম ছাত্রই যায়। বরং আমাদের দেশেই উচ্চ শিক্ষার পিছনে বেশী ছাত্র ছুটে। বি-এ, এম-এ পাস করা কেরাণী আমাদের দেশ ছাড়া অন্য কোথাও দেখি নাই। আমাদের দেশের শিক্ষা জীবনযাত্রার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারায় আমাদের শিক্ষিত সমাজ সাধারণ সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। উভয় সমাজের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

পাশ্চাত্য ডিমোক্রাটিক সমাজে দারিদ্র্যের তাড়না কম। মোটা ভাত, মোটা কাপড় প্রায় সকলেরই আছে। ধনী নির্ধন অবশ্যই আছে, কিন্তু নিরন্ন বিরল এবং কেহই আশাহীন হইয়া জীবন আরম্ভ করে না।

ইহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সততা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছি। লণ্ডনের হোটেলে ব্যাগ ফেলিয়া আসিয়াছি, কেহ স্পর্শও করে নাই। ওয়াশিংটনে বাস-যাত্রীগণের নিকট কেহ টিকিট দিয়া পয়সা আদায় করে না; যাত্রীরা নিজেরাই নির্দ্দিষ্ট বাক্সে পয়সা ফেলিয়া দিয়া যায়।

খাদ্য বিষয়েও ইহাদের অনেকটা সমতা দেখিয়াছি। মাছ, মাংস, তরকারি, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য—ইহাই সর্ব্বত্র মানুষের খাদ্য। কিন্তু আমাদের দেশে রান্নার বিভিন্নতা অফুরন্ত। পাশ্চাত্য দেশে সাধারণতঃ সিদ্ধ ও ভাজার মধ্যেই রান্না সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ লোকেই হোটেলে খায় বলিয়া খাদ্য-বিষয়ে রুচির পার্থক্যও কম। আমাদের প্রতি পরিবারেই খাদ্যের পার্থক্য। এমন কি একই পরিবারে এক এক জনের এক এক রকম খাদ্য।

ইহাদের সমাজ-ব্যবস্থায় বিশেষ জটিলতা দৃষ্ট হয় না। পরিবার বহুপ্রসারী নয়, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। পিতাপুত্রের সম্পর্কও অত্যন্ত স্বল্পপরিসর।

সাধারণ লোকের চিন্তাধারা জটিলতাশূন্য। ইহারা সব জিনিসের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান খোঁজে না। নিরামিষ বা আমিষ আহারের আধ্যাত্মিক মূল্য বিচার করে না। অত্যন্ত জীবনধারা স্ব স্ব রুচি অনুসারে সহজ ভাবে অনুসরণ করিয়া যায়। এই সমস্ত কারণেই সে সব দেশে "স্নবারি" বা সামাজিক ভেদবুদ্ধি-মূলক অভিমান কম। আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ায় ধনী নির্ধন একই কেফেটেরিয়ায় বসিয়া একই খাদ্য পরমানন্দে ভোজন করে।

ইহাদের যানবাহনেও রকমারি কম। রাস্তায় শুধু বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত গাড়ী বা মোটরগাড়ীই চলিতেছে। আমাদের দেশে একই রাস্তায় রিক্সা, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, মোটর গাড়ী ও ট্রাম গাড়ী ভিড় করিয়া চলিয়াছে। ফলে প্রত্যেকের গতিবেগ ব্যাহত হইতেছে এবং রাস্তার শৃঙ্খলাও বজায়

থাকিতেছে না। ইহা যেন আমাদের সমাজেরই অনুরূপ। সেখানে বৈদিক সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ ভিক্ষু, চার্ব্বাকপন্থী, গোঁড়া মুসলমান ও উগ্র আধুনিকপন্থী একত্র ভিড় করিয়া ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করিতেছে।

এত দারিদ্র্য, এত অসাম্য ও এত জটিলতা যাহাতে আমাদের দেশে ডিমোক্রাসির পরিপন্থী হইয়া না উঠে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহার সঙ্গে রহিয়াছে আমাদের ব্যক্তিগত অধৈর্য্য ও কর্ম্মবিমুখতা এবং সমাজে জীবনীশক্তির অভাব। শিক্ষিত সমাজের সহিত সাধারণ সমাজের যোগ নাই। ফলে শিক্ষিত সমাজ স্বীয় বুদ্ধিতে অতিরিক্ত বিশ্বাসী এবং সাধারণ সমাজের বুদ্ধিতে আস্থাহীন। এরূপ অবস্থা ডিক্টেটরশিপের অনুকূল। ডিমোক্রাসি সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে আস্থাবান। ডিক্টেটরশিপের উৎস একটি, ডিমোক্রাসির উৎস অগণিত। সেইজন্য পরস্পরকে বুঝিবার চেষ্টা এবং পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা ডিমোক্রাসির সাফল্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক। চুলচেরা বিচার করিয়া পদাধিকার বলে স্ব-স্ব ক্ষমতার সম্পূর্ণ প্রয়োগ ডিমোক্রেসির পরিপন্থী। স্বেচ্ছায় স্বক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া অন্যের দাবি মানিতে হইবে; প্রত্যেকের প্রাপ্য সম্মান প্রত্যেককে স্বেচ্ছায় দিতে হইবে, ব্যক্তি, আইন-সভা এবং বিচারালয়ের পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে হইবে—ইহাই ডিমোক্রাসির নিয়ম। যদি আমরা ডিমোক্রাসি চাই তবে এ নিয়ম আমাদিগকে মানিতেই হইবে। ভারতবর্ষে এরূপ শিক্ষার অভাব ছিল না। আবার কি আমরা সেই শিক্ষা ফিরাইয়া আনিয়া ভারতমাতাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব?

এইরূপ নানা চিন্তায় মন আলোড়িত হইতেছে। বিমান রেঙ্গুন ছাড়িয়া সগর্জ্জনে ছুটিয়াছে। রেঙ্গুন ছাড়িবার ২০।২৫ মিনিট পরে নদীতীরে সুন্দর একটি ছোট শহর অতিক্রম করিয়া কিছুক্ষণ উপকূল ধরিয়া উড়িয়া সমুদ্রে পড়িলাম। উপকূল অদূরেই রহিল—মাঝে মাঝে চর। আমরা ১১০০৭ ফিট উঁচু দিয়া উড়িতেছি। ক্রমশঃ উপকূল-ভাগ অদৃশ্য হইল। চারিদিকে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র বিরাট একখানি পাতের মত পড়িয়া আছে। গৃহগামী মন চঞ্চল কালকেও পিছনে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে চাহিতেছে। সমুদ্রের মধ্যে আবার দু-একটি চর দেখা দিল। তরঙ্গিণীগণ সহস্র ধারায় সমুদ্রে মিলিত হইতেছে। সুন্দর সবুজ বনানী। মাঝে মাঝে গৃহস্থদের ঘরবাড়ী। প্রত্যেক বাড়ীতে বিস্তৃত পরিষ্কার প্রাঙ্গণ। ধানের মরাই দেখা যাইতেছে। মাঝে মাঝে পুকুর। দৃশ্য দেখিয়া মন যেন ভরিয়া উঠিতেছে। নীচেকার নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী যেন মাথা নাড়িয়া আমাকে নীচে ডাকিতেছে। বনের এত শোভা, জলের এত নির্ম্মলতা এবং গৃহস্থ-কুটিরের এত পবিত্রতা তো কোথাও দেখি নাই। দ্রুত কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি। হিমাদ্রিশিখর হইতে নামিয়া আসিয়া শত তরঙ্গিণী যেখানে সিন্ধুর সঙ্গে মিলিতেছে সেই মিলন-লীলাক্ষেত্র দিগন্তের অন্তরালে মিলাইয়া গেল। বিমান গর্জ্জন করিয়া ছুটিতেছে। কলিকাতায় তখন বেঙ্গল টাইম চলিতেছে। দমদম বিমানঘাটির উপর দিয়া উড়িয়াবিমান পাঁচটায় গঙ্গার উপরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিকটেই বালি ব্রিজ ও দক্ষিণেশ্বরের শ্রেণীবদ্ধ শিবমন্দির। ভক্তিভরে মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম। অদূরে কলিকাতার সৌধশ্রেণী ও হাওড়া পোল। গঙ্গা-বক্ষে শত শত নৌকা ও ষ্টীমার। সবেগে জল ছিটাইয়া বিমান গঙ্গাবক্ষে অবতরণ করিল। বিমান হইতে নৌকায় নামিতেই দেখি অনতিদূরে গঙ্গার পশ্চিম তীরে দণ্ডায়মান আমার দাদা, বৌদি, ভাইয়েরা, পুত্র-কন্যাগণ, আমার চারি বৎসরের ভাইপো দীপু, বন্ধুবর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং তাহাদের সঙ্গে আমার রোগম্লানা পত্নী।

বর্ত্তমান শিক্ষা-সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, এম্-এ, বি-টি

আমাদের দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে; কাজেই আমাদের শিক্ষা-সমস্যার দিকে কর্ত্তৃপক্ষের ও জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে পড়েছে। এ অতি শুভ লক্ষণ। শিক্ষাই যে জাতির সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে, দেশের শিশুদের যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া না হলে, সে দেশের কোন বিষয়েই উন্নতি যে হতে পারে না—এ সত্য সর্ব্বজনবিদিত; তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রচলিত বহু ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ, শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সবাই এত সজাগ হয়েছেন আর চারদিকে নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনায় তোড়জোড় পড়ে গিয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষা বিষয়ে মহামনীষী রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার কিছু সন্ধান করলে আমরা অমূল্য সম্পদলাভ করতে পারি। অনন্যসাধারণ প্রতিভা, স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও 'বিশাল প্রাণ' কবিগুরুর থাকায়, তিনি এমন এক ব্যাপক, উদার ও স্বচ্ছ দৃষ্টি পেয়েছিলেন যা দিয়ে তিনি সব বিষয়কেই খুব তলিয়ে অতি স্বচ্ছভাবে দেখতে পেতেন, আর সকলের ওপর এক নূতন আলোকপাত করতে পারতেন। তাই শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নানাবিধ লেখা ও বক্তৃতা আলোচনা করলে আমরা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-সমস্যা কি, আর তার

সমাধানের উপায়ই বা কি, তা ভাল করে জানতে পারব, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শিক্ষাবিষয়ে কবিগুরুর আদর্শ তাঁর নিজ হাতে গড়া শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ও বিশ্বভারতীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই অভিনব শিক্ষায়তনগুলোর পরিচালনার জন্যে এখানকার প্রধান প্রধান কর্মীর নিকট নানা উপদেশ দিয়ে বিভিন্ন সময়ে যে সব চিঠিপত্র কবিগুরু লিখেছিলেন তা পাঠ করলে আমরা যেন একটা নূতন আলো দেখতে পাই, যা আমাদের বর্তমান সমস্যা সমাধানে খুবই কাজে লাগবে, মনে হয়।

কবিগুরুর মতে শিশুর হৃদয়-মুকুলকে পূর্ণ বিকশিত করা, অর্থাৎ তার মধ্যে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের সাহায্য করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। এ শিক্ষাদানের পক্ষে শান্তস্নিগ্ধ প্রকৃতির সংস্পর্শ বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাই রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতনের ছাত্রেরা পায় প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ, যা শিক্ষাকে করে তুলে সরস ও সজীব। কবির ভাষায় বলি, "এখানকার (শান্তিনিকেতনের) এই প্রভাতের আলো শ্যামল প্রান্তর গাছপালা যেন শিশুদের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্য্য তরুণ চিত্তে আনন্দ সঞ্চারের দরকার আছে, বিশ্বের চারদিককার রসাস্বাদ করা ও সকালের আলোয় সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনা থেকেই হতে থাকে। আমি চেয়েছিলুম যে তারা অনুভব করুক যে বসুন্ধরা তাদের ধাত্রীর মত কোলে করে মানুষ করছে—তারা শহরের যে ইঁট কাঠ পাথরের মধ্যে বর্দ্ধিত হয় সেই জড়তার কারাগার থেকে তাদের মুক্তি দিতে হবে।...কারণ বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে তাতে করে শিশুচিত্তের বিষম ক্ষতি হয়েছে।" তাই প্রকৃতির একান্ত উপাসক কবিগুরু বলছেন, 'আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয়, তবে লোকালয় হইতে দূরে, নির্জন মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই।'

শিশুর এই শিক্ষালাভ যদি উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যেই এতটা হতে পারে, তবে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা কি? এ প্রশ্নের উত্তরও কবিগুরুর লেখার মধ্যে সুন্দরভাবে রয়েছে। তিনি লিখছেন, 'যদি তাঁর (শিক্ষকের) জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতে হয় তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণসাধন করিতে হয়, তবেই তিনি (শিক্ষকের) গৌরবলাভ করিতে পারেন।' শিক্ষক হবেন সত্যকার জ্ঞানানুরাগী। তাঁর জ্ঞানের সাধনা ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করে তুলবে। রবীন্দ্রনাথ একচিঠিতে লিখছেন, "জ্ঞানের সাধনার গুরু ও শিষ্যের গভীর যোগ, কেন না উভয়েই ছাত্র।" একথাগুলোর মধ্যে কত গভীর সত্য নিহিত রয়েছে! ইহা প্রত্যেক শিক্ষকের প্রণিধান করার যোগ্য।

এ হেন শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আত্মীয়তা যখন গড়ে উঠবে, শিক্ষকের স্নেহসিক্ত প্রাণের স্পর্শে। 'শিশুর মন মোটেই জড় পদার্থ নয়। এ হচ্ছে অত্যন্ত সচল ও সজীব জৈব পদার্থ, এর উদ্বোধন করতে হবে স্নেহ ও মমতাভরা সোনার কাঠির স্পর্শ দিয়ে।'

শিক্ষকের আর একটি বড় গুণ তাঁর অসীম ধৈর্য্য। ছাত্রের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ থাকলে ধৈর্য্য অবশ্যি আপনা হতেই আসবে। তাই কবিগুরু শান্তিনিকেতনের জনৈক অধ্যাপককে এক পত্রে লিখছেন, "একে একে ছেলেদের হৃদয়কে উদ্বোধিত করিয়া দিবার যে চেষ্টা করিতেছেন তাহাই বিদ্যালয়ের যথার্থ কাজ। মানুষের কল্যাণ করিতে অসীম ধৈর্য্যের প্রয়োজন। কাহারও আশা পরিত্যাগ করিবেন না—ফল পাই বা না পাই প্রত্যেক ছাত্রের প্রতিই আমাদের চিত্তকে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিতে হইবে। ইহাই আমাদের তপস্তা।" কবিগুরুর এই বাণী শিক্ষকদের মধ্যে এক নূতন উদ্যম ও প্রেরণা এনে দেয়, সন্দেহ নাই।

উদার, উন্মুক্ত প্রকৃতির পরিবেশে ও আদর্শ শিক্ষকের সাহচর্যে, আনন্দের ভিতর দিয়ে, প্রাণ ও মনের বিকাশ ও রস সঞ্চার হয়। এই পরিবেষ্টনের মধ্যে ছাত্র ও শিক্ষকের একটা মধুর, পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে যায়—ছাত্রদের নিয়মশৃঙ্খলা মানাবার জন্যে কোন বেগই পেতে হয় না। নিয়মশৃঙ্খলাবোধ যাতে আরও সহজ হয়, তার জন্যে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের হাতে যথাসাধ্য কর্তৃত্ব দিতে বলেছেন। এ বিষয়ে তিনি লিখছেন,

"বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্বন্ধ ভিতরকার সম্বন্ধ যেন হয়ে ওঠে—এতে যদি কিছু অসুবিধাও ঘটে তবে সেও স্বীকার করে নিতে হবে—ছাত্রদের কাজেকর্মে শাসনে জাগরণে চালনাটাই যেন বড় হয়ে না ওঠে, সাধনাটাই বড় হয়। ছাত্রেরা যেন অনুভব করে যে, তারাও বিদ্যালয়কে গড়ে তুলছে, জানে যে তারা এর প্রাণ। তাই বিদ্যালয়ের নানাপ্রকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের নিজের ইচ্ছা চালনার বহুবিধ উপায় করে দেওয়া কর্তব্য, নানাপ্রকার কাজে তাদেরও সম্মতির স্থান থাকা চাই। তাই সমস্ত জিনিস গড়ে তোলবার ভার তাদের হাতে দিতে থাক—কেন না গড়ে তোলাই যে একটা মস্ত শিক্ষা।...ভুল করতে দাও, তাহাতেই ভুল সমূলে নষ্ট হবে।" কবিগুরুর এই অমূল্য উপদেশ সকল শিক্ষাবিদের, বিশেষতঃ শিক্ষকবর্গের, প্রচুর চিন্তার খোরাক জোগাবে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর একটি প্রধান দোষ এই যে 'ইহাতে প্রাণ ও মনের বিকাশ হয় না, কল্পনাশক্তি সৃষ্টিকার্য্যচর্চায় ব্যবহৃত হয় না, মন অপরিণত থেকে যায়,

বুদ্ধি, উদ্ভাবনীশক্তি কিছুরই স্ফূর্তি হয় না।' কেন এমন হয়, তা কবিগুরু আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ফলে ভাবা শিক্ষার সঙ্গে ভাবগ্রহণ হয় না, চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি,—জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে যে দুইটি অত্যাবশ্যক—তার বিকাশের সহায়তা করা হয় না; কাজেই জীবনকে নিয়মিত করবার মত মূল, কলেজের শিক্ষা থেকে বড় একটা কিছু পাওয়া যায় না। এর ওপরে, কোনও প্রকারে একজামিনে পাস দিয়ে, চাকরী পাওয়ার যোগ্যতালাভ করার জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন—শিক্ষার উদ্দেশ্যকে এরূপ সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত করায়, ফলে সে শিক্ষা একটা ব্যর্থতা এনে দেয়। কেন না, তা জীবনের সত্য-কারের প্রয়োজনে লাগে না। এই ব্যর্থতা দূর করবার জন্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কবিগুরু বহু পূর্ব্বেই বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। তাঁর মতে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের যথাযথ অনুশীলন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের অমিল দূর হবে, পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে। তিনি আরও বলেছেন যে, জীবনযাত্রার নানা সমস্যা ছাত্রদের কাছে উপস্থিত করে তার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করা চাই। গ্রামের নানা সমস্যা—অর্থনৈতিক বা সামাজিক—তা সব সাক্ষাৎভাবে জেনে, তার সমাধানের উপায় চিন্তা করা চাই। ক্লাসের শিক্ষার চেয়ে এগুলো বড় শিক্ষা, একথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টবাক্যে বলেছেন। 'গ্রামবাসীর সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের যোগে সেবার সম্বন্ধ রাখা আবশ্যক। এই ব্রতীকৃত্য শিক্ষা আমাদের অন্য কোন শিক্ষার চেয়ে কম গুরুতর নয়।'

ক্লাসে শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক কিরূপে ছাত্রের স্বাধীন চিন্তার বিকাশসাধন করবেন তার কিছু ইঙ্গিতও কবিগুরুর এই লেখার মধ্যে পাই।

"ছাত্রেরা যেটুকু শিখবে তার সঙ্গে সঙ্গেই সেটুকু প্রকাশ করবার সাধনা প্রতিদিনই করা চাই। শুধু তাই নয়, ছাত্রদের ভাবাতে হবে। এমন কি তারা যদি পুঁথিগত বিষয় সম্বন্ধে সাহস করে প্রতিবাদ করতে পারে তা হলেই বুঝব তাদের যথেষ্ট শিক্ষা হচ্ছে। পুঁথি যেন মনের ওপর আধিপত্য না করে, মনই পুঁথির ওপর আধিপত্য করবে।"

এমনি করে বিদ্যার্জন করলে বিদ্যা ও ব্যবহারের মধ্যে—শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে—দুর্ভেদ্য ব্যবধান দূর হয়ে যাবে, শিক্ষালাভ সার্থক হবে।

আজকাল বনিয়াদি শিক্ষার কথা খুব শুনা যাচ্ছে। এই শিক্ষার একটি মূল নীতি হচ্ছে এই যে, মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল শক্তির মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ আছে। পরস্পরের সহযোগিতায় তারা শক্তিলাভ করে। এ ত কবিগুরুরই কথা—বহুকাল আগেই তিনি লিখে গিয়েছেন। তাই নানাবিধ হস্তশিল্প শেখা, শিক্ষার সম্পূর্ণতার জন্য যে আবশ্যক—এ মত কবিগুরু পোষণ করতেন। তাঁর এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন,

"আমার মত এই যে, আমাদের আশ্রমের প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোন না কোন হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ ক'রে দেওয়া চাই। হাতের কাজ শিক্ষাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আসল কথা, এই রকম দৈহিক কৃতিত্ব চর্চ্চায় মনও সজীব সতেজ হয়ে ওঠে। যেসব ছেলেকে আমরা নির্ব্বোধ বলে মনে করি তাদের অনেকেরই সুপ্তচিত্ত এই দৈহিক কর্ম্মদক্ষতার সোনার কাঠির স্পর্শ অপেক্ষা করে আছে। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ ক'রে নেয়। তা ছাড়া যার দেহ শিক্ষিত হয় নি সে যত বড় পণ্ডিতই হোক, সংসারক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত হয়ে জীবনধারণ করতে হয়—সে অসম্পূর্ণ মানুষ। এ অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকেই বাঁচাতে হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বনিয়াদি শিক্ষার মূল তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্ব্বেই বলে গিয়েছেন। অবশ্য এই মূল নীতির প্রয়োগ কি প্রণালীতে করতে হবে, সে স্বতন্ত্র কথা।

প্রাণ ও মনের শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণ বিকশিত করতে—সম্পূর্ণ মানুষ তৈরী করতে—মানুষের কোমল বৃত্তিগুলোর জাগরণের যে একান্ত প্রয়োজন, তা কবিগুরু ভাল করেই জানতেন, তাই সুকুমার শিল্পচর্চ্চা, বিশেষতঃ ছবি ও গান তাঁর বিদ্যালয়—শান্তিনিকেতনে এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে।

ধর্ম্মশিক্ষাও শিক্ষার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে কবি-গুরু মনে করতেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর কথায় বলি, "রবীন্দ্রনাথের জগৎ ভগবান, মানুষ ও প্রকৃতি মিলে। এই তিন সত্য সম্বন্ধেই ছাত্রদিগকে সচেতন করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য ছিল।" শিশুটা একেবারে স্বাভাবিকের সঙ্গে মিশ খাওয়াবার সময় ও সুবিধা শিশুদের দিতে হবে, এই ছিল তাঁর বাণী। স্বভাবের নিয়মের মধ্যে থাকলেই শিশুরা আনন্দে, অবাধে বিকশিত হতে পারে, তাতে তাদের দেহের ও মনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় তাদের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা হয়। এর পরিবর্ত্তে ধর্ম্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে কতকগুলো নীতি-শিক্ষা দেওয়ার কবিগুরু ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে 'এতে সৎকথাকে বিরস ও বিফল শুধু করা হয়', তার ফল মনুষ্যসমাজের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। তাই তিনি বলেছেন,

"জীবনের আরম্ভে মনকে, চরিত্রকে গড়ে তোলার সময় উপদেশ নহে, অনুকূল অবস্থা এবং অনুকূল নিয়মই সকলের চেয়ে বেশী আবশ্যক।"

এই অনুকূল অবস্থা এবং অনুকূল নিয়ম বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে; দেখিয়ে দেবার জন্যে চাই উপযুক্ত শিক্ষক, উপযুক্ত পরিবেশ।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা আজ যেমন প্রকট হয়ে উঠেছে, এর আগে এতটা কোন কালেই ছিল না; তার কারণ ভারতে ইংরেজ শাসনের লোপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের, তথা পাশ্চাত্ত্যের, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে যেন আমরা অস্বীকার না করি। বিশ্বের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতই মহাসমন্বয় ঘটাবে, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের বাণী; সেই আদর্শ নিয়ে তিনি বিশ্বভারতী গড়ে তুলেছেন, এবং আজ এই বিশ্বভারতী হয়ে উঠেছে বিশ্বের সংস্কৃতির মহামিলনতীর্থ। কবিগুরুর অনন্যকরণীয় ভাষায় বলি,

"সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই—যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য করতে যার কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই, যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা করে সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা।"

শিক্ষাক্ষেত্রে কবিগুরুর মহান্ আদর্শ ও ভাবধারা আমাদের হৃদয় ও মনকে নিশ্চয়ই উদ্বুদ্ধ করবে, আর আমাদের নানাবিধ শিক্ষাসমস্যার সমাধানে এক নূতন আলো দেখাবে, সন্দেহ নাই।*

* এই প্রবন্ধ লিখতে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত কবিগুরুর বিভিন্ন পত্রাবলী থেকে বিশেষ সাহায্য লওয়া হয়েছে—প্রবন্ধ-লেখক।

ইতিহাস-শিক্ষা

এস. এম. ছদরুদ্দিন

১

ইতিহাস কালের সাক্ষী। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাঁধা পড়ে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। একে বলা যেতে পারে মানুষের জীবন-বেদের টীকা, সভ্যতার দলিল। মানুষের জীবন, কর্মাবলী ও তার সভ্যতার ধারা বুঝতে হলে ইতিহাসের শরণাপন্ন হতেই হবে।

অনেকে ইতিহাসকে মৃত অতীত বলে উপেক্ষা করতে চান। তাঁদের মতে বর্তমানই আসল, অতীতকে ভুলে গেলেও চলে। কিন্তু আসলে তা নয়। অতীতকে ভিত্তি করেই জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে। যাদের অতীত নেই, তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নেই বললেই চলে। গৌরবোজ্জ্বল অতীত মানুষের মনে আনে কর্মপ্রেরণা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাই তার দৃষ্টি থাকে সজাগ। অতীত যাদের নেই তারা সামনে পিছনে কোন দিকেই তাকাতে পারে না। দৃষ্টি তাদের সীমাবদ্ধ, কর্মপ্রেরণাও তথৈবচ।

পৃথিবী পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই পরিবর্তন মোটেই আকস্মিক নয়। বিচিত্র ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত এই পরিবর্তনের জনয়িতা। ইতিহাস-পাঠেই ছাত্রগণ বুঝতে পারে যে, বর্তমানের জন্ম হয় অতীতের গর্ভে এবং ভবিষ্যতের ভিৎ রচিত হয় বর্তমানের উপর। ঘটনাধারা সহজেই এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে সংক্রমিত হতে পারে। মানব-মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং জাতির উত্থানপতন তাদের নিজ নিজ কর্মধারা সূচিত ও সাধিত হচ্ছে। যুগে যুগে ইতিহাসের হচ্ছে পুনরাবৃত্তি। জয়চাঁদ যে ভুল তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে করলেন, দৌলত খাঁ তাই করলেন পাণিপথে—মীরজাফর ও উমিচাঁদ পলাশী-প্রান্তরে। নেপোলিয়নের যেভাবে পতন হ'ল, ঠিক সেই ভাবেই হ'ল হিটলারের পতন। ইতিহাস তাই শুধু গল্পই বলে না, অতীতের কাহিনীর ভিতর দিয়ে সে বর্তমানকে ফুটিয়ে তোলে, ভবিষ্যতের পথ-চলা সহজ করে তোলে। এইখানেই পুরাতন ও নূতন পদ্ধতিতে ইতিহাস শিক্ষাদানের পার্থক্য। পুরাতন ধরণের ইতিহাস-শিক্ষা ছিল ঘটনাসর্বস্ব, যুক্তিবিচারবর্জিত। বর্তমান ইতিহাস-শিক্ষাপদ্ধতি ঘটনার উপর ততখানি জোর দেয় না, যতখানি দেয় যুক্তিবিচারের উপর।

ইতিহাস মহাকালের ইঙ্গিত ও সতর্কবাণী। অতীতের বুকে দাঁড়িয়ে সে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে, আর উচ্চারণ করছে মানুষের জন্য সাবধান-বাণী। ইতিহাস ঠিকমত পাঠ করলে বুদ্ধির প্রাখর্য্য, জ্ঞানের পরিসর বাড়ে ও বিচারশক্তি পরিপক্কতা লাভ করে। ইতিহাস-পাঠের উদ্দেশ্যও তাই। কিন্তু তাই বলে "শিক্ষক যেন ইতিহাস-পাঠকে ধর্মোপদেশে পরিণত না করেন। ছাত্রেরা যেন বিচারাসনে বসে জাতিকে ও অতীতের মহাপুরুষদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার করবার প্রয়াস না পায়।...কষ্টকল্পিত উপদেশের পরিবর্তে ছাত্রেরা বীরত্বের মহিমা, নিঃস্বার্থপরতা ও বিশ্বস্ততার মর্য্যাদা, নৃশংসতা ও কাপুরুষতার গ্লানি মনে-প্রাণে উপলব্ধি করবে। ইতিহাসের ঘটনা তারা হয়ত ভুলেই যাবে, কিন্তু

ইতিহাস-পাঠের প্রভাব কাজ করতে থাকবে ঘটনা ভুলে যাবারও বহু পরে।"১

ইতিহাসের ইঙ্গিত ও সতর্কবাণী বুঝতে হলে কল্পনা ও চিন্তা-শক্তির কিঞ্চিৎ প্রয়োজন। এগার-বারো বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এ দুটোর পূর্ণ-বিকাশের আশা করা যায় না। কাজেই পঞ্চম শ্রেণীর পূর্ব্বে সত্যিকার ইতিহাস-পাঠ আরম্ভ করা সম্ভবপর নয়। এইজন্য প্রথম দিকে চিন্তা ও কল্পনার খোরাক হিসাবে শিশুকে গল্প ও উপকথার আশ্রয় নিতে হবে। এর ভিতর দিয়েই তাদের ঐতিহাসিক বোধ ও রুচি গড়ে উঠবে। ছাত্রমনকে এর জন্য ধাপের পর ধাপ প্রস্তুত করতে হবে।

মানুষ বীর-পূজারী—বিশেষ করে মানবশিশু। বীরাঙ্গনা ও বীরপুরুষদের রোমাঞ্চকর বীরত্ব-কাহিনী তার কল্পনাকে দোলা দেয়। সেজন্য ইতিহাসের প্রথম পাঠ হবে দেশ-বিদেশের অতীত ও বর্ত্তমান বীরপুরুষদের জীবন-কথা। শিশুর বয়স যত কম হবে, গল্পে সেই পরিমাণে রোমাঞ্চকর উপাদানও রাখতে হবে তত বেশী করে। সাধারণ মানুষের একঘেয়ে জীবন শিশু-মনে সাড়া জাগায় না। রঙচঙে পোশাকের মত শিশুর জন্য চাই উদ্দীপনাপূর্ণ রোমাঞ্চকর চরিত্র। বর্ত্তমান অপেক্ষা অতীতই এই উপকরণের জন্য অধিকতর প্রশস্ত। অতীতের বীর ও বীরাঙ্গনাদের কাহিনী রূপ-কথার মতই হৃদয়গ্রাহী। এই জন্য স্বাভাবিক নিয়মে এগুলিই শিশুমনে প্রভাব বিস্তার করে। এ বয়সে ইতিহাস ও রূপ-কথার মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা টানা নিষ্প্রয়োজন, এমন কি গল্পগুলিকে বিশেষ দেশ, জাতি অথবা যুগের মধ্যেও সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। শিশুর প্রথম পাঠ্য-ইতিহাস হবে তার খেলাঘরের মতই টুকিটাকি রঙচঙে জিনিষ দিয়ে রচিত। এখানে সকল দেশের, সকল কালের, এমন কি সকল জাতির দু'চারটে রূপ-কথা ও ঐতিহাসিক গল্প নির্ব্বিবাদে গলাগলি ভাবে থাকতে পারে।

রূপ-কথার রাজ্যর থেকে আস্তে আস্তে শিশুকে ইতিহাসের প্রাণলীলা-ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে হবে। উপাখ্যান-ভাগ ও বিষয়-বস্তু সর্ব্বস্তরে শিশুর উপযোগী হওয়া চাই। শিশুরা যা ভাল-ভাবে বুঝতে পারে শিক্ষক তাই সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করবেন, যেমন,—ব্যক্তিগত চরিত্র, পরাক্রম, দুঃসাহসিক কার্য্য,আবিষ্কার, উদ্ভাবন, মানুষের জীবন-যাত্রার ধারা ও কর্ম্মপ্রণালী। এর পর জাতীয় জীবনের উত্থান-পতন এবং হাল আমলের নাগরিকের দাবি-দাওয়া ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা জন্মাতে হবে। এখানেও যথেষ্ট সাবধানতার প্রয়োজন। দুর্ব্বোধ্য আইনকানুনের ঘোরপ্যাঁচ বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিরোধের প্রধান প্রধান কার্য্যকারণ ও ফলাফল যতটুকু না জানলে নয়, শুধু ততটুকুই শিশুর উপযোগী করে সহজ ও সরল ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। মোট কথা, বর্ত্তমানকে বুঝবার জন্য অতীতের যতটুকু জানা প্রয়োজন শুধু ততটুকু রেখে, বাকীটা কেটে-ছেঁটে বাদ দিতে হবে। ইতিহাসের সিলেবাস বা পাঠ্যতালিকা রচনায় সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে যে, অতীতকে জানাটাই ইতিহাস-পাঠের উদ্দেশ্য নয়, বর্ত্তমানকে বুঝাই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

ইতিহাসকে শুধু যুদ্ধ-বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে ইতিহাস-শিক্ষা ব্যর্থ হয়। যুদ্ধই ইতিহাসের সবকিছু এবং দু'দশটা যুদ্ধ-জয়ই জাতির মহত্ত্বের একমাত্র মাপকাঠি—এই ধারণা ছাত্রমন থেকে অপসারিত করতে হবে। তারা যেন বুঝতে পারে যে, "ইতিহাসের আকর্ষণ-কেন্দ্র এখন আর যুদ্ধ নয়, রাজনীতি—এবং ক্রমে ওখান থেকে সরে গিয়ে ওটা দাঁড়াচ্ছে সমাজনীতিতে। জাতির ভাগ্যনির্ণয়ে রাজারাণীর যদি কোন হাত না থেকে থাকে তবে তাঁদের পরিবর্ত্তে সত্যিকার ইতিহাস-স্রষ্টা যাঁরা তাঁরাই ইতিহাসে স্থান লাভ করছেন।"২

সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে পরিবর্ত্তন ঘটছে যুদ্ধ তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মেঘের চলার পথে যেমন বজ্র ও বিদ্যুৎ, সমাজের চলার পথে তেমনি যুদ্ধ ও বিরোধ কতকটা অবশ্য-ম্ভাবী। মেঘ যদি শুধু বজ্র হ'ত, পৃথিবী শস্যশ্যামলা না হয়ে কবে রসাতলে যেত। যুদ্ধ-বিগ্রহই যদি সমাজের মূলমন্ত্র হয়, তবে তার পরিণতি কি হবে হিরোশিমাই তার প্রমাণ। কাজেই যুদ্ধের উপর অতিরিক্ত জোর না দিয়ে সমাজ-জীবনের সমন্বয়ের ক্রমধারাগুলিকে খুঁজে বের করতে হবে। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে সামাজিক প্রগতির আসল রূপটি উদ্ঘাটিত করতে হবে ছাত্রদের সামনে। রণবীরের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর ও বিজ্ঞান-বীরের সাধনা ও সিদ্ধি হবে ইতিহাসের বিষয়বস্তু। এই রূপে নূতন করে ইতিহাস রচনা এবং পঠনপাঠনা করলে যুদ্ধের সম্ভাবনা অনেকটা কমে আসবে, শান্তি কতকটা কায়েম হবে। ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে একথা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। দেশে সুখশান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে তার পুনর্গঠন ও ইতিহাসের পুনর্লিখন প্রয়োজন। ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করে ভারতের নূতন ইতিহাস লিখতে হবে না, বরং কঠোর সত্যের উপর ভিত্তি করেই একে পুনরায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। ইতিহাস সত্যের প্রতীক। সত্য—একমাত্র কঠোর সত্যই হবে তার উপাদান। মিথ্যার আশ্রয় নিলে ইতিহাস আর ইতিহাস থাকে না, তা হয় উপন্যাস ও উপকথা। "দুর্নীতি অথবা

১। Board of Educa i(n, London—*Hand Book of Suggestions.*

২। P. B. Ballard—*The New Examiner.*

সদাচার শিক্ষার জন্ত এখন আর আমরা ইতিহাস পাঠ করি না। নাটকীয় বিচিত্র দৃশ্যের জন্যও নয়। আমরা জানি এর জন্ত ইতিহাস অপেক্ষা উপকথা অধিকতর উপযোগী। কারণ ইতিহাসের চেয়ে উপকথায় কার্যকারণ সম্পর্কের সঙ্গে আমাদের ধারণার মিল অনেক বেশী। এতে বর্ণিত চরিত্র ঐতিহাসিক চরিত্র অপেক্ষা অধিকতর নিষ্কলঙ্ক ও বীরত্বপূর্ণ, এর বৃত্তাবলী বিচিত্রতর ও করুণ। জার্মানীতে যেমন স্বদেশভক্তি ও আনুগত্য বৃদ্ধির জন্ত ইতিহাসের আশ্রয় নেওয়া হয়, আমরা সেরূপ করতে চাই নে। নিজ দেশ অথবা দলের সুবিধার জন্তে একই বিজ্ঞান থেকে বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্নমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ন্যায়ানুমোদিত নয় বলে আমরা উপলব্ধি করি। এর ফলে ব্যক্তিবিশেষের অভিরুচি অনুযায়ী ইতিহাসের পরিবর্তন না হলেও অঙ্গহানি হওয়া স্বাভাবিক। সত্যই বিজ্ঞানের প্রাণ, একথা আমরা উপলব্ধি করি এবং ইতিহাসের নিকট থেকে সত্য ছাড়া আমরা অন্ত কিছু প্রত্যাশা করি না।"৩

একদেশদর্শী স্বার্থান্ধ কোন কোন ঐতিহাসিকের লেখনী দ্বারা ভারতের ইতিহাস যে মসীলিপ্ত হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য। সিরাজউদ্দৌলা ও আওরংজেবের চরিত্রের উপর যথাক্রমে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও স্যর যদুনাথ সরকার যে ভাবে আলোকপাত করেছেন সেটাই হবে ইতিহাস পুনর্লিখনের আদর্শ। যুদ্ধে নাকি প্রথম সমাধি-রচনা হয় সত্যের। ফলে ইতিহাস-রচনা ভরে ওঠে মিথ্যা বর্ণনায়। প্রকৃত ঐতিহাসিক হবেন সত্যসন্ধ। তাঁকে মিথ্যার ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে সত্যকে খুঁজে পেতে বের করতে হবে।

এইখানেই ঐতিহাসিকের কাজ শেষ হ'ল না। খনি থেকে মণি তুলে তাকে ঝেড়ে পুঁছে পরিষ্কার করতে হবে, দক্ষ জহরীর মত তাঁকে তাঁর আবিষ্কৃত উপকরণকে বাছাই করে বাজারে বের করতে হবে। ঐতিহাসিক তথ্যের এসিড-টেষ্ট বা অগ্নি-পরীক্ষার জন্ত একদিকে যেমন তার অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম সমালোচনা-শক্তি থাকা চাই, অপর দিকে তেমনি চাই মুক্ত মন ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী। আলবেরুনির মত সত্যের অপলাপে যাঁরা হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করেন, ভিন্ন দেশে ভিন্ন মতাবলম্বী ও পরধর্মাবলম্বীর বিদ্বেষবাণে যাঁরা অটল, একমাত্র তাঁরাই এ কাজের যোগ্য।

প্রত্যেক জাতির ইতিহাসই কোনো না কোনো অত্যাচারী রাজার অপকর্মে কলঙ্কিত হয়েছে। ভারতে দীর্ঘ সাত-আট শত বৎসর মুসলমান রাজত্বকালে যদি দু-চার জন ঐরূপ নবাব-বাদশার উদ্ভব হয়ে থাকে, তবে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। এমনই দু-চার জন রাজা-বাদশার অসঙ্গত আচরণ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। মুসলমান আমলে ভারতে প্রজানুরঞ্জক রাজার অভাব হয়নি। অত্যাচারী রাজা-বাদশাদের অত্যাচারকে ফলাও করে বর্ণনা করায় লাভ ত নাই-ই, বরং ক্ষতির সম্ভাবনাই ষোল আনা। এক্ষেত্রে কুকর্মকে বড় করে না দেখে যদি তাঁদের সৎকর্মের অনুসন্ধান করা হয় তা হলে তার অভাব হবে বলে মনে হয় না। উদাহরণস্বরূপ আওরংজেব ও শিবাজীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আওরংজেবকে অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু-বিদ্বেষী ও শিবাজীকে মুসলমান-বিদ্বেষী বলে গালি দেওয়া হয়ে থাকে। কেবল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে গোটা মুসলমান ও হিন্দু এই উভয় জাতির প্রতি কটাক্ষ করা হয়। এটা যেমন হাস্যকর তেমনি করুণ। আওরংজেবের সুদীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে হিন্দু-মন্দিরের জন্ত হাজার হাজার দেবোত্তর ও জায়গীর-দানের দৃষ্টান্তের অভাব নেই, হিন্দু-প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন এমন দৃষ্টান্তও আছে, অথচ সাধারণ ইতিহাস সে সম্পর্কে নীরব। শিবাজীর বেলায়ও তাই। তাঁর সাহস, রণচাতুর্য্য ও বীরত্ব সত্ত্বেও তাঁকে পার্বত্য মূষিকরূপে চিত্রিত করা হয়। এটা সত্যের অপলাপ ও একদেশদর্শিতা মাত্র।

নূতন ইতিহাস-রচনায় একমাত্র যোদ্ধাকেই গৌরবময় আসন না দিয়ে যোদ্ধাকেও শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে হবে, এ কথা পূর্বেই বলেছি। যুদ্ধের আগুন যাঁরা ছড়ালেন, তাঁদের চেয়ে শান্তিবারি যাঁরা সিঞ্চন করলেন তাঁরাই কি অধিকতর বরণীয় নয়? কিন্তু ইতিহাসে তাঁদের স্থান কৈ?

ডক্টর গুচের মতে হাজার রকমে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমরা যদি ছাত্রদের সামনে সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসকে একটি মাত্র বিরাট কাহিনী আকারে ধরতে এবং ইতিহাস-স্রষ্টাদের কর্মাবলী, প্রত্যেকটি ঘটনা ও আন্দোলনকে একটি অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত করতে না পারি, তা হলে ইতিহাস-শিক্ষার উদ্দেশ ব্যর্থ হয়ে যাবে। শিক্ষক যদি জ্ঞানী ও ভাবুক হন তা হলে অন্ধকার-যুগ থেকে আরম্ভ করে আলোকোজ্জ্বল বর্তমান কাল পর্য্যন্ত মানব-জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, উত্থান-পতন এবং যুগে যুগে মানুষের সাধনা ও সিদ্ধির আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি অনায়াসেই ছাত্রমনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু শিক্ষক সত্যিকারের "জ্ঞানী ও ভাবুক" না হলে সবই পণ্ড হবে। কয়মানেরো তিনি যদি দেশের গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি দেখতে না পান, তাঁর হৃদয় যদি মানবজাতির মঙ্গল-কামনায় উদ্বুদ্ধ না হয়, তা হলে তাঁর ইতিহাস-পাঠদান সার্থক হতে পারে না। এ ছাড়া শিক্ষকের থাকা চাই সরস ও প্রাণবন্ত বর্ণনাশক্তি। তাঁর বর্ণনাভঙ্গীর যাদু-প্রভাবে শিশুর কাছে ইতিহাসের নীরস ঘটনা হবে ছোটখাট এক একটি গল্পবিশেষ। নিম্ন শ্রেণীতে তা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। উচ্চ শ্রেণীতে বর্ণনা ও আলোচনার

৩। Langlois and Seignoleos—*Introduction to the History*.

যারা জটিল বিষয়কে করতে হবে 'জলবৎ তরলম্'। শিক্ষক বিভিন্ন ধরণের সমসাময়িক ছবি, পোশাক-পরিচ্ছদ, মুদ্রা প্রভৃতির সাহায্যে পাঠটিকে জীবন্ত করে তুলবার চেষ্টা করবেন। মৃত অতীত তবেই ছাত্রদের সামনে হবে জীবন্ত।

ইতিহাস-পাঠদানে চার্ট, বিশেষ করে টাইম-চার্ট, খুবই প্রয়োজনীয়। এই নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকে সন তারিখের বিশেষ পক্ষপাতী, অনেকে আবার তা পরিত্যাগ করার সুপারিশ করেন। ব্যালার্ড তারিখবিহীন ইতিহাসকে মাইল-চিহ্নবর্জিত পথ, সীমাহীন রাজ্য অথবা আলোকবাহী জাহাজবিহীন অকূল সমুদ্রের সহিত তুলনা করেছেন। আবার অতিমাত্রায় তারিখ-সম্বলিত ইতিহাসকে তিনি তুলনা করেছেন সেটেলিয়ার বৈচিত্র্যবিহীন গোরস্থানের সঙ্গে। "প্রান্তরে দু'দশটি বৃক্ষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকলে সীমারেখার কাজ করে, কিন্তু বৃক্ষবিরল না হয়ে তা যখন ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষবহুল হয় তখন প্রান্তরকে কান্তার বলে ভুল করা বিচিত্র নয়। ...পরিমিত তারিখ সুফলপ্রদ। তা আমাদের চিন্তাধারা সুদৃঢ় করে এবং ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়। এই ধারণার শোচনীয় অভাব আমাদের আছে।...তারিখ না হলেই নয়। তারিখ হবে সংখ্যায় অতি অল্প, কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সুচয়িত এবং নিত্য ব্যবহৃত।"[৪]

প্রকৃষ্টরূপে ইতিহাস শিক্ষা দিতে পারলে "ছাত্রেরাই যে সকল যুগের উত্তরাধিকারী, শত সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা, উদ্ভাবন ও বিজয়ের ভাগ্যবান ভোগদখলকারী—ছাত্রমন যতই বিকশিত হতে থাকবে ততই তারা একথা মনে প্রাণে উপলব্ধি করবে। পাশবিক জীবনের ঘৃণ্য স্তর থেকে বর্তমানের বিচিত্র জগতের বর্ণাঢ্যরঞ্জিত স্তরে আমাদের উন্নয়নের গল্পই যে ইতিহাস, একথা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার পরিপূর্ণ চেষ্টাও হবে।"[৫]

৪। P. B. Ballard—*The New Examiner.*

৫। Dr. G. P. Gooch—*History* (*Education for Citizenship*).

তামসিক

শ্রীনিরুপমা দত্ত

এ পর্য্যন্ত মালয় উপদ্বীপের বিলুপ্ত অতীতের যেটুকু তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, অতি প্রাচীন

পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

কাল হইতে এই দেশটি একটি মহা ঐশ্বর্য্যশালী রাজ্যবিশেষ ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মালয়ের দক্ষিণ-প্রান্তে অবস্থিত সিঙ্গাপুর দ্বীপটি সম্পর্কে বিশেষ কোন বৃত্তান্ত উক্ত সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। অথচ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যখন দেখিতে পাই যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা মালয় উপদ্বীপে আসিয়া অনেকগুলি প্রতিপত্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তখন স্বতঃই একথা মনে হয় যে, অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত এই দ্বীপটি কি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

ইউরোপীয়দের মধ্যে সার ষ্ট্যাম্‌ফোর্ড র‍্যাফেল্‌স ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সিঙ্গাপুর দ্বীপটি আবিষ্কার করেন। ইহার বনানীমণ্ডিত ও শৈলমালা-সুশোভিত প্রাকৃতিক শ্রী দেখিয়া তিনি যে কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা সে সময়ে জনৈক বন্ধুকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্র হইতে জানিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, "...আমি কোথা হইতে এই পত্রখানি লিখিতেছি তা জানিতে হইলে আপনাকে সম্ভবত এশিয়ার মানচিত্রের সাহায্য লইতে হইবে। মালয়ের দক্ষিণ-প্রান্তে অবস্থিত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মনোরম। ভাবিতে আজ সত্য সত্যই গর্ব্ববোধ হয় যে, পৃথিবীর এই অজানা অংশে এই রমণীয় দ্বীপটি আমারাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। শুনিলাম ইহার নাম সিঙ্গাপুরা (সিংহপুর) অর্থাৎ city of lion, অথচ ইহা

শুনিয়া যেন মনে করিবেন না যে, ইহার বাসিন্দারা সব চতুষ্পদ হিংস্র পশুমাত্র। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে, এ কয়দিন ক্রমাগত পর্য্যটন করিয়াছি, কিন্তু ইহার গভীর জঙ্গলে কয়েকটি বড়বাঘ ছাড়া অন্য কোন হিংস্র জন্তুর সাক্ষাৎ পাই নাই। মালয়ের অধিবাসীদের নিকট শুনিয়াছি যে, পূর্ব্বে সিঙ্গাপুর ছিল একটি মহানগরী এবং ভারতীয় হিন্দু নৃপতিরা এখানে রাজত্ব করিতেন। অবশ্য বর্ত্তমানে ইহার অতীত গৌরবের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না ; এখন ইহার তিন-চতুর্থাংশ গভীর অরণ্যে সমাচ্ছন্ন এবং আটটি ধীবর-পরিবার ব্যতীত আর কোন মনুষ্য-বসতি এখানে নাই। আমার ইচ্ছা আছে, এই সৌন্দর্য্যশালিনী ভূখণ্ডের বুকে একটি মহানগরী প্রতিষ্ঠা করিব এবং ইহার পর উপযুক্ত মাল-মশলা সংগৃহীত হইলে এই সুপ্রাচীন সিঙ্গাপুরের একখানি ইতিহাস লিখিব।"[1] দুঃখের বিষয়, সার ষ্ট্যাম্ফোর্ড ইহার মাত্র নয় বৎসর পরে অকালে পরলোকগমন করেন। কাজেই তাঁহার উক্ত ইচ্ছাই অপূর্ণ রহিয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর চীনা পর্য্যটক অং-তি-য়াঙের[2] ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্প্রতি এই রমণীয় দ্বীপটির তমসাবৃত অতীতের উপর ঈষৎ আলোকসম্পাত করিয়াছে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের প্রথমার্দ্ধে ধর্ম্মপ্রাণ অং-তি-য়াঙ ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি অভিমুখে জলপথে যাত্রা করিয়াছিলেন। চার মাস জলপথে চলিবার পর হঠাৎ এক দিন প্রলয়ঙ্করী ঝটিকা উত্থিত হয়। সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গাঘাতে জলযানখানি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া চলিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ঝড় থামিলে একটি শ্যামলশ্রীমণ্ডিত সুন্দর দ্বীপ দিগন্ত-রেখার কোলে ভাসিয়া উঠে। যাত্রীরা প্রাণপণে জলযানখানিকে সেই দিকে চালাইতে থাকেন এবং অবশেষে তটভূমিতে উপনীত হন। উপকূলে অবতরণ করিয়া তাঁহারা জানিতে পারেন যে, উক্ত দ্বীপটির নাম তা-মা-সি-কে (তামসিক) এবং সি-লি-পা-লা (শ্রীপাল) নামক রাজার দ্বারা উহা শাসিত ; অধিবাসীরা অধিকাংশই হিন্দু দেব-দেবীর উপাসক। ইহারা তাম্রবর্ণ, বিনয়ী ও অতিথিসেবা-পরায়ণ ; ইহাদের ঘরবাড়ী কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং ছাদ খড়ে ছাওয়া ; কাল-ই-য়াম (কল্যাণ) নাম্নী একটি ক্ষুদ্র নদী উক্ত দ্বীপের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে দক্ষিণ সাগরে অবস্থিত পান-পু (পন্থু) দ্বীপের রাজকন্যার সঙ্গে এখানকার রাজার বিবাহ হইয়াছে। সেই উৎসবের স্মারক-চিহ্নস্বরূপ প্রজাদের কুটীরদ্বারে তখনও ফল ও পুষ্পমাল্য ঝুলিতেছিল...।

কোন অজ্ঞাত কারণে ভ্রমণলিপিখানির অবশিষ্টাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তামসিকের তৎকালীন পরিস্থিতির অনেক বিস্তৃত কাহিনী হয় তো তাহাতে বর্ণিত ছিল। সুবিখ্যাত লিপিতত্ত্ববিদ্ ডাঃ সাইম হান বলেন যে, অং-তি-য়াঙ বর্ণিত

উক্ত তামসিক দ্বীপই যে বর্ত্তমান সিঙ্গাপুর তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সিঙ্গাপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক দিয়া প্রবাহিত ক্ষুদ্র কালাং নদীটিই অং-তি-য়াঙ বর্ণিত কল্যাণ নদী এবং সিঙ্গাপুরের দক্ষিণ-সমুদ্রে অবস্থিত বর্ত্তমান পুলো-পন্থু যে উক্ত তামসিক-রাজমহিষীর পিত্রালয় ছিল তাহা ইহার নাম ও অবস্থিতি হইতে অনায়াসেই প্রমাণিত হয়।

কিছু দিন পূর্ব্বে কালাং নদীর মোহনায় প্রাপ্ত লিপি-খোদিত একটি প্রস্তরখণ্ড প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে বিশেষ বিস্ময় ও কৌতূহলের সৃষ্টি করে। অজ্ঞানতা বশতঃ পি. ডবলু. ডি-র একটি শ্রমিক উহাতে লৌহ মুদ্গরাঘাত করায় প্রস্তরটি চারিটি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। উপস্থিত উহার একটি খণ্ড কলিকাতা যাদুঘরে এবং অবশিষ্ট তিন খণ্ড স্থানীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে। (শিলালিপি নং ১, ২, ৩)। এই শিলাখণ্ডে কোন বিস্মৃত জাতির লিপি উৎকীর্ণ আছে। তবে দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন লিপির সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য থাকায় সুপ্রসিদ্ধ লিপিতত্ত্ববিদ্ ডাঃ উইনষ্টেড বলেন—যাঁহারা এই লিপি খোদিত করিয়াছিলেন তাঁহারা দ্রাবিড় জাতির কোন বিলুপ্ত শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সিঙ্গাপুরের একটি গিরিগাত্রেও অনুরূপ লিপির কিয়দংশ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার প্রতিলিপিটি নিম্নে প্রদত্ত হইল (শিলা-লিপি নং ৪)।

উক্ত শিলালিপিগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সুপ্রাচীন কালে এই দ্বীপবক্ষেও অনেকগুলি রাজ্যের অভ্যুত্থান ও পতন হইয়াছিল—যদিও কালস্রোতে তাহাদের সমুদয় স্মৃতি আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুপ্রাচীন 'তামসিক' নামটি ইহাদেরই উদ্ভাবিত, অবশ্য এই নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি তাহা বলা কঠিন। এশোনিয়ার পৌরাণিক কাহিনীতেও তামসিক নামটি

১। সিঙ্গাপুর যাদুঘরে রক্ষিত সার ষ্ট্যাম্ফোর্ড র‍্যাফেল্‌স লিখিত পত্র (১০. ১. ১৮১৯)

২। *Discovery of Tamasik*—Prof. Khoo Ting Eng.

সুপরিচিত। উক্ত কাহিনী পাঠে জানা যায় যে, এককালে তামসিক একটি পরাক্রমশালী রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, এবং সমগ্র মালয়ের নৃপতিবৃন্দ তামসিক-রাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তামসিক-রাজের সিংহাসন ছিল স্বর্ণনির্ম্মিত।

শিলা লিপি
নং ১

তামসিক রাজ্যের একটি পুরনো কাহিনী এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি :

অতীতে একদা শ্রীদেও নামে এক নৃপতি তামসিকে রাজত্ব করিতেন। রূপে গুণে শৌর্য্যে বীর্য্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। যুদ্ধবিদ্যায় তিনি এত নিপুণ ছিলেন যে, উত্তর প্রদেশের বিংশতি জন নৃপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তিনি উক্ত দেশসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার পঞ্চবিংশ জয়ন্তী উৎসবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু নৃপতি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সকলেই স্ব-স্ব রাজ্যের শ্রেষ্ঠ দ্রব্য উপঢৌকন-স্বরূপ আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে পাঁচ জন নৃপতি আনিয়াছিলেন স্বতন্ত্র বস্তু—যাহার মূল্য মুদ্রায় নির্দ্ধারিত হয় না। তাঁহারা অবগত ছিলেন যে, মহারাজ শ্রীদেও তখনও কুমার, তাই তাঁহারা তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিতে প্রত্যেকে একটি করিয়া কন্যা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। রাজসভায় সেই পাঁচ জন নৃপতি পঞ্চকন্যা সহ প্রবেশ করিলে মহারাজ শ্রীদেও সিংহাসন হইতে উঠিয়া সসম্মানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীদেও এই পঞ্চ কন্যাকে অন্তঃপুরে রাজমাতার নিকট লইয়া যাইতে মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজ-আজ্ঞা পালন করিবার পূর্ব্বেই কিন্তু পঞ্চকন্যা পূর্ণ শতদলের ন্যায় রাজার চরণপ্রান্তে গিয়া অর্দ্ধ বৃত্তাকারে উপবেশন করিলেন। মহারাজ সবিস্ময়ে দু'পা পিছাইয়া গিয়া উক্ত নৃপতিবৃন্দের প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তখন ঐ কয়জন নৃপতিরা সবিনয়ে বলেন, মহারাজ, আজ আপনার শুভ জয়ন্তী উৎসবে আমাদের এই পঞ্চকন্যারত্ন আপনার হস্তে সম্প্রদান করিলাম। আপনি ইহাদিগকে গ্রহণ করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। ইহাতে মহারাজ শ্রীদেওয়ের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। পদপ্রান্তে সমাসীনা রাজদুহিতাদের অপরূপ লাবণ্যমণ্ডিত মুখের পানে বিমূঢ়ের ন্যায় ক্ষণকাল তিনি চাহিয়া রহিলেন, শেষে আত্মস্থ হইয়া মহারাজা বলিলেন—আপনাদের ঔদার্য্য যথার্থই প্রশংসনীয় তবে এ ধরণের উপহার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমার একবার মন্ত্রণাগারে গিয়া মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে।"

মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি গম্ভীরভাবে বৃদ্ধ প্রধান

শিলা লিপি
নং ২

অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করেন, "উপহারগুলো কেমন মনে হচ্ছে আপনার"—

"অতি চমৎকার! অতি সুন্দর!"—বৃদ্ধ মন্ত্রী সহাস্যে বলেন।

শ্রীদেও বলিলেন, "কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে একটি কূট চক্রান্ত নিহিত আছে।"—

"কূট চক্রান্ত? কি রকম?"—বৃদ্ধ মন্ত্রী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন। মহারাজ শ্রীদেওয়ের মুখখানা আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল। চিন্তিত ভাবে বলিলেন, ঐ পঞ্চ নৃপতি এককালে আমার পিতার মহা শত্রু ছিলেন; সুতরাং আজ হঠাৎ এরূপ মিতালি করার উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝতে পারছেন না?"

মন্ত্রী বলিলেন, "যদি সেই মতলবই এঁদের থাকে তা হলে এঁরা নিজ নিজ দুহিতাকে আনবেন কেন?" শ্রীদেও বলিলেন, "কিন্তু ওরা আসলে রাজ-দুহিতা কিনা তার উপযুক্ত প্রমাণ আছে?" ক্ষণকাল থামিয়া ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আমি ঠিকই বলছি ওরা কখনই রাজকন্যা নয়, ওরা পতিতা রমণী"!

"পতিতা"!—মন্ত্রী মহাশয় হতবাক হইয়া যান।

শ্রীদেও বলিলেন, "হাঁ, রাজ-দুহিতারা কখনও এভাবে কোন নৃপতির চরণ-বন্দনা করে না; তা ছাড়া রাজকন্যাদের বক্ষাবরণও স্বতন্ত্রপ্রকার। ঐ নৃপতিবর্গের উদ্দেশ্য এই পতিতাদের মারফত আমার রাজ্যের গুপ্ত খবরগুলি জেনে নিয়ে আমার অতর্কিতে আক্রমণ করা।"

এই কথাগুলি বলিয়াই শ্রীদেও উক্ত পাঁচ জন নৃপতি এবং পঞ্চ কন্যাকে বন্দী করিতে সৈন্যদের আদেশ দিলেন। যথাসময়ে প্রমাণিত হইল যে, মহারাজ শ্রীদেওয়ের অনুমান বর্ণে বর্ণে সত্য। তখন উক্ত কয়জন রাজাদের শিরশ্ছেদন করা হইল এবং ঐ পাঁচটি কন্যাকে তাহাদের মাতৃভূমিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

রাজা শ্রীদেও সর্ব্বদা রাজকার্য্যে নিরবচ্ছিন্ন ব্যস্ত

থাকিতেন। কর্মশেষে মাঝে মাঝে তিনি দক্ষিণ-সমুদ্রে জলহস্তী শিকার করিতে যাইতেন।

এক দিন শিকার করিয়া সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিবার পথে একটি আশ্চর্য দৃশ্য মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি

শিলালিপি নং ৩

দেখেন, কিছু দূরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের কিনারায় উপবিষ্টা এক পরমাসুন্দরী নারী কতকগুলি জলহস্তীর মসৃণ গাত্রে সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। এই অসামান্যা রমণীর পরিচয় জানিবার দুর্নিবার কৌতূহল শ্রীদেওয়ের মনে জাগিয়া উঠিল। এক জন সাধারণ বণিকের বেশ ধারণ করিয়া তিনি একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং সঙ্গীদের বজরা লইয়া তামলিকে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিয়া তিনি সেই নাম না জানা দ্বীপের অভিমুখে নৌকা বাহিয়া চলিলেন। রাজা তীরে পৌঁছিতেই জলহস্তীগুলি অতিবেগে জলের মধ্যে ডুব মারিল। রমণী চকিত বিস্ময়ে আগন্তুকের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, পরে দৃঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কে তুমি বিদেশী ?"

রমণীকে অভিবাদন করিয়া শ্রীদেও বিনয়নম্র কণ্ঠে বলিলেন, "আমি তামলিক-দ্বীপ নিবাসী জনৈক সওদাগর। হালমিহারা দ্বীপে বাণিজ্য করে দেশে ফিরে আসছিলাম, হঠাৎ জলদস্যুরা অতর্কিতে আক্রমণ করে আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। আমি প্রাণ নিয়ে কোন রকমে পালিয়ে এসেছি এই দ্বীপে। যদি আজ রাত্রির মত একটু আশ্রয় দেন তা হলে বড়ই বাধিত হই দেবী!"

রমণী একটু ম্লান হাসিল। তার পর বলিল, "শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম; কিন্তু সওদাগর, এখানে কাউকে আশ্রয় দেবার অধিকার তো আমার নেই।"—"আমি যে একান্ত নিরুপায় দেবী"!—একথা বলিয়া ছদ্মবেশী রাজা রমণীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের পানে অসহায়ের মত চাহিয়া থাকেন। রমণী ক্ষণকাল কি ভাবিল, তার পর বলিল—"আচ্ছা তবে এস, কিন্তু আমার জীবন বিপন্ন করে তোমার এই অনুরোধ রাখলাম।"

খানিক দূর যাইতেই দু'জনে আসিয়া গিরিগাত্রে নির্মিত একটি সুরম্য প্রাসাদ-তোরণে পৌঁছিলেন। প্রাসাদে প্রবেশ করার পূর্বে রমণী বলিল, "সওদাগর আমায় প্রতিশ্রুতি দাও যে আগামী কাল প্রত্যূষে তুমি এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবে।" রাজা বলিলেন, "তথাস্তু দেবী।"

আহারান্তে রাজাকে একটি সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া গিয়া রমণী বলিল, এইখানে তুমি রাত্রি যাপন করবে। তবে একটা কথা মনে রেখো সওদাগর, কাল সূর্যোদয়ের পূর্বেই তোমায় পালাতে হবে, নইলে বিপদে পড়বে।" মহারাজ শ্রীদেও

শিলালিপি নং ৪

মনের কৌতূহল আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। বলিলেন, "আচ্ছা এই দ্বীপটির কি নাম ? আপনি কি এর রাণী ?" রমণী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এর নাম পুলোবুলান (চন্দ্রদ্বীপ) আর আমি এর রাণী নই, আমি এখানে বন্দিনী।"

"—বন্দিনী!" শ্রীদেও বিস্ফারিত নেত্রে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকেন। তার পর জিজ্ঞাসা করেন, "কে আপনাকে এই দ্বীপে বন্দী করে রেখেছে দেবী ?"

"—সে অনেক কথা সওদাগর",...বলিয়া রমণী চুপ করিয়া যান। শ্রীদেওয়ের পীড়াপীড়িতে অবশেষে তিনি আত্ম-পরিচয় দিলেন, করুণ কণ্ঠে বলিলেন—"আমি হচ্ছি বাংশাওয়ান রাজ্যের রাজকন্যা মুতিয়ারা (দুর্লভ মুক্তা)।"

শ্রীদেও সবিস্ময়ে বলিলেন, "দায়াং মুতিয়ারা ? কিন্তু... শুনেছিলাম যে তিনি আর জীবিত নেই।

মৃদু হাসিয়া মুতিয়ারা বলিলেন, "হাঁ সংসারে তাই রটেছে বটে, কিন্তু যা রটেছে আসলে তা ঘটে নি। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমিই সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী হই, কিন্তু আমার খুল্লতাত জোর করে আমার সিংহাসন কেড়ে নিয়ে আমায় এই জনমানবহীন দ্বীপে বন্দিনী করে রেখেছেন।"

নির্বাসিতা রাজকন্যার বেদনাপূর্ণ কথাগুলি শ্রীদেওয়ের কোমল চিত্তকে গভীর ভাবে আলোড়িত করিল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যেমন করিয়াই হোক এই "দুর্লভ মুক্তা"টিকে মুক্তি দিয়া নিজের জীবন-সঙ্গিনীরূপে তাকে রাজান্তঃপুরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন।

কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া শ্রীদেও বলিলেন—"দেবী, আমি যদি তামসিকে ফিরে গিয়ে আমাদের মহারাজ শ্রীদেওকে আপনার কাহিনী জানাই তা হলে তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে কারামুক্ত করতে চেষ্টা করবেন। আশা করি আপনার এতে কোন আপত্তি নেই।"

কোর্ট ক্যানিং-এ খনন-কার্য্য দ্বারা প্রাপ্ত হিন্দু আমলের স্বর্ণালঙ্কার

"—না, আপত্তি কিসের?" মুক্তিরাম্মা ম্লান হাসিলেন, "তোমাদের মহারাজের মহানুভবতার কথা আমিও শুনেছি তাঁকে জানিয়ো আমার কথা।"

পরদিন মহারাজ শ্রীদেও তামসিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রধানমন্ত্রীকে গোপনে সব কথা জানাইয়া বলিলেন যে, আগামী কাল তিনি স্বয়ং রাজকন্যাকে আনিতে যাইবেন, তবে রাজ্যের মধ্যে উপস্থিত একথা যেন কেহ জানিতে না পারে। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি চন্দ্রদ্বীপে গিয়া পৌঁছিলেন। সেদিনও মুক্তিরাম্মা তেমনি সাগর-সৈকতে বসিয়া জলহস্তীদের আদর করিতেছিলেন। এমন সময় পুষ্পমাল্যে সুশোভিত এক সুবৃহৎ নৌকা থেকে সওদাগর-বেশী শ্রীদেও অবতরণ করিয়া মুক্তিরাম্মাকে অভিবাদন করিয়া রাজা শ্রীদেওয়ের নামাঙ্কিত একখানি পত্র তাঁহাকে দিলেন।" তারপর তাঁহাকে লইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকা সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া চলিল। তামসিক বন্দরে পৌঁছিবামাত্র তাঁহারা দেখিলেন, সৈন্যসামন্ত সহ রাজার রথ তাঁহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। মুক্তিরাম্মাকে সেই রথে তুলিয়া দিয়া ছদ্মবেশী রাজা বলিলেন, আমার এবার বিদায় দিন রাজকন্যা। মুক্তিরাম্মার চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন,—"তোমার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে সওদাগর।"

খুব ধুমধাম সহকারে মুক্তিরাম্মার সহিত মহারাজ শ্রীদেওয়ের বিবাহ-উৎসব সুসম্পন্ন হইল। পরদিন ফুলশয্যার রাত্রি। শয়নকক্ষে স্বর্ণ-পালঙ্কের উপর বসিয়া ছিলেন মহারাণী মুক্তিরাম্মা। কিছুক্ষণ পরে কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিলেন মহারাজ শ্রীদেও। রাণী মুক্তিরাম্মা দাঁড়াইয়া উঠিয়া চকিত বিস্ময়ে বলিলেন, "এ কি সওদাগর তুমি কি করে এখানে এলে?"

রাজা জানিতেন, বিবাহের সময় রাণী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। এইবার যখন শ্রীদেও আনুপূর্ব্বিক সকল কথা

সিঙ্গাপুরে কোর্ট ক্যানিং-এ মাটির নীচে প্রাপ্ত সোনার চুড়ি

বলিলেন তখন স্বামীর মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া মুক্তিরাম্মার দুই চক্ষু বাহিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল।...

মধ্যরাত্রি। দ্বারে প্রচণ্ড করাঘাতের আওয়াজে মহারাজের নিদ্রা ভাঙিয়া গেল। কী ব্যাপার? প্রধান মন্ত্রী শশব্যস্তে আসিয়া খবর দিলেন, বাংশাওয়াম রাজ্যের দশ সহস্র সৈন্য অতর্কিতে তামসিক আক্রমণ করিয়াছে।

মহারাজ শ্রীদেও বুঝিলেন যে, রাজকন্যা মুক্তিরাম্মাকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই বাংশওয়াম-রাজের এই আকস্মিক আক্রমণ। মন্ত্রীকে রথ প্রস্তুত রাখিতে আদেশ দিয়া সেই বাসর-রজনীতেই তিনি রণক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পরদিন প্রভাতে কয়েক জন রোরুদ্যমানা পরিচারিকা মহারাণীর শয়নকক্ষে আসিয়া জানাইল যে, বাংশাওয়াম-সৈন্য তামসিকের অর্দ্ধেকের বেশী জয় করিয়াছে এবং মহারাজ শ্রীদেও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন। মুক্তিরাম্মা বুঝিলেন তাঁহারই জন্য শান্তিপূর্ণ তামসিক রাজ্যের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম। বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে তীক্ষ্ণ ছোরাখানি বাহির করিয়া তিনি আমূল নিজের বুকে বসাইয়া দিলেন।১ তারপর হইতে তামসিক বাংশাওয়াম-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সিঙ্গাপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সমুদ্রে অনেকগুলি ছোট-বড় দ্বীপ আছে, তন্মধ্যে একটির নাম পুলো মুক্তিরাম্মা (মুক্তা দ্বীপ)। কথিত আছে, কয়েকজন বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারী রাণী মুক্তিরাম্মার মৃত দেহটি উক্ত দ্বীপে লইয়া গিয়া সংকার করিয়াছিলেন।২

১। প্রাচীনাবাসী লোকেরা আজও এই কাহিনীটি অভিনয় করিয়া থাকে।

২। Tamilian Antiquity—Doroisinga m.

ইহা ছাড়া দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত প্রাচীন কাহিনী হইতেও তামসিকের বিস্মৃতপ্রায় অতীতের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। স্বর্ণভূমির অপর্য্যাপ্ত ধনসম্পদ রক্ষা করিবার নিমিত্ত সামরিক কেন্দ্র বা প্রধান নৌঘাঁটি হিসাবে
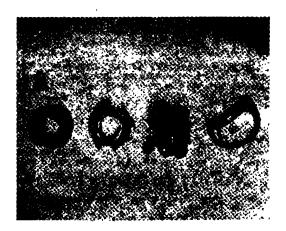
ভূগর্ভে প্রাপ্ত বিবিধ অলঙ্কার

তামসিকের ভৌগোলিক অবস্থান অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন দেশের সংগ্রামকুশল নৃপতিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকালে স্বর্ণভূমিতে (পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে) ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে চীনা বণিকদের বিশেষ কোন কারণে বিবাদ বাধিয়া উঠে—উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তৎকালীন চীন সম্রাট উক্ত অঞ্চল দখল করিবার অভিপ্রায়ে রণতরী প্রেরণ করিবেন শুনিয়া মহারাজ রাজেন্দ্র চোল চীনাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে একটি শক্তিশালী নৌবহর তামসিক বন্দরে প্রেরণ করেন। অবশ্য চীনা নৌবহরের সঙ্গে কোন সংঘর্ষের বিবরণ উক্ত কাহিনীতে উল্লিখিত নাই। তবে কিছুকালের জন্য তামসিক যে চোলরাজের একটি প্রধান নৌঘাঁটি ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৯২৮ সালে সিঙ্গাপুরের ফোর্ট ক্যানিং কেল্লায় একটি জলাশয় খননকালে প্রাচীন হিন্দু আমলের কয়েকটি স্বর্ণালঙ্কার ভূগর্ভ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল। উক্ত দ্রব্যগুলি পরীক্ষা করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলিয়াছেন যে, অলঙ্কারগুলি যাঁহারা ব্যবহার করিতেন তাঁহারা আসিয়াছিলেন সুদূর দাক্ষিণাত্য হইতে। ইহার পর চোল সাম্রাজ্যের পতন হইলে নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের১ অন্য কোন রাজা তামসিক দখল করিয়া কিছুকাল শাসন করেন। কিন্তু হঠাৎ এক প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের (ভূমিকম্প কিংবা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ) ফলে তামসিক নগরী নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তখন হইতে কয়েক শতাব্দী তামসিক লোকলোচনের অন্তরালে অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। কালক্রমে সুদৃঢ় সৌধমালা ও পুষ্পকুঞ্জে সুশোভিত তামসিক নগরী দুষ্প্রবেশ্য মহারণ্যে পরিণত হয়।

সুপ্রাচীন তামসিক নামটি কি করিয়া সিংহপুর বা

ভূগর্ভ হইতে উদ্ধৃত প্রাচীন যুগের স্বর্ণালঙ্কার

সিঙ্গাপুরে রূপান্তরিত হয় এখন সেই বিষয়ে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের তামসিকের অরণ্যময়ী রূপের বর্ণনা আমরা দেখিতে পাই বৌদ্ধ রাজপুত্র সাং নীলোত্তমের ভ্রমণ-কাহিনীতে।২ কথিত আছে, তিনি শৈলেন্দ্র বংশের রাজপুত্র ছিলেন। দেশ পর্য্যটন করা ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় নেশা। একদা সুদূর স্বর্ণভূমিতে পর্য্যটন কালে দক্ষিণ-মালয়ের বিস্তাং গিরিশিখর হইতে তামসিকের অপূর্ব্ব শ্যামল কান্তারের পটভূমিকায় রূপালী বালুকাময় সমুদ্রতটভূমি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পার্ব্বত্য অধিবাসীরা তাঁহাকে জানায় যে, উহা একটি অতি প্রাচীন জনমানবহীন দ্বীপ—নাম তামসিক। রাজপুত্র নীলোত্তম তৎক্ষণাৎ তামসিকের দিকে জলপথে যাত্রা করেন। মাঝপথে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হওয়ায় সমুদ্রবক্ষ এতদূর তরঙ্গসঙ্কুল ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে যে, নৌকার বোঝা হাল্কা করিবার জন্য রাজপুত্রের মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণ-শিরোভূষণটি পর্য্যন্ত সাগর-গর্ভে ফেলিয়া দিতে হইয়াছিল। তামসিকে অবতরণ করিয়া তিনি দেখেন, অদূরে বনভূমিতে দীর্ঘ কেশরযুক্ত একজন বিরাটকায় পশুরাজ বিচরণ করিতেছে। সবিস্ময়ে রাজপুত্র বলিলেন, তামসিক যখন এমন সুন্দর কেশরীকুলের আবাসভূমি তখন ইহার নাম হোক 'সিংহপুর'।

দক্ষিণ-ভারতের পুরাবৃত্ত হইতে তামসিকের এই নূতন নাম সিংহপুর বা সিঙ্গাপুরের উৎপত্তি সম্পর্কে আর একটি বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী জানা যায়৩। অতি প্রাচীন কাল হইতে খ্রীষ্টীয়

১। *The Malay Annals.*

২। *History of Malay—R. O. Winshad.*

৩। শিলাপ্পাধিকরম—তামিল মহাকাব্য।

অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত সমগ্র স্বর্ণভূমি ভারতীয় উপনিবেশিকগণ কর্তৃক শাসিত ছিল। উক্ত হিন্দু উপনিবেশিকেরা ভারতের যে যে অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন নূতন দেশ নবপ্রতিষ্ঠিত পল্লী বা জনপদগুলিকেও তাঁরা সেই সেই অঞ্চলের নামে অভিহিত করেন। অনেকে আবার নিজেদের উপাস্য দেবতাদের নামে স্থানসমূহের নামকরণ করিতেন। এই সকল উক্তির যাথার্থ্য শ্যাম, কাম্বোজ, বোর্ণিও, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয়, সেলিবিস (শৈলবিষ?) এ্যাম্বোন (আম্রবন?) ইত্যাদি দেশসমূহের নগর ও পল্লীর সংস্কৃত বা সংস্কৃতের অপভ্রংশ নাম হইতে প্রমাণিত হয়। তামিল কাব্যগ্রন্থ 'শিলপ্পাধিকরম' হইতে জানা যায় যে, দক্ষিণ ভারতের কলিঙ্গ রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল সিংহপুর। কলিঙ্গবাসীরা বহির্জগতের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা স্বদেশের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন তাহা বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহারা সুদূর স্বর্ণভূমিতে গিয়া কতকগুলি নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ভারত ও সিংহলের মধ্য-পথে অবস্থিত জাফ্‌না দ্বীপও সে সময় কলিঙ্গবাসীরা অধিকার করিয়াছিলেন। নিজেদের রাজধানীর নামের অনুকরণে জাফ্‌নার প্রধান জনপদটিরও নাম তাঁহারা দিয়াছিলেন 'সিংহপুর'। উক্ত সিংহপুর অধুনা সিংহনগর নামে পরিচিত। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কয়েকটি রাজ্যের অনেকগুলি পল্লী ও শহরের নামের সঙ্গে সিংহশব্দ যুক্ত আছে। যথা, সিংহভূমি—সুমাত্রা ; সিংহসারি—যবদ্বীপ ; সিংহরাজা—বলী ; সিংহপুর—কাম্বোজ ইত্যাদি। ডাঃ সাইদ হাম বলেন—উক্ত জনপদগুলি প্রাচীন কলিঙ্গবাসীরা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কি না তাহা যদিও এখনো প্রমাণিত হয় নাই, তথাপি মালয় এবং বোর্ণিও দ্বীপে কলিঙ্গবাসীরা যে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা, আচার-ব্যবহার এবং কয়েকটি স্থানের নাম হইতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অদ্যাবধি মালাই অধিবাসীরা কৃষ্ণকায় দক্ষিণ-ভারতীয়দের 'ওরাং কলিঙ' অর্থাৎ কলিঙ্গবাসী বলিয়া থাকে। সুতরাং ইহা হইতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, 'সিংহপুর' নামটি প্রাচীন কলিঙ্গবাসী উপনিবেশিকদেরই প্রদত্ত।

চট্টগ্রাম বিপ্লব-কাহিনী

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

গত সংখ্যায় চট্টগ্রাম বিপ্লব-কাহিনী প্রসঙ্গে সূর্য্য সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের কয়েকটি চিঠি এবং রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রীতিলতা পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। দলপতি সূর্য্য সেনের নিকট হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিবার সময় সেই স্থানে কয়েকটি চিঠি ও রচনা রাখিয়া আসেন। তাহার মধ্যে সূর্য্যসেনের উদ্দেশে লিখিত পত্রখানি পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় প্রীতিলতার আর দুইখানি পত্র প্রকাশিত হইল। তাহার মধ্যে প্রথম পত্রখানি "মণিদা"র উদ্দেশে লিখিত। এই "মণিদার" পরিচয় সঠিক জানা যায় নাই ; পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইনিই প্রীতিলতাকে বিপ্লবী-দলে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং ঐ সময় তিনি কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। সূর্য্য সেন তাঁহার রচনায় ইহাকে "অসীম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "অসীম" বোধ হয় তাঁহার প্রকৃত নাম নয়, ছদ্মনাম—প্রকৃত নাম ঐ রচনায় গোপন করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। চট্টগ্রামের বিপ্লবীগণ বোধ হয় তাঁহার পরিচয় বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় পত্রখানি প্রীতিলতা তাঁহার কোন প্রিয়জনের উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন। তাঁহারও পরিচয় জানা যায় নাই। তিনি প্রীতিলতার "মণিদা"র একজন বিশেষ বন্ধু এবং প্রথম পত্রে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

তৃতীয় পত্রখানি প্রীতিলতার লিখিত একটি ক্ষুদ্র রচনা। মরণের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে প্রীতিলতার হৃদয়ে যে উন্মাদনা আসিয়াছিল এই কয়েক ছত্রে তাহা পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে।

সূর্য্য সেন পুলিসের নিকট ধরা পড়িবার সময় এই তিনখানি পত্র গহিয়া প্রায়ে তাঁহার কাছে পাওয়া গিয়াছিল।

চতুর্থ পত্রখানি দেশবাসীর প্রতি প্রীতিলতার অন্তিম বাণী। এই পত্রখানি প্রীতিলতার মৃতদেহের বস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। পত্রখানি ইংরেজী ভাষায় প্রীতিলতার স্বহস্তে লিখিত। এই পত্রে তাঁহার জীবনের কথা, তাঁহার প্রবল দেশপ্রীতি, দেশের জন্য আত্মদানের একান্ত আকাঙ্ক্ষা ও এ বিষয়ে নারীর ধর্ম্ম প্রভৃতি বিশেষ প্রাঞ্জল ভাষায় পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রীতিলতার মৃত্যুর পর সূর্য্য সেন "Female organisation" অর্থাৎ বিপ্লবী নারী-সংঘের একটি ইতিহাস রচনা

প্রীতিলতার ১নং পত্রের এক অংশের প্রতিলিপি

করেন। এই প্রবন্ধটি অসমাপ্ত অবস্থায় তাঁহার নিকট পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধের একটি উৎসর্গ-পত্রে প্রীতিলতার উদ্দেশে লিখিত একটি ক্ষুদ্র রচনা আছে।

সর্ব্বশেষে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের দুইখানি পত্র প্রকাশিত হইবে। পত্র দুইখানি রামকৃষ্ণ আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে প্রীতিলতাকে লিখিয়াছিলেন। শেষ পত্রখানি ২৯-৭-৩১ তারিখে লিখিত। ইহারই ৫ দিন পরে ৪ঠা আগষ্ট তারিখ রাত্রে রামকৃষ্ণের ফাঁসি হয়।

এই পত্র লিখিবার সময় রামকৃষ্ণ জ্বরে ভুগিতেছিলেন—পত্রে সে কথার উল্লেখ আছে। এই জ্বর অবস্থায়ই রামকৃষ্ণের ফাঁসি হয়। এই পত্র দুইখানি অন্যান্য কাগজপত্রের সহিত ২২-৬-৩২ তারিখে ধলঘাটে সূর্য্য সেনের আবাসস্থলে পাওয়া গিয়াছিল। নির্ম্মল ও অপূর্ব্ব সেন ঐ স্থানে আহত হন। তাড়াতাড়ি ঐ স্থান ত্যাগ করিবার সময়ে সূর্য্য সেন ও প্রীতিলতা অনেকগুলি চিঠি-পত্র ওখানে ফেলিয়া আসেন। তাহার মধ্যে প্রীতিলতার স্বহস্তে লিখিত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সহিত আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে সাক্ষাৎ বিষয়ে একটি দীর্ঘ মর্ম্মস্পর্শী প্রবন্ধ ছিল, কিন্তু লেখকের নিকট ঐ প্রবন্ধের কোনো নকল না থাকায় উহা প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না। এই সকল পত্র ও রচনা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

প্রীতিলতার পত্র

১

শ্রীচরণেষু,—

মণিদা, এতদিন পর বুঝি তোমার স্বপ্ন সফল হতে চলল। তুমি চেয়েছিলে তোমার বোনটিকে স্বদেশজননীর পায়ে উপহার দাও, তাই কোন্ এক শুভদিনে তুমিই প্রথম আমাকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলে। দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভারে অবনতা, স্বেচ্ছাচারীর লাঞ্ছনায় উৎপীড়িতা—সে কথা তুমিই আমাকে প্রথম মনে করিয়ে দিয়েছিলে। দুঃখিনী মায়ের চোখের জল মুছাতে তুমিই আমায় ডাক দিয়েছিলে। তাই আজ সেই ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে কেবলই তোমার কথা মনে পড়ছে। বিধির বিধানে আজ তুমি কারাপ্রাচীরের অন্তরালে—যাকে তুমি নিজের হাতে মানুষ করলে তোমার সেই স্নেহের বোনটিকে বীরবেশে সাজিয়ে দিতে তুমি পারলে না, তাতে দুঃখ করবার কিছুই নেই আমি জানি—আমার এই অভিযান তোমার বন্দী জীবনকে আনন্দময় গৌরবময় করে তুলবে। আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার উপর তোমার যে বিশ্বাস ছিল আমি তার যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারি।

আমায় যেদিন তুমি স্বদেশবাণী শুনাও সেদিন সেই দেবতুল্য মানুষটির কথা আমায় কাছে বলেছিলে, আমি তার সন্ধান পেয়েছি। তোমার প্রেরিত অর্ঘ্য-স্বরূপ আমি নিজেকে তার পায়ে সঁপে দিয়েছি—তিনি আমাকে তোমার দেওয়া দানরূপেই গ্রহণ করেছেন—তোমায় কত আশীর্ব্বাদ করেছেন।

দাদা! যাবার আগে আমি অনেক পেয়ে গেলাম—অন্তর আমার কানায় কানায় ভরে গেছে, কি সুন্দর সঙ্গ আমি পেয়েছি। কত সুন্দর সুন্দর, উদার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় আমি পেলাম। আমার জীবন ধন্য হয়েছে। কত সুন্দর গভীর অনুভূতি আমার হৃদয়কে ঐশ্বর্য্যময় করে তুলেছে—স্মৃতির বোঝাও আজ কানায় কানায় ভরে উপচে পড়তে চায়। থাক্, সে অনেক কথা—আমি লিখে জানাতে পারব না। তুমি যাবার পর ভগবান আমায় অফুরন্ত দিয়েছেন—আমাকে দিনের পর দিন তোমারই দেখান পথের দিকে এগিয়ে এনেছেন—আমি এগিয়েই চলেছিলাম।

আমি দু'চোখ মেলে অনেক দেখেছি—আমারই দু'চোখের সামনে ভগবান তিনটি জীবনের যবনিকা টেনে দিয়েছেন—আমি তাঁদের চিনেছিলাম—জেনেছিলাম অতি আপন করে পেয়েছিলাম। ভগবানের কৃপা হলে একদিন সবই শুনবে। আমি লিখে জানাতে পারছি না—লিখতে গেলে হয়ত তার সবটুকু সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যাবে।

অনেক কথাই মনে হচ্ছে—তোমাকে হয়ত অনেক কিছুই বলার ছিল, কিন্তু বলতে না পেরেও আমার এতটুকু দুঃখ নেই—আমি বেঁচে থাকি আর না থাকি আমার অন্তরের বাণী একদিন তোমার কানে পৌছবেই।

তোমার বন্ধুটিকে বলো তাঁকে আমি মনে করেছি, খুবই মনে পড়েছে তাঁর কথা—আমার বিপ্লবী জীবনে তাঁরও ত একটি মহৎ দান আছে। আমি আজ হৃদয়ভরা কৃতজ্ঞতা নিয়ে তাঁর কথা মনে করছি। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়ো।

বিদায়ের বাঁশী বুঝি বেজে উঠল। আমি আমার সবটুকু সম্বল নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি—জানি না আমার যাওয়া হবে কিনা। ভগবানের কাছে শুধু এই প্রার্থনা—আমায় যেন আবার ফিরতে না হয়।

তোমার স্নেহাশীষ মাথায় করে আমি চললাম। আমার ভক্তিপ্রণতি জেনো। ইতি স্নেহের বোনটি।

২

প্রিয়বরাসু,

হয়ত ভাবছ, আমি তোমায় ভুলে গেছি। তবে না ভাবাটাই সম্ভব, কেন না তুমি ভাল করেই জান আমার বিপ্লবী-জীবনের সাক্ষীরূপেই আমি তোমাকে চেয়েছিলাম এবং সত্যিকার চাওয়াই চেয়েছিলাম তাতে এতটুকু ফাঁকি ছিল না। তুমি আমার মন বুঝেছিলে এবং যতদিন সামনে ছিলাম আমাকে খুব ভাল করেই বুঝতে দিয়েছ যে তুমি আমায় খুবই ভালবাসতে। কিন্তু ভাই মনে পড়ে কি এক এক দিন আমি তোমায় বলতাম—আমাদের এই বন্ধুত্বের বন্ধন খাঁটি হবে সেদিন যেদিন তুমি সর্ব্বস্ব ছেড়ে আমার আদর্শ ও সাধনাকে তোমার জীবনে মূর্ত্ত করে তুলবার জন্য ছুটে আসবে। মনে পড়ে কি তোমার ছোট খাতাটিতে লিখে দিয়েছিলাম—আমাকে ভুলে যেও কিন্তু যে বীণা তোমায় শুনিয়েছি তাহা ভুলো না। তবেই আমি তোমার ভালবাসাকে এতটুকু সন্দেহ করব না।

আমার আদর্শকে তুমি সুন্দর দেখেছিলে তাই তুমি আমায় এত ভালবাসতে। জানি না—তাই কিনা, কিন্তু আমার সেই ধারণা, এবং তাই হলে আমি খুশী। কিন্তু আমার আদর্শকে সুন্দর দেখে আমাকে ভালবেসে ক্ষান্ত হলে চলবে না। তাই আমি একান্ত মনে চাই যে তুমি একদিন তাঁর কাছে ছুটে এস—যে সর্ব্বত্যাগী মহৎ লোকটির কথা আমি তোমার কাছে বলেছিলাম। আমি বড়ই দুঃখ নিয়েই এসেছিলাম—তুমি আমায় কথা দাওনি বলে। মনে মনে সঙ্কল্প করে এসেছিলাম আর একদিনও তোমাকে জিজ্ঞেস করব না—নিজের জীবন উৎসর্গ করে তোমাকে এ পথে একেবারে টেনে আনব। আজ যাবার বেলায় আমি সে বিশ্বাসই নিয়ে যাচ্ছি—ইচ্ছা হয় আমার এ বিশ্বাসের মর্য্যাদা করো।

বিদায়ের বাঁশী বেজে উঠেছে। আমি চললাম ভাই। তোমরা আমার জীবনে অনেক আনন্দই দিয়েছিলে—তাই যাবার বেলায় তোমাদের মনে না করে পারছি না। তোমাদের মধুর সঙ্গ আমাকে অনেক দুঃখই ভুলিয়ে রেখেছিল তাই আজ তোমাদের প্রতি হৃদয়ভরা কৃতজ্ঞতা নিয়ে যাচ্ছি। তোমার কাছে আমি আরও ঋণী। আমার দুঃখে তুমি কেঁদেছ, আমার মুখে তুমি হাসি দেখলেই তুমি হেসেছ—আমার কত অন্যায় আবদার তুমি রক্ষা করেছ—এতখানি আপন তুমি আমায় করে নিয়েছিলে। আমিও আজ যাবার বেলায় তোমাকে খুবই মনে করছি এবং বুঝতে পারছি যে আমার অন্তরেও সত্যিকার অনুভূতিই ছিল তোমার জন্য।

আজ বেশী কিছু বলবার নেই, অনেক কথাই তোমাকে বলা হয়েছে—অনেক কথাই তোমার শোনা হয়েছে—নূতন করে বলবার কিছুই নেই।

যাবার বেলা তোমাকে মনে করেছিলাম—এ কথাটা যাতে তুমি জান সেই উদ্দেশ্যেই তোমার জন্য দু'চারটে কথা লিখে গেলাম।

আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জেনো ইতি—

৩

প্রীতিলতার রচনা

ঐ যে রণভেরী বেজে উঠেছে, চল সবাই চল, আর দেরী নয়—শুভ শঙ্খ বেজে উঠেছে—বিজয় নিশান উড়িয়ে চল আমরা মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি, আমাদের এই অভিযান ব্যর্থ হবে না—ইহা ভারতবাসীকে ডেকে বলছে "দিন আগত ঐ"।

মাগো তোর শৃঙ্খলতার মোচন করতে আর কত রক্ত চাই মা? কত দিনে তোর দুঃখ ঘুচবে মা? বুকের রক্ত

দিয়েও কি তোর চোখের জল মুছাতে পারলাম না। তুই কি আরও কাঁদবি? আর কাঁদিসনে মা। একবার তোর চোখে হাসি দেখতে চাই মা।

বুঝেছি আমি সব বুঝেছি। ভগবান আমায় আর একবার ব্যথা দিয়ে পরখ করে দেখলেন, আমায় কাছে টানলেন, আমি বুকের মধ্যে তাঁর সাড়া পেয়েছি। আমি তাঁকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেছি। সে যে আমার বড়ই আপন সে কথা ভুলেছিলাম বলেই ত এমন করে আমার ভুল ভেঙে দিয়ে গেল, আমাকে সে যে বড়ই ভালবাসে।

ক্রমশঃ

সাহিত্য ও জনগণ

শ্রীনীলরতন দাশ

সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবরাশি মানুষের অন্তরে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাহাকে রূপে রসে মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করাই সাহিত্যের কাজ। সাহিত্যের মূল উৎস রহিয়াছে এই মাটির মানুষের প্রাণভূমিতে এবং মুখ্যতঃ এই মানুষকেই অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে সাহিত্য, কাব্য ও শিল্পকলা। জনৈক লেখক সত্যই বলিয়াছেন—"মানুষের প্রথম ও শেষ পরিচয় এই মাটির সঙ্গে, কাজেই কবি বা সাহিত্যিক মাটির মায়া ছেড়ে, পৃথিবীর বন্ধন কাটিয়ে এমন কোনও জগতের পরিচয় জানেন না, যার অধিবাসীরা তাঁকে অভাবনীয় কোনো মালমশলার যোগান দিবে—অচিন্তিতপূর্ব্ব কোনো কাব্য বা সাহিত্য রচনার জন্ত।" বস্তুতঃ সাহিত্যের কাজ শুধু কল্পনাকে লইয়া বিলাস করাই নয়—মাটির মানুষের, মানব-সমাজের অস্ফুট বেদনাকে রূপ দেওয়াই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কালের ললাটে সেই সাহিত্যই কোহিনুরের মত দীপ্তি পায়, যাহা মানুষকে মানুষের আত্মীয় করে, যাহা প্রাণের সঙ্গে প্রাণকে মিলাইয়া দেয়, হৃদয়কে হৃদয়ের নিকটে আনে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"অখণ্ড মানুষকে প্রকাশ করাই সাহিত্যের কাজ, বাহিরের জগৎকে অন্তরের জগৎ, মানুষের জগৎ করিয়া তোলাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।"..."সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ।"..."মানুষের প্রবাহ হু হু করে চলে যাচ্ছে; তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাকবে না, কেবল সাহিত্যে থাকবে। এইজন্ত সাহিত্যের এত আদর, এইজন্তই সাহিত্য সর্ব্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার।... আমার প্রধান কথাটা এই, সাহিত্যের জগৎ মানেই হচ্ছে মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশ্রিত জগৎ। যেমন করেই দেখি আমরা মানুষকেই চাই, সাক্ষাৎ ভাবে বা পরোক্ষভাবে। মানুষের সম্বন্ধে কাটাছেঁড়া তত্ত্ব চাইনে, মূল মানুষটিকেই চাই। তার হাসি চাই, তার কান্না চাই, তার অনুরাগ বিরাগ আমাদের হৃদয়ের পক্ষে রৌদ্রবৃষ্টির মত।"

যুগে যুগে, দেশে দেশে যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে আমরা দেখিতে পাই—সেই সেই যুগের ও দেশের বিশেষ বিশেষ অবস্থার মুক্তির আকৃতি। চিরকাল নিষ্পিষ্ট অধঃপতিত জীবন্মৃত মানুষের মুক্তি-মন্ত্র যাঁহারা কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বের অমর সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পীগোষ্ঠী। গ্যেটে, শীলার, হুইটম্যান্, ভিক্টর হুগো, টলষ্টয়, গোর্কি, ডষ্টয়ভস্কি, বায়রণ প্রমুখ জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা মানব-সমাজের বাস্তব অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া একদা যে লেখনীর জয়যাত্রা পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহাতে নির্যাতিত মানুষের আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ করিয়া জনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার বাণীই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। জার-শাসিত রুশিয়ার লাঞ্ছিত উৎপীড়িত জনসাধারণ অদৃষ্টের উপর দোষ দিয়া দিনের পর দিন নীরবে অভিজাতসম্প্রদায়ের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং সচ্ছলতা সৃষ্টি করার জন্ত প্রাণান্তকর পরিশ্রম দ্বারা নিজেদের জীবনীশক্তি ক্ষয় করিয়া কোন প্রকারে দুর্ব্বিষহ জীবন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছিল। অত্যাচারের উপর সাহিত্যিকদের তীব্র কশাঘাত ও দরদী মনের বাণীই সেই রুশিয়ার মুক্তিপ্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িক ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"য়ুরোপে ফরাসীবিপ্লব মানুষের চিত্তকে যে নাড়া দিয়েছিল, সে ছিল বেড়াভাঙার নাড়া। এইজন্ত দেখতে দেখতে তখন সাহিত্যের আভিজাত্য প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্বজনীনরূপে। সে যেন রসসৃষ্টির সার্ব্বজনিক যজ্ঞ। তার মধ্যে ছিল সর্ব্বমানবের মুক্তির বাণী।...সেই বিশ্বকল্যাণ ইচ্ছার আবহাওয়ায় জেগে উঠেছিল যে সাহিত্য সে মহৎ, সে মুক্তদ্বার সাহিত্য সকল দেশে কালের মানুষের জন্ত; সে এনেছিল আলো, এনেছিল আশা।"

একদা সাহিত্য ছিল অভিজাত-সম্প্রদায়ের জীবননাট্যের দুন্দুভি। বিরাট মানবসমাজের একপ্রান্তে যে এক দল মুষ্টিমেয় নরনারী ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের প্রাচুর্য্যের মধ্যে আপনাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে বহন করিয়া চলিয়াছে, তাহাদিগকে লইয়াই ছিল সাহিত্যের কারবার। "সে দিনের সাহিত্যে ছিল রাজা-

বাদশাদের বুদ্ধিমত্তার কীর্তি, রাজনন্দিনী আর বাদশাজাদীদের গোপন প্রেমের কাহিনী, পৌরাণিক দেবদেবীর অলৌকিক মহিমা, দিগ্বিজয়ী মহাবীরদের অসির ঝঙ্কার আর ধনুকের টঙ্কার।" মানুষের মধ্যে যাহারা অসাধারণ তাহারাই ছিল সেদিন কাব্যের ও উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা, আর যাহারা সাধারণ তাহারা ছিল সাহিত্যে অস্পৃশ্য—সাহিত্যের দরবারে অপাংক্তেয়। কিন্তু কালক্রমে সাহিত্যের উদার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের দাবি প্রতিষ্ঠিত হইল। আমাদের দেশের বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, বৈষ্ণব-কবি মানুষের সার্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠার আবেদন জানাইয়া মানুষকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করিয়া কহিলেন—

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

তাঁহারা উচ্চবর্ণের রচিত ভেদবৈষম্যমূলক সমাজবিধির নাগপাশ হইতে জন সাধারণকে মুক্তি দিয়া সর্বজাতিকে শ্রদ্ধা করিবার এবং সকলকে ভালবাসিবার মহান আদর্শ প্রচার করিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"বৈষ্ণব কাব্যই আমাদের দেশের সাহিত্যকে প্রথম রাজসভার সঙ্কীর্ণ আশ্রয় হইতে বৃহৎ জনসমাজের মধ্যে বাহির করিয়া আনিল। পর্বতের গুহা ভেদ করিয়া ঝরণা বাহির হইল।···বৈষ্ণবধর্মপ্লাবনের সময় বিশ্বপ্রেম যেদিন বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে সমস্ত কৃত্রিম সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙিয়া দিয়া উচ্চনীচ শুচি-অশুচি সকলকেই এক ভগবানের আনন্দলোকে আহ্বান করিল, সেই দিনকার বাংলাদেশের গান বিশ্বের গান হইয়া জগতের নিত্যসাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু শুষ্কধর্ম যখন সর্বমানবের মহেশ্বরকে দূরে রাখিয়া মানুষের মধ্যে কেবল বাদ-বিচার এবং ভেদ-বিভেদের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম সীমাবিভাগ করিতে ব্যস্ত হয়, তখন সাহিত্যের রসপ্লাবন শুষ্ক হইয়া যায়, কেবল তর্কবিতর্ক-বাদবিবাদের ধূলা উড়াইয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।"

বৈষ্ণব-সাহিত্যের পরে আমরা দেখিতে পাই, মানুষের জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত দেশবাসীকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া নিজেদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলেন টেকচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু, প্রমুখ সাহিত্যরথিগণ। সাহিত্যে এত কাল যাহারা ছিল অস্পৃশ্য, সেই হাসিম সেখ আর রামা কৈবর্তের দলও আসন পাইল ইঁহাদের সাহিত্যে। তাঁহাদের সাহিত্য আজও মানুষের মনে নাড়া দেয় এবং সাড়া জাগায়।

বঙ্কিম-যুগের পর দেখি বঙ্গ-সাহিত্যের বিশাল অঙ্গন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠোচ্চারিত সর্বমানবের জয়গানে মুখরিত। কবি সারা জীবন "উদার ছন্দে পরমানন্দে" "নরদেবতার বন্দনা" করিয়াছেন। গীতাঞ্জলিতে যে আকুল ক্রন্দনের সুর কবির কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাতে শুনিতে পাই শুধু প্রেমে সকল মানুষের সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করিবার ব্যাকুল প্রার্থনা। মানুষের ভিতরে অস্বীকার করিয়া, মানুষের হাট হইতে দূরে থাকিয়া ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা বৃথা,—এই মূলতত্ত্ব গীতাঞ্জলির অনেক গানে আছে। তাই তো তিনি বলিয়াছেন, "বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি, সেই তো স্বর্গভূমি।" তাই কবির প্রথম জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা,—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

এবং তাঁহার শেষ জীবনের উক্তিতে দরদী মনের সেই একই ব্যাকুলতা আমরা শুনিতে পাই,—

"আমি চাই বন্ধুজন যারা,
তাহাদের হাতের পরশে—
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাবো জীবনের চরম প্রসাদ,
নিয়ে যাবো মানুষের শেষ আশীর্বাদ।"

রবীন্দ্র-যুগে শরৎ-সাহিত্যেও আমরা সাধারণ মানুষের জয়গান শুনিতে পাই। শরৎচন্দ্র সাহিত্যের দরবারে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসিলেন সেই সব নরনারী, যাহারা অত্যন্ত পরিচিত বলিয়াই আমাদের কাছে পাইয়াছে শুধু উপেক্ষা আর অনাদর। তিনি তাহাদিগকে অনাদরের আবর্জনাস্তূপ হইতে তুলিয়া আনিয়া তাহাদের ধূলিমলিন ললাটে পরাইয়া দিলেন শ্রদ্ধা ও প্রীতির চন্দনতিলক। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই; যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসেব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোন দিন ভেবে পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই। ওদেরই বেদনা দিলে আমার মুখ খুলে; এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারে দুঃসহ সুবিচার। তাই, আমার কারবার এদের নিয়ে।"

শরৎচন্দ্রের পর বর্তমান যুগে কয়েকজন শক্তিশালী সাহিত্যিক সমাজের উপেক্ষিত নির্যাতিত জনগণের বেদনাকে সার্থকভাবে সাহিত্যে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শুধু বিলাসের চিত্র আঁকিয়া, সৌখিন সাহিত্য শিল্প ও কাব্য সৃষ্টি করিয়া ভাববিলাসিতা চরিতার্থ করিলে শিল্পরস জীবনের মর্মমূলে পৌঁছে না, এবং সাহিত্যরস সমাজ-জীবনের একেবারে মূলদেশে অভিসিঞ্চিত না হইলে সমাজ শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হয়। আর দুর্মমূলক পেলবতার

জাতির পৌরুষ আজ্জয়—তাহার কর্ম্ম-শক্তিতে আনিয়াছে পঙ্গুতা, জীবনে দেখা দিয়াছে দুর্নীতি, চিত্তে জাগিয়াছে অবসাদ। "এই অবসাদের দিগন্তব্যাপী অন্ধকারকে অপসারিত করার জন্ত আজ প্রয়োজন সেই সাহিত্যের, যার সৃষ্টি চিত্তের সবলতা থেকে, বুদ্ধির সমগ্রতা থেকে, জীবনের প্রাচুর্য্য থেকে।" আজিকার স্বাধীন গণতন্ত্রের যুগে সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পীরা মানুষকে এবং মানুষের সমাজকে দূরে না রাখিয়া তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া সাহিত্য ও শিল্পের ভিতর দিয়া জাতির অভীপ্সাকে করিয়া তুলুন ঊর্দ্ধমুখী। তাঁহাদের কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠুক জনগণের জয়-গান। তাঁহাদের সৃষ্টি যেন আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে, উদ্ঘাটিত করে জীবনের বিশাল দিগন্তকে, আমাদের চরিত্রকে করিয়া তুলে পৌরুষের মহিমায় সমুজ্জ্বল—আমাদের চিত্তে আনিয়া দেয় নবীন কর্ম্মপ্রেরণা।

কমলমণির ডাঙা

শ্রীনীহাররঞ্জন ঘোষাল

শ্যামনগরে প্রথম যেদিন পাটের কল চালু হ'ল সেদিনের কথা আজ আর কারও স্মরণ নেই। কিন্তু 'কমলমণির ডাঙা' সেদিনের স্মৃতিকে এখনও বহন করছে। সেদিন পূর্ব্ববঙ্গ থেকে কাঁচা পাট আসতে লাগল শ্যামনগরে—তৈরী হ'ল বস্তা, আর মুনাফার অঙ্ক বস্তাবন্দী হয়ে জমতে লাগল বিলিতী ব্যাঙ্কে।

পাটের কলের বড় সাহেব মুখুজ্জে-বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে গজাননবাবুকে চাকরি নিতে অনুরোধ করে বললেন, "ব্যবসায় করে সব টাকা আমরা দেশে নিয়ে যেতে চাই নে। তোমাদের মধ্যেও কিছু টাকা বিলিয়ে দিতে চাই। আমাদের একজন বড়বাবু দরকার। তোমাকে কালকেই কাজে যোগ দিতে হবে।" সাহেব চলে যাওয়ার পর গজাননবাবুর পিতা গামছা পরে গাড়ু হাতে এসে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন। সাহেব তক্তপোশের যে-অংশটিতে বসেছিলেন, সেই অংশটি গাড়ুর জল. দিয়ে শোধন করে ছেলেকে বললেন, "সাহেবের আপিসে বড়বাবুর চাকরী পাওয়া ভাগ্যের কথা, সে চাকরী যদি আবার বৈঠকখানায় বসেই পাওয়া যায় তবে জানবে যে, আমাদের উপরে মা কালীর অসীম দয়া আছে। অফিস-ফেরত জামা কাপড়গুলো গোয়ালঘরে রেখে এস। আমি সেখানে একটা দড়ি টাঙিয়ে রাখব।"

মাইনর পাস-করা গজানন বাবু পরের দিন পঞ্চাশ টাকায় সই লাগিয়ে বড়বাবুর চেয়ারে গিয়ে বসলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাওয়া কেবল মা কালীর দয়ারই সম্ভব হ'ত না, বাবা তারকেশ্বরের সোজাসুজি পক্ষপাতিত্ব না থাকলে, বড়বাবুর চাকরী কেউ পায় না এটাই ছিল সকলের বিশ্বাস। গজানন মুখুজ্জের সৌভাগ্যে শ্যামনগরের অনেকেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠল। শীতের রাতে লেপের তলায় শুয়ে কত নব-বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর গায়ে মৃদু আঘাত করে বলেছে, "সবাই তো যাচ্ছে পাটের কলে চাকরী করতে। পঞ্চাশ না পাও, পঁচিশ টাকা তুমি নিশ্চয়ই পাবে।"

শীতের প্রকোপে কুঁচকে-যাওয়া পা দুটো তখন পর্য্যন্ত অনেক স্বামীরই গরম হয়ে ওঠে নি—তারা জবাব দিত,"মাইনর পাস করা গজানন যেখানে পঞ্চাশ টাকা পায়, সেখানে আমি যাব পঁচিশ টাকায় চাকরী করতে ? হ্যাঃ।"

"তুমি তো ওটাও পাস করতে পার নি।"

"কিন্তু বাবা আমার এন্‌ট্রান্স-পাস। শ্যামনগরের এন্‌ট্রান্স-পাস বাপের কোন্ ছেলে গেছে পাটের কলে গোলামি করতে শুনি ?"

সে রাত্রে অনেক স্বামীরই পা দুটো কুঁচকে ছিল বটে, কিন্তু আজ এই এক শ বছরের মধ্যে শ্যামনগরের শতকরা নব্বই জন কুলবধূর স্বামীই পাটের কলে গোলামি করে। কয়েক বছর আগে যেমন ইংরেজের হয়ে লড়াই করবার জন্ত ঢাক পিটিয়ে বহু লোককে সৈন্তদলে ভর্ত্তি করা হ'ত, সে-যুগে তেমনি পাটের কলে কেরাণী ভর্ত্তি করবার জন্ত বড়সাহেব কেবলমাত্র এক'দনই মুখুজ্জে-বাড়ীর বৈঠকখানায় পঞ্চাশ টাকার বড়শী ফেলে এসেছিলেন। সেই বড়শী ধরে আজও বড়সাহেবরা পুরো শ্যামনগরখানাকে ডাঙে খেলাচ্ছেন।

মুখুজ্জে-বাড়ীর বৈঠকখানায় তক্তপোশটাকে যখন জল দিয়ে শোধন করা হয়েছিল তারপর চার পুরুষ অতীত হয়ে গেছে। তখন শ্যামনগরে বিশুদ্ধ জলের অভাব ছিল না। কিন্তু বিগত পঁচিশ বছরে জল দূষিত হয়েছে, কুইনিন-মিক্‌চারের হয়েছে প্রাচুর্য্য। সবাই এখন কুইনিন খেয়ে পাটের কলে গোলামি করতে যায়। ফলে কর্ম্মক্ষম লোকের অভাবে শ্যামনগরের মাঠে ধানের বদলে বনধাগড়া জন্মাতে লাগল আর পুরুষদের আয়ু গেল কমে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা মিটবার আগেই অনেক যুবতী বিধবা হ'ল। পাটের কলের মুনাফার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিধবার সংখ্যা বাড়তে লাগল। কলকাতার

বিধবা-আশ্রমের চাঁদার খাতার মোটা অঙ্কের চৌপর মাথায় দিয়ে অনেক মহাজন নাম সই করলেন বটে, কিন্তু বিধবার সংখ্যা তাতে কমল না। শুধু ইট, সুরকী আর খাট-পালঙ্ক বাড়ল।

মুখুজ্জে-বাড়ীর কমলমণি ষোল বছরে বিধবা হয়েছে। বড়বাবু গজানন মুখুজ্জের একমাত্র নাতি তপন মুখুজ্জেও বংশ-গত অধিকারের জোরে পাটের কলে চাকরী পেয়েছিল। প্রায় এক শ বছর আগেও অনেকে নাতির অন্নপ্রাশন দেখে গেছে। কিন্তু অধুনা সেই পিতামহদের নাতিরা অনেকেই সন্তানের মুখ দেখতে পায় না। তপন মুখুজ্জেও পেলে না। কমলমণির বয়স যখন ষোল, তখন সহসা তপন মুখুজ্জে মারা গেল। সবাই বলে, "তপনবাবুর যক্ষ্মা হয়েছিল।"

কমলমণি পেল একখানা টিনের ঘর, এক বিঘে জমি আর সেই সঙ্গে একটা তালগাছ। তালগাছে ফল হ'ত না একটাও, কিন্তু রস হ'ত প্রচুর। রসের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে, মুলুখী সিকার ভিরিশ লক্ষ বিড়ি ফুঁকে জীবন কাটিয়ে গেছে তপন মুখুজ্জের বাবা আর তপন নিজে। পাটের কলে উপার্জ্জিত টাকা খরচ হয়ে গেল তালগাছের গোড়ায় সার লাগাতে। পাটের কলে চাকরী ছিল পিতাপুত্র উভয়ের পেশা, আর তাড়ির রস খাওয়া ওদের নেশা। পেশার চেয়ে নেশাই ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠল, ফলে পিতাপুত্র দু'জনকেই অকালে সংসার ছেড়ে এমন এক জায়গায় যেতে হ'ল যেখানে সম্ভবতঃ নেশার বালাই নেই।...

কমলমণি বিছানায় শুয়ে অনেক রাত অবধি ঘুমোতে পারে না। বহুক্ষণ পরে তন্দ্রা আসে। স্বপ্নে দেখে, স্বামী তার তালগাছের তলায় এসে দাঁড়িয়ে আছেন। কেমন দৃঢ় বলিষ্ঠ তাঁর দেহ! বিয়ের শুভদৃষ্টির সময় যেমন দেখেছিল ঠিক তেমনটি—তাড়ির নেশায় ক্ষয়ে-যাওয়া কঙ্কালসার মূর্ত্তি নয়।...

স্বামী যেন নির্দ্দেশ করছেন, শুধু তাদের পরিবারের নয়, সারা গাঁয়ের সর্ব্বনাশের মূল ঐ তালগাছটাকে কেটে ফেলতে। ...হঠাৎ কমলমণির তন্দ্রা টুটে যায়। নলখাগড়ার বনের ফাঁক দিয়ে বহুক্ষণ সে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে তালগাছটার দিকে। এদিকে প্রহর গড়িয়ে চলে। কমলমণির চোখে ঘুম আসে না।...

তপনবাবু মারা যাওয়ার পর মুখুজ্জে-বাড়ীর তালগাছতলায় তাড়ি-রসিকদের ভিড় আরও বাড়তে লাগল। কমলমণি কাউকে নিষেধ করলে না, কেউই বঞ্চিত হ'ল না তাড়ির রস-পান থেকে। কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে গ্রামবাসীরা তালগাছতলার জমিটুকুর নামকরণ করলে কমলমণির ডাঙা। দীনবন্ধু আর হরেন চাটুজ্জে প্রাতঃকালেই তালগাছতলায় এসে জুটতে লাগল। দীনবন্ধু কারও অনুমতি না নিয়েই পিঁপড়ের মত সুড়সুড় করে তালগাছের প্রায় ডগায় গিয়ে ওঠে। মাটির কলসীটা পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দেয়, পাটের কল থেকে চুরি করা ছুরি দিয়ে তালগাছের গায়ে খানিকটা বেশী করে গর্ত করে রাখে। সন্ধ্যায় সময় এসে আবার একটা শূন্য ভাঁড় ঝুলিয়ে রেখে যাবে। চাটুজ্জেই হোক আর নমশূদ্রই হোক, এখানে সব সমান—বিনি পয়সায় তালের রস খেতে বর্ণাশ্রমের গায়ে আঁচড় লাগে না।

প্রতিদিনই দীনবন্ধু আর হরেন চাটুজ্জে রসের কলসী নিয়ে চলে যায়, কমলমণির অন্দরমহলের দিকে ফিরেও তাকায় না ওরা। কমল মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। শীতের সকালে খোঁপার নীচে ঘাড়ের দিকটা সহসা ঘেমে ওঠে। মনে মনে ভাবে যে, শ্যামনগরের কন্ন পুরুষগুলো সব মাটির কলসী হাতে করে কেবল তালগাছই খুঁজে বেড়ায়। বিস্ময় বোধ করে কমলমণি।

অল্পকাল পরেই কমলমণি লক্ষ্য করল যে, বাড়ীখানাকে যেন উনিশ লক্ষ নলখাগড়ায় ঘিরে ফেলেছে। ওর বিশ্বাস ছিল যে, গ্রামের পরিপূর্ণ যৌবনের পলিমাটিতে নলখাগড়া জন্মায় না।

জন্মায় এবং বাঁচেও। যে মাটিতে মানুষের পদচিহ্ন পড়ে না, সেখানে আগাছাগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় আর প্রচার করে প্রকৃতির উদ্দাম বলিষ্ঠতা। শিল্পীর ছোঁয়াচ লাগলেই, শক্তির বিকাশের মধ্যে আসে সৌন্দর্য্য। ফুটন্ত গোলাপ আর হাস্নুহানাগুলো এই সৌন্দর্য্য বুকে নিয়েই সবাইকে এক দিন মুগ্ধ করে দেয়। কমলমণিও এমনি করে ফুটে উঠতে চেয়েছিল। সে পারল না। তপন মুখুজ্জে মারা গেল। হরেন আর দীনবন্ধু মরে নি বটে, কিন্তু প্রাণ ওদের ধুকপুক করছে। ওরা তাই কমলমণির ডাঙায় কেবল তাড়ির গন্ধই পেল।

আগে গ্রামে তালগাছের অভাব ছিল না; তাড়িও মিলত প্রচুর। কিন্তু এখন যত্নের অভাবে আর নলখাগড়ার বনের প্রভাবে সব শুকিয়ে মরে গিয়ে একটিতে মাত্র ঠেকেছে, তাই কমলমণির ডাঙার প্রতি তাদের এত ভক্তি। এদিকে কিন্তু মুখুজ্জে-বাড়ীর অবগুণ্ঠন পরে মুখুজ্জে-বাড়ীর বৌ হাঁপিয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে প্রায় চার বছর আগে। শ্যামনগরের রেল-লাইনের পূবদিকে আমেরিকান সাহেবরা তাঁবু ফেলবে। তাই ওরা কল চালিয়ে জঙ্গল সাফ করছে। সে দু'একবার উঁকি দিয়ে দেখেছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই যেন সারা মাঠ পরিষ্কার হয়ে গেল। ইচ্ছে করলে ওরা শ্যামনগরের বুকের উপর থেকেও শতাব্দীর জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করতে পারত। পীড়িত মানুষগুলোকে যদি ওরা বাঁচাতে পারত তবে শুধু কমলমণি নয় সারা গ্রাম আবার নূতন করে বেঁচে উঠত।

কিন্তু আমেরিকান সাহেবেরা শ্যামনগর গ্রামকে কিংবা কমলমণিকে বাঁচাতে আসে নি, তারা এসেছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে।

কিন্তু কমলমণির যে নিজের গ্রামকে বাঁচাতেই হবে। একটা তালগাছের মধ্যে যেন তার জীবনের সবগুলো সমস্যা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই তালগাছ যেন একটা জীবন্ত সত্তা, তার শ্বশুরকে আর স্বামীকে অকালে হত্যা করেছে, তিল তিল করে শোষণ করছে গাঁয়ের লোকেদের জীবনীশক্তি। জীবনের সকল সাধ বুঝি তার গলে গলে তালবৃক্ষের সর্ব্বদেহে সর্ব্বনাশা রসের সঞ্চার করছে। গ্রামবাসীদের পৌরুষ তাদের পচা সিতারের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে।...কমলমণি তাই আজ নিজের হাতেই উঠোনের বাড়ন্ত মনসাগাছগুলো কাটতে বসল। লাইনের ওপার থেকে তবে সাহেবেরা মুখুজ্জেবাড়ীর টিনের ঘরখানা দেখতে পাবে। সেই সঙ্গে আরও দেখতে পাবে যে, কমলমণির ডাঙায় কেবল মনসাগাছই জন্মায় না। বুঝতে পারবে, এখানকার পুরুষদের পৌরুষ না থাকলেও মেয়ের আছে শক্তি।

অনেক রাত অবধি কমলমণি ঘুমোতে পারত না। কিন্তু কাল হয়তো সে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল। সাহেবদের কলের গান শুনতে শুনতে সে আজ ক'দিন থেকে একটু সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। জাগরণে যাকে পাওয়া সম্ভব-নয়, ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে তাঁকে স্পর্শ করা যায় অতি সহজ ভাবেই। স্বপ্নে তপন এসে তার কাছে দাঁড়ায়, যেন তাকে বলে, "কমল, তোমার শ্বশুরের এবং আমার অকাল-মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত তুমি কর, গাঁয়ের লোকদের বাঁচাও।

সেদিন ভোরবেলা কমল ঘরের বাইরে এসে দেখতে পেল যে, উঠোনে তার মানুষের পদচিহ্ন পড়েছে।

এলো হরেন চাটুজ্জে। দীনবন্ধু এখন পাটের কলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সাহেবদের কাছে ঠিকেদারী করছে। মাল কিনতে সে কলকাতায় গেছে। হরেন চাটুজ্জে বলল, "তোমার দাওয়ায় বসেই সাহেবদের শিবিরগুলো দেখা যায় দেখছি। মনসাগাছগুলো সব কেটে ফেললে কেন?"

"উপায় কি চাটুজ্জে মশাই, এখন থেকে সাবধান না হলে, ঘরের মধ্যেও আগাছা জন্মাবে। তামনগরে আর আছে কি? শুধু মনসাগাছ।" "অবশ্য আপনাদের মত অকর্ম্মা পুরুষের দল থাকতে গাঁয়ে মনসাগাছ ছাড়া আর কি জন্মাতে পারে?"— বললে কমলমণি।

"কি আমাদের তুমি অকর্ম্মা বললে কমল?" হরেন চাটুজ্জে হুঙ্কার ছাড়লে। হাতে তার তাড়ির কলসী ছিল। দেহের কম্পনে খানিকটা রস উছলে মাটিতে গেল পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে টাট্টু ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠে চাটুজ্জে হাহাকার করে বলল, "ভাগের মা গঙ্গা পায় না। পাঁচ জনে মিলে ভাগাভাগি করে এক কলসীতেই রাত কাটাতে হয়। তার মধ্যে অর্দ্ধেকটা যদি পড়েই যায়, তবে রাত যে আর কাটতে চাইবে না কমল।" বলেই সে হন্ হন্ করে ছুটে বেরিয়ে গেল। দোদুল্যমান তাড়ির কলসীতে কমলমণি দেখতে পেল, সমগ্র তামনগরের পৌরুষ যেন হাল্কা হাওয়ায় তাল-পাতার মত ডাইনে-বাঁয়ে হেলে-দুলে পড়ছে।

সন্ধ্যের দিকেই কমলমণি আজ নিজের কর্ত্তব্য স্থির করে নিয়েছিল। নিজের হাতে মুখুজ্জে-বাড়ীর এবং গাঁয়ের সর্ব্বনাশের মূল তালগাছটাকে সে কেটে ফেলবে। মুখুজ্জে-বংশের সর্ব্বনাশের স্রোতে তামনগরের ভবিষ্যৎকে সে ভেসে যেতে দেবে না। বিস্মৃতপ্রায় বড়বাবু গজানন মুখুজ্জের শেষ অন্ন পাঁঠা বলি দেওয়ার শাণিত খাঁড়াটা সে সজোরে দু'হাত দিয়ে তুলে ধরল। তার পর সে এগিয়ে গেল তাল-গাছের দিকে। অশুভ ধ্বংসকারিণী বিপ্লবী-শক্তির মূলে শক্তি যোগালেন ঈশ্বর—সাহায্য করলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর গজানন মুখুজ্জে।

সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে খাঁড়াটা চক্ চক্ করে উঠল কি না, কমলমণি দেখতে পেলে না। দেখতে পেলে না এমন কি, দীনবন্ধু আর হরেন চাটুজ্জে। প্রথম কোপ যখন দিতে গেল, তখন যেন সে শুনতে পেলে, কাতরকণ্ঠে কে বলছে "পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি নষ্ট করো না।"

মনে হ'ল শ্বশুরের কণ্ঠস্বর, পরক্ষণেই যেন দেখলে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বামী, বজ্রকণ্ঠে যেন আদেশ দিচ্ছেন—"আঘাত কর কমল, আঘাত কর। অকল্যাণকে ধ্বংস কর।"

একটু থমকে দাঁড়াল কমলমণি। সে আঘাত করল তাল-গাছের গোড়ায়। উপরে বাঁধা মাটির কলসী একটু দুলে উঠল। ভ্রূক্ষেপ করল না সে। রেল-লাইনের ওপারে পশ্চিমের সভ্যতা এসে তাঁবু ফেলেছে। কমলমণি আশা করেছিল, সাহেবেরা একদিন আসবে রেল-লাইনের এপারে। জঙ্গল-কাটা যন্ত্র দিয়ে তামনগরের তালগাছগুলো কেটে ফেলবে। সে-আশা তার সফল হয় নি। রেল-লাইনের সীমায় এসে সভ্যতার চাকা গেছে আটকে।

খাঁড়ার ঘায়ে তালবৃক্ষ যখন ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে, তখন দূরে দেখা গেল একজন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে দীনবন্ধুর আগমনশীল মূর্ত্তিখানি। দীনবন্ধু আজকাল তামনগরের বড় ঠিকেদার। গাছকাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—এবার কমল-মণি দেহের সবটুকু শক্তি সংহত করে হানলে প্রচণ্ড আঘাত। শেষ আঘাতে তালগাছ পড়ল ভেঙে।

তালগাছের নীচে চাপা পড়ল তপন মুখুজ্জের বিধবা স্ত্রী কমলমণি।

আগামী কল্যের প্রথম প্রভাতে, সম্ভবতঃ নূতন সভ্যতার বীজ বপন করা হবে কমলমণির ডাঙায়। এক দিন সে বীজ হয়ত মহীরুহে পরিণত হবে। বিপ্লবের রসে মাটির কলসী সেদিন সোনার কলসীতে রূপান্তরিত হওয়াও বিচিত্র নয়। একটা মুমূর্ষু সভ্যতার ক্লান্ত পদধ্বনি বুঝি কমলমণির ডাঙায় এসে থেমে গেল।

আরভিল

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

আরভিল হইতেছে চীনাবাদাম হইতে প্রস্তুত বস্ত্রবয়নোপযোগী এক প্রকার কৃত্রিম আঁশ বা তন্তু। কৃত্রিমভাবে বস্ত্রসমস্যার সমাধান এই নূতন নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেই প্রাকৃতিক বস্ত্রদানকারী পদার্থের অনুকরণে সর্ব্বপ্রথম কৃত্রিমভাবে বস্ত্রপ্রস্তুত-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। কার্পাস-বস্ত্র, মসিনা-বস্ত্র প্রভৃতির প্রধান উপাদান সেলুলোজ নামে এক প্রকার জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ এবং এই সেলুলোজের সাহায্য গ্রহণ করিয়াই কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন তৈয়ারী হইয়াছিল। ১৮৯৪ সালে রেশম, পশম প্রভৃতির অনুকরণে প্রোটিন গঠিত আঁশ সর্ব্বপ্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল। কৃত্রিম রেশম উৎপাদনে অত্যধিক সাফল্যহেতু বহুদিন যাবৎ অন্য কোন নূতন কৃত্রিম আঁশের দিকে তত বেশী মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। ১৯৩৫ সালে দুগ্ধমধ্যস্থ 'কেসিন' নামে প্রোটিন হইতে যে কৃত্রিম সুতা তৈয়ারী হইয়াছিল তাহার নাম 'লেনিটল'। এদিকে মনুষ্য-সমাজে বস্ত্রের অভাব বর্দ্ধিত হওয়ায় নানাভাবে তাহা মিটাইবার চেষ্টা চলিতে থাকে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, দুগ্ধ অপেক্ষা উদ্ভিজ্জ প্রোটিন (যেমন সোয়াবিন, চীনাবাদাম প্রভৃতি) কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা বিশেষ সুবিধাজনক। তজ্জন্য সম্প্রতি চীনাবাদাম, সোয়াবিন, মৎস্যের বর্জ্জিত অংশ, পাখীর পালক প্রভৃতি হইতে বস্ত্র নির্ম্মাণোপযোগী সুতা তৈয়ারীর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পাখীর পালক, মৎস্যের বর্জ্জিত অংশ আবর্জ্জনা হিসাবে নষ্ট করা হয়, তাহা ছাড়া চীনাবাদাম প্রভৃতির প্রাচুর্য্যই লক্ষিত হয়। সুতরাং যদি এই জিনিসগুলি বস্ত্রে রূপান্তরিত করা যায় তবে হয় তো জগতের প্রতিটি মনুষ্যই উপযুক্ত পরিমাণে বস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারে। ইহাই হইল আরভিল আবিষ্কারের গোড়ার কথা।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানাস্থানে বিশেষভাবে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকায় এবং চীন, বোর্ণিও দ্বীপ, আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি বৎসরে প্রায় আশি লক্ষ টন চীনাবাদাম এই সমস্ত দেশে উৎপাদিত হইত। ১৯৩৯ সালে বিলাতের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ সর্ব্বপ্রথম চীনাবাদামের প্রোটিন হইতে কৃত্রিমভাবে বস্ত্রবয়নোপযোগী সুতা তৈয়ারী করিতে চেষ্টা করে। দেখা গেল, অতি অল্প খরচেই চীনাবাদাম হইতে কৃত্রিম পশম তৈয়ারী করা সম্ভব। ঐ বৎসরই আরভিল নাম দিয়া এই পশম রেজেষ্ট্রী করা হইল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাসমর আসিয়া পড়ায় সাময়িকভাবে আরভিল তৈয়ারীর কার্য্য স্থগিত রাখা হয়। যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী পুনরায় নূতন উদ্যমে কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইতিমধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগেও আরভিল তৈয়ারীর ব্যাপক বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

চীনাবাদামের ভিতর শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ তৈলাক্ত পদার্থ থাকে যাহা রান্নার কাজে এবং কৃত্রিম মাখন তৈয়ারী করিতে ব্যবহৃত হয়। প্রোটিন থাকে শতকরা ২৮ ভাগ; বাকী অংশ গরু-মহিষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। চীনাবাদাম উত্তমরূপে পরিপক্ক হইলে প্রোটিনের অংশ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রথমে খোসা ছাড়াইয়া চীনাবাদাম হইতে তৈল নিষ্কাশন করিয়া লইতে হয়। এই সময় উত্তাপ যাহাতে ৪০ ডিগ্রীর উপরে না উঠে সেদিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। তৈলমুক্ত চীনাবাদামের সহিত কম ঘন ক্ষার মিশ্রিত করিলে প্রোটিনের দ্রবণ মিলিবে। এই দ্রবণ হইতে কোন অম্ল প্রয়োগে পুনরায় প্রোটিন বাহির করিয়া লইয়া ক্ষার-সাহায্যে এমন প্রোটিন দ্রবণ করিতে হইবে যাহার ভিতর প্রোটিনের অংশ শতকরা ২০ হইতে ৩০ ভাগ থাকে। আরও কয়েকটি প্রক্রিয়ার পর এই দ্রবণ অতিক্ষুদ্র ছিদ্রের ভিতর দিয়া চালিত করিলে সুতার আকারে বহির্গত হইয়া আসিবে। সুতাগুলি বস্ত্রবয়নের উপযুক্ত করিতে হইলে আরও অনেকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্য লইতে হয়।

আরভিল সুতা দৃঢ়তায় পশম অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। তবে ভিজাইলে ইহার দৃঢ়তা অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং প্রাণীজ রেশম বা পশমের সহিত ইহা উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিলে বস্ত্রবয়ন বিশেষ সুবিধাজনক হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পশমের সহিত আরভিল ব্যবহার করিলে তাহা খাঁটি পশম অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট হয় না এবং অধিক দিন স্থায়ীও হয়। রেশমের সহিত এইরূপ ভাগে ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই মিশ্রিত বস্ত্র রেশম অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়; তাহা ছাড়া এই পোশাক তাপরক্ষক এবং ব্যবহারে আরামদায়ক। তুলার সঙ্গেও আরভিল মিশ্রিত করিয়া বয়নকার্য্য চলিতে পারে। যে সমস্ত যন্ত্রে পশম, তুলা প্রভৃতি হইতে সুতা কাটা এবং বস্ত্র বয়ন করা হয়, সেই সব যন্ত্রই আরভিলের জন্য অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। আরভিল বস্ত্র ঈষৎ হরিদ্রাভ।

পশম, তুলা প্রভৃতি রং করিবার নিমিত্ত যে সব রং ব্যবহৃত হয় তাহা দ্বারাই আরভিলও রং করা যাইতে পারে। পশমের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হইলে সুতাগুলি কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হওয়া প্রয়োজন; আরভিল তৈয়ারী করিবার সময়ই সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ভিজাইলে পশম যেরূপ সঙ্কুচিত হয় আরভিলও তদনুরূপ সঙ্কুচিত হয় বলিয়া ব্যবহারে কোন অসুবিধা হয় না। জলে ভিজাইলে আরভিল বস্ত্র পচিয়া যায় না বা উহাতে কোন প্রকার ছাতা ধরে না। কৃত্রিম রেশম তৈয়ারী করিতে যে খরচ পড়ে আরভিল প্রস্তুতে তদপেক্ষাও কম খরচ পড়ে। এক টন চীনবাদাম হইতে পাঁচ শত পাউণ্ড আরভিল সুতা পাওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের ঘরকন্নার কথা

শ্রীনীলিমা চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ-ইয়র্ক শহরে পদার্পণ করে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। বিরাট শহর, সেই অনুপাতে জনসংখ্যাও বিপুল, আকাশস্পর্শী সুবৃহৎ অট্টালিকাসমূহ, নদীর নীচে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ-পথ, বড় বড় প্রলম্বন সেতু, কংক্রীটের ছক-কাটা সুপ্রশস্ত সোজা রাস্তা, সব কিছুই হৃদয়কে বিস্ময়ে অভিভূত করে। টাইম-স্কোয়ারের দীপ্ত আলোর জৌলুস, চোখ ঝলসে দেয়। খবরের কাগজ বিক্রেতাদের হাঁকাহাঁকি নেই। রাস্তায় অগণিত মোটরগাড়ীর স্রোত, প্রতি মোড়ে মোড়ে স্বতশ্চল সঙ্কেতক—(Automatic Signalling) দিবারাত্র লাল ও সবুজের নিশানা এবং পথচারীদের সতর্ক করে রাস্তা পারা-পারের সাদা রেখা। বাড়ী-ঘর মাঠ ময়দান, বাস্, রাস্তা, ভূগর্ভে বিদ্যুৎ-চালিত ট্রেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এদেশে বাস্ ও ভূগর্ভ-ট্রেনে টিকিট-প্রথা নাই। সর্ব্বত্র এক ভাড়া—পাঁচ ও দশ পয়সা; স্লট-এ ফেলে যাত্রীরা চলে যাচ্ছে। টিকিট পরীক্ষা করার কনডাক্টর বা ইন্‌সপেক্টর নেই। মনে হ'ল সমস্ত মার্কিন জাতি যেন যন্ত্রচালিতবৎ চলেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা মেনে চলছে। পঞ্চম এভিন্যুর সু-উচ্চ হর্ম্ম্য ও চোখ-ধাঁধানো পণ্যশালার সুষমা অভিভূত ও আকৃষ্ট করবার মতই। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের জীবনযাত্রার যেন এক মানদণ্ড—তফাৎ শুধু আকারে। যে গ্রামে তিন শত মাত্র লোকের বাস তার এবং নিউ-ইয়র্ক, শিকাগো, ওয়াশিংটন শহরের বাহ্যিক রূপ অনেকটা একই ধরণের। ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরা পর্য্যন্ত শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাযুক্ত। এদের অভিধানে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, অনশন ও বস্ত্রহীনতা নেই।

এ দেশে কাক চিল, মশা মাছি রাস্তায় কুকুর বিড়াল বড় একটা নজরে পড়েছে বলে মনে পড়ে না। এই সব স্তরের জীব এদেশে জীবনধারণ করবেই বা কি করে? এখানে গৃহের আবর্জ্জনা রাস্তায় স্তূপীকৃত করা হয় না। ঢাকা দেওয়া ময়লা ফেলার গাড়ীর নিশানা পেলে গৃহস্থেরা যে যার বাড়ীর আবর্জ্জনার পাত্র রাস্তায় নিয়ে আসেন, অথবা শেষরাত্রে সেটাকে রাস্তায় নামিয়ে রাখেন। গাড়ী এসে ময়লা ঢেলে নিয়ে পাত্রটি রেখে চলে যায়। এ সব আবর্জ্জনার পাত্রও ঢাকা দেওয়া। তাই পূর্ব্বোক্ত স্তরের জীবদের আহার জুটবে কোথা থেকে? বড় বড় হোটেল ও হাঁসপাতালে আবর্জ্জনা পুড়িয়ে ফেলবার যন্ত্র আছে। এ দেশের মফস্বলে পানা-পুকুর, ডোবা, খাল, বিল, বন-বাদাড় কাঁটাবনের ঝোপ চোখে পড়ে না—অতএব মশা মাছিরও উপদ্রব নেই। রাস্তায় এক টুকরো কাগজ ফেললে জরিমানা দিতে হয়। আমাদের দেশে নাগরিক আইনে শাস্তির ব্যবস্থা নেই বলে আমাদের প্রতিবেশীরা অবলীলাক্রমে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে তিন-চার তলা উঁচু বাড়ী থেকে গৃহের যাবতীয় আবর্জ্জনা নীচে রাস্তার

আমেরিকার রান্নাঘর ও উনুন

উপর ছুঁড়ে ফেলেন। এবিষয়ে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেরই সমান আচরণ। সেই উপচীয়মান আবর্জ্জনারাশির উপর সুরু হয় রাজ্যের পশুপক্ষীর ভোজনপর্ব্ব। ও দেশে কিন্তু পাকা কংক্রীটের রাস্তা—ধুলো ও কাদার বালাই নেই। সকল বাড়ীতেই কাঁচের জানালা, তাতে ধুলোবালির উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। দেশটা শীতপ্রধান বলে জানালা বন্ধ রাখলে কষ্ট হয় না।

আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের জাঁকজমক দেখে মনে মনে এদের অবস্থার সঙ্গে আমার নিজের দেশের তুলনা প্রায়ই করতাম। আমরা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব্ব করে থাকি। অবশ্য অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রত্যেক জাতিরই থাকা উচিত, কিন্তু শুধু অতীতের গর্ব্বে আচ্ছন্ন হয়ে বর্তমান যুগধর্ম্মকে তো পাশ কাটিয়ে যাওয়া সমীচীন নয়। এদের জড়বাদী সভ্যতা থেকেও আমাদের শিক্ষণীয় ও অনুকরণ করবার অনেক কিছুই আছে।

মার্কিন দেশের শিক্ষা, রীতিনীতি, আচারব্যবহার, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, পারিবারিক জীবন সমস্তই আমাদের দেশের

রান্নাঘরের আর একটি দৃশ্য

সম্পূর্ণ বিপরীত। এদেশে এসে এ ধারণা মনে বদ্ধমূল হ'ল যে, মানুষের শ্রমের প্রকৃত মর্য্যাদা ও উপযুক্ত মূল্য এরা দিতে শিখেছে। নারী ও পুরুষ উভয়ে এখানে সমান মর্য্যাদা পেয়েছে। নারীরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করছে। পুরুষেরা তাঁদের উপযুক্ত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত নয়। কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রনৈতিক সকল ক্ষেত্রে তারা পুরুষের যোগ্য সহকর্ম্মিণী, পরাশ্রিত এবং পুরুষের মুখাপেক্ষী কৃপার পাত্রী নন।

এদেশে প্রায় শতকরা ত্রিশ জন নারী বাইরে আপিস ইত্যাদিতে কাজ করে জীবিকা অর্জ্জন করে থাকেন। দৈনিক আট ঘণ্টা তাঁদের কাজ করতে হয়, সপ্তাহে পুরো এক দিন ছুটি তাঁদের বরাদ্দ। তাঁদের স্বাস্থ্য-বীমা ও বেকার-বীমা বাধ্যতামূলক। আপিসের কাজের উপর আছে নিজেদের ঘরগৃহস্থালির কাজ, আর স্বামী-পুত্র-পরিজনদের দেখাশুনা। ঝি চাকর রাখা বহু ব্যয়সাপেক্ষ। প্রায় পাঁচশো টাকার কম মাইনেতে একটি ঝি রাখা চলে না। এদেশে সংসারের কাজ চালাবার জন্য চাকর, দারোয়ান, বেয়ারা, রসুই বামুন, ধোপা, জমাদার, কুলি ও মালী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন লোক রাখার রেওয়াজ নেই। বিভিন্ন কাজের জাতভেদ এখানে নেই। প্রচুর মাইনে দিয়ে একটি ঝি নিযুক্ত করলেন, সে তার নির্দিষ্ট আট ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উপরোক্ত যে-কোন কাজ করে দেবে। বহু ব্যয়সাপেক্ষ বলে সে দেশে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে ঝি চাকর নিযুক্ত করা সম্ভবপর হয় না। অনেকে দৈনিক ঘণ্টা হিসাবে বা সাপ্তাহিক ঘণ্টা হিসাবে ঠিকা লোক রাখেন। তাতেও ঘণ্টায় আড়াই টাকা আন্দাজ মজুরী দিতে হয়। সেজন্য রান্নাবান্না, বাসন মাজা, কাপড় ধোয়া ও ইস্ত্রি করা, ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজ মেয়েরাই করে থাকেন, এমন কি দরকার পড়লে ব্যাঙ্ক পোষ্ট আপিস ইত্যাদিতেও যান। ঘরে বাইরে সকল কাজেই পুরুষেরা সাধ্যমত তাঁদের সাহায্য করেন।

আমেরিকায় পরিবারগুলো ছোট—নিছক স্বামী-স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা নিয়ে গঠিত। বহু আত্মীয়-স্বজন নিয়ে গঠিত একান্নবর্ত্তী পরিবার এদেশে নেই বললেই চলে। দু' তিনটি বিবাহিত ভাই এক পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করছে অথবা কোনো বিবাহিতা মহিলা শ্বশুরশাশুড়ী নিয়ে ঘরকন্না করছেন এমন দৃশ্য সে দেশে বিরল। সে দেশে বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা জীবনযাত্রা সহজ ও সরল করবার বহুবিধ পন্থা আবিষ্কার করছেন। এখানকার লোকেরা ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রয়োগে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহকে সহজসাধ্য করে তোলে। মার্কিন মেয়েরা খুব কর্ম্মঠ। বাহিরের নানা কর্ম্মে ও ঘর-গৃহস্থালীর কাজে তাদের নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি। এর উপর এদের আমোদ-প্রমোদ, সভা-সমিতি, নাচ-গান, সিনেমা-থিয়েটার এসব তো আছেই। নিজেদের বাসগৃহকে সুসজ্জিত করবার জন্যে এরা প্রাণপণ চেষ্টা করে থাকে।

শীতপ্রধান দেশ, অধিবাসীদের অটুট স্বাস্থ্য। অপর্য্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য তাদের ভাগ্যে জোটে। সর্ব্বত্র সস্তা বৈদ্যুতিক আলোক ও গ্যাসের প্রচলন আছে, চব্বিশ ঘণ্টা উষ্ণ ও শীতল জল সরবরাহ হয়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে কাপড় ধোয়া ও ইস্ত্রি করা হয়, কাঁচের বাসন ধোয়া-মোছার কাজও চলে। ঘরের ধুলোবালিও যন্ত্রের সাহায্যে সাফ হয়। ঘরে ঘরে সস্তা টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে—প্রতিবারে ফোন করতে পাঁচ পয়সা মাত্র খরচ হয়। দরজা খোলা ও বন্ধ করার যন্ত্র, রেফ্রিজারেটার, উত্তাপ-যন্ত্র, এগুলি অতি সাধারণ গৃহস্থালীর অপরিহার্য্য অঙ্গ। গৃহসংলগ্ন উদ্যানের গাছপালায় জল-সিঞ্চনের যন্ত্রটিও অভিনব। শহর থেকে এক শত মাইল দূরে কোন এক পল্লীগ্রামের জনৈক মার্কিন চাষীর গৃহে রেডিও, টেলিফোন, গ্যাসের উনুন, কাপড় ধোয়ার যন্ত্র, মাখন তোলার যন্ত্র, গো-দোহনের যন্ত্র, মোটর গাড়ী, ট্রাক্টার ইত্যাদি দেখে চমৎকৃত হয়েছি। সামান্য চাষীর গৃহস্থালীর উপকরণ আমাদের ধনী-পরিবারেও কল্পনার অতীত।

আমেরিকান রান্নাঘরের বন্দোবস্ত চমৎকার—রান্নাবান্না, ভাঁড়ারের জিনিষপত্র রাখা ও খাওয়ার ব্যবস্থা কত স্বল্প-পরিসর জায়গায় হয়, দেখলে বিস্মিত হতে হয়। রান্নাঘরে

কয়লার কালি ও ধোঁয়ার বালাই নাই; অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রুটি সেঁকবার পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্র আছে। রুটি সেঁকা হলে আপনি ঘণ্টা বেজে ওঠে। স্লাইস কাটা অবস্থায় রুটি কিনতে পাওয়া যায়। জল ফুটে উঠলে কেট্‌লী আপনি শিস দিয়ে উঠে। অ-কলঙ্ক (stainless) ইস্পাতের ও কাচের তৈজসপত্র ধোয়া-মোছা খুব সহজ। রান্নার জন্য ঝকঝকে গ্যাস বা বিদ্যুতের উনুন—সেটিও অভিনব। সকালে কাজে বের হবার পূর্ব্বে সব ঠিক-ঠাক করে সাজিয়ে গুছিয়ে উনুনে রান্না চাপিয়ে দিয়ে গেলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আপনা থেকেই উনুন জ্বলে উঠে তৈরি হয়ে থাকবে। ঘড়ি বসানো আছে—রান্না শেষ হলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উনুন নিবে যাবে—পুড়ে যাওয়ার ভয় নেই। উনুনের উত্তাপ ইচ্ছামত বাড়ানো বা কমানো যায়। উনুনের গায়ে স্বচ্ছ প্লাষ্টিক সিট লাগানো, ভিতরের রান্না দেখতে পাওয়া যায়। এক সঙ্গে দুই তিন কিম্বা চার পদ তৈরি করা যায়। প্রেসার কুকারের এখন খুব প্রচলন। যে-কোন রকম মাংস দশ পনের মিনিটে সিদ্ধ হয় এবং তরিতরকারি চার পাঁচ মিনিট ও ডাল-ভাত সাত আট মিনিটের বেশী লাগে না। এতে যেমন রান্নার সময় সংক্ষেপ হয় তেমনি গ্যাস ও বিদ্যুতের খরচা কম লাগে। তরিতরকারি মাছ মাংস কাটবার নানা অভিনব পন্থা আছে। এই সব সুবিধা সে দেশের মেয়েরা পেয়েছেন বলে একা হাতে তাঁরা ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম করতে পারেন।

কাগজের তৈরি পেয়ালা, গেলাস, ডিস, চামচে, টেবিল ঢাকনা, ন্যাপকিন ইত্যাদির প্রচলন খুব বেশী। এগুলি দামেও খুব সস্তা। একবার ব্যবহার করে ফেলে দিলেই হ'ল। শিশুদের ন্যাপকিন ও কাপড়ের কাঁথা ইত্যাদির পরিবর্ত্তে নরম কাগজের ন্যাপকিন এখন খুব চালু হয়েছে। এতে মেয়েদের অনেক শ্রম লাঘব হয়েছে।

এদেশের স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই দেহ স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। ছয় ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট ছেলেমেয়ে সে দেশে বিরল নয়। গত পঞ্চাশ বৎসরে মেয়েদের আয়ু গড়পড়তা ৩৯ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ পুষ্টিকর আহার্য্যের ব্যবস্থা। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে পরিস্রুত পানীয় জল ও Pasteurised দুধ সরবরাহ হয়। এদেশে শতকরা নব্বই জন প্রত্যহ দুধ পান করেন। ফল ও ফলের রস এদের খুব প্রিয়। প্রাতঃকালীন বা নৈশ ভোজনের সঙ্গে ফল অপরিহার্য্য। অতিথি অভ্যাগতদের ফলের রস পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করানো হয়। গরমের সময় কমলা, আঙুর, আপেল, গ্রেপফ্রুট টমাটোর রস আমেরিকানরা প্রচুর পরিমাণে পান করে। ফল বেশ সস্তা। ফলের রস বের করবার উত্তম একটি যন্ত্র আছে—তাই দিয়ে ১০০টা লেবুর রস বের করতে ৭।৮ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। তা ছাড়া টিনজাত ফলের রস খাওয়ারও খুব রেওয়াজ আছে। এ দেশের দৈ, ঘোল, ক্ষীর, পনির ইত্যাদি অতি উপাদেয় খাদ্য। এরা প্রচুর পরিমাণে জল পান করে থাকে। ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানে খাবার সময় জল না চাইলে পাওয়া যায় না। কিন্তু সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের দেশেরই মত ভোজনের সময় খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে এক গ্লাস জলও দেওয়া হয়। দিনে তিন বার তারা খায় এবং রাত্রের খাবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। মাছ মাংস ও ডিম এদের খাদ্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। প্রত্যহ তারা কিছু কাঁচা সব্জী খেয়ে থাকে। কাঁচা টোমাটো, গাজর, বাঁধাকপি, সেলরি, লেটুস, পেঁয়াজ, মাছ-মাংসের সঙ্গে থাকবেই। সিদ্ধ, ভাজা, সেঁকা (bake) ও ঝলসানো (boil) এই চার পদ্ধতিতে মাছ মাংস তরকারি কেক পুডিং ইত্যাদি সব রকম রান্না করা যায়। সেঁকা ও ঝলসানো এ দুটি প্রকরণ আমাদের দেশের উনুনে সম্ভব নয়। এখানে তা কিন্তু গ্যাস বা বৈদ্যুতিক উনুনে করা হয়। ভর্জ্জিত দ্রব্য গুরুপাক বলে এরা ভাজা খুব কম খায়। রান্নার জটিলতা কম। মশলা বা বাটনার পাট একদম নাই।

নিউ ইয়র্কের বড় বড় হাঁসপাতালে চিকিৎসকগণ ছাত্রদের ব্যবহারিক শিক্ষা (practical training) দেবার জন্যে হদম সংক্রান্ত ব্যাধি ও টাইফয়েড রোগের কেস যে উপযুক্ত পরিমাণে পান না—একবার সেকথা উল্লেখ করেছিলেন। কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, টাইফয়েড—যা প্রতি বৎসর মহামারীরূপে আমাদের দেশে দেখা দেয়, সেই সব মারাত্মক ব্যাধির বীজ সে দেশবাসীরা নির্ম্মূল করেছে। সে দেশে মাছ মাংস-কিনে বাড়ীতে এনে নিজেদের কাটার দরকার হয় না। মাংস বিক্রেতা কসাই বিদ্যালয়ে (Butchers' School) বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষিত না হলে মৎস্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হতে পারে না। পশু বা পক্ষীর যে-কোন অঙ্গের মাংস চান তা কর্ত্তিত অবস্থায় কাঁচের আলমারীতে বরফের মধ্যে সাজানো আছে। যেদিন রান্না করতে ইচ্ছে হয় না সেদিন বাইরে আহার সেরে নিতে পারেন। আমেরিকানরা যেখানে কাজ করে সেখানেই মধ্যাহ্নভোজন সেরে ফেলে। বড় বড় দোকান ব্যাঙ্ক, ঔষধালয়, চুলকাটার দোকান—সব জায়গায়ই খাবার পাওয়া যায়। এই সমস্ত হোটেল, রেস্তোরাঁ, চা ও কফির দোকান, ক্যাফেটারিয়া ইত্যাদি সরকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ নিয়মিত ভাবে পরিদর্শন করে থাকেন। কোথাও খাদ্যদ্রব্য নির্দ্দিষ্ট মানের চেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর হলে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ উক্ত দোকান বন্ধ করে দিতে পারেন।

গত ১৬০ বৎসরের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অতি সাধারণ স্তরের নরনারীও খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে সচেতন। এই অবৈতনিক শিক্ষার জন্য সে-

দেশে শতকরা কুড়ি ভাগ বিক্রয়কর আদায় করা হয়। আমাদের মেয়েদের জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ রন্ধনশালায় অতিবাহিত হলেও খাদ্যের গুণাগুণ বিচারে তাঁদের অজ্ঞতা অপরিসীম। সেই সনাতন কয়লার উনুন ও খাদ্য প্রস্তুতের পুরনো পদ্ধতি ভিন্ন নূতন কিছু শিখবার ব্যবস্থা তাদের নেই।

সর্বোপরি সে দেশে স্বামী স্ত্রী ঘর-গৃহস্থালীর কাজে পরস্পরকে সাহায্য করেন। এ ছাড়া মেয়েদের সুবিধার জন্য ক্রেশে ও নার্সারি বিভালয় ইত্যাদি তো আছেই। আমাদের দেশে নারীকে উপযুক্ত মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দেশের সমগ্র নারীসমাজের অশিক্ষা ও কুসংস্কার দূর করে তাদের মনে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করবার চেষ্টা করতে হবে। তার জন্য প্রথমেই চাই বালকবালিকাদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা।

স্বাধীনতা অর্জনের পর সমগ্র ভারতে গঠনমূলক কার্যের সূচনা হয়েছে। এই সময় নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করে আমাদের খাদ্য, পানীয়, নিরক্ষরতা, বাসগৃহ, যানবাহন ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে হবে। এতদিন আমাদের দেশের জনসাধারণ সকল ত্রুটির জন্য ব্রিটিশকে দায়ী করে নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু এখন স্বাধীন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপরিচালকদের উপরেই সকল দায়িত্বভার ন্যস্ত। বর্ত্তমানে তাঁদের নিকট দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা, সস্তা গ্যাস ও বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যাপক প্রচলন এবং পরিস্রুত উষ্ণ ও শীতল জল সরবরাহ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের আশা করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত নয়। এর ফলে আমাদের মেয়েদের সাংসারিক কর্মভার অনেকটা লঘু হবে, এবং একমাত্র ঘরকন্না ও রন্ধনশালার বাইরে সংসারের সহস্র কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করবার সময় ও সুযোগ তাঁরা পাবেন।

খাদ্য-বিভাগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেণ্টে কয়েক জন সভ্য কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের নীতি ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা ও মন্তব্য করিয়াছেন। ঐ সকল সমালোচনা ও মন্তব্য পড়িয়া খাদ্য বিভাগ সম্বন্ধে অনায়াসেই বলা যায় যে, 'চকচকে সকল দ্রব্যই স্বর্ণ নহে।' বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সভ্যগণ খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার ও খাদ্য সরবরাহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিবার জন্য নানাপ্রকার পরিকল্পনার আভাস দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মিষ্টার ক্র্যাব একটি যাহা বলিয়াছেন তাহাই জনসাধারণের অধিকাংশের মত এবং ধারণা। তিনি বলিয়াছেন যে, সভ্যগণ যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে সকল পরিকল্পনার আভাস দিয়াছেন তাহা নূতন নহে; গত ছয় বৎসর যাবৎ এই সকল অভিমত ও পরিকল্পনার আভাস দেওয়া হইতেছে; কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ নীতি অনুসারে কাজ করিতে পারেন নাই বলিয়াই দেশে খাদ্যাবস্থার এরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে। সম্প্রতি মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় ভারতের পূর্ব্বতন অর্থসচিব মিষ্টার আর. কে. সন্মুখম চেট্টি বলিয়াছেন, "১৯৪৩ সাল হইতে 'অধিকতর খাদ্য উৎপাদন কর' আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু ইহার ফল খুবই অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যপূর্ণ হইয়াছে। আমার নিজের সুচিন্তিত মত এই যে, প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিজ নিজ প্রদেশে কৃষির উন্নতিবিধান করা প্রথম দায়িত্ব; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্ব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন নাই। খাদ্য সম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকারসমূহের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন আবশ্যক।" চেট্টি মহাশয়ের উক্তিও জনসাধারণের সমর্থনযোগ্য।

"অধিকতর খাদ্য উৎপাদন কর" আন্দোলনের সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত নানা কারণে (এবং অকারণেও) বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে এবং দেশের খাদ্য-উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য নানা পরিকল্পনা এবং নানা মতামত প্রকাশিত হইয়াছে; এই সকল পরিকল্পনা ও মতামত সম্বলিত পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যাও কম নহে। এই পরিকল্পনাগুলির মধ্যে কতকগুলি কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে, আর কতকগুলি কি কি কারণে কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই তাহা সাধারণের জানিবার উপায় নাই। অথচ এখনও পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য 'কমিটি,' 'কনফারেন্স,' 'ডেপুটেশন' প্রভৃতির অন্ত নাই এবং এই উদ্দেশ্যে অজস্র অর্থ ব্যয় হইতেছে।

বিশেষজ্ঞগণের মত এই যে, উপযুক্ত পরিমাণ জল সেচনে শতকরা ৫০ হইতে ১০০ ভাগ, উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগে শতকরা ২০ হইতে ৪০ ভাগ এবং উন্নত শ্রেণীর বীজের ব্যবহারে শতকরা ৫ হইতে ১০ ভাগ জমির ফলন বাড়ানো যায়। এই মতকে ধ্রুব সত্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। এই মত কতটুকু সত্য তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মাটিতে ও বিভিন্ন আবহাওয়ায় কয়েক বৎসর যাবৎ ব্যাপকভাবে সুপরিচালিত পরীক্ষার প্রয়োজন। এইরূপ

পরীক্ষার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ যে ফলন নির্ণীত হইবে তাহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী এবং অল্পকাল-মেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজন, কিন্তু বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থায় অল্পকাল-মেয়াদী নানা পরিকল্পনা প্রথমেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং অধিকতর উদ্যম ও উৎসাহের সহিত উহাদিগকে কার্য্যকরী করিতে হইবে। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে, বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী অল্পকাল-মেয়াদী বিবিধ পরিকল্পনা তেমন আগ্রহ সহকারে অবলম্বিত হয় নাই। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই অল্পবিস্তর আবাদ-যোগ্য 'পতিত' জমি আছে। অনেক ক্ষেত্রে ছোটখাটো পরিকল্পনার সাহায্যে বিভিন্ন কারণ দূর করিয়া এই সকল 'পতিত' জমিকে আবাদের উপযুক্ত করা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে ছোটখাটো জল-সেচনের ব্যবস্থা বহুল পরিমাণ 'পতিত' জমিকে "হাস্তভরা তৃণ ক্ষেত্রে" পরিণত করিতে পারে। আমার নিজের অঞ্চলের একটি মাত্র উদাহরণ দিব। আমাদের অঞ্চলে ছোট একটি নদী ছিল; বহুদিন হইতে উহা 'হাজিয়া মজিয়া' গিয়াছে; লোকে উহাকে 'কাণা নদী' বলে; ১৯২৬ সালে স্বাস্থ্য বিভাগের তদনীন্তন পরিচালক ডাক্তার বেণ্টলীর সহিত কথোপকথন-প্রসঙ্গে "কাণা নদীর" উল্লেখ করাতে তিনি কতকগুলি ম্যাপ দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে, নদীর নাম 'কাণা নদী' নহে, ইহার নাম 'খানা নদী'; আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক জলসেচনের জন্ত এই নদী খনন করা হইয়াছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, দেশের প্রকৃত চাষী-দিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া তাহাদের অভাব, অভিযোগ, সমস্যা প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া তাহা দূরীভূত করিবার তেমন কোন প্রয়াস দেখিতেছি না; তাহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এবং তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির তেমন কোন ব্যাপক পরি-কল্পনা আজও গৃহীত হয় নাই। এই উদ্দেশ্যে গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে পারিলে বর্ত্তমান অবস্থায়ও সহজসাধ্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া কৃষকগণ খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বাড়াইতে পারে; তবে এই সকল সহজসাধ্য প্রণালী তাহাদের চোখের সামনে দেখাইয়া দিতে হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ দু'একটী সহজ-সাধ্য প্রণালীর কথা বলিতেছি—(১) সবুজ সারের উপ-কারিতা, (২) গর্ত্তে গোময় ও গো-চোনা সংরক্ষণ, (৩) গোময়ের অপচয় নিবারণ ইত্যাদি। কৃষকদিগের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ও সাহায্য করিবার জন্ত, সর্ব্বসাধারণের উপকার ও উন্নতির জন্ত তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এবং গ্রামবাসীদের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সর-বরাহ ও কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্ত সমবায় প্রণালীতে গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার এমন কোন কার্য্যকরী প্রচেষ্টা চোখে পড়ে না। এ ক্ষেত্রে ডেনমার্কের উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে রাখা দরকার। গ্রামবাসীদের সহিত এক-যোগে কাজ করিয়া গ্রামবাসীদের লইয়াই এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের উপর এইরূপ প্রতিষ্ঠান চাপাইয়া দিলে তাহা কার্য্যকরী হইবে না। শহর হইতে বড় বড় পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করিলে কোন ফলই হইবে না।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার মহারাজা কাশিম-বাজার পলিটেকনিক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ক্যাপটেন পেটাভেল বলিয়াছিলেন যে, সর্ব্ব বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের সাধারণ বুদ্ধির অভাব দেখা যায়। আশা করি, এখনও তাঁহার উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য হইবে না।

আলোচনা

"সেনদীঘি মৎস্যের চাষ"

গত পৌষ সংখ্যা "প্রবাসী"র বিবিধ প্রসঙ্গে "সেনদীঘি মৎস্যের চাষ" শীর্ষক একটি নিবন্ধ বাহির হয়। সেনদীঘি ২৪ পরগণার অন্তর্গত বোড়াল গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামের শ্রীশ্রী৺ত্রিপুরা সুন্দরী সেবা-সমিতি ইহা সংস্কারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতায় ২৩ বি, মনোহরপুকুর রোড হইতে শ্রীযুক্ত দেবকুমার ঘোষ সেনদীঘির ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ এবং ঐ নিবন্ধে প্রকাশিত অন্যান্ত তথ্যের (যেমন, সেনদীঘির অংশীদার ও স্বত্ব-স্বামিত্বের) সত্যতা সম্বন্ধে আপত্তি জানাইয়া আমাদিগকে পত্র দিয়াছেন। আমরা তাঁহার পত্রের সারমর্ম্ম উক্ত সমিতির কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়া জানাইলে সমিতির সম্পাদক তাহার পাল্টা জবাব দিয়াছেন এবং ঘোষ মহাশয়ের উক্তিগুলির অসারতা দেখাইয়া লিখিত প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। কোন জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া তৎসম্পর্কে পত্রিকার পৃষ্ঠায় বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলে মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয় আমাদের এইরূপ ধারণা এবং এইজন্ত আমরা দেবকুমার বাবু ও ত্রিপুরাসুন্দরী সেবা-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ উভয়কেই এ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছি। এ বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ প্রকাশ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

যুদ্ধকালীন সোভিয়েট কবিতা

শ্রীভবানীগোপাল সান্যাল

প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয়ত্রই কবিগণ বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডলীর জন্য কাব্যসৃষ্টি করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। এই যে নির্ব্বাচিত সমধর্ম্মী পাঠকগোষ্ঠী—ইহাদের মনকে স্পর্শ করিতে পারিলেই হয়ত কবিতার সার্থকতা। সুতরাং জনসাধারণের সহিত ঐ কাব্যরসধারার হৃদয়গত যোগাযোগ সামান্যই। কাব্যরস বা কাব্যের আবেদন সমগ্ররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবনকে পূর্ণতররূপে উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য জনসাধারণের কম। ম্যাথু আরনল্ড এক স্থানে মন্তব্য করিয়াছেন যে, শ্রেষ্ঠ কবিতা আমাদের জীবনকে গঠন করে, আনন্দে পরিপ্লাবিত করে ও মুহ্যমান মনকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। উপরন্তু আর্টের বিচারে কবিতার নৈর্ব্যক্তিক রূপের বিশিষ্টতার স্বীকৃতি ব্যতিরেকেও জীবনের ক্ষেত্রে তাহার ব্যবহারিক মূল্যটিও সমালোচকগণ সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং কবিতার দুইটি রূপ বা সত্তা স্মরণীয়। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে এমনতর দুইটি সত্তার কথা ম্যাথু আরনল্ড তাঁহার 'কালচার এণ্ড এনার্কি' গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। একটি তত্ত্বের দিক, অন্যটি তাহার লৌকিক আবেদন। মহাপুরুষদের অনুসৃত ধর্ম্ম-জীবন ও লোকসমাজে তাহার প্রচারের মধ্যে এই দুই দিক আমরা লক্ষ্য করি। শ্রীচৈতন্য অন্তরঙ্গদের সহিত ভক্তি-রস আস্বাদন করিতেন, কিন্তু বাহিরে জনসাধারণের সাহচর্য্যে নামকীর্ত্তন করিতেন। কবিতার ক্ষেত্রেও তত্ত্ববিচারে তাহার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সমন্বয় হইয়া সার্থক ব্যঞ্জনা সৃষ্ট হইয়াছে কিনা তাহা আলোচনার যেরূপ অবকাশ আছে, তেমনি লোক-জীবন-প্রবাহের উপরে কবিতা কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে উপযোগী তাহাও বিচার্য্য। একদিকে কবি যেরূপ ধ্যান করেন, 'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক'—অন্যদিকে তাঁহার উপলব্ধ এই সত্য পরীক্ষিত হয় জন-সাধারণের উপরে ইহা কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছে তাহা দ্বারা।

শেলির মতে কবিতা পাঠকের কল্পনাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে এবং ইহার ফলে যে 'হৃদয়নীবারমনসা' যাহা সুন্দর তাহাকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে। এইজন্য কবি একস্থানে মন্তব্য করিয়াছেন যে, নৈতিক উৎকর্ষের আদর্শের দ্বারা তিনি কল্পনার সাহায্যে শ্রোতৃমণ্ডলীকে অর্থাৎ তাহাদের মনকে উদ্বুদ্ধ করিতে চান। সুতরাং এখানে লক্ষ্য করা যাইবে যে কাব্যের ব্যবহারিক দিকটি শেলি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার যথার্থ সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির ক্ষমতা সুধীদের বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। অর্থাৎ কাব্যানুরাগী জনসাধারণের কাব্য-পাঠের লিপ্সা থাকিলেই হইবে না, তাহাদের কল্পনা মার্জ্জিত ও রসাস্বাদনের শক্তি গভীর হওয়া প্রয়োজন। কবি নিজ মন হইতে অন্যের মনে তাঁহার অভিজ্ঞতার সমগ্র ভাবই সঞ্চার করিয়া দিতে চান। এই সমগ্র ভাব বলিতে আমরা বুঝি কবির চিন্তাধারা ও চিন্তাধারার পদ্ধতি। সমগ্রতার উপলব্ধি সাধারণের শক্তির অতীত, কাব্যের লৌকিক রূপ সমর্থন করিয়া কাব্য রসাস্বাদনে রসাস্বাদকেন্দ্রকে সঙ্কুচিত করা একটু অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সুদূর অতীতে কবিতা ছিল মানব-মনের ভাব-রাশি ব্যক্ত করিবার একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু কালক্রমে কবিতা ব্যক্তি-মানসের অনুভূতির ক্ষেত্রে অনেকটা আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

আজ সোভিয়েট রুশিয়ার কবিতা কিন্তু জনগণের জন্যই রচিত হইতেছে। তথায় সাধারণ পাঠকেরা শুধুমাত্র কাব্য পাঠেই পরিতৃপ্ত না হইয়া ইহাকে জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগপূর্ব্বক বিচিত্ররূপে আস্বাদন করিবার প্রয়াস পান। রুশিয়ার কাব্যের আবেদনকে সঙ্কীর্ণ বলিলে তাহার সার্থকতা অস্বীকার করা হইবে। মানবিকতা রুশীয়-কাব্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। রুশিয়ার যুদ্ধকালীন কবিতা সাম্প্রতিক ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত। জার্ম্মেনী কর্ত্তৃক রুশিয়া আক্রান্ত হইলে জনসাধারণ এই যুদ্ধের গুরুত্ব অনুধাবন করিতে সমর্থ হইল। সামগ্রিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া তাহারা তাহাদের সমষ্টিগত ব্যাপক প্রতিরোধ-ব্যবস্থা শুরু করিয়া দিল। জনসাধারণ মৌলিক অধিকার গুলিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দেশব্যাপী এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিল। সমগ্র দেশবাসী একটি মাত্র স্থির আদর্শ ও উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইল। এই আদর্শ তাৎকালিক সোভিয়েট কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, কবিদের কাব্যরচনা করিবার অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। সোভিয়েট যুদ্ধকালীন কবিতার মধ্যে দূরপ্রসারী ইঙ্গিত আছে। মানবিকতার দিক দিয়া এই কবিতাগুলির মূল্য অসাধারণ, কোন কবিতা পাঠকচিত্তে ভাবগত ঐক্যবোধ সৃষ্টি করিতে পারে কি না তাহা দ্বারাই ত ইহার সার্থকতা নির্ণীত হয়। কবিও অনুরূপ ঐক্যবোধের প্রেরণায় কাব্যসৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হন। এই ঐক্যবোধের উপলব্ধি আমাদের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথ ইহার নাম দিয়াছিলেন বিশ্বরূপ। "মানুষের দুটো রূপ একটা তার বিশেষরূপ আর একটা তার বিশ্বরূপ। সেই বিশ্বরূপেই সে অসীমের সঙ্গে এক, সেই বড় সত্তার মধ্যে

ভালো রান্না
খেয়ে যেমন তৃপ্তি
পরিবেশনেও
তেমনি...

দৃঢ়ভাবে সত্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে মানুষের আর কোন ভয় থাকে না।" কবিতার মাধ্যমেই এই বৃহৎ সত্যোপলব্ধি সম্ভব।

যুদ্ধকালীন সোভিয়েট কবিতার উদ্ভব হইয়াছে জনগণের জাগ্রত মন হইতে। এই কবিতাগুলির মধ্যে তাহাদের উদ্বুদ্ধ মনোভাব বিবৃত হইয়াছে। সোভিয়েট জনগণের স্বাদেশিকতা, জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি ও ভবিষ্যতের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস সাম্প্রতিক কবিতাবলীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এই তিনটি কারণ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধযুক্ত। শত্রুর প্রতি তীব্র বৈরভাব এই কবিতাগুলির মর্ম্মমূলে রসসিঞ্চন করিয়াছে। ইহা দেশের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা হইতে সঞ্জাত হইয়াছে।

আলোচ্যমান যুদ্ধকালীন কবিতাগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই তিন শ্রেণী রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের তিন পর্য্যায়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত রাখিয়া ভাগ করা চলে। প্রথম অংশ সঙ্কটকাল বা বিপর্য্যয়ের বৎসরগুলি। এই সময়ে লেনিনগ্রাড অবরুদ্ধ হয় ও ষ্টালিনগ্রাডকে জয় করিবার জন্ম জার্ম্মানী সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করে। রুশিয়াও মরণপণ করে যে, লেনিনগ্রাড বা ষ্টালিনগ্রাড কোনক্রমে শত্রুহস্তে সমর্পণ করা চলিবে না। অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাডে বসিয়া টিকোনভ, মার্গারিটা আলিগার ও বেরঘোলজ তাঁহাদের কবিতা রচনা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে লক্ষ্য করা যাইবে যে, যতই নাৎসী জার্ম্মানীর অত্যাচার রুশিয়ার প্রতিরোধ-সঙ্কল্পকে চূর্ণ করিবার জন্ম বাড়িয়া চলিয়াছে ততই রুশিয়ার জনগণের আহত আত্মাভিমান ও রুদ্র রোষ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। সৈন্যবাহিনীর অমিত বিক্রম, জীবনকে তুচ্ছ করিয়া পশ্চাৎ হইতে শত্রুর ব্যূহকে বিপন্ন করিবার প্রয়াস এই পর্য্যায়ে লক্ষ্য করা যাইবে। তৃতীয় শ্রেণীতে দেখি প্রতিরোধ-ব্যবস্থা হইতে অভিযান। 'দি রোড টু দি ওয়েষ্ট'— এই পর্য্যায়ের বড় শ্লোগান। সমস্ত অন্যায় অত্যাচার ও নিপীড়নের অবসান হইবে যদি ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানীকে পর্য্যুদস্ত ও উৎসাদিত করা যায়। যে অত্যাচার রুশিয়াকে সহ্য করিতে হইয়াছে, দেশের নৈতিক শক্তিকে বিধ্বস্ত করিবার জন্ম অধিকৃত রুশিয়ার স্ত্রীলোক ও শিশুদের উপরে যে অবর্ণনীয় নিপীড়ন একদা চলিয়াছিল তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় যদি আক্রমণকারী জার্ম্মানীর স্পর্দ্ধিত মস্তককে চূর্ণ করা যায়। জার্ম্মানীর পতনে শুধু রুশিয়া নহে সমগ্র পৃথিবী রক্ষা পাইবে। এই প্রেরণা তৃতীয় পর্য্যায়ের কবিতাগুলিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

সঙ্কটকালের কবিগণের মধ্যে টিকোনভ, আলিগার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাড শহরে বসিয়া অপরিসীম দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ সহ্য করিয়া ইঁহারা কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের রচনায় পিতৃভূমিকে রক্ষা করিবার যে অনমনীয় দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বিস্ময়কর। শত্রু ঘরে হানা দিতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে শহরে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাগুলি আসিতেছে, গোলা ফাটিয়া পড়িতেছে এবং আকাশ হইতে বোমা আসিয়া গৃহ ও আশ্রয়স্থলগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছে। একদা রুশীয় নরনারী জীবন-প্রাচুর্য্য উপভোগ করিয়াছিল, আজ সেই উচ্ছল জীবনযাত্রাকে শত্রু বিনষ্ট করিতে চাহে। টিকোনভ নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন:

> Fasten a grenade to your belt
> And bullets' silvery veins.

দেশ ও জাতি যখন বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন তখন ভয় ও কাপুরুষতা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। সমগ্র জাতিকে একটি সঙ্গীতের সুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে:

> Let songs of national revenge
> Replace all other songs for you.

পবিত্র নেভা নদীর তীরে লেনিনগ্রাডের বীর সৈন্যগণ দণ্ডায়মান। নগরীর এইরূপ মনোমুগ্ধকর রূপ পূর্ব্বে কোন দিন দেখা যায় নাই। মৃত্যুর আলোকে নগরী অপূর্ব্ব শ্রী ও সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে:

> Never have I seen our city look so beautiful
> As now in the silent close of day.

এই যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে তাহা কেহ জানে না, তবুও যে নীতি সৈন্যগণ ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে তাহা এই যে লেনিনের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত নগরী শত্রুর নিকটে আত্মসমর্পণ করিবে না। Our city shall never see a foe—ইহাই সকলের সঙ্কল্প।

এই সুদৃঢ় সঙ্কল্প আজ যেন নেভা নদীর উচ্ছল তরঙ্গভঙ্গে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে:

> We may die but no foot of the foeman
> Shall ever our city profane.

ইতিমধ্যে শত্রুর আক্রমণবেগ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিলে শুধুমাত্র রুশিয়া রক্ষা পাইবে তাহা নয়—সমগ্র ইউরোপের স্বাধীনতাও রক্ষা পাইবে।

বেরঘোলজ-এর একটি কবিতায় প্রতিবেশীর সহিত কথোপকথন লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মান আক্রমণ লেনিনগ্রাডে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড হইয়াছিল, বিমান আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি দশ হইতে বার ঘণ্টা থাকিত। খাদ্য-রেশনের পরিমাণ বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া নরনারীর দুঃখকে আরও তীব্রতর করিয়া তুলিতেছিল। মৃত্যুসমাকীর্ণ লেনিনগ্রাডে মধ্যে মাঝে মনে নৈরাশ্য আসিয়া দেখা দেয়। এই নৈরাশ্য ও ভীতির ঊর্দ্ধে শির উত্তোলন করিয়া দুইপুত্রহারা জননী তাঁহার সর্ব্বশেষ সন্তানকে যুদ্ধে পাঠাইতে বিরত হন না:

এই সব বই

এর সঙ্গে পরিচয় না রাখা মানে অগ্রগমনের দিনে পিছিয়ে থাকা

এরিখ মারিয়া রেমার্ক

অল্ কোয়ায়েট

বিশ্বের সাহিত্যসমাজে অদ্ভুত চাঞ্চল্য এনেছিল এই উপন্যাস : আধুনিক যুদ্ধের ব্যর্থতা ও অসঙ্গতির নির্মম কাহিনী। বেদনার বিরূজনীনতা আছে বলেই এ বইএর আবেদন কখনো কোনো দেশে নিপ্রভ হবার নয়। অনুবাদ করেছেন মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। দাম ২।০

তিন বন্ধু

রেমার্কের প্রথম প্রেমের উপন্যাস। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী শান্তির সঙ্কীর্ণ ভূমিতে প্রেমের এই পট আঁকা। হোটেলে আত্মহত্যা, রেস্তোরাঁয় গণিকার ভিড়, চোরাগোপ্তা খুন, চারদিকে রাজনৈতিক গুণ্ডামি — যুদ্ধোত্তর জার্মানীর এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে পা ফেলে চলেছে তিনজন প্রাক্তন সৈনিক। তাদেরই একজনের অপ্রত্যাশিত প্রেম আর অন্যদের অকুণ্ঠ আত্মত্যাগের কাহিনী। অনুবাদ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ৩৭৫ পাতার বিরাট উপন্যাস। দাম ৫৲

ডি. এইচ. লরেন্স

লরেন্সের গল্প

ইংরাজী সাহিত্যে লরেন্সের আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। ইংলণ্ডের বনেদী চালের সাহিত্যজগতে তিনি কিছুদিন মৌসুমী ঝড়ের মতো বয়ে গেছেন। লরেন্সের সাহিত্য-প্রতিভার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাঠক পাবেন এই বইএ। সম্পাদনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব বসু, ক্ষিতীশ রায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। দাম ৩।০

লেডি চ্যাটার্লির প্রেম

নীতিবাদীদের কড়া পাহারা সত্ত্বেও লরেন্সের এই উপন্যাস যে আজো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে তার কারণ লরেন্সের অসামান্য প্রতিভা। অনুবাদ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।

সমারসেট মম্

মম্‌এর গল্প

মম্‌-এর রচনা আশ্চর্য, অপরূপ, অসংখ্য চরিত্রের অফুরন্ত এক প্রদর্শনী। তাঁর রচনার বুনন সূক্ষ্ম, সরল ও বাহুল্যবর্জিত, কিন্তু সম্পূর্ণ নগ্ন। যেখানে শেষ হয় সেখানকার অপ্রত্যাশিত বিস্ময় একেবারে মর্মে গিয়ে লাগে। সম্পাদক : প্রেমেন্দ্র মিত্র। দাম ৩৲

লুইজি পিরানদেল্লো

পিরানদেল্লোর গল্প

ইতালির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক পিরানদেল্লোর শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন। গভীর বেদনারসে রচনাগুলি পরিপ্লুত। এ বেদনা কখনো মধুরের আভাস এনে দেয়, কখনো বিদ্রূপের বাঁকা হাসি, কখনো বা অশ্রুজল। সম্পাদনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। দাম ৩৲

অস্কার ওয়াইল্ড

হাউই

জীবনে যত রচনা ওয়াইল্ড করেছেন তার ভিতর সর্বশ্রেষ্ঠ নিজের ছেলেদের জন্য লেখা তাঁর গল্পগুলি। প্রতিটি গল্পের প্রতিটি কথা স্বকীয় প্রতিভায় উজ্জ্বল। নানা রঙে রঙিন, খামখেয়ালি, কোমলমধুর এই গল্পগুলি শিশুসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। সচিত্র। দাম ২।০

ইভানফ, সোলোখফ ইত্যাদি

আধুনিক সোভিয়েট গল্প

সারা দেশে এ বই অভাবিত চাঞ্চল্য এনেছিল, কয়েক মাসের মধ্যেই ফুরিয়ে গিয়েছিল এর প্রথম সংস্করণ। দ্বিতীয় সংস্করণে পাঁচটি নতুন গল্প সংযোজিত হয়েছে— আধুনিকতম লেখকদের পাঁচটি গল্প। এতে বইএর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক দুরকম মর্যাদাই বেড়ে গেছে। অনুবাদ করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। দাম ৩।০

জেম্‌স জিন্‌স

বিশ্ব-রহস্য

গ্রহলোক ও প্রাণলোক সৃষ্টির রহস্য নিয়ে আরম্ভ করে নাক্ষত্রজগতের দেশকালের বিরাট পরিমাপ পরিমাণ গতিবেগ দূরত্ব ও তার অগ্নি আবর্তের চিন্তাতীত প্রচণ্ডতার বিস্ময়কর রহস্যের কথা জিন্‌স এই গ্রন্থে অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করেছেন। অনুবাদ করেছেন প্রমথনাথ সেনগুপ্ত। সচিত্র। দাম ৩৲

কক্ষপথে নক্ষত্র

আধুনিক দূরবীন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বিশ্বরহস্যের যে ভূমিকা সৃষ্টি করেছে এই গ্রন্থে তারই আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের জন্যেই গ্রন্থটি বিশেষভাবে লেখা, অভিনব বহুসংখ্যক ম্যাপ ও আলোকচিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করা হয়েছে। অনুবাদ করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। যন্ত্রস্থ।

সিগনেট প্রেসের প্রবর্তনায় বাংলায় ভর্জমাসাহিত্যের যে নূতন রূপ উদ্‌ঘাটিত হল তাকে আমরা সাদরে আহ্বান করে নেব... —ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী

সিগনেট প্রেসের বই

সিগনেট প্রেস : ১০/২ এলগিন রোড : কলিকাতা ২০

Let not thy parents' home be shamed
By conquest and captivity.
Never will we accept defeat
Never to slavery shall be brought
That city where Vladimir Lenin
The courage of endurance taught.

কবিতার শেষাংশে সমগ্র রুশিয়ার মুক্তিপ্রয়াসী আত্মা যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

Dry are all the meadows
Sad are the harvest fields.

দেশের এই বিষাদমাখা রূপ পরিবর্ত্তিত হইবে। সময় আসিয়াছে,—দেশব্যাপী বিপর্য্যয়ের একদা অবসান হইবে। শত্রুসৈন্ত দেশ হইতে বিতাড়িত হইবে। রুশীয় সৈন্ত পলায়নপর শত্রু-সৈন্তের পশ্চাতে পশ্চিম দিকে ধাবমান হইবে।

We live through storms, we live through tempests searing
But life returns, new cranes will soon be rearing
Fortune soon out to sea our ships be steering
Their course lies west.
May nothing disturb.

নব জীবনের আবির্ভাবে সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হইবে। সে-দিন পশ্চিম দিকে রুশীয় সৈন্তের জয়যাত্রার পথ উন্মুক্ত হইবে, রুশিয়ার গৌরবময় বিজয় শুধু তার নিজেরই সৌভাগ্য বহন করিয়া আনিবে না—ইহা সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে কল্যাণকর হইবে। সর্ব্বপ্রকার ভীতি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া পৃথিবী এক সাম্যবাদমূলক রাষ্ট্রগঠনের দিকে অগ্রসর হইবে। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অবসানে সাম্রাজ্যবাদ-পরিপুষ্ট দেশগত বাধা বিভেদ ও আত্মঘাতী প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিলুপ্ত হইবে। কবির আশাদীপ্ত সঙ্গীত সমস্ত জগতের নিকটে নূতন আশ্বাস বহন করিয়া আনিতেছে :

One happiness for all, as one sky for the earth
One, universal happiness,
Frontierless unconfined.

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কবিতাগুলিতে প্রাণসঞ্চার করিয়াছে অত্যাচারী শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করিবার তীব্র-বাসনা। অধিকৃত রুশিয়ার উপরে বিজয়ী জার্ম্মান সৈন্ত নির্ম্মম অত্যাচার করিয়াছে। তাহাদের নিষ্ঠুরতা হইতে শিশু বা স্ত্রীলোক কেহই পরিত্রাণ পায় নাই। সহস্র সহস্র মৃতদেহ তুষারাচ্ছন্ন দগ্ধ তৃণক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ডন নদী-তীরস্থ ভূভাগ, ইউক্রেনের উর্ব্বর কৃষ্ণ-মৃত্তিকা, রুশিয়ার পার্ব্বত্য উত্তর অঞ্চল সকল স্থানে একই ব্যাপারে পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। যে শস্তশ্যামল প্রান্তর একদা লোকচিত্তকে বিমুগ্ধ করিত, শস্ত শস্তের প্রাচুর্য্য অবিচ্ছিন্নভাবে আবিষ্কার নাইটিঙ্গেলের সুমধুর কণ্ঠ-ধ্বনিত হইত, তাহার পরিবর্ত্তে দেখা দিয়াছে পরিকীর্ণ কঙ্কাল-মূর্ত্তি। দগ্ধ প্রান্তর কিন্তু সময় আসিয়াছে আজ প্রত্যাঘাতের।

See in ashes a small charred body there
A dead child lies.

His burning home
Is smouldering still in the calm morning skies,
And in the empty street
A crater yawns,
Bleeding with strata of the murdered earth.

কিন্তু এই দৃশ্য জনসাধারণ ভুলিবে না :

We shall remember all
The blood, the murdered child.

কোভালেনকভের একটি কবিতায় :

When the hour will strike there shall be no forgiving
One word revenge upon your flag shall flame.

প্রত্যাঘাতের অভিপ্রায় দ্যোতক এই কবিতাগুলি সাধারণ ভাবে বিচার করিলে প্রচার-মূলক বলিয়া মনে হয়। এই প্রচারের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে সামরিক যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা। শুধু মাত্র সাম্প্রতিক মূল্যের দিক হইতে এই কবিতাগুলিকে বিচার করিলে ভুল হইবে। এই কবিতাগুলির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি সমসাময়িক জীবনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি ও জীবন-বিশ্লেষণ। অতীত ও বর্ত্তমানকে এক বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে বিন্যস্ত করিয়া জীবন ও জীবনের অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্তকে উদ্‌ঘাটন করিবার প্রয়াসও বিস্ময়কর। এই রহস্ত জগৎ ও জীবনকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে। ইহারই ফলে প্রচারমূলক হইলেও এই কবিতাগুলি মনকে স্পর্শ করে।

কোভালেনকভ একটি কবিতায় তাঁহার রচিত সঙ্গীত ও কবিতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন :

A song and a verse
Are bomb and a banner
And the voice of a singer
Can raise a class from the dust.

শেষ স্তরে আধুনিক সোভিয়েট কবিতাগুলির মর্ম্মকথা প্রকাশিত হইয়াছে। দেশ ও জাতির প্রতি গভীর অনুরাগ এই কবিতাগুলিতে প্রাণ ও রসসঞ্চার করিয়াছে। জাতির জীবনে যখন দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিয়াছে তখন কবিও তাঁহার নিপীড়িত দেশবাসীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আজার-বাইজানের এক কবি লিখিয়াছেন :

It is no shame to die for the land we hold dear
Westward the Soviet armies are pressing on without fear
Westward, ever westward rides Kyor-Oglu.

কিওর-ওগলু 'আজার বাইজান' উপাখ্যানের বিখ্যাত বীর। প্রথম স্তরে জন্মভূমির প্রতি যে মমতা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা রিউপার্ট ব্রুকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

নববিবাহিতা বধূও তাহার প্রেমাস্পদকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে যে, বধূরাও আজ দুর্য্যোগের এই দিনে মর্ম্মসহচরী নহে :

But through dark clouds of war and fiery tempests
Shoulder to shoulder with their men they go.

দুর্য্যোগের এই দিনে নবপরিণীতারাও বধূবেশে বাসরকক্ষে

ভীরুপদক্ষেপে কম্পিতবক্ষে যাইতে আগ্রহান্বিতা নহেন। তরঙ্গ-মুখর রণসমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া তাঁহারা সত্যের সম্মুখীন হইতে চাহেন,

বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্ব্বল লজ্জায়।
দেখা হবে তুষ্ঠ সিন্ধুতীরে
তরঙ্গ গর্জ্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয় ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিতে।

তৃতীয় স্তরের কবিতা রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের তৃতীয় পর্য্যায় অবলম্বনে লিখিত। এই পর্য্যায়ে রুশ সৈন্য প্রচণ্ড উন্মাদনার জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া পশ্চিম দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। বহু বৎসরের আকাঙ্ক্ষা—আক্রমণকারী শত্রুসৈন্য পর্য্যুদস্ত করা, নিজেদের পিতৃভূমি অধিকার করিবার স্বপ্ন আজ সার্থক হইতে চলিয়াছে। আলেক্সি সুরকভের কবিতাগুলি এক দিকে বিজয়লিপ্সা, অন্য দিকে অগ্রগতি ও জয়যাত্রার কামনায় উন্মুখর হইয়া তৎকালীন রুশদের মনোভাব সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করিতেছে।

'দি অর্ডার অব দি ডে' নামক কবিতায় দুর্দ্ধর্ষ কশাক যুবক সৈন্যদের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তাহারাও পিতৃদত্ত তরবারির সম্মান রক্ষার সুযোগ পাইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতেছে। সুরকভের জনপ্রিয় কবিতা 'দি রোড লিড্‌স্ টু দি ওয়েষ্ট' রুশ জাতির অতীত ইতিহাস স্মরণ করা হইয়াছে। যেরূপভাবে একদা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সৈন্য মস্কৌ হইতে পরাভূত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছিল অনুরূপ ভাগ্য জার্ম্মান-জাতির ইতিহাস কলঙ্কিত করিবে।

সুরকভের কবিতাগুলির সাময়িক মূল্য যথেষ্ট বলিয়া এগুলি একদা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু কাব্য-সৌন্দর্য্যের দিক হইতে বিচার করিলে ইহাদের বিশেষ সার্থকতা উপলব্ধি করা কঠিন। ইলিয়া ক্রেনকেলের "লিবারেটেড্ ভিলেজ" নামক কবিতায় জার্ম্মান সৈন্যের পশ্চাদপসরণে শান্তিপূর্ণ গ্রাম্য-জীবনযাত্রার যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহা মর্ম্মস্পর্শী। একটি ছত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে—In the village smithy yesterday silent, iron peacefully tinkles—ইহার মধ্যে সমগ্র গ্রাম্য জীবনের নিরুদ্বেগ ধারা যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। মানসপটে ভাসিয়া উঠে—

Familiar long-awaited seemingly unending
Streches the smoky line of huts.

নবেজেভ কুষাকের "দি রেড ষ্টার" নামক জনপ্রিয় কবিতা ষ্টালিন পুরস্কার প্রাপ্ত। রক্তবর্ণ তারকার বজ্র-সংঘাত চিহ্নিত অভ্যুদয়ের ইতিহাস স্মরণ করিয়া কবি বর্ণনা করিতেছেন,

For home, for all we love and for all that love us
Thou callest us again to righteous war.

শেষ স্তবকে এই যুদ্ধের মানবিক আদর্শ বর্ণিত হইয়াছে,

Strike comrades with new strength for liberation
For human rights for our beloved nation
Lead us to battle, red October star.

সাম্প্রতিক কবিতা মানবিকতার স্পর্শে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েট যুদ্ধকালীন কবিতার মূল্য এইখানে স্বীকৃত যে, ইহা সর্ব্বদেশের নরনারীর হৃদয় স্পর্শ করে।

বাঙ্গালা-রূপের উদ্ভবকাল বিচার

শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ-মজুমদার

মাতৃভাষা পরম শ্রদ্ধার বস্তু। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। এই বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি লোক কথা বলে। এই ভাষা-ভাষীর সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীতে সপ্তম। বাঙ্গালা ভাষায় আদি লেখকদের কথা আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম মনে হয়, ইহার উৎপত্তি এবং রূপের আবির্ভাব হইল কবে? এ সম্বন্ধে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বলেন—"খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের আগে বাঙ্গালারূপের আবির্ভাব হয় নাই, একথা সকলেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির সময় নিয়ে নানা মুনির নানা মত। যত দূর দলিল-প্রমাণ আমরা পেয়েছি তাতে আমাদের বলতে হয় যে

মীননাথই বাঙ্গালা ভাষার আদিম লেখক। তাঁর লেখা চার লাইনের একটি শ্লোক বৌদ্ধ গানের টীকায় উদ্ধৃত করা হয়েছে। সে শ্লোকটি এই—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাট।
কমল বিকশিল কহিহ ণ জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকেন ভমরা।

এই শ্লোকে 'পরমার্থের' 'বিকশিল' আধুনিক বাঙ্গালা-রূপের সমান। শব্দ ও ব্যাকরণ-বিচারে আমরা একে প্রাচীন বাঙ্গালা বলব।...

নাথপন্থার আদি গুরু এই মীননাথ। এটা বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় যে, একজন বাঙ্গালী গোটা ভারতবর্ষকে একটা ধর্ম্মমত দিয়েছিলেন।" (শনিবারের চিঠি, আশ্বিন—১৩৫১ বাং, ৩৮০-৩৮৬ পৃঃ)। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উক্ত শ্লোকের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন—"শৈব যোগীদের দু' একটি বোল পুঁথিতে তোলা আছে। একটি নাথদের আদি গুরু মীননাথের লেখা, খৃষ্টের ৮০০ শত বছরের লেখা, খাস বাঙ্গালা, এখনও বুঝিতে কষ্ট হয় না" (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ত্রিপুরা-শাখার ৫ম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ)। মীননাথ বাঙ্গালা ভাষার আদি লেখক এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। কিন্তু ডাঃ শহীদুল্লাহ্ বলিতেছেন—৭ম খ্রীষ্টাব্দের আগে বাঙ্গলা-রূপের আবির্ভাব হয় নাই এবং শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, উক্ত শ্লোকটি ৮ম খ্রীষ্টাব্দের লেখা। এ সব উক্তির মধ্যে যুক্তি-প্রমাণের অভাব আছে বলিয়া মনে হয়। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলেন—"নাথ-সিদ্ধাগণের সময় নির্ণয় করা বাঙ্গালাদেশের সাহিত্যের এবং ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক।" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৫৯-৬০ পৃঃ)। এখন বাঙ্গালা-রূপের উদ্ভবকাল স্থির করিতে হইলে মীননাথের সময় নির্ণয় করা আবশ্যক। শাস্ত্রী মহাশয় এবং ডাঃ শহীদুল্লাহ্ সম্ভবতঃ নিঃসন্দেহে মীননাথের সময় নির্ণয় না করিয়া ঐ উক্তি করিয়াছেন।

শ্রীভগানন্দ ও শ্রীশিবশঙ্কর সিংহ প্রণীত এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত নেপালের ইতিহাসে আছে যে, নিজ দেশের দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য নেপালরাজ ৫২২ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করিয়া সিদ্ধা-মীননাথকে নেপালের ললিত পত্তনে লইয়া গিয়াছিলেন। নেপালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ 'করণ্ডব্যূহে' মীননাথের জীবনী আলোচিত ও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। হড্‌সন বলেন—আসামের পুত্তলক পর্বত হইতে মীননাথ নেপালে নীত হইয়াছিলেন। তিনি অনুমান করেন ৫ম খ্রীষ্টাব্দে মীননাথ নেপালে যান এবং তথাকার অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দূর করিয়া দেন (R. A. S. J. Series VII. Part I, page 137, and Language Literature and Religion of Nepal and Tibet)। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হয়েন সাঙ বলেন, কপিলের শিষ্য অর্থাৎ সাংখ্যমতাবলম্বী ভববিবেক ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি মীননাথের সহিত দেখা করেন (রেভারেণ্ড বিল সাহেবের অনুবাদিত সিয়ুকী গ্রন্থ)। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভী তাঁহার *Le Nepal* গ্রন্থে লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে মীননাথ নেপ. ছিলেন। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ এবং গোরক্ষনাথের শিষ্য পদ্মবজ্র সরোরুহ বা পদ্মসম্ভব। প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত Schlaginlweit সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন—এই পদ্মসম্ভব ৭২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এসব উক্তি বিচার-বিবেচনা করিয়া প্রথমোক্ত মতকে নিঃসন্দেহে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত হইবে। তাহা হইলে মীননাথের সময় নিঃসন্দেহে ৫২২ খ্রীষ্টাব্দ। মীননাথই যখন বাঙ্গালা ভাষার আদি লেখক, তখন বাঙ্গালা-রূপের আবির্ভাব ৭ম খ্রীষ্টাব্দের পরে হইয়াছে ডাঃ শহীদুল্লাহ্‌র এই উক্তি যথার্থ বোধ হয় না। নিঃসন্দেহে বলা যায় বাঙ্গালা-রূপের আবির্ভাব ৫ম খ্রীষ্টাব্দেই হইয়াছে।

বাঙ্গালাদেশে কেহ কেহ মনে করেন যে, কৃত্তিবাসই বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি এবং বৈষ্ণব মহাজনগণই বাঙ্গালা পদাবলী সাহিত্যের প্রবর্ত্তক। এই ধারণা কিন্তু ভ্রমাত্মক। তবে বৈষ্ণব মহাজনদের হস্তেই যে বাঙ্গালা পদাবলী-সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবি কৃত্তিবাসের সময় আনুমানিক ১৪শ খ্রীষ্টাব্দ। পদাবলী সাহিত্যে বাঙ্গালার চণ্ডীদাস এবং মিথিলার বিদ্যাপতির খুব সুনাম আছে। ইঁহারা গৌরাঙ্গ-দেবের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সময় ১৪শ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগ অথবা ১৫শ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ, এবং গৌরাঙ্গদেবের সময় ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। উপরে উদ্ধৃত মীননাথের লেখাটি কবিতা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কবি কৃত্তি-বাসের প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা কবিতার জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, মীননাথই বাঙ্গালা আদি কবি।

পুস্তক-পরিচয়

নব-সন্ন্যাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স—১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে—৫৲ ও ৩৲ টাকা।

পরাধীন দেশের ভাবপ্রবণ যুবশক্তিকে অমূর্ত্ত আলোকপ্রাপ্তির মোহ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া মর্ত্যভূমির কর্ম্মপ্রবাহে যুক্ত করিয়া দেওয়ার মহিমাই উপন্যাসখানির মধ্যে বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই সর্ব্বস্বত্যাগের সাধনাতেই সন্ন্যাসের নূতন রূপ—বিপ্লবের পটভূমিকায় জীবনদর্শনের এই বলিষ্ঠ ভঙ্গীকে, জন্মভূমির বন্ধনমোচনের এই আদর্শকে উজ্জ্বল করিয়া আঁকিবার প্রয়াস উপন্যাসখানিতে দেখা যায়—অথচ আদর্শবাদ ইহার কাহিনীকে আত্মসাৎ করিতে পারে নাই। জীবনের গভীর প্রশ্নগুলি—তরুণ মনের ভাবে-কল্পনায়-আদর্শে মেশানো বৃত্তিগুলি, কখনও সেবার ব্যাকুলতায়—কখনও নূতন সৃষ্টির নেশায়—কখনও ঝড়ের দোলায়—কখনও বা বসন্ত-বার্ত্তার পুলকে সাতরঙা কিরণের মত ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের বৈচিত্র্য ও প্রসারের সীমা নাই। ঘটনাগুলি বিচিত্র লীলাপ্রবাহের দুধারে আপনি আসিয়া জড়ো হইয়াছে এবং স্রোতোধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একটি পূর্ণসত্তার অভিমুখে গল্পটিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

উপন্যাসখানি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে ঝরিয়া বরাকরের খনিচক্রের চিত্র—কয়লাখনির মনুষ্যত্বহারা শ্রমিকদের মধ্যে মানুষকে খুঁজিয়া পাইবার চেষ্টা—যার ফলে মাতঙ্গিচরণ দাস, তার বৈরিণী কন্যা চম্পা, বুদ্ধিহীন বনমালী, ইহাদের চারি পাশের নোংরা বস্তি, কয়লার কালিতে কালো আকাশ আর ফসলহীন রুক্ষ মাটি, এই সব উপাদান অরণিকাঠের মতই সংগৃহীত হইয়াছে। অগ্নিহোত্রী মাষ্টার মহাশয় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এই সকলের পুরোভাগে এবং এই পটভূমিকাতেই অমূর্ত্ত আলোক-পিপাসু, ভাবপ্রবণ যুবক টুনুকে নূতন সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন তিনি। এই খণ্ডটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ—গল্পের গতিবেগ বাড়াইবার জন্য লেখক বিন্দুমাত্র প্রয়াস পান নাই, চমক লাগাইবার মত উপকরণ লইয়াও সেগুলিকে কাহিনীর মুখ্য বস্তু করেন নাই। যেমন—বস্তির বাস্তব চিত্রে গোটা বস্তিটার আলোক-চিত্র পাওয়া যায় না, তবু বস্তিটিকে চিনিতে ভুল হয় না। কু-চিত্রণে জিনিষটাকে ভয়াবহক না করিয়াও সংযম-কৌশলে বাস্তবকে স্ব-মহিমায় প্রকাশ করা সম্ভব—তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চম্পা। মিশনরী স্কুলে স্বল্প শিক্ষাপ্রাপ্ত এই যুবতী-তরুণীর স্বৈরাচার অনুরাগের আগুনে পুড়িয়া খাঁটি সোনা হইয়াছে। এ ছাড়া খনির ম্যানেজারের প্রতিকূলতা লইয়া বেশ খানিকটা নাটকীয় ব্যাপার সৃষ্টি করা চলিত—সেটুকু যথাসম্ভব সংক্ষেপে সারা হইয়াছে।

এই খণ্ডে মন্থরগতি ঘটনার সঙ্গে চম্পা-টুনুর জীবনপ্রবাহ কৌতূহলকে তেমন উদ্রিক্ত করে না—যদিও ইহাদের মনোজগতের লীলামাধুর্য্য মনের কোথায় যেন লাগিয়া থাকে। এই খণ্ডটিকে রস-প্রস্তুতির ক্ষেত্র বলা যায়। ইহাতে উত্তেজক ঘটনাপ্রিয় পাঠককে খানিকটা ক্ষুণ্ণ করে কিন্তু রসগ্রাহী পাঠক রসবিস্তারের এই প্রয়াসকে অভিনন্দিতই করিবেন।

প্রথম খণ্ডের শেষাংশে টুনুর অসংযত আচরণের ফল—দ্বিতীয় খণ্ডে পৌঁছিবার আগ্রহকে অতিমাত্রায় উদ্দীপ্ত করিয়া তুলে। দ্বিতীয় খণ্ডে আট বৎসরের ব্যবধানে তাই ঝরিয়া বরাকরের মাটি ছাড়িয়া মেদিনীপুরের মাটিতে কাহিনীর সুরু। এই মাটি নহিলে স্বাধীনতার সংগ্রামকে তীব্র করিবার উপাদানই বা মিলিত কোথায়? এখানে মাষ্টার মশাই নাই—কিন্তু যে আগুনে তিনি আত্মাহুতি দিয়াছেন, তাহা শান্তি-আশ্রমের অন্তরে পূর্ণশক্তিতে বিদ্যমান। তার এক একটি স্ফুলিঙ্গ, নরোত্তম, বালক হীরক

প্রভৃতি আশ্রমের কর্মীবৃন্দ। টুলুর জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করিতে আসিয়াছে তটিনী। বিপ্লবের ঘন-ঘটা বাহিরে এবং অন্তরে—ঘর বাঁধিবার, সেবা করিবার নেশার সঙ্গে ঘর ভাঙ্গিবার, স্বাধীন হইবার সাধনাতে মিশিয়া ঘটনার পর ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছে। আগষ্ট বিপ্লব, বন্যা, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, মেদিনীপুরের বুকে জাতীয়তাবোধের শক্তিকে জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজনে শেষ হয় নাই, টুলুর নিরাসক্ত সন্ন্যাস জীবনে, পূর্ণিমার চাঁদ ও বসন্ত-বায়ু মায়া বিস্তার করিয়াছে। এই ছন্দকাহিনীর রস এবং ইতিহাসের তথ্য, বিপ্লবীর জীবনদর্শনের সত্যকে মেলিয়া ধরিয়াছে, আর সমস্ত চরিত্র তারই আলোর পথ বাহিয়া অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে পৌঁছিয়াছে। নব-সন্ন্যাস আমাদের স্বাধীনতায়, সাধনার সার্থক চিত্র, এমন চিত্র বাংলা উপন্যাসে খুব বেশী নাই। প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মনীষী মওলানা আবুল কালাম আজাদ—রেজাউল করীম-এম্ এ, বি এল। নূর লাইব্রেরী, ১২।১, সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা৭ মূল্য ৩্।

গ্রন্থকার বাংলাসাহিত্যে সুপরিচিত, তাঁহার লিখনভঙ্গী সহজ, কোথাও জড়তা নাই। মওলানা আজাদ সাহেবের জীবন-পরিচিতি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত করিয়া তিনি অতি সঙ্গত কাজ করিয়াছেন। পরলোকগত মহাদেব দেশাই প্রণীত ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সমস্ত উপাদান সংগৃহীত হইলেও ইহা অনুবাদ নহে, বিশেষ করিয়া মওলানার ধর্মমতের ব্যাখ্যা অতি সুন্দর হইয়াছে—হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলে ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন।

নানা অনিবার্য কারণবশতঃ গ্রন্থকার ১৯৪৭-এর পরবর্তী ঘটনাবলীর ও তাহার মধ্যে মওলানা আজাদ সাহেবের চরিত্রস্ফূর্তির বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ) সন্নিবেশিত করিতে পারেন নাই। পাঠকমাত্রেই এ বিষয়ে অভাববোধ করিবেন। তাঁহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে সংবাদপত্রে সামান্য যাহা কিছু বাহির হইয়াছিল, তাহার উল্লেখমাত্র করিলেও পুস্তকের উপযোগিতা আরও বাড়িত।

আল-হেলালের প্রচ্ছদপট দেওয়া সত্ত্বেও পুস্তকের মূল্য বেশী ধরা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সন্ধ্যামালতী—শ্রীআশুতোষ সান্যাল। উষা পাবলিশিং হাউস, ৩৪, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা। দাম ১৸০।

এখানি কবিতার বই। অধ্যাপক আশুতোষ সান্যাল কবিতা লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। "সন্ধ্যামালতী" তাঁহার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিবে। কবিতাগুলিতে লেখকের অন্তর্গূঢ় বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে।

> ভুলতে পারি সকল কথা—পারি না সেই স্মৃতিটি,
> পালিয়ে গেছে কোকিল, তবু কর্ণে বাজে গীতিটি।

তিনি বলিতেছেন,

> যদি এল অমারাতি নিয়ে তার সান্দ্র অন্ধকার,
> কোন্ প্রয়োজন ছিল কর্পূর-ধবল জ্যোছনার?

সন্দেহ জাগিতেছে,

> ভাল কি লাগিবে মোর ভালবাসা,
> আমার স্বপন—করুণা—আশা?

প্রশ্ন করিতেছেন,

> সন্ধ্যামালতী বলিতে পারিস্ কে তোরে বাসিত ভালো?
> দিনের অন্তে সাজাতিস্ তুই কার কুন্তল কালো?

জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে না,

> বনের কাঁটা তুলতে পারি, মনের কাঁটা যায় না তোলা,
> মরমে যা রইল গাঁথা, সহজে তা যায় কি ভোলা?

শব্দচয়ন, পদমাধুর্য্য এবং ছন্দ-বৈচিত্র্য "সন্ধ্যামালতী"কে মনোহর করিয়াছে। তুমি যেন প্রিয়া,

> কান্তপদাবলী-সম হৃদয়হারিণী।

"সন্ধ্যামালতী" পাঠকের মনকে নন্দিত করিবে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা।

সাহিত্যানুরাগীর নিকট বিভূতিভূষণের নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। "প্রবাসী"র পাঠকের নিকট ত তিনি একান্ত সুপরিচিত। বইখানি সঙ্কলনগ্রন্থ। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ছোট গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত। সেগুলি নানাধরণের। তাঁহার রচিত গল্পও অসংখ্য। বিভিন্ন ভঙ্গী ও শ্রেণীর নিদর্শন-স্বরূপ একএকটি বিশিষ্ট গল্প লইয়া গ্রন্থখানি সঙ্কলিত। রাণুর প্রথম ভাগ, বরযাত্রী, ননীচোরা, চৈতালী, হৈমন্তী, বর্ষায়, ব্রজাগুল, মাসী প্রভৃতি পনরটি গল্প ইহাতে আছে। বিভূতিভূষণের গল্পের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য স্নিগ্ধতা। তাঁহার গল্পে হাসি ও অশ্রু দুই-ই আছে। গোড়ায় শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য লিখিত একটি ভূমিকা আছে। এই স্নিগ্ধতা হাসি-অশ্রু-রঙ্গ-রহস্যভরা তাঁহার গল্পগুলিকে সুন্দর করিয়াছে। এই স্নিগ্ধতা তাঁহার শিশু ও কিশোর চরিত্রকে সুমধুর করিয়াছে। যাঁহারা আগেই পড়িয়াছেন এবং যাহারা নূতন পড়িবেন, উভয়প্রকার পাঠকের পক্ষেই এই সুনির্ব্বাচিত গল্পসংগ্রহ আনন্দের কারণ হইবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নিয়োগ বিষয়ক অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণ—অধ্যাপক কস্তুরচাঁদ লালুয়ানী। ১২৩ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭৪। মূল্য ২।০।

বর্তমান গ্রন্থে লেখক ধনবিজ্ঞানের একটি জটিল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। একাদশটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার কেইনস্‌ ও সেকেলে (ক্লাসিকাল) অর্থশাস্ত্র, অর্থনৈতিক সমস্যা, কেইনসের অর্থনৈতিক পরিভাষা, সঞ্চয় ও পুঁজি নিয়োগ, নিয়োগ (এমপ্লয়মেন্ট), সুদ, নিয়োগ সরবরাহের (সাপ্লাই) দিক, ব্যবসায় চক্রাবর্ত্ত (ট্রেড সাইকেল) প্রভৃতি নিপুণতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের মতে "প্রত্যেক দেশ যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করিতে থাকে এবং ধন বিতরণ বৈষম্য যদি নির্দ্দিষ্ট সীমা-রেখার বাইরে না যায়, তা হলে বিনা রক্তপাতে, বিনা পরিশ্রমে এমন সব রাষ্ট্র পৃথিবীর বুকে গড়ে উঠবে যা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার খণ্ডকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই সফল করতে পারবে।" পরেই লেখক বলিতেছেন, "সারাটা পৃথিবী জোড়া পূর্ণ নিয়োগ যেদিন আসবে সেদিনই কেবল বিশ্ব-শান্তি সম্ভব হবে, তার আগে নয়।" খুব খাঁটি কথা। 'অতিমুদ্রা' বা মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধেও লেখক প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিয়াছেন। বিখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্‌ কেইনসের মতবাদ গ্রন্থকার বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া উহার মূল্য নির্দ্ধারণে প্রয়াস পাইয়াছেন। অবশ্য যে মতবাদ আমাদের নব নব আর্থিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করিতে পারে এবং উহার সমাধানের উপর আলোকপাত করিবে তাহাই সুধীসমাজে গ্রহণীয়। বিশেষ কোন দেশের বিশেষ সময়ের অবস্থার ভিত্তিতে যে ধনবিজ্ঞানের সূত্র রচিত হইয়া নির্ব্বিচারে দেশ-বিদেশে স্বীকৃত হইবে সেদিন আর নাই। বাস্তবের দৃষ্টিতে এবং সমগ্রভাবে মানবকল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক সূত্রের যে মূল্য ধনবিজ্ঞানের মতামতও সেই মূল্যই প্রত্যাশা করিতে পারে—উহার বেশী নহে। বাস্তব জগৎ গণিতের নিয়মে চলে না—ধনবিজ্ঞানীর একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। গণিতবিশারদ অর্থশাস্ত্রীরা একথা অনেক সময় ভুলিয়া যান বলিয়া নানা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

এই পুস্তকের শেষে একটী মূল্যবান পরিভাষা-তালিকা দেওয়ায় বিষয়-বস্তুর জটিল আলোচনা পাঠকের নিকট সরল হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ আরও ভাল কাগজে ছাপা উচিত ছিল। গ্রন্থখানি ধনবিজ্ঞানের পাঠকমহলে, বিশেষ ভাবে ছাত্রসমাজে আদর-লাভ করিবে বলিয়া আশা করি।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা—শ্রীরাখালদাস সোম। দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৬৩, মূল্য ৩৲।

জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ তারিখে স্বাধীন ভারত যে পতাকা উড্ডীন করিয়াছে তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে শতাব্দীর সাধনা, আত্মবলি ও রক্তের আহুতি। এই দিনের আনন্দে যেন আমরা অতীতকে না ভুলি লেখক তাহা দেশের ভাই-বোনদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। পুস্তকে কয়েকখানি ছবি দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ভারত কি করে স্বাধীন হল—শ্রীবিভাস দে। ছুটির আসর। ৭, সোয়ালো লেন। ৭৭ নং ঘর, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

সহজ ভাষায় লিখিত কিশোর-কিশোরীদিগের পাঠযোগ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস। ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তন হইতে স্বাধীনতালাভ পর্য্যন্ত প্রধান ঘটনাগুলি সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

সাধু সভাপতি স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ স্মৃতিকথা—স্বামী সত্যানন্দ গিরি। মহেশ লাইব্রেরী। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

জীবন সম্বন্ধে যাঁহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু তাঁহারা গিরি মহারাজের স্মৃতিকথা পড়িয়া শিক্ষা এবং আনন্দ উভয়ই পাইবেন। গিরি মহারাজ আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ এবং সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; দেশী ও বিদেশী ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন—তাঁহার উপদেশ গভীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত।

নিশাঠাকুরের কড়চা—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

গদ্য-কবিতা এখনও নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছে। কারও হাতে ফুটে উঠছে ছন্দলাবণ্যে, কারও হাতে হয়ে পড়ছে বর্ণরাগহীন, নীরস। বর্ত্তমান কাব্যগ্রন্থে কবি নিপুণহাতে প্রয়োগ করেছেন এই নব রীতিকে, গদ্যে পদ্যে দিয়েছেন জোড় মিলিয়ে। মাঝে মাঝে হঠাৎ দু' চার পংক্তির শেষে বেজে ওঠে ধ্বনির মিল, লাগে মৃদু সুরের ঝঙ্কার। আবার চলতে থাকে স্মৃতি-কাহিনী অপেক্ষাকৃত অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে। আমাদের পুরাতন গ্রাম্য জীবনে ছিল এত স্বপ্ন, এত কল্পনা, এত রহস্য। আলোছায়ার বিচিত্র রঙে কবি এঁকে গেছেন ছবির পর ছবি। সেই বাঁশঝাড়—যার ভিতরে একবার ঢুকলে "সহসা ফিরতে পারত না কেউ।" আর "তে-কোণা দীঘি" যাতে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে "হর হর মহাদেব" বলে সন্ন্যাসীরা জলে পড়ত ঝাঁপিয়ে"। "সেদিন গেছে ফুরিয়ে—সকালের সোনার আলো—জ্বলে যায় যেমন সাঁঝের আগুনে।" প্রথম কবিতার নামে বইয়ের নাম। তা ছাড়া আছে 'জঙলা মাঠ', 'আমরুল', 'দেখা ও দর্শন' এবং 'এক যে ছিল মানুষ' নামে চারটি কবিতা। প্রথম কবিতায় রহস্য-ঘন পুরাতন কাহিনীর মধ্যে পাঠক মন্ত্রমুগ্ধ হবেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাবেয়া অমলেন্দু ১ম পর্ব্ব :—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক :—এ, চক্রবর্ত্তী, বি, এ, রাজসাহী। মূল্য ২৷৵০।

অবাঞ্ছিত ঘটনাপূর্ণ পরিবেশ ও অসংযত বর্ণনা ভারাক্রান্ত একখানি উপন্যাস। পড়িতে পড়িতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে।

দ্বি-স্রোতা—শ্রীসুষমা সেনগুপ্ত। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স। ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২৷০।

উপন্যাস। নায়ক অসিত নয় শত টাকা বেতনের চাকুরে। সুপুরুষ এবং ভাল ঘরের ছেলে—অবিবাহিত। সুতরাং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বহু কুমারী মেয়ের কল্পনার অন্ত নাই, কিন্তু অসিতকে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে রেখা নামে একটি মেয়ের প্রেমে পড়িতে দেখা গেল—যাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে তার ডালহৌসী স্কোয়ারের মোড়ে। কিন্তু এই সাক্ষাৎকে পরিচয়ের পর্য্যায়ে লইয়া আসিতে গিয়া যে সস্তা পরিবেশের সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার প্রশংসা করা যায় না। ইহার পরে নানা ঘটনাবৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া উভয়ের বিবাহ ঘটিল। রেখা আদর্শ চরিত্র নারী। সে ডাক্তার। অক্লান্ত পরিশ্রমে একটি ছোট হাসপাতাল করিয়াছে, এবং সেবাধর্ম্মকে সে জীবনের চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বিবাহিত জীবনে সংঘর্ষ দেখা দিল এই পথ ধরিয়া। বিবাহের পূর্ব্বে একটা মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেও বিবাহের পরে অসিতের সে প্রতিশ্রুতি পালনে শৈথিল্য দেখা দেয়, কিন্তু রেখার ব্যক্তিত্বের কাছে

তাহাকে হার মানিতে হয়। অবশেষে অসিতের জীবনপথে শীলার সাক্ষাৎ মেলে।

রেখা এবং শীলার চরিত্র চমৎকার ফুটিয়াছে। দুটি চরিত্রই বিভিন্নমুখী ধারায় এবং স্বকীয়তায় সুপরিস্ফুট। কিন্তু অসিতের প্রতি লেখিকা অবিচার করিয়াছেন। নারী-চরিত্রগুলিকে প্রাধান্য দিতে হইবে বলিয়াই অসিতকে এভাবে চিত্রিত করা উচিত হয় নাই।

সামান্য কতকগুলি ত্রুটি বাদ দিলে উপন্যাসখানি অধিকতর সুখপাঠ্য হইত।

৩। বিসর্জ্জনের পর—দীনেন্দ্রকুমার রায়। শ্রীদীপেন্দ্রকুমার রায় কর্তৃক রহস্যলহরী পাবলিশিং হাউস, রাণাঘাট, নদীয়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০।

পুস্তকখানি রহস্যলহরী উপন্যাসমালার ২১৬.নং উপন্যাস। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। এই শ্রেণীর উপন্যাস লিখিয়া তিনি একশ্রেণীর পাঠকমহলে বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন। আলোচ্য উপন্যাসখানিতেও তাঁর রচনানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পড়িতে পড়িতে একটা বিশেষ ধরণের আগ্রহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বানান ও ছাপার ভুল অত্যন্ত বেশী।

৪। রোমাঞ্চ : প্রথম খণ্ড :—শ্রীঅসিতকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত; রোমাঞ্চ গ্রন্থাগার, ১২, হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

এই সঙ্কলনে ছয়টি গল্প স্থান লাভ করিয়াছে। যাঁহারা এই শ্রেণীর রহস্যপূর্ণ গল্প পড়িতে ভালবাসেন, তাঁহারা বইখানি পড়িয়া আনন্দ পাইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বইখানি এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলা চলে। বিশেষ করিয়া রাতের অতিথি, বিভীষিকা, সংঘর্ষ ও লমুক্রিয়া নামক গল্প কয়টি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

বানান ভুল পুস্তকখানির একটি বড় ত্রুটি। প্রচ্ছদপট সুন্দর।

শিশু-কবিতা—শ্রীআশুতোষ কাব্যতীর্থ সম্পাদিত। শ্রীতাস কর্ণার—৫নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা।

ছোটদের কবিতা-সঙ্কলন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া বহু খ্যাতনামা কবির মোট ৪১টি কবিতা ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। প্রায় সবগুলি কবিতাই সুলিখিত। পুস্তকখানি ছোটদের কাছে আদৃত হইবে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

মিন্টুর গল্প—শ্রীবিমল বসু। পরিবেশক—ছোটদের আসর। ১৬-এ, ডক্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

বছর দশেক আগে 'সত্যি না স্বপ্ন' এই নামে সমালোচ্য পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের গল্পগুলি কলিকাতা বেতারে তখনকার ছোটদের আসরে পঠিত হইয়া বিশেষ সমাদরলাভ করিয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া বেতারের আসরের নির্মলদাই শুধু ছোটদেরই নয়, বড়দেরও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই বইয়ের প্রত্যেকটি গল্পই মণিমুক্তার মত নিটোল, অনাবিল হাস্যরসে সমুজ্জ্বল। শিল্পী সমর দে-র আঁকা রমণীয় প্রচ্ছদপট পুস্তকখানিকে শিশুদের নিকট রীতিমত লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

ছবি ছড়ায় নেতাজী—শ্রীবিজয়রতন বসাক। সি সি বসাক এণ্ড সন্স। ১২৭, মসজিদবাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দশ আনা।

ইহাতে ছবি ও ছড়ার সাহায্যে শিশুদের উপযোগী করিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে।

ছন্দা—শ্রীমহেন্দ্রলাল সেন। চন্দ্রনাথ লাইব্রেরী, শ্রীহট্ট। মূল্য ১।০ টাকা।

গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত নহেন। তাঁহার 'আবছায়া' নামক পুস্তকখানি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রশংসিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তকখানি গল্প সঞ্চয়ন। ইহাতে ছন্দা, জ্যোৎস্না, বান্ধবী, যোগাযোগ, চাঁদ নয় মাটি, দান নয় পাওনা এবং আজ ও কাল—সবশুদ্ধ এই সাতটি গল্প স্থান পাইয়াছে। 'জ্যোৎস্না' গল্পটি মোপাসাঁর একটি বিখ্যাত গল্পের ছায়া অবলম্বনে লেখা—বাকিগুলি মৌলিক। লেখকের গল্প বলার ভঙ্গীটি চিত্তাকর্ষক।

রবীন্দ্রনাথের কথা—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সান্যাল এণ্ড কোম্পানী ১-১ এ, কলেজ স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

লেখক 'বঙ্গীয় শব্দকোষের' সঙ্কলয়িতা হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অনুসারেই তিনি এই অভিধান সঙ্কলন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকেই তিনি অধ্যাপকরূপে ইহাতে যোগদান করেন এবং রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্য লাভ করিয়া তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হন। বর্ত্তমান পুস্তকে তিনি তাঁর সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা 'মানুষ' রবীন্দ্রনাথকে জানিবার ও বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। শান্তিনিকেতন আশ্রমের আদিপর্ব্ব সম্বন্ধে পাঠক সাধারণের কৌতূহলের অন্ত নাই—এই পুস্তক হইতে সেই কৌতূহল কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইবে। 'বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে লেখক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয়ের কথা এমন নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, অভিনয়-দৃশ্যটি যেন চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতার এবং গদ্য রচনার যে সকল সমালোচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে সুপণ্ডিত লেখক যে সুপরিণত রসবোধেরও অধিকারী সে পরিচয় পাওয়া যায়। 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' হইতে তিনি মণিমুক্তার মত মহার্ঘ্য, রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি উক্তিও এই পুস্তকে সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। এই বইয়ে নানা দৃষ্টিকোণ হইতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপের উপর আলোক সম্পাত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তী ভূমিকায় সত্যই বলিয়াছেন—'যাঁরা অন্তর্দৃষ্টি-পূর্ণ জ্ঞান-গম্ভীর এই রচনাটি পাঠ করবেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহু তোরণ তাঁদের সম্মুখে খুলে যাবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।" কথাগুলি খুবই খাঁটি।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

যোগচতুষ্টয়—স্বামী সুন্দরানন্দ। উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩। ১৩৬ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের নিজ জীবনে আচরিত সমন্বয়-সাধন-ধারায় যোগ চতুষ্টয় যথা—ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ যে ভাবে বিকশিত হইয়াছিল, যার সারকথা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও লেখনীতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, সেগুলিরই সবিস্তার সরল বিশ্লেষণ, বিভিন্ন শাস্ত্রীয় আকরগ্রন্থের প্রমাণ-প্রয়োগ সহ সুপণ্ডিত গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রথমে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। তৎসমুদয় প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনক্রমে,

বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত যোগ-চতুষ্টয়ের যে প্রতীক্-চিত্র রামকৃষ্ণ-মিশনের যাবতীয় পুস্তকাদিতে দৃষ্ট হয় তাহা বর্তমান গ্রন্থেরও মলাটে দেদীপ্যমান এবং উহার তাৎপর্য্য গ্রন্থ-মধ্যে সরল ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সাধন ভজনে আগ্রহান্বিত লোকের সংখ্যা যেমন কম তেমনই এ বিষয়ে নির্দ্দেশদানে সমর্থ সদুপদেষ্টা এবং সহজবোধ্য গ্রন্থাদিও কম। আলোচ্য-গ্রন্থে প্রধান চারিটি যোগের তত্ত্ব বুঝিবার সহায়তা তো হইবেই, উপরন্তু সাধন-পদ্ধতিও ইহাতে বর্ণিত হওয়ায় এই পুস্তক ধর্মানুরাগীদের যথেষ্ট উপকারে লাগিবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দেশ-বিদেশের কথা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ে সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে সঙ্ঘের সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত সঙ্ঘ-সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সভ্যগণ ইহাতে যোগদান করেন। সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দজী মহারাজ সঙ্ঘের বার্ষিক কার্য্যাবলীর [১৯৪৬-৪৭] বিশদ বিবরণ পাঠ করেন। উক্ত বিবরণী হইতে জানা যায়—আলোচ্য বর্ষে সঙ্ঘের বিভিন্ন প্রচারকদল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান শহর ও তিন সহস্র গ্রামে ব্যাপকভাবে হিন্দু ধর্ম্মের আদর্শ ও সংস্কৃতি প্রচার করেন, এবং সঙ্ঘের সেবকগণ কাশী, গয়া, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে যাত্রীদের সুখসুবিধার জন্য বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। সঙ্ঘকর্ত্তৃক তীর্থযাত্রীদের আহার, আশ্রয় এবং পাথেয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। ধর্ম্মপ্রচার ব্যতীত শিক্ষা-বিস্তার, সমাজ-সংস্কার, অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, অপহৃতা নারীর উদ্ধার, মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠা, রক্ষীদল গঠন, শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, কু-সংস্কার দূরীকরণ প্রভৃতি বিবিধ জন-কল্যাণমূলক কর্ম্মও সঙ্ঘকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে সঙ্ঘ কলিকাতা, নোয়াখালি ও ত্রিপুরার দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে এবং চট্টগ্রাম ও ফেণীর বন্যাপীড়িত স্থানে ব্যাপকভাবে সেবা-কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। এতদ্ব্যতীত দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য কতিপয় দাতব্য চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সভায় পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তগণের সেবা ও পুনর্ব্বসতি-কার্য্যের সুব্যবস্থা, বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দু-ধর্ম্মের ব্যাপক প্রচার-ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কিত কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বিনোদবিহারী গুপ্ত

বিগত ১৫ই ফাল্গুন বিনোদবিহারী গুপ্ত মহাশয় পরিণত বয়সে আসানসোলে পরলোকগমন করিয়াছেন। গুপ্ত মহাশয় আই. বি. আর. এস. এম-এর সব্-এজেন্ট রূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। চট্টগ্রাম লাইন যাঁহাদের

বিনোদবিহারী গুপ্ত

উদ্যোগে খোলা হয় তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। এই চাকুরী ছাড়িয়া প্রথমে তিনি কয়েক বৎসর বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে এবং পরে বারমণ কোম্পানীতে চিফ একাউন্টান্ট রূপে কাজ করেন; কিন্তু স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতি ঝোঁক থাকায় তিনি অবশেষে পণ্ডিত সুন্দরলালের সঙ্গে ষ্ট্যাণ্ডার্ড এইরেটেড ফ্যাক্টরী নামে একটি ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া আরো ছোটখাটো নানা ব্যবসায়ের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল। অবশেষে তিনি হুগলী ষ্টীমার সার্ভিসে যোগ দেন এবং উক্ত কোম্পানী 'কাম নেভিগেশনে' রূপান্তরিত হইলে তাহার ম্যানেজিং এজেন্ট হন।

গুপ্ত মহাশয় একজন সজ্জন ও সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার গোপন দান ছিল প্রচুর। তাঁহার পুত্র শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত বাংলা মাসিক-পত্রিকা পাঠকমহলে পরিচিতি লাভ

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সার্কুলার